ভারতকোষ

প্রথম খণ্ড

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভারতকোষ

প্রথম খণ্ড

ভারতকোষ

প্রথম খণ্ড

ভারতকোষ

প্রথম খণ্ড

অওঘড় - ঊষানাথ সেন

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীসুশীলকুমার দে সভাপতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীনির্মলকুমার বসু শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শশিভূষণ দাশগুপ্ত সজনীকান্ত দাস

সহ-সম্পাদকবৃন্দ

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য শ্রীশঙ্খ ঘোষ

শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায় শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কলিকাতা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারি অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

ভারতকোষ প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গনির্বাচন, তথ্যসংকলন, রচনাসম্পাদন এবং প্রকাশনা বিষয়ে ইঁহারা সম্পাদক-সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন :

ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আর্দেশীর দীন্‌শা
শ্রীআবুল হায়াত
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য
ফাদার ফার্লো, পিয়ের
শ্রীবিজয় সিংহ নাহার
শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত

দর্শন

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী

ভাষা ও সাহিত্য

শ্রীঅমল ভট্টাচার্য
ফাদার আঁতোয়ান, রবেয়ার
শ্রীফেলিক্‌স য়ুর্লভ
শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনীতি

শ্রীঅনুপম গুপ্ত
শ্রীঅম্লান দত্ত
শ্রীঅশোক সেন
শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য
শ্রীনবেন্দু সেন
শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ রায়
শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়
শ্রীবৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীভবতোষ দত্ত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীনরেশচন্দ্র রায়
শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
শ্রীসুবিমল মুখোপাধ্যায়

আইন

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

ইতিহাস

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভূগোল ও গেজেটিয়ার

শ্রীইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঊষা সেন
শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়
শ্রীকাননগোপাল বাগচী
শ্রীতারাপদ মাইতি
শ্রীশরদিন্দু বসু
শ্রীসত্যেশ চক্রবর্তী

বিজ্ঞান

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য
শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীঅরুণকুমার শীল
শ্রীআরতি দাশ
শ্রীকনকশংকর রায়
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণাংশু রায়
শ্রীবাসন্তিকা লাহিড়ী
শ্রীমনোজকুমার পাল
শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ
শ্রীরমাতোষ সরকার
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিল্পকলা

শ্রীঅজিত ঘোষ
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীকানাই সামন্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদেবলা মিত্র
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শ্রীপুলিনবিহারী সেন
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
শ্রীমঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

ক্রীড়া

শ্রীঅজয় বসু
শ্রীকমল ভট্টাচার্য
শ্রীবেরী সর্বাধিকারী
শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু)
শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশনা

শ্রীআদিত্য ওহদেদার
শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
শ্রীশিবদাস চৌধুরী
শ্রীশিবশংকর মিত্র
শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী

মুখবন্ধ

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিশ্বকোষ 'আঁসিক্লোপেদি'তে দিদেরো লিখিয়াছিলেন, 'পৃথিবীময় যে জ্ঞান ছড়াইয়া আছে তাহা সমাহৃত ও সুবিন্যস্ত করা বিশ্বকোষের উদ্দেশ্য ; উক্ত জ্ঞানের মর্ম সমকালীন জনসমষ্টির নিকট ব্যাখ্যাত করা ও ভবিষ্যদ্বংশীয়ের হাতে উহা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা কোষগ্রন্থের লক্ষ্য। বিগত শতাব্দীর জ্ঞানচর্চা যেন অনাগত যুগের প্রয়োজনে লাগে ; উত্তরপুরুষ যেন আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানী হইয়া আমাদের অধিক সৎ ও সুখী হইতে পারেন'।

ইহাই সকল কোষগ্রন্থের মর্মবাণী। বস্তুতঃ আধুনিক কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত ও বিস্ময়কর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বাড়িয়াছে। মধ্যযুগের মত একালে কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাপারংগম হওয়া আর সম্ভবপর নহে। কোনও কোনও লেখক জল্পনা করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও মানবজ্ঞানের যে পরিসীমা ছিল লাইবনিট্‌সের (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রী) মত কোনও অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হয়ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহা অধিগত করিতে পারিতেন। এ দাবি কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যার পরিধি এত দূর সম্প্রসারিত হইয়াছে যে তাহাতে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। জ্ঞানবিজ্ঞানের এই অতি দ্রুত বিকাশের সহিত আধুনিক কালে আর একটি লক্ষণ দেখা দিয়াছে : 'স্পেশালাইজেশন' বা বিশেষজ্ঞতা অর্জনের অনুশীলন। ফলে এযুগে সর্বজ্ঞ তো দুর্লক্ষ্য বটেই, একই বিদ্যার সকল বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও দুর্লভ। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লাভের এই সকল বাধা অতিক্রমণে কোষগ্রন্থের সাহায্য স্বভাবতঃই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কেননা কোষগ্রন্থের কাজই হইল বিশ্ববিদ্যার সারাংশ সংকলন করিয়া উহা সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশন করা। সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কোষগ্রন্থ-সংকলকগণ সকল জাতির জ্ঞানসাধনার সংহিতা রচনা করিতে অবতীর্ণ হওয়ায় একটি উপরি-লাভ হইয়াছে। বিদ্যা যে সংকীর্ণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে, মানবজ্ঞান যে অবিভাজ্য— এই সত্য আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিকতার বোধ আরও পরিব্যাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ছিল বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্যই লিখিত প্রবন্ধসঞ্চয়ন। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র নবম সংস্করণ (১৮৭৫-৮৯ খ্রী) মুদ্রিত হইবার পর ঐ আদর্শ সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানরাজ্য সর্বসাধারণের নিকট অবারিত করিয়া দিবার প্রবর্তনায় প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষারীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিষয়বস্তুকে কোনও প্রকারে তরলীকৃত না করিয়াও সরল ও যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত ভাষায় উহার পরিবেশন আধুনিক কোষগ্রন্থের আদর্শ। পুরানো ধরনের বিশ্বকোষে প্রবন্ধগুলি হইত মনোগ্রাফের অনুরূপ। অধুনা ঐ রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাঠকসাধারণ যাহাতে সহজে ও অবিলম্বে জ্ঞাতব্য বিষয় খুঁজিয়া পান সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এখন প্রবন্ধের বিন্যাসভঙ্গী পরিবর্তিত ও আয়তন সংক্ষিপ্ততর হইয়াছে। স্কুল-কলেজের ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ হইতে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহারাও আজ তাই কোষগ্রন্থ পাঠ করিয়া অল্পায়াসে বিশ্ববিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারেন। এইরূপে, মাতৃভাষায় রচিত বিশ্বকোষ এযুগে লোকশিক্ষার বাহন হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বকোষগ্রন্থের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে উহার সংকলনকার্য

আসলে একটি মহৎ আন্দোলনের সমতুল্য। একটি সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গবেগে ইহার উদ্ভব। অন্য পক্ষে, জাতির পুনরুজ্জীবনের সাধনায় বহু বার ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। আদিযুগের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ-সংকলক ছিলেন বারো (১১৬-২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি জাতিতে রোমক। গ্রীসের সাংস্কৃতিক দাসত্বের উর্ধ্বে ওঠার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা রোমক জাতির চৈতন্যকে অধিকার করিয়াছিল, তাহারই প্রবর্তনায় তাহারা গ্রীক সংস্কৃতি অধিগত ও আত্মীকৃত করিতে থাকে। বিশ্বকোষ প্রণয়নে বারোর প্রচেষ্টা সেই প্রবর্তনারই পরিণাম। পরবর্তীকালে ইওরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের যুগেও ইহার বহু উদাহরণ মিলিবে। মাতৃভাষায় কোষগ্রন্থ প্রণয়নের সূত্রপাত এই যুগেই। প্রথম ইংরেজ মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাক্সটনের (১৪২২-৯১ খ্রী) নাম ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁসের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনিই আবার ইংরেজী ভাষায় বিশ্বকোষ ('মিরর অফ দি ওয়ার্লড', ১৪৮১ খ্রী) সংকলনের কাজে পথিকৃৎ।

বিশ্বকোষ যে কি প্রবল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে, ফরাসী বিশ্বকোষ 'আঁসিক্লোপেদি' (১৭৫১-৭২ খ্রী) তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সামন্ততন্ত্র, যাজকসংঘ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র— এবং সমগ্রভাবে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে এত বৃহৎ, এত সংগঠিত এবং এত স্পর্ধিত আঘাত ইতিপূর্বে হানা হয় নাই। ফলে কেবল মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শেরই নহে, পুরাতন সমাজব্যবস্থারও ভিত্তিমূল কাঁপিয়া ওঠে। যে ফরাসী বিপ্লব মানব-ইতিহাসে যুগান্তর প্রবর্তন করে, তাহা অনেকাংশে ফরাসী বিশ্বকোষ আন্দোলনের দান।

কেবল নূতন ভাবাদর্শের জোয়ার আনয়নের দিক দিয়াই নহে, নিছক সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলেও মনে হয়, ফরাসী বিশ্বকোষ রীতিমত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। পূর্বতন কোষগ্রন্থগুলি ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিবিশেষের একক প্রচেষ্টার ফল। ফরাসী বিশ্বকোষেই প্রথম বহু লেখকের সংঘবদ্ধ ও সমবেত সাধনা যুক্ত হইল। যে লেখকগোষ্ঠীকে দিদেরো ও দালাঁবেয়র প্রথমে জড়ো করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রুশো ও অল্‌বাক (Holbach) ব্যতীত আর কেহই প্রখ্যাত ছিলেন না। পরে 'আঁসিক্লোপেদি'র বিরুদ্ধে রাজরোষ ও যাজকসংঘের আক্রোশ যত তীব্র হইতে লাগিল, ফরাসী চিন্তাজগতের দিকপালগণ তত উৎসাহের সহিত উহার লেখকরূপে যোগ দিতে লাগিলেন। চতুর্থ খণ্ডে আসিলেন তুর্গো, দুক্লো, বর্দো, বুলাঁজে; পঞ্চম খণ্ডে ভোল্‌তেয়ার, মার্মোঁতেল, ফার্বোনে, দেলেয়ের; ষষ্ঠ খণ্ডে যোগ দিলেন দ্য ব্রস, স্যাঁ-লাঁবেয়র, মোর্‌লে, নেকার, কেনে। উক্ত চিন্তানায়কগণ লোকমানসে একই আন্দোলনভুক্ত লেখকরূপে এতই চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিলেন যে যৌথভাবে তাঁহারা 'এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট' বা 'বিশ্বকোষপন্থী' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যা সংকলনের কর্মোদ্যোগ ক্রমে কি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে, 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ১৭৬৮-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৩ খণ্ডে ইহার প্রথম প্রকাশ। তখন উহার মোট শব্দসংখ্যা ছিল ৩০০০০০০। বর্তমানে উহা ২৪ খণ্ডের এবং ৩৮০০০০০০ শব্দ সংবলিত কোষগ্রন্থে রূপান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ৮২০০-এরও অধিক বিশেষজ্ঞের সংঘবদ্ধ সহযোগিতা ব্রিটানিকার সাফল্যের মূলে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্থায়ী সম্পাদকীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দপ্তরে পৃথিবীর সকল প্রান্ত হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়। সেই সকল নূতন তথ্যের আলোকে ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রমাগত পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত বা পরিবর্জিত হইতেছে। ইহাকেই বলে 'কন্‌টিন্যুয়াস এডিটিং' বা বিরতিহীন সম্পাদনা। নূতন সংস্করণ প্রকাশ না

করিয়াও এইভাবে ব্রিটানিকাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রামাণিক ও আধুনিকতম আকরগ্রন্থ রূপে অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। আধুনিকতম তথ্য সহজলভ্য করিবার জন্য ব্রিটানিকাতে আরও দুইটি ব্যবস্থা আছে : ১. বর্ষপঞ্জীপ্রকাশ ও ২. গবেষণাকেন্দ্র। 'ব্রিটানিকা বুক অফ দি ইয়ার' নামে বর্ষপঞ্জীতে প্রতি বৎসরের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্নিবেশিত হয়। 'লাইব্রেরি রিসার্চ সার্ভিস' নামক ব্রিটানিকার গবেষণাদপ্তর হইতে গ্রাহকবর্গের জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বকোষ আন্দোলনে প্রথমেই প্রয়োজন বহু বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা। তারপর এই চারিটি জিনিস অপরিহার্য : ১. স্থায়ী সম্পাদকীয় দপ্তর ২. বিরতিহীন সম্পাদনা ৩. বর্ষপঞ্জী এবং ৪. গবেষণাকেন্দ্র।

বাংলা দেশের কোষগ্রন্থগুলি প্রথম সংকলিত হইতে থাকে উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিতে। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সহিত এই সকল সংকলন বিশেষভাবে জড়িত হইয়া আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮২২-৫৮ খ্রী) ছিল অভিধান ও বিশ্বকোষের সমন্বয়। পরিশিষ্টসহ ইহা ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলন ও প্রকাশ -কার্যে প্রায় ৪০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং বহু পণ্ডিতজনের সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়াছিল। অজস্র অর্থব্যয়ে সম্পাদিত এই গ্রন্থ রাধাকান্ত দেব বিনামূল্যে বিতরণ করেন। দেশ-বিদেশের সুধীসমাজ ইহাকে সাদর অভিনন্দন জানান। আজ পর্যন্ত ইহার সেই সমাদর অক্ষুণ্ণ আছে ; ইহার একাধিক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে। 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের কিছুদিন পরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি আঠার বৎসরের চেষ্টায় অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৮৭৩-৮৪ খ্রী) এই গ্রন্থের নাম 'বাচস্পত্য' অভিধান। শব্দকল্পদ্রুমের ত্রুটি পরিপূরণের উদ্দেশ্যে ইহাতে অনেক নূতন শব্দ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

বাংলায় বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজে প্রথম অগ্রসর হন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি। ১৮১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে 'বিদ্যাহারাবলী' নামক গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হন। ইহার প্রথম খণ্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' এবং 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামক দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সংকলিত ও অনূদিত 'সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী'র (১৮৩৩ খ্রী) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্সিজ' নামক গ্রন্থের ১৩টি কাণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৪৬-৫১ খ্রী)। বিবিধ বিদ্যার আকর হইলেও ইহাকে ঠিক বিশ্বকোষ বলা চলে কিনা বিচার্য। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের মধ্যে বৈদেশিক জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করা। বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে ইহার ব্যবহার ছিল।

তিন ভাগে ১৬৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত (১২৮৯-৯৯ বঙ্গাব্দ) ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণপূর্ণ 'ভারতকোষ' বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রসঙ্গ সংবলিত প্রথম বিশ্বকোষ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ হইতে ইহা খণ্ডশঃ প্রচারিত হইতেছিল ; রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব ছিলেন ইহার সংকলক। তবে এরূপ গ্রন্থের পাঠকগোষ্ঠী তখনও গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়া ইহা তেমন সমাদর লাভ করে নাই মনে হয়।

বাংলা বিশ্বকোষের ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথ বসু -সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ বাঙালীর একটি গৌরবস্তম্ভ-স্বরূপ। আজ পর্যন্ত ইহাই বাংলায় একমাত্র সুপরিচিত ও সুসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আরব্ধ (১ম খণ্ড ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) ২২ খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থ নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সমাপ্ত হয়। সেকালের বহু মনীষী সংকলনের এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সমগ্র দেশে ইহার সমাদর হইয়াছিল। পরে (১৯১৬-৩১ খ্রী) ২৪ খণ্ডে ইহার একটি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১৩৪০-৪৫ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের ৪ খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৩৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যুতে এই নবীন সংস্করণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বিশ্বকোষের কাজে হাত দিবার পূর্বে নগেন্দ্রনাথ 'শব্দেন্দুমহাকোষ' নামক ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ্যমান আর একখানি মহাকোষের কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহাতে ৪০০ পৃষ্ঠায় অ-কারাদি শব্দের কিছু অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত-দর্পণ' নামে আর একখানি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সূচনায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রকাশের কার্য আরম্ভ করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে সম্পাদকদ্বয়ের পরলোকগমনের ফলে দুইখানি গ্রন্থেরই অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশ্বকোষের ৪ খণ্ড এবং মহাকোষের ২ খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত কোষগ্রন্থগুলি সমস্তই ছিল প্রায় ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল। কিন্তু অধুনা স্বাধীনতালাভের পর হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সরকারি বা সাধারণের অর্থে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের সূচনা দেখা যাইতেছে। মাতৃভাষার মর্যাদা বাড়িয়াছে; প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বিশ্বকোষ সংকলনের প্রস্তাব তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তামিল, তেলুগু, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় সংকলনের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

তামিল বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ঘোষিত হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। গত বৎসরের প্রারম্ভে ৯ খণ্ডে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে— ৭৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫ টাকা। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তেলুগু বিশ্বকোষের প্রারম্ভিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রতি খণ্ড ৮০০ পৃষ্ঠা হিসাবে ১৬ খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। এক-এক খণ্ডে একটি বা একাধিক বিষয়ের ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের বিবরণ থাকিবে। তেলুগু ভাষাসমিতি এই কার্যের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত ৭ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা। কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভার তত্ত্বাবধানে নূতন 'হিন্দী বিশ্বকোশ'-এর কার্য চলিতেছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত পরিকল্পনানুসারে ইহা প্রতি খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠা হিসাবে ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রকাশনের সমগ্র ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করিতেছেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত এক পরিকল্পনাক্রমে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ানুসারে সজ্জিত ১০ সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী ১০ খণ্ডে ওড়িয়া ভাষায় একখানি বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাযে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের উপযোগী আর একখানি সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ ৪ খণ্ডে ২ হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে ইহার দুইটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে আনুমানিক ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করিবার সংকল্প সফল হইবে কিনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সন্দিহান— আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র সরকার ৯ বৎসরে ও ১৯ খণ্ডে সমাপ্য একখানি বিশ্বকোষ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার আনুমানিক ব্যয় হইবে ৩০ লক্ষ টাকা।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সম্মিলিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে ৪ খণ্ডে সমাপ্য এই বাংলা ভারতকোষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কালোচিত আদর্শ অবলম্বনে নবীন রূপে এই ভারতকোষের কার্যারম্ভ হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থনিবন্ধাদি আলোচনাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ে পরিচয় লাভের কৌতূহল জাগরিত হইতে পারে, এ জাতীয় বিষয়ের যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের— বিশেষতঃ বাংলা দেশের— সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এবং বিশ্ববিষয়ের যৎসামান্য পরিচয় প্রদান ইহার উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গনির্বাচনে স্বভাবতঃই ৪ খণ্ডের আনুমানিক ৩ হাজার পৃষ্ঠার সীমা স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। ইতিহাস ভূগোল সমাজ ভাষাসাহিত্য শিল্পবাণিজ্য পূজাপার্বণ আচারব্যবহার রীতিনীতি জ্ঞানবিজ্ঞান আমোদ-উৎসব পরলোকগত মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণানুক্রমে প্রধানতঃ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত অথবা বিশেষজ্ঞ-লিখিত প্রখ্যাত গ্রন্থনিবন্ধাদি অবলম্বনে সংকলিত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিবরণগুলি যাহাতে অতিবিস্তৃত, অনাবশ্যক রূপে পাণ্ডিত্যবহুল ও নিতান্ত গুরুগম্ভীর না হয় সে দিকে সাধ্যমত দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বিবরণে অনুল্লিখিত অতিরিক্ত তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবরণশেষে 'দ্র' বা দ্রষ্টব্যস্তম্ভের মধ্যে কিছু কিছু আকর গ্রন্থনিবন্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা যে যে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা সেই সেই বিষয় সম্পর্কে লিখাইয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। এজন্য শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের এবং ভারতবহির্ভূত কোনও কোনও স্থানের সুধীগণের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রস্তুতিতে এই রূপে প্রায় ২৫০ জন লেখকের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে। অবাঙালী লেখকগণ সাধারণতঃ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, পরিষদ্ সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন। যেখানে বিশেষজ্ঞের লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর অথবা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় নাই, সেখানে প্রকাশিত উপকরণের সাহায্যে ভারতকোষ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রচনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শেষোক্ত স্থল ব্যতীত সর্বত্রই লেখাগুলি লেখকের স্বাক্ষর সংবলিত।

অনেক ক্ষেত্রে ভারতকোষের উপযোগী রচনা সংগ্রহ করা ও সংগৃহীত রচনাগুলিকে এই কোষগ্রন্থের উপযোগী ও সুসমঞ্জস করিয়া তোলা এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দ্রুত গ্রন্থপ্রকাশের পথে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা এ জাতীয় কার্যসম্পাদন স্বভাবতঃই সময়সাপেক্ষ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে শব্দের বানান সম্পর্কে বাংলায় এখনও সর্বজনগ্রাহ্য কোনও নির্দিষ্ট রীতি গড়িয়া ওঠে নাই। ভারতকোষে মূলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'বাংলা বানানের

নিয়ম' ও রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধান অনুসরণ করা হইয়াছে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

ভারতকোষে অনুসৃত বর্ণানুক্রম এইরূপ :

অ আ অ্যা ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড়
ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য য় র ল শ ষ স হ

অ্যা স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে আ-এর পরে গণ্য হইয়াছে, যেমন 'আহোম'-এর পর 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান'। কিন্তু য-ফলা+আ-কার -এর উচ্চারণ অ্যা-র মত হইলেও উহা যথাস্থানেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাই 'অগ্নিহোত্র'-এর পর 'অগ্ন্যাশয়'। ৎ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে পরিগণিত না হইয়া হস্-যুক্ত 'ত' রূপে গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-কারান্ত ব্যঞ্জন হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয়, তাই স্থলনির্দেশপ্রসঙ্গে কোনও বর্ণের হসন্ত ও অ-কারান্ত রূপের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই; যথা 'অকলঙ্ক'-এর পর 'অকৃল্যাণ্ড', 'উৎপল বংশ'-এর পর 'উত্তঙ্ক'। বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে 'ণ্ট' বা 'ণ্ড' ণ্+ট ণ্+ড হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই, ন্+ট ন্+ড রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাই, যদিও 'অণুবীক্ষণ'-এর পর 'অণ্ড'— তথাপি 'অ্যানেস্থেসিয়া'র পর 'অ্যান্টিবায়োটিক্স' বা 'ইনসুলিন'-এর পর 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্স' দেওয়া হইয়াছে।

বাংলায় হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। বর্তমান গ্রন্থেও ভগবান্, প্রাচ্যবিদ্, উপনিষদ্ এইরূপ কতিপয় শব্দ ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রে হসন্ত সচরাচর বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণ-সৌকর্যার্থে হসন্তের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত প্রচুর হইয়াছে। যথা, 'অস্মোসিস', 'অল্-বীরূনী', 'ভিল্দান্দেন', 'হেপ্টা এপি থেবাস' ইত্যাদি। উচ্চারণ বা অর্থ -বিপর্যয়ের আশঙ্কা না থাকিলে বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও শব্দের অন্তে সচরাচর হসন্ত ব্যবহার হয় নাই।

তৎসম শব্দে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইলেও স্থলবিশেষে ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সমাসের পূর্বপদস্থিত ইন্-ভাগান্ত শব্দ পরিচিত ক্ষেত্রে ই-কারান্ত না হইয়া 'ঈ-কারান্ত' হইয়াছে, যথা 'যোগীগণ', 'মন্ত্রীসভা', 'অনুগামীগণ' ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখকগণের ইচ্ছানুসারে অধুনা অপ্রচলিত কিছু কিছু বানান ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা যজ্ঞিয়, অবস্তি, অন্তরিক্ষ, বশিষ্ঠ। 'বেশি, বেশী' 'সরকারি, সরকারী' প্রভৃতি অ-তৎসম শব্দে বিশেষ্য-বিশেষণ ভেদ করা হয় নাই, সর্বত্রই 'ই'-কার ব্যবহৃত।

বিদেশের স্থান ব্যক্তি বা গ্রন্থের নাম সাধারণতঃ ইংরেজী রূপ বা উচ্চারণ অনুসারে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দেশের রীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যথা আরিস্তোফানেস, উগো, লে মিজেরাব্ল, নেফেলায়, পারী, প্রাহা, হ্বীন, ম্যুন্খেন ইত্যাদি। স্থানের পরিচিত নামগুলি অনেক ক্ষেত্রে মূল নামের পার্শ্বে নিবিষ্ট হইয়াছে; যথা হ্বীন (ভিয়েনা), ম্যুন্খেন (মিউনিখ)। গ্রন্থের নাম মূল উচ্চারণানুসারে বঙ্গাক্ষরে নির্দেশ করিয়া বন্ধনীমধ্যে আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে; যেমন 'লে শাতিমাঁ (শাস্তি)' 'প্রোমেথেউস দেস্মোতেস (বন্দী প্রমিথিউস)' 'এত্ দুক্যেএম (পুতুলের সংসার)'।

এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতকোষ মুদ্রণের কাজ শুরু হইবার পরে ব্যাবহারিক অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইয়া বানানবিষয়ক এই সকল সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ গৃহীত হইতে থাকে। ফলতঃ এই গ্রন্থের সর্বত্র বানানসম্মিতি ঘটিয়া ওঠে নাই। বিশেষতঃ বিদেশী নাম ব্যবহার প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রথম দিকে প্রচলিত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। এই সকল অসংগতির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী আন্তরিক দুঃখিত। পরবর্তী খণ্ডসমূহে এ বিষয়ে অধিকতর সংগতি অর্জিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতকোষ প্রকাশের পূর্বনির্ধারিত সময় অনেক দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত বিলম্বজনিত ত্রুটির জন্য আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহক -বর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অধিকতর বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থের কলেবর কিছু হ্রাস করিয়া উ-কারাদি শব্দ দিয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করা হইল।

ভারতকোষের কয়েকজন বিশেষ উৎসাহী পরামর্শদাতা ও কর্মী গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন, ইহা গভীর বেদনার বিষয়। ইঁহাদের মধ্যে রাজশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থের পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রণী ছিলেন। সজনীকান্ত দাস ও শশিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে নানাভাবে গ্রন্থসংকলনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

দেশের বিদ্বৎসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অকৃপণ সহযোগিতার কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রসঙ্গনির্বাচন, নিবন্ধরচনা, গ্রন্থসম্পাদনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা জনের নিকট হইতে নানা ভাবে যে অজস্র সাহায্য পাওয়া গিয়াছে সেজন্য সম্পাদকমণ্ডলী তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বিশিষ্ট সহায়কবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা-সমিতির সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনমত উপদেশ ও পরামর্শ দান করিয়া ভারতকোষ সংকলন ও প্রকাশনের কার্যে যথেষ্ট সহযোগিতা করিয়াছেন। সামান্য একটি তথ্য, একটি শব্দ বা কোনও বিষয়ের আকরসন্ধানের ব্যাপারে সময়ে-অসময়ে ইঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে হইয়াছে। ইঁহারা শান্তভাবে সংশয়িত বিষয়ের মীমাংসায় যথাশক্তি সহায়তা করিতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। বাহিরের সুধীসমাজের নিকট হইতেও সময়বিশেষে প্রয়োজনানুসারে অনুরূপ সাহায্যলাভের সৌভাগ্য হইতে ভারতকোষ বঞ্চিত হয় নাই। সর্বাপেক্ষা আনন্দের ও আশ্বাসের কথা এই যে গ্রন্থপ্রকাশের সূচনায় কর্মনিযুক্ত সহ-সম্পাদকবৃন্দ ও তাঁহাদের তরুণ সহকর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরম নিষ্ঠার সহিত খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দেশের ও জাতির প্রতি পবিত্র কর্তব্য বোধে ভারতকোষের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

গ্রন্থসংকলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মনিযুক্ত ছিলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীঅমরেন্দ্র দাস, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅলক চক্রবর্তী ও শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড স্টেট্‌স ইন্‌ফর্মেশন সার্ভিস লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি, দিনেমার দূতাবাস, নরওয়ের কন্‌সালেট জেনারেল, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ব্রিটিশ কাউন্সিল, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্‌, সোভিয়েৎ দেশ, স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্বকোষ প্রণয়নের যে সমস্ত কাজ চলিতেছে,

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহার বিবরণ পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সকল বিভাগের কর্মীগণ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আরও নানা প্রকার সাহায্যের দ্বারা বাধিত করিয়াছেন শ্রীঅচিন্ত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীঅবকাশ জেনা, শ্রীঅমূল্য গুপ্ত, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত, শ্রীঅরুণ সান্যাল, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীঅসীম চক্রবর্তী, শ্রীঅসীমরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীআবদুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ, শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব, শ্রীআর. সত্যনারায়ণ রাও, শ্রীআশিস লাহা, শ্রীউদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী এ প্রভাকর রাও, শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, শ্রীকমলকুমার মজুমদার, শ্রীকাজল ঘোষ, শ্রীকানাই কর্মকার, শ্রীকার্তিক সাহা, শ্রী কে. এম. গোবি, শ্রীকেশব দত্ত ভাট, শ্রীখগেন ভৌমিক, শ্রীচিত্ততোষ দত্ত, শ্রীচিত্রলেখা ভট্টাচার্য, শ্রীচিত্রা দত্ত, শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, শ্রীজ্যোতি রায়, শ্রীজ্যোতি সেনগুপ্ত, শ্রীতন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীদিনেনকুমার সোম, শ্রীদীপককুমার বসু রায়চৌধুরী, শ্রীদীপেন্দ্র মিত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীনির্মাল্য আচার্য, শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা, শ্রীপ্রণতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতিমা ঘোষ, শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় চৌধুরী, শ্রীবিনোদকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীবেলা দত্তগুপ্ত, শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম্‌, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সুর, শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন দত্ত, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাসুদ হাসান, শ্রীমুরারিমোহন দে, শ্রীমৈত্রী শুক্ল, শ্রীযাদব মুরলীধর মূলে, শ্রীরেডিয়াম ভট্টাচার্য, শ্রীশোভরাজ গুরনানী, শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, শ্রীশ্যামলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও জোশী, শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক, শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমীর ভট্টাচার্য, শ্রীসমীর সেনগুপ্ত, শ্রীসাবিত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুতপা সুর, শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, শ্রীসুপ্রভা রায়, শ্রীসুশোভন সরকার, শ্রীসোয়ান্‌হিল্ড বী, শ্রীহিরণ-কুমার সান্যাল ও শ্রীহুমায়ুন কবির। অনুবাদের কাজে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ ও শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার 'বাংলা কোষগ্রন্থের কথা' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও বহুবিধ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এ জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষ দুঃখিত। মণ্ডলী সর্ববিধ ত্রুটির পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিতেছেন। ভবিষ্যতে ইহাদের প্রয়োজনানুরূপ কালানুযায়ী প্রতিকার সাধনের উদ্দেশ্যে যে একটি স্থায়ী 'ভারতকোষ প্রতিষ্ঠান' গঠনের প্রয়োজন, ইহা পদে পদে অনুভূত হইতেছে। ভারতকোষ কোনও ব্যক্তিবিশেষের কাজ নহে, সকলের সমবেত কাজ— চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে এ কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি এবং যে কোনও প্রকার ত্রুটিনির্দেশের দ্বারা সংকলনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য সকলের নিকট বিশেষ রূপে আহ্বান জানাই।

লেখকবিবরণ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ইন্দ্রিয়

শ্রীঅজয় বসু, ক্রীড়া বিভাগ, 'যুগান্তর' / অমর সিং ; আই. এইচ. এফ ; আই. এফ. এ ; অ্যাথলেটিক্স

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় / অপেরা

শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, শারীরবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / অগ্ন্যাশয় ; অন্ত্র

শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / ইকাফে

শ্রীঅধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, মিথিলা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট / অক্ষপাদ ; অতীশদীপংকর শ্রীজ্ঞান

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টেনারি প্রফেসার অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশন্‌স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আকালী ; আন্তর্জাতিকতা ; ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ; ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট

শ্রীঅনিলবরণ রায়, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী / অরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅবনীচরণ বসু, অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ, পশ্চিম বঙ্গ / আবগারি

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত, কলিকাতা / আরব সাগর ; অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর ; উত্তর মহাসাগর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আলেক্‌সান্দর

শ্রীঅমর্ত্যকুমার সেন, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্‌স, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় / আর্থিক উন্নতি

শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / অশ্ব ; উষ্ট্র

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ, মহাধিকর্তা, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / উৎখনন, ভারতে

শ্রীঅমলেন্দু বসু, ইংরেজী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / অট্টহাস ; অণ্ডাল ; অন্ধ্র প্রদেশ ; অযোধ্যা ; আগরতলা ; আদিনা মসজিদ ; আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ; আরামবাগ ; আলিপুর ; আসানসোল ; ইউনিয়ন বোর্ড ; ইংরেজবাজার ; ইছাপুর ; উত্তর প্রদেশ ; উদ্ধারণপুর ; উলুবেড়িয়া

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর কলেজ / ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, কলিকাতা / আয়রন লাংস ; ইনসুলিন ; ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ ; ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ ; উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅরবিন্দ গুহ, কলিকাতা / অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ; অমৃতলাল বসু ; অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, কলিকাতা / আড়িয়াল খাঁ ; আত্রাই ; আমোদর

শ্রীঅরুণকুমার শীল, ধাতুবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / ইস্পাত

শ্রীঅরুণাভ দত্ত, কলিকাতা / অমৃতা শেরগিল

শ্রীঅলক চক্রবর্তী, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ / অণু ; অস্‌মিয়াম ; আইসবার্গ, আকাশগঙ্গা ; আকাশবিদ্যা ; আগ্নেয়গিরি ; আলফা -রশ্মি ; অ্যাকুমুলেটর ; ইউরেনাস ; ইলেকট্রনিক্‌স

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ইহুদী, ভারতে

শ্রীঅশোক মিত্র, ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট / ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্‌স্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট

শ্রীঅশোক সেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / ইওরোপ

শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য, জার্নাল অফ জেনেটিক্‌স / অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ; ইয়ংহাজব্যাণ্ড, ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড

ফাদার আঁতোয়ান, রবেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / আরিস্তোফানেস ; ঈস্‌কাইলাস ; উগো, ভিক্তোর মারী

শ্রীআদিত্য ওহদেদার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি / ইউনেস্কো ; ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি

শ্রীআবুল হায়াত, কলিকাতা / আখেরি চাহার শুম্বা ; আজান ; আবু বকর ; আলী ; আল্লা ; আহ্‌মদিয়া ; ইকবাল, মহম্মদ ; ইজ্‌তিহাদ ; ইত্তিহাদ ; ইমান ; ইমাম ; ইসমাইলি ; ইসলাম ; ঈদ ; ঈদ-অল্-ফিত্‌র্ ; ঈদ-উজ্-জোহা

শ্রীআরতি দাশ, মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ / অন্ধশিক্ষা

আর্দেশীর দীন্‌শা, কলিকাতা / অগ্নিপূজা ; অন্ত্যেষ্টি[২] ; অহুর-মজ্‌দা ; আবেস্তা

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ / অভিব্যক্তিবাদ ; অমেরুদণ্ডী ; অর্কিড ; আন্ত্রিক রোগ ; অ্যালার্জি ; উভচর ; উভলিঙ্গ

শ্রীইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অভ্র ; অ্যাজবেস্টস ; উষ্ণ প্রস্রবণ

শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ কলেজ / আম্বেদকার, ভীমরাও রামজী ; অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি ; ইলবার্ট বিল

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, কলিকাতা / আদিগঙ্গা ; ইছামতী ; ইঞ্জিনিয়ারিং ; ইরাবতী

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ইন্দ্রপ্রস্থ ; উগ্রসেন[১] ; উগ্রসেন[২] ; উজ্জয়িনী

শ্রীকাননকুমার মজুমদার, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা রামমোহন কলেজ, আরামবাগ / ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / আত্মা

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, ক্যাটালগ বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / অনন্ত কন্দলী ; অনশন ব্রত

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, 'প্রবাসী' / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীগুরনেক সিং, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল বিবলিওগ্রাফি / আদিগ্রন্থ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দির/অনাক্রম্যতা ; অনুভূ ; অপভূ ; অভিকর্ষ ; অযৌন ও যৌন জনন ; অরোরা-বোরিয়ালিস ; অশ্বত্থ[১] ; অস্মোসিস ; আগ্নেয়াস্ত্র ; আতশবাজী ; আবহবিদ্যা ; আয়নমণ্ডল ; আলেয়া ; আলোকবর্ষ ; আলোকস্তম্ভ ; অ্যাণ্টিবায়োটিক্‌স ; অ্যাণ্টিসেপটিক ; অ্যাণ্ড্রোমিডা ; অ্যামিবা ; ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার ; ইলিশ ; উদ্ভিদবিদ্যা ; উল্কা[১]

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, প্রচার বিভাগ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে / উড্‌রফ, স্যর জন জর্জ

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কলিকাতা / অনুরূপা দেবী

শ্রীচণ্ডীচরণ দেব, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অস্থি

শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন, জাতীয় অধ্যাপক / ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অফ রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ল ইন্‌স্টিটিউট / অস্ত্র আইন ; আইন ; আদালত ; উত্তরাধিকার

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / অক্ষক্রীড়া ; অক্ষয় তৃতীয়া ; অগস্ত্য ; অগ্নিপুরাণ ; অগ্রদানী ; অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ; অধিবাস ; অনধ্যায় ; অনন্তব্রত ; অনিরুদ্ধ ভট্ট ; অন্ত্যেষ্টি[১] ; অন্নকূট ; অন্নপূর্ণা ; অন্নপ্রাশন ; অবতার[১] ; অবধূত ; অভিষেক ; অম্বুবাচী ; অরণ্যষষ্ঠী ; অরন্ধন ; অর্ধোদয় যোগ ; অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স ; অশোক[১] ; অশৌচ ; অশ্বত্থ[১] ; অশ্বত্থামা ; আইবুড়ো ভাত ; আকাশপ্রদীপ ; আগম ; আচার ; আঁতুড় ; আদ্যশ্রাদ্ধ ; আপদ্ধর্ম ; আভ্যুদয়িক ; আম[২] ; আরতি ; আশ্রম ; আস্তিক ; আস্তীক ; ইতুপূজা ; ঈদপূজা ; উচ্ছিষ্ট ; উপচার ; উপনয়ন ; উপপুরাণ ; উমাপতিধর ; উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; উল্কা[২]

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অগ্রবাল ; আজিমু-শ্-শান্ ; আফজল খাঁ ; আলাউদ্দীন খিলজী ; ইতিমাদউদ্দৌলা[১] ; উদয়নারায়ণ

শ্রীজ্ঞানশংকর সেনগুপ্ত, সম্পাদক, ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব / ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা / আলপনা ; আলীবর্দী খাঁ ; উমিচাঁদ

শ্রীতারাপদ মাইতি, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / অমৃতসর ; আজমগড় ; আমেদাবাদ ; আম্বালা ; আসাম

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, পুথিশালা বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / অক্রূর ; অক্ষমালা[৩] ; অগ্নিপরীক্ষা ; অজ ; অজামিল ; অদ্ভুত রামায়ণ ; অদ্ভুতাচার্য ; অধ্যাত্ম রামায়ণ ; অম্বরীষ ; অরুন্ধতী[২] ; অর্জুন[১] ; অশ্বত্থামা ; অষ্টাবক্র ; অহল্যা ; উত্তরা ; উত্তানপাদ ; উদ্দালক

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ইতিহাস বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ / অঙ্গরাগ ; অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; আতর

শ্রীদিনেনকুমার সোম, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / অম্বর ; আরকট ; আলওয়ার ; ইম্ফল ; উটকামণ্ড

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / অল্-বীরূনী ; অসুর ; আত্মীয়-সভা ; আদিত্য ; আদি ব্রাহ্মসমাজ ; আবদুর রজ্জাক ; আরিয়ান ; আর্য ; আর্যসমাজ ; ইব্‌ন বতুতা ; ঈ-ৎসিঙ ; উপগুপ্ত

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / অঘোরনাথ চক্রবর্তী ; অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; অমৃতলাল দত্ত ; আফ্‌তাব্‌উদ্দীন খাঁ ; আশুতোষ দেব ; উজির খাঁ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অন্ধ্রপ্রদেশ[১] ; অবন্তি ; আর্যাবর্ত

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / অস্ট্রিক

শ্রীদীপালি ঘোষ, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / উগ্রক্ষত্রিয়

শ্রীদীপ্তি সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সরোজিনী নাইডু উইমেন্‌স কলেজ / আরাবল্লী ; উলার

শ্রীদুর্গা দাস, 'ইনফা', নয়া দিল্লী / উষানাথ সেন

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / অঙ্গিরা ; অথর্বন্ ; অথর্ববেদ ; আরণ্যক ; আশ্বলায়ন

শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শারীর বিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / অণ্ডকোষ ; অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, কিউরেটার, আশুতোষ মিউজিয়াম/ আশুতোষ মিউজিয়াম

শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ, প্রধান সম্পাদক, মহাবোধি সোসাইটি/ অনাগারিক ধর্মপাল

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / উডকাট

শ্রীদেবব্রত সিংহ, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অস্তিবাদ

শ্রীদেবলা মিত্র, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / অজন্টা ; অমরাবতী ; অর্ধনারীশ্বর ; আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ; উদয়গিরি ; উদয়গিরি-খণ্ডগিরি

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ / অজিত কেশকম্বলী ; আলার কালাম

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ঈশ্বর

শ্রীধর্মধর মহাস্থবির, নালন্দা বিদ্যাভবন / অষ্টাঙ্গিক মার্গ

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / অর্থ নৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

শ্রীধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, কলিকাতা / উধুয়ানালা

শ্রীনবেন্দু সেন, অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ; ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ইন্দ্র[২] ; ঈশান[১] ; উপমন্যু ; উমা[১] ; উমা[২] ; উর্বশী ; উলূপী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'যুগান্তর' / ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া ; ঈসপ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা / অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ; অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিমাইসাধন বসু, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অগ্নিকুল ; অজয়রাজ ; অমোঘবর্ষ ; আজমীর ; ইন্দ্র[৩] ; উদয়পুর ; উদয়সিংহ ; উদয়াদিত্য[২]

শ্রীনির্বাণীতোষ ঘটক, কলিকাতা / উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীনির্মলকুমার বসু, প্রাক্তন অধিকর্তা, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / অগ্নি[১] ; অনশন ; অসহযোগ আন্দোলন ; অস্পৃশ্যতা ; আইন অমান্য আন্দোলন ; আইহোলি ; আগস্ট আন্দোলন ; আহার ; অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, প্রাক্তন সম্পাদক, ক্যালেণ্ডার রিফর্মস কমিটি / অব্দ ; অয়ন ; আর্যভট

শ্রীনিশীথরঞ্জন কর, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / উত্তরমেরু

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অক্‌সস্ ; আর্মানী

শ্রীনেপাল চক্রবর্তী, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ / অণুবীক্ষণ যন্ত্র

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা / অঙ্গুলি ছাপ ; অপরাধ বিজ্ঞান

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, সিটি কলেজ অফ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশন / অগ্রদ্বীপ ; আমতা

শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, ফলিত গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আপেক্ষিকবাদ

শ্রীপরিমল গোস্বামী, প্রাক্তন সম্পাদক, 'যুগান্তর' সাময়িকী বিভাগ / আলোকচিত্রণ

শ্রীপরিমলবিকাশ সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীর বিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ইনকিউবেটর

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, কলিকাতা / অজিতকুমার চক্রবর্তী ; অতুলপ্রসাদ সেন ; অসিতকুমার হালদার ; আশুতোষ চৌধুরী ; ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট ; ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ; ঊর্মিলা দেবী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কর্মসচিব, ভারতকোষ / অলংকার[১] ; আমোদ-প্রমোদ ; ইডেন গার্ডেন্‌স

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / অম্বিকাচরণ মজুমদার ; অশ্বিনীকুমার দত্ত ; আনন্দময়ী ; আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ; আনন্দ-রাম বড়ুয়া ; আমীর আলী, সৈয়দ ; আশুতোষ দেব

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয় / আয়ুধ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / অভেদানন্দ স্বামী

শ্রীপ্রণবকুমার সেন, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অনাত্মবাদ

শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী, গেজেটিয়ার রিভিশন বিভাগ, বিহার সরকার / আরা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / অবন্তীপুর ; অমরকণ্টক ; অম্বরনাথ ; আঁটপুর ; আফগানিস্তান ; আহ্‌মদনগর ; ইন্দোর ; ইলামবাজার ; উত্তরপাড়া

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, আইন কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অ্যাটর্নি-জেনারেল

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অহল্যাবাঈ

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার, কলিকাতা / ইন্দ্রজাল

শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ রায়, অর্থনীতি বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / অবাধ নীতি ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাতা / অতুলকৃষ্ণ মিত্র ; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; অমৃতলাল মিত্র

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অনার্য[১] ; অষ্ট্রিক ; আদি ; আদিবাসী ; আহোম ; উরাঁও ; উদ্ধি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, সেণ্ট জন্‌স অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড / অ্যাম্বুলেন্স

শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অজ্ঞাবাদ

ফাদার ফাল্লোঁ, পিয়ের, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / আদম ; ঈভ

শ্রীবাসন্তিকা লাহিড়ী, মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ / আবেগ

শ্রীবিজনকান্তি বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, জিয়াগঞ্জ কলেজ / অধীনতামূলক মিত্রতা ; আদিলশাহী বংশ ; ইমাদশাহী বংশ ; উৎপল বংশ

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / ইছাই ঘোষ

শ্রীবিনয় ঘোষ, কলিকাতা / ইম্পে, স্যর ইলাইজা ; উইল-সন, হোরেস হেম্যান

শ্রীবিনয় চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় / ইতিহাস

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / অর্হৎ ; উরুবিল্ব

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলাভবন, বিশ্বভারতী / অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র, বসু বিজ্ঞান মন্দির / আলোক

বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ / উপনিষদ্‌

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা / অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ; অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী ; অদ্বৈতাচার্য ; অনন্ত আচার্য ; অর্থশাস্ত্র ; ঈশান নাগর ; ঈশ্বরপুরী ; উদ্ধব-দাস ; উদ্ধারণ দত্ত

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / অক্ষোভ্য ; অঙ্গুত্তরনিকায় ; অঙ্গুলিমাল ; অদ্বয়বজ্র ; অবদান ; অবলোকিতেশ্বর ; অভিধম্মকোশ ; অমিতাভ ; অম্বপালী ; অশ্বঘোষ ; অসঙ্গ ; আজীবিক ; আদিবুদ্ধ ; ইন্দ্রভূতি ; ইসিদাসী ; উড্ডীয়ান ; উদান ; উপোসথ ; উপ্পলবণ্ণা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ / অগ্নি ; অগ্নিহোত্র ; অভিনবগুপ্ত ; অলংকারশাস্ত্র ; অশ্বমেধ ; অশ্বিদ্বয় , আনন্দবর্ধন ; ইন্দুরাজ ; ইন্দ্র ; উদ্ভট ; উষস্

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, অন্নামলৈ বিশ্ববিদ্যালয় / অবধী সাহিত্য

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আকাশবাণী, কলিকাতা / আকাশবাণী

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / অডিটর-জেনারেল ; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, বি. এন. কলেজ, পাটনা / অমাত্য ; অযোধ্যা

শ্রীভবতোষ দত্ত, সদস্য, ফিন্যান্স কমিশন / অর্থনীতি

শ্রীভবতোষ দত্ত, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / অক্ষয়কুমার বড়াল ; অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; আখড়াই, হাফ-আখড়াই ; আজু গোঁসাই ; অ্যাণ্ট্‌নি ফিরিঙ্গি ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীভাগ সিং, সাধারণ সম্পাদক, শিখ কাল্‌চারাল সেণ্টার / আদিগ্রন্থ

শ্রীভুবনমোহন দাস, নৃতত্ত্ব বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় / অসমীয়া জাতি

শ্রীমঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী, চিলড্রেন্‌স লিট্‌ল থিয়েটার / অবতার[২]

শ্রীমণি ঘোষ, জামশেদপুর / আবদুল বারি

শ্রীমহেশ্বর নেওগ, রীডার, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় / অসমীয়া লোকনৃত্য ; অসমীয়া লোকসংগীত ; অসমীয়া সাহিত্য

শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাউথ পয়েণ্ট স্কুল / আন্‌ডেরসেন, হান্‌স খ্রিস্টিয়ান

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রি-কাল্‌চারাল রিসার্চ / আখ ; আঙুর ; আনারস ; আম[১] ; আলু

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, রসায়ন বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / অ্যাল্‌কেমি

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রাক্তন জনগণনা অধীক্ষক, সিকিম ও পশ্চিম বঙ্গ / আদমশুমার

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু), কলিকাতা / অম্বিকাচরণ গুহ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, অ্যাডভোকেট, কলিকাতা / অষ্টম ; উইল

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ / আড়্‌বার ; উভয়বেদান্ত

শ্রীযাদব মুরলীধর মূলে, গ্রন্থাগারিক, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি / অভঙ্গ

শ্রীযোগানন্দ দাস, কলিকাতা / আনন্দচন্দ্র মিত্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, 'প্রবাসী' / অবলা বসু ; অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ; আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ ; অ্যালবার্ট হল ; ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ; ইণ্ডিয়ান লীগ ; ইয়ং বেঙ্গল ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; উমেশচন্দ্র দত্ত ; উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কলেজ / অম্বর, মালিক

শ্রীরঘুবীর চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / আন্তর্জাতিক আইন

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় / অটলবিহারী ঘোষ

শ্রীরমা চৌধুরী, অধ্যক্ষ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / আনন্দ-মোহন বসু

শ্রীরমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম / উপগ্রহ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ; অচিরবতী ; অনার্য[১] ; অন্তিয়োক ; অপরান্ত ; অর্জুন[৩] ; আক্কর-টোম ; আক্কর-ভাট ; আজাদ হিন্দ ফৌজ ; আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া ; আদিশূর ; আরাকান ; ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস

রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চন্দননগর কলেজ / ইণ্ডিয়া অফিস

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, কলিকাতা / অলংকার[১] ; অহোবল ; আমীর খুসরৌ ; আলাপ

শ্রীরামগোপাল আগরওয়ালা, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আয় ; আয়কর

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রসায়ন বিভাগ, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ / অক্সিজেন ; অটোক্লেভ ; আই-সোটোপ ; আলকাতরা ; অ্যান্টিমনি ; অ্যালকা-লয়েড ; অ্যালকালি ; অ্যালকোহল ; অ্যালুমিনিয়াম ; অ্যাসিড

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / অস্ত্রচিকিৎসা ; আয়ুর্বেদ ; অ্যালোপ্যাথি ; ইউনানি

শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ / অনাথ-পিণ্ডিক ; অনুরুদ্ধ ; অম্বট্‌ঠ ; আনন্দ ; উগ্‌গ ; উপসেন বঙ্গন্তপুত্ত ; উপালি ; উরুবেল কস্‌সপ

শ্রীশম্ভু মিত্র, 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায় / অভিনয়

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় / অংশুবর্মা ; অর্জুনায়ন ; ইউ-চি ; ইক্ষ্বাকু

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / আরিস্তোতল

শ্রীশান্তি বসু, দর্শন বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ / ইব্‌সেন, হেন্‌রিক য়োহান

শ্রীশিবদাস চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি / ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌স

শ্রীশিবনাথ রায়, রিসার্চ অফিসার, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স / উইলকিন্‌স, চার্লস

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / অঙ্গ[১] ; অম্বষ্ঠ ; আভীর

শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. / আই. সি. এস.

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অট্‌ঠকথা ; অবদান ; অভিধম্মাবতার ; উদ্দক-রামপুত্ত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / অক্‌ল্যাণ্ড ; অর্‌ম, রবার্ট ; অ্যামহার্স্ট, উইলিয়াম পিট ; ইংরেজ, ভারতে

শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / অতিবেগুনী রশ্মি ; অবলোহিত রশ্মি ; অশ্ব-ক্ষমতা ; আয়ন ; ইলেকট্রন ; ঈথর

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / উপন্যাস ; উপন্যাস, বাংলা

শ্রীশ্রীপদ রামচন্দ্র টিকেকর, বোম্বাই / আত্মারাম পাণ্ডুরং তরখড়

শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অদ্বৈতবাদ ; আরুণি ; ইল ; ইলা ; উভয়ভারতী

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / অশোক[১]

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ / ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স কমিশন

শ্রীসত্যকাম সেন, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / আরাকান য়োমা

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অকলঙ্ক ; অঙ্গ[২] ; অনন্তনাথ ; অনেকান্তবাদ ; অপভ্রংশ সাহিত্য ; অভয়দেবসূরি ; উদয়প্রভসূরি , উমাস্বামী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় / আলাওল

শ্রীসত্যেশ চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / অজয় ; অস্ট্রেলিয়া ; আফ্রিকা ; ইওরোপ ; উত্তর আমেরিকা

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয় / ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; উপেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীসন্তোষ ঘোষ, স্থাপত্য বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন / ইতিমাদউদ্দৌলা[২]

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, রেজিস্ট্রার, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স / ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স

শ্রীসর্বাণী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / আগ্রা

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার, কলিকাতা / আফিম

শ্রীসুকুমার রায়, ইসলামী ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আইন-ই-আকবরী ; আকবর ; আকবর-নামা ; আবদুর রহিম খান খানান ; আবদুল কাদের বদায়ুনী ; আবুল ফজল ; ইব্রাহিম কুতুব্ শাহ্ ; ইসা খাঁ মসনদ আলী

শ্রীসুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব

বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / অক্ষর ; অনার্য[১] ; অপভ্রংশ ভাষা ; অবধী ; অবহট্‌ঠ ; অর্ধমাগধী ; অসমীয়া ভাষা ; ইন্দো-ইওরোপীয় ; উপকথা ; উপভাষা ; উর্দু

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী / আরাকান

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, 'ইওর হেলথ' পত্রিকা / অগ্নি[১] ; অগ্নি[৩] ; অনন্ত

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উৎখনন ; উর

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা / আর্য[১]

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, অধ্যক্ষ, বিনয় ভবন, বিশ্বভারতী / অ্যাণ্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' / উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশন

শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ইংরেজী ভাষা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ অমরু ; অর্থশাস্ত্র[২]

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীসুশোভন সরকার, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

সৈয়দ এহ্‌তেশাম হুসৈন, উর্দু বিভাগ, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু সাহিত্য

শ্রীসৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / আজিমগঞ্জ ; আলমোড়া ; আলীগড় ; আল্লেপী

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ / অক্টার্লোনি ; অঙ্গদ[২] ; অজাতশত্রু ; অজিত-সিংহ ; অনঙ্গপাল ; অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ ; অন্ধকূপ-হত্যা ; অমরসিংহ[২] ; অর্জুনমল ; অর্ণোরাজ, অল্প্‌-তগীন ; অহিচ্ছত্র ; আলবুকের্ক ; উদয়ন

শ্রীহরিগোপাল বরাট, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ / অ্যানেস্থেসিয়া

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ / আম্বেদকার, ভীমরাও রামজী ; অ্যাণ্টি-সার্ক্যুলার সোসাইটি ; ইলবার্ট বিল

শ্রীহরিহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ন্যাশন্যাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরেটরি, জামশেদপুর / অ্যালয়

শ্রীহুমায়ুন কবির, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা / আজাদ, মওলানা আবুল কালাম

শ্রীহেমন্তকুমার ইন্দ্র, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ / আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ

শ্রীহোসেন্নুর রহমান, রিসার্চ ফেলো, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / আহ্‌মদ খাঁ, সৈয়দ

ভা র ত কো ষ

ভারতকোষ

অওঘড়, -র দশনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্মগিরি নামে জনৈক সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অওঘর বা অওঘড় সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। গুজরাট অঞ্চলে ইহাদের গদি আছে কিন্তু শিষ্য-পরম্পরা নাই। গদির মোহন্তের মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনকে বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর মোহন্তপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে সুখড়, রুখড়, গুদড়, ভূখড়, কুকড় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সাদৃশ্য আছে।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ১৮৭০, ১৮৮৩ খ্রী; H. H. Wilson, *Religious Sects of the Hindus*, Calcutta, 1958.

অংশুবর্মা অংশুবর্মা নেপালের লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের সময় মহাসামন্ত ছিলেন। শিবদেব নামেমাত্র রাজা ছিলেন, সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন অংশুবর্মা। আভীরগণ সাময়িকভাবে নেপাল দখল করিয়া লইলে, অংশুবর্মাই স্বীয় বীর্যবলে তাহা পুনরুদ্ধার করেন। ইহাতে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত শাসন-ক্ষমতা তাঁহার হাতে চলিয়া আসে। অবশেষে তিনি নিজ নামেই রাজত্ব করিতে থাকেন। হিউএন্-ৎসাঙ্-এর মতে অংশুবর্মা ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৬০৮-৬২৫ খ্রী পর্যন্ত তিনি নেপালের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

দ্র R. C. Majumdar and A. D. Pushalkar, *History and Culture of the Indian People*, vol. III, Bombay, 1954.

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

অকলঙ্ক অকলঙ্ক বা অকলঙ্কদেব সমন্তভদ্রের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত জৈন নৈয়ায়িক। কুমারিলভট্ট বহু স্থলে অকলঙ্কদেবকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরী ও প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কদেবকে সমর্থন করিয়া কুমারিলভট্টের মত খণ্ডন করিয়াছেন। শুভচন্দ্র পাণ্ডবপুরাণের প্রারম্ভিক শ্লোকাবলীতে নৈয়ায়িক হিসাবে অকলঙ্কদেবের প্রশংসা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটের রাজা সাহসতুঙ্গদন্তিদুর্গের রাজত্বকালে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অকলঙ্কদেব জীবিত ছিলেন। তিনি উমাস্বামীর তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের তত্ত্বার্থরাজবার্তিক নামে একটি এবং সমন্তভদ্রের আপ্তমীমাংসার উপর অষ্টশতী নামে একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, ন্যায়বিনিশ্চয়, লঘীয়স্ত্রয় ও স্বরূপসম্বোধন নামে তিনখানি জৈন ন্যায়গ্রন্থও তাঁহার রচনা। বাদিরাজ (দ্বিতীয়) তাঁহার ন্যায়বিনিশ্চয় গ্রন্থের একটি টীকা লিখিয়াছিলেন।

দ্র M. Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. II, 1931.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্‌ল্যাণ্ড (১৭৮৪-১৮৪৯ খ্রী) ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ তিনি ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল পদ গ্রহণ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রুশভীতির যে প্রভাব ছিল তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য অক্‌ল্যাণ্ড ব্রিটিশ মন্ত্রণাসভার নিকট হইতে যথাযথ নির্দেশ পান। তিনি আফগানিস্থানে বার্নেসের নেতৃত্বে এক বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ করেন। বার্নেসের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। আফগানিস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাবুলে রুশ অফিসার ভিট্‌কেভিচ্‌কে গ্রহণ করায় অক্‌ল্যাণ্ড ভীত ও সন্ত্রস্ত হন। তিনি দোস্ত মহম্মদকে আমির পদ হইতে অপসারণের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের সাহায্যে শাহ্‌ সুজা আফগানিস্থানে সমরাভিযান করিয়া তথাকার আমির-পদ গ্রহণ করেন। আফগানগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানায়; বার্নেস এবং ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ম্যাকনাটেনকে তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে ব্রিটিশ সৈন্য ধ্বংস হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

অক্‌সস্‌ অন্য নাম আমূ-দরিয়া। রুশীয় তুর্কীস্থান তথা মধ্য এশিয়ার প্রধান নদী। উৎপত্তিস্থল পামীর

মালভূমি হইতে মোহানা আরল সাগর পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার। অক্সস্ ও হিন্দুকুশের মধ্যে প্রাচীন বহ্লীক বা ব্যাক্ট্রিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। পরবর্তী কালে অক্সস্ উপত্যকায় ইউচিগণ বসতি স্থাপন করে। সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময় অক্সস্ অঞ্চলের দুইটি প্রদেশ মোগলগণ কর্তৃক বিজিত হয়। রুশ-আফগান বিরোধের সমাধান-কল্পে সীমানানির্ধারণ কমিশন ১৮৮৬ খ্রী অক্সস্ নদীকে উক্ত দুইটি দেশের সীমানা হিসাবে নির্দিষ্ট করেন। ১৮৯৫ খ্রী পরিবর্তিত আকারে এই সীমানা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

নীলমণি মুখোপাধ্যায়

অকিঞ্চন (১৭৫০-১৮৩৬ খ্রী) প্রকৃত নাম রঘুনাথ রায়। শ্যামা ও কৃষ্ণবিষয়ক গীতি রচয়িতা। সংগীতগুলি অকিঞ্চন ভণিতাযুক্ত, সেইজন্য এই নামে প্রসিদ্ধ। বর্ধমান রাজ এস্টেটে তিনি দেওয়ানের কাজ করিতেন। পরমার্থ-চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার মানসে তিনি কার্য ত্যাগ করেন।

অকিঞ্চন দাস সম্ভবতঃ ভক্তিরসাত্মিকা, ভক্তিরসালিকা, ভক্তিরসচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এইগুলি ১৭ শতকের শেষভাগে লিখিত। ইনি সহজিয়া সম্প্রদায়ের লোক। রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটককে ইনি বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

দ্র সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৯৪০ খ্রী।

অক্টার্লোনি (১৭৫৮-১৮২৫ খ্রী) স্যর ডেভিড অক্টার্লোনি ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলে যোগ দেন। তিনি স্যর আয়ার কুট, লর্ড লেক প্রভৃতির অধিনায়কত্বে সৈন্য পরিচালনা করেন। দিল্লীর রেসিডেণ্ট পদে থাকা-কালীন ঐ নগরীকে তিনি যশোবন্ত রাও হোলকারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ১৮১৪ খ্রী তিনি মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৮১৪-১৮১৬ খ্রী নেপাল যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কাঠমাণ্ডুর কুড়ি মাইলের মধ্যে তিনি নেপালী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া নেপাল সরকারকে সগৌলির সন্ধি অনুমোদনে বাধ্য করেন। এই সন্ধি অনুসারে নেপাল গাহড়বাল ও কুমায়ুন জেলা এবং তরাই-এর এক বৃহদংশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সমর্পণ করে। তাহা ছাড়া সিকিমের উপর দাবিও নেপাল পরিত্যাগ করে। কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকিবে বলিয়াও স্থির হয়। অক্টার্লোনি পিণ্ডারী যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন এবং পিণ্ডারী সর্দার আমির খানের সহিত এক আপস-মীমাংসা করিতে সক্ষম হন। ভরতপুর-রাজের বিরুদ্ধে দুর্জনশালের বিদ্রোহের সময় তিনি রাজার সমর্থনে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন উহা তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্ট অনুমোদন না করায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং অল্পকাল পরে ভগ্ন হৃদয়ে ১৮২৫ খ্রী ১৫ জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতার ময়দানে এক বৃহৎ স্তম্ভ (অক্টার্লোনি মনুমেণ্ট) নির্মিত হইয়াছিল।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অক্রূর বৃষ্ণি বংশীয় কৃষ্ণের ভক্ত ও জ্ঞাতিসম্পর্কে পিতৃব্য। কোনও কোনও পুরাণ অনুযায়ী কৃষ্ণবিরোধী। পিতা শফলক; মাতা গান্ধিনী। কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়নের জন্য বিশ্বস্ত দূত হিসাবে ইনি কংস কর্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানিবার জন্য কৃষ্ণের অনুরোধে ইনি হস্তিনায়ও গিয়াছিলেন। বৃষ্ণি বংশীয় পঞ্চবীরের অর্চনাবিধি প্রবর্তনকালে ইনি পঞ্চবীরের অন্যতম ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইনি প্রথম জীবনে মথুরায় এবং শেষ জীবনে দ্বারকায় অবস্থান করেন।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অক্ষক্রীড়া পাশাখেলা। দ্যূতক্রীড়া বা জুয়া খেলাও এই নামে পরিচিত ছিল। মনে হয়, কেহ কেহ ইহা দ্বারা দাবা খেলাও বুঝিয়াছেন। কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে অক্ষদ্বারা জাগরণের যে বিধান আছে তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঘুনন্দন তাঁহার তীর্থতত্ত্বে চতুরঙ্গ বা দাবাখেলার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোজাগর পূর্ণিমায় অক্ষক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকিলেও সাধারণতঃ ইহা নিন্দনীয় ছিল। মনু-সংহিতায় (৭।৪৭) ইহা দশ কামজ ব্যসনের অন্যতম। অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে অক্ষক্রীড়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে দাবাখেলা সম্পর্কে যেমন নানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় পাশাখেলা সম্পর্কে তেমন নয়। প্রাচীন ক্রীড়ার সহিত আধুনিক ক্রীড়ার পার্থক্য আছে।

দ্র বঙ্গীয় মহাকোষ; *Indian Historical Quarterly*, vol. XIV.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষপাদ অক্ষপাদ গোতম ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক। ইনি দ্বিতীয় শতক অথবা তাহার কিছু পরে আবির্ভূত

হন বলিয়া মনে করা হয়। জনশ্রুতি ছাড়া তাঁহার জীবনবৃত্ত সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। পঞ্চাধ্যায়াত্মক ন্যায়সূত্রে তিনি প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ-নিরূপণ এবং পরীক্ষা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ন্যায়সম্প্রদায়ে প্রমাণ অংশ ক্রমশঃ প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে। বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য গৌতমসূত্রের সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ। অবিদ্ধকর্ণ, ভাবিবিক্ত, অধ্যয়ন, ত্রিলোচন প্রভৃতির ন্যায়ভাষ্যব্যাখ্যা কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে এবং উদ্দ্যোতকরের ন্যায়ভাষ্যবার্তিক, বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্যটীকা ও উদয়নাচার্যের তাৎপর্যপরিশুদ্ধি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'প্রৌঢ়গৌড়নৈয়ায়িকসানাতনি'র ন্যায়সূত্র-ব্যাখ্যা উদয়ন এবং শংকরমিশ্র কর্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে। বল্লালসেনের রাজত্বকালে কোনও বাঙালী পণ্ডিত একখানি ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পরবর্তী যুগেও ন্যায়সূত্রের উপর নানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৈথিল কেশবমিশ্রের গৌতমীয়সূত্র-প্রকাশ, দাক্ষিণাত্য ভট্টবাগীশ্বরের ন্যায়সূত্রতাৎপর্যদীপিকা এবং বঙ্গীয় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ন্যায়সূত্রবৃত্তি ও রাধামোহন গোস্বামীর ন্যায়সূত্রবিবরণ সমধিক উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ -প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ -কৃত ন্যায়দর্শনের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা দ্বারা বর্তমান যুগে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র সুগম হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের পরে কাশ্মীরে এবং উদয়নাচার্যের পরে বিদেহ-বঙ্গে মধ্য ও নব্য ন্যায়প্রস্থান উদ্ভূত হয়। সামান্যতঃ অক্ষপাদ মতানুযায়ী হইলেও ইহাতে বহুস্থলে নূতন মত গ্রহণ ও প্রাচীন মত বর্জন করা হইয়াছে।

অনন্তলাল ঠাকুর

অক্ষমালা[১] রুদ্রাক্ষের মালা (অক্ষাণাং মালা)। অক্ষমালা জপমালা বিশেষ। শৈব ও শাক্তগণ এই মালা কণ্ঠে ও বাহুতে ধারণ করিয়া থাকেন। রুদ্রাক্ষের মালা না হইলেও প্রার্থনা ও জপের জন্য অন্যান্য ধর্মেও জপমালা (rosary) ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে।

অক্ষমালা[২] তন্ত্রমতে 'অ'-কার হইতে 'ক্ষ'-কার পর্যন্ত ৫০টি বর্ণমালাকে অক্ষমালা বলে।

অক্ষমালা[৩] শূদ্রকন্যা অক্ষমালা বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সংসর্গে তিনি অসামান্যা গুণবতী হইয়াছিলেন। (মনুসংহিতা, ৯।২৩)।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অনুপ্রেরণায় যে সকল মনীষী বাংলা গদ্যসাহিত্য ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাসে স্বীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপের নিকটবর্তী চুপী গ্রাম। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগের ফলে প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্মের চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁহার শিক্ষাভিলাষ ও জ্ঞানস্পৃহা কখনও হ্রাস পায় নাই। ন্যূনাধিক চতুর্দশ বৎসর বয়সে তিনি 'অনঙ্গমোহন' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যৌবনের প্রারম্ভে 'সংবাদ-প্রভাকর'-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। গুপ্তকবির অনুরোধে 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর জন্য তিনি 'ইংলিশম্যান' নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তাঁহার গদ্যরচনার সূচনা হয় এবং অচিরেই তিনি 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর একজন বিশিষ্ট লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন এবং কিছুকাল ইহার সহকারী সম্পাদকের কার্য করেন। ১৮৪০ খ্রী ১৩ জুন কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ব-বোধিনী-পাঠশালা স্থাপিত হইলে অক্ষয়কুমার ইহার শিক্ষক নিযুক্ত হন; এবং তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহার প্রণীত বালপাঠ্য একটি বাংলা 'ভূগোল' প্রকাশিত হয় (১৮৪১ খ্রী)। ১৮৪৩ খ্রী ৩০ এপ্রিল পাঠশালাটি হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তথায় যাওয়া সম্ভব হয় নাই। পাঠশালায় শিক্ষকতাকালে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক নির্বাচনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গৃহীত এক প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় তাঁহার একটি প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তিনি মাসিক ৩০৲ বেতনে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রী ১৬ আগস্ট তাঁহার সম্পাদকতায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ খ্রী পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত এই পত্রিকার

সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালননৈপুণ্যে ও রচনাগুণে এই পত্রিকা অনতিবিলম্বে তৎকালীন বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রে পরিণত হয়। তত্ত্ববিদ্যা ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী ইহাতে স্থান পাইত এবং কোনও কোনও প্রবন্ধ সচিত্রও হইত। অক্ষয়কুমারের নিজের সুপরিচিত উৎকৃষ্ট রচনার অধিকাংশই ইহাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার কেবলমাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বেতনভোগী সম্পাদকই ছিলেন না, তিনি মনেপ্রাণে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রী ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অপর উনিশজন বন্ধুর সহিত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পত্তন হইল। অক্ষয়কুমারের মনে সর্বদা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রবল ছিল। তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই প্রকার অন্ধ শাস্ত্রবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার তাঁহাদিগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মুখ্যতঃ ইঁহাদের সহিত সমস্যাটির আলোচনা করিয়াই দেবেন্দ্রনাথের মনেও এই বিষয়ে সন্দেহ জাগে এবং বহু চিন্তা ও অনুশীলনের পর অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে ব্রাহ্মসমাজ অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। অতঃপর 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া স্থির হইল। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের বিবর্তনে এই বৃহৎ পরিবর্তনটির সহিত অক্ষয়কুমারের নাম জড়িত হইয়া আছে। অক্ষয়কুমার সর্ববিধ সমাজসংস্কারের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রী ১৫ ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে মুখ্যতঃ কুসংস্কার-উচ্ছেদ ও সমাজকল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতির উদ্যোগে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎসমিতি' নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যথাক্রমে তাহার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহপ্রচলন, বাল্যবিবাহবর্জন ও বহুবিবাহনিরোধ এই সভার কার্যতালিকাভুক্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনও অক্ষয়কুমার মনেপ্রাণে সমর্থন করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় এই আন্দোলনের সপক্ষে লেখনী চালনা করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বলপূর্বক হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদানের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ যখন সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হন, তখন সেই কার্যেও তিনি অক্ষয়কুমারকে সহযোগী রূপে পাইয়াছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও জমিদারগণের নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধেও অক্ষয়কুমার লেখনীচালনা করেন। ১৮৫৫ খ্রী ১৭ জুলাই কলিকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তিনি মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শিরোরোগের প্রাবল্যে ১৮৫৮খ্রী, আগস্ট মাসে তাঁহাকে এই পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই সময় প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার পুস্তকের আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি উক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর যখন দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ নূতনভাবে সংগঠিত হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় প্রধানতঃ দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল। ইহার একটি ভক্তিবাদ, অপরটি যুক্তিবাদ। রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে এই দুই ধারার সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সার্থকভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারায় ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে কখনও বা প্রথমটি কখনও বা দ্বিতীয়টির উপর ঝোঁক পড়িয়াছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার জীবনে, চিন্তায় ও রচনায় মুখ্যতঃ রামমোহনের জীবনদর্শনের এই যুক্তিবাদী দিকটিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রধান হইলেও একক ছিলেন না। তাঁহাদের একটি দল ছিল। ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদের সময়ে সময়ে মতবিরোধও হইত, যদিও এই মতভেদ তাঁহাদের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ ঘটায় নাই। অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস-বর্জন সর্ববিধ সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ ও সমাজকল্যাণ-মূলক ব্যবস্থার প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে অক্ষয়কুমার প্রমুখ যুক্তিবাদী ব্রাহ্মদিগের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্তনের অক্ষয়কুমার অন্যতম সমর্থক ছিলেন। ব্রাহ্ম হইলেও তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। শেষ জীবনে তিনি অনেকটা অজ্ঞাবাদী (agnostic) হইয়া উঠেন। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আদর্শে বাংলা

ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সার্থক সূত্রপাত করিয়া তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির যে বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁহার গদ্য রচনা স্পষ্ট, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর ও প্রসাদগুণযুক্ত। প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর তাঁহার রচনার কিছু কিছু সংশোধন করিয়া দিলেও, শীঘ্রই উহার প্রয়োজন অতীত হয়। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ, ১৮৫১ খ্রী ; দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৩ খ্রী) ও 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬ খ্রী) শীর্ষক পুস্তকদ্বয়ে তিনি অতি সুশৃঙ্খল যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি জর্জ কুম্ব রচিত 'কনস্টি-টিউশন অফ ম্যান' নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত হইলেও হুবহু উহার অনুবাদ নহে। দ্বিতীয় পুস্তকখানি নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। প্রথম গ্রন্থে তিনি ইংরেজী শব্দ অবলম্বনপূর্বক বাংলায় যে পরিভাষাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, বর্তমান সময়ের সরকারি ও বেসরকারি পরিভাষা নির্মাণকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক ও মূল্যবান। বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ, ১৮৫৩ খ্রী ; দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৪ খ্রী ; তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯ খ্রী) তৎকালে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০ খ্রী ; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খ্রী) নামক অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যায়। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থরচনার ইহাই প্রথম সার্থক প্রয়াস। প্রধানতঃ 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত হোরেস হেম্যান উইলসনের 'স্কেচ অফ দি রিলিজিয়াস সেক্ট্স্ অফ দি হিন্দুস্' নামক প্রবন্ধদ্বয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থটি রচিত হইলেও ইহাতে অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণাও যথেষ্ট বর্তমান। তাঁহার 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার'ও (গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রজনীনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) এই জাতীয় একখানি মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা' (১৮৪৫ খ্রী) ; 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫ খ্রী) ; 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫ খ্রী) ও 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। বঙ্গসাহিত্যের সুপরিচিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয়কুমারের পৌত্র।

দ্র নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, কলিকাতা, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ ; মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১২৯২ বঙ্গাব্দ ; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৪ খ্রী ; শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯০৪ খ্রী ; রাজনারায়ণ বসু, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, কলিকাতা, ১৮৭৮ খ্রী ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রী ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২, কলিকাতা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

সুশীলকুমার গুপ্ত

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ খ্রী) কবি অক্ষয়-কুমার বড়াল কলিকাতা চোরবাগানে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। অক্ষয়কুমারের শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ হয় হেয়ার স্কুলে। কিছুদিন দিল্লী অ্যাণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের হিসাব-বিভাগের কাজ করিয়া পরে তিনি নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে প্রবেশ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এখানে প্রধান কর্মচারীরূপে কাজ করেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ৪ আষাঢ় (১৯ জুন ১৯১৯ খ্রী) তিনি পরলোকগমন করেন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ ১২৮৯) বাহির হইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ—'প্রদীপ' (১৮৮৪ খ্রী), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫ খ্রী), 'ভুল' (১৮৮৭ খ্রী), 'শঙ্খ' (১৯১০ খ্রী) এবং 'এষা' (১৯১২ খ্রী)।

অক্ষয়কুমার রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কবিতা' (১৮৮৭ খ্রী) এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা'র (১৮৮৭ খ্রী) কবিতা নির্বাচনেও সহায়তা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'পান্থ' নামক একটি কাব্যের তিনটি পর্যায় ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইয়াও অক্ষয়-কুমার বাংলা কাব্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি ছিলেন বিহারীলালের শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও বিহারীলালের নিকট হইতে আত্মগত কল্পনামূলক প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের দীক্ষা পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের কবিতার ন্যায় তাঁহার কবিতাতেও বাস্তব-বিচ্ছেদের জন্য দুঃখের সুর বর্তমান। মৃত পত্নীর স্মৃতিতে লিখিত 'এষা'র যুগে আসিয়া আবার গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যেই তিনি তৃপ্তি খুঁজিয়াছেন। শব্দচয়নে বাক্যগঠনে অর্থের পরিমিতি রক্ষায় তিনি সতর্ক ও ক্ল্যাসিকধর্মী।

দ্র সুশীলকুমার দে, নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৫৪ খ্রী ; মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৮ম সং ; সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫৮, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ ; প্রিয়লাল দাস, এষার কবি, ১৯৩৩ খ্রী।

ভবতোষ দত্ত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০ খ্রী) বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ নদীয়া জেলার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম। পিতা মথুরানাথ কুমারখালি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন ; পরে সরকারি চাকুরিসূত্রে রাজসাহীবাসী হন। অক্ষয়কুমার বাল্যকালে কুমারখালি ও পরে রাজসাহীতে শিক্ষালাভ করেন। রাজসাহী কলেজ হইতে বি. এল. পাশ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন এবং আমৃত্যু এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল হইতেই অক্ষয়কুমারের প্রবল সাহিত্যানুরাগ ছিল। রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' এবং কুমারখালির 'গ্রাম-বার্তা'য় তাঁহার বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল ; এবং বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষভাবে ঐতিহাসিক রচনার জন্যই অক্ষয়কুমার বিখ্যাত। 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৮৯৮ খ্রী) ও 'মীরকাসিম' (১৯০৬ খ্রী) নামক দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মূল দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে তিনি ইঁহাদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং প্রচলিত অনেক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁহার পরবর্তী কালের রচনা 'গৌড়লেখমালা' (১ম স্তবক, ১৯১২ খ্রী) তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এই গ্রন্থে বাংলার পালরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়া তিনি বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার পথ সুগম করিয়াছেন। এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতীত অক্ষয়কুমার 'সমরসিংহ' (১৮৮৩ খ্রী), 'সীতারাম রায়' (১৮৯৮ খ্রী), ও 'ফিরিঙ্গি বণিক' (১৯২২ খ্রী) নামক অপর তিনখানি গ্রন্থ এবং 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'রানী ভবানী', 'বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য' প্রভৃতি ও গৌড় সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ২৪ মার্চ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হলে 'অন্ধকূপহত্যার কাহিনী' সত্য কিনা বিচার করিবার জন্য 'ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি'র প্রযত্নে যে সভা হয়, উহাতে অক্ষয়কুমার ঐ কাহিনীকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাঁহার সেই মতই এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে সাধারণভাবে গৃহীত হইতেছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চার প্রসারের জন্য অক্ষয়কুমার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ চেষ্টা এই প্রথম। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিলে অক্ষয়কুমার সর্ব-প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই সমিতির চিত্র-শালার দ্রব্যসংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে তিনি শরৎকুমারের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ক্রিকেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) অক্ষয়কুমার সভাপতিত্ব করেন। পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে তিনি ইতিহাস শাখার সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে ১৩১১ বঙ্গাব্দে অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট সদস্যপদে নির্বাচিত করেন। সরকার তাঁহাকে 'কৈসর-ই-হিন্দ' স্বর্ণ-পদক (১৯১৫ খ্রী) ও 'সি. আই. ই.' উপাধি দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পালরাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮ খ্রী) আন্দুলের চৌধুরী বংশে জন্ম। তিনি আইনজীবী (অ্যাটর্নি) ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সহপাঠী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চায় তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গান আছে। অক্ষয়-

চন্দ্রের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মাত্র তিনখানি—'উদাসিনী' (১৮৭৪ খ্রী); 'সাগর-সঙ্গমে' (১৮৮১ খ্রী); 'ভারত-গাথা' (১৮৯৫ খ্রী)।

দ্র সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৭৬, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। ইনি চুঁচুড়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গঙ্গাচরণ সরকার মুনসেফ ও পরে সবজজ ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন (১৮৭২ খ্রী)। অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম রচনা 'উদ্দীপনা' ইহাতে প্রকাশিত হয়। বহরমপুরে পাঁচ বৎসর ওকালতি করিবার পর মাতার রোগবৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন এবং রাজনীতি-আলোচনা ও হিন্দুসমাজের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ খ্রী চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইহা ১৭ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। 'নবজীবন' (১৮৮৪-১৮৮৯ খ্রী) পত্রিকারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। উভয় পত্রিকাতেই সমকালীন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের রচনা থাকিত। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় অক্ষয়চন্দ্র প্রাচীন কাব্য -সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত যুক্তাক্ষরহীন 'গোচারণের মাঠ' বিখ্যাত শিশুপাঠ্য কাব্য। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম যুগ্ম সহকারী-সম্পাদক ছিলেন।

দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩৯, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

অক্ষয়তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। অতি পুণ্যদিন বলিয়া পরিগণিত। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব হইতে জানা যায়, অক্ষয়তৃতীয়ায় সত্যযুগের প্রারম্ভ, জনার্দন এই দিন যব সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাকে দেবলোক হইতে মর্ত্যে অবতরণ করাইয়াছিলেন। সেই জন্য এই দিনে দানাদি কার্যে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। এই দিন শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা; এই উপলক্ষে কৃষ্ণকে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিবার বিধান আছে। অনেকে এই দিন জলপূর্ণ কুম্ভ দান করেন। মহিলারা অক্ষয়তৃতীয়া ব্রতানুষ্ঠান প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা এবং জলপূর্ণ কুম্ভ ও ভোজ্য দান করিয়া থাকেন। কোনও কোনও ব্যবসায়ী অক্ষয়তৃতীয়ায় নববর্ষারম্ভ এবং হালখাতা করেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষয়বট প্রলয়কালে বিষ্ণু বটপত্রে অধিষ্ঠান করেন শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। ইহা হইতে এইরূপ বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে যে বটগাছের মৃত্যু নাই এবং তাহা পবিত্র ও পূজার যোগ্য। প্রয়াগ, গয়া, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে এক একটি বটবৃক্ষ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এইগুলি প্রাচীন এবং এইগুলির মৃত্যু নাই; সুতরাং বৃক্ষগুলি অক্ষয়। এই সকল বৃক্ষে জলসেক করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। প্রয়াগের অক্ষয়বট এখন কেল্লার ভিতর পড়িয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্ব ভরাট হইবার ফলে ইহা সমতল হইতে নিম্নে অবস্থিত। ঐতিহাসিক আবদুল কাদের লিখিয়াছেন যে, সম্রাট আকবরের সময় হিন্দুরা এই বৃক্ষের মূল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। সে সময় গঙ্গা বৃক্ষের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত।

অক্ষর (syllable) ভাষাবিজ্ঞানে পদ-উচ্চারণে একক মান (unit)। যেমন 'রাম' সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে 'রা+ম' (দুই অক্ষর), বাংলা ভাষার উচ্চারণে 'রাম্' (এক অক্ষর)। একটি অথবা দুইটি স্বরধ্বনি লইয়া অক্ষর হইতে পারে। যেমন 'এ' 'বউ'। স্বরধ্বনিযুক্ত এক বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি লইয়া অক্ষর হইতে পারে। যেমন, 'প্রোৎসাহিত' (প্রোৎ+সা+হি+ত) = প্র্ওৎ+ স্আ +হ্ই+ৎঅ, অনৈতিহাসিক (অ+নৈ+তি+হা+ সিক্, বাংলা উচ্চারণে) = অ+ন্ঐ+ৎই+হ্আ+ স্ইক্। ভাষাবিজ্ঞানে অক্ষর দ্বিবিধ, সংবৃত (closed) ও বিবৃত (open)। সংবৃত অক্ষর ব্যঞ্জনান্ত, বিবৃত অক্ষর স্বরান্ত। বিবৃত অক্ষরে হ্রস্ব স্বর থাকিলে এক মাত্রা (mora), দীর্ঘ স্বর থাকিলে দুই মাত্রা। সংবৃত অক্ষরে সর্বদা দুই মাত্রা।

সুকুমার সেন

অক্ষোভ্য পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের অন্যতম। প্রায় সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থেই ইহার উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। ইঁহাকে বিজ্ঞানস্কন্ধস্বভাব ও বজ্রকুলী বলা হইয়া থাকে। মামকী ইঁহার প্রজ্ঞা। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রায় প্রত্যেক দেশেই নানা আকারের অক্ষোভ্যের বহু মূর্তি ও চিত্র পাওয়া গিয়াছে। অক্ষোভ্যের বাহন এক জোড়া হস্তী এবং চিহ্ন বজ্র। তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধদিগের নিকট অক্ষোভ্য বিশেষ সমাদৃত।

অক্ষোভ্যের বর্ণ নীল এবং অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত দেবতাদিগের মধ্যে 'হেরুক' অগ্রগণ্য।

দ্র *Advayavajra Samgraha*, Baroda, 1927;

B. Bhattacharya, *The Indian Buddhist Iconography,* 2nd Edition, Calcutta, 1958.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্সিজেন রসায়ন বিজ্ঞানের প্রভাতে জানা গিয়াছিল বায়ু মূলতঃ অক্সিজেন (১ আয়তন) ও নাইট্রোজেন (৪ আয়তন) গ্যাসের মিশ্রণ। ফরাসী বিজ্ঞানী লাবোয়াজিয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে বায়ুস্থ অক্সিজেন দহনসহায়ক ; অক্সিজেন না থাকিলে কোনও পদার্থ দগ্ধ হয় না। অক্সিজেনের শ্বাস লইয়া প্রাণী বাঁচে। এমন কি জলচর প্রাণী জলে দ্রবিত সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের শ্বাস লয়। লোহায় মরিচা ধরে লোহার সহিত আর্দ্র অক্সিজেনের (বায়ু হইতে) রাসায়নিক ক্রিয়া হয় বলিয়া। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচনক্রিয়াও ঘটে অক্সিজেনের স্পর্শ লাগে বলিয়া। পর্বতশৃঙ্গ আরোহণকালে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় বলিয়া আরোহীরা অক্সিজেনের শ্বাস লইবার জন্য অক্সিজেনপূর্ণ সিলিণ্ডার বহন করে। রোগীর শ্বাসকষ্ট হইলে অক্সিজেনের শ্বাস লইবার ব্যবস্থা করা হয়। অক্সিজেন বেশি পাইলে আগুন গনগনে হয় ; কামারেরা তাই হাপর ব্যবহার করে। লোহা বা ইস্পাত কাটিবার বা দুইখণ্ড গলাইয়া পিটিয়া জুড়িবার জন্য অক্সিজেনমিশ্রিত অ্যাসিটিলিন গ্যাসের বেশি উষ্ণ শিখা ব্যবহার হয়।

আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু তরল করিয়া উহা হইতে অক্সিজেন পৃথক করা গিয়াছে। এই ভাবে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদন করা হয়।

জিনিস দগ্ধ হয়, ইহার উপাদানের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয় বলিয়া। কাঠ, কয়লা, কেরোসিন সকলই দাহ্য পদার্থ। কার্বন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি ইহাদের অন্যতম উপাদান। দহনকালে অক্সিজেনযুক্ত হইয়া কার্বন হইতে কার্বনডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন হইতে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাণীর শ্বাসকার্যেও কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা মৃদু দহনকার্য। নাসাপথে বায়ু বা অক্সিজেন ফুসফুসে গিয়া রক্তে মিশে।

রক্তপ্রবাহের সহিত অক্সিজেনও দেহতন্তুতে সঞ্চালিত হয়। প্রয়োজনমত খাদ্যের উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির সঙ্গেও যুক্ত হয়। তাহাতে কার্বনডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। কার্বনডাইঅক্সাইড রক্তপ্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া আবার ফুসফুসে ফিরিয়া আসে। সেখান হইতে নাসাপথে প্রশ্বাসের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়।

প্রবাহপথে **নদী** বহিয়া চলে পচা পাতা পল্লব, প্রাণীর মৃতদেহ, স্বাস্থ্যহানিকর আবর্জনা। নদীর ধারে গড়িয়া উঠা জনপদ হইতে মলমূত্রাদি হানিকর আবর্জনা নদীতে পড়ে। জলে মিশিয়া থাকা অক্সিজেন আবর্জনার উপাদানের সহিত রাসায়নিক সংযোগে ব্যয় হইয়া যায়। তাহাতে জল দূষিত হইবার ও জলজ প্রাণীর অক্সিজেন অভাবে প্রাণহানির আশঙ্কা হয়।

নদীর জলে ঢেউ উঠে। জলের বুকে সূর্যকিরণ পড়ে, বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহাতে বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত জলের ময়লার মিশিবার সুযোগ হয়। এইভাবে তরঙ্গবহুল স্রোতস্বতীর জলে জীবাণু নষ্ট হয়।

আজকাল রৌদ্র ও বায়ুর মধ্যে জলের মিহি ধারা উৎক্ষেপ করিয়া সূর্যকিরণ ও অক্সিজেনের সাহায্যে জীবাণু নাশ করিয়া পানীয় জল শোধনের ব্যবস্থা আছে।

অক্সিজেন গ্রহণে প্রাণী যেমন বাঁচে তেমনই নিত্য অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার জন্য ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়। ইহার রাসায়নিক কার্যে অগ্নির দাহিকাশক্তি বাড়ে, খাদ্যের উপাদান দহনের ফলে দেহে শক্তি আসে, আবার ইহারই প্রভাবে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জরা উপনীত হয়, পালন ও হনন একাধারে চলে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অগস্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র বিখ্যাত মহর্ষি। কুম্ভমধ্যে জন্মিয়াছিলেন, তজ্জন্য নামান্তর কুম্ভযোনি। পত্নীর নাম লোপামুদ্রা। অগস্ত্য অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মনে হয় তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তামিল ভাষার প্রবর্তকরূপেও তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নানাস্থানে তাঁহার পূজার প্রচলন আছে। বাংলাদেশে ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিন অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদান করিবার ব্যবস্থা আছে। তিনি দক্ষিণদেশস্থ বিন্ধ্যপর্বতকে নতশির এবং বাতাপি ও ইল্বল নামক দুই প্রধান অসুরকে বধ করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে যাত্রাকালে অগস্ত্য ক্রমবর্ধমান বিন্ধ্যকে বলিয়াছিলেন, 'যে পর্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি সে পর্যন্ত তুমি মস্তক অবনত করিয়া থাক'। অগস্ত্য আর না ফেরায় বিন্ধ্য মস্তক উত্তোলিত করিতে পারেন নাই। (মহাভারত বনপর্ব, ১০৪)। সাধারণ ধারণা, অগস্ত্যযাত্রার দিন (মাসের প্রথম দিন) যাত্রা করিলে অগস্ত্যের মত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই। তাই ঐ দিন যাত্রা করা নিষিদ্ধ। বনবাসকালে রাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিলে,

রামকে অগস্ত্য বহু দৈব অস্ত্র দিয়াছিলেন (রামায়ণ, অরণ্য, ১১-৩)। রাম-রাবণের যুদ্ধকালে ইনি লঙ্কায় গিয়া রামকে আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দেন। (রামায়ণ, যুদ্ধ, ১০৭)। অগস্ত্য-প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। (রামায়ণ, যুদ্ধ, ১১১)। শম্বুকবধের পর রাম অগস্ত্যদর্শনের জন্য অগস্ত্যাশ্রমে গেলে অগস্ত্য তাঁহাকে শ্বেতরাজার নিকট হইতে লব্ধ দিব্য আভরণ দান করেন (রামায়ণ, উত্তরা, ৭৬)। দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্রজল পান করিয়া শোষণ করিলে দেবতাগণ সমুদ্রান্তঃস্থিত দৈত্য বধ করেন (মহাভারত, বন, ১০৫)।

দ্র Nilkanta Sastri, *A History of South India*, London, 1958.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অগ্নি[১] আগুনের ব্যবহার অত্যন্ত পুরাতন। পিকিঙের দক্ষিণে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে যে আদিমানবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে তাহারা আগুনের সাহায্যে মাংস ঝলসাইয়া ভোজন করিত।

ভারতের নানা বনবাসী জাতি বিভিন্ন উপায়ে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন করে। চকমকির ব্যবহারও আছে। আন্দামানীরা আগুনের ব্যবহার জানে, আগুন ধরাইতে জানে না।

সাইক্ল-পাম্পের মধ্যে চাপের ফলে উত্তাপ হয়। সেইরূপ উত্তাপের সুযোগ লইয়া বোর্নিও দ্বীপ ও ব্রহ্মের কোনও কোনও বন্যজাতি একপ্রকার দেশী পাম্পের সহায়তায় আগুন ধরায়।

নির্মলকুমার বসু

অগ্নি[২] কোনও দাহ্যবস্তুর অক্সিজেনের সহিত দ্রুত রাসায়নিক সংযোগে যে আলোক, তাপ ও শিখার উৎপত্তি হয়, তাহাকে অগ্নি বলে। একটি বিশেষ উষ্ণতায় উন্নীত না হইলে কোনও দাহ্যবস্তু প্রজ্বলিত হয় না। বৈদ্যুতিক চুল্লীর আভা এই সংজ্ঞা অনুসারে অগ্নি নহে, কিন্তু বর্তমানে ইহাকেও অগ্নি আখ্যা দেওয়া হইতেছে।

অগ্নির ব্যবহার মানবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, যদিও তাহা কোন্ সুদূর অতীতে ঘটিয়াছিল, বলা যায় না।

অতি প্রাচীন যুগে সম্ভবতঃ পাথর ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। পরবর্তী কালে হয়তো কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদনের প্রথা বহুল প্রচলিত হইয়াছিল। বর্তমানে সংহত সূর্যালোক, ঘর্ষণ, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবস্থায় অগ্নি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেগুলি বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই জ্বলিয়া ওঠে।

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

অগ্নি[৩] অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতাগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। ঋগ্বেদীয় দেবতাগণের মধ্যে সূক্তসংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করিলে ইন্দ্রের পরেই তাঁহার স্থান। ঋগ্বেদের অন্যূন ২০০ সূক্তে তিনি মুখ্যভাবে আহূত ও স্তুত হইয়াছেন। এতদ্-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেবগণের সহিত অগ্নির সংস্রবও প্রায়শঃই লক্ষিত হইয়া থাকে।

অগ্নির আকৃতি সম্পর্কে ঋগ্বেদে যে সকল বিশেষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। যথা—'ঘৃত-নির্ণিক্', 'ঘৃত-কেশ', 'দ্রুন্ন', 'ধূম-কেতু', 'তমোহন্', 'চিত্র-ভানু', 'শুক্র-শোচিঃ', 'শুচিদন্', 'কৃষ্ণ-বর্ত্তনি', 'হিরণ্য-রথ'। অগ্নির বাহনের নাম 'রোহিৎ'।

অগ্নির কর্ম প্রধানতঃ যজ্ঞস্থলে দেবতাদের আবাহন ও দেবগণের উদ্দেশে হবির্বহন। তিনি মনুষ্য ও দেবতা-গণের দূত-স্বরূপ—'অগ্নে দূতো বিশামসি' (ঋ ১. ৩৬. ৫)। দেবগণের হবিঃ বহন করেন বলিয়া তাঁহার আর এক বিশেষণ 'হব্য-বাট্' বা 'হব্য-বাহন'।

ঋগ্বেদে অগ্নিকে 'হোতা', 'পুরোহিত' এবং 'ঋত্বিক্' রূপেও নির্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নির জন্ম বা উৎপত্তি সম্পর্কেও ঋগ্বেদে বহুবিধ কল্পনা করা হইয়াছে। কখনও বলা হইয়াছে, মাতরিশ্বা কর্তৃক দ্যুলোক হইতে তাঁহাকে আহরণ করা হইয়াছে; কখনও মেঘদ্বয়ের মধ্য হইতে ইন্দ্র-কর্তৃক তিনি উৎপাদিত হন—এইরূপ বলা হইয়াছে। কোনও কোনও মন্ত্রে দ্যাবা-পৃথিবীকে তাঁহার মাতা ও পিতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আচার্য শাকপূণির মতানুসারে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক—অগ্নি এই ত্রিবিধ স্থানেই আশ্রিত (নিরুক্ত, ৭ ২৮. : 'পৃথিব্যাম্ অন্তরিক্ষে দিবীতি শাক-পূণিঃ।' 'পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোকে' —ইহাই আচার্য শাকপূণির মত)। নিরুক্তব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য এই ত্রি-রূপ অগ্নির বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন—

'পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি তদ্ বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুদাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা।'—নিরুক্ত, ১২ ১৯। 'পার্থিব অগ্নিরূপে পৃথিবী-লোকে যাহা কিছু আছে, তাহাতেই তিনি অধিষ্ঠান করেন। অন্তরিক্ষলোকে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্যরূপে।'

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে অগ্নিকে 'দিব্য' ও 'অপ্সুমৎ' এই বিশেষণদ্বয়ের দ্বারাও বিশেষিত করা হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহে অরণি-দ্বয়ের সংঘর্ষণ হইতে যজ্ঞিয় অগ্নির উৎপত্তি প্রায়শঃই বর্ণিত হইয়াছে—'উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্ঠ অরণী' (ঋ ৫.৯ ৩)।

ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রসমূহে অগ্নির সহিত 'ত্রিত্ব' সংখ্যার সম্বন্ধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি 'ত্রিষধস্থ,' 'ত্রিপস্ত্য'; 'গার্হপত্য,' 'আহবনীয়' ও 'দক্ষিণ' রূপে তাঁহার রূপত্রয়ও সুবিদিত। 'হব্য-বাহন', 'ক্রব্য-বাহন' ও 'আমাদ্' রূপে তাঁহার ত্রিবিধ রূপও যজুর্বেদে দৃষ্ট হয়।

ঋগ্‌বেদে 'দৈবোদাস', 'ত্রাসদস্যব', 'বাধ্র্যশ্ব' প্রভৃতি রূপে অগ্নির বিশেষণও দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণ কর্তৃক অগ্নির উপাসনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

ঋগ্‌বেদে প্রধানতঃ রক্ষক ও পুত্র, পশু, হিরণ্য প্রভৃতির দাতা রূপে অগ্নির আবাহন লক্ষিত হয়। তিনি 'বিশ্‌পতি', তিনি 'রক্ষোহন্'।

অগ্নি এই শব্দটির সহিত ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত ল্যাটিন ও স্লাভনিক ভাষায় প্রচলিত যথাক্রমে ignis এবং ogni শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণের মধ্যে অগ্নিপূজার সবিশেষ প্রচলন সুবিদিত।

'বৈশ্বানর', 'তনূনপাৎ', 'নরাশংস' প্রভৃতি রূপেও ঋগ্‌বেদে অগ্নির আবাহন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্র A. A. Macdonell, *Vedic Mythology*, Strassburg, 1897 ; J. Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. V. 3rd Edn. London, 1884 ; M. Bloomfield, *Rig-Veda Repititions*, Part 2, Harvard Oriental Series, vol. XXIV, 1916.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অগ্নি[৪] বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহিত অগ্নির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অগ্নির পবিত্রতা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত। প্রাচীন কালে বহু স্থানে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষীয় জরথুস্ত্রবাদী পার্শী সম্প্রদায় অগ্নিপূজক।

পুরাণের মতে ধর্মের ঔরসে বসুভার্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম। মতান্তরে তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। অগ্নির ভার্যা স্বাহা। 'অগ্নিপূজা' দ্র।

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

অগ্নিকুল পৃথ্বীরাজ রাসো এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বিশ্বামিত্র, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ দক্ষিণ রাজপুতানার আবু পর্বতে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু দৈত্যদের অত্যাচারে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটে। তখন বশিষ্ঠ মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি হইতে পরমার, চৌলুক্য, পরিহার (প্রতিহার) এবং চাহমান—এই চারজন বীরপুরুষ সৃষ্টি করেন। ইঁহারা দৈত্যদের নিধন করিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এই চারজন বীরপুরুষ হইতে যথাক্রমে পরমার, চৌলুক্য, প্রতিহার ও চাহমান (চৌহান) রাজপুত বংশের সৃষ্টি হয়। অগ্নি হইতে জন্ম এই কারণে এই রাজপুত বংশগুলি 'অগ্নিকুল রাজপুত' নামে খ্যাত। কাহিনীর ঈষৎ ভিন্নরূপও প্রচলিত আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী অমূলক মনে করেন।

দ্র চান্দ বরদাই, পৃথ্বীরাজ রাসো, ১ম ভাগ, কাশী, ১৯০৪ খ্রী।

নিমাইসাধন বসু

অগ্নিপরীক্ষা রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ-নির্ণয়ার্থ প্রাচীন পরীক্ষাবিশেষ। ধান্য দ্বারা ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালিত করিয়া অভিযুক্তের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয়ে সাতটি অশ্বত্থপত্র স্থাপন এবং সাতগাছি সূত্র দ্বারা সেই সপ্ত পত্র বেষ্টন করা হইত। পরে পঞ্চাশ পল অর্থাৎ ৩ তোলা, ২ মাষা, আট রতি পরিমিত, ৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ অগ্নিতুল্যবর্ণ তপ্ত লৌহপিণ্ড অভিযুক্তের অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয়ে অর্পিত হইলে ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ ৭টি মণ্ডল তাহাকে অতিক্রম করিতে হইত এবং অষ্টম মণ্ডলে দাঁড়াইয়া, নবম মণ্ডলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইত। ইহাতে হস্ত দগ্ধ হইলে অপরাধী; অন্যথায় নিরপরাধ জ্ঞান করা হইত। অষ্টম মণ্ডলের কোনও এক মণ্ডলের মধ্যে তপ্ত লৌহপিণ্ড পড়িলে পুনরায় পরীক্ষা হইত। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ২য় অধ্যায়)।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অগ্নিপুর মাহিষ্মতী দ্র

অগ্নিপুরাণ পুরাণ ও পুরাণেতর নানা বিষয়ের আলোচনাত্মক পুরাণগুলির অন্যতম। ইহা মূলতঃ অগ্নিবশিষ্ঠ-সংবাদরূপে নিবদ্ধ। ইহাতে বিষ্ণু, লিঙ্গ, দুর্গা, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার পূজা, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান, দেবতার মূর্তিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, বিবাহানুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি প্রভৃতির কথা ছাড়া মৃত্যু ও জন্মান্তরবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল, বংশানুকীর্তন প্রভৃতি বিশুদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ের বিবরণ আছে। আলোচিত অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের মধ্যে জ্যোতিষ, শাকুনবিদ্যা, গৃহনির্মাণ, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসা, ছন্দঃ, কাব্য, ব্যাকরণ, কোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেহ

কেহ মনে করেন, ইহা পূর্ব ভারতে (বাংলা বা বিহারে) খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত।

দ্র M. Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. *I.* ; Haraprasad Sastri, *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts*, Asiatic Society of Bengal, vol. V, Preface, 1928.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অগ্নিপূজা জড়বিজ্ঞানের দিক হইতে বলা চলে যে অম্লজান (অক্সিজেন) এবং অঙ্গারের (কার্বন) সমবায়ে অগ্নির উৎপত্তি হয়। অগ্নি এবং আলোক তাহাদের শক্তি এবং ঔজ্জ্বল্যের কারণে আদিম মানবের নিকট রহস্যময় আকর্ষণের বস্তু ছিল। আদিম মানব আকাশের বিদ্যুৎ অথবা অরণ্যের দাবাগ্নিকে প্রথম দেখিয়াছিল। তাহার পর একদা ধাতু অথবা শিলাখণ্ডের সহিত প্রস্তরখণ্ডের আকস্মিক সংঘাতে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিতে পায়, অবশেষে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সে ধাতু, প্রস্তর, এমন কি কাষ্ঠখণ্ডও ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাই বলুন না কেন অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার এবং অগ্নির সাহায্যে উষ্ণতা-সম্পাদন, রন্ধনবিদ্যা এবং শিল্পাদি প্রচলনই যে আজিকার সভ্যজীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। অগ্নির অসাধারণ উপযোগিতার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অগ্নিকে ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করিতে আরম্ভ করে।

(ক) ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয়দিগের আদিপুরুষগণ ইওরেশিয়ার যে সমতল ভূখণ্ডে বাস করিতেন তাহা বৎসরের কতক সময় ব্যাপিয়া তীব্র শীতে আচ্ছন্ন থাকিত। এই জন্য শৈত্যনিবারণ, উষ্ণতাসাধন এবং হিংস্র জন্তু বিতাড়নাদি ব্যাপারে অগ্নি সংসারযাত্রার একটি অত্যাবশ্যক উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

যাযাবর জাতির ন্যায় ইন্দো-ইওরোপীয় অথবা আর্যজাতি যখন যেখানে যাত্রা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের আদি জন্মভূমিতে প্রচলিত অগ্নিকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে আর্যগণ নিজেদের অগ্নি এবং আলোকের সন্ততিরূপে বিশ্বাস করিয়া উষা, সূর্য, মিত্র, অগ্নি অথবা আতর্‌-এর পূজা করিতে শিখিলেন।

গ্রীস, ইরান এবং ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে মূল ভাষার (আদিম ইন্দো-ইওরোপীয় আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব) অগ্নিদ্যোতক শব্দটি এইভাবে আবিষ্কার করা যাইতে পারে—

ইন্দো-ইওরোপীয় মূল :

১ দিব=দীপ্তি পাওয়া > ল্যাটিন ডিউস, সংস্কৃত দেব, আবেস্তীয় দইব=দীপ্তিমান দেবতা, জার্মান টিউ·Tiw, যেমন Tuesday ; ইংরেজী 'ডে' শব্দ <dæg (প্রাচীন ইংরেজী)=সংস্কৃত 'দাঘ' অথবা 'দাহ', তুলনীয় 'নিদাঘ'=গ্রীষ্মদিন ; ল্যাটিন atrium 'আত্রিউম্‌'=আবেস্তীয় 'আতর্‌'=অগ্নিস্থান বা বেদী ; ল্যাটিন ignis 'ইগ্‌নিস্‌'=সংস্কৃত 'অগ্নি'=বাল্‌টিক ogne 'ওগনে'=স্লাভ oganu 'ওগনু'=আগুন

(খ) ইন্দো-ইরানীয় অগ্নি— অনার্য আদিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া উত্তর ভারতে আর্যজাতির ভ্রমণ-অভিযান যখন সমাপ্ত হইল তখন তাঁহারা কৃষিজীবীরূপে এদেশে বসবাস আরম্ভ করিলেন। জাতীয় দেবতারূপে গৃহীত হইয়া ইন্দ্র দান করিলেন বিজয়, সোম দিলেন উল্লাসবর্ধক পানীয়, এবং স্বয়ং অগ্নি পশুযাগে ও অন্যবিধ যজ্ঞাদিতে উৎসর্গীকৃত বস্তুসমুদয় দেবতাবর্গের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভারতীয় আর্যগণের নিকট অগ্নি অতি প্রধান দেবতারূপে গৃহীত হইলেন— তাঁহার নাম হইল অসংখ্য এবং বাস হইল ত্রিলোক ব্যাপিয়া। অসুরের জঠরে জন্ম-লাভ করিয়া (অসুরস্য জঠরাদ্‌ অজায়ত) অগ্নি দেবতাবর্গের মুখ এবং জিহ্বারূপে পরিচয় লাভ করিলেন। তিনি অন্তরিক্ষে, তিনি ধরিত্রীগর্ভে, তিনি জীবজগতে, তিনি ঈশ্বর, পরিবারে তিনি গৃহপতি, তিনি যুগস্রষ্টা প্রভু, তিনি জাতি ও সমাজে চক্রবর্তী। ইন্দো-ইরানীয়গণ ছিলেন মূলতঃই অগ্নি-উপাসক এবং তাঁহাদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য তাঁহারা অগ্নির সাহায্যে দেবগণের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত ও জটিল পদ্ধতিতে যজ্ঞ ও উপাসনাদি করিতেন। ক্রমে যখন আর্যজাতি পাঞ্জাবে আসিলেন তখন অগ্নি দ্বারা মৃতদেহ পবিত্রীকরণপদ্ধতি বা শবদাহপ্রথার প্রচলন হইল, যে প্রথা ইরানীয় আর্যগণ কখনও গ্রহণ করেন নাই।

(গ) ইরান দেশে আতর্‌, অতর্‌ (atar)— প্রাচীন ইরান দেশের সমগ্র সভ্যতা অথবা আর্যসংস্কৃতি অগ্নিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। জরথুস্ত্র (Zarathustra) পরিপূর্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যজ্ঞের পরিবর্তে যশ্‌নের (Yasna) বা পূজাবিধির প্রচলন করেন এবং মূর্তিপূজা, গোমেধ, হওম (Haoma) ও সোমপান নিষিদ্ধ করেন। অগ্নি এবং ইন্দ্র পশুবধের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া আবেস্তীয় গাথায় তাঁহাদের আদৌ উল্লেখ নাই কিন্তু তাহার পরিবর্তে আদিম আর্য জাতির (proto-Aryan) বেদী অথবা কুণ্ডস্থিত অগ্নির মাহাত্ম্য কীর্তিত

হইয়াছে। তিনি অহুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তিনি পুথ্র বা মজ্‌দা, তিনি বিশ্বকে নবজন্ম দান করেন। তিনি দৈব জগতে অষ (Asha) অথবা ঋতের প্রতীক।

আতর্‌ বিধিমতে ধর্মবিশ্বাসের মুখ্যবস্তুরূপে স্বীকৃত হইলেন এবং নিয়মানুষ্ঠানে ও সর্ববিধ ক্রিয়াকর্মের মূলাধার-রূপে পরিগৃহীত হইলেন। পরিবারসমূহে অগ্নিকুণ্ডে আতর্‌ রক্ষিত হইত এবং রাজা তাঁহার রাজপ্রাসাদ অপদানে (Apadana) এই আতর্‌কে প্রজ্বলিত রাখিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে হেরোডটাস যথার্থই বলিয়াছিলেন যে ইরান দেশে মূর্তি বা উপাসনাগৃহ নাই। একটি বহনযোগ্য আধারে অগ্নিবেদীকে শোভাযাত্রা করিয়া লওয়া হইত। পার্থিয়ান যুগে (১৫০ খ্রীষ্টপূর্ব) পর্যন্ত উৎসবাদির সময় সর্বসাধারণের উপাসনার নিমিত্ত অগ্নিকে উন্মুক্ত স্থানে রাখা হইত। মাত্র সাসানীয় যুগে ২২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অগ্নিকে দুর্গের ছাদে স্থাপন করা হয়। ক্রমে জনসাধারণের উপাসনার জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া আতর্‌ রক্ষার ব্যবস্থা হইল। পরিবারস্থিত যে অগ্নির নিকট স্বাস্থ্য, সন্ততি এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি করা হইত তাহার নাম প্রথম আধুনিক যুগে হইল দদ্‌-গাহ্‌ (বা ধর্মসম্মত)। ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীতে যে আতর্‌ জনসাধারণ-কর্তৃক উৎসবাদিতে পূজিত হইতেন তাঁহার নাম ছিল আতর্‌ গাহ্‌ (পার্বণসম্মত) এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীতে যে আতর্‌ জাতীয় বিজয়োৎসবে অথবা রাজ্যাভিষেকের সময় পূজা পাইতেন তাঁহার নাম পৌরাণিক বীরগণের নামের অনুকরণে বৃত্রহণ্‌, বৃত্রঘ্ন, বেরেথ্রঘ্ন বা বহ্‌রাম ইত্যাদি রাখা হইত। এই নিয়মে নগরের নামও আতর্‌ পাত্‌ বা আতরাবাদ হইয়াছিল। অগ্নিগৃহগুলিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অর্থকোষ ও বিচারশালা ইত্যাদি স্থাপিত হইত। মূলতঃ বলিতে গেলে আথর্বণগণ (আতর্‌ বা অগ্নির রক্ষকগণ বা পরিচর্যাকারী) যাঁহারা ঐরয়্‌ (আর্য) জাতিকে তাহাদের অইরান (= ইরান) -রূপী বিশ্রামভূমি বা উপনিবেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা অগ্নিকেন্দ্রিক যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করেন তাহা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অতি বিচিত্র অধ্যায়।

(ঘ) আতর্‌-এর পার্শী পুরোহিতগণ— খ্রীষ্টীয় ৬৫১ অব্দে আরব কর্তৃক ইরান বিজয়ের পরই জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের প্রাচীন অগ্নিপূজার অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আদর্শ, তত্ত্বচিন্তা ও বিশ্বাস অবিচ্ছিন্ন ধারায় রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পলাতক পার্শীগণ ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এদেশে বসবাস করিবার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আতর্‌ বহ্‌রামকে বিশিষ্টরূপেই ইরানশাহ নাম দিয়া স্থাপিত করা হয়। ঐ অগ্নি গুজরাটের উদ্‌বাডোতে এখনও প্রজ্বলিত রহিয়াছে। শাস্ত্রমতে এই সম্প্রদায়কে একেশ্বরবাদী বলা হয়, কবি ফিরদৌসী পারস্যের জাতীয় মহাকাব্য শাহ্‌নামাতেও তাহাই বলিয়াছেন। তথাপি প্রচলিত বিশ্বাসে কতকটা অশুদ্ধভাবে ইহাদের গবর (Gabrs) বা অগ্নিপূজক বলা হইয়া থাকে। গুজরাটী ভাষায় অগিয়ারি অথবা ইংরেজী Fire-Temple শব্দটিও যথার্থ অর্থবোধক নহে। পার্শীগণ নিজেরা ভারতে এবং ইরানে এইস্থলে দদ্‌-গাহ (Dad-Gah) অদরন্‌ (Adaran) এবং আতশ্‌-বহ্‌রাম (Atash-Behram) ইত্যাদি শব্দ (গির্জা প্রভৃতি শব্দের সমার্থক) ব্যবহার করিয়া থাকেন। আতর্‌ গৃহ বুঝাইতে মিথ্র দর্‌-ই-মেহর্‌ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। পার্শী সমাজে অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাসূচক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—অদরন্‌-গৃহে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে আতর্‌ দিবারাত্রি জ্বলিতে থাকে, গোঁড়া পার্শীগণ সেখানে কখনই কিছু অপবিত্র করিবেন না, তাঁহারা ফুঁ দিয়া আগুন নিবাইবেন না, ধূমপান করিবেন না, পুরোহিত অগ্নির সম্মুখে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণের সময় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মুখ আবৃত করিবেন ; ইহা ভিন্ন অগ্নি দ্বারা শবদাহ প্রথা যে জরথুস্ত্র মতাবলম্বী পার্শী সম্প্রদায়ের নিকট নিষিদ্ধ, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে অগ্নিদেব পূজার বাহক কিন্তু প্রাপক নহেন, তাঁহার প্রতি এই শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যেরই অনুসারী। তাই ভারতের রাজন্যবর্গ সহজেই পার্শী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। সৌরাষ্ট্রের মৈত্রিকগণ এবং পাঞ্জাবের অগ্নিহোত্রী সম্প্রদায়ও অগ্নিকে অনুরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের শকযুগের এবং ইরান দেশের প্রাচীন মুদ্রায় অগ্নিবেদীর চিত্র দেখা যায়। শক নৃপতিগণের পুরোহিতবর্গ ক্রমে ব্রহ্মক্ষত্রিয়রূপে এদেশের সমাজে মিশিয়া গেলেন। দাক্ষিণাত্যে ইঁহাদের বংশ হইতেই বঙ্গদেশের সেন রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্রাট আকবর নওসারীর (Navasari) দস্তুর মেহেরজী রানার (Dastur Meherjirana) নিকট হইতে অগ্নি-পূজার তত্ত্বচর্চা করেন—এমন কি তাঁহার গৃহেও সেই পবিত্র অগ্নির স্থাপনা করেন।

আর্দেশীর দীন্‌শা

অগ্নিমিত্র শুঙ্গ বংশ দ্র

অগ্নিহোত্র আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্তব্য যজ্ঞবিশেষ। বেদাধ্যয়নের পর গুরুগৃহ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রহ্মচারী বিবাহ করিয়া গৃহস্থ বা গৃহপতি হইতেন। প্রত্যেক গৃহপতির বাড়িতেই একটি পৃথক অগ্নিশালা বা

অগ্ন্যাগার নির্মিত হইত। সেইখানে যথাবিধি অগ্নি প্রতিষ্ঠা করা হইত। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠাকর্মের নাম অগ্ন্যাধান। যিনি অগ্নি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলা হয়।

অগ্নিশালাস্থ চতুষ্কোণ বেদীর তিন দিকে তিনটি অগ্নি-স্থাপন করা হইত। বেদীর পশ্চিম দিকে গার্হপত্য, পূর্বদিকে আহবনীয় এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নির স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আহবনীয় অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশে এবং দক্ষিণাগ্নিতে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইত। গার্হপত্য অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত হইতে দেওয়া হইত না। প্রয়োজনমত উহা হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিস্থানে অগ্নি আনীত হইত। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের নাম অগ্নিহোত্র। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে সূর্য ও অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিতে হইত। সামান্য একটু দুধ, তদভাবে সামান্য দধি বা চাউল আহুতি দিলেই কার্য সম্পন্ন হইত। যিনি নিত্য অগ্নিহোত্রযাগ সম্পাদন করেন তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী বলা হয়। গৃহস্থকে স্বয়ং এই যাগ করিতে হইত। অসমর্থ হইলে পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামাতা, অথবা অধ্বর্যুকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল।

দ্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -কৃত অনুবাদ, রামেন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, রামেন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড; A. B. Keith, tr. *The Rigveda Brahmanas*, Harvard Oriental Series, Vol. XXV, 1920.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অগ্ন্যাশয় (pancreas) ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) সন্নিকটে অবস্থিত অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিটি দুই প্রকার রস ক্ষরণ করে—পাচকরস ও হর্মোন।

অগ্ন্যাশয়ের ক্ষারধর্মী পাচকরস নালিকার সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায়। ইহাতে ট্রিপ্‌সিন (trypsin), কাইমোট্রিপ্‌সিন (chymotrypsin), অ্যামাইলেজ্ (amylase), লাইপেজ্ (lipase) প্রভৃতি এন্‌জাইম্ থাকে—প্রথম দুইটি ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিনের, তৃতীয়টি শর্করার ও চতুর্থটি তৈলজাতীয় খাদ্যের পাচন করে। ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫০০-১২০০ মিলিলিটার পাচকরস অগ্ন্যাশয় হইতে ক্ষরিত হয়। আহারের সময় খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতির জন্য স্নায়ুর প্রভাবে ইহার ক্ষরণ ঘটে। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে রক্তে ক্ষরিত সিক্রিটিন (secretin) ও প্যানক্রিয়োজাইমিন (pancreozymin) হর্মোন-দ্বয়ের প্রভাবেও অগ্ন্যাশয় হইতে এই পাচকরসটি ক্ষরিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অগ্ন্যাশয় হইতে রক্তে ইন্‌সুলিন (insulin) ও গ্লুকাগন (glucagon) নামক দুইটি হর্মোনও ক্ষরিত হয়। এই বিষয়ে 'অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি' ও 'হর্মোন' দ্রষ্টব্য।

অজিতকুমার চৌধুরী

অগ্রদানী পতিত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহাদের জল অনাচরণীয়। ইঁহারা প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রেতশ্রাদ্ধের দ্রব্য, প্রায়শ্চিত্তের দান এবং তিলদান, স্বর্ণদান, গোদান প্রভৃতি গ্রহণ করেন বলিয়া পতিত। অথচ এই সমস্ত দান গ্রহণের জন্য সমাজে ইঁহাদের চাহিদা ও প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমানে অনেক সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতও যে এই দান গ্রহণ করেন না এমন কথা বলা যায় না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অগ্রদ্বীপ বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সদর থানায় গঙ্গার চড়ায় অবস্থিত গ্রাম। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই মৌজার জনসংখ্যা ছিল ৩,১৮০। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ জীউ এখানকার বিখ্যাত দেবতা। বারুণী উপলক্ষে এখানে পক্ষকালব্যাপী বিরাট মেলা বসে। চৈত্রমাসে এখানে 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের একটি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লুপ লাইনের পাটুলি স্টেশন হইতে ৫ কিলোমিটার (তিন মাইল) উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব পারে অগ্রদ্বীপ অবস্থিত।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

অগ্রবন আগ্রা দ্র

অগ্রবাল (আগরওয়ালা, আগরবাল) কিংবদন্তী, প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত উপাদান একত্রিত করিয়া বলা চলে যে এই জাতির আদিস্থান ছিল দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের হিসার জেলায় ফতেহাবাদ-শিরসা (শৈরীষক) পথের উপর অবস্থিত অগ্রোদক (অগরোহা) নগর। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে প্রাপ্ত মুদ্রায় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত আছে 'অগোদকে অগাচ জনপদস' অর্থাৎ অগ্রোদক স্থানে অগাচ (অগ্রত্য বা অগ্র) জনপদের মুদ্রা। অনুমিত হয় অগ্রজনপদের সংগঠনকেও জনপদ যুগের অন্য জাতিগণের রাজনৈতিক সংগঠনের ন্যায় শ্রেণী বলা হইত। ইহার একক ছিল কুল। প্রত্যেক কুলে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রধান হইতেন। অগ্রশ্রেণীর কুলপুরুষ (আদি পুরুষ) ছিলেন রাজা অগ্রসেন। ইঁহার রাজধানী ছিল অগরোহা।

কিংবদন্তী অনুসারে ইঁহার ১৮ পুত্র হইতে ১৮ গোত্র উদ্ভূত হইয়াছিল ও ইনি ক্ষত্রিয় ছিলেন কারণ এই শ্রেণী মূলতঃ শস্ত্রোপজীবী ছিল। কালক্রমে ইঁহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতি কৃষি পশুপালন বাণিজ্য ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত হওয়ায় ইঁহারা বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ অথবা শ্রেণীরূপে পরিগণিত হন। বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত অগ্রোতকান্বয় বা অগ্রোতক বংশী বা অগ্রবাল জাতির উল্লেখ প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের ঘন বসতি দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশ। বাণিজ্য বা অন্য কারণে দেশের অন্যত্র ইঁহাদের বিস্তার হয়। যাঁহারা রাজস্থানে ও মধ্যদেশে যান তাঁহারা যথাক্রমে মারোয়াড়ী ও দেশী নামে অভিহিত হন।

জগদীশনারায়ণ সরকার

অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫ খ্রী) চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশে জন্ম ও মৃত্যু বারাণসীতে। সর্বভারতীয় সংগীতক্ষেত্রে অঘোরনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিভাবান গায়ক। কলিকাতায় তাঁহার সংগীতশিক্ষা। প্রধান ওস্তাদ ধ্রুপদ-খেয়াল গায়ক আলী বখ্‌স্‌, পরে মুরাদ আলী খাঁ, দৌলৎ খাঁ ও শ্রীজান্ বাঈয়ের নিকটেও তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। ধ্রুপদ, ভজন ও টপ্পাগানে এবং কণ্ঠমাধুর্যের জন্য তিনি স্বনামধন্য। শেষ দশ বৎসর বিপুল গৌরবে তিনি বারাণসী ও বোম্বাইতে অবস্থান করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁহার গানের চারিখানি রেকর্ড করা হইয়াছিল। সে-গুলি 'বিফল জনম বিফল জীবন' 'আনন্দ বন গিরিজা' (G2-12912 ও 12909), 'গোবিন্দ মুখারবিন্দ' ও 'নজরা দিল্ বাহার' (G2-12910 ও 12911)। ১৯১১ খ্রী সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী দরবারে তিনি সংগীত পরিবেশন করেন। কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ কর্তৃক তিনি 'সংগীতরত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত হন। সংগীতশিষ্য . নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, পুলিনবিহারী মিত্র, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতরত্নাকর অঘোরনাথ, যুগান্তর সাময়িকী, ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৮খ্রী।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯১৫ খ্রী) অধ্যাপক, শিক্ষাবিৎ। ঢাকা বিক্রমপুরের অধিবাসী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করিয়া এডিনবরায় যান ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ইহা ব্যতীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি রসায়ন-বিজ্ঞানের 'হোপ' পুরস্কার লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্যে শিক্ষাসংস্কার-কার্যে যোগদান করেন ও নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র নিজাম রাজ্যে বালক-বালিকাদের জন্য তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় কবিতাও রচনা করিতেন। সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার সরল ব্যবহারে তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ, হারীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

অঘোরী, অঘোরপন্থী বীভৎস বস্তু সম্বন্ধে বিকারহীন এবং ঘৃণারহিত ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। যাঁহারা অঘোর অর্থাৎ ভীষণের পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন তাঁহাদের অঘোরপন্থী বা অঘোরী বলা হয়। যে শিব অনাসক্ত, যাঁহার আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ লোকাচার বহির্ভূত, বিষ্ঠা চন্দন যিনি সমজ্ঞান করেন তাঁহার অপর নাম অঘোরনাথ। যাঁহারা শিবের এই অঘোরত্বের সাধক তাঁহাদের প্রথমে যথানিয়মে সন্ন্যাস লইয়া অঘোরমন্ত্র লইতে হয়। সন্ন্যাসীরা এই মন্ত্রকে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন মনে করেন এবং অঘোরীদের দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। অঘোরীগণ কাপালিক নহেন, তাঁহারা নরবধ করেন না, শক্তির নিকট নরবলি দেন না, যদিও শিবের ন্যায় তাঁহারা শ্মশানচারী এবং মৃত নরমাংস ভক্ষণে তাঁহাদের অরুচি নাই। জীবনধারণের প্রয়োজনসামগ্রী এতই স্বল্প যে লোকালয়ে প্রায়ই তাঁহাদের আনাগোনা নাই— মনুষ্য-সমাজের সহিত তাঁহাদের যোগ শুধু শ্মশানগামী শব-বাহকদের সহিত, তাহাদের নিকট হইতেই আহার্য বা পানার্থে কারণ-বারি সংগ্রহ করেন। উলঙ্গ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এই সাধনপদ্ধতি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, বুদ্ধদেব এইরূপ উলঙ্গ সাধু সম্প্রদায়কে 'অচেলক' বলিতেন। ইংরেজী সভ্যতার প্রভাব ও আইনপ্রণয়নের ফলে বর্তমানে ইঁহাদের সংখ্যা নগণ্য।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৮৮৩খ্রী।

অঙ্ক গণিত ও সংখ্যা দ্র

অঙ্গ[১] বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা লইয়া প্রাচীন অঙ্গরাজ্য গঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদের ইহা অন্যতম। গৌতম বুদ্ধের গৃহ-ত্যাগের সময়ে দেখা যায় যে অঙ্গরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত এবং বিম্বিসার অঙ্গ-মগধের রাজা। অজাতশত্রু যুবরাজ অবস্থায় অঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন।

ঋগ্‌বেদে অঙ্গের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অথর্ববেদে অঙ্গ-বাসীদের ব্রাত্য জাতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাদের বসতি ছিল শোণ ও গঙ্গার অববাহিকায়। পাণিনিও অঙ্গ দেশকে বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত মধ্য-দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতে আছে যে বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত ঋষি দীর্ঘতমসের বংশধরগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিতেন। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণও অনুমান করেন যে অঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে।

অঙ্গরাজ্যের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত। মহাভারতের আদিপর্বে আছে যে রাজা অঙ্গের নামানুসারেই রাজ্যের নামকরণ হয়। কিন্তু রামায়ণে আছে যে কামদেব বা মদন শিবের কোপে এইস্থানেই অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনঙ্গ হন বলিয়াই দেশের এই নাম।

অঙ্গরাজ্যের বহুল উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। রাজা দশরথের অন্তরঙ্গ মিত্র অঙ্গরাজ রোমপাদ বা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও নিজকন্যা শান্তার সহিত মুনির বিবাহ দেন। দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করার আখ্যান সর্বজন-বিদিত।

চম্পা (চম্পাপুরী, চম্পানগরী) ছিল অঙ্গ দেশের রাজধানী। এখনও ভাগলপুরের সন্নিকটে ইহার অস্তিত্ব আছে। মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে ইহার প্রাচীন নাম মালিনী বা মালিন। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের একাধিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় চম্পা উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পুণ্যতীর্থস্থান। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধ নগরীর অন্যতম চম্পা একটি বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেও প্রখ্যাত হয়। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ও সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণকালে চম্পা বা চান্‌-পোতে আসিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার মিত্র

অঙ্গ[২] জৈন আগমশাস্ত্রের অংশ। জৈনদের প্রধান ধর্মসাহিত্যকে আগমশাস্ত্র বলে। এই আগমশাস্ত্র সংখ্যায় পঁয়তাল্লিশখানি ('দৃষ্টিবাদ' বাদে)। কিন্তু অঙ্গগ্রন্থের সংখ্যা একাদশ, দৃষ্টিবাদসহ দ্বাদশ। এই দ্বাদশাঙ্গগ্রন্থ জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। ইহা ছাড়া, আবার দ্বাদশ উপাঙ্গগ্রন্থও আছে। বর্তমানে যে অঙ্গশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা মহাবীরের পঞ্চম গণধর সুধর্মস্বামী কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। কথিত আছে, সাধুগণ এই দ্বাদশাঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর ১৬০ বৎসর পর্যন্ত এই দ্বাদশাঙ্গ লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হইয়াছিল। অতঃপর উহা লিপিবদ্ধ হয়। দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত চতুর্দশ পূর্বশাস্ত্রও এই অঙ্গগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গগ্রন্থের মূল বক্তব্য এই যে, প্রতি সৎপদার্থের মধ্যে প্রতিক্ষণেই যুগপৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির কার্য চলিতেছে ('উপ্পণেই বা বিগমেই বা ধুবেই বা')। এই ত্রিপদীবাক্যই জৈনদর্শনের মূল কথা এবং ইহাই জৈনদর্শনে পরিণামবাদ। এই মূল তত্ত্ব দ্বাদশাঙ্গগ্রন্থে নানাভাবে রূপায়িত হইয়াছে। এই সমস্ত অঙ্গগ্রন্থের নামের জন্য 'প্রাকৃতসাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

দ্র M. Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. II, Calcutta, 1931.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গদ[১] বিখ্যাত শিখ গুরু। গুরু নানক মৃত্যুর (১৫৩৮ খ্রী) পূর্বে দুই পুত্রের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া অন্যতম প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। অঙ্গদ শিখদিগকে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করেন। কেহ কেহ বলেন তিনিই গুরুমুখী লিপির প্রবর্তন করেন। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অঙ্গদ[২] কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ বালির পুত্র। মাতার নাম তারা। রাম কর্তৃক বালি নিহত হইলে সুগ্রীব রাজ্যলাভ করেন এবং অঙ্গদ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। বানর-সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হইয়া তিনি সীতা উদ্ধারের সাহায্যকল্পে রামের পক্ষে লঙ্কায় গমন করেন এবং সম্পাতির নিকট হইতে সীতার সন্ধান আনিয়া দেন। রাবণের সহিত রামের যুদ্ধের আয়োজন হইলে যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে রাম অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। রামের নির্দেশে অঙ্গদ রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করিয়া রামের শরণাপন্ন হইতে বলেন। এই প্রসঙ্গে অঙ্গদ রাবণকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেন। 'অঙ্গদের রায়বার' নামে প্রসিদ্ধ বাংলা রামায়ণের এই অংশ বাঙালীর বিশেষ প্রিয় বস্তু। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন।

অঙ্গরাগ বিভিন্ন উপচারের সংমিশ্রণে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সুরভিত বা কান্তিময় করিবার উদ্দেশ্যে যে অভ্যঞ্জন বা অঙ্গলেপ প্রস্তুত হয় তাহাকে অঙ্গরাগ (cosmetic) বলে। সকল দেশে সকল কালে নরনারী অল্পবিস্তর অঙ্গরাগ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন মিশরে প্রথম রাজবংশের শাসনকালে (৪০০০ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং ভারতবর্ষের সিন্ধুসভ্যতার যুগে বিবিধ অঙ্গরাগের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অঞ্জন অঞ্জনশলাকা অধররঞ্জনবর্তী (lipstick) কপোল-রক্তপিষ্টিকা (rouge paste) বর্তলৌহের (bronze) মুকুর, হস্তিদন্তের চিরুনি প্রসাধনপট্ট ইত্যাদি প্রসাধন সংক্রান্ত বহুবিধ উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিবিধ অঙ্গরাগ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে 'দশনবসনাঙ্গরাগ' একটি কলা হিসাবে গণ্য হইত। 'দশনবসন' অর্থাৎ অধরোষ্ঠ এবং 'অঙ্গ' অর্থাৎ দেহ উভয়ের সৌন্দর্য সম্পাদনই এই কলার উদ্দেশ্য। 'কামসূত্র' 'রতিরহস্য' 'অনঙ্গরঙ্গ' 'নাগরসর্বস্ব' 'পঞ্চসায়ক' প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্গরাগের নানাবিধ প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহারবিধি লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যসমূহেও অঙ্গরাগ ব্যবহারের বহুল বর্ণনা

কামসূত্রের নাগরকবৃত্ত প্রকরণে লিখিত হইয়াছে— নাগরক প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিয়তকৃত্য সমাপনান্তে দণ্ডধারণপূর্বক সামান্য অনুলেপনাদি ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া মুখ সিকৃথ (মোম) ও অলক্তক রঞ্জিত করিয়া আদর্শে মুখ দেখিবে এবং মুখবাস ও তাম্বূল গ্রহণপূর্বক নিজকার্যে নিযুক্ত হইবে। সে প্রতিদিন স্নান করিবে, একদিন অন্তর অঙ্গে তৈলাদি মর্দন করিবে, দুইদিন অন্তর ফেনক (সাবান) সাহায্যে গাত্র পরিষ্কৃত করিবে, তিনদিন অন্তর ক্ষৌরকার্য করিবে ও নখ কাটিবে। সর্বদা সংবৃত কক্ষাদির ঘর্ম 'কর্পট' অর্থাৎ রুমালদ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। ঈশ্বরকৃত 'গন্ধযুক্তি' ও শার্ঙ্গধরকৃত 'গন্ধদীপিকা' গ্রন্থে অঙ্গরাগাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 'বৃহৎসংহিতা'-র গন্ধযুক্তি প্রকরণেও নানা প্রকার অঙ্গরাগের আলোচনা আছে। প্রাচীন কামশাস্ত্রকার ও চিকিৎসকগণ দেহ-দুর্গন্ধনাশক এবং ঘর্মনিবারক নানাবিধ অঙ্গরাগ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গাত্র ও বিশেষ করিয়া মুখের ত্বক মসৃণ কোমল ও কান্তিযুক্ত করিবার জন্য অঙ্গরাগ প্রস্তুত হইত। দেহ সুরভিত করিবার জন্য অঙ্গলেপন ও নানাবিধ তৈলাদি এবং কেশপতন নিবারণের জন্যও নানাপ্রকার ঔষধ বা অনুলেপন প্রস্তুত হইত। দন্তধাবনের জন্য নানা প্রকার মঞ্জন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। অবাঞ্ছিত লোমনাশের বহুবিধ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গরাগ প্রস্তুতির নানাবিধ ব্যবস্থার উল্লেখ পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। আধুনিককালের 'ফেস পাউডারে'র ন্যায় প্রাচীনকালে লোধ্রচূর্ণ চন্দনচূর্ণ ও কুঙ্কুমচূর্ণাদি ব্যবহৃত হইত। অধরে ও কপোলে রক্তরাগ প্রস্ফুটিত করিবার জন্য লিপস্টিক ও রুজের ন্যায় অলক্তক ও মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার হইত। তাম্বূলরাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করা নিত্যকর্ম ছিল। নয়নের শ্রীবর্ধনের জন্য কজ্জল ও বিবিধ প্রকারের অঞ্জন ব্যবহৃত হইত। শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা ও কোমল রাখিবার জন্য অধরোষ্ঠ ও গণ্ডে মোম ব্যবহার করা হইত। দেহ কুঙ্কুমচূর্ণে ও নখ কুরুবকপুষ্পরাগে রঞ্জিত করা হইত।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশে অঙ্গরাগের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সে কারণে প্রত্যেক দেশে অঙ্গরাগ প্রস্তুতি একটি বিরাট শিল্পে পরিণত হইয়াছে। এমন কি যে দেশ যে পরিমাণে সাবান প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া থাকে সে দেশকে সেই অনুপাতে সভ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে অঙ্গরাগ শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ এইরূপ—

	১৯৬০ উৎপাদন-পরিমাণ কিলোগ্রাম	১৯৬১ উৎপাদন-পরিমাণ কিলোগ্রাম
ফেসক্রীম ও স্নো	৭৬৬১০২	৭১৮৩৪৭
ফেস পাউডার	৪১৩৫৩২	২৩৬৭৪০
টয়লেট পাউডার	২৬৪৩৭৬২	২৫৪৬২২১
টুথ পেস্ট	১৮২০৭৬২	১৮৪০০৬৭
টুথ পাউডার	২৬১১২৫	

ত্রিদিবনাথ রায়

অঙ্গামী নাগা নাগা দ্র

অঙ্গিরা প্রাচীন ঋষি অঙ্গিরা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি মূল গোত্রপ্রবর্তকদিগের মধ্যে একজন। অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয়গণ ঋগ্‌বেদের ঋষি হইলেও অথর্ববেদের মন্ত্র সংকলনে তাঁহাদের কৃতকর্ম ও খ্যাতি অধিক। অথর্ববেদের এক নাম আঙ্গিরস বেদ। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে যে, অঙ্গিরা

অথর্বার কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অথর্ববেদের যাতু, অভিচার প্রভৃতি ঘোর কর্মের মন্ত্রগুলি আঙ্গিরস মন্ত্র নামে খ্যাত। অথর্ববেদীয় কল্পগ্রন্থের মধ্যে আভিচারিক কল্পের নাম আঙ্গিরসকল্প। 'অথর্বা' ও 'অথর্ববেদ' দ্র।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

অঙ্গুত্তর নিকায় সুত্তপিটকের চতুর্থ নিকায়-কে অঙ্গুত্তর নিকায় বলা হয়। রাজগৃহের প্রথম বৌদ্ধ-মহাসংগীতির সময় অনুরুদ্ধ এই নিকায়ের ভার গ্রহণ করেন। কখনও কখনও 'একুত্তর নিকায়' নামেও ইহাকে অভিহিত করা হয়।

ইহার সুত্তগুলি প্রথমতঃ ১১টি পরিচ্ছেদে (নিপাত) বিভক্ত এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে আবার কতকগুলি বগ্‌গ (বর্গ) আছে। প্রত্যেক নিপাতে সুত্তগুলি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে একই নিপাতের অন্তর্ভুক্ত সুত্তগুলির আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে। যেমন, প্রথম নিপাতে সেই সব বিষয় রহিয়াছে যাহাদের সংখ্যা 'এক'; এই নিপাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। এইরূপে দ্বিতীয় নিপাতের বিষয়বস্তুগুলির সংখ্যা হইল 'দুই'; তৃতীয় নিপাতের 'তিন' ইত্যাদি।

দীঘ ও মজ্‌ঝিম নিকায়ের বৃহদাকার সুত্তগুলিতে উপস্থাপিত বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব (doctrine) এই নিকায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের সুত্ত সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অভিধম্ম পিটকের অন্যতম গ্রন্থ পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি বস্তুতঃ এই নিকায় হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতির সাহায্যেই সংকলিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গুলি ছাপ মানুষের আঙুল, করতল ও পদতল -এর ত্বকের উপর অনেক সূক্ষ্ম রেখা দেখা যায়। ইংরেজীতে এগুলিকে রিজ (ridge) বলে। এই রেখাগুলি হাতের তথাকথিত সামুদ্রিক রেখা হইতে বিভিন্ন। এই সকল সূক্ষ্ম রেখা নানা ভাবে বিন্যস্ত থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা মোটামুটি ইহার তিনটি প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়াছেন— হোর্ল, লুপ এবং আর্চ (whorl, loop, arch)। প্রাচীন হিন্দুরা শঙ্খ, জবা, পদ্ম, সীপ প্রভৃতি বিভাগে এই সকল রেখাবিন্যাসকে বর্ণনা করিতেন।

প্রথমে যজুর্বেদে এই টিপদাগের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মানবের অবয়বের বিভিন্ন চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপে অঙ্কিত চক্রের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য অঙ্গুলির টিপে অঙ্কিত শঙ্খ, সীপ ও জবা সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপূজা সম্পর্কীয় 'নারায়ণ অষ্টক' গ্রন্থে পদ্ম, চক্র, ধনু, অঙ্কুশ, মৎস্য প্রভৃতি টিপের শ্রেণীবাচক বহু শব্দ দেখা যায়। 'পঞ্চাষ্টক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ১৩ সংখ্যক শ্লোকে দণ্ড, অঙ্কুশ, চাপ, কুলিশ, বজ্র, শ্রীবাস্তব, মৎস্য প্রভৃতি উপশ্রেণীবাচক শব্দও আছে। চীন দেশে অনুরূপ দুইটি শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়— লো (Lo) এবং কী (Ki)। ইংলণ্ডে ১৬৮৪ খ্রী, ইটালীতে ১৬৮৬ খ্রী, জার্মানীতে ১৭৫১ ও ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আঙুলের ছাপের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

আঙুল বা ত্বকের ছাপের সম্বন্ধে ইহা বলা চলে— এক ব্যক্তির হাতের বা পায়ের ত্বকের চিহ্ন কখনও অন্য কোনও ব্যক্তির ছাপের সহিত হুবহু মিলিয়া যায় না। অর্থাৎ আঙুল বা হাতের ছাপ পাইলে একজন লোককে শনাক্ত করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন যে এক-একটি জাতির মধ্যে হোর্ল, লুপ এবং আর্চ -এর বিশেষ বিশেষ অনুপাত পাওয়া যায়। সেইজন্য তাহাদের মতে পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীর উক্ত অনুপাত যদি একই প্রকারের হয় তাহা হইলে উভয়ে রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে হুগলী জেলার কালেক্টর লক্ষ্য করেন যে বাংলা দেশের গ্রামে জাল সহি নিবারণের জন্য লোকে স্বাক্ষরের পাশে টিপ্‌সহি দিয়া থাকে। তিনি তদনুসারে রাজাধর কোনাই নামক জনৈক বাঙালী ঠিকাদারের নিকট দলিলে টিপ্‌সহি গ্রহণ করেন। এই দলিলটি আজিও ঐতিহাসিক দলিলরূপে পরিগণিত হয়। হুগলী জেলার আরও দুইজন রাজপুরুষ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইলিয়াম হাচেল এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্যের উপরে ভিত্তি করিয়া স্যর ফ্র্যান্সিস্ গলটন্ ইংলণ্ডে বসিয়া টিপ বা হাতের ছাপের বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ভারতীয় কর্মচারীদের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় ও শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আঙুলের ছাপ সংগ্রহের জন্য ফিংগার প্রিণ্ট বিউরো (Finger-Print Bureau) স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বিহারের কর্মচারী খানবাহাদুর আজিজউল হক এবং বাংলায় হেমচন্দ্র বসু এই বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। কলিকাতার টিপ্‌শালাকে আদর্শ করিয়া ইংলণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ১৯০১ খ্রী ও পরে আরও সমগ্রভাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে টিপ্‌শালা স্থাপিত হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু টিপ্‌শালা স্থাপিত হয়।

বিভিন্ন জাতির করতলে হোর্ল, লুপ ও আর্চ -এর অনুপাত অবলম্বন করিয়া সম্পর্কনির্ণয়ের চেষ্টা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত সাধনস্তরে রহিয়াছে, পূর্ণ সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই।

পঞ্চানন ঘোষাল

অঙ্গুলিমাল প্রথম জীবনে অঙ্গুলিমাল ছিলেন একজন নৃশংস দস্যু। বুদ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্র ও স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। তিনি বুদ্ধের শরণ লন এবং পরে অর্হৎ হন।

ইনি কোশলরাজের পুরোহিতপুত্র ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল অহিংসক। তক্ষশিলায় পাঠ লইবার সময় তিনি গুরুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সতীর্থগণ অহিংসকের প্রতি গুরুর স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন এবং নানা উপায়ে অহিংসকের প্রতি গুরুর মন বিষাক্ত করিয়া দেন। অহিংসকের ধ্বংস কামনা করিয়া গুরু তাঁহার নিকট গুরু-দক্ষিণা হিসাবে মানুষের এক হাজার দক্ষিণ-হস্তাঙ্গুলি দাবি করিলেন। অহিংসক তখন কোশলের অরণ্যপথে অতর্কিতে পথিকদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকটি নিহত পথিকের হস্ত হইতে একটি করিয়া অঙ্গুলি সংগ্রহ করিয়া গলায় মালা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলেন। এইজন্যই অহিংসকের নাম হইল অঙ্গুলিমাল। অঙ্গুলিমালের অত্যাচার হইতে ভীত সন্ত্রস্ত প্রজা-সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য কোশলরাজ ঐ দস্যুকে ধরিতে তাঁহার সৈন্য পাঠাইলেন। দস্যুর নাম কিন্তু কেহই জানিত না। কে ঐ দস্যু তাহা অহিংসকের মাতা বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে সাবধান করিতে অরণ্যে গেলেন। ঐ সময় অঙ্গুলিমালের সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ হইতে একটিমাত্র অঙ্গুলি অবশিষ্ট ছিল। মাতাকে আসিতে দেখিয়া দস্যু তাঁহার সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করিবার বাসনায় তাঁহাকে হত্যা করিতে স্থির করিলেন। বুদ্ধ এই সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং বুদ্ধের প্রভাবে অঙ্গুলিমালের পরিবর্তন ঘটে। বুদ্ধ পরে অঙ্গুলিমালকে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সম্মুখে উপস্থিত করান এবং রাজা তাঁহার পরিবর্তন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাগ্রহণের সময় জনসাধারণ অঙ্গুলি-মালকে আক্রমণ করিলেও বুদ্ধের উপদেশে অঙ্গুলিমাল তাহাদের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন।

দ্র G. P. Malalasekera : *A Dictionary of Pali Proper Names*, London, 1937.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বৈষ্ণবমত নামে পরিচিত। রূপ, সনাতন, সার্বভৌম, রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি অনুচরগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত অবগত হইয়া-ছিলেন। জীবগোস্বামী-প্রণীত 'ভাগবতসন্দর্ভ'-ই বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের সর্বপ্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। সর্বসম্বাদিনী নামে *এই গ্রন্থের একটি অনুব্যাখ্যা আছে। জীবগোস্বামী এই অনুব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন।* বঙ্গ-ভাষায় রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনের যাবতীয় তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি দ্বারা বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনের পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা ব্রহ্মসূত্রের কোনও ধারাবাহিক ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য নামে একখানি ভাষ্য রচনা করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, চৈতন্যদেব স্বয়ং মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কারণ তাঁহার দীক্ষাগুরুর (ঈশ্বর পুরীর) গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মতে পদ্মপুরাণোক্ত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় থাকিতে পারে না। রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায়ের, মধ্ব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের এবং নিম্বার্ক চতুঃসন-সম্প্রদায়ের স্বীকৃত আচার্য। তাঁহাদের মতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের একটি শাখামাত্র। কিন্তু এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরীর উপাস্য ছিলেন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, তাঁহাদের লক্ষ্য ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে লীলাবিলাসী কৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রেমসেবা; কিন্তু মাধ্বমতাবলম্বীদিগের উপাস্য তত্ত্ব লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্য মুক্তি। মাধ্বমতাবলম্বীরা গোপীগণকে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন না; তাঁহাদের মতে গোপীভাব নিন্দনীয়। মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরানন্দের সন্ন্যাসাশ্রমের উপাধি 'পুরী', কিন্তু মাধ্বমতাবলম্বীরা সন্ন্যাসাশ্রমে 'তীর্থ' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে

সেই সকল শ্লোক পদ্মপুরাণে নাই। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিল শুধু সেব্য-সেবকভাব স্বীকার-বিষয়ে। কিন্তু কেবল সেব্য-সেবকভাব কেন, উপাস্য, উপাসনাপ্রণালী, লক্ষ্য এবং সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ের সমতা থাকিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধবিষয়ে মতের প্রভেদ অনুসারেই দার্শনিকেরা সম্প্রদায়ভেদ নির্ণয় করিয়া থাকেন। জগতের সত্যতা সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্যদিগের দ্বিমত নাই। বৈষ্ণবাচার্যগণ শংকরের মায়াবাদ সমর্থন করেন না। শংকরের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। এই মতে ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধের প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা ব্রহ্মের সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে না। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে জগৎ নশ্বর, কিন্তু মিথ্যা নহে। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের দাস। শংকরাচার্য কেবলাভেদবাদী। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা জীব ও ব্রহ্মের কেবলাভেদ স্বীকার করেন না। তত্ত্ববাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বা স্বাধীন তত্ত্ব, জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র (ব্রহ্মের অধীন) তত্ত্ব, উহারা চিরকালই ব্রহ্ম হইতে পৃথক। এই মতের নাম আত্যন্তিক ভেদবাদ। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণকে আত্যন্তিক ভেদবাদী বলা যায় না, কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কোনও তত্ত্ব নাই; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশমাত্র। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ কেবলাভেদবাদীও নহেন, কারণ তাহারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ও জগতের ভেদও স্বীকার করেন। তাহারা ভেদাভেদবাদী। কিন্তু তাহাদের ভেদাভেদবাদ ভাস্করাচার্যের ঔপচারিক ভেদাভেদবাদের ন্যায় নহে। তাঁহারা ব্রহ্মে উপাধিসংযোগ কল্পনা করেন না। তাহাদের মতবাদ নিম্বার্কাচার্যের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের ন্যায়ও নহে। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের অভেদকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিলে জীব ও জগতের দোষসমূহকে ব্রহ্মের স্বাভাবিক দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মের দোষের কথা শ্রুতিতে নাই। বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতে সমুদায় জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান। পরস্পরবিরোধী ভেদ এবং অভেদের যুগপৎ অবস্থান যুক্তি-তর্কের অগোচর হইলেও শ্রুতার্থাপত্তি নামক প্রমাণের বলে স্বীকার্য। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এই যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধটিকে বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ আখ্যা দিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে অভিহিত করাই যুক্তিসংগত।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অপ্রাকৃত চরমতত্ত্ব বিষয়ে শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, সম্ভব ও চেষ্টা প্রভৃতি প্রমাণের উপযোগিতা থাকিলেও এই সকল প্রমাণ নির্দোষ নহে, কারণ ইহারা পৌরুষেয়। সাধারণ পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব প্রভৃতি দোষ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণে এই সকল দোষ নাই, কারণ শব্দ বা বেদাদি শাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক রচনা নহে, শব্দ অপৌরুষেয়। ইহা পরব্রহ্ম কর্তৃক প্রকটিত; ইহা স্বতঃপ্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ শব্দের প্রামাণ্য নিরসনে অসমর্থ। শব্দপ্রমাণ বা শাস্ত্র-প্রমাণের প্রতিকূল কোনও প্রমাণ স্বীকার্য নহে। অনুমানাদি প্রমাণ যে স্থলে শব্দপ্রমাণের সহায়ক হয় শুধু সেই স্থলেই তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শব্দপ্রমাণের প্রয়োগক্ষেত্র বর্ধিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ ও পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসপ্রকটিত বাক্য এবং এই হেতু শব্দপ্রমাণের মধ্যে গণ্য। পুরাণ বেদার্থপরিপূরক; উহা বেদতুল্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পুরাণ প্রধানতঃ তিন প্রকার। সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার এবং তামসিক পুরাণে শিবের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। পরমার্থ বিষয়ে সাত্ত্বিক পুরাণের প্রামাণ্যই শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিক পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যাসদেব বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য জ্ঞাপন করিবার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে শংকরাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সেই ব্রহ্মসূত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা বর্ণনাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহা সর্বপ্রমাণচক্রবর্তী। ইহার প্রামাণ্যই চরম প্রামাণ্য।

বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পারিভাষিক নাম সম্বন্ধ, চরম অভীষ্টলাভের শাস্ত্রবিহিত উপায়ের নাম অভিধেয় এবং সাধন বা উপাসনার উদ্দেশ্যের নাম প্রয়োজন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতে ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে, পরতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়, এই তত্ত্ব প্রাকৃত পদার্থের ন্যায় জড় নহে, উহা জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ; তত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণভাবে উহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব আখ্যা

দিয়া থাকেন। উপলব্ধির পার্থক্য অনুসারে এই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বেরই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নাম হইয়া থাকে (ভাগবত ১।২।১১)। বেদান্তীগণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম আখ্যা দিয়া থাকেন, যোগীগণ এই তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন এবং ভক্তগণ এই তত্ত্বকে ভগবান্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্য-শ্রুতির অনুসরণ করিয়া আচার্য শংকরও বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এমন কি স্বগত ভেদও থাকিতে পারে না। এক জাতীয় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। একটি অশ্বের সহিত অপর একটি অশ্বের প্রভেদ স্বজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মের স্বজাতীয় আর কেহ নাই; সুতরাং তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ নাই। এক জাতীয় পদার্থের সহিত ভিন্ন জাতীয় পদার্থের প্রভেদকে বিজাতীয় ভেদ বলা হয়। চেতন পদার্থের সহিত অচেতন পদার্থের প্রভেদ বিজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই তখন তাঁহার বিজাতীয় ভেদের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কোনও জীবদেহের সহিত উহার অবয়বসমূহের প্রভেদকে স্বগত ভেদ বলা হয়। বৃক্ষের দেহের মধ্যে মূল, কাণ্ড, শাখা প্রভৃতির ভেদবৈচিত্রী আছে বলিয়া বৃক্ষের সহিত উহার মূলকাণ্ডাদির স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের স্বগত ভেদ স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই; ব্রহ্ম নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মের শক্তি বা গুণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সহিত উক্ত শক্তি বা গুণের ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। ভেদ স্বীকার করিলে অদ্বয়ত্বের হানি হইবে, এই ভয়ে শংকর ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্বাদিজ্ঞাপক শ্রুতিসমূহের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শুধু উপাসনার সুবিধার জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বাদির কথা বলা হইয়াছে। সর্ববিধ ভেদরহিত, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ভগবৎস্বরূপসমূহ মায়াপ্রসূত। শংকরাচার্য শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত অনেক শব্দের মুখ্যা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা ও গোণী বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির ব্যাখ্যায় শংকর যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ এইরূপ— 'তৎ' শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান চিদ্রূপ ব্রহ্ম এবং 'ত্বং' পদের অর্থ অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান চিদ্রূপ জীব। ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কারণ উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে, মুখ্যার্থের সংগতি থাকিলে লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা কোনও শব্দের অর্থ করা উচিত নহে। বেদবাক্যের অর্থ মুখ্যা বৃত্তিতেই করা উচিত। তাহা না করিলে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করার সার্থকতা থাকে না। লক্ষণাদ্বারা নির্ণীত অর্থ স্বতঃপ্রমাণ নহে, যেহেতু যুক্তির সহায়তা ব্যতীত সেই অর্থ লাভ করা যায় না। কি অভেদবাচক, কি ভেদবাচক, কি নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক, কি সবিশেষ ব্রহ্মবোধক সকল শ্রুতিবাক্যেরই গুরুত্ব সমান। দৃশ্যমান জীব-জগদাদির সত্যতা স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষা করা সম্ভব। জীবের ও জগতের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলেও উহারা ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে। আপাত দৃষ্টিতে ব্রহ্মের সহিত উহাদের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও তত্ত্বতঃ উহারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। ব্রহ্মের সহিত অপর কোনও পদার্থের ভেদ স্থাপন করা সম্ভব নহে। দুইটি পদার্থের প্রত্যেকটিই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হয়। স্বয়ংসিদ্ধ, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কিংবা স্বগত কোনও ভেদ ব্রহ্মের নাই। সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম এবং জীব উভয়েই চিৎপদার্থ; তথাপি জীবে ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে বলা চলে না, যেহেতু জীব স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থ নহে; জীব ব্রহ্মেরই তটস্থা শক্তি, ব্রহ্মাপেক্ষ। ব্রহ্মের সহিত মায়ার এবং মায়াপ্রসূত জগতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ব্রহ্ম চিৎ, ইহারা জড়; তথাপি ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ আছে বলা চলে না, যেহেতু মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি এবং জগৎ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। ইহারা স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে, ইহারাও ব্রহ্মাপেক্ষ। ব্রহ্মে স্বগত ভেদও নাই। স্বগত ভেদের অর্থ উপাদানগত ভেদ এবং তজ্জনিত ক্রিয়াশক্তির ভেদ। জীবের মধ্যে স্বগত ভেদ আছে, কারণ জীবের উপাদানগত দেহ এবং দেহী এক বস্তু নহে। দেহ জড়, দেহী চিদ্রূপ। ব্রহ্মের মধ্যে এইরূপ দেহ-দেহী ভেদ নাই। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ— যেই ব্রহ্ম, সেই বিগ্রহ; যেই বিগ্রহ, সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে উপাদানগত ভেদ না থাকায় তজ্জনিত ক্রিয়াশক্তি ভেদও নাই, জীবের মধ্যে উপাদানগত ভেদ-জনিত ক্রিয়াশক্তি ভেদ আছে। জীবের চক্ষু-কর্ণাদি তাহার দেহের পৃথক পৃথক উপাদান। চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশি বলিয়া চক্ষু কেবল দেখিতে পারে, শুনিতে পারে না; কর্ণে মরুতের ভাগ বেশি বলিয়া কর্ণ শুনিতে পারে, দেখিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মে উপাদানগত ভেদ না

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

থাকায় তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধারণ করে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মের চক্ষু-কর্ণাদিও সচ্চিদানন্দ, তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সর্বশক্তিসম্পন্ন। জীবের চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার স্বগত ভেদ নির্দেশ করে, কিন্তু ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার স্বগত ভেদ নির্দেশ করে না। ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে যে সকল ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সেই সকল ভগবৎ-স্বরূপও তাঁহার স্বগত ভেদ নহে, কারণ কোনও ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংসিদ্ধ নহে। ভগবদ্ধাম এবং ভগবৎ-পরিকরাদিও স্বয়ংসিদ্ধ নহে। ইহারাও ব্রহ্মাপেক্ষ। সুতরাং ইহা-দিগকেও ব্রহ্মের স্বগত ভেদ বলা সংগত নহে। এইভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, পরব্রহ্ম ত্রিবিধভেদরহিত অদ্বয়তত্ত্ব।

বৃহত্ত্ববাচক বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্মপদটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। বৃংহ ধাতুর একটি অর্থ নিজে বড় হওয়া, আর একটি অর্থ অপরকে বড় করা। যিনি নিজে বড় এবং অপরকেও বড় করেন তিনিই ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সমানও দেখা যায় না, তাহা অপেক্ষা বড়ও দেখা যায় না (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত উপনিষদে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের শুধু একটু শক্তি নহে, বহু শক্তি আছে এবং প্রত্যেকটি শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি। যিনি সর্ববিধ শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন, তাহার নিশ্চয়ই অপরকে বড় করিবার শক্তি আছে। উক্ত উপনিষদে ব্রহ্মের জ্ঞানের ক্রিয়া এবং ইচ্ছার ক্রিয়ার কথাও স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। বৃংহ ধাতুর দুইটি অর্থ চরম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া লইলে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের কোনও দিকে কোনও অন্ত নাই, তিনি অনন্ত। স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে এবং প্রকাশবৈচিত্রীতে তাঁহার আনন্ত্য অবশ্যস্বীকার্য। শ্রুতি যখন তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির কথা বলিয়াছেন তখন তাঁহার সশক্তিকত্ব এবং সবিশেষত্ব অস্বীকার করার কোনও হেতু নাই।

ব্রহ্মের শক্তিসমূহের মধ্যে স্বরূপ শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বরূপ শক্তিকে চিচ্ছক্তিও বলা হয়, কারণ ইহাতে জড়ত্বের লেশমাত্র নাই; ইহা জড়বিরোধী এবং চিন্ময়। ইহার আর এক নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, যেহেতু ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা নিবিড়। ইহা পরা শক্তি নামেও পরিচিত, যেহেতু মায়া শক্তি ও জীব শক্তি নামক অপর দুইটি প্রধান শক্তি অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার চিচ্ছক্তি এক হইয়াও তিন রূপে প্রকাশলাভ করিতেছে। ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির সদংশের নাম সন্ধিনী। সন্ধিনীর সাহায্যে তিনি নিজের ও অপরের সত্তাকে ধারণ করেন এবং অস্তিত্ববান বস্তুমাত্রকেই সত্তাদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের চিদংশের শক্তির নাম সংবিৎ শক্তি। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম এই শক্তিদ্বারা নিজে জানেন এবং অপরকে জ্ঞানদান করেন। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। তিনি তাঁহার চিচ্ছক্তির যে বৃত্তিটির সাহায্যে নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আনন্দ আস্বাদন করান তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা ইহারই মূর্ত বিগ্রহ। ব্রহ্ম নিজেই নিজের আস্বাদ্য। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে প্রতি ক্ষণে যে আনন্দবৈচিত্রীর সৃষ্টি হইতেছে তাহাও তিনি আস্বাদন করিতেছেন। তিনি রসস্বরূপ। রস শব্দের দুইটি অর্থ— (১) আস্বাদনের বিষয় এবং (২) আস্বাদক। উভয় অর্থেই তিনি রস। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পূর্ণতম বিকাশের নাম ভগবান্। ভগবানে ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি বহু গুণের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও মাধুর্যই ভগবত্তার সার; ঐশ্বর্য ভগবত্তার সার নহে। ভগবানের এই স্বাভাবিক মাধুর্য সর্বাকর্ষক; এইজন্য তাঁহাকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হয়। স্বকীয় রসবৈচিত্রীর অনুরূপ তাঁহার বহু মূর্ত রূপ থাকিলেও দ্বিভুজ নররূপই তাঁহার যথার্থ রূপ। গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর, পীতাম্বর, ঘনশ্যাম বপুতেও তিনি বিভু, সবগ ও অনন্ত। তিনি লীলাময়। তাঁহার ধামাদি ও লীলাপরিকরগণ তাঁহারই স্বরূপ শক্তিদ্বারা প্রকটিত। কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, কি ভগবদ্ধামাদিতে তত্ত্বতঃ তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

শংকরাচার্য বৃংহ ধাতুর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে শুধু বৃহৎ বলিয়াছেন; তিনি ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক জ্ঞানমাত্র। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ বলেন যে, শংকরের নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহেন, তিনি পরব্রহ্মের শক্তিবৈচিত্রীর ন্যূনতম অভিব্যক্তি, পরব্রহ্মের অঙ্গের কান্তিমাত্র। শংকর যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন তিনিও নিঃশক্তিক নহেন; নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার শক্তি এবং স্বরূপগত আনন্দময়ত্ব অনুভব করাইবার শক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও আছে। কিন্তু তাহাতে পরব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তির অভিব্যক্তির মাত্রা এত অল্প যে, তাহা প্রায় অনুভবযোগ্য নহে। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে পরব্রহ্মের অসংখ্য স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে যে স্বরূপটিতে শক্তির অভিব্যক্তি ন্যূনতম সেই স্বরূপটিকেই সাধারণতঃ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয় এবং যে স্বরূপটিতে শক্তিসমূহের অভিব্যক্তি পূর্ণতম সেই স্বরূপটিকে ভগবান্ আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যেই পরব্রহ্মের শক্তি, শক্তিকার্য, গুণ,

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং পরতত্ত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যবর্তী যে সকল স্বরূপ আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের মত সাকার এবং সবিশেষ। সবিশেষ স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যে স্বরূপটিতে সর্বাপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ সেই স্বরূপটির নাম পরমাত্মা। এই স্বরূপটি সাকার হইলেও ইহাতে লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির অভিব্যক্তি নাই। যে সকল স্বরূপের মধ্যে পরমাত্মা অপেক্ষা অধিক এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্প শক্তির বিকাশ বিদ্যমান তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভগবত্তা স্বীকার্য। রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ, সংকর্ষণ প্রভৃতি স্বরূপ ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনাদি; তিনি সকলের আদি এবং সমস্ত কারণের কারণ। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদি ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইলেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আংশিক প্রকাশ থাকায় তাঁহাদিগকে স্বাংশস্বরূপ বলা হয়; শ্রুতি পরব্রহ্মকে সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই বলিয়াছেন। মায়িক সত্ত্বাদি গুণের দিক হইতে দেখিলে তিনি নির্গুণ, যেহেতু মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস-ভূত অপ্রাকৃত গুণের দিক হইতে দেখিলে তিনি সগুণ। তিনি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার।

পরব্রহ্ম স্বয়ং চিৎস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার তিনটি প্রধান শক্তির মধ্যে একটি চিদ্‌বিরোধিনী, জড়রূপা। এই শক্তির নাম মায়াশক্তি। মায়া অজ্ঞান; পরব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অন্ধকার যেমন সূর্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, অজ্ঞানও সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরব্রহ্মকে স্পর্শ করার শক্তি মায়ার নাই। পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কার্যস্থল হইতে সর্বদা বাহিরে অবস্থান করে বলিয়া মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই এই শক্তির কার্যস্থল। গুণমায়া ও জীব-মায়া ভেদে এই শক্তির দুইটি বৃত্তি আছে। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতির নাম গুণমায়া। সাংখ্যেরা বলেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি আপনা-আপনি বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে এবং বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতে পারে। স্বতঃপরিণামশীলা প্রকৃতিই জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে, প্রকৃতি জড় বা অচেতন শক্তি বলিয়া আপনা-আপনি পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে পারে না। শক্তিমান পরব্রহ্ম তাঁহার দৃষ্টি-দ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার না করিলে প্রকৃতির বিক্ষোভ এবং সাম্যাবস্থার নাশ হইতে পারে না। জগতের বিভিন্ন বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা প্রকৃতির নাই। অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেমন দাহক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তিতে গুণমায়া জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। অগ্নির শক্তি ব্যতীত লৌহ যেমন কোনও কিছু দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত গুণমায়াও জগতের উপাদানে পরিণত হইতে পারে না। পরন্তু লৌহের সাহচর্য ব্যতীতও অগ্নি যেমন অনায়াসে দহনকার্য করিতে পারে সেইরূপ গুণমায়ার সাহচর্য ব্যতীতও পরব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির ভগবদ্ধামাদির উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে। দহনকার্যের মুখ্য কারণ লৌহ নহে, অগ্নি। জগতের মুখ্য উপাদানকারণ গুণমায়া বা প্রকৃতি নহে, পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিই জগতের মুখ্য উপাদানকারণ। গুণমায়া বা প্রকৃতি জগতের গৌণ উপাদানকারণ মাত্র। মায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বৃত্তির নাম জীবমায়া। ইহা তাঁহার আবরণাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবকে জড়বস্তুতে আকৃষ্ট করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত করে। অনাদি বহির্মুখ জীব জীবমায়ার প্রভাবে প্রাকৃত ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃত দেহ স্বীকার করিয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। মায়ামুগ্ধ জীবের প্রাকৃত সুখভোগের নিমিত্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাকৃত দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং জীবমায়াকে সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু জীবমায়া দ্বারা সৃষ্টির আনুকূল্য সাধিত হইলেও জীবমায়া জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ নহে। জীবমায়া পরব্রহ্মের চিৎশক্তিতে শক্তিমান হইয়াই সৃষ্টির আনুকূল্য করিয়া থাকে। পর-ব্রহ্মই সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্তকারণ। দণ্ড-চক্রাদি যেমন ঘটের গৌণ নিমিত্তকারণ, জীবমায়াও সেইরূপ বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। কুম্ভকার যেমন ঘটের মুখ্য নিমিত্তকারণ, পরব্রহ্ম সেইরূপ জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ পরিণামবাদী। তাঁহারা শংকরের বিবর্তবাদ সমর্থন করেন না। শংকরের মতে ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক, জগতের সত্তা ব্যাবহারিক। বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে জগৎ নশ্বর হইলেও মিথ্যা নহে। সাংখ্যমতাবলম্বী পরিণামবাদীগণের মতে কার্যের সত্তা কারণের সত্তার

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

সমান; কার্য কারণেরই বিকার; জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে, জগৎ পরব্রহ্মের ন্যায় সত্য হইলেও স্বয়ং পরব্রহ্মের পরিণাম নহে; ইহা তাঁহার মায়া শক্তির পরিণাম। পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিই পরিণতিপ্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্ম স্বয়ং অথবা তাঁহার স্বরূপ শক্তি জগদ্রূপ পরিণতিপ্রাপ্ত হন না। জগৎ যদিও মায়ারই পরিণতি তথাপি ইহাকে পরব্রহ্মের পরিণাম বলার কারণ এই যে, মায়া পরব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তির পরিণামকে শক্তিমানের পরিণাম বলা হয়। ব্রহ্ম মায়ার সাহচর্যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। বিবর্তবাদীগণ পরব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে গিয়া সৃষ্টিবাচক শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মপরিণামবাদীগণ পরব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাচক শ্রুতিবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। শক্তিপরিণামবাদী বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ উভয় প্রকার শ্রুতিরই মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে মায়া শক্তির অতিরিক্ত জীব, কাল এবং কর্মও বিশ্বসৃষ্টির সহায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পরব্রহ্মই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। মায়া বা প্রকৃতি তাঁহারই শক্তিতে তাঁহারই সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে। জীবগণ সৃষ্ট বস্তু ভোগ করিবার লোভে দেহাদি অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টিব্যাপারকে সফল করিতে সহায়তা করে। কাল বা সময় প্রকৃতির পরিণতির আনুকূল্য করিয়া থাকে। পরব্রহ্মের শক্তিতেই প্রকৃতির বিকারপ্রাপ্তির যোগ্যতা জন্মে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বে পরিণতি, মহৎ-তত্ত্বের অহংকারে পরিণতি, অহংকারের তন্মাত্রাদিতে পরিণতি কালসাপেক্ষ। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিতে পরিণত হওয়ার যোগ্য হইলেও কিছুকাল গত না হইলে দধিতে পরিণত হইতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বও কালের আনুকূল্য ব্যতীত জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারে না। পরমেশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া জীবের কর্ম বা অদৃষ্ট জীবের কর্মফলভোগের অনুকূলভাবে প্রকৃতিকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এইভাবে অদৃষ্টও সৃষ্টিকার্যের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ব্যতীত ভগবানের আর একটি প্রধান শক্তি আছে। সেই শক্তির নাম জীব শক্তি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা প্রভৃতিদেহে যে সকল জীবাত্মা আছে তাহারা পরব্রহ্মের জীব শক্তিরই অংশ। জীব শক্তি বহিরঙ্গা মায়া শক্তি হইতে উৎকৃষ্ট, কারণ মায়া শক্তি জড়া, কিন্তু জীব শক্তি চিদ্রূপা বা চৈতন্যময়ী। চিদ্রূপতত্ত্বের দিক দিয়া জীব শক্তি অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির সমজাতীয়া হইলেও উহা অন্তরঙ্গা নহে। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপের মধ্যে জীব শক্তির স্থিতি নাই। জীব শক্তির স্থান মায়া শক্তির ঊর্ধ্বে এবং চিচ্ছক্তির নিম্নে। এই শক্তি অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া শক্তির মধ্যবর্তিনী। ইহা চিচ্ছক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা মায়া শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে বলিয়া ইহাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। ভগবানের স্বরূপগত চিচ্ছক্তি কখনও মায়া শক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, কিন্তু জীব শক্তি মায়া শক্তির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হইতে পারে। জীব পরব্রহ্মের অংশ। কিন্তু টঙ্কছিন্ন পাষাণখণ্ডকে যে অর্থে অখণ্ড শিলার অংশ বলা হয়, জীবকে সেই অর্থে পরব্রহ্মের অংশ বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য। অংশপদের অর্থ এখানে একদেশ। পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে তাঁহার জীব শক্তিও একদেশমাত্র। জীব পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই তাহাকে পরব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। শক্তি কখনও শক্তিমান হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। কি মায়া শক্তি, কি স্বরূপ শক্তি, কি জীব শক্তি সকল শক্তির সত্তাই পরব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার সকল শক্তির যোগ এক প্রকার নহে। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির সহিত তাঁহার যোগ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। উহা তাঁহার স্বরূপেই অবস্থান করে। তিনি বহিরঙ্গা মায়া শক্তিরও নিয়ন্তা, মায়া তাঁহার আশ্রয় না পাইলে থাকিতেই পারে না; সুতরাং মায়া শক্তিও তাঁহার সহিত যুক্ত। কিন্তু মায়া কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব পরব্রহ্মের অংশ হইলেও স্বরূপ শক্তি যুক্ত পরব্রহ্মের অংশ নহে। স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্মের অংশের নাম স্বাংশ। চতুর্ব্যূহ, পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপ, পুরুষাবতারগণ, লীলাবতারগণ এবং গুণাবতারাদি স্বাংশের অন্তর্গত। জীবকে মায়া শক্তি যুক্ত পরব্রহ্মের অংশও বলা যায় না, কারণ চেতন পদার্থ জড় পদার্থের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ জীব শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্মের অংশই জীব। জীব পরব্রহ্মের বিভিন্নাংশ, পরব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যে তাহার অবস্থান নাই। ভগবৎস্বরূপসমূহ পরব্রহ্মের বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা শক্তিতে ন্যূন বলিয়া তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মের অংশ বলা হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম সূর্যমণ্ডলতুল্য এবং জীবগণ সূর্যরশ্মিতুল্য। সূর্যরশ্মি যেমন সূর্যের অংশ হইলেও সর্বদাই সূর্যের বাহিরে অবস্থান করে, সেইরূপ জীবগণও পরব্রহ্মের স্বরূপের বাহিরেই অবস্থান করে। সূর্যরশ্মি যেমন কখনও সূর্য-

মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে না সেইরূপ জীবগণও কখনও পরব্রহ্মের স্বরূপভূত হইয়া যায় না। এমন কি মুক্তাবস্থাতেও ভগবৎস্বরূপের সহিত জীবস্বরূপের পার্থক্য থাকে। জীবাত্মা আয়তনে ভগবৎস্বরূপের ন্যায় বিভু বা সর্বব্যাপক নহে, মনুষ্যাদির দেহের ন্যায় মধ্যমাকারও নহে; উহা অণু-পরিমাণ। অণুপরিমাণ হইলেও উহা জড় নহে, চেতন। একবিন্দু চন্দন যেমন দেহের এক অংশে থাকিয়া সমগ্র দেহে স্নিগ্ধতার অনুভূতি প্রদান করে, সেইরূপ জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করিয়া থাকে। জীব শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্ম যেমন চিদ্‌বস্তু, জীবও সেইরূপ চিদ্‌বস্তু। কিন্তু পরব্রহ্ম ও তাঁহার স্বাংশ ভগবৎ-স্বরূপগণ যেমন বিভুচিৎ, জীব সেইরূপ নহে। জীব অণুচিৎ। পরব্রহ্ম বিস্তীর্ণ জলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য; জীব একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের তুল্য। জীব কর্মবশে যে সকল মায়িক দেহ ধারণ করে তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু জীবাত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই— জীবাত্মা নিত্য। জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত। জীব শুধু জ্ঞানস্বরূপ নহে, তাহার জ্ঞাতৃত্বও আছে। কিন্তু সে পরব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞ নহে। তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

জীবের কর্তৃত্বও আছে; কিন্তু তাহা পরমেশ্বরের অধীন। পরব্রহ্ম প্রযোজক কর্তা, জীব প্রযোজ্য কর্তা। পরব্রহ্মের শক্তির সহায়তা ব্যতীত জীব নিজের কর্তৃত্বকে বিকাশ করিতে পারে না। কর্তৃত্ব-বিকাশের ফলে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই কর্মের দায়িত্ব ঈশ্বরের নহে, জীবের। ঈশ্বর কখনও সেই কর্মের ফল ভোগ করেন না; জীবকেই কর্মফল ভোগ করিতে হয়। পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর শুধু কর্মের ফল দান করিয়া থাকেন। তিনি জীবকে যে কোনও প্রকার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবার শক্তি দিয়াছেন। কর্ম করিবার সময়ে জীব সেই শক্তিকে ব্যবহার করে। জীব পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া ভগবানের স্বাতন্ত্র্যধর্মের কিয়দংশ জীবের মধ্যেও আছে। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বিভু, জীবের স্বাতন্ত্র্য অণু। পরমেশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত। এইজন্য অবস্থাবিশেষে জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য পরমেশ্বরের বিভুস্বাতন্ত্র্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্য। সুতরাং জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও তাহা অবাধ নহে। যে কোনও ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবার শক্তি থাকিলেও সকল ক্ষেত্রে ইচ্ছানুরূপ কাজ করিবার শক্তি জীবের নাই। জীব যে কোনওরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবে পরমেশ্বর তদনু-রূপ কাজ করিবার শক্তি প্রদান করিবেন, ইহাও আশা করা যায় না। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করার শক্তি জীবের আছে; কিন্তু সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার শক্তি তাহার নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবের স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ। নিজের অবাধ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও জীব পরমেশ্বরপ্রদত্ত অণুস্বাতন্ত্র্যকে কিয়ৎপরিমাণে যথেচ্ছ-ভাবে ব্যবহার করিতে পারে বলিয়া সে তাহার কর্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকে। জীবের দুইটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ; আর-এক শ্রেণীর জীব অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্মুখ। নিত্য ভগবদুন্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতে পার্ষদরূপে ভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তাঁহাদের দৃষ্টি ভগবানের স্বরূপ শক্তির দিকে। বহির্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতে মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টি মায়া শক্তির বিলাসের দিকে। সুখাভিলাষী বহির্মুখ জীব সুখস্বরূপ ভগবান্‌কে ভুলিয়া সুখের আশায় স্বেচ্ছায় দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কর্তৃত্বাভিমানী হইয়া মায়াময় সংসার ভোগ করিতে অগ্রসর হয়; সে তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে। মায়া কখনও জীবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কবলিত করে না। মায়া ভগবানেরই শক্তি। বহির্মুখ জীবকে নানাবিধ দুঃখ প্রদান করিয়া ভগবদুন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। মায়া ভগবানের স্বরূপ শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কিন্তু তটস্থ শক্তিময় জীবকে মুগ্ধ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। মায়া বিভু-চিৎ ভগবৎস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, কিন্তু অণু-চিৎ জীবকে আবৃত করিতে পারে। নিত্যমুক্ত জীবেরাও তটস্থ শক্তিময় এবং অণুচিৎ। কিন্তু তাহাদিগকে কবলিত করিবার শক্তি মায়ার নাই, কারণ তাহারা ভগবানের স্বরূপ শক্তিদ্বারা অনুগৃহীত। বহির্মুখ জীবগণের মধ্যে স্বরূপ শক্তির অনুগ্রহ নাই বলিয়া মায়া তাহাদিগকে কবলিত করিতে পারে। জীবের কৃষ্ণবহির্মুখিতা অনাদি হইলেও চিরস্থায়ী নহে। কৃষ্ণবহির্মুখিতার ফলে যে মায়া-বন্ধন ঘটে তাহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী নহে। উহা আগন্তুক; সুতরাং দূরীভূত হওয়ার যোগ্য। ভগবদ্-বিস্মৃতি দূর করিতে পারিলেই ভগবদ্‌বহির্মুখিতা দূর হয়; ভগবদ্‌বহির্মুখিতা দূর হইলেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়। ভগবদ্‌বিস্মৃতি দূর করিতে হইলে সর্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু মায়ার প্রভাবে বিক্ষিপ্তচিত্ত জীব ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারে না।

মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় শরণাগত হইয়া ভগবান্‌কে ভজন করা। শাস্ত্রে কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার সাধনা ও

উপাসনার কথা আছে। ইহাদের মধ্যে ভক্তি অভীষ্ট-লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল ভক্তির ফলের তুল্য নহে। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই কর্মাদির অভীষ্ট ফল লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু কর্মাদি দ্বারা ভক্তির ফল লাভ করা যায় না। ভক্তির ফলে শুধু মুক্তি নহে, ভগবৎ প্রেমও লাভ হয়। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে ভক্তির অনুশীলন করে তাহার নাম সাধনভক্তি। সাধনভক্তির সহিত কর্ম-জ্ঞানাদির সংমিশ্রণ থাকিলে তাহাকে মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। মিশ্রা ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। কর্মমিশ্রা ভক্তিতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। শুদ্ধা সাধনভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা থাকে না। শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনের নাম শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধা সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নয়টি প্রধান। নবধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের নাম ও ভগবান্ বস্তুতঃ অভিন্ন। নাম অন্যান্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতা পূর্ণ করিতে পারে; ইহা স্বয়ং ভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে পারে। সাধকের চিত্তের অবস্থা অনুসারে সাধনভক্তিকে বৈধী ও রাগানুগা, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, কর্মফলদাতা ভগবান্‌কে ভজন না করিলে পরকালে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহাদের ভক্তির নাম বৈধী ভক্তি। শাস্ত্রবিধিই এই ভক্তির প্রবর্তক। বৈধী ভক্তির ফলে সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের ঐশ্বর্যাত্মক স্বরূপের সেবাপ্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা কৃষ্ণের মাধুর্যে প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার সেবাযোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভজনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণসেবার লোভই ইহার প্রবর্তক। রাগানুগা ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ করা যাইতে পারে। রাগানুগার সাধককে অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলাবিলাসী কৃষ্ণের মানসিক সেবা করিতে হয় এবং যথাবস্থিত দেহে বিধিমার্গের সাধকের ন্যায় শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য, এই চারি ভাবের নিত্য পরিকরগণকে লইয়া ব্রজে নিরন্তর কৃষ্ণের লীলা চলিতেছে। যে ভাবের সেবার জন্য যে সাধকের চিত্ত প্রলুব্ধ হয় তাঁহাকে সেই ভাবের পরিকরদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মানসিক সেবা করিতে হয়। রাগানুগা ভক্তি আনুগত্যময়ী।

জীবের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় যে ভক্তির পরিপক্ব অবস্থাই প্রেম। এইজন্য প্রেমকে সাধ্য ভক্তি বলা হয়। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য বস্তু নহে, উহা নিত্যসিদ্ধ। উহা ভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। ভগবানের স্বরূপশক্তির বাহিরে উহার অবস্থান নাই। সুতরাং প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত মনে উহার অবস্থান সম্ভব নহে। শুদ্ধা সাধনভক্তির ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তথায় প্রেমের আবির্ভাব হয় মাত্র। প্রেমের শক্তি অসাধারণ। প্রেম ভগবান্‌কে দেখাইতে এবং বশীভূত করিতে পারে। কৃষ্ণ অপেক্ষা আপন জীবের আর কেহ নাই। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের সেবক; কৃষ্ণসেবার বাসনাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম। কৃষ্ণের কৃপায় মায়ার প্রভাব বিদূরিত হইলে জীবের এই সম্বন্ধজ্ঞান ও সেবাবাসনা আপনা-আপনি স্ফুরিত হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় এই সেবাবাসনা প্রাকৃত মনের বৃত্তিরূপেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু যখন ভগবৎকৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে প্রাকৃত মন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় তখন এই সেবাবাসনাও উহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত হইয়া যায়। এই অপ্রাকৃত সেবাবাসনা যখন শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে প্রেম আখ্যা দেওয়া হয়। পরম কারুণিক কৃষ্ণ সর্বদাই তাঁহার হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। প্রাকৃত চিত্ত মলিনতাবশতঃ উহা গ্রহণ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ চিত্তে উহার আবির্ভাব হয়। কিন্তু উহা একই সময়ে পূর্ণতমরূপে আবির্ভূত হয় না, বিভিন্ন স্তরে প্রকটিত হয়। প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা জন্মে; ফলে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হয়। এই জগতে সখা, পুত্র, পতি প্রভৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, নিত্যধামে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিকরদের সম্পর্ক তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ। ভক্ত কখনও নিজের সুখের লেশমাত্র কামনা করেন না; তিনি কৃষ্ণকে সুখী করিতেই ব্যস্ত। কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন তাঁহার চিত্তে আর কিছু নাই। তাঁহার প্রেমবন্ধন ছিন্ন হওয়ার কারণ উপস্থিত হইলেও ছিন্ন হয় না। প্রেমের গাঢ়তম অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেদ, ধর্ম, স্বজন, সমাজাদি ত্যাগ করিয়া স্বীয় অঙ্গ দ্বারাও কৃষ্ণের সেবা করিতে যত্নবান হন। ব্রজের গোপীগণের মধ্যেই প্রেমের সর্বাধিক বিকাশ। গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ। শ্রীরাধার প্রেমই সর্বাতিশায়ী। বহুকান্তা ব্যতীত উজ্জ্বলরসবৈচিত্রীর উল্লাস হয় না বলিয়া শ্রীরাধা অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সাধকের চিত্তে সর্বপ্রথম প্রেমের যে স্তরের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম প্রেমাঙ্কুর, ভাব বা রতি। রতির পরের

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

স্তরকেই প্রেম আখ্যা দেওয়া হয়। প্রেম গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যথাক্রমে স্নেহ, মান প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। যদিও রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরই সাধারণভাবে প্রেমের অন্তর্গত, তথাপি বিশেষ অর্থে উক্ত পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তরকেই প্রেম বলা হইয়া থাকে। প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ নামে অভিহিত করা হয়। স্নেহের উদয় হইলে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না। স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া যখন কৌটিল্য বা অদাক্ষিণ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাকে মান বলা হয়। যে মান উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদবিশ্বাসের সৃষ্টি করে তাহার নাম প্রণয়। প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটিলে কৃষ্ণলাভের সম্ভাবনায় অতিশয় দুঃখও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। প্রণয়ের এই উন্নত অবস্থার নাম রাগ। যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্বদা প্রিয়জনকে নূতন রূপে অনুভব করায় তাহার নাম অনুরাগ। অনুরাগ যাবৎ-আশ্রয়বৃত্তি ও স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ভাব বলা হয়। ভাবের পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব। মোদন ও মাদন নামে মহাভাবেরও দুইটি স্তর আছে। মাদনই প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর। কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও মাদনের অভিব্যক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত আনন্দবৈচিত্রীর সৃষ্টি হইতে পারে মাদনে তৎসমুদয়ের যুগপৎ অনুভব লাভ হয়। ইহাই মাদনের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিমার্গের সাধক যতদিন স্থূলদেহে বিদ্যমান থাকেন ততদিন তাঁহার চিত্তে প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর আর কোনও স্তরের আবির্ভাব হয় না। প্রাপ্তপ্রেম সাধকের দেহভঙ্গ হইলে তিনি যখন ভগবৎ-লীলাস্থলে জন্মলাভ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার মনে স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহার তুলনায় তুচ্ছ। ইহা জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির সাহায্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, আপ্তকাম হইয়াও কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তিনি স্বাধীন। তাঁহার জন্ম অবিদ্যা, কাম অথবা কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। তিনি পূর্ণ। তাঁহার কর্ম অভাববোধজনিত নহে। তাঁহার জন্মকর্মকে লীলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাঁহার পিতা-মাতা প্রভৃতি তাঁহারই শুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে তাঁহার লীলা দুই প্রকার। যে লীলা কখনও লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় না তাহাই অপ্রকট লীলা। তিনি কৃপা করিয়া যে লীলা কখনও কখনও লোকনয়নের গোচরীভূত করেন তাহার নাম প্রকটলীলা। ভক্তের প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন এবং তদ্দ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রজলীলা প্রকটিত করেন। প্রকট-লীলায় সকল রস অপেক্ষা কান্তারসের বৈচিত্রীই অধিক। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে কান্তা দুই প্রকার। পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পতি-পত্নীর মধ্যে যে ভাব থাকে তাহার নাম স্বকীয়া কান্তাভাব। বৈধ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নহে, এইরূপ যুবক-যুবতীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ লক্ষিত হয় তাহার নাম পরকীয়া কান্তাভাব। অপ্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির নিত্য স্বকীয়া ভাব। স্বকীয়া ভাবের নায়ক-নায়িকার মিলনে গুরুতর বাধাবিঘ্ন কিছু না থাকায় আনন্দচমৎকারিতা বর্ধিত হয় না। এইজন্য প্রকটলীলায় কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকাদির নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরকীয়া ভাবের সৃষ্টি করেন।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রধানতঃ শাস্ত্রোক্তির উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণের শক্তি ও গুণ, জীবাত্মার স্বরূপ ও স্বাভাবিক ধর্মাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রুতিতে জীব ও পরব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য আছে; আবার উভয়ের অভেদবাচক বাক্যও আছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। জীব ভেদাভেদসম্বন্ধে ভগবানেরই প্রকাশ। জীবকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিবার হেতু এই যে জীব ও পরব্রহ্ম উভয়ই চিদ্‌বস্তু। আবার জীবকে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিবার হেতু এই যে জীবের স্বরূপগত ধর্ম পরব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম হইতে পৃথক। উভয়েই চিদ্‌বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু জীব অণুচিৎ, পরব্রহ্ম বিভুচিৎ। জীব অল্পজ্ঞ, অল্প শক্তিমান; পরব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। জীব মায়ার বশীভূত হওয়ার যোগ্য; পরব্রহ্ম মায়ার বশীভূত হওয়ার যোগ্য নহেন, তিনি মায়াধীশ। জীবের দেহ মায়িক জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত। পরব্রহ্মের বিগ্রহে মায়িক উপাদান নাই। জীব জগতের স্রষ্টা নহে; পরব্রহ্ম মায়াযোগে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জীব অংশ, পরব্রহ্ম অংশী। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই থাকে। ইহারা সর্বতোভাবে ভিন্নও নহে, সর্বতোভাবে অভিন্নও নহে। সুতরাং জীব ও পরব্রহ্মের সম্বন্ধে যুগপৎ ভেদবাচক ও অভেদবাচক শ্রুতির প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে জীব-জগদাদি সমস্তই পরব্রহ্মের শক্তি। আমরা যাহাকে জীব বলি, সেই জীব পরব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা

যাহাকে জগৎ বলি, তাহা পরব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম। শাস্ত্রে যে সকল ভগবদ্ধামের কথা বলা হইয়াছে সেই-সকল ধাম পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির বিলাস। পরব্রহ্মের পরিকরগণও তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। যেহেতু জীবজগদাদি সমস্তই পরব্রহ্মের শক্তি সেই হেতু শক্তির সহিত শক্তিমানের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান জীব-জগদাদির সহিত পরব্রহ্মেরও সেই সম্বন্ধ স্বীকার্য। অগ্নির সহিত দাহিকাশক্তির ন্যায় পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তি নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান। এই প্রকার নিত্য অবিচ্ছেদ্য শক্তির নাম স্বাভাবিক শক্তি। স্বাভাবিক শক্তি আগন্তুক শক্তি হইতে পৃথক। অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহখণ্ডের দাহিকাশক্তি স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক। ইহা সকল সময়ে লৌহখণ্ডে থাকে না। কিন্তু পরব্রহ্মের শক্তিসমূহ সর্বদাই পরব্রহ্মে থাকে। কস্তুরীর গন্ধকে যেমন কস্তুরী হইতে পৃথক করা যায় না, দাহিকাশক্তিকে যেমন অগ্নি হইতে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিকেও পরব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না। শক্তিকে বাদ দিয়া শুধু শক্তিমানকে বস্তু বলা চলে না; শক্তিমানকে বাদ দিয়া শুধু শক্তিকেও বস্তু বলা যায় না। শক্তি এবং শক্তিমান, এই উভয়ের মিলিত স্বরূপই বস্তুর স্বরূপ। বস্তুটি বিশেষ্য, শক্তিসমূহ তাহার বিশেষণ। স্বাভাবিক বিশেষণ-যুক্ত বিশেষ্যই বস্তু। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম বিশেষ্য, স্বরূপ-শক্তি, তটস্থা শক্তি, মায়া শক্তি প্রভৃতি তাঁহার বিশেষণ। পরব্রহ্ম শক্তিমান আনন্দ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তু বলিলেই যদি বিশেষ্য ও বিশেষণের, শক্তিমান ও শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝায়, পরব্রহ্ম বলিলেই যদি শক্তিমান আনন্দকে বুঝায়, তাহা হইলে পৃথকভাবে শক্তির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন (সর্বসম্বাদিনী, পৃ ৩৬)—কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মন্ত্রাদির প্রভাবে বস্তুর শক্তি স্তম্ভিত হইলেও বস্তুটি বিনষ্ট হয় না। সাময়িকভাবে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত হইলেও অগ্নিকে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইরূপ ক্ষেত্রে শক্তির অনুভবের অভাব হইলেও শক্তিমানের অনুভব থাকে। সুতরাং শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক নামে অভিহিত করাই যুক্তিসংগত। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। যেখানে অগ্নি আছে সেখানে দাহিকা শক্তিও আছে, যেখানে কস্তুরী আছে সেখানে তাহার গন্ধও আছে; তথাপি শক্তি ও শক্তিমানকে সর্বতোভাবে অভিন্ন বলা যায় না, কারণ শক্তিমানের বাহিরেও অনেক সময়ে শক্তির প্রভাব অনুভূত হয়। অগ্নির বহির্দেশেও দাহিকা শক্তি বা তাপ অনুভূত হয়; দূর হইতেও কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যায়। পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও তাঁহার শক্তির আভাস অনুভূত হয়। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও অস্বীকার করা যায় না, অভেদও অস্বীকার করা যায় না। উহাদের মধ্যে কেবল অভেদ স্বীকার করিলে এক অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়। শক্তি যদি শক্তিমানের সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন হয় তাহা হইলে শক্তিমানের বাহিরে তাহার অনুভূতি হয় কিরূপে? শক্তিমানের সহিত শক্তির ভেদ আছে বলিয়াই শক্তিমানের বাহিরেও কখনও কখনও শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ আছে সত্য, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ ভেদ বা কেবল ভেদ বলা যায় না। পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে। দুইটিকে পৃথক পদার্থ মনে করিলে পরব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষা করা যায় না। এইজন্য বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভেদ ও অভেদ কিভাবে যুগপৎ অবস্থান করে তাহা বুদ্ধিগম্য নহে। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত উহার শক্তির এইরূপ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত ভাববস্তুর শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর (বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২)। শর্করার মিষ্টত্ব, যবক্ষারের তিক্ততা, অগ্নির উত্তাপ প্রভৃতি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শর্করা মিষ্ট কেন, যবক্ষার তিক্ত কেন, অগ্নি জ্বালাময় কেন, এই সকল প্রশ্নের কোনও সমাধান নাই। বিচার-বুদ্ধি দ্বারা হেতু নির্ণয় করা অসম্ভব হইলেও যাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, তাহাকেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর বস্তু বলা হয়। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে যুগপৎ ভেদাভেদসম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও এইরূপ অচিন্ত্য পদার্থ। উভয়ের ভেদ বা অভেদ কোনওটিই অস্বীকার করা যায় না, অথচ পরস্পরবিরোধী উভয়ের যুগপৎ অবস্থান কোনও প্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। এইজন্য শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধটিকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধ বলা হইয়াছে।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শাস্ত্রানুগতভাবে সমন্বয়ের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যে অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন সেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

অচিরবতী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাহিত রাপ্তি নদীর প্রাচীন নাম। কোশল দেশের রাজধানী

শ্রাবস্তী নগরী এই নদীর উপর অবস্থিত ছিল। ইহাকে পঞ্চ মহানদীর অন্যতম বলা হইত। পালি সাহিত্যে এই নদীর নাম সুবিখ্যাত। সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে 'অজিরবতী' এই আকারে উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাকে ঐরাবতীও বলা হইত এবং তাহা হইতেই রাপ্তি নামের উদ্ভব হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অচ্ছোদ সরোবর কাশ্মীরের অন্তর্গত মার্তণ্ড হইতে ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) দূরবর্তী বিখ্যাত সরোবর। বর্তমানে ইহা 'আচ্ছাবল' নামে পরিচিত। বাণভট্টের কাদম্বরীতে এই সরোবরের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সরোবরের তীরে সিদ্ধাশ্রম অবস্থিত ছিল।

দ্র Nundo Lal Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927.

অজ অযোধ্যাপতি সূর্যবংশীয় রাজা, রঘুর পুত্র, দশরথের পিতা ও রামচন্দ্রের পিতামহ। ইনি বিদর্ভরাজের কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। একদা আকাশপথে গমনশীল মহর্ষি নারদের বীণাগ্রভাগ হইতে এক দিব্য পুষ্পমাল্য উদ্যানে বিহাররত ইন্দুমতীর বক্ষে নিপতিত হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে পত্নীবিয়োগে অজবিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অজন্টা, অজিণ্ঠা ভারতবর্ষের প্রত্নকীর্তিরাজির মধ্যে অজন্টার (২০°৩০´ অক্ষাংশ এবং ৭৫°৪৫´ দ্রাঘিমাংশ) শৈলখাত (rock-cut) গুহাবলী ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে বিশ্ববিশ্রুত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুহাগুলি নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ এই বৌদ্ধকেন্দ্রের একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘকাল অজন্টার উল্লেখ ইতিহাসে বা ভ্রমণকাহিনীতে প্রায় নাই বলিলেই হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যতম জেলা-সদর ঔরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ১০১ কিলোমিটার (৬৩ মাইল) এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ের জলগাঁও স্টেশনের প্রায় ৫৫ কিলোমিটার (৩৪ মাইল) দূরবর্তী ফর্দাপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে এই গুহাবলী। পূর্বোক্ত স্থানদ্বয় হইতে নিয়মিত বাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। গুহাগুলি হইতে অজন্টা গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল)।

৭৬ মিটার (২৫০ ফুট) উচ্চ একটি খাড়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশ কাটিয়া গুহাগুলি নির্মিত। প্রায় ৫৪৯ মিটার (৬০০ গজ) ব্যাপিয়া অর্ধবৃত্তাকারে গুহাগুলি অবস্থিত; বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে নির্মিত হওয়ায় পূর্ব-পরিকল্পনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইহাদের মেঝে অনুভূমিক নয়; ৮ নং গুহা সর্বনিম্নে এবং ২৯ নং সর্বোচ্চে। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক গুহাই নিজস্ব সোপানের দ্বারা নীচে প্রবহমান নদী ওয়াঘোরার সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সোপানগুলির মাত্র দুইটি এখন অবশিষ্ট।

অসমাপ্ত গুহাসহ গুহার সংখ্যা মোট ৩০। তন্মধ্যে ৫টি (গুহা নং ৯, ১০, ১৯, ২৬ এবং ২৯) চৈত্যগৃহ; অবশিষ্ট ২৫টি সংঘারাম। বৌদ্ধ শৈলখাত স্থাপত্যধারার দুইটি বিশিষ্ট পর্বে ইহারা নির্মিত। দুই পর্বের মধ্যে প্রায় চার শতাব্দীর ব্যবধান। প্রথম পর্বভুক্ত ৬টি গুহাই (৮, ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৫-এ) খ্রীষ্টপূর্ব যুগের এবং প্রাচীনতমটি (১০) খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। ইহাদের মধ্যে ৯ ও ১০ সংখ্যক চৈত্যগৃহ এবং বাকিগুলি সংঘারাম। চৈত্যগৃহদ্বয়ের দ্বারের উপরিভাগে 'চৈত্য-গবাক্ষ' নামে পরিচিত একটি অশ্বনালাকার বাতায়ন বহির্ভাগের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। চৈত্যগৃহের অভ্যন্তরে স্তম্ভশ্রেণীর আসন (ground-plan) শূর্পের আকৃতিবিশিষ্ট। ছাদের নীচের পিঠ অর্ধবৃত্তাকার; পূর্বে ইহার গায়ে কাঠের কড়ি-বরগা লাগানো ছিল। চৈত্যগৃহ হইল দেবায়তন। প্রথম পর্বের এই দুইটি দেবায়তনেই আরাধ্য বস্তু হইল একটি করিয়া শৈলখাত স্তূপ; কেননা এই যুগে বুদ্ধমূর্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। সংঘারামে শ্রমণমণ্ডলীর সমাবেশের জন্য একটি সুপ্রশস্ত দরদালান এবং ইহার তিনদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসিক প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছিল।

প্রায় চারি শতাব্দীব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পর পুনরায় নবোদ্যমে ব্যাপকতর শৈলখাত স্থাপত্যকর্মের সূত্রপাত হয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে। অধিকাংশ গুহা নির্মিত হয় বাকাটকদের রাজত্বকালে। এই দ্বিতীয় পর্বে ১১ ও ৭ সংখ্যক গুহাদ্বয়ে পরীক্ষামূলক ধাপ অতিক্রান্ত হইলে সংঘারাম গঠনরীতির মান নির্ধারিত হয়। প্রথমে অলিন্দ, অলিন্দের পশ্চাতে একটি স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত মণ্ডপ এবং মণ্ডপের তিনদিকে প্রকোষ্ঠশ্রেণী; মণ্ডপের পিছনের সারির কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ। এই আদর্শে গঠিত হইলেও সংঘারামগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা বিদ্যমান। ৬ সংখ্যক গুহাটি দ্বিতল। এই সময়কার সংঘারামের

মধ্যে চারিটি (১, ২, ১৬ এবং ১৭) স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রণে অনবদ্য। এইগুলির মধ্যে ১৬ নং বাকাটরাজ হরিষেণের (৪৭৫-৫০০ খ্রী) মন্ত্রী বরাহদেবের এবং ১৭ নং হরিষেণেরই অধীন একজন সামন্তনৃপতির উৎসর্গ। এই পর্বের চৈত্যগৃহত্রয়ের ২৯ সংখ্যক গুহা অসমাপ্ত। অপর দুইটিতে (১৯ ও ২৬) পূর্বেকার গঠনরীতি অনুসৃত হইলেও লক্ষণীয় পার্থক্যও বিদ্যমান। প্রথমতঃ, অভ্যন্তর-ভাগ অলংকারবহুল কারুকার্যখচিত ; দ্বিতীয়তঃ, আরাধ্য-স্তূপে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ।

শৈলখাত স্থাপত্যের বিবর্তনধারায় অজণ্টার গুহারাজির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অজণ্টার চিত্রকলার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এখানকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য -বিভব সাধারণতঃ উপেক্ষিত। অথচ, ইহাদের মূল্যও কম নহে। অজণ্টার চিত্রাঙ্কন দুইটি বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়। উভয় পর্বের অন্তর্বর্তীকাল সুদীর্ঘ। প্রথম পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকের অন্তর্ভুক্ত। আলেখ্যের পরিচ্ছদ পরিধান-পদ্ধতি, উষ্ণীষ ও অলংকারাদি সাঁচী ও ভারুতের উদ্‌গত মূর্তির ন্যায়। এই পর্বের চিত্রাবলীতে শিল্পী-হস্তের নিপুণ কাজ অনুভব করা যায়। সমসাময়িক অন্য ভারতীয় ভাস্কর্য অপেক্ষা ইহারা উচ্চস্তরের। ইহাদের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক চিত্র এখন প্রায় অবলুপ্ত ; সেইজন্য ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে ইহাদের গুরুত্ব খুবই বেশি।

চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপত্যকর্ম তৎপরতার পুনরুদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ এবং পরবর্তী তিন শতাব্দী ইহার ব্যাপ্তি। বিভিন্ন শিল্পীর রচিত বলিয়া শিল্পমানে ইতর-বিশেষ থাকিলেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের চিত্ররাজি সৌন্দর্যে, ব্যঞ্জনায়, রঙের পরিকল্পনায় সুসমঞ্জস সার্থক রেখাবিন্যাসে বৈচিত্র্যে ও গতিশীলতায় সমৃদ্ধ। এই চিত্ররাজিতে নর-নারীর ললিত সৌন্দর্য ও বিচিত্র আবেগ নিখুঁত ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাস্তবিকই প্রাচীর-চিত্রাঙ্কনে চিত্রকর এখানে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পমানের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মানের অবনতি পরিলক্ষিত হয় সপ্তম শতকের আলেখ্যে। এই সময়কার বুদ্ধের ছবিগুলি নিষ্প্রাণ ও ভাবব্যঞ্জনাবর্জিত।

কক্ষের প্রাচীর ও স্তম্ভের চিত্রাবলীর উপজীব্য বিষয় একান্তই ধর্মভাবাপন্ন। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ববৃন্দ, বুদ্ধদেবের জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও জাতকের কাহিনী অবলম্বনে এই-গুলি অঙ্কিত। এই আলেখ্যরাজিতে সমসাময়িক রাজপ্রাসাদ, কুটির, নগর, গ্রাম, আশ্রম ইত্যাদির জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হইয়াছে। উপরন্তু চিত্রগুলি তদানীন্তন সমাজের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রাদি, আসবাবপত্র, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রক্রিয়ারও প্রামাণিক দলিলবিশেষ। এই সকল আলেখ্যের মাধ্যমে সেই প্রাচীন যুগের মানুষের কল্পনার দেবদেবী ও উপদেবতা -অধ্যুষিত স্বর্গরাজ্যের আভাস পাওয়া যায়।

বর্ণাঢ্য অলংকরণ ছাদের নিম্নপিঠের চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য। তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, মানব ও কিন্নর প্রভৃতি লইয়া বিচিত্র নকশার সমারোহ ; সর্বত্রই স্বাভাবিকতা, সজীবতা ও ললিত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি। এইগুলি সন্দেহাতীতভাবে চিত্রকরের তুলির অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয়বহ।

অনেকে ফ্রেস্কো আখ্যা দিলেও অজণ্টার চিত্রাবলী ফ্রেস্কো নহে, কারণ ফ্রেস্কো টেকনিক (*fresco buono*, ইহাতে সদ্যসিক্ত চুন-পলস্তারার উপর কোনও প্রকার আটকাইবার উপাদান না দিয়া শুধু জলের সহিত রঞ্জক-পদার্থ মিশাইয়া চিত্রণ করা হয়) এখানে অনুসৃত হয় নাই। এখানে আঠা ব্যবহার করা হইয়াছে। কাদামাটি তুষ ও সমজাতীয় অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রাচীর-গাত্রে পুরু আস্তরণ দেওয়া হয়। তাহার উপর খুব পাতলা চুনের প্রলেপ দিয়া প্রথমে আলেখ্যের রেখাগুলি টানা হয়, পরে বিভিন্ন রঙের সমাবেশে রেখাগুলির অন্তর্বর্তী স্থল পূর্ণ করা হয়। একমাত্র ল্যাপিস্ লাজুলি (*lapis lazuli*) ব্যতীত রঙের সমস্ত উপাদানই (লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের গিরিমাটি, ভূসো কালি, চুন ও নীলরঙের ল্যাপিস্ লাজুলি পাথর) স্থানীয়।

দ্র J. Fergusson and J. Burgess, *The Cave Temples of India*, London, 1880 ; J. Burgess and Bhagwanlal Indraji, *Inscriptions from the Cave Temples of Western India*, Arch. Surv. West. Ind. No. 10, Bombay, 1881 ; J. Burgess, *Report on the Buddhist Cave Temples and Their Inscriptions*, Arch. Surv. West. Ind, IV, London, 1883 ; J. Griffiths, *The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta*, I-II, London, 1896-97 ; *Ajanta Frescoes*, India Society, London, 1915 ; A. Foucher, *Preliminary Report on the Interpretation of the Paintings and Sculptures of Ajanta*, Jour. Hyderabad Arch. Soc. for 1919-20, Bombay, 1921 ; V. Goloubew, *Documents pour Servir a l'elude d' Ajanta—les peintures de la premiere grotte*, Ars Asiatica, X, Paris and

Brussels, 1927 ; S. Paramasivam, *Technique of the Painting Process in the Cave Temples at Ajanta*, An. Rep. Arch. Dept. H. E. H. the Nijam's Dominions, 1936-37, Calcutta 1939 ; G. Yazdani, *Ajanta* (texts and plates), I-IV, Oxford, 1930-55 ; V. V. Mirashi, *Vakataka Inscription in Cave XVI at Ajanta*, Hyderabad Archaeological Series, No. 14, 1941 ; Percy Brown, *Indian Architecture* (*Buddhist and Hindu*) Bombay, 1942 ; Debala Mitra, *Ajanta*, 3rd Edn. New Delhi, 1959.

দেবলা মিত্র

অজন্তা অজণ্টা দ্র

অজয় সাঁওতাল পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উৎপন্ন হইয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমান্ত কিছুদূর পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া, কাটোয়া শহরের নিকটে ভাগীরথীর সহিত যুক্ত। প্রধানতঃ বর্ষার জলে পুষ্ট এই নদীটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও নাব্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অবাধে জঙ্গল কাটিবার ফলে ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে নদীগর্ভ বালুকাপূর্ণ হইয়া বন্যাপ্রবণতা দেখা দেয়। এই নদী-উপত্যকায়— বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে— কয়লাখনির অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। অজয়ের তীরে কবি জয়দেবের বাসভূমি কেন্দুবিল্ব বা জয়দেব-কেঁদুলি গ্রাম। বর্ধমান জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব-পূর্ণ 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ইহার তীরে অবস্থিত। ইলাম-বাজারের নিকট বাঁধ দিয়া বন্যারোধের চেষ্টা হইতেছে। ইহা দামোদর-উপত্যকার সেচ-প্রণালীর সহিত সংযুক্ত।

সতোশ চক্রবর্তী

অজয়রাজ শাকম্ভরীর (বর্তমান আজমীর ও সংলগ্ন অঞ্চল) চৌহান বংশের রাজা। পিতা ১ম পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর অজয়রাজ (অজয়দেব, সল্‌হন্) রাজা হন (আনুমানিক রাজত্বকাল ১১১০-১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার সময় হইতেই চৌহান রাজগণ পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যবিস্তারের নীতি অবলম্বন করেন। অজয়রাজ মালবের পরমারদের পরাজিত করিয়া পরমার-সেনাপতি সুলহন্‌কে বন্দী করেন ও উজ্জয়িনী পর্যন্ত জয় করেন। তিনি আরও তিনজন রাজাকে পরাজিত করেন। 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' মহাকাব্যে উল্লেখ আছে যে তিনি গর্জন মাতঙ্গদের (সম্ভবতঃ গজনীর মুসলমান) পরাজিত করেন। তিনি অজয়মেরু (আজমীর) নগরের প্রতিষ্ঠাতা। রানী সোমল্ল দেবী বা সোমলেখার নামে এবং নিজ নামে অজয়রাজ রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। নিজে শৈব হইলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথিত আছে যে শেষ জীবনে পুত্র অর্ণোরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি বনগমন করেন।

নিমাইসাধন বসু

অজাতশত্রু মগধের হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বিম্বিসারের পুত্র। বৌদ্ধ কাহিনীতে অজাতশত্রু (বা কূণিক) পিতৃহন্তারূপে পরিচিত।

কথিত আছে, অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের নিকট নিজের পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ বিবরণ অনুসারে তিনি বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু জৈনেরা তাঁহাকে জৈনধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবি করেন।

অজাতশত্রু শক্তিশালী শাসক ছিলেন। বিমাতার ভ্রাতা কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত তিনি বিরোধে লিপ্ত হন। বহুদিন যুদ্ধের পর প্রসেনজিৎ শেষ পর্যন্ত স্বীয় কন্যার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ দেন ও যৌতুকস্বরূপ কাশী গ্রাম অজাতশত্রুকে প্রত্যর্পণ করিয়া শান্তিস্থাপন করেন। অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের নিকট হইতে বৈশালী অধিকার করেন। জৈন সূত্র অনুসারে পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছত্রিশটি গণশাসিত রাজ্যসমবায়ও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ প্রস্তুতি সত্ত্বেও অজাতশত্রুর অগ্রগতি রোধ করিতে পারেন নাই।

অজাতশত্রু মগধরাজ্যকে বৃহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া মগধসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অজামিল কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ অজামিল শূদ্রার প্রতি আসক্ত হইয়া চৌর্য, প্রবঞ্চনা, প্রাণীপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা পরিবার পোষণ করিতেন। শূদ্রার গর্ভে তাঁহার দশটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটি ছিল পিতা-মাতার অতিশয় প্রিয়, নাম নারায়ণ। অজামিল মৃত্যুকালে যমদূত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে প্রিয়পুত্র নারায়ণকে আহ্বান করিতে থাকিলে 'নারায়ণ' নামকীর্তন শ্রবণে বিষ্ণুদূত আসিয়া তাঁহাকে মৃত্যুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথোপকথনে ভগবৎ-নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন (ভাগবত ৬।১-২)। এই উপাখ্যান অবলম্বনে

সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ইহার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যদান করে।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১২৯৩-১৩২৫ বঙ্গাব্দ) জন্ম ৪ ভাদ্র ১২৯৩, মৃত্যু ১৪ পৌষ ১৩২৫। পিতা ফরিদপুর জিলার মঠবাড়ি গ্রামের শ্রীচরণ চক্রবর্তী, মাতা সুশীলা দেবী।

অকালমৃত্যুর ফলে প্রতিভার স্বাক্ষর সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে না পারিলেও যৌবনেই যাঁহারা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন অজিতকুমার তাঁহাদের অন্যতম। তরুণ বয়সেই তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ব্যক্তি-রবীন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হন; এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ত্যাগব্রত স্বীকার করিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। শিক্ষাদানকর্মে সাহিত্য-রসাস্বাদনে অভিনয়ে সংগীতে সকল দিক হইতে ছাত্রদের মনকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে তিনি বিশেষ আগ্রহ বোধ করিতেন; এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা, নিষ্ঠা, উদ্যম ও উদ্ভাবনশীলতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে এককালে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে একখানি গ্রন্থে (১৩১৮) এই বিদ্যালয়ের প্রথম দশকের ইতিহাস ও আদর্শ তিনি বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন।

অজিতকুমার রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩১৯) ও 'কাব্যপরিক্রমা' (১৩২২) দীর্ঘকাল রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের প্রধান সহায় ছিল; প্রকাশের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, ইতিমধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, এই দুইখানি গ্রন্থ এখনও অভিনিবিষ্ট রবীন্দ্রচর্চাকারীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের নিয়তসঙ্গলাভ ও তাঁহার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্য-ধারার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার শুভযোগ তাঁহার লিখিত কবি-পরিচিতিকে বিশেষ একটি মূল্য দিয়াছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য একটি বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইওরোপে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও রবীন্দ্ররচনার অজিত-কুমার-কৃত কিছু কিছু অনুবাদ বিলাতে সুধীসমাজের কোনও কোনও মহলে প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। ক্ষিতিমোহন সেন সংকলিত কবীর-দোঁহার অনেকগুলি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন; তাহারই ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ *One Hundred Poems of Kabir* গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

পরবর্তীকালে বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠকের মনে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় মেটারলিঙ্ক, এ. ই., ফ্র্যান্সিস টমসন, হুইটম্যান প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারের বিষয় প্রভৃত আলোচনা করিয়া অজিতকুমার তাহার অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল রচনার কোনও কোনওটি তাঁহার 'বাতায়ন' (১৩২২) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

অজিতকুমার রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) বাংলা জীবনীসাহিত্যে প্রধান গ্রন্থগুলির অন্যতম। কিশোরবয়স্কদের জন্য রচিত তাঁহার 'খ্রীষ্ট' (১৩১৮) গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। অভিন্নহৃদয় সতীর্থ অকালপরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের 'রচনাবলী'ও (১৩১৯) তিনি সংকলনপূর্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

অজিতকুমার অভিনয়পটু ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রযোজিত কোনও কোনও নাট্যাভিনয়ে তাঁহার নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল; তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, সেকালে রবীন্দ্রসংগীতচর্চার তিনি অন্যতম বাহক ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপদেশ-নির্দেশ লইয়া রামমোহন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে অজিতকুমারের কয়েকটি রচনা 'রাজা রামমোহন' (১৯৩৭) গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। তাঁহার বহু মূল্যবান রচনা এখনও সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

পুলিনবিহারী সেন

অজিত কেশকম্বলী গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক যে ছয়জন প্রচারক অপধর্মীয় (heretic) বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে অপখ্যাত, অজিত কেশকম্বলী বা কেশকম্বল তাঁহাদের অন্যতম। কেশকম্বলী শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা হয় যে অজিত ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ চুলের তৈয়ারি কম্বল পরিধান করিতেন (দীঘনিকায়ের কস্‌সপ-সীহনাদ সুত্তের অট্‌ঠ-কথা দ্র)। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত অজিতের মতবাদ সর্বত্র এক নহে, কিন্তু সর্বত্রই তাহা বিরুদ্ধ ও হেয় মতবাদ এবং প্রধানতঃ তাহা উচ্ছেদবাদ (nihilism) (দীঘ-নিকায়ের সামঞ্ঞফল ও ব্রহ্মজাল সুত্ত এবং মজ্‌ঝিম-নিকায়, ১, ও 'সঞ্ঞুত্তনিকায়, ৩, হিসাবেই বর্ণিত হইয়াছে— অর্থাৎ অজিত যাহা অস্বীকার করিতেন মূলতঃ তাহারই বর্ণনা এই সকল গ্রন্থে আছে। দীঘনিকায়-এর সামঞ্ঞফল সুত্তে বর্ণিত অজাতশত্রুর প্রশ্নের উত্তরে

তিনি যে ভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাকে আদর্শ কুতার্কিক (sophist) বলা যাইতে পারে। এই মতানুসারে দান যজ্ঞ হবন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিরর্থক ; সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের অতিপ্রাকৃত ফল কাল্পনিক ; ইহলোক-পরলোকের অস্তিত্ব নাই ; পিতা-মাতা বলিয়া কিছু নাই—কিন্তু জীব স্বয়ং উৎপন্ন নহে ; চরম জ্ঞানের অধিকারী এবং তথাকথিত ইহলোক-পরলোক সংক্রান্ত অভিজ্ঞ কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নাই যিনি এই জ্ঞান বিতরণ করিতে পারেন। চতুর্ভূতের উপাদানে জীব-শরীর গঠিত— মৃত্যুর পর তাহার পার্থিব অংশ পৃথিবীতে, জলীয় অংশ জলে, বায়বীয় অংশ বায়ুতে এবং তেজোময় অংশ অগ্নিতে প্রত্যাবর্তন করে ও বিলীন হয় ; তাহার ইন্দ্রিয়নিচয় বিলীন হয় আকাশে। শ্মশানভূমিতে বহন করা পর্যন্তই শববাহকেরা তাহার গুণকীর্তন করে, কিন্তু তাহার অস্থিসমূহ ভস্মীভূত হইবামাত্র তাহার যজ্ঞ ও দানাদি কর্মের শেষ হয়। মূর্খ ও জ্ঞানী উভয়েরই দেহাবসানে পরম পরিসমাপ্তি ঘটে—মৃত্যুর পর তাহাদের আর কোনও সত্তা থাকে না। এই প্রসঙ্গে গুণনামা আজীবিকের মতবাদ দ্রষ্টব্য (Fausböll, *Jataka*, vol. 6 ; মহানারদ কস্সপ জাতক ৫৪৪, পৃ ২২৫)।

দ্র T. W. Rhys Davids, *Dialogues of the Buddha* ; H. G. Jacobi, *Jaina Sutras* II. XXIV, (*Sutrakritanga*) ; B. M, Barua, *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy*, Calcutta 1921 ; G. P, Malalasekera : *Dictionary of Pali Proper Names*, London, 1937-38 ; A. L. Basham, *History and Doctrines of the Ajivikas*, London, 1951.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন (১৮৩৯-১৯২০ খ্রী) সুরসিক ও কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি রচিত অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্টের টীকা, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, বকদূত, চৈতন্যশতক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে দ্রুত কবিতা রচনায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

দ্র কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, নবদ্বীপ মহিমা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অজিত সিংহ (রাঠোর) যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর (১০ ডিসেম্বর, ১৬৭৮ খ্রী) পর ১৬৭৯ খ্রী, ফেব্রুয়ারি অজিত সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। যোধপুরের রানারূপে মনোনয়নলাভের জন্য তাঁহাকে দিল্লীতে ঔরঙ্গজেবের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সম্রাট ইতঃপূর্বে ছত্রিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইন্দ্র সিংহ রাঠোর নামে যশোবন্তের এক ভ্রাতুষ্পুত্রপুত্রকে যোধপুরের রানা রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অজিত সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাকে সিংহাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল ; অন্যথায় সম্রাট তাঁহাকে আপন হারেমে পালনের সংকল্প করিলেন। এই প্রস্তাবে রাঠোরেরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিল। যশোবন্তের মন্ত্রীপুত্র দুর্গাদাস রাঠোর অপরিসীম বীরত্ব ও কৌশলের সাহায্যে অজিত সিংহকে দিল্লী হইতে উদ্ধার করিয়া যোধপুরে লইয়া গেলেন। ঔরঙ্গজেব শাহ্‌জাদা আজম, মুয়াজ্জম ও আকবরের সহিত যোধপুরের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যোধপুর অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু মেবারের শিশোদীয় বংশীয় রানা রাজসিংহ অজিত সিংহের পক্ষে যোগ দিলেন। ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় এই যুদ্ধের মীমাংসা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ্ অজিত সিংহকে রানা রূপে স্বীকার করিয়া লন।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় কন্যাকে মোগল সম্রাটের সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন। অজিত সিংহ ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আজমীর ও গুজরাটের শাসনকর্তা-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরে মারাঠাদের সহিত সহযোগিতার অভিযোগে তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করা হয়। স্বীয় পুত্র ভক্তসিংহের দ্বারা তিনি নিহত হন।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অজ্ঞাবাদ (agnosticism) একটি দার্শনিক মতবাদ। ইহার অর্থ এই যে, অতীন্দ্রিয় সত্তা (যথা আত্মা ঈশ্বর ইত্যাদি) সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তথাকথিত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি বাস্তবিক আছে কি নাই, অজ্ঞাবাদী সে বিষয়ে কিছুই বলিতে চাহেন না। কারণ তাঁহার মতে এ বিষয়ে কোনও জ্ঞানই তাঁহার হয় নাই এবং হইতে পারেও না। অজ্ঞাবাদী অবশ্য এ কথা বলেন না যে আত্মা নাই বা ঈশ্বর নাই। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন জড়বাদী ও

অবিশ্বাসী নাস্তিক এবং উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের দাবি করেন জ্ঞানবাদী (gnostic)। এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদ পরিহার করিয়া মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন অজ্ঞাবাদী (agnostic)। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাবাদী কিছু স্বীকারও করেন না, আবার অস্বীকারও করেন না। অজ্ঞাবাদের মূলে আছে প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ (empiricism)— এখানে 'প্রত্যক্ষ' শব্দে কেবল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষই বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী বলেন যে আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস হইল ঐন্দ্রিয়জ্ঞান। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই আমাদের একমাত্র সম্বল হয় তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও দিনই কিছু জানিতে পারিব না। এইভাবে প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদের এক ধারা অজ্ঞাবাদে পরিণত হইয়াছে, অন্য ধারা পরিণত হইয়াছে অবিশ্বাসবাদে।

অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন অজ্ঞাবাদের সমর্থক। কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেবকে যখন আত্মা ও জগৎসংসার সম্বন্ধে দশটি আধিবিদ্যক প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি নীরব ছিলেন। এইগুলি 'দশ অব্যাকৃতানি' নামে অভিহিত। কিন্তু বুদ্ধদেব স্বয়ং কতদূর অজ্ঞাবাদী ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে agnosticism বা অজ্ঞাবাদ পদটি আধুনিক কালে প্রবর্তন করেন টি. এইচ. হাক্সলি (T. H. Huxley)। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত Metaphysical Society-র অধিবেশনে বিভিন্ন সদস্য যখন তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন হাক্সলি বলেন যে, তাঁহার নিজস্ব মতবাদ হইল agnosticism (a = ন, gnosticism = জ্ঞানবাদ)। প্রাচীন জ্ঞানবাদী (gnostic) যেমন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের দাবি করিতেন, হাক্সলি সেইরূপ সবিনয়ে তাঁহার অজ্ঞতার কথা নিবেদন করেন। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তিনি হ্যামিল্টন (Hamilton) -এর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। হাক্সলি মনে করিতেন যে, হিউম (Hume) ও কাণ্ট (Kant) তাঁহার স্বদলীয়। হিউমের দর্শন প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদের চরম নিদর্শন। পূর্বেই বলিয়াছি ইহা শেষ পর্যন্ত হয় সন্দেহবাদে না হয় অবিশ্বাসবাদে পরিণত হয়। কাণ্ট তাঁহার *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান, যাহার অপর নাম আধিবিদ্যক জ্ঞান, অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে সকল মূল প্রত্যয় দ্বারা আমাদের জ্ঞান গঠিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহাদের কোনও অবকাশ নাই। সুতরাং ঐ সকল তত্ত্ব চিরদিনই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকিয়া যাইবে। তাঁহার মতে অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় পদার্থ দুই প্রকার। উপরি-উক্ত প্রত্যয়গুলি যখন স্বমহিমায় যাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সমাহার করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের এক অপরূপ চরমোৎকর্ষ চিন্তা করে এবং স্বভাবতঃ তাহা বিশ্বাস করে, তখন সেই চরম উৎকৃষ্ট রূপটি জ্ঞানপরিধির বাহিরে থাকে, কারণ ঐ রূপটি ইন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়িতে পারে না এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়িতে পারে না, কাণ্টের মতে তাহা অজ্ঞেয়। আত্মা, ঈশ্বর, জগতের আদি কারণ প্রভৃতি প্রচলিত অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি এই জাতীয়। দ্বিতীয় এক প্রকার অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে, যাহার নাম thing-in-itself। কাণ্ট মনে করেন যে দেশকালরূপ আকারে আকারিত রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি আমা-নিরপেক্ষ নহে, কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং দেশকালরূপ আকার, উভয়েই আমা-সাপেক্ষ। অথচ আমি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না যে, যখন আমি বৃক্ষলতাদি বস্তুগুলি দেখি তখন আমা-নিরপেক্ষ কিছু-একটা পদার্থ নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু স্বরূপে এই পদার্থ আমার ইন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়ে না এবং যেহেতু স্বরূপে এই পদার্থ দেশকালরূপ আকারে আকারিত হয় না, অতএব উহা অজ্ঞেয়। ইহাই হইল কাণ্টের অজ্ঞাবাদ। কাণ্ট মনে করেন যে অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি জ্ঞানলভ্য না হইলেও আমরা ইহাদের স্বীকার করি এবং ইহাদের কয়েকটি আমরা কর্মমার্গে এবং দুই-একটি রসোপলব্ধিমার্গে ধরিতে পারি। আমাদের দেশেও অনেক বৈষ্ণব দার্শনিক এই জাতীয় কথা বলেন— 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'।

হ্যামিল্টন বলেন যে চরমতত্ত্ব (absolute) হইলেন অজ্ঞেয়। জগতের কোনও কিছু জানিতে হইলে উহাকে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে জানিতে হয়। কিন্তু চরমতত্ত্ব হইলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি সকল সম্বন্ধের বন্ধনমুক্ত; সুতরাং তাঁহাকে জানার অর্থ তাঁহাকে আবার বন্ধনযুক্ত করা। যেহেতু ইহা স্ববিরোধী, অতএব বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জ্ঞানলাভের সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে চরমতত্ত্ব অজ্ঞেয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানের (science) পূজারী হইয়াও শেষকালে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া এক বিরাট শক্তির কার্য চলিতেছে। তবে তিনি ইহাও বলিলেন, আমরা জানি যে এই শক্তি আছে কিন্তু ইহা কি, তাহা আমরা জানি না; অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে শক্তির প্রকাশ সেই শক্তি আমাদের নিকট অজ্ঞেয়। দার্শনিক মতবাদ হিসাবে অজ্ঞাবাদকে সম্পূর্ণরূপে

সমর্থন করা যায় না। অজ্ঞাবাদীগণের উক্তির মধ্যে অনেক অসংগতি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক অজ্ঞাবাদীই অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে ইহা স্বীকার করেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সহিত উহার কি সম্বন্ধ তাহারও ইঙ্গিত দেন; এরূপ ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

সাম্প্রতিক কালে পৃথক দার্শনিক মতবাদ হিসাবে অজ্ঞাবাদের বিশেষ কোনও প্রচলন নাই এবং কোনও নির্দিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়কে ঐ ভাবে অভিহিত করা হয় না। বর্তমানকালে পাশ্চাত্ত্যদেশীয় একদল প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে কোনও বাক্যের কোনও অর্থ আছে কিনা বিচার করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, ঐ জাতীয় সমস্ত বাক্যই অর্থহীন। কিন্তু হাক্সলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একটু পৃথক— তাঁহার অনুসন্ধেয় বিষয় ছিল অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব কতদূর প্রমাণযোগ্য এবং উহা কতদূর আমাদের জ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভূত।

অজ্ঞাবাদের দার্শনিক মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত না হইলেও ইহা মানিতে হইবে যে মানবমনের পক্ষে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সকল রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করা সম্ভব নহে। সুতরাং অজ্ঞাবাদ গ্রহণ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, অতীন্দ্রিয় চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু না জানিতে পারি।

দ্র T. H. Huxley, *Collected Essays*, vol V, London, 1894; James Ward, *Naturalism and Agnosticism*, London, 1893; Leslie Stephen, *An Agnostic's Apology*, New York, 1903; R. Flint, *Agnosticism*, London, 1903; R. A. Armstrong, *Agnosticism and Theism in the Nineteenth Century*, London, 1905; F. Von Heigel, *Reality of God: Religion and Agnosticism*, New York, 1931.

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

অটলবিহারী ঘোষ (১৮৬৪-১৯৩৬ খ্রী) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার রামসাগর গ্রামে মাতুলালয়ে অটলবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ও ল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিন প্রথমে আলিপুর আদালতে এবং পরে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি করেন। দীর্ঘকাল তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য তন্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। বিশিষ্ট ইংরাজ তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ উড্রফের (Sir John Woodroffe) সহযোগিতায় তিনি আগমানুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় তন্ত্রশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চর্চার সুব্যবস্থা হয়। ক্রমে তিনি এই শাস্ত্রের আলোচনায় এমনভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহাকে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল। বহু পরিশ্রম করিয়া তিনি 'সারদাতিলক', 'প্রপঞ্চসার', 'কুলার্ণব', 'কৌলাবলী নির্ণয়', 'তন্ত্ররাজ', 'তন্ত্রাভিধান' প্রভৃতি প্রায় বিশখানি গ্রন্থ আগমানুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ইনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

অটোক্লেভ যন্ত্রবিশেষ। ইহার সাহায্যে কোনও তরল পদার্থকে তাহার স্ফুটনাঙ্কের অনেক বেশি উষ্ণতায় গরম করা চলে। এইরূপ করিতে তরল পদার্থটির উপর বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপ অপেক্ষা ২০/৩০ গুণ বেশি চাপ দিবার প্রয়োজন হয়। পদার্থটি অটোক্লেভে লইয়া তাপ দিলে তাহার উষ্ণতা বাড়ে। অটোক্লেভের ঢাকনা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে তরল পদার্থ তাপ পাইয়া বাষ্পে পরিণত হইলেও উষ্ণ বাষ্প নির্গত হয় না। তাহাতে অটোক্লেভের ভিতরে বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পায়।

তাপ ও তৎসহ চাপ সহিতে পারে এইরূপ যন্ত্রের গাত্রাবরণ শক্ত হওয়া দরকার। ভিতরে তরল বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত যাহাতে যন্ত্রের উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়া না হয়, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। অনেক অটোক্লেভ পুরু ঢালাই লোহা বা কলঙ্ক না পড়া ইস্পাতে তৈয়ারি। যন্ত্রটি সিলিণ্ডার আকৃতির, কোথাও কোনও জোড় থাকে না। উষ্ণ বাষ্পের চাপে যাহাতে না ফাটিয়া যায় সেইজন্য গাত্রাবরণ সর্বত্র সমান পুরু করা হয়। ঢাকনা এমন ভাবে স্ক্রু দিয়া আঁটার ব্যবস্থা থাকে যে সিলিণ্ডার ও ঢাকনার যোগস্থান দিয়া যেন উষ্ণ বাষ্প নির্গত হইতে না পারে। সেইজন্য মোটা রবারের চ্যাপ্টা ঢাকা সিলিণ্ডার ও ঢাকনার যোগস্থলে বসাইয়া তারপর ঢাকনা স্ক্রু আঁটিয়া বন্ধ করা হয়।

বেশি তাপ পাইয়া বদ্ধ অটোক্লেভ তাপবৃদ্ধিতে ফাটিয়া যাইতে পারে। তাই ইহাতে সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্ দেওয়া থাকে। উষ্ণতা ও চাপ মাপার ব্যবস্থাও থাকে। আজকাল সহজে স্বল্প সময়ে রান্না করিবার জন্য অটোক্লেভ জাতীয় কুকার, প্রেসার কুকার প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে জল তাপ পাইয়া স্টিমে পরিণত হয়। স্টিম সিলিণ্ডারে চাপ দেয়। কাজেই বায়ুমণ্ডলের চাপের অধিক

চাপে ও জলের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা বেশি উষ্ণতায় খাদ্যদ্রব্য (মাংস ইত্যাদি) স্বল্প সময়ে সহজে সুসিদ্ধ হয়, অথচ খাদ্যগুণ নষ্ট হয় না।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অটোজাইরো জাইরোস্কোপ দ্র

অট্টহাস বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার লাভপুর থানায় ঐ নামের মৌজায় অবস্থিত ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম। সাধারণের বিশ্বাস, এখানে সতীর অধরোষ্ঠ পতিত হয়। দেবী ফুল্লরার মন্দিরে প্রায় দশ-বারো হাত বিস্তৃত অঙ্গসামঞ্জস্যহীন একটি প্রকাণ্ড শিলামূর্তি আছে। ভক্তগণের বিশ্বাস উহা অধরাকৃতি। দেবীর প্রিয় বলিয়া দেবীকে ভোগ নিবেদন করিবার পূর্বে এখানে শিবাভোগ হয়। মন্দিরপার্শ্বে ভৈরবের মন্দির আছে।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Birbhum District Gazatteer*, Calcutta, 1910 ; A. Mitra, *Census. 1951—West Bengal—District Handbook, Birbhum*, Calcutta, 1954.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অট্ঠকথা, অত্থকথা সংস্কৃত অর্থকথা। প্রধানতঃ বৌদ্ধ পালি ত্রিপিটকের নিকায় বা তাহার অন্তর্গত সুত্তগুলির ব্যাখ্যান। অট্ঠকথাগুলির অধিকাংশই বুদ্ধঘোষের রচনা। ধম্মপাল প্রভৃতি আরও কয়েকজনের অত্থকথা আছে। পালি ব্যাকরণেরও অট্ঠকথা পাওয়া যায়, যথা কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণের 'সারত্থবিকাসিনী'। প্রাচীন সিংহলী ভাষায় রচিত অট্ঠকথাও পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের রচিত অট্ঠকথা অর্থাৎ ব্যাখ্যানেরও টীকা পাওয়া যায় যেমন, বুদ্ধঘোষ-রচিত সমন্তপাসাদিকার টীকা। এই জাতীয় আরও টীকা আছে। বুদ্ধঘোষ-রচিত নিম্নলিখিত অট্ঠকথাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ : বিনয়পিটকের 'সমন্তপাসাদিকা', দীঘনিকায়ের 'সুমঙ্গলবিলাসিনী', মজ্ঝিমনিকায়ের 'পপঞ্চসূদনী', অঙ্গুত্তরনিকায়ের 'মনোরথপূরনী', সঞ্ঞুত্ত-নিকায়ের 'সারত্থপকাসিনী', খুদ্দকনিকায়-অন্তর্গত খুদ্দকপাঠের এবং সুত্তনিপাতের 'পরমত্থজোতিকা'। কাহারও কাহারও মতে খুদ্দকনিকায়-অন্তর্গত ধম্মপদের এবং জাতকের অট্ঠকথাও বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত, কিন্তু তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলী ভাষায় এই দুইটির যে অট্ঠকথা আছে, বুদ্ধঘোষের পরমত্থজোতিকার অন্তর্ভুক্ত অংশটি তাহার পালি অনুবাদ মাত্র। অভিধম্ম পিটকের ধম্মসঙ্গনির অট্ঠকথা 'অত্থসালিনী' এবং বিভঙ্গপ্রকরণের 'সম্মোহ-বিনোদনী'ও বুদ্ধঘোষের রচনা। ধম্মপাল 'পরমত্থদীপনী' নামে অট্ঠকথা রচনা করেন, ইহা উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থ এবং থের ও থেরীগাথার ব্যাখ্যান।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

অডিটর-জেনারেল মহানিরীক্ষক। কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর-জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া বা সংক্ষেপে 'অডিটর-জেনারেল' ভারতবর্ষের সংবিধানে উল্লেখিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অন্যতম। সংবিধানের ১৪৮ হইতে ১৫১ ধারায় তাঁহার নিয়োগ, কার্যাবলী, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি রাজস্ব হিসাবে বা অন্যান্য উৎস হইতে যে সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করেন উহার সম্যক্ রক্ষণাবেক্ষণ কাম্য এবং সরকারি কোষাগার হইতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে অডিটর-জেনারেলের উপর সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ও আইনসম্মত উপায়ে ব্যয় হইতেছে কিনা তাহার পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে।

অডিটর-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার বেতন ও চাকুরির অন্যান্য সর্তাদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তিনি মাসিক চার হাজার টাকা বেতন পাইবেন। একবার নিযুক্ত হইয়া অডিটর-জেনারেল ছয় বৎসরকাল উক্তপদে আসীন থাকেন। অবাঞ্ছিত প্রভাব যাহাতে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন না ঘটায় তজ্জন্য স্থির হইয়াছে যে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ পন্থা ব্যতীত তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইবে না। তাঁহার কার্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের অধীনে কোনও চাকুরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার কার্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও পার্লামেণ্টের মঞ্জুরীসাপেক্ষ হইবে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অডিটর-জেনারেল স্থির করিবেন। সরকারি অর্থের ব্যয় যাহাতে অবৈধ, ক্ষতিকর বা অপচয়মূলক না হয় তাহার উপর তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং ঐরূপ ব্যয় হইলে তিনি তৎসম্পর্কে মন্তব্য করেন ও অনেক ক্ষেত্রে উহা নাকচও করিতে পারেন। সরকারি আয়-ব্যয়ের প্রধান প্রধান ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে একটি বিবরণী তিনি বৎসরান্তে পার্লামেণ্টের (বা রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভার) সমক্ষে পেশ করেন।

পার্লামেণ্ট বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটিতে ঐ বিবরণী আলোচিত হয় এবং আলোচনান্তে কমিটি পার্লামেণ্টের বা রাজ্যের আইনসভার নিকট আপন অভিমত সংবলিত বিবরণী পেশ করেন। সাধারণভাবে এই বিবরণীর উদ্দেশ্য হইল যে সরকারি দপ্তরসমূহ ভবিষ্যতে ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবেন এবং ঐগুলি দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন।

বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

অণহিল পাটক, -বাড় এই প্রাচীন নগরী আহ্‌মেদাবাদের ১০৫ কিলোমিটার উত্তরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান নাম পাটন। প্রবাদ এই যে, চাপ বা চাবোৎকট চোবড়া জাতির রাজা বনরাজ ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে চৌলুক্যরাজ মূলরাজ গুজরাট অধিকার করিয়া অণহিল পাটকেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঘেল বংশীয় রাজগণ গুজরাট অধিকার করেন। তখনও ইহা গুজরাটের রাজধানী ছিল। ১২৯৭ খ্রী আলাউদ্দিন খিলজী বাঘেলরাজ কর্ণকে পরাজিত করিয়া এই রাজ্য ও রাজধানী অধিকার করেন। ১৪০৭ খ্রী পর্যন্ত দিল্লীর শাসনকর্তাদের অধীনে ছিল। শেষ শাসনকর্তা মুজাফ্‌ফর শাহ অণহিল পাটকের প্রথম স্বাধীন স্থলতান (১৪০৭-১৪০৮ খ্রী)। মুজাফ্‌ফর শাহের পুত্র প্রথম আহ্‌মেদ ১৪১২ খ্রী সবরমতী তীরে আহ্‌মেদাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া অণহিল পাটক হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। চৌলুক্য কুমারপালের রাজত্বকালে প্রখ্যাত জৈন বৈয়াকরণ ও অভিধানকার হেমচন্দ্র উক্ত নগরের সম্মানিত অধিবাসী ছিলেন।

অণু যৌগিক বা মৌলিক যে কোনও পদার্থের ধর্মাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার স্বাধীন অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম অংশকে ঐ পদার্থের অণু (molecule) বলা হয়। একই পদার্থের অণু একই প্রকারের; বিভিন্ন পদার্থের অণু বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সোনার অণুগুলি পরস্পর একই প্রকারের, এই জন্য সোনার বিভিন্ন ধর্মাবলী, তাহা ভৌত বা রাসায়নিক যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে উহার অণুর ধর্ম। অতএব কোনও পদার্থের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে উহার অন্তর্নিহিত অণুর ধর্ম। রাসায়নিক অণু সম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞানীদের যে ধারণা, তাহার মূলে রহিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে জে এল. গেলুসাক ও এ অ্যাভাগাড্রোর গ্যাসীয় পদার্থ লইয়া গবেষণা।

অণুকে ভাঙিলে উহার মধ্যে ছোট ছোট কণিকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাহাদের পরমাণু বলে। যে বল কোনও অণুর পরমাণুগুলিকে ধরিয়া রাখে তাহাদের মান আন্তরাণবিক বলের মান অপেক্ষা অনেক বড়। 'অণু' কথাটি সাধারণতঃ বৈদ্যুতিকভাবে উদাসীন পরমাণুর সমষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন পরমাণুর সমষ্টিতে বৈদ্যুতিক আধান থাকে তখন উহাদের আয়ন বলা হয়।

কোনও পদার্থ যথার্থ নিরবচ্ছিন্ন নহে, উহাদের মধ্যে ফাঁক আছে। চাপ বাড়াইয়া বা শৈত্যপ্রয়োগে পদার্থের আয়তন কমিয়া যায়, ইহার অর্থ তখন উহাদের মধ্যস্থ ফাঁকগুলি ছোট হইয়া যায়। বিপরীত ভাবে, চাপ কমাইয়া বা তাপপ্রয়োগে পদার্থ আয়তনে প্রসারিত হয় বা অণুসমূহের মধ্যস্থ ফাঁকগুলি বাড়িয়া যায়। দুই অণুর মধ্যবর্তী এই স্থানকে আন্তরাণবিক স্থান বলা হয়। ইহার কল্পনা প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে উপরি-উক্ত ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা যায় না। সম্ভবতঃ আন্তরাণবিক স্থান ঈথার দ্বারা পূর্ণ। বাহ্য বলের প্রভাবে ঈথারের অবস্থান্তর ঘটে।

হিলিয়াম অণু কারবন অণু বোরন অণু
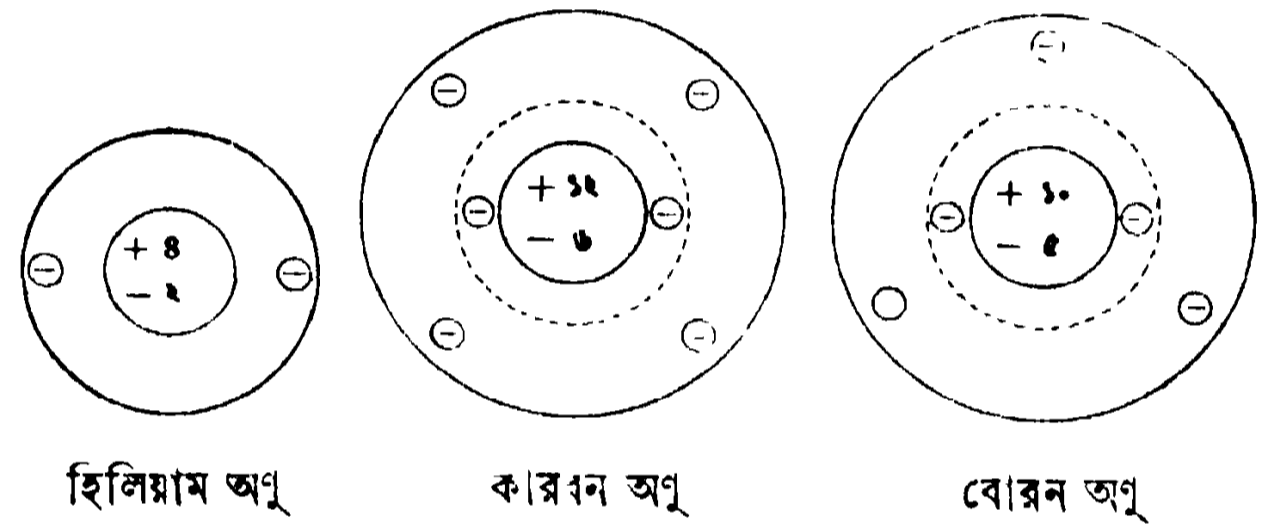
কোনও পদার্থের দুই অণুর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান কল্পনা করিয়াই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে ঐ শূন্যস্থানের মধ্যে অণুগুলি দ্রুত-কম্পনশীল। ফলে অণুগুলির মধ্যে সর্বদাই পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তাহা হইতেছে না বলিয়া পদার্থের অণুগুলি একটি বল দ্বারা পরস্পর বিধৃত থাকে। এই আকর্ষণী বলকে আন্তরাণবিক বল বলা হয়। কঠিন পদার্থে এই বল অত্যন্ত তীব্র, সেইজন্য ইহাদের অণুগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ় আকর্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। ইহার ফলেই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন সম্ভব হয়।

তরল পদার্থে আন্তরাণবিক আকর্ষণী বল অনুভবযোগ্য হইলেও অতি দুর্বল। ফলে ইহাদের অণুগুলি কিছু বিচ্ছিন্ন। ইহাদের নির্দিষ্ট আকার নাই। আধার-পাত্র যেরূপ, তরলের আকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে।

গ্যাসীয় পদার্থে অণুগুলি পরস্পর হইতে আরও

দূর-বিচ্ছিন্ন। সেইজন্য ইহাদের অণুগুলির যে কোনও দিকে যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে যাইবার প্রবণতা বেশি। ফলে যে কোনও গ্যাস সহজেই বহুদূরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। কোনও গ্যাসের ভৌত গুণাবলী একক আয়তনে অবস্থিত অণুসমূহের উপর, উহার ভরের উপর ও গড় গতিশক্তির উপর নির্ভর করে। রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে, উহাতে অবস্থিত পরমাণুর সংখ্যা এবং উহাদের সজ্জার উপর।

অলক চক্রবর্তী

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করিয়া দেখিবার যন্ত্রের নাম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। খালি চোখে কোনও বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণ দৃষ্টিক্ষমতা-যুক্ত কোনও ব্যক্তি চোখ হইতে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটার দূরের বস্তুকে খুব স্পষ্ট দেখিতে পায়। চোখ হইতে ১০ ইঞ্চির মধ্যবর্তী বস্তু আকারে বড় দেখাইলেও উহা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়— কারণ চোখের লেন্স তখন আর উহাকে ফোকাসে আনিয়া প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করিতে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বস্তুকে চোখের খুব নিকটে আনে এবং প্রতিবিম্বকেও চোখের লেন্সের ফোকাসে লইয়া আসে। প্রতিবিম্বটি আকারে বিবর্ধিতও হয়। ফলে বস্তুটি সহজেই দেখা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুই প্রকারের। ১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ২. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সাধারণ বিবর্ধক কাচ (magnifying glass) বস্তুতঃ একটি উত্তল লেন্স বা অভিসারী লেন্স অথবা অনেকগুলি লেন্সের সমন্বয়ে নির্মিত একটি অভিসারী লেন্সের দ্বারা গঠিত একটি সরল অণুবীক্ষণ।

ঠিক কবে অণুবীক্ষণের মূল নীতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা সকলেরই অজানা। কথিত আছে, প্রাচীনকালে চীন দেশে এবং ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বের সুসভ্য অঞ্চলে চশমা হিসাবে বিবর্ধক কাচ ব্যবহৃত হইত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাকেরিয়াস্ জানসেন নামে একজন ওলন্দাজ চশমা-নির্মাণকারী ৬ ফুট লম্বা এবং দুইটি লেন্সযুক্ত একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে এইরূপ অণুবীক্ষণ নির্মিত হয়, কিন্তু সেই সব যন্ত্র ছিল— গোলাপেরণ (spherical aberration) এবং বর্ণাপেরণ দোষে দুষ্ট (যে বিন্দুগুলি দিয়া আলোক রশ্মি গেলে স্পষ্ট প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে— সেই বিন্দু হইতে আলোর বিচ্যুতিকে অপেরণ বলে)।

কার্যপ্রণালী ক সাধারণ অনুবীক্ষণ একটি উত্তল লেন্স বা অভিসারী লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে কোনও বস্তু রাখিলে একই পার্শ্বে বস্তুটির বিবর্ধিত অলীকবিম্ব সৃষ্ট হয়। লেন্সের পিছনে চোখ রাখিলে বিম্বটি সহজেই দেখা যায়। লেন্স হইতে বস্তু-দূরত্ব ঠিক করিয়া বিম্বটিকে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে আনা হয়— কারণ তখনই বস্তুটির বিবর্ধন সর্বাপেক্ষা বেশি। ছোট লেখা বা পুঁথি পড়িবার সময়ে যে বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করি তাহা এই ধরনের।
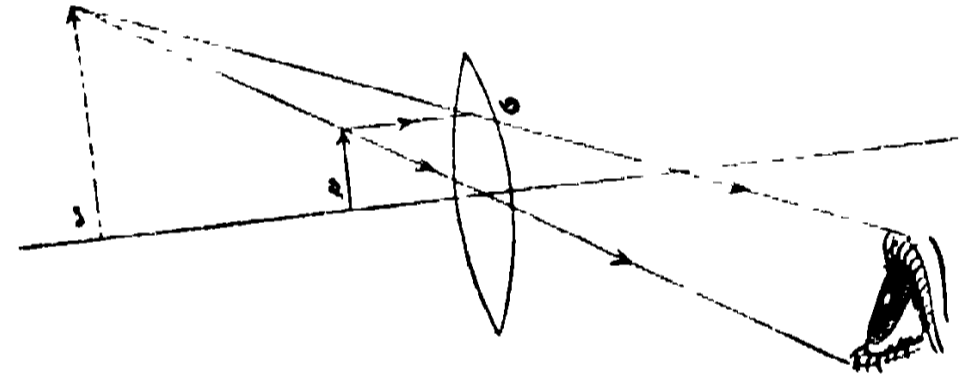
১. বিবর্ধিত অলীকবিম্ব ২. বস্তু
৩. অভিসারী লেন্স

খ. যৌগিক অণুবীক্ষণ— বস্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে যৌগিক অণুবীক্ষণের ব্যবহার সুবিধাজনক। কারণ এই যন্ত্রের বিবর্ধনক্ষমতা সরল অণুবীক্ষণ অপেক্ষা বেশি। ইহাতে কোনও ধাতব নলের দুই প্রান্তে দুইটি অভিসারী লেন্স সম-অক্ষীয় (co-axial) অবস্থায় নির্দিষ্ট দূরত্বে আবদ্ধ থাকে। উহাদের মধ্যকার দূরত্ব অবশ্য পরিবর্তন করা যায়। লেন্স দুইটির একটির নাম অবজেকটিভ বা অভিলক্ষ্য এবং অপরটি আই-পিস্ বা অভিনেত্র। অভিলক্ষ্য বা অবজেকটিভ কার্যতঃ কয়েকখানি লেন্স দ্বারা গঠিত স্বল্প ফোকাস-দূরত্বের একখানি অভিসারী লেন্স। ইহাকে

বস্তুর কিছু দূরে রাখা হয়। অভিনেত্র সাধারণতঃ দুই-খানা লেন্স দ্বারা গঠিত স্বল্প ফোকাস-দূরত্বের অভিসারী লেন্স। ইহাকে চোখের নিকটে রাখিতে হয়। অভিলক্ষ্য বা অবজেকটিভ তাহার সম্মুখে ঠিক ফোকাস-দূরত্বের বাহিরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর একটি বাস্তব, বিবর্ধিত ও অবশীর্ষ (inverted) বিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিবিম্বটি অভিলক্ষ্যের বিপরীত দিকে অভিনেত্রের ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে গঠিত হয় এবং ইহা অভিনেত্রের সম্মুখে বস্তুর কাজ করে। সুতরাং লেন্সের বিপরীত দিকে চোখ রাখিলে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে অলীক, বিবর্ধিত এবং সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। ফলে, শেষ প্রতিবিম্ব লক্ষ্যসাপেক্ষে অবশীর্ষ হয়।
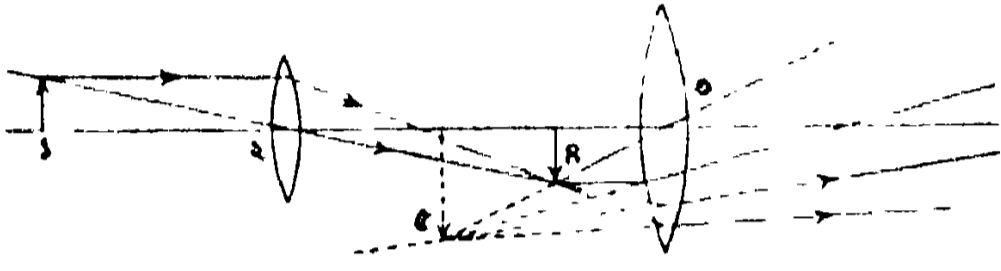
১. বস্তু ২. অভিলক্ষ্য ৩. অভিনেত্র
৪. অভিলক্ষ্যের দ্বারা গঠিত বিম্ব ৫. অভিনেত্র দ্বারা গঠিত বিবর্ধিত বিম্ব

বিবর্ধনক্ষমতা— কোনও বস্তুর আপাত আকার— বস্তু-দর্শকের চক্ষুতে যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ উহার রৈখিক আকার এবং চোখ হইতে দূরত্বের উপর নির্ভর করে। কাজেই বস্তু যত চোখের নিকটে, আপাত আকার ততই বড় হয়। কিন্তু স্পষ্ট দর্শনের জন্য বস্তুকে খুব চোখের নিকটে না আনিয়া স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে রাখিতে হয়। বস্তু ও বিম্বের দৃষ্টিকোণের উপর বস্তুর আপাত আকার কতটা হইবে, তাহা নির্ভর করে। বস্তুকে লেন্সের সাহায্যে বড় করিবার ক্ষমতাকে বিবর্ধনক্ষমতা বলা হয়। অণুবীক্ষণের বিবর্ধনক্ষমতা লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ফোকাস-দূরত্ব কম হইলে বিবর্ধন বেশি হইবে।

বিশ্লেষণক্ষমতা— যে ক্ষমতাদ্বারা কোনও আলোক-যন্ত্র দুইটি পরস্পর-নিকটবর্তী বস্তুর একটির বিম্বকে অপরটির বিম্বের সহিত না মিশাইয়া উভয়কেই স্পষ্ট দর্শনে সাহায্য করে তাহাকে ঐ যন্ত্রের বিশ্লেষণক্ষমতা (resolving power) বলে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলট্রা-অণুবীক্ষণ, ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহাদের কার্যপ্রণালী ও সাধারণ বা যৌগিক অণুবীক্ষণের মত, তবে ইহাদের ব্যবহারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা বহুগুণ বিবর্ধিত হইয়া সহজেই দর্শকের চোখে দৃশ্যমান হয়।

নেপাল চক্রবর্তী

অণ্ড ডিম দ্র

অণ্ডকোষ শুক্রাশয় পুরুষের মুখ্য জননাঙ্গ (sex-organ)। ইহা শুক্রাণু (spermatozoa) উৎপাদন করে। এই শুক্রাণুগুলি সংগমকালে শুক্রস্থলী (seminal vesicle) ও প্রোস্টেট গ্রন্থির রসের সহিত মিশিয়া লিঙ্গপথে বাহির হইয়া আসে; এই মিশ্রণকেই শুক্র বলা হয়। শুক্রাণু উৎপাদন ব্যতীত শুক্রাশয় রক্তে টেস্টোস্টেরোন নামক একটি পুং-যৌন হর্মোন ক্ষরণ করে। এই হর্মোনটিই শুক্রস্থলী, প্রোস্টেট প্রভৃতি পুংজননাঙ্গগুলির উপযুক্ত বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কার্য-শক্তির মূল কারণ। এই হর্মোনের অভাবে ঐ সকল অঙ্গের বৃদ্ধি ও কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ক্লীবত্ব পর্যন্ত ঘটিতে পারে। পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রভৃতি পুং-দেহের বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও এই হর্মোনটির প্রভাবেই বিকশিত হয়। পুরুষের যৌনবোধ ও ব্যক্তিত্বও ইহার উপর নির্ভর করে।

শুক্রাণু উৎপাদন ও পুং-যৌন হর্মোনের ক্ষরণ— শুক্রাশয়ের এই দুইটি কার্যই পিটুইটারি গ্রন্থির দুইটি হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দেবজ্যোতি দাশ

অণ্ডাল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় কয়লাখনি অঞ্চলে রানীগঞ্জের প্রায় ১৬ কিলোমিটার বা ১০ মাইল পূর্বে পূর্ব-রেলপথের উল্লেখযোগ্য জংশন; বিভিন্ন-স্থানে কয়লা প্রেরণের জন্য এই স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বড় রেল-ইয়ার্ড আছে। অণ্ডাল হইতে পূর্ব-রেলপথের দুইটি শাখা লাইন বাহির হইয়াছে। একটির দ্বারা রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের উত্তরাংশের সহিত ও অন্যটির দ্বারা বীরভূম জেলার সিউড়ি ও সাঁইথিয়ার সহিত অণ্ডালের যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। কয়লাখনি ব্যতীত সিমেন্ট ও চীনামাটির বাসনের কারখানা, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ভাটিখানা ইত্যাদিও এখানে আছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী অণ্ডাল থানার লোকসংখ্যা ৮৬০০৮।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অতিপ্রজতা জনসংখ্যা দ্র

অতিবেগুনী রশ্মি আলোক বর্ণালীর যে অংশ চোখে

প্রবেশ করিলে দর্শনের অনুভূতি জন্মায় তাহাকে দৃশ্যমান বর্ণালী (visible spectrum) বলে। ইহার একপ্রান্তে বেগুনী আলো, তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ অ্যাংস্ট্রম (এক অ্যাংস্ট্রম = $১০^{-৮}$ সেণ্টিমিটার) অন্য প্রান্তে লাল আলো, তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০০ অ্যাংস্ট্রম। বর্ণালীকে যদি একটি ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ফেলিয়া ছবি তোলা হয় তবে লক্ষ্য করা যাইবে বর্ণালীর যে অংশে কোনও আলো চোখে দেখা যায় নাই সেখানেও প্লেটটি কালো হইয়াছে। ইহাতে বেগুনী হইতে লাল এই সীমার বাহিরে অদৃশ্য আলোকরশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বর্ণালীতে বেগুনী আলোর বাহিরে যে অদৃশ্য আলো তাহাকেই অতিবেগুনী রশ্মি বলা হয়। ইহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০০ অ্যাংস্ট্রম অপেক্ষা কম। অতিবেগুনী রশ্মি সহজেই কাচ, বাতাস প্রভৃতি দ্বারা শোষিত হয়। সূর্যের আলোতে যে পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি আছে তাহার বেশির ভাগ বাতাস শোষণ করে। ৩০০০ অ্যাংস্ট্রমের ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছায় না। সর্বপ্রকার আলোক-উৎস হইতেই কমবেশি অতিবেগুনী রশ্মি পাওয়া যায়। বেশি পরিমাণে এই আলো সৃষ্টির জন্য মার্কারি ভেপার ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কাচের পরিবর্তে এই ল্যাম্পে কোয়ার্ট্‌জ্‌ বা সিলিকা ব্যবহার করিলে শোষণের পরিমাণ কম হয়। কোনও কোনও বস্তু (যেমন কুইনাইনের দ্রবণ) অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করিয়া দৃশ্য আলোক (visible light) বিকিরণ করে। ইহাকে ফ্লুরেসেন্স বলা হয়। ফ্লুরেসেণ্ট টিউবে অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করিয়া দৃশ্য আলো সৃষ্টির জন্য টিউবের গায়ে ফ্লুরেসেণ্ট পাউডার লাগানো থাকে। অতিবেগুনী রশ্মি চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইজন্য ওয়েলডিং প্রভৃতি কাজে চোখে রঙিন চশমা ব্যবহার করিতে হয়। অতিবেগুনী রশ্মি জীবাণুনাশক। ইহার দ্বারা জল জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই রশ্মি চামড়ার উপর বাদামী রঙ সৃষ্টি করে। এইজন্য সূর্যের আলোয় দেহের রঙ পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় ঘা শুকাইবার জন্য অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করা হয়। অধিক পরিমাণে ও অত্যন্ত ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। চর্বিজাতীয় বস্তুর উপর অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করিলে ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়। এইজন্য তৈলাক্ত দেহে সূর্যস্নান উপকারী। অতিবেগুনী রশ্মিতে ফ্লুরেসেন্স লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় খাদ্যে ভেজাল ধরা যায় এবং আসল ও নকল পাথরের প্রভেদ নির্ণয় করা হয়। 'আলোক' দ্র।

শ্যামল সেনগুপ্ত

অতীশদীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতী পরম্পরানুসারে অতীশ (১১শ শতাব্দী) বিক্রমণীপুররাজ কল্যাণশ্রীর পুত্র। বিক্রমণীপুরকে সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর রাজ্য বলিয়া মনে করা হয়। অতীশ প্রথমে মাতার নিকট এবং পরে ভারতের বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে, সুবর্ণদ্বীপে এবং সিংহলে অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিক্রমশীলামহাবিহারে একান্নজন আচার্য এবং একশত আটটি মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের ঐকান্তিক আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারার্থ তিনি ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টায় ভোট দেশে আদিম ধর্ম পরিত্যক্ত এবং বৌদ্ধধর্মাচার পরিগৃহীত হয়। বৌদ্ধ ক-দম্‌ (পরবর্তী নাম গে-লুক্‌) সম্প্রদায় অতীশই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন এবং স্বয়ং 'রত্ন-করণ্ডোদ্‌ঘাট', 'বোধিপাঠপ্রদীপ', 'বোধিপাঠপ্রদীপপঞ্জিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সম্রাট নয়পালের উদ্দেশ্যে বিমলরত্নলেখ নামক পত্র রচনা করেন। তাঁহার মূল সংস্কৃত রচনাগুলি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। তিব্বতী ভাষায় উহাদের অনুবাদ পাওয়া যায়। অতীশ তিব্বতে বুদ্ধের অবতার-রূপে পূজিত হন। লাসার নিকটে তাঁহার সমাধিস্থান তিব্বতের অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভারতে অবস্থানকালে অতীশ সম্রাট নয়পাল এবং পশ্চিমদেশীয় কর্ণ (কনোজ ?) -রাজের বিবাদে মধ্যস্থতা করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

অনন্তলাল ঠাকুর

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কলিকাতার সিমুলিয়ানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত। নিত্যানন্দপ্রভুর বংশে ইহার জন্ম। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহযোগিতায় ইনি শ্রীরূপের লঘু-ভাগবতামৃতের একটি সটীক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু পুঁথি মিলাইয়া একটি টীকা-টিপ্পনীযুক্ত প্রামাণিক সংস্করণও প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থ বিদ্বজ্জনের গবেষণার উপযোগী করিয়া সম্পাদনা করিবার কার্যে ইনিই পথ-প্রদর্শক। রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ করিয়া ইনি কবি-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত ঈশ্বর পুরীর জীবনী ও 'ভক্তের জয়' গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল।

বিমানবিহারী মজুমদার

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২ খ্রী) অতুলকৃষ্ণ কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্রবংশীয় রাজকৃষ্ণ মিত্রের পুত্র।

তিনি বাল্যকালেই পিতৃহীন হন এবং মাতুলের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। অল্প বয়সেই তিনি নাট্যকলা এবং অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য এমারেল্ড থিয়েটারের সহিত যুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি নিয়মিত নাটক লিখিতে থাকেন এবং জীবনের শেষকাল পর্যন্ত প্রায় ৪০খানি নাটক লেখেন। এই নাটকগুলির মধ্যে 'নন্দবিদায়' (১৮৮৮ খ্রী), 'লুলিয়া' (১৯০৭ খ্রী), 'ঠিকে ভুল' (১৯১০ খ্রী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপেরাধর্মী নাটক রচনায় এবং বিশেষ করিয়া দ্বৈতসংগীত রচনায় অতুলকৃষ্ণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

প্রবোধকুমার দাস

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১ খ্রী) রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে আদি নিবাস ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল হইতে রংপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত অতুলচন্দ্র রংপুর জিলা স্কুলেই পড়াশুনা করেন। অতঃপর কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরেজী ও দর্শন বিষয়ে অনার্স লইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন। তিনি ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতেই তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অতুলচন্দ্র রংপুরেই আইন ব্যবসায় করিতে থাকেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। সেই সঙ্গে ১৯১৮-২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান ল এবং জুরিসপ্রুডেন্স -এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় দশ বৎসর পর অধ্যাপনা ছাড়িয়া তিনি আইন ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন এবং বিপুল সাফল্য লাভ করেন।

অতুলচন্দ্র বিভিন্নমুখী মনীষার অধিকারী ছিলেন। রংপুরে তাঁহার শিক্ষকস্থানীয় দেশকর্মী নগেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে গভীর দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরে সারা জীবনই তিনি নানা রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অতুলচন্দ্র এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন তিনি কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে আন্দোলনে যোগ দেন। এম. এ. পাশ করার পর কিছুকাল তিনি রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়াও স্বাধীন বিচারবোধ দ্বারাই চালিত হইয়াছেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের সময় 'ব্যাগে ট্রাইবুনাল'-এ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বক্তব্য প্রস্তুত করিবার ভার অতুলচন্দ্রের উপরেই পড়িয়াছিল। শোনা যায়, তাঁহার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করে নাই।

অতুলচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যসেবা খুব বিস্তৃত না হইলেও অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরী -সম্পাদিত সবুজপত্রে প্রবন্ধকাররূপে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। প্রমথ চৌধুরীর তিনি একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন। ভারতীয় রসতত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যাতারূপে পরবর্তী কালে সুপরিচিত হইলেও সমাজ শিক্ষা ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রী) প্রকাশিত 'শিক্ষা ও সভ্যতা' অতুলচন্দ্রের এগারোটি প্রবন্ধের প্রথম সংগ্রহ। অতঃপর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৩৩৫), 'নদীপথে' (১৩৪৪), 'জমির মালিক' (১৩৫১), 'সমাজ ও বিবাহ' (১৩৫৩), 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৩৬৪) প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত বইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা' রূপে লিখিত। এতদ্ব্যতীত 'পত্রাবলী—ধর্ম ও বিজ্ঞান' নামে আর একখানি গ্রন্থ দিলীপকুমার রায়, বীরবল এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের যুক্তনামে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ট্রেডিং উইথ দি এনিমি' (Trading With the Enemy) নামে একটি গবেষণা নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'অনাথনাথ দেব পুরস্কার' লাভ করেন। পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এল. উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯৫৭ খ্রী)।

অতুলচন্দ্রের রচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও বৈদগ্ধ্য ও দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে বাংলা মনন-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সম্পদ বলিয়া সেইগুলি সমাদৃত।

ভবতোষ দত্ত

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রী) জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৭১, ঢাকা; মৃত্যু ২৬ আগস্ট ১৯৩৪, লক্ষ্ণৌ। পিতা রামপ্রসাদ সেনের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার মগর গ্রামে। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঢাকায় চিকিৎসকরূপে ইহার খ্যাতি হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ

বাল্যেই পিতৃহীন হইয়া মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের স্নেহে বর্ধিত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া অতুলপ্রসাদ বিলাত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কলিকাতায় ও রংপুরে কিছুকাল আইন-ব্যবসায় করিবার পর তিনি লক্ষ্ণৌ শহর নিজ কর্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন। এইখানে তিনি ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের মধ্যে আসন লাভ করেন; আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মাতামহ কালীনারায়ণ ভগবদ্‌ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও সহজ ভক্তিসংগীত রচয়িতারূপে খ্যাত ছিলেন; অতুলপ্রসাদ মাতামহের এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন— অল্প বয়সেই তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন ('তোমারি যতনে তোমারি উদ্যানে') এখনও তাহা 'ব্রহ্মসংগীত'-ভুক্ত থাকিয়া গীত হইয়া থাকে। নানাকর্মব্যস্ত বেদনাহত জীবনে এই সংগীতরচনাই চিরদিন তাঁহার মনের এক প্রধান আশ্রয় ছিল। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা বহু নহে, দুইশতের কিছু অধিক; কিন্তু ইহারই সুর ও ভাব -বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরাধীনতার বেদনায় রচিত তাঁহার গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে', 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর' প্রভৃতির জনপ্রিয়তা স্বাধীন ভারতেও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার ভগবৎসংগীত, প্রকৃতি ও প্রেম-গাথা, সর্বত্রই যে গভীর বেদনার মধ্যেই ভক্তি ও প্রেমের আস্পদের প্রতি একান্ত আত্মনিবেদন ও নির্ভর কথার ঋজুতায় ও সুরের বৈচিত্র্যে মূর্ত হইয়াছে, তাহারই ফলে তাঁহার রচিত গান দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী শ্রোতার মর্মস্পর্শী হইয়া আছে। বাংলা কাব্যগীতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ না করিয়াও তিনি তাহাতে হিন্দুস্থানী সংগীতের সুর ও বিশিষ্ট ঢঙের সার্থক যোজনা করিয়াছেন; বাউল ও কীর্তনের সুরের যোগসাধন করিয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাতে হিন্দুস্থানী ঢঙেরও সংযোজন করিয়া তিনি বাংলা গানে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১ খ্রী) গ্রন্থে সংকলিত হয়; তৎপূর্বে 'কয়েকটি গান' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কাকলি' গ্রন্থমালায় এ সকল গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতেছে।

অন্তর্মুখী এবং ভগবৎমুখী গীতিরচয়িতা অতুলপ্রসাদ বহির্জীবনেও স্বীয় প্রতিভার চিহ্ন নানাভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। গত শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল বাঙালী বিভিন্ন প্রদেশকে নিজ কর্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া জনসেবার যোগে তত্তৎপ্রদেশবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক হইয়াও, চিরদিন বাংলা ভাষার সেবা ও জন্মভূমির স্মৃতি অন্তরে বহন করিয়াও, বঙ্গেতর প্রদেশে তিনি নিজেকে কখনও প্রবাসী বলিয়া মনে করেন নাই— "নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলবে?…এ দেশও আমাদের দেশ," আর এই দেশের কল্যাণকর্মে তিনি শ্রম অর্থ ও প্রীতি অকুণ্ঠভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশ, বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার সহিত তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়াছিলেন; লক্ষ্ণৌ শহরের যে রাজপথে তিনি গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করিতেন, তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার নামে সেই রাজপথ সরকারি ভাবে চিহ্নিত হইয়াছিল; দীনদুঃখীকে উদারহস্তে দান করিয়া, সার্বজনিক নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মভার গ্রহণ করিয়া তিনি সর্বসাধারণের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন মৃত্যুর পর তাহার স্মরণে তাঁহার গুণানুরাগীগণ লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, তথায় তাঁহার স্মরণে একটি 'হল' চিহ্নিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গোখলের অনুবর্তীরূপে তিনি কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন, পরে লিবারাল ফেডারেশন বা উদারনীতিক সংঘভুক্ত হন ও ইহার বার্ষিক সম্মিলনে সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবাসী (বর্তমানে নিখিল-ভারত) বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ইহার অন্যতম প্রধান ছিলেন; সম্মিলনের মুখপত্র 'উত্তরা'র তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনে তিনি সভানেতৃত্ব করেন। তাঁহার উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ জীবিতকালেই লোকসেবায় ব্যয়িত হইয়াছিল; অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ, তাঁহার আবাসগৃহ এবং গ্রন্থস্বত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন।

দ্র দিলীপকুমার রায়, 'অতুলপ্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গীত', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩১; উত্তরা, আশ্বিন ১৩৪১ 'অতুলসংখ্যা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী; রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'অতুলপ্রসাদ', 'বাংলার গীতকার' গ্রন্থ।

পুলিনবিহারী সেন

অত্রি[১] ব্রহ্মার মানসপুত্র। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গোত্রপ্রবর্তকগণের অন্যতম, সংহিতাকার। অথর্ববেদে ইঁহার প্রাধান্য দেখা যায়। কুল বা গোত্র -প্রতিষ্ঠাতা অত্রি প্রাচীনতম ঋষিগণের সমসাময়িক বলিয়া পরিগণিত হইলেও পৌরাণিক কাল পর্যন্ত এই বংশের প্রভাকর ব্যতীত অন্য কাহারও নাম পাওয়া যায় না। পুরুবংশীয় রাজা ভদ্রাশ্ব বা রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যাকে প্রভাকর বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহের দশ পুত্র হইতে আত্রেয়গণের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তীকালে আত্রেয়গণ অর্ণবপোতনির্মাণে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে ভার্গব-বংশীয়গণের সহিত বিরোধকালে হৈহয়-রাজ কার্তবীর্যার্জুন দত্ত আত্রেয়কে তুষ্ট করিয়া আত্রেয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্র R. C. Majumdar. ed. *The History and Culture of the Indian People—The Vedic Age,* London, 1951.

অত্রি[২] ব্রহ্মার চক্ষু হইতে উৎপন্ন, সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। দক্ষের কন্যা অনসূয়া ইঁহার স্ত্রী। পুত্রলাভার্থে স্ত্রীর সহিত ইনি তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া বিষ্ণু দত্তাত্রেয়, শিব দুর্বাসা এবং ব্রহ্মা সোম নামক তিন পুত্র দান করেন। অন্যমতে ইনি দশপ্রজাপতির অন্যতম। বনবাসকালে রামচন্দ্র ইঁহার আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

অত্রি[৩] অত্রি হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব হইয়াছিল।

অথর্বা অথর্বন্ শব্দটি প্রাচীন কাল হইতে ইরানে ও ভারতবর্ষে প্রায় সমান অর্থে চলিত আছে। উভয় দেশের ধর্মগ্রন্থেই অগ্নিপূজা ও পৌরোহিত্যকর্মের সহিত অথর্বার সম্পর্ক দেখা যায়। অথর্বা ঋষি সর্বপ্রথম অগ্নিমন্থন করেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। অথর্বার পুত্র দধ্যঞ্চ্ (দধীচি) অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। বৈদিক 'অথর্যু' শব্দের অর্থ অর্চিষ্মান্ অগ্নি। অথর্বপরিবারের পুরোহিতগণ যজমানের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইতেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে অথর্বগণের খ্যাতি ছিল। অন্য দিকে জরথুস্ত্র ধর্মের অগ্নিপূজক পুরোহিতেরা 'আথর্বন' (বর্তমানকালে 'অথোর্না') নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অথর্বা ঋষি অঙ্গিরার সহযোগে অথর্ববেদের সংকলন করেন। সেইজন্য অথর্ববেদীয় মন্ত্রগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— 'আথর্বণ' ও 'আঙ্গিরস'। আথর্বণ মন্ত্রের বিনিয়োগ হয় ভৈষজ্যাদি শান্ত কর্মে আর আঙ্গিরস মন্ত্রের প্রয়োগ হয় অভিচারাদি ঘোর কর্মে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

অথর্ববেদ অথর্বা ঋষির নামে প্রসিদ্ধ অথর্ববেদকে আঙ্গিরস বেদ, অথর্বাঙ্গিরস বেদ এবং ভৃগ্বঙ্গিরো বেদও বলা হয়। অথর্বা অঙ্গিরাঃ ও ভৃগু ছিলেন বেদমন্ত্রের প্রখ্যাত দ্রষ্টা এবং বিশিষ্ট সংকলয়িতা। ইঁহাদের নামেই চতুর্থ বেদের পরিচয়। অপর তিন বেদের পরিচয় অন্যরূপ। ঋক্, যজুঃ ও সাম— পদ্য, গদ্য ও গীতি এই ত্রিবিধ মন্ত্রের মধ্যে যেরূপ মন্ত্রের সংকলন যে বেদে অধিক, তদনুসারে সেই বেদের নামকরণ হইয়াছিল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ। চতুর্থ বেদে তিন প্রকার মন্ত্রই স্থান পাইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রপ্রকৃতির উল্লেখ করিয়া এই বেদের স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। সেইজন্য ইহা মন্ত্রসংকলয়িতাদের নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

নানা গ্রন্থে অথর্ববেদের বহু শাখার নাম পাওয়া যায়। পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবেদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য এই নয়টি শাখা অধিক প্রসিদ্ধ। বৈদিক চরণপর্ষদের প্রধান প্রধান ঋষিদের নাম অনুসারে একই অথর্ববেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রবর্তন হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শাখার মন্ত্রসংহিতা ও কল্পসূত্রের মধ্যে অল্পবিস্তর পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথর্ববেদের বহু শাখা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নানা-গ্রন্থের উক্তি ও উদ্ধৃতি উহাদের পুরাকালিক অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। শৌনক-শাখার মন্ত্রসংহিতা ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। পৈপ্পলাদসংহিতারও মূল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। শৌনকসংহিতা এবং শৌনক-শাখার গোপথ-ব্রাহ্মণ, বৈতানসূত্র, কৌশিকসূত্র, অথর্বপরিশিষ্ট ও পদ্ধতিগ্রন্থ হইতে শৌনকীয় অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর বিবরণ পাওয়া যায়। মূল বিষয়ে শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার লক্ষ্য অভিন্ন।

বিশকাণ্ডে বিভক্ত শৌনক সংহিতার সাতশত ত্রিশটি সূক্তে প্রায় ছয় হাজার মন্ত্র সংকলিত আছে। অন্তিম কাণ্ডের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অপর কাণ্ডগুলিরও অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের সঙ্গে এক। সমগ্র মন্ত্র-সংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ এইরূপ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ কাণ্ড গদ্যময়। অথর্বমন্ত্রের প্রাচীন অনুক্রমণী পঞ্চপটলিকায় এবং অথর্বপ্রাতিশাখ্যে ঊনবিংশ ও বিংশ কাণ্ডের কোনও মন্ত্রের উদ্ধৃতি না থাকায় এই দুইটি কাণ্ড মূল গ্রন্থের খিল বা পরিশিষ্ট রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ঋগ্‌বেদের পরে অথর্ববেদ সংকলিত হইয়াছিল। কিন্তু সংকলিত মন্ত্রগুলি যে সবই ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা অর্বাচীন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে ভাষার তারতম্যগত প্রমাণ পৌর্বাপর্যনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

অথর্ববেদের বহু মন্ত্রেরই মুখ্য বিনিয়োগ গৃহ্যকর্মে, শ্রৌতযজ্ঞে উপযোগিতা নাই বলিলেই চলে। এই বেদের স্বার্থকেন্দ্রিক মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের সহজাত আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'শান্ত' ও 'ঘোর' এই দুই প্রকার কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবতা ওষধি প্রভৃতির আবাহন ও প্রসাদন অথর্বমন্ত্রের লক্ষ্য। অর্থলাভ, রোগনাশ, রাষ্ট্রিক সমৃদ্ধি, পারিবারিক সম্প্রীতি, ভূতনিবারণ প্রভৃতি শান্তকর্ম। এইগুলি শান্তিক-পৌষ্টিকের অন্তর্গত আভ্যুদয়িক কৃত্য। শত্রুবিনাশ, পর-রাষ্ট্রেরউৎসাদন, প্রতিপক্ষপীড়ন, বশীকরণ, ভূতাবেশন প্রভৃতি ঘোর কর্ম। এইগুলি যাতুবিদ্যার অন্তর্গত আভিচারিক কৃত্য। 'কৃত্যাপ্রতিহরণ' নামে আরও এক শ্রেণীর মন্ত্র পাওয়া যায়। উহার বিনিয়োগ হয় শত্রুকৃত অভিচারের প্রতিষেধকল্পে। 'আঙ্গিরসকল্পে' দশ প্রকার আথর্বণিক কর্মের উল্লেখ আছে— শান্তিক, পৌষ্টিক, বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, দ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ, আকর্ষণ ও বিদ্রাবণ। আথর্বণিক দশকর্মের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মের বেশ মিল দেখা যায়। এই সকল আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক কর্মের উপযোগী মন্ত্র অন্য বেদে অল্প, অথর্ববেদে অধিক। ইহা ছাড়া বিবাহ, গর্ভাধান, পিতৃমেধ প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠেয় কর্মের মন্ত্রও এই বেদে আছে।

সাধারণ লোকের প্রয়োজনে সংকলিত অথর্ববেদ নানা-দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বেদের ভূমিসূক্তে (১২.১) বৈদিক ঋষি বসুন্ধরাকে সর্বপ্রথম জননী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন— 'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ'। এই বেদের আয়ুষ্য মন্ত্র ও ভৈষজ্য মন্ত্রে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রথম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে যে নানারূপ ওষধির নাম এবং বিভিন্ন শারীর সংস্থানের উল্লেখ আছে তাহাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি বলিয়া স্বীকৃত। অথর্ববেদের 'রাজকর্ম' পর্যায়ের মন্ত্রপ্রকরণে রাজার নির্বাচন, অভিষেক ও গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু গভীরার্থ উক্তি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে এই বেদের বিভিন্ন প্রকরণের মন্ত্রসমূহ লৌকিক ও ঐহিক বিষয়ে বেদাধ্যায়ীর আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অপর দিকে অথর্ববেদে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যাও কম নয়। এক পরম তত্ত্বেই যে বিশ্বের 'প্রতিষ্ঠা' তাহা এই বেদের নানা মন্ত্রে বারংবার ঘোষিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী, বেন, স্কম্ভ, অনড্বান, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, পার্ষ্ণি, সলিল প্রভৃতি বিষয়ে অথর্ববেদের সূক্তগুলি সৃষ্টিরহস্য ও আত্মতত্ত্বের গুরুত্বময় ভাবনা বলিয়া বিবেচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাত্যকাণ্ডের (পঞ্চদশ কাণ্ড) ব্রাত্যগণকে অনেকে নিগূঢ় অধ্যাত্মরহস্যের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অথর্ববেদের এক নাম ব্রহ্মবেদ। গোপথব্রাহ্মণে নির্দেশ আছে যে, ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক্ অথর্ববিদ্যায় পারঙ্গম হইবেন। তদনুসারে ব্রহ্মার সহিত সম্পর্ক হেতু ব্রহ্মবেদ সংজ্ঞাটির উৎপত্তি হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ অভিচার মন্ত্র, অপর অর্থ বিশ্বের মূল তত্ত্ব। এই উভয়রূপ ব্রহ্মই অথর্ববেদের প্রতিপাদ্য। সুতরাং সকল প্রকারেই অথর্ববেদ ব্রহ্মবেদ। বস্তুতঃ এই বেদে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক মন্ত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের একটা নিবিড় সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই দিক দিয়া অথর্ববেদ একাধারে ঐহিক ও পারমার্থিক ঋদ্ধির অনুকূল। আঙ্গিরস-কল্পের মতে এই বেদে সংসারীর ভোগ এবং সন্ন্যাসীর মোক্ষ এই উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়— যত্রহি রাগিণাং ভুক্তির্যত্র মুক্তিররাগিণাম্।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

অদিতি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী। সবিতা, বিষ্ণু, সূর্য, ত্বষ্টা, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, রুদ্র, পূষা, মিত্র, বিবস্বান্ এবং ভগ — এই দ্বাদশ দেবতার মাতা বলিয়া ইনি দেবমাতা নামে খ্যাতা। ইন্দ্র ইঁহাকে সমুদ্রমন্থনলব্ধ কুণ্ডল দান করেন। পারিজাত লাভের জন্য ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যে বিবাদ হয় অদিতি তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। ইঁহার ভগ্নী দিতি হইতে দৈত্যকুলের জন্ম হয়।

অদ্ভুত রামায়ণ বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণের অর্বাচীন পরিশিষ্ট। ইহার অন্য নাম 'অদ্ভুতোত্তর কাণ্ড'। ভরদ্বাজ মুনির নিকট ইহা বাল্মীকি-কর্তৃক কথিত। অধ্যায় সংখ্যা ২৭, শ্লোক সংখ্যা ১৩৫৯। এই গ্রন্থে সীতাকে রাবণের রানী মন্দোদরীর কন্যা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সীতা মূল প্রকৃতি বা শক্তি রূপে বর্ণিতা। পুষ্কর দ্বীপে সহস্রস্কন্ধ রাবণের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র মূর্ছিত হইয়া পড়িলে, সীতা প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ বধ করেন। সীতার মহিমা, সহস্রনাম স্তোত্র ও অন্যান্য বহু বিষয়ের সহিত এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত -সম্মত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানও বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কাশ্মীরের শাক্ত সমাজে সমাদৃত।

দ্র M. Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. I, Calcutta, 1927.

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অদ্ভুতাচার্য অদ্ভুত রামায়ণ নামক বাংলা রামায়ণগ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। ইনি ষোড়শ শতকের শেষভাগে পাবনা জেলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এক সময়ে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে এই রামায়ণ প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত রামায়ণে অদ্ভুত রামায়ণের অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অদ্বয়বজ্র আচার্য অদ্বয়বজ্র ছিলেন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য। তাঁহার আর এক নাম ছিল 'অবধূতী-পা'। আচার্য অদ্বয়বজ্র বাঙালী ছিলেন। উত্তরবঙ্গের দেবী-কোটবিহারের সহিত তাঁহার নাম জড়িত আছে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ অদ্বয়বজ্রকে রাজা মহীপাল, দীপংকর, নরো-পা প্রভৃতির সমসাময়িক বলিয়াছেন। বজ্রযানের বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার একুশটি রচনা 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রণয়ন ছাড়া তিনি কিছু কিছু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দ্র *Advayavajra Samgraha*, Baroda, 1927 ; B. Bhattacharya, *Sadhanamala*, Baroda, 1928 ; Schiefner, *Geschichte des Buddhismus*, St. Petersburg, 1869.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্বৈতচরণ আঢ্য (১৮১৩-১৮৭৩ খ্রী) কলিকাতা আমড়াতলা আঢ্য বংশে জন্ম। অদ্বৈতচরণ ফোর্ট উইলিয়ম অস্ত্রাগারের (arsenal) হিসাব রক্ষক ছিলেন। ইহা ব্যতীত ইনি ব্যবসায়ী ও সাহিত্যামোদী ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়চাঁদ আঢ্য বিদেশে গমন করিলে 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও ৩৩ বর্ষকাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন।

দ্র সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪২।

অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী (১৮৩৫-১৯২৯ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কীর্তনগায়ক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে কীর্তন-শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং বহু স্থান হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা করিয়া মনোহরসাহী কীর্তনে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় হরিনামামৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন। ৭৬ বছর বয়সে ইনি নব্যন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপে আসেন ও তিন বৎসর ধরিয়া আশুতোষ তর্কভূষণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান।

বিমানবিহারী মজুমদার

অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই ইনি ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পরম গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম। পরে শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করেন। নবদ্বীপেও ইঁহার একটি বাড়ি ছিল। নবদ্বীপের ভক্তদের ইনিই প্রধান অবলম্বন ছিলেন।

নিমাই গয়া হইতে ভাবসম্পদ লইয়া ফিরিয়া আসিবার কয়েকমাস পরে ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তখন প্রবীণ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্যই সর্বপ্রথম বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সচন্দন তুলসীপত্র দিয়া প্রণাম করেন।

অদ্বৈতের দুই স্ত্রী— শ্রী ও সীতা। সীতাদেবীর গর্ভে পাঁচটি (অথবা ছয়টি) পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম অচ্যুত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম ও জগদীশ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কোনও কোনও পুঁথিতে এবং অদ্বৈতবিলাস গ্রন্থে স্বরূপ নামে আর একটি পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে অচ্যুত বাল্যকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন।

অদ্বৈতপ্রভু পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে ভক্তগণের দ্বারা স্বরচিত স্তব কীর্তন করান।

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে আসেন তখন অদ্বৈত আচার্য বিদ্যাপতির পদ গাহিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতপ্রভু লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। তাই যবন হরিদাসকে তিনি শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। আত্মমহিমা প্রচারেও তিনি বীতস্পৃহ ছিলেন। একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের পরিবর্তে তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলে অদ্বৈত আচার্য তাহাদিগকে উৎসাহ দেন নাই।

পরবর্তীকালে 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'বাল্যলীলাসূত্র', 'অদ্বৈত-

মঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রামাণিক নহে।

বিমানবিহারী মজুমদার

অদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ উপনিষদে বর্ণিত জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান দার্শনিক মত। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রধান প্রধান উপনিষদের মতে সমগ্র বাহ্যিক জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি স্থির শাশ্বত মূলতত্ত্ব রহিয়াছে। এই তত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, নিত্য ধ্রুব শাশ্বত হইলেও স্বীয় বিশেষ শক্তি দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ সৃষ্টি পূর্বক স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সত্তার আভাস দান করিয়াছেন। এই সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত তত্ত্বই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। আবার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই স্বীয় বুদ্ধমুক্তস্বভাবকে আবৃত করিয়া বদ্ধজীবরূপে জগৎ ভোগার্থে প্রকাশমান। অতএব একটি অখণ্ড আত্মচৈতন্যই জগৎপ্রপঞ্চরূপে ভোগের বিষয় ও অসংখ্য জীবরূপে ভোগের কর্তা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও জগৎ এবং জগৎ ও পরমাত্মায় যে কোনও ভেদই নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদের যথার্থ বক্তব্য তত্ত্ব। দ্বৈতের অভাবই অদ্বৈত। এই মতে সত্য এক অদ্বিতীয় ও চিরন্তন।

এই মতকে উপজীব্য করিয়া প্রথম গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্য উপনিষদের কারিকা রচনা করেন। তাঁহার মতে স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা পরচৈতন্য জগদ্রূপ মায়ার বিলাস সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের নিজস্ব স্বাধীন সত্তা নাই। মায়াকল্পিত জীব মায়াকল্পিত শরীর ধারণ করিয়া মায়াকল্পিত জগৎসংসারে বিচরণ করিতেছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব বা জগতের উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই।

গৌড়পাদাচার্যের প্রভাবে শংকরাচার্য অদ্বৈততত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রধান প্রধান উপনিষৎ ও ব্যাসরচিত বেদান্তসূত্রের উপরে ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে মঠস্থাপন দ্বারা অদ্বৈতবাদচর্চার পথ সুগম করিয়া তিনি মতটি এমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন যে পূর্বচর্চা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকেই অদ্বৈতবাদের স্থাপক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। শংকরাচার্য ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ও পিতার নাম শিবগুরু যজুর্বেদী। শংকরাচার্য আত্মার একত্ব স্থাপন করিবার জন্য জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই জগৎমিথ্যাত্ব মতটি মায়াবাদের উপর স্থাপিত। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই, সমস্ত তর্ক আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে। শংকরাচার্য পরমতখণ্ডনের জন্য যুক্তিতর্ক বিস্তার করিলেও আত্মার স্বরূপ স্থাপনে সম্পূর্ণ শ্রুতি-প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদের উপদেশের তাৎপর্য আত্মৈকত্ব। ইহাই উপনিষদ্বর্ণিত অদ্বৈততত্ত্ব এবং ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রেতে এই মতই সুশৃঙ্খল দার্শনিক মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একই আত্মা ভ্রান্তিবশতঃ বহুজীব বলিয়া ও জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হন। প্রকৃত নিরুপাধিক শুদ্ধস্বভাব আত্মা মায়া— উপাধিবশতঃ কখনও ঈশ্বর, কখনও জীব, কখনও জড়বস্তু রূপে বিবর্তিত। আত্মার এই বিবর্ত নশ্বর ও মিথ্যা। যাহা কিছু উৎপন্ন ও ক্ষয়ী তৎসর্বই অনিত্য ও মিথ্যা। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুকে বা প্রত্যেক জীবের স্বরূপ পরীক্ষা না করিয়া অদ্বৈতবাদে জগতের মূলতত্ত্ব ও জীবের যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণ করা হইয়াছে। সত্য পরমার্থ এবং সেই সত্য বাহিরে না অন্বেষণ করিয়া জীবের অন্তরাত্মাতেই করা উচিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। এই মহাবাক্যে জীবাত্মাকেই নির্বিশেষ পরা সত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই উপলব্ধিই পরম দর্শন। কারণ এই অখণ্ড আত্মোপলব্ধি উদ্ভাসিত হইলেই মিথ্যা জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হয়। জীবের কর্ম ও কর্মফল মিথ্যা, তাহার ভোগ মিথ্যা ও সংসারবন্ধনও মিথ্যা। এই সমস্তই মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলেই এই অবিদ্যা অবগত হইয়া আত্মাকে মিথ্যা বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়, ইহাই মোক্ষ। বাসনা-কামনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও আত্মায় একাগ্রধ্যানযুক্ত না হইলে অখণ্ডাকার জ্ঞানের উদ্ভব হয় না। পবিত্র সংযত দেহ-মনে যথার্থ বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু ব্রহ্মদর্শী গুরুর সমীপে উপনীত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করেন। সেই উপদেশ সম্বন্ধে স্বীয় চিত্তের যাবতীয় সন্দেহ তর্কের সাহায্যে অপগত করিয়া বিজ্ঞানানন্দঘন পরম সত্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া গভীর ধ্যানের দ্বারা সেই সত্য উপলব্ধি করিয়া কর্তা ভোক্তা প্রভৃতি মায়িক রূপ পরিত্যাগ করেন এবং নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত অভিন্নস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অবিদ্যাবৃত জীবস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করেন ও নূতন কর্মসঞ্চয় করিয়া মৃত্যুর পরে পুনরায় সেই কর্মফল ভোগার্থে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে তাহাকে আবর্তিত হইতে হয়। জীবের এই কর্তৃত্বাভিমান দূর না হইলে মুক্তি আসে না। অভিমানই জীবের বন্ধনের প্রথম সোপান। আত্মা যখন অবিদ্যাবশতঃ দেহের সহিত নিজের ঐক্য বোধ করে তখনই কর্তা কর্ম ও ক্রুত্যাত্মক সংসারযাত্রা শুরু হয়। জড়দেহের উপর নির্লিপ্ত চৈতন্যের এই অধ্যাসই সমস্ত

ভ্রান্তির মূল। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জগতের তথাকথিত কারণ। আত্মাই জীবের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞাতা, তিনিই বিষয়বিশিষ্টরূপে বিষয়কে উদ্ভাসিত করিয়া জ্ঞেয় হন, আবার তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। জগতের প্রত্যেকটি খণ্ডজ্ঞানই অখণ্ডচৈতন্যের বিভিন্ন রূপে প্রকাশমাত্র। জগৎ মায়িক বলিয়া ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু জগৎ অলীকও নহে। কারণ অলীক বস্তুর প্রকাশ হয় না বা তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কূটস্থ চৈতন্য লীলাবশতঃ জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা জগতের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ততক্ষণ ইহার ব্যাবহারিক সত্তা অস্বীকার করার উপায় নাই। ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুল্ম পর্যন্ত প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুরই অস্তিত্ব ব্যাবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। একমাত্র আত্মাই যথার্থ পারমার্থিক সত্য। এই জগৎভ্রমকে রজ্জুতে সর্পভ্রমের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়। অন্ধকারাবৃত রজ্জুর স্বরূপ জানিয়া অস্পষ্ট বস্তুটিতে সর্পত্বের আরোপ করিয়া লোক যেমন ভীত-চকিত হয়, তেমনই সদাত্মার স্বরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকায় কেবল সৎ-রূপে প্রকটিত আত্মায় জগৎপ্রপঞ্চের আরোপ করিয়া আমরা সংসারমোহে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা সদসদ্‌বহির্ভূত অনির্বচনীয়। এই অবিদ্যাই জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদের ভিত্তিমাত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ সূক্ষ্ম খণ্ডন-মণ্ডনের দ্বারা এই দর্শনকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের নাম বিখ্যাত। শেষোক্ত পণ্ডিতদ্বয় একই ব্যক্তিও হইতে পারেন। প্রকাশাত্মযতি পদ্মপাদাচার্যের পঞ্চপাদিকার উপর বিবরণ নামক টীকা রচনা করিয়া এবং অখণ্ডানন্দ বিবরণের টীকা রচনা করিয়া বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদের বিবরণ-প্রস্থান স্থাপন করেন। সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য সর্বজ্ঞাতাত্মমুনি সংক্ষেপ শারীরক রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্যের উপর ভামতী টীকা রচনা করিয়া ভামতী-প্রস্থান স্থাপন করেন। অমলানন্দ ভামতীর উপর কল্পতরু টীকা ও তদুপরি অপ্পয় দীক্ষিত পরিমল টীকা রচনা করিয়া বাচস্পতির মত দৃঢ় করেন। আনন্দবোধযতি, শ্রীহর্ষ ও চিৎসুখাচার্য নব্যন্যায়ের আদর্শে খণ্ডনাত্মক রীতি অনুসরণ করিয়া অন্যান্য দার্শনিকদের আক্রমণ হইতে অদ্বৈতবাদকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। এই রীতির পরাকাষ্ঠা মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে মূর্ত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রকটার্থ বিবরণকার, বিমুক্তাত্মন্, বিদ্যারণ্য মুনি, রামাদ্বয়, নৃসিংহাশ্রম মুনি, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বিশ্রুত আচার্যগণ পরমত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতক হইতে অদ্বৈতবাদের জয়যাত্রা শুরু হইয়া সুদীর্ঘকাল অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠার চূড়ায় আরোহণ করে। কিন্তু তাহার পর আর কোনও মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই— 'অচিন্ত্যভেদাভেদ', 'অবিদ্যা', 'দ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'বেদান্ত', 'মায়াবাদ' দ্র।

দ্র আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩২, ১৯৪৯, ১৯৬১ খ্রী; V. P. Upadhyay, *Lights on Vedanta*, Varanasi, 1959; G. R. Malkani, *Metaphysics of Advaita Vedanta*, 1961; Anilkumar Roy Choudhuri, *Self and Falsity*, 1955.

সংযুক্তা গুপ্ত

অধরচাঁদ যে চাঁদ সহজে ধরা দেন না— বাউলদের আত্মারূপী আল্লাহ্, সহজ মানুষ, মনের মানুষ। অধরকে ধরা বা উপলব্ধি করাই বাউলের কাম্য।

বাউল গানে অধরচাঁদের নামান্তর আছে— মনের মানুষ, সহজ মানুষ, অটল মানুষ, আলেক মানুষ, ভাবের মানুষ ইত্যাদি। মূলতঃ ইহা ব্যক্তির অন্তরতম সত্তা। বাউলগণ ইঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরও মনে করিয়াছেন। লালন ফকির দুইটি পঙ্‌ক্তিতে ভাবটি সুন্দর ফুটাইয়াছেন:

'জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়?'

দ্র ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৯৫৪ খ্রী; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৯৫৭।

অধরলাল সেন (১৮৫৫-১৮৮৫ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের উদীয়মান বাঙালী কবি, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক পরিবারের সন্তান। সফলতার বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বেই দুর্ঘটনার ফলে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বল্পায়ু জীবনে অধরলাল মাতৃভাষায় পাঁচখানি কাব্য এবং ইংরেজীতে তথ্যমূলক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন বেশ উজ্জ্বল ছিল। ডেপুটি কালেক্টর রূপে রাজকার্য করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং

ফ্যাকাল্‌টি অফ আর্টস্‌-এর সভ্য ছিলেন। **বঙ্গীয় এশিয়াটিক** সোসাইটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। অধরলাল রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৭, কলিকাতা, ১৯৫২ খ্রী; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

অধিবাস চন্দন তৈল হরিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা আনুষ্ঠানিক অঙ্গসংস্কার। বিবাহাদি সংস্কারকর্মে এবং দুর্গাপূজা দোলযাত্রা প্রভৃতি দেবকার্যে ইহার অনুষ্ঠান হয়। দেবপূজায় পূজার পূর্বদিন সন্ধ্যায় এবং বিবাহাদি ব্যাপারে কার্যের দিন সকালে অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রপূত চন্দনাদি দ্রব্য প্রথমে শালগ্রাম ও ভূমি স্পর্শ করাইয়া এবং যাহার অধিবাস তাহার কপালে ঠেকাইয়া বিভিন্ন অঙ্গ মার্জনা (কার্যতঃ স্পর্শমাত্র) করা হয়। অঙ্গের ক্রম এইরূপ— হৃদয় মস্তক শিখা নেত্রদ্বয় কবচদ্বয় নাভি হস্তাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলি। অধিবাসের দ্রব্য চন্দন তৈলহরিদ্রা মৃত্তিকা শিলা ধান্য দূর্বা পুষ্প ফল দধি ঘৃত আতপতণ্ডুল সিন্দুর কজ্জল গোরোচনা (অভাবে হরিদ্রা) শ্বেতসর্ষপ কাঞ্চন রৌপ্য তাম্র চামর দর্পণ দীপ বরণডালা। বিবাহে কন্যার অধিবাসে বরের অধিবাসের অবশিষ্ট চন্দন তৈল হরিদ্রা কজ্জল ও সিন্দুর ব্যবহৃত হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অধীনতামূলক মিত্রতা (subsidiary alliance) লর্ড ওয়েলেস্‌লি -প্রবর্তিত নীতিবিশেষ। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়া ওয়েলেস্‌লি এ দেশে বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্যর জন শোর -এর নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তে এই নূতন নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন— যে সকল দেশীয় রাজা ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন ব্রিটিশ সরকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাহাদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। উহার জন্য যে সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইবে তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য বৃহৎ রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজ্যাংশ এবং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে হইবে। বৃহৎ রাজ্যগুলি আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনী রাখিতে পারিবে। এই সকল মিত্র রাজা ব্রিটিশ সরকারের বিনা অনুমতিতে অপর কোনও রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবিগ্রহ বা কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারিবেন না। হায়দরাবাদের নিজামই সর্বপ্রথম এই মিত্রতা স্বীকার করেন। মহীশূর এবং মারাঠা শক্তিকে এই মিত্রতায় আবদ্ধ করিতে ওয়েলেস্‌লিকে যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। স্যর টমাস্‌ মন্‌রো প্রমুখ অনেকে এই নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের মতে ইহার দ্বারা অযোগ্য রাজা ও রাজবংশকে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বিজনকান্তি বিশ্বাস

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া কথিত শিব-পার্বতীর কথোপকথন আকারে বিরচিত সপ্তকাণ্ডাত্মক রামায়ণ। রামকাহিনী-বর্ণনপ্রসঙ্গে ইহাতে মুক্তির সাধন-রূপে রামভক্তির মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের 'রামহৃদয়' ও 'রামগীতা' অংশ দুইটি রামভক্তগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অনগ্রসর শিশু বুদ্ধি দ্র

অনঙ্গপাল ছত্রিশটি প্রধান রাজপুত বংশের অন্যতম তোমর বা তুয়ার বংশীয় নৃপতি। চারণগীতিতে তাঁহাকে বর্তমান দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ রাসো' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত আছে যে অনঙ্গপাল তাঁহার দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। অবশ্য ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অনঙ্গবজ্র সিদ্ধাচার্য দ্র

অনধ্যায় আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন বর্জন বা ছুটি। নানা উপলক্ষে শাস্ত্রে অধ্যয়ন বর্জনের বিধান আছে। পঞ্জিকায় অনেকগুলি অনধ্যায়ের উল্লেখ আছে। এখন পর্যন্ত টোলে শাস্ত্রের নির্দেশমত কতকগুলি অনধ্যায় মানিয়া চলা হয়। মূলতঃ বেদাধ্যয়ন সম্পর্কে অনধ্যায়ের সূচনা হইলেও অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কেও ইহার কিছু কিছু প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রতিপদ্‌ অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ত্রয়োদশীর দিন রাত্রিতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন বর্জনীয়। কোনওরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটিলেই অধ্যয়ন-ত্যাগের নির্দেশ ছিল। ঝড়-বৃষ্টি মেঘগর্জন বজ্রপাত উল্কাপাত ভূমিকম্প চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ধূলিবর্ষণ অগ্নিকাণ্ড আশেপাশে যুদ্ধারম্ভ যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে এক বা একাধিক দিন অনধ্যায়ের ব্যবস্থা ছিল। কান্নার

শব্দ গান-বাজনার শব্দ শিয়াল কুকুর গাধা উট প্রভৃতির বিকট শব্দ কানে আসিলেই অনধ্যায়। অধ্যয়নের সময় গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া কোনও জন্তু চলিয়া গেলে অনধ্যায়ের বিধান ছিল। অনেক লোক একত্র সমবেত হইলে অর্থাৎ উৎসব উপলক্ষে অনধ্যায় হইত। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুগৃহে আসিলে তাঁহার সম্মানের জন্য শিষ্টানধ্যায় পালন করা হইত। বাড়িতে অতিথি আসিলে তিনি চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অনধ্যায়। রাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে দুই দিন অনধ্যায়। গ্রামের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতের সংকার না হওয়া পর্যন্ত অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। অপবিত্র অবস্থায়, কার্যান্তরে ব্যস্ত থাকাকালে ও শ্মশান-সমীপে অধ্যয়ন বিধেয় নহে।

দ্র মনুসংহিতা, ৪।১০১ প্রভৃতি ; P. V. Kane, *History of Dharmasastra,* vol. II, Poona, 1941.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনন্ত শব্দার্থ অনুসারে যাহার অন্ত বা শেষ নাই তাহাই অনন্ত, যেমন গোলাকার বা বলয়াকার বস্তু। কিন্তু গণিতে অনন্ত একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনও সংখ্যা কল্পনীয় বৃহত্তম সংখ্যা হইতে বৃহত্তর হইলে তাহা অনন্ত। মনে করা যাউক, ক-এর মান খ গ ভগ্নাংশের সমান। গ-এর মান যেমন হ্রাস পাইবে ক-এর মান সেই অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে। গ হ্রাস পাইতে পাইতে শূন্যের নিকটবর্তী হইলে ক-এর মান অনন্তে পৌছিবে। ইহার প্রতীক ∞।

অনন্তের মান পরিমাপ বা গণনা করিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। তৎসত্ত্বেও দুইটি অনন্ত রাশির তুলনা করা যায়। একটি সমষ্টির প্রত্যেকটি পৃথক সত্তার সহিত অপরের একৈক মিল করা যাইতে পারে। সর্বাংশে মিলিয়া গেলে দুইটির মান সমান। গণিতবিৎ গেয়র্গ কান্টর অনন্তের গণিতে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই গণিতে হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলেফ অনন্তের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল মূল সংখ্যা ও ভগ্নাংশের সমষ্টি ক্ষুদ্রতম অনন্ত রাশি। কোনও রেখায় বা তলে বিন্দুর সমষ্টি ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। সকল জ্যামিতিক বক্রের সমষ্টি বৃহত্তম অনন্ত রাশি।

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

অনন্ত আচার্য বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহাকে নবদ্বীপবাসী বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। পদকল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচনা। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। পরে বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। অনন্তদাস-ভণিতায় পদকল্প-তরুতে যে ৩২টি পদ ধৃত হইয়াছে তাহা ইঁহার রচনা হইতেও পারে, আবার অদ্বৈতপ্রভুর শাখাভুক্ত অনন্ত-দাসের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে।

বিমানবিহারী মজুমদার

অনন্ত কন্দলী অনন্ত কন্দলী অসমীয়া সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি মহাপুরুষ শংকরদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের ভিতর (১৫০০-১৫২০ খ্রী) জন্মগ্রহণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। 'বৃত্রাসুর বধ' কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার বাড়ি ছিল আসামের হাজো গ্রামে। তাঁহার পিতা রত্ন পাঠক ভাগবত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ও হাজো-র মাধব দেবালয়ের পাঠক ছিলেন। অনন্ত কন্দলীর আদি নাম হরিচরণ। অনন্ত কন্দলী ছাড়া শ্রীচন্দ্রভারতী, ভাগবতাচার্য, ভাগবত ভট্টাচার্য, মধুভারতী ইত্যাদি নামেও তাঁহাকে অভিহিত করা হইত। তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহার পিতার নিকট ভাগবত শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার পিতার প্রভাবে ক্রমে ভক্তিতে তাঁহার মতি হয়। স্ত্রীলোক ও শূদ্রেরা যাহাতে ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারে এইজন্য তিনি অসমীয়া ভাষায় কাব্যাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

অনন্ত কন্দলী মহাপুরুষ শংকরদেবের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। মহাপুরুষ শংকরদেবের উপদেশানুসারেই তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের মধ্য ও শেষ ভাগ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মহাপুরুষ শংকরদেব নিজে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম ভাগ ('দশম') অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনন্ত কন্দলীর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রামায়ণ', 'কুমর হরণ', ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত 'বৃত্রাসুর বধ', ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মধ্য ও শেষ দশম', 'মহীরাবণ বধ' কাব্য ও 'সীতার পাতাল প্রবেশ' নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই 'মধ্য ও শেষ দশম' অনন্ত কন্দলীর অক্ষয় কীর্তি।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, গৌহাটি, ১৯৬৩।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

অনন্তনাথ চতুর্দশ জৈন তীর্থংকর। ইঁহার পিতা কোশলাধিপতি সিংহসেন এবং মাতা রাজ্ঞী সুযশ। মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে একটি অনন্ত মুক্তার মালা দেখিয়াছিলেন। সেইজন্য পুত্রের নাম রাখা হইল অনন্ত। ইনি অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার চিহ্ন সজারু, নির্বাণ সুমেরু শিখরে।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ পূর্বগঙ্গ বংশীয় বিখ্যাত নৃপতি। তিনি উৎকল দেশ জয় করেন। প্রায় সত্তর বৎসর ব্যাপী শাসনকালে (আনুমানিক ১০৭৬-১১৪৮ খ্রী) তিনি চোল, চালুক্য ও পাল বংশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূর্বগঙ্গ রাজ্যের সামানা উত্তরে গঙ্গা নদীর মোহনা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্তবর্মা ধর্ম ও শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির তাঁহার রাজত্বকালেই নির্মিত হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অনন্ত ব্রত ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে চতুর্দশ বর্ষ যাবৎ এই ব্রত করণীয়। ব্রতোপলক্ষে অনন্তদেব বা বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। পূজায় অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যের সহিত চতুর্দশ ফল এবং যব, গোধূম বা তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। ব্রতীকে চতুর্দশ-সূত্রনির্মিত ও বিষ্ণুনামপূত চতুর্দশগ্রন্থিযুক্ত ডোর বাহুতে ধারণ ও ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের ব্যবস্থা বাংলার রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' ও মিথিলার রুদ্রদেবের 'বর্ষকৃত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৯-১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। অনন্তলাল বিষ্ণুপুর ঘরানার গায়ক ও গীতরচয়িতা। বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু রামশংকরের শেষ জীবনের তিনি অন্যতম শিষ্য। স্থানীয় সংগীত বিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজার সংগীত-সভায় গায়ক রূপে অনন্তলাল আজীবন জন্মভূমিতে বাস করিয়াছেন। সংগীত-জগতে তাঁহার তিন কৃতী পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম দুই জনের প্রথম সংগীত শিক্ষা পিতার নিকটে। রচিত গীতাবলীর মধ্যে 'একি রূপ হেরি হরি', 'দীনতারিণী বোলে মা', 'মধু ঋতু আই' ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরবাসী আরও কয়েকজন গায়ক তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর ঘরানা, ১৯৬৩ খ্রী।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অনশন রাজনৈতিক কারণে অনশন দুই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিত রামরক্ষা ও যতীন দাস ম্যাক্‌সুইনী কারাগারে অপমানকর অবস্থায় বাঁচা অপেক্ষা অনশনে দেহত্যাগ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা জাপানের হারা-কিরির সহিত তুলনীয়।

সত্যাগ্রহে অনশনের প্রয়োগ অন্য কারণে হয়। সৎ-শক্তি সচরাচর সমাজে অসৎ-শক্তি অপেক্ষা দুর্বল। গান্ধীজী সৎ-শক্তিকে জাগ্রত বা উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে অনশনব্রত গ্রহণ করিতেন। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ (১৯২১, ১৯৪৭ খ্রী) ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (১৯৩২ খ্রী) ইহার লক্ষ্য ছিল। সমাজের সৎ-শক্তি অগ্রসর হইয়া যদি ইহার নিরাকরণ না করে তবে জীবন ধারণ নিরর্থক— ইহাই তাঁহার যুক্তি ছিল। এইরূপ অনশন মিত্রদের প্রতি প্রেমের বশে প্রযুক্ত হইতে পারে, শত্রুর প্রতি ক্রোধের বশে নহে।

নির্মলকুমার বসু

অনশনব্রত অনশন অর্থ উপবাস, ভোজন হইতে বিরত থাকা। অনশনব্রত আহার পরিত্যাগের সংকল্প। সাধারণতঃ অনশন বলিতে মৃত্যুসংকল্পপূর্বক উপবাস বুঝায়। স্তর ভেদে অনশন ত্রিবিধ— স্বল্পানশন, অর্ধানশন ও পূর্ণানশন। স্বল্পানশন ও অর্ধানশন আংশিক অনশন, পূর্ণানশন নিরম্বু উপবাস।

অনশন প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। বর্তমান কালেও সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা অল্পবিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। অবিচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রাচীনকালেও অনশন করা হইত, বর্তমানেও করা হইয়া থাকে। বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে অনশন-ব্রত প্রয়োগে মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত যেমন আছে (যতীন দাস), তেমনি বহু ক্ষেত্রে অবিচারের প্রতিকার হইতেও দেখা গিয়াছে। কয়েকটি জাতির মধ্যে প্রতিহিংসা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত অনশনের প্রথা বিদ্যমান। অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতিনীতিতেও অনশনব্রত পালনের বিধান রহিয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসকেরা আংশিক অনশনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনশন ও কামনাপূরণের জন্য অনশন করিয়া হত্যা দেওয়ার প্রথাও সুপ্রাচীন। মনু বলেন, প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য উত্তমর্ণগণ অধমর্ণের দ্বারে হত্যা দিয়া থাকেন।

ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে অনশনের ব্যবস্থা থাকিলেও ধর্মই অনশনের একমাত্র কারণ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহার উৎপত্তির কোনও একটিমাত্র নির্দিষ্ট কারণ নাই। শুদ্ধীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, শোকানুষ্ঠান, সমবেদনা জ্ঞাপন, কামনা-বাসনা পূরণ, দীক্ষা, জাদুবিদ্যা ও বিশেষ শক্তিলাভ প্রভৃতি বহু কারণে অনশনব্রত পালনের রীতি সুপ্রচলিত। ইহা ব্যতীত বহু প্রাচীন কাল হইতে সন্ন্যাসজীবনে অনশন-ব্রত পালন অবশ্যকর্তব্য রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন ধর্মমতেও অনশনব্রত পালনের বিধান রহিয়াছে। মহাযান বৌদ্ধেরা অনশনের পক্ষপাতী ছিলেন। চীনের তাও ধর্ম (Taoism) অনশনকে ইহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য করে। ইহুদীগণও ধর্মকার্যে ও প্রায়শ্চিত্তে (Day of Atonement) অনশনব্রত পালন করিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং অনশন করিয়া-ছিলেন (St. Luke iv. 2 seq.) ও অনশনকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে অনুগামীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন (St. Mark ii, 19 seq. ; St. Matthew vi. 16 seq.)। জরথুস্ত্রীয় ধর্মে উপবাস পাপ বলিয়া গণ্য কিন্তু কেহ মরিলে জরথুস্ত্রীয়েরা তিন রাত্রি অনশন করিয়া থাকেন। জৈনদের মধ্যে অনশনব্রত প্রায় প্রত্যেক ধর্মকার্যের অঙ্গস্বরূপ। ধর্মকার্যে অনশন ব্যতীত অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৃত্যুবরণেরও বিধান রহিয়াছে। জৈনদের এই আমৃত্যু অনশন ত্রিবিধ— ভক্তপ্রত্যাখ্যান, ইঙ্গিনী ও পাদপোপগমন। ভক্তপ্রত্যাখ্যানে অনশনকারী চলিতে পারেন ও ইচ্ছা করিলে জলপান করিতে পারেন, ইঙ্গিনীতে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে চলিতে বাধা নাই কিন্তু অনশনকারীকে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। আর পাদ-পোপগমন আমৃত্যু নিশ্চল নিরম্বু অনশন। মৃত্যু সংকল্প করিয়া এক, দুই, তিন, সাত, নয়দিনব্যাপী অথবা একমাস-ব্যাপী অনশনের নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। গরুড়-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে সে বিষ্ণুতুল্য হয়, অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া যতদিন জীবিত থাকে তাহার প্রত্যেক দিন স-দক্ষিণ-ক্রতু দিবসতুল্য হইয়া থাকে (৩৬।৫-৬)। ইহা ব্যতীত অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বশিষ্ঠ-সংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে অনশনব্রত পালনের বিধি-বিধান রহিয়াছে।

দ্র বঙ্গীয় মহাকোষ।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

অনাক্রম্যতা রোগ-বীজাণু শরীরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও যদি রোগের আক্রমণ না ঘটে, তবে সেই অবস্থাকে অনা-ক্রম্যতা বলা হয়। অনাক্রম্যতা দুই রকমের, ১. স্বাভাবিক ২. কৃত্রিম অর্থাৎ অর্জিত। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কোনও কোনও লোকের এক বা একাধিক রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা থাকে। সংখ্যায় অল্প হইলেও কোনও কোনও ব্যক্তির প্রায় সকল রকম রোগ-বীজাণুর বিরুদ্ধেই অনাক্রম্যতা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের জীবৎকালের মধ্যে রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে যদি অনাক্রম্যতা অর্জন করা যায়, তাহাকে কৃত্রিম বা অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। ইহা বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব। বীজাণুঘটিত কোনও রোগে আক্রান্ত হইবার পর কেহ যদি আরোগ্য লাভ করে, তবে ভবিষ্যতে তাহার সেই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আবার ইন্‌জেক্‌শন বা টিকার সাহায্যে শরীরের মধ্যে কোনও পদার্থ প্রবেশ করাইয়াও অনাক্রম্যতা লাভ করা যায়।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর শরীর এমন ভাবেই গঠিত যে, কোনও বিষাক্ত পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করিলেই তাহাকে বিষ-প্রতিরোধক পদার্থ উৎপাদনে উত্তেজিত করে এবং সেই পদার্থই বহিরাগত বিষকে প্রতিরোধ করে। রোগোৎপাদক বীজাণু কর্তৃক উৎপাদিত বিষকে বলা হয় টক্সিন, আর এই বিষক্রিয়া প্রতিরোধের জন্য শরীরের মধ্যে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে অ্যান্টিটক্সিন। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে— বিষের প্রভাব হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল পদার্থ রক্তের গ্লোবিউলিন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন— ডিপথেরিয়া টক্সয়েডকে (বিশুদ্ধীকৃত লবণজলে দ্রবীভূত ডিপথেরিয়া টক্সিন) সুস্থ শরীরে ইন্‌জেক্‌শন করিলেই অ্যান্টিটক্সিন উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ইহাই এই রোগের বিরুদ্ধে শরীরকে অনাক্রম্য করিয়া তোলে।

শরীরের মধ্যে ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে অ্যান্টিটক্সিন বা প্রতিবিষ প্রবেশ করাইয়া যে অনাক্রম্যতার সৃষ্টি করা হয়, তাহা নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ ; কারণ শরীর সেই অ্যান্টিটক্সিনকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। অন্যান্য পন্থায় সৃষ্ট অনাক্রম্যতাকে বলা হয় সক্রিয় ; কারণ এই ব্যবস্থায় শরীর নিজেই অ্যান্টিটক্সিন প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হয়। নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা সাধারণতঃ এক বৎসরের বেশি স্থায়ী হয় না। সক্রিয় অনাক্রম্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে— এমন কি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগমুক্তির পরও

সারা জীবন তাহার শরীরে সেই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

রোগ-বীজাণু যখন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ইংল্যাণ্ডে জেনার-ই সর্বপ্রথম (১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন করেন।

ভ্যাক্‌সিনেশনের সাহায্যে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করা যায়— জেনারের এই আবিষ্কারের বিষয় পাস্তর জানিতেন। অ্যান্থ্রাক্স সম্পর্কে ককের বিস্ময়কর কার্যাবলীর কথা শুনিয়া তিনি গোরু, ভেড়া প্রভৃতির অ্যান্থ্রাক্স রোগ প্রতিরোধ করিবার পন্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। তিনি ককের পন্থা অনুসরণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অ্যান্থ্রাক্স-জীবাণু পশুদেহে প্রবেশ করাইয়া অ্যান্থ্রাক্সের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ইহার পর পাস্তর মানুষ ও পশুদের ভয়াবহ জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। এইভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ ডিপথেরিয়া, পীতজ্বর, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি, লক-জ, মেনিঞ্জাইটিস, হাম প্রভৃতি অনেক রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আজকাল কতকগুলি রোগ-প্রতিরোধক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই কারণেই এই সকল রোগে মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার উপায় হিসাবে অর্জিত অনাক্রম্যতা বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩ খ্রী) অনাগারিক ধর্মপাল আধুনিক যুগে সিংহলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় নেতা। একাধারে তিনি সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিৎ, লেখক এবং বাগ্মী। তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর সিংহলের কলম্বো শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল বারাণসীর সারনাথে দেহরক্ষা করেন।

তিনি ছিলেন কলম্বোর ধনী এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মুদালিয়র ডি. সি. হেওয়াবিতরনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেণ্ট টমাস স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। সরকারি করণিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শিক্ষাদপ্তরে যোগদান করেন, কিন্তু পরে বৌদ্ধধর্মের সেবার্থে চাকুরি ছাড়িয়া দেন। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিভ্রমণ করেন। বুদ্ধগয়ায় যাইয়া তিনি সেখানে বৌদ্ধদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই তাঁহার উদ্যোগে মহাবোধি সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা হিসাবে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান এবং আরও অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় গয়া, বুদ্ধগয়া এবং সারনাথে পান্থশালা নির্মিত হয়। সারনাথে একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁহার। এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা ও সারনাথে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় লণ্ডনে বৌদ্ধ মিশন স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তিনি অন্তরীণ হন। অনাগারিক ধর্মপাল ভারতবাসীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শিক্ষা ও শিল্প-বিষয়ক জাগরণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তির সাহায্যে তিনি 'অনাগারিক ধর্মপাল ট্রাস্ট' -এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সারনাথে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার দেহাবসান হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে আরও পঁচিশবার এই দেশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

দেবপ্রিয় বলিসিংহ

অনাত্মবাদ একটি দার্শনিক মতবাদ। ইহা নৈরাত্ম্যবাদ নামেও পরিচিত। চার্বাক এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই মতের সমর্থক। তাঁহাদের মধ্যে একাধিক বিষয়ে মত-বিরোধ বিদ্যমান; তথাপি তাঁহারা কোনও না কোনও প্রকারে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

অনাত্মবাদের আলোচনায় প্রথমে আত্মা বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের মত বর্ণনা করা যাইতে পারে। কারণ, এই মত সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাসের অনুরূপ। ন্যায়-মতে প্রতিটি মানুষ দেহ এবং আত্মার মিলনে গঠিত। ঘট ও পট যেমন দ্রব্য এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যেমন তাহাদের গুণ, সেইরূপ দেহ ও আত্মা দুইটিই দ্রব্য এবং তাহাদের দুইটিতেই বিভিন্ন গুণ ও কর্ম বর্তমান। কোনও ব্যক্তির সত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে সেই ব্যক্তির দেহ এবং দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার উল্লেখ করিতে হয়। কোনও ব্যক্তির জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতির আশ্রয় তাহার দেহ হইতে পারে না। অতএব ইহাদের আশ্রয়রূপে দেহাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য স্বীকার করিতে হয় এবং সেই দ্রব্যই আত্মা— কারণ 'অহম্' জ্ঞানের বিষয়রূপেও

আমরা এই দ্রব্যকেই পাই। দার্শনিক বিশ্লেষণে এই আত্মা সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন তত্ত্ব অবগত হই। যেমন, আমরা জানিতে পারি যে আত্মা অবিনশ্বর।

চার্বাকপন্থী দার্শনিকগণের মতে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহাদের মতে দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত কোনও আত্মা নাই।

চার্বাকের মতে (ইন্দ্রিয়-) প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অনুমান কিংবা অন্য কোনও প্রমাণ মানা যায় না। ধূম হইতে বহ্নির অনুমান করিতে হইলে 'যে স্থলে ধূম সেই স্থলে বহ্নি' এই সাধারণ নিয়ম (বা ব্যাপ্তি) সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ধূম অথবা বহ্নির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিটি স্থলে পরীক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া এই সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞানও সম্ভব নহে। সুতরাং অনুমানকে একটি প্রমাণ বলিয়া মানা যায় না। শব্দাদি অন্যান্য যে সমস্ত প্রমাণের কথা বলা হয় সেইগুলি সবই অনুমানের উপর নির্ভরশীল, অতএব প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে।

এখন প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। কারণ, দেহ এবং দেহে উদ্ভূত চৈতন্য ব্যতীত আত্মা বিষয়ক কোনও প্রত্যক্ষ হয় না। দেহ এবং আত্মার অভেদ আমাদের বাক্য-ব্যবহার হইতেও সূচিত হয়। 'আমি স্থূল', 'আমি কৃষ্ণবর্ণ' প্রভৃতি বাক্য নিশ্চয়ই দেহ ভিন্ন কোনও 'আমি' সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

চার্বাকের মতে সমস্ত জগৎ-ব্যাপার বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল) এবং ক্ষিতি এই চারিটি ভূত বা মৌলিক উপাদানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ ইহারাই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে (প্রত্যক্ষগোচর নয় বলিয়া চার্বাকগণ অন্যান্য দর্শনে স্বীকৃত পঞ্চম ভূত আকাশও মানেন নাই।)। সুতরাং তথাকথিত আত্মারও স্বরূপ এই চারিটি ভূতের সাহায্যেই নিরূপণ করিতে হইবে। আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ মাত্র। এই দেহ বায়ু ইত্যাদি মৌলিক উপাদানে গঠিত এবং চৈতন্য এই দেহেই উদ্ভূত গুণ। যদি বলা হয় যে বায়ু প্রভৃতি মৌলিক উপাদান জড়বস্তুমাত্র এবং তাহাদের কোনওটিতেই চৈতন্য নাই— অতএব তাহাদের দ্বারা গঠিত দেহেও চৈতন্য থাকিতে পারে না, তাহা হইলে চার্বাকগণ বলিবেন যে এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, তাম্বূল চর্বণে যে রক্তবর্ণ উৎপন্ন হয় সেই রক্ত-বর্ণও তাম্বূলের কোনও উপাদানেই বর্তমান নাই। সুতরাং একটি উৎপন্ন দ্রব্যে এমন গুণ থাকিতে পারে যাহা তাহার কোনও উপাদানেই বিদ্যমান নহে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণও আত্মা বলিয়া কোনও দ্রব্য মানেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে দ্রব্য বলিয়া কিছুই নাই। চার্বাকগণ কিন্তু দেহকে একটি দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে কতকগুলি বিশেষ গুণ এবং কর্মের আশ্রয় হিসাবে মানিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা আত্মাকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ এই দুইটি কথাই অস্বীকার করেন। গুণের আশ্রয় রূপে অথবা চির-সৎ পদার্থরূপে— কোনও ভাবেই তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

প্রথমে কোনও বিশেষ ব্যক্তির একটি ক্ষণের সত্তা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। সেই ক্ষণে সেই ব্যক্তির সত্তা 'পঞ্চস্কন্ধে'র সংঘাত (সমষ্টি) মাত্র। পঞ্চস্কন্ধ বলিতে রূপ (দেহের মৌলিক উপাদানসমূহ), বিজ্ঞান (অহং-বোধ), বেদনা (সুখ ও দুঃখের অনুভূতি), সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ) এবং সংস্কার (প্রবণতা) বুঝানো হইতেছে। কথিত আছে যে গ্রীকরাজা মিলিন্দ (Menander) যখন উপরি-উক্ত মতবাদ গ্রহণ করিতে চাহেন নাই তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন তাঁহাকে বলেন যে রাজা যে রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন সেই রথ যেমন তাহার অংশগুলির একটি বিশেষ সংস্থানের নামমাত্র, সেইরূপ রাজা মিলিন্দের (কোনও এক বিশেষ ক্ষণের) আত্মাও উপরি-উক্ত পঞ্চ-স্কন্ধের সংস্থানের একটি নাম ব্যতীত কিছুই নহে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যে কেবল পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত তাহাদের আশ্রয়রূপ আত্মাই অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা কোনওরূপেই স্থায়ী আত্মা মানেন নাই। অর্থাৎ কোনও বিশেষ ক্ষণে আত্মা যে পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত তাহার পরক্ষণে আত্মা ঠিক সেই পঞ্চস্কন্ধেরই সংঘাত হইতে পারে না। কারণ, এই সংঘাতের প্রতিটি উপাদানই ক্ষণিক। উৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রতিটি উপাদান অপর একটি উপাদান উৎপন্ন করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বরূপতঃ আত্মা এইরূপ ক্ষণিক উপাদানসমূহের ধারামাত্র।

এই বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই হইতে পারে যে ইহাতে ফলতঃ পূর্বজন্ম, পরজন্ম, কর্মফল এবং মুক্তি— সমস্ত কিছুই অস্বীকৃত হইতেছে। কারণ কোনও স্থায়ী আত্মা না থাকিলে জন্মান্তর ইত্যাদি সব কিছুই অর্থহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধগণ জন্মান্তর প্রভৃতি সমস্ত কিছুই মানিয়াছেন। এই আপত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন যে কোনও স্থায়ী আত্মা না থাকিলেও পূর্বোক্ত ধারার নিজস্ব ঐক্য এবং সেই অর্থে, স্থায়িত্ব রহিয়াছে।

একটি ধারার ঐক্য সেই ধারার অন্তর্ভুক্ত ক্ষণিক পদার্থ-গুলির কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং এক হইতে অপরে উৎপন্ন সংস্কার দ্বারা নিরূপিত।

অতএব দেখা যাইতেছে, নৈরাত্ম্যবাদ বহুলাংশে ক্ষণিক-বাদের উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধগণ বহুবিধ যুক্তির সাহায্যে এই ক্ষণিকবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে সত্তা এবং প্রত্যক্ষের স্বরূপের উপর ভিত্তি করিয়া যে দুইটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে সেই দুইটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপে কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী) জড়বাদ চার্বাক-মতের সহিত এবং ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬ খ্রী) মতবাদ বৌদ্ধমতের সহিত বহুলাংশে তুলনীয়। 'কর্মবাদ' ও 'ক্ষণিকবাদ' দ্র।

দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ, বৈভাষিক দর্শন, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; T. W. Rhys Davids, *Buddhism*, New York, 1907; H. Oldenberg, *Buddha, His Life, His Doctrine, His Order*, London, 1882; F. T. Stcherbatsky, *Buddhist Logic*, vol. 1, Leningrad, 1930; S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, vol. 1, London, 1923; M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, London, 1932; T. R. V. Murti, *The Central Philosophy of Buddhism*, London, 1955.

প্রণবকুমার সেন

অনাথপিণ্ডিক সংস্কৃত অনাথপিণ্ডদ। শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম বৎসরেই রাজগৃহে বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া তিনি শ্রোতাপন্ন হন। কোশল রাজকুমার জেত-র উদ্যানভূমি আঠার কোটি মুদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া সেই অর্থে তাহা তিনি ক্রয় করেন এবং সমপরিমাণ অর্থে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া আরও আঠার কোটি মুদ্রা সমেত জেতবনারাম বুদ্ধ ও সংঘকে নিবেদন করিয়া তিনি দান-ধর্ম পালন করেন। বুদ্ধ ও সংঘের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। অনাথপিণ্ডিক দিনে দুইবার করিয়া তথাগতকে দর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু বুদ্ধ পরিশ্রান্ত হইতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি কখনও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন না। পাঁচশত অতিথি ও একশত ভিক্ষুকে তিনি প্রত্যহ আহার্য প্রদান করিতেন। অপরিমিত দানের ফলে শেষ বয়সে তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সুদত্ত। দানশীলতার জন্যই তিনি অনাথপিণ্ডিক এবং দাতাদিগের অগ্রণী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডিকের পুত্রবধূ সুজাতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা ও বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের তর্কশক্তির বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন।

দ্র G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. 1, London, 1937.

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

অনার্য[১] ভারতের যে প্রাচীন অধিবাসীগণ বেদ রচনা করেন তাঁহারা আর্য নামে পরিচিত। বর্তমান কালের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা আর্যগণের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। ইহা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের বলা হয় অনার্য। সুতরাং অনার্য কোনও একটি বিশিষ্ট জাতি বা শ্রেণীকে বুঝায় না— আর্য ব্যতীত অন্য ভারতবাসীর সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র।

আর্যগণ ভারতে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই অনেক জাতির লোক এ দেশে বাসস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের কোনও লিখিত বিবরণ নাই। তবে নানা উপায়ে তাহাদের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

তাহাদের ব্যবহৃত কতকগুলি প্রস্তরনির্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার নির্মাণ কৌশল ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। এই অনুসারে প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নব্য প্রস্তর-যুগ প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। অনেকগুলি পর্বতগুহা-গাত্রে এই সকল যুগের অঙ্কিত চিত্র আছে তাহা হইতে ইহাদের জীবনযাত্রার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। খুব প্রাচীনকালের অধিবাসীরা ঐ সব প্রস্তর দিয়া পশু হত্যা করিত এবং তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত। তাহারা আগুনের ব্যবহার, কৃষিকার্য, গৃহনির্মাণ, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি জানিত না। ক্রমে ক্রমে তাহারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং মাটির বাসন তৈয়ারি করিতেও শেখে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক বা একাধিক জাতি বাস করিত যাহারা লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার জানিত এবং নানা বিষয়ে উচ্চস্তরের সভ্যতার অধিকারী ছিল। দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষগণও সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া খুব উন্নত ছিল।

আর্যগণ ভারতে আসিয়া এই সব প্রাচীন জাতিকে পরাজিত করেন এবং তাহাদের বাসভূমি দখল করেন।

তাহাদের মধ্যে অনেকে দাসরূপে আর্যসমাজভুক্ত হইয়া ক্রমে শূদ্র নামে পরিচিত হয়। আবার অনেক অনার্য জাতি দুর্গম পর্বতে বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদের বংশধরেরা এখনও সেই সব অঞ্চলে বাস করে।

আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যে এই সকল জাতি দাস নিষাদ দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত। আর্যগণ ঘৃণাসহকারে তাহাদের কুৎসিত চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ, অবোধ্য ভাষা ও ধর্মহীনতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যে শক্তিশালী ছিল এবং তাহাদের পুর ও দুর্গ অধিকার করা যে আর্যগণের পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয় নাই— তাহারও পরিচয় ঐ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

বর্তমান কালের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, খাসিয়া, ভুটিয়া, নাগা প্রভৃতি বহু জাতি প্রাচীন অনার্য জাতির বংশধর। তাহাদের ভাষা আর্য-ভাষা হইতে বিভিন্ন এবং শরীরের গঠনেও অনেক প্রভেদ। নৃতত্ত্ববিদেরা শারীরিক গঠন অনুসারে এই সমুদায় লোককে কয়েকটি বিশিষ্ট জাতিতে (race) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদায় ভাষা প্রচলিত তাহার অধিকাংশই— বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাট, রাজস্থানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি— আর্যগণ যে ভাষায় বেদ লিখিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ভূত। ইওরোপের প্রাচীন ও বর্তমান বহু জাতির এবং ইরানীয় (পারসীক) জাতির ভাষা ও বেদের ভাষা— একই মূল ভাষার শাখা-প্রশাখা মাত্র। এইজন্য এই মূল ভাষাকে ইন্দো-ইওরোপীয় ও ইন্দো-ইরানীয় বলে। কিন্তু পূর্বোক্ত অনার্যগণের ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহে। তামিল তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষাও মূলতঃ অনার্য ভাষা। অনার্য ভাষার সহিত আর্যভাষার বহু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আর্য ভাষাগুলিতেও কতকগুলি অনার্য শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে এক দিকে যেমন অনার্য জাতির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে আর্যগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তেমনি আর্য ধর্ম এবং সমাজেও অনার্য জাতির প্রভাব স্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার
প্রবোধ ভৌমিক

অনার্য[২] ভাষাবিজ্ঞানে অনার্য ভাষা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে অনার্য ভাষা বলিতে যে ভাষা আর্য (অর্থাৎ ইন্দো-ইওরোপীয় মূল ভাষার ইন্দো-ইরানীয়) শাখা প্রসূত নয় ; অর্থাৎ দক্ষিণ ও মধ্যভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, উত্তরভারতে ও মধ্যভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা এবং হিমালয়ের পাদভূমিতে প্রচলিত ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা। দ্বিতীয় অর্থে অনার্য ভাষা বলিতে সেই ভাষাকেই বুঝায় যে ভাষা ইন্দো-ইওরোপীয়, দ্রাবিড়ীয় অথবা ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা নয়, অর্থাৎ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। এই গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে পড়ে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, খাসী ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লাল সেনের গুরু ও ধর্মাধ্যক্ষ (১২শ শতাব্দী)। ইঁহার রচিত 'পিতৃদয়িতা' ও 'হারলতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বল্লাল সেন তাঁহার 'দানসাগর' গ্রন্থে ইঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়— ইনি বরেন্দ্র-ভূমিতে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। নিজ গ্রন্থের পুষ্পিকায় ইনি চাম্পাহট্টীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 'হারলতা'র বলা হইয়াছে ইনি গঙ্গাতীরবর্তী বিহার পট্টকের অধিবাসী ছিলেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনিল পুরাণ ধর্মমঙ্গল দ্র

অনুভূ (perigee) জ্যোতির্বিজ্ঞানে উপগ্রহের উপ-বৃত্তাকার কক্ষপথের মধ্যে অবস্থিত গ্রহ হইতে নিকটতম বিন্দুকে অনুভূ বা পেরিজি বলা হয়। যেমন পৃথিবী হইতে চন্দ্রের কক্ষপথের নিকটতম বিন্দু বা পেরিজির দূরত্ব হইল ৩৫৬৪০০ কিলোমিটার (২২১৪৬৩ মাইল) (অপভূর দূরত্ব ৪০৬৬৮৬ কিলোমিটার বা ২৫২৭১০ মাইল)। ভ্যানগার্ডের কক্ষপথের অনুভূর দূরত্ব ৩২২ কিলোমিটার (২০০ মাইল) এবং কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লো-রারের পৃথিবী হইতে নিকটতম দূরত্ব বা অনুভূ হইল ৩৫৪ কিলোমিটার (২২০ মাইল)।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনুভূতিনাশক ঔষধ অ্যানেস্থেসিয়া দ্র

অনুমতিকল্প দশবথুনি দ্র

অনুরাধপুর একাদিক্রমে প্রায় পনরশত বৎসরকাল সিংহলের রাজধানী ছিল। রাজা পাণ্ডুকাভয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অনুরাধপুর পত্তন করেন এবং রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করেন। উপর্যুপরি কয়েকজন রাজার প্রযত্নে নগরের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়, এমন কি

ব্রাহ্মণ জৈন আজীবিক ও বিভিন্ন পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের জন্য বাসস্থান এবং চিকিৎসালয় ও প্রসূতিভবনের ব্যবস্থা ছিল। খ্রীষ্টজন্মের সমসাময়িককালে নগরটি ঐশ্বর্যের শিখরে উঠিয়াছিল। বুদ্ধগয়া হইতে প্রেরিত বোধিদ্রুমের শাখা রাজা পিয়তিস্স কর্তৃক এখানকার মহাবিহারের কাননে রোপিত হইয়াছিল এবং সেই মহাবৃক্ষ এখনও দেখানো হইয়া থাকে। বুদ্ধের চিবুক বা গ্রীবাস্থি-ধৃত ধাতুগর্ভ নামক যে স্তূপ ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দেবানম্পিয়তিস্স কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল সেই স্তূপের কোণে দন্তপুর (পুরী) হইতে আনীত বুদ্ধের শৌবন দন্ত (canine tooth) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে স্থাপিত হয়। তাম্র মহাবিহার এবং মহাবংশে বর্ণিত 'রুবন্‌বেলি' এই নগরে অবস্থিত। এই স্তূপ রাজা দুট্‌ঠগামণী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। নগরের ইষিভূমাঙ্গন নামক স্থানটি মহীন্দের চিতাভূমি। এখানকার ঘণ্টাকর বিহারে ত্রিপিটকের অট্‌ঠকথা সিংহলী হইতে পালি ভাষায় বুদ্ধঘোষ কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে চোলরাজ সিংহল জয় করেন এবং রাজধানী অনুরাধপুর বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর সিংহল রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করিলে রাজধানী পলোন্নরুতে স্থানান্তরিত হয়। সিংহল সরকার এই স্থানের প্রত্নবস্তুসমূহ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

দ্র Wilhelm Geiger, *The Mahavamsa*, Colombo, 1950 ; H. W. Codrington, *A Short History of Ceylon*, London, 1939 ; H. Parker, *Ancient Ceylon*, London, 1909 ; S. Paranavitana, *The Excavations in the Citadel of Anuradhapura*, Memoirs of the Archaeological Survey of Ceylon, Colombo, 1936 ; Herman Oldenberg, ed. and tr., *Dipavamsa : An Ancient Buddhist Historical Record*, London, 1878 ; H. C. Ray, ed. *History of Ceylon*, vol. 1, part I, Colombo, 1959.

অনুরুদ্ধ বুদ্ধের খুল্লতাত অমিতোদনের পুত্র ছিলেন। ভ্রাতা মহানামের অনুরোধে তিনি আনন্দ ভগু কিম্বিল দেবদত্ত ও ক্ষৌরকার উপালির সহিত অনুপিয় আম্রবনে বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই দিব্যচক্ষু লাভ করেন। অনুরুদ্ধ স্নেহবৎসল, সংঘের পরম অনুরাগী এবং বুদ্ধের অতি প্রিয় ছিলেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের সময়ে অনুরুদ্ধ কুশিনারায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত স্থৈর্যে ভিক্ষুগণ নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই উপদেশে তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিয়াছিল। প্রথম ধর্মসংগীতির সময়ে অঙ্গুত্তরনিকায়ের সংরক্ষণ ও সংকলনের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হয়। বজ্জিদেশে বেলুবগ্রামে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

দ্র G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. 1, London, 1937.

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮ খ্রী) জন্ম ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮২, ২৪ ভাদ্র ১২৮৯ ; মৃত্যু ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮, ৬ বৈশাখ ১৩৬৫। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, মাতা ধরাসুন্দরী। পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্গসমাজে সমাজসংস্কারক হিসাবে এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ; তাঁহার জীবনচর্যা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবীর সাহিত্য-প্রীতি তাঁহাকে প্রভাবিত করে। তাঁহার প্রথম কবিতা ধ্রুবপাঠের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দশ বৎসর বয়সে উত্তরপাড়া-নিবাসী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শিখরনাথ পরবর্তী কালে আইন ব্যবসায় উপলক্ষে সস্ত্রীক মজঃফরপুরে বসবাস করেন। সাহিত্যকর্ম সমাজসেবা এবং গৃহকর্ম— অনুরূপা সকলই সমভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রানী দেবী' ছদ্মনামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় মুদ্রিত হয় এবং প্রথম উপন্যাস 'টিলকুঠী' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়, উহাতেই তাঁহার খ্যাতির সূত্রপাত। তাঁহার 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; স্টার রঙ্গমঞ্চে নাটকখানি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। 'মা', 'মহানিশা', 'পথের সাথী' এবং 'বাগ্‌দত্তা'ও নাট্যরূপে পরিবেশিত হয়। সমাজ-সংস্কারেও অনুরূপা অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। মজঃফরপুরে মহিলাদের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সহিত সংযুক্তভাবে কার্য করেন। একাধিক নারীকল্যাণ আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্‌ভিন্ন কাশী এবং কলিকাতার অনেকগুলি কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও অনুরূপা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিহার ভূমিকম্পে গুরুতর আহত হইয়াও

তিনি কল্যাণব্রত সংঘ স্থাপন করিয়া বহু বিপন্ন নরনারীর চিকিৎসা, আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি পণপ্রথা উচ্ছেদ, পুরুষের একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সভাসমিতি করেন। তিনি মনে করিতেন ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে সম্পত্তিঘটিত বিবাদে মুসলিম সমাজে শান্তি নাই, অনুরূপ আইনের দ্বারা হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে— তাহার দ্বারা হিন্দুনারীর কল্যাণ হইতে পারে না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পাঁচশত সভায় হিন্দু কোড্ বিল -এর বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করেন ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলন করেন। ভূদেবের আদর্শনিষ্ঠাকে কথাসাহিত্যে কাহিনীর সূত্রে পরিবেশন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৩৫ খ্রী) ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪১ খ্রী) প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

রচিত গ্রন্থরাজি . 'পোষ্যপুত্র', 'বাগ্‌দত্তা', 'জ্যোতিঃ-হারা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'মা', 'উত্তরায়ণ', 'পথহারা', 'চক্র', 'বিবর্তন', 'সর্বাণী', 'হিমাদ্রি', 'গরীবের মেয়ে', 'হারানো খাতা', 'সোনার খনি', 'ত্রিবেণী', 'জোয়ার ভাঁটা', 'রামগড়', 'পথের সাথী', 'প্রাণের পরশ', 'রাঙাশাঁখা', 'মধুমল্লী', 'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'বিস্মরণা', 'কুমারিল ভট্ট', 'নাট্যচতুষ্টয়', 'বর্ষচক্র', 'সাহিত্য ও সমাজ', 'সাহিত্যে নারী স্রষ্টী ও সৃষ্টি', 'উত্তরাখণ্ডের পত্র', 'স্ত্রী', 'বিচারপতি' ; অসমাপ্ত রচনা জীবনের স্মৃতিলেখা।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

অনুশীলন সমিতি বিপ্লব আন্দোলন দ্র

অনেকান্তবাদ জৈন দার্শনিকগণের একটি বিশেষ মত। অনেকান্তবাদ বলিতে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মতবাদ বুঝায়। এখানে 'অন্ত' শব্দের অর্থ হইতেছে 'পক্ষ' বা 'কোটি' বা 'ধর্ম'। বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জৈন দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে নিত্যও একটি 'অন্ত', অনিত্যও 'অন্ত'। যাহা একটি অন্তে বিদ্যমান, তাহা ঐকান্তিক। কিন্তু যাহা উভয় অন্তে বিদ্যমান তাহা অনৈকান্তিক। নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকায় বলা হইয়াছে— 'অস্তীতি নাস্তীতি উভে অপি অন্তাঃ। শুদ্ধীতি অশুদ্ধীতি ইমেপি অন্তাঃ। তস্মাদ্ উভে অন্তে বর্জয়িত্বা মধ্যেপি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ'। সুতরাং অস্তি ও নাস্তি, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি এক-একটি অন্ত বা ধর্ম বা পক্ষ। অতএব 'অনেকান্ত' শব্দের বিবক্ষিত অর্থ হইল— যাহাতে পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক ধর্মের সমাবেশ থাকে। যেখানে ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই সেখানে 'অন্ত' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। উপনিষদে বস্তুর স্বরূপ কেবল 'নিত্যসত্তা'তেই পর্যবসিত, আর বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে বস্তুর 'নিত্যসত্তা' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। যাহা প্রতীতির সাহায্যে উপলব্ধ হয়, তাহা কেবল ক্ষণবিধ্বংসী ও পরস্পর অসংবদ্ধ গুণ-প্রবাহ মাত্র। জৈনগণ উভয়ের সমন্বয়ে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বস্তু নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। নিত্যাংশে উহা 'দ্রব্য' এবং অনিত্যাংশে উহার নাম 'পর্যায়'। এই দ্রব্য-পর্যায়াত্মক বস্তুর স্বরূপ প্রদানই অনেকান্তবাদের মূলভিত্তি। বস্তুর এই স্বরূপকে প্রকাশ করিবার জন্য জৈনগণ সাতটি 'নয়ের' আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম—'স্যাদস্ত্যেব সর্বমিতি সদংশ-কল্পনা-বিভজনেন প্রথমো ভঙ্গঃ। যথা— স্যাদ্ অস্ত্যেব ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘটের অস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য। দ্বিতীয়—'স্যান্নাস্ত্যেব সর্বমিতি পর্যুদাস-কল্পনা-বিভজনেন দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ। যথা — স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘটের নাস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য। তৃতীয়—'স্যাদস্ত্যেব স্যান্নাস্ত্যেবেতি ক্রমেণ সদংশাসদংশ-কল্পনা-বিভজনেন তৃতীয়ো ভঙ্গঃ। যথা— স্যাদস্তি নাস্ত্যেব ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘটের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য। চতুর্থ— 'স্যাদবক্তব্যমেবেতি সমসময়ে বিধিনিষেধয়োরনির্বচনীয়-কল্পনা-বিভজনয়া চতুর্থো ভঙ্গঃ। যথা— স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘট সর্বাংশে বা আংশিকভাবে অব্যক্ত (অপরিস্ফুট)। পঞ্চম— 'স্যাদস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যমেবেতি বিধিপ্রাধান্যেন যুগপদ্‌বিধিনিষেধানির্বচনীয়-খ্যাপনা-কল্পনা-বিভজনায় পঞ্চমো ভঙ্গঃ। যথা— স্যাদস্ত্যেব স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘটের অস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য এবং উভয়ভাবেই অব্যক্ত। ষষ্ঠ—'স্যান্নাস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যমেবেতি নিষেধপ্রাধান্যেন যুগপন্নিষেধ-বিধ্য-নির্বচনীয়-কল্পনা-বিভজনয়া ষষ্ঠো ভঙ্গঃ। যথা— স্যান্নাস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যো ঘটঃ॥' অর্থাৎ ঘটের নাস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য এবং উভয়ভাবেই অবক্তব্য (অবর্ণনীয়)। সপ্তম— "স্যাদস্ত্যেব স্যান্নাস্ত্যেব স্যাদবক্তব্য-মেবেতি ক্রমাৎ সদংশাসদংশ-প্রাধান্য-কল্পনয়া যুগপদ্-বিধিনিষেধানির্বচনীয়-খ্যাপনা-কল্পনা-বিভজনয়া চ সপ্তমো ভঙ্গঃ। যথা— স্যাদস্ত্যেব নাস্ত্যেব অবক্তব্যঃ॥' অর্থাৎ ঘটের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সর্বাংশে বা আংশিকভাবে সত্য এবং উভয়ভাবেই যুগপৎ অবক্তব্য। এইরূপে সাতটি নয়ের মাধ্যমে জৈনগণ 'অনেকান্তবাদ' স্থাপনে প্রয়াসী

হইয়াছেন। 'স্যাদ্' শব্দদ্বারা এই মতবাদ ব্যক্ত করা হয় বলিয়া ইহা 'স্যাদ্বাদ' নামেও পরিচিত।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনোমা কানিংহ্যামের মতে গোরক্ষপুর জেলার অউমি নদী। তাঁহার মতে নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত চন্দৌলি নামক স্থান হইতে গৃহত্যাগী গৌতমের ভৃত্য ছন্দক তাঁহার অশ্ব কণ্টককে কপিলাবস্তুতে ফিরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু কালাইল (Carlleyle) বস্তি জেলার কুদাওয়া নদীকে অনোমা হইতে অভিন্ন মনে করেন এবং তমেশ্বর বা মনেয়া হইতে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) উত্তর-পূর্বে মহাথানডির স্তূপটিকে ছন্দকের প্রত্যাবর্তনের চিহ্নিত স্থান ও গোরক্ষপুর জেলার অনোমার পূর্বতীরে শিরসরাও-এর স্তূপটিকে গৌতমের কেশকর্তনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দেহের যে সকল গ্রন্থি রক্তে রস ক্ষরণ করে, সেইগুলিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে। এই ক্ষরিত রসের সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থকে বলে হর্মোন।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থিই প্রধান। এই গ্রন্থি মস্তিষ্কে অবস্থিত। ইহার তিনটি অংশ। সম্মুখের অংশটি অন্ততঃ ছয়টি বিভিন্ন হর্মোন ক্ষরণ করে— বৃদ্ধি-কারক হর্মোন (growth hormone), থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন (thyrotropin), অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোন (adrenocorticotropin) ও তিনটি যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন (gonadotropins)। এই সকল হর্মোনের দ্বারা পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশ (adrenal cortex), শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়কে (ovary) নিয়ন্ত্রিত করে। পিটুইটারির এই সম্মুখ-ভাগটিকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) নামক অংশ। শৈত্যে হাইপো-থ্যালামাস উদ্দীপিত হইয়া রক্তে একটি হর্মোন ক্ষরণ করে। ইহা পিটুইটারির সম্মুখভাগে পৌছিয়া থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। ইহা ছাড়া আকস্মিক বিপদ বা উত্তেজনায় হাইপোথ্যালামাস হইতে রক্তে একটি হর্মোনের ক্ষরণ ঘটে। ইহা পিটুইটারিতে গিয়া অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। প্রধানতঃ হাইপোথ্যালামাস হইতে রক্তে ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই পিটুইটারির সম্মুখভাগের হর্মোন ক্ষরিত হইয়া থাকে।

পিটুইটারির পশ্চাদ্ভাগের হর্মোন দুইটি— রক্তচাপ-বর্ধক হর্মোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন (vasopresin) ও অনৈচ্ছিক পেশী-সংকোচক হর্মোন বা অক্সিটোসিন (oxytocin)। পিটুইটারির পশ্চাদ্ভাগের ক্ষরণও হাইপোথ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু স্নায়ুর দ্বারাই হাইপোথ্যালামাস এই অংশটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তে ক্ষরিত কোনও হর্মোনের দ্বারা নয়।

পিটুইটারির মধ্যভাগের হর্মোন ইণ্টারমিডিন (inter-medin) নামে পরিচিত।

থাইরয়েড গ্রন্থি গলদেশে শ্বাসনালীর নিকট অবস্থিত। ইহার হর্মোন থাইরক্সিন (thyroxine)। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও হর্মোন-ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারির থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোনের দ্বারা। শেষোক্ত হর্মোনের ক্ষরণ বাড়িলে থাইরয়েড উদ্দীপ্ত হইয়া অধিকতর হর্মোন ক্ষরণ করে।

থাইরয়েডের সহিত চারিটি অতি ক্ষুদ্র প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের হর্মোন প্যারাথর্মোন (parathormone)। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণের দ্বারা। রক্তে ক্যালসিয়াম কমিয়া গেলে ইহারা উদ্দীপ্ত হইয়া রক্তে প্যারাথর্মোন ক্ষরণ করে।

প্রতিটি বৃক্কের (kidney) উপরে একটি অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি (adrenal) থাকে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির দুইটি অংশ— বহিরাংশ বা কর্টেক্স্-এর হর্মোন অনেকগুলি। এইগুলিকে কর্টিকয়েড্স্ (corticoids) বলা হয়। কেন্দ্রীয় অংশ বা মেডুলার হর্মোনের নাম অ্যাড্রিন্যালিন (adrenalin)। অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশকে নিয়ন্ত্রিত করে পিটুইটারির অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোন, আর কেন্দ্রীয় অংশটি নিয়ন্ত্রিত হয় সমব্যথী (sympathetic) স্নায়ুর দ্বারা। আকস্মিক বিপদ বা উত্তেজনায় একদিকে পিটুইটারি হইতে অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশকে হর্মোন-ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। অপর দিকে মস্তিষ্ক হইতে সমব্যথী স্নায়ুর দ্বারা আবেগ (impulse) আসিয়া অ্যাড্রিন্যালের কেন্দ্রীয় অংশে পৌছিয়া তাহাকে হর্মোন -ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। আবার এই কেন্দ্রীয় অংশের হর্মোন অ্যাড্রিন্যালিন ও পিটুইটারি হইতে অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশের ক্ষরণ উদ্দীপিত করিতে পারে।

অগ্ন্যাশয় (pancreas), শুক্রাশয় (testis) ও ডিম্বাশয় (ovary) গ্রন্থি তিনটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একদিকে অগ্ন্যাশয় ক্ষুদ্রান্ত্রে পাচকরস ক্ষরণ করে এবং শুক্রাশয়

পুং-জননকোষ ও ডিম্বাশয় ডিম্বাণু উৎপাদন করে। অপর দিকে আবার এই তিনটি গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হিসাবেও কাজ করে। অগ্ন্যাশয় রক্তের মধ্যে দুইটি হর্মোন ক্ষরণ করে— ইন্‌স্যুলিন (insulin) ও গ্লুকাগন (glucagon)। ইহাদের ক্ষরণ প্রধানতঃ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাধিক্য ঘটিলে অগ্ন্যাশয় উদ্দীপিত হইয়া ইন্‌স্যুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে এবং রক্তে গ্লুকোজ কমিয়া গেলে গ্লুকাগন ক্ষরিত হইতে পারে। আকস্মিক অবস্থায় ইন্‌স্যুলিনের ক্ষরণ সম্ভবতঃ সমব্যথী স্নায়ুর দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। শুক্রাশয় ক্ষরণ করে পুং-যৌন হর্মোন টেস্টোস্টেরোন (testosterone) আর ডিম্বাশয় ক্ষরণ করে দুইটি স্ত্রী-যৌন হর্মোন— ঈস্ট্রোজেন (estrogen) ও প্রোজেস্টেরোন (progesterone)। এই দুইটি গ্রন্থির হর্মোন-ক্ষরণ পিটুইটারির যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোনগুলির উপর নির্ভর করে। এই গ্রন্থিদ্বয়ের ক্ষরণ বয়ঃপ্রাপ্তির সময় শুরু হয় ও বার্ধক্যের আগমনে হ্রাস পায়।

ইহা ছাড়া বক্ষোস্থির (sternum) নিকট থাইমাস (thymus) ও মস্তিষ্কে পিনিয়াল গ্রন্থিও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের হর্মোন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে থাইমাস গ্রন্থি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় বয়ঃপ্রাপ্তির সময় পর্যন্ত আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহার পর ইহার আয়তন হ্রাস পায়।

অধিকাংশ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল ও যৌন-গ্রন্থিগুলির উপর পিটুইটারির প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এই গ্রন্থিগুলিও পিটুইটারিকে প্রভাবান্বিত করে। রক্তে থাইরয়েডের হর্মোন থাইরক্‌সিনের মাত্রাধিক্য ঘটিলে পিটুইটারি হইতে থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ কমিয়া যায়। অনুরূপভাবে রক্তে অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশের কর্টিকয়েড হর্মোনগুলির আধিক্য হইলে পিটুইটারির অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্‌স্‌-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ হ্রাস পায়। আবার রক্তে ঈস্ট্রোজেনের আধিক্যে পিটুইটারির যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ প্রভাবিত হয়।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয় ও অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাংশ প্রাণধারণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কেন্দ্রীয় অংশ, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও জীবনধারণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। এইগুলিকে নষ্ট করিয়া দিলে দেহের স্বাভাবিক কার্যাবলী ও স্বাস্থ্য অল্পাধিক বিপর্যস্ত হয়। যেমন, শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় কাটিয়া বাদ দিলে জীবের প্রজননশক্তি ও যৌনবোধ লোপ পায় এবং অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কেন্দ্রীয় অংশ নষ্ট করিয়া দিলে উত্তেজনা বা আকস্মিক বিপদে দেহ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অসহায় হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভারবহন বা মাংস-উৎপাদনের কার্যে উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য পালিত গো-মহিষ, ছাগল, কুক্কুট প্রভৃতির দেহ হইতে শুক্রাশয়, কাটিয়া বাদ দেওয়ার পদ্ধতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। মধ্যযুগে ক্রীতদাসদিগের দেহ হইতেও শুক্রাশয় বাদ দিয়া তাহাদের ক্লীবে পরিণত করা হইত ও 'খোজা' প্রহরীরূপে মুসলমান হারেমে নিযুক্ত করা হইত।

স্নায়ুতন্ত্রের সহিত সহযোগিতায় কার্য করিয়া অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি কেবল যে জীবের দৈহিক অবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা নহে— ইহারা মানসিক চিন্তা ও বোধকেও বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। 'হর্মোন' দ্র।

দেবজ্যোতি দাস

অন্তিয়োক মৌর্য সম্রাট্ অশোক তাঁহার শিলালিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি যবনরাজ অন্তিয়োক এবং অন্য চারিজন (যবন) রাজার রাজ্যে (বৌদ্ধ) ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই অন্তিয়োক এশিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত সিরিয়া রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অন্তিয়োক (Antiochus II Theos)। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ হইতে ২৪৬ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস প্রতিষ্ঠিত সিরিয়া দেশের রাজগণের সহিত মৌর্য রাজগণের সদ্ভাব ছিল এবং দূত-বিনিময় হইত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অন্ত্যেষ্টি[১] শেষ যজ্ঞ অথবা অন্তিম সংস্কার। বর্তমানে মুখ্যতঃ শবদাহ। দাহের পূর্বে ঘৃত মাখাইয়া শবদেহ স্নান ও চন্দনচর্চিত করাইয়া উহার দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই চক্ষু ও মুখে সাত খণ্ড সোনা বা কাঁসার টুকরা দিয়া মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। শব চিতায় স্থাপন করার পর উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুত্র কন্যা বা কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাহার মুখে অগ্নিসংযোগ করেন। দাহকার্য শেষ হইলে চিতাগ্নিতে এক এক করিয়া সাত টুকরা ছোট ছোট কাঠ দিয়া কুঠারের দ্বারা জলন্ত চিতার উপর সাতবার আঘাত করিতে হয়। তাহার পর যিনি মুখাগ্নি করিয়াছেন তিনি সাত কলসী ও অন্য সকলে এক এক কলসী জলের দ্বারা চিতার আগুন নিভাইয়া দেন। চিতাস্থানে একটি জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া পিছন

ফিরিয়া বাম হাতে একটি দণ্ড লইয়া উহা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। আগুনের দিকে আর না তাকাইয়া স্নান করিতে যাইতে হয়। বাড়ির দরজায় ফিরিয়া নিমের পাতা দাঁতে কাটিয়া শমী প্রস্তর অগ্নি বৃষ ছাগ জল গোময় শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিয়া শিশুকে আগে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করা নিয়ম। দিবসে দাহ হইলে রাত্রিতে গ্রামে প্রবেশ করিতে হয় এবং রাত্রে দাহ হইলে দিনে প্রবেশ করিতে হয়।

গর্ভবতী নারীর শব দাহ করিবার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান নিষ্কাশিত করিয়া মাটিতে প্রোথিত করিতে হয়। কাহারও যথানিয়মে শব সংকার না হইয়া থাকিলে, সংকার সম্বন্ধে কোনও নির্ভরযোগ্য সংবাদ না পাওয়া গেলে অথবা দ্বাদশ বৎসর কেহ নিরুদ্দেশ থাকিলে পর্ণনর (চলতি কথায় কুশপুত্তলিকা) দাহের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মেষলোমের সূত্রের দ্বারা গ্রথিত শরপত্র ও পলাশপত্রের সাহায্যে নরাকৃতি পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া নারিকেল ফলের দ্বারা উহার মস্তক প্রস্তুত করিতে হয় এবং যবের পিটুলি দ্বারা ঐ পুত্তলিকা লেপিয়া দিয়া যথানিয়মে দাহ করিতে হয়। সাধুসন্ন্যাসী বা দুই বৎসর বয়সের কম শিশুর শব দাহ না করিয়া ভূগর্ভে সমাহিত করিবার বিধি আছে। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির শব জলে ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা কোথাও কোথাও দেখা যায়। শবদাহের সংগতি যাহাদের নাই তাহারা শবের মুখে আগুন ছোঁয়াইয়া জলে ভাসাইয়া দেয়।

দ্র রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব; P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. IV, Poona, 1953.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অন্ত্যেষ্টি[২] পার্শী (জরথুস্ত্রীয়) অন্ত্যেষ্টিপ্রথার অনুষ্ঠান রন্দিবাদ-এর জনস্বাস্থ্য সূত্রানুযায়ী পালিত হয়। প্রথমতঃ মৃতের শরীর স্নান করাইয়া শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়, পরে শিলাসনে দেহ শায়িত করা হয় এবং মৃতের নিজ গৃহে অথবা স্থানীয় পার্শী সমাজের মিলনকেন্দ্রে একটি কুকুর সাক্ষী করিয়া ও অগ্নি লইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ধর্মাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর দেহটিকে আর স্পর্শ করা হয় না। দিবালোকের মধ্যে শবদেহ স্থানান্তরিত করা চলে; এইসময়ে গাথাসমূহের আবৃত্তি করা হয়; পুরোহিতগণ ও অন্যান্যেরা শবের অনুগমন করেন। দখ্‌মা (Dakhma—ইংরেজীতে Tower of Silence অর্থাৎ 'নিঃশব্দ শান্তির মন্দির') —শবমন্দিরে গিয়া পরিচ্ছদাদি সরাইয়া লইয়া মৃতদেহটিকে অনাবৃতভাবে দখ্‌মার উপরিভাগে উন্মুক্ত আকাশের তলে রাখিয়া দেওয়া হয়। ঐ স্থানে স্নান এবং প্রার্থনাদি সমাপনান্তে শবানুগামীগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনদিনের জন্য আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ। তিনদিন সন্ধ্যায় 'শ্রওষ' (Sraosha) দেবের স্তব ও মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। তৃতীয় দিনে 'উথম্না' (Uthamna) সভার অনুষ্ঠান হয়। আত্মার মুক্তির জন্য চতুর্থ দিবসের ঊষাকালে শেষ বিচারের দিন-সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। ১০ম, ৩০শ এবং ৩৬৫তম দিবসে অন্যান্য অনুষ্ঠান পালিত হয়। 'ফ্রবষী' (Fravashi) অর্থাৎ মহাপুরুষগণের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট দিনে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

আর্দেশীর দীন্‌শা

অন্ত্র (intestines) পাকস্থলীর পর হইতে মলদ্বার পর্যন্ত পৌষ্টিক নালীর অংশকে অন্ত্র বলে। এখানে খাদ্যের পাচন ও আত্তীকরণ সম্পন্ন হয়। প্রথম ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্র ও দ্বিতীয় ভাগ বৃহদন্ত্র।

ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ৬.৫ মিটার দীর্ঘ। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের দিকের গাত্রে থাকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, তাহার বাহিরে যথাক্রমে বৃত্তাকার ও লম্বালম্বি পেশীর দুইটি স্তর আছে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, অংশগুলি পরস্পর সংলগ্ন ও উহাদের প্রভেদ প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থিগুলির আকৃতি-প্রকৃতিতে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পাকস্থলী সংলগ্ন প্রথমাংশ ডুয়োডেনাম প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ; যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের নালীগুলি ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় অংশ জেজুনাম দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের অবশিষ্ট ভাগের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। অবশিষ্টাংশের নাম ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে আন্ত্রিক রস বলে। এই রস ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩ লিটার পরিমাণে ক্ষরিত হয়। ইহা ক্ষারধর্মী এবং ইহাতে অ্যামাইলেজ্, পেপটাইডেজ্, এণ্টারোকাইনেজ্, লাইপেজ্ প্রভৃতি এন্‌জাইম থাকে—প্রথমটি শর্করার, পরের দুইটি প্রোটিনের ও চতুর্থটি স্নেহজাতীয় পদার্থের পাচনে সাহায্য করে। আন্ত্রিক রস, অগ্ন্যাশয়ের পাচক রস ও যকৃতের পিত্তের মিলিত কার্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থের পাচনক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং পাচিত খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেই রক্তে গৃহীত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশীগুলির সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য বৃহদন্ত্রের দিকে পরিচালিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পর বৃহদন্ত্রের আরম্ভ। বৃহদন্ত্র প্রায় ১.৫ মিটার দীর্ঘ। ইহা সিকাম ও কোলোন এই দুই অংশে বিভক্ত। সিকাম দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে প্রায় ৭.৫ সেন্টিমিটার। কোলোন আরোহী, আড়াআড়ি,

অবরোহী, সিগময়েড প্রভৃতি অংশে বিভক্ত। দৈর্ঘ্যে প্রথমাংশটি প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার, দ্বিতীয়াংশটি প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার, তৃতীয়াংশটি প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থিগুলি কেবল শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে এবং কোনও এন্‌জাইম ক্ষরণ করে না। অবশ্য কোলোন-এ বিভিন্ন জীবাণু সেলুলোজ প্রভৃতি শর্করা ও প্রোটিনকে ভাঙিতে পারে ও কয়েকটি ভিটামিনও প্রস্তুত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বৃহদন্ত্র খাদ্য হইতে জল শোষণ করিয়া লয়। ফলে খাদ্যের অপাচ্য অংশগুলি জমাট বাঁধিয়া মলের সৃষ্টি করে। বৃহদন্ত্র হইতে ইহা মলনালীতে যায়। মলনালী প্রায় ১০ হইতে ১২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। এখান হইতে মল মলদ্বার দিয়া দেহের বাহিরে যায়। মলদ্বারটি প্রায় ২·৫ হইতে ৩·৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও একটি পেশীবন্ধনীর দ্বারা সুরক্ষিত।

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

অন্ধকূপ-হত্যা হলওয়েল-বর্ণিত হত্যাকাণ্ড। তাঁহার মতে (*Narrative of the Black Hole* গ্রন্থ দ্র) সিরাজুদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার করিবার পর ১৭৫৬ খ্রী ২০ জুন কলিকাতার ১৪৬ জন ইংরেজ অধিবাসীকে ‘অন্ধকূপ’ নামে পরিচিত ৫৪৯ সেন্টিমিটার (১৮ ফুট) দীর্ঘ ও ৪৫২ সেন্টিমিটার (১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি) প্রশস্ত এক ক্ষুদ্র কক্ষে সমস্ত রাত্রি আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ফলে বন্দীদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই কাহিনীর সত্যতা এবং এই সম্পর্কে নবাবের দায়িত্বের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ২০ জুন সন্ধ্যায় নবাবের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ১৪৬ জন ইওরোপীয় বন্দী থাকা সম্ভব ছিল না, ইহা ইংরেজ লেখকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতেই জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ ২৬৭ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট কক্ষে ১৪৬ জন ব্যক্তির স্থান সংকুলান কোনক্রমেই সম্ভব নহে। ভোলানাথ চন্দ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে যুদ্ধজনিত বিশৃঙ্খলার ফলে ও শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতা এবং নথিপত্র খোয়া যাওয়ার দরুন যাহারই মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহারই নাম অন্ধকূপে নিহতদের তালিকাভুক্ত করা হয়। অধিকন্তু অন্ধকূপ নবাবের সৃষ্ট কোনও কারাকক্ষ নহে। ইংরেজরাই ঐ কক্ষে বন্দীদের আবদ্ধ রাখিত। যে সকল সৈন্য নবাবের সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, উহাদের কেহ কেহ মত্তাবস্থায় নবাবের সৈন্যদের আক্রমণ করায় তাহাদের আবদ্ধ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইরূপ বন্দীর সংখ্যাও ৬০ জনের অধিক হইতে পারে না। সম্ভবতঃ কয়েকজন বন্দী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একজন মাত্র মহিলার এইরূপ বন্দীদশা ঘটিয়াছিল। কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাইয়াছিলেন। অন্ধকূপ-হত্যার জন্য সিরাজুদ্দৌলা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নাই। নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার্থ ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে অন্ধকূপের নিকটবর্তী স্থানে এক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ফলে এই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অন্ধশিক্ষা নানাদেশের বহু শিক্ষাবিৎ বিভিন্ন উপায়ে অন্ধদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছেন। স্পেনদেশের ফ্র্যান্সিস্কো লুকাস কাঠের উপর খোদিত অক্ষর দ্বারা অন্ধশিক্ষার প্রয়াস পান। ইহা ছাড়া শক্ত কাগজ কাটিয়া অক্ষর তৈয়ারি করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও প্রচলনের প্রচেষ্টা হয়। ফরাসী দেশের লুই ব্রেইল (১৮০৯-১৮৫২ খ্রী) বাল্যকালে দুর্ঘটনায় অন্ধ হইয়া যান। পরবর্তী জীবনে তিনি অন্ধশিক্ষার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাহাকে ব্রেইল-পদ্ধতি বলা হয়। ইহাতে কাগজে ছয়টি উন্নত বিন্দুর সমাহারে অক্ষর, ছেদচিহ্ন ও সংখ্যা প্রভৃতি লিখিত হয়। বিশেষভাবে প্রস্তুত সচ্ছিদ্র একটি ধাতব পাতের সাহায্যে পঙ্‌ক্তি ঠিক রাখিয়া নরম কাগজে ধাতব লেখনীর দ্বারা এই পদ্ধতিতে লিখিতে হয়। ইহা ছাড়া বিশেষভাবে প্রস্তুত টাইপরাইটার যন্ত্রের সাহায্যেও ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা যায়। এই পদ্ধতিতে লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকগুলি অঙ্গুলির সাহায্যে অনুভব করিয়া পড়িতে হয়। এই পদ্ধতি পরিমার্জিত হইয়া বর্তমানে সকল সভ্যদেশেই গৃহীত হইয়াছে। একদিকে ব্রেইল-পদ্ধতির দ্বারা যেমন অন্ধের সম্মুখে বহির্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার দ্বারাও অন্ধ ব্যক্তির জীবিকার্জন সহজ করা হইয়াছে।

ভারতে অন্ধশিক্ষার গোড়াপত্তন করেন প্রধানতঃ ইওরোপীয় মিশনারীগণ। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ অন্ধশিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রসারে উদ্যোগী হন। ভারত সরকারের উদ্যোগে ও ইউনেস্কোর সহায়তায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ব্রেইল-পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। ইহা ‘ভারতী ব্রেইল’ নামে

অন্ধ্র প্রদেশ

পরিচিত। ভারতী ব্রেইল পদ্ধতি অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণের এবং শিক্ষোপযোগী আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য দেরাদুনে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। দেরাদুনে বয়স্ক অন্ধদের সর্বভারতীয় শিক্ষণকেন্দ্র আছে। অন্ধদের শিক্ষার সুবিধার জন্য কিছু কিছু বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অন্ধদের শিক্ষার জন্য চারিটি বিদ্যালয় আছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয় অন্যতম। বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ আবাসিক। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও অন্ধশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা

আরতি দাশ

অন্ধ্র প্রদেশ[১] দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত তেলুগু যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা এখন আপনাদিগকে এবং আপনাদের দেশকে 'আন্ধ্র' বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখমালায় 'অন্ধ্র' নাম সুপ্রচলিত। বাংলায় তেলুগু ভাষাকে 'তেলেগু' এবং তেলুগুভাষীদিগকে কখনও কখনও 'তেলিঙ্গা' বলা হয়। মধ্যযুগের সংস্কৃত গ্রন্থ ও লেখাদিতে এই জাতি এবং দেশ বুঝাইতে অনেক সময় তিলিঙ্গ, তেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, ত্রিলিঙ্গ প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইত। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রের পূর্বে, কান্যকুব্জের দক্ষিণে, কলিঙ্গের পশ্চিমে এবং পাণ্ড্যদেশের উত্তরে তিলিঙ্গদেশ অবস্থিত। তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণেরা পঞ্চদ্রাবিড় সংজ্ঞক ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর একটি প্রধান শাখা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ফলে তাঁহার কতকগুলি পুত্রের অপত্যগণ 'অন্ধ্র' প্রভৃতি নীচজাতিতে পরিণত হয় এবং আর্যদেশের প্রান্তভাগে বাস করিতে থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কালে অন্ধ্রজাতি আর্যাবর্তের দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের সন্নিকটে বাস করিত। পরে তাহারা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে সরিয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যসম্রাট্ অশোক (আনুমানিক ২৬৯-২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) তদীয় লেখাবলীতে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য জাতিসমূহের মধ্যে অন্ধ্রদিগের নাম করিয়াছেন।

আনুমানিক ১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৌর্য বংশ উচ্ছেদ করিয়া শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণগণ মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। উহার ১১২ বৎসর পর কাণ্বায়ন বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাণ্বায়ন বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উত্তরার্ধে অন্ধ্রজাতীয় সিমুক দক্ষিণাপথ ও মালব অঞ্চলে শাতবাহন রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। সিমুক প্রথমে শেষ কাণ্বায়নরাজ সুশর্মার সামন্ত ছিলেন। শাতবাহনেরা আপনাদিগকে 'দক্ষিণাপথেশ্বর' বলিতেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল গোদাবরী নদীর তীরবর্তী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আধুনিক মহারাষ্ট্র প্রদেশের ঔরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত পৈঠন। ব্রাহ্মণরক্ত সংস্রবের জন্য শাতবাহনরাজগণ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেন; কিন্তু গোঁড়া সমাজপতিরা তাঁহাদিগকে শূদ্র মনে করিতেন।

সিমুকের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম শাতকর্ণি মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে শাতবাহন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বৈদেশিক শক রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০-১২৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষহরাত বংশীয় শক নরপতি নহপানের সামন্ত ঋষভদত্ত উত্তর-মহারাষ্ট্রের নাসিক-পুনা অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। নহপান স্বয়ং সম্ভবতঃ কুষাণ সম্রাট্গণের সামন্ত ও পশ্চিম-ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু শাতবাহন বংশীয় গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (আনুমানিক ১০৬-১৩০ খ্রী) নহপানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া উত্তরে মালব ও কাঠিয়াবাড় পর্যন্ত অধিকার করেন।

পূর্বতন শাতবাহন রাজ্যের উত্তরাংশে গৌতমীপুত্রের অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নহপানের পতনের পর ১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কার্দমক বংশীয় শকরাজ চষ্টন এবং তদীয় পৌত্র ও সহকারী রুদ্রদামা গৌতমীপুত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রুদ্রদামার হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি শকরাজের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কেবলমাত্র নাসিক-পুনা অঞ্চলে শাতবাহন অধিকার বজায় রহিল। পশ্চিম ভারতের অন্যান্য জনপদে রুদ্রদামার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। কার্দমকেরা উজ্জয়িনী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া পশ্চিম ভারত শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু গৌতমীপুত্রের উত্তরাধিকারীগণের আমলে উত্তরে শক রাজ্যের কিয়দংশ এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা-গুণ্টূর অঞ্চলে শাতবাহন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী হইলেও অমরাবতী ও নাগার্জুনি কোণ্ডার বৌদ্ধ বিহারসমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে শাতবাহন বংশের পতন ঘটিলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে নাগার্জুনি কোণ্ডা উপত্যকায়

অন্ধ্র প্রদেশ

অবস্থিত বিজয়পুরীর ইক্ষ্বাকু বংশ প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঞ্চীর পল্লববংশীয় রাজগণ অন্ধ্রাপথ অর্থাৎ কৃষ্ণা-গুণ্টুর অঞ্চল অধিকার করেন। এই সময়ে পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলের বেঙ্গীনগরে শালঙ্কায়ন বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ঐ অঞ্চলে বিষ্ণুকুণ্ডীবংশীয় রাজগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রথম শান্তমূল, পল্লবরাজ শিবস্কন্দবর্মা এবং শালঙ্কায়ন বংশের দেববর্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্নাংশে বৃহৎফলায়ন, বাকাটক, নল প্রভৃতি আরও কতকগুলি রাজবংশের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। পশ্চিম গোদাবরী ও বিশাখপট্টনমের কোনও কোনও নরপতি আপনাদিগকে 'কলিঙ্গাধিপতি' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও রাজধানী ছিল পিষ্টপুর (বর্তমান পিঠাপুরম্)। আনুমানিক ৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকাকুলমের নিকটবর্তী কলিঙ্গনগরে গঙ্গবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাদামির চালুক্যবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খ্রী) নিম্ন গোদাবরীর উভয় তীরবর্তী পিষ্টপুর ও বেঙ্গী অঞ্চল অধিকার করিয়া স্বীয় ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে ঐ জনপদে স্থাপিত করেন। বিষ্ণুবর্ধনের উত্তরাধিকারীগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে বেঙ্গীরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিহাসে 'বেঙ্গীর পূর্বচালুক্য' নামে পরিচিত। প্রথমে পিষ্টপুর, পরে বেঙ্গী এবং শেষে রাজমহেন্দ্রীতে (রাজমন্দ্রী) তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

এই বংশের দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য নরেন্দ্রমৃগরাজ (নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) সার্ধ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অষ্টোত্তরশত যুদ্ধে রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গরাজগণের সৈন্য পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র তৃতীয় গুণগ বিজয়াদিত্যও মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। দশম শতাব্দীর অন্তিমভাগে চোলসম্রাট্ প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৬ খ্রী) বেঙ্গীদেশ অধিকার করিয়া পূর্বচালুক্যবংশীয় শক্তিবর্মাকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। পূর্বচালুক্য রাজ্যে প্রভাব বিস্তার উপলক্ষে তখন হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চোল এবং কল্যাণের উত্তরকালীন চালুক্য রাজগণের মধ্যে বিবাদ চলিয়াছিল। চোলসম্রাট্ রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র এবং পূর্বচালুক্য নরপতি রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোল সিংহাসন লাভ করিবার পর বেঙ্গীরাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়।

একাদশ শতাব্দীতে হনুমকোণ্ডা ও বরঙ্গলের কাকতীয় রাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া অন্ধ্র প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই বংশের গণপতি (১১৯৮-১২৬২ খ্রী) প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণে মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্চীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রানী রুদ্রাম্বার শাসনদক্ষতা ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলোর প্রশংসালাভ করিয়াছিল। ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রাম্বার দৌহিত্র দিল্লীর খিল্‌জীবংশীয় সুলতান আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাকতীয় রাজ্য দিল্লীর তোগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দিল্লীর সুলতানদিগের অধঃপতনের সুযোগে অন্ধ্র প্রদেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোণ্ডাবীডু ও রাজমহেন্দ্রীর রেড্ডি রাজ্যদ্বয় উল্লেখযোগ্য। কোণ্ডাবীডুর কুমারগিরি রেড্ডি (১৩৮৬-১৪০২ খ্রী) বিদ্বান্ এবং বিদ্বজ্জনের পরিপোষক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই দুইটি রাজ্যে প্রথমে বিজয়নগর রাজগণের এবং পরে উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় নৃপতিগণের অধিকার বিস্তৃত হয়। গজপতি বংশের স্থাপয়িতা কপিলেন্দ্র (১৪৩৫-১৪৬৭ খ্রী) অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাডের অনেকগুলি জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বেল্লারী জেলাস্থিত বিজয়নগরকে কেন্দ্র করিয়া একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের পত্তন হয়। বিজয়নগর রাজগণ প্রথমে কর্নাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে সমগ্র তামিলনাডে তাঁহাদের আধিপত্য প্রসারিত হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯ খ্রী) কপিলেন্দ্রের দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রের হস্ত হইতে গজপতি সাম্রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সদাশিব রক্ষসতঙ্গড়ি নামক স্থানের এক ভীষণ যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের চারিটি মুসলিম রাজ্যের সম্মিলিত সেনাদলের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

আলাউদ্দীন বহ্‌মন শাহ্ (১৩৪৭-১৩৫৮ খ্রী) গুলবর্গা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া বহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর অন্ধ্র প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশাল বহ্‌মনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাঁচটি মুসলমান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এইগুলির অন্যতম ছিল কুলী কুতুবশাহ্ (১৫১৮-১৫৪৩ খ্রী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুতুবশাহী রাজ্য। হায়দরাবাদের ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত গোলকোণ্ডা দুর্গ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ ফররুখশিয়র 'নিজামউল্-মুল্ক' উপাধি দিয়া আসফ জাহ্ নামক এক ব্যক্তিকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আসফ জাহ্ প্রায় স্বাধীনভাবে দক্ষিণ ভারতের মোগল রাজ্যাংশ শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণ সাধারণতঃ নিজাম নামে পরিচিত। হায়দরাবাদ নগরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট সামরিক সাহায্য লাভের জন্য উত্তর সরকার অর্থাৎ কোণ্ডাপল্লি, এলুরু, রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকুলম নামক চারিটি জনপদের কর্তৃত্ব উক্ত কোম্পানির হস্তে অর্পণ করেন। এই অঞ্চল বঙ্গোপ-সাগরের তীরে কৃষ্ণা নদী হইতে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সওয়া পাঁচ কোটি টাকা।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদিগের স্থলে ক্রমশঃ ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব বর্ধিত হইতে থাকে। ফলে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ নিজামের নিকট হইতে উত্তর সরকার লাভ করে। শীঘ্রই গুন্টুর অঞ্চলেও ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত হয়। এই সকল জনপদ ইংরেজ শাসিত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার সময় তেলিঙ্গানা হায়দরাবাদের নিজামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান রাজ্যের অপরাংশ ছিল ব্রিটিশ-ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অংশ। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তেলুগুভাষী জেলাগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইল। কর্নূল ঐ প্রদেশের প্রধান নগর হইল।

ইতিমধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম রাজ্যে ভারত-সরকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিছুকালের জন্য মহামান্য নিজাম বাহাদুর প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে ঐ জনপদ শাসন করেন। অতঃপর নিজাম রাজ্যের মারাঠী, কন্নড এবং তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলত্রয় বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ রাজ্যের অস্তিত্বলোপের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর নিজামের শাসনাধীন তেলিঙ্গানা জনপদ নবগঠিত প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃহত্তর 'অন্ধ্র প্রদেশ' গঠিত হইল। তখন প্রাদেশিক রাজধানী কর্নূল হইতে হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিগ্‌বর্তী দেশসমূহে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে প্রাচীন কলিঙ্গবাসীর দান উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরস্থিত অঞ্চলের অধিবাসীরাই ঐ কলিঙ্গ জাতির বংশধর। অন্ধ্র প্রদেশ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। প্রাকৃত সত্তসঈ বা গাথাসপ্তশতী শাতবাহনরাজ হালের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিংবদন্তী অনুসারে গুণাঢ্যের প্রাকৃত বৃহৎকথা এবং সর্ববর্মা রচিত সংস্কৃত কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ শাতবাহন রাজসভায় লিখিত হইয়াছিল। কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচরিত রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডী অন্ধ্রদেশীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নন্নিচোড়কৃত কুমারসম্ভবমু এবং নন্নয় রচিত আন্ধ্র মহা-ভারতমু প্রাচীন তেলুগু সাহিত্যের গৌরব। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি পূর্বচালুক্য বংশীয় প্রথম রাজরাজের রাজত্বকালে (১০১৯-১০৬১ খ্রী) রচিত হইয়াছিল।

পূর্বভারতের পালবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনে হীন জাতি হিসাবে অন্ধ্রদিগের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অন্ধ্র-দেশীয় অন্ত্যজ জাতিসমূহের লোকেরা জীবিকার্জনের জন্য পালরাজ্যে আসিয়া বিভিন্ন নিম্নবৃত্তি অবলম্বন করিত।

দ্র M. Rama Rao, *Andhra through the Ages*, Guntur, 1957 ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IV, Bombay, 1955 ; Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, *India 1963*, Delhi, 1963 ; Dinesh Chandra Sirkar, *The Successors of the Satavahanas in the Lower Deccan*, Calcutta, 1934.

দীনেশচন্দ্র সরকার

অন্ধ্র প্রদেশ[২] ভারতের অন্যতম রাজ্য; আয়তন ২৭২০৯২ বর্গ কিলোমিটার (১০৬২৮৬ বর্গমাইল)। দাক্ষিণাত্য উপত্যকার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত এই রাজ্যের দক্ষিণে মাদ্রাজ, পশ্চিমে মহীশূর, উত্তর-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর; সমুদ্রোপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার (প্রায় ৬০০ মাইল)। রাজ্যটির মানচিত্রের আকৃতি সম্পর্কে খর্বগ্রীব ও স্ফীতোদর, এই বর্ণনা অনেকটা যথাযথ। রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত বরাবর পূর্বঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত। বিভিন্ন নদীর নকশা-কাটা অনুচ্চ পর্বতরাজি, উর্বর নদী-উপত্যকা এবং সমতল উপকূল-অঞ্চল— এক কথায় ইহাই অন্ধ্র প্রদেশের ভূ-সংস্থান। সমগ্র রাজ্য ব্যাপিয়া পর্বত ও অধিত্যকা-ভূমি ইতস্ততঃ বিস্তৃত। রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী

অন্ধ্র প্রদেশ
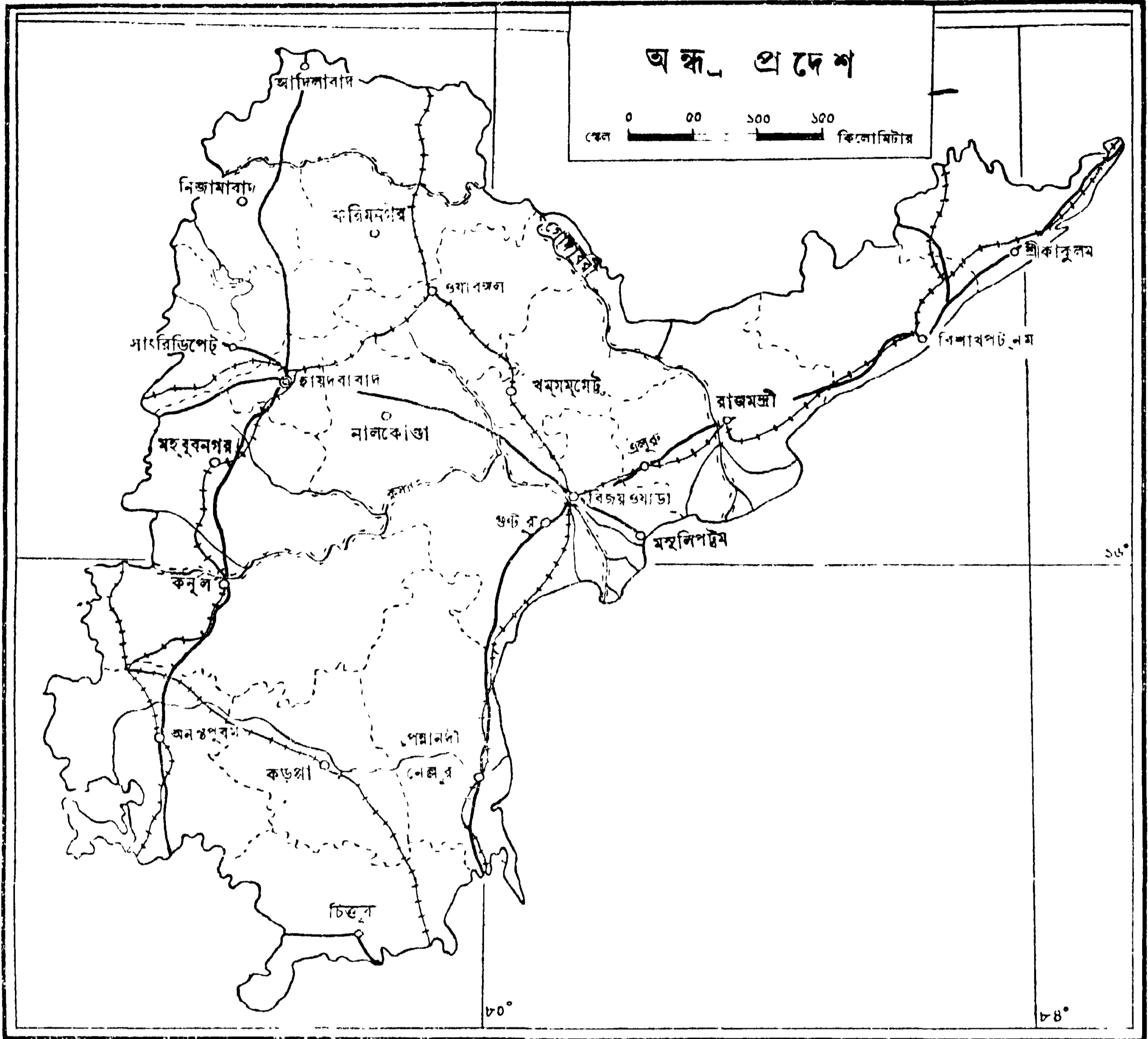
বিভিন্ন প্রকারের— কোথাও গোদাবরী-কৃষ্ণা-বিধৌত উর্বর উপত্যকাভূমি, কোথাও রয়ালসীমার পর্বতসংকুল অধিত্যকা, কোথাও উত্তর-সরকার অঞ্চলের অসমতল উন্নতভূমি, কোথাও বা নেল্লুর-গুণ্টুর অঞ্চলের বালুকাময় সমুদ্রোপকূল ; কিন্তু সর্বত্রই অতি মনোরম। কতকগুলি পর্বত উচ্চ এবং বনসম্পদময়, কতকগুলিতে ছোটখাটো ঝোপঝাড় ও গাছপালার সাধারণ জঙ্গল আছে এবং অনেকগুলি সম্পূর্ণ ঊষর। শ্রীকাকুলম, বিশাখপট্টনম, গোদাবরী, কর্নুল, ওয়ারঙ্গল এবং আদিলাবাদ জেলায় বিশাল বনভূমি আছে।

গোদাবরী এবং কৃষ্ণা এই রাজ্যের দুইটি প্রধান নদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নদীর সংখ্যা ত্রিশের অধিক। অনুমান করা হয় সমস্ত নদী হইতে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত জলের পরিমাণ বৎসরে ১৮৮২ মিলিয়ন হেক্টর সেন্টিমিটার (১৫০ মিলিয়ন একর ফুট)। গোদাবরী শাখানদীগুলির মধ্যে পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী, শবরী,

মঞ্জিরা, মানের ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তুঙ্গভদ্রা, এরালা, ওয়ারালা, দুধগঙ্গা, ভীমা, মুশী ইত্যাদি কৃষ্ণার প্রধান শাখানদী। অন্যান্য নদীর মধ্যে পেন্নার, নাগাবলী, বংশধারা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ। রাজ্যে ২০টি জেলা আছে, যথা— ১. শ্রীকাকুলম, ২. বিশাখপট্টনম, ৩. পূর্ব গোদাবরী, ৪. পশ্চিম গোদাবরী, ৫. কৃষ্ণা, ৬. গুণ্টুর, ৭. নেল্লুর, ৮. চিত্তুর, ৯. কড়প্পা, ১০. অনন্তপুরম, ১১. কর্নুল, ১২. মহ্‌বুবনগর, ১৩. হায়দরাবাদ, ১৪. মেডক্‌, ১৫. নিজামাবাদ, ১৬. আদিলাবাদ, ১৭. করিমনগর, ১৮. ওয়ারঙ্গল, ১৯. খম্‌মম্‌ এবং ২০. নালকোণ্ডা। শেষোক্ত ৯টি জেলা লইয়া তেলিঙ্গানা অঞ্চল; প্রথমোক্ত ১১টি জেলা অন্ধ্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। হায়দরাবাদ শহর-সমষ্টি ব্যতীত বিজয়ওয়াড়া, গুণ্টুর, বিশাখপট্টনম, ওয়ারঙ্গল, রাজমন্দ্রী, কাকিনাড়া, এলুরু, নেল্লুর, বন্দর (মসুলিপট্টম), কর্নুল, ইত্যাদি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী অন্ধ্র প্রদেশের লোকসংখ্যা ৩৫৯৮৩৪৪৭ (পুরুষ ১৮১৬১৬৭১ এবং স্ত্রী ১৭৮২১৭৭৬)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ১৩৩ (প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ৩৩৯)। গত দশকে লোকসংখ্যা ১৫.৬৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ৯৮১ : ১০০০।

জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যে ২২৩টি শহর এবং ২৭০৮৪টি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যার প্রতি হাজারের মধ্যে ১৭৪ জন শহরবাসী, ৮২৬ জন গ্রামবাসী। রাজ্যে মোট কর্মীর সংখ্যা ১১২৯৯৪০০ জন পুরুষ এবং ৭৩৬৩৬৪২ জন নারী। তন্মধ্যে ৪৬৫৪২৬৪ জন পুরুষ ও ২৮৩২৫৫৫ জন নারী কৃষিকর্মে; ২৪৫৪৭৪১ জন পুরুষ ও ২৮৮১৭৫৩ জন নারী কৃষিমজুর রূপে এবং ১১৪৯২৮৭ জন পুরুষ ও ৬৬৫৮৬৭ জন নারী গৃহশিল্পে নিযুক্ত আছেন।

রাজ্যের কৃষিদ্রব্যের মধ্যে ধান্য, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই জাতীয় শস্য, ইক্ষু, তুয়ার, মটরশুঁটি, লঙ্কা, বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ, চীনাবাদাম, রেড়ি, তুলা, তামাক, বজ্‌রা, রাগী, পিঁয়াজ, তিল এবং মেস্তা উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র প্রদেশে প্রচুর কাষ্ঠ (কুসুম, তুন্‌, রোজউড্‌, ইরুল, টিক্‌) এবং বাঁশ পাওয়া যায়।

ধান্য উৎপাদনের সর্বভারতীয় গড় যেখানে একর প্রতি ৩৩০.২৩৭ কিলোগ্রাম (৭২৯ পাউণ্ড), অন্ধ্র প্রদেশের গড় সেখানে ৫১৭.৭৭৯ কিলোগ্রাম (১১৪৩ পাউণ্ড); অন্ধ্র অঞ্চলে গড়পড়তা হার আরও বেশি, ৫৯৮.৪১৩ কিলোগ্রাম (১৩২১ পাউণ্ড)। রাজ্যে কর্ষিত জমির মোট পরিমাণ ১১৬৩০২৬৮ হেক্টর (২৮৭৩৮০০০ একর) অর্থাৎ মোট ভৌগোলিক আয়তনের ৪৩.১%। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী হিসাব অনুযায়ী, ইহার মধ্যে ২৭৭৩৮১৪ হেক্টরে (৬৮৫৪০০০ একরে) ধান্যের এবং ২৪১০৭৯৮ হেক্টরে (৫৯৫৭০০০ একরে) জোয়ারের চাষ হয়; এই অস্থায়ী হিসাবে দেখা যায় রাজ্যে ৩৫৫৩৯৬৮ মেট্রিক টন (৩৪৯৮০০০ টন) চাউল, ১২৯৩৩৬৮ মেট্রিক টন (১২৭৩০০০ টন) জোয়ার, ৪৯১৭৪৪ মেট্রিক টন (৪৮৪০০০ টন) চীনাবাদাম, ৩৮৬০৮ মেট্রিক টন (৩৮০০০ টন) রেড়ি, ৩৬৫৭৬ মেট্রিক টন (৩৬০০০ টন) তিল, ১২৩০০০ বেল তুলা, ১২৯৪৫৬ মেট্রিক টন (১১৬০০০ টন) তামাক, ৬৫৮৩৬৮ মেট্রিক টন (৬৪৮০০০ টন) ইক্ষু (গুড়) ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। রাজ্যের আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ব্যাপিয়া বনাঞ্চল বিস্তৃত। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮৩৯০০০ টাকা মূল্যের বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে।

রাজ্যে সেচব্যবস্থাধীন জমির মোট পরিমাণ ২৯৯২৯৩২ হেক্টর (৭৬৪৫০০০ একর)। রাজ্যের সেচ পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনাটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে সিদ্ধেশ্বরম হইতে ১৪৫ কিলোমিটার (৯০ মাইল) নীচে নন্দীকোণ্ডাতে কৃষ্ণা নদীর উপর ৯২ মিটার (৩০২ ফুট) উচ্চ একটি পাকা (masonry) বাঁধ আছে। জলাধার হইতে দুইটি খাল (লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক ক্যানাল এবং রাইট ব্যাঙ্ক ক্যানাল) -এর ব্যবস্থা আছে; এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৮.২৫ মিলিয়ন হেক্টর সেন্টিমিটার (৫.৪৪ মিলিয়ন একর ফুট) জল সংরক্ষণ করা যাইবে; ২১৭ কিলোমিটার (১৩৫ মাইল) দীর্ঘ রাইট ব্যাঙ্ক ক্যানাল প্রথম পর্যায়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৩১১২২৪ লিটার (১১০০০ কিউসেক) জল বহন করিবে; লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক ক্যানাল প্রথম পর্যায়ে মুনেরু নদী পর্যন্ত ১৭৪ কিলোমিটার (১০৮ মাইল) দীর্ঘ হইবে এবং তেলিঙ্গানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে। এই পরিকল্পনাটির প্রথম পর্যায়ে অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ১২২ কোটি টাকা। ইহার দ্বারা গুণ্টুর, কর্নুল, নেল্লুর, ওয়ারঙ্গল এবং নালকোণ্ডা জেলায় প্রায় এক মিলিয়ন হেক্টর (২.০৬ মিলিয়ন একর) জমিতে জল সেচ হইবে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। অন্যান্য বহু সেচ-প্রকল্পের মধ্যে বৃহৎ প্রকল্পরূপে রাল্লাপাদ (দ্বিতীয় পর্যায়), রমপেরু ড্রেনেজ, আপার পেন্নার, ভৈরবাণীটিপ্পা, তুঙ্গভদ্রা, রজোলীবাণ্ডা ডাইভারশন এবং কদম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পরিকল্পনার ফলে বহু উষর জমি

শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিতেছে এবং এই রাজ্যের রূপান্তর ঘটিতেছে।

গৃহপালিত পশু-সম্পদে এই রাজ্য সম্পৎশালী; ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা অনুযায়ী এই রাজ্যে ১২১৮০০০০ গবাদি পশু, ১২৬২৯০০০ ছাগ এবং ১৬০৫৭০০০ কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী আছে।

কয়লা, সিমেণ্ট, খনিজ তৈল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, পাট, বস্ত্র, কাচ, চিনি, তৈল, চর্ম, কাগজ, মৃৎশিল্প (ceramics) এবং সিগারেট এই রাজ্যের মৌলিক ও অন্যান্য বৃহদায়তন শিল্প। ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টায় বিশাখপট্টনমের জাহাজ নির্মাণের কারখানাটির গুরুত্ব সমধিক; বিশাখপট্টনমে একটি খনিজ তৈলশোধনাগারও (oil refinery) অবস্থিত। বিজয়ওয়াড়া এবং অন্যান্য স্থানে সিমেণ্টের কারখানা আছে; ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আদিলাবাদ, গুণ্টূর এবং কর্নূল জেলায় তিনটি নূতন সিমেণ্টের কারখানা চালু হইয়াছে। কাপড়ের কলগুলি হায়দরাবাদ, ওয়ারঙ্গল এবং অন্য কতিপয় শহরে অবস্থিত। নিজামাবাদ জেলার বোধন এবং অন্যান্য স্থানে চিনির কল এবং আদিলাবাদ জেলার শিরপুর, রাজমন্ত্রী এবং তিরুপতিতে কাগজের কল আছে; উক্ত কাগজের কলগুলির মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গূডুরে মৃৎশিল্পের একটি নূতন কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। সিগারেট কারখানাগুলি হায়দরাবাদ শহরে কেন্দ্রীভূত। তেলিঙ্গানা অঞ্চলটি শিল্পসমৃদ্ধ; কাপড়ের কলগুলির মধ্যে ১১টিই এই অঞ্চলে অবস্থিত; এই অঞ্চলে দুইটি তুলা এবং জিনিং ইউনিট (ginning unit) এবং শতাধিক তামাক কারখানাও আছে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন, মিনারেল ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন এবং স্মল-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। হায়দরাবাদের নিকটে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা, সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সিন্থেটিক ড্রাগ কারখানা, কোঠগুড্ডেম এবং বিশাখপট্টনমে দুইটি সারের কারখানা, কোঠগুড্ডেমে ২৪০ মেগাওয়াট্ উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট থার্মাল ইউনিট, সিঙ্গরেনি কয়লাখনিগুলির নিকটে একটি লো টেম্পারেচার কার্বনিজেশন প্ল্যাণ্ট এবং একটি এক লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট পিগ্ আয়রন প্ল্যাণ্ট স্থাপন রাজ্যের শিল্পায়নকে অতি দ্রুত আগাইয়া দিবে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ৫৬০৮৭২ মেট্রিক টন (৫৫২০৪০ টন) কয়লা, ৭১৬১০৩ মেট্রিক টন (৭০৪৮২৬ টন) সিমেণ্ট, ১৮৭৩৯৭১৪ মিটার (২০৪৯৪০০০ গজ) সুতির পিস্-গুড্স্, ১৭২ লক্ষ কিলোগ্রাম (৩৭৯ লক্ষ পাউণ্ড) কার্পাস সুতা, ১২৬৭২৪ মেট্রিক টন (১২৪৭২৯ টন) চিনি, ৩৫৪৬৯ মেট্রিক টন (৩৪৯১১ টন) কাগজ, ৬৮১ কোটি সিগারেট উৎপাদিত হয়। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বার্ষিক বস্ত্র উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৩৬ কোটি মিটার (৩৯ কোটি গজ)। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কম্বল ও কয়ার বয়ন, ডালা, সাজি, ঝুড়ি ইত্যাদি বুননও উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র প্রদেশের হস্তশিল্পের মধ্যে করিমনগরের রৌপ্যের ঝালরের কারুকার্য, ওয়ারঙ্গল ও এলুরুর কার্পেট, নরসাপুরের লেসের কাজ, নির্মল, কোণ্ডাপল্লী, নাক্কাপল্লী ও তিরুপতির খেলনা ভারতের বাহিরেও সুপরিচিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

কয়লা, লৌহ, চুনা পাথর, ম্যাঙ্গানিজ এবং অ্যাজবেস্টস্ এই রাজ্যের প্রধান খনিজদ্রব্য। কোঠগুড্ডেম, তাণ্ডুর, ইয়েলাণ্ডু এবং সাস্তি অঞ্চলে কয়লাখনি অবস্থিত; প্রধান অভ্র অঞ্চলটি নেল্লূর জেলায়; নেল্লূরে ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও আছে। খনিজ শিল্প রাজ্যের সর্বত্র ছড়ানো। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬০৮৭২ মেট্রিক টন (৫৫২০৪০ টন) কয়লা, ২৩৭৪৫ মেট্রিক টন (২৩৩৭১ টন) ম্যাঙ্গানিজ, ৩৩৫৭ মেট্রিক টন (৩৩০৪ টন) অভ্র, ২৪০১৬১ মেট্রিক টন (২৩৬৩৭৯ টন) আকরিক লৌহ, ১০২৭৪৬৯ মেট্রিক টন (১০১১২৮৯ টন) চুনা পাথর, ৯১৫ মেট্রিক টন (৯০১ টন) অ্যাজবেস্টস্, ২২৩৪৪ মেট্রিক টন (২১৯৯২ টন) ব্যারাইট্স্ উৎপাদিত হইয়াছে; ক্রমাইট্, চায়না ক্লে, ফেল্স্পার, ফায়ার ক্লে, ষ্টিয়াটাইট্, স্লেট এবং স্ফটিকও উৎপাদিত হয়। গুণ্টূর এবং নেল্লূর জেলায় আনুমানিক মোট ৩৯৫২২৪০০০ মেট্রিক টন (৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন) আকরিক লৌহের দুইটি বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত চতুর্দশ বৎসরে এখানে কতিপয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে বৎসরে ৮৮১ মিলিয়ন কিলোওয়াটের অধিক হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে মাছকুন্দ (উৎপাদন: ১৫৫·১৪৯ মিলিয়ন ইউনিট), তুঙ্গভদ্রা ও নিজামসাগর (উৎপাদন: ১৬·৫৭৮ মিলিয়ন ইউনিট) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিশাখপট্টনম, বিজয়ওয়াড়া, নেল্লূর, ও রামকুণ্ডম তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গিদ্দলুর, কুম্বুমে ও মার্কাপুরে ডিজেল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

এই রাজ্যে পরিবহন ও সংযোগব্যবস্থা উন্নত পর্যায়ের। বিশাখপট্টনম বন্দর ভারতের ৬টি প্রধান বন্দরের অন্যতম।

অন্ধ্র প্রদেশ

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মোট ১৪৭৭৮৬১ মেট্রিক টন (১৪৪৮৮৮৩ টন) মাল ওঠানো-নামানো হয়; ৯ মিটার (২৮½ ফিট) ড্র (draw)-এর এবং ১৬৮ মিটার (৫৫০ ফিট) দৈর্ঘ্যের জাহাজ এখানে আসিতে পারে; বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ কতকগুলি বার্থ আছে; তাহার মধ্যে কতকগুলি ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ, কয়লা ও তৈলের জন্য ব্যবহারযোগ্য; ৯২ মিটার (৩০০ ফিটের) ছোট পোতের জন্য ব্যবহারযোগ্য ১১২ মিটার ×১৯ মিটার (৩৬৬ ফিট×৬০ ফিট) একটি ড্রাই ডক আছে। বিশাখপট্টনম বৃহৎ বন্দরটি ব্যতীত এই রাজ্যে ৬টি মাঝারি ও ক্ষুদ্র বন্দর আছে; তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে কাকিনাড়া ও মসুলিপট্টমের নাম করা যাইতে পারে। অন্ধ্র অঞ্চলে নৌকার সাহায্যে পরিবহনের কাজ অংশতঃ নির্বাহিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চের হিসাব অনুযায়ী অন্ধ্র প্রদেশে ২৬৭১ কিলোমিটার (১৬৬০ মাইল) ব্রড গেজ, ১৮৪০ কিলোমিটার (১১৪৪ মাইল) মিটার গেজ এবং ৩৭ কিলোমিটার (২৩ মাইল) ন্যারো গেজ— অর্থাৎ প্রায় ৪৫৫০ কিলোমিটার (২৮২৭ মাইল) রেলপথ আছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ের সিকন্দরাবাদ বিভাগের সদর সিকন্দরাবাদ শহরে অবস্থিত; ব্রড গেজ ও মিটার গেজ ব্যবস্থা এখানে সংযুক্ত হইয়াছে এবং এইস্থান হইতেই রেলপথগুলি পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যে অন্যূন ২২৫৩ কিলোমিটার (১৪০০ মাইল) ন্যাশনাল হাইওয়ে, ৫৬৩৩ কিলোমিটার (৩৫০০ মাইল) স্টেট হাইওয়ে, ১৩১৯৭ কিলোমিটার (৮২০০ মাইল) মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোড, ৪৫০৬ কিলোমিটার (২৮০০ মাইল) অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট রোড ও ৫৪৭২ কিলোমিটার (৩৪০০ মাইল) ভিলেজ রোড— প্রায় ৩১০৬১ কিলোমিটার (১৯৩০০ মাইল) রাস্তা ছিল। দুইটি সরকারি পরিবহন প্রতিষ্ঠান তেলিঙ্গানায় এবং অন্ধ্রের কৃষ্ণা অঞ্চলে বাস চলাচল পরিচালনা করে। বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ, বিশাখপট্টনম, বাঙ্গালুর, দিল্লী ও কলিকাতা শহরের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল ব্যবস্থা চালু আছে। হায়দরাবাদ শহরের বেগমপেটে একটি বিমানবন্দর আছে; বিজয়ওয়াডা এবং বিশাখপট্টনমের নিকটে বিমান অবতরণের ব্যবস্থা আছে। হায়দরাবাদ ও বিজয়ওয়াডায় আকাশবাণীর দুইটি বেতার-কেন্দ্র অবস্থিত।

দ্বাদশ বৎসর অন্তর পুষ্করম স্নান-উৎসব উপলক্ষে রাজমন্দ্রীতে গোদাবরী তীরে বহু তীর্থযাত্রী সমাগত হন। রামনবমীতে রাজমন্দ্রী হইতে ১৬১ মিটার (১০০ মাইল) দূরবর্তী ভদ্রাচলমে রামচন্দ্রের মন্দিরে বিশাল জনসমাগম হয়। কর্নুল জেলায় শ্রীশৈলমে ভাস্কর্যমণ্ডিত মল্লিকার্জুন মন্দিরের শিবলিঙ্গটি ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। শিবরাত্রির পূজা উপলক্ষে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পুণ্যস্থান দর্শন করেন। তিরুপতিতে সপ্তপর্বত বলিয়া খ্যাত বেঙ্কটাচলপতির তিরুমলৈ-এর মন্দির দ্রাবিড় শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে সারা বছর ধরিয়া অগণিত যাত্রী সমাগম হয়। সপ্তপর্বতে কপিলতীর্থম, আকাশগঙ্গা, পাপনাশম ইত্যাদি পুণ্য সরোবর ও জলপ্রপাত অবস্থিত। মল্লেশ্বর বা জয়সেন (শিব)-এর মাহাত্ম্য বিজড়িত বিজয়ওয়াডাতেও অনেকে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করেন। এই স্থানটির চতুর্দিকে অনেক টিলা আছে। তাহার মধ্যে কনকদুর্গ ও ইন্দ্রকীলের নাম করা যাইতে পারে। হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদে এক সঙ্গে ১০০০০ মুসলমান প্রার্থনা করিতে পারেন; এখানে প্লাস্টারের উপর ফ্রেস্‌কোর কারুকার্য লক্ষণীয়। কাজীপেটের নিকট প্রতি বৎসর 'দরগা উরুস্' প্রতিপালিত হয়।

এই রাজ্যের সমাজজীবন বৈচিত্র্যময়। কতিপয় সর্বভারতীয় উৎসব ব্যতীত এই অঞ্চলে কয়েকটি বিশেষ স্থানীয় উৎসব প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে তিনদিনব্যাপী সংক্রান্তি পণ্ডগ (মকর সংক্রান্তি) প্রধান। প্রথম দিন ভোগী-পোঙ্গলি পারিবারিক উৎসবরূপে পালিত হয়; দ্বিতীয় দিন মকর সংক্রান্তিতে স্ত্রীলোকেরা সূর্যকে পোঙ্গলি (চাল, গুড় ও দুধের তৈয়ারি শুষ্ক মিষ্টান্ন) নিবেদন করেন। এই দিনটি বিশেষ আনন্দের সহিত প্রতিপালিত হয়। তৃতীয় দিবস মাতু-পোঙ্গলি। ঐদিন গ্রাম দেবতাগণকে নিবেদিত পোঙ্গলি গবাদি পশুকে খাইতে দেওয়া হয়। গোকুল অষ্টমী (জন্মাষ্টমী)-তে বালকবালিকারা কৃষ্ণের জীবনী বিষয়ে গান করে। আমাদের দেশের দুর্গাপূজার অনুরূপ ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত নবরাত্রি উৎসবের প্রথম তিন দিবস লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে, পরবর্তী তিন দিবস শক্তি বা পার্বতী দেবীর উদ্দেশে এবং শেষ তিন দিবস সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত। প্রতি গৃহে একটি সুসজ্জিত মঞ্চের উপর পূজিত দেব-দেবী ও তাঁহাদের বাহনদের মৃন্ময় মূর্তি এবং নানাপ্রকার খেলনা শোভা পায়। পূজা উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের প্রীতি উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দেবী দুর্গার প্রতীকরূপে মঙ্গলকলস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বালিকারা এতদুপলক্ষে নৃত্যগীত করে। অষ্টম দিবসে— কোনও কোনও স্থানে দশম দিবসে— আয়ুধ-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া

অন্ধ্র প্রদেশ

দশমীতে সরস্বতী পূজা হয় এবং এই দিবসটি কোনও কার্যারম্ভের পক্ষে বিশেষ শুভ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই নয় দিবসের উপরে উল্লিখিত বিভাগ কোনও কোনও স্থানে একটু অন্যপ্রকার। হায়দরাবাদে বন্‌জারা (জিপ্‌সী) নারীদের নৃত্য এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। দীপাবলী বা দেওয়ালি এই অঞ্চলে কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যাচারী নরকাসুর বধের স্মরণোৎসব-দিবস। এই সময়ে পুরাতন জিনিসপত্র পরিত্যাগ করা হয় এবং নূতন পোশাক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করা হয়। কার্তিক উৎসব উপলক্ষে বিষ্ণু, শিব ও সুব্রহ্মণ্যদেবের উদ্দেশে পরপর তিন দিন গৃহস্থ তাঁহার গৃহ, পূজাস্থান, তুলসীমঞ্চ প্রভৃতি প্রদীপ দিয়া শোভিত করেন। চতুর্থ দিন অমঙ্গল বিতাড়নের জন্য কুপ্প (আবর্জনা) দীপম্ উপলক্ষে প্রদীপ দেওয়া হয়। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বৈকুণ্ঠ একাদশী, ত্যাগরাজ-উৎসব, খ্রীষ্টান-দের সেণ্ট্ টমাস দিবস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লোক-নৃত্যের দিক দিয়াও অন্ধ্র প্রদেশের সমাজ-জীবন সৌন্দর্যময়। অর্ধ-যাযাবর বন্‌জারা নারীদের নৃত্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। বন্‌জারা নারীগণের পক্ষে নৃত্য অবশ্যকর্তব্য; বন্‌জারা নৃত্যগুলির মধ্য দিয়া ধান্য রোপণ, ধান্য কর্তন ইত্যাদি দৈনন্দিন কার্যের চিত্র উপস্থাপিত করা হয়; সুসজ্জিত ও অলংকৃত বন্‌জারা নারীদের ছন্দোময় নৃত্য অতি মনোহর দৃশ্য। হায়দরাবাদ অঞ্চলের গোণ্ড্‌গ্রাম-গুলিতে দশহরার পর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া সুসজ্জিত পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে নৃত্য প্রদর্শন করে। তাহাদের ডাণ্ডারিয়া নর্তক বলা হয় এবং সম্মানিত অতিথির মত স্বাগত জানানো হয়। এই নৃত্যে সমস্ত নর্তক একই সঙ্গে ঘড়ির বিপরীত গতিতে নৃত্য করেন এবং তাল বজায় রাখিবার জন্য হস্তধৃত যষ্টিদ্বারা পরস্পরের যষ্টিতে আঘাত করেন। তেলিঙ্গানা অঞ্চলে নারীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নবোঢ়াদের মধ্যে, প্রচলিত লোকনৃত্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সিদ্দিদের আফ্রিকান উপজাতীয় যুদ্ধনৃত্য-গুলি উপভোগ্য। ভারতের নৃত্যকলায় কুচিপুড়ি নৃত্য অন্ধ্রের বিশিষ্ট দান।

রাজ্যের প্রধান ভাষা তেলুগু।

এই রাজ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২১২; পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই অনুপাত যথাক্রমে ৩০২ ও ১২০। রাজ্যের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত হায়দরাবাদ জেলায় সর্বোচ্চ ও আদিলাবাদ জেলায় সর্বনিম্ন।

রাজ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যথা— ওয়ালটেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়; হায়দরাবাদের নিকট রাজেন্দ্রনগরে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। রাজ্যে সাধারণ স্কুল কলেজ ব্যতীত ২টি কৃষি কলেজ, ৬টি মেডিক্যাল কলেজ, ২টি পশুচিকিৎসা কলেজ, ১টি আইন কলেজ, ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৩টি পলিটেকনিক, ১টি মাইনিং ইন্‌স্টিটিউট, ১১টি সংস্কৃত কলেজ, ১টি জনতা কলেজ, ৪টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, কতিপয় বেসিক ট্রেনিং ও সেকেণ্ডারি গ্রেড ট্রেনিং সেণ্টার, স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত ১টি নার্সিং কলেজ ইত্যাদি আছে। বহু সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র ও ১৪ শতাধিক পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

এই রাজ্যে বহু দর্শনীয় স্থান আছে। গুণ্টুর হইতে ২৯ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দূরবর্তী অমরাবতীর নাম প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাতবাহনের অধীনে অন্ধ্রদের প্রাচীন রাজধানী ও দক্ষিণ ভারতে মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র ধান্যকটকের ধ্বংসাবশেষ এখানে অবস্থিত। অমরাবতীর বিশ্ববিখ্যাত মহাচৈত্য ২০০০ বৎসর পূর্বের ভাস্কর্যের শিল্পোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণার দক্ষিণ তীরবর্তী নাগার্জুনকোণ্ডা বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্য, জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নিখুঁত মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি তদানীন্তন যুগের শিল্প ও নগর- পরিকল্পনার সুন্দর নিদর্শন। রাজমন্দ্রীতে গোদাবরীর উপর ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম (২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ৫৬ স্প্যানের) রেল ব্রিজটি দেখিবার মত। অবকাশযাপনের জন্য ওয়ালটেয়ার ভারতের অন্যতম প্রধান সমুদ্রোপকূলবর্তী শহর। বিশাখ-পট্টনমের নিকটবর্তী ডলফিন্‌স্ নোজ (Dolphin's Nose) অন্তরীপ হইতে সমুদ্র ও জনপদের দৃশ্য নয়নগ্রাহী। বিশাখপট্টনমের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) উত্তরে সিংহাচলম পাহাড়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত শ্রীনরসিংহের মন্দিরটির স্থাপত্যের মান উৎকৃষ্ট। হায়দরাবাদের চারমিনারের নির্মাণসৌষ্ঠব লক্ষণীয়। ফালাক্‌নামা, চৌমহল্লা ও কিংকোঠি প্রাসাদ, হাইকোর্ট, পাব্লিক গার্ডেন্‌স্ (ভারতের অন্যতম বৃহৎ উদ্যান), সালার জং মিউজিয়াম ইত্যাদি অবশ্যদর্শনীয়। হায়দরাবাদের প্রায় ১১ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল) পশ্চিমে গোলকোণ্ডা দুর্গ কুতুবশাহী রাজ্যের রাজধানী ছিল। হনম্‌কোণ্ডায় দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব্ধ কিন্তু অর্ধসমাপ্ত 'সহস্র স্তম্ভের মন্দির'টি চালুক্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। কাজীপেট হইতে ৬৪।৮০ কিলোমিটার (৪০।৫০ মাইল) দূরে রামাপ্পা হ্রদের তীরে পালামপেটে অবস্থিত মন্দিরগুলির

স্থাপত্যশৈলী হনমকোণ্ডা মন্দিরের অনুরূপ; কিন্তু এই মন্দিরগুলি অধিকতর অলংকৃত। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ নিজামসাগর (১২৮ বর্গ কিলোমিটার বা ৫০ বর্গ মাইল) এবং হুসেন সাগর, হিমায়ৎ সাগর (৮৫ বর্গ কিলোমিটার বা ৩৩ বর্গ মাইল) ও ওসমান্ সাগর হ্রদ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Census of India, Paper No. 1 of 1962-1961 Census, Final Population Totals,* Delhi, 1962; *India 1963,* Publication Division, Delhi, 1963; *The Fifteenth Year of Freedom, 1961-62,* A. I. C. C., New Delhi.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অন্নকূট পর্বতচূড়ার আকারে অন্ন সাজাইয়া অনুষ্ঠিত উৎসব। দেওয়ালির পরের দিন কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে ও বিভিন্ন স্থানের বৈষ্ণব মন্দিরে সাড়ম্বরে এই উৎসব পালিত হয়। জয়দেব প্রভৃতি সাধকদের তিরোধান তিথি উপলক্ষে অন্য সময়েও এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মূলতঃ ইহা গোবর্ধনপূজা। এই পূজায় গোময় বা অন্নের দ্বারা গোবর্ধনগিরির প্রতীক নির্মাণের ব্যবস্থা আছে (স্মৃতিকৌস্তুভ, ধর্মসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। গোবর্ধন পর্বতের সমীপবর্তী একটি পর্বতের নামও অন্নকূট। ইহার পরিক্রমার বিধান বরাহপুরাণে (১৬৪ অধ্যায়) আছে। বাংলার স্মৃতিগ্রন্থে অন্নকূট উৎসবের নাম নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রী) চিত্রকর। ২২ মার্চ ১৮৪৯ খ্রী : ১০ চৈত্র ১২৫৫ বঙ্গাব্দে চব্বিশ পরগনা শিখরবালি গ্রামে সেকালের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপরিবারে অন্নদাপ্রসাদের জন্ম। পিতা চন্দ্রকান্ত, মাতা মৃন্ময়ী। শৈশবকাল হইতেই শিল্পচর্চার প্রতি অন্নদাপ্রসাদের সহজাত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদ নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস-এ যোগ দেন। তিনি প্রথমে এনগ্রেভিং ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, পরে অধ্যক্ষ লকের নিকট পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শিক্ষা করেন। এই বিভাগের প্রথম ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ, ক্রমে তিনি এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।

অন্নদাপ্রসাদ পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

অন্নদাপ্রসাদের অন্যতম প্রধান কীর্তি আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা (১৮৭০ খ্রী)। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি একদল তরুণ শিল্পীকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী গড়িয়া তোলেন। এই আর্ট স্টুডিয়ো হইতে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা পৌরাণিক বিষয়ে বহু চিত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রতিলিপি সেকালে বিশেষ-জনপ্রিয় হইয়াছিল।

অন্নদাপ্রসাদের প্রভাব বাংলাদেশে সমকালীন শিল্পের ক্ষেত্রে রবি বর্মার তুল্য ছিল বলা চলে। আঙ্গিকের দক্ষতায় তাঁহার তুল্য শিল্পী উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে অল্পই ছিলেন। অন্নদাপ্রসাদের অঙ্কিত কেশবচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লর্ড রিপন প্রভৃতির প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শিল্পীগণ মিলিত হইয়া বঙ্গীয় কলাসংসদ্ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদাপ্রসাদ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনি স্কেচিং পার্টি, প্রদর্শনী, শিল্প সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা, চিত্রশালা বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব করেন তাহা শিল্প প্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহের সূচক। শিল্পবিষয়ক বাংলা প্রথম পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের উদ্যোগেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Antiquities of Orissa* (১৮৭৫, ১৮৮০ খ্রী) ও *Buddha Gaya* (১৮৭৮ খ্রী) পুস্তকচিত্রণও সমাদর লাভ করিয়াছিল।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

দ্র অন্নদা-জীবনী, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, কলিকাতা, ১৩১৪।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা শক্তিদেবতার রূপভেদ। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণা পূজার নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। দেবী রক্তবর্ণা বিচিত্রবসনা অন্নপ্রদাননিরতা স্তনভারনম্রা ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁহার চূড়ায় বালচন্দ্র; নৃত্যপরায়ণ চন্দ্রাভরণ শিবকে দেখিয়া তিনি হৃষ্টা। চৈত্রী শুক্লা অষ্টমীতে ইহার বার্ষিক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশেষ পূজার স্পষ্ট উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাশীর অন্নপূর্ণা ও তাঁহার অন্নকূট মহোৎসব প্রসিদ্ধ। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। দেবীর একটি সুন্দর স্তোত্র শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অন্নপ্রাশন শিশুর প্রথম অন্নভক্ষণোৎসব। এই উৎসবের জন্য বালকের পক্ষে ছয় বা আট মাস এবং বালিকার পক্ষে

সাত বা নয় মাস বয়স প্রশস্ত। নামকরণের উৎসবও এই উৎসবের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত এই দুই সংস্কার উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হোম প্রভৃতি করণীয়। তবে এই সমস্ত কার্য এখন আর অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় না। বস্তুতঃ অন্নপ্রাশনের উৎসব কতকটা বজায় থাকিলেও নামকরণের অনুষ্ঠান এখন লুপ্তপ্রায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অন্নামলৈ নগর চিদম্বরম দ্র

অপভূ (apogee) উপগ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের দূরতম বিন্দুকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অপভূ বা অ্যাপোজি বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব মোটামুটি ৩৮৬২৩২ কিলোমিটার (প্রায় ২৪০০০০ মাইল) ধরা হইলেও ইহার কক্ষপথের দূরতম বিন্দু অর্থাৎ অপভূ ৪০৬৭০২ কিলোমিটার (প্রায় ২৫২৭২০ মাইল) দূরে অবস্থিত। কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ডের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের দূরতম বিন্দু অর্থাৎ অপভূর দূরত্ব অনুমিত হইয়াছে ২২৫৩ হইতে ২৫৭৪ কিলোমিটারের (প্রায় ১৪০০ হইতে ১৬০০ মাইলের) মধ্যে। পৃথিবী হইতে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারের অ্যাপোজি বা অপভূর দূরত্ব হইল ১৬০৯ কিলোমিটার (প্রায় ১০০০ মাইল)।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অপভ্রংশ ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি অপভ্রংশ শব্দটি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথচ শিষ্ট ভাষায় অচল এমন শব্দ বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা এই অর্থে এখন পালি ও প্রাকৃত (অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা) শব্দ ব্যবহার করি। সবচেয়ে প্রাচীন প্রাকৃত-ব্যাকরণের রচয়িতা বররুচি তাঁহার প্রাকৃতপ্রকাশে অপভ্রংশ নাম করেন নাই। পুরুষোত্তম প্রভৃতি পরবর্তী প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টভাবে অপভ্রংশকে প্রাকৃতের নব্য অথবা সরলতররূপ বলেন নাই। তাঁহারা অপভ্রংশ বলিতে একাধিক ভাষা বুঝিয়াছেন। তবে অপভ্রংশের বর্ণনায় প্রধানতঃ নাগরক (অথবা নাগর অপভ্রংশ)-ই ধরিয়াছেন। সাহিত্যে এই নাগর অপভ্রংশের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে নাগর অপভ্রংশ সমগ্র উত্তরাপথে এবং দক্ষিণাপথের উত্তরভাগে সংস্কৃতের দোহার রূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

এখন আমরা ভাষাবিজ্ঞানে অপভ্রংশ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ গ্রীয়র্সনের অনুসরণে একটু বদলাইয়া লইয়াছি। প্রত্যেক আঞ্চলিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা কোনও না কোনও মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) হইতে আসিয়াছে এই অনুমান করিয়া গ্রীয়র্সন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রাকৃত হইতে এক (বা একাধিক) অপভ্রংশ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সেই সব আঞ্চলিক অপভ্রংশ হইতে বাংলা হিন্দী পাঞ্জাবী রাজস্থানী সিন্ধী গুজরাটী মারাঠী ইত্যাদি প্রাদেশিক (নব্যভারতীয় আর্য) ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। তদনুসারে আমরা অনুমান করি যে পূর্বভারতে প্রচলিত প্রাকৃত হইতে পূর্বী অপভ্রংশ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই পূর্বী অপভ্রংশ হইতে ভোজপুরী মগহী মৈথিলী এই তিন বিহারী ভাষা এবং বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়া এই তিন গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন। সাহিত্যে যে অপভ্রংশের নিদর্শন পাইতেছি অর্থাৎ যাহাকে পুরুষোত্তম প্রভৃতি নাগরক বলিয়াছেন তাহা, গ্রীয়র্সনের মতে, পশ্চিমা অপভ্রংশ শৌরসেনী। ইহা শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে জাত এবং পশ্চিমা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার জনক। বলা বাহুল্য পূর্বী দক্ষিণী ইত্যাদি কোনও আঞ্চলিক অপভ্রংশের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গ্রীয়র্সনের মতে অপভ্রংশের কাল আনুমানিক ৫০০ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

সুকুমার সেন

অপভ্রংশ সাহিত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মধ্যভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষাকে যে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন, তাহার অন্তিম স্তরের নাম অপভ্রংশ। ইহার প্রচলনকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। ভাষার গঠনমূলক অবস্থানকাল দশম শতাব্দী পর্যন্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের বিকৃতিমাত্রই প্রাচীনকালে অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। পাণিনি এই বিকৃতিকে ভাষা ও বার্তিককার অপশব্দ বলিয়াছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন, একটি সংস্কৃত শব্দ হইতে নানারূপ অপভ্রংশ শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২য় বা ৩য় শতক) সংস্কৃত এবং দেশী ভাষা হইতে পৃথক ভাষা হিসাবে 'অপভ্রষ্ট' বা 'বিভ্রষ্ট' ভাষার উল্লেখ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (১৭।৩, ৬১) অপভ্রংশ ভাষার কিছু লক্ষণও উল্লিখিত হইয়াছে। ভরতের মতে উহা আভীরী অপভ্রংশ —উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (১৭।৬৬, ৭৪, ৯৯ প্রভৃতি) কতকগুলি অপভ্রংশ শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তীকালীন বৈয়াকরণদের

অপভ্রংশ সাহিত্য

গ্রন্থে বর্ণিত অপভ্রংশ ভাষার বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহা ছাড়া, শ্বেতাম্বর জৈনদের আগমগ্রন্থে (আচা ২. ৪. ৫), বৌদ্ধদের পরবর্তীকালীন গ্রন্থে (লঙ্কাবতার, ললিতবিস্তার, মহাবস্তু ইত্যাদি), বিমলসূরির (৩য় শতক) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিখিত পউমচরিয়ম্ নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কালিদাসের (৫ম শতক) 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের গানগুলি অপভ্রংশে রচিত। ইহা হইতে বুঝা যায় কালিদাসের সময়ে বা তাহারও কিছু পূর্বে অপভ্রংশ ভাষার বিকাশ হইয়াছিল।

ভামহ (৭ম শতাব্দী), দণ্ডী (৮ম শতাব্দী) প্রভৃতি আলংকারিকগণ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্যকে একটি বিশেষ স্থান দিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া তাঁহারা কাব্যকে মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা— সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। অপভ্রংশে রচিত কাব্যের মান সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহে, এই মতও তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরবর্তী কালে পুরুষোত্তম (১২শ শতাব্দী) অপভ্রংশকে শিষ্ট লোকের ভাষা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাকৃতের মত অপভ্রংশ ভাষার অধিকাংশ গ্রন্থই জৈনগণ কর্তৃক বিরচিত। তাঁহারা তীর্থংকরদের জীবনচরিত অবলম্বনে 'পুরাণ' বা চরিতাদি গ্রন্থ, লোকশিক্ষার নিমিত্ত 'ধর্মকথা' কাব্য, বিবিধ আখ্যানাদি সংবলিত 'কথানক' কাব্য, এমন কি জৈন দর্শন পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

অধুনা প্রাপ্ত অপভ্রংশ গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্বয়ম্ভূদেবের (৭ম বা ৮ম শতাব্দী) পউমচরিউ। ইহাতে ৫৬টি সন্ধিতে, ১২০০০ শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জৈন শলাকা পুরুষদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরামচন্দ্রকে জৈনগণ পদ্ম (<অপ. পউম) নামে অভিহিত করেন। স্বয়ম্ভূ 'হরিবংশ পুরাণ' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই স্বয়ম্ভূ নিজে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ত্রিভুবন উহা সম্পূর্ণ করেন। পরবর্তী কালের ধাহিলের (বা দাহিলের) পউমসিরি-চরিউ এই শ্রেণীর কাব্য। ইহা দশম শতাব্দীতে রচিত। সংস্কৃত মহাভারত সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত না হইলেও, কৃষ্ণ-বলরাম এবং কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী ধবলকবি তাঁহার 'হরিবংশ পুরাণে' সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পুষ্পদন্তের (১০ম শতাব্দী) মহাপুরাণ বা তিসটিঠ মহাপুরিস-গুণালংকার গ্রন্থে ২৪ তীর্থংকর, ১২ চক্রবর্তী, ৯ বাসুদেব, ৯ বলদেব ও ৯ প্রতিবাসুদেবের জীবনচরিত বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ নামে দুইখণ্ডে বিভক্ত। জসহরচরিউ ও নয়কুমারচরিউ নামে তিনি দুইখানি আখ্যানকাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। 'জসহরচরিউ' কাব্যে তিনি রাজা যশোধরের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, আর 'নয়কুমারচরিউ'তে নাগকুমারের কাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়াছেন। জৈন মহাপুরুষদের জীবনচরিত অবলম্বনে পরবর্তী কালে অপভ্রংশভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে হরিভদ্রের 'নেমিণাহ-চরিউ' (১১৫৯ খ্রী) এবং পদ্মকীর্তির (১৪শ শতক) 'পার্শ্বপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য বিভিন্ন আখ্যায়িকা বা চরিত অবলম্বনে রচিত অপভ্রংশ কাব্যের মধ্যে ধনপালের (১০ম শতাব্দী) 'ভবিস্-সয়ত্তকহা' একটি উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্য। এই গ্রন্থে লেখক পঞ্চমীব্রতের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। এই পঞ্চমী ব্রত আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুন মাস ধরিয়া চলে এবং পাঁচ বৎসর পালন করার পর পরিসমাপ্ত হয়। এই ব্রত পালনের ফলশ্রুতি হিসাবেই ভবিষ্যদত্তের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের চক্রান্ত উপেক্ষা করিয়া, কিরূপে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ফিরিয়া পান, তাহার বিবরণই এই কাব্যের উপজীব্য। কনকামর (১০৬৫ খ্রী) মুনি কর্তৃক বিরচিত 'করকণ্ডচরিউ' কাব্যে জৈন সাধু করকণ্ডের জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। করকণ্ড জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত ছিলেন। ধার্মিকনায়ক বলিয়া বিবেচিত সুদর্শনের কাহিনী অবলম্বনে নয়নন্দী (১০৪৪ খ্রী) 'সুদর্শন চরিত' রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচিত 'আরাধনা' নামে আর একটি গ্রন্থও আছে। সিংহসেন 'মেহেসরচরিউ' (১৪৩৯ খ্রী) লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি 'রৈধূ' নামে পরিচিত ছিলেন। রৈধূ নামেই তিনি 'দহলক্খণ-জয়মাল' ও 'জীবন্ধরচরিত' লিখিয়াছেন। জীবন্ধরচরিতকে অবলম্বন করিয়া অপভ্রংশ ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

'কথানক' কাব্যের মধ্যে শ্রীচন্দ্রের (১০ম বা ১২শ শতাব্দী) 'কথাকোষ' একটি উৎকৃষ্ট সংকলন জাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে ৫৩টি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি ঘটনার পারিপাট্যে চিত্তাকর্ষক।

নীতিমূলক অপভ্রংশ কাব্য রচনাতেও জৈনগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক ও জিনবল্লভ সূরির শিষ্য জিনদত্তসূরি (১০৭৫-১১৫৪ খ্রী) তিনখানি নীতি-মূলক সংগীতাত্মক কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার আচার্য জিনবল্লভ সূরির স্তুতিমূলক 'চচ্চরী' একটি ৪৭ শ্লোকাত্মক গীতিকাব্য। বহু উপদেশ ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ

তাঁহার আর দুইটি নীতিমূলক কাব্য হইতেছে 'উপদেশ রসায়ন রাস' ও 'কালস্বরূপ ফুলক'। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে ৮০টি ও ৩২টি শ্লোক আছে। এই শ্রেণীর অপর একজন লেখক হইলেন মহেশ্বর সূরি (১৩০৯ খ্রী)। তিনি হেমহংস সূরির শিষ্য। মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্বস্বের অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাবলী অবলম্বনে লিখিত সুপ্রভাচার্যের 'বৈরাগ্যসার' (১১৭১ খ্রী) ৭৭টি দোহায় লিখিত এই ধরনের আর একটি নীতিমূলক কাব্য।

উপদেশপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থরচনায় প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন জৈনাচার্য জোইন্দু। কাহারও মতে তিনি ৭ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার আবির্ভাব-কাল ১০০০ শতকের পূর্বে নহে। তাঁহার পরমাত্মপ্রকাশ' 'যোগসার' 'শ্রাবকাচার দোহক' ও 'দোহাপাহুড়' ভাবগাম্ভীর্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দেবসেনের 'সাবয়ধম্মদোহা', (৮৯৪ খ্রী) রাজসিংহের (১০ম শতাব্দী) 'পাহুড়দোহা', অভয়দেব সূরির 'জয়-তিহুয়ণ' স্তোত্র প্রভৃতিও এই জাতীয় গ্রন্থ।

জৈনেরা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা পশ্চিমী ও দক্ষিণী অপভ্রংশ। পূর্বদেশের প্রাচ্য অপভ্রংশে যে সকল অজৈন গ্রন্থকারের লেখার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে কাহ্নু, সরহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাহ্নের (৭০০ খ্রী) ও সরহের (১০০০ খ্রী) দোহাকোষ সাধনসংকেতমূলক অপভ্রংশ দোহা। ইহা মূলতঃ উপদেশাত্মক হইলেও ইহাতে প্রভূত কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন আছে। 'ডাকার্ণবতন্ত্র'ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। তাঁহারাই সর্বপ্রথম কবিতায় মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রচলন করেন। ইহা হইতেই দেশভাষার ছন্দে মিলের উদ্ভব। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির (১৪শ শতাব্দী) 'কীর্তিলতা'ও প্রাচ্য অপভ্রংশের আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রাচ্যদেশে যে সমস্ত লেখক অপভ্রংশ গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ছন্দোগ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র লেখক পিঙ্গলাচার্য (আনুমানিক ১৫শ শতাব্দী) তাহাদের অন্যতম। ইহাতে 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'বর্ণবৃত্ত' উভয় জাতীয় ছন্দেরই আলোচনা আছে। ১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে রত্নশেখর সূরির পরে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি উদাহরণসহ যে সব ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মাত্রাবৃত্তে গাহা, বিগ্গাহা, উগ্গাহা, দোহা, রোলা, ছপ্পঅ, কব্বলকৃথণ, দোঅই (দ্বিপদী) প্রভৃতি এবং বর্ণবৃত্তে পঞ্চাল, মন্দর, মালতী, মল্লিকা, রূপমালা, তোটক, চাসর, চচ্চরী প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ছন্দের উদাহরণ হিসাবে তিনি যে সকল শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহার সাহিত্যমূল্য কম নহে।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধ-বিজ্ঞান মানুষের অপরাধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করাই অপরাধ-বিজ্ঞানের (criminology) আলোচ্য বিষয়। এই বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা— মনস্তাত্ত্বিক, ব্যাবহারিক ও প্রায়োগিক। ইংরেজীতে ইহাদের যথাক্রমে ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি (criminal psychology), অ্যাপ্লায়েড ক্রিমিনলজি (applied criminology) এবং ফোরেন্সিক সায়ান্স (forensic science) বলা হইয়া থাকে। এই তিনটি শাখাই বর্তমানে এরূপ পুষ্ট হইয়াছে যে, ইহাদের কেন্দ্র করিয়া তিনটি প্রায় স্বতন্ত্র বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রাচীন ভারতে এই বিদ্যাটির যথেষ্ট প্রচলন ছিল, নানা দিক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনস্তাত্ত্বিক শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল এই যে, মানুষ অপরাধ করে কেন। অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা কি রূপে ও কি কারণে জাগ্রত হয় এবং কি রূপে এই ব্যাধি হইতে মানুষ নিরাময় হইতে পারে? এই বিভাগে অপ-স্পৃহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বংশানুক্রম ও পরিবেশ, অপরাধী-বিভাগ, অপরাধী-সমাজ, অপরাধ-চিকিৎসা, অপরাধ-দর্শন, অপরাধ-সাহিত্য, অপরাধ-গবেষণা প্রভৃতি কয়েকটি উপবিভাগ আছে। কি রূপে পরিবেশসম্ভূত অপ-স্পৃহা সৎ লোকের মধ্যেও আবির্ভূত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতের মনীষীরা তৎকালীন রীতি-অনুযায়ী বহু কাহিনীর মাধ্যমে দিয়া গিয়াছেন। কুপরিবেশের মধ্যে মানুষের অপস্পৃহা জন্মায় এবং প্রতিরোধশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে উহা দমন করা যায়। মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ-বিজ্ঞানের আধুনিক পণ্ডিতগণও এই একই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাও বলেন যে, বাক্প্রয়োগ দ্বারাও মানুষের অপস্পৃহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বিশেষ কোনও ঘটনাও এই অপস্পৃহা দূর করিবার সহায়ক হইতে পারে। বাক্যের ন্যায় কোনও কোনও ঘটনাও মানুষকে প্ররোচিত করিয়া তাহাদের দ্বারা এমন সকল অপকর্ম করাইতে পারে, যাহা তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও চিন্তাও করিত না।

বিগত শতাব্দীতে ইওরোপে লমব্রসো এবং গোরিং অপরাধ-বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা

করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের উভয়ের মতবাদই ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইটালীয় পণ্ডিত লম্‌ব্রসোর মতে লম্বা চোয়াল, শূকরচক্ষু, থ্যাবড়া নাক প্রভৃতি অস্বাভাবিক দৈহিক চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণতঃ উৎকট অপরাধী হয়। লম্‌ব্রসোর শিষ্যেরা এই বিষয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হন। তাঁহাদের মতে এই সকল শারীরিক লক্ষণ হইতে কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের অপরাধ করিতে পারে, তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত গোরিং এই মতবাদ খণ্ডন করেন। তিনি প্রায় তিন হাজার কয়েদীর দেহ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে, অপরাধস্পৃহার সহিত দৈহিক লক্ষণের কোনও সম্বন্ধ নাই। গোরিং-এর মতে, চিত্তদৌর্বল্যের জন্যই মানুষ অপরাধ করে। পনর বৎসরের বালকের যেরূপ বুদ্ধি থাকা উচিত, কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যদি তাহা অপেক্ষা দুই-চারি বৎসরের কম বয়স্কের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি বলা হয়। গোরিং-এর মতে এই সকল দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিই হয় উৎকট অপরাধী। তিনি পরীক্ষার দ্বারা এইরূপ বহু দুর্বলচিত্ত অপরাধী বাহির করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকদের মধ্যে এইরূপ বহু পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় যে, প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা ঠিক তের বা চৌদ্দ বৎসরের বালকের ন্যায়। কিন্তু তাহাদের কেহই কখনও কোনও অপরাধ করে নাই। কাজেই গোরিং-এর মতবাদও ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অনেকেই প্রাচীন হিন্দুদের মতকেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। মানবচরিত্রে অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং সুপরিবেশে তাহার সুপ্তি এবং কুপরিবেশে তাহার অভিব্যক্তির কথা সাধারণ-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন যাহা কিছু মতভেদ তাহা এই অপস্পৃহার উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে। একটি মাত্র কারণের জন্য কেহ অপরাধী হয় না। অপরাধী সৃষ্টির পিছনে সাধারণতঃ বহুবিধ কারণ বর্তমান থাকে। কেবল মাত্র অভাব-অভিযোগ এবং কুপরিবেশ অপস্পৃহা উদ্ভবের কারণ হইতে পারে না। ক্লেপটোম্যানিয়াক প্রভৃতি অপরাধ-রোগী প্রায়ই ধনী ও শিক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ক্ষেত্রে অপস্পৃহা যে অভাব বা পরিবেশজনিত নয় ইহা সুস্পষ্ট।

অপস্পৃহা উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী অপরাধীদের প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে— ১. অপরাধ-রোগী এবং ২. নীরোগ অপরাধী। এই নীরোগ অপরাধীদের আবার স্বভাব ও অভ্যাস হিসাবে মধ্যম ও দৈব অপরাধীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থার অপরাধীদের প্রাথমিক অপরাধী এবং পরিণত অবস্থার অপরাধীদের প্রকৃত অপরাধীও বলা যাইতে পারে। অন্য দিকে মানুষের অপস্পৃহাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন— দ্রব্যস্পৃহা ও শোণিতস্পৃহা। এই শোণিতস্পৃহা আবার যৌনজ ও অযৌনজ— দুইটি উপ-বিভাগে বিভক্ত। এই সকল বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই।

ব্যাবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞান বিভাগটিকে তিনটি প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বিভাগে প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, সিঁদেল চোর, সাধারণ চোর, ডাকাত, অপহারক, বলাৎকারকারী প্রভৃতি বিবিধ যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধীদের বাসস্থান, রীতিনীতি, স্বভাব-চরিত্র, সংগঠন, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় বিভাগে আলোচনা করা হয় অপরাধ নির্ণয় ও অপরাধ নিরোধের রীতিনীতি। ইহাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষী ও আসামীর বিবৃতি গ্রহণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ ও উহাদের সংরক্ষণ, খানাতল্লাশ ও দেহতল্লাশ, গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ, মিছিল (T. I. Parade) শনাক্তকরণ, টহলদারি ও পাহারাদারির ব্যবস্থা, সাধারণ ও পরিবেশগত প্রমাণ সংগ্রহ ও সোপর্দকরণ ইত্যাদির রীতিনীতির বিবরণ দেওয়া হয়। তৃতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়— স্বভাবদুর্বৃত্ত শ্রেণীর ইতিবৃত্ত ও অপরাধ-পদ্ধতি, পদচিহ্ন এবং অঙ্গুলির ছাপ, সংকেত উদ্ধার ও হস্তলিপি-বিদ্যা প্রভৃতি।

অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের আইনগত (legal) প্রয়োগের রীতিনীতি সম্পর্কিত শাস্ত্রকে ফোরেন্সিক সায়েন্স (Forensic Science) বলা হইয়া থাকে। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত একটি কেশ, রক্তবিন্দু, ধাতুনির্মিত দ্রব্য, মৃত্তিকা, দগ্ধ বিড়ি-সিগারেটের ভস্ম প্রভৃতি দ্রব্যাদির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এই ফোরেন্সিক সায়েন্সের সাহায্যে সমাধা করিয়া বহু দুরূহ অপকর্মের মীমাংসা সম্ভব হয়। খাদ্যাদিতে ভেজাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই বিদ্যা অপরিহার্য। রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত আল্ট্রা-ভায়োলেট প্রভৃতি আলোকরশ্মির দ্বারাও এই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে একটি কেশ বা একবিন্দু রক্ত দেহের কোন্ অংশ হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা যেমন বলা যায়, তেমনই উহা কোন্ মানুষের দেহ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও বহু ক্ষেত্রে বলা সম্ভব হয়। হত্যা প্রভৃতি অপরাধে এই বিজ্ঞানের

সাহায্যে আসামীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। বর্তমান কালের মত বিজ্ঞানসম্মতভাবে না হইলেও অপরাধ-বিজ্ঞানের এই বিভাগটি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতেও চর্চা হইয়াছিল।

পঞ্চানন ঘোষাল

অপরান্ত ভারতের একটি প্রাচীন জাতি ও জনপদের নাম। বর্তমানে কোঙ্কন নামে পরিচিত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে সহ্যাদ্রি ও সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত প্রদেশই প্রধানতঃ অপরান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। পুরাণ, রঘুবংশ, বৌদ্ধগ্রন্থ ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও অপরান্ত নামে আর একটি দেশ ছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অপরার্ক কোঙ্কন দেশের অধিপতি শিলাহাররাজ প্রথম অপরাদিত্য অপরার্ক নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা রচনা করিয়া ইনি খ্যাত হন। ইহা বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরার ন্যায় মূলানুগ টীকা নহে, অপরার্কের স্বাধীন চিন্তা দ্বারা উদ্ভাসিত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা। তিনি ভাসর্বজ্ঞ-র ন্যায়সারেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

দ্র K. A. Nilakanta Sastri, *A History of South India*, London, 1958.

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪ খ্রী) একাধারে নট, নাট্যকার এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচালক। পাকপ্রণালী ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অপরেশচন্দ্র বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পঠনকালে মাত্র পনর বৎসর বয়সে শখের থিয়েটারের আখরায় যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং স্টার থিয়েটারের সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের নিকট প্রথমে অভিনয় শিক্ষা করেন। কলিকাতা ও মফস্বলের নানাস্থানে প্রায় দশ বৎসর কাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত তিনি শখের অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির সহিত উদীয়মান নট হিসাবে এবং নাট্যশিক্ষার ব্যাপারে তাঁহার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতারূপে যোগদান করেন। নট হিসাবে উচ্চ খ্যাতি অর্জন না করিলেও তাঁহার বাচনভঙ্গী ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ তাঁহার অভিনয়কে হৃদয়গ্রাহী করিত। ঐ বৎসরেরই ফাল্গুন মাসে তিনি কিছুকালের জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি নব-সংগঠিত স্টার থিয়েটারে নট, নাট্যকার এবং পরিচালকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এইখানেই তাঁহার কর্মজীবন শেষ হয়।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু পরে অপরেশচন্দ্র পর্যায়ক্রমে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'কর্ণার্জুন' নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং ২০০ রজনীর অধিক অভিনীত হইয়াছিল। তিনি 'রঙ্গিলা' (১৯১৪), 'আহুতি' (১৯১৫), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'উর্বশী' (১৯১৯), 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩), 'মন্ত্রশক্তি' (১৯৩০), 'মা' (১৯৩৪) প্রভৃতি ২৮ খানি নাটক, একখানি উপন্যাস এবং 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামে নিজ নটজীবনের আংশিক কাহিনীর রচয়িতা। নাটক রচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

প্রবোধকুমার দাস

অপালা ব্রহ্মবাদিনী। চর্মরোগের জন্য দেহ সম্পূর্ণ নির্লোম হওয়ায় ইনি স্বামীপরিত্যক্তা হন। পিতা অত্রির মাথায় টাক ছিল এবং তাঁহার শস্যক্ষেত্র অনুর্বর ছিল। ইন্দ্রের নিকট অপালার প্রার্থনা ছিল— 'আমাদের পিতার উষর ক্ষেত্র, আমার এই শরীর ও আমার পিতার মস্তক এই সকলকে লোমযুক্ত কর। সেই ইন্দ্র বহুবার আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদিগের সংখ্যা বর্ধিত করুন, তিনি আমাদিগকে বহুবার ধনবান করুন। পতি পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সংগত হইব।'

সোমচর্বণরতা অপালার দন্তঘর্ষণজনিত শব্দকে অভিষব প্রস্তরোত্থিত ধ্বনি মনে করিয়া ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হন এবং অপালার মুখ হইতে সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করেন। ফলে অপালা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মবাদিনী অপালা ঋগবেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ঋষি।

অপেরা সংগীত-প্রধান নাটক। অন্যান্য নাটকে সংগীত থাকিতে পারে, কিন্তু সংগীত সেখানে পীড়াদায়ক নাটকীয় ঘটনার পর মানসিক স্বস্তি ও সমতা বিধান করিবার জন্য, কোনও গূঢ় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অথবা দর্শকদিগকে নিছক আনন্দদান করিবার জন্যই সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু অপেরায় সমগ্র নাট্যঘটনাটি

অপেরা

সংগীতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়, সুতরাং সংগীতের উপযোগী করিয়াই সেখানে নাটকের ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত হয়। তবে অপেরা যখন নাটকেরই একটি বিশিষ্ট বিভাগ, তখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অপেরার সংগীত স্বতন্ত্রভাবে গেয় সংগীতের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নাট্যরসের আবেদন দর্শকচিত্তে জাগাইয়া তোলা। অপেরা সংগীত-প্রধান হইলেও ইহা রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হইবার জন্যই লিখিত হয়; সেই জন্য ইহার রচনা ও মঞ্চে উপস্থাপন বিষয়ে কেবল শ্রাব্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলে না, দৃশ্যতার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য দৃশ্যসজ্জা এবং চরিত্রগুলির অঙ্গভঙ্গী ও চোখ-মুখের ক্রিয়াদির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা দরকার। তবে অপেরার জগৎ সাধারণতঃ বাস্তববন্ধনমুক্ত কল্পনারঞ্জিত জগৎ, সেইজন্য স্বাভাবিক-ভাবেই অপেরার অভিনয় সাংকেতিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া পড়ে।

অপেরা নামটি বিদেশী, কিন্তু সংগীতপ্রধান এক বিশেষ শ্রেণীর নাটককে বুঝাইবার জন্য বাংলা সাহিত্যে এই নামটি গৃহীত হইয়াছে। তবে অপেরার আর একটি প্রতিশব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইল গীতাভিনয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি এক নূতন ধরনের নাট্যাভিনয় প্রচলিত হইল এবং তাহাই গীতাভিনয় নামে আখ্যাত হইল। গীতাভিনয় অনেকাংশে নাটকেরই অনুরূপ, কিন্তু ইহার অভিনয় ছিল যাত্রাধর্মী; অর্থাৎ ইহাতে দৃশ্যপটাদির ব্যবহার হইত না। এই গীতাভিনয়ের উদ্ভব সম্বন্ধে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখের সংবাদ-প্রভাকরে লেখা হইয়াছিল:

"প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সংগীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ-প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।"

যে সব শখের দল গীতাভিনয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভবানীপুরের উমেশচন্দ্র মিত্রের দল, কলিকাতায় আরপুলি গলির দল ও সিমুলিয়ার 'সখের যাত্রা কোম্পানি'। শখের দলগুলি সুপরিচিত নাটকগুলিই অতিরিক্ত বহু গান সংযোজন করিয়া গীতাভিনয়ের উপযোগী করিয়া লইত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম অপেরা বা গীতাভিনয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণের রত্নাবলী অবলম্বনে হরিমোহন কর্মকারের রচিত আর একখানি গীতাভিনয়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ নভেম্বর বৌবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সংবাদ-প্রভাকরের বিবরণে জানা যায় যে, শুধুমাত্র যবনিকা অবলম্বন করিয়া এই অভিনয় হইয়াছিল এবং এই অভিনয়ে তৎকালীন গণ্যমান্য সমাজের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরেও পদ্মাবতীর আরও কয়েকটি অভিনয় হইয়া-ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সাবিত্রী-সত্যবান'-এর গীতাভিনয়ও একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র শর্মার 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক' (১৮৬৬)-এ প্রাচীন যাত্রার আদর্শ অনেকটা বজায় ছিল। হরিমোহন কর্মকারের 'জানকীবিলাপ' (১৮৬৭) গীতাভিনয় রূপে তখন বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 'জানকীবিলাপ' সম্পূর্ণরূপে সংগীতময়, গদ্য ইহাতে মোটেই নাই। এই সময়ে অন্যান্য যে গীতাভিনয়গুলি প্রকাশিত অথবা অভিনীত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৬৭), যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'কীচকবধ-নাটক', 'চিত্রাঙ্গদা মিলন' (১৮৬৯), 'চণ্ডকৌশিক' (১৮৬৯), শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'লক্ষ্মণ-বর্জন নাটক' (১৮৭০), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'আগমনী' (১৮৭০) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য।

গীতাভিনয় যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি রূপ হইলেও সংগীতপ্রাধান্যের ফলে ক্রমে গীতাভিনয় ও যাত্রা সমার্থক হইয়া পড়িল। তবে প্রাচীন যাত্রার সহিত গীতাভিনয়-যাত্রার পার্থক্য এখানে যে, গীতাভিনয়-যাত্রাতে ঘটনার সংহতি দৃঢ়তর এবং সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা গীতাভিনয়-যাত্রা রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দাস দে, তিনকড়ি বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গীতাভিনয়-যাত্রাকে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়। ব্রজমোহন প্রথমে পাঁচালির দল চালাইতেন, সেইজন্য তাঁহার গীতাভিনয়-যাত্রায় পাঁচালির প্রভাব বেশি পড়িয়াছিল। সংগীত-রচনা ও কৌতুকরস সৃষ্টিতেও ব্রজ-মোহনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যাত্রা-পালাগুলির মধ্যে 'অভিমন্যুবধ', 'রামাভিষেক', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'শতস্কন্ধ রাবণবধ', 'দানববিজয়', 'কংসবধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গীতাভিনয়-যাত্রা রচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন মতিলাল রায়। মতিলালের রচনার মধ্যে পাঁচালি ও কথকতার মিশ্রণ দেখা গিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার রচনায় প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতার অভাব ছিল। তাঁহার গদ্যরচনা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। তাঁহার রচিত পালাগুলির মধ্যে 'সীতাহরণ', 'ভরতাগমন', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'রামরাজা', 'কর্ণবধ', 'ব্রজলীলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মতিলালের পরে তাঁহার দল চালাইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র ধর্মদাস। ইনিও কয়েকখানি গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন, যথা, 'কবচ-সংহার', 'শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি। পরবর্তী গীতাভিনয় রচয়িতাদের মধ্যে দ্বারকানাথ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ দে প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

গীতাভিনয় রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ হইলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু। মনোমোহনের নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত নাটক এবং গীতাভিনয় উভয় রূপেই সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার অনেকগুলি নাটককে অতিরিক্ত সংগীত সংযোজনা করিয়া গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হরিশ্চন্দ্র', 'পার্থপরাজয়', 'যদু-বংশ ধ্বংস', 'রাসলীলা' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

পরবর্তী কালে গ্র্যাণ্ড অপেরা, অপেরা কমিক, অপেরা বুথ প্রভৃতির অনুকরণে নানা শ্রেণীর গীতিনাট্য রচিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরতন সান্যাল প্রভৃতি এই ধরনের গীতিনাট্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরে অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ মিত্র, কুঞ্জবিহারী বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রভৃতি অনেকেই গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নৃত্যবহুল নাটকগুলি অপেরা জাতীয় রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আধুনিক কালে অপেরা নাটক প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক যাত্রাদলগুলি অনেক ক্ষেত্রে অপেরা নামটি গ্রহণ করে বটে, কিন্তু যাত্রার মধ্যেও সংগীতপ্রাধান্য বর্তমানে অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং যাত্রাভিনয়ও সংলাপ-প্রধান ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

অজিতকুমার ঘোষ

অপ্পয্য দীক্ষিত (১৫২০-১৫৯২ খ্রী) দাক্ষিণাত্যের ভেলোরের নায়কগণের, বিশেষ করিয়া নায়ক চিন্ন বোম্ম-র আশ্রিত নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি বেঙ্কটনাথ বা বেদান্ত-দেশিক রচিত প্রসিদ্ধ 'যাদবাভ্যুদয়' কাব্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। 'চিত্রমীমাংসা' এবং 'লক্ষণাবলী' নামক সাহিত্যালোচনা বিষয়ক দুইখানি পুস্তক তাঁহার রচিত। কবি জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' কাব্যের ব্যাখ্যান হিসাবে 'কুবলয়ানন্দ' নামে তাঁহার গ্রন্থখানি বিস্তারিত ব্যাখ্যান বা টীকা হইলেও ভাষার গুণপনায় ইহা অলংকারশাস্ত্রের স্বতন্ত্র গ্রন্থের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক দার্শনিক ও ভক্তিমূলক গ্রন্থ আছে।

দ্র K. A. Nilakanta Sastri, *A History of South India*, London, 1958 ; Sushil Kumar De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1960.

অপ্পর্ তামিল দেশবাসী প্রসিদ্ধ শৈব সাধক ও শৈব নায়নার সম্প্রদায়ের অন্যতম পূজ্য গুরু। (নায়নার দ্র) খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি বর্তমান ছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। অপ্পর্ তাহা খর্ব করিয়া শৈব ধর্মের বিস্তারকার্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

দ্র K. A. Nilakanta Sastri, *A History of South India*, London, 1958.

অবচেতন মনঃসমীক্ষা দ্র

অবজারভেটারি মানমন্দির দ্র

অবতার[১] পৃথিবীর পাপভার অবতারণ বা অপহরণের জন্য দেব-দেবীরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন মূর্তিতে বা অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৪।৭-৮) ও দেবী-মাহাত্ম্যে (১১।৫৪-৫) বিষ্ণু ও জগজ্জননীর এইরূপ আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি আছে। অবতার দ্বিবিধ— অংশাবতার ও পূর্ণাবতার। বিষ্ণুর অবতারই বেশি পরিচিত। নানা গ্রন্থে অবতারের নানা সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৯।৭২-১০৪)

ভগবানের চার, ছয় ও দশ মূর্তির কথা বলা হইয়াছে। হরিবংশে ছয় মূর্তির (বরাহ, নরসিংহ, বলিনাশন বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম ও কৃষ্ণ) কথা আছে। বায়ু-পুরাণ, বরাহপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে দশ অবতারের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে অবতারদের মধ্যে বেদব্যাসের নাম আছে। ভাগবতপুরাণে তিন স্থানে (১।৩, ২।৭, ১১।৪) যথাক্রমে বাইশ, তেইশ ও ষোল অবতারের নাম পাওয়া যায়। ভাগবতোক্ত অবতারের মধ্যে সনৎকুমার, নারদ, কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, বুদ্ধ ও ধন্বন্তরির নাম উল্লেখযোগ্য। ঋষভ ও জৈনদিগের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব একই ব্যক্তি হইতে পারেন। ইঁহার বংশপরিচয় ও যোগচর্যার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (ভাগবত, ৫।৩-৬)। পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় উনচল্লিশটি বিভব বা অবতারের নাম পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দশ অবতারের নাম : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, বলরাম বা কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী।

দ্র R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems*, Strussburg, 1913 ; O. Schrader, *Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita*, Madras, 1916.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অবতার২ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর অঞ্চলের লোকনৃত্য। চড়ক ও গম্ভীরার উৎসবে মন্ত্রপূত মুখোশ পরিয়া এই নৃত্য করা হয়। দশ অবতারের রূপ ও লীলা প্রকট করাই এই নৃত্যের উপজীব্য।

মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

অবদান পালি অপদান ; দুইটি একই শব্দ ; উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্নরূপে লিখিত হয়। অর্থ 'উল্লেখযোগ্য কার্য'।

সংস্কৃতভাষায় লিখিত অবদানগুলিতে নীতি অথবা ধর্মসম্বন্ধীয় বুদ্ধের অতীত জন্মের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী বিবৃত হয়। জাতকের ন্যায় অবদানও বৌদ্ধসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জাতকের সহিত ইহার সাদৃশ্যও রহিয়াছে।

অবদানের সূচনায় বুদ্ধ কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে তাঁহার অতীত জন্মের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন তাহার উল্লেখ করা হয় এবং ঐ কাহিনী বিবৃত হইবার পর একটি নীতি-বাক্য থাকে। এই হিসাবে অবদানের তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়— বর্তমানের প্রসঙ্গ, অতীত কাহিনী ও একটি নীতি। অতীত কাহিনীর নায়ক যদি বোধিসত্ত্ব হন তবে সেই অবদানকে জাতকও বলা যাইতে পারে। কোনও কোনও অবদানে অতীত কাহিনীর পরিবর্তে বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। প্রথম পর্বের অবদানগুলিতে তথাকথিত হীনযানী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু পরবর্তী কালের অবদান সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে মহাযানী।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পালি অপদানের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার বহুসংখ্যক প্রখ্যাত শ্রাবক-শ্রাবিকাদের ঐতিহ্য-মূলক জীবনীগ্রন্থ। ইঁহাদের বর্তমান জীবনের কার্যকলাপ ও পরমার্থলাভ কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলভোগরূপে গৌতমপূর্ব এক বা কল্পান্তে অবস্থিত একাধিক বুদ্ধগণের প্রসাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছিল, অপদান পদ্যাকারে তাহারই কৃতজ্ঞতাময় আবেগময় ও অকপট ধারাবাহিক দীর্ঘ বর্ণনা। জাতকের কাহিনীগুলিতে বোধিসত্ত্ব নায়ক এবং বিভিন্ন জন্মে তাঁহার কার্যাবলী 'দশপারমী'-র পূরণস্বরূপ। অপদানের অতীত বা বর্তমান কাহিনীগুলির সেইরূপ কোনও লক্ষণ নাই, শুধু ভূতপূর্ব বুদ্ধদিগের আন্তরিক সেবা ও তাহার স্থলে ভবিষ্যৎ জন্মে পরম সৌভাগ্য ও জীবন্মুক্তি লাভই অপদানে সংগৃহীত পদ্যাবলীর বিষয়বস্তু। চরিয়াপিটকও দশপারমী-পূরণ-কারী বোধিসত্ত্বের পূর্ব-জীবনের পদ্যে বর্ণিত কাহিনীর উল্লেখমাত্র। থেরী-গাথাও গৌতমবুদ্ধের শ্রাবক-শ্রাবিকাদের বর্তমান জীবনের আত্মকাহিনী ও উপলব্ধির পদ্যে নিবদ্ধ বর্ণনা। ইহাতে দুই এক ক্ষেত্রে কোনও থের বা থেরীর পূর্বজীবনের ঘটনার ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির সহিত অপদানের ইহাই পার্থক্য।

অপদানের রচনা ও শব্দগঠনে স্থানে স্থানে বৈদিকোত্তর সংস্কৃত ভাষার ছাপ আছে।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

অবধ অযোধ্যা দ্র

অবধী পূর্বী হিন্দীর অন্তর্গত একটি প্রধান উপভাষা। ইহার অপর নাম কোশলী বা বৈস্ওয়ারী। অবধী নামটি আসিয়াছে অযোধ্যা (< অবধ্, অওধ্) হইতে, অর্থ অযোধ্যা অঞ্চলের উত্তর কোশলের ভাষা। পূর্বী হিন্দীর আরও দুইটি প্রধান উপভাষা আছে— বঘেলী ও ছত্তিসগঢ়ী। বঘেলী বঘেলখণ্ডের ভাষা, ছত্তিসগঢ়ী দক্ষিণ কোশলের।

১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত পুস্তক 'উক্তিব্যক্তি-প্রকরণ'-এ এই অবধী বা কোশলী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই বই দামোদর পণ্ডিত কর্তৃক

লিখিত, বিষয়— লোকভাষা অবধীর মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা। ইহাতে বহু প্রাচীন অবধী শব্দ ও বাক্য আছে। জৌনপুরের সুলতানদের সমৃদ্ধিকালে অবধীর পরিপুষ্টি শুরু হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষায় অন্ততঃ দুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়। একটি মালিক মহম্মদ জায়সী-র 'পদুমাবৎ' (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪১ খ্রী) এবং তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' (রচনাকাল আনু-মানিক ১৫৬৫ খ্রী)। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লেখকের রচনাতে সমৃদ্ধ অবধী সাহিত্য পুরাতন নব্য ভারতীয় আর্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সুকুমার সেন

অবধী সাহিত্য মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যে ব্রজভাষার পরেই অবধীর স্থান। খড়ীবোলী ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত অবধী ভাষার যাবতীয় রচনা হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়। ইহার সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ কবি জগনিক বিরচিত 'আল্হা-খণ্ড'। আল্হা-উদলের বীরত্ব-কাহিনীপূর্ণ এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করা হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মৌখিক পরম্পরায় চলিয়া আসার ফলে ইহাতে প্রচুর ভাষাগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ ইলিয়ট ফরুক্খাবাদ (ফরাক্কাবাদ) জিলার বিভিন্ন চারণ কবির মুখ হইতে আল্হা খণ্ডের কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের পরেই অবধ প্রদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ 'আল্হা-খণ্ড'।

আল্হা খণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে দামোদর পণ্ডিত বিরচিত 'উক্তিব্যক্তিপ্রকরণ' নামক গ্রন্থখানিকে অবধী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আনুমানিক ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল অবধী ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃতের শিক্ষাদান। ইহাকে ঠিক সাহিত্যগ্রন্থ বলা যায় না। উত্তর ভারতের অন্যতম সাহিত্যিক ভাষারূপে অবধীর বিকাশ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে।

অবধী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা সুফীভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত এবং প্রধানতঃ মুসলমান কবিদের রচিত প্রেমাখ্যান কাব্য। এই শাখার প্রথম গ্রন্থ 'চন্দায়ন' (চন্দাবত) বা 'লৌরচন্দা' নামক একখানি প্রেমকাব্য। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবি মুল্লা দাউদ এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। লোরিক ও চন্দার প্রণয়কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। নায়ক এক জায়গায় বলিতেছে : 'আমি জাতিতে আহীর, আমার নাম লোরিকা। শহদেব ভরের কন্যা চন্দার বিবাহ হয় ভবনের সঙ্গে। আমি ভবনের গৃহ হইতে চন্দাকে লইয়া আসিয়া তাহাকে আমার স্ত্রী করি। সে পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গিনী হইল।' এই গ্রন্থ এখনও পুরাপুরি লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই এবং পরবর্তী প্রায় ১৩০ বৎসরের মধ্যে ইহার অনুসরণে কোনও কাব্য রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। সেইজন্য কেহ কেহ ষোড়শ শতাব্দীকেই প্রেমকাব্যের আবির্ভাবকাল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শ শতকের গোড়াতেই কুতবন রচিত 'মৃগাবতী'-তে ইহার সূচনা এবং ঐ শতকের মধ্যভাগে মালিক মহম্মদ জায়সী রচিত 'পদুমাবৎ' গ্রন্থে ইহার পূর্ণ বিকাশ। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপর এই ধারার প্রভাব লক্ষণীয়।

হিন্দী সাহিত্যের অমর কবি তুলসীদাস ষোড়শ শতকের চতুর্থ পাদে অবধী ভাষায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'রামচরিতমানস' রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিংশ শতাব্দীর আগে অবধী ভাষায় কোনও কৃষ্ণচরিত কাব্য রচিত হয় নাই। কৃষ্ণলীলা যেন ব্রজভাষার জন্যই সুরক্ষিত ছিল।

সন্ত কবিদের মধ্যে অবধী ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচনা করেন সপ্তদশ শতকের মলুকদাস। অতঃপর মথুরাদাস, ধরণীদাস, চরণদাস প্রমুখ কবিদের মধ্য দিয়া এই ধারা বেশ কিছুকাল অব্যাহত ছিল।

উনিশ শতকে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব (১৮৫০-১৮৮৫ খ্রী) এবং মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর সম্পাদনায় সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিকপত্র 'সরস্বতী' প্রকাশের (১৯০০ খ্রী) ফলে উত্তর ভারতে যে প্রবল হিন্দী আন্দোলন (যথার্থভাবে বলিতে গেলে খড়ীবোলী-আন্দোলন) গড়িয়া উঠিল, তাহার সম্মুখে অবধী সাহিত্য আর তাহার পূর্ব-গৌরবে টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। অবধীভাষী কবিগণও খড়ীবোলী আয়ত্ত করিয়া হিন্দী সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। ভারতেন্দুর সহযোগী প্রতাপনারায়ণ মিশ্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতাপনারায়ণ তাঁহার নিজস্ব ভাষা অবধীতে কিছু কিছু রচনা করিলেও খড়ীবোলীই ছিল তাঁহার মুখ্য অবলম্বন।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এইরূপ চলিল। এই সময়ে অবধীর চর্চা থাকিলেও তাহা খুবই সামান্য। খড়ীবোলীর আওতার মধ্যে থাকিয়া অবধী সাহিত্যে যাঁহারা নূতন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করিলেন তাঁহারা সকলেই বিংশ শতাব্দীর কবি। স্বর্গীয় বলভদ্র দীক্ষিত (ছদ্মনাম 'পঢ়ীস') ইঁহাদের অগ্রগণ্য। পঢ়ীসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিলেন বংশীধর শুক্ল, চন্দ্রভূষণ ত্রিবেদী,

অবধী সাহিত্য

দয়াশংকর দীক্ষিত (ছদ্মনাম 'দেহাতী') ইহাদের পশ্চাতে স্ত্রী-পুরুষ আরও অনেকে। বিশাল হিন্দী অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষাসমূহের মধ্যে অবধী আজ পর্যন্ত সর্বাধিক সাহিত্য-মর্যাদার অধিকারী বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অবধী সাহিত্যের লেখকবৃন্দ হিন্দী সাহিত্য হইতে বিযুক্ত নহেন; তাঁহাদের কেহ কেহ একই সঙ্গে উভয় সাহিত্যের চর্চা করিয়া আসিতেছেন।

হিন্দী সাহিত্যের তুলনায় অবধী সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য স্বভাবতই কম। ইহাতে নাটক ও প্রহসন জাতীয় রচনা কিছু কিছু থাকিলেও ইহা মুখ্যতঃ কাব্যসাহিত্য; এবং ইহার মূল উপজীব্য পল্লী ও পল্লী-জীবন। লখনউ বেতার-কেন্দ্রের 'পঞ্চায়েৎঘর' নামক পল্লীমঙ্গল-আসরের সঞ্চালক চন্দ্রভূষণ ত্রিবেদী (যিনি 'রমই কাকা' নামে পরিচিত) পল্লী সম্পর্কিত নানাবিধ রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন।

পল্লীর কৃষক, খেত-খামার, নদী-প্রান্তর, বর্ষা-বসন্ত, গ্রাম্য মেয়ে, দাম্পত্য-চিত্র, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ লইয়া অবধী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীত ও লোক-সাহিত্যই অবধীর প্রধান গৌরব। ইহার ইতিহাস বিশেষ প্রাচীন এবং পুরুষ-পরম্পরায় সেই প্রাচীন ধারা যুগোচিত কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ বর্তমান যুগের কবিদের মধ্যেও বজায় রহিয়াছে।

বিষয় অনুসারে অবধী লোকসংগীতসমূহকে নিম্নলিখিত-রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে— নহছূ বা নাখুর (নখ-ক্ষৌর), বিবাহের গীত, চৌমাসা, বারহমাসা, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সম্বন্ধীয় গান, সোহর (পুত্রজন্ম সম্বন্ধীয় গীত), ছঠী (ষষ্ঠ রাত্রি), পসনী (অন্নপ্রাশনের গান), চক্কীর গান, হোলী ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গীতসমূহে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির উল্লেখ যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই সমস্ত শহরের ঐশ্বর্য, বিলাস ও প্রলোভন সম্পর্কে সুদূরবর্তিনী পল্লীনারীদের মনোভাবটুকু বেশ বোঝা যায়। ষষ্ঠ রাত্রির গীতে নবজাত শিশুকে উপলক্ষ করিয়া প্রতিবেশিনীদের একটি গানে পাই— উহার দাদু হইল কলিকাতার রাজা, সে যখন হাতিতে চড়িয়া আসিবে তখন দুয়ারে নহবত বাজিতে থাকিবে। কাকা বোম্বাই-এর রাজা, সে আসিবে ঘোড়ায় চড়িয়া। বাবা দিল্লীর রাজা, সে আসিবে মোটরে। অন্য সমস্ত স্বজন কানপুর, লখনউ প্রভৃতির রাজা— তাহারা কেহ আসিবে সাইকেলে চড়িয়া, কেহ বা গাধার পিঠে ইত্যাদি। অপর একটি গানে বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীকে যাহা বলিতেছে, তাহার মর্মার্থ এইরূপ —হে প্রিয়, তুমি আমার জন্য একখানি ফুল-কাটা শাড়ি আনিয়া দিও। কিন্তু মিনতি আমার, তুমি কলিকাতা যাইও না, বোম্বাই যাইও না, লখনউ হইতে আনিয়া দিলেই চলিবে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি নিতান্তই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত; ইহার রচয়িতাদের নাম পর্যন্ত জানিবার উপায় নাই। আধুনিক যুগের কবিরাও মুখ্যতঃ সেই পল্লী-জীবনকে আশ্রয় করিয়াছেন। পল্লীবালার চিত্র অঙ্কনে বলভদ্র দীক্ষিত (পঢ়ীস) বলিতেছেন: কাশ-ফুলের মত তাহার চেহারা; কোঁকড়ানো চুল আসিয়া মুখের উপর চুমু খাইতেছে। বাছুরকে সে আদর করে; খিল খিল করিয়া হাসে— যেন বালুকারাশির উপর প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পশু-পাখির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বনে বনে সে মঙ্গলগীত গাহিয়া বেড়ায়— গরীব কিসানের বিটিয়া।

ইহারই মধ্যে আবার নূতন সুর শোনা যায় কোনও কোনও কবির কণ্ঠে। 'কিসানশংকর' কবিতায় মৃগেশ দেখিয়াছেন মহাদেবের সহিত কৃষকের সাদৃশ্য। কবি বলিতেছেন: আমিও কিসান, তুমিও কিসান,···ঘরবাড়ি আমারও নাই, তোমারও নাই···আমরা উভয়ে ধূলিমাখা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। তুমি মাখো শ্মশানের ছাই, আমি মাখি খেতের ধূলি।

ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাও আধুনিক অবধী সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণসমাজের মর্যাদা ভারতপ্রসিদ্ধ। আধুনিক অবধী কবি 'পঢ়ীস' সেই কনৌজী ব্রাহ্মণদের অধঃপতিত মিথ্যা মর্যাদাকে আঘাত দিতে গিয়া বলিয়াছেন: হম কনউজিয়া বামন আহিন— আমরা হইলাম কনৌজী ব্রাহ্মণ। ঘরে পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূদের লইয়া পরিবারটি নিতান্ত ছোট নয়। ভিক্ষা করিয়া সকলের পেট ভরাইতে হয়। বত্রিশ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা ঘরে রহিয়াছে, আর আছে আঠার বছরের পৌত্রী; তবু উন্নত আমাদের মর্যাদার জয়-পতাকা। কারণ আমরা যে কনৌজী ব্রাহ্মণ।

মধ্যযুগের অবধীতে রামায়ণ লিখিয়া তুলসীদাস হিন্দী-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় হইয়া আছেন। সে যুগের অবধীতে কোনও কৃষ্ণকাব্য রচিত হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন বর্তমান যুগের দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র তাঁহার সুবৃহৎ 'কৃষ্ণায়ন' কাব্য রচনা করিয়া। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের আদর্শে রচিত এই কৃষ্ণকাব্যখানি অবধী সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ।

আধুনিক অবধীতে নূতন নূতন সংযোজন হইলেও অবধী সাহিত্যের পাঠকের মনে শেষ পর্যন্ত যে ছাপ থাকিয়া যায় তাহা চন্দ্রভূষণের প্রগতিশীল কবিতা নয়, বলভদ্রের ব্যঙ্গ-কবিতা নয়, দ্বারকাপ্রসাদের কৃষ্ণকাব্যও নয়, তাহা সেই সুচিরাগত পল্লীসংগীত। 'হিন্দী সাহিত্য' দ্র।

দ্র ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, অবধী ঔর উস্‌কা সাহিত্য, দিল্লী, ১৯৫৪ ; ইন্দুপ্রকাশ পাণ্ডেয়, অবধী লোকগীত ঔর পরম্পরা, এলাহাবাদ, ১৯৫৭।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অবধূত বিচিত্র আচারবিশিষ্ট সাধক। যিনি একই সঙ্গে ত্যাগ ও ভোগের অনুসরণ করেন অথচ কোনওটিতেই আসক্ত হন না তিনি অবধূত। সর্বপ্রকার প্রকৃতিবিকারকে উপেক্ষা করেন (অবধুনোতি) বলিয়া নাম অবধূত (কাশীর সরস্বতী ভবন প্রকাশিত গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ১)। অবধূত নানাপ্রকার— শৈবাবধূত, কৌলাবধূত, গৃহস্থ, দিগম্বর, পরমহংস।

গৃহস্থ সবস্ত্র সস্ত্রীক ভাবুক সাধক শুচি গুরুভক্তিরত জ্ঞানী নিষ্কাম শিবার্চনপরায়ণ। দিগম্বরাবধূত সর্বভোগী সর্বজাতির ধর্ম-কর্মে রত। গৃহস্থাবধূতের মদ্যগ্রহণ ও অগম্যাগমন নিষিদ্ধ, দিগম্বরের পক্ষে বিহিত। পরমহংস অপরিগ্রহ নিষেধবিধিরহিত আত্মভাবসন্তুষ্ট শোক-মোহশূন্য নিঃসঙ্গ কর্মত্যাগী।

দ্র হরকুমার ঠাকুর, হরতত্ত্বদীধিতি, পঞ্চদশ কলা, কলিকাতা, ১৮৮১ ; শব্দকল্পদ্রুম।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রী) দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র গুণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথের জীবন বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা বিশেষ কতকগুলি উপলব্ধি ও বিচিত্র রকমের ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত।

'আপন কথা' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'ঘরোয়া' এই তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে পারা যায়। বিশেষভাবে 'আপন কথা' বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথ যেমনভাবে তাঁহার শৈশবের নানা উপলব্ধি চিত্রিত করিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' বই দুইখানির সাহায্যে তৎকালীন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা চলে।

বাহিরের জগৎ হইতে অনেক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন, দাস-দাসী পরিবৃত শৈশবজীবন অবনীন্দ্রনাথের মনকে যে কল্পনাপ্রবণ অন্তর্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল এ ব্যাপারে আশ্চর্য হইবার কোনও কারণ নাই।

অবনীন্দ্রনাথের শৈশবের স্মৃতি প্রথমতঃ আলো-ছায়ার জগৎকে কেন্দ্র করিয়া। প্রদীপের আলোয় পদ্মদাসী, চাঁদের আলো, আলো অন্ধকারে ঢাকা ঘর বারান্দা, বিচিত্র আকারের আসবাবপত্র, পিতার লাল রঙের চটি জুতা, কর্মতৎপর দাস-দাসীর বিচিত্র গতিভঙ্গী এইসবের স্মৃতি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পানুভূতির আদিম উপাদান।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন পিতা গুণেন্দ্রনাথের শৌখিনতা ও বিলাসিতা। সেই সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল পিসীর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো নানারকম পট। শৈশব ও কৈশোরের যে সকল ঘটনা তাঁহার মনে ছাপ ফেলিয়াছিল সেই সকল ঘটনা বিচিত্র রূপে রঙে সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার উত্তরকালীন রচনাতে।

অবনীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই গৃহমুখী শিল্পী। যদিও মুসৌরি দার্জিলিং ডালহৌসি ভ্রমণ বা বাংলার সাহাজাদপুর প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন তাঁহার শিল্পকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই কথা স্বীকার করিতে হয় অবনীন্দ্রনাথ সকল সময়ই এই সকল অভিজ্ঞতাকে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই নূতন করিয়া উপভোগ করিয়াছেন।

সংক্ষেপে, বাহিরের অভিজ্ঞতা পরিচিত পরিবেশে যে পর্যন্ত না অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন সেই পর্যন্ত কোনও অভিজ্ঞতাই শিল্পের উপাদান হইয়া উঠে নাই।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবন কি ভাবে পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছিল সংক্ষেপে সেই বিষয়ে কিছু বলা দরকার। স্কুল-কলেজ অপেক্ষা গৃহশিক্ষকের কাছেই অবনীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের শিক্ষা। ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ কিছুকাল সংগীতচর্চা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রকলার প্রতি তাঁহার সহজাত আকর্ষণ অতি শৈশবকাল হইতেই লক্ষ্য করা যায়। পিতা গুণেন্দ্রনাথ এক সময় আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শৌখিন পরিবেশ ও শিল্পচর্চার আবহাওয়া অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ সহায়ক ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষক গিলার্ডি ছিলেন তৎ-কালীন আর্ট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। শিল্পী গিলার্ডির

নিকট অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্যাস্টেল ড্রয়িং, ওয়াটার কালার ড্রয়িং শিক্ষা করিয়াছিলেন। গিলার্ডির কাছে শিক্ষা শেষ করিয়া অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষক পামারের কাছে লাইফ্ স্টাডি, অয়েল পেন্টিং ইত্যাদি শিক্ষা করেন। অবনীন্দ্রনাথ যে সময়ে রীতিমত বিলাতী পদ্ধতিতে শিল্পচর্চা করিয়াছিলেন এবং স্টুডিয়ো সাজাইয়া প্রতিকৃতি শিল্পী (portrait painter) হইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন সেই সময় দেশী ছবির একখানি অ্যালবাম তিনি উপহার পান। ঠিক একই সময় কতকগুলি আইরিশ ইলুমিনেশন (Irish Illumination) তিনি উপহার পান মার্টিন ডেন নামক এক মহিলার নিকট হইতে। দেশী ও বিদেশী ছবির একটি আশ্চর্য মিল অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন। দেশী ছবির ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ-সমাবেশ, সূক্ষ্ম কারুকার্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে তিনি দেশী ছবির আদর্শে ছবি আঁকিবার প্রয়াস পান। দেশী আদর্শে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা কৃষ্ণলীলা চিত্রাবলী। এই চিত্রাবলীর কিছু অংশ অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষক পামারকে যখন দেখান তখন তাঁহাকে বিলাতী পদ্ধতির পরিবর্তে নিজের আবিষ্কৃত পথই অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন।

কৃষ্ণলীলা চিত্রাবলীর রচনাকালে কলিকাতা আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। হ্যাভেলের চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন (১৮৯৮ খ্রী)। ইতিপূর্বে কোনও ভারতীয় শিল্পী ঐ পদ পান নাই।

হ্যাভেলের সহযোগিতায় অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প ভালভাবে অনুশীলন করেন। বজ্রমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা ইত্যাদি চিত্রে ভারতীয় আঙ্গিক ও আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি।

জাপানী অঙ্কনরীতি অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেন টাইকানের নিকট হইতে ; অপর দিকে ভারতীয় ভাব-ধারা অবলম্বনে টাইকান কতকগুলি চিত্র রচনা করেন। ভারত ও জাপানের শিল্পীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের প্রথম সূচনা হয় এই ভাবে।

জাপানী প্রভাবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতি যে পথে চালিত হইয়াছিল তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ওমর খৈয়ামের চিত্রাবলী। ওমর খৈয়ামের চিত্ররীতিতে অবনীন্দ্রনাথ যে নূতন কতকগুলি উপাদান ভারতীয় শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা একান্তভাবে ভারতীয় শিল্পের পরম্পরা দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। শিল্পগুরুরূপে অবনীন্দ্রনাথের জীবন শুরু হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় হইতে অবনীন্দ্রনাথের জীবন অনেক পরিমাণে কর্মতৎপর হইয়া উঠে এবং ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে তিনি শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃত হন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ই. বি. হ্যাভেল, স্যর জন উড্রফ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির পত্তন হয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিল্প-আদর্শকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

হ্যাভেলের ভারত ত্যাগের কিছুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দরবার উপলক্ষে কলিকাতায় যে আয়োজন হয় সেই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্তীরা মণ্ডপসজ্জার ভার প্রাপ্ত হন এবং এই সময় ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে অবনীন্দ্রনাথ সি. আই. ই. উপাধি পান। বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে স্বাদেশিকতা ও কর্মতৎপরতার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনে যৎসামান্য। তিনি কোনদিনই লোকনেতা হইয়া উঠিতে পারেন নাই। জোড়াসাঁকো বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় শিল্পী অবনীন্দ্র-নাথকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পাই। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে জোড়াসাঁকো বাড়ি ক্রমশঃ একটি যেন প্রতিষ্ঠানের রূপ পাইয়াছিল। তাঁহার অতুলনীয় শিল্পসংগ্রহ হইতেই আনন্দ কুমারস্বামী *Indian Drawing* পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হিসিডা, খাৎসুতা, কম্পু-আরাই ইত্যাদি জাপানী শিল্পীদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীদের পরিচয়ের সম্ভাবনা অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের বাসভবনকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম ঘটিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'বিচিত্রা সভা'র পত্তন হয়। নানা দিক দিয়া একালের জীবনযাত্রায় ভারতীয় পরিবেশসৃজনের চেষ্টা এই সূত্রে শুরু হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের শিল্পপ্রচেষ্টার নিদর্শন ভারতের বাহিরে প্রথম প্রদর্শিত হয় লণ্ডনে, পরে প্যারিস শহরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত দুইটি প্রদর্শনীর মূল্য অসাধারণ। কারণ এই প্রদর্শনীর ফলে অবনীন্দ্রনাথ-গোষ্ঠীর শিল্পকৃতি সম্বন্ধে ইওরোপীয় ক্রিটিকেরা যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আজিও বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত। টোকিয়ো শহরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের ছবির প্রদর্শনী হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এ দেশে অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ও স্বীকৃত হন তাঁহার এই সময়ের কাজে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের যে বিশেষ রকমের পরিবর্তন ঘটে সে সম্বন্ধে রসিকসমাজ আজিও অনবহিত। ১৯২০-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প যত বৈচিত্র্যময় হইয়া দেখা দিয়াছিল এমন পূর্বে বা পরে আমরা লক্ষ্য করি না। এই সময়ে স্যর আশুতোষের আন্তরিক চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন (১৯২১ খ্রী)।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রেখা বর্ণ রূপ— তিনের সমন্বয়ে অবনীন্দ্রনাথ সরল রূপসৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা যে পরিমাণে মূর্তিধর্মী তাহার সাদৃশ্য পূর্বের রচনাতে আমরা দৈবাৎ পাই। 'কাটুম কুটুম' নামে পরিচিত অবনীন্দ্রনাথের শেষ দিকের রচনা সম্পূর্ণ সাহিত্যভাব-বর্জিত আকারনিষ্ঠ 'বিমূর্ত' রূপ-সৃষ্টি।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ভারতীর আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিছুকাল বাস করেন।

যে মন ও ভাব লইয়া অবনীন্দ্রনাথ কাটুম কুটুম খেলনা গড়িয়াছিলেন সেই মন ও ভাবের প্রকাশ আমরা তাঁহার শেষের দিকের ছবিতেও পাই। এই সকল ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকারে ছোট— এই সময়ে বহু রকমের 'স্টিল লাইফ' তিনি করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অনধিক কাল পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রায় সমস্ত ছবি রবীন্দ্রভারতী ক্রয় করেন।

একালে ভারতীয় শিল্পের নবজাগৃতি অবনীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের (প্রতিভার) দ্বারা প্রেরিত বা অনু-প্রাণিত এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অপর দিকে অল্প লোকেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা নিঃসংকোচে স্বীকার করিতে পারিয়াছেন। অবনীন্দ্র-প্রতিভার গতি এবং অবনীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণ পৃথক কারণে পৃথক দুইটি ক্ষেত্রে সক্রিয় হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পপ্রেরণাকে অন্তরের অন্তরে স্বীকার করিয়াছেন এবং সাহিত্যগত ভাব ও শিল্পরূপ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তিনি অনুভব করেন নাই। প্রেরণার শক্তিতে অবনীন্দ্রনাথ চালিত হইয়াছিলেন, এ দেশের বা বিদেশের কোনও পরম্পরা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। অপর দিকে জনমত তাঁহাকে কেবলই বাঁধিতে চাহিয়াছিল ভারতীয় প্রাচীন পরম্পরার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা পরম্পরা হইতে শিল্পের প্রকরণগত উপায়-উপাদান অনায়াসে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার শিল্প একান্তভাবে বাংলার অথবা একান্তই ভারতীয় পরম্পরা-বিবর্তন এ কথা বলা চলে না। আন্তর্জাতিক পটভূমিতে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় শিল্পী। শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি উন্মেষিত হইয়াছে সর্বপ্রথম অবনীন্দ্রনাথে। ওমর খৈয়াম, সাহাজাদপুর দৃশ্যাবলী, আরব্য আখ্যানচ্ছবি অথবা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ছবি— এই সব রচনাতে সাহিত্যগত ভাবপ্রকাশের চেষ্টা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ রূপসৃষ্টির সাফল্যই বিশেষ দ্রষ্টব্য আর তাহাই ছিল শিল্পের লক্ষ্য। তাঁহার রচিত অজস্র mask বা মুখোশ কল্পনা শিল্পীর আকারনিষ্ঠ রূপনির্মাণের বিশেষ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা সংগত। অপর দিকে তাঁহার হাতের তৈয়ারি কাটুম কুটুম খেলনা বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার বিবর্তন কি ভাবে সম্ভব হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষ কতকগুলি রচনার উল্লেখ করা গেল।

অবনীন্দ্রনাথের যে শিল্পাদর্শ ভারতে জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার মূলে আছে অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া শিক্ষা। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। চিত্রশিল্পের প্রকরণগত কোনও বৈশিষ্ট্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবর্তীদের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। অপর দিকে নিজস্ব অঙ্কনরীতির দ্বারাও তরুণ শিল্পীদের প্রভাবান্বিত করার কোনও চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সংক্ষেপে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিল্প-প্রেরণা সম্বন্ধে শিল্পীদের তিনি বারে বারে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ শিল্পীদের মনকে যে ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল তেমন ভাবেই শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্র-নাথের প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে আধুনিক ভারতীয় শিল্পধারা বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রভাব অপসৃত হইলে এবং তাঁহার চিত্ররূপের বাহ্যিক অনুকরণমাত্রে অনেকে প্রবৃত্ত হইলে, অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্পধারা বৈচিত্র্যহীন সাহিত্যানু-কারী, ভাবালু এবং আঙ্গিকের দিক দিয়া দুর্বল হওয়ার কারণে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসে।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধি এতই মহৎ যে তুলনায় তাঁহার সাহিত্যশিল্পের কৃতিত্ব যেন নিষ্প্রভ; তথাপি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার সাহিত্যকৃতি দুই কারণে শ্রদ্ধেয়। প্রথমতঃ, তাঁহার চিত্রশিল্প ও সাহিত্যশিল্প উভয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড শিল্পী-ব্যক্তিত্ব রচনা করিয়াছে, তাঁহার আত্মপ্রকাশের বাহক হিসাবে এক শিল্পকর্ম অপর শিল্পকর্মের সম্পূরক। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার চিত্রগুলির সঙ্গে রচনাগুলিও অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার রচনাগুলিতে স্বাধিকারোজ্জ্বল শক্তি, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। নিছক লেখক হিসাবেও অবনীন্দ্রনাথের মহিমা অসামান্য।

অবনীন্দ্রনাথের লেখকজীবন দীর্ঘ— বিষয়বস্তুতে, রচনাশৈলীতে এবং রচনার মেজাজে বিচিত্র রূপসম্পন্ন। 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬ খ্রী) রচিত হইয়াছে সেই সব শিশুদের জন্য যাহারা হয়ত নিজেরা এখনও পড়িতে শিখে নাই। বয়সে আরও দুই-তিন বৎসর বাড়িয়া ইহারা পড়িবে 'শকুন্তলা' (১৮৯৫খ্রী) ও 'নালক' (১৯১৬ খ্রী) —প্রাচীন ভারতের জীবন তাহাদের সম্মুখে চিত্রায়িত হইবে সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়। আবার হয়ত এই বয়সের বালক-বালিকার কল্পনা উদ্বুদ্ধ হইবে 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫ খ্রী) পাঠান্তে। এইভাবে 'রাজকাহিনী' (১৯০৯ খ্রী, ১৯৩১ খ্রী) 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯২১ খ্রী), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১ খ্রী), 'মাসি' (১৯৫৪ খ্রী), 'মারুতির পুঁথি' (১৯৫৬ খ্রী) প্রভৃতি নানা কাহিনী-গ্রন্থগুলি শৈশব হইতে প্রথম যৌবন অবধি নানাবয়সের চিত্তাবস্থায় বিমল আনন্দের সঞ্চার করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বই 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়, তাহার পরে তাঁহার দীর্ঘ জীবনকালে বহু গ্রন্থ 'ভারতশিল্প' (১৯০৯ খ্রী), 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯ খ্রী), 'প্রিয়দর্শিকা' (১৯২১ খ্রী), 'চিত্রাক্ষর' (১৯২৯ খ্রী ?), 'ঘরোয়া' (১৯৪১ খ্রী), 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১ খ্রী), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪ খ্রী),' সহজ চিত্রশিক্ষা' (১৯৪৬ খ্রী), 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭ খ্রী), 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭ খ্রী), 'ভারতশিল্পে মূর্তি' (১৯৪৭ খ্রী), 'একে তিন তিনে এক' (১৯৫৪ খ্রী), 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫ খ্রী), 'রং-বেরং' (১৯৫৮ খ্রী), রচিত হইয়াছে। সাময়িকপত্রাদিতে প্রকাশিত অনেক রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়াছে, কিছু বা এখন পর্যন্ত হয় নাই। দুইখানি গ্রন্থ, 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' শ্রুতিধরীর লেখনীতে রচিত, কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থেই অবনীন্দ্রনাথের আপন ভাষা যেন টেপ-রেকর্ডে বিধৃত হইয়াছে। 'বুড়ো আংলা' গ্রন্থে অন্তপ্রেরণার সুদূর উৎস বিদেশী কাহিনীতে, কিন্তু অপরের বস্তুকে বেমালুম আপন করার এমন মসৃণ শিল্পক্ষমতা শেক্‌স্‌পীয়রেও বিরল। সাহিত্যের যে অংশকে আমরা শিশুসাহিত্য বলিয়া অভিহিত করি, যে সাহিত্যের আনন্দ বস্তুতঃ শিশু বা বালকের জন্যই নহে, বয়স্কদের জন্যও বটে, বাংলা সাহিত্যের সেই শাখায় অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব চিরোজ্জ্বল এবং তুলনারহিত। তাঁহার প্রশস্ত প্রতিভায় যেন হান্স আনডারসেন, লিউইস্ ক্যারল্, জেম্‌স্ ব্যারি এবং আরও অনেক প্রতিভাধর বিদেশী লেখকের কল্পনাশক্তি সমন্বিত ও কেন্দ্রিত হইয়াছে দেশজ কথন-ঐতিহ্যের সঙ্গে। কাহিনীনির্বাচনে ও কাহিনীকথনে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতঃ দেশজ ঐতিহ্যে নিষিক্ত। বঙ্গীয় কথকঠাকুর, ঘুমপাড়ানি দাসী, চাঁইবুড়ো— ইহাদের কথন-পদ্ধতি অবনীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে বিধৃত হইয়াছে এবং দেশজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলিয়া এই গল্পগুলির বৈচিত্র্য অতুলনীয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একাধিক শৈলী প্রকট। কাব্য-ধর্মী গদ্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার প্রায় যাবতীয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় বটে তথাপি এই নিদর্শনের সমৃদ্ধতম আকর চারিটি গ্রন্থে— 'রাজকাহিনী', 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা' ও 'পথে বিপথে'। অন্যত্র পাওয়া যায় কথাশৈলী, যে শৈলী লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "অবন যেন কথা কইছে আমি শুনতে পাচ্ছি।" এই কথাশৈলীর কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও শ্লেষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে অথচ শ্লেষে কোনও নির্মমতা নাই। এই গদ্যের ধর্ম যখন যেমনই হউক না কেন তাহার প্রাণশক্তি বাংলা ভাষার প্রাকৃত বাক্-রীতিতে। কাহিনীকথনের মেজাজে, বাক্-ভঙ্গীতে, কাহিনীরচনার ছাঁদে ও করণ-কৌশলে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতঃ প্রাকৃতপন্থী, তাঁহার শিল্পে ও মনীষায় বিশুদ্ধ ভারতীয়তা অনন্যসাধারণ। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহার একাত্মতা কত সহজ ও নিবিড় ছিল তাহার অন্যতম সাক্ষ্য পাওয়া যায় শিল্পসম্বন্ধীয় রচনাগুলিতে।

শিশু বা বালক-বালিকার জন্য অনেক কাহিনী রচনা করিয়াছেন বলিয়া যে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী অগভীর ছিল এমন নয়। বস্তুতঃ চিত্রশিল্পে যেমন, সাহিত্যশিল্পেও তেমনই তাঁহার দূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টির পরিচয় পাই। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষী মূর্তির অ্যানাটমি দিয়ে মানস-মূর্তির অ্যানাটমির দোষ ধরতে যাওয়া মূর্খতা।" অন্যত্র বলিয়াছিলেন, "ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক …আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক।" অর্থাৎ শিল্পের কারবার স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা লইয়া নয়, যদিও যে কোনও মানবিক অভিজ্ঞতার ন্যায় শৈল্পিক অভিজ্ঞতার মূলও বাস্তবে, শিল্পলোকে স্থূল বাস্তব রূপান্তরিত হয় পরাবাস্তবে। অবনীন্দ্রনাথের কাহিনীগুলি প্রাকৃত রসনিষিক্ত বটে কিন্তু

তাহারা নিয়ত পাঠকের চিত্তে লৌকিক সত্যের অপেক্ষাও মহত্তর অতিকাল্পনিক সত্যের ইঙ্গিত আনিয়া দেয়। সামান্যকে অসামান্যীকরণের মধ্যে লেখক অবনীন্দ্রনাথের গভীর জীবনবোধের পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ দেশী-বিদেশী নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ; *The Visva-Bharati Quarterly*, May-October, 1942 ; *Abanindranath Tagore*, *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, November, 1961.

অমলেন্দু বসু

অবন্তি, -ন্তী প্রাচীন ভারতের একটি পরাক্রান্ত জাতি এবং তদধ্যুষিত জনপদের নাম ছিল অবন্তি। অবন্তি দেশের রাজধানী ছিল সিপ্রা নদীর তীরবর্তী উজ্জয়িনী নগরী। কখনও কখনও উজ্জয়িনীকে অবন্তি এবং সিপ্রাকে অবন্তি নদী বলা হইয়াছে। নামটি কদাচিৎ 'অবন্তী' আকারে লিখিত দেখা যায়। প্রাচীন মালবজাতির নাম হইতে মধ্যযুগে দেশটির মালব বা পশ্চিম মালব নাম হয়।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তি নামক জনৈক রাজা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে রাজা অবন্তিকে যদুকুলের হৈহয় শাখার মাহিষ্মতী নগরাধিপতি কার্তবীর্যার্জুন বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যে অবন্তিদক্ষিণাপথ সংজ্ঞক রাষ্ট্র ও উহার রাজধানী মাহিষ্মতীর উল্লেখ লক্ষণীয়। মাহিষ্মতী বর্তমান মধ্যপ্রদেশের নিমার অঞ্চলে অবস্থিত। অপর একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে কার্তবীর্য বংশীয় তালজঙ্ঘ হইতে তালজঙ্ঘকুলের উদ্ভব এবং উহার পঞ্চশাখার নাম— ভোজ, বীতিহোত্র, শার্যাত, অবন্তি এবং তুণ্ডিকের।

উপরে যে কিংবদন্তীগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন অবন্তি জাতির দেশ উজ্জয়িনী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং একসময়ে দক্ষিণ-নর্মদা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত অবন্তিগণের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। এই সময় সুবিস্তৃত অবন্তি জনপদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে উজ্জয়িনী ও মাহিষ্মতীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই দক্ষিণ অবন্তিকে বৌদ্ধ লেখকেরা অবন্তি-দক্ষিণাপথ বলিয়াছেন এবং অনেক সময় উহাকে অশ্মক দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া অশ্মকাবন্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অশ্মকরাজ্যের রাজধানী ছিল অন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ জেলার অন্তর্গত বোধন (প্রাচীন 'পৌদন্য')। সুতরাং অবন্তিদক্ষিণাপথ রাজ্য নর্মদার দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে মাহিষ্মতী নগরীকে অনূপ দেশের রাজধানী বলা হইয়াছে।

মূল অবন্তিরাজ্য অর্থাৎ উজ্জয়িনী অঞ্চলকে বর্তমানে পশ্চিম মালব বলা হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জনপদটির মালব নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ উজ্জয়িনী এবং মালব দেশকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই মালব গুজরাটের মহীনদীর নিকটে অবস্থিত ছিল। আবার বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীতে উজ্জয়িনীকে অবন্তি-জনপদের এবং বিদিশানগরী অর্থাৎ বর্তমান ভিলসার নিকটবর্তী বেসনগরকে মালব দেশের প্রধান নগর বলিয়াছেন। এই প্রাচীন ধারা অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগেও অনেকে পশ্চিম ও পূর্ব মালবকে যথাক্রমে অবন্তি ও মালব নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনী অঞ্চল বুঝাইতে মালব নামের ব্যবহার সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই সময় গুজরাটের অন্তর্গত মালবদেশ হইতে আসিয়া পরমারগণ পশ্চিম মালবে অধিষ্ঠিত হন।

ভারতের ঐতিহ্যে অবন্তি বা মালব অর্থাৎ পশ্চিম-মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী সুপ্রসিদ্ধ। ইহার প্রথম কারণ উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল মন্দির। দ্বিতীয়তঃ, ইহা কিংবদন্তীবর্ণিত সুবিখ্যাত শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। এই বিক্রমাদিত্যকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮ অব্দ হইতে গণিত বিক্রমসংবতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কীর্তিকাহিনীই জনশ্রুতির 'বিক্রমাদিত্য' কল্পনার মূল ভিত্তি বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ বৈদেশিক শকরাজগণ ভারতবর্ষে যে সংবতের ব্যবহার প্রচারিত করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে উহার সহিত বিক্রমাদিত্যের নাম সংযুক্ত হইয়াছিল।

অবন্তির প্রাচীন ইতিহাসে পুরাণবর্ণিত প্রদ্যোতবংশ এবং গুপ্তপূর্বযুগের শকরাজবংশ সুপ্রসিদ্ধ। বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই শকবংশ উৎখাত করিয়া পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শক ও গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী জ্যোতিষবিদ্যাচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দ্র Nundo Lal Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, London, 1927 ; B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1954 ; G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*,

London, 1937; Dinesh Chandra Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

অবন্তীপুর কাশ্মীর রাজ্যে, জম্মু হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে, শ্রীনগর হইতে অনধিক ২৯ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্বে) ভাঁতিপুরা ও জৌত্রর নামক গ্রাম দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া ছড়াইয়া আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা ১৫৯০ মিটার (৫২১৭ ফুট)।

প্রাচীন কাশ্মীরের উৎপল বংশীয় নরপতি অবন্তীবর্মা (৮৫৫/৮৫৬-৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার রাজত্বকালে নিজ নামানুসারে এই নগরের পত্তন করিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। কাশ্মীরের সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এবং অবন্তীপুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত তোরমানের তাম্র-মুদ্রা হইতে অনুমান করা হয় যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে হুনদিগের রাজত্বকাল হইতেই (অবশ্য শ্রীভরের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, তোরমানের মুদ্রা পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল) অবন্তীপুর চীন, তিব্বত, মধ্য এশিয়া ও গান্ধারের বাণিজ্যপথে অবস্থিত অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। একাদশ শতাব্দীর লেখক ক্ষেমেন্দ্রের পুস্তক 'সময়মাতৃকা', দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও পরবর্তী কালের অন্যান্য গ্রন্থাদির সাক্ষ্য হইতে অনুমিত হয় যে অবন্তীবর্মা কর্তৃক এখানে রাজধানী স্থাপিত এবং তৎপুত্র শংকরবর্মা কর্তৃক রাজধানী এখান হইতে শংকরপুরপট্টনে স্থানান্তরিত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত এই নগরের গুরুত্ব অক্ষুন্ন ছিল।

অবন্তীপুরে কাশ্মীরের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের দুইটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে, জৌত্রর গ্রামের প্রান্ত ভাগে, কহ্লণ এবং অন্যান্য গ্রন্থকার বর্ণিত, অবন্তীবর্মার রাজত্বকালে তাঁহারই উৎসাহে নির্মিত অবন্তীশ্বর শিব-মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেষ্টনী লইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণের আয়তন ৬৬ মিটার×৬১ মিটার (২১৮×২০০ ফুট); মন্দিরের ভিত্তিভূমির ক্ষেত্রফল ৫৩০ বর্গ ডেসিমিটারের (৫৭ বর্গফুটের) অধিক। উৎপল রাজবংশীয়রা ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী।

নৃপতি অবন্তীবর্মা স্বয়ং বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে নির্মিত অবন্তীস্বামী বিষ্ণুমন্দিরটির নির্মাণকার্য সম্ভবতঃ অবন্তীপুরে রাজধানী স্থাপনের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাগুক্ত মন্দিরটির তুলনায় ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র। মন্দিরপ্রাঙ্গণের ক্ষেত্রফল ৫৩×৪৫ মিটার (১৭৪×১৪৮ ফুট) ও মধ্যবর্তী দেবালয়টির আয়তন ৩০৭ বর্গ ডেসিমিটার (৩৩ বর্গফুট)। পূর্বোক্ত মন্দিরটির ৮০৫ মিটার (অর্ধমাইল) দক্ষিণে, ভাঁতিপুরা গ্রামে অবস্থিত এই মন্দিরটি সম্ভবতঃ রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের পূজার্চনার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। ধ্বংসপ্রায় হইলেও এই মন্দিরটি অবন্তীশ্বর শিবমন্দিরের তুলনায় অভগ্ন।

অবন্তীশ্বর মন্দিরটি এত ধ্বংসপ্রাপ্ত যে তাহা হইতে উহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব নহে। তুলনায় অবন্তীস্বামী মন্দিরটি এতদ্‌বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করে। তুষারপাতের দেশ কাশ্মীরের কাষ্ঠনির্মিত গৃহের শীর্ষরচনারীতি হইতে প্রাপ্ত, সরলরৈখিক পিরামিডাকৃতি দুই বা তিন স্তরে রচিত ত্রিভুজাকৃতি শীর্ষ, কাশ্মীরের মন্দিরস্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই মন্দিরদ্বয়েরও শোভাবর্ধন করিত। এই রীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, দ্বিস্তর (বা ত্রিস্তর) ত্রিভুজাকৃতি কৌণিক খিলানের ব্যবহার, অবন্তীস্বামী মন্দিরের প্রায়ভগ্ন দ্বারপথ-গুলিতে আজিও অংশতঃ দৃশ্যমান। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, 'ডোরিক' রীতির 'কলাম'-এর ন্যায় স্তম্ভের ব্যবহার; কক্ষ-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ মন্দিরবেষ্টনীতে এবং খিলানের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহারে সর্বত্র এই স্তম্ভের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইত; অবন্তীস্বামী মন্দিরবেষ্টনীটি আজিও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অবন্তীশ্বর মন্দিরটির ন্যায় অবন্তীস্বামী মন্দিরটিও পঞ্চায়তন শ্রেণীর মন্দির; কিন্তু মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবালয়টির তুলনায় ক্ষুদ্রকায় চারিটি মন্দির পৃথক পৃথক ভাবে অঙ্গনের চারিটি কোণে অবস্থিত। আকারে এবং আকৃতিতে মধ্যবর্তী দেবালয়টির অনুরূপ অবন্তীস্বামী প্রবেশদ্বারগৃহটি অংশতঃ ভগ্ন অবস্থায় আজিও পরিলক্ষিত হয়। অবন্তীস্বামী মন্দিরের ভাস্কর্যালংকার-সংবলিত ভিতটি মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। স্থাপত্যের সহিত একই সময়ে কাশ্মীরের ভাস্কর্যশিল্পও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবন্তীপুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত প্রচুর শৈব ও বৈষ্ণব মূর্তি এবং তৎসহ কার্তিকেয় প্রভৃতি অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি সেই সাক্ষ্য বহন করে।

দ্র Sunil Chandra Roy, *Early History and Culture of Kashmir*, Calcutta, 1957; R. C. Kak, *Ancient Monuments of Kashmir*, London, 1933; James Fergusson, *History of Indian and Eastern*

Architecture, London, 1910; Percy Brown, *Indian Architecture*, vol., I, Bombay, 1952.

প্রণবরঞ্জন রায়

অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১ খ্রী) দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা সরকারের বৃত্তি পাইয়া তিনি মাদ্রাজে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অবলা বসু নারীশিক্ষা সমিতির (১৯১৯ খ্রী) প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

দ্র সরলা দেবী চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ১৯৫৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল

অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার প্রজ্ঞা পাণ্ডরা হইতে প্রসিদ্ধ মহাযানী বোধিসত্ত্ব মহাকারুণিক অবলোকিতেশ্বরের উদ্ভব। কথিত আছে যে, গৌতমবুদ্ধের তিরোধান ও মৈত্রেয়বুদ্ধের আবির্ভাবের অন্তবর্তীকালেই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বিরাজ করেন।

মহাযানী গ্রন্থ 'কারণ্ডব্যূহ' হইতে অবলোকিতেশ্বরের চরিত্র, স্বভাব এবং তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। এইরূপ উল্লিখিত আছে যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নির্বাণ লাভের পর শূন্যে বিলীন হইবার মুহূর্তে বহু প্রাণীর আর্তনাদ শুনিলেন। বোধিসত্ত্বের অবর্তমানে প্রাণীসাধারণ তাহাদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই ভীত হইয়াছিল। পরমকারুণিক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর প্রাণীসাধারণের এই কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাহাদের আর্তনাদ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন জগতের সকল প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ না করিবে ততদিন তাহাদের মুক্তির জন্য এই জগতে কাজ করিয়া যাইবেন এবং নির্বাণে প্রবেশ করিবেন না।

ইঁহার অপর নাম পদ্মপাণি। 'সাধনমালা' ও অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আমরা অবলোকিতেশ্বরের অন্ততঃ ১৫টি রূপ ধারণা করিতে পারি। নেপালে ও ভারতবর্ষে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

দ্র সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত কারণ্ডব্যূহ, কলিকাতা, ১৯৩০; B. Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography*, London, 1924; B. Bhattacharyya, *An Introduction to Buddhist Esoterism*, London 1932.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবলোহিত রশ্মি লাল আলো হইতে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য আলোকরশ্মিকে অবলোহিত রশ্মি বলা হয়। প্রায় ৭৫০০ অ্যাংস্ট্রম হইতে ইহার শুরু। বিশেষভাবে প্রস্তুত ফোটোগ্রাফির প্লেটের সাহায্যে অবলোহিত রশ্মি ধরা যায়। এই রশ্মি কোনও বস্তুর উপর পড়িলে উত্তাপ সৃষ্টি করে। এইজন্য থার্মোকাপ্‌ল-এর সাহায্যেও অবলোহিত রশ্মির অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। প্রত্যেক বস্তু হইতেই উষ্ণতার জন্য কিছু পরিমাণে অবলোহিত রশ্মি বিকিরিত হয়। সেইজন্য অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করিলে রাত্রির অন্ধকারেও অনুজ্জ্বল বস্তুর ছবি পাওয়া যায়। এইরূপ ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফি সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। কাগজে লেখা উঠাইয়া ফেলিলে বা কাপড়ে রক্তের দাগ ধুইয়া ফেলিলে অবলোহিত রশ্মিতে নেওয়া আলোকচিত্রে তাহা ধরা যায়। এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের কাজে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়। নানাবিধ পেশীর ব্যথায় অবলোহিত রশ্মি প্রয়োগ করিলে কিছু সুফল পাওয়া যায়। 'অতিবেগুনী রশ্মি' ও 'আলোক' দ্র।

শ্যামল সেনগুপ্ত

অবহট্ঠ (< অপভ্রষ্ট) প্রাকৃত (অপভ্রংশ) ও নবীন ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যবর্তী অবস্থার সাহিত্যিক ছাঁদ, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও শৈব অথবা নিরীশ্বর যোগীদের লেখা 'দোহা' নামক প্রকীর্ণ কবিতার ভাষা। সরহ ও কাহ্নের মত বৌদ্ধ যোগী যাঁহারা সংস্কৃতে তত্ত্বগ্রন্থ এবং সদ্যোজাত প্রাচীন বাংলায় গান লিখিয়াছিলেন তাঁহারা অবহট্ঠে নীতি ও সহজ অধ্যাত্মজ্ঞানের কথা লিখিয়াছিলেন। অবাঙালী যোগী-সাধকের লেখা অবহট্ঠ দোহাও পাওয়া গিয়াছে। অবহট্ঠ ভাষার ব্যবহার বিশেষ বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের মধ্যে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল (আনুমানিক ৭০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) তাহাও অবহট্ঠে লেখা। এইরূপ ব্যবহার পঞ্চদশ শতাব্দী এবং তাহার পরেও ছিল। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গলের অধিকাংশ সূত্রশ্লোক এবং উদাহরণ-কবিতা প্রায় সবই অবহট্ঠে লেখা। পঞ্চদশ

অবাধ নীতি

শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় গদ্য-পদ্যে জীবনীকাব্য 'কীর্তিলতা' রচনা করিয়াছিলেন।

অবহট্‌ঠে রচিত কিছু কিছু সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা-শ্লোক (আর্যা) বাংলায় আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। যেমন শুভংকরের নামে চলিত এই আর্যাটি—

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥

মূলে হয়ত এইরকম ছিল—

কুডবেঁ কুডবেঁ কুডবেঁ লিজ্জই।
কট্‌ঠাএঁ কুডব কট্‌ঠাএঁ লিজ্জই॥

খাটি বাংলায় এমনই হওয়া উচিত ছিল—

কুড়ায় কুড়া কুড়ায় নিয়ে।
কাঠায় কুড়া কাঠায় নিয়ে।

সুকুমার সেন

অবাধ নীতি (laissez-faire) ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহে যুগবিশেষের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি আস্ফালন মাত্র। প্রতিটি যুগে এক দিকে বিগত দিনের প্রভাব, অন্য দিকে আগামী দিনের পূর্বাভাস প্রমূর্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৫০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী যুগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই যুগে বাণিজ্যতান্ত্রিক মতবাদ এবং মধ্যযুগীয় ভাবধারা যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তথাপি বাণিজ্য-উদ্‌বৃত্ত বৃদ্ধির প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের যে কঠিন বেড়াজালে বাণিজ্যতান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে পদে পদে ব্যাহত করিয়াছে— তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নবযুগের অঙ্কুর ধীরে ধীরে উদ্‌গত হইয়া উঠিয়াছে। অবাধ নীতি এক দিকে সরকার সম্পর্কীয় নূতন চিন্তাধারা অন্য দিকে আর্থিক চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক সংস্কারের ইঙ্গিতবাহক মাত্র।

অবাধ নীতির উদ্ভব হইয়াছিল বিশেষ কয়েকটি ঘটনার প্রভাবে। মোটামুটিভাবে এই ঘটনাগুলি হইতেছে : ১ উদীয়মান পুঁজিবাদী সম্প্রদায়, ২. ধর্ম, ৩. অ্যাডাম স্মিথ রচিত অর্থতত্ত্ব ও ৪. শিল্পবিপ্লব।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অবধি শ্রেণী হিসাবে যে সম্প্রদায়ের স্থান নগণ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই সেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সংখ্যায় এবং সম্পদে সমাজে প্রায় শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত সম্প্রদায়ের এই প্রাধান্যলাভের মূলে ছিল উহার ক্ষিপ্র কর্মশক্তি আর সেই প্রগতির সুযোগ-সুবিধার চূড়ান্ত সদ্‌ব্যবহারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সেই যুগে নূতন দেশ আবিষ্কারের যে জোয়ার আসিয়াছিল তাহাতে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের নূতন সম্ভাবনা এই কর্মশক্তিকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নূতন বাণিজ্য এলাকার সন্ধানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল মূল্যস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যাহার মূলে কাজ করিয়াছে স্পেন দেশ হইতে মূল্যবান বহু ধাতুর অপসারণ, আর ড্রেক, হকিন্স, ফ্রবিশার প্রমুখ ব্যক্তির মারাত্মক দস্যুবৃত্তি। সম্প্রসারিত বাণিজ্যের মুনাফায় তখন কেবলমাত্র উচ্চতর হারে পুঁজি-সঞ্চয়ই ঘটে নাই; বণিক, বিক্রেতা, জাহাজ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী প্রত্যেকের ভাগ্যেই আসিয়াছিল শক্তি ও সমৃদ্ধি-লাভের অফুরন্ত সুযোগ। এই সময় সব চেয়ে লাভবান হইয়াছিল দুইটি জাতি— ইংরাজ ও ওলন্দাজ।

উন্নতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন শিল্প-সংস্থা তখন ক্রমশঃই অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছিল। তাহার স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া লইতেছিল ব্যক্তিগত প্রয়াসের আওতায় নূতন শিল্পোদ্যোগ। গিল্ড-জাতীয় সংস্থার তখন প্রায় পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রয়াসের সমৃদ্ধিলাভের তখন সুবর্ণসুযোগ। শিল্পসংগঠনে এই বিপ্লব-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদর্শ জগৎ নূতন মূল্যবোধের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সংযত ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আদর্শ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে নৈতিক বিধিবিধান সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় ধারণা ভাঙিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছিল, আসিয়াছিল একান্ত ধনের জন্যই ধনস্পৃহার অভিনব নীতিবোধ। গোড়ার দিকে যদিও মূল্যবান ধাতুর সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য-উদ্‌বৃত্ত সম্প্রসারণের খাতিরে এই নূতন নীতিবোধ ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন জানাইল তথাপি ইতস্ততঃ এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির সৃষ্টি হইল যে, মুনাফাস্পৃহার চরিতার্থতার ব্যাপারে বাণিজ্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমুক্তি একান্তই কাম্য।

মধ্যযুগে ধর্মের কাজ ছিল ব্যক্তির বিপক্ষে সমাজকে সমর্থন। খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসনে তখন সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত, এমন কি নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারেও ধর্মের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তথাপি এই কথা সত্য যে, বাণিজ্যবিস্তারের যে অনুকূল পরিবেশ তখন সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার অনুপ্রেরণায় এবং মুনাফাবৃদ্ধির প্রয়াসে ব্যক্তিগত স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা তখন সর্বপ্রকার বিরোধ অবরোধ অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রচেষ্টার দুর্বার গতিবেগ এক দিকে যেমন আইনকানুন এবং জনমতকে আগাগোড়া রূপান্তরিত করিয়াছে অন্য দিকে তেমনই ধর্মের প্রভাব এবং অনুশাসনকেও প্রভূত পরিমাণে খর্ব করিয়াছে। তৎকালে সমস্ত নীতি এবং তত্ত্ব বণিক ও বিনিয়োগকারীর স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিদ্বজ্জনের নানা লেখায় সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। একমাত্র অর্থশাস্ত্রেই এই বিশিষ্ট ভাবধারার কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তখনও সম্ভবপর হয় নাই। এই কাজ সুসম্পন্ন করিলেন অ্যাডাম স্মিথ। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত প্রয়াস ধনোৎপাদনের সর্বোত্তম পন্থা। গোড়ার দিকে শস্য-আইনে লাভবান জমিদারশ্রেণী এই মতের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত শস্য-আইনকে নাকচ করা প্রায় অসম্ভব হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে শিল্পবিপ্লবের সংঘাতে স্মিথের মতামত সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পর পর কয়েকটি যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। পরবর্তী শতাব্দীর সমাজ সম্পর্কিত উদার মনোভাব এবং স্বাধীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সহজ বিকাশ ব্যতীত এই সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভবপর হইত না। স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ এবং স্বচ্ছন্দ আর্থিক ক্রিয়াকলাপের গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষের মনে তখন আর কোনও দ্বিধাবোধের স্থান ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাতন্ত্র্যবাদ এতটা শক্তিশালী মতবাদে পরিণত হইয়াছে যে, সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দ্র G. M. Trevelyan, *English Social History;* H. M. Robertson, *Aspects of the Rise of Economic Individualism ;* H. Levy, *Economic Liberalism;* R. H. Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism.*

প্রবুদ্ধনাথ রায়

অবিদ্যা বেদান্ত দ্র

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬২ খ্রী) চব্বিশ পরগনা জেলার আড়বালিয়া গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ৫ এপ্রিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ফার্স্ট আর্টস্‌ -এর ছাত্র থাকার সময়েই তিনি বিখ্যাত বিপ্লববাদী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবাধীনে আসেন (১৯০২) এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবন বাছিয়া লন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের পর অবিনাশচন্দ্র অরবিন্দ ঘোষের সহকর্মী হিসাবে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিপ্লবপন্থী 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবিনাশচন্দ্র প্রথমাবধি যুগান্তরের ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন, সম্পাদক হন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়ে তিনি 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের যুবমনে রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারে সাহায্য করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে পুলিশ বোমার কারখানা আবিষ্কার করে; অতঃপর ঐ বৎসরের ২ মে গ্রে স্ট্রীটের নবশক্তি কার্যালয় হইতে অবিনাশচন্দ্র অরবিন্দের সহিত একই সঙ্গে গ্রেফতার হন। আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত অবিনাশচন্দ্রও অভিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আলিপুর জেলা জজ তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; পরে হাইকোর্ট তাঁহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবিনাশচন্দ্র অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত আন্দামানে প্রেরিত হন। ছয় বৎসর পরে ভারতভূমিতে আনীত হইলেও মাদ্রাজ বোম্বাই ও মণ্ট্‌গমারি (পাঞ্জাব) জেলে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হয়। অবশেষে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি কারামুক্ত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি বারীন্দ্রনাথ ঘোষের 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিনাশচন্দ্র *Calcutta Municipal Gazette* পত্রিকার দপ্তরে কাজ করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে কলিকাতার উপকণ্ঠে সিঁথিতে নিজভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অব্দ বৎসর; কালবোধার্থে বর্ষনির্ণায়ক সংখ্যা। যেমন শকাব্দ বঙ্গাব্দ খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি। দীর্ঘ কালান্তরের দুইটি ঘটনার অন্তর্গত সময় নির্ণয়ে বা ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পারম্পর্য এবং উহাদের সঠিক কাল নিরূপণের উদ্দেশ্যেই অব্দ গণনার প্রচলন হইয়াছে। যে কোনও ক্রমবর্ধমান অখণ্ডিত অব্দ দ্বারাই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। মানবজাতির সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কালজ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন হইতেই কোনও না কোনও প্রকার

অব্দের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে প্রতাপশালী রাজাদিগের অভিষেককাল হইতে এক প্রকার অব্দ গণনা হইত। এই রাজকীয় অব্দ অধিক কাল প্রচলিত থাকিত না, নূতন রাজার অভিষেকে আবার নূতন অব্দের প্রচলন হইত। স্বল্পকালব্যাপী এই প্রকার অব্দের দ্বারা কালনির্ণয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাজগোষ্ঠীর আদিকাল হইতে অব্দ গণনার প্রথা প্রচলিত হয়। কোনও কোনও স্থলে প্রথম দিকে এই অব্দসংখ্যা একশতের অধিক হইয়া গেলে, শতসংখ্যা বাদ দিয়া গণনা চালাইয়া যাওয়া হইত। পরে এই প্রথাও পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমবর্ধমান অখণ্ড অব্দ গণনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের প্রচলন ছিল। স্থূলতঃ দেখা যায় যে প্রতি পাঁচ বৎসর পর পর রবি ও চন্দ্র আকাশের একই স্থানে মিলিত হইয়া থাকে— ইহা হইতেই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের উৎপত্তি। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে (প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই যুগের ভিত্তিতে পঞ্জিকা গণনার পদ্ধতি বিবৃত আছে। পরবর্তী কালে রচিত মহাভারতে দেখা যায় পাণ্ডবগণের বনবাসের চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইল কিনা গণনা করিবার জন্য এই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের ব্যবহার করা হইয়াছে। ২ শকাব্দকাল (অর্থাৎ ৮০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ গণনা পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল— বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে ইহা জানা যায়। অনুমিত হয় যে পাঁচ বৎসরের এই যুগ গণনা পদ্ধতি আরও প্রাচীন কাল হইতে অর্থাৎ বৈদিক সংহিতাসমূহ রচনার কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল। অদ্যাবধি এই যুগের উল্লেখ পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিগ্রহ দ্বাদশ বৎসরে একবার রাশিচক্র আবর্তন করে, ইহার ভিত্তিতে দ্বাদশবর্ষাত্মক যুগের উৎপত্তি। প্রাচীন কালে এই পঞ্চবর্ষাত্মক ও দ্বাদশবর্ষাত্মক যুগ দ্বারাই অব্দ গণনার কার্য সাধিত হইত। পরে এই দুই যুগের সমন্বয় দ্বারা ষষ্টিবর্ষাত্মক যুগের উৎপত্তি হয়। ষাট বৎসরের এই যুগ গণনা পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের অনেক পূর্বেই প্রবর্তিত হয় এবং এখনও সর্বভারতে ইহা প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে ষষ্টিবর্ষাত্মক এই বার্হস্পত্য বর্ষ দ্বারাই অদ্যাবধি অব্দ গণনার কাজ চলিয়া আসিতেছে। যদিও পঞ্জিকায় অন্যান্য অব্দেরও উল্লেখ থাকে, তথাপি এই বার্হস্পত্য বর্ষই তথায় প্রধানতঃ উল্লিখিত হয়। এই অব্দ গণনায় ৬০টি বৎসরের পৃথক পৃথক নাম আছে এবং প্রতিটি অব্দ এক সৌর বৎসরে বা সৌর-চান্দ্র বৎসরে পূর্ণ হয়। উত্তর ভারতের পদ্ধতি এই বিষয়ে একটু পৃথক, তথায় বৃহস্পতিগ্রহের একটি রাশি ভোগ কাল অর্থাৎ ৩৬১ দিনে এক বার্হস্পত্য বর্ষ পূর্ণ হয়। ফলে বৎসরের যে কোনও দিনে এই বৎসর আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু উত্তর ভারতে ইহাকে অব্দ রূপে ব্যবহার করা হয় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে শতাব্দী গণনার জন্য একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইহাতে এক-এক শতাব্দীকে ভচক্রস্থ ২৭টি নক্ষত্রের নামে অভিহিত করা হইত। কল্পনা করা হয় যে সপ্তর্ষিগণ একশত বৎসর ধরিয়া এক-এক নক্ষত্রে অবস্থান করেন। ইহাকে সপ্তর্ষিচার বা লৌকিক কাল বলা হয়। এই শতাব্দীর অন্তর্গত বৎসরগুলিকে একাদিক্রমে ১০০ পর্যন্ত গণনা করা হইত অথবা পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের ২০টি যুগে বিভক্ত করা হইত। কাশ্মীর ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশে এই প্রকার অব্দ গণনা প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লণ পণ্ডিতের ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থে এই অব্দের এবং তৎসহ পাণ্ডবকালের উল্লেখ আছে। এই সপ্তর্ষিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বিদ্যমান। বৃদ্ধগর্গ ও পুরাণ মতে মঘাকাল (বা মঘা-শতাব্দী) আরম্ভ হইয়াছিল ৩১৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কিন্তু বরাহমিহিরের মতে মঘাকালের আরম্ভ ২৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ভারতের অন্যত্র কিন্তু এই সপ্তর্ষিকাল ব্যবহৃত হইবার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কহ্লণ পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরাব্দেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বৃদ্ধগর্গের রচনানুসারে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভকাল ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বরাহমিহিরও ইহাই বলিয়াছেন।

৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্য-রাত্রিতে অথবা ১৮ ফেব্রুয়ারির সূর্যোদয়কালে কলিযুগের আরম্ভ ধরিয়া ঐ সময় হইতে কল্যব্দ গণনা করা হয়। কল্যব্দ সর্বভারতে প্রচলিত এবং সকল পঞ্জিকাতেই ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এই অব্দের আরম্ভকাল অতি প্রাচীন হইলেও ইহার প্রচলন তত প্রাচীন নহে। ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট প্রথম কল্যব্দের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তাঁহার কালে কলির ৩৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আর্যভট বা তাঁহার অল্পকাল পূর্ববর্তী কোনও জ্যোতির্বিৎ জ্যোতির্গণনার সুবিধার জন্য এই অব্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে জ্ঞাত গ্রহগতির দ্বারা পশ্চাৎ গণনা করিয়া আর্যভট দেখিয়াছিলেন যে, ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাহু ব্যতীত সকল গ্রহের মধ্যাবস্থান মেষাদির অতি সন্নিহিত হয়। তাই তিনি সকল মধ্যস্থানকেই শূন্য কল্পনা করিয়া ঐ দিবসকে কল্যাদি বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু আধুনিক গণনা দ্বারা জানা

যায় যে উক্ত কালে মধ্যগ্রহসকল একত্র ছিল না, প্রায় ৫০ ডিগ্রির মধ্যে ছড়াইয়া ছিল। ৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে কল্যব্দের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়।

উপরে যে সকল অব্দের কথা বলা হইল, তাহার কোনটিই যে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এ দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। সম্রাট্ অশোক তাঁহার শিলালিপিতে এই সকল কোনও অব্দ ব্যবহার না করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঠিক কাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের পক্ষে এক সমস্যাস্বরূপ। উক্ত কাল ২৭৩ হইতে ২৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ধরা হয়।

উত্তর ভারতের বাংলা দেশ ব্যতীত প্রায় সর্বত্র বিক্রমসংবৎ প্রচলিত। ইহার আরম্ভকাল ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কথিত আছে যে, বিক্রমাদিত্য নামে উজ্জয়িনীর এক রাজা কর্তৃক এই অব্দ প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে কোনও রাজার অস্তিত্ব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। বিক্রমসংবৎ নামে এই অব্দের সর্বপ্রথম ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় কাঠিয়াওয়াড় রাজ্যে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে। উহাতে ৭৯৪ বিক্রমাব্দের উল্লেখ আছে। ইহাকে মালবগণাব্দ এবং কৃতাব্দও বলা হইত। রাজস্থানে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে ২৮২ কৃতাব্দের উল্লেখ আছে। বর্তমানে উত্তর ভারতে চৈত্র শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে সংবৎ আরম্ভ হয়। গুজরাটে এই অব্দ উহার কার্তিক শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ হয় এবং কচ্ছে আষাঢ় শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে সংবতের আরম্ভ।

৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাব্দের আরম্ভ। এই অব্দ প্রায় সর্বভারতেই প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে ইহা শালিবাহনাব্দ বা শালিবাহন শক নামে প্রসিদ্ধ। এই অব্দের প্রবর্তক কে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই, যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সম্রাট্ কণিষ্কই ইহার প্রবর্তক। শককাল, শকভূপকাল, শকেন্দ্রকাল এবং শকসংবৎ নামান্তরেও এই অব্দ প্রচলিত। চান্দ্রগণনায় চৈত্র শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে এবং সৌরগণনায় মেষাদি হইতে সাধারণতঃ এই অব্দ গণিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এই শককালের পূর্বে আর একটি শকাব্দ প্রচলিত ছিল। শকরাজগণ কর্তৃক ব্যাক্ট্রিয়া বিজিত হইবার সময় ১২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই প্রাক্তন শকাব্দ প্রবর্তিত হয়। ইহা অনেক ক্ষেত্রে এজেস (Azes) -অব্দ বলিয়াও পরিচিত ছিল। ইহার প্রথম ২০০ বৎসর ধরিয়া অর্থাৎ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ কাল পর্যন্ত শতসংখ্যা অনেক সময় বাদ দিয়া এই অব্দ ব্যবহার করা হইত। তৎপর কণিষ্কের কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শতসংখ্যা বাদ না দিয়াই এই অব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বরাহমিহিরের কাল (মৃত্যু ৫৮৭ খ্রী) হইতে অদ্যাবধি ভারতের সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থে এই শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে ভারত সরকার এই শকাব্দকেই সর্বভারতে ব্যবহার-যোগ্য অব্দ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধাব্দ বা বুদ্ধনির্বাণকাল হিসাবে এক অব্দ প্রচলিত আছে। উহার আরম্ভকাল ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে এই অব্দ সিংহলে প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই অব্দের প্রচলন ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ছিল না। বুদ্ধনির্বাণের প্রকৃত কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ কিন্তু একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধদের মত জৈনদিগের মধ্যেও মহাবীরের নির্বাণ-কাল হইতে এক অব্দ গণনার প্রচলন আছে। উহার আরম্ভকাল ৫২৮ খ্রীষ্টপূর্ব।

গুপ্তরাজবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে এই অব্দ প্রচলিত ছিল। গুপ্তবংশের পতনের পরে কাঠিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত বলভীদেশের রাজগণ এই অব্দ ব্যবহার করিতেন। এইজন্য ইহা গুপ্তবলভীসংবৎ নামেও পরিচিত। পরবর্তী কালে গুজরাট ও রাজপুতানায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোথাও কোথাও এই অব্দের প্রচলন দেখা যায়।

২৪৮-৪৯ খ্রী হইতে একটি অব্দের প্রচলন হয়। ইহা কলচুরি বা চেদি অব্দ নামে অভিহিত। ইহা মধ্য প্রদেশে প্রচলিত ছিল।

অনেকে মনে করেন যে হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি অব্দ প্রচলিত হয়। ইহা হর্ষাব্দ নামে পরিচিত। ভাটিক নামে একটি অব্দ কয়েকটি শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে। ৬২৪ খ্রী হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হয়। উড়িষ্যায় গাঙ্গেয় সংবৎ প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ একটি অব্দ ব্যবহার করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্লের রাজ্যকাল—৬৯৪ খ্রী হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হয়।

মিথিলায় লক্ষ্মণসংবৎ নামে এক অব্দ প্রচলিত আছে। ইহা যে বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের স্মৃতি বহন করিতেছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অব্দ রাজা লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনে আরোহণকালে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। কারণ এই সংবতের প্রথম বৎসর বিভিন্ন মতানুসারে ১১০৮ হইতে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন ইহার ৬০।৭০ বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ রাজা বিজয়সেন যখন মিথিলা জয় করেন তখন পৌত্র লক্ষ্মণসেনের জন্মসংবাদ পাইয়া এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য এই অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। মিথিলার বাহিরে এই অব্দের বিশেষ প্রচলন ছিল না। কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপিতে লক্ষ্মণসেনের অতীতরাজ্যসংবতের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার তারিখ (আনুমানিক ১২০০ খ্রী) হইতে ইহার গণনা আরম্ভ। বঙ্গদেশে বলালি সন ও পরগনাতি সন নামে দুইটি অব্দ প্রচলিত ছিল; ইহাদেরও আরম্ভ আনুমানিক ১২০০ খ্রী হইতে।

৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই শুক্রবার হইতে হিজরা অব্দ গণিত হয়। ঐ বৎসর মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় গমন করেন এবং সেই স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য এই অব্দ প্রচলিত হয়। ১২টি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে ইহার বৎসর পূর্ণ হয়। খলিফা উমর ৬৩৮-৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই অব্দের প্রচলন করেন। অনেকে মনে করেন যে হিজরা প্রথমে সৌর-চান্দ্রিক হিসাবে গণনা করা হইত, কিন্তু মলমাস নির্ণয়ে ঐকমত্যের অভাবে ১০ হিজরার পর হইতে (অর্থাৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে) সম্পূর্ণ চান্দ্র হিসাবে এই অব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। এই মত ধরিলে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ শুক্রবার বাসন্ত ক্রান্তিপাত দিবসের পরদিন হইতে এই অব্দের আরম্ভ।

দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেন রাজবংশ বঙ্গ দেশে শকাব্দ প্রচলিত করেন। পরে মুসলমানদের আগমনের পর এ দেশে রাজকার্যে হিজরা অব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে, যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায় শকাব্দই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু হিজরা অব্দ ৩৫৪ দিনে পূর্ণ হয় বলিয়া উহার বর্ষারম্ভ বৎসরের যে কোনও সময়েই হইতে পারে। পরন্তু ৩২$\frac{1}{2}$ বৎসর পর পর হিজরা সনে এক বৎসর করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রাজকার্যের অসুবিধা হয়। এইজন্য সম্রাট্ আকবরের সময়ে হিজরাকেই ৩৬৫ দিনে গণনা করিবার ব্যবস্থা হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের হিজরাসংখ্যা ৯৬৩-র সহিত তৎপরবর্তী সৌরবৎসরসংখ্যা যোগ করিলে বর্তমান কালের বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের ফসলী এবং উড়িষ্যার বিলায়তী ও আমলীরও ঐ একই রূপ উৎপত্তি, কেবলমাত্র বর্ষারম্ভকালের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এই সকল অব্দের আরম্ভকাল বঙ্গাব্দের প্রায় ৭ মাস পূর্বে। বিলায়তী কন্যাদি হইতে, আমলী ভাদ্র শুক্লদ্বাদশী হইতে এবং ফসলী অব্দ ভাদ্র কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতীয় ফসলীর বর্ষসংখ্যা বঙ্গাব্দ হইতে ৩ সংখ্যা অধিক এবং আরম্ভকাল আষাঢ়।

চট্টগ্রামে প্রচলিত মগী অব্দ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। নেপালে প্রচলিত নেওয়ার অব্দের আরম্ভকাল ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কার্তিক শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে গণিত হয়। কেরলে প্রচলিত কোল্লাম্ অব্দের আরম্ভকাল ৮২৪ খ্রী। ইহা দক্ষিণ মালাবারে সিংহাদি হইতে এবং উত্তর মালাবারে কন্যাদি হইতে গণিত হয়। কোল্লাম অব্দকে পরশুরামের অব্দও বলা হয়। আদিতে পরশুরামের অব্দসংখ্যা হাজারের অধিক হইলে হাজার বাদ দিয়া গণনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বহির্ভারতীয় অব্দের মধ্যে খ্রীষ্টাব্দই প্রধান। ইহা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত। ডাইওনিসিয়াস এক্সিজাস কর্তৃক ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। ইহার আদি গণনা করা হইয়াছিল তৎকালে জ্ঞাত যীশুখ্রীষ্টের জন্মকাল হইতে। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় জানা যায়, যে বৎসর হইতে খ্রীষ্টাব্দ গণনা করা হয়, যীশু সম্ভবতঃ তাহার ৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ দেশে যেমন কল্পিত গ্রহযুতির ভিত্তিতে কল্যব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য দেশেও সেইরূপ ৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি হইতে প্রায় ঐরূপ ভিত্তিতেই এক কাল গণনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। তৎকালে ব্যাবিলনে নাবু নাজির নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে ইহাকে নবোনাসার অব্দ বলা হয়। কিন্তু এই অব্দ কল্যব্দের ন্যায় মাত্র জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। গ্রীক ওলিম্পিয়াড আরম্ভ হয় ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং রোম নগরীর পত্তন হয় ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই দুইটি তারিখও অব্দ গণনায় ব্যবহৃত হইত। সেলুকাসের রাজত্বকাল হইতে এক অব্দ গণনা প্রচলিত হয়। তাহার আরম্ভকাল ৩১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ইহুদীদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টিকাল ৩৭৬১ খ্রীষ্টপূর্ব ৭ অক্টোবর। তদনুযায়ী তাহাদের এক অব্দ প্রচলিত আছে। এক ফরাসী পণ্ডিত যোসেফ স্কালিগার একই অব্দ দ্বারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার সুবিধার জন্য ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক কাল গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার পিতার নামে উহাকে জুলিয়ান অব্দ নামে অভিহিত করেন। ইহার আরম্ভকাল ৪৭১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১ জানুয়ারি। জাপানে প্রচলিত জাপানী

অব্দের আরম্ভকাল ৬৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ব্রহ্মদেশে প্রচলিত অব্দের আরম্ভকাল ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক অব্দ ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেইগুলি তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই বলিয়া উল্লিখিত হইল না।

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

অভঙ্গ মারাঠী সন্ত কবিদের ভক্তিগীতির নাম অভঙ্গ। ১৩শ হইতে ১৮শ শতক ব্যাপী যে ধর্মীয় অভ্যুত্থান (ভাগবত ধর্ম) মহারাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল, ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে চিহ্নিত। অভঙ্গগুলিই সে সময়ে ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতপুরাণের দর্শন সাধারণ্যে পৌছাইয়া দিবার বাহন হইয়া উঠিয়াছিল।

অভঙ্গের ছন্দোরূপটি প্রকৃতপক্ষে ওবি নামক আরও পুরাতন জনপ্রিয় এক ছন্দ হইতে উদ্ভূত। অভঙ্গ ছন্দের অল্প কয়েকটি বিধি আছে। সর্বাধিক প্রচলিত রূপটিতে দেখি, ছয় অক্ষরের তিনটি চরণ ও চার অক্ষরের হ্রস্বতর চতুর্থ চরণ। এই রূপটিতে, দ্বিতীয় তৃতীয় চরণ মিত্রাক্ষর হয়। দৈর্ঘ্য বিষয়ে অভঙ্গের কোনও নির্দিষ্ট সীমা নাই। বাঁধাধরা ছন্দোরূপের হাত হইতে অব্যাহতি এবং গীতিস্পন্দকে আত্মস্থ করিয়া লইবার বিশেষ প্রবণতার ফলেই সম্ভবতঃ ইহার ব্যাপক ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা ঘটিতে পারিয়াছে।

আদি মারাঠী কবি ছিলেন মুকুন্দরাজ (১২শ শতক)। তাঁহার কয়েকটি অভঙ্গও আমরা পাইতেছি। অতএব বুঝা যায়, মারাঠী কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই অভঙ্গগুলির সূত্রপাত। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ এবং রামদাসও অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের প্রসিদ্ধতর রচনাবলী ওবি ছন্দেই লিখিত। নামদেবই প্রথম রচনাপ্রাচুর্যের দ্বারা অভঙ্গকে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁহার অভঙ্গ শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীগুরুগ্রন্থসাহেবে অন্তর্ভুক্ত হইবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করিয়াছে।

নামদেবের পর ক্রমশঃ এক বিরাট সন্তগোষ্ঠী দেখা দিল। জীবনের নানা নিম্ন স্তর হইতে ইঁহারা আগত; কুম্ভকার, কর্মকার, ক্ষৌরকার, মালী, তেলী, পরিচারিকা, অচ্ছুৎ— এমন কি মুসলমান কশাই এবং তন্তুবায়। ইঁহাদের রচিত অভঙ্গ যেন ভক্তির জগতে এক গণতন্ত্র আনিয়া দিল। ইঁহাদের কবিতার প্রধান গৌরব স্বতঃস্ফূর্তি আর প্রগাঢ় নিষ্ঠা। এইগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ করিবার জন্য ইঁহারা আপন আপন বৃত্তিজগৎ হইতে গৃহীত শব্দাবলীর সুন্দর ব্যবহার করিয়াছেন।

অভঙ্গলেখকদের চূড়ামণি ছিলেন তুকারাম (১৭শ শতক)। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাঁহার রচনার সংখ্যা যাহাই হউক, তাঁহার প্রায় ৪৫০০ অভঙ্গ এখন পাওয়া যাইতেছে। এইগুলির ভিত্তি রচনা করিয়াছিল তাঁহার প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি এবং মানব-প্রকৃতি ও সমকালীন সমাজপরিবেশ বিষয়ে তাঁহার গভীর উপলব্ধি। এমন কি খ্রীষ্টীয় প্রচারকেরাও এইগুলির প্রগাঢ় গীতলতা, প্রবল অভিব্যক্তি, গ্রামীণ বাগ্‌বিধি এবং চতুর রসবোধের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। স্যর আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বলিয়াছিলেন, যাহাদের মুখে মুখে তুকারামের গান ফেরে তাহাদের তো বুঝানো অসম্ভব যে নৈতিক মহিমায় হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম বড়। পরবর্তী ইতিহাসে অভঙ্গরচনার ক্ষেত্রে তুকারামের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে (অভঙ্গবাণী প্রসিদ্ধ তুক্যাচী)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবরত্নমালা'য় (১৯০৭ খ্রী) তুকারামের কিছু কবিতার বঙ্গানুবাদ পাইতেছি।

এই সন্তদের অনেক অভঙ্গই এখন প্রবাদ হিসাবে চলিয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের জনজীবনে এইগুলিই হইল স্তোত্র, এইগুলিই শাস্ত্র। ইহা ভিন্ন প্রার্থনাসমাজ জাতীয় সংস্কারক সম্প্রদায়ের কাছেও এইগুলিই ছিল বিশ্বাসের ভাণ্ডার। আধুনিক মারাঠী কবিগণও অভঙ্গের ছন্দোরূপটিকে অল্পস্বল্প ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবরত্নমালা, কলিকাতা, ১৯০৭; যোগীন্দ্রনাথ বসু, তুকারাম চরিত, কলিকাতা, ১৯০১; Nicol Macnicol, *Psalms of Maratha Saints*, Calcutta, 1919; John S. Hoyland, *Village Songs of Western India*, London, 1934; J. Nelson Fraser & J. F. Edwards, *The Life and Teachings of Tukaram*, Madras, 1922; Mahadevasastri Joshi, *Bharatiya Sanskriti Kosh*, Poona, 1962; S. V. Kelkar, *Maharashtriya Jnanakosha*, Poona, 1924.

ওয়াই. এম. মুলে

অভয়দেবসূরি একজন প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার। তিনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। মূলতঃ টীকাকার হইলেও তিনি 'জয়তিহুয়ণ'-স্তোত্র নামে প্রাকৃতভাষায় একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি একবার বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন এই গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং ইহার ফলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। কেবল তাহাই নহে বহুকাল যাবৎ

ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত একটি পার্শ্বনাথের মূর্তিও তিনি উদ্ধার করেন এই রচনার মহিমায়। অভয়দেবস্থরির বহু শিষ্য ছিল। তাহার মধ্যে ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'জীব-সমাস' নামক গ্রন্থের লেখক মলধারী হেমচন্দ্র প্রধানও প্রসিদ্ধ। অভয়দেবস্থরি প্রধানতঃ জৈন আগমশাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'অঙ্গ' গ্রন্থের টীকার মধ্যে স্থানাঙ্গ, ভগবতীব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, জ্ঞাতৃধর্ম কথা, উপাসকদশাস্থত্র, অন্তকৃদ্-দশাস্থত্র এবং প্রশ্ন ব্যাকরণের টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া 'সম্মতিতর্কপ্রকরণ'-এর টীকাও তিনি লিখিয়াছিলেন। হরিভদ্রের 'অষ্টক প্রকরণ' গ্রন্থের 'অষ্টকবৃত্তি' নামে একখানি টীকাও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দেবগুপ্ত নামে পরিচিত জিনচন্দ্রগণীনের ১৪টি প্রাকৃত গাথায় লিখিত 'নবতত্ত্ব-প্রকরণ' নামে একটি জৈন নবপদার্থের পুস্তক আছে। অভয়দেব ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উপরি-উক্ত ১৪টি শ্লোকের উপরও একটি টীকা লিখিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত সকল টীকাই মুদ্রিত হইয়াছে।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিকর্ষ পৃথিবীর একটি অদৃশ্য শক্তি চতুর্দিকের যাবতীয় পদার্থকেই তাহার কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। বোঁটা খসিয়া গেলে এইজন্যই গাছের ফল উপরের দিকে না উঠিয়া মাটিতে পড়ে। উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়িলে কিছুদূর গিয়াই আবার মাটিতে ফিরিয়া আসে। উঁচু জায়গা হইতে পড়িয়া গেলে আমরা মাটিতেই পড়ি, উপরে উঠিয়া যাই না। পৃথিবীর এই যে শক্তি, যাহা অদৃশ্য থাকিয়াও সব সময় আমাদের নীচের দিকে টানিতেছে, তাহাকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলা হয়। নিউটন প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে (মহাবিশ্বের এই আকর্ষণকে বলা হয় মহাকর্ষ, আর চতুর্দিকের বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে বলা হয় অভিকর্ষ)। দুইটি বস্তুর পরিমাণ অর্থাৎ ভর এবং তাহাদের পারস্পরিক দূরত্বের উপর এই আকর্ষণশক্তির তারতম্য নির্ভর করে। বস্তু দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আকর্ষণশক্তির জোর বৃদ্ধি পাইবে। আবার উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে আকর্ষণের শক্তি হ্রাস পাইবে। যে পদার্থের বস্তু-পরিমাণ যত বেশি, পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে তাহাকে তত বেশি জোরে আকর্ষণ করে। কাজেই আমাদের কাছে কোনও জিনিস ভারি এবং কোনও জিনিস হালকা বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর অভিকর্ষ না থাকিলে কোনও জিনিসের ওজন অনুভূত হইত না। আবার কোনও বস্তুকে যদি পৃথিবী হইতে অনেক উঁচুতে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে সেখানে সেই বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্রা অনেকটা হ্রাস পাইবে। কেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব প্রায় ৬৪৪০ কিলোমিটার (৪০০০ মাইল)। ভূপৃষ্ঠ হইতে যদি কোনও বস্তুকে আরও ৬৪৪০ কিলোমিটার উপরে তোলা যায়, তবে সেখানে তাহার ওজন ভূপৃষ্ঠের ওজনের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ পৃথিবীর উপর যদি আমাদের দেহের ওজন হয় প্রায় ৫৬ কিলোগ্রাম (দেড় মণ), তবে ৬৪৪০ কিলোমিটার উপরে আমাদের ওজন হইবে মাত্র ১৪ কিলোগ্রাম (১৫ সের)। ১৪৪৯০ কিলোমিটার (৯০০০ মাইল) উপরে উঠিলে সেখানে ওজন হইবে এখানকার প্রায় দশ ভাগের একভাগ। এই ভাবে ক্রমশঃ আরও অনেক উঁচুতে উঠিতে পারিলে এক-সময়ে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির প্রভাব অনুভূত হইবে না।

হালকাই হউক, কি ভারিই হউক— এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেকটি জিনিসকেই সমানভাবে মাটির দিকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। একটা হালকা জিনিস ও একটা ভারি জিনিসকে উপর হইতে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে যদি বাতাস বা অন্য কিছুর বাধা না পায়, তবে একই সঙ্গে মাটিতে পড়িবে। কোনও কিছুর উপরেই এই আকর্ষণশক্তির পক্ষপাতিত্ব নাই।

পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে যেমন পদার্থের ওজন অনুভূত হয়, তেমনই আবার উচ্চস্থান হইতে পতনের সময় তাহার গতিবেগও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই গতিবেগ বৃদ্ধির হার সব কিছুর পক্ষে একই রকম। উঁচু জায়গা হইতে একটা বল ছাড়িয়া দিলে এক সেকেণ্ড পরে তাহার গতিবেগ হইবে সেকেণ্ডে ৯৬০ সেন্টিমিটার (৩২ ফুট), দুই সেকেণ্ড পরে তাহার গতিবেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৯২০ সেন্টিমিটার (৬৪ ফুট), তিন সেকেণ্ড পরে এই গতিবেগ দাঁড়াইবে সেকেণ্ডে ২৮৮০ সেন্টিমিটার (৯৬ ফুট)। অভিকর্ষের টানে প্রতি সেকেণ্ডে ৯৬০ সেন্টিমিটার করিয়া গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে। নীচের দিকে নামিবার সময় পদার্থের গতিবেগ যেমন ভাবে বৃদ্ধি পায়, তেমনই আবার উপরের দিকে যত বেশি জোরে উঠিবার চেষ্টা করা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণও তত বেশি অনুভূত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অভিচার ষট্‌কর্ম দ্র

অভিধর্মকোশ বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক বসুবন্ধু এই অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। ৬০০ কারিকায় রচিত

অভিধম্মকোশে বসুবন্ধু অভিধর্মের প্রায় সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। প্রধানতঃ সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধগণের জন্য রচিত হইলেও অভিধম্মকোশের দার্শনিক উৎকর্ষের জন্য ইহা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণেরই একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থের একটি ভাষ্যও লিখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ এতদূর সমাদৃত ছিল যে মহামতি বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে একটি আশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আশ্রমের শুকপক্ষীগণ অভিধম্মকোশ আবৃত্তি করিতেছিল।

এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পুঁথি এখনও পাওয়া যায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিতপ্রবর যশোমিত্র রচিত এই গ্রন্থের টীকা 'স্ফুটার্থাভিধম্মকোশব্যাখ্যা' পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা অভিধম্মকোশের পুনরুদ্ধারে সাহায্য করিয়াছে। ৮টি খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থে আচার্য বসুবন্ধু অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে ধাতু, ইন্দ্রিয়, কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আত্মা (soul) সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতবাদের একটি অতি মূল্যবান আলোচনা রহিয়াছে। পরমার্থ ও হিউএন্-ৎসাঙ্-কৃত এই গ্রন্থের দুইটি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিধম্মপিটক পিটক দ্র

অভিধম্মাবতার উরগপুরবাসী বুদ্ধদত্তকৃত অভিধম্ম গ্রন্থ। চোড় দেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহা অভিধম্ম শিক্ষার ভূমিকাবিশেষ। বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্গের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বুদ্ধঘোষের রচনার কোনও কোনও অংশের ন্যায় বুদ্ধদত্তের আলোচনা জটিল বা অস্পষ্ট নহে। তাঁহার ভাষা সুস্পষ্ট এবং শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থের অধিকাংশই পদ্যে নিবদ্ধ, শুধু স্থানে স্থানে গদ্যাকারে গ্রন্থকারের স্বীয় ব্যাখ্যান আছে। গ্রন্থের দুইটি টীকা পাওয়া যায়— ১. মহাবিহারবাসী বাচিস্সর মহাসামিকৃত এবং ২. সারিপুত্তশিষ্য সুমঙ্গলকৃত।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

অভিধান কোষ দ্রা

অভিনবগুপ্ত কাশ্মীরীয় আচার্য অভিনবগুপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ। পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০-৯৬০ অব্দের মধ্যে। অভিনবগুপ্ত নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থমধ্যে তিনি আপনার বংশ-পরিচয়, বিদ্যালাভের বিবরণ, বিভিন্ন গ্রন্থরচনার ইতিহাস প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা তাঁহার জীবনেতিহাস সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারি, অতি সংক্ষেপে তাহাই উল্লিখিত হইল। তাঁহার পূর্বপুরুষ মহাপণ্ডিত অত্রিগুপ্ত ছিলেন কান্যকুব্জের অধিবাসী। তিনি কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্তৃক আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭৪০ অব্দে কাশ্মীর দেশে নীত হন এবং সেই দেশেই বিতস্তা তীরবর্তী প্রবরপুর নামক নগরীতে রাজপ্রদত্ত ভূমিতে নিবাস কল্পনা করেন। তাঁহারই বংশে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বরাহগুপ্তের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন অভিনবগুপ্তের পিতামহ। তাঁহার ঔরসে অভিনবগুপ্তের পিতা নরসিংহগুপ্ত (অপর নাম চুখখুলক) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অভিনবগুপ্তের জননীর নাম ছিল বিমলা বা বিমলকলা। অতি বাল্যকালেই তাঁহার জননী লোকান্তরিতা হন। তখন পিতাই তাঁহাকে লালন-পালন করেন। পিতার নিকট তিনি অতিগহন শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণে নিরতিশয় প্রাধান্য লাভ করেন—'পিত্রা স শব্দগহনেকৃতসম্প্রবেশঃ।' ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। যেমন ভূতিরাজের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা, লক্ষ্মণগুপ্তের নিকট কাশ্মীরের ক্রম ও ত্রিক বা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন, ভট্টেন্দুরাজের নিকট গীতা, সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র, ভট্টতোত বা ভট্টতৌতের নিকট নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র-বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তাঁহার বিদ্যার্জনস্পৃহার যেন সীমা ছিল না। তর্ক, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণবদর্শনও তিনি বিভিন্ন গুরুর সেবার দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এমনই ছিল তাঁহার শাস্ত্রকৌতূহল।

ইহার জন্য তাঁহাকে কাশ্মীর দেশ ত্যাগ করতঃ দেশান্তরেও ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তিনি অনন্যসাধারণ শিবভক্ত ছিলেন; নিরন্তর সাধনার দ্বারা তিনি শিবস্বভাব বা মহেশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পাঁচটি শাস্ত্রোক্ত চিহ্নের দ্বারা সাধকের হৃদয়ে রুদ্রশক্তি সমাবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়— যেমন, সুনিশ্চলা রুদ্রভক্তি, মন্ত্রসিদ্ধি, সর্বতত্ত্ববশিত্ব, প্রারব্ধকার্যনিষ্পত্তি এবং কবিত্ব ও সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তৃত্ব— সেই সকলই অভিনবগুপ্তপাদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইত। জয়রথ অভিনব গুপ্তাচার্য-রচিত 'তন্ত্রালোক' গ্রন্থের টীকায় বলিয়াছেন—

> "সমস্তং চেদং চিহ্নজাতম্ অস্মিন্নেব গ্রন্থকারে
> প্রাদুরভূদিতি প্রসিদ্ধিঃ। যদ্‌গুরবঃ—

"অকস্মাৎ সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞত্বাত্বং লক্ষ্মপঞ্চকম্।
ষষ্মিঞ্ছ্রীপূর্বশাস্ত্রোক্তমদৃশ্যত জনৈঃ স্ফুটম্॥"

অভিনবগুপ্ত আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। সংসারপাশে আপনাকে বদ্ধ হইতে দেন নাই— 'দারা-সুত-প্রভৃতি-বন্ধকথামনাপ্তঃ।' কাশ্মীরীয়গণের নিকট তিনি সাক্ষাৎ ভৈরবাবতাররূপে পরিচিত। কথিত আছে, পরিণতবয়সে তিনি দ্বাদশশত শিষ্যসমভিব্যাহারে শ্রীনগর সমীপস্থ ভৈরবগুহায় প্রবেশ করতঃ স্বেচ্ছায় দেহ বিসর্জন দিয়া মুক্তিলাভ করেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত শৈব আগমশাস্ত্র, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন এবং অলংকার ও নাট্যশাস্ত্রের উপর অগণিত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'বোধ-পঞ্চদশিকা', 'মালিনীবিজয়বার্তিক', 'পরাত্রিংশিকা-বিবরণ', 'তন্ত্রালোক', 'তন্ত্রসার', 'ধ্বন্যালোক-লোচন', 'অভিনবভারতী', 'ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ', 'পরমার্থ-সার' এবং 'প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী' নামক নিবন্ধরাজি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া 'ক্রমস্তোত্র', 'ভৈরবস্তব' প্রভৃতি দার্শনিক স্তোত্রও তাঁহারই রচিত। দার্শনিক ও সাধক অভিনবগুপ্তপাদের পরিচয় বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। আমরা শুধু সাহিত্যমীমাংসক অভিনবগুপ্তের মতবাদ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন'-ব্যাখ্যার অবতরণিকা-শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ভট্টেন্দুরাজচরণাব্জকৃতাধিবাস-
হৃদ্যশ্রুতোঽভিনবগুপ্তপদাভিধোঽহম্।
যৎকিঞ্চিদপ্যনুরণন্ স্ফুটয়ামি কাব্যা-
লোকং স্বলোচননিযোজনয়া জনস্য॥"

সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তিনি 'ধ্বন্যালোক' (বা 'কাব্যালোক') গ্রন্থখানি ভট্টেন্দুরাজের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার টীকা 'কাব্যালোক-লোচন', 'সহৃদয়ালোক-লোচন' বা 'ধ্বন্যালোক-লোচন' রূপে পরিচিত। 'লোচন'-ব্যাখ্যার পূর্বেও ধ্বন্যালোকের উপর আর একখানি টীকা ছিল; তাহার নাম 'চন্দ্রিকা'। অভিনবগুপ্ত তাঁহার একটি শ্লোকে উক্ত টীকার উপর সশ্লেষ কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽয়ং লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥"

'চন্দ্রিকা'কার যে তাঁহারই এক পূর্ব-সগোত্র ছিলেন তাহাও অভিনবগুপ্ত স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন। 'লোচন'-টীকার বহুস্থলে 'চন্দ্রিকা'কারের ব্যাখ্যা আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রাচীন টীকাখানি মহিমভট্টের সময় হইতেই লুপ্ত।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-টীকাখানি না থাকিলে 'ধ্বন্যালোক'গ্রন্থের পঠন-পাঠন ও উহার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। 'লোচন' গ্রন্থে অভিনবগুপ্ত আচার্য ভট্টনায়করচিত অধুনালুপ্ত 'হৃদয়দর্পণ' নামক ধ্বনিধ্বংসগ্রন্থ হইতে বহু উক্তি উদ্ধারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম সাহিত্য-গুরু ভট্টতোত (বা তৌত) -প্রণীত 'কাব্য-কৌতুক' নামক লুপ্ত অলংকারনিবন্ধ হইতেও বহু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত 'কাব্য-কৌতুক' গ্রন্থের উপর যে 'বিবরণ' নামক একখানি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন তাহাও 'লোচন'-ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই মূল্যবান টীকাটিও আজ লুপ্ত। 'লোচন'-টীকায় অভিনবগুপ্ত আপনার অপূর্ব দার্শনিক মনীষা ও সাহিত্যবোধের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি ও গভীরতা সত্যই বিস্ময়কর।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের উপর অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী' নামক সুবৃহৎ ব্যাখ্যাও তাঁহার অপূর্ব মনীষার নিদর্শন। ইহা 'নাট্যবেদ-বিবৃতি' নামেও পরিচিত। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ কবি কর্তৃক সম্পাদিত এই গ্রন্থটি গাইকোয়াড় সংস্কৃত গ্রন্থমালায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই পর্যন্ত তিনটি খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তের এই ব্যাখ্যা হইতেই প্রাচীন ভারতে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা কিরূপ ব্যাপক ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সুবিশাল গ্রন্থের নানা স্থলে উদ্ভট, লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, বার্তিককৃৎ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতমুনির— 'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'— এই সুবিখ্যাত রসসূত্রের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যান প্রচলিত আছে, সেই সকলই অভিনব-গুপ্তের 'ভরত'-টীকা হইতেই আহৃত। 'নাট্যশাস্ত্রে'র সম্পাদন ও ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বহু আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করতঃ মূল গ্রন্থের প্রকৃত পাঠোদ্ধার ও অর্থনিরূপণে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি উপাধ্যায় ভট্টতৌতের নিকট হইতে যে বহুমূল্য উপদেশ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অভিনবগুপ্ত স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। 'পঠিতোদ্দেশক্রমস্তু অস্মদুপাধ্যায়-পরম্পরাগতঃ'— ইত্যাদি উক্তি তাহার সাক্ষ্য। ভারতীয় নাট্যের তত্ত্ব (theory) ও প্রয়োগ (practice)— উভয়ের আলোচনার পক্ষেই 'অভিনব-ভারতী'র গুরুত্ব অসামান্য।

সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে অভিনবগুপ্তের মতবাদ বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা এই স্থলে সম্ভব নহে। তিনি ধ্বনিকার

আনন্দবর্ধনের পরেই ধ্বনিপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রবক্তা— সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এমন কি, যদিও আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে ভরতমুনির রসপ্রস্থানের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে রসধ্বনির সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য খ্যাপন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব করেন নাই, তথাপি রসতত্ত্বকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বকালের জন্য উহাকে সাহিত্যবিচারের কেন্দ্রীয় তত্ত্বরূপে প্রচার করার গৌরব অভিনবগুপ্তেরই। তাহা ছাড়া কবিকর্মে শান্তরসের প্রাধান্য এবং সর্বপ্রকার রসের শান্তরস হইতেই উদ্ভব ও শান্তপ্রায় আস্বাদ প্রতিপাদনও অভিনবগুপ্তের অন্যতম মহৎ কৃতিত্ব। সেইজন্য মম্মটকৃত 'কাব্যপ্রকাশ'-এর টীকাকার মাণিক্যচন্দ্র অভিনবগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন – 'সর্বস্বং হি রসস্যাত্র গুপ্তপাদা বিজানতে'। রসতত্ত্ববিষয়ে অভিনবগুপ্তের মতবাদ 'অভিব্যক্তিবাদ'-রূপে পরিচিত।

দ্র P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, Bombay, 1951 ; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1960 ; K. C. Pandey, *Abhinavagupta : An Historical and Philosophical Study*, Chowkhamba Sanskrit Series, Benares, 1935 ; Raniero Gnoli, *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta*, Roma, 1956.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অভিনয় একটি শিল্পকলা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু নাট্যকারের সৃষ্ট গল্পের গতি, চমক ও উত্তেজনার সাহায্য লইয়া কেবলমাত্র একটি চরিত্রের সংলাপ আবৃত্তি করার মধ্যে বিশিষ্ট কলাসৃষ্টির মর্যাদা কোথায়? প্রত্যেক শিল্পকলারই একটি নিজস্ব ও স্বাধীন প্রকাশভঙ্গী থাকে যাহার দ্বারা উহা এমন কিছু আবেগ সৃষ্টি করিতে পারে যাহা অন্য কোনও শিল্পপন্থায় সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গানে যখন একটি বিশেষ পর্দার পর আরও একটি বা একাধিক বিশেষ পর্দা লাগানো হয়, তখন তাহা শ্রোতাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা অন্য কোনপ্রকারে অনুভবে সঞ্চারিত করা সম্ভব নহে। চিত্রেও সেইরূপ। বিশেষ একটি রঙে বা বিশেষ একটি রেখায় ইহা যে আবেদন দর্শকদের মনে জাগাইয়া থাকে তাহা অন্য কোনপ্রকারে সম্ভব নহে। সেইরূপ অভিনয়েও বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ও অভিনেতার সত্তার অভিক্ষেপণ দ্বারা এমন কিছু আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়া উঠে যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, আঁকিয়া প্রকাশ করা যায় না, বা গাহিয়া প্রকাশ করা যায় না।

তাই বলিয়া সাহিত্যিক-প্রদত্ত সংলাপকে বাদ দিয়া কেবল মূকাভিনয়কেই একমাত্র বিশুদ্ধ অভিনয়ধারা বলা হয় না। অভিনয়শিল্পের অতি শৈশব হইতেই ভাষাকেও ইহার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে একটি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'— এই কথা কয়টি 'প্রফুল্ল' নাটকে হাজারবার পড়িয়াও ইহার উচ্চারণের মাধ্যমে অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ গভীর ব্যথার যে বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বা 'সীতা' নাটকে শিশিরকুমার যেভাবে 'শত্রু! শত্রু!'— বলিয়া লবের গণ্ডে মৃদু-মৃদু আঘাত করিয়া এক জটিল আবেগ সৃষ্টি করিতেন, তাহাও তেমনই না দেখিয়া আন্দাজ করা সম্ভব নহে। এইগুলি ভাষাকে ছাড়াইয়া ভাষার ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ স্মর্তব্য।

অতি পূর্বে, নাট্যকলার যখন কৈশোর, তখন অভিনেতারা অভিনয়ের ক্ষণেই মুখে মুখে সংলাপ তৈয়ারি করিয়া বলিতেন; ইহা ইওরোপে *Commedia dell' Arte*-র বিশিষ্ট রূপে প্রকর্ষ লাভ করিয়াছিল। শ্রীমনোমোহন ঘোষের অনুমান, ভারতেও নাট্যপ্রচেষ্টার প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এবং সেই কারণেই তিনি বলেন যে, গ্রীক পদ্ধতি যখন শ্রবণের উপর বেশি মূল্য দিয়াছে, ভারত তখন দর্শনের উপর। সেইজন্যই বহুদিন হইতে ভারতে নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য।

কেবলমাত্র আবৃত্তিনির্ভর না হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষে ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত অনেক প্রকার আঙ্গিকমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। বহুযুগ পূর্বেই নাট্যশাস্ত্রে সেইগুলি বিধিবদ্ধ অবস্থায় উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও সেই সকল মুদ্রার অনেকগুলিই আজ ভারতীয় অভিনয়ে অপ্রচলিত, তথাপি প্রাচীন মুদ্রার মত কয়েকটি ভঙ্গী এখনও পর্যন্ত সাধারণভাবে এ দেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কাহাকেও নিরস্ত করিতে আমরা দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া যে ভঙ্গী করি তাহা বোধ হয় ভারতের সকল নাট্যমঞ্চে স্বাভাবিক বোধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োগকালে কাহারও মনে হয়ত স্বপ্নেও উদিত হয় না যে, এটিও শাস্ত্রোল্লিখিত একটি মুদ্রা; ইহার নাম পতাকা মুদ্রা এবং আজিও ভারতনাট্যম নৃত্যে ইহা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ কিছু কিছু মুদ্রা চলিত থাকিয়া গেলেও বহু মুদ্রাই কিন্তু আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ফলে আজ

অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহাদের স্থলে এখন অনেক নূতন মুদ্রা বা করণেরও উদ্ভব হইয়াছে। যেমন টাকা বুঝাইতে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চাপ দিয়া বাজাইবার ভঙ্গী করা বা চিন্তামগ্নতা বুঝাইতে হস্তের উপর মস্তক ন্যস্ত করা। এইভাবে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনোভাব প্রকাশের যে অজস্র উপায় আছে তাহা আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্যে গণ্য হয়।

অভিনয়ের বাচিক অংশ সম্পর্কেও মানুষ বহুযুগ ধরিয়া আলোচনা করিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণপদ্ধতি খুবই সরল করিয়া বুঝানো আছে। এবং তাহার পরে বিভিন্ন ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন রসের প্রকাশে কণ্ঠ কেমন ভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহারও বিবরণ দেওয়া আছে। ইওরোপেও অ্যারিস্টটল হইতে বাচিক অভিনয়ের আলোচনা চলিয়াছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও অতীত আচার্যগণ নূতন অভিনেতাদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাল করিয়া অনুশীলন করাইতেন, যাহাতে তাহাদের উচ্চারণে স্পষ্টতা আসে, ছন্দোবোধ জন্মায় ও স্বরপ্রক্ষেপণের ক্ষমতা আয়ত্ত হয়।

কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রাথমিক। কণ্ঠস্বরের যে ক্ষমতায় শিল্পী দুরূহ আবেগময় দৃশ্যের অভিনয়ে মোহ-বিস্তার করিয়া থাকেন তাহা সংগীতশিল্পীর শিল্পকর্মের মতই। ইহাতে নিজস্ব স্বরগ্রাম জানিতে হয় এবং প্রত্যেক সুর সম্পর্কে আপন কণ্ঠস্বরের আচরণও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা প্রয়োজন। যন্ত্রের নিজস্ব আচরণ জানা না থাকিলে যন্ত্রী যেমন তাহাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারে না, সেইরূপ আপন কণ্ঠস্বরের আচরণও অভিনেতার পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আঙ্গিক ও বাচিক— অভিনয়ের এই দুই অংশেই শিল্পীদের লক্ষ্য থাকে স্বচ্ছতা লাভ করার দিকে। অর্থাৎ অভিনেয় চরিত্রটির অন্তরকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার দিকে। যদি আঙ্গিক বা বাচিক ভঙ্গী এইরূপ হয় যে তাহার কৌশলটাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু অভিনেয় চরিত্রটির অন্তরকে প্রকাশ করে না, তাহা হইলে সেই অভিনয়কে অস্বচ্ছ বলা চলে।

অভিনয়ের আর একটি অংশ রূপসজ্জা ও চরিত্রোপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে পারা। যেমন, যোদ্ধার ভূমিকা অভিনয়ে তরবারি বহন ও ব্যবহার করিতে পারাও অভিনয়ের অংশ। তেমনই আবার চায়ের দোকানের বয়ের ভূমিকায় চায়ের পাত্র বহন করিতে পারাও অভিনয়ের অংশ।

কিন্তু বাহ্যিক সমস্ত প্রকরণের উপর আছে অভিনেতার সত্তা। সেই সত্তার ব্যবহার ও প্রকাশই হইল অভিনয়ের কঠিনতম অংশ। এবং সেই অংশের দ্বারাই শিল্পী নিজের গভীরতা ও মহত্ত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন।

ইহা যে কি প্রকারে সাধিত হয় সেই সম্পর্কে যুগে যুগে বহু মনীষী বহুপ্রকার মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত মতের মধ্যে অমিল যেমন প্রচণ্ড, মিলও তেমনই প্রচুর। সক্রেটিস ও এক আবৃত্তিকারের আলোচনার যে লিপি প্লেটো বহু প্রাচীন যুগে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ বলা আছে যে, কবি ও তাঁহার আবৃত্তিকারেরা অনুপ্রেরণার অস্বাভাবিক অবস্থাতেই নিজ শিল্প সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। সেই সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত অভিনেতার সৃষ্টির উৎস যে কোথায় এই সম্পর্কে যেমন বহু মত ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনই আবার প্রতিবাদেরও প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। দেনিস দিদেরো (Denis Diderot) অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককল্যাঁ (Benoit Constant Coquelin) ও হেনরি আরভিং (Henry Irving) এই তর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা তাল্‌মা (Francois Joseph Talma)-র প্রায় সমসাময়িক কালে দুইজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর এই সম্পর্কে আলোচনা এবং তাঁহাদের পাশ কাটাইয়া তাল্‌মার নিজের লিখিত যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে তাহা আজিও প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করে।

রুশ নাট্যাচার্য স্তানিস্লাভ্‌স্কি (Constantin Sergey-evich Stanislavsky) প্রতিভাধর অভিনেতাদের পদ্ধতিটা কি তাহা শিখাইয়াছেন এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ক্ষমতাপন্ন অভিনেতামাত্রেরই সফলতর হইবার সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

জার্মান নাট্যকার ও নির্দেশক ব্রেখ্‌ট (Bertolt Brecht) আবার স্তানিস্লাভ্‌স্কির পদ্ধতির ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে একটা দূরত্ব সকল সময়েই বজায় রাখা প্রয়োজন। তাহা হইলে দর্শক ভাবাবেগে ভাসিয়া না গিয়া যুক্তি দিয়া সমস্ত জিনিসটি বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

এই সকল তর্কের এখনও কোনও মীমাংসা হয় নাই। এবং কোনদিন হইবে কি না তাহাও সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যে পারে, সে কেমন করিয়া যেন এত তর্ক-ঝগড়া সত্ত্বেও পারিয়া যায়, আর রসপিপাসু দর্শকও অমনি ধন্য ধন্য করিয়া উঠে।

কিন্তু এই পারাটাও আবার দেশ ও কালের সীমার মধ্যে অত্যন্ত আবদ্ধ। সমসাময়িক মানুষের মন যে ইঙ্গিতে মুগ্ধ হয়, যে শব্দবিন্যাসচাতুর্যে আপনাকে বিস্মৃত হয়, তাহার ক্রিয়া পরবর্তী যুগে লুপ্ত হইয়া যায়। তাই লেখক বা চিত্রকর যুগের আগে জন্মিয়াও পরবর্তী যুগের বোধের প্রসাদে বাঁচিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু অভিনেতা সমসাময়িক মনকে আন্দোলিত করিতে অক্ষম হইলে তাঁহার পক্ষে সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব; এবং সমসাময়িক কালে বিখ্যাত অভিনেতার সঠিক মূল্যনিরূপণ পরবর্তী যুগে তেমনই কঠিন। অথচ বহমান সময়ের একটি ক্ষণের মধ্যে চিরন্তন সময়কে উপলব্ধি করিবার যে কঠিন মূল্য তাহা অভিনয়শিল্পীকে শোধ করিতেই হয়। ইহাই তাহাদের ভাগ্যলিপি।

দ্র *Natyashastra*, vol. I, tr. Manomohan Ghosh, Calcutta, 1951; B. Jowett, *The Dialogues of Plato*, Oxford, 1892; Denis Diderot, *The Paradox of Acting*, tr. W. H. Pollock, London, 1883; *Memoirs of Hyppolite Clairon*, London, 1800; *Memoires de Marie Francoise Dumesnil*, Paris, 1800; William Archer, *Masks or Faces? A Study in the Psychology of Acting*, London, 1880; C. S. Stanislavsky, *An Actor Prepares*, tr. Elizabeth Reynolds Hapgood, London, 1937; Bertolt Brecht, *A New Technique of Acting*, tr. Eric Bentley, New York, 1949; Toby Cole and Helen Kretch Chinoy, ed. *Actors on Acting*, New York, 1957.

শম্ভু মিত্র

অভিপ্রায়বাদ মনোবিদ্যা দ্র

অভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution) জীবজগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ। বহু বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিলেও লামার্ক, চার্লস ডারুইন ও হিউগো ডিভ্রিস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লামার্কের মূল কথা হইল— প্রথমতঃ জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হয়। আবার ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অবলুপ্তও হইতে পারে। এইভাবে বহিরাকৃতির পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ প্রাণীর জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এইভাবে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। তাহার সূত্র বৈজ্ঞানিকেরা যুক্তি ও প্রমাণের অভাবে গ্রহণ করেন নাই।

ডারুইনের মতবাদ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সমসাময়িক ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩ খ্রী) এই মতবাদকে আরও সুদৃঢ় করেন। এই মতবাদের মূল কথা হইল— ১. জীবজগতে বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি হইলেও জীবের মোট সংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল। ২. বাঁচিবার জন্য নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সহিত এবং খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদকে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম একই প্রজাতি অথবা বিভিন্ন প্রজাতি অথবা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে হইতে পারে। ৩. জীবনসংগ্রামে যাহারা যোগ্য তাহারা বাঁচিয়া থাকে। অযোগ্যেরা অবলুপ্ত হয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় অভিযোজনের ফলে কেহ কেহ টিকিয়া থাকিতে পারে। অভিযোজনের ফলে উৎপন্ন নূতন বৈশিষ্ট্যগুলি অনুকূল পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচনে ক্রমশঃ উন্নত হয় ও বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। ক্রমশঃ প্রাণীদেহে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে ও নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। ডারুইনের মতবাদ কতকাংশে সত্য হইলেও একেবারে নির্ভুল নহে।

হিউগো ডিভ্রিস (১৮৮৪-১৯৩৫ খ্রী) -এর মতবাদ পরিব্যক্তিবাদ— জীবদেহের জননকোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে কখনও কখনও হঠাৎ পরিবর্তন হয়। হয়ত ইহার ফলে দেহেরও পরিবর্তন ঘটে। ইহাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। ইহা অনুকূল পরিবেশের জন্য ঘটে। ডিভ্রিস-এর মতে এই পরিব্যক্তির ফলেই সাধারণতঃ পরিব্যক্তি ক্রমবিকাশের সাহায্য হইয়া থাকে।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিরাম দাস বৈষ্ণব কবি। ইনি ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। গোবিন্দবিজয় নামক গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। তাঁহার আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতক।

অভিষেক মন্ত্রপূত বিবিধ দ্রব্যের দ্বারা (অনেক ক্ষেত্রে গীতবাদ্য সহযোগে) দেবতার বা মানুষের বিশেষ স্নান। দেবতাপ্রতিষ্ঠা বা দেবতার বিশেষ পূজা উপলক্ষে অভিষেকের ব্যবস্থা আছে। দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবে বিষ্ণুর ও দুর্গাপূজায় দুর্গার অভিষেক বা মহাস্নান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্গার মহাস্নান উপলক্ষে এক-একটি দ্রব্য ব্যবহারের সময় স্বতন্ত্র রাগ-রাগিণী সহকারে স্বতন্ত্র বাদ্য বাদনের বিধান আছে। এই প্রসঙ্গে ব্যবহার্য দ্রব্যের

মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতেছে : পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, স্বর্ণোদক, ইক্ষুরস, সাগরোদক, গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্ত-মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, গণিকাদ্বারমৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা প্রভৃতি। রাজার রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গে পূজা-হোমাদি কার্যের পর স্বর্ণ, রজত, তাম্র ও মৃন্ময় কলসে রক্ষিত গন্ধামোদিত পুণ্য নদীর জল স্বুবর্ণভূষিত শঙ্খে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পুরোহিত অমাত্য প্রভৃতি রাজা ও রানীর মাথায় ছিটাইয়া দেন। তৎপরে রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহার সম্মুখে ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন উপস্থাপিত হয় এবং রাজপদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে যথানিয়মে আহ্বান করা হয়। শাক্ত সাধকদের তিনটি অভিষেকের ব্যবস্থা আছে: শাক্তাভিষেক, ইন্দ্রাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। এই সমস্ত অভিষেকের দ্বারা সাধকের মনোরথ সিদ্ধ হয়, বিঘ্ন বিদূরিত হয় এবং সাধনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ হয়। অভিষেক উপলক্ষে স্থাপিত কলসের জল পূজাকার্যের অবসানে যজমানের মাথায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ছিটাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ণাভিষেক কৌল সাধকের অনুষ্ঠান। ইহা গুরুর অনুমতিসাপেক্ষ। পূর্ণাভিষেকের পরে সাধকের নূতন নামকরণ হয় এবং নামের শেষে আনন্দনাথ যুক্ত হয়।

দ্র শব্দকল্পদ্রুম; সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পুরোহিতদর্পণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ; গুরুনাথ বিদ্যানিধি, শান্তিস্বস্ত্যয়নকল্পদ্রুম, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অভেদানন্দ স্বামী (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রী) ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন (ইংরেজী ২ অক্টোবর ১৮৬৬) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রসিকলাল চন্দ ও মাতা নয়নতারা। তাঁহার নাম কালীপ্রসাদ রাখা হয়।

প্রথমে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন ও পরে ১৮ বৎসর বয়সে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রেভারেণ্ড ম্যাকডোরেণ্ড, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির বক্তৃতা এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ষড়্‌দর্শনের আলোচনা তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। তদানীন্তন সুবিখ্যাত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট পতঞ্জলির যোগসূত্র পড়িয়া তাঁহার মন হঠযোগ ও রাজযোগ সাধনা করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মসমাহিত থাকিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। তিনি একজন সিদ্ধ যোগীগুরুর অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহার সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব অভেদানন্দকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'পূর্বজন্মে তুমি যোগী ছিলে, একটু বাকি ছিল, এই তোমার শেষ জন্ম'।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর স্বামী অভেদানন্দ কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ও সামান্য বহির্বাস-মাত্র সম্বল করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের তীর্থস্থান ও নগরাদি নগ্নপদে পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লণ্ডন হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন এবং নিয়মিতভাবে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতে থাকেন। ঐ সময়ে ম্যাক্সমূলার, পল ও ডয়সন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের সহিত তিনি পরিচিত হন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন ও নিউ ইয়র্কে বেদান্ত আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। সেখানে গীতা, উপনিষৎ, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ছাড়াও বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দান করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে তাঁহার 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' (Unity in Variety) সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হয়।

ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ একবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমেরিকায় ফিরিয়া যান। তিনি ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, আলাস্কা, মেক্সিকো, জাপান, হংকং, ক্যাণ্টন, ম্যানিলা প্রভৃতি শহরে ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অবশেষে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ত্যাগ করেন এবং হনলুলুতে অনুষ্ঠিত প্যান প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মিলনে যোগদান করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২১) ভারতে পদার্পণ করেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ কাশ্মীর হইয়া তিব্বত যাত্রা করিয়া লাদাকের বৌদ্ধ মন্দির হেমিসগুম্ফা পরিদর্শন করেন। সেখান হইতে যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবনীর কতকাংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি (পরে মঠ স্থাপিত হয়) ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙে শ্রীরামকৃষ্ণ

বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মবহুল এবং দেশ ও দশের কল্যাণে উদ্‌যাপিত তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অভ্র যদিও প্রায় অধিকাংশ আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার একটি সাধারণ উপাদান, তথাপি স্বচ্ছ এবং বৃহদায়তন অভ্রের পাত বিরল। এই কারণেই অভ্র একটি মূল্যবান খনিজ সম্পদ।

খনিজ পদার্থের মধ্যে অভ্র একটি বিশেষ জাতি বলিয়া গণ্য হয়। অভ্র কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। রাসায়নিকের দৃষ্টিতে অভ্র জলযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম পটাসিয়াম সিলিকেট (hydrated aluminium potassium silicate)। ক্ষেত্রবিশেষে ইহার মধ্যে লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। এই জাতির সাধারণ ধর্ম হইল, ইহা সমান্তরাল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতে সহজে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ অভ্র দুই প্রকারের: ১. মাস্‌কোভাইট, ইহাই আমাদের পরিচিত অভ্র। ইহা শাদা ও স্বচ্ছ। ২. বায়োটাইট, ইহা কালো ও অস্বচ্ছ। দ্বিতীয়টির কোনও ব্যাবহারিক প্রয়োজন নাই।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মূল্যবান বৃহদায়তনের অভ্র (মাস্‌কোভাইট), পেগ্‌মাটাইট নামক একপ্রকার অতি বৃহৎ কণাযুক্ত আগ্নেয় শিলার মধ্যে পাওয়া যায়। পূর্বস্থিত শিলার অন্তর্গত ফাটলের মধ্যে গলিত শিলা প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে শীতল হইয়া কেলাসিত হয়। ইহার মধ্যে জল ও বায়বীয় পদার্থ থাকিবার ফলে অভ্রের কেলাসগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে। ফাটলের মধ্যে কেলাসিত এই শিলাকে 'পেগ্‌মাটাইট শিরা' (vein) বলা হয়।

ভারতের সমধিক পরিচিত বিহারের অভ্র অঞ্চল দৈর্ঘ্যে ১৪৫ কিলোমিটার (৯০ মাইল) ও প্রস্থে প্রায় ২২ কিলোমিটার (প্রায় ১৪ মাইল)। ইহা গয়া জেলা হইতে হাজারিবাগ ও মুঙ্গেরের মধ্যে দিয়া ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে পূর্বস্থিত শিস্ট (schist) ও নাইস (gneiss) জাতীয় রূপান্তরিত শিলা ভেদ করিয়া বহু পেগ্‌মাটাইট শিরা বিদ্যমান। সাধারণতঃ এখানে অভ্রখণ্ডের আয়তন ৩০×১৫×৮ ঘন সেন্টিমিটার (১২″×৬″×৩″), কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৯১×৬১×৮ ঘন সেন্টিমিটার (৩′×২′×৩″) পর্যন্ত হইতে পারে। ভারতের অন্যান্য খনি অঞ্চলের মধ্যে অন্ধ্রের নেল্লুর জেলা ও রাজস্থানের জয়পুর ও উদয়পুরের মধ্যবর্তী অঞ্চল উল্লেখযোগ্য।

খনি হইতে উত্তোলনের পর অস্বচ্ছ ও কলঙ্কযুক্ত অংশ বাদ দিয়া কাস্তে অথবা কাঁচির সাহায্যে চতুষ্কোণ বা আটকোণ বিশিষ্ট টুক্‌রায় পরিণত করা হয়। তাহার পর আয়তন ও স্বচ্ছতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্রকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতে চিরিয়া ফেলা হয়। এই কার্যে ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষতা অতুলনীয়।

পাতের সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, তাপ, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক শক্তির সহনক্ষমতার জন্যই অভ্রের মূল্য। বৈদ্যুতিক শিল্পেই অভ্রের বহুল ব্যবহার। প্রায় সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই (যথা ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, রেডিও ভাল্‌ভ, কন্‌ডেন্‌সার ইত্যাদি) ইহা ব্যবহৃত হয়। অভ্রের গুঁড়া ও টুক্‌রাকে গালা দ্বারা জমাট বাঁধাইয়া মাইকানাইট নামক এক পদার্থে পরিণত করিয়া বিদ্যুৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। চুল্লির জানালায়, ধাতু ঢালাইয়ের ছাঁচের উপর আস্তরণ দিবার জন্য ও পচন-নিরোধক রঙ প্রস্তুতেও অভ্র ব্যবহৃত হয়। অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়।

দ্র Council of Scientific and Industrial Research, *The Wealth of India*, New Delhi, 1962.

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমথিতকল্প দশবথ্‌নি দ্র

অমরকণ্টক মধ্য প্রদেশে মৈকল পর্বতমালার পূর্বচূড়া; পেন্‌ড্রা রোড রেলস্টেশন হইতে অনূন ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরবর্তী। বাসে যাওয়া যায়। এই স্থানেই নর্মদা, শোণ ও মহানদীর উৎপত্তি, এই বিশ্বাসে ইহা প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুদের নিকট বিখ্যাত তীর্থ। মৎস্যপুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাকালে অমরকণ্টক বহু মন্দিরশোভিত ছিল; কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে মধ্যভারতীয় স্থাপত্যের বিকাশে অমরকণ্টকের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এই মন্দিরগুলি উত্তর ভারতীয় বিশুদ্ধ নাগর রীতি হইতে মধ্যযুগের মধ্যভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে বিবর্তনের একটি অন্তর্বর্তী অধ্যায়ের সাক্ষী। গঠনরীতি ও আকৃতির দিক হইতে অপেক্ষাকৃত অভগ্ন চারিটি মন্দির এই মধ্যবর্তী অধ্যায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ও স্বীয় গুণে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলিতে কোনও লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রীতিপ্রকরণের তুলনামূলক বিচার হইতে অনুমান হয় যে, মন্দিরগুলি সম্ভবতঃ নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল।

পাশাপাশি অবস্থিত কেশবনারায়ণ এবং মচ্ছেন্দ্রনাথ মন্দিরদ্বয় রীতিপ্রকরণের দিক হইতে প্রায় অনুরূপ। দুইটি মন্দিরেই একটি করিয়া গর্ভগৃহ (sanctum), গর্ভগৃহমুখী বদ্ধ অলিন্দ বা অন্তরালগৃহ এবং একটি মণ্ডপগৃহ দীর্ঘায়তভাবে পরস্পর সংযুক্ত। দেবস্থান-গর্ভ বিমান দুই ক্ষেত্রেই পঞ্চরথ রীতিতে নির্মিত। বিমানশীর্ষে পর পর দুইটি আমলক ও আমলকবিশিষ্ট অঙ্গশিখর বর্তমান। অন্তরালগৃহের শীর্ষ ত্রিকোণাকৃতি। মণ্ডপদ্বয় চতুষ্কোণ ভূমির উপর অবস্থিত। অলংকৃত স্তম্ভাবলী উহাদের শীর্ষ ধারণ করিয়া আছে। শীর্ষ পিরামিডের আকারে স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়া গিয়া আমলকের নিম্নে শেষ হইয়াছে। পাতালেশ্বর শিবের মন্দিরটির পরিকল্পনা এবং স্থূল গঠনরীতি মচ্ছেন্দ্রনাথ মন্দিরের প্রায় অনুরূপ।

লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী রাজা করণ ডাহ্‌রিয়া (ডাহ্‌লর কলচুরিবংশীয় নৃপতি কর্ণ আনুমানিক ১০৩৪/১০৪২-১০৭৩ খ্রী) কর্তৃক নির্মিত তিনটি দেবগৃহবিশিষ্ট মন্দিরটিও এই পর্যায়ে নির্মিত। পূর্বোক্ত গঠনরীতিতে নির্মিত মণ্ডপটিকে পশ্চিম ভারতীয় প্রথায় তিন দিক হইতে সংযুক্ত করিয়া গর্ভগৃহের উপর তিনটি সপ্তরথ বিমান ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আছে।

উপরি-উক্ত এবং সমসাময়িক অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির-গুলি ও নর্মদা-শোণ-মহানদীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া উল্লিখিত কুণ্ডটি বর্তমানে তীর্থযাত্রীগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। যে মন্দিরগুলিতে অধুনা যাত্রী সমাগম হয় এবং যে কুণ্ডটিকে বর্তমানে নর্মদা ও শোণের উৎস বলিয়া দেখানো হয় সেইগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক গঠনের। প্রতিষ্ঠিত পুরাতন মূর্তিগুলি ব্যতীত এইগুলির বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সম্প্রতি কোনও কোনও পণ্ডিত কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত রামগিরি ও আম্রকূট পর্বতকে যথাক্রমে মধ্য প্রদেশের রামগড় ও অমরকণ্টকের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বাদানুবাদ এখনও চলিতেছে।

দ্র J. D. Beglar, *Report of a Tour in Bundelkhand and Malwa, 1871-72 and in the Central Provinces, 1873-74*, Archaeological Survey of India, Calcutta, 1878; *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: C. P.*, Calcutta, 1908; *Memoirs of the Archaeological Survey of India: No. 23*, Calcutta, 1931; R. C. Majumdar, ed. *The History and Culture of the Indian People*, vol. V, Bombay, 1957; V. K. Paranjpe, *Fresh Light on Kalidasa's Meghaduta*, Poona, 1960.

প্রণবরঞ্জন রায়

অমরকোষ কোষ দ্র

অমরদাস (১৫০৯-১৫৭৪ খ্রী) শিখদের তৃতীয় গুরু। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অঙ্গদ পরলোকগমন করিলে ইনি গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন ও ২২ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিখ ধর্ম যাহাতে পবিত্র থাকে তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার নির্দেশে বাইশ জন ধর্মযাজক বিভিন্ন কেন্দ্রে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

অমরনাথ কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। ইহা পহলগাম্ হইতে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে অবস্থিত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থে সমাগত হন। এখানে একটি নৈসর্গিক গুহার অভ্যন্তরে ডলোমাইট (চুনা পাথর) পাথরকে আশ্রয় করিয়া যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ তিথি অনুযায়ী হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন বলিয়া কথিত আছে, তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর।

গুহাটি প্রায় ৫১৮২ মিটার (প্রায় ১৭০০০ ফুট) উচ্চ তুষারাবৃত শিখরের পশ্চিম দিকে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার স্থানীয় নাম কৈলাস। অমরগঙ্গা নামে সিন্ধুনদের ক্ষুদ্র উপনদী গুহার পশ্চিম দিকে শ্বেত মৃত্তিকার উপর দিয়া প্রবাহিত। এই মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিলে পাপ ক্ষালন হয় বলিয়া যাত্রীরা বিশ্বাস করেন। নদীর পাশ দিয়া গুহায় যাইবার রাস্তা। গুহার ব্যাস ১৫ মিটার (প্রায় ৫০ ফুট), উচ্চতা ৮ মিটার (প্রায় ২৫ ফুট)। গুহার প্রবেশদ্বার হইতে প্রায় ৬ হইতে ৮ মিটার (২০-২৫ ফুট) ভিতরের দিকে গুহার শেষ প্রান্তে লিঙ্গমূর্তি অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৯১ সেন্টিমিটার (৩ ফুট)। যোনিপীঠের পরিধি প্রায় ২ মিটার (৭-৮ ফুট), উচ্চতা প্রায় ৬১ সেন্টিমিটার (২ ফুট)। যোনি-পীঠের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত সর্পাকৃতি তুষারপিণ্ডের দ্বারা লিঙ্গমূর্তি বেষ্টিত। কথিত আছে, অমাবস্যা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পূর্ণিমায় এই মূর্তি পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে; কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন ঐ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অমাবস্যায় লিঙ্গমূর্তির কোনও চিহ্নই থাকে না। লিঙ্গমূর্তির দুই দিকে বরফের দুইটি স্তূপ আছে; ইহাদের একটিকে পার্বতী, অন্যটিকে গণেশের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়।

অমর সিং (১৯১০-১৯৪০ খ্রী) রাজকোটের অমর সিং ছিলেন এক প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ বোলার তাঁহার পূর্বে অথবা পরে ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলেও বোলার অমর সিংয়ের প্রতিষ্ঠা উচ্চে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড সফরকারী প্রথম ভারতীয় দলের সদস্যরূপে বিদেশ পরিক্রমায় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে অমর সিং শতাধিক উইকেট (১২৯) লাভে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন। মিডিয়াম পেস বোলার অমর সিং দুই ধরনের সুইং এবং কাটিং অফ্ ব্রেক বল করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটে পেশাদাররূপে খেলার অধিকার তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাটিংয়েও তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল। বেপরোয়া মারের জন্য ব্যাটস্‌ম্যান-রূপে তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়। ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি দুইটি সেঞ্চুরি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লেভেসন-গাওয়ার একাদশের বিপক্ষে ১০৭ রান করিতে তাঁহার সময় লাগে মাত্র ৮০ মিনিট। অমর সিং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে অকালে পরলোকগমন করেন। শেষ জীবনে তিনি ছিলেন জামনগর দলের খেলোয়াড়।

অজয় বসু

অমরসিংহ[১] মেবারের রানা; প্রতাপসিংহের পুত্র। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের হস্তে তিনি পরাজিত হন। তথাপি ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ইহার পূর্বে জাহাঙ্গীর মেবারের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করিলেও ঐ সকল যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাদা খুর্‌রমকে মেবার অভিযানে প্রেরণ করেন। শাহ্‌জাদা মেবারের খাদ্যসরবরাহের পথ অবরুদ্ধ করায় অমরসিংহ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৬১৫ খ্রী)। তবে ব্যক্তিগতভাবে মোগল দরবারে উপস্থিতি এবং মেবারের কোনও রাজকন্যাকে মোগল হারেমে প্রেরণের অপমান হইতে তাঁহাকে রেহাই দেওয়া হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অমরসিংহ[২] অমরকোষ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থের রচয়িতা। জনশ্রুতি অনুসারে ইনি উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম। কাহারও মতে ইনি বৌদ্ধ এবং কাহারও মতে ইনি জৈন ছিলেন।

অমরাবতী (১৬° ৩০′ অক্ষাংশ এবং ৮০° ২০′ দ্রাঘিমা) অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টূর জেলায়, গুণ্টূর শহর হইতে ৩৪ কিলোমিটার (২০ মাইল) দূরে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম ধান্যকটক, বর্তমানে ধরনিকোট-এ পর্যবসিত হইয়াছে। ধরনিকোট অমরাবতীর ৮০৫ মিটার (অর্ধ মাইল) পশ্চিমে। ইহার সমুন্নত ঢিবিগুলির অভ্যন্তরে ধান্যকটক নগরীর ধ্বংসাবশেষ প্রোথিত বলিয়া অনুমান করা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ধান্যকটক যে সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল, বহুসংখ্যক শিলালেখে তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য আরাধ্য স্তূপটি (মহাচৈত্য নামে খ্যাত) খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের উৎসর্গ-লেখগুলি গ্র্যানাইট পাথরের উষ্ণীষ (coping) ও সাধারণতঃ মহাচৈত্যের বেষ্টনীর (railing) সূচির (cross-bar) গাত্রে উৎকীর্ণ।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে নূতন অলংকরণ ও বিবিধ নূতন অঙ্গ সংযোজন করিয়া মহাচৈত্য ও উহার বেষ্টনীকে নূতন আকার দেওয়া হয়। উৎসর্গ-লেখের অধিকাংশই এই সময়ের সৃষ্টি। এই সকল লেখে শুধু ধান্যকটকের নহে, বিশাল ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা ও গৃহীভক্তের দানের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা কারুকার্যখচিত স্তূপাবরণপাট, (casing slab), স্তম্ভ-বেষ্টনীর বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি দান করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই যুগেই ধান্যকটকের ভাস্করদের শিল্পকলার চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটে। সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁহারা একের পর এক উদ্গত চিত্র (relief) রচনা করিয়া চলেন; সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে এবং অপরিমেয় ব্যঞ্জনায় এইগুলি বিশ্ববিশ্রুত। লেখমালার একটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে সাতবাহন নৃপতি পুলুমায়ির রাজত্বকালে এক ব্যক্তি একটি ধর্মচক্র দান করেন। তবে ইহা হইতে এই ধারণা করা যায় না যে সাতবাহনেরা মহাচৈত্যের নূতন রূপদানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাঁচী ও ভারুতের মতই এই বিশাল স্তূপের রূপকর্মের অমিত ব্যয় অনু-প্রাণিত জনসাধারণই বহন করেন। প্রথম দিকের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের উদ্গত চিত্রে বুদ্ধ রূপায়িত হইয়াছেন প্রতীকের মাধ্যমে; কিন্তু এই যুগে তাঁহার মানবমূর্তিই ভাস্কর্য-রূপ পরিগ্রহ করে। স্তূপ ও বেষ্টনীর নব রূপকর্ম খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেও চলিতে থাকে; অনেক সময় ক্ষোদিত ফলকের পশ্চাদ্‌ভাগে

তদানীন্তন রুচি অনুযায়ী নূতন উদ্‌গত চিত্র যোজনা করিয়া পুনর্বার সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্বতন মহাচৈত্যের আকার, আয়তন ও গঠনরীতি সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যের একান্ত অভাব রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের নবরূপায়িত মহাচৈত্যেরও বিশেষ কিছু এখন আর অবশিষ্ট নাই। তবে সি ম্যাকেঞ্জির (১৭৯৭ খ্রী ও ১৮১৬ খ্রী) নকশা ও বিবরণ, আর্. সিউএলের (১৮৭৭ খ্রী) বিবরণ, আবরণপাটে ক্ষোদিত স্তূপের আকার, অন্ধ্র দেশের বিভিন্ন স্তূপের তুলনামূলক বিচার, স্থানচ্যুত ফলক ও স্তম্ভাদি— এই সব কিছু একত্রে পর্যালোচনা করিয়া মহাচৈত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, আকার ও রূপকর্মের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করা যায়।

স্তূপের অণ্ড (dome) প্রায় ২ মিটার (৬ ফুট) উচ্চ ও ৪৯ মিটারের (১৬০ ফুটের) অধিক ব্যাসবিশিষ্ট একটি মেধির (drum) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেধির পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর গাত্রে একটি করিয়া আয়ক ছিল; আয়কের উপর ছিল পাঁচটি স্তম্ভের একটি সারি। মেধির বহিঃপ্রান্তভাগই কেবল ইষ্টক প্রাচীরে আবৃত ছিল; স্তূপের প্রতিকৃতিখচিত চুনা পাথর আয়ত পাট ও অলংকৃত উপস্তম্ভ পর্যায়ক্রমে সমাবেশ করিয়া প্রাচীরগাত্র আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। এই আচ্ছাদনের শীর্ষে ছিল উদ্‌গত চিত্রে সুশোভিত টানা উষ্ণীষ।

উদ্‌গত চিত্রগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত; বড় অংশগুলির বিষয়বস্তু জাতক ও বুদ্ধদেবের জীবনের বিচিত্র ঘটনা এবং ছোট অংশের উপজীব্য মিথুন। অণ্ডের খাড়া অংশের অঙ্গসজ্জা করা হয় চুনা পাথরের ঊর্ধ্বপাটের সাহায্যে। ঊর্ধ্বপাটগুলি আবার তিন সারি উদ্‌গত চিত্রে শোভিত। উদ্‌গত চিত্রের শিরোভাগে পৃথক পৃথক সারিতে ধাবমান জন্তু, ত্রিরত্ন ও পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি। অণ্ডের গোলাকার অংশ খুব সম্ভব চুনের মোটা প্রলেপে ঢাকা ছিল। মাল্য প্রভৃতির অনুকৃতিতে প্রলেপেও বৈচিত্র্য সঞ্চার করা হইয়াছিল। অণ্ডের শীর্ষে চতুষ্কোণ হর্মিকা-বেষ্টনী; বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে ছত্রাবলী। মেধির মূলদেশের চতুর্দিকে চুনা পাথরের ফলকে আচ্ছাদিত ৩ মিটার ৩৫ সেন্টিমিটার (১১ ফুট ৩ ইঞ্চি) প্রশস্ত প্রদক্ষিণ-পথ। এই পথের প্রান্তদেশের আয়কমুখী চারিটি প্রলম্বিত তোরণ-সংবলিত বেষ্টনীটি রূপকর্মবিভবে ভারতবর্ষের সর্বোত্তম বেষ্টনীসমূহের অন্যতম। অষ্টকোণী স্তম্ভরাজি, তিন সারি সূচি এবং একটি উষ্ণীষে ইহা নির্মিত। বেষ্টনীর উভয়পার্শ্বই অলংকৃত। অভ্যন্তরভাগের রূপকর্ম বিশদতর এবং এই সকল উদ্‌গত-চিত্রের বিষয় জাতকের কাহিনী ও বুদ্ধজীবনী।

মহাচৈত্যকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুর্দিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ, মণ্ডপ, মন্দির, আবাসগৃহ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের নিম্নাংশের যৎসামান্য এখনও বিদ্যমান। এখানে ষষ্ঠ হইতে একাদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি এবং মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, লোকেশ্বর, বজ্রপাণি, হেরুক প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেবতাদের প্রস্তর বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে সেই সময়ে অমরাবতীর বৌদ্ধ শিল্পনৈপুণ্যের যেমন যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনই মূল বৌদ্ধ ধর্ম কি ভাবে ক্রমে মহাযান ও বজ্রযানে রূপান্তরিত হইয়া গেল, তাহারও সাক্ষ্য মিলে। আনুমানিক, ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি স্থানীয় স্তম্ভ-লেখে ধান্যকটকের পরম বুদ্ধক্ষেত্রে পল্লববংশীয় নৃপতি সিংহবর্মা কর্তৃক বুদ্ধদেবের একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। স্থানীয় অমরেশ্বরের মন্দিরের একটি স্তম্ভের গাত্রে ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে ধান্যকটকের নৃপতি কেত অমরেশ্বরের উপাসক হইয়াও বুদ্ধের উদ্দেশে তিনটি গ্রাম দান করেন এবং দুইটি অনির্বাণ প্রদীপের ব্যবস্থা করেন। কেতের দুইজন অন্তঃপুরিকা এইরূপ আরও দুইটি দীপ উৎসর্গ করেন। উক্ত স্তম্ভের ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্য একটি লেখে শ্রীধান্যঘাটীবাসী বুদ্ধের উদ্দেশে আর একটি অনির্বাণ দীপ দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধজগতে ধান্যকটকের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, এই সংবাদের উৎস সিংহলের কাণ্ডী জেলার গদলদেনীয় শিলালেখ। ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এই লেখে স্থবির ধর্মকীর্তিকে ধান্যকটকের একটি দ্বিতল দেবায়তনের পুনঃসংস্কারক বলা হইয়াছে। ধান্যকটকের পুনরুদ্ধৃত প্রস্তরের বিহারে স্বয়ং ধর্মকীর্তি যে ৫ মিটার (১৮ ফুট) উচ্চ বুদ্ধবিগ্রহের উপাসনা করিতেন, তাঁহার প্রশিষ্য বিমলকীর্তি রচিত সদ্ধর্মরত্নাকরে এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ধান্যকটকের অস্তমিতপ্রায় বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইহাই শেষ সাক্ষ্য, কারণ পরবর্তীকালের সব বিবরণীই ইহার সম্বন্ধে নীরব। স্পষ্টতঃই ইহার কিছু-কালের মধ্যেই ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপসৃত হয়; সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ্বর বুদ্ধদেবের সমগ্র মহিমা আত্মসাৎ করেন এবং এই দেবতারই নামানুসারে এই স্থানটি অমরাবতী নাম প্রাপ্ত হয়।

বিশ্ববিশ্রুত এই অমরাবতী দর্শনে দর্শকমাত্রেরই মনে ক্ষোভ জাগে। কারণ, একদা যেখানে সাঁচীর সুমহৎ স্তূপকেও রূপকর্ম-বিভবে পরাভূত করিয়া অন্ধ্রের সর্বোত্তম স্তূপ বিরাজমান ছিল, আজ সেখানে নিরাভরণ মেধির নিম্নতম অংশই শুধু চোখে পড়ে। তাহার অধিকাংশই নবনির্মিত। এই সর্বনাশা ধ্বংসের আংশিক কারণ

অবৈজ্ঞানিক হঠকারী খননকার্য এবং মুখ্য কারণ গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ক্রমাগত অপসরণ। অজস্র ভাস্কর্যসমৃদ্ধ ফলক পোড়ানো হয় চুন তৈয়ারির জন্য। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নকশা তৈয়ারি করিবার জন্য ম্যাকেঞ্জি দ্বিতীয়বার অমরাবতীতে শিবির স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাঁচশতাধিক ক্ষোদিত প্রস্তর প্যারিসের মিউজিয়মে ও লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এবং মাদ্রাজ, কলিকাতা, হায়দরাবাদ ও অমরাবতীর মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সাম্প্রতিক খননের ফলে ক্ষুদ্রাকার কতিপয় স্তূপের নিম্নাংশ, কয়েকটি ইটের দেওয়াল, বজ্রযানীয় মূর্তি সংবলিত দেওয়ালবিশিষ্ট একটি ভবনের কিয়দংশ ইত্যাদি উন্মোচিত হইয়াছে। মহাচৈত্যের দক্ষিণ আয়কের অভ্যন্তর হইতে অস্থি, মুক্তা, পুঁতি, সোনার ফুল এবং অল্প মূল্যের প্রস্তরখণ্ডসহ পাঁচটি স্ফটিকের মঞ্জুষা উদ্ধার করা হয়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক কারুকার্যখচিত পাট, শিলালেখ, ভগ্ন স্তম্ভ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি অমরাবতী সংগ্রহালয়ে রাখা হইয়াছে।

দ্র James Fergusson, *Tree and Serpent Worship*, London, 1873; R. Sewell, *Report on the Amaravati Tope*, London, 1880; James Burgess, *Notes on the Amaravati Stupa*, Archaeological Survey, Southern India, No. 3, Madras, 1882; James Burgess, *The Buddhist Stupas of Amaravati and Jaggayyapeta*, Archaeological Survey, Southern India, I, London, 1887; A. Rea, *Excavations at Amaravati*, Annual Report of Archaeological Survey of India, 1905-1906, 1908-1909; C. Sivaramamurti, *Amaravati Sculptures in the Madras Museum*, Bulletin, Madras Govt. Museum, New Series, General Section, vol. IV, Madras, 1942; Douglas Barnett, *Sculptures from Amaravati in the British Museum*, London, 1954; A Ghosh, ed. *Indian Archaeology, 1958-1959—A Review*, New Delhi, 1959.

দেবলা মিত্র

অমরু,-ক 'অমরুশতক' নামক সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। অমরুর ব্যক্তিগত জীবন বা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অমরুশতকের তিনটি শ্লোক আলংকারিক বামনের (খ্রীষ্টীয় নবম শতক) 'কাব্যালংকার' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু উহাতে কবি বা কাব্যের উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন বিখ্যাত কবি হিসাবে অমরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, অমরু-শতকত্রয়-রচয়িতা ভর্তৃহরির পরবর্তী। অমরুশতকের চারিটি রূপ বর্তমান— দক্ষিণ ভারতীয়, বঙ্গীয়, পশ্চিম ভারতীয় এবং মিশ্র। বিভিন্নরূপে ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৬-১১৫; সকল রূপে সাধারণ শ্লোকসংখ্যা ৫১। ইহার উনিশখানি টীকা আছে। সম্ভবতঃ অমরুর আদর্শ ছিল প্রাকৃতে রচিত হালের 'সত্তসঈ'। জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় নারীর বর্ণনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য। ছন্দের বৈচিত্র্যও উপভোগ্য। পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকগুলি যেন এক-একটি শব্দময় চিত্র।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৫৭ খ্রী) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের সংস্পর্শে আসেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইবার পর তিনি উত্তরপাড়ায় 'শিল্প সমিতি' স্থাপন করেন। সমিতিতে তাঁতশালা, কামারশালা ও কাঠের কাজের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সময় তিনি অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবী নেতার সংস্রবে আসেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলে ও পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ স্ট্রীটে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে স্বদেশী পণ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। এই দোকানটি বিপ্লবীদের মিলনস্থল রূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রেফতার এড়াইবার জন্য তিনি প্রায় সাত বৎসরের অধিককাল আত্মগোপন করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর অমরেন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি লাইব্রেরি' নামে একটি প্রকাশক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এই সংস্থা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ আরও সতর জন বিপ্লবী নেতার সহিত ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। কারামুক্তির পর তিনি

সুরেশ দাস ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে 'কংগ্রেস কর্মীসংঘ' (১৯২৭-১৯২৮ খ্রী) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে অমরেন্দ্রনাথ যোগ দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কারারুদ্ধ হইবার পর তিনি সারা বাংলায় ঐ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন; ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬ খ্রী) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র। দ্বারকানাথের দ্বিতীয় পুত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বনামধন্য পুরুষ। দ্বারকানাথ বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রেলির বাড়ির মুৎসুদ্দি ছিলেন। যে দত্তবংশে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম, সেই দত্তবংশ শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।

অমরেন্দ্রনাথের ডাকনাম কালু। বাড়িতে প্রায়ই শখের যাত্রা হইত। অমরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে সেই যাত্রা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। দুই-একটি নাট্যাভিনয় দেখিবারও সুযোগ হইয়া যায়। ফলে, নিতান্ত অপরিণত বয়সেই অভিনেতা হইবার ইচ্ছা অমরেন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল হয়।

স্টারে একদিন শৈবলিনীরূপিণী তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সহিত নাট্যানুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। এইবার রীতিমত নাট্যচর্চা আরম্ভ হইল, 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' গঠিত হইল। ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবে যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত, ক্লাসিক থিয়েটারে তাহারই পরিণতি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয়। স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও অমরেন্দ্রনাথ কিছুকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সমসাময়িক কালে দানীবাবু ছাড়া আর কোনও অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথের মত দর্শকচিত্ত জয় করিতে পারেন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজ, 'বিষাদে' অলর্ক, 'আলিবাবা'য় হুসেন, 'পাণ্ডবগৌরবে' ভীম, 'সীতারামে' সীতারাম, 'রঘুবীরে' রঘুবীর, 'হরিরাজে' হরিরাজ, 'হারানিধি'তে অঘোর, 'প্রফুল্লে' ভজহরি, 'ভ্রমরে' গোবিন্দলাল প্রভৃতি ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ শেষ অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার শরীর তখন সুস্থ ছিল না, তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল; অভিনয় আর শেষ করিতে পারিলেন না।

নাট্যলোকের একজন বিশিষ্ট নেতারূপে অমরেন্দ্রনাথ বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বাংলা নাট্যশালার দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় তিনি বহু নূতনত্ব আনিয়াছেন। নাট্যলোকে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক।

বিভিন্ন সময়ে 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' নামে তিনখানা সাময়িকপত্র অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন। 'নাট্যমন্দিরে'র প্রথম সম্পাদক স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথ 'ঊষা' (১৮৯৩), 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৮৯৯), 'ঘুঘু' (১৯০৫), 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (১৯০৫), 'কেয়া মজেদার' (১৯০৯), 'প্রেমের জেপলিন' (১৯১৫) প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনের রচয়িতা। নাটক-প্রহসন ছাড়া অন্যবিধ রচনাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

অমরেন্দ্রনাথের চরিত্রে তেজস্বিতা, আত্মবিশ্বাস, সরলতা ও উদারতার সহিত অসংযম ও অবিমৃশ্যকারিতা বিচিত্ররূপে সংমিশ্রিত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

অরবিন্দ গুহ

অমাত্য ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এবং বৌধায়নের পিতৃমেধসূত্রে অমাত্য শব্দটি মন্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। পাণিনির ব্যাকরণ অনুসারে অমা শব্দের অর্থ নিকট বা সহিত। কিন্তু যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলে উল্লিখিত অমাবান্‌ শব্দটির একটি ব্যাখ্যা অমাত্যবান্‌ করিয়াছেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে অমাত্য শব্দ মন্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অমাত্য শব্দের অর্থ মন্ত্রীরূপে গৃহীত হইয়াছে। অমাত্য ও মন্ত্রী এই দুই শব্দ অনেক সময় একার্থবাচক হইলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে বুঝা যায় যে উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীরা 'অমাত্য' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন; কিন্তু মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইতেন রাজার স্বল্পসংখ্যক পরামর্শদাতা। অনেক সময় অমাত্যদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নির্বাচন করা হইত। কিন্তু মন্ত্রীরা সংখ্যায় অল্প হইতেন; সম্ভবতঃ ৩।৪

জনের কম নহে এবং ১০।১২ জনের বেশি নহে। রাজা মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজে হাত দিতেন না ; এবং অনেক সময় মন্ত্রীরা অথবা মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্য চালাইতেন। প্রাচীন ভারতে মন্ত্রীদের যথেষ্ট পদমর্যাদা ও সম্মান ছিল। তাঁহারা বহু পরিমাণে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতেন।

মানবধর্মশাস্ত্রমতে সাত-আটজন (মনু ৭।৫৪) অমাত্য লইয়া মন্ত্রীপরিষৎ গঠিত হইত। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মন্ত্রীর তুলনায় অমাত্যকে নিম্নপদস্থ রাজভৃত্য বলা হইয়াছে। সাতবাহন এবং পল্লবদের রাজ্যে অমাত্যেরা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ও প্রান্তের শাসনকর্তা। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে দেখা যায়, অমাত্য ধীসচিব নহেন কেবল কর্মসচিব। অমরকোষ অনুসারে অমাত্যেরা ধীসচিব হইলেই মন্ত্রীপদবাচ্য হইতেন। গুপ্তযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর অমাত্য ছিলেন। রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও হরিষেণ ও পৃথ্বীসেন ছিলেন কুমারামাত্য এবং তাঁহারা যথাক্রমে সান্ধিবিগ্রহিক ও মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজ্যের মহামাত্য এবং রাজনীতিরত্নাকরে উল্লিখিত অমাত্য ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ রাষ্ট্রকূটদের একটি সামন্তরাজ্যের অধিবাসী সোমদেবসূরি মন্ত্রী অপেক্ষা অমাত্যকে নিম্নশ্রেণীর রাজভৃত্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কৌটিল্য বলিয়াছেন যে মন্ত্রীর সহায়তা ব্যতীত রাজ-কার্য চলিতে পারে না। সকল বিষয়েই রাজা মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতেন। এইজন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই মন্ত্রী ও অমাত্যপদে নিযুক্ত হইতেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হইয়াছে যে অমাত্যকে কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, বলশালী, মান্য, বিদ্বান্, নিরহংকার, এবং কার্যাকার্যবিবেককুশলী হইতে হইবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং অগ্নিপুরাণে আরও কয়েকটি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা— দেশজ, কৃতশিল্প, চক্ষুষ্মান, সুদূরদর্শী, প্রাজ্ঞ, বাগ্মী, দৃঢ়ভক্তি, সুস্থ ইত্যাদি। এতদুপরি সোমদেবের মতে অমাত্যপদে নিয়োজিত ব্যক্তির অতীব মিতব্যয়ী বা অমিতব্যয়ী হওয়াও উচিত নহে।

অমাত্যের গুণাবলী নির্ধারণ করিয়াই শাস্ত্রকারেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বিশেষ শ্রেণী হইতে অমাত্য নিয়োগ করিবার জন্যও কৌটিল্যের পূর্বাচার্যেরা নির্দেশ দিয়াছেন। ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাত-ব্যাধি, বাহুদন্তীপুত্র বলিয়াছেন যে, সহপাঠী, রাজার ন্যায় যাঁহাদের গুণ, আপৎকালে যাঁহারা রাজার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাঁহারা রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন, পিতৃপিতামহক্রমে যাঁহাদের রাজভক্তি বর্তমান, যাঁহারা অভিজাত শ্রেণীর অথচ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শুদ্ধাত্মা, রাজার প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট ও শৌর্যবান্— এইরূপ শ্রেণী হইতেই অমাত্য নির্বাচিত করা উচিত। সোমদেব আত্মীয়দের নিয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌটিল্য অমাত্যের কার্যক্ষমতা এবং পুরুষার্থকেই প্রধান বিবেচ্য বলিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার মতে অমাত্য নিয়োগ করিবার সময় দেশ, কাল এবং কর্মের প্রকৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

সোমদেবসূরি অমাত্যের বর্ণের প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে অমাত্যপদে নিয়োজিত করিবার বিপক্ষে ছিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণেরা কৃপণ এবং ক্ষত্রিয়েরা অভিযুক্ত হইলে খড়্গ প্রদর্শন করেন। সুতরাং সোমদেব প্রকারান্তরে কেবল বৈশ্যদেরই অমাত্য-পদে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন।

কৌটিল্যের পূর্ববর্তী আচার্যগণের সময় হইতেই উপধা-পরীক্ষার দ্বারা অমাত্যদের নিয়োগ করিবার প্রথা ছিল। ধর্মোপধায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ ধর্মস্থীয় বা কণ্টক-শোধন বিচারালয়ে বিচারকের পদে নিয়োজিত হইতেন। অর্থোপধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের সন্নিধাতৃ বা সমাহর্তৃর পদে নিয়োগ করা হইত। কাম অথবা ভয়োপধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাজার প্রমোদ উদ্যানে বা রাজান্তঃপুরে অথবা আসন্ন কার্যে নিয়োজিত হইতেন। কৌটিল্যের যুগে অমাত্যপদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে খনি, হস্তিবন বা রাজকীয় কর্মশালায় নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা ছিল। অমাত্যপদ প্রার্থীদের পরীক্ষার উল্লেখ পরবর্তী কালের কামন্দকীয় নীতিসার এবং নীতিবাক্যামৃতেও পাওয়া যায়।

অমাত্যগণকে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য করিতে হইত। মনুস্মৃতিতে দেখা যায় যে অমাত্যগণ শাসন সম্বন্ধীয় কার্য করিতেন। রাজ্যরক্ষার দায়িত্বও তাঁহাদের উপরেই ছিল (মনুসংহিতা ৭।৫৮-৬২ ; ৭।২২৬)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অমাত্যের কার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। উপধাবিশুদ্ধ অমাত্যের সাহায্যে রাজা গুপ্তচর নির্বাচন করিতেন। ভরদ্বাজের মত অস্বীকার করিয়া কৌটিল্য বলেন যে, রাজার অসুস্থাবস্থায় অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে অমাত্যেরা রাজ-পরিবার হইতেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন যে অমাত্যগণই অন্যদেশীয় এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু হইতে জনপদকে রক্ষা করেন। তাঁহারাই জনপদের বিভিন্ন উন্নতি এবং তথা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কামন্দকীয় নীতিসার, অগ্নিপুরাণ এবং নীতিবাক্যামৃতে দেখা যায় যে অমাত্যেরা রাজ্যরক্ষা এবং আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিতেন। শুক্রনীতিসারের মতে রাজ্যের আয়ের বিশদ

বিবরণ এবং নগর, গ্রাম ও অরণ্যের তালিকা প্রস্তুত করা অমাত্যের কর্তব্য ছিল। চৌলুক্য রাজ্যের বিবরণে দেখা যায় যে, মহামাত্যেরা দলিলপত্র, বৈদেশিক ব্যাপার এবং মুদ্রাবিভাগ পরিদর্শন করিতেন। আবার মানবধর্মশাস্ত্র এবং মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে জানা যায় যে তাঁহারাই মন্ত্রীপরিষৎ গঠন করিতেন এবং পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিতেন। সোমদেবের মতে চতুরঙ্গ সেনার সমস্যা সমাধানও অমাত্যেরাই করিতেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন ভারতে অমাত্যগণই মুখ্যতঃ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

দ্র কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ; U. N. Ghoshal, *A History of Indian Political Ideas,* Oxford, 1959 ; A. S. Altekar, *State and Government in Ancient India,* Benares, 1949.

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

অমিতাভ পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে প্রাচীনতম। ইনি সুখাবতী স্বর্গধামে শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। সৃষ্টির কোনও দায়িত্ব তাঁহার নাই। সে দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে অমিতাভ হইতে উদ্ভূত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উপর।

অমিতাভের বাহন হইল এক জোড়া ময়ূর এবং চিহ্ন হইল পদ্ম। ইনি রক্তবর্ণ, সমাধিমুদ্রাধর, সংজ্ঞাস্কন্ধ-স্বভাব এবং পদ্মকুলী। পাণ্ডরা ইঁহার প্রজ্ঞা।

সুখাবতীব্যূহ নামক মহাযানী গ্রন্থে অমিতাভ বা অমিতায়ুন -এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন, হিউ এন্-ৎসাঙ্, ই-ৎসিং প্রমুখের ভ্রমণবৃত্তান্তেও অবলোকিতে-শ্বর, অমিতাভ, অক্ষোভ্য ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালে তিব্বত ও চীন দেশে অমিতাভের প্রচার হইলেও সম্ভবতঃ জাপানেই অমিতাভ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হন। জাপানী বৌদ্ধ ধর্মে অমিতাভের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। তাঁহার নামানুসারে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নামকরণও (Amidism) হইয়াছে।

ভারতবর্ষ, চীন ও তিব্বতে অমিতাভের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

দ্র *Advayavajra Samgraha,* Baroda, 1927; B. Bhattacharyya, *An Introduction to Buddhist Esoterism,* London, 1932 ; B. Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography,* Calcutta, 1958 ; C. Eliot, *Japanese Buddhism,* London, 1935.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১২৮৬-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে, পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ। তিনি কেশব অ্যাকাডেমি ও জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ -এ শিক্ষালাভ করেন ও কাশীতে কাশীনরেশের পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিজের এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীক ভাষা এবং মৌলবী রাখিয়া উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা ও প্রাকৃত ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'বিভিন্ন ভাষায় পত্রাদি অনুবাদ কার্যালয়' (Translating Bureau) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন নামক পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইতিমধ্যে কিছুকাল তিনি ডোভেটোন কলেজে ল্যাটিন ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৫ হইতে ১৯৪০ খ্রী পর্যন্ত তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) -এ পালি, বাংলা ও হিন্দীর অধ্যাপক ছিলেন ও কিছুদিন ত্রিপুরা এস্টেটের সরকারি ইতিহাস-গবেষক (State-historian) রূপে কার্য করেন। ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দি ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন -এ ফরাসী, জার্মান, পালি, হিন্দী প্রভৃতির অধ্যাপক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১৩১০-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহ-সভাপতিরূপে কার্য করেন। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তিনি জৈনজাতক, শ্রীকৃষ্ণবিলাস, শ্রীশ্রীসংকীর্তনা-মৃত, বিদ্যাপতি, ভক্তমাল ও কর্ণামৃত সম্পাদনা করেন এবং চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ, সরস্বতী ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গীয় মহাকোষ নামক কোষগ্রন্থের তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন। বাণী (১৩১১-১৩১৭ বঙ্গাব্দ), ভারতবর্ষ (১৩২০-১৩২১ বঙ্গাব্দ), সংকল্প (১৩২১), শ্রীগৌরাঙ্গসেবক (১৩২৬-১৩৩৪), পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬-১৩৪০), শ্রীভারতী (১৩৪৪-১৩৪৭) এই সকল মাসিক পত্রিকার ও মর্মবাণী (সাপ্তাহিক, ১৩৩২), ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস্ (ত্রৈমাসিক ১৩২১-

১৩২৩) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'দ্যু জারিক' (*Du Jarric*), 'পিমেণ্টা' (*Pimenta*), 'ব্রহ্মচরিত' ইত্যাদি কতকগুলি দেশী ও বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ ঘাটশিলায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ত্রিদিবনাথ রায়

অমৃতলাল দত্ত আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতিভাবান যন্ত্রসংগীত-শিল্পী, স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা ও হাবু দত্ত নামে সুপরিচিত। ইনি প্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট-বাদক। এস্রাজ, সুরবাহার ও বীণাযন্ত্রেও ইনি গুণী। স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সাহায্যে বেণীমাধব অধিকারীর (বেণী ওস্তাদ) নিকট তাঁহার প্রথম সংগীতশিক্ষা। পরে (গয়ার) এস্রাজী কানাইলাল ঢেড়ী এবং (রামপুরের) স্বনামধন্য উজীর খাঁর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। তৎকালীন ইওরোপের খ্যাতনাম্নী (স্বামীজীর মতে সর্বশ্রেষ্ঠা) গায়িকা মাদাম কালভে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে অমৃতলালের এস্রাজ-বাদন শ্রবণে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলিকাতার ক্লাসিক ও মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নিযুক্ত থাকাকালে অমৃতলাল ক্ল্যারিওনেট-বাদকরূপে সাধারণ্যে গুণপনার পরিচয় দান করেন। আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে অমৃতলালের নিকট যন্ত্রসংগীত শিক্ষা করেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্য . সুরেন্দ্র নিয়োগী, হরি গুপ্ত, সুরেন্দ্র পাল, নারায়ণ পাল, হরিহর রায় প্রভৃতি।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু, কলিকাতা, ১৯৬৩।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রী) ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু।

কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্তমানে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল) অমৃতলালের শৈশবশিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি দুই বৎসর হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে অমৃতলাল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর অমৃতলাল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পর তিনি মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথির চর্চা আরম্ভ করেন। কিছুকাল শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল এবং আরও কয়েকজন সহায়সম্বলশূন্য যুবকের উদ্যমের ফলেই বঙ্গদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অমৃতলালের নাট্যজীবনের ইতিহাস ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গালয়ের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হইয়া আছে। জীবনের অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল তিনি নাট্যশালার কার্যে অতিবাহিত করিয়াছেন।

বঙ্গরঙ্গালয়ে অমৃতলালের মত এমন সর্বগুণান্বিত পুরুষ দুর্লভ। তিনি একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ।

জীবনে নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অমৃতলাল অভিনয় করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'কমলে কামিনী'তে বক্কেশ্বর, 'হীরকচূর্ণে' মিস্টার স্কোবল, 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'তে ম্যাজিস্ট্রেট, 'রাবণবধে' বিভীষণ, 'দক্ষযজ্ঞে' দধীচি, 'নসী-রামে' নসীরাম, 'প্রফুল্লে' রমেশ, 'বেল্লিকবাজারে' দোকড়ি সেন, 'তরুবালা'য় বেহারী খুড়ো, 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহে' বিভিন্ন চরিত্র, 'খাস-দখলে' নিতাই, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ে অমৃতলাল তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন; কিন্তু যে চরিত্রে শ্লেষ আছে তাহার অভিনয়ে, গিরিশচন্দ্রের মতানুসারে, অমৃতলাল অতুলনীয়।

নাট্যকার অমৃতলালের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত নাটক ও প্রহসনগুলি বহুবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। রসরচনার জন্য তিনি স্বদেশবাসীর কাছে 'রসরাজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরূপেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁহার অপূর্ব নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপ্রণালী, তুচ্ছাতুচ্ছ সর্ববস্তুর প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি, ব্যবহার-কৌশল ও অভিনয়শিক্ষাপ্রণালী সর্বতোভাবে আদর্শ-স্থানীয়। নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে তিনি একদা স্টার থিয়েটারকে আদর্শ রঙ্গালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি নটসম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল বহু নাটক ও প্রহসনের রচয়িতা। তাঁহার 'তিলতর্পণ', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'তরুবালা', 'গ্রাম্য-বিভ্রাট', 'কৃপণের ধন', 'খাস-দখল' ও 'ব্যাপিকা-বিদায়' বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। নাটক-প্রহসন ছাড়া অন্যবিধ রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমৃতলালের মত সদালাপী ও রসালাপী ব্যক্তি দুর্লভ।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফিকে অমৃতলাল তাঁহার নাট্য-

জীবনের প্রথম গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে কেবলমাত্র তাঁহার নাট্যকলার গুরু বলিয়াই মনে করেন নাই, তাঁহার মনুষ্যত্বের গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুলাই অমৃতলাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৭, কলিকাতা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

অরবিন্দ গুহ

অমৃতলাল মিত্র (? -১৯০৮ খ্রী) বঙ্গরঙ্গালয়ের অন্যতম প্রধান অভিনেতা। পিতা বাগবাজার বোসপাড়া নিবাসী গোপাল মিত্র। প্রথম জীবনে অমৃতলালের আদর্শ ছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু এবং পরবর্তী কালে গুরু হন গিরিশচন্দ্র। মৃত্যুকাল (মার্চ ১৯০৮ খ্রী) পর্যন্ত প্রধানতঃ ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারের সহিত তিনি যুক্ত থাকেন এবং নানা ভূমিকায় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। তাঁহার অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে রাবণ, ভীম, মহাদেব, নল, বুদ্ধ, বিল্বমঙ্গল, যোগেশ, অখিল, চন্দ্রশেখর, হরিশ্চন্দ্র, নগেন্দ্র, প্রতাপাদিত্য মীরকাশিম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ অবয়ব, মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর, অফুরন্ত দম এবং নিজস্ব একটি সুরমাধুর্য অমৃতলালকে অনন্যসাধারণ অভিনয়কৃতিত্বের অধিকারী করিয়াছিল।

প্রবোধকুমার দাস

অমৃতলাল শীল উত্তর প্রদেশ প্রবাসী ত্রৈলোক্যনাথ শীলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আদি নিবাস কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িশা-বেহালা গ্রাম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৮০ খ্রী হায়দরাবাদ সরকারে কার্যভার গ্রহণ করিলে অমৃতলাল পিতার সহিত হায়দরাবাদে গমন করেন এবং নিজাম সরকারের শিক্ষা বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং সেখানকার নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। উর্দু, ফারসী এবং আরবী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কোরান এবং হদিস্-এ তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উর্দু এবং ফারসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী বাঙালী পাঠকসমাজের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসেবীগণের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি এলাহাবাদে বাস করিতেন।

অমৃতসর পাঞ্জাবের জেলা এবং জেলাসদর। ইহা উল্লেখ-যোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিখদিগের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। জেলার আয়তন ৫১২৩ বর্গকিলোমিটার (১৯৭৮ বর্গ-মাইল)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৫৩৪৯১৬ জন; তন্মধ্যে ৮২৭৮২১ জন পুরুষ ও ৭০৭০৯৫ জন নারী। পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০০ : ৮৫৪। প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকবসতি ৩০০ জন (প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৬ জন)। অমৃতসর শহরে মোট ৩৭৬২৯৫ নরনারীর বসবাস; তন্মধ্যে ২০৮৮৩৮ জন পুরুষ ও ১৬৭৪৫৭ জন নারী।

তৃতীয় শিখগুরু অমরদাসের (১৫৫২-১৫৭৪ খ্রী) উত্তরাধিকারী ও জামাতা গুরু রামদাসকে (১৫৭৪-১৫৮১ খ্রী) সম্রাট্ আকবর শ্রদ্ধাবশতঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী সমেত যে একখণ্ড ভূমি দান করেন তাহারই উপরে রামদাস ভবিষ্যৎ অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এই ক্ষুদ্র জলাশয়টির সংস্কার সাধন করিয়া এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত করেন। ইহার নামকরণ হয় 'অমৃতসর'। আর ইহা হইতেই স্থানটির বর্তমান নামকরণ হইয়াছে। অবশ্য স্থাপয়িতার নামানুসারে প্রথমে ইহার নাম ছিল চকগুরু রামদাস বা রামদাসপুর। রামদাসের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৮১-১৬০৬ খ্রী) অমৃত সরোবরের মধ্যস্থলে শিখদিগের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্রে হরিমন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ একটি উন্নত শহর গড়িয়া উঠে এবং ইহা শিখ জাতি কর্তৃক মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধের এক নূতন কেন্দ্রে পরিণত হয়। নাদির শাহের অভিযানের (১৭৩৯ খ্রী) পর শিখেরা অমৃতসরের রামরৌনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরে আহমদ শাহ্ আবদালীর নিকট পরাজিত হইলেও তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানের সুযোগে তাহারা অমৃতসরের চতুর্দিকে নিজেদের অধিকার দৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করে এবং দুর্গটিও পুনর্নির্মিত করে। কিন্তু তৈমুর শাহ্ ইহাকে পুনরায় বিনষ্ট করেন। আহমদ শাহ্ আবদালী তাঁহার ষষ্ঠ অভিযানের (১৭৬১ খ্রী) পর স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সময় (১৭৬২ খ্রী) অমৃতসর শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন; মন্দিরটিকে বারুদের সাহায্যে উড়াইয়া দেন ও পুষ্করিণীটি ভরাট করিয়া

স্থানটিকে গোহত্যা দ্বারা কলুষিত করেন। বিজয়ীরা প্রত্যাবর্তন করিলে শিখেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শিরহিন্দের যুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে। এইসময় মুসলমানদিগের দ্বারা কলুষিত মন্দিরটির পুনঃস্থাপনা করা হয় এবং অমৃতসর কিছুদিনের জন্য প্রদেশের রাজধানীর গৌরব লাভ করে। পরে জেলাটির এক বৃহদংশ ভাঙ্গী সর্দারগণের হাতে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮০৫ খ্রী) জেলাটি রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের (১৮৪৯ খ্রী) ফলে পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশের সহিত অমৃতসর জেলা ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অমৃতসরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সুদূর আমেরিকা হইতে একদল ভারতীয় বিপ্লবী মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির জন্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অমৃতসরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মুক্তিবাহিনীর জন্য সৈন্যসংগ্রহের পরিকল্পনা, ডাকাতি-লুঠতরাজের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ এবং পুলিশ-মিলিটারির উপর হামলা প্রভৃতি ছিল বিপ্লবীদের কার্যক্রম। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার 'রাওল্যাট অ্যাক্ট' পাশ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, যথেচ্ছ-ভাবে দণ্ডদান, নির্বাসন প্রভৃতির বিধান জারি করেন। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হইলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রতিবাদ সভায় সমবেত নিরস্ত্র ও শান্ত জনতার উপর জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে প্রায় ১৬০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়; ইহার ফলে বহু নরনারী হত ও আহত হয়। হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন—কিন্তু প্রায় সহস্র লোক হত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা অসংগত নহে। সরকারি রিপোর্ট অনুসারে আহতদের সংখ্যা অন্ততঃ ১২০০। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হইল; ব্রিটিশের দমননীতি বর্বররূপ পরিগ্রহ করিল। এই দণ্ড-নীতির প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের সর্বত্র তীব্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে নানারূপ কার্পেট, শাল, পশম ও রেশমশিল্পই প্রধান। এখানকার শাল ও কার্পেট পৃথিবীবিখ্যাত। স্থানীয় শিল্পীদিগের রুপার ও হস্তীদন্তের মনোরম কাজও উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে কাপড়ের কল, সেলাইকল, মেশিন টুল কারখানা, গালিচার কারখানা, ভাটিখানা ও চিনিকল উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কতকগুলি কাপড়ের কল ও সেলাইকলের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-সমিতি ও বণিকসমিতির মধ্যে পাঞ্জাব ফেডারেশন অফ ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড কমার্স, পাঞ্জাব পেপার মার্চেণ্টস্ অ্যাসো-সিয়েশন এবং টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এখানে অবস্থিত।

এখানকার কয়েকটি মেলা ও উৎসব উল্লেখযোগ্য। মেলার মধ্যে বৈশাখী ও দেওয়ালি উৎসব উপলক্ষে অমৃতসর শহরে অনুষ্ঠিত মেলা দুইটিই প্রধান। পূর্বে এইগুলি ধর্মানুষ্ঠানেরই অঙ্গ ছিল— কিন্তু বর্তমানে কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্ররূপেই ইহাদের প্রসিদ্ধি। মেলা দুইটি সমগ্র প্রদেশে সুপরিচিত। অন্যান্য মেলার মধ্যে তরন তারনে চৈত্র ও ভাদ্র মাসে অমাবস্যার দিনে, কালারে রামতীর্থ দীঘির পাড়ে এবং দেহাত সুধার মেলা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মেলাটি জেলার মধ্যে এক শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী এবং গ্রাম্য নাটক ও সংগীতানুষ্ঠান এই মেলার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। উৎসবাদির মধ্যে কার্তিকী অমাবস্যায় দেওয়ালি ও বৈশাখ মাসে বৈশাখী উৎসবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ালির পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত 'ছোটি দেওয়ালি' উৎসবে চাউল ও চিনির উপর পয়সা রাখিয়া ব্রাহ্মণ ও কুমারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, এই দিনে মৃত পূর্বপুরুষেরা গৃহ পরিদর্শন করিয়া থাকেন। পরদিন গোবর্ধনদিবসে সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বালানো এবং মিষ্টদ্রব্য বিতরণ করা অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। নববর্ষ দিবসে অনুষ্ঠিত বৈশাখী উৎসব শিখদিগের নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে দীক্ষিত ('পাহুল') করেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত শিখেরা অতঃপর 'খালসা' (পবিত্র) নামে পরিচিত হইয়া 'সিং' (সিংহ) উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে এই রীতি প্রবর্তিত হয় যে, শিখমাত্রকেই 'পঞ্চ্ কক্কে' (কেশ, কংঘা, কচ্ছ, কড়া ও কৃপাণ) ধারণ করিতে হইবে।

অমৃতসর জেলা পাঞ্জাবীভাষী অঞ্চল। এখানে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২৯৭ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রতি হাজার পুরুষ ও প্রতি হাজার নারীর মধ্যে যথাক্রমে ৩৬৮ জন পুরুষ ও ২১৪ জন নারী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। সমগ্র জেলার মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা ৩০৪৭২৯ জন ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নারীর সংখ্যা ১৫১৪১৩ জন। অমৃতসর জেলায় তিনটি কলেজ আছে এবং তাহা ব্যতীত একটি মহিলা কলেজ, একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি ডেণ্টাল কলেজ আছে। পুরুষদের একটি ও মহিলাদের একটি প্রশিক্ষণ কলেজও স্থাপিত হইয়াছে। ইরিগেশন অ্যাণ্ড পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউটটি এখানে অবস্থিত।

এই জেলায় দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে অমৃতসর শহরটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এখানেই প্রসিদ্ধ 'দরবার সাহেব' স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। কথিত আছে যে, লাহোরের হজরৎ শেখ মিয়ান মীর নামে গুরু অর্জুনের এক মুসলমান শিষ্য কর্তৃক ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণ মন্দিরটি এক বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরের অধোভাগ জাহাঙ্গীরের সমাধিস্তম্ভ ও অন্যান্য বহু মুসলমান স্মৃতিস্তম্ভ হইতে আহৃত মার্বেল পাথরের দ্বারা নির্মিত। গম্বুজের উপরিভাগ স্বর্ণপাতমণ্ডিত তাম্রদ্বারা আচ্ছাদিত। ইহাই মন্দিরটির স্বর্ণমন্দির নামকরণের কারণ। গম্বুজের ভিতরের দিকটি বিদ্রির কার্যশোভিত এবং ফ্রেস্কো-তে শিখগুরুদিগের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা চিত্রিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে জমকালো রেশমী চন্দ্রাতপতলে শিখদিগের পবিত্র গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' রক্ষিত আছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি প্রবেশপথ। মন্দিরের প্রবেশপথে অমর সিংহাসন 'অকাল তখৎ'-এ ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র, নানারকম মণিমুক্তা এবং শিখগুরুদিগের অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। এখানে শিখগুরুদিগের দরবার বসিত এবং স্থানটি বর্তমানে শিখধর্মের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বাসনরূপে পরিগণিত। দেওয়ালি ও অন্যান্য শিখ উৎসবের সময় মন্দিরটিকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। স্বর্ণমন্দির হইতে প্রায় ১০০ মিটার (প্রায় ১১০ গজ) দূরে গুরু হরগোবিন্দের পুত্র বাবা অটলের স্মৃতিসৌধ শোভা পাইতেছে। সাধারণের বিশ্বাস ধর্মনিষ্ঠ বাবা অটল ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী; কথিত আছে সর্পদংশনে মৃত এক ব্যক্তির প্রাণদান করায় পিতা গুরু হরগোবিন্দের নিকট তিনি তিরস্কৃত হন; কারণ গুরু মনে করিতেন লৌকিক কার্যে অলৌকিক শক্তির ব্যবহার নিন্দনীয়; নিজ ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বাবা অটল আপন প্রাণ বিসর্জন দেন। বাবা অটলের স্মৃতিসৌধের উপর হইতে সমগ্র অমৃতসর শহরটি দেখা যায়। ইহার নিকটেই পবিত্র কৌল্‌সর সরোবর অবস্থিত। দুর্গিয়ানা মন্দিরটি হিন্দু দুর্গামন্দির। এই মন্দিরটির অনেকাংশে স্বর্ণমন্দিরের অনুরূপ। এখানেও একটি বৃহৎ সরোবর রহিয়াছে। দেওয়ালি উৎসবে এই মন্দিরটিকেও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। অমৃতসর হইতে ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) দূরে তরন তারন নামে একটি শহর আছে। ধর্মক্ষেত্র রূপেই ইহার প্রসিদ্ধি। গুরু অর্জুনদেবের স্থাপিত এখানকার শিবমন্দিরটিরও গড়ন অনেকাংশে স্বর্ণমন্দিরেরই অনুরূপ। এখানে দরবার সাহেবের পুষ্করিণী অপেক্ষাও বৃহৎ একটি সরোবর আছে; ভক্তদের বিশ্বাস এই যে এই সরোবরে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নিরাময় হয়।

অমৃতসর শহরের বাহিরে বিশাল উদ্যান রামবাগে কয়েকটি ক্লাবের খেলার মাঠ রহিয়াছে। ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস ছিল, সুশীতল জলের জন্য এখানকার 'ঠাণ্ডি কুই' বিখ্যাত। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে খালসা কলেজ, গোবিন্দগড় দুর্গ, টাউনহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: Punjab*, vol. II, Calcutta, 1908; *Punjab District Gazetteer: Amritsar District*, Chandigarh, 1947. *Census of India—Paper No I of 1962—1961 Census—Final Population Totals*, Delhi, 1962; *India-1962*, Publication Division, Delhi, 1962; Harbans Singh, *The Heritage of Golden Temple*, Amritsar; *Festivals of India*, Ministry of Transport, New Delhi, 1956; J. D. Cunningham, *History of Sikhs*, London, 1853; Muhammad Akbar, *The Punjab under the Mughals*, Lahore, 1948; *India—Delhi, Punjab and Himachal Pradesh*, Department of Tourism, New Delhi.

তারাপদ মাইতি

অমৃতা শেরগিল (১৯১৩-১৯৪১ খ্রী) আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ, পিতা শিখ, মাতা হাঙ্গেরীয়। ইওরোপে তাঁহার জন্ম হয় ও শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁহার শিল্পশিক্ষাস্থল প্যারিস। বঙ্গীয় প্রচেষ্টার বহির্ভূত সর্বাধিক ও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী শ্রীমতী শেরগিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্প ও সেজান, গগাঁ প্রমুখ ইওরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রেরিত এবং পরবর্তী ভারতীয় চিত্রকলায় প্রভাববিস্তারকারী।

অরুণাভ দত্ত

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এককোষ প্রাণীমাত্রেই অমেরুদণ্ডী। বহুকোষ প্রাণীদের মধ্যে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী দুই প্রকারই আছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১. ইহাদের দেহে নোটোকর্ড (notochord) অথবা মেরুদণ্ড নাই; ২. কোনও কোনও অমেরুদণ্ডীর শ্বাসকার্যের জন্য ফুলকা (gills) থাকিলেও

গলবিল ছিদ্র (pharyngeal clefts) কখনও থাকে না ; ৩. শরীরের উপরিভাগে যদি শক্ত আবরণী থাকে তাহা জীবিত কোষের দ্বারা গঠিত হয় না। শরীরের ভিতর হাড় থাকে না ; ৪. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র শক্ত সুতার মত। ভিতরে কোনও গহ্বর নাই। হৃৎপিণ্ড সাধারণতঃ শরীরের অক্ষদেশে থাকে। মস্তিষ্ক (brain) কয়েকটি গ্রন্থির (ganglion) দ্বারা গঠিত ; ৫. যে সমস্ত অমেরুদণ্ডীর হৃৎপিণ্ড আছে, তাহাদের শরীরের পৃষ্ঠদেশে উহা থাকে। হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমার সহিত মিশিয়া থাকে ; ৬. চক্ষু মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হয় না। বহু অমেরুদণ্ডীর পুঞ্জাক্ষি আছে। ইহাদের উদাহরণ— কেঁচো, চিংড়ি, পতঙ্গ প্রভৃতি।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমোঘবর্ষ দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তিনজন রাজা 'অমোঘবর্ষ' উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম অমোঘবর্ষই সমধিক প্রসিদ্ধ (আনুমানিক ৮১৪-৮৭৮ খ্রী)। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র।

বেঙ্গীর চালুক্য, মহীশূরের গঙ্গ, গুজরাটের রাষ্ট্রকূট শাখা এবং বাংলার পালরাজগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়।

অমোঘবর্ষ শান্তিপ্রিয় এবং ধর্ম ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি 'কবিরাজ মার্গ' নামে কানাড়ী ভাষায় অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং বহু সাহিত্যিক তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। তিনি শেষ জীবনে জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কথিত আছে যে প্রজাদের এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার্থে তিনি দেবী মহালক্ষ্মীর নিকট নিজ অঙ্গুলি কর্তন করিয়া উৎসর্গ করেন। তিনি জৈন ও হিন্দু উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নিমাইসাধন বসু

অম্বট্‌ঠ গোত্র সম্ভূত কয়েকজনের নাম পিটকাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। অম্বট্‌ঠ মানব নামে যিনি খ্যাত হইয়াছিলেন তিনি আচার্য পোক্‌খরসাদির শিষ্য ছিলেন। জাতিভেদ বিষয়ে তাঁহার সহিত বুদ্ধের আলোচনা হইয়াছিল। অম্বট্‌ঠ মানব বুদ্ধের উপাসক হইয়াছিলেন বলিয়া পিটকাদি গ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু পিটকে সুর অম্বট্‌ঠ বলিয়া আর একজনের নাম দৃষ্ট হয়। তিনি বুদ্ধোপাসকদের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

অম্বপালী, আম্রপালী বৈশালীর রাজোদ্যানে ইঁহার জন্ম হয় এবং উদ্যানপালক তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন। আম্রোদ্যানপালকের কন্যা হওয়ার জন্য তাঁহার নাম হয় অম্বপালী। যৌবনে তিনি এইরূপ অনিন্দ্যসুন্দরী ও রূপলাবণ্যবতী হন যে বিভিন্ন দেশের রাজকুমারেরা তাঁহাকে স্ত্রীরূপে পাইতে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি বিবাহ না করিয়া সভা-নর্তকী হন।

বৈশালীর বাগানে অম্বপালী বুদ্ধকে দর্শন করেন এবং তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে, লিচ্ছবিরাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বুদ্ধ এই বারবনিতার গৃহেই নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। অম্বপালী বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে একটি 'বিহার' দান করেন। নিজ পুত্রকে তথাগতের ধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া অম্বপালী সংসার ত্যাগ করিয়া দিব্যজ্ঞান অর্জন করিতে চেষ্টা করেন ; তিনি দেহের ক্রমধ্বংসশীল প্রকৃতি ও পার্থিব সকল বস্তুর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করেন ও অর্হত্ব লাভ করেন।

পালি পদ্যগ্রন্থ 'থেরীগাথা'য় ইঁহার অমূল্য জীবনদর্শন কবিত্বসমৃদ্ধ অতি মর্মস্পর্শী ভাবব্যঞ্জনায় বিধৃত আছে। এই গাথাগুলিতে তাঁহার করুণ আত্মস্মৃতি, প্রগাঢ় অনুভূতি ও অকপট আত্মনিবেদন মহিমান্বিত ও অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অম্বর রাজস্থানের জয়পুর জেলার একটি মহকুমা এবং মিউনিসিপ্যাল শহর। অম্বর জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইহা জয়পুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ১০।১১ কিলোমিটার (৬।৭ মাইল) উত্তর-পূর্বে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত।

১৯৬১ সালের জনগণনানুযায়ী অম্বর মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ৬৯৩২ (তন্মধ্যে পুরুষ ৩৬৯৬ জন ও নারী ৩২৩৬ জন ; স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৭৬ : ১০০০)।

অম্বরের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে শিবের অম্বিকেশ্বর নাম হইতে অম্বর নামের উৎপত্তি। মতান্তরে, অযোধ্যার অধিপতি অম্বরীষের নামানুসারে ইহার নাম অম্বর। লৌকিক বিশ্বাস এই যে অম্বর 'অম্বরিখান'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। *History and Culture of the Indian People,* vol. V গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে অম্বরের অপর নাম অমরপুর।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কচ্ছবাহ রাজপুতগণ এই রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করেন এবং সুসাবৎ

মিনা-দের প্রধানের নিকট হইতে অম্বর কাড়িয়া লন। অম্বর প্রায় ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ রাজপুতানার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অম্বরে পৌঁছাইয়া বিজয়সিংহকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু অজিতসিংহ, দুর্গাদাস ও রাজা জয়সিংহ কচ্ছবাহ প্রভৃতি মেবারের মহারানা অমরসিংহের সহিত মিলিত হইয়া অন্যান্য কতিপয় রাজ্যের সহিত অম্বরও অধিকার করেন।

রাজপুতরীতির ভাস্কর্যে গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদের পরেই প্রাচীন অম্বর রাজপ্রাসাদের স্থান। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ কর্তৃক ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং মির্জা রাজা প্রথম জয়সিংহ কর্তৃক ইহাতে বহুবিধ সংযোজন সাধিত হয়। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ কর্তৃক সুদৃশ্য তোরণটি নির্মিত হইলে ইহার নির্মাণকার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজপ্রাসাদ ব্যতীত শ্রীজগৎ সরোমান্‌জীর মন্দির, অম্বিকেশ্বর মন্দির, সীতাদেবীর মন্দির এবং আরও কতিপয় মন্দির প্রাচীন রাজপুত স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শনরূপে আজিও দণ্ডায়মান।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Rajputana*, Calcutta, 1908 ; R. C. Majumdar, ed. *History and Culture of the Indian People*, vol. V : *The Struggle for Empire*, Bombay, 1957 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962—1961 Census, Final Population Totats*. Delhi, 1962 ; *The Cambridge History of India* : vol. IV : *Mughal India*. Delhi, 1957.

দিনেনকুমার সোম

অম্বরনাথ মহারাষ্ট্র রাজ্যের থানা জেলার অন্তর্গত একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। অম্বরনাথ রেল স্টেশন বোম্বাই শহর হইতে অনধিক ৬১ কিলোমিটার (৩৮ মাইল) দূরে, মধ্য-রেলপথের বোম্বাই-পুনা লাইনে অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনানুসারে শহরের মোট লোকসংখ্যা ৩৪৫০৯ জন (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৮৫ জন); পুরুষ ১৯১৪৫ জন ও নারী ১৫৩৬৪ জন।

'ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোম্পানি'র অন্যতম বৃহৎ দেশলাই কারখানা অম্বরনাথে অবস্থিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রকল্প হিসাবে ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'সেন্ট্রাল মেশিন টুলস্ প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি' নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানায় যন্ত্রনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয় এবং প্রতি বৎসর একশত শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করে। এখানকার রাসায়নিক কারখানাটিও উল্লেখযোগ্য।

শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি পাথরের মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রের একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে (৯৮২ শকাব্দ) চিত্তরাজাদেবপুত্র মম্বানীরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মম্বানীরাজা ছিলেন কল্যাণের চালুক্যগণের কোঙ্কন-মণ্ডলের মহামণ্ডলেশ্বর বা সামন্তরাজা। মন্দিরটি দুইটি পরস্পরসংলগ্ন গৃহে বিভক্ত। প্রথম গৃহটি বা মণ্ডপ অথবা অন্তরালটি ২·১ বর্গমিটার উপর প্রতিষ্ঠিত। উত্তর এবং দক্ষিণে দুইটি অলিন্দ সংবলিত চতুষ্কোণাকৃতি অলংকৃত প্রবেশদ্বার আছে। প্রতিটি ভিন্ন প্রকার চারিটি স্তম্ভ ভিতর হইতে মণ্ডপগৃহটির উপরি-ভাগকে ধারণ করিয়া আছে। অজন্টা ও এলুরুর শেষ যুগের স্থাপত্যরীতির আদর্শে নির্মিত এই স্তম্ভগুলির মানব-পশু-পক্ষী-লতা-পত্রাদি অলংকৃত কারুকার্য কালপ্রভাবে ম্লান হইয়া গিয়াছে। গর্ভগৃহটির দেবস্থানে একটি শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। গর্ভগৃহসংবলিত গৃহটি (অর্থাৎ বিমানটি) দাক্ষিণাত্য শিখর রীতির মন্দিরের অনুরূপ। বহির্গাত্র চালুক্যরীতির অতি অলংকৃত ভাস্কর্যপূর্ণ। তন্মধ্যে পার্বতী-মহেশ্বর মূর্তি ও বৃহৎ কালিকা মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। আকারে বৃহৎ এই অতি অলংকৃত মন্দিরটি পশ্চিম-ভারতের চালুক্যরীতির মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাঘ মাসে শিবরাত্রির মেলায় এই মন্দিরসংলগ্ন স্থানে প্রচুর জনসমাগম হইয়া থাকে।

প্রণবরঞ্জন রায়

অম্বর, মালিক (১৫৪৯-১৬২৬ খ্রী) নগণ্য হাবসী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং তাঁহার কর্মক্ষমতা ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। আহমদনগর রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থায় তিনি ক্রমাগত দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালিত করিয়া ইহার বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করেন এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ আকবর কর্তৃক আহমদ-নগর অধিকারের অনতিকালমধ্যে তিনি দ্বিতীয় মুরতাজা-নিজাম-শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া এই রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার ও প্রধানমন্ত্রী। পরাক্রমশালী মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তিনি যে কেবল নিজ দেশের স্বাধীনতা

উদ্ধার করিতে ও অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে, শক্তিশালী রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিয়া দাক্ষিণাত্যে তাহাদের অগ্রগতিও রুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গরিলা-বাহিনী ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ।

অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ব্যতীত তিনি সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞরূপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রজাদের হিতসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রজা-কল্যাণমূলক রাজস্বনীতি ছিল দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শাসনকালীন ও পরবর্তী কালের রাজস্বনীতির মূলভিত্তি। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যোৎসাহিতা এবং স্থপতি-বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

অম্বরীষ নাভাগের পুত্র পরম বিষ্ণুভক্ত রাজর্ষি। ইঁহার রক্ষার জন্য বিষ্ণু সুদর্শনচক্র নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক সময় রাজা দ্বাদশীর ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবসরে দুর্বাসা রাজার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া স্নানার্থ গমন করেন। এদিকে পারণার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে দেখিয়া রাজা জলমাত্র পান করিয়া পারণা রক্ষা করেন। দুর্বাসা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শাস্তিবিধানার্থ জটা উৎপাটন করিয়া এক কৃত্যা নির্মাণ করিলে সুদর্শনচক্র সেই কৃত্যা ধ্বংস করিয়া দুর্বাসার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ব্রহ্মা ও শিবের নিকট আশ্রয় না পাইয়া বিষ্ণুর নির্দেশে দুর্বাসা অম্বরীষের শরণাপন্ন হইলেন এবং অম্বরীষের অনুনয়ে সুদর্শনচক্র শান্ত হইল। তখন রাজা মুনিকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলেন (ভাগবত ৯।৪-৫)।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অম্বষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে (মনুসংহিতা ১০।৮ প্রভৃতি) ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যজাতীয়া নারীর গর্ভে জাত একটি সংকর বা সংকীর্ণ বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার অনুলোম বিবাহের ফলে জন্ম বলিয়া অম্বষ্ঠ অনুলোমজ। ব্রাহ্মণের পক্ষে অম্বষ্ঠ একান্তর পুত্র, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা বর্ণের মধ্যে একটি মাত্র বর্ণের (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের) ব্যবধানে ইহার উৎপত্তি। অম্বষ্ঠ শুদ্ধ বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চজাতীয়। মিশ্রবর্ণ হইলেও মিশ্রিত উভয়বর্ণের দ্বিজত্ববশতঃ ইহারাও দ্বিজতুল্য ও দ্বিজধর্মা। ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হয়। ইহাদের বৃত্তি চিকিৎসকতা (মনু ১০।৪৭)।

শিশিরকুমার মিত্র

অম্বিকা কালনা কালনা দ্র

অম্বিকাচরণ গুহ (১৮৪৩-১৯০০ খ্রী) হোগোল কুঁড়িয়া (বর্তমান মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট) গুহ পরিবারের অভয়চরণ গুহের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ৮।৯ বৎসর বয়সকালে টানা পাখার দড়ি ধরিয়া ঝুলিবার কালে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতে ৩।৪ মাস অজ্ঞান অবস্থায় কাটান। ইংরাজ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসিত হন ও তাঁহার উপদেশমত বাড়িতেই পড়াশুনা করেন ও ব্যায়াম, বিশেষ করিয়া ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। ঐ বয়সের বালকের পক্ষে স্বাস্থ্য অতিরিক্ত ভাল থাকার দরুন, সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও কোনরূপ অঙ্গহানি হয় নাই। ব্যায়াম অভ্যাসের ইহাই হইল উৎস।

পিতার অপেক্ষা পিতামহ শিবচরণ গুহের উৎসাহে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নিজ বাটীতে আখড়া স্থাপিত হয়।

কুস্তিতে তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন তৎকালীন মথুরার বিখ্যাত পালোয়ান কালীচরণ চৌবে। তৎকালীন মল্লদের সহিত নিজ আখড়ার মল্ল-প্রতিযোগিতায় দক্ষতার দরুন ভারতব্যাপী মল্লজগতে অম্বুবাবু বা রাজাবাবু নামে পরিচিত হন। তিনি কুস্তি ছাড়াও শৌখিন সেতারশিল্পী এবং দক্ষ অশ্বারোহী হিসাবে খ্যাত হন। অম্বুবাবু প্রচুর নূতন কুস্তির দাঁও প্রচলন করেন। তাঁহার বহু শিষ্য কুস্তিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট কুস্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন। অম্বুবাবুর উৎসাহে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মন হইতে ব্যায়ামবিমুখতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। গুহ পরিবারে কুস্তির চর্চা চারি পুরুষ ধরিয়া অব্যাহত আছে।

যতীন্দ্রচরণ গুহ

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২ খ্রী) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সেনদিয়াতে বিখ্যাত উকিল ও জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদারের জন্ম হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিবার পর মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা করিতে করিতে তিনি এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে পিপ্‌ল্‌স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা এবং উহাকে ভারত সভার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ভারত সভার প্রাদেশিক সম্মিলনের বর্ধমান অধিবেশনে (১৮৯৯ খ্রী) এবং কলিকাতা অধিবেশনে (১৯১০ খ্রী)

তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত সভার সভাপতি ছিলেন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার অধ্যক্ষ সভার সভাপতি হন। জেলা বোর্ড ও পৌরসভার সদস্য ও সভাপতি হিসাবেও তিনি বহুদিন কার্য করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্যর সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অম্বুবাচী ঋতুমতী পৃথিবী অথবা যে সময় পৃথিবী ঋতুমতী হন সেই সময়। বঙ্গ দেশে প্রচলিত মত অনুসারে সূর্য মৃগশিরা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে অবস্থান করেন তখন অর্থাৎ ৬ হইতে ১০ আষাঢ়ের মধ্যে অম্বুবাচীর কাল। অম্বুবাচীতে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, অধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ। মতান্তরে এই সময় যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজের পক্ষে পক্কান্ন বর্জনীয়। বিধবাদের মধ্যে এই আচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চাষীরাও এই উপলক্ষে সমস্ত রকম চাষের কাজ বন্ধ রাখে এবং কোথাও কোথাও এই উপলক্ষে কিছু কিছু আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। আসামের কামাখ্যা-দেবীর মন্দিরে এই সময় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যায় ইহা রজ নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে ইহা একটি বড় উৎসব। তবে সেখানে ইহার অনুষ্ঠানকাল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি হইতে ২ আষাঢ় পর্যন্ত।

দ্র প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অম্ল অ্যাসিড দ্র

অয়ন পথ, গতি। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গতি উত্তরায়ণ (মাঘ হইতে আষাঢ়) ও দক্ষিণায়ন (শ্রাবণ হইতে পৌষ) নামে পরিচিত।

খগোলে বিষুববৃত্তের সহিত ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ ২৩°২৭´ পরিমিত কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থিত। ক্রান্তি-বৃত্তের এই কৌণিকত্বের জন্য বৎসরের ৬ মাস কাল সূর্য বিষুববৃত্তের উত্তরে থাকে এবং ৬ মাস দক্ষিণে অবস্থিত থাকে। ২২ ডিসেম্বর পরম দক্ষিণ স্থান হইতে রবি উত্তরাভি-মুখী হইয়া ২১ মার্চ বিষুববৃত্ত অতিক্রমপূর্বক উত্তরগোলার্ধে প্রবেশ করে এবং ২১ জুন উহার উত্তর-অপক্রম পরমত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ৬ মাস কালকে উত্তরায়ণ বলে। ইহা দেবগণের দিবাভাগ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। আবার ২১ জুন হইতে রবি দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ২৩ সেপ্টেম্বর বিষুববৃত্ত পুনরায় অতিক্রমকরতঃ ২২ ডিসেম্বর তারিখে পরম দক্ষিণস্থানকে অবলম্বন করে। এই ৬ মাস দক্ষিণায়ন বলিয়া কথিত এবং ইহা দেবগণের রাত্রিভাগ বলিয়া বর্ণিত। রবির অয়নান্ত-বিন্দুদ্বয়ের অতিক্রমকালকে যথাক্রমে উত্তরায়ণদিবস (২২ ডিসেম্বর) ও দক্ষিণায়নদিবস (২১ জুন) বলে এবং সম্পাৎ বা ক্রান্তিপাত -বিন্দুদ্বয় অভিহিত করিবার জন্য বাসন্ত ক্রান্তিপাত বা মহাবিষুব (২১ মার্চ) এবং শারদ ক্রান্তিপাত বা জলবিষুব (২৩ সেপ্টেম্বর) শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়।

বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গের সংযোগস্থানকে সম্পাৎ বা ক্রান্তিপাত -বিন্দু বলে। সম্পাৎ-বিন্দুদ্বয় নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে স্থির নহে। উহারা পশ্চাদ্দিকে বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা করিয়া অপসৃত হইয়া থাকে এবং এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় ২৬০০০ বৎসরে একবার সম্পূর্ণ চক্র আবর্তন করে। ইহাকে অয়নচলন বলে। প্রকৃতপক্ষে অয়নচলন অর্থে অয়নান্ত বিন্দুদ্বয়ের চলন। ক্রান্তিপাত-বিন্দুদ্বয়ের পশ্চাদপসরণকে ভাস্করাচার্য সম্পাৎ-চলন আখ্যা দিয়াছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই একার্থবোধক, সেইজন্য অয়নচলন শব্দটি উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হয়। এই অয়নচলন ব্যাপারটি জ্যোতিষশাস্ত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং ইহা গণিতজ্যোতিষ ও ফলিতজ্যোতিষের মধ্যে এক বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেকস্থলে আকাশস্থ বিশেষ বিশেষ তারকার অবস্থান উল্লিখিত আছে। তথায় তৎকালীন অয়নবিন্দু বা সম্পাৎ-বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের অবস্থানের উল্লেখ থাকায় অধুনাজাত অয়নচলনের গতিবেগকে ভিত্তি করিয়া উক্ত সাহিত্যরচনার কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে সম্ভবতঃ হিপারকাস-ই (১২৯ খ্রীষ্টপূর্ব) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, সম্পাৎ-বিন্দু চলমান। তৎকালীন বাসন্তপাত-বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বহু তারকার অবস্থান লিপিবদ্ধ করেন। পরে টলেমির সময়েও (১৩৭ খ্রী) ঐ তারকাগুলির অনুরূপ অবস্থান নির্ণীত হয়। এই উভয় নির্ণয়ের পার্থক্যের দ্বারা অয়নচলনের গতিবেগ তৎকালে নিরূপিত হয় বৎসরে ৩৬ বিকলা। ইহা অবশ্য প্রকৃত গতিবেগ অপেক্ষা অনেক কম। হিপারকাসের প্রকৃত কাল এবং তারকার অবস্থান সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই বোধ করি এই ভ্রমাত্মক বেগ নিরূপণের কারণ। আরবীয়

জ্যোতির্বিদ্ আল বাট্টানি (৮৫৮ খ্রী) ৫৪ বিকলা গতিবেগ উল্লেখ করিয়াছেন।

অয়নান্ত-বিন্দুদ্বয় এবং সম্পাৎ-বিন্দুদ্বয় যে গতিশীল, ইহা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের নিকটেও অতি প্রাচীন কালেই অনুভূত হইয়াছিল। বেদাঙ্গজ্যোতিষ রচনাকালে (১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্ব) ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণ হইত এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্ধভাগে দক্ষিণায়ন হইত, সেইজন্য তৎকালে ধনিষ্ঠাই চক্রের প্রথম নক্ষত্র। পরে মহাভারত রচনাকালে নক্ষত্রচক্র শ্রবণাদি হইয়া যায়। এক নক্ষত্র বা ১৩°২০´ অয়নচলন প্রায় ৯৬০ বৎসরে সম্পন্ন হয়। সুতরাং মহাভারতের কাল বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল অপেক্ষা প্রায় ৯০০ বৎসর পরবর্তী। বরাহমিহির (প্রায় ৫৫০ খ্রী) বলিয়াছেন যে প্রাচীন কালে অশ্লেষার্ধে দক্ষিণায়ন হইত, কিন্তু তাঁহার কালে পুনর্বসু নক্ষত্রে হইতেছে। তিনি দেড় নক্ষত্রবিভাগের অধিক অয়নচলন লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন উক্তিটির কাল না জানাতে অয়নচলনের গতিবেগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য বিষ্ণুচন্দ্র (৫৭৮ খ্রী), শ্রীষেণ, মুঞ্জালভট্ট (৯৩২ খ্রী) ও ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রী) অয়নচলন সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং উহার গতিবেগও সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করেন। ভাস্করাচার্যের নিরূপিত বার্ষিক গতিবেগে এক বিকলারও কম ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

বাসন্ত ক্রান্তিপাত-বিন্দুকে আদিবিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়া যে গণনা হয়, তাহাকে সায়ন গণনা বলে এবং আকাশস্থ কোনও তারকাকে স্থির আদিবিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া যে গণনা, তাহা নিরয়ণ। বস্তুতঃপক্ষে সম্পাৎ-বিন্দুদ্বয় ও অয়নান্ত-বিন্দুদ্বয় উহাদের যেটি হইতেই গণনা করা যাউক, তাহা সায়ন গণনা হইবে এবং উহা হইতে লব্ধ বর্ষমান ৩৬৫·২৪২২ দিনাত্মক হইবে। তদ্রূপ যে কোনও স্থির তারকা হইতে অথবা সম্পাৎ-বিন্দুর কোনও বিশেষ বৎসরের অবস্থান হইতে যে গণনা, উহা নিরয়ণ এবং লব্ধ বর্ষমান ৩৬৫·২৫৬৩৬ দিনাত্মক। সায়ন গণনায় ঋতুসমূহ স্থির, কিন্তু তারকাগুলির অবস্থান পরিবর্তনশীল; নিরয়ণ গণনায় নক্ষত্রচক্র স্থির কিন্তু ঋতুসমূহ পরিবর্তনশীল। পাশ্চাত্য ফলিত-জ্যোতিষ সায়নভিত্তিক। কিন্তু ভারতীয় ফলিতজ্যোতিষ মূলতঃ নিরয়ণ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ক্রান্তিপাত বিন্দুটি ভারতীয় জ্যোতিষের আদিবিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে অপসৃত হইতেছে। এই অপসরণের পরিমাণ বা ক্রান্তিপাত-বিন্দু ও ভারতীয় আদিবিন্দুর পার্থক্যকে অয়নাংশ বলা হয়।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট (৪৯৯ খ্রী) বা ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রী) মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে জ্যোতির্বিদ্যা রচনা করিলেন, তাহা মূলতঃ সায়ন; কেননা তৎকালে সায়ন ও নিরয়ণের পার্থক্য বা অয়নচলন সম্বন্ধে সম্যক্ কোনও জ্ঞান লব্ধ হয় নাই। অয়নচলন সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিস্তার লাভ করিলে অবশ্য পরে অয়নাংশের উল্লেখ দ্বারা দুই পদ্ধতির মধ্যে একটি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু তথাপি সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে না পারিয়া এই প্রকার এক কল্পনা করা হয় যে, যদিও সম্পাৎ-বিন্দুদ্বয় পশ্চাদপসরণ করিতেছে, কিন্তু উহারা অধিক দূর গমন করিবে না। এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত (কাহারও মতে ২৭°, কাহারও মতে ২৪°) যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে এবং অপর দিকে পুনরায় উক্তরূপ সীমা পর্যন্ত যাইবে এবং এইভাবেই আন্দোলিত হইতে থাকিবে। ইহাকে অয়নদোলন মতবাদ বলে। সূর্যসিদ্ধান্ত এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে বার্ষিক অয়নগতি ৫৪ বিকলা, দোলনসীমা ২৭° এবং উহা অতিক্রমের কাল ১৮০০ বৎসর। কল্যাদি হইতে আর্যভটের কাল ৩৬০০ বৎসর। সুতরাং কল্যাদিতে সায়ন নিরয়ণের ঐক্য কল্পনা করিলে আর্যভটের কালে (৩৬০০ কল্যব্দে) পুনরায় সেই ঐক্য লব্ধ হইল এবং আর্যভট-রচিত জ্যোতির্বিদ্যা সায়ন কি নিরয়ণ, তাহা সহজে বুঝিবার উপায় রহিল না। অয়নদোলন মতবাদ সূর্যসিদ্ধান্তে ছিল না, উহা পরবর্তী কালের কোনও জ্যোতির্বিদের সংযোজনা বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। পাশ্চাত্য দেশেও টলেমির সময়ে এইরূপ এক মতবাদ (ট্রেপিডেসন) প্রচলিত হইয়াছিল; উহাতে দোলনসীমা মাত্র ৮° অংশ। পরবর্তী কালে জ্যোতিষিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই ভ্রান্ত অয়নদোলন মতবাদ পরিত্যক্ত হয়।

সায়ন গণনার আদিবিন্দু (অর্থাৎ বাসন্ত বিষুববিন্দু) ও নিরয়ণ গণনার আদিবিন্দু এই উভয়ের পার্থক্য অয়নাংশ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে গৃহীত ভচক্রের আরম্ভস্থান হইতে বাসন্ত ক্রান্তিপাত-বিন্দুর অন্তরই অয়নাংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অয়নাংশের মান নির্দিষ্ট করিতে পারিলেই ভচক্রের আরম্ভস্থানও নির্ধারিত হইয়া যায়। অন্যথা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বীকৃত ভচক্রের আরম্ভস্থান যথাযথ নির্দেশিত করা খুবই দুরূহ কার্য। এই সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। সূর্যসিদ্ধান্তের অয়নদোলন মতবাদ অনুসারে অয়নাংশ গণনা করিলে ১৯৬৪ খ্রী ১৪ এপ্রিল তারিখে অয়নাংশের মান পাওয়া যায় ২১°৫৯′ এবং ইহাতে গৃহীত অয়নগতি ৫৪ বিকলা এবং লব্ধ শূন্যায়নাংশ বর্ষ ৪৯৯ খ্রী।

অয়নদোলন মতবাদ কতকগুলি শর্তাধীন, সেইজন্য উহা যেমন অবাস্তব, উহা হইতে লব্ধ অয়নাংশ এবং অয়নগতিও তদ্রূপ অবাস্তব। এই অয়নাংশের দ্বারা ভচক্রের আরম্ভ-স্থান অর্থাৎ সূর্যসিদ্ধান্তীয় মেষাদি বা অশ্বিন্যাদি হইতে প্রকৃত ক্রান্তিপাত বিন্দুর অন্তর নির্দেশিত হয় না। উহা সঠিক ভাবে নির্দেশ করিতে হইলে অয়নাংশের মান ২৩°৩৪´ গ্রহণ করিতে হয় এবং অয়নগতি ৫৮·৭ বিকলা লইতে হয়। এতল্লব্ধ শূন্যায়নাংশ বর্ষ ৫১৮ খ্রী। বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধান্তীয় ভচক্রারম্ভস্থান বা আদিবিন্দু তারকামণ্ডলীর মধ্যে স্থির নহে, উহারও সামান্য গতি (বৎসরে প্রায় ৮ বিকলা) আছে এবং কাজে কাজেই উহা সম্পূর্ণ নিরয়ণ নহে। ফলে প্রকৃত নিরয়ণ অর্থাৎ গতিহীন এক ভচক্র নির্দেশিত করা প্রয়োজন হইয়াছে এবং উহা করিতে গেলে আদিবিন্দুর পুনর্নির্ধারণ আবশ্যক। উহা করিতে গিয়া আদিতে অনেকে রেবতী তারকাকে ভচক্রের প্রথম বিন্দুতে স্থাপনপূর্বক পঞ্জিকা সংশোধন করিয়াছিলেন। এই রৈবতপক্ষ অনুসারে বর্তমানে অয়নাংশ ১৯°৩৩´, অয়নগতি ৫০ বিকলা এবং শূন্যায়নাংশ বর্ষ ৫৬০ খ্রী। এই রৈবত পক্ষ পণ্ডিতগণের সমর্থন লাভ না করায় উহা বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে চৈত্র পক্ষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। চৈত্র পক্ষ অনুসারে চিত্রা নক্ষত্রের ১৮০° অন্তরে আদিবিন্দু কল্পনা করা হয়। এতদনুসারে ১৯৬৪ খ্রী ১৪ এপ্রিল অয়নাংশের মান ২৩°২১´২৯´´ এবং বার্ষিক অয়নগতি ৫০·৩ বিকলা। ইহা হইতে লব্ধ শূন্যায়নাংশ বর্ষ ২০৭ শক বা ২৮৫ খ্রী। ভারতের প্রায় সর্বত্রই বর্তমানে এই চৈত্র পক্ষাশ্রিত অয়নাংশ অবলম্বনে সংস্কৃত পঞ্জিকাগুলির গণনাকার্য চলিতেছে। সায়ন গ্রহস্ফুট (বা গ্রহস্পষ্ঠ) হইতে এই অয়নাংশ হীন করিলে এই সকল পঞ্জিকায় উল্লিখিত নিরয়ণ গ্রহস্পষ্ঠ লাভ করা যায়।

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

অযোধ্যা উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার ফৈজাবাদ-অযোধ্যা মিউনিসিপ্যাল শহরের অংশ। সাধারণভাবে অযোধ্যা বলিতে অযোধ্যা শহরসহ উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের এক বৃহৎ অংশকেও বুঝায়। ইহা অবধ বা আউধ নামেও পরিচিত। অক্ষাংশ ২৬° ৪৮´ উত্তর, দ্রাঘিমা ৮২° ১৪´ পূর্ব। উত্তর রেলপথের লখনৌ-মোগলসরাই লুপ লাইনের অযোধ্যা স্টেশন, অযোধ্যা শহর হইতে প্রায় ২ কিলোমিটার (দেড় মাইল) দক্ষিণে; স্টেশনটি শহরের সহিত সিমেণ্টের রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। অযোধ্যা লখনৌ-গোরখপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর অবস্থিত এবং এই পথটি ফৈজাবাদের সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিয়াছে। অযোধ্যার পার্শ্ব দিয়া সরযূ (ঘর্ঘরা) নদী প্রবাহিত হইতেছে।

অযোধ্যা অতি পুরাতন স্থান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অযোধ্যার সূর্যবংশীয় রাজাদের বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। লোকস্মৃতিতে বিষ্ণুর অবতার রাজা রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যের সহিত অযোধ্যার নাম বিশেষভাবে জড়িত।

জৈন ঐতিহ্যানুযায়ী চতুর্বিংশ তীর্থংকরদের ত্রয়োবিংশ-জনই ইক্ষ্বাকুবংশীয় ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে স্বয়ং আদিনাথ বা ঋষভদেব এবং অন্যান্য চারি জন অযোধ্যাতেই জন্মগ্রহণ করেন।

অযোধ্যারাজ্যকে কোশলও বলা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী অযোধ্যা ব্যতীত শ্রাবস্তীতেও কোশলরাজদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ সাকেত এবং তাহার পরে শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী হয়। অযোধ্যা গুপ্তসাম্রাজ্যের একটি প্রধান নগরী ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তদের পতন হইলে এতদঞ্চল প্রথমে মৌখরীদের এবং পরে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ ভারতভ্রমণে আসেন। তাঁহার বিবরণী অনুসারে অযোধ্যায় তৎকালে বৌদ্ধধর্ম অতি প্রবল ছিল; এখানকার একশতটি বৌদ্ধমঠে তিন হাজারের অধিক মহাযানী এবং হীনযানী ভিক্ষু ছিল। এখানকার জনসাধারণ সদ্ব্যবহারপরায়ণ, সৎকর্মপ্রিয় এবং ব্যাবহারিক বিদ্যায় অনুরক্ত ছিল।

অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে অযোধ্যা প্রথমে যশোবর্মার এবং পরে গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর অযোধ্যা শ্রীবাস্তবদের ও তাহার পর কান্যকুব্জের গাহড়বাল শক্তির অধীন হয়। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গাহড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্র মুসলমানদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন এবং অযোধ্যা মুসলমান অধিকারে চলিয়া যায়। ক্রমশঃ অবধ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রাদেশিক রাজধানী হইয়া উঠে। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবধের শাসকের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পদের অধিকারী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

তোগলক রাজত্বে এতদঞ্চলে বার বার বিদ্রোহ ঘটে; ইহার ফলে শার্কীদের অধীনে জৌনপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং অযোধ্যা তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। অবিরত যুদ্ধের পরিণামে শার্কী বংশের অবসান ঘটিলে লোদীরা অবধকে তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের (১৫২৬ খ্রী) পর অবধ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্য বাবর একবার অযোধ্যায় অল্প কয়েক দিন বাস করেন। তিনি রামের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ 'জনমস্থান' মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে বাবরের মসজিদ রূপে খ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করান। মসজিদটির নির্মাণকার্যে বিধ্বস্ত মন্দিরের উপকরণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শের শাহ্ কর্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়ের পর অবধ পুনরায় আফগান অধিকারে চলিয়া যায়। শের শাহ্ এখানে টাঁকশাল স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে একাধিক মোগল সম্রাটের রাজত্বকালেও এই টাঁকশালটি চালু ছিল।

আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী আকবরের রাজত্বকালে অবধ্-কা-হাবেলী নামে পরিচিত বর্তমানের অযোধ্যা শহর এবং উহার শহরতলী, অবধ সুবার অন্তর্গত অবধ সরকারের দুইটি মহল ছিল; তৎকালে এই দুইটি মহলে কর্ষিত জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩৮৬৫০ বিঘা। অবধ প্রদেশে কোনও পদস্থ কর্মচারী ছিলেন না বলিয়া আকবর কৃষক ও সৈন্যদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখিবার জন্য ১৫৮০-১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াজির খানকে অবধের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ইংরেজ বণিক উইলিয়াম ফিন্‌চ (১৬০৮-১৬১১ খ্রী) তাঁহার বিবরণীতে অযোধ্যাকে বাণিজ্যসমৃদ্ধ স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এই স্থানের গণ্ডারশৃঙ্গ নির্মিত ঢাল এবং পানপাত্র অত্যুৎকৃষ্ট ছিল।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রী) অবধের তদানীন্তন শাসনকর্তা সাদৎ খান বুরহান-উল্-মুল্‌ক (ক্ষমতালাভ ১৭২৪ খ্রী) এতদঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাদৎ খান উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আমির ছিলেন। সাদৎ খানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদর জঙ্গ্ উত্তরাধিকারী হিসাবে অযোধ্যার শাসনকর্তা হন। এই সময়ে (১৭৩৯ খ্রী) নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন। সফদর জঙ্গ্ নাদির শাহ্‌কে মুদ্রায় ও বিভিন্ন দ্রব্যে মোট দুই কোটি টাকার ভেট প্রদান করিতে বাধ্য হন। সফদর জঙ্গ্ অযোধ্যা হইতে ফৈজাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এলাহাবাদ ও রোহিলখণ্ড প্রদেশও ক্রমশঃ অবধ সুবার অন্তর্গত হয়। সফদর জঙ্গের পর তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ্ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের বিপক্ষে ও আহমদ শাহ্ আবদালীর পক্ষে যোগদান করেন। তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রী) মারাঠাদের পরাজয়ের পর ইংরেজদের নিকট পরাজিত সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে আশ্রয় দেন। ইংরেজদের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া বাংলার নবাব মীরকাসীমও তাঁহার নিকট আশ্রয় লন এবং তিনি তাঁহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমর্থন করেন। বক্সার-এর যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রী) ইংরেজদের নিকট তাঁহাদের তিন জনের সংযুক্ত বাহিনী পরাজিত হইলে দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু সুজাউদ্দৌলা তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে ইংরেজ বাহিনী লখনৌ এবং এলাহাবাদ অধিকার করিলে সুজাউদ্দৌলা তাঁহাদের সহিত শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি করিতে বাধ্য হন (১৭৬৫ খ্রী)। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন নীতি অনুযায়ী অবধকে বঙ্গ এবং উত্তর ভারতের মধ্যবর্তী (buffer) রাজ্যরূপে রাখিবার উদ্দেশ্যে সুজাউদ্দৌলাকে কারা এবং এলাহাবাদ ব্যতীত অবধের অবশিষ্ট অঞ্চল প্রত্যর্পণ করা হয়; সুজাউদ্দৌলা অবশ্য যুদ্ধের ক্ষতিপূরণরূপে কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অবধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফুদ্দৌলার সময়ে রাজধানী লখনৌতে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে কোম্পানি আসফুদ্দৌলাকে তাঁহার রাজস্বের এক বৃহদংশ হইতে বঞ্চিত করেন। ইংরেজ গভর্নর হেস্টিংস তাঁহার নিকট নানা রকমে টাকার দাবি করেন। আসফুদ্দৌলা কোম্পানিকে প্রতিশ্রুত টাকা না দিতে পারায় হেস্টিংস বেগমদের (অর্থাৎ নবাবের মাতা ও পিতামহীর) প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের সম্পত্তি ও ধন আত্মসাৎ করিতে তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই সম্পত্তি অধিকার করিয়া নবাব কোম্পানিকে দেয় টাকা দিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌কে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবধকে কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে বহু তালুকদার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন; অবিবেচনা-প্রসূত কার্যের ফলে পরিবেশ অশান্ত হইয়া উঠে এবং এতদঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়।

অবধ অঞ্চল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। কয়েকজন ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত তালুকদার বিদ্রোহ করেন এবং তাঁহাদের যে সমুদায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহা জোর করিয়া দখল করেন। এই অঞ্চল হইতে ইংরেজ শাসন প্রায় সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়। অবশেষে বিদ্রোহ দমন হইলে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইংরেজ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অযোধ্যায় রাম-সীতা প্রভৃতির স্মৃতিবিজড়িত বহু মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে জনমস্থান-এ রাম জন্মগ্রহণ করেন; বর্তমানে এই স্থানে রাম-সীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রেতাকা ঠাকুর -এর মন্দির অঞ্চলে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন; এখানকার বর্তমান মন্দিরটি (কালেরাম কা মন্দির) তিন শতাব্দী পূর্বে কুলুর রাজা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অহল্যাবাঈ ইহার উন্নতিসাধন করেন। কথিত আছে যে, কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাচীন মূর্তি ঔরঙ্গজেব নদীতে নিক্ষেপ করেন, ঐগুলি উদ্ধার করিয়া নবনির্মিত মন্দিরাভ্যন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

একমাত্র একাদশী দিবসে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত নগেশ্বরনাথ (মহাদেব) -এর মন্দিরটি কুশ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হনুমানগড়িতে হনুমানের একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরেই সর্বাপেক্ষা বেশি লোকসমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরটি বৃহৎ ও দুর্গবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের মধ্যে সীতা কা রসোই (সীতার রন্ধনশালা), বড়া আস্থান (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নির্বাসনান্তে প্রত্যাবর্তনের পর রামের অভিষেকস্থান), রত্নসিংহাসন, রং-মহল, আনন্দ-ভবন, (প্রবাদ অনুযায়ী কৌশল্যা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), কৌশল্যা-ভবন, ক্ষীরেশ্বরনাথ (শিব) -এর মন্দির, শিশ্-মহল মন্দির, কৃষ্ণের মন্দির, উমা দত্-এর মন্দির, তুলসী চৌরা (লোকশ্রুতি অনুসারে 'রামচরিতমানস' রচনা আরম্ভের স্থান), জানকী-তীর্থ, চন্দ্রহরি, ধর্মহরি, স্বর্গদ্বার ঘাট, রামঘাট, সুগ্রীবকুণ্ড, মণিরাম কী ছাউনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্বর্গদ্বার ঘাটের নিকটে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিয়া ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত মসজিদটিও বিধ্বস্তপ্রায়। নূতন মন্দিরগুলির মধ্যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমাওয়ান-এর রাজা কর্তৃক নির্মিত আমাওয়ান মন্দিরটি দর্শনযোগ্য।

মণিপর্বত নামে খ্যাত ২০ মিটার (৬৫ ফুট) উচ্চ টিলাটি কোনও বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। রামকোটের দক্ষিণ-পূর্বে যে দুইটি ছোট টিলা আছে, তাহার একটির নাম সুগ্রীব পর্বত; কানিংহ্যামের মত অনুসারে দুইটি টিলাই বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।

অযোধ্যাতে যে পঞ্চ তীর্থংকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জৈনদের বিশ্বাস, তাঁহাদের (আদিনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্দনাথ, অনন্তনাথ এবং সুমতিনাথের) মন্দিরগুলি দিগম্বর জৈনদের নিকট অতি পবিত্র। অজিতনাথের নামে উৎসর্গীকৃত শ্বেতাম্বর জৈনদেরও একটি মন্দির আছে।

সুমিত্রাঘাটের নিকটে ব্রহ্মকুণ্ডে শিখদের একটি ধর্মস্থান আছে; ঐতিহ্যানুসারে গুরু নানক এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইখানে একটি লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

মণিপর্বতের নিকটে সেঠ্ এবং জব্-এর সমাধি বলিয়া কথিত দুইটি সমাধি, থানার নিকটে নোয়া-র সমাধি বলিয়া কথিত ৮ মিটার বা (৯ গজ) দীর্ঘ একটি সমাধি, শাহ্-জুরান ঘোরির সমাধি, নৌরাহ্নি খুর্দ্ মক্কা মসজিদ, কবীর-টিলায় অবস্থিত খ্বাজা হাথি-র সমাধি, মখ্দুম্ শেখ ভিখ্খা, শাহ্-সামান্, খারিদ্-রস্ এবং শাহ্ চাপ্-এর মসজিদগুলি মুসলমানদের নিকট পবিত্র।

অযোধ্যায় কয়েকটি মেলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রাবণের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিবস হইতে শ্রাবণ ঝুলার মেলা আরম্ভ হয়; বিভিন্ন মন্দির হইতে মূর্তিগুলি শোভাযাত্রা করিয়া মণিপর্বতে লইয়া যাওয়া হয়। চৈত্র মাসে রামনবমীর মেলা এবং কার্তিক-পূর্ণিমার মেলাও উল্লেখযোগ্য। কার্তিকের শুক্লপক্ষের একাদশীতে পঞ্চক্রোশ-পরিক্রমা হয়; ইহার পূর্বে দুই দিবস ধরিয়া চতুর্দশক্রোশ পরিক্রমা হয়।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. I-VI, IX, Part I, Bombay, 1951-1963; *The Cambridge History of India*, vols. I-VI, Delhi; E. B. Joshi, *Uttar Pradesh District Gazetteers: Faizabad*, Lucknow, 1960.

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (?-১৮৭৩ খ্রী) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যে ব্রতী হন ও আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য হিসাবে কার্য করিতে

থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমযুগের আচার্যগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ছিলেন। ১৮৬৫-১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ও ১৮৬৯-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সুবক্তা, সুলেখক ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তদ্‌রচিত গ্রন্থ: 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৮৭০ খ্রী)।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৯৫, কলিকাতা, ১৩৬৩।

যোগেশচন্দ্র বাগল

অযৌন ও যৌন জনন (asexual and sexual reproduction) উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীজগতে যৌন এবং অযৌন— এই দুই রকমের প্রজনন-ব্যবস্থা দেখা যায়। যৌন মিলন ব্যতিরেকে যে প্রজনন হয়, তাহাকে অযৌন প্রজনন বলে এবং যৌন মিলনের ফলে প্রজননকে যৌন প্রজনন বলা হয়। অযৌন প্রজননে দুইটি বিভিন্ন কোষ (গ্যামিট) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় না। একটি কোষই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। অ্যামিবা, ব্যাক্টিরিয়া, প্যারামিসিয়া প্রভৃতির এইভাবেই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঈস্টের মত অঙ্কুরোদ্গমের দ্বারাও কেহ কেহ বংশবৃদ্ধি করে। স্পঞ্জ, হাইড্রা প্রভৃতির মূল দেহ হইতে অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হইবার পর সেইগুলি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া পৃথক পূর্ণাঙ্গ জীবের আকৃতি পরিগ্রহ করে। উদ্ভিদ্‌জগতেও অঙ্কুর, কোরক, কন্দ— এমন কি, বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখা হইতে নূতন উদ্ভিদ্‌ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অযৌন পন্থায় উৎপাদিত জীব ও উদ্ভিদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে ক্রমশঃ উৎকর্ষতার অবনতি ঘটিতেই দেখা যায়। যৌন প্রজননে দুইটি কোষ (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজননক্রিয়ার সূত্রপাত করে। ইহাতে পিতা ও মাতা— উভয়ের জৈবপক্ষ মিলিত হইবার ফলে উভয়ের গুণাবলীই একত্রিত হয়। কাজেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুণাবলী বিকশিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। 'প্রজনন' দ্র।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অরণ্যষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠী। এই ষষ্ঠী জামাইষষ্ঠী নামে অধিকতর পরিচিত। সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই দিনে রমণীদের বনে গমন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর পূজা ও ফলমূল আহারের ব্যবস্থা আছে। অনেক পুত্রবতী জননী এই উপলক্ষে ষষ্ঠীব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রতকথায় জনক-জননী কর্তৃক পুত্রের সকল রকম বায়না পূরণ করার উল্লেখ আছে। তদনুসারে জননীরা আজও সন্তানদের বায়না পূরণ করিয়া থাকেন— বিশেষ করিয়া জ্যৈষ্ঠী শুক্লষষ্ঠীতে সন্তানদের এবং সন্তানতুল্য জামাতাদের সুখাদ্য ও বস্ত্রাদির দ্বারা সন্তোষ বিধানের বন্দোবস্ত করেন। ষষ্ঠীদেবীকে যে সমস্ত ফলমূল ও মিঠাই উপহার দেওয়া হয় তাহার সংস্কৃত নাম বায়ন— মূলতঃ তাহারই অংশ বায়না বা বাটা নামে জামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে ব্রত বা পূজার অনুষ্ঠান সর্বত্র দেখিতে পাওয়া না গেলেও সন্তান-সন্ততিকে, বিশেষতঃ জামাতাকে, আপ্যায়ন করিবার প্রথা সারা বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অরন্ধন আনুষ্ঠানিক রন্ধনবর্জন। পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি অরন্ধনের দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দিন উনানের ভিতর সিজ বা মনসা গাছের ডাল রাখিয়া মনসাপূজা করা এবং পূর্বরাত্রে রান্না করা বাসি ভাত খাওয়ার প্রথা আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আশ্বিনসংক্রান্তিতেও অরন্ধনের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই দিন দুঃখপ্রকাশার্থে উপবাস ও ঐক্য-স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কার্যতঃ আরও কোনও কোনও দিন অরন্ধনের ব্যবস্থা দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে জ্যৈষ্ঠী শুক্লষষ্ঠীর মধ্যাহ্নে ও কার্তিকসংক্রান্তির রাত্রে রান্না না করিয়া খই-চিড়া খাওয়ার প্রথা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাপূজার দিন এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। সরস্বতীপূজার পরের দিন শীতলষষ্ঠী উপলক্ষে পূর্বদিন রান্না করা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার রীতি আছে। বর্তমানে এই সমস্ত প্রথা লুপ্তপ্রায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অরবিড়ু বংশ বিজয়নগর দ্র

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রী) শ্রীঅরবিন্দ এ যুগের বিশিষ্ট বাঙালী রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-লাভের জন্য অপর দুই ভ্রাতাসহ তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডের এক ইংরেজ পরিবারে রাখিয়া আসেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সিভিল সার্ভিস পাশ করেন; কিন্তু অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তিনি চাকুরির জন্য মনোনীত হন নাই। ১৮৯২

খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ট্রাইপস' পাশ করার পর ১৮৯৩ খ্রী ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরিয়া তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং অধ্যক্ষ হন। এখানেই অরবিন্দ মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের প্রকৃত নেতা পুনার ঠাকুর সাহেবের নিকট বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অরবিন্দই বাঙালী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 'যতীন্দর উপাধ্যায়' ছদ্মনামে গায়কোয়াড়ের সৈন্যদলে প্রবেশে সাহায্য করেন ; এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী দল গঠনের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বাংলা দেশে প্রেরণ করেন। লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন, অরবিন্দের ছাত্ররাই ছিল তাহার প্রধান কর্মী। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে অরবিন্দ উহাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সদ্যস্থাপিত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। তখন কংগ্রেসে মডারেটদের বিরুদ্ধে যে নূতন দল গড়িয়া উঠিতেছিল, অরবিন্দও সেই দলে যোগদান করেন। এই নূতন দল স্বরাজ বা স্বাধীনতাকেই প্রকাশ্য-ভাবে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকা এই নূতন দলের মুখপত্ররূপে গৃহীত হয় এবং অরবিন্দ হন তাহার কর্ণধার। ১৯০৭-১৯০৮ খ্রী বন্দী হওয়া পর্যন্ত অরবিন্দ এই কাগজ-খানি পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং এই অল্পদিনের মধ্যেই উহা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অরবিন্দ বৈপ্লবিক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া ধৃত হন এবং এক বৎসর ধরিয়া বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় তাঁহাদের বিচার হয়। আত্মপক্ষ-সমর্থনকালে অরবিন্দ সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার কাহারও পক্ষে কোনও অপরাধ নহে। তখন স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার রাজদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইত। এই ঘোষণার পর হইতেই ভারতে উহার পথ মুক্ত হইল।

বোমার মামলা হইতে মুক্ত হইয়া অরবিন্দ সনাতন ধর্ম-প্রচার ও জাতীয় দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্‌' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' সম্পাদনা শুরু করেন। কিন্তু কিছু কাল পরে অন্তরের নির্দেশে তিনি রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরী গিয়া যোগসাধনায় নিবিষ্ট হন। ফ্রান্স হইতে শ্রীমা মীরা (মাদাম পল রিশার) আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। অধ্যাত্মচৈতন্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁহাদের যোগ-সাধনার মূল লক্ষ্য। অরবিন্দ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দর্শনবিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা 'আর্য'-র মাধ্যমে বহু রচনায় এই দিব্যজীবনের তত্ত্বসমূহ বিশদভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেই সকল রচনা বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছে। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ *The Life Divine*-এ তিনি এই দিব্যজীবনসাধনার বিবরণ দিয়াছেন এবং অতিমানসিক অধ্যাত্মসত্যের সহিত জীবনের সমন্বয় কিরূপে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিচেরীতেই যে আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে এই মহান সমন্বয়কে কার্যে পরিণত করিবার সাধনা চলিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই অরবিন্দ ইংরেজী রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার উত্তরজীবনের রচনাও প্রায় সমস্তই ইংরেজীতে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ *The Life Divine* (১৯৩৯) এ যুগের একটি প্রধান দর্শন-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সাবিত্রীর উপাখ্যান আশ্রয় করিয়া রচিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য *Savitri* (১৯৫০) অধ্যাত্মসত্যের এক অপূর্ব কাব্যরূপ। ইহা ব্যতীত, *The Hero and the Nymph* (বিক্রমোর্বশী), *Urvasie, Song of Myrtilla and Other Poems, Essays on Gita* ইত্যাদি গ্রন্থও বিশেষভাবে সমাদৃত।

অনিলবরণ রায়

অরম, রবার্ট (১৭২৮-১৮০১ খ্রী) ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানির পদ গ্রহণ করেন। পরে মাদ্রাজ কাউন্সিলের তিনি সভ্য হন (১৭৫৪-১৭৫৮ খ্রী)। তাঁহারই পরামর্শে ও উদ্যোগে ক্লাইভকে সেনাপতিরূপে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পাঠানো হয়। ১৭৬৯ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঐতিহাসিক। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে *A History of Military Transactions of the British Nation in Indostan from 1745* অন্যতম।

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

অরুণা প্রাচীন সরস্বতীর শাখা, কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিত। পেহোয়া (পৃথূদক) হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে অরুণা-সংগম নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

অরুণাচলম অরুণগিরি নামেও পরিচিত। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তির অন্যতম তেজোমূর্তি এইস্থানে প্রকটিত। 'চিদম্বরম' দ্র।

অরুন্ধতী[১] কর্দম মুনির কন্যা ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী। অতীব শান্তস্বভাবা ও পতিব্রতাগণের শিরোমণিস্বরূপা। আকাশস্থ সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে নক্ষত্রটি 'বশিষ্ঠ' নামে পরিচিত, তাহার নিকটে অরুন্ধতী নামে ক্ষুদ্র তারার আকারে ইঁহার অবস্থান। কথিত আছে, ক্ষয়িতায়ু ব্যক্তি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না। হিন্দু বিবাহে সপ্তপদী গমনের পরে জামাতা কর্তৃক বধূকে অরুন্ধতী দর্শন করাইবার প্রথা আছে। উদ্দেশ্য— বধূও যেন অরুন্ধতীর ন্যায় পতিপরায়ণা হন।

দক্ষের কন্যা। দক্ষ তাঁহার দশটি কন্যা ধর্মকে সম্প্রদান করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী অন্যতমা।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অরোরা-বোরিয়ালিস, -অস্ট্রেলিস পৃথিবীর মেরু-সন্নিহিত অঞ্চলে আকাশের গায়ে কখনও বৃত্তাকারে, কখনও বৃত্তচাপের আকারে, কখনও বা দোদুল্যমান পর্দার আকারে প্রায়ই বিচিত্র রঙিন আলোর দৃশ্য দেখা যায়। এইগুলিকে অরোরা (বা মেরুজ্যোতি) বলা হয়। অরোরার মধ্যে সাধারণতঃ হরিদ্রাভ, শাদা, গোলাপী, সবুজ ও বেগুনী রঙের স্নিগ্ধ আলোর খেলাই দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৯৬-১২২ কিলোমিটার (৬০-৭০ মাইল) ঊর্ধ্বে বায়ুবিরল স্থানেই অরোরার আবির্ভাব ঘটে। সময়ে সময়ে অবশ্য ২৪০-৪৮০ কিলোমিটার (১৫০-৩০০ মাইল) ঊর্ধ্বেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী অরোরা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহারা একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না— কতকগুলি কিছুক্ষণ ধরিয়া ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, কতকগুলি আবার দেখিতে দেখিতেই মিলাইয়া যায়। উত্তর গোলার্ধে পরিদৃষ্ট অরোরাকে বলা হয় অরোরা-বোরিয়ালিস (উত্তর-মেরুজ্যোতি) এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অরোরাকে বলা হয় অরোরা-অস্ট্রেলিস (দক্ষিণ-মেরুজ্যোতি)।

বৈদ্যুতিক ব্যাপারই অরোরার উৎপত্তির কারণ বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে— বৃহত্তর সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবে পৃথিবীতে চৌম্বক ঝটিকার সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশে অরোরারও আধিক্য ঘটে ; কিন্তু নিম্ন বায়ুস্তরের অরোরার সঙ্গে চৌম্বক ঝটিকার কোনও সম্পর্ক দেখা যায় নাই।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অর্কিড সপুষ্পক, একবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী বিরুৎ (herb) জাতীয় গাছ। প্রকৃতি অনুসারে ইহা পরাশ্রয়ী (epiphytic), মৃতজীবী (saprophytic) অথবা মাটিতে জন্মায়। পরাশ্রয়ী অর্কিডের কতকগুলি মূল আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং কতকগুলি বাতাসে ঝুলিতে থাকে। এই বায়বীয় মূলগুলির বহিরাবরণী আছে। ইহাকে ভেলামেন (velamen) বলে। ভেলামেন বাতাস হইতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে সাহায্য করে। যে মাটিতে পচনশীল জৈব পদার্থ থাকে, তাহাতে মৃতজীবী অর্কিড জন্মায়। ইহাদের মূলের সহিত এক ধরনের ছত্রাক থাকে। ইহাদের সাহায্যে তাহারা মাটি ও পচনশীল দ্রব্য হইতে রস গ্রহণ করে। কোনও কোনও অর্কিডের কাণ্ড রাইজোম (rhizome) অথবা কন্দজাতীয় হয়।

কাণ্ডের পর্ব হইতে পাতা জন্মায় ও সাধারণতঃ পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম দিকে থাকে। পাতা মোটা ও প্রায়শঃই তাহাদের নিম্নাংশ কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে। একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র থাকে। ফুল অপ্রতিসম (zygomorphic), দেখিতে সুন্দর এবং সাধারণতঃ একই সঙ্গে অনেকগুলি ফুটিয়া থাকে। প্রতি ফুলে বাহিরের দিকে তিনটি করিয়া বৃত্যংশ (sepal), ভিতরের দিকে তিনটি করিয়া পাপড়ি থাকে। আকৃতিতে প্রতি ফুলের মাঝের বৃত্যংশ ও মাঝের পাপড়ি অন্য পাপড়ি ও বৃত্যংশ হইতে পৃথক। মাঝের পাপড়ি প্রজাপতির আকারের, চওড়া জুতার মত অথবা লম্বা ও মোচড়ানো হইয়া থাকে। এই পাপড়ির বর্ণ উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়। ইহার নাম ল্যাবেলাম (labellum)। কোনও কোনও অর্কিডে ল্যাবেলাম নীচের দিকে থলির আকারে বাড়িয়া যায়। ইহাতে এক বিশেষ ধরনের কোষ হইতে রস নিঃসৃত হয়। পুংস্তবকে সাধারণতঃ একটি পুংকেশর থাকে। দুইটি পুংকেশরও কোনও কোনও অর্কিডে দেখা যায়। পরাগধানী দুইটি, কোনও কোনও ফুলে চারিটিও হয়। রেণু পরাগধানীর ভিতর একপ্রকার মোমের মত পদার্থের দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। স্ত্রীস্তবক তিনটি গর্ভপত্র (carpel) -যুক্ত। তিনটি গর্ভমুণ্ডের মধ্যে একটি বন্ধ্যা। গর্ভপত্রের তলদেশে এককুঠুরি-যুক্ত একটি ডিম্বাশয় আছে। ডিম্বাশয়টি পেয়ালার মত পুষ্পাধারের (thalamus) সর্বনিম্নে অবস্থিত। গর্ভপত্র পুষ্পাধারের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত। পুংকেশরের পুংদণ্ড

গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডের সহিত যুক্ত। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। ছোট ছোট বীজের উপর পাতলা খোসা আছে।

পরাগসংযোগ পতঙ্গের দ্বারা হয়। এই কাজে সহায়তা করে ফুলের বন্ধ্যা গর্ভপত্র ও ল্যাবেলাম। ল্যাবেলাম সহজেই পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

অর্কিডের ৪৫০টি জাতি ও ৭৫০০ প্রজাতি আছে। ইহাদের মধ্য রাস্না, মান্দা, ভ্যানিলা ইত্যাদি আমাদের অতি পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্র অর্কিড দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ইন্দো-মালয়, সিকিম, হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল ও আমেরিকায় বেশি দেখা যায়।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্জনমল পঞ্চম শিখগুরু। অর্জনমল শিখসম্প্রদায়কে নিজস্ব এক শাসনবিধির মাধ্যমে সংগঠিত করেন। অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে স্বেচ্ছামূলক দানের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি 'আধ্যাত্মিক কর' আদায়ের জন্য মসনদ নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনিই শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থ'-র সংকলয়িতা। তাঁহার নেতৃত্বে শিখসম্প্রদায় বিশেষভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠে; এবং প্রথম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। গুরু অর্জন বিদ্রোহী শাহ্‌জাদা খুসরুকে সমর্থন করায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১৬০৬ খ্রী)। এই প্রাণদণ্ডের পর হইতেই শিখসম্প্রদায় নিজেদের সামরিক প্রথায় পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করে।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অর্জুন[১] ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত তৃতীয় পাণ্ডব। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাকালে ইনি দ্রোণাচার্যের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। শিক্ষাসমাপনান্তে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণে পরাভূত ও দ্রোণাচার্যের বশীভূত করিয়া গুরুদক্ষিণা দান করেন। স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জুন দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেন। খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করার সময় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও তীর্থপর্যটনান্তে দ্বারকায় গেলে অর্জুনের সহিত সুভদ্রার পরিণয় হয়। পরে খাণ্ডববনদাহে কৃষ্ণের সহিত অগ্নিকে সাহায্য ও তৃপ্ত করিয়া অর্জুন অগ্নির নিকট হইতে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লাভ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে উত্তরকুরুবর্ষ পর্যন্ত উত্তর দেশের সমগ্র নৃপতিগণকে জয় করিয়া অর্জুন করপ্রদ করিয়াছিলেন। দ্বৈতবনে বাস করার সময় কিরাতবেশধারী মহাদেবকে সংগ্রামে তুষ্ট করিয়া অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন এবং স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের নিকট নানা দৈব অস্ত্র শিক্ষা করেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন কর্তৃক দুর্যোধন সপরিবারে বন্দী হইলে অর্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনেন। উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে সাগরতুল্য কুরুসৈন্য জয় করিয়া অর্জুন বিরাটরাজের গোধন উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জুন সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া অজেয় নারায়ণী সেনা, বিপুল ত্রিগর্ত-বাহিনী, বহু কুরুসেনাপতি, লক্ষ লক্ষ কুরুসৈন্য ও মহাবীর রাজা ভগদত্ত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতিকে বধ করিয়াছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে অর্জুন দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণের মহিষীগণকে হস্তিনায় লইয়া আসেন। পরে মহাপ্রস্থানের পথে হিমালয়ের যে অংশ হইতে সুমেরু পর্বত দৃষ্টিগোচর হয়, সেই স্থানে অর্জুনের দেহপাত হয়।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অর্জুন[২] পুরাণাদিতে উল্লিখিত প্রাচীন হৈহয় বংশের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। কৃতবীর্যের পুত্র বলিয়া ইনি কার্তবীর্যার্জুন নামে অভিহিত হন। পুরাণ অনুসারে ইনি হিমালয় পর্বত হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন।

অর্জুন[৩] সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করেন। চীন দেশীয় গ্রন্থে তাঁহার নাম যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে এই মন্ত্রীর নাম ছিল অর্জুন বা অরুণাশ্ব। চীন দেশীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চীন সম্রাট্ ওয়াং-হিউয়েনথ্‌সী নামক একজন রাজদূতকে হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এই রাজদূত যখন ভারতে পৌছিলেন তখন হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অর্জুন রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। অর্জুন এই চীনদূতের সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন এবং তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে হত্যা করেন। চীনদূত তিব্বতের রাজার শরণাপন্ন হন। তিব্বতের রাজা চীনসম্রাটের ও নেপালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিব্বত ও নেপাল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চীন রাজদূত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং অর্জুনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ জয় করেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য বলা কঠিন। কিন্তু চীন কর্তৃক ভারতে সামরিক অভিযানের ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

অর্জুন[৪] কচ্ছপঘাতবংশের রাজা। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিখ্যাত গোয়ালিয়র

দুর্গ ইহাদের হস্তগত হয়। এই বংশ পরবর্তী কালে কচ্ছোয়া রাজপুত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুলতান মামুদ কনৌজ আক্রমণ করিলে কনৌজের প্রতীহারবংশীয় রাজা রাজ্যপাল কনৌজ রক্ষার চেষ্টা না করিয়া গঙ্গানদীর অপর পারে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই জন্য কচ্ছপঘাত-বংশীয় রাজা অর্জুন ও চন্দেলরাজ একযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

অর্জুনায়ন অর্জুনায়ন বংশের লোকেরা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন; কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারা প্রাচীন হৈহয় রাজবংশের লোক। পাণিনির টীকাকারই প্রথম অর্জুনায়নদের কথা উল্লেখ করেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় যৌধেয়, কাক প্রভৃতি গণরাষ্ট্রের সহিত ইঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহারা রাজপুতানার অন্তর্গত ভরতপুর ও আলওয়ারের অধিবাসী ছিলেন। ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক শক্তির পতনের পর ইঁহাদের অভ্যুত্থান হয়; কিন্তু পরবর্তী কালে শক ও কুষাণদের হাতে ইঁহাদের পরাজয় ঘটে। গুপ্তযুগে আবার ইঁহাদের সুসংবদ্ধ গণতন্ত্রের কথা শোনা যায়।

দ্র John Allan, *Coins of Ancient India*, London, 1936; R. C. Majumdar ed. *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1951.

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

অর্ণোরাজ চাহমন বংশের শাকম্ভরী শাখার শক্তিশালী শাসক অজয়রাজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে) আজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, পিতার ন্যায় তিনিও মুসলমান আক্রমণ-কারীদের পরাভূত করেন। কিন্তু গুজরাটের চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি বংশীয় নরপতি জয়সিংহ ও কুমারপালের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অর্থনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবাগত হইয়াও আধুনিক যুগে অর্থনীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অর্থনীতির কোনও কোনও দিকের আংশিক চর্চা প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগেও ছিল। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের রচনায় কিছু কিছু আর্থিক সমস্যার আলোচনা আছে; ভারতবর্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রশাসন এবং করনীতি সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তির এবং সমাজের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতি, গতি এবং কারণ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা অপেক্ষা-কৃত সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতদের দান। ইওরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট (mercantilist) এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ফিজিয়োক্র্যাট (physiocrat) নামধারী পণ্ডিতগোষ্ঠী অর্থনীতির কোনও কোনও দিকের বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির জন্ম যাঁহাদের হাতে তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রী), ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ খ্রী), টমাস মলথস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রী) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীকে সাধারণতঃ ক্ল্যাসিক্যাল গোষ্ঠী নামে অভিহিত করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতির আলোচনা ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়ে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লজান বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্বালরাস (১৮৩৪-১৯১০ খ্রী) ও পারেতো (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রী), অস্ট্রিয়াতে মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২১ খ্রী), হ্বিজার (১৮৫১-১৯২৬ খ্রী) ও ব্যম-বাহ্বের্ক (১৮৫১-১৯১৪ খ্রী), সুইডেনে হ্বিক্‌সেল (১৮৫১-১৯২৬ খ্রী) এবং ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজে অ্যালফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৬ খ্রী) -এর হাতে আধুনিক যুগের অর্থনীতিচর্চার সূত্রপাত। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে অর্থনীতির বিশ্লেষণী দিকের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির মূলে কেইন্‌স, হিক্‌স প্রমুখ অর্থনীতিবিদের দান অসামান্য।

অর্থনীতির সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একসময়ে মতভেদ ছিল কিন্তু এখন ইহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, অর্থ-নীতির প্রধান বিষয়বস্তু ব্যক্তি ও সমাজের বৈষয়িক অবস্থার প্রকৃতি এবং তাহার স্থিতি ও গতির বিশ্লেষণ। মানুষের নানাপ্রকার অভাববোধ হইতে আর্থিক সমস্যার উৎপত্তি। অভাব পূরণের জন্য উৎপাদন প্রয়োজন; বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। একই জিনিস বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার একই উপাদান বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলি সবই যদি অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি অভাব মিটানো সম্ভব হইত এবং অর্থনীতির

অর্থনীতি

সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিত না। বাস্তব জীবনে আমাদের অভাব বহু এবং বহুমুখী, অথচ উৎপাদনের উপাদান এই অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ নাই। অতএব সমাজের কোন্ অভাব মিটিবে এবং কোন্‌টা মিটিবে না, কোন্ কোন্ জিনিসের কতটা উৎপাদন হইবে, মোট উৎপাদনের অংশ কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, উৎপাদনের পরিমাণ কোন্ অবস্থায় বাড়িবে বা কমিবে ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের সমস্যার বিশ্লেষণই অর্থনীতির প্রধান বিষয়বস্তু।

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনার দুইটি দিক আমরা সহজেই ভাগ করিয়া লইতে পারি— একটির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সমষ্টিগত বিশ্লেষণ' (macro-analysis) এবং অন্যটির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ' (micro-analysis)। একটি দেশের বা সমাজের জাতীয় আয় কি ভাবে নিরূপিত হয়, কি কারণে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হয় ইত্যাদি সমস্যার বিশ্লেষণ 'সমষ্টিগত অর্থনীতি'র বিষয়বস্তু। অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণ, দ্রব্য উৎপাদনে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আচরণ ইত্যাদি সমস্যার আলোচনা 'ব্যষ্টিগত অর্থনীতি'র প্রধান অঙ্গ।

অন্য একটি দিক হইতেও অর্থনীতির বিশ্লেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আর্থিক সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণে যে সব কারণ কার্যকরী তাহাদের প্রভাব কাল-নিরপেক্ষভাবে দেখা যাইতে পারে। কালস্রোতের প্রভাবকে বাদ দিয়া আলোচনা করিলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার মূলে পৌঁছানো সহজ হয়। এই দিক হইতে দেখিলে ভোগ, উৎপাদন, দ্রব্যমূল্য নিরূপণ, জাতীয় আয় নিরূপণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে আর্থিক কারণগুলি কাজ করে তাহারা কি অবস্থায় একটি 'সাম্যস্থিতি' বা 'স্থিতাবস্থা'র (equilibrium) সৃষ্টি করিতে পারে তাহা আবিষ্কার করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই কারণগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ যে একবার স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থা হইতে কোনও বিচ্যুতি হইবে না, কিংবা কোনও কারণে বিচ্যুতি হইলেও আবার সেই স্থিতাবস্থা ফিরিয়া আসিবে (stable equilibrium)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবস্থা ইহার বিপরীতও হইতে পারে (unstable equilibrium)। কি কারণে বিশেষ একটি জিনিসের বাজার দরে বিভিন্ন প্রকারের স্থিতাবস্থা আসিতে পারে, কিংবা কোনও প্রকার স্থিতাবস্থা না-ও আসিতে পারে তাহা সহজেই আবিষ্কার করা যায়।

এই স্থিতাবস্থার আলোচনা কালনিরপেক্ষ বা গতিহীন পরিস্থিতি ধরিয়া লইয়া করিলে আমরা অর্থনীতির স্থিতিবিজ্ঞানের (economic statics) দিকটা পাই। অন্যদিকে, আর্থিক কারণগুলির আচরণ সময়ের গতিতে কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, বা বিশেষ কোনও একটি সময়ের কোনও আর্থিক কারণ অন্য একটি সময়ের আর্থিক অবস্থাকে কি ভাবে প্রভাবিত করে আমরা তাহারও আলোচনা করিতে পারি। জিনিসের দাম কি ভাবে কালগত কারণের উপরে নির্ভর করে, এই বৎসরের মূলধন-বিনিয়োগ কি ভাবে আগামী বৎসরে উৎপাদন বাড়ায়, গত সপ্তাহের আয় কি ভাবে এই সপ্তাহের ব্যয়কে প্রভাবিত করে— এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমরা অর্থনীতির গতিবিজ্ঞানের (economic dynamics) দিকে যাই।

গতিশীল বা পরিবর্তনশীল অবস্থা হইতে স্থিতাবস্থা আসিতে পারে। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছিলেন যে গতিশীল আর্থিক সমাজে জাতীয় আয় বাড়িতে বাড়িতে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহার পরে আর কোনও বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের মূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটি জিনিসের দাম একটা স্থিতাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অবশ্য এইরূপ স্থিতাবস্থা যে আসিবেই তাহার কোনও কারণ নাই। যে পরিস্থিতিতে ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতেরা পরিবর্তনশীল আর্থিক ব্যবস্থার অপরিবর্তনশীল পরিণতি হইবে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, সেই পরিস্থিতি বাস্তবজীবনে সত্য না-ও হইতে পারে। এমন পরিস্থিতি সহজেই কল্পনা করা যায় যেখানে জাতীয় আয় সীমাহীন-ভাবে পরিবর্ধমান।

ব্যষ্টির যোগফল হইতেই সমষ্টি পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে বিভিন্ন অংশের গতি বিভিন্নমুখী অথচ পরস্পর-নির্ভরশীল, সেখানে সাধারণ যোগ-বিয়োগের নিয়ম অচল। প্রত্যেকেই যেখানে প্রভূততম লাভের চেষ্টা করে সেখানে প্রত্যেকের এই চেষ্টার সম্মিলিত যোগফলে সমষ্টির প্রভূততম লাভ না-ও হইতে পারে, বিশেষতঃ যে সমাজে একজনের লাভ অনেক সময়ে আর একজনের ক্ষতির কারণ হয়। এই দিক হইতে দেখিলে আবার অর্থনীতির আলোচনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বিশেষ কোনও জিনিসের মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হয়, কি কারণে এই ক্ষেত্রে সাম্যস্থিতি আসে— এই জাতীয় সমস্যার আলোচনাকে আমরা 'আংশিক বিশ্লেষণ' নাম দিতে পারি। অন্যদিকে 'আংশিক' সমস্যাগুলির একত্রিত-

রূপ পর্যালোচনা করিয়া আমরা 'সাধারণ' বা পারস্পরিক সাম্যস্থিতির প্রকৃতি নির্ধারণ ও কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে পারি। আলুর দাম কি কি কারণের উপরে নির্ভর করে তাহা 'আংশিক বিশ্লেষণ' (partial equilibrium analysis)। অন্য সব জিনিসের দামের সঙ্গে আলুর দামের সম্পর্ক কোথায় অর্থাৎ, বিভিন্ন জিনিসের পারস্পরিক মূল্য কি ভাবে একটি স্থিতাবস্থায় আসিতে পারে সে আলোচনাকে বলা যাইতে পারে 'সাধারণ বা পারস্পরিক সাম্যস্থিতি বিশ্লেষণ' (general equilibrium analysis)।

বিভিন্ন আর্থিক সমস্যার মধ্যে এইভাবে কয়েকটি প্রকৃতিগত বিভাগ করিয়া লইলে এই সমস্যাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতেরা ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সমকালীন। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, বিদেশী লেন-দেনে ঘাট্‌তি ইত্যাদি সমস্যারও উৎপত্তি হইতেছিল। স্মিথ, রিকার্ডো ও মলথস এই সমস্যাগুলির মূলে যাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অর্থনীতি মূলতঃ 'সমষ্টিগত' এবং তাহার বিষয়বস্তু গতিশীল অবস্থার বিশ্লেষণ। কিন্তু এই 'সমষ্টিগত বিশ্লেষণ' হইতেই তাঁহারা 'ব্যষ্টিগত' এবং 'আংশিক বিশ্লেষণে'র দিকে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাতীয় আয় বা উৎপাদনের সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে যাইতে হইলে ইহার পরিমাপ প্রয়োজন। বহু জিনিসের সম্মিলিত উৎপাদনে যে আয়ের সৃষ্টি হয় তাহার পরিমাপ করিতে হইলে প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য নিরূপণ প্রয়োজন। এই মূল্য নিরূপণ কি ভাবে হয় তাহা 'আংশিক আলোচনা'র বিষয়বস্তু। ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতেরা সমষ্টিগত অর্থনীতির নানাদিকের আলোচনা করিয়াছিলেন —জাতীয় আয় কিসের উপরে নির্ভর করে, শ্রম, জমি ও মূলধনের সংযোগে কি ভাবে উৎপাদনের অসুবিধা বাড়িতে থাকে, জাতীয় আয়ের গতি কোন্ সীমারেখার দিকে, ইহা কি ভাবে শ্রমিক, জমিদার ও মূলধনের মালিকের মধ্যে বিভক্ত হয় ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য কি ভাবে নিরূপিত হয় তাহাও তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। শ্রমই উৎপাদনের মূল, এই সূত্রটি ধরিয়া দ্রব্যমূল্যের প্রকৃতি নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতেরা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতগোষ্ঠীর আলোচিত সমষ্টিগত অর্থনীতি জন স্টুয়ার্ট মিলের পর বহুদিন অবহেলিত হইয়াছিল। একমাত্র কার্ল মার্ক্‌স (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর কোনও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ সমষ্টিগত অর্থনীতির এবং বিশেষতঃ আর্থিক উন্নতির সমস্যা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন নাই। কার্ল মার্ক্‌স ক্ল্যাসিক্যাল বিশ্লেষণ হইতেই তাঁহার সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিজস্ব যে সব অর্থনৈতিক 'নিয়ম' প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ত্রুটি ছিল। এই সময়েই লজান বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্বালরাস (Marie Esprit Leon Walrus) সর্বপ্রথম 'সাধারণ সাম্যস্থিতি বিশ্লেষণ' (general equilibrium analysis)-এর চেষ্টা করেন এবং তাঁহার অনুগামী পারেতো (Vilfredo Pareto) এই বিশ্লেষণ হইতে 'স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞান' (welfare economics) -এর মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। অস্ট্রিয়ার মেঙ্গার (Karl Menger), হ্বিজার (Friedrich von Wieser), ব্যম-বাহ্বের্ক (Bohm-Bawerk) প্রভৃতি পণ্ডিত ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহারে উপযোগের গতি, দ্রব্যমূল্যের প্রকৃতি, সুদ ও মূলধনের প্রকৃতি ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত অর্থনীতিচর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব ছিল অ্যালফ্রেড মার্শালের (১৮৪২-১৯২৪ খ্রী)। অ্যালফ্রেড মার্শালের প্রধান কৃতিত্ব 'আংশিক সাম্যস্থিতি'র বিশ্লেষণে। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপল্‌স অফ ইকনমিক্‌স' (১৮৯০ খ্রী) পৃথিবীর সব দেশে অর্থনীতি-শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য ছিল। মার্শালের প্রভাবে একদিকে যেমন আংশিক বিশ্লেষণের গভীরতা এবং প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই সমষ্টিগত সমস্যার বিশ্লেষণের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছিল। মার্শালের ছাত্রদের মধ্যে আর্থার পিগু (A. C. Pigou, ১৮৭৭-১৯৫৯ খ্রী) মার্শালের প্রবর্তিত পথে স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমনিয়োগ ইত্যাদি সমষ্টিগত সমস্যার আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থনীতি আলোচনার তদানীন্তন গতিধারাতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই।

এই অবস্থার পরিবর্তন হয় দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধে এবং তৃতীয় দশকে। এডওয়ার্ড চেম্বারলেন, শ্রীমতী জোন রবিন্‌সন প্রভৃতি কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ মার্শালীয় দ্রব্যমূল্যতত্ত্বের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া 'পূর্ণ প্রতিযোগিতা'র বাজার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত 'অপূর্ণ প্রতিযোগিতা'র বাজারে কতখানি পরিবর্তিত করা প্রয়োজন, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন কেম্‌ব্রিজবাসী ইটালীয় অর্থনীতিবিদ্ পিয়েরো স্রাফা (Piero

Srafta)। কয়েক বৎসর পরে জন হিক্‌স, হ্বালরাসের 'সাধারণ সাম্যস্থিতি'র তত্ত্ব নূতন ভাবে পরিবেশন করিয়া এবং চাহিদা ও উৎপাদনের তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়া মূল্যতত্ত্বের আধুনিক আলোচনার পথ খুলিয়া দেন।

এই তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে লর্ড কেইন্‌স (১৮৮৩-১৯৪৬ খ্রী) -এর যুগপ্রবর্তনকারী নিয়োগতত্ত্বের আলোচনা প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির আলোচনাতে আবার সমষ্টিগত সমস্যার গুরুত্ব নূতনভাবে অনুভূত হয়। কেইন্‌স নিজেকে ক্ল্যাসিক্যাল পন্থার বিরোধী মনে করিতেন কিন্তু তাঁহার এবং রিকার্ডো-মলথসের বিষয়বস্তু একই ছিল— কেইন্‌সীয় অর্থনীতি অনেকাংশে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিরই পুনরুজ্জীবন। কেইন্‌সের অর্থনীতির প্রচার এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নতির নানা সমস্যার আলোচনার পথ খুলিয়া গিয়াছিল। আর্থিক উন্নতির যে সকল সমস্যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়াছিল প্রায় সেই সব সমস্যাই আবার আর্থিক উন্নতিকামী ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দরিদ্র দেশে দেখা দিয়াছে ; নূতন করিয়া আর্থিক উন্নতির সমস্যার নানা দিক এবং বিশেষতঃ পরিকল্পিত আর্থিক উন্নতির সমস্যা— বিশদভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া নানা দিকে অর্থনীতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান যুগের অর্থনীতি আলোচনার প্রধান উপজীব্য আর্থিক উন্নতির জটিল ও বহুমুখী সমস্যাসমূহ। বিনিয়োগ এবং ভোগব্যয়, এই দুইয়ের যোগফলই জাতীয় আয়— কেইন্‌স প্রদর্শিত এই সহজ সত্যটি হইতে যাত্রা শুরু করিয়া আধুনিক যুগের সমষ্টিগত অর্থনীতি ক্ল্যাসিক্যাল আলোচনার অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রানীতি, করনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি কি ভাবে সামগ্রিক আর্থিক সমস্যার অঙ্গীভূত তাহাও এখন পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

অন্য অনেক দিকেও অর্থনীতির বহুদূর অগ্রগতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহারে ব্যক্তির আচরণ, দ্রব্যের 'উপযোগ' বা কাম্যতা পরিমাপের সমস্যা, ব্যক্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতি, মোট সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধির উপায় ও পরিমাপ-সমস্যা, উৎপাদন-পরিকল্পনার পদ্ধতি, উপাদান ও উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে আধুনিক যুগে পণ্ডিতেরা অনেক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিসংখ্যান ও সংখ্যাবিজ্ঞানের উন্নতিতে অর্থনীতির আলোচনায় পরিমাপের সমস্যা সহজ হইয়া আসিয়াছে এবং নূতন একটি 'অর্থমিতি' (econometrics) শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। গণিতের ব্যবহারে বহু ক্ষেত্রে অর্থনীতির আলোচনায় ও সিদ্ধান্তে অধিকতর যুক্তিসংগতি আসিয়াছে এবং বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক হইয়াছে।

এই ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলে অর্থনীতির মূল বিষয়-বস্তুগুলির একটা সহজ কাঠামো তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে। ব্যষ্টিগত অর্থনীতির মূলসূত্র একদিকে চাহিদার নিয়ম ও অন্যদিকে উৎপাদনের নিয়ম। ভোগ্যদ্রব্য বলিতে যদি আমরা কেবলমাত্র সেই সব জিনিসই বুঝি যাহা আমরা পাইতে চাই এবং বেশি পাইলে বেশি তৃপ্তি পাই, তাহা হইলে 'চাহিদার নিয়ম' বা দ্রব্যমূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্ক সহজেই আবিষ্কার করা যায়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপাদানের সবগুলি একসঙ্গে দ্বিগুণিত বা ত্রিগুণিত করিলে উৎপাদন কতটা বাড়ে (returns to scale) সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলে কোনও একটি মাত্র উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলাফল (factor productivity) সম্বন্ধে সিদ্ধান্তেও আমরা সহজেই আসিতে পারি। চাহিদা ও যোগানের সাধারণ নিয়ম হইতে দ্রব্যমূল্যের স্থিতাবস্থার কারণ নির্দেশ করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের বাজারে উৎপাদকের আচরণ কি রকম হইবে, তাহাও বিশ্লেষণ করা যায়। উৎপাদক তাহার লাভ সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে ইহা ধরিয়া লইয়া উৎপাদক ও বিক্রেতার আচরণ বিশ্লেষণ করা যায়। উৎপাদকের অন্য প্রকার লক্ষ্য ধরিয়া লইয়াও অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে আসা যায়।

দ্রব্যমূল্যতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি উপাদানের মূল্য নিরূপণেও কার্যকরী, কিন্তু উপাদানগুলির বিশেষ বিশেষ সমস্যা থাকাতে শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা, মূলধনের আয় এবং উৎপাদকের লাভ সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এইখানে ব্যষ্টিগত আলোচনা অনেকাংশে সমষ্টিগত আলোচনাতে পরিণত হয়। সমষ্টিগত আলোচনার প্রধান বিষয় জাতীয় আয় এবং তাহার অংশবিভাগ। স্বাভাবিক-ভাবেই জাতীয় আয় সৃষ্টির পদ্ধতির সঙ্গে তাহার বিভাগেরও সংযোগ থাকিবে। উৎপাদনের নিয়ম ও বণ্টনের নিয়ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমষ্টিগত অর্থনীতিতে প্রথম সূত্র বিনিয়োগ (investment) এবং ভোগব্যয়ের যোগফলকে জাতীয় আয়ের সমান বা নামান্তর বলিয়া দেখানো। বিনিয়োগ নির্ভর করে একদিকে লাভের আশা এবং অন্যদিকে সুদের হারের উপরে। সুদের হার নির্ভর করে দেশের মুদ্রার পরিমাণ এবং হাতে নগদ মুদ্রা ধরিয়া রাখা সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাবের উপরে। ভোগব্যয় আয়ের উপরে

অর্থনীতি

নির্ভর করে এবং ভোগব্যয়ের পরে যে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থাকে তাহাই বিনিয়োগের মূল ; স্থিতাবস্থায় বা পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের নামান্তর মাত্র। এই কয়েকটি সূত্র হইতে জাতীয় আয় নিরূপণের মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়। এই সহজ সূত্রগুলিকে নানাভাবে পরিবর্তিত করিয়া এবং নূতন সূত্র যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ('বাণিজ্যচক্র') এবং আর্থিক উন্নতির সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সুদের নিরূপক অনুসন্ধান করিতে হইলে দেশের মুদ্রানীতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সাধারণ ব্যাঙ্ক কি ভাবে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাও জানা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশের জিনিসকে বাহিরে লইয়া যায়, বাহিরের জিনিসকে দেশে আনে ; সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঞ্চয়ের অন্য দেশে বিনিয়োগ এবং অন্য দেশের সঞ্চয়ের আমাদের দেশে বিনিয়োগের পথ খুলিয়া দেয়। সরকারি করনীতি করদাতাদের ভোগব্যয়ের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, সরকারি ব্যয় সাধারণের আয় বৃদ্ধি করিয়া ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। এই ধরনের কয়েকটি সহজ সূত্রের মধ্য দিয়া সমষ্টিগত স্থিতিশীল ও গতিশীল অধিকাংশ সমস্যার আলোচনা সম্ভব হইয়া আসিয়াছে। বহু জটিলতার মধ্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ মূল-সূত্র আবিষ্কার করা যদি বিজ্ঞানের কাজ হয়, তাহা হইলে আধুনিক অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আলোচনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির পথ, উপায়, প্রতিবন্ধক ও আনুষঙ্গিক সমস্যা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণা ও কর্মনীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, এই দুই দিকেই মূল্যবান কাজ হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত জনবহুল, স্বল্প-সঞ্চয়ী, শিল্পে অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান দেশে কি করিয়া দ্রুত আর্থিক উন্নতি আনা যায়, এই সমস্যা বহুদিন ধরিয়াই অর্থনীতি-বিদদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু আর্থিক উন্নতির তাত্ত্বিক গবেষণার যে দ্রুত উন্নতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে হইয়াছে তাহা না হইলে এইসব সমস্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ সুষ্ঠুভাবে হওয়া অসম্ভব হইত। দেশের আয়ের সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক এবং বিনিযুক্ত সঞ্চয়ের সঙ্গে উৎপন্নের সম্পর্ক— এই দুইটির পরিমাণ এবং অনুপাত হইতেই আর্থিক উন্নতির সহজতম সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তবজীবনের জটিলতাগুলিকে একে একে আলোচনার অঙ্গীভূত করিয়া আর্থিক উন্নতির তাত্ত্বিক অনুশীলন সম্ভব এবং ইহা হইতেই কর্মপন্থারও নির্দেশ পাওয়া যায়। গত কয়েক বৎসরে এই দিকে অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী উন্নতি হইয়াছে এবং আর্থিক উন্নতির পথে যাত্রা শুরু হইলে যে সব নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার দিকেও বিশ্লেষণী দৃষ্টি পড়িয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি বিদেশের সঙ্গে লেন-দেনে ঘাটতি, সমাজে ধনবণ্টনের স্বরূপ-পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যা আর্থিক উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যদিকে উন্নতিকামী সমাজে মুদ্রানীতি, করনীতি ইত্যাদিরও যথাযথ পরিবর্তন প্রয়োজন— এই পরিবর্তন কোন্ দিকে হইবে তাহার সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান আলোচনা হইয়াছে।

আর্থিক উন্নতির আলোচনাতে নূতন করিয়া যে জোর দেওয়া হইতেছে, তাহাতে একদিকে যেমন কেইন্স-পরবর্তী সমষ্টিগত অর্থনীতির উন্নতির প্রভাব আছে, অন্যদিকে তেমনই সমাজতান্ত্রিক, পরিকল্পিত অর্থনীতির চিন্তাধারার প্রভাবও আছে। মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ সোভিয়েট রাশিয়াতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম দিকে নানা প্রকার কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইলেও, পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ফলে সোভিয়েট দেশের আর্থিক উন্নতির কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যে মার্ক্সীয় হইতেই হইবে এই কথা ঠিক নয়— গণতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত এবং সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্য-সমন্বিত আর্থিক উন্নতি হইতে না পারার কোনও কারণ নাই।

প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত আর্থিক উন্নতি একদিক হইতে সমাজতন্ত্রেরই নামান্তর। সমাজতন্ত্রের একটি উৎপাদনের দিক আছে এবং অন্য দিকটি সু-সম বণ্টনের। পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের ভার ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং বিশেষতঃ নূতন মূলধন বিনিয়োগের বেশির ভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা রাস্তা, রেলপথ, শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্র ইত্যাদিতে কেন্দ্রীভূত হয়। দেশে যদি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা-প্রসূত বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদির সংখ্যা বাড়ে এবং ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই যদি ইহার সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিতে পারে তাহা হইলেও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়। ব্যক্তির উপার্জিত আয়ের অসম বণ্টন অবশ্য পরিকল্পিত অর্থনীতিতে থাকিতে পারে, কিন্তু করনীতি বা অন্যান্য প্রকার কর্মনীতির দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজেও বণ্টনের অসাম্য কমানো অসম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নূতন আলোচনা হ্বালরাসের

'সাধারণ সাম্যস্থিতি বিশ্লেষণ' এবং তাহার পরবর্তী পারেতোর 'স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের সূত্রাবলী'র সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য যদি হয় সমাজের প্রভূততম স্বাচ্ছন্দ্যবিধান তাহা হইলে ঠিক কি অবস্থায় ইহা আসিতে পারে তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উৎপাদন এবং মূল্য-নিরূপণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কি প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকিলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যায় তাহার আলোচনা 'সাধারণ সাম্যস্থিতি বিশ্লেষণে'র পদ্ধতিতে বহুদূর পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আয়বণ্টন সম্বন্ধে সমাজের পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত কি, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা থাকিলে এই আলোচনাকে শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্তও আনা যায়। অন্য দিকে সর্বাপেক্ষা কাম্য আয়বণ্টন বা তুলনামূলক-ভাবে অধিকতর কাম্য আয়বণ্টন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে বিশ্লেষণের শেষ ধাপে আসিয়া বলিতে হয় যে অর্থনীতি-বিদের কাজ এইবার শেষ, রাজনীতিবিদের কাজ এইবার আরম্ভ।

ভারতবর্ষের মত দেশে অনেক সময় বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার কথা বলা হইয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই জাতীয় পরিকল্পনারই একটি প্রবাহ। মহাত্মাজী প্রদর্শিত পথের স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু মূল সমস্যা উঠে— মানুষের অভাববোধের বৃদ্ধি এবং অগ্রগতিতে। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি এবং কুটিরশিল্পের উপরে নির্ভরশীল 'সর্বোদয়' সমাজের মধ্যে কোনও অর্থ-নৈতিক অসংগতি নাই— যদি মানুষের অভাববোধকে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। অভাববোধ যদি বাড়িতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনও বাড়াইতে হয় এবং তাহা হইলেই গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তি ভাঙিয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধান কথা, ভারতবর্ষের মত দেশে যত দ্রুত শিল্পায়নই হউক না কেন, গ্রামীণ আর্থিক কাঠামোতে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে পড়িতে অনেক দেরি হইবে। ততদিন একদিকে দ্রুত শিল্পায়ন এবং অন্য দিকে আংশিকভাবে সর্বোদয় সমাজের পন্থা একসঙ্গেই চলিতে পারে। দরিদ্র দেশে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়ানোই মূল লক্ষ্য— এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে কোনও একটি ভিন্ন পন্থা নাই, ইহা মনে করা ভুল।

অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, আলোচনাপদ্ধতি এবং তাহার বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল তাহা স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে অন্যান্য স্থানে অর্থ-নীতির বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, ও মতবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে। নবাগত শাস্ত্র হিসাবে অর্থনীতিতে নানা দিকে দ্রুত পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান যুগে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অর্থনীতির মূলসূত্রগুলির একটা সর্বজনস্বীকৃত কাঠামো এখন তৈয়ারি হইয়াছে। অর্থনীতির শৈশবের পঙ্গুতা এখন কাটিয়া গিয়াছে— বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এবং কর্মপন্থার আলোচনায় অর্থনীতি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রম-বিকাশ' ও 'আর্থিক উন্নতি' দ্র।

দ্র A. Marshall, *Principles of Economics*, London, 1890 ; Joan Robinson, *Economics of Imperfect Competition*, London, 1938 ; J. R. Hicks, *Value and Capital*, Oxford, 1939 ; Lord Keynes, *General Theory of Employment, Interest and Money*, London, 1936 ; P. A. Samuelson, *Foundations of Economic Analysis*, Cambridge, 1947 ; W. J. Baumol, *Economic Theory and Operative Analysis*, Englewood Cliff N. J., 1961.

ভবতোষ দত্ত

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত মানুষের পরিচয় নিত্যকালের। অভাব ও তাহার পরিতৃপ্তিবিধান যদি অর্থনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়, তবে সেই বিষয়বস্তুর সন্ধান অধুনাতন মানবসমাজে যেমন পাওয়া যায়, আদিমতম সমাজেও সেইরূপই পাওয়া সম্ভব ছিল ; সমস্যার বহিরঙ্গে নানা পরিবর্তন যুগে যুগে দেখা দিলেও মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে। অথচ শাস্ত্র হিসাবে অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভব নিতান্ত আধুনিক কালে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অর্থ-নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার নানা দিকের ভাল-মন্দ লইয়া আলোচনা করিলেও অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ শাস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে যে ধরনের মূল সূত্রের প্রয়োজন তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে কোনও কোনও গ্রীক (যেমন অ্যারিস্টটল), রোমান (যেমন ক্যাটো বা সেনেকা) ও ভারতীয় (যেমন কৌটিল্য) পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইঁহারা সমকালীন অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কারের পথ হয়ত সুগম করিয়া-ছিলেন, কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ কয়েকটি সাধারণ সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিবার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যে চিন্তাবিপ্লব সংঘটিত হয় তাহার

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

অন্যতম শুভফল প্রকৃতি ও মানুষের আচরণে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের প্রয়াস। এই প্রয়াস প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন নবযুগের সূচনা করিয়াছিল, সেইরূপ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির আলোচনাতেও এক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিল। মধ্যযুগে অন্যান্য সকল আলোচনার মত অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনাও ধর্মীয় আলোচনার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল। এই অন্ধকার যুগের অবসানে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক রীতি-নীতির বিশ্লেষণ আবার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমান্তরালে মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও নূতন চিন্তাধারার আলোড়ন দেখা যাইতে লাগিল।

ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের কবলমুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তানায়কগণ যে সংগঠনকে নূতন মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়া লইলেন, তাহার নাম স্টেট বা রাষ্ট্র। চার্চের মর্যাদা হ্রাস এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি, একই সামাজিক পুনর্বিন্যাসের দুই বিপরীত দিক। সুতরাং আধুনিক কালের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে কোনও অসংগতি নাই। এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে বলা হইয়া থাকে 'ক্যামেরালইজ্‌ম' (cameralism)। camera অর্থাৎ রাজকোষের ধনাগম বৃদ্ধির উপায় বিশ্লেষণই এ যুগের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রধান উপজীব্য ছিল। এই চিন্তাধারার উদ্ভব হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান রাজ্যসমূহে। সেকেনডফ (১৬২৬-১৬৯২ খ্রী), বেকার্স (১৬৩৫-১৬৮২ খ্রী), হর্নিক, জুস্টি প্রভৃতি জার্মান অধ্যাপক ও গ্রন্থকারগণের চিন্তায় এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত ইদানীন্তন অর্থনৈতিক আলোচনার খুব বেশি সাদৃশ্য নাই। রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক নীতি, বিশেষতঃ রাজস্বনীতি কোন্ পথে পরিচালিত করিতে হইবে, ইহা লইয়াই এই আলোচনার সূত্রপাত এবং ইহাতেই শেষ। সাধারণ ব্যক্তি বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রয়াসকে বিশ্লেষণ করিবার মত কোনও মূল নীতি ক্যামেরালিস্টগণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

মধ্যযুগের অবসানে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধির মূলে ছিল সে যুগের প্রসারকামী বণিককুল। রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিতে এই বণিককুলের স্বার্থই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। সুতরাং অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর বণিকস্বার্থের প্রভাব সুস্পষ্টরূপেই দেখা দিয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কি ভাবে রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে, রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা কিরূপে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করিতে পারে, এই ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনায় রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি ও বণিকের ব্যবসায়বিস্তারকে তখন অভিন্ন বলিয়াই গণ্য করা হইত। সে যুগের ইংরেজ বণিকগণের মুখপাত্র হিসাবে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক অর্থনৈতিক আলোচনার প্রসারে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস মান, যোজায়া চাইল্ড (১৬৩০-১৬৯৯ খ্রী) ও উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭ খ্রী) এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেম্‌স স্টুয়ার্ট। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও বণিকস্বার্থের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া যে চিন্তাধারা সে যুগে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার নাম 'মার্ক্যাণ্টাইলইজ্‌ম' (mercantilism)। শুধু ইংরেজ নয়, ফরাসী, ডাচ ও সুইডিশ বণিকগণের প্রভাবেও সেই সেই দেশে মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট চিন্তাধারার উদ্ভব ও প্রসার ঘটিয়াছিল।

মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনকার্যের তুলনায় বাণিজ্য, বিশেষতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। বাণিজ্যের মধ্য দিয়াই রপ্তানিকারী দেশ বহির্জগৎ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান সম্পদ আহরণ করিতে পারে। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি যত বেশি হইবে, দেশে স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। মার্ক্যাণ্টাইলিস্টদের মতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুই প্রকৃত জাতীয় সম্পদ। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যে দেশ অন্য দেশের নিকট হইতে এই মূল্যবান সম্পদ বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে অধিক। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে যাহা এক দেশের ক্ষতি, তাহাই অন্য দেশের লাভ। বিভিন্ন দেশের বণিককুলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয় এই লাভ কোন্ দেশের ভাগ্যে কতটুকু পড়িবে। যে রাষ্ট্র তাহার বণিককুলকে এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে সমধিক সাহায্য করে তাহারই শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। যে রাষ্ট্রের নীতি দেশীয় বণিককুলের স্বার্থের পরিপন্থী তাহার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কম।

রাষ্ট্রীয় নীতিকে এইভাবে বণিককুলের করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করায় বহু ক্ষেত্রে মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট মতবাদ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী আমদানির উপর নানা ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইত বলিয়া সাধারণ লোক সুলভে বিদেশজাত ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইত না, জীবনযাত্রার মানকে যে বৈদেশিক বাণিজ্যের আদান-

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

প্রদানের দ্বারা উন্নীত করা যায় এই উপলব্ধি মার্ক্যান্টাইলিস্টদের মধ্যে ছিল না। দেশে স্বর্ণ-রৌপ্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার দিকেই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কিন্তু সমাজের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াও যে রাষ্ট্রকে প্রভাবশালী ও বর্ধিষ্ণু করিয়া তোলা যায়, এই সহজ সত্যটিকে তাহারা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ইওরোপে এই সময় এক ধরনের প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। প্রকৃতিদেবীই মানবসমাজের সকল সম্পদের উৎস, এই আকারের একটি অর্থনৈতিক মতবাদ ফরাসী দেশের একশ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এই মতবাদকে 'ফিজিওক্রেসি' (physiocracy) নামে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুতঃ এই ফিজিওক্র্যাটগণের দ্বারাই অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র সামাজিক শাস্ত্ররূপে প্রথম পরিগৃহীত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক চিন্তার প্রধান উপজীব্য ছিল, ফিজিওক্র্যাটগণই সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে সমাজের সর্বশ্রেণীর নর-নারীর আর্থিক সম্পর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই একান্ত মানবীয় সম্পর্কের অন্তরালেও নিগূঢ় কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম কার্য করিতেছে, ইহাই ছিল ফিজিওক্র্যাটগণের দৃঢ় বিশ্বাস। এই নিয়মের অনুসন্ধান করাই হইল তাঁহাদের মতে অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম কলারূপে পরিগণিত না হইয়া অর্থনীতি তাঁহাদের চিন্তায় একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের রূপ পরিগ্রহ করিল। পূর্ববর্তী মার্ক্যান্টাইলিস্ট মতবাদের মধ্যে যত কিছু অবৈজ্ঞানিক উপাদান ছিল তাহার বিরূপ সমালোচনা করিতে গিয়াই ফিজিওক্র্যাট পণ্ডিতেরা এই নূতন বৈজ্ঞানিক আলোচনার ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত প্রকৃতিবাদী চিন্তানায়ক রুশোকে ফিজিওক্র্যাট পণ্ডিতগণের চিন্তাধারার উৎসমুখরূপে কল্পনা করা যায়। মানবসমাজের লৌকিক সম্পর্কের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার নিয়ম কার্য করিতেছে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিলে এই নিয়মকে আবিষ্কার করা যায় ও রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্য দিয়া ঐ নিয়মকে প্রকাশ করা যায়, ফিজিওক্র্যাটগণের এই বিশ্বাস রুশোর নিকট হইতেই প্রাপ্ত। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ককে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যিনি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার নাম ফ্রাঁসোয়া কেনে (Francois Quesnay, ১৬৯৪-১৭৭৪ খ্রী)। ইনি চিকিৎসক হিসাবে জীবিকা অর্জন করিতেন, কিন্তু অবসর সময়ে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল সুনিবিড়। ইঁহাকে ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারার প্রধান প্রবক্তা এবং আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করা যায়। এই চিন্তাধারাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে অন্য যাঁহারা সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে মার্ক্‌ইস দ্য মিরাবো, মার্সিয়ার দ্য লা রিভিয়ের, দুপঁ, তুর্গো প্রভৃতি ফরাসী পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনাবলী প্রকাশিত হয় ১৭৫৬-১৭৭৮ খ্রী, এই অল্প কয়েক বৎসর সময়ের মধ্যে। যদিও ফরাসী দেশেই এই চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিস্তৃতি, ইহার প্রভাব তৎকালীন ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশেও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক শক্তির অনন্যত্বে বিশ্বাসী ফিজিওক্র্যাটগণের নিকটে শিল্প ও বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষিকর্মের গুরুত্বই ছিল সমধিক। শিল্পে ও বাণিজ্যে যাহা বিনিয়োগ করা যায়, শুধু তাহাই বিনিয়োগকারীর হাতে ফিরিয়া আসে, কিন্তু কৃষিকর্মে বিনিয়োগ প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ হইয়া বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়, এই ধারণা ছিল ফিজিওক্র্যাট মতবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেনে তাঁহার বিখ্যাত 'আর্থিক বিন্যাসচিত্রণ' (*Tableau economique*) রচনা করেন; তাহাতে একমাত্র কৃষিজীবী শ্রেণীকেই উৎপাদক শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়, বণিক এবং কারিগর শ্রেণীর লোককে 'অনুৎপাদক' (sterile) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাই মানব সমাজের একমাত্র কল্যাণকর নিয়ামক, সেই হেতু রাষ্ট্রের আরোপিত কৃত্রিম বাধা-নিষেধকে ফিজিওক্র্যাটগণ সন্দেহের চোখে দেখিতেন; আর্থিক সম্পর্ক স্বাভাবিক প্রেরণায় যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর, এই জাতীয় একটি ধ্রুব সত্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মার্ক্যান্টাইলিস্ট মতবাদের প্রভাবে পণ্যের স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যত কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ফিজিওক্র্যাটগণ একে একে সেই সকল নিয়ন্ত্রণের উচ্ছেদ দাবি করিতে থাকেন। ফরাসী দেশে কোলবের রাজস্বমন্ত্রী হইয়া এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফিজিওক্র্যাটগণের চিন্তাধারা এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংগত প্রতিবাদ।

এই প্রতিবাদের বার্তা ইংল্যাণ্ডে সাফল্যের সহিত

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

বহন করিয়া আনেন অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রী)। ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে স্মিথকেই আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়। ফিজিওক্র্যাটদের চিন্তাধারা হইতে অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার বক্তব্যের সমর্থন হিসাবে কোনও কোনও যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্মিথ যে দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা ফিজিওক্র্যাটগণের আলোচনাপদ্ধতি হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। ফিজিওক্র্যাট মতবাদে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও কৃষিকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে যে অহেতুক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য আছে, স্মিথের রচনাবলীতে তাহার কোনও পরিচয় নাই। ইংল্যাণ্ডে অ্যাডাম স্মিথের পূর্বে হাচিসন, ডেভিড হিউম, যোজায়া টাকার প্রভৃতি লেখকগণও 'মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট' আর্থিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ ইঁহাদের সকলের প্রবর্তিত তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া এমন এক যুক্তিবদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনার প্রবর্তন করিলেন যে, তাঁহার সেই অমর রচনা *Wealth of Nations* (রচনাকাল ১৭৬৬-১৭৭৬ খ্রী) আজিও অর্থনৈতিক রচনার ক্ষেত্রে এক অপার বিস্ময়। এই গ্রন্থে স্মিথ সমসাময়িক সমাজের এক সুনিপুণ চিত্রই শুধু অঙ্কন করেন নাই, সেই সমাজের স্বাভাবিক, সুস্থ গতি কোন্ দিকে হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গেও বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্মিথের আর্থিক চিত্রণের মধ্যে সমাজের কোনও বিশেষ শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আর্থিক লাভের প্রেরণায় নিজ নিজ কর্মে রত, এই একান্ত পরিচিত তথ্যটিকেই স্মিথ তাঁহার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন স্তরের কর্মীর স্বার্থের সংঘাত অবলুপ্ত হইয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, ইহাই ছিল স্মিথের অর্থনীতির মূলসূত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের আরোপিত নানাবিধ বাধা-নিষেধের অবলুপ্তি ছিল তাঁহার কাম্য। এই সকল কৃত্রিম বাধা-নিষেধের অবসান ঘটিলে মানুষ তাহার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া যুক্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক শোভন আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিবে, ইহাই ছিল অ্যাডাম স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই সরল বিশ্বাসের সমর্থনে প্রবল কোনও যুক্তির অবতারণা না করিয়া স্মিথ প্রকৃতিদেবীর কল্যাণহস্তের (invisible hands of Nature) উপর তাঁহার নির্ভরতার কথাই পরম নিষ্ঠাভরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই নির্ভরতা সে যুগে বহু জনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়াই স্মিথের আর্থিক দর্শন তখন পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। স্মিথ যখন তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনও ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের গতিবেগ প্রবল হইয়া উঠে নাই। শিল্পপ্রধান সমাজে বিভিন্ন স্তরের কর্মীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত কতদূর তীব্র হইয়া উঠিতে পারে তাহার আভাস স্মিথের রচনায় পাওয়া যাইবে না। অবশ্য স্মিথ যে ব্যক্তি-স্বার্থের বিকৃত রূপ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতাই ব্যক্তিস্বার্থকে সংযত রাখিবার একমাত্র পথ, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। শিল্পপ্রধান সমাজে বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ফলে ক্রমশঃ প্রতিযোগিতার পথ কি ভাবে রুদ্ধ হইয়া আসে তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি স্মিথের যুগে হওয়া সম্ভব ছিল না। তখনও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রাধান্য ছিল, যন্ত্র অপেক্ষা কারিগরি হস্তকৌশলের প্রাধান্যই শিল্পের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল।

অ্যাডাম স্মিথের রচনার সহিত ইওরোপের পরিচয় ঘটে অনেকাংশে ফরাসী লেখক স্যে-র (J. B. Say, ১৭৬৭-১৮৩২ খ্রী) মাধ্যমে। স্যে-র রচনায় যুক্তিমত্তা ও তীক্ষ্ণতার যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহাতে ফরাসী দেশ হইতে প্রভাবশালী ফিজিওক্র্যাট মতবাদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া গিয়াছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে ও পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য দেশে যে সকল দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে, তাহাদের প্রভাব সর্বপ্রথম বোধ হয় স্যে-র অর্থনৈতিক রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ শিল্পসংগঠনের জন্য একশ্রেণীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্প-নায়কের (*entrepreneur*) উদ্ভব এই সময়ে ঘটিতেছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়াছিল এবং দিনমজুরশ্রেণীর লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সকল পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক চিন্তার প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল সমাজের প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই শ্রেণীসমূহের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে নিজের আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করিয়া লইয়া ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ খ্রী) এক তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেন। ইঁহার সমসাময়িক লেখক টমাস রবার্ট মলথস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রী) তাঁহার জনসংখ্যাবিষয়ক তত্ত্বের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন সমাজে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, সাধারণ শ্রমিকের দুর্গতি, সমাজে আয়বৈষম্যের বৃদ্ধি এবং কয়েক বৎসর পর পর বাণিজ্যক্ষেত্রে সহসা

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

মন্দার আবির্ভাব তাহাদের মধ্যে প্রাধান্য পায়। মলথস ও রিকার্ডো, উভয় লেখকই সমসাময়িক সমাজের এই সকল সমস্যার মূল হেতু উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মলথসের মতে জনসংখ্যার সীমাহীন বৃদ্ধিই সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের প্রধান হেতু, সামাজিক বা আইনগত সংস্কার দ্বারা এই দারিদ্র্যের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। রিকার্ডোর মতে সমগ্রভাবে আর্থিক জীবনের গতি এমন একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে, যেখানে শ্রমিক ও শিল্পনায়ক উভয়েরই আর্থিক সমৃদ্ধি স্তিমিত হইয়া আসিবে, কেবল ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে তাঁহাদেরই সমৃদ্ধি চরমে উঠিবে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই উভয় লেখকই মানুষের আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে নৈরাশ্যবাদী। কিন্তু ইঁহাদের মন্ত্রশিষ্য জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী) সামাজিক সংস্কারের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা যায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অ্যাডাম স্মিথ হইতে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তার ধারাকে সাধারণতঃ 'ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম যুগের 'ক্ল্যাসিক্যাল' লেখকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যতটা বিশ্বাসী ছিলেন, সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের যতটা নৈরাশ্য ছিল, পরবর্তী 'ক্ল্যাসিক্যাল' লেখকগণের (বিশেষতঃ মিল-এর) রচনায় তাহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিল্পবিপ্লবোত্তর আর্থিক সমাজে যৌথ সামাজিক প্রচেষ্টা ভিন্ন সকল শ্রেণীর লোকের কল্যাণ হইতে পারে না, এই উপলব্ধি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জাগিতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে ফরাসী দেশে সিসমঁদি, সাঁ সিমোঁ, প্রুধঁ, ফুরিয়ের ও লুই ব্লাঁ, ইংল্যাণ্ডে রবার্ট আওয়েন ও উইলিয়াম টমসন এবং জার্মানীতে কার্ল রডবার্টাস ও ফার্ডিন্যাণ্ড লাসালের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সমাজবাদী চিন্তাধারাকে যুক্তি-পরম্পরার দ্বারা গ্রথিত করিয়া কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী) তাঁহার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তন করেন। মার্ক্সের যুক্তিপরম্পরা অনেকাংশে ক্ল্যাসিক্যাল, বিশেষতঃ রিকার্ডীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সহিত তুলনীয়। কিন্তু মার্ক্সীয় অর্থনীতির মূলসূত্র, উৎপন্ন দ্রব্যের উপর শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার (right to the whole produce of labour), পূর্বতন সমাজবাদী লেখকগণের, বিশেষতঃ উইলিয়াম টমসনের চিন্তাধারা হইতে গৃহীত। মার্ক্সের পূর্ববর্তী সমাজবাদী চিন্তা ছিল সামাজিক শুভাশুভের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত; মার্ক্স প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন আর্থিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই সমাজতন্ত্রের দিকে। সমাজের প্রগতির নিয়ম আবিষ্কার করিবার এই চেষ্টার ফলেই মার্ক্স সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া যে নিয়ম আবিষ্কৃত হয় তাহাকে পরবর্তী যুগে নূতন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতে পারে। মার্ক্সকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার আবিষ্কৃত সামাজিক প্রগতির নিয়ম যে সর্বদেশে সর্বকালে প্রয়োগ করা যাইবে এইরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

রিকার্ডো হইতে মার্ক্স পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তার যে ধারাটি প্রবহমান, তাহাকে দ্রব্যমূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমিকের শ্রমকেই মূল উপাদানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যে দ্রব্যের উৎপাদনে শ্রম বেশি পরিমাণে নিযুক্ত, তাহারই মূল্য বেশি, ইহাই ছিল সে যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণের ধারণা। এই ধারণার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে। দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে মানুষের রুচি ও চাহিদার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইংল্যাণ্ডে উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স (১৮৩৫-১৮৮২ খ্রী), অস্ট্রিয়াতে কার্ল মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২১ খ্রী) এবং সুইট্জারল্যাণ্ডে লিয়ঁ ওয়ালরাস (Leon Walras, ১৮৩৪-১৯১০ খ্রী)। মেঙ্গারের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন তাঁহার পরবর্তী অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ ফন্ হ্বিজার (১৮৫১-১৯২৬ খ্রী)। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান স্কুলের (Austrian School) তৃতীয় প্রধান স্তম্ভ, অয়গেন্ ফন্ ব্যম-বাহ্বের্ক (Eugen von Bohm Bawerk, ১৮৫১-১৯১৪ খ্রী)। ইঁহার রচনায় অর্থনীতিশাস্ত্রের এতাবৎ আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যম-বাহ্বের্ক নূতন আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং মার্ক্সীয় অর্থনীতি মূলধনের আয়কে শ্রমিকের বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে বর্ণনা করে, ব্যম-বাহ্বের্ক তাহার সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে আর্থিক সমাজের যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতার চিত্র। পূর্ববর্তী ক্যামেরালিস্ট বা মার্ক্যাণ্টাইলিস্ট চিন্তাধারায় জাতীয় সমৃদ্ধির প্রসারকে যত

গুরুত্ব দেওয়া হইত ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদের সেই গুরুত্ব ছিল না। সমৃদ্ধির প্রথম আবির্ভাব যে দেশেই ঘটুক না কেন, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করিবে, ইহাই ছিল ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস। কিন্তু শিল্পে অগ্রসর দেশ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এই আস্থা বজায় রাখা যতটা সহজ ছিল, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জার্মানী, ফ্রান্স বা আমেরিকার পক্ষে এই বিশ্বাসে অটল থাকা তত সহজ ছিল না। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিরূপ সমালোচনা এই সব দেশের বিভিন্ন লেখকের রচনায় প্রকাশ পাইতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মান অর্থনীতিবিদ্ ফ্রেড্‌রিখ লিস্ট (১৭৮৯-১৮৪৬ খ্রী) এবং আমেরিকার হেনরি ক্যারি (১৭৯৩-১৮৭৯ খ্রী)। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ স্বভাবতঃ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী লেখকগণ ছিলেন জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণনীতির পৃষ্ঠপোষক।

ক্লাসিক্যাল লেখকগণ বিশ্বাস করিতেন সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের যে সকল নিয়ম তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সর্বজনীনভাবে সত্য। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়মই যে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সকল নিয়মই যে দেশ-কালের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেবল আপেক্ষিকভাবে সত্য, এই ধারণার বিস্তার করেন জার্মানীর 'ঐতিহাসিক গোষ্ঠী'র অর্থনীতিজ্ঞেরা। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ভিল্‌হেল্‌ম্ রশ্‌খের (১৮১৭-১৮৯৪ খ্রী) এবং গুস্টাভ শ্‌মলের (১৮৩৮-১৯১৭ খ্রী)। ইংল্যাণ্ডেও এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির বিরূপ সমালোচনা আত্মপ্রকাশ করে ওয়াল্টার ব্যাজেট (১৮২৬-১৮৭৭ খ্রী) ও ক্লিফ লেসলির (১৮২৫ ?-১৮৮২ খ্রী) রচনাবলীর মধ্যে। ইঁহারা সকলেই ছিলেন আর্থিক তথ্য আবিষ্কার ও আলোচনার পক্ষপাতী, তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার মধ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রকে টানিয়া আনিতে ইঁহারা রাজী ছিলেন না।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি, অস্ট্রিয়ান লেখকগণের আলোচনা এবং 'ঐতিহাসিক গোষ্ঠী'র অর্থনীতিবিদ্‌গণের চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করিয়া যে অর্থনীতিবিদ্ এবার অর্থনীতিশাস্ত্রকে সুসংবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন তাঁহার নাম অ্যালফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪ খ্রী)। ইংল্যাণ্ডে জেভন্‌স যে চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, মার্শাল সেই ধারাকে পুরাতন ক্লাসিক্যাল ধারার সহিত যুক্ত করিয়া এক নবীন অর্থনীতির প্রবর্তন করিলেন। এই যুক্ত ধারাকেই বলা হয় নব-ক্লাসিক্যাল (neo-classical) অর্থনীতি। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর আলোচনায় জ্যামিতিক রেখা-চিত্রের ব্যবহার ও গাণিতিক বিশ্লেষণপদ্ধতির প্রবর্তনেও মার্শাল অন্যতম পথিকৃৎ। মার্শালের পূর্বে ফরাসী পণ্ডিত অগুস্ত্যাঁ কুর্নো (১৮০১-১৮৭৭ খ্রী) অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে গণিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফরাসী বাস্তুকার দুপুই জ্যামিতির ব্যবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মার্শাল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Principles of Economics* গ্রন্থে (১৮৯০ খ্রী) এই উভয় ধরনের আলোচনাপদ্ধতিকে তাঁহার বিশ্লেষণ-রীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মার্শালকে সংকীর্ণ অর্থে গাণিতিক অর্থনীতিবিদ্ (mathematical economist) বলা সংগত হইবে না। তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রের বাহিরে অর্থনৈতিক তথ্যাবলীর বিশ্লেষণেও মার্শাল গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

মার্শালের প্রবর্তিত নব-ক্লাসিক্যাল আলোচনারীতি অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন খণ্ডাংশের বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের (partial analysis) পক্ষে সমুপযোগী। কিন্তু এই সকল খণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে মার্শালীয় রীতি প্রায় অচল। গাণিতিক আলোচনাপদ্ধতির সহায়তায় এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করেন পূর্বে উল্লিখিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডপ্রবাসী ফরাসী অধ্যাপক লিয়ঁ হ্বালরাস। অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কি উপায়ে একটি সাম্যাবস্থা (equilibrium) প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া হ্বালরাস্ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Elements d' Economic Politique Pure* (১৮৭৪ খ্রী) রচনা করেন। মার্শালের আলোচনারীতির তুলনায় হ্বালরাসের গ্রন্থে গণিতের প্রয়োগ ছিল আরও অপরিহার্য। পরবর্তী যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থনৈতিক আলোচনায় গণিতের প্রয়োগ বিষয়ে প্রধানতঃ হ্বালরাসের নিকট হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। হ্বালরাস প্রবর্তিত রীতিকে অনুসরণ করিয়া যাঁহারা নব-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির গাণিতিক ধারাটিকে পুষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইটালীয় অর্থনীতিবিদ্ ভিলফ্রেদো পারেতো (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রী)-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতিশাস্ত্রের যে শাখাটি সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণের নীতি লইয়া আলোচনা করে (welfare economics) পারেতো সেই শাখাকে উন্নততর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ

গিয়াছেন। **মার্শাল প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এই শাখাটির** আলোচনা বিস্তার লাভ করে আর্থার সেসিল পিগুর (১৮৭৭-১৯৫৯ খ্রী) বিশিষ্ট রচনা *The Economics of Welfare* গ্রন্থে। নব-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির অন্যান্য শাখাকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইংল্যাণ্ডে ফ্র্যান্সিস এজওয়ার্থ (ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক পত্রিকা *Economic Journal*-এর প্রথম সম্পাদক) ও ফিলিপ উইক্‌স্টীড, আমেরিকায় জন বেট্‌স ক্লার্ক ও আরভিং ফিশার এবং সুইডেনে নুট্ হ্বিক্‌সেল। মার্শালের মত অধ্যাপক হ্বিকসেল-ও অর্থনৈতিক আলোচনার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ে এক প্রামাণিক গ্রন্থ *Lectures on Political Economy*, (১৯০১ খ্রী) রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী দশকে মার্শালীয় অর্থনৈতিক আলোচনার ধারায় নূতন ব্যাপ্তি আনয়ন করেন ইংল্যাণ্ডের শ্রীমতী জোন রবিনসন (১৯০৩ খ্রী), আমেরিকার এডওয়ার্ড চেম্বারলেন (১৮৯৯ খ্রী) এবং জার্মানীর ফন্ স্ট্যাকেলবার্গ (১৯০৫-১৯৪৬ খ্রী)। ইঁহাদের পূর্ববর্তী কালে অর্থনৈতিক আলোচনায় পূর্ণ প্রতিযোগিতাকে সাধারণ নিয়ম এবং একচেটিয়া কারবারকে ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতাই ছিল ব্যতিক্রম, প্রায় সকল ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানেরই কিছু না কিছু একচেটিয়া কর্তৃত্ব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত। এদিকে অর্থনীতিবিদ্‌গণের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন (১৯২৬ খ্রী) ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী ইটালীয় অধ্যাপক পিয়েরো স্রাফা। তাঁহারই প্রদত্ত সূত্র অনুসরণ করিয়া শ্রীমতী জোন রবিন্‌সন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। চেম্বারলেন ও স্ট্যাকেলবার্গও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার রীতি-নীতির নানা দিক উদ্ঘাটন করিতে সাহায্য করেন।

চতুর্থ দশকে (১৯৩১-১৯৪০ খ্রী) অর্থনীতিশাস্ত্রের অভাবনীয় বিস্তার ঘটে। অর্থনৈতিক সমাজের সর্বাত্মক সাম্যস্থিতি (general equilibrium) সম্বন্ধে হ্বালরাস যে আলোচনাপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করেন ইংল্যাণ্ডের জন রবার্ট হিক্‌স (১৯০৪ খ্রী) এবং পরে আমেরিকার পল স্যামুয়েলসন (১৯১৫ খ্রী)। কিন্তু এই দশকের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতিবিদ্ নিঃসন্দেহে জন মেনার্ড কেইন্‌স (১৮৮৩-১৯৪৬ খ্রী)। ইঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ *General Theory of Employment, Interest and Money* (১৯৩৬ খ্রী) অর্থনৈতিক আলোচনার ধারাকে অকস্মাৎ নূতন খাতে ঠেলিয়া দিল। প্রাক্-কেইন্‌সীয় অর্থনীতি ব্যাবসায়িক মন্দা, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় যে বিশ্লেষণরীতির প্রয়োগ করিত, কেইন্‌স তাহার নানাবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া এই জাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে এক নবীন বিশ্লেষণপদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন। কেইন্‌সের সমসাময়িক ও পরবর্তী অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রায় সকলেই নিজের নিজের আলোচনায় এই নবীন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংশকে পৃথক করিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করাই ছিল প্রাচীন রীতি। কেইন্‌স সমগ্রভাবে একটি অর্থনৈতিক সমাজের প্রসার ও সংকোচন লইয়া আলোচনার প্রবর্তন করিলেন। দুই রীতির এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমানে micro-economics ও macro-economics, এই দুই বিভাগে অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কেইন্‌সের খ্যাতি শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁহার প্রবর্তিত আলোচনাপদ্ধতির প্রভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সমাজে বেকারসমস্যার সৃষ্টি হইলে বিভিন্ন শিল্পে পৃথক পৃথক ভাবে মজুরি হ্রাস করিয়া সাধারণতঃ সেই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করা হয়। কেইন্‌স দেখাইলেন যে এই রীতিতে সমস্যা সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। রাষ্ট্র যদি নূতন বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তবে তাহাই হইবে এই সমস্যার একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান। এই নীতি অবলম্বন করিয়া বেকারত্বের প্রতিবিধান করাই বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি। কেইন্‌স ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হইয়াও রাষ্ট্রীয় নীতির উপর যে ধরনের নির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে পূর্বেকার ব্যবধান অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

কেইন্‌সীয় macro-economics বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হইলেও নব-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির প্রাচীন ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই ধারাকে সম্প্রতি এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্বাসিলি লিওন্তিয়েফ (১৯০৬ খ্রী)। হ্বালরাস প্রবর্তিত রীতিকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া লিওন্তিয়েফ এমন এক পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন যাহাতে আর্থিক জীবনের এক অংশে

কোনও পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য অংশে তাহার প্রভাব কিরূপ পড়িবে সে সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিবার চেষ্টা করা যায়। লিওন্তিয়েফের এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'input-output analysis'। এই পদ্ধতির বর্তমান অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া ইহাকে ত্রুটিশূন্য করিতে পারিলে অনেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অর্থনীতিশাস্ত্রেও আগামী দিনের সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব হইবে। অবশ্য, অর্থনৈতিক জীবনে কার্য-কারণ-সম্পর্ক প্রাকৃতিক জগতের কার্য-কারণ সম্পর্কের মত নিয়ত কি না সে সম্বন্ধে যতদিন সন্দেহ থাকিবে, ততদিন অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কঠিন হইবে।

হ্বালরাস তাঁহার সর্বাত্মক সাম্যস্থিতির তত্ত্বকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার গাণিতিক ভিত্তি খুব সন্তোষজনক ছিল না। আধুনিক কালে সুইডেনে ক্যাসেল ও হ্বাল্‌ড এবং আমেরিকার ফন্ নয়মান হ্বালরাস প্রবর্তিত তত্ত্বকে পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জর্জ ডানৎসিগ কর্তৃক আবিষ্কৃত এক নূতন গাণিতিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এই ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনায় আরও বেশি সংগতি আনয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। এই নূতন গাণিতিক পদ্ধতিকে 'mathematical programming' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অর্থনীতিশাস্ত্রে এ যাবৎ যে সকল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকল তত্ত্বকে বাস্তব জীবনে যাচাই করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। পরিসংখ্যানবিষয়ক আলোচনাকে অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল্যবিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে গিয়া ইদানীং অর্থনীতিশাস্ত্রের এক নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে; ইহাকে বলা হয় econometrics বা 'অর্থমিতি'। অর্থনীতিশাস্ত্রে যে ভাবে কার্য-কারণ-সম্পর্কের বিচার হয় তাহা প্রধানতঃ গুণগত (qualitative); অর্থমিতি এই গুণগত বিচারের মধ্যে পরিমাণগত (quantitative) বিশ্লেষণের প্রয়োগের পথ খুলিয়া দিয়াছে এবং এই উপায়ে অর্থনীতিশাস্ত্রকে অন্যান্য প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সমপদবাচ্য হইয়া উঠিতে সহায়তা করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক আলোচনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ নূতন ধারার সংযোজন ঘটিয়াছে। নব-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক সাম্যস্থিতির আলোচনা, তাহার মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও প্রগতির আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। এই ধরনের আলোচনার প্রাচীন ধারাটি শেষ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল-এ আসিয়াই থামিয়া গিয়াছিল। এই প্রায়-অবলুপ্ত ধারাটির পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক বিকাশের সমস্যা বাস্তব ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক বিকাশের তাত্ত্বিক আলোচনা আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে এবং এই জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথে নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organisation) পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক বিকাশের জন্য যে বিশেষ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন এবং এই সকল দেশ নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে সকল পরিকল্পনা অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, সেই সকল প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রগতির তাত্ত্বিক আলোচনা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত দশকে অর্থনৈতিক চিন্তার বিস্তারে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা প্রধানতঃ অনুন্নত আর্থিক সমাজের প্রগতি ও কল্যাণের প্রশ্ন লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। তবে ইহার সমান্তরালে অর্থনৈতিক চিন্তার অন্যান্য ধারাও যথেষ্ট সজীবতার সহিত প্রবাহিত হইতেছে। 'অর্থনীতি' ও 'আর্থিক উন্নতি' দ্র।

দ্র C. Gide and C. Rist, *A History of Economic Doctrines*, New York, 1915; L. H. Haney, *History of Economic Thought*, New York, 1911; T.W.Hutchison, *A Review of Economic Doctrines, 1870-1929*, Oxford, 1953; J. A. Schumpeter, *Ten Great Economists*, London, 1951; *History of Economic Analysis*, London, 1961; B. B. Seligman, *Main Currents in Modern Economics*, Glencoe, 1962.

ধীরেশ ভট্টাচার্য

অর্থমিতি অর্থনীতি দ্র

অর্থশাস্ত্র অধুনা যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয় প্রাচীন ভারতে তাহার নাম ছিল অর্থশাস্ত্র। মহাভারতে (১২।১।৫৮-৬৩) ইহাকে রাজ্যশাস্ত্র বা রাজশাস্ত্র (১২।৫৮।১-৩) বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকার হিন্দী পরিভাষা-সংকলনে ধনবিজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অর্থশাস্ত্র। কিন্তু কৌটিল্য উহাকে 'বার্তা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার মতে, যে বিদ্যার দ্বারা পৃথিবী বা ভূমি লাভ এবং পালন করিবার উপায় জানা যায় তাহাই অর্থশাস্ত্র। পঞ্চতন্ত্রের মতে অর্থশাস্ত্রের অপর নাম নীতিশাস্ত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং দশকুমারচরিতে অর্থশাস্ত্রকে দণ্ডনীতি বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বেও বহু পণ্ডিত দণ্ডনীতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পূর্ববর্তী পাঁচ জন প্রখ্যাত আচার্যের প্রবর্তিত পাঁচটি বিশিষ্ট ধারার উল্লেখ আছে। এইগুলি হইল— মানব, বার্হস্পত্য, ঔশনস, পারাশর এবং আম্ভীয়। ইহা ব্যতীত কৌটিল্য, ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌনপদন্ত, বাতব্যাধি, বাহুদন্তিপুত্র, পরাশর, কাত্যায়ন, চারায়ণ, ঘোটমুখ প্রমুখ পূর্বাচার্যগণের নামোল্লেখ এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কৌটিল্যের কতদিন পূর্বে অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। জয়সওয়াল ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। আলতেকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কাছাকাছি হইবে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে কৌটিল্য যে সকল আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের অপেক্ষা প্রাচীন কালের লোক নহেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৫৯ অধ্যায়) বলা হইয়াছে যে প্রথমে ব্রহ্মা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এক লক্ষ অধ্যায়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা হইতে সংক্ষেপ করিয়া বিশালাক্ষ নীতি বা রাজ্য বিষয়ে দশ হাজার অধ্যায়ে লেখেন। ইন্দ্র উহা অধ্যয়ন করিয়া বাহুদন্তক নামে পাঁচ হাজার অধ্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৃহস্পতি উহাকে সংক্ষেপ করিয়া তিন হাজার অধ্যায় করেন; এবং উশনস (শুক্র) আবার উহা ছোট করিয়া এক হাজার অধ্যায়ে লেখেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১৫-৮) আছে যে প্রজাপতিকৃত গ্রন্থের অর্থসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি বৃহস্পতি সহস্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন।

অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, দণ্ডের স্বরূপ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের বিচার প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনা কিছু কিছু থাকিলেও, মূলতঃ ইহা রাজ্যশাসনের সদুপায় সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জ্ঞান বিতরণের জন্যই রচিত। অর্থশাস্ত্রে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন এবং সমর সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে আলোচনা আছে। এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। গুপ্তযুগে কামন্দকীয় নীতিসার এবং খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে বার্হস্পত্যসূত্র রচিত হয়। শুক্রনীতিসার অর্থশাস্ত্র বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; ইহার অধিকাংশভাগ খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে রচিত। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহাতে কিছু কিছু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়।

অর্থশাস্ত্রের অনেকগুলি বিষয় মহাভারত (বন ১৫০; সভা ৫; উদ্যোগ ৩৩-৩৪; শান্তি ১-১৩০; আশ্রমবাসিক ৫-৭ অধ্যায়), রামায়ণ (অযোধ্যা ১৫, ৬৭ এবং ১০০; যুদ্ধ ১৭-১৮ এবং ৬৩ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণ (২১৮-২৪২), গরুড়পুরাণ (১০৮-১১৫), মৎস্যপুরাণ (২১৫-২৪৩), মার্কণ্ডেয়পুরাণ (২৪) এবং কালিকাপুরাণ (৮৭ অধ্যায়) প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনু (৭-৯), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩০৪-৩৬৭), বৃদ্ধহারীত (৭।১৮৮-২৭১) এবং বৃহৎপরাশরস্মৃতিতে (১০) এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সোমদেবসূরি (৯৫৯ খ্রী) নীতিবাক্যামৃতে, ভোজযুক্তিকল্পতরুতে (আনুমানিক ১০২৫ খ্রী), সোমেশ্বর (আনুমানিক ১১২৭-১১৩৮ খ্রী) মানসোল্লাসে এবং লক্ষ্মীধর কৃত্যকল্পতরুর অন্তর্গত রাজনীতিকাণ্ডে (আনুমানিক ১১২৫ খ্রী) দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। চতুর্দশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে দেবনভট্ট রাজনীতিকাণ্ড, মিথিলার চণ্ডেশ্বর (আনুমানিক ১৩১৫ খ্রী) রাজনীতিরত্নাকর, বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেবরায় অমুক্তমাল্যদ (আনুমানিক ১৫২৫ খ্রী), নীলকণ্ঠ (আনুমানিক ১৬২৫ খ্রী), নীতিময়ূখ এবং মিত্রমিশ্র (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রী) রাজনীতিপ্রকাশ নামক অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের ন্যায় স্বাধীন এবং মৌলিক চিন্তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্র রাধাগোবিন্দ বসাক, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৫০; Narendranath Law, *Aspects of Ancient Indian Polity*, Calcutta, 1921; R. C. Majumdar, *Corporate Life in Ancient India*, Calcutta, 1922; Upendranath Ghoshal, *A History of Indian Political Theories*, Calcutta, 1923; Upendranath Ghoshal, *A History of Indian Political Ideas*, Calcutta, 1959; Kasiprasad Jayaswal, *Hindu Polity*, 1924; Ananta Sadasiva Altekar, *State*

and Government in Ancient India, Patna, 1958.

বিমানবিহারী মজুমদার

অর্থশাস্ত্র রাজনীতি বিষয়ে প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ইহা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য কর্তৃক রচিত। দণ্ডী, বাণভট্ট, পঞ্চতন্ত্র এবং কামন্দক প্রভৃতির সাক্ষ্য হইতেও মনে হয় কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত এবং চাণক্য এক ব্যক্তিরই নাম এবং ইনিই 'অর্থশাস্ত্রে'র রচয়িতা। কিন্তু গ্রন্থখানি চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রীর রচনা বলিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন না। তাঁহাদের প্রধান যুক্তিগুলি এই— ১. গ্রন্থমধ্যে অনেক-স্থলে 'ইতি কৌটিল্যঃ', 'নেতি কৌটিল্যঃ' প্রভৃতি হইতে মনে হয় ইহা কৌটিল্যরচিত নহে। ২. 'কুটিল' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন 'কৌটিল্য' পদটি নিন্দাসূচক ; সুতরাং চাণক্য নিজের গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। ৩. বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র সঙ্গে 'অর্থশাস্ত্রে'র বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হেতু মনে হয়, গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকালের ব্যবধান অধিক নহে ; বাৎস্যায়নের কাল তৃতীয় শতকের পূর্বে নহে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাল চতুর্থ শতক। ৪. মৌর্যগণ ও চন্দ্রগুপ্তের সভার উল্লেখ করিলেও কৌটিল্যের উল্লেখ পতঞ্জলি করেন নাই। ৫. অর্থশাস্ত্রে কুত্রাপি চন্দ্রগুপ্ত বা তদীয় রাজধানী পাটলিপুত্রের উল্লেখ নাই। উক্ত আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, অর্থশাস্ত্র সম্ভবতঃ কৌটিল্যের পরম্পরালব্ধ উপদেশাবলী অবলম্বনে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত বা সংকলিত হইয়াছিল।

'অধিকরণ' নামক ১৫টি ভাগে অর্থশাস্ত্র বিভক্ত এবং প্রতিটি অধিকরণ কতক প্রকরণে বিভক্ত ; প্রকরণগুলির মোট সংখ্যা ১৮০। অন্য প্রকারে ইহা কতক অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়ের শেষে কতক শ্লোকে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থটি সূত্র এবং ভাষ্যের আকারে রচিত। মাঝে মাঝে শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; মোট শ্লোকসংখ্যা ৬০০০। অধিকরণগুলির আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ— ১. রাজকুমারগণের শিক্ষা, মন্ত্রীর যোগ্যতা, বিবিধ গুপ্তচর, রাজার দৈনিক কর্তব্য ; ২. বিভিন্ন বিভাগ ও উহাদের অধ্যক্ষ, নগর ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের শাসনপ্রণালী এবং গণিকাবৃত্তির পরিচালনা ; ৩. দেওয়ানী আইন ; ৪. সমাজের কণ্টকশোধন ও ফৌজদারী আইন ; ৫ রাষ্ট্রের শত্রুনিরসন ও রাজকোষের পূরণপদ্ধতি, সরকারি কর্মচারীগণের বেতন ; ৬-৭. সপ্ত রাজ্যাঙ্গ ও ছয় নীতি ; ৮. রাজার ব্যসন ও রাজ্যের বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি দুর্বিপাক ; ৯-১০. সামরিক অভিযান ; ১১. পৌরপ্রতিষ্ঠান ও গণ (guild) ; ১২-১৩. যুদ্ধজয়ের এবং বিজিত দেশবাসীর প্রীতি অর্জনের পদ্ধতি ; ১৪. মায়ারূপ-ধারণ, রোগবিস্তার প্রভৃতির উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ; ১৫. গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

অর্থশাস্ত্রের ভাষা সাধারণতঃ সহজবোধ্য ; কিন্তু স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহাতে কতক অ-পাণিনীয় শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের দুইটি টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে— একটি ভট্টস্বামীর 'প্রতিপদ্‌পঞ্চিকা', অপরটি মাধবযজ্বার 'নয়চন্দ্রিকা'।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্ধনারীশ্বর শিব ও পার্বতীর সংযুক্ত মূর্তি। অর্ধনারীশ্বরের ধারণা প্রাচীন গুপ্ত যুগেও প্রচলিত ছিল। কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর নান্দীতে শিবকে 'কান্তাসংমিশ্রদেহ' বলিয়াছেন। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে কুষাণ যুগেও এই মূর্তি প্রচলিত ছিল। গুপ্তোত্তর যুগে অর্ধনারীশ্বরের বহু বিগ্রহ পাওয়া যায়। মূর্তির দক্ষিণভাগে সায়ুধ অর্ধশিব, বামাংশে অর্ধপার্বতী। তবে দক্ষিণ ভারতে কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। মূর্তিগুলি সাধারণতঃ স্থানক। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে নৃত্যপর এই সংমিশ্রমূর্তি বিশেষ দর্শনীয়।

দ্র T. A. Gopinatha Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. II, Madras, 1916 ; J. N. Banerjea, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956 ; *Indian Archaeology. 1960-61—A Review*, New Delhi, 1961.

দেবলা মিত্র

অর্ধমাগধী একটি বিশেষ প্রাকৃত ভাষা। এই ভাষায় জৈন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলি রচিত। সেইজন্য জৈন বৈয়াকরণেরা এই ভাষাকে আর্ষ প্রাকৃত অথবা আর্ষ ভাষা বলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে অথবা কবিতায় অর্ধমাগধীর ব্যবহার নাই। তবে সর্বাপেক্ষা পুরানো সংস্কৃত নাটক যাহা পাওয়া গিয়াছে, অশ্বঘোষের দুইটি নাটকের খণ্ডিত অংশ, তাহাতে কোনও কোনও পাত্রের মুখে এমন এক প্রাকৃত দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে অর্ধমাগধীর প্রাচীনতর রূপ বলিতে পারি। পণ্ডিতেরা সে ভাষাকে প্রাচীন অর্ধমাগধী বলেন। অর্ধমাগধীর আরও প্রাচীনতর রূপ বুদ্ধের কথ্য ভাষা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

নামেই প্রকাশ যে অর্ধমাগধীর লক্ষণে মাগধীর অর্ধেক লক্ষণ আছে। অর্ধমাগধী প্রাকৃতের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে এইগুলি : ১. পদান্ত -অস্ > -ও, -এ ; ২. র > ল (সর্বদা নয়, কখনও কখনও) ; ৩. স্বরমধ্যবর্তী লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থানে য় (অর্থাৎ য়-শ্রুতি) ; ৪. আত্মনেপদী ক্রিয়াপদের অল্পস্বল্প ব্যবহার।

সুকুমার সেন

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি (১৮৫০-১৯০৯ খ্রী) বঙ্গীয় নাট্যশালার একজন অবিস্মরণীয় পুরুষ। নাট্যলোকে মুস্তফি সাহেব নামেই তিনি সুপরিচিত।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অর্ধেন্দুশেখর বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্যামাচরণ মুস্তফি। অতি শৈশবকাল হইতেই অর্ধেন্দুশেখর নাট্যানুরাগী। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতা অর্ধেন্দুশেখরের পিতৃস্বসা। সেই রাজবাড়িতেই অর্ধেন্দুশেখরের জীবনের একাংশ অতিবাহিত হয়। রাজবাড়ির মঞ্চে প্রায়ই নাট্যাভিনয় হইত। অভিনয়ের দিন আনন্দ-উত্তেজনায় বালক অর্ধেন্দুশেখর স্নানাহার পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর কয়লাহাটায় অভিনীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামে এক প্রহসনে অর্ধেন্দুশেখর প্রথম অংশ গ্রহণ করেন। এবং একাধিক ভূমিকায় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন।

অনতিকাল পরে অর্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে 'সধবার একাদশী'তে অভিনয় করেন। স্বয়ং নাট্যকার পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যাঁহাদের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্ধেন্দুশেখর তাঁহাদের অন্যতম। বহু নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত অর্ধেন্দুশেখর নানা ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় যত উপকৃত হইয়াছে, তত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। অর্ধেন্দুশেখর একাধারে নট ও নাট্যাচার্য।

হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অনবদ্য। গুরুগম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেবের ভূমিকাভিনয়ে তিনি তুলনারহিত। নাটকের ক্ষুদ্র ভূমিকাও তাঁহার অভিনয়গুণে অসাধারণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অর্ধেন্দুশেখর যে অংশ স্পর্শ করিতেন, গিরিশচন্দ্রের মতানুসারে, তাহাই অননুকরণীয় হইত।

অর্ধেন্দুশেখর 'নীলদর্পণে' উডসাহেব, 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধর, 'আবুহোসেনে' আবুহোসেন, 'জনা'য় বিদূষক, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্‌গজ, 'সিরাজদ্দৌলা'য় ড্রেক, 'মীরকাশিমে' হলওয়েল, হে, মেজর অ্যাডাম্‌স, 'প্রফুল্লে' রমেশ, 'রিজিয়া'য় ঘাতক, 'প্রতাপাদিত্যে' রডা এবং আরও বহু নাটকে বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। নাট্যাচার্যরূপে অর্ধেন্দুশেখর বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন : "অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি— বিধাতার হাতে গড়া একটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক, অর্ধেন্দু ছিল সেই রকম মাস্টার, যিনি কখনও কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না ; একটা দু'কথার পার্টের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ।"

কোনরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও অর্ধেন্দুশেখর রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

অরবিন্দ গুহ

অর্ধোদয় যোগ অতি পুণ্য যোগ। পৌষ-মাঘ মাসের অমাবস্যা রবিবার, ব্যতীপাতযোগ ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই যোগ হয়। ইহা কোটি সূর্যগ্রহণের সমান। অর্ধোদয় যোগে সমস্ত জল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করে, সমস্ত ব্রাহ্মণ শুদ্ধাত্মা ও ব্রহ্মতুল্য হন। এই উপলক্ষে কৃত দান বিশেষ পুণ্যজনক। দিবসেই এই যোগ প্রশস্ত, রাত্রিতে নয় (দ্র রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বের শেষাংশ)। এই যোগ দীর্ঘকাল পর পর সংঘটিত হয়। গত একশত বৎসরের যোগের তারিখ এইরূপ— বঙ্গাব্দ ১২৭০, ২৭ মাঘ ; ১২৯৭, ২০ মাঘ ; ১৩১৪, ১৯ মাঘ ; ১৩৪১, ২০ মাঘ ; ১৩৬৮, ২১ মাঘ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অর্হৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যোগ্য, সম্মানীয়, পূজনীয়, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ইত্যাদি। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে সাধারণভাবে সকল সন্ন্যাসীকেই এই বিশেষণে অভিহিত করা যাইত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে একমাত্র তাঁহারাই অর্হৎ বলিয়া গণ্য যাঁহারা তৃষ্ণামুক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্মজীবনের পরম লক্ষ্য নির্বাণকে উপলব্ধি করিয়াছেন। অর্হৎ মাত্রই রাগ-দ্বেষ-মোহ এবং কামনা-বাসনা মুক্ত, তিনি কৃতকৃত্য ও জীবনের যাবতীয় ব্রতসম্পন্ন, জাগতিক ভাব হইতে মুক্ত, পরমার্থ প্রাপ্ত এবং সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। কাম, ভব (জন্ম), অবিদ্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার আস্রব (আসক্তি) হইতে মুক্ত হইলে

ভিক্ষু অর্হৎ নামে অভিহিত হন। ধ্যান ও প্রজ্ঞার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নির্বাণলাভের যে মার্গ বা উপায়ের (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) বর্ণনা বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায় সেই মার্গের সর্বশেষ স্তর হইল অর্হৎ। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনও বয়সেই অর্হত্ত্ব লাভ সম্ভব। বুদ্ধের সহিত একজন অর্হৎ-এর পার্থক্য শুধু এই যে বুদ্ধ কতিপয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞ, তাহা একজন অর্হৎ-এর আয়ত্তের বাহিরে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পালি ও অন্যান্য বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতমবুদ্ধ ব্যতীত আরও অনেক বুদ্ধের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। তবে বুদ্ধগণ অর্হত্ত্বের অধিকারী। বুদ্ধের বর্ণনায় ত্রিপিটকে সর্বত্র অর্হৎ শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়।

বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য দেশের ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্টস-এর আদর্শে গঠিত মুখ্যতঃ ভারতীয় প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের সম্মিলন। প্রথম অনুষ্ঠানের তারিখ ৫, ৬, ৭ নভেম্বর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। সাধারণতঃ একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পর আর একটি অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সংখ্যা ২১। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বা রাজা-মহারাজাদের আমন্ত্রণে এক-একবার এক-এক স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ইহার আদিনাম ইণ্ডিয়ান ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার সপ্তম অধিবেশনে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে ইহার নূতন নাম হয় অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স বা নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলন। সম্মিলনে ভারত ও তৎ-সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। এইজন্য সম্মিলন বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়। বর্তমানে বিভাগসংখ্যা ১৬টি: বেদ, ইরান (সংস্কৃতি), লৌকিক সংস্কৃতি, ইসলামীয় সংস্কৃতি, আরবী ও ফারসী, পালি ও বৌদ্ধ ধর্ম, প্রাকৃত ও জৈন ধর্ম, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, দ্রাবিড়ীয় চর্চা, ধর্ম ও দর্শন, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা, বৃহত্তর ভারতীয় চর্চা, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি, পণ্ডিত-পরিষদ্। প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের উৎকর্ষসাধনের জন্য সম্মিলন বিশেষ আগ্রহশীল। এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ভারততত্ত্ব প্রতিষ্ঠান গঠন, প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি-সংগ্রহ, অনুশীলনের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় পুথি-পর্যালোচনা বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সম্মিলন অনেক দিন যাবৎ ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সম্মিলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনা।

দ্র K. V. Sarma, *Index of Papers, All-India Oriental Conference, 1919-1945, 1945-1954*, Poona, 1949-1959 ; *Transactions and Proceedings*, 1919—.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অলংকার[১] স্বরসমূহের বিশিষ্ট ও পরম্পরাযুক্ত প্রয়োগকে সংগীতশাস্ত্রে অলংকার বলে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

অলংকার[২] অঙ্গশোভাবর্ধনের জন্য অলংকারের উদ্ভব হইয়াছে, সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত। পরবর্তী কালের সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য হইলেও ইহার ব্যবহার যে এই উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল এইরূপ অনুমানের হেতু নাই। দেহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিবার জন্য পত্র, পুষ্প, শোলার ন্যায় ভঙ্গুর ও অল্পক্ষণস্থায়ী দ্রব্যগুলির ব্যবহারের নাম সজ্জা বা সাজ, তাহা ভূষণ বা অলংকার নহে। যে বস্তুকে বারংবার দীর্ঘকাল ধরিয়া অঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাকেই অলংকার বলা হয়।

কোনও দ্রব্য বা পদার্থ ভাল লাগিয়া গেলে তাহা সংগ্রহ করিয়া সম্পত্তি হিসাবে রাখিবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। তদুপরি যদি মনে হয় দ্রব্যটির ব্যবহারে মঙ্গল হইবে, অর্থাৎ শত্রু-মিত্র সকলের উপর জাদুবলে প্রভাব বিস্তার করা যাইবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে, তাহা হইলে দ্রব্যটিকে সংগ্রহ করিয়া স্থায়ীভাবে ধারণ করা স্বাভাবিক। আদিম মানব, সারমেয় বা অন্য কোনও শ্বাপদের নখ ও দন্ত, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর চোয়াল, ঝিনুক অথবা শুক্তি বা রঙিন পাথর ইত্যাদিতে ছিদ্র করিয়া সেইগুলি অলংকাররূপে ব্যবহার করিত। তাহার কারণ দেহের শোভাবৃদ্ধি নয় বলিয়াই মনে হয়, বরং ইহার কারণ অন্যবিধ হওয়াই সম্ভব। মার্জিতরুচি বর্তমান যুগেও হীরক, প্রবাল, চুনি, পান্না প্রভৃতির কাট বা সেটিং উচ্চ স্তরের হইলেও তাহাদের ব্যবহারের সময়ে ধারকের পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গল ফলাফলের বিচার করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারীকে বন্দী করিয়া যে নিগড় বাঁধা হইত, তাহা হইতে কালক্রমে কোনও কোনও গহনার উদ্ভব হয়।

আদিম কালে এবং সভ্যতার প্রথম যুগে নারী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের প্রবণতা দেখা

গিয়াছে। সেই সময়কার গহনায় কারুকৌশলেরও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শিল্পপর্যায়ে উন্নীত হইবার প্রথম দিকে সহজলভ্য বা দুর্লভ যে কোনও উপকরণের অলংকার আদরণীয় ছিল। সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় দুর্লভ উপাদানের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে এবং উজ্জ্বল বর্ণের প্রস্তর অর্থাৎ মণিরত্ন বা উপল, কষ্টলভ্য হস্তিদন্ত ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঢালাইয়ের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পর ধাতুনির্মিত কারুকার্যময় গহনার প্রচলন হয়। কারুশিল্পদক্ষতা অবশ্য প্রস্তর যুগের শিল্পীও অর্জন করিয়াছিল; সাধারণ পদার্থকে শিল্প-কৌশলের দ্বারা অসাধারণ রূপ দিবার প্রয়াস তখনও করা হইত।

প্রস্তর যুগের পর তাম্র বা কাংস্য যুগ অলংকারশিল্পীর প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। এই যুগে শিল্পী ধাতুখণ্ডকে বিশেষ আকৃতি দান করিয়া বা পাতের উপর চিত্রাঙ্কন ফুটাইয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিবার নূতন সুযোগ লাভ করে। এই যুগেই প্রস্তর কর্তন, ধাতুর উপর প্রস্তর সংযোজন ইত্যাদির কৌশলও উদ্ভাবিত হয়। কাচ এবং মিনা-র কাজ প্রভৃতি পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে অলংকারের রূপ, আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়োবাসীদের নিকট অলংকার অতি আদরের বস্তু ছিল। হার, চুলের বন্ধনী, বলয় ও আংটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত। মেখলা, কানের দুল বা কানবালা, পায়ের মল ইত্যাদির ব্যবহার স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ধনী ব্যক্তির গহনা সাধারণতঃ সোনা, রুপা, ফায়েন্স (faience), গজদন্ত ও মূল্য-বান পাথর দিয়া প্রস্তুত হইত। সাধারণ স্তরের ব্যক্তিদের গহ-নার উপকরণ ছিল শাঁখ, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটি। মেখলাগুলিতে লম্বা নলের মত মালার লহর থাকিত। লহরগুলি তামা বা ব্রোঞ্জের ফাঁড়ির (spacer) ভিতর দিয়া প্রবেশ করানো হইত এবং দুই দিকে দুইটি মুখসাজ (terminal) থাকিত। কণ্ঠহারেরও ব্যবহার ছিল, এইগুলি সাধারণতঃ লম্বা নলাকৃতি (barrel-shaped), গোলাকার, দন্তুরচক্র (cog-wheel) ইত্যাদি নমুনার মত। সোনা, রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখ, হাড়, মসৃণ পাথর, কাচজাতীয় মণ্ড (paste) এবং পোড়ামাটি দ্বারা এইগুলি তৈয়ারি হইত। উজ্জ্বল মূল্যবান পাথর দিয়া নানাপ্রকারের মালা প্রস্তুত হইত। বলয় সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখ, ফায়েন্স ও পোড়ামাটি দিয়া প্রস্তুত হইত। সম্ভবতঃ বলয় শুধু বাম হাতে বাহু হইতে কব্জি পর্যন্ত পরা হইত। রুপা ও তামার আংটি খুব সাধারণ ধরনের ছিল।

দুষ্প্রাপ্য সুতরাং মূল্যবান বস্তু যে অলংকারের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইত তাহার উদাহরণ কাচ। বর্তমান যুগে অলংকারের উপাদান হিসাবে কাচের বিশেষ মূল্য নাই, কিন্তু বৈদিক যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞে বলির অশ্বের মূল্যবান অলংকাররূপে ইহা ব্যবহৃত হইত। চাণক্যের সময়েও কাচমণি নাম লইয়া ইহা রাজরত্নাগারে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য এই কাচ বর্তমান কালের কলে প্রস্তুত কাচ নহে।

ঋগ্‌বেদে দেবতাদের অলংকারের বর্ণনা আছে। রুদ্রের বর্ণনায় স্বর্ণাভরণের উল্লেখ আছে, অসুরগণও নানা প্রকার মণি-কাঞ্চনের অলংকার পরিধান করিত। রামায়ণ-মহাভারতে কুণ্ডল, কবচ, কিরীট, বলয় ইত্যাদি গহনার উল্লেখ আছে। ইহার কয়েকটি গহনার নাম বহুকাল পর্যন্ত এ দেশে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভাস্কর্য ও প্রাচীরচিত্রেও এই সকল গহনার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে মুক্তাহার জাতীয় কয়েকটি অলংকারের বর্ণনা আছে। সেই সময়ে জড়োয়ার কাজে যে সোনা ব্যবহৃত হইত তাহাতে দশ ভাগ স্বর্ণে চার ভাগ রুপা বা তামা অথবা সমান ভাগে মিশ্রিত সোনা ও তামা থাকিত।

গহনাগুলির গড়ন কতকটা আদিম ধরনের হইলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময়ে অলংকারের শিল্পকার্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। গলার বেলনাকার কারুকার্যখচিত ধাতুখণ্ডের মালা, মণিবন্ধের চওড়া ব্রেস্‌লেট, পায়ের বৃহদাকার বাঁকা মল, গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঘোরানো গহনা, কানে প্রকাণ্ড লম্বমান কুণ্ডল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। মণি কর্তন, মসৃণ ও ছিদ্রীকরণ প্রভৃতি কার্যে এই সময়কার মণিকারগণ দক্ষ ও রুচিসম্পন্ন ছিলেন। পিপারোয়া (Piparawa) -য় প্রাপ্ত ভাণ্ডের দ্রব্যগুলি তাহার নিদর্শন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর অলংকারগুলির মধ্যে নানা প্রকারের বৈচিত্র্য দেখা যায়। গান্ধার ও ইরানের সহিত ভারতের যোগাযোগের ফলে সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিয়াছিল। অলংকারের গড়ন অধিকতর মার্জিতরুচির হইয়া উঠে এবং মাপ ও ওজন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অজন্টা গুহার চিত্রাবলী এবং মথুরা ও উড়িষ্যা বা মধ্য ভারতের ভাস্কর্যে নানা ধরনের গহনাগুলি হইতে মনে হয় মধ্যযুগে অলংকারশিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই সময়ের অলংকার অধিকতর কারুকার্যসম্পন্ন। গ্রথিত মুক্তা বা নল, গোল বা অন্য গড়নের ছিদ্রযুক্ত ধাতুখণ্ডের মালার খুব আদর ছিল। এইরূপ গ্রথিত গহনা দেহের অঙ্গসমূহে ব্যবহার করা হইত। ক্রমশঃ ধাতুখণ্ডগুলির পরিবর্তে

মণি-মুক্তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৈদিক যুগেও মণি-মুক্তার ব্যবহার ছিল (যজ্ঞের বর্ণনা, শতপথব্রাহ্মণ দ্র) কিন্তু এই সময়কার রচনাকৌশলে উচ্চস্তরের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পর গ্রথিত গহনার ব্যবহার হ্রাস পাইয়া বলয়, কবচ, কুণ্ডল ইত্যাদির ন্যায় এক খণ্ডে নির্মিত অলংকারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তারের পেটাইয়ের এবং জড়োয়া-কাজের গহনার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। ক্রমে গহনার গড়নে নিপুণ পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্য এবং নির্মাণকৌশলে লালিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। এই সময়েই বোধ হয় সোনা ও রুপার কট্‌কি কাজ এবং মিনা-র কাজের প্রচলন হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতকের গহনাগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়।

অজন্টা গুহাচিত্রাবলীতে নথ, ফুল, নোলক, নাকছাবি প্রভৃতি নাকের গহনা এবং চুট্‌কি, নূপুর ইত্যাদি পায়ের গহনা দেখা যায় না, যদিও কানের মাকড়ি, ডুল ও হাতের বালা, ব্রেস্‌লেট, বাজু ও তাবিজ দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনার্কের সূর্যমন্দিরের ভাস্কর্য-মূর্তিগুলি হইতে সমসাময়িক অলংকারশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কারুকার্যের নৈপুণ্যে, সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় গঠনকৌশলের লালিত্যে অপরূপ। গ্রথিত, পেটা, ফাঁপা, মণি-মুক্তার সেটিং ইত্যাদি সকল প্রকার কাজের উৎকৃষ্ট নিদর্শন মূর্তিগুলিতে রহিয়াছে। সোনা-রুপায় ঝাল দেওয়ার বিদ্যাও এ দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বিদেশী শাসনের ফলে অন্যান্য শিল্পের সহিত অলংকারশিল্পেরও উন্নতি ব্যাহত হইয়াছিল। নূতন ধরনের নমুনা ও গঠনপদ্ধতির সহিত সম্যক্ রূপে পরিচিত হইতে হিন্দু শিল্পীগণকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই কালের মধ্যে নূতন কিছু গড়িয়া উঠে নাই, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি-মাত্র বজায় ছিল। অবশ্য বিদেশ হইতে আনীত কিছু কিছু নূতন গহনার প্রচলন হইয়াছিল।

বিদেশী প্রভাব কিছুকাল স্থায়ী হওয়ার ফলে প্রাচীন কলার আদর্শ উত্তর ভারত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চিত্রে, মূর্তিতে এবং ধাতব শিল্পসামগ্রীতে এই আদর্শ ও রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়কার দক্ষিণ ভারতের প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিগুলি হইতে অলংকারশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনুকরণ বলিয়াই বোধ হয়; কেবল মাদুরার বড় মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি এবং রামেশ্বরের মন্দিরের কয়েকটি স্ত্রীমূর্তির অঙ্গে নূতন ধরনের কিছু অলংকার দেখা যায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অলংকারের কিছু বর্ণনা বিদেশী পর্যটক মানুচির পুস্তকে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকদের এই সব গহনার কথা তিনি বলিয়াছেন: কণ্ঠে— নানা প্রকারের হার। পদে— মণিখচিত কয়েক প্রকারের গহনা। কর্ণে— শুধু বৃহৎ ছিদ্রের কথা বলিয়াছেন, কোনরূপ কর্ণাভরণের উল্লেখ করেন নাই।

দক্ষিণদেশের অল্পবয়স্কদের গহনা: কটিদেশে— হার। পদে— ঘুঙুর। পদাঙ্গুলিসমূহে— চুট্‌কি।

মানুচি তাঁহার পুস্তকে এইরূপ বলিয়াছেন যে মোগল রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ নিম্নলিখিত গহনাসমূহের ব্যবহার করিতেন. কণ্ঠে— তিন ছড়া মুক্তার কণ্ঠী বা চিক; তিন হইতে পাঁচ ছড়ার খুব লম্বা মুক্তার শলি। সীমন্তে— চন্দ্রাকারের টিক্‌লিসমন্বিত মুক্তার সিঁথি। কর্ণে —মহামূল্যবান মণি। গলদেশে— মুক্তা বা মণির বৃহৎ মালা, মালার মধ্যস্থলে মহামূল্যবান চুনি, পান্না বা হীরকের ধুকধুকি। বাহু ও হস্তে— ছোট ছোট মুক্তার থোপাসংযুক্ত মণিখচিত বাজুবন্ধ, বালা, কঙ্কণ, মুক্তার মান্তাসা। অঙ্গুলিতে— প্রত্যেক অঙ্গুলিতে মণিসংবলিত আংটি, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটিটি মুকুরসংবলিত। পদে— মূল্যবান মল ও মুক্তার মালা। উপরন্তু পায়জামার কটিবন্ধের দড়ির দুই মুখে পাঁচ অঙ্গুলিপ্রমাণ পনর ছড়া মুক্তার থোপা থাকিত।

জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহান নূতন নূতন গহনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

রাজপুত রাজাদের আমল হইতে রাজস্থানের জয়পুরে মণিকর্তন, মণিসংযোজন বা সেটিং এবং মিনা-র কাজের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানেও এখানকার কাজ প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্যের কয়েকটি শহরের এবং মহারাষ্ট্রের পুনায় নির্মিত প্রাচীন নকশার গহনাগুলির খ্যাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আদৌ অবিমিশ্র হিন্দু অলংকারশিল্প বলিয়া কিছু ছিল কিনা বলা কঠিন। আসীরীয় বা গ্রীক প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু অজন্টার কাল হইতে ভুবনেশ্বরের সময় পর্যন্ত দীর্ঘকাল ভারতীয় অলংকারশিল্পের যে একটি বিশেষ ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই শিল্পরীতির পরিকল্পনা, গঠন-বিন্যাস বা কারুকৌশল সমস্তই ভারতীয় শিল্পীগণের দ্বারা উদ্ভাবিত।

অলংকারশাস্ত্র

ইংরেজ সভ্যতার প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে অলংকারশিল্পে কিছু কিছু ইওরোপীয় ঢঙের ও নামের গহনার আদর হয়; যেমন, শিরে টায়রা, কর্ণে ইহুদি মাকড়ি, ড্রপ, গলায় নেকলেস, মুক্তার কলার, মাফ্ চেন ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার পর হইতে বিদেশী ঢঙের গহনার কদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে প্রাচীন ধরনের ও গড়নের অলংকারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে।

দ্র কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো, কলিকাতা, ১৯৬১; কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, গহনা, প্রবাসী, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ; Rajendralal Mitra, *Indo-Aryans*, vol. I, Calcutta, 1881.

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অলংকারশাস্ত্র প্রাচীন ভারতে কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের জন্য যে সমালোচনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়, তাহাই কালক্রমে অলংকারশাস্ত্ররূপে পরিচিত হয়। যদিও পরবর্তী কালে 'অলংকার' শব্দটি অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থের শোভাহেতু কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্মকেই পারিভাষিকভাবে বুঝাইয়া থাকে, তথাপি ব্যাপক অর্থে কাব্যশোভাহেতু যে কোনও উপাদানকেই 'অলংকার' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিতেও পারা যায়। বামনাচার্য তাঁহার 'কাব্যালংকারসূত্রে' এই ব্যাপক অর্থেই 'অলংকার' শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন— 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। সৌন্দর্যমলংকারঃ।' (কা সূ. ১।১।১-২)। তাঁহারও পূর্ববর্তী আচার্য দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' নামক নিবন্ধে বলিয়াছেন— 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকারান্ প্রচক্ষতে।' সুতরাং এই ব্যাপক অর্থে কাব্যের গুণ, রীতি, বৃত্তি, লক্ষণ প্রভৃতি সৌন্দর্যসম্পাদক যাবতীয় উপাদানকেই 'অলংকার' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায়। সেই কারণে অলংকারশাস্ত্রে অনুপ্রাস-উপমাদি পারিভাষিক অলংকারসমূহেরই যে কেবলমাত্র আলোচনা হইয়াছে তাহা নহে; গুণ, রীতি, বৃত্তি, রস, দোষ প্রভৃতির স্বরূপবিশ্লেষণও অলংকারশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে পরিগণিত। অতএব অলংকারশাস্ত্র সা হি ত্য বি চা র শা স্ত্রে র ই নামান্তরমাত্র। ইংরেজীতেও ইহাকে 'Poetics' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করিলে নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। সংস্কৃতে 'কাব্যমীমাংসা', 'কাব্যলক্ষণ', 'সাহিত্যমীমাংসা' প্রভৃতি সংজ্ঞাও এই ব্যাপক অর্থে অলংকারশাস্ত্রের পর্যায়রূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। মহর্ষি যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে 'উপমা' অলংকারের স্বরূপ নির্বচন করিয়াছেন (নিরুক্ত ৩।১৩-১৮)। অতিশয়োক্তি, রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতি বিচিত্র অলংকারের বহু নিদর্শনও বৈদিক সূক্তসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নামক প্রসিদ্ধ নিবন্ধে অলংকারশাস্ত্রকে স্পষ্টতঃই সপ্তম বেদাঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'কাব্যমীমাংসা'র প্রথম অধ্যায়ে রাজশেখর 'সাহিত্যবিদ্যা'র উৎপত্তির যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে 'অষ্টাদশাধিকরণী' সাহিত্যবিদ্যার প্রবক্তা আচার্যবৃন্দের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ভরত, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি দুই-একজন আচার্যের নাম সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে পরিচিত।

ভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'ই প্রাচীনতম সাহিত্যবিচারবিষয়ক নিবন্ধরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। 'নাট্যশাস্ত্র' অতি বিস্তৃত গ্রন্থ— ইহা ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও দৃশ্যকাব্য বা রূপক সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনাই এই সুবৃহৎ গ্রন্থের উপজীব্য, তথাপি দৃশ্য-শ্রব্যনির্বিশেষে সামান্যতঃ কাব্যসম্বন্ধীয় বহু তত্ত্বই প্রাসঙ্গিকভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র বর্তমানে যে আকারে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার রচনাকাল বিষয়ে পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ প্রচলিত আছে। তবে আচার্য কানের মতে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যে নাট্যশাস্ত্র মোটামুটি বর্তমান আকারেই প্রচলিত ছিল, ইহা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্যরাজির উপর নির্ভর করিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়।

নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রস ও ভাবের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই দুইটি অধ্যায় যথাক্রমে রসাধ্যায় ও ভাবাধ্যায় রূপেও পরিচিত। 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'— এই প্রসিদ্ধ রসসূত্রটি ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত। সপ্তদশ অধ্যায়ে ৩৬ প্রকার 'লক্ষণ'; উপমা, রূপক, দীপক ও যমক— এই চতুর্বিধ 'অলংকার' ও উহাদের 'অবান্তর'ভেদ; দশবিধ 'কাব্যদোষ' এবং দশবিধ 'কাব্যগুণ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। অলংকারশাস্ত্রের যথাযথ ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষে সামান্যতঃ কাব্যসম্পর্কে ভরতমুনির এই সকল মতবাদ শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলনযোগ্য। নাট্যশাস্ত্রের উপর বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। লোল্লট, উদ্ভট, শঙ্কুক, কীর্তিধর, ভট্টনায়ক প্রভৃতি বহু আচার্যই নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। তবে আচার্য অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী'

নামক সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থই নাট্যশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনের পক্ষে বর্তমানে একমাত্র সহায়। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য -সম্বন্ধীয় অসংখ্য তথ্যের আলোচনায় এই ব্যাখ্যা পূর্ণ। অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অসামান্য।

ভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্রে'র অব্যবহিত পরবর্তী-কালীন অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমানে একরূপ অজ্ঞাত বলিলেই হয়। ভামহ প্রণীত 'কাব্যালংকার' এবং দণ্ডী বিরচিত 'কাব্যাদর্শ'— এই দুইখানিই পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য অলংকারনিবন্ধ। ভামহ ও দণ্ডী —এই দুইজন আচার্যই অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে চিরন্তন আলংকারিকরূপে প্রখ্যাত। অতএব ইঁহাদের প্রাচীনত্ব সর্ববাদিসম্মত। তবে এই উভয় আচার্যের পৌর্বাপর্যবিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর উত্তরার্ধ তাঁহাদের উভয়েরই আনুমানিক আবির্ভাবকাল— ইহাই পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রচলিত মত। ভামহ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে তিনি প্রাচীনগণের বহু গ্রন্থ আলোচনাপূর্বক তাঁহার স্বকীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার মেধাবিরুদ্র নামক এক পূর্বাচার্যের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ভরত ও ভামহের মধ্যবর্তীকালীন বহু অলংকারনিবন্ধ বর্তমানে লুপ্ত। 'কাব্যালংকার' গ্রন্থখানি ৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত— ১. কাব্যশরীর, ২. অলংকৃতি (বা কাব্যালংকার), ৩. কাব্যদোষ, ৪. ন্যায়নির্ণয় এবং ৫. শব্দশুদ্ধি— এই 'বস্তুপঞ্চক' যথাক্রমে ৬টি পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ন্যায়নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধি মুখ্যতঃ ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রেরই আলোচ্য, তথাপি যুক্তিদোষ এবং শব্দদোষ কাব্যের উৎকর্ষের হানি ঘটাইয়া থাকে, সেইজন্যই তাহার পরিহারের উদ্দেশ্যে ভামহ এই দুইটি বিষয়ের আলোচনাও কাব্যবিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আচার্য দণ্ডী বিরচিত 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থখানিও প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থে দণ্ডী কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি, কাব্যের প্রাণভূত শ্লেষপ্রসাদাদি দশটি গুণ, উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দার্থালংকার, কাব্যদোষ প্রভৃতি বহু তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

কাব্যে অলংকারকেই ভামহ শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন— 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্'। ভামহের মতে নিরলংকার কাব্য প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে এবং অলংকার তাঁহার মতে বক্রোক্তিরই নামান্তর। সুতরাং ভামহ স্বভাবোক্তিকে অলংকাররূপেই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু দণ্ডীর মতে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি— এই দশটি গুণই কাব্যের প্রাণভূত। বৈদর্ভ মার্গের রচনাতে এই সকল গুণের সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থের শোভা-হেতু অলংকারসমূহ শ্লেষপ্রসাদাদি গুণগুলির ন্যায় কাব্য-দেহের সহিত অতখানি অন্তরঙ্গতাসূত্রে জড়িত নয়। তাই গুণগুলি সম্পর্কে দণ্ডী বলিয়াছেন— 'এতে বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশ গুণাঃ স্মৃতাঃ'; কিন্তু— 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকারান্ প্রচক্ষতে'। ভামহও মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ নামে তিনটি পৃথক গুণ স্বীকার করিয়াছেন বটে, তথাপি অলংকার ও গুণের মধ্যে প্রকারগত কোনও তারতম্য তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। ভামহ বৈদর্ভ ও গৌড়ীয় মার্গের মধ্যে পার্থক্যও গতানুগতিক এবং অযৌক্তিক বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ আরও বহু বিষয়ে দণ্ডী ও ভামহের মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভামহ শব্দ ও অর্থ— এই উভয়কে সম্মিলিতভাবে কাব্যদেহের ঘটকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। অপর পক্ষে দণ্ডীর মতে কাব্যলক্ষণে শব্দেরই প্রাধান্য যুক্তিসিদ্ধ— 'শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'। সেইরূপ ভামহ প্রতিভাকেই কাব্যনির্মাণের একমাত্র হেতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন— 'কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'। দণ্ডীর মতে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস— এই তিনটিই সম্মিলিতভাবে কাব্যের হেতু— 'নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্। অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥' ভামহ এবং দণ্ডী এই উভয় আলংকারিকই পরবর্তী আলংকারিক আচার্যগণের মতবাদকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এইজন্য উভয়েই সম্প্রদায়প্রবর্তক আচার্যরূপে আলংকারিকসমাজে গৌরবের সহিত কীর্তিত হইয়া থাকেন। যদিও ভামহ এবং দণ্ডী উভয়েই ভরতমুনিসম্মত 'রসতত্ত্ব'কে কাব্যের শোভাহেতু ধর্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ভরত রসকে যেরূপ কাব্যসৃষ্টির একমাত্র উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন ('ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'), ভামহ অথবা দণ্ডী কেহই রসকে ততখানি উচ্চ মর্যাদা দান করেন নাই। তাঁহারা 'রসবৎ' অলংকারের মধ্যে ভরতসম্মত রসতত্ত্বের অন্তর্ভাব সাধন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রস তাঁহাদের মতে উপমাদি অলংকারের ন্যায়ই কাব্যশোভাঘটক ধর্মমাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে।

ভামহ ও দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিকগণের মধ্যে উদ্ভট ও বামন— এই দুই আচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভট ভামহ রচিত 'কাব্যালংকার' গ্রন্থখানির উপর একখানি টীকা রচনা করেন— উহা 'ভামহ-বিবরণ' নামে পরিচিত। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা আলংকারিক 'ভামহ-বিবরণে'র নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। উদ্ভট ঐ ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব বহু সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ইটালীয় পণ্ডিত Raniero Gnoli পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত কাফিরকোঠের নিকটবর্তী একটি স্থানে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৯ম-১০ম শতাব্দীতে লিখিত একখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহা 'ভামহ-বিবরণে'র একটি খণ্ডিত অংশ।

উদ্ভট প্রণীত আর একটি গ্রন্থের নাম 'কাব্যালংকার-সারসংগ্রহ'। ইহা ছয়টি বর্গে বিভক্ত। উদ্ভট মোট ৪১টি অলংকারের লক্ষণ ও উদাহরণ এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। উদাহরণগুলি উদ্ভটেরই স্বরচিত 'কুমারসম্ভব' নামক কাব্য হইতে সংকলিত— ইহা এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অলংকারের সংখ্যা ও লক্ষণ বিষয়ে উদ্ভট মুখ্যতঃ ভামহেরই অনুবর্তী, যদিও কোনও কোনও স্থলে তিনি তাঁহার স্বকীয় মতবাদের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রতীহারেন্দুরাজকৃত 'লঘুবৃত্তি' এবং তিলককৃত 'বিবেক' নামে দুইখানি টীকাসহ 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহ' মুদ্রিত হইয়াছে। উদ্ভটের বহু নিজস্ব সিদ্ধান্ত পরবর্তী আলংকারিকগণ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন— তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র এস্থলে উল্লেখ করা গেল : ১. শব্দ-শ্লেষ ও অর্থশ্লেষরূপে 'শ্লেষ' অলংকারের ভেদ নিরূপণ ; ২. শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে শব্দার্থ বৈশিষ্ট্যনিবন্ধন কাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন ; ৩. বৈয়াকরণ পদ্ধতি অনুসারে উপমা-অলংকারের ভেদ নিরূপণ ; ৪. 'রস' প্রভৃতির 'স্বশব্দবাচ্যত্ব' সিদ্ধান্ত ; ৫. কাব্যগত গুণ এবং অলংকারের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ অস্বীকার ইত্যাদি। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের বহু স্থলে উদ্ভটের সিদ্ধান্তের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবকাল আনন্দবর্ধনের পূর্বে ইহা নিঃসন্দেহ।

> "বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
> ভট্টোঽভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ॥"
>
> —রাজতরঙ্গিণী (৪।৪৯৫)

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে উদ্ভট কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়দেবের (৭৭৯-৮১৩ খ্রী) রাজসভায় সভাপতি ছিলেন।

আচার্য বামন তাঁহার 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি' নামক গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র মতবাদের প্রবর্তন করেন। এই গ্রন্থের সূত্র ও বৃত্তি বা ব্যাখ্যা এই উভয় অংশই বামনের রচনা। বামন যদিও প্রধানতঃ দণ্ডী, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীনগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার চিন্তার অভিনবত্বের নিদর্শনও এই গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট। বামনাচার্য ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতির ন্যায় কাব্যে অলংকারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্যও তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং অলংকার অপেক্ষা গুণেরই যে কাব্যদেহের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে খ্যাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন . 'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ॥' বামনাচার্যের মতে রীতিই কাব্যের আত্মা ; বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি এবং পদবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য গুণনিবন্ধন— 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা॥' রীতি বামনাচার্যের মতে ত্রিবিধ— বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া এবং পাঞ্চালী। তন্মধ্যে গুণসামগ্র্যনিবন্ধন বৈদর্ভী রীতিই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বামনাচার্য দণ্ডীর ন্যায়ই শ্লেষপ্রসাদাদি দশবিধ কাব্যগুণ স্বীকার করিয়াছেন বটে, তথাপি প্রত্যেকটি গুণই শব্দগত ও অর্থগতরূপে দ্বিবিধ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে গুণের সংখ্যা বিংশতি। সুতরাং দণ্ডীর মতের সহিত রীতি ও গুণের সংখ্যা বিষয়ে বামনাচার্যের মতের পার্থক্যও লক্ষণীয়। পরবর্তী কালে মম্মট প্রভৃতি নব্য আলংকারিকগণ বামনাচার্যের এই রীতি ও গুণ সম্বন্ধীয় মতবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। বামনের 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি' পাঁচটি অধিকরণ ও বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত— শারীরাধিকরণ, দোষদর্শন, গুণবিবেচন, আলংকারিক এবং প্রায়োগিক— এইরূপ ক্রমে অধিকরণগুলি বিন্যস্ত। বিষয়বস্তু ও তাহার বিন্যাসের পদ্ধতির দিক দিয়া ভামহের 'কাব্যালংকারে'র সহিত বামনের গ্রন্থের সাম্য লক্ষণীয়। আধুনিক গবেষকগণ রাজতরঙ্গিণীর একটি শ্লোকের (৪।৪৯৭) উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বামনাচার্য কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়দেবের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। অন্যান্য সাক্ষ্য হইতেও আমরা তাঁহার কাল সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সুতরাং বামনের কাল আনুমানিক ৭৫০-৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী। অতএব উদ্ভট এবং বামন খুব সম্ভব পরস্পরের সমকালীন ছিলেন, যদিও তাঁহাদের গ্রন্থে পরস্পরের কোনও উল্লেখ নাই।

অলংকারশাস্ত্র

রুদ্রটকৃত 'কাব্যালংকার' অলংকারশাস্ত্রের আর একটি প্রসিদ্ধ নিবন্ধ। রুদ্রটও কাশ্মীরেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গ্রন্থে ধ্বনিবাদের কোনও উল্লেখ না থাকায়, ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী। প্রসিদ্ধ টীকাকার বল্লভদেব কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থের উপর একখানি টীকা রচিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুকাল পূর্বে যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। রুদ্রটের গ্রন্থখানি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে মোট ৭৩৪টি শ্লোক আছে— তন্মধ্যে অধিকাংশই আর্যা ছন্দে রচিত। রুদ্রট যদিও ভরতের রসতত্ত্বের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথাপি তিনি উদ্ভট প্রভৃতি প্রাচীনগণের ন্যায় কাব্যে অলংকারেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভরত-পরিগণিত নব রসের অতিরিক্ত 'প্রেয়ঃ' নামক দশম রস স্বীকার করিয়াছেন। অলংকারসমূহকে যুক্তিসংগত পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি নির্দিষ্ট বর্গে বিভক্ত করার কৃতিত্ব রুদ্রটের। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অর্থালংকারসমূহকে বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় এবং শ্লেষ এই চারিটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটী এবং গৌড়ী এই চতুর্বিধ রীতির পরিগণনা; মধুরা, ললিতা, প্রৌঢ়া, পরুষা এবং ভদ্রা এই পঞ্চবিধ অনুপ্রাসবৃত্তির উল্লেখ; বর্ণ-পদ-লিঙ্গ-ভাষা-প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভক্তি-বচনভেদে শ্লেষের অষ্টবিধত্ব নিরূপণ; চক্রবন্ধ-মুরজবন্ধ-অর্ধভ্রম-সর্বতোভদ্র প্রভৃতি 'চিত্রে'র আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে রুদ্রট আপন স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মম্মট প্রভৃতি পরবর্তী বহু আলংকারিক রুদ্রটের মত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে বহু উদাহরণ আপন আপন নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকগণ কর্তৃক অনুল্লিখিত কয়েকটি অভিনব বাগ্‌বিকল্প বা অলংকার ('মত', 'সাম্য', 'পিহিত') রুদ্রটের আবিষ্কার বলিয়াই মনে হয়।

ভরত হইতে রুদ্রট পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন ও ইতিহাসের ধারাকে পণ্ডিতগণ প্রাচীন মতবাদ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। ইহার পর আচার্য আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবের সঙ্গে অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং কাব্যবিচারে এক অভিনব এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তিত হইল।

'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থখানি অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। 'কারিকা' এবং 'বৃত্তি' এই উভয় অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি আচার্য আনন্দবর্ধনের রচনা বলিয়া প্রচলিত, তবে কারিকা অংশটি প্রাচীন অজ্ঞাতনামা কোনও গ্রন্থকারের রচনা এবং তিনিই 'ধ্বনিকার' রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, ইহা এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। তবে এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্তমানে দুরূহ। 'ধ্বন্যালোক' চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির উপর আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রণীত 'লোচন'-টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। লোচনেরও পূর্বে 'চন্দ্রিকা' নামে অপর একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল; কিন্তু অদ্যাবধি উহা অনাবিষ্কৃত।

ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকগণ কাব্যের গুণ, অলংকার, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতি সৌন্দর্যসম্পাদক কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্মের উপর প্রাধান্য আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকর্মের প্রাণভূত রসতত্ত্ব, ভরতমুনি যাহাকে কেন্দ্রীয় কাব্যতত্ত্বরূপে অতি প্রাচীন যুগেই নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং স্থূল ধরনের। আনন্দবর্ধনের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি সেই অবজ্ঞাত রসতত্ত্ব, যাহাকে প্রাচীনগণ সাধারণ অলংকারের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে পুনর্বার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন—

> "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
> ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥"

তিনি আরও দেখাইলেন যে সেই 'রসতত্ত্ব' কখনও 'স্বশব্দ-বাচ্য' হইতে পারে না। সুতরাং উদ্ভটের মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা তিনি প্রমাণ করিলেন। প্রাচীনগণ অভিধা এবং লক্ষণা, অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ ভেদে শব্দের দুই প্রকার শক্তি বা ব্যাপার স্বীকার করিতেন। ধ্বনিকার যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে শব্দের অভিধা বা লক্ষণা কোনও ব্যাপারের দ্বারাই রসের বোধ জন্মিতে পারে না; এমন কি ভাট্ট মীমাংসকগণ কর্তৃক পরিগণিত বাক্যার্থবোধের অনুকূল 'তাৎপর্য' নামক শক্তিও রসের প্রতিপাদনে অক্ষম। সুতরাং রসপ্রতীতির জন্য একটি অভিনব ব্যাপারান্তর অবশ্য-স্বীকার্য— ধ্বনিকারের মতে এই ব্যাপারের নাম 'ব্যঞ্জনা'। এই ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারাই রসের বোধ সম্ভব; সুতরাং রস সর্বদাই 'ব্যঙ্গ্য'; কখনও বাচ্য বা লক্ষ্য নহে। 'ব্যঞ্জনা'-ব্যাপার যদি স্বীকার করিতেই হইল, তখন অন্য ক্ষেত্রেও ইহার উপযোগিতা বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। আনন্দবর্ধন বহু যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শন করিলেন যে কাব্যের যাহা সারভূত অর্থ, তাহা 'রস'ই হউক, 'বস্তু'ই হউক বা 'অলংকার'ই হউক, কখনও স্বশব্দ-

বাচ্যরূপে চমৎকারজনক হইতে পারে না। ব্যঙ্গ্য অর্থই কেবলমাত্র চমৎকারকারী হইতে পারে। সুতরাং 'বস্তু' 'অলংকার' এবং 'রস' এই ত্রিবিধ বিষয়ই কেবলমাত্র ব্যঙ্গ্যরূপে কাব্যের প্রাণভূত তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু এই ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে আবার রসই পরমসারভূত, আর সকলই তাহার কাছে গৌণ। রসহীন কাব্য নিষ্প্রাণ শবের শরীরের মতই অনুপাদেয়— তাহাতে কোনও গুণ থাকিতে পারে না, অলংকারযোজনার দ্বারা তাহা আরও বীভৎস বা হাস্যাবহ হইয়া উঠে মাত্র। গুণ রসেরই ধর্ম, অলংকার রসেরই উৎকর্ষক, রীতি রসেরই প্রকাশ, দোষ রসেরই অপকর্ষক। এইভাবে আনন্দবর্ধন রসকেই কাব্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না যে, রসাধিষ্ঠিত কাব্যদেহ যদি নিরলংকারও হয় তথাপি তাহা উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে স্বীকৃত হইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা থাকিতে পারে না। সুতরাং ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দার্থালংকারকে কাব্যবিচারে যে প্রাধান্য দিয়াছিলেন, অলংকারের সেই প্রাধান্য হইতে তিনি কবিতাকে মুক্ত করিলেন। শব্দ ও অর্থগত অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি বাগ্‌বিকল্পপ্রধান রসতাৎপর্যশূন্য কবিকর্মকে ধ্বনিকার 'তুষ্যতু দুর্জনঃ' ন্যায়ানুসারে অধম কাব্যের মর্যাদা দিলেও, বস্তুতঃ তাহা যে অকাব্যই তাহা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন— 'ন তন্মুখ্যং কাব্যং, কাব্যানুকারো হ্যসৌ'। যেহেতু—'পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপর্যবিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে'। রসের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সুকবি অলংকার যোজনা করিবেন, অলংকার বিনিবেশন সম্বন্ধে ধ্বনিকারের ইহাই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও বাঁধিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত অলংকারযোজনার জন্য রসসমাহিত কবিচিত্তের কোনও পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না, যথার্থ অলংকার 'রসাক্ষিপ্ত' এবং 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'।

"রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥"

ধ্বনিকারের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই আচার্য অভিনবগুপ্ত অলংকারসমূহকে কাব্যদেহের সহিত অন্তরঙ্গতার তারতম্য অনুসারে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন— বাহ্য, আভ্যন্তর এবং বাহ্যাভ্যন্তর। উৎকৃষ্ট কবিকর্মে অলংকার কখনও বাহ্য বা কাব্যদেহের সহিত শিথিলসম্পৃক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বাচ্যরূপে নিবদ্ধ অলংকার কাব্যদেহের সহিত যতই দৃঢ়পিনদ্ধ হউক না কেন, তাহা কখনও কাব্যের আত্মার পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাব্যাপারের এমনই মহিমা যে প্রতীয়মান অলংকাররাজিও রসধ্বনির মতই কাব্যের আত্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাব্যাপারের অস্তিত্বসাধন করিবার জন্য আনন্দবর্ধনকে প্রাচীন আচার্যগণের প্রচলিত মতবাদ বহুবিধ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিতে হইয়াছে। ব্যঞ্জনাব্যাপারের অস্তিত্বসাধন, কাব্যনির্মাণে ও কাব্যের আস্বাদনে ভরতসম্মত রসতত্ত্বের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং এই উভয়ের ভিত্তিতে 'প্রসিদ্ধপ্রস্থানসম্মত' গুণ, অলংকার, রীতি, বৃত্তি, সংঘটনা, দোষ প্রভৃতি কাব্যের যাবতীয় উপাদানের হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব নিরূপণের দ্বারা একটি সর্বতোভদ্র এবং সুসংহত 'কাব্যনয়' (theory of poetry) গড়িয়া তোলাই আচার্য আনন্দবর্ধনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তিনি পরস্পরবিরোধী, বিক্ষিপ্ত প্রাচীন-পরিগণিত উপাদানসমূহকে একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদের নূতনভাবে মূল্যনির্ণয় করিয়াছেন। কাব্যবিচারের ইহা এক অভিনব শৈলী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধ্বনিকার ইহার জন্য কোনও গৌরব দাবি করেন নাই। তিনি 'ধ্বন্যালোকে'র অন্তিম পুষ্পিকাশ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন— যে কাব্যনয়ের তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা পরিণতপ্রজ্ঞ সহৃদয়গণের হৃদয়ে চিরপ্রসুপ্তকল্প ছিল ; তিনি শুধু তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। পরবর্তী সকল আলংকারিকই ধ্বনিকারের প্রবর্তিত কাব্যনয় শ্রদ্ধার সহিত অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের নিবন্ধরাজি প্রণয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সেইজন্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন —'ধ্বনিকৃতামালংকারিকসরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ'।

ধ্বনিকারপরিকল্পিত অভিনব ব্যঞ্জনাব্যাপার এবং সেই ব্যঞ্জনাব্যাপারের সাহায্যে বোধিত ব্যঙ্গ্যার্থ— যাহা ধ্বনি এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যরূপে প্রধানতঃ দ্বিবিধ, এই উভয়বিধ তত্ত্বের পরিষ্কারসাধনে আচার্য অভিনবগুপ্তের দান অসামান্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আনন্দবর্ধনের এবং অভিনবগুপ্তের ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন আচার্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অভিনবগুপ্তের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ভট্টনারায়ণ এবং সমকালিক কুন্তক ও মহিমভট্ট —এই তিনজন আচার্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহারা তিনজনই কাশ্মীরীয়।

'রাজতরঙ্গিণী'র একটি শ্লোকে (৫।৫৯) এক ভট্টনায়কের উল্লেখ আছে। তিনি কাশ্মীরাধিপতি শংকরবর্মার সমকালিক, সুতরাং তাঁহার কাল আনুমানিক ৮৮৩-৯০২ খ্রী। অনেকের মতে কাব্যমীমাংসক ভট্টনায়ক

অলংকারশাস্ত্র

এবং এই ভট্টনায়ক অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অধ্যাপক কানে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে ভট্টনায়কের কাল আনুমানিক ৯০০-১০০০ খ্রী। যাহা হউক, ভট্টনায়ক-রচিত 'হৃদয়দর্পণ' নামক মূল্যবান গ্রন্থখানি বর্তমানে লুপ্ত। ইহা 'ধ্বনিধ্বংস' গ্রন্থরূপেও পরিচিত। অনেকে মনে করেন 'হৃদয়দর্পণ' ধ্বন্যালোকের খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একখানি টীকা। আচার্য অভিনবগুপ্ত, মহিমভট্ট প্রভৃতি পরবর্তী বহু লেখক 'হৃদয়দর্পণ' হইতে বহু কারিকা স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা হইতে দর্পণকারের মতবাদের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই। তাঁহার কয়েকটি মতবাদ অত্যন্ত মৌলিক এবং গভীর মননশীলতাপ্রসূত। যেমন— ১. কাব্যে অভিধা ব্যতিরিক্ত (অভিধা বলিতে গৌণী বৃত্তি বা লক্ষণাকেও বুঝিতে হইবে) 'ভাবনা' বা সাধারণীকৃতি এবং 'ভোগীকৃতি' নামে দুইটি ব্যাপার স্বীকার। 'ভাবনা'র সাহায্যে কাব্যবর্ণিত বিভাবাদি অর্থের সাধারণীকরণ (universalisation) সম্ভব হইতে পারে; আর ভোগীকৃতির সাহায্যে সেই সকল সাধারণীকৃত অর্থরাজির সহৃদয়চিত্তে আস্বাদন (relish) সম্ভব হয়। অভিনবগুপ্ত এই উভয় ব্যাপারের অস্তিত্বই খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনাব্যাপারের উপযোগিতা স্থাপন করিয়াছেন; ২. কবিকে গো-বৎসের সহিত তুলনা এবং যোগীগণ অপেক্ষাও কবিকে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী বলিয়া নির্দেশ; ৩. বেদাদি শাস্ত্র প্রভুসম্মিত, ইতিহাস-পুরাণাদি সুহৃৎ-সম্মিত এবং কবিকর্ম কান্তাসম্মিত রূপে কল্পনা; ৪. কাব্যে উপদেশ (instruction) অপেক্ষা আস্বাদের (delight) প্রাধান্য; ৫. কাব্যকে রসপরিপূর্ণ কবিচিত্তের উচ্ছলন বা উদ্গাররূপে বর্ণনা— 'যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্'; ৬. রসপ্রতীতি বিঘ্নিত না হইলে দোষদুষ্ট রচনারও কাব্যত্ব অব্যাহত থাকে, যেমন কীটানুবিদ্ধ রত্নাদির রত্নত্ব সর্ববাদিসম্মত— ইত্যাদি। প্রভাকর রচিত 'রসপ্রদীপ' নিবন্ধে 'কীটানুবিদ্ধরত্নাদিসাধারণ্যেন কাব্যতা। দুষ্টেষ্বপি মতা যত্র রসাদ্যনুগমঃ স্ফুটঃ॥'—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ভট্টনায়ক রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অভিনবগুপ্তেরই সমসাময়িক কুন্তকাচার্য ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে এক অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন তাঁহার 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে। যদিও দণ্ডী, ভামহ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ 'বক্রোক্তি'কে কাব্যের শোভাহেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। দণ্ডী সমগ্র বাঙ্ময়কে 'স্বভাবোক্তি' এবং 'বক্রোক্তি' ভেদে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছেন এবং 'বক্রোক্তি' শব্দটিকে সামান্যতঃ 'অলংকার' শব্দেরই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ভামহও শব্দ ও অর্থের বক্রতাকে সর্ববিধ অলংকারের মূল রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। শব্দার্থগত এই বক্রত্বই লৌকিক বাক্য হইতে অলৌকিক কবিকর্মের বৈলক্ষণ্যসম্পাদক। কবিগণ স্বভাবতঃই 'বক্রবাক্'— বক্রবাচাং কবীনাং যে প্রয়োগং প্রতি সাধবঃ' (কাব্যালংকারঃ, ৬৷২৩)। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন'-গ্রন্থে ভামহসম্মত শব্দগত এবং অভিধেয়গত এই 'বক্রতা'র স্বরূপ ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন— 'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্।' বক্রোক্তিজীবিতকারও 'বক্রোক্তি' শব্দটিকে এই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 'বক্রোক্তি'কে শুধুমাত্র অলংকারসমূহের মূলীভূত তত্ত্বরূপেই দেখেন নাই, কাব্য-সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এই 'বক্রতা'র সর্বাতিশায়ী প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে 'বক্রোক্তি'ই 'কাব্যজীবিত'— এই 'কবিব্যাপারবক্রতা' বর্ণবিন্যাসে, প্রাতিপাদিক ও ধাতুর প্রয়োগে, প্রত্যয় নির্বাচনে, বাক্য যোজনায়, প্রকরণে এবং প্রবন্ধপরিকল্পনায় বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ধ্বনিকার যে প্রতীয়মানার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থকে কাব্যের আত্মারূপে পরিগণনা করিয়াছেন, বক্রোক্তিজীবিতকারের মতে তাহা নিরর্থক এবং অসংগত; কেননা ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ বক্রতারই বিলাস-বিশেষ মাত্র, ইহার স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই। আর এই বক্রতার মূলে আছে কবিব্যাপার বা প্রতিভা। যেখানে প্রতিভার দারিদ্র্য, সেখানে বক্রতার কোনও সম্ভাবনা নাই এবং সেইরূপ বাঙ্‌নির্মিতি কাব্যরূপে পরিগণিত হইবার অযোগ্য। সুতরাং কুন্তকসম্মত কাব্যনয়ে প্রতিভার স্থান সর্বোচ্চ এবং এই প্রতিভার বৈচিত্র্য অনুসারে তিনি সুকুমার, মধ্যম এবং বিচিত্র— কাব্যরচনার এই ত্রিবিধ শৈলী বা মার্গ (style) নিরূপণ করিয়াছেন। প্রাচীনসম্মত বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী ভেদে মার্গভেদকথন কুন্তকের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক। বক্রোক্তিজীবিতকারের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব অবশ্যস্বীকার্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার নির্ধারিত নীতিই যে সর্বত্র দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না।

ধ্বনিবাদের অন্যতম মুখ্য সমালোচকরূপে 'ব্যক্তি-বিবেক'কার মহিমভট্ট বিশেষভাবে স্মরণীয়। যদিও তিনি অতি কঠোরভাবে ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি ধ্বনিকারের অপূর্ব মনীষার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ধ্বনিমার্গকে তিনি 'অতিগহন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি

বলিয়াছেন, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের যাবতীয় প্রকারই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই প্রতিপাদন করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে একটিমাত্র শক্তিই সম্ভব— তাহা হইতেছে 'অভিধা' (denotation), এবং অর্থেরও একমাত্র শক্তি— তাহা হইতেছে 'লিঙ্গতা' বা 'অনুমাপকত্ব'। এতদতিরিক্ত শব্দ বা অর্থের অতিরিক্ত কোনও শক্ত্যন্তর যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আচার্য আনন্দবর্ধন যে শব্দ ও অর্থের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নামে একটি বিলক্ষণ শক্তি বা ব্যাপার স্বীকার করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থকে কাব্যের আত্মারূপে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। এমন কি, লক্ষণাব্যাপার ও লক্ষ্যার্থও মহিমভট্টের মতে যথাক্রমে অনুমান ও অনুমেয়ার্থেরই প্রকার মাত্র। মহিমভট্ট ধ্বনিকারের প্রসিদ্ধ ধ্বনিলক্ষণ অক্ষরশঃ খণ্ডন করিয়া তথাকথিত ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ যে অনুমেয়ার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না তাহা সবিস্তারে দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতি একপ্রকার অনুমান (syllogistic reasoning) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অবশ্য তাঁহার এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী কালে ধ্বনিবাদের সমর্থকগণ কর্তৃক অসার বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে— কেননা অনুমানের মূলীভূত 'অবিনাভাব' বা ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধেরই এখানে অভাব। তদ্ভিন্ন ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যের বীজ নিহিত আছে। অনুমেয়ার্থের মধ্যে তাহার সদ্ভাব নাই। মহিমভট্টের ধীশক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধ্বনিকারের মনীষার মধ্যে যে ব্যাপকতা, ঔদার্য ও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষণীয়, মহিমভট্ট প্রভৃতি ধ্বনিবিরোধী আচার্যগণের ক্ষেত্রে তাহার অভাব বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ব্যক্তিবিবেক'কারের অপর এক কৃতিত্ব কাব্যদোষের অতিগম্ভীর বিচার— মম্মটাচার্যপ্রমুখ আলংকারিকগণ দোষবিচারে মহিমভট্টের সমীক্ষারাজি অতি শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। মহিমভট্ট 'তত্ত্বোক্তিকোশ' নামে অপর একখানি আলংকারিক নিবন্ধ (?) রচনা করিয়াছিলেন— তাহাতে তিনি 'প্রতিভাতত্ত্ব' (poetic intuition) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রুয্যককৃত 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান' অসম্পূর্ণ টীকা। ইহা অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ— কিন্তু গ্রন্থকার ধ্বনিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক বলিয়া পদে পদে মহিমভট্টের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরীয় গ্রন্থকার ক্ষেমেন্দ্রের (আনুমানিক ৯৯০-১০৬৩ খ্রী) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' নামক এক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে 'ঔচিত্য'কেই (propriety) কাব্যের আত্মারূপে কীর্তন করিয়াছেন— 'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্'। অলংকার, গুণ, রীতি প্রভৃতি যাবতীয় কাব্যগোচর উপাদান সকলই তাঁহার মতে ঔচিত্যানুসারী হইতে হইবে, এমন কি 'রস' পর্যন্ত, যাহা ভরত, আনন্দবর্ধনপ্রমুখ আচার্যগণের মতে কাব্যের প্রাণভূত তত্ত্বরূপে স্বীকৃত, তাহাও ঔচিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। 'ঔচিত্য'কে কবিগণের প্রণিধানযোগ্য বিষয়রূপে উল্লেখ করিতে ধ্বনিকারও বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন— অনৌচিত্যই একমাত্র রসভঙ্গের হেতু। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যকে কাব্যসৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে একটি অভিনব মতবাদের প্রবর্তন করিবার আগ্রহাতিশয্যের বশবর্তী হইয়া —ইহাই মনে হয়। সুতরাং তাঁহাকে মৌলিক চিন্তাশীলতার জন্য কোনও গৌরব দান করা যুক্তিযুক্ত নহে। 'কবিকণ্ঠাভরণ' নামে আর একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন— কবিগণের শিক্ষাপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটির উদ্দেশ্য। ইহা পাঁচটি সন্ধিতে বিভক্ত।

ভরত হইতে অভিনবগুপ্ত এবং ধ্বনিবাদের সমালোচকসম্প্রদায় পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের যে ধারা আমরা এ পর্যন্ত অনুসরণ করিলাম, তাহার মধ্যে স্বাধীন মৌলিক চিন্তার স্ফুরণ আমরা প্রত্যেক স্তরেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। ভরত কাব্যবিচারে রসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, ভামহ ও উদ্ভট অলংকারকেই কাব্যশোভার একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দণ্ডী দশটি গুণকেই কাব্যের প্রাণভূত তত্ত্বরূপে কীর্তন করিয়াছেন, আবার বামনাচার্য 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নশীল। ইহাতেই কাব্যসমালোচনার ধারা পরিসমাপ্ত হয় নাই। প্রাচীনগণের মতবাদের নূতনভাবে সমীক্ষার দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ও তাঁহার ব্যাখ্যাতা অভিনবগুপ্তপাদাচার্য ব্যঞ্জনাব্যাপারের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ব্যঙ্গ্যার্থকেই কবিকর্মের সারভূত তত্ত্বরূপে ঘোষণা করিয়া কাব্যবিচারের এক অভিনব শৈলীর প্রবর্তন করিলেন। কুন্তক আবার ধ্বনিকারের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বক্রোক্তিকেই কাব্যসৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক রূপে খ্যাপন করিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যকে কাব্যশোভার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রতী হইলেন। এইভাবে রসপ্রস্থান, অলংকারপ্রস্থান, গুণপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, ধ্বনিপ্রস্থান, ঔচিত্যপ্রস্থান— একটির পর একটি উদ্ভূত হইল। ইহার মধ্যে ভরতসম্মত রসপ্রস্থান এবং আনন্দবর্ধনপ্রবর্তিত ধ্বনিপ্রস্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরস্পরের পরিপূরক

রূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। মহিমভট্টের অনুমিতিবাদ গভীর মননশীলতাপ্রসূত হইলেও ধ্বংসাত্মক সমালোচনাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য— কাব্যবিচারের সর্বাঙ্গীণ কোনও মার্গ গড়িয়া তোলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ভট্টনায়কের লুপ্ত 'হৃদয়দর্পণ'ও 'ধ্বনিধ্বংস' রূপেই পরিচিত— যদিও ভট্টনায়কের একাধিক সমীক্ষা পরবর্তী আলংকারিকগণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অলংকার-শাস্ত্রের ইতিহাসে উপরি-আলোচিত যুগকে সৃজনশীল পর্বরূপে নির্দেশ করিলে অযৌক্তিক হইবে না।

কিন্তু ইহার পর অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে অবক্ষয়ের যুগ সূচিত হইল। যদিও ভোজরাজ (আনুমানিক ১০০৫-১০৫৪ খ্রী) 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এবং 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক সুবৃহৎ নিবন্ধদ্বয় রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, তথাপি পূর্বাচার্যগণের বিচিত্র সমীক্ষারাজির অপূর্ব সংগ্রহরূপেই তাহাদের গৌরব। মম্মটাচার্যের 'কাব্যপ্রকাশ'ও (১০৫০-১১০০ খ্রী) সংঘটনানৈপুণ্যের জন্য যতখানি সমাদর লাভ করিয়াছে, লেখকের মৌলিক চিন্তার জন্য ততখানি নহে— পাণিনীয় ব্যাকরণে ভট্টোজি-দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সহিত এই দিক দিয়া কাব্য-প্রকাশের তুলনা করা চলে। কাব্যপ্রকাশের পঠন-পাঠন এতই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল যে পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি চিরন্তন আচার্যগণের মূল গ্রন্থের সহিত পরিচয়লাভের আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছিল— ফলে অলংকারশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থরাজি কালক্রমে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কাশ্মীরক আচার্য রুয্যক প্রণীত 'অলংকারসর্বস্ব' (আনুমানিক খ্রী ১১শ শতকের পূর্বার্ধ), জৈন আচার্য হেমচন্দ্রসূরি (১০৮৮-১১৭২ খ্রী) প্রণীত 'স্বোপজ্ঞ'-টীকা সমেত 'কাব্যানুশাসন', বিদ্যাধর (আনুমানিক ১২৮২-১৩২৭ খ্রী) রচিত 'একাবলী', বাগ্‌ভটরচিত 'কাব্যানুশাসন' (আনুমানিক খ্রী ১৪শ শতক), বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'সাহিত্যদর্পণ' (খ্রী ১৪শ শতক) এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রচিত 'রসগঙ্গাধর' (খ্রী ১৭শ শতকের মধ্যভাগ) আনন্দবর্ধনোত্তর যুগের আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য অলংকারনিবন্ধ। তন্মধ্যে 'সাহিত্যদর্পণ' সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে— কেননা এই গ্রন্থে বিশ্বনাথ অতি সংক্ষেপে অলংকারশাস্ত্রের যাবতীয় তথ্যরাজি একত্র সংকলন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য সর্ববিধ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ফলে সংস্কৃত কাব্যবিচার সম্পর্কে ইহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অতি উপাদেয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত— যদিও চিন্তার মৌলিকতা ইহার মধ্যে নিতান্তই স্বল্প। এই যুগে স্বাধীন চিন্তার বিস্ময়কর বিকাশ একমাত্র পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি গ্রন্থের অবতরণিকা শ্লোকে যে বলিয়াছেন— তাঁহার রচিত 'অলংকারসন্দর্ভ' যাবতীয় অলংকারগ্রন্থের গর্ব খর্ব করিবে, ইহা মোটেই শূন্যগর্ভ আস্ফালন নহে। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে শুধু অলংকারশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে; প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত 'প্রৌঢ়মনোরমা'র খণ্ডনগ্রন্থ তাঁহার ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহা ছাড়া কবিত্বশক্তিও ছিল তাঁহার অতি উচ্চস্তরের।

ভরত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত করিতে পারি। সুশীলকুমার দে এইরূপ চারিটি স্তরভেদ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—১. সুপ্রাচীন যুগ হইতে ভামহ পর্যন্ত— প্রথম স্তর, যাহাকে formative stage বলা যাইতে পারে; ২. ভামহ হইতে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় স্তর, যাহা creative stage রূপে নির্দেশের যোগ্য; ৩. আনন্দবর্ধন হইতে মম্মট পর্যন্ত স্তরকে definitive stage বলিতে পারা যায়; এবং ৪. চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তর— যাহা scholastic stage রূপে পরিচিত— মম্মট হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত স্থায়ী। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনকে যদি এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য-মণিরূপে কল্পনা করা যায় তবে অলংকারশাস্ত্রের ধারাকে আনন্দবর্ধনপূর্ব, আনন্দবর্ধন এবং আনন্দবর্ধনোত্তর— এই তিনটি পর্বেও বিভক্ত করিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে আজিও পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। ভরতের পূর্ববর্তী অলংকারশাস্ত্রের কোনও গ্রন্থ আমাদের অজ্ঞাত; মেধাবিরুদ্রের শুধু নামোল্লেখই পাওয়া যায়; অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু ভট্টতৌতের 'কাব্য-কৌতুক', এবং তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা 'বিবরণ' এখনও পর্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে লীন; ভট্টনায়কের 'হৃদয়দর্পণ', ধ্বন্যালোকের 'চন্দ্রিকা' নামক ব্যাখ্যা, উদ্ভট, ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক প্রভৃতি আচার্য প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যানরাজি, উদ্ভটকৃত 'ভামহবিবরণ', রুয্যকের 'সাহিত্য-মীমাংসা' এবং 'নাটকমীমাংসা' নামক সন্দর্ভদ্বয়, মহিমভট্ট-কৃত প্রতিভাতত্ত্বসম্বন্ধীয় 'তত্ত্বোক্তিকোশ' নামক বিচারগ্রন্থ, —এইরূপ শত শত গ্রন্থ আজ লুপ্ত। যদি কোনও সুদূর ভবিষ্যতে এই সকল গ্রন্থরাজির উদ্ধার সম্ভব হয়, তবে ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের মনীষার বহু বিস্ময়কর নিদর্শন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ রচিত অলংকারশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থরাজির সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্তব্য। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মূল ধারার বিবর্তনের যে ইতিহাস উপরে প্রদত্ত হইল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ যদিও মুখ্যতঃ তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি রসতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের সমীক্ষার অভিনবত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভরত এবং তাঁহার অনুবর্তীগণ রসের মুখ্যতঃ নয়টি ভেদ (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত) স্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহারা 'ভক্তি'কে ভাবরূপে গণনা করিতেন— উহার রসত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিকেই একমাত্র রস বা 'রসরাট্' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপগোস্বামী (১৪৭০ -১৫৫৪ খ্রী) প্রণীত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। একই ইক্ষুবীজ যেমন রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতশর্করা এবং সিতোপলারূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর মাধুর্য ও ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়ীভাব বা কৃষ্ণপ্রেম ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব (বা মহাভাব) রূপ ষড়্‌বিধ অবস্থার মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়া চরম মাধুর্য ও আস্বাদময়তা লাভ করিয়া থাকে। সেই মহাভাবদশারই চরম পরিণতি 'দিব্যোন্মাদ'। বৈদান্তিককেশরী পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থ এই ভক্তিরসবিষয়ক অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভ', বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ', কবিকর্ণপূর বিরচিত 'অলংকারকৌস্তুভ', এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'কাব্যকৌস্তুভ' এবং 'সাহিত্য-কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থে রসতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রমেয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। রূপগোস্বামী 'নাটকচন্দ্রিকা' নামে নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরসের প্রাধান্যস্থাপনে বৈষ্ণব আলংকারিক ও দার্শনিকগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট মনীষার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অলংকারশাস্ত্রের অন্যান্য প্রমেয় তত্ত্বের নিরূপণে তাঁহারা পূর্বাচার্যগণের মতবাদসমূহই শুধু গতানুগতিকভাবে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রবিষয়ে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকেরই বিশ্বাস অলংকারশাস্ত্র শুধু উপমা-অনুপ্রাস প্রভৃতি বাগ্‌বিকল্পেরই আলোচনায় পূর্ণ। অবশ্য শুদ্ধ অলংকারের বিচার কোনও কোনও গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ দেখা যায় বটে। যেমন রুয্যককৃত 'অলংকারসর্বস্ব'। কিন্তু আমরা দেখিলাম অলংকারবিচার ভারতীয় কাব্যমীমাংসাশাস্ত্রের একদেশমাত্র। 'রত্নাপণ'কার কুমারস্বামী বলিয়াছেন—'যদ্যপি রসালংকারাদ্যনেকবিষয়মিদং তথাপি ছত্রিন্যায়েন অলংকারশাস্ত্রমুচ্যতে'। কাব্যের ক্রিয়াবিধি সংক্রান্ত কবিসংরম্ভগোচর যাবতীয় উপাদানই এই বিশাল শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকে মনে করেন, কবিকর্মের সামগ্রিক বিচার অলংকারশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে অসম্ভব। আলংকারিকগণ শুধু কাব্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক-একটি শ্লোকবাক্য, পদ বা বর্ণের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিতেই জানেন— সমগ্র কাব্যের অখণ্ড তাৎপর্যবিষয়ে তাঁহারা নীরব। ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুতঃ আলংকারিকগণ 'অঙ্গী রস' ও 'অঙ্গরস' বিচারে কবিকর্মের অখণ্ড তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতে যেভাবে মহাভারত এবং রামায়ণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে কাব্যের সামগ্রিক বিচারের পদ্ধতিও যে তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না, তাহা জানা যায়। তদ্ভিন্ন, কাব্যে মূল বিষয়বস্তুকে কবি কিভাবে পরিবর্তন করিবেন, তাহার নির্দেশও প্রাচীন আচার্যগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। আচার্য কুন্তক বিরচিত 'প্রবন্ধবক্রতা' এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ই বহন করে। প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে কবিকর্ম একটি অখণ্ড সৃষ্টি; ইহাকে খণ্ডিত করা অসম্ভব। শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, অলংকার, রস— সব কিছুই এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তথাপি ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ের জন্য কাব্যদেহকে খণ্ডিত করিতে হয়। বর্ণ, পদ, বাক্য, গুণ, দোষ, রীতি, বৃত্তি, রস প্রভৃতির পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সকলই যে অবিদ্যাপ্রসূত, তাহা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই। কুন্তক তো স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

> "অলংকৃতিরলংকার্যমপোদ্ধৃত্য বিবিচ্যতে।
> তদুপায়তয়া তত্ত্বং সালংকারস্য কাব্যতা॥"

কাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত সম্বন্ধ এবং লৌকিক শব্দার্থ হইতে উহাদের বৈলক্ষণ্য, ব্যঞ্জনাব্যাপারের স্বরূপ ও উহার প্রয়োজনীয়তা, গুণ ও অলংকারের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ, কাব্যের সহিত অলংকারের যথার্থ সম্বন্ধ, রসাস্বাদ ও তাহার পদ্ধতি, কাব্যপাঠের ফল— প্রীতি অথবা ব্যুৎপত্তি, রসাস্বাদের সহিত পুরুষার্থের সম্পর্ক নিরূপণ, দৃশ্যকাব্য

এবং শ্রব্যকাব্যের পরস্পর প্রভেদ নির্ণয়, কবিপ্রতিভার স্বরূপবিচার প্রভৃতি শত শত মূলতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ অপূর্ব সমীক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, সেণ্ট টমাস, কাণ্ট, হেগেল, কোলরিজ, ক্রোচে, বের্গসঁ, ভালেরি প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ইওরোপীয় মনীষীগণের সাহিত্যবিচারসম্বন্ধীয় বহু মতবাদের সহিত ভারতীয় মনীষীগণের বিভিন্ন সমীক্ষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতেও ধরা পড়িয়াছে এবং তাঁহারা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও গভীরতা দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছেন। বস্তুতঃ রসতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারে ভারতীয় আচার্যগণ তাঁহাদের সমীক্ষারাজি দার্শনিকতার যে মহিমান্বিত সমুন্নত শীর্ষে উন্নীত করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিশ্বের সাহিত্যবিচারের ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ সাহিত্যবিচারের যে সকল সূত্র নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস যেমন জানিতে হইবে, বর্তমানের পাশ্চাত্ত্য-সমালোচনপদ্ধতির সহিত সেইরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয়ও রাখিতে হইবে।

দ্র অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯২৮; বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৫৩; বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য-মীমাংসা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যবিচার, কলিকাতা, ১৯৩৯; সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ। P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, Bombay, 1951; Sushil Kumar De, *History of Sanskrit Poetics*, revised edition, Calcutta, 1960; V. Raghavan, *Studies on Some Concepts of Alankara Sastra*, Madras, 1942; V. Raghavan, *The Number of Rasas*, Madras, 1940.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অলকট, কর্নেল হেনরি স্টিল (১৮৩২-১৯০৭ খ্রী) আমেরিকান থিওজফিস্ট। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট আমেরিকার অরেন্‌জ নগরীতে অলকটের জন্ম হয়। সিটি অফ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' পত্রিকার কৃষিবিষয়ক সম্পাদকের পদে এবং ১৮৬৩-১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ও নৌ বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭ নভেম্বর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যাঁহারা নিউ ইয়র্কে থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, অলকট তাঁহাদের অন্যতম। তিনি আমরণ উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং 'থিওজফিস্ট' পত্রিকার (১৮৭৯-১৯০৭ খ্রী) সম্পাদনা করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হেজ ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রণয়নের ভার অলকটের উপর অর্পণ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অলকট ও মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিওজফিক্যাল সোসাইটিকে পুনর্গঠিত করেন। তাঁহাদের উদ্যোগে মাদ্রাজের আডিয়ারে থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। অলকট ও অ্যানি বেসাণ্ট কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অ্যানি বেসাণ্টের সহিত ভারত ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন ও ভাষণ দেন। আডিয়ারে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে *Sorgho and Umphee* (১৮৫৭), *People from the Other World* (১৮৭৫), *The Buddhist Catechism* (১৮৮২), *Theosophy, Religion and Occult Science* (১৮৮৫); *Posthumous Humanity* (১৮৮৭), *Old Diary Leaves* (১৮৯৫-১৯০৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার প্রচারকরূপে তাঁহার নাম স্মরণীয়।

অলক-, অলকানন্দা গঙ্গার উপনদী, বিষ্ণুগঙ্গা ও সরস্বতীগঙ্গার মিলিত ধারা। সংগমে মিলিত হইবার পূর্বে বিষ্ণুগঙ্গা নামও প্রচলিত। বদ্রিনাথ হইতে কিছু দূরে বসুধারা নামক জলপ্রপাত হইতে উদ্ভূত। গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর এই নদীর উপর অবস্থিত।

অলখনামী, আলেখিয়া যিনি অলখ, অলক্ষ্য অর্থাৎ যাঁহাকে দেখা যায় না, তাঁহার নাম যাঁহারা সকল কাজে লইয়া থাকেন, তাঁহারা উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে অলখনামীরা দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের পুরী এবং অলখগিরগণ গিরি শাখার। এই দুই সম্প্রদায় ব্যতীত যাঁহারা গোরক্ষপন্থী কানকাটা যোগীদের ন্যায় আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আলেখিয়া নামে পরিচিত। আলেখিয়া শব্দটি এই জাতীয় মতাবলম্বী সকলের সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়। অলখ্-কো-জাগানেওয়ালে নামেও ইহারা সাধারণ্যে পরিচিত।

সম্প্রদায়গত আচার-ব্যবহারের পার্থক্য থাকিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মূল তত্ত্ববিশ্বাস আছে যে

পরম দেবতা বুদ্ধির অগোচর, কোনরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান বা ভক্তির পথে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই সূত্রে অলখগির সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা লালগিরের উপদেশ স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি রাজস্থানের বিকানীর জেলায় চর্মকার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হইয়া যায় -- পরলোক বলিয়া কিছু নাই, পুনর্জন্ম বা স্বর্গ-নরক নাই। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিজের সৃষ্টি। পবিত্র জীবন যাপন, নিরন্তর ধ্যান ও তপশ্চরণের দ্বারা ইহজীবনেই প্রশান্তি লাভ করা যায়। তিনি জীবহিংসা ও মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন এবং দানশীলতায় তাঁহার উৎসাহ ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

আলেখিয়ারা বিচিত্র পোশাক পরিধান করেন— কম্বলের লম্বা আলখাল্লা এবং গোল বা মোচার আকারের উচ্চ টুপি। ইঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায় রৌপ্য পিত্তল বা তাম্র নির্মিত চার পাঁচ হার জিঞ্জিরের মত অলংকার পায়ে পরেন। ভিক্ষাজীবী হইলেও ইঁহাদের আচরণ ভিক্ষুকের মত নহে। গৃহস্থের বাড়ি গিয়া 'অলখ্‌ কহো' বলিয়া আওয়াজ করিলে যদি ভিক্ষা মিলিয়া যায় তবে তাহা গ্রহণ করেন নচেৎ তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দ দাস নামে এক ব্যক্তি উড়িষ্যা দেশে আলেখিয়াদের ন্যায় মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যদের মতানুসারে মুকুন্দ আলেখিয়ার অবতার। ১৮৭৫ খ্রী তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠা ছিল।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ; *Encyclopaedia of Religion & Ethics*, vol. I, Edinburgh, 1959.

অলপ্‌-তগীন গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে অলপ্‌-তগীন ক্রীতদাস ছিলেন। পরে খুরাসান রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করেন। ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গজনী অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি কাবুল রাজ্যের একাংশও জয় করেন। ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অল্‌-বীরূনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রী) সম্পূর্ণ নাম আবু'ল রৈহান্‌ মহম্মদ্‌ ইব্‌ন্‌ আহ্‌মদ অল্‌-বীরূনী। মধ্য এশিয়াস্থ তুর্কীস্তানের অন্তর্গত খোয়ারিজ্‌ম (বর্তমান 'খিভা') অঞ্চলে তাঁহার জন্ম হয়। জাতিতে তিনি পারসীক ছিলেন এবং উত্তরাঞ্চলের তুর্কীপ্রভাবিত ফারসী তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার অনুপ্রেরণায় তিনি গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। স্বীয় মাতৃভাষা ব্যতীত তিনি আরবী, হিব্রু, সিরিয়াক, সংস্কৃত এবং সম্ভবতঃ পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলের ভারতীয় কথ্য ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং গ্রীক ভাষা না জানিলেও আরবী ও সিরিয়াক অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীক-গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক খোয়ারিজ্‌ম বিজিত হইলে পরাজিত পক্ষের অন্যতম প্রতিভূরূপে তিনি ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে নীত হইয়াছিলেন। মামুদ পাঞ্জাবের কিয়দংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে তিনি ভারতের ঐ সকল অঞ্চল পরিদর্শন করিবার সুযোগ পান ও সংস্কৃত-ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেন। এই সকল অধ্যয়ন-অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তিনি ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ২০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং কপিলকৃত সাংখ্য-দর্শন ও পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনবিষয়ক গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত হইতে আরবীতে অনুবাদ করেন। অবশেষে তিনি আরবী ভাষায় ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'তহ্‌কীক্‌ মা লি'ল-হিন্দ্‌ মিন্‌ মক্কাল মক্বূল ফি'ল অক্ল্‌ অও মর্ধূল' (সংক্ষেপে 'তারীখ্‌-উল্‌ হিন্দ্‌' বা ভারতবর্ষের ইতিহাস) রচনা করিতে সমর্থ হন। ইহাতে তিনি ৮০টি অধ্যায়ে হিন্দুদিগের ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার ও উৎসবাদি, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ, কালগণনপদ্ধতি, ব্যবহারশাস্ত্র, ভূগোল, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও সহানুভূতি -সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু- সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিদেশীরচিত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তারীখ্‌-উল্‌ হিন্দ্‌' অন্যতম। ইহা পাঠে একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা সম্পর্কে অতি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। অল্‌-বীরূনী ইউক্লিড ও টলেমির দুইখানি গ্রন্থ (সম্ভবতঃ আরবী অনুবাদ হইতে) এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয়কারী যন্ত্রবিষয়ক স্বরচিত একখানি গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আরবী ভাষায় তাঁহার অপর দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব্‌ অল্‌-আসার অল্‌-বাক্কিয়া অন্‌'ইল্‌ কুরূন্‌ অল্‌-খলিয়' (বিভিন্ন জাতির কালনিরূপণ শাস্ত্র) ও 'অল্‌-ক্কানূন অল্‌-মা'সূদি ফি'ল্‌-হই'য়া ওয়া'ল নুজুম্‌' (জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক)। তাঁহার

রচিত সর্বসমেত ২৭ খানি গ্রন্থ বর্তমান আছে। গজনীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র E. Sachau, tr. *Alberuni's India* ('তারীখ্-উল্-হিন্দ'-এর সটীক অনুবাদ), vols. 1 and 2, London, 1910; E. Sachau, tr. *Alberuni's Chronology of Ancient Nations* ('কিতাব অল্-আসার'-এর অনুবাদ), London, 1879; *Al-Biruni Commemoration Volume*, Iran Society, Calcutta, 1951.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

অশোক[১] ধর্মশাস্ত্র আয়ুর্বেদ ও কাব্যে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ-বিশেষ। ইহার পত্র দুর্গাপূজাদি কার্যে ব্যবহৃত কলা-বৌ বা নবপত্রিকার অন্যতম উপকরণ। তপস্যার স্থান হিসাবে পঞ্চবটী নির্মাণে বেদির অগ্নিকোণে অশোক স্থাপন করিতে হয়। বৃহৎপঞ্চবটীস্থলে বেদির চারিধারে বর্তুলাকারে পঁচিশটি অশোক গাছ রোপণ করিতে হয়। অশোকের ফুল লক্ষ্মী বিষ্ণু ও দেবীর পূজায় প্রশস্ত এবং কামদেবের পঞ্চবাণের অন্যতম। ইহা যুবতীদিগের পদাঘাতে বিকশিত হয় এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আছে। ইহা হইতে প্রস্তুত ঔষধ স্ত্রীরোগে বহুলব্যবহৃত। চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ও অষ্টমী যথাক্রমে অশোকষষ্ঠী ও অশোকাষ্টমী নামে পরিচিত। অশোকষষ্ঠীতে মায়েরা অশোক ফুল ভক্ষণ করেন; অশোকাষ্টমীতে শোকমুক্তি কামনায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আটটি করিয়া অশোককলিকা পানের বিধান আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অশোক[২] পৃথিবীতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার দ্বারা যে সকল অসামান্য পুরুষ ইতিহাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন অশোক তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মগধের মৌর্যরাজ-বংশের তৃতীয় সম্রাট্। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতামহ এবং দ্বিতীয় মৌর্যসম্রাট্ বিন্দুসার তাঁহার পিতা। অশোকের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত সিংহল দেশের ইতিবৃত্ত অনুসারে রাজা বিন্দুসারের শতাধিক পুত্রের অন্যতম অশোক তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তক্ষশীলায় এবং উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃ-বিরোধ আরম্ভ হয়। মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সহায়তায় অশোক তাঁহার ভ্রাতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধের সাম্রাজ্য হস্তগত করেন। এই ভ্রাতৃবিরোধের কারণে বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক হয়। অশোকের রাজত্বকালে তাঁহার নিজের আদেশে পর্বতগাত্রে, শিলাস্তম্ভে এবং গিরিগুহায় উৎকীর্ণ প্রায় ৪০ খানি 'ধর্মলিপি' বা অনুশাসন ভারতের নানা-স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কোনও একটিতেও তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে কোনও ভ্রাতৃবিরোধের ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায় না। পরন্তু তাঁহার পঞ্চম মুখ্য শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে সম্রাট্ অশোক তাঁহার অভিষেকের পরে ত্রয়োদশ বর্ষেও তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীদের পরিবার-বর্গের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন।

সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকাল সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায় না। তাঁহার শিলালিপিতে তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন গ্রীক নরপতির উল্লেখ আছে। তাঁহাদের রাজত্বকাল এবং অন্যান্য প্রমাণ বিচার করিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে সম্রাট্ অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

তাঁহার ধর্মলিপিগুলিতে তাঁহাকে সাধারণতঃ 'দেবতা-দের প্রিয়' এবং 'প্রিয়দর্শী' এই দুইটি উপাধি ও নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত মাস্কিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত আরও দুই-একটি অনুশাসনে তাঁহার অশোক নামের উল্লেখ আছে।

সম্রাট্ অশোক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রায় সমগ্র ভারত-বর্ষব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে এই সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা হইতে পূর্বে সম্ভবতঃ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের কতক অংশ পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যস্থিত শক্তিশালী কলিঙ্গ রাজ্য স্বাধীন ছিল। অভিষেকের আট বৎসর পরে সম্রাট্ অশোক বহু সৈন্যসহ কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেন। কলিঙ্গবাসীরা ভীষণ বাধা দিল এবং উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। কলিঙ্গ রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল। সম্রাট্ অশোক জয়লাভ করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত, দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত এবং উহার বহুগুণ লোক যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধের এই সর্বনাশা রূপ ও ফল দেখিয়া বিজয়ী সম্রাট্ অশোকের মন গভীর শোক, দুঃখ ও অনুশোচনায় পূর্ণ হয় এবং অল্পকাল পরেই সম্ভবতঃ উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মের

প্রভাবে তাঁহার জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। অল্প-কাল পরেই সম্রাট্ অশোক তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে ঘোষণা করেন যে, কলিঙ্গের যুদ্ধে নিহত, মৃত এবং রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত লোকের এক শতাংশ, এমন কি এক সহস্রাংশ লোকের প্রাণহানিও তিনি অত্যন্ত পরিতাপ-জনক মনে করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, নিরপরাধ ব্যক্তিকে তো কখনই আক্রমণ করা হইবে না, এমন কি যে ব্যক্তি সম্রাটের অনিষ্ট বা শত্রুতা করিবে, তাহাকেও যথাসম্ভব ক্ষমা করা হইবে। তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করেন এবং কলিঙ্গবিজয়ের পরবর্তী তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি আর কোনও যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও যুদ্ধের দ্বারা দিগ্বিজয় করিবার নীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয়ে তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা নিযুক্ত করিতে আহ্বান করেন। সম্রাট্ অশোক তাঁহার প্রথম জীবনের প্রিয় বিহারভ্রমণ, শিকার, জলসা এবং অত্যধিক আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন জীবন আরম্ভ করেন। ইহার পর প্রমোদভ্রমণের স্থান লইল তীর্থদর্শন। তিনি বুদ্ধগয়া, বস্তি জেলার অন্তর্গত শিগ্‌লিভা গ্রামে অবস্থিত পূর্ববর্তী বুদ্ধ কনক মুনির আশ্রম এবং গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁহার উদ্যোগে শেষোক্ত দুইটি স্থানে দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত হয়। লুম্বিনী গ্রামের স্তম্ভে 'এখানে ভগবান্ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' এই বাক্য ক্ষোদিত আছে। ভগবান্ বুদ্ধের স্মৃতির সম্মানার্থে ঐ স্থানের অধিবাসীদের দেয় করভার সম্রাট্ হ্রাস করিয়া দেন। রাজধানী পাটলি-পুত্র হইতে লুম্বিনী গ্রাম পর্যন্ত তীর্থযাত্রার দীর্ঘ পথে তিনি লউরিয়া আরারজ, লউরিয়া নন্দনগড় এবং রামপূর্বে তিনটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করেন। তীর্থযাত্রা ছাড়াও সম্রাট্ অশোক তাহার বিশাল সাম্রাজ্যময় 'ধর্মযাত্রা' অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণ করিতেন এবং সাধারণ লোকদের সহিত মেলা-মেশা করিয়া তাহাদের নিকট ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অভিষেকের বার বৎসর পর হইতে পরবর্তী পনর বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পর্বত গাত্রে ও শিলাস্তম্ভে ধর্মের বাণী ক্ষোদিত করাইয়া ধর্মের প্রচার ও জনসাধারণের মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন। সুদূর আফগানিস্তানের অন্তর্গত কান্দাহার এবং জালালাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মনসেরা ও সাহাবাজগড়ি, উত্তর প্রদেশের দেহ্‌রা-দুন জেলার কালসী, কাথিয়াওয়াড়, গিরনার, উড়িষ্যার তোষালি এবং মহীশূরের মাস্কি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার 'ধর্মলিপি' পাওয়া গিয়াছে। সর্বজনবোধ্য করিবার জন্য তাঁহার শিলালিপিতে স্থানীয় প্রচলিত বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার শিলালিপি ও শিলাস্তম্ভে একাধিক লিপির ব্যবহার দেখা যায়, যেমন কান্দাহার এবং জালালাবাদের শিলালিপিতে গ্রীক ও অ্যারামাইক অক্ষর, মনসেরা ও সাহাবাজগড়ির শিলালিপিতে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মী লিপি। এই সকল শিলালেখের ভাষা অর্ধমাগধী— অনেকটা পালি ভাষার অনুরূপ। ভারতের সর্বত্র এই একই ভাষার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই ভাষা তখন ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র ভারত একই ভাষার সূত্রে সংযুক্ত ছিল।

অশোক তাঁহার ধর্মলিপিতে যে ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব কিছু নাই— এমন কি দেব-দেবীর পূজার কথাও নাই।

পিতা-মাতার আজ্ঞাপালন, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদয় আচরণ, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-প্রতিবেশী ও অন্যান্য পরিচিত জনকে ধনদান, অহিংসা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযম, সর্বপ্রকার ব্যসন পরিহার, জীবে দয়া প্রভৃতি যে সমুদায় নীতি পালন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য অশোক কেবলমাত্র তাহাই ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে ভগবান্ বুদ্ধ যে ধর্ম নির্দেশ করিয়াছিলেন অশোকের ধর্ম যে তাহারই পুনরুক্তিমাত্র, ইহাই বহুজন-গ্রাহ্য মত। এই ধর্মপ্রচারের জন্য সম্রাট্ অশোক তাঁহার সুবিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র, দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র এবং কেরলপুত্র রাজ্যে, ভারতের বাহিরে দক্ষিণদিকে সিংহলে, সম্ভবতঃ পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশে এবং উত্তর-পশ্চিমদিকে সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, মাসিডোনিয়া এবং এপিরাস প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যসমূহে প্রচারক প্রেরণ করেন। সিংহলের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে সম্রাট্ অশোক তাঁহার স্বীয় পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। রাজকর্মচারীগণ রাজকার্য পরিদর্শন ও পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপ্রচার করিতে আদিষ্ট হয়। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও ধর্মাচরণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ধর্মমহামাত্র নামক নূতন একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধ ধর্মে ইতিমধ্যে নানা মতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিবার জন্য সম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বৃদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণের এক মহাসভা আহ্বান করিয়া মতৈক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। সম্রাট্ অশোক তাঁহার বিস্তৃত

সাম্রাজ্যের সর্বত্র পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও প্রাণীহত্যা হ্রাসের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের ভোজনালয়ে পূর্বে প্রত্যহ বহুশত পশু-পক্ষী হত্যা করা হইত; তিনি এই ব্যবস্থা রহিত করেন। কোনও কোনও প্রাণী একেবারে অবধ্য এবং অন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও বয়স্ক না হইলে অবধ্য— তাঁহার একখানি লিপিতে এইরূপ বহু নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্রাট্ অশোক প্রজাদিগকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করিতেন, রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহকালের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেন। প্রজাগণ সম্রাটের সন্তানতুল্য এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া রাজার সন্তানদিগের সহিত তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন প্রজাসাধারণেরও সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে রাজকর্মচারীদিগকে তিনি আদেশ দেন। রাজকর্মচারীদের প্রতি সম্রাটের আদেশ ছিল যে তাঁহারা যেন সর্বদা অনলসভাবে রাজকার্য পরিচালনা করিয়া করুণার সহিত ন্যায়বিচার করেন। ধর্মানুসরণ করিলে কি প্রকারের স্বর্গসুখ পাওয়া যায় তাহা লোক-দিগকে বুঝাইবার জন্য সম্রাট্ অশোক নানা প্রকারের প্রদর্শনী এবং শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। স্বীয় ধর্মের অত্যধিক প্রশংসা ও অপরের ধর্মের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হইয়া অপরের ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া তাহাদের ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সম্রাট্ অশোক প্রজাদিগকে অনুরোধ জানান। সম্রাট্ নিজেও ভিন্নধর্মাবলম্বীগণের সহিত সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করিতেন; ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই দান করা উচিত এই কথা তিনি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্মিত বরাবর গিরিগুহা অদ্যাবধি বুদ্ধেতর আজীবিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য হইয়া আছে। গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত যে ধর্ম এতাবৎকাল কেবলমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল, সম্রাট্ অশোকের এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে তাহা ভারত ও বহির্ভারতে, যেমন সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং পূর্ব ইওরোপ প্রভৃতি স্থানে বিস্তারলাভ করে। তাঁহার জন্যই আজিও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বুদ্ধের ধর্মমত অনুসরণ করে।

সর্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল। পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খনন, বিশ্রামাগার নির্মাণ, রাজ্যের নানা স্থানে মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার হিতকর প্রচেষ্টাসমূহের নিদর্শন। জীবের প্রতি সম্রাট্ অশোকের এই করুণা ধর্ম ও দেশ -নিরপেক্ষ ছিল। নিকটতম পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের গ্রীক রাজাদের দেশেও তিনি পশু ও মানুষের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং তদুপরি এই সকল দূরবর্তী দেশের চিকিৎসালয়-সমূহে রুগ্ন মানুষ ও পশুদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য নানা লতা, গুল্ম ও ফলবৃক্ষ প্রেরণ ও রোপণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অশোকের সময় স্থাপত্য এবং অন্যান্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পরেও তাঁহার প্রাসাদের সৌন্দর্য চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ফা-হিয়েন লিখিয়া গিয়াছেন যে সম্রাট্ অশোকের প্রাসাদ মানুষের তৈয়ারি নহে— উহা দৈত্যের হাতে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ অশোক ৮৪০০০ স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেইগুলি সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র সাঁচীতে যে বৃহৎ স্তূপটি আছে তাহা প্রথমে সম্রাট্ অশোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পরে উহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অশোক যে ভগবান্ বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সম্প্রতি আবিষ্কৃত তাঁহার আহ্‌রৌরা ক্ষুদ্র শিলালেখে ইহার উল্লেখ আছে। অশোকের নির্মিত কয়েকটি শিলাস্তম্ভ কালের ধ্বংসলীলাকে পরাজিত করিয়া অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের শিল্পকৌশল বর্তমান স্থপতিগণের ও শিল্পবিশেষজ্ঞদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। এক-একটি স্তম্ভ ৯ হইতে ১২ মিটার (৩০ হইতে ৪০ ফুট) উচ্চ, একখানি অখণ্ড পাথরে তৈয়ারি এবং এমন চমৎকার পালিশ করা যে আয়নার মত স্বচ্ছ মনে হয়। এই সকল স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে বৃহৎ পশুমূর্তি আছে, তাহার কারুকার্য অপরূপ। সারনাথে অবস্থিত অশোকের স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারিটি পূর্ণাবয়ব সিংহের আকৃতি অতুলনীয় শিল্পের নিদর্শন। এই শীর্ষাংশই বর্তমান স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রতীক।

সম্রাট্ অশোকের পারিবারিক জীবনের কথা অল্পই জানা যায়। পরবর্তী কালে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অসন্ধিমিত্রা তাঁহার প্রধানা মহিষী এবং কারুবাকী বা চারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতী এবং তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার অপর চারি মহিষী ছিলেন এবং মহেন্দ্র, তিবর, কুনাল এবং জলৌক নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিতে একমাত্র তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী কারুবাকী বা চারুবাকী এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্র তিবরের উল্লেখ আছে। সিংহল দেশের ইতিবৃত্তে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রার কথা পাওয়া যায়।

অশোকের শিলালিপিতে ইহাদের কাহারও উল্লেখ নাই। অনেকে অনুমান করেন, অশোকের মৃত্যুর পরে তাঁহার কোনও পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন নাই। সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পরে দশরথ এবং সম্প্রতি নামক তাঁহার দুই পৌত্রের মধ্যে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়।

সম্ভবতঃ চল্লিশ অথবা একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে সম্রাট্ অশোক দেহত্যাগ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট্ অশোকের স্থান অতুলনীয়। অমিত বলশালী হইয়াও পশুবলে পররাজ্য জয় করিবার নীতি তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। পরস্বাপহারী, অসংযত বিজিগীষু, রক্তোন্মাদ মাসিডন-অধিপতি আলেকজাণ্ডার, রোমক সাম্রাজ্যের জুলিয়স্ সিজর কিংবা ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন— যে কাহারও অপেক্ষা 'মহান' (The Great) উপাধি সম্রাট্ অশোকের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য।

দ্র অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোক-লিপি, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; E. Hultzsch, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, vol. 1 *(Inscription of Asoka)*, Oxford, 1925; D. R. Bhandarkar, *Asoka*, Calcutta, 1925; V. A. Smith, *Asoka—The Buddhist Emperor of India*, Oxford, 1919; Benimadhab Barua, *Asoka and His Inscriptions*, Calcutta, 1946.

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

অশৌচ নিকট আত্মীয়ের জন্ম মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে উদ্ভূত সাময়িক অপবিত্রতা। অশৌচকালে ধর্মকার্য সম্পাদনের অধিকার তিরোহিত হয়। আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব অনুসারে এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অশৌচকাল এক মাস, দশ দিন, তিন দিন বা এক দিন মাত্র হইয়া থাকে। মরণাশৌচে ক্ষৌরকর্ম ও মৎস্য-মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। যাঁহার অশৌচ হইয়াছে তাঁহার স্পৃষ্ট অন্ন অগ্রাহ্য— কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার দেহ অস্পৃশ্য। পিতা, মাতা বা পতির মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্যন্ত পুত্র ও পত্নীর দেহাশৌচ বা কালাশৌচ। কালাশৌচে পাদুকা, ছত্র, পর্যঙ্ক, কাষ্ঠাসন, মাল্য, পরান্ন ও মৈথুন বর্জনীয়। শরীরের কোনও অংশে রক্তপাত হইলে একদিন ক্ষতাশৌচ। স্ত্রীলোকের রজস্বলাশৌচ সাধারণ কর্মে তিন দিন— দৈব ও পিতৃকার্যে চার দিন। বিশেষ বিবরণ রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অশ্ব অশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিহ্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ২৫০০০ বৎসর পূর্বের বা পুরাতন প্রস্তর (প্যালিওলিথিক) যুগের। গৃহপালিত পশুগুলির মধ্যে গরু এবং অশ্বই বোধ হয় প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতিপালিত হইত। রথের সহিত সংযুক্ত অশ্বের প্রাচীনতম নিদর্শনটির প্রাপ্তিস্থান গ্রীস; নির্মাণকাল প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ক্রমবিবর্তনের ফলেই বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় অশ্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। উন্নত-শ্রেণীর আধুনিক অশ্বগুলির অধিকাংশই শক্তিশালী কৃষ্ণকায় ফিল্যাণ্ডার (Filander) ও আরবীয় অশ্ব হইতে উদ্ভূত।

অশ্ব স্তন্যপায়ী পশু ও গর্দভের সহিত একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের পায়ে বিজোড়সংখ্যক ক্ষুর ও পাকস্থলীতে একটিমাত্র কক্ষ থাকে। অশ্বের পিত্তস্থলী (gall bladder) থাকে না। অশ্বের জীবনকাল প্রায় ৩০ বৎসর ও গর্ভধারণ কাল ৩২২ দিন। বিশেষতঃ শীত-প্রধান দেশে অশ্ব কেবল শরৎকালেই প্রজনন করে।

প্রতীচ্যে বহু প্রকারের অশ্ব আছে। তাহাদের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ভারি, তাহাদের সাহায্যে কিছু কিছু চাষের কাজ এখনও করা হইয়া থাকে এবং যেগুলি হালকা ও দ্রুত দৌড়াইতে সক্ষম, সেইগুলি মানুষের বাহনের কাজ ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। অশ্বারোহণ, ঘোড়দৌড়, গাড়িটানা, ভারবহন ইত্যাদি কার্যে ভারতে প্রধানতঃ অশ্বের ব্যবহার হয়। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে উপযুক্ত পথের অভাব, সেখানে অশ্বই পণ্যদ্রব্যাদি প্রেরণের একমাত্র বাহন। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় অশ্বই বিদেশীয় অশ্বের মত কর্মক্ষম নহে। ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনীর জন্য বহুসংখ্যক অশ্বের প্রয়োজন হয়।

ভারতে আনমোল (Unmol), ভুটিয়া, মণিপুরী, মাড়ওয়ারী, কাথিয়াওয়াড়ী প্রভৃতি অশ্ব পাওয়া যায়। আনমোল রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলাম অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। কথিত আছে যে, ইহাদের পূর্বপুরুষ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তাঁহার সহিত এই দেশে আসিয়াছিল। নেপাল ও হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের ভুটিয়া অশ্ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি; ইহাদের দেহ সুসংবদ্ধ এবং কেশর ও লেজ দীর্ঘ। মণিপুর রাজ্যের মণিপুরী অশ্বও ক্ষুদ্রাকৃতি। মাড়ওয়ারী অশ্ব মাড়ওয়ারে পাওয়া যায়; ইহাদের আকৃতি রাজসিক; ইহারা দ্রুতগামী ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাত। দ্রুতগামী কাথিয়াওয়াড়ী অশ্ব রাজস্থান ও কাথিয়াওয়াড়ে পাওয়া যায়।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

অশ্ব-ক্ষমতা কোনও যন্ত্র বা প্রাণী যে হারে কাজ করে (বলবিজ্ঞার অর্থে) তাহাকে ঐ যন্ত্র বা প্রাণীর ক্ষমতা (পাওয়ার) বলা হয়। ইহা মাপা হয় অশ্ব-ক্ষমতা বা হর্স-পাওয়ারের এককে। জেম্‌স ওয়াট তাঁহার যন্ত্রের কর্ম-ক্ষমতা নির্দেশ করিবার জন্য এই একক প্রবর্তন করেন। একটি অশ্বের কর্মক্ষমতার সহিত মোটামুটি সম্পর্ক থাকিলেও বলবিজ্ঞায় ইহার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। ৫৫০ পাউণ্ডের কোনও বস্তু সেকেণ্ডে ১ মিটার উঁচুতে তুলিতে যে ক্ষমতা প্রয়োজন তাহাই এক অশ্ব-ক্ষমতা। দশমিক প্রথার এককে ইহা ৭৪৬ ওয়াটের সমান। ৭৩ মিটার (২৩৮ ফুট) উচ্চ কুতুবমিনারে উঠিতে ৫০ কিলোগ্রাম (১১০ পাউণ্ড) ওজনের কোনও লোকের যদি ১০ মিনিট সময় লাগে, তবে তাহার অশ্ব-ক্ষমতা প্রায় [illegible] হইবে।

শ্যামল সেনগুপ্ত

অশ্বঘোষ সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অশ্বঘোষ বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার কাব্য, নাটক ও দর্শনগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। অশ্বঘোষের জীবনকাহিনীর জন্য আমাদিগকে চীনা ও তিব্বতী সূত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ ইঁহার আবির্ভাবকাল। ইনি সম্রাট্ কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং সাকেত (অযোধ্যা) ইঁহার জন্মস্থানরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইঁহার মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী। পার্শ্ব অথবা তাঁহার শিষ্য পুণ্যযশাঃ ছিলেন অশ্বঘোষের গুরু।

এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি এক ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রসমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তথা-গতের বাণীপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। বৌদ্ধ হিসাবে তিনি প্রথমে সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। মৈত্রী, করুণা ও বুদ্ধ-ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করিয়াই প্রধানতঃ মহাযানের সূত্রপাত হয়। তাঁহার তিব্বতী জীবনীকার তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ও গীতিকাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সংগীতের মাধ্যমে তিনি জগৎ ও জীবনের অসারতা বর্ণনা করিতেন এবং এইরূপে নাকি তিনি বহু লোককে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরাগী করিতে পারিয়াছিলেন।

অশ্বঘোষ রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে যে গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সবই বুদ্ধচরিতে বর্তমান। মহাকবি কালিদাসের উপর যে এই মহাকাব্যের ছায়াপাত হইয়াছে তাহা আজ স্বীকৃত। এই মহাকাব্যের কাব্যরস হৃদয়গ্রাহী। ভাষা সরস, ছন্দের মধ্যে প্রাণ আছে এবং উপমাগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবি অশ্বঘোষের পূর্ণ পরিচয় এই মহাকাব্যে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায় বর্তমানে যে বুদ্ধচরিত পাওয়া যায় তাহা ১৭ সর্গে সমাপ্ত। গৌতমের প্রথম জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের আরম্ভ পর্যন্ত কাহিনী হইল বুদ্ধচরিতের বিষয়বস্তু। চীনা সূত্র হইতে জানা যায় যে, এই মহাকাব্যটি ২৮ সর্গে সমাপ্ত ছিল এবং গৌতমের বোধিলাভ পর্যন্ত কাহিনী ছিল ইহার বিষয়বস্তু। তিব্বতী অনুবাদেও এই ২৮ সর্গ বর্তমান। অনুমিত হয় যে, সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ১৩ সর্গ প্রাচীন ও মূল গ্রন্থের অংশ। খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে অমৃতানন্দ নামে এক ব্যক্তি বুদ্ধ-চরিতের একটি পুথি প্রস্তুত করিবার সময় কোনও সম্পূর্ণ গ্রন্থ না পাইয়া শেষের কয়েক সর্গ নাকি নিজেই রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের সহিত জুড়িয়া দেন।

'সৌন্দরানন্দ' অশ্বঘোষ রচিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে। এই কাহিনীগুলি বুদ্ধচরিতে বিস্তৃতরূপে বিবৃত বা আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। এই কাব্য ১৮ সর্গে সমাপ্ত। বুদ্ধ তাঁহার এক ভ্রাতা নন্দকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিলে রূপবতী যুবতী স্ত্রী সুন্দরীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য নন্দের ব্যাকুলতা কিরূপে বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের প্রভাবে দূরীভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নন্দ 'অর্হত্ব' লাভ করেন তাহাই এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ভাব, ভাষা, ছন্দ সকল দিকেই এই কাব্যগ্রন্থ বুদ্ধচরিতের অনুরূপ হইলেও উৎকর্ষের বিচারে বুদ্ধচরিত নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

'শারিপুত্র প্রকরণ' অশ্বঘোষ বিরচিত একটি নাটক। এই নাটকের কতকগুলি খণ্ডিত অংশমাত্র জার্মান পণ্ডিতেরা মধ্য এশিয়ায় কুড়াইয়া পান। বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গে বর্ণিত শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের বৌদ্ধ ধর্ম ও সন্ন্যাস-গ্রহণের কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য বিষয়।

অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে 'বজ্রসূচী' ও 'সূত্রালংকার' অন্যতম। এই গ্রন্থ দুইটির রচয়িতা যে আচার্য অশ্বঘোষই তাহা এখনও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই। বজ্রসূচীতে ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথার উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। সূত্রালংকার ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারজীব কর্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা

কুমারলাতও হইতে পারেন। মাতৃচেত রচিত কতকগুলি কবিতা তিব্বতে অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের মতে মাতৃচেত বস্তুতঃ অশ্বঘোষেরই নামান্তর। 'গণ্ডীস্তোত্র গাথা' -শীর্ষক একটি উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যের রচয়িতারূপেও অশ্বঘোষের নাম করা হয়। মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ' নামে একটি দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থের কর্তা হিসাবেও আচার্য অশ্বঘোষ উল্লিখিত হইয়াছেন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বত্থ[১] ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অশ্বত্থ গাছ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ইহা বিষ্ণুস্বরূপ। রতিভোগনিরত হর-পার্বতীর নিকট দ্বিজবেশী অগ্নিকে পাঠাইয়া দেবতারা রতিসুখের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। ফলে পার্বতীর শাপে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা যথাক্রমে অশ্বত্থ, বট ও পলাশরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের দর্শন, স্পর্শ ও সেবার দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয়। আর এক কাহিনী অনুসারে, দানবনির্জিত দেবগণ বিভিন্ন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। ফলে দেবতাশ্রিত বৃক্ষ দেবময় হইয়া উঠে। হরি অশ্বত্থ বৃক্ষকে আশ্রয় করেন। অপর এক কাহিনীর মতে, বিষ্ণু অশ্বত্থ বৃক্ষকে অলক্ষ্মীর বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেন। কেবল শনিবার অলক্ষ্মীর কনিষ্ঠা ভগিনী লক্ষ্মী এখানে আগমন করেন। তাই শনিবারে এই বৃক্ষ বিশেষভাবে পূজনীয়, অন্য বারে ইহা অস্পৃশ্য (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১১৭, ১১৮, ১৫১ অধ্যায়, আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা সংস্করণ)। অশ্বত্থ গাছের গোড়া বাঁধাইয়া দেওয়া ও গোড়ায় জল দেওয়া, অশ্বত্থ গাছের তলায় ধর্মকার্য করা ও অশ্বত্থ গাছকে প্রণাম করা পাপনাশক ও মঙ্গলজনক কার্য। পক্ষান্তরে অশ্বত্থ গাছ বা তাহার ডাল নষ্ট করিলে নিদারুণ পাপ হয় (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১১শ অধ্যায়)।

অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও বট-অশ্বত্থের বিবাহ দান আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠায় বৃক্ষ রোপণ করিয়া সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য তাহাকে উৎসর্গ করা হয়। সাধনার স্থান হিসাবে পঞ্চবটী স্থাপনে বেদির পূর্ব দিকে অশ্বত্থ রোপণ করিতে হয়— বৃহৎ পঞ্চবটীস্থলে চারিদিকেই অশ্বত্থের ব্যবস্থা করিতে হয়। দেব-দেবীর পূজায় ঘটের উপরে যে পঞ্চপল্লব দেওয়া হয়, অশ্বত্থপল্লব তাহাদের মধ্যে একটি।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অশ্বত্থ[২] ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus religiosa Linn.*, সংস্কৃত নাম অশ্বত্থ। হিন্দী— পিপল, পিপ্‌লি। অশ্বত্থ গাছ সাধারণতঃ জীর্ণ পাকা বাড়ির ফাটল অথবা বৃহৎ উদ্ভিদাদির কোটরে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহারা পরগাছা নহে। জীর্ণ বৃক্ষকোটরে চারাগাছ জন্মগ্রহণ করিবার পর প্রথমতঃ শাখা বা পত্র-পল্লব বিস্তার না করিয়া শিকড় ও তাহার শাখা-প্রশাখাগুলিকে ক্রমশঃ নীচের দিকে প্রসারিত করিতে থাকে এবং দুই-এক বৎসরের মধ্যেই মাটির নাগাল পাইয়া ক্রমশঃ স্ফীত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই শিকড় বা ঝুরিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কাণ্ডের আকার ধারণ করে। প্রতি বৎসরই ইহাদের পাতা ঝরিয়া পড়ে এবং বসন্তের প্রারম্ভে নূতন মুকুল গজায়। পাতাগুলি দেখিতে অনেকটা গাছপানের পাতার মত, কিন্তু আকারে অনেকটা ছোট। পাতার মধ্যশিরার উভয় দিকে উপশিরাগুলি সমান্তরালে বিস্তৃত। বোঁটাগুলি বেশ লম্বা। বোঁটার গোড়ার দিকে জোড়ায় জোড়ায় ক্ষুদ্রাকৃতির ফল ধরে। ভারতের প্রায় সর্বত্র অযত্নবর্ধিত বা পথিপার্শ্বে রোপিত অশ্বত্থ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বীজ অথবা কলম হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধেরা এই গাছকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে কোনও কোনও অঞ্চলে ইহাদের ফল এবং কচি পাতা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পাখিরা প্রচুর পরিমাণে অশ্বত্থের ফল উদরস্থ করিয়া থাকে। শুষ্ক ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে—ইহাতে ৯.৯% জলীয় পদার্থ, ৭.৯% অ্যালবুমিনয়েড, ৫.৩% তৈলাক্ত পদার্থ, ৩৪.৯% কার্বোহাইড্রেট, ৭.৫% রঞ্জক পদার্থ, ৮.৩% ছাই, ১.৮৫% সিলিকা এবং ০.৬৯% ফস্‌ফরাস (P_2O_5) আছে। সাধারণ ঘাস অপেক্ষা ইহাদের পাতায় দুই-তিন গুণ বেশি প্রোটিন পাওয়া যায়। শুঁটিজাতীয় পশুখাদ্য অপেক্ষা ইহাদের পাতায় দুই-তিন গুণ বেশি চুনজাতীয় পদার্থ আছে। অবশ্য পাতায় পুষ্টিকর পদার্থ বেশি থাকিলেও অন্যান্য পশুখাদ্য অপেক্ষা সেগুলি দুষ্পাচ্য। এই গাছের কর্তিত স্থান হইতে একরকম শাদা রস নির্গত হয়। ইহাতে ০.৭% হইতে ৫.১% রবার জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বটের আঠার মত এই রসও মোটর-টায়ারের ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। অশ্বত্থ গাছের কাঠ মোটামুটি শক্ত এবং রং কতকটা ধূসরাভ শাদা। এই কাঠ সাধারণতঃ প্যাকিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছালে প্রায় ৪% ট্যানিন পাওয়া যায় এবং ইহা বেশ ঝাঁঝালো। এই ছালের ক্বাথ চর্মরোগে ও ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়। জলের সাহায্যে এই ছাল হইতে নিষ্কাশিত পদার্থে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ও

ই. কোলাই ব্যাক্টেরিয়া দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অশ্বত্থ গাছের পাতা ও কচি মুকুল চর্মরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্যের পুত্র ও প্রসিদ্ধ বীর। জন্মকালে অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম অশ্বত্থামা। ইনি চিরজীবী বলিয়া খ্যাত। পিতা দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা কৌরবপক্ষের সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশপূর্বক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বধ করেন। ক্রুদ্ধ অর্জুন ইঁহার অঙ্গস্বরূপ শিরোমণি ছেদন করিয়া ইঁহার শাস্তি ও দ্রৌপদীর সান্ত্বনার ব্যবস্থা করেন। শিরোমণি ছেদনের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ উপশমের জন্য প্রতিদিন তেল মাথার পূর্বে গৃহস্থের পক্ষে কিছু তেল মাটিতে ছিটাইয়া দেওয়ার প্রথা বর্তমান আছে। ভীষণ যুদ্ধে নিরত দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের পক্ষ হইতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়। এই সময়ে ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করেন। তাই যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত অশ্বত্থামার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে হস্তীর উল্লেখ করেন। যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি অনুসারে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বাংলায় প্রবাদবাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে।

দ্র মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৯০, সৌপ্তিক পর্ব ১৩-১৬; ভাগবত, ১।৭ ৮।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অশ্বমেধ সার্বভৌম নরপতিদের দ্বারা অনুষ্ঠেয় বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্র মহাভিষেক বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েকজন দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধযাজী নরপতির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ, বসন্ত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত বৎসরাধিক কাল লাগিত। প্রথমে নানা লক্ষণসমন্বিত মেধ্য অশ্বের নির্বাচন করিতে হইত। অশ্বনির্বাচনের পর তাহাকে স্নান করাইয়া প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তখন সেই অশ্ব স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সঙ্গে একশত জীর্ণ অশ্বও ছাড়িয়া দেওয়া হইত। মেধ্য অশ্বের রক্ষার জন্য নানা আয়ুধভূষিত শত শত যোদ্ধাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পররাজ্যের মধ্য দিয়া বিচরণকালে মেধ্য অশ্বকে যদি কোনও রাজা হরণ করিতেন, অথবা কোনও উপায়ে তাহার অগ্রগতি ব্যাহত করিতেন তবে রক্ষক পুরুষগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইত। যদি মেধ্য অশ্বের রক্ষকগণ বাধাপ্রদানকারী সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেন, তবেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারিত।

অশ্ব প্রত্যাবর্তনের পরের দিনে হইত অভিষেচন এবং অশ্বমেধযাজী নরপতির পত্নীগণ অশ্বের বিলেপন ও প্রসাধনাদিক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। অতঃপর মেধ্য অশ্বটিকে একটি ছাগের সহিত এবং অন্যান্য বধ্য প্রাণীর সহিত যজ্ঞিয় যূপে বদ্ধ করা হইত। অনন্তর তাহাকে সংজ্ঞপন বা শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইত। যজমান-মহিষী মৃত অশ্বের পার্শ্বে শয়ন করিতেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে তিনি বীরপুত্রপ্রসবিনী হইতে পারিতেন। অতঃপর অশ্বের দেহটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইত, এবং দেবতাদের উদ্দেশে বপা আহুতি দেওয়া হইত। যজমানের অবভৃথ স্নান এবং ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণাদি বিতরণের পর যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইত।

বৈদিক গ্রন্থসমূহে অশ্বমেধের মহিমা উচ্ছ্বসিত ভাষায় কীর্তিত হইয়াছে। সর্ববিধ পাতক, এমন কি ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতক হইতেও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা মুক্ত হওয়া যাইত। মহাভারতে এই বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেবের উক্তির মর্মার্থও ইহাই। অশ্বমেধ যে শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠানমাত্র ছিল তাহা নহে, ইহা একটি সুমহান রাষ্ট্রীয় উৎসবরূপেও পরিগণিত হইত। স্বদেশ ও বিদেশস্থ প্রজাবর্গ, নানাজাতীয় অতিথিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ এই উৎসবে সানন্দে যোগদান করিতেন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে অশ্বমেধ যজ্ঞকে 'উৎসন্নযজ্ঞ'রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। 'উৎসন্নযজ্ঞ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অজ্ঞাত। তবে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, অগণিত অঙ্গসমন্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। সেই কারণেই হউক অথবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের ফলেই হউক, অশ্বমেধ যজ্ঞ কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে ইহা কলিযুগে নিষিদ্ধ হয়। বাংলা দেশের শারদীয়া দুর্গাপূজা কলির অশ্বমেধ বলিয়া মনে করা হয়। ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিপতি সমুদ্রগুপ্ত এই যজ্ঞ সম্পাদন

করিয়া 'চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তা' বিশেষণের দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন।

দ্র শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।১-৫ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৮-৯ ; মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব ৭১ ও পরবর্তী অধ্যায়-সমূহ ; J. Eggeling, *Satapatha Brahmana*, Part V ; *Sacred Books of the East*, vol. XLIV ; A. B. Keith, *Veda of the Black Yajus*, Harvard Oriental Series, vol. XVIII ; D. R. Sahani *Epigraphia Indica*, vol. XX, No. 4 ; D. R., Bhandarkar, *Brahmanic Revival*, 1939.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অশ্বিদ্বয় সূক্তসংখ্যার দিক দিয়া গণনা করিলে ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোম— এই দেবতাত্রয়ের অব্যবহিত পরেই অশ্বিদ্বয়ের স্থান। পঞ্চাশেরও অধিক সূক্ত প্রধানভাবে তাঁহাদেরই উদ্দেশে উচ্চারিত। ইঁহারা দ্যুস্থান দেবতাগণের (celestial gods) অন্যতম। কিন্তু ইঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অতি প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যেও মতভেদ লক্ষিত হয়। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে ইঁহারা যুগ্ম দেবতা (twin gods), কেননা 'অশ্বিনৌ' এই দ্বিবচনের দ্বারা তাঁহারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। আচার্য যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে ইঁহাদের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : অনন্তর দ্যুস্থানস্থিত দেবগণের (সম্বন্ধে আলোচনা করিব)। তাঁহাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয়ই মুখ্য। তাঁহাদিগকে অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনৌ) বলা হয়, যেহেতু তাঁহারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত (√অশ্‌) করেন— একজন রসের দ্বারা, অপর জন জ্যোতির দ্বারা। 'তাঁহারা অশ্বী, যেহেতু তাঁহারা অশ্বযুক্ত'— ইহা ঔর্ণবাভ আচার্যের মত। অতএব অশ্বিদ্বয় কাহারা? কেহ কেহ বলেন— দ্যুলোক এবং পৃথিবী। অপর একদল বলেন -দিন ও রাত্রি। আর এক সম্প্রদায়ের মতে, সূর্য ও চন্দ্র। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন 'পুণ্যকর্মা দুইজন রাজাই অশ্বিদ্বয়' (নিরুক্ত, ১২।১)।

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতভেদের একটি প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, ঋগ্‌বেদে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির মধ্যে বড় অধিক 'পৌরুষবিধ্য' (anthropomorphism) প্রবেশ করিয়াছে, যাহার ফলে উঁহাদের মূল নৈসর্গিক (natural) স্বরূপটিই আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই যুগ্ম দেবতাদ্বন্দ্বের নিত্য সাহচর্য বুঝাইবার জন্য ঋগ্‌বেদে প্রায়শঃই তাঁহাদিগকে নেত্রদ্বয়, হস্তদ্বয়, চরণদ্বয়, পক্ষদ্বয় প্রভৃতি যুগ্ম পদার্থের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

অশ্বিগণের বহুলপ্রচলিত বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি— 'যুবানা', 'বভ্রূ', 'হিরণ্য-পেশসা', 'মায়াবিনা', 'হিরণ্য-বর্তনী', 'রুদ্র-বর্তনী' ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদীয় সূক্তসমূহে অশ্বিদ্বয়ের রথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের রথ 'হিরণ্যয়' ; ঈষা এবং অক্ষও 'হিরণ্যয়' ; এই রথ 'ত্রিচক্র', 'ত্রি-বন্ধুর' ; ইহার পবিসংখ্যাও তিন— 'ত্রয়ঃ পবয়ঃ'। এই রথের গতি অতি ক্ষিপ্র 'রঘুবর্তনি' ; ইহা সহস্র আভরণ ও সহস্র কেতুতে ভূষিত— 'সহস্র-কেতু', 'সহস্র-নির্ণিজ্‌' ; এই রথের বাহন কখনও বা রাসভ, কখনও বা বিহঙ্গ অথবা শ্যেনসদৃশ, হংসসদৃশ ক্ষিপ্রগতি অশ্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষিপ্রগতি রথে তাঁহারা বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন।

অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যাস্ক বলিয়াছেন : 'তাহাদের দুইজনের কাল— অর্ধরাত্রের পর, পূর্ণপ্রকাশের ব্যাঘাত পর্যন্ত' (নিরুক্ত ১২।১)। অতএব তাঁহারা যে প্রাতঃকালীন দেবতা— ইহা যাস্কের মত হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে ঋগ্‌বেদে বহুবিধ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। তাঁহারা বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যৌবন দান করেন ; পুরুমিত্রযোষা কমদ্যুকে তাঁহারা রথে করিয়া যুবা বিমদের নিকট বহন করিয়া আনেন। যুদ্ধে বিশ্‌পলার জঙ্ঘা ছিন্ন হইলে অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার আয়সী (লৌহময়ী) জঙ্ঘা নির্মাণ করিয়া দেন, অন্ধ ঋজ্রাশ্বের দৃষ্টিশক্তিও তাঁহাদের সাহায্যেই পুনরুজ্জীবিত হয়। মহাভারতেও আয়োদ ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু অশ্বিদ্বয়েরই প্রসাদে তাঁহার লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি পুনর্বার লাভ করেন দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষা নাম্নী এক জরৎ-কুমারীও অশ্বিদ্বয়ের প্রসাদেই পিতৃগৃহে কুমারীত্বদশা হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এই সকল উপাখ্যানকে কোনও কোনও ব্যাখ্যাতা নৈসর্গিক ঘটনারই রূপক হিসাবে ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মুরের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন : 'কিন্তু রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার পদ্ধতি যথার্থ না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা একই অভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিভিন্ন নামে এবং বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে— ইহা কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং ঋষিগণ তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি আখ্যান উল্লেখ করিয়া কিভাবে অশ্বিদ্বয় তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন— এইরূপ কল্পনা করাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।'

পরবর্তী যুগে অশ্বিদ্বয়ের অদ্ভুত আরোগ্য-কর্তৃত্ব ও চিরযৌবন সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা সেইজন্য 'দেব-ভিষজ্‌' বা 'দেব-বৈদ্য' রূপেও খ্যাত। গোলড্‌স্ট্যুকর মনে করেন যে অশ্বিদ্বয়ের ব্যক্তিত্বে নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক উভয়বিধ কল্পনার এক অপূর্ব মিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছিল :

'আমার মতে অশ্বিগণ সম্পর্কে প্রচলিত আখ্যানরাজিতে দুইটি বিভিন্ন উপাদানের চিত্রণ হইয়াছে— একটি নৈসর্গিক এবং অপরটি মানবিক বা ঐতিহাসিক। কালক্রমে এই উভয় উপাদান মিশ্রিত হইয়া অভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং এই সকল আখ্যানের যথার্থ তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে এই দ্বিবিধ উপাদানকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। মানবীয় উপাদান বলিতে অশ্বিগণ কর্তৃক বিভিন্ন রোগের বিস্ময়জনক আরোগ্যকার্য বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের জ্যোতির্ময় স্বরূপ নৈসর্গিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই আমার ধারণা। আলোকের রহস্যময় স্বরূপ এবং তাহার অদ্ভুত কার্যকলাপের সহিত আরোগ্য ও ভৈষজ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিবিধ উপাদানের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসংগত নহে।'

দ্র A. A. Macdonell, *Vedic Mythology*, Strussburg, 1897 ; J. Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. V, London, 1873.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রী) ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে, বাটাজোড় গ্রামনিবাসী ব্রজমোহন দত্তের পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম হয়। সত্য ও নীতির প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বদেশপ্রেমের জন্য তিনি বরিশালবাসীর নিকট আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

পরীক্ষাদানের অনুমতি পাইবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাকালে তাঁহার অজ্ঞাতে বয়স দুই বৎসর বাড়াইয়া যোল করা হইয়াছিল। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বি. এ. পাঠকালে তিনি এক বৎসর কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থান হইতেই এম. এ. পাশ করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া অশ্বিনীকুমার প্রথমে কিছু-কাল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বরিশালে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায় তাঁহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধ হওয়ায় স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি উহা ত্যাগ করেন এবং বরিশালের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে (১৮৮৯ খ্রী) পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর উহাতে বিনা বেতনে কর্ম করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যেও তিনি 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠা এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (১৮৮৭ খ্রী) করেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা বিভাগের হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়া মহিলাদের জন্য 'ব্রজমোহন পুরস্কারে'রও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার বরিশালের সকল উন্নতিমূলক কর্ম ও সভা-সমিতির সহিত আজীবন যুক্ত ছিলেন। লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সভ্য, মাদক নিবারণী সভার সম্পাদক, পিপ্‌ল্‌স অ্যাসোসিয়েশন (পরে ভারত-সভার সহিত যুক্ত) -এর সভাপতি— ইত্যাদি নানাভাবে তিনি স্বদেশবাসীর সেবা করিয়াছিলেন। বরিশালে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে দুর্গতদের সাহায্যকার্যে তিনিই ছিলেন পুরোধা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতিও ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসবে প্রধান অধিবেশনের সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার প্রাদেশিক সম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আসামের চা-বাগানের কুলিদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বাংলা রেলপথে ও ষ্টীমার কোম্পানিতে যে ধর্মঘট হয়, অসুস্থ অবস্থাতেও অশ্বিনীকুমার উহার বরিশাল সমিতির সভাপতিরূপে কার্য করেন।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাতেও অশ্বিনীকুমারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এবং উহাতে তিনি নিজেও গান লিখিয়া দিতেন। তাঁহার রচনা প্রধানতঃ ধর্ম ও নীতিমূলক। তন্মধ্যে 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রেম' প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের যুবকদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তাঁহার 'ভক্তিযোগ' বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

২১ কার্তিক, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় অশ্বিনীকুমারের মৃত্যু হয়।

দ্র সুরেন্দ্রনাথ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ১৯৩১ খ্রী ; শরৎ-কুমার রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, কলিকাতা, ১৯৩৯ খ্রী।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অশ্মক, অস্মক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে দাক্ষিণাত্যের দেশ। কূর্মপুরাণে ইহাকে পাঞ্জাবের কোনও দেশ বলা হইয়াছে। বৃহৎসংহিতাতে ইহা উত্তর-পশ্চিমের দেশ বলিয়া কথিত। রিজ ডেভিড্‌স ইহাকে বৌদ্ধ যুগের অস্‌সক হইতে অভিন্ন মনে করেন এবং তাঁহার মতে ইহা অবন্তির উত্তর-পশ্চিমে

অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময়ে গোদাবরীতীরে অস্‌সকদেশীয় লোকের বসতি ছিল এবং পোতন তাহাদের প্রধান শহর ছিল। সুত্তনিপাত ও পারায়নবগ্‌গ অনুসারে অস্‌সক গোদাবরী ও নর্মদা -তীরস্থ মাহিষ্মতীর মধ্যবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহাকে অলকা বা মূলকাও বলা হইত এবং ইহার রাজধানী মহাভারতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধগণ ইহাকে পোতালি বা পোতন বলিতেন। অশোকের সময়ে ইহা মহারাষ্ট্রের অংশ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত দশকুমারচরিতে দণ্ডী ইহাকে বিদর্ভের আশ্রিত রাজ্য বলিয়াছেন। হর্ষচরিতেও ইহার উল্লেখ আছে। পুরাণে মূলককে অশ্মকের পুত্র বলা হইয়াছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামী ইহাকে মহারাষ্ট্র হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। মহাভারতে ইহা অশ্মক নামে অভিহিত।

অষ্টম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যে আইনটির দ্বারা জমিদার কর্তৃক বাকি খাজনার জন্য পত্তনি তালুক নিলামের নিয়মটিকে স্বীকার ও বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহা ছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নম্বর রেগুলেশন। আবার উক্ত রেগুলেশনের যে ধারাতে নিলামের অধিকার বর্ণিত এবং প্রণালী ব্যবস্থাপিত ছিল, তাহারও সংখ্যা ৮ অর্থাৎ অষ্টম ধারা। অষ্টম রেগুলেশনের অষ্টম ধারা অনুসারে পত্তনি নিলাম সংঘটিত হইত বলিয়া কথ্য ভাষায় নিলামটিকেই অষ্টম বলিতে আরম্ভ করা হয় এবং ক্রমাগত ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইবার ফলে শব্দটির ঐ অর্থই স্থায়ী হইয়া যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হইবার ফলে জমিদারগণকে কিস্তিমত রাজস্ব আদায় দিতে হইত। কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে স্বয়ং খাজনা আদায় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গভর্নমেন্টের নিকট রাজস্ব জমা দেওয়া জমিদারগণ কঠিন বোধ করিতেছিলেন। সেই কারণে নিজেদের অধীনে তালুক সৃষ্টি করিয়া তালুকদার মারফত খাজনা সংগ্রহ করিবার পন্থা তাঁহারা আবিষ্কার করেন এবং উক্ত ব্যবস্থার দ্বারা চাষী-প্রজাদের দেয় খাজনা যথাসময়ে আদায় করিবার দায়িত্ব তালুকদারদের উপর গিয়া পড়ে। জমিদারগণের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা যে সকল তালুক সৃষ্টি করেন, সেইগুলিতে তিনি এই মর্মে একটি বিশেষ শর্ত সংযুক্ত করিয়া দেন যে, নির্দিষ্ট দিনে খাজনা আদায় না দিলে মহারাজা বাকি খাজনার জন্য তালুক সরাসরি নিলামে উঠাইতে পারিবেন। ক্রমশঃ এই শর্তটি অন্যান্য জমিদারগণও প্রয়োগ করিতে থাকেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নম্বর রেগুলেশন এই শ্রেণীর তালুকগুলিকে পত্তনি আখ্যা দেয় এবং জমিদারদের প্রাপ্য বাকি খাজনার জন্য পত্তনি নিলাম করাইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া বৎসরে দুইবার— আশ্বিন পর্যন্ত বাকি খাজনার জন্য কার্তিক মাসে এবং সংবৎসরের বাকি খাজনার জন্য পরবর্তী বৎসরের বৈশাখ মাসে— নিলামের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দেয়। কার্তিকের নিলামের নাম ছিল 'ষাস্‌মাহি' এবং বৈশাখের নিলামটির নাম ছিল 'দয়াজদোমাহি'। চলতি কথায় উভয়ের সাধারণ নাম ছিল অষ্টম।

বাংলার তদানীন্তন সমাজজীবনে অষ্টম জারির আইনটির প্রভাব খুব বেশি ছিল। অষ্টম জারির ফলে অনেক ভদ্র নিম্নস্বত্বভোগী জমির মালিক সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, অত্যাচারী জমিদার এই আইনের সুযোগ লইয়া তাঁহার প্রজাদের অন্যায়ভাবে দমন করিয়াছেন, এইরূপ বহু ঘটনার কথা সেই সময়ে লোকমুখে শুনা যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত বাংলা উপন্যাসে ভূম্যধিকারী-সংসারের কাহিনী থাকিলেই অষ্টমের উল্লেখ আছে। অষ্টম ছিল পত্তনিদারের বিভীষিকা। ইহার সাহায্যে অসাধু কর্মচারী, অভিভাবক অথবা অংশীদারগণ খাজনা বাকি ফেলিয়া ও গোপনে সম্পত্তি নিলামে চড়াইয়া নিজেরাই সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিতেন। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে (১৯৫৫ খ্রী) হইতে জমিদারি প্রথা লোপ পাইবার ফলে অষ্টম জারির আইনটিও লোপ পাইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

অষ্টমাতৃকা মাতৃকা দ্র

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা দ্র

অষ্টাঙ্গিক মার্গ আট অঙ্গের সমন্বয়ে বুদ্ধপ্রদর্শিত দুঃখ-মুক্তির একমাত্র উপায়ই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহার অঙ্গসমূহ : ১. সম্যক্‌ দৃষ্টি। চার আর্যসত্য ও দ্বাদশ নিদানযুক্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। ২. সম্যক্‌ সংকল্প। কাম হিংসা ও প্রতিহিংসা -বিহীন নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সংকল্প। ৩. সম্যক্‌ বাক্য। মিথ্যা, পিশুন, কটু ও বৃথা বাক্য হইতে বিরত হইয়া সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য কথন। ৪. সম্যক্‌ কর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মাদক সেবনে বিরত হইয়া জীবে দয়া, বদান্যতা ও সচ্চরিত্র থাকার কর্ম। ৫. সম্যক্‌ জীবিকা। মিথ্যাজীবিকা পরিহার করিয়া সৎ জীবিকা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষয়-বাণিজ্য মিথ্যা জীবিকার অন্তর্গত। ৬. সম্যক্‌ উদ্যম। ইন্দ্রিয়সংযম, কু-চিন্তা ত্যাগ করিয়া সু-চিন্তার উৎপাদন, উৎপন্ন

সৎ চিন্তার স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা। ৭. সম্যক্ স্মৃতি। কায়, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ভাবসমূহের প্রকৃত স্মৃতি— উহাদের মালিন্য, ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতির প্রতি সর্বদা সতর্ক থাকা। ৮. সম্যক্ সমাধি। কাম ও অকুশল চিন্তা হইতে বিরত হইয়া চিত্তের একাগ্রতাসাধনকে সমাধি বলে। সম্যক্ সমাধি দ্বারা মনের বিক্ষেপ বিদূরিত হয়।

ধর্মাধার মহাস্থবির

অষ্টাবক্র অষ্টস্থানে বক্র দেহবিশিষ্ট বিখ্যাত মুনি। যোগগ্রন্থ 'অষ্টাবক্রসংহিতা' ইঁহার নামে প্রচলিত। পিতা কহোড়, মাতা সুজাতা। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই একদিন পিতার বেদপাঠের ত্রুটি ধরিয়া দিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অষ্ট স্থানে বক্র হইয়া জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন (মহাভারত, বনপর্ব, ১৩২)। পরে পিতার প্রসন্নতায় সমঙ্গা নদীতে স্নান করিয়া তাঁহার শরীরের বক্রতা দূর হয়।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান শাখা যোগাচার আচার্য অসঙ্গ ও তদীয় ভ্রাতা বসুবন্ধুর দ্বারা বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। আচার্য অসঙ্গ ছিলেন বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পুরুষপুরে (পেশোয়ার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন বিরিঞ্চিবৎস, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতির কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। আচার্য অসঙ্গ ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। অধিকতর খ্যাতিমান অনুজ আচার্য বসুবন্ধুকে ইনিই মহাযানী মতবাদের অনুরাগী করিয়াছিলেন। আচার্য অসঙ্গের পূর্বেই সম্ভবতঃ যোগাচার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে আমরা জানিতে পারি যে অসঙ্গ মৈত্রেয় কর্তৃক প্রবুদ্ধ হন। অনেকের মতে অসঙ্গকে অনুপ্রাণিত করেন অভি-সময়ালংকার প্রণেতা শাস্ত্রকার মৈত্রেয়নাথ।

আচার্য অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাধকের। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা শুধু দার্শনিক আলোচনা নহে, তাহা সাধনমার্গের কথা।

অসঙ্গের দুইটি রচনা হইল মহাযান সূত্রালংকার ও মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র। চীনা ও তিব্বতী ঐতিহাসিকগণ তাঁহার রচিত আর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র, ম হা যা না ভি ধ র্ম-সংগীতিশাস্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অসঙ্গকৃত বজ্রচ্ছেদিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার টীকার চৈনিক অনুবাদও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এইগুলির মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্‌মিয়াম একটি মৌলিক ধাতু। পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) ৭৬, পারমাণবিক ভার (atomic weight) ১৯০.২, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২২.৪৮, গলনাঙ্ক ২৭০০° সেন্টিগ্রেড, স্ফুটনাঙ্ক ৫৩০০° সেন্টিগ্রেড। অস্‌মিয়াম সর্বাপেক্ষা ভারি পদার্থ। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টেন্যান্ট ইরিডিয়াম ও অস্‌মিয়ামের মিশ্রণ হইতে ইহাকে পৃথক করেন। অস্‌মিয়াম বাষ্প অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহার প্রভাবে সাময়িকভাবে অন্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাকে প্ল্যাটিনামের সহিত মিশ্রিত অবস্থায়ও পাওয়া যায়। ইরিডিয়াম ও অস্‌মিয়ামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের মিশ্রণে যে সংকর ধাতু (alloy) তৈয়ারি হয়, তাহা গ্রামোফোনের পিন এবং ফাউন্টেন-পেনের নিব তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়।

অলক চক্রবর্তী

অসমীয়া জাতি অতি প্রাচীন কালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে আসামে প্রবেশ করিয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও প্রামাণিক তথ্যের অভাবে কাহারা ঠিক কোন্ সময়ে, কিভাবে আ সি য়া ছি ল, শারীরিক গঠনবৈশিষ্ট্যে কতটুকু তাহাদের দান এবং অসমীয়া সংস্কৃতির গোড়াপত্তনে তাহারা কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে বলা শক্ত। তথাপি এইটুকু বলা যায় যে ইহারা সকলে আসামে পরস্পর মিলিত হইয়া এবং প্রত্যেকেই কিছু কিছু অবদানের দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিল এক সম্মিলিত অসমীয়া জাতি ও সংস্কৃতি।

আসাম অনেক জাতি (caste) ও উপজাতির (tribe) বাসভূমি। বাসস্থান অনুযায়ী উপজাতিগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় – পাহাড়ীয়া উপজাতি এবং সমভূমি অঞ্চলের উপজাতি। গারো পাহাড়ে বাস করে মাতৃ-প্রধান উপজাতি গারো; খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ে মাতৃ-প্রধান খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া; মিকির পাহাড়ে মিকির; মিজো পাহাড়ে মিজো এবং নাগা পাহাড়ে নাগারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলেও অনেক উপজাতির বাস। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে দেখা যায় বড়ো গোষ্ঠীর কাছাড়ী, রাভা, লালুং ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আছে দেউরী, চুটীয়া, মরান, মিরি, ফাকিয়াল, আইটন, তুরুং, আহোম ইত্যাদি নানা উপজাতির লোক।

অসমীয়া জাতি

পৃথিবীর প্রধান মানবগোষ্ঠী বা race তিনটি— ককেশীয়, মঙ্গোলীয় এবং নিগ্রো। ইহার মধ্যে ককেশীয় এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক আসামে দেখা যায়। আসামের উপজাতিরা প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব ভারত সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা হয় যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলতঃ প্রাক্-দ্রাবিড় অথবা 'ভেদ্দীদ্', 'অষ্ট্রেলীয়', 'প্রাক্-অষ্ট্রেলীয়' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভাষা বিশ্লেষণেও মনে হয় যে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোকই সর্বপ্রথম আসামে প্রবেশ করে। অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোক এখনও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে দেখা যায়। আসামের খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া উপজাতির ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আসামের কতকগুলি উপজাতির মধ্যে ভেদ্দীদ্দের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা নৃতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মনে করেন খাসিয়া, কুকী, মিকির এবং কাছাড়ীর মধ্যে ভেদ্দীদ্ (প্রাক্-দ্রাবিড়) লক্ষণ দেখা যায়। নাগা পাহাড়ে আবিষ্কৃত দুইটি মাথার খুলির মধ্যে একটি ভেদ্দীদ্ গোষ্ঠীর। বড়ো গোষ্ঠীর কাছাড়ী, রাভা, গারো ইত্যাদি উপজাতির মধ্যে আধুনিক গবেষণা হইতে জানা গিয়াছে যে, শারীরিক বৈশিষ্ট্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা ভেদ্দীদ্ গোষ্ঠীর দান বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করিলে হয়ত অন্যান্য অসমীয়া জাতির মধ্যেও এই গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয়।

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকও অতি প্রাচীন কালে আসামে প্রবেশ করিয়াছিল এবং পরে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ হয়। এখনও বনিয়া, কৈবর্ত্য ইত্যাদি জাতির শারীরিক গঠনবৈশিষ্ট্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন সময়ে মঙ্গোলীয় জাতির বিভিন্ন শাখা আসামে আসিয়াছিল। গারোদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যান অনুসারে উহাদের পূর্বপুরুষ তিব্বত হইতে আসিয়া উত্তর-পশ্চিম পথে আসামে প্রবেশ করিয়া পরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। হোয়াংহো নদীর দক্ষিণ উপত্যকা হইতে একটি মঙ্গোলীয় দল দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে আসিয়া দুইটি দলে বিভক্ত হয়। ইহাদের একটি দক্ষিণে চলিয়া যায় এবং অপরটি আসামের পূর্ব সীমারেখা ধরিয়া আসামে প্রবেশ করে। ইহারা ভোটবর্মী। সম্ভবতঃ ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল প্যারিওইয়ন জাতির: আসামে প্যারিওইয়ন গোষ্ঠীর অস্তিত্বেরও প্রমাণ আছে। ইহারা মঙ্গোলীয়। দক্ষিণ অঞ্চলে আসিয়া ইহারা বিভিন্ন জায়গায় অ-মঙ্গোলীয় লোকের সহিত সংমিশ্রিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব পথে আসামে প্রবেশ করে আহোমরা। প্রথমে ইহারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে ব্রহ্মদেশ কর্তৃক আসাম আক্রমণের সময় পর্যন্ত ইহারা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। আহোম রাজত্বকালে বিভিন্ন উপজাতি পরস্পর সম্মিলিত হইবার সুযোগ পায়। ইহাদের অনেক পরে আসে টাই ভাষাভাষী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খাময়াং, আইটন, ফাকিয়াল, তুরুং প্রভৃতি। ইহারা সকলেই মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত।

আসামের উপত্যকা অঞ্চলের অসমীয়ারা ককেশীয় জাতির অন্তর্গত। নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ইহাদের সম্যক্ বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই। তবে ককেশীয় উপগোষ্ঠীর কোন্ কোন্ উপাদান ইহাদের মধ্যে আছে— সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়। ইহারা পশ্চিম ভারত হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়া আসামে প্রবেশ করে। উত্তর ভারতের অন্যান্য ইন্দো-আর্যদের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ, কলিতা, কায়স্থ ইত্যাদি নানান বর্ণের লোক এই শাখার অন্তর্গত।

মঙ্গোলীয় জাতির লোক আসিয়া ইহাদের পূর্বেই আগত অষ্ট্রিক জাতিগুলিকে নিজেদের মধ্যে প্রায় আত্মসাৎ করিয়াছিল। ইন্দো-আর্যরা আসিয়া সেই শাখার সহিত বিশেষভাবে সংমিশ্রিত হইবার তেমন সুযোগ পায় নাই। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে উহারা মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সংমিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরিয়া যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায় ততই বেশি করিয়া মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আসামের উপজাতীয়দের শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় উপাদানে গঠিত। কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে ভেদ্দীদ্ উপাদানের আভাস পাওয়া যায়। পরে ককেশীয় প্রভাবও দেখা যায়। অসমীয়া জাতির লোক প্রধানতঃ ককেশীয় (ইন্দো-আর্য) জাতির অন্তর্গত। সংমিশ্রণের ফলে, সামান্যভাবে হইলেও, ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে মঙ্গোলীয় লক্ষণ দেখা যায়। দ্রাবিড়ীয় উপাদান কতকগুলি অনুচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভুবনমোহন দাস

অসমীয়া ভাষা বাংলা ও ওড়িয়ার ঘনিষ্ঠতম ভাষা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার সহিত অসমীয়ার পার্থক্য স্পষ্ট ছিল না। মূলতঃ বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপভাষা আর অসমীয়া একই বাগ্‌ব্যবহারের দুইটি ছাঁদ -বিশেষ। আসাম রাজ্যে যেমন ভাষাবৈচিত্র্য আছে ভারত-রাষ্ট্রের আর কোনও রাজ্যে এমন নাই। ভারতীয় আর্য, অষ্ট্রিক, তিব্বতচীনীয় গোষ্ঠীর বিচিত্র ভাষা আসামে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিছু পরিমাণে অষ্ট্রিক এবং প্রচুর পরিমাণে তিব্বতচীনীয় (বিশেষ করিয়া বড়ো) ভাষার প্রভাব অসমীয়া ভাষার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বাংলা হইতে পৃথক ভাষারূপে অসমীয়া সাহিত্যের আরম্ভ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে।

বাংলার তুলনায় অসমীয়া ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এইগুলি : ত বর্গ স্থানে ট বর্গ, ট বর্গের স্থানে ত বর্গ ; 'স'-কার স্থানে প্রায় 'হ'-কার ; 'চ'-কারের উচ্চারণ 'স'-এর মত ; সপ্তমীর একবচনে 'ৎ' বিভক্তি ; নাম শব্দের বহুবচনে কয়েকটি বিশেষ বিভক্তি ইত্যাদি। অসমীয়ার বাক্য-বিন্যাসরীতি অনেকটা মধ্য বাংলার অনুযায়ী। শব্দ-ভাণ্ডারে বহু অনার্য শব্দের সমাবেশ।

সুকুমার সেন

অসমীয়া লোকনৃত্য পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদের মাতৃভূমি আসাম— ইহার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া জনজীবনের সামগ্রিক রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পকলার ক্ল্যাসিক্যাল রূপ-রীতির মূলে রহিয়াছে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। তবে তাহার দ্বারা লোকশিল্পের ধারা ব্যাহত হয় নাই।

অসমীয়া বৈষ্ণবদের ক্ল্যাসিক্যাল রূপ-রীতির আত্মস্থী-করণের ফলে 'ওজা-পালি' নামক নৃত্যসহযোগে কাহিনী-কথনের উদ্ভব হয়। এই নৃত্য যৌথভাবে দেবায়তনে অনুষ্ঠিত হইত এবং এই সব বিবিধ নাট্যানুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্যের মাঝখানে কিছু কিছু সংলাপও থাকিত। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু নৃত্যপরিকল্পনায় বিশেষভাবে পরবর্তী বৈষ্ণব যুগের অভিনেয় নাটকসমূহে (যেগুলি ভাওনা নামে পরিচিত) ক্ল্যাসিক্যাল প্রভাব অনেক শিথিল। বরং এই সব নৃত্যের মধ্যে দেহের প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের নিখাদ আনন্দই বেশি লক্ষ্য করা যায়, যাহাদের বর্ণনীয় বিষয় সাধারণতঃ যুদ্ধ, পদ অথবা রথযাত্রা, অশ্বপৃষ্ঠে বা পুষ্পরথে যাত্রা। বীর যোদ্ধবৃন্দের ইতস্ততঃ সঞ্চারণ, শরক্ষেপের তালে তালে যে রকম সুমিত এবং নির্দিষ্ট পদপাতের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহা সত্যই উদ্দীপক। ভ্রমন্ত অভিনেতৃদের তালে তালে খোল এবং মৃদঙ্গ বাজানো হয়। বিদূষক (যাহাদের বহুয়া বলা হয়) নৃত্যের বেলায় সাধারণ ঢোল ব্যবহার করাই রীতি। সূত্রধার, কৃষ্ণ অথবা গোপিনীদের বিভিন্ন রসপর্যায়ে, যেমন রাস এবং কালিয়দমনে উন্নততর ক্ল্যাসিক্যাল রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। কোনও কোনও নৃত্যে জীবজন্তুর চরিত্রচিত্রণের জন্য মুখোশ (অসমীয়াতে বলে মুখা) এবং পূর্ণ দেহাচ্ছাদন (অসমীয়া ভাষায় চোঁ নামে পরিচিত) ব্যবহৃত হয়।

এই প্রদেশের সর্বাধিক প্রচলিত লোকনৃত্য হইল বিহু নৃত্য। আসামের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে অর্থাৎ লখীমপুর, শিবসাগর, নগাঁও (নওগাঁ), দরং জেলার তেজপুর মহকুমার অসমীয়াভাষী জনসাধারণ এখনও এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই বিহু নৃত্যের প্রভাব মিরি বা মিশ্‌িং নামক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সম্প্রদায় সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্র নদী এবং তাহার অন্যতম শাখা সুবনশিরি (লখীমপুর জেলায় প্রবাহিত) উপত্যকায় এবং নেফা বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের সুবনশিরি বিভাগে বাস করে। বড়ো-কাছাড়ী এবং মিকির সম্প্রদায়েরও নিজস্ব বিহু নৃত্য রহিয়াছে। নেফা অঞ্চলের উপজাতিসমূহের কিছু কিছু নৃত্যের মধ্যেও ইহার অল্প-বিস্তর লক্ষণ দেখা যায়। আর জয়পুরের নাগাদের মধ্যে ইহার পূর্ণ রূপটিই বজায় রহিয়াছে। ইহার প্রভাব উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে অনুভূত হয়। তাহার উপর তিনটি বিহু উৎসবের মধ্যে একটি (বিহু নৃত্যগুলি এই সব উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত) অসমীয়া নববর্ষ বা ব'হাগ (< বৈশাখ) মাসে শুরু। মোটের উপর নৃত্যগুলি খুব পরিণতরূপ লাভ না করিলেও এই অনুষ্ঠানটি প্রায় জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পাইয়াছে। পার্বণটি শুরু হয় ধান কাটার পর, যখন চাষীদের অখণ্ড অবসর। এই সময়ে তাহাদের খেত-খামারে ব্যস্ত থাকিতে হয় না, তাহার পরিবর্তে সময়টা তাহারা ব্যয় করে বনগীত বা বন্যপ্রেমের গানে (এইগুলি প্রায়ই দ্বিপদীতে রচিত)। বনগীতগুলি অসমীয়া এবং বড়ো, মিরি প্রভৃতি উপভাষায় রচিত হয়। বৎসরের শেষ দিন অর্থাৎ পুরাতন পঞ্জিকার ৩১ চৈত্র বিষুব-সংক্রান্তির দিন হইতে বিহু উৎসব আরম্ভ হইয়া কয়েক দিন ধরিয়া চলে। প্রাচীন সুখ-সমৃদ্ধির কালে প্রায় একমাস ধরিয়া চলিত। অবশ্য পার্বণ শুরু হইবার পূর্বেই নদীর দুই ধার বা নিকটবর্তী ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করা উপলক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকারা গীতিমুখর হইয়া উঠে এবং বিহু ঢোলের সহযোগিতায় গ্রামগুলি নৃত্যে মাতিয়া উঠে।

বিহু নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— হুচরি আর বিহু। শেষেরটিই হইল খাঁটি বিহু— ইহা বৃক্ষতলে মুক্ত অঙ্গনে অথবা আরণ্যক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এক বা একাধিক গ্রামের তরুণ-তরুণীরা স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমবেতভাবে উন্মুক্ত আকাশের নীচে হৈ-হুল্লোড় করে। আগে রাত্রিকালে পর্যন্ত এই নাচের উৎসব চলিত, কিন্তু এখন দিনের বেলাতেও এই নৃত্যমুখর উৎসব বিরল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয় পুরুষ, না হয় রমণী নৃত্যে অংশগ্রহণ করে, অন্য সম্প্রদায় শুধু দর্শক হিসাবে থাকে। বাদ্যযন্ত্রগুলিও খুব সাধারণ— বিহু ঢোল তো আছেই, তাহা ছাড়া একজাতীয় ছোট মন্দিরা, যাহাকে পাতিতাল বলে, স্বরকম্পনের জন্য বিবিধ রীড-সংবলিত গগনা নামক একজাতীয় বাঁশি, শিঙা ইত্যাদি। এই সব বাদ্য পুরুষেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্য দিকে টকা নামে আড় বাঁশের তৈয়ারি তাল দিবার এক প্রকার যন্ত্র স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। উক্ত বাদ্যযন্ত্রসমূহের সহযোগিতায় গীত গানগুলি খুব সহজ এবং ইহাদেরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে এক ধরনের গান হইতেছে দ্বিপদী শ্রেণীর ছোট ছোট প্রেমসংগীত যাহার তাল দ্রুত এবং একঘেয়ে। সুতরাং প্রত্যেকটি নৃত্যকালের সময় এক মিনিটেরও কম, যদি না কোনও প্রক্ষিপ্ত অংশের দ্বারা তালকে প্রলম্বিত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের ছোট ছোট গানের সহযোগিতায় নৃত্যের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় প্রকার নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের রেশ বিলম্বিত এবং পেঁপা নামক একজাতীয় শিঙার দ্বারা তিন অথবা চার প্রকার ক্বণন শুরু হয়। ইহার ফলে নর্তকের নৈপুণ্যপ্রদর্শনের কিছুটা সুযোগ থাকে। কিন্তু আসলে তারুণ্যের সৌন্দর্যই এই নৃত্যের প্রাণ। মিরি তরুণীদের সৌন্দর্য এই অপরিণত নৃত্যপদ্ধতিকে অপরূপ সুষমা ও লালিত্য দান করে। সংগীত ব্যতিরেকে কেবল নৃত্যের সাহায্যে বিষয়বর্ণনের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ আট জন মিলিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অথবা আগু-পিছু হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। হস্তের বিচিত্র মুদ্রা এবং ভঙ্গীতে বসন্ত-বাতাসে কম্পমান তরুপল্লবের সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়।

হুচরি কোনও গ্রাম বা শহরের বিভিন্ন গৃহের সম্মুখবর্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই কলরবমুখর তরুণ-তরুণীদের উৎসবের আর একটি তাৎপর্যও রহিয়াছে— উক্ত উৎসব উপলক্ষে নববর্ষের আবাহন এবং গৃহস্থের কল্যাণ-কামনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনাসমূহ গীত হয়।

এই পার্বণের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যভঙ্গীসহ ধর্মসংগীত দ্বারা। এই জাতীয় গানকে হুচরি কীর্তন বলে। একজন মূল গায়েন ধুয়া ধরে এবং অন্যান্য গায়কগণ অন্তর্বর্তী সময়ে ঐ পদেরই পুনরাবৃত্তি করে। মূল গায়েনের সহযোগে অন্য সব গায়ক বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে এবং সংগীতের লয়ের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতিবেগও মৃদু অথবা তীব্র হইতে থাকে। গানের সঙ্গে ঢোল, তাল এবং টকায় সংগত করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু বিহুগীত দ্বারা— এই পার্বণ উপলক্ষেই দ্বিপদীগুলি রচিত হয়। বনগীতের কথাও পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই জাতীয় গানের সহযোগে যে সব নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রূপবৈচিত্র্যে গ্রামীণ পরিবেশে যেইরূপ দেখা যায় সেই রকমই। সাধারণতঃ ইহার লয় অতি দ্রুত, মাঝে মাঝে বিলম্বিত।

ঢুলীয়াদের নৃত্য খুব উদ্দাম এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে প্রায় দড়াবাজি বলিয়া মনে হয়, যদিও আসলে তাহা নহে। সুবৃহৎ ঢাক বা ঢাকঢোল, জয়ঢোল, বরঢোল এবং মন্দিরার সমবেত ধ্বনিতে রণগীতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, শুধু বাঁশির ধ্বনি মাঝে মাঝে মৃদু কোমল রেশ বহিয়া আনে। গায়ক ও বাজনদারেরা বিচিত্র রঙের পোশাক পরিয়া গানসহযোগে উৎসব আরম্ভ করে। তাহার পর শুরু হয় ঢুলীদের দড়াবাজি— 'লাফানো-ঝাঁপানো-দৌড়ানো; কাঠির উপরে থালা ঘুরানো, রনপায়ে চড়া, তলোয়ার ছোঁড়া, দড়ির উপর নাচ, মল্লক্রীড়া ইত্যাদি।' সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় মুখোশনৃত্যও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সব পার্বণে স্থূল (এমন কি অশ্লীল) পরিহাসের সামাজিক অধিকার স্বীকৃত। ঢুলীয়ারা বিবাহ বা অন্যান্য উৎসবের শোভাযাত্রায় বাজনদাররূপে গমন করে।

রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে আর এক জাতীয় ঢুলীয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে বিহু ঢোল বাজানো হয় এবং পাতিতালে সংগত করা হয়— তাহার সঙ্গে গীত কাব্যকাহিনীর বিষয় ঢোল এবং মন্দিরার ঐশ্বরিক আবির্ভাব।

পশ্চিম আসামের ভাওরীয়া বা ভাউরা এবং বহুয়া বিবিধ হাসি-ঠাট্টার জন্য জনপ্রিয়। যে কোনও উপলক্ষে গান বাঁধিবার কুশলতাও সবিশেষ লক্ষণীয়। হাস্য-পরিহাসের জন্যই এইগুলি সর্বাধিক বিখ্যাত এবং এই জাতীয় রঙ্গরস অনেক সময়ই ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করিয়া। কথা-গান এবং বেশ কিছুটা অশালীন নৃত্যভঙ্গীর মধ্য দিয়া তাহারা প্রভূত হাস্যের উদ্রেক করিয়া থাকে।

ভাওনা নামক মার্জিত নাট্য-অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় এই স্থুল বহুয়া সংযোজিত হয় ক্ষণিক বিনোদনের জন্য। অতীতে এই জাতীয় একপ্রকার বহুয়ার নাম ছিল ভুমুক— আজ তাহা শুধু ইতিহাস।

সর্পদেবী মনসার পূজা উপলক্ষে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানে 'দেবনারী' বা দেওধনির অংশগ্রহণকারিণীর উপর কখনও কখনও ভর হয় এবং তাহার মাধ্যমে অনেক সময় দৈববাণী হইয়া থাকে। সারা জীবন তাহাকে কৌমার্য রক্ষা করিতে হয়। স্বহস্তে নিহত একটি গৃহপালিত কপোতের উষ্ণ শোণিত পান করিয়া সাধারণতঃ তাহার নৃত্য শুরু হয়। আলুলায়িত কেশে আট জনকে লইয়া বৃত্তাকারে ধীর পদক্ষেপে নাচের আরম্ভ— ঢাক এবং মন্দিরার সংগত দ্রুততর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ে বাত্যাতাড়িত পত্রের ন্যায় দেওধনির পদসঞ্চালন তীব্র হয়, মাথাও সেই অনুপাতে ভীষণ বেগে নড়িতে থাকে। এইভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া সে পড়িয়া যায় এবং এই অবস্থায় সময় সময় ভর হয়। ইহাকে ভর নৃত্য বলে।

গ্রামাঞ্চলে পুতলা নাচ বা পুতুল নাচ প্রচলিত আছে। ইদানীং এই সব অনুষ্ঠান বিরল হইয়া আসিয়াছে। সংগীত এবং সংলাপের সাহায্যে সাধারণতঃ রামায়ণের কাহিনী ও কদাচিৎ মহাভারতের গল্প বর্ণিত হইয়া থাকে। সূত্রধার খোল এবং মন্দিরার তালে তালে সুতার সাহায্যে পুতুলগুলি নাচায়।

আসামের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে গোয়ালপাড়া জেলার এক নিজস্ব নৃত্যরীতি রহিয়াছে। গৌরীপুরের জমিদার বাড়িতে পূজা উপলক্ষে এক প্রকার নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। আট-নয়জন তরুণী মিলিয়া অনেকটা ভাটিয়ালি বা ঝুমুরের ঢঙে বৃত্তাকারে নৃত্য করে।

কার্তিক পূজা উপলক্ষে একটি মেয়ে ধনুক হস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে। ভাওনা নাচের মত সময় সময় সে তাহার দ্বারা তীরক্ষেপণের শব্দ করে। গৌরীপুরে আর এক প্রকার নাচ দেখা যায়, যেখানে আট জন বালিকা সমবেতভাবে আগু-পিছু হইয়া নৃত্য করে এবং ইহার সঙ্গে মধ্য ভারতের আদিবাসীদের নাচের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আর এক প্রকার নৃত্যানুষ্ঠানে পাঁচ জন বালিকা ঢাকের তালে তালে বিবাহসংগীত গাহিতে গাহিতে কুলা হাতে বৃত্তাকারে নাচে। এই ভঙ্গীতে কুলাতে ধান ঝাড়াইয়ের রূপক স্পষ্ট। ইহা হইতে অনুমান করা যায় এই নৃত্য নবান্ন উৎসবের সহিত জড়িত।

আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বাংলাভাষী অঞ্চলে আর একজাতীয় নৃত্যপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বলে বউ-নাচ— নবপরিণীতার নৃত্য। গৃহপ্রাঙ্গণে তিনটি ভাগে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ভাগে আট-দশজন গ্রামের মেয়ে ঢোলক, কাঁসি এবং সানাইয়ের সঙ্গে ধামাইল গীতসহযোগে নাচিতে থাকে। ধামাইল গীতের বিষয় হইল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। মধ্যভাগে থাকে নববধূ— পরিধানে রেশমী শাড়ি, সর্বাঙ্গ অলংকারে ভূষিত— সিঁথিতে মোর, কানে কানবালা, নাকে নথ, হাতে রুপার মণিবন্ধ ও পায়ে মল। বিনম্র বিনতিভরা ভঙ্গীতে সে. জ্যেষ্ঠাদের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। উক্তবিষয়ক আর একটি সংগীত শুরু হইলে নববধূ অতি ধীর পদক্ষেপে ঘুরিতে থাকে এবং ব্রীড়াবনতা হইয়া বাজনার তালে তালে হস্ত সঞ্চালন করে। এই নৃত্য অতি মৃদু এবং ধীর, নচেৎ তাহা পরিবারে নবাগতার শালীনতাবিরোধী হইবে।

গত শতকে দক্ষিণ আসামে কাছাড়ীদের এক নিজস্ব রাস নৃত্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জনৈক রাজা গোবিন্দচন্দ্র ধ্বজনারায়ণ বাঙালী বৈষ্ণবদের পদাবলী-সংগ্রহের মত 'শ্রীমহারাসোৎসব গীতমালা' নামে একটি গীতিসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে বলা হয় 'বর্মন রাস'। গ্রামের নাট্যমণ্ডপের কৃত্রিম নিকুঞ্জবনে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব ভাবের সঙ্গে উপ-জাতীয় বড়ো শিল্পপদ্ধতির সংশ্লেষণের ইহা একটি দৃষ্টান্ত।

ইহা ছাড়া আরও বহু লোকনৃত্য রহিয়াছে। আসামের মুসলমানগণের মধ্যে ওজা-পালিরা কারবালার বিষয় অবলম্বনে রচিত জারি গান সমবেতকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে বুক চাপড়াইয়া থাকে।

জিকির গানে কিছু কিছু মুসলমান করতালিসহযোগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে। ইহার সহিত শাহ্ মিলন বা আজান ফকিরের (১৭শ শতাব্দী) নাম জড়িত।

কামরূপ জেলায় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বালকেরা গৃহবাসীর দ্বারে দ্বারে মহ-হৌ গাহিয়া বেড়ায়। ইহার ফলে নাকি মশা দূর হয়। তাহাদের হাতে থাকে বাঁশের লাঠি এবং ইহার দ্বারা মাটিতে আঘাত করিতে করিতে লম্ফঝম্প করে।

অসমীয়াদের মধ্যে একটি প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত— বিবাহের পূর্বরাত্রে অভুক্তা কন্যার সম্মুখে চপল নৃত্য। একটি বালক অথবা বালিকা কুলা পিঠে কুঁজা হইয়া একবার সামনে যায়, আবার পিছনে আসে। যে নাচে, তাহাকে বলে কুলা-বুঢ়ী।

গ্রামের কোনও বিপর্যয়ের সময় স্বর্গের অপ্সরাদের উদ্দেশে প্রার্থনার জন্য 'অপেসরা-সবাহ' নামক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। কয়েক জন মহিলা আলুলায়িত কেশে

অপ্সরাদের উদ্দেশে স্তবগান করিতে করিতে বৃত্তাকারে নাচিতে থাকে।

•বড়ো কাছাড়ীদের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ঋতু পার্বণ উপলক্ষে নানাপ্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে। প্রতিটি নৃত্যানুষ্ঠানে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয়। ইহাদের অনেকগুলিই তাহাদের প্রধান পার্বণ খেরাইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই উৎসব সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহারা ফণীমনসার গাছকে শিবরূপে পূজা করে। এখানে শিব বহু নামে পরিচিত— বুঢ়া (বৃদ্ধ দেবতা), বাথো বা বাথৌ, বাথৌ-ব্রই, বাথৌ-শিব্রাই। তাঁহার স্ত্রী দেবী মথু-রও অনেক নাম— যেমন, বুঢ়ী (বৃদ্ধা দেবী), ভল্লী (অর্থাৎ ভরলী, এখানে কামাখ্যা দেবীর কথা বলা হইয়াছে ; গৌহাটির ভরলী নদীর তীরে নীলাচল পাহাড়ে তাঁহার অধিষ্ঠান) এবং ভল্লী-বুধি। দক্ষিণ কাছাড়ীদের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ হেড়ম্বিয়াল নামে পরিচিত, তাহাদের কিছু কিছু গানে নীলাচলকে তাহাদের পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আসামের পশ্চিমাঞ্চলের বড়োদের মধ্যে সর্পদেবী মনসার পূজা উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন প্রকার সংগীত এবং নৃত্যের প্রচলন আছে।

সোনবাল এবং ঠেঙাল কাছাড়ীদের মধ্যে হাইদাং গীত নামে দীর্ঘ গাথা নৃত্যসহযোগে গীত হয়। উপলক্ষ: বাথৌসাল বা বাথৌর মন্দিরে বৃদ্ধ দেবতার স্তবগান। বৈশাখের শুষ্ক আকাশ হইতে বারিধারা আবাহনের জন্য হোজাই রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী নভঙা মৌজার প্রৌঢ়াগণ একপ্রকার জাদুনৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে নাচিয়া চলে যতক্ষণ না তাহাদের প্রত্যাশানুযায়ী ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়।

কোক্রাঝাড়ের (গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) কাছাড়ীদের মধ্যে নিম্নলিখিত নৃত্যগুলি প্রচলিত। এই তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, এই সরল বড়োগণ জীবনকে কিভাবে পার্বণমুখর করিয়া তুলিয়াছে :

গরাই-দবনাই-নাই— অশ্বোপরি রণনৃত্য। গান-দৌলা-বন-নাই— পতঙ্গ ধরিবার নৃত্য। নেউলাই-গেলে-নাই— নকুল নৃত্য, এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ এবং দ্রুত পদক্ষেপ। সান-গলাও-বনাই— এই নৃত্যের বিষয় সীমানা লইয়া দুই দলের দাঙ্গা। সাথরাও-লি— তরবারি নৃত্য। এখানে কয়েক জন তরুণী প্রত্যেকে দুইটি করিয়া তলোয়ার লইয়া প্রথমে সারিবদ্ধভাবে, পরে বৃত্তাকারে নৃত্য করে। থাইজামা-ফনাই— পুরুষেরা বৃত্তাকারে নাচে। প্রত্যেকে এক হাতে তলোয়ার, অন্য হাতে বস্ত্র লইয়া কোনও বৃক্ষ বা গুল্মকে প্রদক্ষিণ করে। নৃত্যের বর্ণনীয় বিষয় হইল বৃক্ষের ছেদন অথবা বৃক্ষ হইতে লাল পিপীলিকার উচ্ছেদ। ফাইরগোত-সিরগোত-মসা নাই— একপ্রকার ছন্দ-প্রধান নৃত্য যাহাতে শরীরের সমস্ত প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন প্রয়োজন।

বড়োদের অন্যান্য নাচের মধ্যে বাগরুম্বা এবং মাই-গাইনাই নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো তরুণীগণ সারাদিনের শ্রমের অবসানে নক্ষত্রখচিত প্রশান্ত রাত্রির নির্জনতায় বাগরুম্বা নৃত্যের অনুষ্ঠান করে। তাহারা তাহাদের ভগিনীদের আহ্বান করে, 'প্রাণ খুলে কর্ গান, নাচ সবে মিলে ঘিরি,' কেননা রাত্রি ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্রই নিশাবসানে আর এক কর্মব্যস্ত দিবসের সূচনা হইবে। এই নৃত্য যেমনই প্রাণোচ্ছল, তেমনই মনোরম। মাই-গাইনাই-এর সঙ্গে রহিয়াছে ফসল কাটার আনন্দের অনুষঙ্গ। এই উৎসবে পুরুষেরা কাস্তে হাতে এবং মেয়েরা কলস লইয়া নৃত্য করে। উক্ত নৃত্যের বিষয়বস্তু হইল ধান্যরোপণ, যাহাতে রমণীগণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হইতে নিম্নলিখিত নৃত্যসমূহের উদ্ভাবন হইয়াছে :

খাফ্রি-সিপ-নাই— দৌদিমি বা দেওধনি এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে বস্ত্রখণ্ড লইয়া নাচে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একদল মহিলা (ইহাদের সংখ্যা সাধারণতঃ আট) এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে বেতের তৈয়ারি ডিম্বাকৃতি থালা লইয়া বৃত্তাকারে নৃত্য করে (আক্ষরিক-ভাবে পূর্বোক্ত শিরোনামার অর্থ ছাতা ঘুরানো)।

দাও-থাই-লঙ-নাই— একদল বালিকার নৃত্য, প্রথমে সারিবদ্ধভাবে (সাধারণতঃ এগার জন তিনটি সারিতে যথাক্রমে চার, তিন ও চার এই পর্যায়ে বিভক্ত), পরে বৃত্তাকারে আলুলায়িত কেশে তাহারা নাচে। হাতে থাকে ভাণ্ড— এই ভাণ্ড হইতে দেবী যেন কুক্কুটের রক্ত পান করিবেন।

বরাই-মসা-নাই— তরবারি হস্তে আর এক জাতীয় সমবেত নৃত্য।

খেরাই সারারাত্রি ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয় ; উপরি উক্ত নৃত্যগুলি ছাড়াও এই রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে আরও অনেক নৃত্যের প্রচলন আছে। পূজা সমাপনান্তে পুরোহিত আসন্ন ফসল বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করেন এবং দৌদিমির মাধ্যমে দৈবাদেশ হয়। তাহার পর সকলে মিলিয়া নৃত্য-গীতমুখর শোভাযাত্রাসহকারে ধান্যক্ষেত্রের রক্ষক মাইনাও-কে গৃহে লইয়া যায়।

এই সব সংগীতে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখ্য খাম (ঢোল), বের্জা (সারঙ্গী), বিঙ্গি (বীণা), করতাল, চিফুং (বংশী) এবং গঙিনা (অসমীয়া ভাষায় বলে গগনা)। মেয়েদের পরিচ্ছদে থাকে নানা বৈচিত্র্য তাঁতে বোনা লাল-কালো-সবুজ-হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের পরিচ্ছদে— যেমন রিগু (ঘাগরা), রেজাঙফাই (বহির্বাস) ও রিখাওচা (ঘোমটা দিবার ওড়না)— গাছ, মানুষ, হাতি, বিড়াল এবং কুমিরের ছবি আঁকা। তাহাদের অলংকারগুলিরও (রাঙবাঙ্ছ বা কণ্ঠহার, খামাওঠাই বা কর্ণাভরণ) নিজস্ব সৌন্দর্য রহিয়াছে।

বড়োদের বিবাহ উপলক্ষে শোভাযাত্রায় সংগীত-সহযোগে লঘু নৃত্যের প্রথা আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মিকু বা মিকির নামক সমতল-ভূমির একশ্রেণীর উপজাতির (যাহাদের বাস প্রধানতঃ শিবসাগর, নগাঁও এবং কামরূপ জেলায়) নিজস্ব বিহু নৃত্য রহিয়াছে। তাহাদের একপ্রকার নৃত্যের নাম চোমাঙকান— মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পুরুষ-নারী কোমর ধরাধরি করিয়া নাচে।

মিরিগণের গীত বিহুগান ও বনগীত এবং তাহাদের বিহু নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। সমতল-ভূমির হিন্দুভাবাপন্ন মিরিগণের উৎসব-অনুষ্ঠান প্রায় আসামবাসীদের মত। তাহাদের লোকসংগীতগুলি নিজস্ব উপভাষায় রচিত। কখনও কখনও আবার অসমীয়া ভাষায় এবং কোনও কোনও সময়ে উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত হয়। খ, ঘ, ধ, ফ ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ অল্পপ্রাণ হইয়া যাইবার দরুন তাহাদের গান আরও মধুর শোনায়। পূর্বে বিহু পার্বণে অনেক মিরি বিহু গায়ক আশেপাশের শহরে আসিত। কিন্তু তাহাদের নিজস্ব একটি উৎসব রহিয়াছে, তাহার নাম নবছিগা বিহু। এই উপলক্ষে প্রচুর পানাহার ও নৃত্য-গীত হয় এবং কারসিং কটং, মুগলিং, মিরেমা প্রমুখ উপজাতীয় দেব-দেবীর উপাসনা হয়। নৃত্যে কেবল তরুণ-তরুণীগণই অংশগ্রহণ করে।

ভুটান পার্বত্য অঞ্চল ও তাহার উপত্যকার ভুটিয়াগণ ঢাক এবং মন্দিরায় (যাহাকে ভোট-তাল বলে, অসমীয়া ধর্মসংগীতে ভোর-তাল নামে গৃহীত) গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই উপলক্ষে গীত গানের একমাত্র ধুয়া বিরাম-হীনভাবে ধ্বনিত হয় ওহ···ওহ···ওহ। নৃত্যানুষ্ঠানে একটি মেয়ে আজানুলম্বিত ঘাগরা পরে, ঘাগরার দুই প্রান্ত দুইটি ছেলে ধরে। একজন ছেলের পরিধানে অনুরূপ আজানুলম্বিত ঘাগরা, আর একজন রোমশ আচ্ছাদনে রাক্ষসের মুখোশ পরে। মেয়েটির পরিধানে থাকে ধাতু-নির্মিত মুকুট যাহার কানগুলি কুলার মত। ঐ কুলার মত কানের প্রান্ত হইতে সুতা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। মুকুটপরিহিতা মেয়েটি এই সুতা হাতে লইয়া নানাপ্রকার নৃত্যের ভঙ্গী করে। তাহার পাশের ছেলে দুইটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাতের বিচিত্র মুদ্রাসহযোগে নাচে।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, লোকায়ত জীবনযাত্রা যত প্রাণোচ্ছল হয়, লোকনৃত্যের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষও সেই পরিমাণে বাড়ে। আধুনিক সভ্যতার চোখধাঁধানো পক্ষসঞ্চালনে লোকনৃত্যগুলি নিষ্প্রাণ অথবা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ লোকনৃত্যে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ হওয়াই রীতি এবং আগু-পিছু হইয়া পদসঞ্চালন দ্বারা নাচের শুরু হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সর্পিল ভঙ্গীতে পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিবার ভঙ্গীও লক্ষণীয়। অধিকাংশ নৃত্যই কোনও পার্বণ বা ঐ জাতীয় উৎসব উপলক্ষে পরিকল্পিত। উপজাতিগণ গেন্না বা পার্বণের সময় মরং বা কুমারগৃহে (আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলনসভা) একত্র হয়। বর্শা এবং রণনৃত্য নাগাদের মধ্যে প্রচলিত, অন্য দিকে বড়ো-কাছাড়ীগণের কোনও কোনও নৃত্যে ঢাল-তলোয়ার ব্যবহারের রীতি আছে। দক্ষিণ ভারতের কোলটম জাতীয় কাঠিনৃত্য আসাম প্রদেশে নাই। আসামের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে বংশনৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভরনৃত্য এবং ভাঁড়ামি-নাচের প্রচলন এখনও অসমীয়া-ভাষী উপত্যকায় রহিয়াছে। মোটের উপর বৈচিত্র্য এবং মান উভয় দিক দিয়াই আসামের লোকনৃত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'অসমীয়া লোকসংগীত' দ্র।

মহেশ্বর নেওগ

অসমীয়া লোকসংগীত অসমীয়া জীবনের মর্মরূপ তাহার লোকসংগীত, গাথা এবং কাহিনীতে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমন আর কোথাও নয়। এইগুলির মধ্য দিয়া আসামের সাধারণ মানুষ ও জীবনের বাণী মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জীবনযাত্রাও পরিবর্তমান। ফলে লোক-সংগীতের চর্চা একেবারে থামিয়া না গেলেও লোকসংগীত-রচনা বিরল হইয়া আসিতেছে। অধিকাংশ গীতই সামাজিক অনুষ্ঠান বা ধর্মোৎসব উপলক্ষে রচিত। গাথাগুলির বিষয় প্রধানতঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা কিংবদন্তীমূলক

কোনও ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব। এই সকল রচনায় স্থানীয় প্রভাব গভীর হইলেও ইহাদের আবেদন সর্বজনীন। সারল্য এবং আন্তরিকতা ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া লোকসংগীত হইতে এমন দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে যাহা ভাবে ও গঠনে সুদূর স্কটল্যাণ্ডের কোনও সীমান্তপ্রদেশের গীতির সদৃশ। বিবিধ লোকসংগীত প্রসঙ্গে 'নাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (আক্ষরিক অর্থ নাম-কীর্তন)। বৈষ্ণব ধর্মের হরিনাম-সংকীর্তন হইতেই ইহা গৃহীত।

আসামে 'বিহু' (সংস্কৃত বিষুবৎ হইতে) নামে তিনটি পার্বণ হয়। এই উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র -সংক্রান্তিতে; ইহারা যথাক্রমে কাতি-বিহু, মাঘ-বিহু, এবং চ'ত বা ব'হাগ-বিহু নামে পরিচিত। কাতি-বিহু-কে বলা হয় 'কঙালী (কাঙালী) বিহু' এবং এই পার্বণের বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান অথবা সংগীত নাই। মাঘ-বিহু-কে বলা হয় 'ভোগালী বিহু'; এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ভোজন, কেননা এই সময় আসামের ধান্য-সংগ্রহের কাল। তবে বিহুর মধ্যে প্রধান হইল ব'হাগ বিহু এবং ইহা 'রঙালী বিহু' নামে পরিচিত। প্রচুর আনন্দানুষ্ঠানসহযোগে ইহা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। নূতন ধান গোলায় তুলিবার পর কৃষক নর-নারীর পর্যাপ্ত অবসর থাকে এবং মাঘ-বিহুর মধ্যেই এই কার্য শেষ হইয়া যায়। সংগীতের মাধ্যমে মানসিক আদান-প্রদানের ইহাই উপযুক্ত সময়। উপরন্তু কাল হইল বসন্ত এবং টেনিসনের ভাষায়, 'বসন্তে তরুণ-চিত্ত প্রেমচিন্তায় চঞ্চল'। এই সকল গ্রাম্য প্রেমিকের অনুরাগ সরল এবং সাবলীল পদ্যে বর্ণিত। এইরূপ ক্ষুদ্র গীতিগুলি বনগীত বা বনঘোষা নামে পরিচিত। বন অথবা বনের নিকটবর্তী বসতিই এই গানগুলির উৎস। প্রেম এখানে মত্ত আবেগরূপে চিত্রিত, 'প্রেমের বিষণ্ণ বিধুরতা'র কথা এখানে পাওয়া যাইবে না। প্রেমিকপ্রবর কল্পনা করে প্রেয়সীর সুন্দর তনুর সান্নিধ্য, ভ্রমররূপে সে যেন প্রিয়ার অধরে উপবিষ্ট, আর মনে মনে ভাবে: আকাশের পাখি আর বনের হরিণ-হরিণীও যদি প্রেমমিলনে সার্থক হয়, তবে তাহারাই বা হইবে না কেন?

শিক্ষার প্রসার এবং যানবাহনাদির দ্রুত উন্নতি এবং বহুবিধ জীবিকা ও বৃত্তির উদ্ভবের ফলে গ্রামজীবনের মাধুর্য দ্রুত অবলুপ্তির পথে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কবিদের 'বনগীত' রচনার শক্তিও বিলীয়মান।

ব'হাগ-বিহুর সময় বনগীতে গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে— আনন্দের স্পর্শ লাগে ধানের খেত আর গোচারণভূমিতে, নদী এবং হ্রদে, অরণ্য আর পর্বতে। বিহু-উৎসব উদ্‌যাপনের নিজস্ব কতকগুলি গানের বিষয় এই, যদিও তাহাদের বর্ণিত বিষয় মুখ্যতঃ এই অনুষ্ঠানের উপাচার এবং ঋতুরূপ। ইহাকে বলে 'বিহু-নাম'। তরুণগণ (কোনও কোনও সময়ে তরুণী এবং বৃদ্ধেরাও বটে) চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে একত্র হইয়া উৎসবে মাতে (ইহাকে বলে হুচরি)। তাহার পর গ্রামের প্রতিটি গৃহে গিয়া প্রথমে একটি ধর্মসংগীত, পরে বিহু-নাম এবং মাঝে মাঝে বনগীত গায়। গৃহকর্তা গায়কগণকে অর্থ ও বস্ত্র -সহযোগে অভ্যর্থনা করেন, প্রতিদানে তাহারা গৃহস্বামীকে আশীর্বাদ করে।

বনগীত হইল প্রেম এবং স্বেচ্ছা-মিলনের গান, আর বিয়ানাম বা বিবাহ-সংগীতের উপজীব্য আইন-আচার-সিদ্ধ সামাজিক বিবাহ। ইহার একদিকে রহিয়াছে আসন্ন নূতন জীবন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, অন্য দিকে রহিয়াছে পারিবারিক বিচ্ছেদের বিষণ্ণতা। সংগীতের বিষণ্ণ রাগিণীতে মাতার অশ্রুসজল মিনতি ফুটিয়া উঠে— কন্যার মাতা যেন আর না হই। স্নেহ-মমতায় মানুষ করিবার পর নির্মমভাবে তাহাকে অন্যের নিকট সমর্পণ করিতে হয়। বিদায়ী কন্যার অতীত জীবন ও পরিবেশের রোমন্থনে গানগুলি বিধুর। কৃষ্ণ-রুক্মিণী (শংকরদেবের উক্তবিষয়ক দীর্ঘ কবিতা বিশেষভাবে ইহার প্রেরণাস্বরূপ), ঊষা-অনিরুদ্ধ, অর্জুন-সুভদ্রা এবং হর-গৌরীর কাহিনীও কোনও কোনও গানের উপজীব্য। বর-কন্যার সৌন্দর্যবর্ণনা অবলম্বনে গীতিরচনাও কোথাও কোথাও হইয়া থাকে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত আর এক জাতীয় গানকে বলা হয় 'জোরানাম' বা 'খিচাগীত'। এইগুলি ভাবে-ভাষায় অনেক লঘু ও চপল। বর এবং কন্যা বা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া প্রচুর রঙ্গ-রসিকতা করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় রঙ্গের প্রধান পাত্র হইলেন লুব্ধ পুরোহিত যিনি অগ্নিপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত ক্ষণ তাঁহার মেদবহুলা গৃহিণীর কথা চিন্তা করিতেছেন।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে যখন কৃষিকার্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন সাধারণে 'ভেকুলী-বিয়া' বা ভেক-বিবাহের আয়োজন করে। সাধারণের সংস্কার রহিয়াছে যে, ইহার ফলে আকাশ হইতে বৃষ্টি নামিয়া আসে। এই কৌতুকজনক প্রথারও নিজস্ব সংগীত রহিয়াছে। তাহাকে বলে 'ভেকুলী-বিয়ার নাম'। তবে এইগুলি মধুর নারীকণ্ঠের পরিবর্তে পুরুষকণ্ঠে গীত হয়।

প্রত্যেক দেশ এবং যুগে ছেলে-ভুলানো ছড়া রহিয়াছে, কেননা শিশুরা স্বভাবতঃই সংগীত এবং গল্প -প্রিয়, তাহাদের নিদ্রাকর্ষণের জন্যও ইহার প্রয়োজন। পরিণতবয়স্ক

অপেক্ষা শিশুরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। পশু-পক্ষী এবং জড়প্রকৃতিও এখানে মানুষের মত কথা বলে, জীবনধারণ করে। যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে এবং নক্ষত্রখচিত আকাশে স্মিতবদন চন্দ্রের আবির্ভাব হয়, যখন গ্রামের দূর 'নামঘর' বা প্রার্থনাগৃহ হইতে ডবা (দামামা) -র শব্দ ভাসিয়া আসে, তখন শিশুর শুরু হয় চন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন— সে কি তাহাকে খেলিবার জন্য একটি কি দুইটি নক্ষত্র দিতে পারে ?

ঘুমপাড়ানি গানগুলিও শিশুর নিকট রহস্যময় জগতের প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেয়। এখানে খেঁকশিয়ালির উল্লেখ আছে, কিন্তু সে রতনপুরের স্বপনপুরীতে পলাতকা —তাহা না হইলে তাহার কর্ণচ্ছেদন করিয়া প্রদীপ তৈয়ারি হইবে। বহু ঘুমপাড়ানি গান শিশুদের যুক্তিতর্কের ক্রম অনুসারে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত। কিছু কিছু ছড়ার উদ্দিষ্ট হইল বিচিত্র পশু-পক্ষী।

কয়েকটি ছড়া আছে যাহার বিষয় শিশুদের ক্রীড়া। এইরূপ একটি সহজ খেলা হইতেছে হাতের তালুতে লুকানো কোনও ছোট পাথর বা ফলকে (গুটি) আন্দাজে বলা। যে আন্দাজ করিবে, সে আপন মনে আওড়ায় :

> অলোগুটি টলোগুটি কচুগুটি ঘাই,
> এইখন হাতর গুটিটো এইখন হাতে পায়।

আসামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তের জেলাসমূহে কিশোরগণ কাতিক মাসের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মশক-নিবারক 'মহ-খেদোয়া গীত' গাহিয়া বেড়ায়। তাহাদের ধারণা এইভাবে সেই বৎসরের জন্য মশকদিগকে বিতাড়িত করা যায়।

বসন্তের দেবী শীতলা সাধারণতঃ 'আই' বা মাতারূপে পরিচিতা। তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনাসংগীতকে বলে আই-নাম। দক্ষিণ ও মধ্যভারত অথবা তান্ত্রিক মাতৃকাদের মত আইয়েরও সপ্ত স্বসা। সপ্ত ভগ্নী আসেন সপ্ত পর্বতশৃঙ্গ হইতে। সকল জীব এবং জড়, বৃক্ষ এবং লতিকা তাঁহাদের নিকট নতি স্বীকার করে। তাঁহারা নির্মাল্য (নির্মালি') -স্বরূপ পুষ্প বিতরণ করেন— এই নির্মাল্য হইল বসন্তের গুটিকার প্রতীক। রোগাক্রান্ত দেহকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবী-দের নিকট অতি নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা করিতে হয়। এই প্রার্থনায় বেশ আন্তরিক সুর লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি গানে দেবী শীতলা পিচলা নদীর তীরবর্তী ফুল-বাড়ির 'দেওঘর' বা মন্দির হইতে আগত বলিয়া পরি-কল্পিত। পূর্বোক্ত স্থানটি উত্তর লখীমপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং এখানকার দেবীমূর্তি একদা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

লখিমী (লক্ষ্মী) এবং সুবচনী দেবীর উদ্দেশেও গান রচিত হয়। লক্ষ্মীকে গৃহস্থগণ আবাহন করেন ধান কাটিবার সময়। গ্রামে অথবা নিকটবর্তী কোথাও মহামারীর সূত্রপাত হইলে সুবচনীর আরাধনা শুরু হয়। শরীর অকারণে শীর্ণ হইলে অথবা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বন্ধ হইলে 'অপেচরী' বা অপ্সরার কুদৃষ্টি সন্দেহ করা হয়। এই কুপ্রভাব এড়াইবার জন্য স্থানীয় বৃদ্ধাগণ কোনও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে প্রার্থনা-সংগীত নিবেদন করেন।

কৃষ্ণ-কাহিনীর, বিশেষতঃ শংকরদেবের বৈষ্ণববাদের প্রভাব সমগ্র আসামব্যাপী। বৈষ্ণব সাহিত্য কৃষ্ণের বাল্যলীলা, ব্রজগোপীগণ, কুব্জা সৈরিন্ধ্রী এবং রাধিকার কাহিনীকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। ফলে 'নাম-ধর্ম' সকলের নিকটই আকর্ষণীয়। উক্ত বিষয় অবলম্বনে রচিত গীতিসমূহ সাধারণতঃ 'গোঁসাই-নাম' রূপে পরিচিত। কৃষ্ণ সর্পকুলমণি কালিয়ের শিরে নৃত্যরত, কৃষ্ণের এই-চিত্র তাহাদের নিকট জীবনের প্রতীক এবং হতাশ প্রাণে পরম আশ্বাসস্বরূপ।

শিব অতি জনপ্রিয় দেবচরিত্র। বহু পোষ্যের সংসার হইলেও ভাঙ-গাঁজা খাইয়াই তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। পরিধানে কেবল ব্যাঘ্রচর্ম; ইচ্ছামত তিনি বর বিলাইয়া বেড়ান। স্ত্রী কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া তিনি চাষ-আবাদে মন দেন। কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত পদ্যে শিবের সহিত তাঁহার সুগৃহিণী পার্বতীর কলহ বর্ণিত হইয়াছে। পার্বতী 'পগলা' স্বামী হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে বলিতেছেন, 'এই বাতুল দেবতা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই'।

এক ধরনের অসমীয়া গানকে বলে 'দেহ-বিচারর গীত'। এইগুলি 'টোকারী' নামক বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গীত হয় বলিয়া ইহার অন্য নাম 'টোকারী গীত'। এই সব সংগীতের সহিত বাংলার বাউলের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাউলদের মত ইহারাও ভ্রাম্যমাণ চারণ কবি। 'পূর্ণ-সেবা', 'বর-সেবা', 'রাতিখোয়া সবা' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের গোপন তাত্ত্বিক আলোচনাতেও এইগুলি ব্যবহৃত হয়। এই রূপক গানগুলিতে মানবদেহের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে— অণু হইল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। মানবদেহ হইল বিশ্বজগতের সারাৎসার। আবার ইহা যেন একটি গৃহ যাহার নয়টি দরজা কিংবা একটি নগরী যাহার নয়টি প্রবেশপথ। মন (মনাই, মন ভাই, ঘরর মানুহ ইত্যাদি

অসমীয়া লোকসংগীত

বাংলার বাউলের 'মনের মানুষে'র সঙ্গে তুলনীয়) হইল দশেন্দ্রিয়ের প্রহরী এবং জীব ভ্রমবশতঃ মনের আজ্ঞায় নিয়োজিত ইন্দ্রিয়াবলীকে নিজের মনে করিয়া কর্মচক্রে পা দেয়। জীব এই কর্মের ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, কেবল নিজগুরুর শরণ লইলে। নিজগুরুর আবাস হৃৎপদ্মে। মায়া একটি নদী, তাহার দুই তীরে কাল এবং বিকাল নামে (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) দুই পক্ষী বাস করে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত আসামেও প্রোষিত-ভর্তৃকার সারা বৎসরের দুঃখ-দুর্দশা লইয়া 'বারমাস্যা' রচিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ হইতে সাধারণতঃ বর্ষের শুরু, তাহার পর মাসের পর মাসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর আবর্তনে বিরহিণীর হৃদয়বেদনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'জয়ধন বানিয়ার বারমাহি গীতে' মানিক নামক বণিক স্বীয় পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষার মানসে ছদ্মবেশে অবৈধ প্রণয় নিবেদন করেন। কিন্তু বারটি মাস কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না এবং অবশেষে পত্নীকে আত্মপরিচয় দিলেন। এই কাব্য রোমাণ্ডের দৌলত কাজীর (১৭শ শতাব্দী) লোর-চন্দ্রানী পাঁচালির সহিত তুলনীয়। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য বিরহের অমর আলেখ্য; এবং মনে হয় অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী অথবা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 'বারমাস্যা'র মূল প্রেরণা তিনিই।

মাঝিদের গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল নৌকা-প্রতিযোগিতার গান। এই গানে প্রতিযোগী মাঝিদের উদ্দামতার সহিত দলগত চেতনা চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কোনও গানের বিষয় হইল দূরপথযাত্রী স্বামীর বিরহে নায়িকার হৃদয়ার্তি অথবা রাধার খেয়া-পারাপার করিবার মাঝিরূপ কৃষ্ণ। কয়েকটি হাসির গানের বর্ণিত বিষয় হইল মাকু, চরকা বা তাঁতের জন্য ক্রন্দনরতা স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর অনুযোগ।

জুনা হইল একপ্রকার ক্ষুদ্র 'গাথা', কিছুটা রঙ্গ-পরিহাসের মধ্যে এই গাথার উপজীব্য কার্পাস, চরকা, লাঙল বা পিপীলিকা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ের ক্ষুদ্র কাহিনী বা ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ 'কপাহর জুনা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে— এখানে এক দক্ষ তাঁতিনীর কথা বলা হইয়াছে, সে এমন সূক্ষ্ম সুতা বোনে যে তাহার দ্বারা হাতি বাঁধা যায়, এমন কাপড় বোনে যে পরিবার সময় গায়ের চামড়া উঠিয়া আসে। 'তাঁতীর জুনা'য় কৃষ্ণ কোনও এক তন্তুবায়ের গৃহে গিয়া রাধার জন্য শাল তৈয়ারির ফরমাস করিতেছেন এবং শালের কারুকার্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে নির্দেশ দিতেছেন। 'জুনা'র অন্তর্বর্তী ব্যঙ্গ কবিতা ও রঙ্গ-রচনায় দুইটি টাইপ চরিত্র রহিয়াছে— একজন হইল পূর্ব-আসামের অধিবাসী বহুয়া এবং অন্যজন পশ্চিম আসামের ভাউরা (ভাওরীয়া)। বহুয়া এবং ভাউরা উভয়েরই কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ ছড়া বানাইবার অধিকার আছে। শব্দব্যবহারেও তাহাদের মাত্রাতিরেক সমাজস্বীকৃত। ভাউরার এই জাতীয় রচনা 'ভুঁইকঁপর গীতে' ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে বৈষ্ণব-সত্রগুলিসহ তীর্থনগরী বরপেটার সর্বনাশা পরিণতির কথা চিত্রিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত বারমাহি গীতকেও গাথা বলা যাইতে পারে, কেননা যতই ক্ষুদ্র হউক, ইহারও একটি কাহিনী রহিয়াছে। 'পগলা-পার্বতীর গীত'কেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। অবশ্য ইহা শুধু ভাঙের নেশায় সদামত্ত শিব এবং পার্বতীর কলহ-কাহিনী। শিব তুচ্ছ কারণেও তাঁহাকে প্রহার করিতে পারেন— এই আশঙ্কায় পার্বতী পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার ভয় দেখান, কিন্তু শিব তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিবেন না। অবশেষে পার্বতীকে স্বীকার করিতে হয়, 'তোমার কোমল করস্পর্শ কিছুতেই এড়াইবার উপায় নাই'।

'জনাগাভরুর গীত' এবং 'ফুলকোঁয়রর গীত' নামে দুইটি গাথা রহিয়াছে। এখানে রোম্যান্সের জগতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা আসিয়া মিশিয়াছে। প্রথম কবিতাটি দীর্ঘ— গোপীচন (নামটি বাংলা 'ময়নামতীর গীতে'র গোপীচান্দের কথা মনে করাইয়া দেয়) নামক রাজপুত্র কি করিয়া জনাগাভরু নাম্নী নারীকে জয় করিল তাহারই কাহিনী। জনাগাভরু তাহার বিবাহপ্রার্থী যুবকদের যে কঠিন শর্ত আরোপ করিয়াছিল, একমাত্র গোপীচনের পক্ষেই তাহা সার্থক করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় কবিতাটি সময় সময় দুই-তিন সর্গে বিভক্ত, যেমন, মণিকোঁয়র-এর কাহিনী, কাঁচনমালা এবং ফুলকোঁয়র-এর কাহিনী। শেষোক্ত কবিতায় আহোম রাজত্বের সামাজিক পরিবেশের চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর নায়ক ফুলকোঁয়র কাঠের উড়ন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া অন্য দেশের রাজকন্যা ধন পঁচতুলাকে গোপনে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ঘটকতা করে একজন মালিনী। যুবরাজের শারীরিক উপস্থিতিই এমন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের সৃষ্টি করে যে শুষ্ক তরু এবং পতিত উদ্যান সহস্রপুষ্পশোভিত হইয়া ওঠে।

'দুবলা শাস্তীর গীত' (সতীলক্ষ্মী দুবলার কাহিনী) আংশিক পাওয়া গিয়াছে। এখানে দুবলার প্রতি জনৈক তরুণ বণিকের অবৈধ প্রস্তাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে তুলনীয় 'জয়ধন বনিয়ার বারমাহী গীত'। 'রাধিকা শাস্তীর গীতে'র অনুরূপ একটি পালা বাংলাতেও পাওয়া

অসমীয়া সাহিত্য

যায়। এখানে রাধিকা কৈবর্ত-কন্যা এবং বৈষ্ণব নেতা শংকরদেবের (১৬শ শতাব্দী) সমসাময়িকরূপে বর্ণিত। রাধিকার 'পল' বা খালুই করিয়া জল বহন করিবার দুরূহ পরীক্ষার কথা এই কাব্যে বলা হইয়াছে।

আহোম ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব লইয়া রচিত ঐতিহাসিক গাথাগুলি সবিশেষ উপভোগ্য। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 'ঘিনাই বরফুকনর গীত' (ঘিনাই ওরফে বদনচন্দ্র বরফুকনের গান)। এই শোকগাথায় বলা হইয়াছে বরফুকন বা আহোম সেনাপতি ও শাসনকর্তা কি করিয়া ব্রহ্মদেশীয় হামলাকারীদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। 'হরদত্ত-বীরদত্তর গীতে'র দুইটি চৌপদী মাত্র এখন পাওয়া যায়। কাহিনীটি সম্ভবতঃ বদনচন্দ্রের পূর্বপুরুষ প্রতাপবল্লভ বরফুকনের বিরুদ্ধে কামরূপের দুই চৌধারী, হরদত্ত এবং বীরদত্তের বিদ্রোহ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শহীদ মণিরাম দেওয়ানের জীবনকাহিনী লইয়া রচিত কাব্যটি কিছুটা বিক্ষিপ্ত, সেগুলি একত্র করিলে বোধ হয় একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পাওয়া যাইবে। জয়মতীর জীবন লইয়া রচিত গাথার কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে। জয়মতী একজন আহোম রাজকন্যা; নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান দেন নাই বলিয়া রাজঘাতকদের হাতে তিনি প্রাণ দেন। তাঁহার স্বামীই পরবর্তী কালের রাজা গদাধর সিংহ। হারেমের অবৈধ প্রণয়লীলা হইল 'নাহরর গীতে'র বিষয়। ইহা ছাড়া এখন পর্যন্ত আরও যে সমস্ত ঐতিহাসিক গাথা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চিকন-সরিয়হর গীত', 'বাখর বরার গীত'।

রূপকথাগুলি সাধারণতঃ গদ্যে রচিত, যদিও মাঝে মাঝে বিষণ্ণ সুরের গান সংযোজিত হইয়াছে। জিকির এবং জারী নামে প্রচুর ইসলামীয় সংগীত রহিয়াছে। মুসলমান দরবেশ আজান ফকির (১৭শ শতাব্দী) -কে এই জাতীয় অধিকাংশ গানের রচয়িতা বলা হইয়া থাকে।

মহেশ্বর নেওগ

অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া আসামের প্রধান ভাষা। এইরূপ নামকরণের মূলে আছে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম 'অসম' (আরও প্রাচীন কালে বলা হইত কামরূপ এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুর)। ইহা নব্য ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত একটি পূর্ণবিকশিত ভাষা এবং মাগধী অপভ্রংশ হইতে ইহার উৎপত্তি। এই ভাষার ব্যাকরণ এবং শব্দের উপর ভোটবর্মীর কিছু প্রভাব আছে; আবার শব্দভাণ্ডারে অস্ট্রিক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিউএন্-ৎসাঙ্ যখন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের রাজধানী পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি এই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে 'মধ্য ভারতের ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন'। বোধ হয় তৎকালে প্রচলিত আর্য এবং ভোটবর্মী ভাষার মিশ্রিত রূপের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।

সহজযান সম্প্রদায়ের গুহ্য যোগসাধন এবং কামাচার-পদ্ধতি বিষয়ে ২৩ জন সিদ্ধপুরুষ (৮ম-১২শ শতাব্দী) লিখিত রহস্যময় গীতিকা চর্যা বা চর্যাপদকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়; এবং অসম, বাংলা, উড়িষ্যা ও মিথিলা প্রত্যেকেই উহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া দাবি করে। তবে কিছু-সংখ্যক চর্যাপদ ও পদকর্তার উপর তৎকালীন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কামরূপের কিছু প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়।

অসমীয়া ভাষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ শুরু হয় ভারতের উভয় মহাকাব্য এবং পুরাণকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টার দ্বারা। মাধব কন্দলী (১৫শ শতাব্দী) এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি রামায়ণের মধ্য ভাগের পাঁচটি কাণ্ড হৃদয়গ্রাহী এবং মনোহর ছন্দে অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। হরিবর বিপ্র এবং হেম সরস্বতী রাজা দুর্লভনারায়ণের (১৪শ শতাব্দী) রাজত্বের সমসাময়িক। কবিরত্ন সরস্বতী রাজা দুর্লভনারায়ণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেন। রুদ্র কন্দলী নামক অপর এক কবি তৃতীয় এক-জন নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ এবং মনে হয়, তিনিও এই সময়ে জীবিত ছিলেন। হরিবর এই পর্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্যের বিষয় রামের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ এবং জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বে বর্ণিত অর্জুনের সহিত আত্মজ বভ্রুবাহনের যুদ্ধ। হেম সরস্বতী 'বামনপুরাণ' হইতে গৃহীত আখ্যান অবলম্বনে একশত শ্লোকে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর কাহিনী রচনা করেন। পৌরাণিক আখ্যান লইয়া রচিত 'হর-গৌরী-সংবাদ' নামক কাব্যটিও সম্ভবতঃ তাঁহারই রচনা। মহাভারতের দ্রোণপর্বের অন্তর্গত জয়দ্রথবধ-অনুপর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবলম্বনে অসমীয়া কাব্য রচনা করেন কবিরত্ন এবং রুদ্র কন্দলী। এই যুগে কাহিনীবর্ণনার এবং পরিণত ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে কাব্যরচনার প্রতি অসামান্য উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই শংকরদেবের (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রী) নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র দেশে এক বিরাট নবজাগরণের সূত্রপাত হয়।

অসমীয়া সাহিত্য

সম্ভবতঃ উক্ত আন্দোলনের বহির্ভূত ছিলেন এমন তিন জন কবি— মঙ্কর, দুর্গাবর কায়স্থ এবং পীতাম্বর কবি— ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্য রচনা করেন। মঙ্কর ও দুর্গাবর সর্পদেবী মনসাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠা নূতন ধর্মশাখার জন্য অসমীয়া ভাষায় ছন্দে নবপুরাণসৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। দুর্গাবর রামায়ণও রচনা করেন; এবং স্থানে স্থানে, বিশেষভাবে করুণ দৃশ্যে, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাগের সুরযোজনায় মনোরম সংগীত সৃষ্টি করেন। পীতাম্বরও তাঁহার ঊষা-পরিণয়, ভাগবত (দশম) এবং চণ্ডী-আখ্যানে এই একই রীতি অবলম্বন করেন। উক্ত তিন জন কবির সহিত সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের রচনা-শৈলীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাঁহারা যে কাব্যরীতি গ্রহণ করেন, উহা বাংলা দেশে সুপ্রচলিত পাঁচালি বা পাঞ্চালি। বিষয়বস্তুর দিক হইতেও উহাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উহাদের বিষয়ের আবেদন ভাবনা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়বোধকেই অধিকতর পরিতৃপ্ত করিত।

শংকরদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব একেশ্বর-বাদ। বিষ্ণু-কৃষ্ণের নামকীর্তন এবং লীলাকীর্তনই উহাতে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। উহা 'একশরণ নামধর্ম' নামে পরিচিত। উক্ত ধর্মের উপাসকগণ এই একটিমাত্র বিগ্রহেরই পূজা করেন এবং অন্য দেব-দেবীর আরাধনা এই ধর্মে নিষিদ্ধ। এই বৈষ্ণববাদে রাধা-কৃষ্ণ শাখাও স্বীকৃতি পায় নাই। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যে নূতন জোয়ার আসিল। শংকরদেব এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও প্রধান প্রচারক মাধবদেব বহু গীত, নাটক, কাহিনী-কাব্য এবং অন্যান্যপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টি করেন। অসমীয়া-সাহিত্যের এই যুগকে একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ ভাগবত-পুরাণ এবং এক ঈশ্বর বিষ্ণু-কৃষ্ণের যুগ বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, শংকরদেব স্বয়ং দ্বাদশখানির মধ্যে আটটি পুরাণকাহিনী অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন; এবং অবশিষ্ট পুরাণগুলির অনুবাদেও তিনি অন্যান্য গবেষকদের প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'কীর্তন-ঘোষা'ও পুরাণের সারাংশ অবলম্বনে রচিত। শংকরদেবের ভাষায় প্রতিভাবান লেখকের যোগ্য দার্ঢ্য চোখে পড়ে। তাহা ছাড়া, তাঁহার বহু সংগীতে (বরগীত) এবং পত্নী-প্রসাদ, কালী-দমন, কেলি-গোপাল, রুক্মিণী-হরণ, পারিজাত-হরণ, রাম-বিজয় ইত্যাদি নাটক রচনায় তিনি কিছু কিছু ব্রজবুলি-বাগ্‌ধারাও গ্রহণ করেন। উক্ত নাটক-সমূহে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার, প্ররোচনা, নান্দী প্রভৃতি গৃহীত হইলেও সাধারণভাবে উহাদের গঠনভঙ্গীতে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বর্তমান।

মাধবদেবের বরগীত এবং নাটকাবলীর (চোর-ধরা, পিম্পরাগুচুয়া ইত্যাদি) শিল্পোৎকর্ষ তাঁহার গুরু শংকরদেব অপেক্ষা অনেক বেশি। তাঁহার রচনায় বাৎসল্যই প্রধান, শংকরদেবে যেমন দাস্য। কৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনাতেই তাঁহার রচনার প্রধান স্ফূর্তি। রহস্যময় আকুতির সহিত তিনি মাতা যশোদা এবং বৃন্দাবনের গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের চপল লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সহস্রশ্লোকযুক্ত কাব্যগ্রন্থ 'নামঘোষা' তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। উক্ত গ্রন্থে ভক্তির সহিত বৈদান্তিক তাত্ত্বিকতার দুর্লভ সমন্বয় ঘটিয়াছে।

অনন্ত কন্দলী এবং রাম সরস্বতী শংকরদেবের সম-সাময়িক অন্য দুই জন প্রধান কবি। অনন্ত কন্দলী বৈষ্ণব নেতার আদেশে ভাগবত (দশম স্কন্ধ)-এর উত্তরার্ধ অনুবাদ করেন; এবং রাম সরস্বতী সেই সন্তের প্রতি ভক্তের বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। কন্দলীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য 'কুমর-হরণ', অনিরুদ্ধ-ঊষার প্রণয়কাহিনী। তিনি ভাগবতের কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করেন এবং রামায়ণের একটি নিজস্ব ভাষ্যও রচনা করেন— তবে উহাতে মাধব কন্দলীর অনুকরণ সুস্পষ্ট। মহাভারতের কাহিনী, বিশেষতঃ বনপর্ব, রাম সরস্বতীর প্রিয় বিষয়। তিনি পাণ্ডবদিগের দৈত্যবধপ্রসঙ্গ অতিরঞ্জিত করিয়া একাধিক 'বধকাব্য' রচনা করেন। (এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকজন অনুকারকের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা 'খটাসুর বধ'-এর রচয়িতা সাগরখরি)। সরস্বতীর 'ভীম-চরিত' নামক আর একটি কৌতুককাহিনীও স্মরণীয়— উহাতে শিব কৃষকরূপে এবং ভীম তাঁহার ভৃত্যরূপে বর্ণিত। 'ঘুঘুচা (গুণ্ডিচা)-যাত্রা'র লেখক শ্রীধর কন্দলীর 'কান খোয়া'ও (কর্ণ-ভক্ষক) উপভোগ্য কৌতুক-কাব্য, ঘুম-পাড়ানি ছড়ার মতই তাহার আবেদন।

গোপীনাথ পাঠক (১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ), দামোদর দাস, লক্ষ্মীনাথ দ্বিজ, পৃথুরাম দ্বিজ প্রমুখ কবিগণ যখন মহাভারতের কাহিনীর অসমীয়া কাব্যানুবাদে মগ্ন, তখন হৃদয়ানন্দ কায়স্থ এবং অন্যান্য গৌণ কবিবৃন্দ রামায়ণের কাহিনীর প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীকান্ত সূর্যবিপ্র (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানস' অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। গোবিন্দ মিশ্র এবং রত্নাকর মিশ্রের 'ভগবদ্গীতা'-র পদ্যানুবাদও বিশেষ প্রশংসনীয়। হরিবংশ অবলম্বনে সাহিত্যরচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন গোপালচরণ দ্বিজ (১৬শ শতাব্দী), ভবানন্দ মিশ্র (১৬শ শতাব্দী) এবং বিদ্যাচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। শেষোক্ত জনের

রচনায় মূল হইতে বহু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। পদ্যকারদিগের অনেকেরই বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল পুরাণকাহিনী। তবে অধিকতর শক্তিমান কবিগণের ভাগবত সম্পর্কেই বেশি আগ্রহ দেখা যায়। শংকরদেব এবং অনন্ত কন্দলী ব্যতীত অনিরুদ্ধ কায়স্থ (মাধবদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র এবং ১৬শ শতাব্দীতে প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত উগ্র মউমর শাখার প্রবর্তক), গোপালচরণ দ্বিজ (১৬শ শতাব্দী), কেশবদাস কায়স্থ (শংকরদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র, ১৬শ শতাব্দী), নিত্যানন্দ কায়স্থ (১৭শ শতাব্দী) প্রমুখ আরও অনেকে এই পুরাণ অবলম্বনে কাব্যরচনা করেন। অন্যান্য পুরাণ অনুবাদ এবং অনুকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ভাগবত মিশ্রের (১৭শ শতাব্দী) 'বিষ্ণুপুরাণ', ভুবনেশ্বর বাচস্পতি মিশ্রের (১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ', কবিচন্দ্র দ্বিজের (১৮শ শতাব্দী) 'ধর্মপুরাণ', বলরাম দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) এবং দুর্গেশ্বর দ্বিজের (১৮শ শতাব্দী ?) 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', রুচিনাথ কন্দলী (১৮শ শতাব্দী) এবং রঙ্গনাথ চক্রবর্তী (১৭শ শতাব্দী) -র 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণ' (চণ্ডী-আখ্যান)।

প্রাচীন সাহিত্যে পদ্যে বহু রোম্যান্স রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি হইল কলাপচন্দ্রের 'রাধা-চরিত', রাম দ্বিজের 'মৃগাবতী-চরিত', দ্বিজবরলের 'মাধব-সুলোচনা-উপাখ্যান' এবং অজ্ঞাতনামার 'মধুমালতী'। এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিকাশে উত্তর ভারতীয় কবি কুতুবন, মনজাহান প্রমুখের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চারণ কবি সূর্যবিপ্রের 'শিয়াল-গোঁসাই' (১৬১৬ খ্রী) ছন্দোনৈপুণ্যে অসাধারণ। রামানন্দ দ্বিজের 'মহামোহ-কাব্য' কৃষ্ণ মিশ্রের সুবিখ্যাত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' অবলম্বনে রচিত। রাম মিশ্র অসমীয়া ভাষায় 'হিতোপদেশ' এবং 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'-র কাহিনী (১৬৫৪-১৬৬৩খ্রী) বর্ণনা করেন।

শংকরদেব এবং মাধবদেবের বরগীত সংগীতের অনুকরণে কাব্য রচনা করেন আসামের বহু বৈষ্ণব মোহান্ত। তাঁহাদের মধ্যে গোপালদেব, অনিরুদ্ধ, শ্রীরাম, যদুমণি এবং রামানন্দ এই ব্যাপারে কিছু পরিমাণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই 'একশরণ কৃষ্ণভক্তি'-মূলক কবিতার অনুপূরক হিসাবে ১৮শ শতাব্দীতে দেখা দিল রুদ্রসিংহ (১৬৯৬-১৭১৪ খ্রী), শিবসিংহ (১৭১৪-১৭৪৪ খ্রী) প্রমুখ রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য কবিগণের শাক্ত ও রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী। এই কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইলেন রামনারায়ণ কবিরাজ চক্রবর্তী। ইনি গীতগোবিন্দ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ঐ একই পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের অন্তর্গত শঙ্খচূড় ও তুলসীর কাহিনী প্রভৃতির অনুবাদ করেন। 'শকুন্তলা-কাব্য' তাঁহার অপর একটি রচনা। এই কাব্যে চন্দ্রকেতু এবং কামকলার একটি ক্ষুদ্র প্রণয়কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে। 'যোগিনীতন্ত্রে'র আংশিক অনুবাদ করেন রামচন্দ্র বরপাত্র। অনন্ত আচার্য রচনা করেন শৈব 'আনন্দ-লহরী'। নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণে'র উপজীব্য মনসার কাহিনী।

শংকরদেব এবং মাধবদেবের অনুসরণে বৈষ্ণব সত্রের বহু মোহান্ত নাটক রচনা করেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি সত্যই সার্থক রচনা এবং সেগুলি এখনও পর্যন্ত পল্লীতে অভিনীত হইয়া থাকে।

পদ্যে জীবনীরচনার সূত্রপাত করেন দৈত্যারি, ভূষণ, বৈকুণ্ঠ এবং রামানন্দ (১৭শ শতাব্দী)। প্রত্যেকেরই বিষয় শংকরদেবের জীবনবৃত্তান্ত। এই ধারা পরবর্তী কালেও অব্যাহত থাকে। সূর্যখরি দৈবজ্ঞ (১৭৯৮ খ্রী), রতিকান্ত (১৮শ শতাব্দী) এবং আরও অনেকে পদ্যে কামরূপের কোচ রাজগণের ইতিবৃত্ত রচনা করেন। অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর এবং দুতিরাম পদ্যে আহোম রাজবংশের পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিদ্যা অবলম্বনে কাব্যরচনার ফলে পদ্যের বিষয়ব্যাপ্তি আরও প্রসারিত হয়। বকুল কায়স্থের 'কিতাবত-মঞ্জরী' (১৪৩৪ খ্রী) -র বিষয় গণিত, হিসাবরক্ষা এবং জমি-জরিপ।

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পন্ন অসমীয়া গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন শংকরদেব এবং মাধবদেবের নাটকাবলীর ব্রজবুলি-বাগ্ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবত-ভট্টাচার্য (১৫৫৮-১৬৩৮খ্রী) তাঁহার 'ভাগবত-পুরাণ' এবং 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদে যে পরিণত গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন কবিগণ ব্যবহৃত কৃত্রিম অন্বয় ও কাব্যরীতিও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রায় একই সময়ে গোপালচন্দ্র দ্বিজ নামক মোটামুটি খ্যাতিসম্পন্ন জনৈক কবি শংকরদেবের সংস্কৃতে রচিত ভক্তিবিষয়ক প্রবন্ধ 'ভক্তি-রত্নাকরে'র অনবদ্য অনুবাদ করেন। পরবর্তী শতকে রচিত উল্লেখযোগ্য ধর্মবিষয়ক গদ্যগ্রন্থাবলী হইল রঘুনাথ মহন্তের 'কথা-রামায়ণ' (১৬৫৮ খ্রী), 'পদ্মপুরাণ : ক্রিয়া-যোগ-সার' (লেখক অজ্ঞাত), কৃষ্ণানন্দের 'সাত্বত-তন্ত্র' এবং 'কথা-ঘোষা'।

বৈষ্ণবগণের 'কথা-গুরু-চরিতাবলী' এবং আহোমগণের কুলপঞ্জী 'বুরঞ্জী'তেই দৈনন্দিন গদ্যের চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গদ্যের ধারা ১৭শ শতকের শেষ দুই পাদ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। 'পুরনি

অসম বুরঞ্জী' (গোস্বামী সম্পাদিত, ১৯২২) 'অসম বুরঞ্জী' (ভুইঞা সম্পাদিত, ১৯৪৫) এবং 'কথা-গুরু-চরিত' (লেথারু সম্পাদিত, ১৯৫২) এই জাতীয় চরিত-গ্রন্থ ও বুরঞ্জী গদ্যের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন নিদর্শন। ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সাহিত্যমূল্যের জন্য নয়, বিষয়বর্ণনাতেও ইহাদের সিদ্ধি অসামান্য। এই জাতীয় কুলপঞ্জীরচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং এই সময়ে কাশীনাথ ফুকন, মণিরাম দেওয়ান বড়ুয়া (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শহীদ) এবং হরকান্ত বড়ুয়া আসামের ইতিহাস সংকলন করেন।

নূতন গদ্যকে সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও ব্যবহার করা হইল, যেমন সুকুমার বরকাথের 'হস্তি-বিদ্যার্ণব' (১৭৩৪ খ্রী) সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হস্তিবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ ; অজ্ঞাতনামার 'ঘোড়া-নিদানে'র বিষয় অশ্ব-চিকিৎসা ; কাশীনাথের 'অঙ্কর আর্যা'র বিষয় গণিত। এই যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা হইল শুভংকরের নৃত্যের মুদ্রাবিষয়ক গ্রন্থ 'হস্ত-মুক্তাবলী'র সটীক অনুবাদ।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের যানদাবু সন্ধি অনুযায়ী আসামের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির পরবর্তী পঁচিশ বৎসর আসামকে বহু দুরবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে এবং আদালতে অসমীয়ার পরিবর্তে বাংলা ভাষা স্থান পাইল। কিন্তু মাতৃভাষাপ্রীতি ঐ শতকের মাঝামাঝি হইতেই পুনর্জাগরিত হয়। মার্কিন মিশনারীগণ অসমীয়া ভাষায় এবং আসাম সম্পর্কে গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া এই সুপ্তিভঙ্গে সহায়তা করিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীনাথ ফুকনের ইতিহাস (১৮৪৪খ্রী), রেভারেণ্ড নথন ব্রাউনের 'অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ' (১৮৪৪ খ্রী), মাইলস ব্রনসনের 'অসমীয়া অভিধান' (১৮৬৭খ্রী) ইত্যাদি। ইহার পূর্বেই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারীগণ অসমীয়া ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকান মিশনারীগণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হইতে 'অরুণোদই' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে শুরু করেন। অসমীয়া ভাষায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারের কৃতিত্ব উক্ত পত্রিকার প্রাপ্য। প্রধানতঃ আনন্দরাম ফুকন এবং মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় অসমীয়া ভাষা সরকারি মর্যাদায় পুনরধিষ্ঠিত হয় (১৮৭২ খ্রী)। উহার ফলে শুরু হয় সাহিত্যের নবজাগরণ।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হইলেন হেমচন্দ্র বড়ুয়া। তিনি ব্যাকরণ এবং অভিধান প্রণয়ন করিয়া আধুনিক অসমীয়া ভাষার আদর্শ মান স্থাপন করিয়াছেন। সমাজের মালিন্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার ব্যঙ্গরচনা 'বাহিরে রংচং ভিতরে কোয়াভাতুরী' (১৮৬১খ্রী) -কে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস বলা যাইতে পারে। অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা তাঁহার নাটিকা 'কানীয়া কীর্তন'। গুণাভিরাম বড়ুয়া আধুনিক সাহিত্যের প্রধান ঐতিহাসিক এবং চরিতকার। রমাকান্ত চৌধারী এবং ভোলানাথ দাস যথাক্রমে তাঁহাদের কাব্য 'অভিমন্যু-বধ' (১৮৭৫খ্রী) এবং 'সীতাহরণ' (১৮৮৮খ্রী) -এ প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেন।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ; তিনি তাঁহার সুহৃদ্ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা এবং হেমচন্দ্র গোস্বামীর সহযোগে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জোনাকী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার গদ্যরীতিকে আরও সুষ্ঠু রূপ দান করেন এবং আধুনিক সাহিত্যোপযোগী সর্বভাবনার যথার্থ বাহন করিয়া তোলেন। তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ব্যঙ্গরচনাগুলিতে হেমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব আছে। খাঁটি অসমীয়া চরিত্রচিত্রণই তাঁহার গল্প-উপন্যাস-নাটক ও প্রহসনের বিশেষ গুণ। বেজবড়ুয়া, গোস্বামী এবং আগরওয়ালাই অসমীয়া কাব্যে ১৯শ শতকের গোড়ার ইংরেজী রোম্যান্টিসিজমের ধারা আনয়ন করেন। এখন হইতে কাব্য হইল আরও মন্ময় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং তাহার বিষয়ব্যাপ্তিও অনেক বাড়িয়া গেল। গোস্বামীই প্রথম সনেট-রচয়িতা। পরবর্তী কালে তিনি অসমীয়া পুরাতত্ত্বচর্চায় মনোনিবেশ করেন। আগরওয়ালার কাব্যে উচ্চস্তরের আদর্শবাদ লক্ষ্য করা যায়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কর্কশ পদ্যে এবং পৌরুষময় গদ্যে স্বাদেশিকতার সহিত মননশীলতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। অন্যতম প্রভাবশালী লেখক পদ্মনাথ গোসাঞি বড়ুয়া ঐতিহাসিক নাটক ও উপন্যাস রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মন্ময় বিষয়ের বিষয়ানুগ বর্ণনায় তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি ধর্মীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার গদ্যের একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। অপর দুইজন সচেতন গদ্যশিল্পী হইলেন লম্বোদর বরা এবং সত্যনাথ বরা। শেষোক্ত জন তাঁহার কিছু কিছু রচনায় বেকনের নিবন্ধকে আদর্শ করিয়াছেন। রজনীকান্ত বরদলৈর ঐতিহাসিক এবং রোম্যান্টিক উপন্যাসে স্কটের প্রভাব সুস্পষ্ট। আখ্যান-কাব্য রচনায় হিতেশ্বর বরবড়ুয়া প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। গীতিকবি দুর্গেশ্বর শর্মার কাব্যরীতির ঘরোয়া সুরটি অনবদ্য।

অসমীয়া সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর নবীন লেখকবৃন্দ 'জোনাকী'-র আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেজবড়ুয়ার মাসিকপত্র 'বাঁহী' (১৯০৯-১৯৪৫খ্রী) বহু তরুণ লেখকের আবিষ্কারক ও স্রষ্টা। রঘুনাথ চৌধারী তাঁহার পক্ষীসম্পর্কিত কবিতাবলীতে প্রকৃতিধর্মের কথা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। অম্বিকাগিরী রায়চৌধারীর কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেমের রহস্যময় আকৃতি, জীবন সম্পর্কে প্রচণ্ড ভালবাসা এবং অদম্য স্বদেশপ্রেম লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথ দুওরার গীতি এবং গদ্যকবিতার মূল সুর গভীর বিষাদ। বিভিন্ন যুগ ও বিদেশী কবির প্রভাবকে তিনি আত্মস্থ করিয়া নূতন রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার 'ওমর-তীর্থ' এবং 'মিলনের সুর' যথাক্রমে ওমর খৈয়াম ও হাফিজের নবভাষ্য। সূর্যকুমার ভুইঞা, রত্নকান্ত বরকাকতী, লক্ষ্মীনাথ ফুকন, শৈলধর রাজখোয়া, নলিনীবালা দেবী প্রমুখের গীতিকবিতার গঠনরীতি ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। তৃতীয় দশকেও কয়েকজন বিশিষ্ট কবির আবির্ভাব হয়, যেমন, দিম্বেশ্বর নেওগ, বিনন্দচন্দ্র বড়ুয়া, অতুলচন্দ্র হাজারিকা এবং দৈবচন্দ্র তালুকদার। দেবকান্ত বড়ুয়া বোধ হয় তিরিশের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রেমের কবিতায় সংশয়ী দৃষ্টির ও নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছেন। অন্য দিকে গণেশচন্দ্র গগৈ-র প্রেমের কবিতায় আছে স্পর্শকাতরতার সহিত বিষণ্ণতার সমন্বয়। এই পর্বের আরও কয়েকজন কবি উল্লেখযোগ্য, যেমন— চন্দ্রধর বড়ুয়া, পদ্মধর চালিহা, নীলমণি ফুকন, দণ্ডিনাথ কলিতা, উমেশচন্দ্র চৌধারী, কমলেশ্বর চালিহা, প্রসন্নলাল চৌধারী এবং আনন্দচন্দ্র বড়ুয়া।

নাটকের ক্ষেত্রে রচনাপ্রাচুর্যে সর্বপ্রধান হইলেন অতুলচন্দ্র হাজারিকা। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'শোণিত-কুঁয়রী' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কারেঙর লিগিরী'-তে উল্লেখযোগ্য আঙ্গিক ও শিল্পগত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। মিত্রদেব মহন্ত, ইন্দ্রেশ্বর বরঠাকুর, নকুলচন্দ্র ভুইঞা, প্রসন্নলাল চৌধুরী প্রমুখ নাট্যকারগণ শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের প্রধান জোগানদার।

অসমীয়া উপন্যাসশাখা এই পর্বে বিশেষ পরিণতি পায় নাই। দণ্ডিনাথ কলিতা ও দৈবচন্দ্র তালুকদারের এই শাখায় কিছু দান আছে।

এই পর্বের সর্বাপেক্ষা সার্থক হইল ছোটগল্প। শরৎচন্দ্র গোস্বামী এই ক্ষেত্রের একজন নিরলস শিল্পী। তিরিশের যুগেও বহু উল্লেখযোগ্য গল্পকারের সন্ধান মেলে। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ গল্পে মহিচন্দ্র বরা এবং হলিরাম ডেকা-র নাম করা যায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পকার হইলেন— বীণা বড়ুয়া, রমা দাস, মুনীন বরকটকী, কৃষ্ণ ভুইঞা, নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী। লক্ষ্মীধর শর্মার গল্পে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত প্রকাশনৈপুণ্যের সমন্বয় প্রশংসনীয়। আবদুল মালিক নিঃস্বদের প্রতি সহানুভূতি এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর জন্য খ্যাতিমান।

লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার সাহিত্য-প্রবন্ধাবলীর পরে প্রকাশিত হয় লঘু প্রবন্ধের সংগ্রহ 'চিত্রসেন জখরীয়া'। তরুণরাম ফুকনের শিকার-কাহিনীগুলির সাহিত্যমূল্যও অনস্বীকার্য। সূর্যকুমার ভুইঞা, সোনারাম চৌধুরী, আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা, বেণুধর শর্মা প্রমুখ অনেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। বাণীকান্ত কাকতী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের মূল্যায়ন করিয়াছেন। বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, তীর্থনাথ শর্মা, হেম বড়ুয়া, মহেশ্বর নেওগ প্রমুখ অনেকে তিরিশ-চল্লিশের যুগে এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শের প্রতি বিদ্রোহ দেখা দিল— উত্তরপুরুষদের মধ্যে আসিল নূতন বিশ্লেষণী চেতনা। ছোটগল্পে ইতিপূর্বেই মনোবিশ্লেষণ শুরু হইয়াছে। কোনও কোনও কবি মুক্তছন্দেরও যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করিলেন। লিটন স্ট্র্যাচির ধরনে লিখিত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার নূতন পরীক্ষামূলক চরিতগ্রন্থেও এই নূতন সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অদ্ভুতভাবে আসামের জীবনকে বিপর্যস্ত করে এবং ফলে সাহিত্যসৃষ্টিও প্রায় বন্ধ থাকে। পুস্তক-প্রকাশ বিরল হইয়া উঠে। কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক সাময়িকপত্রই সাহিত্যের বাহন হইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে। পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা যখন পুনরায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে শুরু করিল, তখন দেখা গেল পুরাতন আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। দূরাগত ও নিকটাগত বহুবিধ প্রভাবে সাহিত্যের শীর্ণ স্রোত আবর্তিত হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া কাব্যে এই পরিবর্তন স্পষ্টলক্ষ্য। কবিগণ যথেষ্ট দুঃসাহসের সহিত নব নব পরীক্ষা করিয়াছেন; এবং তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন। অমূল্য বড়ুয়া, নবকান্ত বড়ুয়া, হেম বড়ুয়া, হরি বরকাকতী, মহেন্দ্র বোরা, নীলমণি ফুকন (কনিষ্ঠ), বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কেশব মহন্ত, নির্মলপ্রভা বরদলৈ, অমলেন্দু গুহ, বীরেশ্বর বড়ুয়া, হোমেন বরগোহাইন প্রমুখ তরুণ কবিগণ প্রেরণার সন্ধানে বিচিত্রপথগামী হইয়াছেন; একদিকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অন্য দিকে

ফরাসী প্রকৃতিবাদ অথবা জাপানী কবিতা তাঁহাদের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

উপন্যাসও এই পর্বে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। বীণা বড়ুয়ার 'জীওনর বাটত', রাধিকামোহন গোস্বামীর 'চাকনৈয়া', নবকান্ত বড়ুয়ার 'কপিলী-পরীয়া সাধু', প্রফুল্ল-দত্ত গোস্বামীর 'কেঁচা পাতর কঁপনি', যোগেশ দাসের 'ডাওর আরু নাই', আবদুর মালিকের 'ছবিঘর' এবং 'সুরুষমুখীর স্বপ্ন', হিতেশ ডেকার 'মাটি কার?' এবং 'ভাড়া ঘর', পদ্ম বরকাকতীর 'মনর দাপন', বাসনা বড়ুয়ার 'সেউজী পাতর কাহিনী', বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'ইয়ারু-ইঙ্গম' কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মোহম্মদ পিয়ার এবং অন্যান্য কয়েকজন কিছু ছোট উপন্যাস লিখিয়াছেন। প্রেম-নারায়ণ দত্ত ডিটেকটিভ উপন্যাসে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ছোটগল্পের প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ। আবদুল মালিক, দীননাথ শর্মা প্রমুখ গল্পকার এখনও রচনায় নিরলস। তবে তিরিশের অধিকাংশ গল্পকারই আজ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন। তাহার পরিবর্তে নূতন দৃষ্টি, নূতন প্রকাশভঙ্গী এবং সূক্ষ্ম ও কিছুটা জটিল শিল্পরীতি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন একদল তরুণ লেখক। তাঁহারা হইলেন— যোগেশ দাস, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, হোমেন বরগোহাইন, 'সৌরভ চলিহা', রোহিণীকুমার কাকতী, চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া, মহিম বোরা, নীরদ চৌধুরী প্রমুখ। ভবেন শইকীয়া এবং লক্ষ্মীনন্দন বোরা তাঁহাদের জীবনোপলব্ধির অনন্যতায় ও প্রকাশবৈশিষ্ট্যে সহজেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনার প্রতি বহু তরুণ লেখক আকৃষ্ট। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে হেমচন্দ্র বড়ুয়া, মহেশচন্দ্র দেবগোস্বামী, তিলক হাজারিকা, হেমচন্দ্র শর্মা, ভদ্র বোরা প্রমুখ তরুণগণ এই জাতীয় রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ললিত বোরা এবং কিরণচন্দ্র শর্মার রম্যরচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

আসামে এখনও কোনও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ নাই। অবশ্য নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে সকলেই, বিশেষতঃ তরুণেরা, খুবই উৎসাহী। এই অভাবের দরুন আসামের নাট্য-সাহিত্যের অগ্রগতি বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। পূর্বযুগের পৌরাণিক নাটকসমূহ জনপ্রিয়তা হারাইয়াছে। আবার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের উগ্র জাতীয়তাবোধও আজ প্রায় লুপ্ত বলিয়া ঐতিহাসিক নাটকের আবেদনও বিলীয়মান। অবশ্য, লাচিত বরফুকন (গৌহাটিতে মোগল সেনাবাহিনী প্রতিরোধের নেতা), মণিরাম দেওয়ান (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শহীদ), টিকেন্দ্রজিৎ (মণিপুরে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা), কুশল কোঁয়র (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শহীদ) প্রমুখের বীরত্বকাহিনী এখনও নাট্যকারদের প্রিয় বিষয়। সামাজিক নাটক এবং একাঙ্কিকার যুগোপযোগিতা ক্রমবর্ধমান। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আজ পর্যন্ত অনাগত, তবে সাধারণের নাট্যপিপাসাকে যাঁহারা মোটামুটি পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যপ্রসাদ বড়ুয়া, গিরিশ চৌধুরী, অনিল চৌধুরী, সারদা বরদলৈ, সুরেন্দ্রনাথ শইকীয়া এবং দুর্গেশ্বর বরঠাকুর। বীণা বড়ুয়া ('এবেলার নাট') বেতারনাট্যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তবে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার কোনও নাটক অভিনীত হয় নাই।

সাহিত্যসমালোচনার সমৃদ্ধিও খুব উল্লেখ্য নহে। অধিকাংশ সমালোচকই স্পষ্টভাষণে দ্বিধাগ্রস্ত। কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ অবশ্য তাঁহাদের অধীত বিদ্যার আলোকে সাহিত্যের মূল্যায়নে অগ্রসর হইয়াছেন, যেমন বিরিঞ্চি-কুমার বড়ুয়া, ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী, মহেশ্বর নেওগ, প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভবানন্দ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী। অতুলচন্দ্র বড়ুয়া জীবিকায় শিক্ষক না হইলেও কয়েকটি সুন্দর প্রাথমিক পর্যায়ের সমালোচনাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ (হয়ত স্বেচ্ছায় নহে) পুরাতন বিষয়ের গবেষণায় পরিতৃপ্ত— মধ্যযুগের অসমীয়া সাহিত্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশেই তাঁহাদের সমধিক আগ্রহ। চরিত-গ্রন্থ এবং ভ্রমণকাহিনী খুব জনপ্রিয় নহে। তবে এই বিষয়ে মহেশ্বর নেওগকৃত তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীশংকর-দেব' স্মরণীয় প্রচেষ্টা। বেণুধর শর্মার 'মণিরাম দেওয়ান'-এ গৌরবময় অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্যম লক্ষণীয়। সূর্যকুমার ভূঞা'র 'হরিহর আটা' জনৈক উদ্‌ভ্রান্ত সন্তের কাহিনী। ইহার বিষয় ও বর্ণনভঙ্গী সাবলীল। বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী, অমলেন্দু গুহ প্রমুখ ইওরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। হেম বড়ুয়ার সুলিখিত মার্কিন মুলুক ও সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্রমণ-কাহিনীতে কাব্য ও রোম্যান্সের সৌরভ বিশেষ উপভোগ্য।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষণীয় তাহার প্রাণ-প্রাচুর্য, উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাস। পরিমাণে না হইলেও, উৎকর্ষে এই সকল সৃষ্টি যথেষ্ট মূল্যবান এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সহিত তুলনীয়।

মহেশ্বর নেওগ

অস্‌মোসিস অভিস্রবণ। মাছের পটকা বা পার্চমেণ্টের পাতলা পর্দার সাহায্যে কোনও গাঢ় দ্রবণকে যদি অপর

একটি লঘু দ্রবণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা যায়, তবে লঘু দ্রবণের অণুগুলি ঐ ভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর গতিতে গাঢ় পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু গাঢ় পদার্থ অতি ধীরে ধীরে পাতলা পদার্থের মধ্যে আসে। পার্চমেণ্ট, পটকা প্রভৃতির ভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়া এইরূপ বিশেষ ধরনের ব্যাপনকে বলা হয় অস্‌মোসিস।

নলের মত একটা কাচপাত্রের অর্ধেকটা ইক্ষুচিনির জলে পূর্ণ করিবার পর একখণ্ড পার্চমেণ্ট বা পটকার পর্দার সাহায্যে খোলা মুখটিকে ভাল করিয়া আঁটিয়া কিছুটা জল-ভর্তি একটা থালার উপর উবুড় করিয়া রাখিলে চিনির জল এবং বিশুদ্ধ জল পর্দার দ্বারা পরস্পরের বিপরীত দিকে পৃথক ভাবে থাকিবে। চিনির অণু অপেক্ষা জলের অণুগুলি এই পর্দাকে সহজে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কয়েক ঘণ্টা এইভাবে রাখিবার পর দেখা যাইবে, নলের ভিতরে চিনির জলের উপরিভাগের সমতা কিছুটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, পার্চমেণ্টের পর্দার মধ্য দিয়া জল নলের ভিতরে ঢুকিয়াছে। অবশ্য চিনির কিছুটা অণুও জলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। মোটের উপর, উপরের দিকে নলের মধ্যেই জলের ব্যাপন বেশি হইবে। অস্‌মোসিসের জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অসহযোগ আন্দোলন কংগ্রেসের অধীনে মহাত্মা গান্ধী -প্রবর্তিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন।

গান্ধীর অহিংস অসহযোগের মৌলিকতা হইল, ইহাতে হিংসার প্রয়োগ নীতিবিরুদ্ধ— অস্ত্রশক্তির অভাবজনিত নহে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগকালে সংকল্পে অটল থাকিয়া প্রতিপক্ষের হৃদয়কে জয় করাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, ইহা গঠনকেন্দ্রিক হইলেও সংগ্রামের প্রয়োজন স্বীকার করে। তৃতীয়তঃ, অহিংস অসহযোগে শুধু ব্যক্তি নহে, সংঘবদ্ধভাবে জনতা শুদ্ধ বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হইবে। যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইয়া স্বরাজের নিকটবর্তী হইবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত তুর্কীর অধীশ্বর এবং ইসলামের ধর্মগুরুর সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্তে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়। বিদ্রোহকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে গান্ধী খিলাফৎ কনফারেন্সে (নভেম্বর, ১৯১৯ খ্রী) সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের উপদেশ দেন। খিলাফৎ কমিটির ২৮ মে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পত্রে প্রকাশ, ১ আগস্ট, ১৯২০ খ্রী অসহযোগ আরম্ভ হইবার কথা ছিল। পরে খিলাফৎ, রাউলাট আইন (১৩ মার্চ, ১৯১৯ খ্রী), জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রী) ও পাঞ্জাবে দমননীতির প্রতিকার-কল্পে কংগ্রেস কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০খ্রী) ও নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২০ খ্রী) অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের পুনর্গঠন সাধিত হয়।

আন্দোলনের একদিক— চরকা-খদ্দর, মাদকতাবর্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যস্থাপনের দ্বারা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচারশালা প্রত্যাখ্যান, অপর-দিক— খেতাববর্জন, নীতিবিরুদ্ধ আইন অমান্যের দ্বারা সরকারকে দুর্বল ও অচল করা। গঠনকর্মের জন্য তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হয়। সেই অর্থে দেশে হাতে-তৈয়ারি বস্ত্রশিল্পের প্রসার, জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন ও গ্রামে সংস্কার ও সংগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়। নীতিবিরুদ্ধ আইন বা আদেশভঙ্গের ফলে অন্ততঃ ৩০০০০ নরনারী কারাবরণ করেন। দেশে অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়।

আন্দোলনের ফলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারচেষ্টা ও সংগ্রামও প্রবর্তিত হয়। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের আন্দোলন, পাঞ্জাবে গুরুদ্বারের সংস্কার-প্রচেষ্টা ইহারই দৃষ্টান্ত।

অসহযোগ আন্দোলনের সহিত জড়িত কেরলে মোপলা-বিদ্রোহ ও ১৮০০০ মুসলমানের আফগানিস্থানে হিজরত (গমনের) -এর উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

হিংসার আভাস সত্ত্বেও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ আইন অমান্য ও করদান বন্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সিদ্ধান্ত হয়: গুজরাটে বারদৌলি তালুকায় সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। সরকারি রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র ভারতে ষাটটি স্থানে শৃঙ্খলাহীন জনতা হিংসার পথ আশ্রয় করে। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এক ক্রুদ্ধ জনতা গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে। ইহার ফলে কয়েকজন পুলিশ গৃহের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গান্ধী অনুভব করেন যে শুধু জনতা নহে, স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসকর্মীও পরোক্ষভাবে ইহা সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করিয়াছে। তখন তিনি বারদৌলিতে গৃহীত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবের দ্বারা সমবেত আইন অমান্য স্থগিত রাখেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে ও সীমায়িত ক্ষেত্রে অমান্যের আদেশ রহিয়া যায়।

তখন হইতে আন্দোলনের উদ্যম কমিয়া আসে। সংকুচিত হইতে হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিতে থাকে।

বাংলা, বোম্বাই, কেরল, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশে খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগ্রাম শুরু হয়; সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের পর্ব স্থগিত থাকে।

নির্মলকুমার বসু

অসহায় মনুসংহিতার প্রাচীন ভাষ্যকার। সম্ভবতঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন। ইনি কুমারিল ভট্টের পূর্ববর্তী। ইঁহার পূর্ববর্তী মনুসংহিতার আর কোনও ভাষ্যকারের নাম জানা যায় না।

অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪ খ্রী) পিতা সুকুমার হালদার, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন 'অত্যগ্রসর' অনুবর্তী রাখালদাস হালদারের পুত্র; মাতা সুপ্রভা দেবী, মহর্ষির অন্যতমা দুহিতা শরৎকুমারীর কন্যা। আদি নিবাস জগদ্দল, কলিকাতার মহর্ষি-ভবনে জন্ম। কিশোর বয়সেই কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; শিল্পাচার্যের যে ছাত্রগোষ্ঠীর প্রতিভায় 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা'র প্রসার ঘটিয়াছিল— অসিতকুমার তাঁহাদের অন্যতম। অসিতকুমারের ছবির প্রধান গুণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহার 'সৌকুমার্য'; তাঁহার আঁকা চিত্রের কাব্যগুণপ্রাধান্যহেতু বিশিষ্ট শিল্প-রসিক কর্তৃক তিনি 'কালার পোয়েট'-রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। 'রাসলীলা', 'যশোদা ও কৃষ্ণ', 'অগ্নিময়ী সরস্বতী' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত চিত্র। চিরজীবনই তাঁহার শিল্পচর্চা অব্যাহত ছিল, তবে পূর্বোল্লিখিত এবং যৌবনে অঙ্কিত কোনও কোনও ছবিতে তাঁহার যে প্রতিষ্ঠা, তাহার দ্বারাই তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মূর্তিকলাতেও তাঁহার অধিকার ছিল; তাঁহার রেখা-চিত্রও উল্লেখযোগ্য। অভিনয়কলাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত 'ফাল্গুনী' এবং অন্য কোনও কোনও নাটকে তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন।

শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কলাবিভাগে যোগ দেন; শান্তিনিকেতন কলাভবনের যে সকল ছাত্র পরে শিল্পী হিসাবে যশস্বী তাঁহাদের অনেকে প্রথম দিকে তাঁহার নিকট শিক্ষা এবং প্রেরণা লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন; পর-বৎসর লখনৌ সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষপদে বৃত হন ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন; এই বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন; ব্যাবহারিক শিল্পে রুচিসম্মত প্রণালীর প্রয়োগ ও কারুশিল্পের পুনঃপ্রবর্তনে তিনি বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধরচন্দ্র বক্তৃতা 'ভারতের কারু-শিল্প' (১৯৩৯ খ্রী) গ্রন্থে এই বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশের পরিচয় আছে।

শ্রীমতী হেরিংহামের উদ্‌যোগে ১৯০৯-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অজণ্টা গুহাচিত্রের অনুলিপি করিবার যে আয়োজন হয় তাহাতে তিনি নন্দলাল বসুর সতীর্থ ছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে 'অজন্তা' গ্রন্থ (১৩২০ বঙ্গাব্দ) রচনা করেন তাহা অল্পপরিসরে অজণ্টা শিল্পের সহিত অনেক বাঙালী পাঠকের সহজে পরিচয়সাধন করিয়া দিয়াছে। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' বিতর্ক ও আন্দোলনের ফলে মৌখিক ভাষার আসন বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি চলিত ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অনুরূপ গ্রন্থ 'বাগ্‌গুহা ও রামগড়' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ); বাঘগুহাচিত্র ও যোগীমারা গুহাচিত্রের অনুলেখ্য প্রণয়নে (যথাক্রমে ১৯২১ ও ১৯১৪ খ্রী) যে শিল্পী-গণ ব্রতী হইয়াছিলেন অসিতকুমার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

সাহিত্যের নানা বিভাগে অসিতকুমারের ঔৎসুক্য ছিল, তাঁহার বহুসংখ্যক গ্রন্থে তাহার নিদর্শন লিপিবদ্ধ। 'হো-দের গল্প' (১৯১১) যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত তাঁহার 'পাথুরে বাঁদর রামদাস ও কয়েকটি গল্প' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ও অল্পবয়স্কদের উপযোগী কোনও কোনও নাটিকাও উল্লেখযোগ্য। বয়স্কদের জন্যও তিনি নাটিকা লিখিয়াছেন। শিল্পপ্রসঙ্গেও বাংলা ও ইংরেজীতে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদে, যথা 'ঋতুসংহার' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ), 'মেঘদূত' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)।

দ্র অসিতকুমার হালদার, রবিতীর্থে, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ; James H. Cousins, *Asitkumar Haldar*, with annotations on plates by Ordhendra Coomar Gangoly, Calcutta, 1923; P. R. Ramachandra Rao, *Modern Indian Painting*, Madras, 1953; Mukti Mitra, *Asit Kumar Haldar*, Lalit Kala Akademi, 1961; Binod-bihari Mukhopadhyaya, 'Abanindranath and his Tradition', *Lalit Kala Contemporary*, New Delhi, June, 1962.

পুলিনবিহারী সেন

অসিলোগ্রাফ ক্যাথড রে অসিলোগ্রাফ দ্র

অসুর বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই। একটি সুপ্রচলিত মত অনুযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যে অসুর শব্দ মূলতঃ প্রাচীন অস্সুর বা আসিরীয়ার অধিবাসী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থকগণ বলেন যে, বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা আর্যগোষ্ঠীর সহিত মধ্যপ্রাচ্যের অস্সুর সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাহার ফলে অস্সুরদেশীয়গণের বৈদিক যুগের সূচনা হইতেই ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে। অপর কতিপয় পণ্ডিতের মতে অসুর বলিতে ভারতবর্ষের আর্যপূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীবৃন্দকে বুঝিতে হইবে; ইহাদিগকে জয় করিয়াই আর্যভাষীগণ ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আবার কেহ কেহ এই দুইটি মতের সামঞ্জস্য বিধান করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, অস্সুর বা আসিরীয় গোষ্ঠী আর্যগণের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্য হইতে আসিয়া ভারতে বসতি স্থাপন করেন ও পরবর্তী কালে আর্যগণ তাহাদের পরাজিত করিয়াই উত্তর ভারত অধিকার করে। কিন্তু উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তগুলির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ-উল্লিখিত এক কিংবদন্তী অনুসারে অস্সুর-দেশের সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস অতি প্রাচীন কালে একবার জয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলেও সম্ভবতঃ কোনও সত্য নাই।

বৈদিক ও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত অসুর শব্দটির উৎপত্তি সম্প্রতি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও পারস্য অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন পারসীক আর্যগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়া ও শিরদরিয়া নদীদ্বয়ের উপত্যকা অঞ্চলে বাস করিয়াছিল। এই স্থানে বাসকালে ক্রমশঃ তাহাদের একটি বিশিষ্ট জীবনচর্যা ও ধর্ম গড়িয়া উঠে। আর্যগোষ্ঠীর আদিম লোকযাত্রা ও ধর্ম হইতে ইহা বহুলাংশে স্বতন্ত্র ছিল। আদিম আর্য ধর্মের দুই বৈশিষ্ট্য— প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজা ও অগ্নি-উপাসনা। কিন্তু আর্যসভ্যতার পূর্বকথিত নূতন পর্বে আদিম প্রকৃতিপূজার অতিরিক্ত নিরালম্ব, নির্বিষয়, ভাবরূপ এবং নৈতিক স্বভাববিশিষ্ট কতগুলি নূতন দেবতার আরাধনার পত্তন হইল। প্রাচীন প্রাকৃতিক শক্তিরূপী দেবতাগণ 'দেইবো' (প্রাচীন ইন্দো ইওরোপীয়) বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীয়; পরবর্তী সংস্কৃত 'দেব') নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত পার্থক্য সূচিত করিবার জন্যই নূতন আরাধ্যমণ্ডলীর নামকরণ হইয়াছিল 'অসুর'। সম্ভবতঃ প্রাচীন অস্সুর বা আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্য দেবতার নামটি এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হইয়াছিল। অনুমান করা হইয়াছে, ব্যাবিলনের কাস্সুবংশীয় রাজগণের মাধ্যমে সম্ভবতঃ অস্সুর-প্রভাব আর্যধর্মের এই নবপর্বের উপর পড়িয়াছিল। অসুরমণ্ডলীর প্রধান হইলেন বরুণ; প্রাচীন 'দইব' বা 'দেব' -পক্ষের প্রধান রহিলেন ইন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে আর্যগোষ্ঠীও অসুর-উপাসক এবং দেব-উপাসক, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ক্রিস্টেন্‌সেনের মতে যাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জিতরুচি ও চিন্তাশীল এবং যাহাদিগের জীবিকা ছিল মুখ্যতঃ কৃষি ও গোপালন, তাহারাই অসুরপন্থী হইয়াছিল; অপর পক্ষে সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল অনেকাংশে প্রাচীন দেবপন্থা অনুসরণ করিল। উত্তরকালে এই অসুর-উপাসকগণ ইরানে বসতি স্থাপন করে ও দেবপন্থীগণ উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া তথায় ক্রমশঃ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু ইরানে অধিষ্ঠানকারী অসুর-উপাসকগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক দেবপন্থী রহিয়া গেল; তেমনি ভারতে আগত দেববাদীগণের সঙ্গেও অল্পসংখ্যক অসুর-উপাসক আসিয়াছিল। সংস্কৃতিতে, চিন্তাশীলতায় ইহারা দেবোপাসকগণ অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের ছিল। দেবপন্থীগণের সহিত ইহাদের প্রথমে সংঘর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ইহাদের উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি 'দেবোপাসকগণকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করে। এই হেতু আমরা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেমন অসুরগণের নিন্দাবাদ ও অসুরধর্মের উপর কটাক্ষ দেখিতে পাই, অপর পক্ষে সেইরূপ দেবোপাসকগণের প্রধান আরাধ্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণকে অসুর উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশে অসুর শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক শুভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অসুর-পন্থীগণ যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। মায়া বা ইন্দ্রজালশক্তি বিশেষভাবে অসুরপন্থীগণের আয়ত্ত, এই ধারণা বৈদিক যুগেও ছিল। পরবর্তী মহাকাব্য-পুরাণাদিতে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। স্থাপত্যবিদ্যাতে ইহাদের অসাধারণ পারদর্শিতার কাহিনী সুবিদিত ও এই প্রসঙ্গে ময়াসুর বা ময়দানবের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেবপন্থী

ও অসুরপন্থীগণের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মৃতি বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতীয় ঐতিহ্যে স্পষ্টতর। পৌরাণিক দেবাসুরের বিরোধকাহিনী ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংখ্যা-গুরু দেবপন্থীগণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও মুষ্টিমেয় অসুর-পন্থীর ক্রম-অবলুপ্তির ফলেই সম্ভবতঃ বিরোধ ও সংঘর্ষের চিত্রটি এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনোযোগ-পূর্বক অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক, 'অসুর' নামক একটি ক্ষুদ্র আদিবাসীগোষ্ঠী বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলস্থ নেতারহাট অধিত্যকায় বর্তমানে বাস করে। ইহারা আবার তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা, বীর অসুর, বিরজিয়া ও আগারিয়া। ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহারা পুরুষানুক্রমে লৌহের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চল হইতে খনিজ লৌহ সংগ্রহ করিয়া ও নিজস্ব পদ্ধতিতে তাহা গলাইয়া তাহা হইতে ইহারা নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত লৌহ গলাইবার এই আদিম পদ্ধতি ও ইহাদের নিজস্ব লৌহশিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কালের কোনও কোনও পণ্ডিত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ছোটনাগপুর অঞ্চলের এই আদিবাসী অসুরগোষ্ঠী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত অসুরপন্থীগণের বংশধর। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই।

দ্র R. C. Majumdar ed. *The History and Culture of the Indian People*, vol. I, London, 1951 ; V.K. Rajwade's article 'Asura' in the *Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference*, vol. II, Poona, 1922 ; A. P. Banerjee Sastri, *Asura India*, Patna, 1926 ; K. K. Leuva, *The Asur*, New Delhi, 1963.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

অস্ট্রিক অষ্ট্রিক বর্গের বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন—অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রোনেশীয়। ভারতবর্ষে যে সব অষ্ট্রিক ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলি অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার অন্তর্গত। অস্ট্রোনেশীয় শাখার ভাষাগুলি মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, সামোয়া-তাহিতি-হাওয়াই-ফিজিপ্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মাদাগাস্কারে প্রচলিত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার দুইটি উপশাখা রহিয়াছে— মুণ্ডা বা কোল ভাষাগোষ্ঠী এবং মোন্-খ্‌মের ভাষাগোষ্ঠী। বিহারে ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যায় এবং মধ্য প্রদেশেই প্রধানতঃ মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ভাষা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো কোরওয়া প্রভৃতি ভাষা-গুলির সাদৃশ্য খুবই বেশি – গ্রীয়ার্সন এগুলিকে 'খেরওয়ারী' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন; খেরওয়ারী ভাষাগুলি প্রধানতঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচলিত। মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে খড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদবা এবং কুরকু উল্লেখযোগ্য— খড়িয়া ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায়, জুয়াং, শবর ও গদবা উড়িষ্যায়, কুরকু মধ্য প্রদেশে প্রচলিত। মোন্-খ্‌মের গোষ্ঠীর ভাষাগুলি ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন এবং ভারতবর্ষে আসাম ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বলা হয়; আসামের খাসিয়া বা খাসী ভাষা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভাষা মোন্-খ্‌মের ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

হিমালয় অঞ্চলে ভোটবর্মী ভাষাগোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষা ও উপভাষা আছে যাহাদের গঠনরীতির সহিত অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডা বা কোল ভাষাগুলির গঠনরীতির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; এই কারণে গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন যে, হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিতা এই সব ভাষ ও উপভাষাতে প্রাচীন মুণ্ডা বা কোল ভাষার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা হইতে তাঁহারা অনুমান করেন যে অষ্ট্রিক ভাষা অতীতে একসময় হিমালয় অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। আলোচ্য ভাষা ও উপভাষাগুলিতে মুণ্ডা বা কোল ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপ: ১. অবরুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি। ২. তিনটি বচন— একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। ৩. উত্তম পুরুষের দ্বিবচন আর বহুবচনের দুইটি করিয়া রূপ অর্থাৎ 'আমি ও তুমি', 'আমি ও সে', 'আমি ও তোমরা', 'আমি ও তাহারা' বুঝাইতে ভিন্ন ভিন্ন সর্বনামপদের ব্যবহার। ৪ ক্রিয়াপদের রূপে কর্তা ও কর্মের নির্দেশক সর্বনামস্থানীয় বা সর্বনামজাত পদের উপস্থিতি। ৫. কখনও কখনও ধাতুকে দ্বিত্ব করিয়া ক্রিয়া-প্রাতিপদিক গঠন। ৬. 'কুড়ি' সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া উচ্চতর সংখ্যার গণনা।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, বিশেষ করিয়া ৫র্থ বৈশিষ্ট্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

মুণ্ডা বা কোল ভাষার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত হিমালয়-অঞ্চলের ভাষাগুলি দার্জিলিং হইতে শুরু করিয়া নেপালের মধ্য দিয়া কানওয়ার, কুলু, লাহুল, কাংড়া, চম্বা প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। গ্রীয়ার্সন এই ভাষা-

গুলিকে পূর্বী ও পশ্চিমী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ধীমাল, থামী, লিম্বু, য়াখা, খম্বু, রাই বা জিমদার, বায়ু প্রভৃতি ভাষাগুলি পূর্বীশ্রেণীর অন্তর্গত; আর পশ্চিমী-শ্রেণীর অন্তর্গত হইল, মঞ্চাটী, চম্বা, লাহুলী, কনাশী, কনৌরী বা কনওয়ারী, রাংকাস, ডরমিয়া, চৌদাংসী, ব্যাংসী প্রভৃতি ভাষাগুলি। পশ্চিমীশ্রেণীর অন্তর্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে সিমলার উত্তর-পূর্বে প্রচলিত কনৌরী বা কনওয়ারী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং এই ভাষা লইয়া কিছুটা চর্চাও হইয়াছে; মুণ্ডা বা কোল ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ইহার মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান।

হিমালয় অঞ্চলে ভোটবর্মী গোষ্ঠীর আরও কতগুলি ভাষা আছে, যেমন, গুরুং, মুরমী, সুনওয়ার, নেওয়ারী, লেপচা প্রভৃতি; এইগুলির মধ্যেও মুণ্ডা বা কোল ভাষার প্রভাব কোনও একদিন বিদ্যমান ছিল বলিয়া গ্রীয়ার্সন অনুমান করেন; তিনি মনে করেন যে, মুণ্ডা বা কোল ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি কালক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গর্ডন বোল্‌স্ এই অঞ্চলে গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাষাগত ব্যাপারে অস্ট্রিক প্রভাব সূচিত হইলেও এই স্থানের অধিবাসীদের সহিত খেরওয়ারী জাতিবৃন্দের কোনও মিল নাই। আচার-অনুষ্ঠান, অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ বর্তমান কালে পাওয়া যায় না।

দীপংকর দাশগুপ্ত

অস্ট্রিকভাষীর সংখ্যা কম নয়। অনেকে আবার দুইটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারে। বিহার প্রদেশের মুণ্ডারা যাহারা অস্ট্রিক ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের অনেকে স্থানীয় হিন্দী বলিতে পারে। পশ্চিম-বাংলার সাঁওতালদের অনেকে বাংলা ভাষা বলিতে বা লিখিতে পারে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়াদের স্বীয় ভাষায় অনেক রূপকথা, উপকথা বা লোকগাথা প্রচলিত রহিয়াছে। বর্তমান কালে সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার ফলে ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারণ ও শিল্পকরণের জন্য এই সকল অস্ট্রিকভাষী উপজাতিগুলি ক্রমশঃ আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছে।

আর্যপ্রভাব বিস্তারের ফলে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের ভাষার বহু শব্দ হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় স্থান পাইয়াছে। অনেক উপজাতির মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা ব্যবহৃত হইলেও তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান, সমাজের গঠন এবং শারীরিক লক্ষণের মধ্যে অনেক তারতম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আসাম অঞ্চলের খাসিয়াদের কথা ধরা যাইতে পারে। তাহারা মঙ্গোল জাতির (রেস) অন্তর্ভুক্ত। দেহে লোম অতি অল্প এবং মাথার চুল সোজা। খাসিয়াদের সমাজে গৃহকর্ত্রীর কন্যারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং গৃহকর্ত্রীর নাম ও গোত্র পাইয়া থাকে। ইহারা কৃষিজীবী। বাংলা বা বিহারের সাঁওতাল জাতি কৃষি-জীবী, কিন্তু ইহাদের সমাজে পুরুষেরা সম্পত্তির মালিক হয় ও পুত্র-পৌত্রাদি পিতামহের গোত্র বা কুল-নাম পায়। আকৃতিগত ব্যাপারে খাসিয়াদের সহিত ইহাদের মিল নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নিকোবরীয়গণের দেহে কিঞ্চিৎ নিগ্রোবটু (নিগ্রিটো) প্রভাব রহিয়াছে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

অস্ট্রেলিয়া ১১৪° পূর্ব হইতে ১৫৪° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ১০° দক্ষিণ হইতে ৪৪° দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাদেশটি পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ভূখণ্ড। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর -বেষ্টিত এবং মকরক্রান্তির দ্বারা প্রায় সমভাবে দ্বিখণ্ডিত এই ভূভাগের ৩৮% অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫৪ মিলিমিটারের (১০ ইঞ্চি) এবং আরও ৩১% অঞ্চলে ২৫৪ হইতে ৫০৮ মিলিমিটারের (১০-২০ ইঞ্চি) মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশের অন্তর্ভাগে দৈনিক উত্তাপের পার্থক্য যথেষ্ট হইলেও সমগ্র মহাদেশটিতে শীত ও গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের পার্থক্য সাধারণতঃ ১০° সেন্টিগ্রেডের (২০° ফারেনহাইট) বেশি নহে, অর্থাৎ শীতকাল প্রখর নহে। উত্তর ক্রান্তীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে এবং দক্ষিণে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম ভাগ শুষ্ক ও প্রায় মরুভূমিতুল্য এবং পূর্ব ভাগ অত্যন্ত আর্দ্র। সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে প্রাপ্ত গড় বৃষ্টিপাতের অঙ্কটির কোনও ব্যাবহারিক মূল্য নাই, কারণ এ দেশের বৃষ্টিপাত নিতান্তই অনিশ্চিত। চাষীকে সর্বদাই অনাবৃষ্টি বা অতি-বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

নবীন ভঙ্গিল পর্বত, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, সচল হিমবাহ ও সুবৃহৎ নদী-উপত্যকার অনুপস্থিতিই ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ অঞ্চলই বৈচিত্র্যহীন বিস্তৃত মালভূমি অথবা সমতলভূমির দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ নদী স্রোতো-হীন। কেবল পূর্বপ্রান্তের নদীগুলিতে, প্রধানতঃ অধিক বর্ষণের ফলে, সংবৎসর জল থাকে; ফলে তাহাদের ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবন-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি। এই অঞ্চলের স্তরীভূত শিলারাশি প্রাচীন ভূ-আলোড়নের ফলে

কুঞ্চিত, ভগ্ন, বহু প্রকার চ্যুতি-সংকুল এবং স্থানে স্থানে প্রাচীন আগ্নেয়শিলার দ্বারা আবৃত। এই সকল কারণে পূর্বাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর ও গিরিখাত-সংকুল এবং হ্রস্ব ও খরস্রোতা নদীতে পূর্ণ। ইহা গ্রেট্ ডিভাইডিং রেঞ্জ নামে পরিচিত, যদিও ইহার অধিকাংশ, এমন কি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোসিউস্কো (২২২৭ মিটার বা ৭৩০৮ ফুট) মালভূমির তুল্য। পূর্ব উপকূল হইতে পর্বতের আকৃতি স্পষ্ট দেখা গেলেও, পশ্চিম দিকে উহা অতি ধীরে ঢালু হইয়া মহাদেশের অন্তর্ভাগের সমতলভূমির সহিত মিশিয়াছে। উত্তরে ইয়র্ক অন্তরীপ হইতে দক্ষিণে বাস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই পার্বত্য অঞ্চলটির সর্বাধিক প্রস্থ মাত্র ৬৪৪ কিলোমিটার (৪০০ মাইল)। দক্ষিণের টাসমানিয়া দ্বীপটি ভূগঠনের বৈশিষ্ট্যে এই পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন খণ্ডমাত্র।

গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে এক বিস্তৃত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সমতলভূমির মত। উত্তরে কার্পেন্টারিয়া উপসাগর হইতে দক্ষিণে এন্‌কাউণ্টার উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই মধ্যদেশীয় সমভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৪৪ মিটার (৮০০ ফুট)। ভূ-আলোড়নের ফলে ইহার কিছু কিছু অংশ বসিয়া গিয়া স্থানীয় জলবিভাজিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রে এবং স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যে এই সমতলভূমি তিনটি খণ্ডে বিভাজ্য। সর্বদক্ষিণে মারে ও তাহার উপনদী ডার্লিং -বিধৌত অঞ্চল অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মারে নদী তুষারপুষ্ট। সেইজন্য ইহা হইতে সেচের জল পাওয়ার সুবিধা আছে। সর্বোত্তরে কার্পেন্টারিয়া উপসাগরের তীরে দ্বিতীয় অঞ্চলটি অবস্থিত। ইহা মিচেল, গ্রেগরি, গিলবার্ট ইত্যাদি নদীর দ্বারা বিধৌত। নদীগুলি ছোট; ইহাদের জলও সংবৎসর থাকে না। ইহাদের মধ্য ভাগে অবস্থিত আয়ার হ্রদ অঞ্চল, ভৌগোলিক গুণে নিতান্তই মহাদেশীয়। কুপার, ডাইয়ামন্টীনা, জর্জিনা প্রভৃতি নদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত আয়ার, গ্রেগরি, ব্লাঙ্ক, কালাবোনা, ফ্রোম প্রভৃতি হ্রদে মিশিয়াছে। কিন্তু শুধুই বর্ষার জলে পুষ্ট এই নদীগুলির ক্ষীণ স্রোত ক্বচিৎ ঐ সব হ্রদে পৌছায়। অত্যধিক বাষ্পীভবনের ফলে হ্রদগুলির জল লবণাক্ত এবং বহু ক্ষেত্রেই গুঁড়া লবণের আস্তরণে ঢাকা থাকে।

মধ্যদেশীয় সমতল অঞ্চলের পশ্চিমে, অর্থাৎ মহাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের, ভূ-প্রকৃতি মালভূমির সদৃশ। গড় উচ্চতা ৩০৪ মিটার (১০০০ ফুট) হইলেও এই বৈচিত্র্যহীন অঞ্চলে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১৫২৪ মিটার (৫০০০ ফুট) -এরও অধিক। অতি প্রাচীন শিলাগঠিত মালভূমি অঞ্চল বহু খনিজ পদার্থে পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে রুপা, সীসা ও দস্তা; সোনা ও তামা; ইউরেনিয়াম; লোহা, টিন ও অ্যাজবেস্টস্ প্রধান। অত্যধিক বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাতের অল্পতার জন্য সংবৎসর জল থাকে এমন নদী নাই বলিলেই চলে। মরুপ্রায় এই অঞ্চলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ্রদগুলি বহু ক্ষেত্রে শুকাইয়া গিয়া জিপসাম ও লবণ সংগ্রহের সুযোগ দিয়াছে। এই অঞ্চলটি সমুদ্রতীরে চ্যুতির সৃষ্টি করিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার আর্টেজীয় কূপ পৃথিবীবিখ্যাত। এইরূপ ভৌম জলের চাপ এত অধিক হয় যে, বহু সময়েই পাম্প ছাড়া আপনা হইতেই জল ভূপৃষ্ঠে উঠিয়া আসে। এইজন্য মহাদেশের অন্তর্ভাগে জলের অভাব অনেকাংশে পূরণ হইয়াছে। এই ভৌম জল নানাবিধ খনিজ পদার্থে পূর্ণ বলিয়া কৃষিকার্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। সাধারণতঃ ইহা পশুচারণের তৃণক্ষেত্রে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রায় সমগ্র মধ্যদেশীয় সমতল অঞ্চলে, গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমভাগে ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের সমুদ্রতীরে বিচ্ছিন্নভাবে এইরূপ ভৌম জলধারা সহজলভ্য।

মহাদেশের প্রধান গাছ ইউক্যালিপ্টাস। স্থানীয় জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে প্রায় ছয় শত বিভিন্ন প্রকারের ইউক্যালিপ্টাস গাছ দেখা যায়। পর্ণমোচনের পরিবর্তে ইহারা বল্কল ত্যাগ করে। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে ইহারা দীর্ঘ ও সরল, যেমন সিডনি ব্লুগাম (*eucalyptus salignum*) ও কারি (*eucalyptus diversicolor*); কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে খর্ব ও পাকানো, যেমন মালী। দীর্ঘ বৃক্ষের বন প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সীমাবদ্ধ। উত্তর ও পূর্ব উপকূলের বনে ইউক্যালিপ্টাসের পরিবর্তে তাল জাতীয় গাছ, অ্যাশ, সিডার ও বীচ গাছ পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে কাউরি পাইন, হুপ পাইন এবং হুয়ন পাইন জন্মে। দেশাভ্যন্তরে বনের পরিবর্তে বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রই প্রধান। এই সব ঘাস ৬ হইতে ৯ ডেসিমিটার (২-৩ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়, যেমন মিচেল (*astrebla spp.*), ফ্লিণ্ডার্স (*iscilema spp.*); ওয়ালাবি (*danthonia spp.*) ইত্যাদি। এই সব তৃণক্ষেত্রে খর্বাকৃতি ইউক্যালিপ্টাস গাছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জন্মে। মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলে মুল্‌গা (*acacia aneura*) জাতীয় কাঁটাঝোপ প্রধান।

অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় অস্ট্রেলিয়াতে স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা কম, অপর পক্ষে পাখি ও মাছের সংখ্যা অনেক বেশি। বহু যুগ ধরিয়া অন্যান্য স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ইহা বিচিত্র জীব-জন্তুতে

পূর্ণ। অণ্ডজ অথচ স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে প্লাটিপাস ও একিনা প্রধান। ইহা ছাড়া আর-এক প্রকার জীব আছে যাহাদের পেটের বাহিরের দিকে শিশুসন্তান বহন করিবার জন্য থলি থাকে। তাহাদের মধ্যে ক্যাঙারু, ওয়ালাবি, নানা প্রকার বিড়াল ও ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, অপোসাম এবং কোয়ালা (ভালুক) প্রধান। মাংসাশী জন্তু বলিতে কেবল ডিঙ্গো (কুকুর)। সরীসৃপের মধ্যে কুমির, কচ্ছপ, কাছিম, নানাপ্রকার গিরগিটি ও সাপ এবং বড় পাখির মধ্যে এমু, কাসোয়ারি, ব্রোলগা, জাবিরু ও ঈগল উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার পাখিদের সম্পূর্ণ নাম-তালিকা না দিলেও লায়ার, কাকাতুয়া ও সারসের নাম অবশ্যই করিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে এই মহাদেশটি ইওরোপবাসীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে টরেস নিউগিনির দক্ষিণের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন, যদিও তিনি সে সময়ে মূল মহাদেশের অস্তিত্ব জানিতে পারেন নাই। পরবর্তী-কালে ওলন্দাজ নাবিকেরা কার্পেন্টারিয়া উপসাগর-কূল আবিষ্কার করেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবেল টাসমান সমগ্র মহাদেশটিকে বেষ্টন করিয়া সমুদ্রপথে ঘুরিয়া আসেন এবং টাসমানিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি পূর্ব উপকূলে যাইতে পারেন নাই। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক সর্বপ্রথম এই মহাদেশের পূর্ণ অবয়ব সম্বন্ধে অবহিত হন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে এই মহাদেশ জনহীন ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ নৃতত্ত্বের বিচারে সিংহলের ভেড্ডাদের মত। ইহাদের গড় উচ্চতা ১৬৮ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি), চর্মের রং গাঢ় বাদামী, চুল কোঁকড়ানো, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত ও দেহ লোমশ, ভ্রূ-যুগল ঘন এবং চোয়ালের হাড় মুখের কাছে উঁচু কিন্তু চিবুক দুর্বল। হাত ও পায়ের হাড় সরু কিন্তু মাথার খুলি খুব মোটা। ইতিহাসের কোন্ সময়ে ইহারা এই মহাদেশে আসে তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে প্রত্নতত্ত্বের বিচারে ইহাদের আগমন কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া হয় এবং সম্ভবতঃ বিনা বাধায় ইহারা ধীরে ধীরে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই আদিম অধিবাসীরা খাদ্য উৎপাদন করে না, শিকার বা অন্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহারা কৃষি ও ধাতুর ব্যবহার জানিত না। ১০০ হইতে ১৫০০ জন লোক লইয়া এক-একটি গোষ্ঠী খাদ্যসংগ্রহের তাগিদে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। ফলে স্থায়ী বসতির সুযোগ ছিল না। অস্ত্র ও যন্ত্রাদি নির্মাণের কুশলতা বা সমাজব্যবস্থার জটিলতা অনুধাবন করিলে বলা চলে যে জাতি হিসাবে ইহারা সাধারণ ইওরোপীয়দের অপেক্ষা বুদ্ধিতে কম নহে। অস্ট্রেলিয়ার ঊষর ভূমিতে জীবনধারণের জন্য ইহাদের সমাজব্যবস্থা ও অস্ত্রাদি যথেষ্ট সূক্ষ্ম ছিল, যদিও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানায় ইহারা ঔপনিবেশিকদের হাতে পরাজিত হয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ইহাদের মোট সংখ্যা আনুমানিক ৩০০০০০ ছিল। বর্তমানে উহা মাত্র ৭৫০০০ এবং তাহার মধ্যে টাসমানিয়া দ্বীপের ৩০০০০ বর্ণসংকর আদিম অধিবাসী ইওরোপীয়দের হাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উপনিবেশগুলি কয়েদিদের জন্য স্থাপিত হয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপ প্রথম বসতি স্থাপন করেন পোর্ট জ্যাকসনে (বর্তমান সিডনি)। সেই সময়ে প্রথম গমের চাষ হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মেরিনো ভেড়া আমদানি করা হয়। অন্যান্য কয়েদি-বসতি স্থাপিত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে টাসমানিয়া দ্বীপে ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুইন্সল্যাণ্ডে। কিন্তু ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে যাহারা বসতি স্থাপন করে তাহারা কেহ কয়েদি ছিল না, স্বেচ্ছায় তাহারা আসে। এইরূপ স্বেচ্ছায় আগমনকারী ঔপনিবেশিকরা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ও মেলবোর্ন-এ এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এডিলেড্-এ বসতি স্থাপন করে। তাহারা কয়েদি-বসতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব অঞ্চলে এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেশের সর্বত্র কয়েদিদের বসতি স্থাপন বন্ধ করা হয়।

প্রথম দিকের উপনিবেশগুলি সমুদ্র উপকূলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন চার্লস্ স্টুয়ার্ট সর্বপ্রথম গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ অতিক্রম করিয়া মারে ও ডার্লিং নদী আবিষ্কার করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সোনার খনি আবিষ্কারের পর দেশাভ্যন্তরে জনসমাগম বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মহাদেশের সমস্ত অঞ্চলই এই সব ঔপনিবেশিকদের পরিচিত হয়। সেই সময়ে সমগ্র মহাদেশটি ৬টি (নিউ সাউথ ওয়েলস্, টাসমানিয়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া) স্বয়ংশাসিত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া ফেডারেল রাজ্য 'কমন-ওয়েলথ্ অফ অস্ট্রেলিয়া' গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ক্যান্‌বেরা হইতে পরিচালিত হয়। নর্দার্ন টেরিটরি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত।

আদিম উপজাতি ছাড়া অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বর্তমান

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য ও নগর

রাজ্য	আয়তন ••• বর্গকিলোমিটার/ ••• বর্গমাইল	জনসংখ্যা (•••)	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা (•••)	নগরের প্রধান বৈশিষ্ট্য
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	৮০০/৩০৯	৩৬৬০	সিডনি	১৮৬৫	রাজধানী, মহাদেশের বৃহত্তম নগর ও বন্দর; শিল্পকেন্দ্র; পশম, গম, কয়লা, সীসা ও মাখন রপ্তানি করে।
			নিউক্যাসল	১৭৮	বন্দর; কয়লাখনি ও শিল্পকেন্দ্র।
ভিক্টোরিয়া	২২৮/৮৮	২৭০০	মেলবোর্ন	১৫২৫	রাজধানী; যাত্রীবাহী বন্দর; গম, পশম, মাখন, মাংস ও মদ রপ্তানি করে। পশম, বস্ত্র-বয়ন ও খনিজ তৈল পরিশোধনের কারখানা আছে।
			গীলং	৭২	রাজ্যের দ্বিতীয় বন্দর; পশম-বস্ত্র, কৃষিযন্ত্রাদি ও মোটর-গাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে; কৃষিজাত দ্রব্য ও পশম রপ্তানি করে।
কুইন্‌সল্যাণ্ড	১৭৩৫/৬৭০	১৪০১	ব্রিসবেন	৫০২	রাজধানী ও প্রধান বন্দর; পশম, মাংস, তামা ও টিন রপ্তানি করে।
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	৯৮৪/৩৮০	৪৪৬	এডিলেড	৫০০	রাজধানী ও প্রধান বন্দর; কৃষিযন্ত্রাদি ও মোটর-গাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে; গম, পশম এবং মদ রপ্তানি করে।
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	২৫২৮/৯৭৬	৭০০	পার্থ্‌	৩৪৯	রাজধানী ও বন্দর; গম, পশম ও সোনা রপ্তানি করে।
টাসমানিয়া	৬৭/২৬	৩৪০	হোবার্ট	৯৫	রাজধানী ও প্রধান বন্দর; লৌহ, বয়ন ও কাগজশিল্প কেন্দ্র; ফল, পশম, চামড়া, কাঠ ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ রপ্তানি করে।
			লন্‌সেস্টন	৫০	শিল্পকেন্দ্র।
নর্দার্ন টেরিটরি ও	১৩৫৭/৫২৪	৫৭	ক্যানবেরা	৩১	কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী।
ক্যানবেরা			ডারউইন	৭·৮	নর্দার্ন টেরিটরির রাজধানী ও বিমানপথের বিশিষ্ট কেন্দ্র।

অধিবাসীরা ইওরোপ হইতে আগত। 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া' নীতির জন্য যাহারা শ্বেতাঙ্গ নহে তাহারা এই মহাদেশে থাকিতে পারে না। মহাদেশের গত ১০০ বৎসরে জনসংখ্যার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :

১৮৬০	১১ ৪৬ ০০০
১৮৮০	২২ ৩২ ০০০
১৯০০	৩৭ ৬৫ ০০০
১৯২০	৫৪ ১১ ০০০
১৯৪০	৭০ ৬৯ ০০০
১৯৫৭	৯২ ০০ ০০০ (আনুমানিক)

মহাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি ও পশুচারণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ অধিবাসীদের ৭০% শহরে থাকে। শহরগুলির অধিকাংশ উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে একজন লোকের বসতি।

মহাদেশের খনিজ সম্পদ, বিশেষ করিয়া কয়লাখনিগুলি, প্রধানতঃ উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত। খনিজ সম্পদের দিক হইতে পূর্ব উপকূল বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। স্থানীয় কয়লা, আমদানিকৃত খনিজ তৈল ও স্থানীয় জলবিদ্যুৎ শিল্পাঞ্চলের শক্তির চাহিদা মেটায়। প্রধানতঃ জলের অভাবের জন্যই কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ কম। সেচব্যবস্থাধীন অঞ্চলের শতকরা ৬৫ ভাগই পশুচারণের জন্য ব্যবহৃত।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সূত্রে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ কুইন্‌সল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে মূলতঃ পশমের জন্য মেষপালন করা হয়। ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌স রাজ্যের আর্দ্র নদী-উপত্যকা অঞ্চলে প্রধানতঃ মাংস সংগ্রহের জন্য মেষপালন করা হয়। মাংস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গোপালন প্রধানতঃ মধ্যদেশীয় সমভূমির ক্রান্তীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। আর পূর্ব উপকূলে প্রধানতঃ দুগ্ধ দোহনের জন্য গোপালন করা হয়। বিনা সেচে ফলের চাষ পশ্চিম ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়াতে ব্যাপকভাবে করা হয়। কিন্তু সেচব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাপকভাবে গমের চাষ হয় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। আবাদী চাষব্যবস্থা (প্রধানতঃ আখ) উত্তর অস্ট্রেলিয়া (নর্দার্ন টেরিটরি) ও কুইন্‌সল্যাণ্ডে সীমাবদ্ধ। শহরগুলিতে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষি ও পশুচারণ -অঞ্চলের শহরগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই খ্যাত। ইহা ছাড়া খনি অঞ্চলে বহু শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

রপ্তানি-বাণিজ্যের দিক হইতে পশম, মাংস, গম, ফল, চিনি, সীসা, মাখন, ময়দা, চামড়া ও খনিজ দ্রব্য এবং আমদানি-বাণিজ্যের দিক হইতে খনিজ তৈল, মোটর গাড়ি, বস্ত্রাদি, যন্ত্রাদি, চা ও তামাক প্রধান। ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও নিউজিল্যাণ্ড প্রধান আমদানিকারক দেশ। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানী, কানাডা ও ভারত প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।

যদিও প্রতিটি বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রেলপথ বিদ্যমান, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে পরিবহনের কাজ প্রধানতঃ জলপথেই সাধিত হয়। রেলপথগুলি বিভিন্ন মাপের। সেই কারণেই বাণিজ্যের জন্য জলপথ ও দ্রুত যাত্রীবহনের জন্য বিমানপথ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোকবিশিষ্ট নগর ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীগুলির বৃত্তান্ত ১৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। লোকসংখ্যার হিসাব ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা নির্দেশ করিতেছে।

দ্র *Atlas of Australian Resources*, Department of National Development, Division of Regional Development, Canberra, 1957 ; *The Australian Encyclopaedia*, Sydney, 1938 ; S. M. Wadham and G. L. Wood, *Land Utilisation in Australia*, Melbourne, 1950 ; K. W. Robinson, *Australia, New Zealand and S. W. Pacific*, London, 1960.

সত্যেশ চক্রবর্তী

অস্তিবাদ (এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিজ্‌ম) অস্তিত্বধারণার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কালের অন্যতম দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সাধারণভাবে 'অস্তিবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। চিরাচরিত ইওরোপীয় দর্শনে যুক্তিমূলক বিচারের যে প্রাধান্য ছিল, অস্তিবাদ তাহার বিরুদ্ধে এক নূতন জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হইল। সেই জিজ্ঞাসাকে 'সত্তাজিজ্ঞাসা' বলিয়া বর্ণনা করা যায়। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইওরোপের কয়েকজন দার্শনিকের আলোচনায় এই সত্তাজিজ্ঞাসার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। মূর্ত সৎ-এর স্বীকৃতিতে অস্তিবাদী চিন্তার বিশিষ্ট ধারার সূচনা। শুধু বিমূর্ত চিন্তনের দ্বারা গ্রাহ্য যে সৎ তাহা হইতে পৃথক করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত হইল শুদ্ধ অস্তিত্ব বা শুদ্ধ সত্তার (এক্সিসটেনৎস্‌) ধারণা। ইহা সৎ-বস্তুর আশ্রয়ী অন্যতম গুণমাত্র নহে ; ইহা নিজে স্বতন্ত্র বস্তু, যদিও আর

অস্তিবাদ

দশটি বস্তু হইতেও উহা একান্ত পৃথক। উহার স্থান জ্ঞাতা বা বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিষয়জগতে নহে, বরং ব্যক্তিসত্তার একান্ত আন্তর স্বরূপেই ইহার পরিচয়।

অস্তিবাদী দর্শনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল: ১. সত্তার বিষয়ে, বিশেষতঃ মানবিক সত্তার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা উত্থাপন। ২. সত্তাজিজ্ঞাসায় বহিরঙ্গ বিচার অপেক্ষা অন্তরঙ্গ একাত্মতার উপর প্রাধান্য স্থাপন। সৎ-এর স্বরূপ কি, অস্তিত্বের তথা মানবিক অস্তিত্বের স্বরূপ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের শুধু যুক্তিনিষ্ঠ সমাধান সম্ভব নহে। অস্তিবাদী দর্শনে অস্তিত্বের ধারণা একমাত্র মানবিক সত্তার দ্বারাই নির্দেশিত এবং মানুষের অন্তরতম সারবস্তুতেই তাহার পরিচয় নিহিত, জ্ঞানের আধেয় হিসাবে উহা প্রদত্ত হইতে পারে না। অস্তিত্ববান পদার্থের (হাইডেগারের ভাষায় ডাজাইন্) মূলস্বরূপ এই শুদ্ধ অস্তিত্ব ব্যক্তিমানসে বিশেষভাবে উপস্থিত হয়। সুতীব্র আন্তর চেতনার মধ্য দিয়াই ব্যক্তি সত্তা-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। তাই, অস্তিত্বের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব, এই প্রশ্নের সন্ধানেই ইহার স্বরূপবিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা মিলিতে পারে। যুক্তিমার্গের অস্বীকৃতি এবং অতিযৌক্তিক (ইর্‌র‍্যাশন্যাল) স্বীকৃতিতেই অস্তিবাদীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই অতিযৌক্তিকতা ব্যক্তির কৃতিশক্তির (উইল্) মধ্য দিয়া পরিস্ফুট। আমাদের স্বভাবে বুদ্ধি ছাড়াও কৃতি বা প্রযত্নের দিক রহিয়াছে। নীতির পথ মূলতঃ এই কৃতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভূত। অস্তিত্বকে যাঁহারা মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, কৃতিশক্তির পথটিই তাঁহাদের নিকট গ্রহণীয়। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ নীতিমূলক, বুদ্ধি-মূলক নহে।

অস্তিবাদী দর্শনের পথিকৃৎ ডেনদেশীয় সোরেন কীর্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রী) বিমূর্ত বুদ্ধিতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়া নীতির ও ধর্মের স্তরে যে মূর্ত সৎ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, তাহারই প্রাধান্য ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন হেগেলীয় বুদ্ধিবাদী দর্শনের তীব্র সমালোচক, কারণ তাহাতে মূর্ত অস্তিত্বের স্থান নাই। চিন্তনধর্মী যুক্তিবদ্ধ বিমূর্ত চেতনার পরিবর্তে ব্যক্তির নৈতিক চেতনায় নিহিত ক্রিয়াত্মক অন্তর্মুখতার উপর কীর্কেগার্ড গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে ব্যক্তি কেবল নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা নহে; সক্রিয় 'হওয়া'তেই ব্যক্তির প্রকৃত আগ্রহ নিহিত আছে। 'বিষয়িতা' (সাবজেক্‌টিভিটি)-ই সত্য; ঈশ্বরের সাযুজ্যে সত্যকারের অস্তিত্ববান হওয়াতেই মানুষের প্রকৃত সার্থকতা। কীর্কেগার্ডের প্রায় সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক নীৎশে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রী) ভিন্নতর পথে অস্তিবাদী জীবনদর্শনের মূলসূত্র প্রচার করেন। খ্রীষ্টধর্ম ও -নীতির তীব্র সমালোচক নীৎশে মানবের একান্ত মহিমার দিকে তদানীন্তন ইওরোপীয় মানসের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনিও শুদ্ধ যুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন।

অস্তিত্বের এই দ্বিধাহীন স্বীকৃতির সূত্র অবলম্বন করিয়া বিংশ শতাব্দীতে একাধিক ইওরোপীয় দার্শনিক তাঁহাদের স্বকীয় চিন্তাধারার অবতারণা করিয়াছেন। কীর্কেগার্ডকে অনুসরণ করিয়া ইঁহারাও স্বীকার করিলেন, ব্যক্তিমানবের যথার্থ স্বরূপ তাহার একান্ত আন্তর সত্তায় নিহিত, আর তাহাই অস্তিত্বকে সূচিত করে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিষয়াভিমুখী দৃষ্টিতে এই অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। অন্তর্মুখী আত্মচেতনার মধ্য দিয়াই উহার উপলব্ধি ঘটে। সেই আত্মচেতনার রূপ পরিস্ফুট হয় নিবিড় চিত্তসংক্ষোভের মধ্য দিয়া। ব্যক্তির আন্তর জীবনে নানা ভাবে যে সংকট-ময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহারই মধ্য দিয়া জগতে লিপ্ত সত্তা-বিচ্যুত মানবের অন্তর্মুখতা জাগ্রত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইওরোপে অস্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা জার্মানীর মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯ খ্রী) সৎ 'জাইন'-এর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া প্রধানতঃ মানবিক সত্তার 'ডাজাইন' স্বরূপের বিশ্লেষণে নিরত হইয়াছেন। বিষয়গত প্রত্যক্ষগম্য বস্তু হইতে অস্তিত্ববান এই সত্তার প্রভেদ সুস্পষ্ট। কারণ, বিষয়গতভাবে কখনও উহা আমাদের গোচরীভূত বা ইন্দ্রিয়গম্য হইতে পারে না। আর এই সত্তা পরিসীমিত নহে। জগতের সঙ্গে উহা সংযুক্ত। কোনও বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করা এবং তাহাতে অংশগ্রহণ করা উহার ধর্ম। আবার, আমাদের সত্তাচেতনা স্বভাবতঃই সীমিত এবং কালনির্দেশিত। কারণ মানবিক সত্তা কালগর্ভ; মানবসত্তার স্বরূপই হইল কালপ্রবাহের উপর ভাসমান হইয়া 'নেতি'র সম্মুখীন হওয়া। মানবজীবনের গভীরে শঙ্কা (আঙ্‌স্ট্) বিরাজ করে, কারণ সত্তার পিছনেই 'নেতি'র অবস্থান। জগতের মধ্যে আশ্রয়-বিহীন অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করিয়া শঙ্কাবোধের মধ্য দিয়া আমরা মূল সত্তার পরিচয় লাভ করি। অস্তিবাদী দর্শনের একটি মূল সূত্র: আমরা আছি, কিন্তু থাকার কোনও ভিত্তি নাই। মোটামুটিভাবে হাইডেগারের অস্তিবাদী মতকে নৈরাশ্যবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বলা চলে। কিন্তু উহা মূলতঃ তত্ত্ববিদ্যামুখী (অন্টোলজিক্যাল) —জ্ঞানবিদ্যাগতভাবে অস্তিত্ব সৎ-তত্ত্বের পূর্ববর্তী হইলেও অধিবিদ্যাগত দৃষ্টিতে সৎ-ই পূর্ববর্তী।

সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক কার্ল য়্যাসপার্স (১৮৮৩ খ্রী) -এর দর্শনে বিশেষভাবে 'অতিক্রমণ' (ট্রান্‌সেনডেন্‌স)

সূত্রের উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে নিছক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ের স্তর হইতে প্রকৃত মানবিক সত্তার পরিস্ফুরণের তাত্ত্বিক স্তরে অতিক্রমণের মধ্য দিয়াই অস্তিত্বের স্থিতি এবং সৎ-এর সিদ্ধি। অবশ্য এই অতিক্রমণ কখনও সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারে না।

সমসাময়িক ফ্রান্সে, বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে, অস্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫ খ্রী) অনেকাংশে হাইডেগারের পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার নিরীশ্বরবাদী দর্শনে সৎ-এর পিছনে 'নাস্তি'র কথা বলেন। কিন্তু সার্ত্র মানবিক সত্তার স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁহার মতে স্বতন্ত্রভাবে আমরা যাহা নির্ধারণ করি, আমরা তাহাই। অর্থাৎ আমরা নিজেরা আমাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করি। ফলে একদিকে যেমন আমাদের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তেমনি আবার আমরা নিজেদের দায়িত্বও সৃষ্টি করি। ব্যক্তির জীবনে ইহা হইতে যে মানস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা উৎকণ্ঠা। এই সমস্ত ব্যাখ্যানের পিছনে রহিয়াছে অস্তিবাদের মূলসূত্র: অস্তিত্ব তত্ত্বধর্মের (এসেন্স) পুরোবর্তী। আর চৈতন্যের ক্রিয়াত্মক ব্যাখ্যান অনুসারে জগৎ-বিযুক্ত চৈতন্যের রূপান্তর হয় 'নাস্তি'তে যে নাস্তি সার্ত্রের মতে সৎ-কে পরিবৃত করিয়া আছে। সার্ত্রের অস্তিবাদ যেমন ক্রিয়াত্মক, তেমনই মানবতাবাদী। আপনাকে উত্তীর্ণ হইয়াই মানুষের অস্তিত্ব; এবং স্বাধীনতা, শঙ্কা ও একাকিত্ব দ্বারা মানুষ নির্ধারিত।

ফ্রান্সের গাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯ খ্রী) আধুনিক খ্রীষ্টমতাবলম্বী অস্তিবাদের প্রচারক। তাঁহার মরমিয়াবাদী অধিবিদ্যাকে তিনি ব্যক্তিগত মূর্ত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অভিজ্ঞতা প্রাথমিকভাবে বিষয়ের নয়, বিষয়ীর। ঐশ্বরিক ও সামাজিক সংযোগের মধ্য দিয়া যে অংশ গ্রহণ, তাহার দ্বারাই ব্যক্তি সৎ-কে উপলব্ধি করিতে পারে। ব্যক্তির সহিত সৎ-এর সম্বন্ধ বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের বাহিরে।

দ্র Soren Kierkegaard, *The Journals of Soren Kierkegaard*, Oxford, 1938; Robert Bretall ed. *A Kierkegaard Anthology*, Princeton, 1946; Martin Heidegger, *Existence and Being*, tr. W. Brock, 1949; Karl Jaspers, *Reason and Existence*, tr. W. Earle, London, 1956; Karl Jaspers, *The Perennial Scope of Philosophy*, tr. R. Mannheim, London, 1949; Gabriel Marcel, *The Philosophy of Existence*, tr. M. Harai, 1948; Jean Paul Sartre, *Existentialism*, New York, 1947; Jean Paul Sartre, *Being and Nothingness*, New York, 1956.

দেবব্রত সিংহ

অস্ত্র আইন যে আইনে সাধারণ নাগরিকদের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রাদি রাখিবার নিয়মাদি বিধিবদ্ধ থাকে তাহাকে অস্ত্র আইন বলা হয়। এইরূপ আইন অনেক দেশেই আছে, ইংল্যাণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হয় হইয়াছে। ভারতবর্ষে অস্ত্র আইনের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সমস্ত ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিবার সংকল্প করেন। বিদ্রোহের সময় কতকটা এবং তাহার অব্যবহিত পরেই যে সমস্ত স্থানে বিদ্রোহ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল, সেই সব স্থানের অধিবাসীদের সমস্ত অস্ত্র সৈন্য-বিভাগের আদেশে কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন করিয়া লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ব্যতীত কোনও অস্ত্র রাখা বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অস্ত্র আইনে অস্ত্র রাখা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধগুলি একত্রিত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অস্ত্র আইন দ্বারা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অস্ত্র আইনকে রদ করিয়া নূতন আইন প্রবর্তিত করা হইয়াছে, কিন্তু বিধানের দিক দিয়া দুই আইনে বিশেষ প্রভেদ নাই। বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাহার সরঞ্জামাদি তৈয়ারি করা এবং ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য রাখা বেআইনি। অন্যান্য অস্ত্র সম্বন্ধেও সরকার ইচ্ছা করিলে লাইসেন্স লওয়া আবশ্যিক করিতে পারেন। পক্ষান্তরে আইনে এইরূপ বিধানও আছে যে, সরকার ইচ্ছা করিলে ব্যক্তি-বিশেষ অথবা কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। লাইসেন্স লইতে ফি দিতে হয় এবং লাইসেন্স চাহিয়া দরখাস্ত করিলে দরখাস্তকারী অস্ত্র রাখিতে অনুমতি পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না তাহা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কুড়ি ইঞ্চি লম্বা নলের সাধারণ বন্দুক দরখাস্ত করিলেই পাওয়া যায় এবং দরখাস্তকারী কোনও অনুমোদিত রাইফেল ক্লাবের সভ্য হইলে '২২ বোরের রাইফেল সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। অন্যান্য ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া লাইসেন্স দেওয়া হয়। রাষ্ট্র এবং সমাজের নিরাপত্তা রক্ষা অস্ত্র আইনের উদ্দেশ্য।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

অস্ত্রচিকিৎসা রোগ নিরাময়ের জন্য অতি প্রাচীন কালেও মানুষ যে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করিত, খ্রীষ্টপূর্ব অন্যূন দশ হাজার বৎসর পূর্বেকার নব্যপ্রস্তর যুগের তুরপুনের ছিদ্রযুক্ত কতকগুলি মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কারের ফলে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নিদর্শন মেমফিনা নামক স্থানের অনতিদূরে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন একটি সমাধিপ্রস্তরে ক্ষোদিত মানুষের উপর বিভিন্ন রকমের অস্ত্রোপচারের চিত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে হস্ত-পদাদির উপর অস্ত্রোপচার, অণ্ডকোষ কর্তন, অগ্রচ্ছদা ছেদন প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রোপচারের চিত্র রহিয়াছে। ঋগ্বেদেও আঘাত ও ক্ষত নিরাময়ের জন্য অস্ত্রচিকিৎসার উল্লেখ আছে।

সম্ভবতঃ সুশ্রুতই প্রথম শল্যচিকিৎসক, যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরসংস্থান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মস্তিষ্ক ও উদরের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার, ক্ষতস্থানে সুস্থ ত্বক সংযোজন (স্কিন গ্র্যাফটিং), ক্ষত বা বিকৃত নাসিকা ও কর্ণের স্বাভাবিক রূপদান (প্ল্যাস্টিক সার্জারি), ভগ্ন অস্থি সংযোজন, স্থানচ্যুত অস্থি যথাস্থানে সংস্থাপন, অর্বুদ ছেদন, বস্তির অভ্যন্তরে প্রস্তর চূর্ণীকরণ (লিথোটমি), হস্ত-পদাদি বিচ্ছিন্নকরণ এবং অশ্বপুচ্ছের দীর্ঘ লোমের সাহায্যে কর্তিত স্থান সেলাই প্রভৃতি কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, জুলিয়াস সীজারকে জননীর উদর কর্তনের দ্বারা প্রসব করানো হইয়াছিল।

শারীরসংস্থানবিদ্যার জনক ভেসেলিয়াস কর্তৃক শবব্যবচ্ছেদ প্রবর্তিত হইবার ফলেই বর্তমান যুগের অত্যাশ্চর্য অস্ত্রচিকিৎসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর মরগ্যাগ্নি এবং তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ শল্যচিকিৎসক জন হাণ্টার (১৭২৮-১৭৯৩ খ্রী) স্বাভাবিক শারীরসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রোগাক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন এবং এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পর্যায়ে উন্নীত করেন।

সুশ্রুতের সময় হইতেই শৈত্য প্রয়োগে নির্দিষ্ট স্থান অসাড় করিয়া ছোটখাটো অস্ত্রোপচার এবং সম্মোহনের সাহায্যে রোগীকে নিদ্রাভিভূত করিয়া বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হইত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লাইবিগ ও শৌবেরন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিম্পসন সংজ্ঞালোপকারী ঔষধ হিসাবে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করিয়া অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেন। গ্লাসগোর ইংরেজ চিকিৎসক লর্ড লিস্টার ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জীবাণুদুষ্টির প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রচিকিৎসায় অসাফল্যের কারণ দূর করেন।

এখন পর্যন্তও ক্লোরোফর্ম এককভাবে অথবা ক্লোরোফর্ম গ্যাসের সহিত মিশ্রিতভাবে সংজ্ঞালোপকারী পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। স্থানীয় সংজ্ঞালোপকারী ঔষধ হিসাবে কোকেন, নভোকেন, প্রোকেন প্রভৃতির ব্যবহারও প্রচলিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি যে সকল স্থলে ক্লোরোফর্ম, ঈথার প্রভৃতির ব্যবহার ক্ষতিকর, সেই সকল স্থলে কটিদেশে শিরদাঁড়ার বহিঃস্থ মেরু মস্তিষ্কে সংজ্ঞালোপকারী ঔষধ ইনজেকশন করিয়া সংশ্লিষ্ট দেহাংশকে অসাড় করিবার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বরফ প্রয়োগে দেহের তাপমাত্রা অনেকাংশে হ্রাস করিয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের মধ্যেও অস্ত্রোপচার সাধিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক প্রভৃতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত রাখিয়া ঐ সকল দেহাংশের উপর অস্ত্রোপচারও বর্তমানে কল্পনাতীত নহে। হাতের মুখ্য শিরার ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ক্যাথিটার প্রবিষ্টকরণও কুশলী অস্ত্রচিকিৎসকদের হাতে এক নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ চিকিৎসাপদ্ধতি তুলিয়া দিয়াছে। সমব্যথী স্নায়ু (সিম্প্যাথেটিক নার্ভ্স) কর্তন করিয়া বর্ধিত রক্তচাপ হ্রাস করা এবং মস্তিষ্কে বিশেষ রকম অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থাকে স্বাভাবিক করা সম্ভব হইয়াছে। অন্তস্তন ধমনী বাঁধিয়া প্রতিহত রক্তস্রোতকে হৃদ্ধমনীর মধ্যে চালিত করিয়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে করোনারি থ্রম্বোসিস নিরাময়ে সাফল্য লাভ হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রভূত গবেষণার ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের, বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসকের চেষ্টায় নাক, কান, হস্ত-পদাদিশূন্য মানুষও তাহাদের বিনষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিরিয়া পাইতেছে। এমন কি, চক্ষুকোটরে অপরের চক্ষু সংস্থাপন করিয়া অন্ধকেও চক্ষুষ্মান করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছে। আঘাত বা অন্য কোনও কারণে মেরুদণ্ডের বিকৃত অস্থিগুলির অস্বাভাবিক অবস্থাকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া তাহাদের ব্যাহত ক্রিয়া অনেকটা ফিরাইয়া আনা হইতেছে। অস্ত্রচিকিৎসার এই ক্রমোন্নতি ভবিষ্যৎ অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতির সূচনা করিতেছে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

অস্থি আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা কঠিন টিস্যু বা কলা। অস্থির জন্যই দেহের একটি নির্দিষ্ট আকার থাকে। ইহা ছাড়া শরীরের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ অস্থির আবরণে আঘাত হইতে রক্ষা পায়। আপাত-দৃষ্টিতে অস্থিকে প্রাণহীন মনে হইলেও ইহা জীবন্ত কোষের সাহায্যেই গঠিত। শরীরে নূতন অস্থি তৈয়ারি এবং সেই সঙ্গে পুরাতনের অবলুপ্তি ঘটানো এই কোষগুলির কাজ। জৈব ও অনঙ্গারক পদার্থের মিশ্রণে অস্থি গঠিত হয়। অস্থির কাঠিন্য প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের উপর নির্ভর করে। হাত, পা ইত্যাদির অস্থিগুলির মাঝখানে একটি নালী আছে, যাহার মধ্যে হলুদ রঙের মজ্জা থাকে। এই অস্থিগুলির দুই প্রান্ত স্পঞ্জের মত, সেখানে লাল রঙের মজ্জা পাওয়া যায়। এই লাল মজ্জা লোহিত কণিকা তৈয়ারির কাজে সাহায্য করে। আট সপ্তাহ হইতে ভ্রূণের অস্থির গঠন আরম্ভ হয়। শরীরের বেশির ভাগ অস্থি কার্টিলেজ বা তরুণাস্থির উপর গড়িয়া উঠে। কার্টিলেজের ছাঁচটি প্রথমে পেরিকন্‌ড্রিয়াম নামে একটি সংযোগ-কলায় আবৃত থাকে। এই পেরিকন্‌ড্রিয়ামের নীচের তলার অস্‌টিয়োব্লাস্ট কোষের জন্যই অস্থি তৈয়ারি হয়। লম্বা অস্থির মধ্যভাগকে ডায়াফাইসিস ও দুইটি প্রান্তকে এপিফাইসিস বলা হয়। ডায়াফাইসিসে প্রথম অস্থি তৈয়ারির কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে এইখানে রক্তবহা নালী জন্মাইতে থাকে এবং কার্টিলেজের জায়গায় অস্থি গড়িয়া উঠে। যৌবন পর্যন্ত এপিফাইসিস ও ডায়াফাইসিসের মধ্যে কার্টিলেজের ব্যবধান থাকে এবং এইজন্যই অস্থি লম্বায় বাড়িতে পারে। ২০ বছর বয়সের পর এই দুইটি অংশের সংযোগসাধনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থির বৃদ্ধি বন্ধ হয়। মুখ ও মাথার চ্যাপটা অস্থিগুলি কিন্তু এইভাবে কার্টিলেজের ছাঁচের উপর গড়িয়া উঠে না। ইহারা একরকম ঝিল্লী বা মেমব্রেন-এর মাধ্যমে তৈয়ারি হয়। এই জাতীয় অস্থির বহিরাবরণ ঘন ও শক্ত, কিন্তু ভিতরটা স্পঞ্জের ন্যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অস্থির গঠনের জন্য দায়ী অস্‌টিয়োব্লাস্ট। আর একরকম কোষ অস্‌টিয়োক্লাস্ট অস্থির অবলুপ্তি ঘটায়। নানারকম খাদ্যপ্রাণ (প্রধানতঃ খাদ্যপ্রাণ ডি) ও উত্তেজক রস (প্রধানতঃ প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির রস) অস্থির গঠনকার্যে নানাভাবে সাহায্য করে। ইহাদের অভাবে অস্থির কঠিনতা হ্রাস পাইয়া অধিক নমনীয় হয়।

চণ্ডীচরণ দেব

অস্পৃশ্যতা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পূর্বে রচিত অত্রি-ধর্মসূত্রে রজক, চর্মকার, কৈবর্ত, ভিল্ল প্রভৃতি জাতিকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা অথবা প্রতিলোমজ চণ্ডালাদি জাতিবর্গ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। অস্পৃশ্যতার উল্লেখ বা প্রমাণ নাই।

ব্রাহ্মণ্য এবং নানা উপজাতির সংস্কার অনুসারে অবস্থাবিশেষে সাময়িকভাবে অস্পৃশ্যতাদোষ ঘটে। রজস্বলা অবস্থায় নারীর এবং জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষে জ্ঞাতিবিশেষের অশৌচ হয়, পরে বিহিত কর্মের দ্বারা সে অবস্থা দূরীভূত হয়। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের সোনা চুরি প্রভৃতি অপরাধের জন্য মনুসংহিতায় অপরাধীকে বহিষ্কারের বিধি আছে, কিন্তু তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় কিনা বুঝা যায় না। তবে ঐ সংহিতায় বৌদ্ধ, পাশুপত, জৈন, লোকায়ত, কাপিল শাখাবলম্বীদের ছুঁইলে স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হইবার বিধি আছে। কিন্তু অত্রির মতে বৈদিক ক্রিয়াবরণ, বিবাহসভা অথবা মেলায় এই নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে।

ঠিক কোন্ সময়ে জানা যায় না, শূদ্রবর্ণের বাহিরেও বহু জাতি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য (শুধু অ-জলচল নহে) বলিয়া বিবেচিত হইতে আরম্ভ হয়। নিরীক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়, যে সকল জাতির কৌলিক বৃত্তির সহিত মানুষ বা পশুর মৃতদেহ, অথবা দেহ হইতে নির্গত রক্ত, মল-মূত্রাদির সম্পর্ক আছে তাহারা অন্ততঃ অর্বাচীন কাল হইতে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। সিংহল বা জাপানে অনুরূপ বৃত্তিধারী জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। হয়ত ইহা ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ সূচিত করে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভারতে শতকরা ১৪ জন 'অস্পৃশ্য'। কোথাও ইহার মাত্রা ১১% কোথাও ৩২%। অস্পৃশ্যতাবিচারেও তারতম্য লক্ষিত হয়। 'অস্পৃশ্য'কে ছুঁইলে উত্তর ভারতে স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। কেরল, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণপল্লীর মধ্য দিয়া কাহারও যাওয়া নিষিদ্ধ, কেহ বা ৬৪ বা ১২৮ হস্ত ব্যবধানের মধ্যে আসিতে পারে না, কাহারও ছায়া দেহে পড়িলে স্নান করিতে হয়, কাহারও দৃষ্টিমাত্রে দোষ জন্মায়। সেইরূপ জাতির কোনও ব্যক্তি উচ্চবর্ণের পল্লীবাসীকে সতর্ক করিবার জন্য চিৎকার বা অন্যবিধ শব্দের সহায়তায় স্বীয় অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯২১, বিশেষতঃ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেন। ১৯৩৫-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ভোজনালয়ে, মন্দিরে, যানবাহনে, পথে-ঘাটে 'অস্পৃশ্য'দের পূর্ণ অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত হয়। কাহারও প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে অপরাধী দণ্ডনীয় হইতে পারে।

বর্তমান শাসনবিধিতে এইরূপ আইন সর্বভারতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্যদোষে ও শিক্ষার সম্যক্‌ প্রসারের অভাবে তলে তলে অস্পৃশ্যতা বর্তমান রহিয়াছে। ক্ষীণ হইলেও ইহা নির্মূল হয় নাই।

নির্মলকুমার বসু

অহম্‌ মনঃসমীক্ষা দ্র

অহল্যা গৌতম ঋষির পত্নী। ইন্দ্র গৌতমের মূর্তি ধারণ করিয়া অহল্যার সহিত মিলিত হইলে গৌতমের অভিশাপে তিনি বায়ুভক্ষা নিরাহারা সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া আশ্রমে অবস্থান করেন। রামচন্দ্র গৌতমাশ্রমে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি শাপমুক্ত ও গৌতমের সহিত মিলিত হন (রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৪৮।৯)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণে পরিণত হন ও রামের পাদস্পর্শে উদ্ধার লাভ করেন। গৌতমের ঔরসে অহল্যার গর্ভে রাজা জনকের পুরোহিত শতানন্দ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অহল্যাবাঈ (১৭২৫/২৬-১৭৯৫ খ্রী) আহ্‌মদনগর জেলার পাথরষি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দ রাও সিন্ধিয়া। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার জন্ম ১৭২৫ কিংবা ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের হোলকারবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও হোলকারের পুত্র খণ্ডে রাও হোলকারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। খণ্ডে রাও দীর্ঘজীবী হন নাই। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের নিকট কুম্ভের দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

খণ্ডে রাও ও অহল্যাবাঈয়ের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম মালে রাও, কন্যার নাম মুক্তাবাঈ। স্বামীর মৃত্যুর পর অহল্যাবাঈ মলহর রাওকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করিতেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মলহর রাওয়ের মৃত্যু হইলে মালে রাও ইন্দোরের সিংহাসনে বসিলেন। মালে রাওয়ের কোনও যোগ্যতা ছিল না। বাল্যকালে তাঁহাকে নির্বোধ ও লঘুচিত্ত বলিয়া মনে হইত। সিংহাসনে বসিবার পর হইতে তাঁহার মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদের পীড়ন করিয়া মালে রাও আনন্দ উপভোগ করিতেন; অহল্যাবাঈ বহু ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া অর্থ-বস্ত্র দান করিতেন। একবার বিনা দোষে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া মালে রাও সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান ও অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শাসনকাল এক বৎসরের বেশি স্থায়ী হয় নাই।

অহল্যাবাঈ নিজে এইবার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সকলে সন্তুষ্ট হন নাই। গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে মলহর রাওয়ের এক কর্মচারী প্রস্তাব করিলেন যে, অহল্যাবাঈ হোলকারবংশের কোনও শিশুকে দত্তক গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার নামে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা চলিবে। সম্ভবতঃ গঙ্গাধর যশোবন্ত মনে করিয়াছিলেন এই উপায়ে তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অহল্যাবাঈ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি পেশোয়া মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্থলোভে রঘুনাথ রাও ইন্দোর রাজ্য আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন। অহল্যাবাঈ বিপদ আশঙ্কা করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সর্দারদের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। এবং পেশোয়ার নিকটও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার ফলে মহাদজি সিন্ধিয়া, জানোজি ভোঁসলে প্রভৃতি সেনা-নায়কগণ রঘুনাথ রাওয়ের সহিত যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে পেশোয়ার নির্দেশের ফলে রঘুনাথ রাওয়ের ইন্দোর আক্রমণ সম্ভব হইল না।

অহল্যাবাঈ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার একার পক্ষে রাজ্যশাসন ও সৈন্যপরিচালনা সম্ভব নয়। সেই-জন্য তিনি তুকোজি হোলকার নামে একজন সৈনিককে প্রধান সেনানায়কের পদে নিয়োগ করেন। তুকোজি হোলকারের সীলমোহরে 'মলহর রাও হোলকারের পুত্র তুকোজি হোলকার' এইরূপ লেখা থাকিত। প্রকৃতপক্ষে তুকোজির সহিত মলহর রাও হোলকারের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পূর্বব্যবস্থা অনুসারে অহল্যাবাঈয়ের মৃত্যুর পর তুকোজি হোলকার এবং তাঁহার বংশধরগণ ইন্দোর রাজ্যের শাসক হইয়া উঠেন।

সুনিপুণ শাসনপ্রণালী ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে অহল্যাবাঈ তাঁহার রাজত্বকালে ইন্দোর রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় নায়কদের মধ্যে মহাদজি সিন্ধিয়ার সহিত প্রথমে তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। একবার মহাদজি সিন্ধিয়াকে তিনি বহু অর্থ দিয়া সাহায্য করেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাদজি সিন্ধিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তুকোজি হোলকার ও মহাদজি সিন্ধিয়া ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাদজির মৃত্যু হইলে এই বিরোধের অবসান হয়। বিখ্যাত

ঐতিহাসিক স্যর জন ম্যাল্‌কল্‌ম্ অহল্যাবাঈয়ের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তাঁহার সরল জীবনযাত্রা, অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দয়া ও দাক্ষিণ্যের কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু রাজ্যশাসনের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি কঠোর হইতে পারিতেন। শান্তিরক্ষার জন্য একবার তিনি বহু ভীল সর্দারকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ম্যাল্‌কল্‌ম্ বলিয়াছেন, মালব দেশে অহল্যাবাঈকে সুশাসনের প্রতীক বলিয়া মনে করা হইত। মালব দেশে অসংখ্য মন্দির, ধর্মশালা, রাজপথ তাঁহার সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। নর্মদাতীরে মহেশ্বর তাঁহার খুব প্রিয় স্থান ছিল। এখানে তাঁহার নির্মিত মন্দির, প্রাসাদ, নদীতীরে প্রশস্ত সোপানাবলী তাঁহার দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার রাজ্যের বাহিরে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতেও তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। বারাণসী ও গয়ায় তাহার বহু নিদর্শন আছে। ম্যাল্‌কল্‌ম্ লিখিয়াছেন, পূর্বে জগন্নাথধাম, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে কেদারনাথ ও দক্ষিণে রামেশ্বর, যেখানেই হিন্দুতীর্থ সেখানেই অহল্যাবাঈয়ের দানশীলতার পরিচয় আছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে অহল্যাবাঈয়ের মৃত্যু হয়।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

অহিচ্ছত্র প্রাচীন উত্তর পঞ্চাল রাজ্যের (রোহিলখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত) রাজধানী। স্থানটি বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলী জেলার অন্তর্গত রামনগর হইতে অভিন্ন। খননকার্যের ফলে অহিচ্ছত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। অহিচ্ছত্রের প্রাচীন নাম অধিচ্ছত্র। অহিচ্ছত্রের কোনও কোনও রাজার মুদ্রা পূর্বে বস্তি জেলা পর্যন্ত প্রচলিত থাকায় কেহ কেহ ঐ সমুদায় নরপতিকে পঞ্চাল এবং কোশল উভয়েরই প্রভু বলিয়া মনে করেন। আবার এই রাজন্যবর্গের অনেকের নামের শেষে 'মিত্র' থাকায় তাঁহাদের 'মিত্র রাজা' বলিয়াও অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার তাঁহাদের একই নামবিশিষ্ট শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজন্যগণ হইতে অভিন্ন মনে করেন। তবে এ সম্পর্কে কোনরূপ নিশ্চিত প্রমাণ নাই। বিভিন্ন মুদ্রা হইতে অহিচ্ছত্রের রাজন্যবর্গের মধ্যে ভদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, ফল্গুনীমিত্র, ভানুমিত্র, ভূমিমিত্র, ধ্রুবমিত্র, অগ্নিমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বৃহৎস্বাতীমিত্র, বিশ্বপাল, রুদ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, বঙ্গপাল, ত্রৈবর্ণীপুত্র ভাগবত, আষাঢ়সেন, দমগুপ্ত, বসুসেন, যজ্ঞপাল, প্রজাপতিমিত্র ও বরুণমিত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহারা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। এক শ্রেণীর মুদ্রায় অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। ঐ সকল মুদ্রায় শক প্রভাব হইতে অনুমান করা যায় যে, অহিচ্ছত্রের অচ্যুতের সহিত পশ্চিম ভারতের সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্‌-ৎসাঙ্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে অহিচ্ছত্রকে হীনযান বৌদ্ধদিগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অহুর-মজ্‌দা সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অসুর+মেধস্', মূলতঃ এগুলি আর্য দেব-দেবীর নাম; প্রত্যেক জাতি কতকগুলি নৈসর্গিক দেব-দেবী মানিত। আদি আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় এই দেবতাদের নাম ছিল daiva 'দইব' (=সংস্কৃত 'দেব', আবেস্তা daeva 'দএব')। উহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান ঈশ্বররূপে 'অহুর' (সংস্কৃত অসুর =অসু+র, প্রাণবান, শক্তিশালী) প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জরথুশ্‌ত্র (সংস্কৃত প্রতিরূপ 'জরদুষ্ট্র') ইরান দেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তখন তাঁহার প্রচারের ফলে 'অহুর' বা 'অহুর-মজ্‌দা' (=জ্ঞানময় পরমেশ্বর, আধুনিক ফারসীতে Hormazd হোরমজ্‌দ্) একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার অধীন অপর দেব-দেবী বা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দেবতা অপর কেহ রহিল না। কিন্তু এই ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী (Angramainyu 'অংগ্র-মৈন্যু', আধুনিক ফারসীতে Ahriman 'অহ্‌রিমন্'), অসত্যের ও অন্ধকারের প্রতীক এক পাপ-পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এবং ক্রমে 'দেব' বা 'দএব'-গণ অপদেবতা বা ঈশ্বরবিদ্বেষী দানবরূপে অবনমিত হইল (আধুনিক ফারসীতে 'দও' বা 'দীব্'='রাক্ষস')।

আর্দেশীর দীনশা

অহোবল দক্ষিণভারতীয় সংগীতশাস্ত্রকার। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'সংগীত পারিজাত' নামক সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র রচনা করেন। উত্তরভারতীয় সংগীতের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। 'সংগীত পারিজাত' প্রামাণিক সংগীতশাস্ত্রসমূহের অন্যতম।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

অহ্রিমন মৈন্যু দ্র

আই. এইচ. এফ. ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন বা সংক্ষেপে আই. এইচ. এফ. হইল ভারতে হকির নিয়ামক সংস্থা। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া গোল্ড-কাপ হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানকালে কয়েকজন উৎসাহীর উদ্যোগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আই. এইচ. এফ. -এর কার্যকলাপে সক্রিয়তার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়। আই. এইচ. এফ. -এর উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম ভারতীয় হকিদল ওলিম্পিক আসরে (আমস্টারডাম) প্রেরিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে সেই বৎসরেই আই. এইচ. এফ. -এর অনুমোদনক্রমে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় কলিকাতায় সর্বপ্রথম আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। উত্তরকালে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা জাতীয় প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

অজয় বসু

আই. এফ. এ. ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা সংক্ষেপে আই. এফ. এ. বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। সরকারি মতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. এ.-র প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। আই. এফ. এ. -পরিচালিত দুইটি প্রধান প্রতিযোগিতা আই. এফ. এ শীল্ড ও কলিকাতা ফুটবল লীগ ক্রীড়ামহলে সুপরিচিত। এই দুইটি ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি প্রতিযোগিতাও আই. এফ. এ. -র তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হইয়া থাকে। শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং লীগের প্রথম আয়োজন ঘটে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম পর্বে আই. এফ. এ. -র পরিচালকগোষ্ঠীতে কেবলমাত্র তদানীন্তন শাসকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই আসন পাইতেন। পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কালী মিত্রকে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে আই. এফ. এ. কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করা হয়। সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন-জীবী নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যস্থতায় আই. এফ. এ. কাউন্সিলের সদস্যপদ ইওরোপীয় ও ভারতীয় ক্লাব-সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টনের নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. এ. -র গঠনতন্ত্র সংশোধন-সূত্রে কাউন্সিলের বিকল্পে নির্বাচিত গভর্নিং বডির উপর আই. এফ. এ. -র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অপেশা-দারী ফুটবল পরিচালনার ভার একদা অপেশাদার কর্মকর্তাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইন সংশোধন করিয়া গভর্নিং বডি বেতনভুক্ত কর্মসচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক ফুটবল পরিচালনা ছাড়াও জাতীয় ফুটবল ইতিহাসেও আই. এফ. এ. নানাভাবে জড়িত। এই ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য আই. এফ. এ. -প্রদত্ত সন্তোষ ট্রফির নজির। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মানার্থে আই. এফ. এ. -র প্রাক্তন সভাপতি সন্তোষের মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত। এই সুদৃশ্য কাপটি আই. এফ. এ. -র পক্ষ হইতেই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

আই. এফ. এ. -র প্রথম সভাপতি ছিলেন বিচারপতি উইলিয়াম ম্যাক্‌ফার্‌সন, প্রথম সম্পাদক এ. আর. ব্রাউন। সন্তোষের মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন ইহার প্রথম ভারতীয় সভাপতি ও মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম ভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক।

অজয় বসু

আইন ইংরেজী 'ল' অর্থে বাংলায় আইন শব্দ প্রচলিত। সমষ্টিবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে পরস্পরের স্বার্থ এবং সুবিধা অনুযায়ী কতকগুলি বিধি-নিষেধ সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি শিষ্টাচার বা সুনীতির কথা— সেগুলির মধ্যে কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আবার কতকগুলি বিধি না মানিলে সমাজ ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা; সেগুলির মধ্যে বাধ্যবাধকতা আছে। সেগুলি না মানিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়; অথবা কেহ না মানিলে তাহাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিয়া মানিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সমাজের প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি এবং যে সব বিধি-নিষেধের মধ্যে বাধ্যবাধকতা আছে— যেগুলি কেবলমাত্র নৈতিক উপদেশ নহে, সেইগুলিকেই আমরা আইন বলি।

এককালে রাজা-বাদশার হুকুমেই আইন জারি হইত। বর্তমান যুগে আইনের প্রধান সৃষ্টিকর্তা হইতেছেন ব্যবস্থাপক-সভা। ব্যবস্থাপক-সভা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করেন সেগুলিকে অনুশাসন বা আনুশাসনিক আইন (স্ট্যাটুটরি ল) বলা যাইতে পারে। আনুশাসনিক আইন ছাড়া সম্প্রদায়ভেদে কতকগুলি বিভিন্ন আইন আছে, সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক আইন (পার্সোন্যাল ল) বলা যায়। যেমন হিন্দু আইন বা মুসলমান আইন। আবার চিরা-চরিত আচার হইতেও আইনের সৃষ্টি হইতে পারে। কোনও আচার বা প্রথা বহুকালাবধি চলিয়া আসিলে তাহাও আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বর্তমান যুগে আর এক প্রকার আইনের সৃষ্টি হয়— তাহাকে বলা হয় জজের সৃষ্ট আইন। কোনও বিষয়ে পরিষ্কার বিধি না

থাকিলে ন্যায় ও বিবেক অনুসারে জজ যে রায় দেন তাহাতে এই প্রকার আইনের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া আনুশাসনিক বা সাম্প্রদায়িক আইনের অর্থ করিতে গিয়া, এমন কি ব্যবস্থাপক-সভা কর্তৃক রচিত আইনের ব্যাখ্যাচ্ছলেও, এইরূপ আইনের সৃষ্টি হইতে পারে। ফৌজদারী আইন সমস্তই আনুশাসনিক। দেওয়ানী আইনের অধিকাংশই আনুশাসনিক— কিছু আচারসম্মতও হইতে পারে। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে, যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতিতে, হিন্দু এবং মুসলমানেরা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আইনে চালিত হন। সাম্প্রদায়িক আইন শাস্ত্রসম্মত বা আচারসম্মতও হইতে পারে। সম্প্রতি হিন্দু সাম্প্রদায়িক আইন ব্যবস্থাপক-সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া আনুশাসনিক আইনে পরিণত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে আর এক প্রকার আইন সৃষ্ট হইয়াছে— ইংরেজীতে তাহাকে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল, আমরা বলিতে পারি প্রশাসনিক আইন। এই যুগে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বহু ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতেছে। প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিধান প্রণয়ন করা ব্যবস্থাপক-সভার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই আজকাল বহু আনুশাসনিক আইনে মূল সূত্র বলিয়া দিয়া খুঁটিনাটি নিয়মকানুন প্রণয়নের ভার শাসনবিভাগ বা একজি-কিউটিভ -এর উপর দেওয়া থাকে। সেই সমস্ত নিয়ম-কানুন আইনেরই শামিল এবং এই সকল নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করা শাসনবিভাগেরই দায়িত্ব। ফলে বর্তমানে শাসনবিভাগকে বহু বিষয়ে বিচারবিভাগের মতই ন্যায়ানু-মোদিত ভাবে কাজ করিতে হয়। সেই সব কাজে আদালত সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কোনও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহক ন্যায়ানুমোদিত ভাবে কাজ করিল কিনা তাহা দেখিবার জন্য কোনও কোনও দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রিবিউন্যাল বা প্রশাসনিক আদালত আছে। প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনের যেরূপ বাহুল্য হইয়াছে, এ দেশেও শীঘ্রই প্রশাসনিক আদালত গঠন করিতে হইতে পারে। হাইকোর্ট যদিও সংবিধানের ২২১ ধারা অনুযায়ী কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তথাপি হাইকোর্টের এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ।

প্রয়োজনভেদে আইন দুই প্রকার হইতে পারে। যে সমস্ত আইন দ্বারা রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে ইংরেজীতে পাবলিক ল বলে— আমরা বলিতে পারি রাষ্ট্রসম্বন্ধী। যেমন সংবিধান। অন্যান্য যাবতীয় আইন ইংরাজী প্রাইভেট ল -এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়িবে।

আন্তর্জাতিক আইন, আইন বলিয়া বর্ণিত হয় বটে, কিন্তু আইনের যে প্রধান উপাদান বাধ্যকরতা (স্যাংশন্) আন্তর্জাতিক আইনে তাহারই অভাব। আন্তর্জাতিক আইন চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকে ঐ আইন মানিতে বাধ্য করার মত কোনও আদালত এখনও সৃষ্ট হয় নাই। আন্ত-র্জাতিক আদালত একটা সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে উহার বিচার করিবার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সম্মতির উপর নির্ভর করে এবং বিচারের পরেও উহার মীমাংসা বিবদমান রাষ্ট্রগুলি না মানিলে তাহাদিগকে মানাইবার কোনও ক্ষমতা উক্ত আদালতের নাই। বিজেতা জাতি আদালত বসাইয়া পরাজিত জাতির কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে আন্তর্জাতিক আইন-ভঙ্গের অপরাধে শাস্তি দিয়াছে, বিগত যুদ্ধের পরে তাহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিলে তাহার প্রতি-বিধানের সম্ভাবনা জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও অনিশ্চিত।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

আইন অমান্য আন্দোলন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বীকৃত হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই অতঃপর ভারতের লক্ষ্য হইবে। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বত্র স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য পঠিত হয় এবং অপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার ঘটে।

আইন অমান্যের প্রস্তুতিস্বরূপ গান্ধীজী ব্রিটিশ বড়-লাটের নিকটে রেজিন্যাল্ড রেনল্ড্স নামে এক ইংরেজ যুবকের দৌত্যে কয়েকটি জাতীয় দাবি সমন্বিত এক পত্র প্রেরণ করেন। যথাকালে এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২ মার্চ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম হইতে ৭৯ জন সহকর্মী লইয়া পদযাত্রা শুরু করেন। ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করার পর ৫ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রকূলে ডাণ্ডি নামক এক স্থানে উপস্থিত হন। এই ২৪ দিন সময়ের মধ্যে বহু গ্রামে তিনি জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বোধিত করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তৎকালে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল প্রাতঃকালে গান্ধীজী সমুদ্রকূলে একমুঠা লবণ সংগ্রহ করিয়া গভর্নমেন্টের আবগারি আইন ভঙ্গ করেন। ভারতের নানা স্থানে সেইদিন হইতে আইন অমান্যের কাজ আরম্ভ হয়। বাংলা

দেশে চব্বিশ পরগনা জেলায় মহিষবাথান এবং নীলাতে, মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার কয়েকটি স্থানে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চলিতে থাকে এবং সমগ্র প্রদেশের সত্যাগ্রহীগণ এই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত হন। যে সকল স্থানে লবণ তৈয়ারি সম্ভব নহে, সেখানে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক বই বিক্রয়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সভাসমিতির চেষ্টা, বিলাতি কাপড় বা আবগারি দোকানে ক্রেতাদের খরিদ না করিতে অনুরোধ করিয়া বা পিকেটিং-এর দ্বারা আন্দোলন চালু রাখা হয়।

বোম্বাই, কলিকাতা, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকস্থানে পুলিস লাঠি বা গুলি চালায়। জেলে প্রেরণ অপেক্ষা লাঠির আঘাত এবং পাইকারি জরিমানা আশ্রয় করিয়া গভর্নমেণ্ট আন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বসমেত প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত কারাগারে প্রেরণ করিতে হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে ৩০০০০ ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে গান্ধীজী স্থির করেন যে ধরসানা নামক স্থানে অবস্থিত গভর্নমেণ্টের লবণগোলা সত্যাগ্রহীগণকে দখল করিতে হইবে। সেই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরই মে মাসে তাঁহাকে আটক করা হইল। কিন্তু তাহার পরেও ধরসানা এবং ওয়াডালা নামক স্থানে সত্যাগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে। অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার সত্ত্বেও ধরসানার সত্যাগ্রহীদল যেরূপ অবিচলিত ধৈর্যের সহিত অহিংস সত্যাগ্রহ চালাইয়াছিল, একজন বিদেশী লেখকের বিবরণী তাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফার খানের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে। সেখানে সভাসমিতির সম্পর্কে নিষেধমূলক আইনভঙ্গ প্রধান কার্য ছিল। পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ও সভা করার চেষ্টা দৃঢ়ভাবে চলিতে থাকে। দমননীতির উদ্দেশ্যে সৈন্যবিভাগকে প্রয়োগ করা হয়। পেশোয়ারে গুলিচালনার ফলে দুই হইতে তিন শতের মত লোকের প্রাণহানি ঘটে। চারসাদ্দা, উটমালজাই প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণের উপর কঠিন দমননীতি প্রয়োগ করিয়াও আন্দোলন প্রশমিত করা যায় নাই। স্থানীয় সত্যাগ্রহীদল অহিংসনীতিতে অটল রহিল। ইহাদের নাম ছিল 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার', 'ঈশ্বরের-ভৃত্য'।

পেশোয়ারের ঘটনাবলীর বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার রিপোর্টে পাঠান সত্যাগ্রহীদের অপূর্ব বীরত্ব এবং সংযমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়। সে রিপোর্টও পেশোয়ারের রিপোর্টের মত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আন্দোলন নানাস্থানে এইভাবে চলিতে থাকে। তাহার পর কংগ্রেসকে গোল-টেবিল বৈঠকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাট আরউইন সাহেব গান্ধীজীর সহিত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার ফলে আন্দোলন স্থগিত থাকে। ঐ বৎসরের শেষভাগে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক মীমাংসা ব্যতিরেকেই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এই সময় ভারতে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ পুনরায় ধৃত হইতে থাকেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে আইন অমান্য আন্দোলন আবার তীব্র উদ্যমে আরম্ভ হয়। গান্ধীজীও কারাগারে প্রেরিত হইলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িক বিভেদের মত হিন্দুসমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতির ভিতরেও অনুরূপ এক ভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেন। হিন্দুসমাজের আশু সংস্কার এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজকে প্রণোদিত করিবার জন্য গান্ধীজী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর অনশনব্রত গ্রহণ করেন। ফলে সমাজের নেতৃবৃন্দ একত্র হইয়া সংকল্প গ্রহণ করেন ও হরিজনদের সম্পর্কে এক নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়া লন। তাহার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিভেদমূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

পরে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিয়া হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পর সত্যাগ্রহ গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত আইন অমান্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আগস্ট ১৯৩৩ হইতে মার্চ ১৯৩৪ পর্যন্ত ইহা চালু ছিল। অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে (১৮-১৯ মে) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

দ্র *India Annual Register 1930-34*, N. N. Mitra ed., Calcutta; E. Wilkinson, L. Maltters and V. K. Krishna Menon, *Condition of India*, London, 1933; B. P. Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, Allahabad, 1935.

নির্মলকুমার বসু

আইন-ই-আকবরী আকবরের 'সচিব' ও 'প্রধানমন্ত্রী' আবুল ফজল -রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা আকবরের রাজত্ব-কালীন মোগল সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতিবিষয়ক এবং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিস্তারিত বিবরণ। এই গ্রন্থ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজপ্রাসাদ ও রাজসভা, রাজকোষ ও টাঁকশাল, মণিরত্ন ও মুদ্রা, খাদ্য ও গন্ধদ্রব্য, হস্তলিপি ও চিত্রকলা ইত্যাদি বিবৃত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে— সরকারি কর্মচারী ও সৈন্যের বিবরণ, উৎসব, মৃগয়া ও আমোদ-প্রমোদ এবং পণ্ডিত, কবি, গায়ক প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী; তৃতীয় অধ্যায়ে আকবর-প্রতিষ্ঠিত ইলাহী সংবৎ, মোগল সাম্রাজ্যের ভূমি-জরিপ ও রাজস্ব এবং বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ; চতুর্থ অধ্যায়ে হিন্দু-সাহিত্য ও -সভ্যতা এবং মুসলিম সাধুগণের জীবনী; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আছে আকবরের কথাসংগ্রহ। উনবিংশ শতাব্দীতে গেজেটিয়ার প্রকাশিত হইবার পূর্বে এইরূপ গ্রন্থ কোথাও রচিত হয় নাই। মোগল শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী ঐতিহাসিকগণের মূল গ্রন্থ। ইহাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন, সামরিক সংগঠন, রাজস্বনীতি ও শাসনপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। অবশ্য এই বিবরণ আদর্শ পদ্ধতির চিত্র অথবা প্রকৃত কার্যকর শাসনপদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত, তাহা সঠিক বলা যায় না। রাজস্ব ব্যতীত প্রাদেশিক বিবরণের মধ্যে আমরা কৃষি, বাণিজ্য, যানবাহন, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাই। বেশভূষা, খাদ্য, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া, উৎসব ও বিবাহবিধি ইত্যাদি সামাজিক ইতিহাসের উপাদানও আইন-ই-আকবরীতে রহিয়াছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এই গ্রন্থের মূল্য কম নহে। কবি, চিত্রকর, সংগীতজ্ঞ, সাধুপুরুষ ও সমসাময়িক অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত আছে। আকবরের কথাসংগ্রহ তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়।

দ্র H. Blochmann, *Ain-i-Akbari*, vol. I, Calcutta, 1939; H. S. Jarrett, *Ain-i-Akbari*, J. N. Sarkar's Introduction, vols. II & III, second edition; Calcutta, 1949.

সুকুমার রায়

আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রী) জার্মানীর অন্তর্গত উল্‌ম শহরে জন্ম; জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ঘটে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরী করিবার সময়ে আলোকের উদ্ভব এবং পরিণতি সম্বন্ধে এক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সেই বৎসরেই 'ইলেকট্রো-ডাইন্যামিক্‌স অফ মুভিং বডিজ' নামক প্রবন্ধে আইনস্টাইন যে নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করেন তাহা অবলম্বন করিয়াই আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেন এবং কাইজার হ্বিলহেল্‌ম্ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে নাৎসি অধিকার কালে ইহুদী বলিয়া আইনস্টাইনকে দেশত্যাগ করিতে হয়। আমেরিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রিন্‌স্টনে অবস্থিত ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্‌সড স্টাডি নামক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সেখানকার উদ্যানে যে স্থানে আইনস্টাইন প্রত্যহ পদচারণা করিতেন তাহা আজও 'আইনস্টাইন্‌স ওয়াক' নামে পরিচিত। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন রুজভেল্ট আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন যুদ্ধাস্ত্রে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের সম্বন্ধে আইনস্টাইন তাঁহাকে পরামর্শ দেন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারা যাঁহারা আজ পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আইনস্টাইনের নাম অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে এই শক্তিকে যাহাতে শুভ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে আইন-স্টাইন বিশ্বাস করিতেন যে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পক্ষে এক শাসনের অধিভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ভারতবর্ষের প্রতি আইনস্টাইনের শ্রদ্ধা ছিল। উচ্চতর গণিতের বিশেষ ক্ষেত্রে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম আইনস্টাইনের নামের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়াছে।

তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'দি মিনিং অফ রিলেটিভিটি' (১৯২১ খ্রী), 'ইনভেস্টিগেশনস্ অন দি থিওরি' (১৯২৯ খ্রী) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। এই মহান বিজ্ঞানী ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

আইবুড়ো ভাত বিবাহের পূর্বে শুভদিনে (কোথাও কোথাও পূর্বদিনে বা বিবাহদিনেও) অবিবাহিত পাত্র-পাত্রীকে ভোজন করাইবার লোকাচারসিদ্ধ অনুষ্ঠান। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। পাত্র-পাত্রীকে এই উপলক্ষে নূতন কাপড় দেওয়া হয়। নূতন কাপড় পরিয়াই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। পঞ্জিকায় ইহা অব্যূঢ়ান্ন এই সংস্কৃত নামে উল্লিখিত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আইসবার্গ পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে, শীতপ্রধান দেশে বা উঁচু পর্বতের উপরিভাগে কোনও নির্দিষ্ট উচ্চতার উপরে সকল সময়েই তুষার জমিয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যে নির্দিষ্ট সীমারেখার উপরিভাগের তুষার কখনও গলে না, তাহাকে হিমরেখা বলে। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, অক্ষাংশ এবং ঋতু ইত্যাদি বিষয়ের উপরে হিমরেখার উচ্চতা নির্ভর করে। হিমরেখার উপরে বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত তুষার স্তরে স্তরে জমিতে থাকে। তখন উপরের তুষারের চাপে নিম্নস্তরের তুষার বরফে পরিণত হয়। ইহারা উপরের চাপ ও পৃথিবীর আকর্ষণে স্থানচ্যুত হইয়া পর্বতের ঢালু উপত্যকা বহিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করিতে থাকে। এই বরফস্তূপকে হিমবাহ বলে। নাতিশীতোষ্ণ ও নিরক্ষীয় প্রদেশে হিমরেখা হইতে হিমবাহ কিছু নীচে নামিলে উত্তাপে বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়। সেই জলে অনেক সময়ে নদীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু মেরুপ্রদেশে উষ্ণতা কম বলিয়া হিমবাহ গলিয়া যায় না। জল অপেক্ষা বরফ হাল্‌কা বলিয়া অনেক সময়ে হিমবাহ সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়। মেরুপ্রদেশে হিমরেখা প্রায় সমুদ্র-সমতলে অবস্থিত। এইজন্য ঐসব অঞ্চলে অনেক সময়ে হিমবাহ হইতে প্রকাণ্ড বরফখণ্ড ভাঙিয়া সমুদ্রে নীত হয়। এই সব ভাসমান বরফখণ্ডকে হিমশৈল বা আইসবার্গ বলে। ভাসিতে ভাসিতে ইহারা সমুদ্রে বহুদূরে চলিয়া যায়। উষ্ণতর অঞ্চলে আসিলে ইহার বরফ গলিতে আরম্ভ করে। তখন ইহার অভ্যন্তরস্থ নুড়ি, কাদা, শিলা ইত্যাদি সাগর-গর্ভে সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ চড়ার সৃষ্টি হয়। উষ্ণস্রোতের সহিত হিমশৈল মিলিত হইলে কুয়াশার সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক সময়ে জাহাজ ইহার অবস্থান বুঝিতে না পারায় গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে।

অলক চক্রবর্তী

আই. সি. এস. ভারতে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস -এর তিনটি আদ্যক্ষর। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে, সমসাময়িক চিঠিপত্রে ও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কথার ব্যবহার থাকিলেও পদাধিকারীর পিছনে প্রাদেশিকতাবর্জিত সংক্ষেপিত 'আই. সি. এস.' আখ্যার প্রচলন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ ও বদলির নীতি ঘোষণার পর।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের চেষ্টায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন ও পূর্বেকার মনোনয়নপ্রথা রহিত হইলে মনোনীত প্রার্থীগণের পঞ্চাশ বছরের শিক্ষায়তন হেইলিবেরি কলেজ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া যায়। তদবধি প্রধানতঃ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষাই ছিল আই. সি. এস. -এ প্রবেশপথ। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বর্ষব্যাপী বিশেষ পাঠ্যক্রমের অনুশীলন ও অশ্বারোহণশিক্ষা সমাপ্তির পর ভারতসচিবের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরান্তে কর্মে নিযুক্ত ও ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেন। সদ্যনিযুক্ত অফিসারের কাছে বিভিন্ন বৃত্তিশ্রেণীর মধ্যে শাসনবিভাগের আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক, সেখানে কালক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্বও দুর্লভ ছিল না। বিচারবিভাগে সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে আসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেবল যোগ্যতার বিচারেই বৃত্তি-বণ্টন হইত মনে করা ভুল।

আই. সি. এস. -গোষ্ঠীতে ভারতীয় অনুপ্রবেশ আইন-সম্মত হইলেও সহজ ছিল না, কারণ বিদেশযাত্রা ছিল ব্যয়বহুল। দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান নিয়োগ আশানুরূপ সাফল্যের অভাবে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতে যুগ্মপরীক্ষার প্রবর্তন হয় নাই। শ্বেতাঙ্গ কায়েমি স্বার্থ ও অশ্বেতাঙ্গের সর্বাঙ্গীণ ব্রিটিশানুগত্যে সন্দেহই ছিল দ্রুত ভারতীয়করণের অন্তরায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেন প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ ভারতীয় আই. সি. এস ; কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দেও কিঞ্চিদধিক অর্ধেক পদ এবং দায়িত্বপূর্ণ প্রায় সমস্ত পদই ছিল শ্বেতাঙ্গদের করতলগত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানগণের এককালীন পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন 'সার্ভিস' আই. এ. এস. (ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস) -এর সৃষ্টি হইল। আই. সি. এস -এর সদস্যগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর অরাজকতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন ও নিয়মানুগ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে আই. সি. এস.-এর দান স্মরণীয়, কিন্তু ভারতহিতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ অক্লান্তকর্মা সমদর্শী ন্যায়নিষ্ঠ অফিসারের যে আলেখ্য চিত্রিত হয় তাহা অনেকাংশে কাল্পনিক। মুষ্টিমেয় লোকের কথা বাদ দিলে অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক —শিক্ষিত, ভদ্র ও কর্মক্ষম, কিন্তু স্বার্থসচেতন, গণ্ডীবদ্ধ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে উদাসীন এবং রাজনৈতিক সহানুভূতি-বিহীন। কর্মবিমুখ কেরানি-নির্ভর অফিসার বিরল ছিল না এবং যুদ্ধোত্তর কালে বহুবিঘোষিত সততার ভঙ্গুরত্বও ক্ষেত্রবিশেষে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শাসনযন্ত্র সচল রাখিয়া ভারতীয় আই. সি. এস. -গোষ্ঠীও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে জনসাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার

চেষ্টায় কেহ কেহ শ্যাম রাখিতে গিয়া কুল বিসর্জন দিয়াছিলেন।

শৈবালকুমার গুপ্ত

আইসোটোপ একই মৌলিক পদার্থের দুইটি পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম এক, অথচ পরমাণু দুইটির ভার পৃথক হইলে ইহাদের আইসোটোপ বলা হয়।

কোনও কোনও মৌলিক পদার্থের দুইটি পরমাণুতে সমসংখ্যক প্রোটন থাকিলেও নিউক্লিয়াসে সমাহৃত নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। অথচ পরমাণু দুইটিতে সমসংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। ক্লোরিন এইরূপ একটি মৌলিক পদার্থ।

	এক নং ক্লোরিন পরমাণু	দুই নং ক্লোরিন পরমাণু
নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা	১৭	১৭
নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা	১৮	২০
বিভিন্ন কক্ষে সমাহৃত ইলেকট্রন	২, ৮, ৭	২, ৮, ৭
পরমাণুর ভার	৩৫	৩৭
উভয়ের রাসায়নিক ধর্ম	সদৃশ	সদৃশ

ক্লোরিন পরমাণু তাহা হইলে দুই প্রকারের। ইহাদের পরমাণুর ভার ও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য আছে। ক্লোরিনের পরমাণুর ভার ৩৫·৪৬; অর্থাৎ উক্ত দুইটি আইসোটোপ এমন অনুপাতে মিশিয়া আছে যে, ইহাদের গড় ভার ৩৫·৪৬ হইয়াছে।

প্রাকৃতিক জলে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত দুই প্রকারের হাইড্রোজেন পাওয়া গিয়াছে। একটির পরমাণুতে নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও তাহাকে ঘেরিয়া একটি ইলেকট্রন ঘুরিয়া চলে। ইহার পরমাণুর ভার ১; অপরটির পরমাণুতে নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন অবস্থিত, ঘূর্ণমান ইলেকট্রন ১, পরমাণুর ভার ২, ইহা হাইড্রোজেন আইসোটোপ। ইহার অপর নাম ডয়টেরিয়াম। কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে আর একটি হাইড্রোজেন আইসোটোপ, ট্রাইটিয়াম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পরমাণুর ভার ৩, নিউট্রন সংখ্যা ২।

ইউরেনিয়াম বেশ ভারি মৌলিক পদার্থ। ইহার দুইটি আইসোটোপ, একটির পরমাণুর ভার ২৩৮; প্রোটন সংখ্যা ৯২, নিউট্রন সংখ্যা ১৪৬; অপরটির পরমাণুর ভার ২৩৫, প্রোটন সংখ্যা ৯২, নিউট্রন সংখ্যা ১৪৩।

ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় বা রেডিওঅ্যাকটিভ। ইহার পরমাণু আপনা-আপনি অন্য পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়। ইহার পরমাণু স্বতঃবিভাজনের ফলে ক্রমে রেডিয়ামে (পরমাণুর ভার ২২৬) পরিণত হয়। আবার ক্রমে রেডিয়াম হইতে লেড বা সীসায় (পরমাণুর ভার ২০৬) পরিণত হয়।

ইউরেনিয়াম বা রেডিয়ামের পরমাণুর বিভাজন প্রাকৃতিক ধর্ম বলা চলে। আজকাল সাইক্লোট্রোন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিভাজন সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে নবজাত পরমাণুগুলিও রেডিওঅ্যাকটিভ হয়। প্রচণ্ড বেগবান নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙিয়া পরমাণুর রেডিও-আইসোটোপ সৃষ্টি হইয়াছে।

নিউট্রন বর্ষণে সাধারণ কোবাল্টকে (৫৯) কোবাল্ট আইসোটোপে (৬০) পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। আইওডিন আইসোটোপ (১৩১) গলগণ্ডরোগে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কতকগুলি রেডিও-আইসোটোপ কার্বন-১৪, ফস্‌ফরাস-৩২ কৃষিবিজ্ঞানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরবিজ্ঞানের অনেক রহস্য, যাহা রেডিও-আইসোটোপ উদ্ভাবনের পূর্বে জানা ছিল না, আজ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ফস্‌ফরাস-৩২ বিশেষ করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। মস্তিষ্কের কোথায় ফোড়া হইয়াছে, তাহা আজ রেডিও ফস্‌ফরাসের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণু-বোমা তৈয়ারিতে প্রয়োজন হয়। ইহার মারণশক্তি প্রচণ্ড।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আইহোলি প্রাচীন অয্যাভোলে, আর্যপুর। উত্তর ১৬°৫০´, পূর্ব ৭৫°৫৭´। মহীশূর রাজ্যে বিজাপুর জেলায়, কাটগেরি স্টেশন হইতে ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরে মালপ্রভা নদীর অপর পারে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। চালুক্যবংশের রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। মেগুটি মন্দিরে দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে ক্ষোদিত শিলালিপি বর্তমান (৬৩৪ খ্রী)।

আইহোলির বৈশিষ্ট্য হইল, এখানে উত্তর ভারতের শিখর বা রেখ মন্দির এবং ধাপে ধাপে রচিত ছাদবিশিষ্ট দ্রাবিড়শৈলীর একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে। ৩।৪টি চতুরস্র আসনবিশিষ্ট রেখ মন্দির ভিন্ন শিখরযুক্ত দুর্গা মন্দিরের আসন আয়ত, কিন্তু পিছনের অংশ অর্ধবৃত্তাকার। পর্বতে ক্ষোদিত বৌদ্ধবিহারে এইরূপ আসন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

লাড়খানগুড়ি-কে কেহ কেহ দ্রাবিড়শ্রেণীর প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে গণ্য করেন। পিঢ়া বিশিষ্ট দেউলের প্রাচীন নিদর্শনও এখানে বর্তমান।

নকুলীশাদি বহু শৈবমূর্তি, অনন্তশায়ী এবং বামনাদি বিষ্ণুর কয়েকটি রূপ, ব্রহ্মাদি দেবতার প্রতিকৃতিও মন্দিরে ক্ষোদিত হইয়াছে। মূর্তিগুলি বলিষ্ঠ, সহজ ও সুন্দর।

দ্র Henry Cousens, *The Chalukyan Architecture of the Kanerese Districts,* Calcutta, 1926; Percy Brown, *Indian Architecture,* vol. I, Bombay, 1959.

নির্মলকুমার বসু

আউরেল স্টাইন স্টাইন, মার্ক আউরেল দ্র

আউল, আউলিয়া বলিতে বাউলসম্প্রদায়ভুক্ত এক-শ্রেণীর মুসলমান সাধককে বুঝায়। অবশ্য আউল ও বাউল বর্তমানে প্রায় সমার্থক। আউলসম্প্রদায়ের গুরু আউলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের গুরুপীঠকে 'গদি' বলে এবং পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ কয়েকটি গদি আছে। অনেকের মতে আউলগণের সাধনপদ্ধতি বাউলগণ হইতে অভিন্ন। সহজ কর্তাভজা নামেও ইহারা পরিচিত। প্রকৃতি লইয়া পারমার্থসাধনে ইহারা বিশ্বাসী।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭০; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

আউলচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি গুরু। কথিত হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উলা গ্রামবাসী মহাদেব বারুই তাঁহার পানের বরোজের মধ্যে অজ্ঞাত-কুলশীল যে শিশুটিকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন তিনিই পরবর্তী কালে আউলচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ হন। এইরূপ নামকরণের হেতু জানা যায় না। পাগলাটে বা আকুল স্বভাবের জন্য এই নাম হইতে পারে। সুফী সাধকদের উপাধি আউলিয়া এবং ইনি মুসলমান ফকিরের ন্যায় বেশ পরিধান করিতেন, সেই কারণেও এই নাম হইতে পারে। আউলচাঁদের গুরুর নাম জানা যায় না; কিন্তু অনুমান করা হয়, তিনি কোনও মুসলমান সহজ-সাধকের শিষ্য ছিলেন। আউলচাঁদের ভক্তগণ তাঁহাকে চৈতন্যদেবের অবতার মনে করিতেন। সুফীদের 'হক্' বা সত্য তাঁহার মতবাদের মূল হইলেও চৈতন্যভক্তিবাদের ইষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলোপের ভাব তাঁহার ধর্মমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার বাইশ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'কর্তাভজা' দ্র।

দ্র সুকুমার সেন, 'কর্তাভজার কথা ও গান', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭০।

আউলিয়া মনোহর দাস মনোহর দাস নামে দুইজন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে আউলিয়া মনোহর দাস 'পদসমুদ্র' ও 'নির্যাসতত্ত্বে'র সংগ্রহকর্তা। ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য। বিষ্ণুপুর ইঁহার আদি নিবাস। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া নানা তীর্থ পর্যটনের শেষে ইনি হুগলী বদনগঞ্জে বহুদিন বাস করেন। এই অঞ্চলের বহু বৈষ্ণব পরিবার তাঁহার শিষ্য। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনধামে গমনকালে পথিমধ্যে জয়পুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। বদনগঞ্জে মকরসংক্রান্তিতে তাঁহার স্মরণে মেলা বসে।

দ্র শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রী) আকবর আবুল ফতে জালালউদ্দীন মহম্মদ ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট্। বাবরের পৌত্র; হুমায়ুন ও হামীদাবানুর পুত্র। তাঁহার পিতা হুমায়ুন যখন শের শাহ্ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় অন্বেষণে বিব্রত, সেই সময়ে বর্তমান সিন্ধুদেশের অন্তর্গত অমরকোট নগরে তথাকার সহৃদয় রাজা প্রসাদের আশ্রয়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সম্রাট্ আকবর জন্মগ্রহণ করেন (১৫ অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রী)। শিকার, অশ্বারোহণ, তীরনিক্ষেপ ও অস্ত্র-বিদ্যায় আকবর উৎসাহী হইলেও গতানুগতিকভাবে তিনি শিক্ষালাভে মনোনিবেশ করেন নাই এবং শিক্ষকগণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরক্ষর। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুমায়ুন পাঠগৃহ হইতে পদস্খলনে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক আকবর তাঁহার বিচক্ষণ অভিভাবক বৈরাম খানের নেতৃত্বে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রথম চারি বৎসর কাল আকবর তাঁহার সুযোগ্য অভিভাবক বৈরাম খানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে বৈরাম পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রী) পরাজিত করেন এবং দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। তাহার

পর মানকোট দুর্গ অবরোধ করিয়া অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিকন্দর শূরকে দমন করেন। আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মোগল রাজ্য লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। বৈরামের শাসনকালে (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রী) আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর মোগল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিদ্রোহ দমন, রাজ্যজয় ও শাসনকার্যে সফলকাম হইলেও বৈরামের যথেচ্ছাচারিতায় আকবর ও আমীরগণ অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করেন এবং আকবর তাঁহাকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য হইতে অবসর দান করেন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে বৈরামের পতনের পর আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই; তিনি পরবর্তী চারি বৎসর অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। এই সময় হইতেই আকবর তাঁহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় দেন। অম্বরাধিপতি বিহারীমলের কন্যার প্রাণিগ্রহণ করিয়া বিবাহসূত্রে রাজপুত জাতির সহিত মৈত্রীস্থাপন এবং হিন্দুদিগের তীর্থ কর ও জিজিয়া কর রহিত করিয়া দেশবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়া রাজ্যস্থাপনের এই অভিনব নীতি তিনি অবলম্বন করেন। রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমান, বিজেতা ও বিজিতের সমান অধিকার— ইহা ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়।

এই সময় হইতে আকবর সাম্রাজ্যবিস্তারে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উত্তর ভারতের সমগ্র হিন্দু ও মুসলিম রাজ্য ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ তিনি একে একে জয় করেন। মালব (১৫৬২ খ্রী), গণ্ডোয়ানা (১৫৬৪), চিতোর (১৫৬৮), রনথম্ভোর ও কালঞ্জর (১৫৬৯), গুজরাট (১৫৭৩), বঙ্গদেশ (১৫৭৬), কাবুল (১৫৮৫), কাশ্মীর (১৫৮৬), উড়িষ্যা (১৫৯২), সিন্ধুদেশ (১৫৯৩), বেলুচিস্তান (১৫৯৪), কান্দাহার (১৫৯৫), বেরার (১৫৯৬), আহ্‌মদনগরের উত্তরাংশ (১৬০০) এবং খান্দেশ (১৬০১) মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবরের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে আহ্‌মদনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দূরদর্শী আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ ও স্বাধীনতা-প্রিয় রাজপুতদিগকে অস্ত্রবলের অপেক্ষা মৈত্রী দ্বারা জয় করা সহজ হইবে। তাঁহার উদার নীতির ফলে অম্বর, বিকানীর, জয়সলমীর, যোধপুর ও অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিগণ মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। কেবল মেবারের রানা তাহা স্বীকার করেন নাই। আকবর রানা প্রতাপকে হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬) পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপ মৃত্যুর পূর্বে (১৫৯৭) চিতোর ব্যতীত স্বদেশের প্রায় অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ আফগান সম্প্রদায়-গুলিকে দমন করিয়া ও সেই অঞ্চল স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া আকবর বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পারস্যের প্রবল প্রতাপশালী শাহ্‌ আব্বাস ও মধ্য এশিয়ার পরাক্রান্ত উজবেক সম্রাট্‌ আবদুল্লা খানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তিনি এই উভয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন। আকবর পারস্যের শাহ্‌ ও উজবেক সম্রাট্‌ উভয়কেই পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া বাস্তবিক কাহাকেও সাহায্য করেন নাই; বরং তাঁহার কূটনীতির ফলে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে আকবরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং মধ্য এশিয়ার আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মোগল সম্রাট্‌ সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। আকবরের বৈদেশিক নীতি তাঁহার বিচক্ষণ কূটনীতির পরিচায়ক। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় মুসলিম ধর্মবিষয়ের অধিনেতা (ইমাম, খলিফা) উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে তুরস্কের সুলতান ও পারস্যের শাহের সমকক্ষ বলিয়া মুসলিম জগতে প্রচার করিলেন।

মোগল শাসনপদ্ধতিতে আমরা আকবরের অনন্য-সাধারণ গঠনশক্তির পরিচয় পাই। আকবর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনে চারি জন মন্ত্রী সম্রাট্‌কে সাহায্য করিতেন; রাজস্ব বিভাগে দেওয়ান, সৈন্য বিভাগে মীর বখ্‌সী, রাজ-গৃহ পরিচালনা ও সরকারি কারখানা বিভাগে মীর সামান এবং ধর্ম, দাতব্য ও বিচার বিভাগে প্রধান সদর। আকবর তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য পনরটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি সুবা কয়েকটি সরকার বা জেলায় এবং প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি পরগনা, কিন্তু গ্রামের শাসনভার স্থানীয় পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

রাজকর্মচারীগণের নিয়োগ, পদমর্যাদা ও বেতন নিয়মিত করিবার জন্য আকবর মনসবদারি-প্রথা প্রবর্তন করেন। রাজকর্মচারীদিগকে তেত্রিশটি-শ্রেণীর মনসবদারে বিভক্ত করেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁহাদের পদমর্যাদা ও

বেতন নির্ধারিত করিয়া দেন। সামরিক বিভাগে আকবর নিয়ম-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রতারণা নিবারণের জন্য অশ্বগুলিকে সরকারি চিহ্নে চিহ্নিত করার প্রথা প্রবর্তন করেন। সৈন্যদলের নাম-পরিচয় দপ্তরে লিখিয়া রাখা হইত এবং নিয়মিত সময়ে তাহাদের সরকারি পরিদর্শনে উপস্থিত থাকিতে হইত। অবশ্য আকবরের পূর্বেও শের শাহ্ এবং আলাউদ্দীন খিলজীও এই নিয়ম প্রচলন করেন।

রাজস্ব বিভাগে আকবর বহুবিধ সংস্কার দ্বারা উন্নতি-সাধন করেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার বিচক্ষণ রাজস্ব-সচিব টোডরমল্লের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। জরিপ করাইয়া জমির উর্বরতা ও কৃষির অবস্থা অনুযায়ী জমি-গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। গত দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্য ও তাহার নগদ মূল্যের গড় ধরিয়া প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উহার নগদ মূল্য দেয় রাজস্বরূপে নির্ধারণ করিয়া দেন (১৫৭৯-১৫৮০ খ্রী)। আকবর বহু অবৈধ উপকর ও শুল্ক রহিত করিয়া প্রজাদের করভার লাঘব করিয়াছিলেন। রাজ্যের কতকাংশে (খালসা) সম্রাট্ রাজস্ব আদায় করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ ভূমির রাজস্ব আদায় করিতেন জায়গিরদারগণ। কর্মচারীরা সাধারণতঃ নগদ বেতন পাইতেন না; তাঁহাদের জায়গির হিসাবে জমি দেওয়া হইত। সেই জমির রাজস্ব আদায় করিয়া কর্মচারীরা (মনসবদারগণ) বেতন লইতেন এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। অধুনারচিত অনেক ইতিহাসগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, আকবর জায়গির-প্রথা রহিত করিয়া মনসবদারি-প্রথা প্রবর্তন করেন। এই উক্তি ভুল। আকবর জায়গির-প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য (১৫৭৩-১৫৭৮ খ্রী) তাহা রহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে নানাবিধ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেইজন্য (১৫৭৯-১৫৮০ খ্রী) গত দশ বৎসরের গড় আয় ধরিয়া জায়গিরগুলির সঠিক আয় নির্ধারণ করিয়া দেন এবং জায়গির-প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করেন।

আকবরের ধর্মমত লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এখনও মতভেদ রহিয়াছে। আকবর সুন্নী মুসলিম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন শিয়া এবং বাল্যকাল হইতেই তিনি সুফী সংস্পর্শে আসেন; ইহাই তাঁহার ধর্মমতের প্রথম পরিবর্তনের কারণ। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি সুফীসম্প্রদায় ব্যতীত হিন্দু যোগীদের সংস্পর্শেও আসেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মচর্চা করিতে ভালবাসিতেন এবং কখনও কখনও অতীন্দ্রিয় দর্শনে ভগবানের সাহচর্য অনুভব করিতেন। ধর্মালোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রীতে তিনি একটি ধর্মসভাগৃহ (ইবাদৎখানা) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই সভা মুসলিমগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আকবরের অনুসন্ধিৎসু মন কেবল ইসলাম ধর্মের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। এই সভায় তাঁহার আমন্ত্রণে জৈন ও জরথুশ্ত্র ধর্মের আচার্য এবং বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতের সমাগম হইল। আকবর তাঁহাদের সহিত ধর্মচর্চা করিতেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ করিলেন দীন-ই-ইলাহী প্রচার করিয়া। এই ধর্মের মত বা নীতি কি তাহা আকবর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। তবে সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা বিবিধ ধর্মের সমন্বয়। ইসলাম, খ্রীষ্ট ও ইহুদী ধর্মের একেশ্বরবাদ, হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্ম, জরথুশ্ত্র ধর্মের অগ্নি উপাসনা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসা ও সুফীবাদের মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি দীন-ই-ইলাহীর প্রধান উপাদান। বিবিধ ধর্মের সংশ্লেষ ও সমন্বয় ছিল আকবরের উদ্দেশ্য কিন্তু ইহা মধ্যযুগে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও মনঃপূত হইল না। আকবর কাহাকেও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই; আঠার জনের বেশি এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দীন-ই-ইলাহীর অবসান হয়। নিষ্ফল হইলেও ইহা আকবরের মহান আদর্শবাদ ও প্রশস্ত মানবতার পরিচয় দেয়।

আকবরের ধর্মমতের সহিত তাঁহার সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা জড়িত। তিনি সপ্তাহে দুইদিন পশু-পক্ষী বধ নিষিদ্ধ করেন, মদ্যপান দূর করিবার জন্য মদ্যবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেন এবং বাল্যবিবাহ, সগোত্রে বিবাহ ও বাধ্যতামূলক সতীদাহ নিবারণ করেন। মধ্যযুগে সমাজসংস্কারে আকবর বর্তমান যুগের অগ্রদূত।

আকবরের শেষজীবন ছিল দুঃখময়। তাঁহার পুত্রদ্বয় মুরাদ ও দানিয়ালের মৃত্যু, সেলিমের বিদ্রোহ, মাতৃবিয়োগ ও তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু আবুল ফজলের হত্যা আকবরের শেষজীবন বিষাদপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫/২৬ অক্টোবর মধ্যরাত্রিতে সম্রাটের দেহান্তর ঘটে এবং পরদিন আগ্রার প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরবর্তী সেকেন্দ্রায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

আকবরের চরিত্রে বিরোধী গুণের অপূর্ব সমাবেশ লক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন কোমল অথচ দৃঢ়, অমায়িক অথচ গম্ভীর, নিরক্ষর অথচ শিক্ষিত। স্বভাবতঃ দয়াশীল

হইলেও সময় সময় তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। ন্যায়পরায়ণ, সরলপ্রকৃতি এবং ক্ষমাশীল হইলেও তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইতেন। তিনি রাজাকে ভগবানের ছায়া মনে করিতেন, কিন্তু রাষ্ট্রকে ধর্মের বাহনরূপে গ্রহণ করেন নাই। মিতাচারী ও সংযমী, কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী, সুনিপুণ যোদ্ধা, বিচক্ষণ সাধক, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, আকবর ছিলেন উদারমতি ও গুণগ্রাহী। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। তাঁহার সভায় বহু গুণী ও জ্ঞানী লোকের সমাবেশ হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বদায়ূনী ও নিজামুদ্দীন, কবি ফৈজী ও উরফী, হাস্যরসিক বীরবল, সংগীতজ্ঞ তানসেন ও বজবাহাদুর, চিত্রকর সৈয়দ আলী ও আবদুস সমাদ, হস্তলিপিশিল্পী মহম্মদ হুসেন ও সর্বগুণসম্পন্ন আবদুর রহীম তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন। ফারসী ও হিন্দু সাহিত্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যেরও তিনি সমাদর করিতেন এবং তাঁহার আদেশে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। স্থাপত্য ও চিত্রকলায় তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ফারসী ও ভারতীয় চিত্ররীতির সমন্বয়ে তাঁহার সভায় মোগল চিত্রকলার উদ্ভব হয়। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি, ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদগুলি ও সেকেন্দ্রায় স্বীয় সমাধি-মন্দির আকবরের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। পারসীক ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ে মোগল সভ্যতার উদ্ভব হয় তাঁহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় : আকবর স্বয়ং সেই সমন্বয়ের প্রতীক।

দ্র Frederick Augustus, Count of Noer, *The Emperor Akbar*, vols. I & II, tr. Annette S. Beveridge, Calcutta, 1890 ; Vincent A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, 2nd edition, Oxford, 1919 ; Lawrence Binyon, *Akbar*, London, 1932 ; R. Grousset, *Figures de Proue*, Paris, 1948 ; E. Diez, *Akbar*, 1916 ; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

সুকুমার রায়

আকবরনামা আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আকবরের বিখ্যাত সচিব ও প্রাধনমন্ত্রী আবুল ফজল -রচিত আকবর ও তাঁহার পূর্বপুরুষের ইতিহাস। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তৈমুর হইতে হুমায়ুনের মৃত্যু পর্যন্ত তৈমুর বংশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের সিংহাসনে আরোহণ হইতে প্রথম সতর বৎসরের এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বের বিবরণ রহিয়াছে। আবুল ফজলের রচনাভঙ্গী অলংকারবহুল এবং জটিল। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যবশতঃ ঐতিহাসিক সত্য গোপন করিতে সময় বিশেষে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই ; তথাপি আকবরের রাজত্বকালীন মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ইহা মূল এবং অপরিহার্য গ্রন্থ। অপর কোনও সমসাময়িক অথবা পরবর্তী কালের ইতিহাসগ্রন্থে আকবরের রাজত্বের এত বিস্তারিত সঠিক তারিখযুক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়া ইনায়েৎউল্লা আকবরনামার উপসংহার লিখিয়াছেন।

দ্র H. M. Elliot and J. Douson, *History of India*, vol. VI, London, 1875.

সুকুমার রায়

আকবর হায়দারি[১] (১৮৬৯-১৯৪২ খ্রী) দক্ষিণ ভারতের ক্যাম্বে অঞ্চলের নজরালি হায়দার-এর পুত্র। শেষ বয়সে উপাধিসমূহ লাভ করিবার পর তিনি রাইট অনারেবল নবাব হায়দার নয়াজ জঙ্ বাহাদুর নামে সরকারি দপ্তরে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের ফিন্যান্স বিভাগের চাকুরিতে প্রবেশ করিয়া কর্মক্ষমতাবলে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ লাভ করেন। পরে হায়দরাবাদে নিজাম সরকারের চাকুরিতে যোগদান করিয়া মন্ত্রী ও শেষে উপদেষ্টা হিসাবে রাজ্যের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নাইট, পি. সি., ডি. সি. এল. (অক্সফোর্ড), এল. এল. ডি. (ওসমানিয়া ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়) ইত্যাদি সম্মান-সূচক উপাধিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য বড়লাটের কার্যনির্বাহক সভার (একজিকিউটিভ কাউন্সিল) সদস্য ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন।

আকবর হায়দারি[২] (১৮৯৪-১৯৪৮ খ্রী) পুরা নাম স্যর মহম্মদ সালর আকবর হায়দারি। বোম্বাই এবং পরে অক্সফোর্ডের বেলিয়াল কলেজ হইতে পাঠ সমাপনান্তে আই. সি. এস. চাকুরিতে যোগদান করেন। কার্য-ক্ষমতাগুণে তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের কয়েকটি উচ্চপদ লাভ করেন ও সি. আই. ই (১৯৩৫), সি. এস. আই. (১৯৪১ খ্রী), কে. সি. আই. ই. (১৯৪৪ খ্রী) উপাধিতে ভূষিত হন। দেশবিভাগের পর তিনি আসামের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হন এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৯৪৮ খ্রী)।

আকালী শিখসম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট অংশ আকালী নামে পরিচিত। গুরু নানক যখন শিখধর্মের প্রবর্তন করেন তখন আকালীদের উদ্ভব হয় নাই। দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন শিখসম্প্রদায়কে সামরিক দীক্ষা প্রদান করিয়া খালসার সৃষ্টি করেন তখন আকালীদের উদ্ভব হয়। কেহ কেহ বলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহই আকালী দলের বা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, অর্থাৎ তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশেই শিখসম্প্রদায়ের একটি যুদ্ধপ্রবণ অংশ কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব এবং আচরণ গ্রহণ করিয়া আকালী নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই মত কতদূর সত্য তাহাতে সন্দেহ আছে, কারণ গোবিন্দ সিংহের রচনাবলীতে এইরূপ নূতন সংঘ সৃষ্টির কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামরিক ভাবের প্রবর্তন করেন তাহার স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই আকালী-দের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুরু নানক যে প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সহিত আকালীদের রণোন্মাদনার কোনও মৌলিক সাদৃশ্য নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে (অর্থাৎ গুরু গোবিন্দ সিংহের ধর্মসংস্কারের পূর্বে) শিখসম্প্রদায়ের ইতিহাসে আকালীদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আকালী শব্দটি মূলতঃ অমরত্বসূচক এবং ঈশ্বরের দাসত্ববাচক। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আকালী ঈশ্বরের আদেশপালনে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধা। নীলবর্ণ পোশাক পরিধান করিয়া এবং লৌহনির্মিত বর্মে আবৃত থাকিয়া আকালী নিজেকে সাধারণ শিখ হইতে পৃথক করিয়া রাখে। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখসম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্য বিনা দ্বিধায় অকাতরে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে— এই শিক্ষাই তৎকর্তৃক সংগঠিত খালসার ভিত্তি। আকালীদের জীবনে এই মহৎ শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। কৃপাণ যে কেবলমাত্র তাহাদের নিত্যসঙ্গী ছিল তাহা নহে, কৃপাণকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের কর্মজগৎ এবং ভাব-জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কোনও পার্থিব প্রভুর কর্তৃত্ব স্বীকার করিত না। শিখদের ধর্মোন্মাদনা এবং সামরিক প্রেরণা আকালীদের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

শিখ ধর্মে সন্ন্যাসের স্থান নাই, ইহা গৃহস্থের ধর্ম। পারিবারিক এবং সামাজিক কর্তব্য পালনের মধ্যেই ঈশ্বর-সেবা এবং ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইবে, গুরু নানক এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। শিখগুরুগণ নিজেরাও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, সাধারণ গৃহী জীবন যাপন করিয়াই তাঁহারা গুরু নানকের নির্দেশিত পথে আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেন। আকালীরা এই ঐতিহ্যের মূলধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহারা পারি-বারিক বন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও সেবার মধ্য দিয়া জন-সমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত। যাহাদের রণোন্মাদনা অপেক্ষাকৃত কম তাহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম-মন্দিরে ভৃত্যের কাজ করিত। ইংরেজ ঐতিহাসিক কানিংহ্যাম দেখিয়াছিলেন, একজন আকালী শতদ্রু নদীর তীরে পার্বত্য অঞ্চলে জনসাধারণের সুবিধার জন্য পথ প্রস্তুত করিত, স্থানীয় লোকেরা ভক্তিভরে তাহার আহার্য জোগাইত। সামরিক ধর্মগ্রহণ আকালীদিগকে মানুষের প্রতি সাধারণ কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তবে অনেক সময় আকালীর তরবারি লুঠতরাজ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যে ব্যবহৃত হইত।

আকালীরা অমৃতসরে শিখদের কেন্দ্রীয় মন্দিরে সশস্ত্র প্রহরীর কার্য করিত। বিভিন্ন ধর্মোৎসবে কর্তৃত্বের ভার তাহারা গ্রহণ করিত। প্রতি বৎসর বৈশাখীতে এবং দেওয়ালিতে অমৃতসরে শিখদের কেন্দ্রীয় সভার (সরবৎ খালসা) অধিবেশন হইত। রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই কেন্দ্রীয় সভাই শিখদের কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য করিত। শিখ খণ্ডরাজ্যগুলির নেতৃগণ এই সভায় সমবেত হইয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। আকালীরা এই সভা আহ্বান করিত। তাহাদের এই অধিকার মানিয়া লইয়া শিখনায়কগণ আকালীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সামাজিক ব্যবস্থাতেও আকালীদের কর্তৃত্ব ছিল। ধর্মবিরোধী ও নীতিবিরোধী আচরণের প্রতিবাদ এবং শাস্তিবিধানের দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখসমাজে আকালীদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা মোগল ও আফগান রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত ধর্মরক্ষার প্রয়াসের অচ্ছেদ্য যোগ— এই সকল কারণে আকালীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সংকোচের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু রণজিৎ সিংহের শাসন-কালে এই প্রয়োজন দেখা দিল। আকালীরা যে কেবল-মাত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করিত তাহা নহে, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রতিবেশী ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত শিখ রাজ্যের সদ্ভাব বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। আকালীরা অত্যন্ত ইংরেজবিদ্বেষী ছিল; প্রকৃতপক্ষে তাহারা সকল বিদেশীকেই ঘৃণা করিত। ইংরেজ দূত

মেটকাফের দেহরক্ষীদল আকালীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর বিভিন্ন ঘাটে সৈন্য মোতায়েন রাখিতেন, নতুবা আকালীরা শতদ্রুর পরপারে ব্রিটিশ অধিকারে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ করিত।

তথাপি শিখসমাজে আকালীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, রণজিৎ সিংহের মত পরাক্রান্ত শাসকও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার প্রয়াস করিতে সাহসী হন নাই। তিনি নানা প্রকারে তাহাদিগকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। রণজিৎ সিংহের বাহিনীতে একটি আকালী অশ্বারোহী দল ছিল। যেখানে ঘোর বিপদের সম্ভাবনা থাকিত সেখানে এই দলকে প্রেরণ করা হইত। এই দল যখন লুঠতরাজে ব্যাপৃত হইত তখন বাধাদানের জন্য সাধারণ সৈন্যদিগকে নিয়োগ করা হইত।

শিখরাজ্যের পতনের পর আকালীদের প্রভাব ধর্ম-জীবনে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ বায়ুমণ্ডল দ্র

আকাশগঙ্গা আকাশ পরিষ্কার থাকিলে অন্ধকার রাত্রিতে মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, শাদা মেঘের মত একটি উজ্জ্বল পথ বেশ প্রশস্ত বৃত্তের মত আকাশকে উত্তর-দক্ষিণে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ বলে।

আকাশমণ্ডলে কতকগুলি উজ্জ্বল পদার্থ মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহাদের নাম নীহারিকা। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাষ্পময় এবং ইহাদের নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। অপর কতকগুলির আকৃতি কতকটা নির্দিষ্ট, ইহারা অসংখ্য ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি। এই ধরনের এক-একটি নীহারিকা এক-একটি নক্ষত্রভাণ্ডারবিশেষ। সূর্য যে নীহারিকার মধ্যে আছে তাহাকে আমরা সৌর নীহারিকা বলি। আকাশের ছায়াপথ এই সৌর নীহারিকা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ইহার মধ্যে প্রায় দশ হাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র আছে। ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছাইতে প্রায় ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার বৎসর লাগে।

বর্ষার শেষে, বিশেষ করিয়া সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর (ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত) মাসে প্রায় মাথার উপর দিয়া আকাশের উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত ঈষৎ শাদা ক্ষীণ আলোকের ছায়াপথও দেখা যায়। কালপুরুষ, ক্যাসি-ওপিয়া প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলের উপর দিয়াও বিভিন্ন ছায়াপথ দেখা যায়।

অলক চক্রবর্তী

আকাশপ্রদীপ আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সারা কার্তিক মাস সন্ধ্যাকালে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে তিলতৈল বা ঘৃতাদি দ্বারা আকাশে বা বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। বর্তমানে স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার অগ্রভাগে প্রদীপ বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তুলসীতলায় দীপ দেওয়ার প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায় (রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আকাশবাণী ১৯২২-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে যখন বেতার মারফত ঘরে ঘরে সংগীত-বক্তৃতা প্রভৃতি প্রচারিত হইতেছিল সেই সময়ে ভারতে কয়েকজন উৎসাহী বিজ্ঞানানুরাগী ছোট ছোট ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র স্থাপন করিয়া বেতার-বক্তৃতা ও গ্রামোফোন-সংগীত প্রচার করিতেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে এই বিষয়ে বহু ছাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। মাদ্রাজে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি বেতার পরিষদ্ বা ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯২৫-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের সম্মুখে টেম্প্‌ল চেম্বার্সের সর্বোচ্চ তলায় মার্কনি কোম্পানির বড় সাহেব জে. আর. স্টেপ্‌ল্‌-টনের অধ্যক্ষতায় একটি ছোটখাটো স্টুডিও স্থাপিত হয় ও সেখান হইতে বহু শৌখিন গায়ক ও বাদকের গান-বাজনা পরিবেশন করা হইতে থাকে।

এই সময় বেতার শুনিবার জন্য কোনও লাইসেন্স লইতে হইত না। তখন লাউড স্পীকার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতার ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) সীমার মধ্যে সন্ধ্যাকালে এক ঘণ্টা ভারতীয় অনুষ্ঠান ও আর এক ঘণ্টা ইওরোপীয় সংগীত পরিবেশিত হইত।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ের এফ্. এম্. চিনয় কোম্পানির কর্তৃপক্ষ (এটি পাশাদের একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান) সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসর (১৯২৭ খ্রী) ২৩ জুলাই বোম্বাই শহরে বেতার স্টেশন প্রথম চালু হয় এবং তাহার মাসখানেক পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট কলিকাতায় ১ গার্স্টিন প্লেসে আর একটি স্টেশন বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করিতে শুরু

করে। সন্ধ্যাকালে তিন হইতে চার ঘণ্টা নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন এরিক ডানস্টন ও তাঁহার অধীনে কলিকাতার প্রথম স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন সি. এস. ওয়ালিক্। এখানকার ভারতীয় অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর বেতারযন্ত্র রাখিতে হইলে লাইসেন্সের ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু সে সময় সারা ভারতবর্ষে লাইসেন্সের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের ঊর্ধ্বে উঠে নাই— তাহার মধ্যে ইওরোপীয়গণই বেশি লাইসেন্স গ্রহণ করতেন। লাইসেন্সের মূল্য দশ টাকা ধার্য হয়। পোস্ট অফিসের উপরই লাইসেন্স দিবার ভার ছিল। সরকার দুই টাকা কাটিয়া বাকি অর্থ কোম্পানিকে দিতেন। বহু ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সেই বেতার শুনিত— সরকার হইতে সেজন্য খুব চাপ দিবার বন্দোবস্ত ছিল না। ফলে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। পূর্বতন ইওরোপীয় কর্মীগণ স্টেশনে কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল অর্থব্যয়ের জন্য কোম্পানির অবস্থা সঙ্গিন হইয়া উঠিল এবং তদানীন্তন বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্য স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় ভারত সরকার এক বৎসর পরীক্ষামূলক-ভাবে বেতার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রতিষ্ঠানটির পূর্বতন নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম দেওয়া হইল 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস বন্ধ করিবার জন্য সরকার কৃতসংকল্প হইলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের তদানীন্তন সদস্য স্যর জোসেফ্ ভোর কোনক্রমেই বেতার পরিচালনা করিতে রাজী হইলেন না। জনসাধারণের আন্দোলন, বেতার অনুষ্ঠান পরিচালকদের বিনা মাহিনায় কাজ করার প্রস্তাব, স্টেপ্‌ল্‌টন সাহেবের যুক্তি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল।

অবশেষে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার সরকারের পক্ষে বেতারের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাবিস্তারে ও যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে প্রচারের ক্ষেত্রে বেতারের উপযোগিতা বুঝাইয়া দিলে স্যর জোসেফ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সরকার ভালভাবেই বেতার চালাইবেন। বেতার স্থায়িত্ব লাভ করিল। লাইসেন্সের ব্যাপারে কড়াকড়ি প্রবর্তিত হইল এবং বেতার ও কয়েকটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপর কর বসাইয়া ইহার আয় বৃদ্ধি করা হইল।

ইহার কিছুদিন পরে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লায়নেল ফিল্ডেন নামে ব্রিটিশ বেতারের এক দায়িত্বশীল কর্মীকে ভারতীয় বেতার-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য সরকার লইয়া আসিলেন। ফিল্ডেন আসিয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা স্টেশন নাট্য-বিভাগ, ছোটদের বিভাগ, বিদ্যার্থীমণ্ডল, কলেজের ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠান, সংগীতবিচিত্রা, বিচিত্র সংবাদ, অর্কেস্ট্রা, খেলাধুলার ও বাহিরের নানা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের রিলে, পুস্তক সমালোচনা, নাট্য ও সিনেমা সমালোচনা, সাহিত্য-বৈঠক সব কিছুই আরম্ভ করিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সুতরাং তিনি প্রথমে কলিকাতার আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণযোগ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, রাজধানী দিল্লীতে কোনও স্টেশন নাই। তখন তিনি সর্বাগ্রে দিল্লীতে বেতার স্টেশন স্থাপন করিলেন ও নিজ সহকারী রূপে এ. এস. বোখারিকে গ্রহণ করিলেন। বোখারি সাহেবের ভ্রাতা জেড্. এ. বোখারিকেও তিনি দিল্লী স্টেশনের কর্মকর্তা করিলেন।

ফিল্ডেন সাহেব কলিকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই ছাড়াও আরও সাতটি মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন ও দিল্লীতে একটি বড় শর্ট ওয়েভ স্টেশন স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারই উদ্যোগে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মাস তিনেক পরে দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রাত্যহিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংবাদপ্রচার-বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বহু ভাষায় একই সংবাদ সারা ভারতের বিভিন্ন স্টেশনের আপন আপন ভাষাভিত্তিক প্রয়োজন অনুসারে রিলে করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম বাজনার পক্ষপাতী না থাকায় ফিল্ডেন সাহেব তাঁহার মতানুবর্তী হইয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করার প্রথা বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' নাম পরিবর্তন করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' নাম রাখা হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বেতার মন্ত্রী বি. ভি. কেশকার 'বেতার জগৎ' পত্রিকার এক পুরাতন বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'আকাশবাণী' কবিতাটির সন্ধান লাভ করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' নামের পরিবর্তে 'আকাশবাণী' নামটি প্রচারের নির্দেশ দেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা ছাড়াও মাঝারি ও ছোটখাটো বহু স্টেশন প্রায় প্রতি প্রদেশেই স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইডেন

উদ্যানে নিজস্ব নূতন গৃহে আকাশবাণীর কলিকাতা শাখার কার্যালয় ও স্টুডিও স্থানান্তরিত হয়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

আকাশবিদ্যা এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে গমন-সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে আকাশবিদ্যা (অ্যাস্ট্রোনটিক্স) বলে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন জিলোকবৃস্কি (১৮৫৭-১৯৩৬ খ্রী) এবং ওবার্থ (১৮৯৪ খ্রী)। তাঁহারা রকেটের দহনপ্রক্রিয়ার জন্য তরল জ্বালানি ব্যবহার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রী) এই বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। রকেটকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে কতটা ব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধে এই সময়েই সবিশেষ গবেষণা আরম্ভ হয়। কোনও ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে গ্যাসের তীব্র বিস্ফোরণের শক্তি উহাকে চালিত করার জন্য তখন ব্যবহার করা হইত। গ্যাসের চাপের জন্য সৃষ্ট ক্রিয়ার সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া রকেটকে গ্যাসপ্রবাহের বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দেয়। কোনও আকাশযানকে চন্দ্রে পাঠাইতে হইলে তাহাতে এমন বেগ দেওয়া উচিত যাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল যানটিকে টানিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া না আনে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বেগের মান প্রতি সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার হইলে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত প্রভাব থাকে না। কোনও রকেটে ঐ বেগ দিলে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলক্ষেত্রের প্রভাব উহাতে থাকে না। সেজন্য ইহার পর আর চালনা করিবার জন্য বলের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন থাকে কেবল উহার দিক পরিবর্তনের জন্য এবং পুনরায় নিরাপদে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার মত বল। রকেট যদি যাত্রী-বাহী হয়, তাহা হইলে এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আন্তর্গ্রহ সংযোগের প্রধান অসুবিধা ছিল কোনও বস্তুতে ঐ প্রবল বেগ সঞ্চারিত করা। ঐ অসুবিধা সর্বপ্রথম দূর করেন রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারাই সর্বপ্রথম ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ করেন। ইহার পর হইতে এখন পর্যন্ত আমেরিকা ও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা বহু উপগ্রহ পৃথিবীর চারিপার্শ্বে আবর্তিত করাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মনুষ্য-বাহীও ছিল। 'রকেট' ও 'ক্ষেপণাস্ত্র' দ্র।

অলক চক্রবর্তী

আকাশমুখী, ঊর্ধ্বমুখী শৈব সাধু সম্প্রদায়। কৃচ্ছ্রসাধন হিসাবে যাঁহারা নিরন্তর আকাশের দিকে মুখ রাখিয়া অবস্থান করেন তাঁহাদের নাম আকাশমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী। এইভাবে অবস্থানের ফলে সাধকের গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের পেশীসমূহ সংকুচিত হইয়া গিয়া ঘাড় ফিরানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহারা জটাধারী ও শ্মশ্রু-গুম্ফধারী, ইহাদের দেহ ভস্মাচ্ছাদিত। কেহ কেহ রঙিন বস্ত্র পরিধান করেন। ইহারা ভিক্ষাজীবী।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৩ খ্রী।

আখ সুদীর্ঘ আর্দ্র ঋতু (অভাবে সেচ) এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩২° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট) ও ১৩° সেন্টিগ্রেড (৫৬° ফারেনহাইট) বিশিষ্ট অঞ্চলে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ ও চুনযুক্ত মাটিতে যত্নসহকারে চাষ করিলে আখের দৈর্ঘ্য ৬-৮ মিটার (২০-২৫ ফুট) পর্যন্ত হয়। কিন্তু নৈসর্গিক উত্তাপ হিমাঙ্কের নিকট নামিয়া গেলে অথবা বায়ুমণ্ডল অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া গেলে ফসলের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়। সেই কারণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আখ উৎপাদনকারী দেশগুলি ক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্র হইতে উত্থিত অথবা আগ্নেয়শিলা গঠিত সমতলভূমিতে অবস্থিত, যথা— কিউবা, পোর্টোরিকো, বাহামা, মরিশাস, জাভ, হাওয়াই, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি। উপক্রান্তীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষে ইহার চাষ ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে। এই ব্যতিক্রমের কারণ ভারতের কৃষি-অর্থনীতির কাঠামো, আবহাওয়া, জমির প্রকৃতি, বহির্বাণিজ্যনীতি এবং সর্বোপরি কোয়েম্বাটুর আখের সামগ্রিক সাফল্য।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুল্য নৈসর্গিক উত্তাপ দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত অঞ্চলে সহজলভ্য হইলেও মৌসুমি বায়ু -অধ্যুষিত ভারতের একমাত্র বঙ্গ দেশ ব্যতীত কোনও অঞ্চলেই বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপ্তি আখ চাষের পক্ষে যথেষ্ট নহে। উপরন্তু স্থানীয় চিনিকলের অভাবে অন্যতর সহজসাধ্য ফসলের চাষে বাংলাদেশের কৃষক আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের অন্যত্র আখ চাষে সেচের প্রয়োজন। গাঙ্গেয় সমভূমির মতন সেচের সুবিধা দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র নাই। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বর্ষাপুষ্ট হইবার ফলে সেচব্যবস্থা ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য দাক্ষিণাত্যে নৈসর্গিক উত্তাপের সুবিধা থাকিলেও আখ চাষ অপেক্ষা তৈলবীজ, তুলা ও চীনাবাদাম চাষ অনেক বেশি ব্যাপক। কিন্তু হিমালয়ের তুষারপুষ্ট উত্তর ভারতের নদীগুলির কল্যাণে ও জমির সহজ ঢালের জন্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে সেচব্যবস্থা সহজলভ্য। অন্যতর লাভজনক ফসল চাষ করিবার সুবিধা না থাকায়

পশ্চিম বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ ভারতের সর্বপ্রধান আখ-উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে দেড়গুণ বেশি, অথচ উৎপাদন ব্যয় উত্তর ভারতে কম। ভারতে প্রথম চিনিকল ওলন্দাজ ব্যবস্থায় ১৮৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে ইংরেজ ব্যবস্থায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম বিহারে স্থাপিত হয়। সমসাময়িক কালে নীল চাষের অবনতির ফলে আখ চাষ ঐ অঞ্চলে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতের চিনিশিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা চালু হয়, সে সময়ে সমগ্র ভারতে চালু ৩১টি কলের মধ্যে ১৪টি পূর্ব-উত্তর প্রদেশে এবং ১২টি পশ্চিম বিহারে অবস্থিত ছিল। সেই সময় হইতে চিনি-শিল্পে— এবং ঐ সূত্রে আখ চাষে— গাঙ্গেয় সমতলের ঐ অঞ্চলটি সর্বভারতীয় উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র কোয়েম্বাটুর আখের প্রচলন হইয়াছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জলদি, মাঝারি এবং নাবি জাতের আখ হইতে বীজ বা বীচন (আখ-এর চাষ বীজ হইতে হয় না, আখ-এর ডগা বা টুকরা মাটিতে বসাইলে প্রত্যেক গাঁটে যে চোখ বা অঙ্কুর থাকে তাহা হইতে গাছ জন্মায়) সংগ্রহ করিতে হয়। পাতা ছাড়াইয়া উভয় প্রান্ত বাদ দিয়া রোগ এবং কীট-মুক্ত আখ বীচনের জন্য মনোনয়ন করিতে হয়। একরে ৪০-৫০ মন বীচনের আখের প্রয়োজন হয়। তিনটি চোখ-বিশিষ্ট বীচন বা কাটিং একরে ১৬০০০ লাগে। বপনের পূর্বে রোগ-প্রতিষেধক ঔষধে শোধন করা উচিত।

সেচের সুবিধা থাকিলে কার্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে শুরু করিয়া মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত জাত অনুযায়ী লাগানো চলে। ইহার পরে বসাইলে ফলন কম হয়। বৃষ্টির ভরসায় চাষ করিলে মাঘ-ফাল্গুনে লাগানোই প্রশস্ত; কারণ গাছ বড় হইলে বর্ষার জল পাইয়া বাড়িতে পারে। আখ-এর বীচন জমিতে লম্বা নালী কাটিয়া বসাইতে হয়। মোটা জাতের আখ ৩½ ফুট, মাঝারি মোটা ৩ ফুট, মাঝারি ২½ ফুট এবং সরু আখ ২ ফুট অন্তর নালীতে বসাইতে হইবে। নালী কাটিয়া বীচন বসাইয়া পরে মাটির ভেলি বাঁধিয়া দিলে আখ বড় হইয়া ঢলিয়া পড়ে না।

বীচন হইতে ক্রমে আখের ঝাড় বৃদ্ধি হয়। একই ঝাড় হইতে পর পর তিন বৎসর আখ সংগ্রহ চলে, যদিও উৎপাদনের হার ও শর্করার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। পুরাতন ঝাড় হইতে সংগৃহীত আখকে 'রেটুন' বলে। 'রেটুন' হইতে আখের বীচন সংগ্রহ করা হয় না।

সবুজ সার ব্যবহার না করিলে একর প্রতি ৩০০ মন আবর্জনা সার দেওয়া উচিত। উত্তর ভারতে ১০০ পাউণ্ড এবং দক্ষিণ ভারতে ৩০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন একর প্রতি প্রয়োগে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

খরার কয়েক মাস ৩ সপ্তাহ অন্তর সেচ দিলে ভাল। বর্ষার পরও প্রয়োজন মত সেচ দিলে চিনির পরিমাণ বাড়ে। সেচের পর প্রথম দিকে গভীরভাবে নিড়ানি দিলে আগাছা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিকড় ও ঝাড় বাড়িবার সুযোগ পায়। বর্তমানে আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা প্রকার রসায়ন প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে।

জাত অনুসারে এবং লাগাইবার সময়ের উপর আখ কাটা নির্ভর করে। শীতের আরম্ভেই গুড় তৈয়ারি অথবা মিলের চিনি তৈয়ারির জন্য আখ কাটা আরম্ভ হয় এবং গ্রীষ্মের আরম্ভে শেষ হয়, কারণ গরমে আখের শর্করার পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে। আখ কাটার উপযোগী হইয়াছে কিনা তাহা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায় নচেৎ আখের গায়ে আঘাত করিলে যদি ভারি আওয়াজ হয় এবং রং যদি ফিকা হলুদ হয় তবে কাটার সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভারতে আখের নানা প্রকার রোগ হয়। তাহাদের মধ্যে ধসা রোগ মারাত্মক। রোগাক্রান্ত অঞ্চল হইতে বীচন সংগ্রহ করা উচিত নয়। আক্রান্ত আখ সমূলে উচ্ছেদ করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। ভুসা রোগের আক্রমণ কম। বীচন শোধন করিয়া লাগাইলে রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে আক্রান্ত অঞ্চল হইতে কোনও মতেই বীচন সংগ্রহ করা উচিত নহে। জমিতে উই থাকিলে নালীতে কীটনাশক ঔষধ দিয়া বীচন বসানো উচিত। মাঝরা এবং ডগা ছিদ্রকারী একজাতীয় পোকা আখের সমূহ ক্ষতি করে। বর্তমানে যন্ত্রের দ্বারা কীট-নাশক ঔষধ ছড়াইয়া সুফল পাওয়া যায়। আক্রমণ ব্যাপক হইলে বিমানের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন সময়ে চাষের উপযোগী আখের মধ্যে জলদি কোয়েম্বাটুর ৩১৩, মাঝারি কোয়েম্বাটুর ৫২৭ ও নাবি কোয়েম্বাটুর ৪১৯ উল্লেখযোগ্য। চাষীদের সকল প্রকার চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে নূতন আখ প্রজননের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেই সব জাতের আখ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলন করা হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহার মধ্যে কোনও কোনও উৎকৃষ্ট জাত আবার রোগের জন্য পরিত্যক্ত হয়। যেমন, পশ্চিম বাংলায় কোয়েম্বাটুর ৪৫৩

উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধসার ব্যাপক আক্রমণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দিনের উত্তাপ বাড়িলে রসে শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়া অল্পকালের মধ্যে কাটা আখ চিনিকলে আনিতে হয়। রস নিষ্কাশনের পর ছিবড়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া চিনিকলগুলি আখ-উৎপাদক অঞ্চলের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। মোটামুটি হিসাবে চিনির উৎপাদন ব্যয়ের ৫০% আখ খরিদে প্রয়োজন হয়। এতৎ-সত্ত্বেও মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চিনিকলগুলিকে ব্যবহৃত আখের ৩০%-৪০% রেলযোগে আমদানি করিতে হয়। বাকি ৬০%-৭০% আখ স্থানীয় চাষীরা নিজ ব্যবস্থায় শিল্পকেন্দ্রে লইয়া যায়। একমাত্র মহারাষ্ট্র অঞ্চলের চিনি-কলগুলি প্রায় ৮০% আখ নিজস্ব খামার হইতে সংগ্রহ করে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধের জন্য উভয় শ্রেণীর উৎপাদককেই নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কোনও বিশেষ ঋতুর অস্বাভাবিক প্রকৃতির জন্য একদিকে যেমন চিনিকলগুলিতে হঠাৎ আখ আমদানি বাড়িয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে তেমন কৃষকদের কাছে আখ প্রচুর পরিমাণে অবিক্রীত থাকিয়া যাইতে পারে।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত চিনিশিল্প সংরক্ষণ-নীতির প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৯৩২ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সারা ভারতে চিনিকলের সংখ্যা ৩২ হইতে বাড়িয়া ১৩২টিতে পৌঁছায়। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে চিনিকলের সংখ্যা ছিল ১৬০টি। ইহার সহিত ঐ সব বৎসরের মোট উৎপাদিত চিনির হিসাব পরীক্ষা করিলে এই শিল্পের উন্নতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হইবে। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোট উৎপাদিত চিনির পরিমাণ ছিল ১৬০০০০ টন; ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উৎপাদন ৬৪২০০০ টনে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোট উৎপাদন ছিল ২০০৬০০০ টন। অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর শিল্প-কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি না বাড়িলেও উৎপাদনপ্রথার প্রভূত উন্নতি ঘটে।

ভারতে উৎপাদিত আখের ৩০% চিনিকলে, প্রায় ৫০% গুড় উৎপাদনে এবং বাকি ২০% খাদ্য ও নানা প্রকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। মোটামুটি তিন প্রকার প্রথায় চিনি উৎপাদিত হয়। সর্বাধুনিক প্রথায় আখের রসের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বায়ুশূন্য পাত্রে সরাসরি দানা চিনি উৎপাদন করা হয়। দ্বিতীয় প্রথায় গুড় পরিষ্কার করিয়া এবং কেলাসিত চিনি বীজ হিসাবে নিয়োগ করিয়া দানা চিনি প্রস্তুত করা হয়। তৃতীয় প্রথায়, গুড় হইতে মিছরি ও বাটা চিনি জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করা হয়। উৎপাদন হারের দিক হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রথা অনুন্নত।

চিনিশিল্পের সহিত কয়েক প্রকার সহযোগী শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাদের মধ্যে মাৎগুড় হইতে মদ্য ও সুরাসারশিল্প এবং ছিবড়া হইতে কাগজশিল্প সর্বপ্রধান। ছিবড়া হইতে বোর্ড প্রস্তুত করা হয়। গুড় হইতে গবাদি পশুর খাদ্য এবং উহার সহিত আখের পাতা মিশাইয়া জমির সার প্রস্তুত করা চলে।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

আখড়া সংস্কৃত অক্ষবাট শব্দ হইতে উদ্ভূত। মূল অর্থ মল্লভূমি বা ক্রীড়াভূমি হইতে বর্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে, দল বাঁধিয়া বিশেষ কোনও একটি শখ বা বৃত্তি চর্চা করিবার স্থান, যেমন কুস্তির আখড়া, যাত্রার আখড়া, বৈষ্ণবের আখড়া অর্থাৎ কীর্তনস্থান। শব্দটি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র পর্যন্ত একই অর্থে প্রচলিত। বিহার এবং উত্তর প্রদেশেও ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায়ের মোহন্তরা যেখানে বাস করেন তাহাকে আখড়া বলা হয়। এই সকল আখড়ার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। মোহন্তের মৃত্যু হইলে এই সকল সম্পত্তির অধিকার লইয়া বিরাট মকদ্দমার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বঙ্গদেশের আখড়াগুলির মধ্যে বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চার আখড়াগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য আখড়াগুলি বর্তমান কালের 'ক্লাব'-এর ন্যায় বিশেষ একটি শখ চর্চা করিবার জন্য পরিচালিত হইত। তবে তাহার কার্য পরিচালনা সভ্যদের ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। অধিকাংশ সময়েই একজন পারংগম ব্যক্তি আখড়া স্থাপন করিয়া সেই বিশেষ শখের অনুরাগী ব্যক্তিগণকে সংগ্রহ করিয়া দল বাঁধিতেন এবং নিজেই আখড়াধারী অর্থাৎ কর্তা হইয়া অর্থসংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া আখড়ার যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা করিতেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে আখড়াধারী তাঁহার স্থলাভিষিক্তকে মনোনীত করিয়া যাইতেন, কোনও কারণে তাহা সম্ভবপর না হইলে আখড়ার সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত করিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই আখড়াগুলির মর্যাদা ছিল। দেশজ সংস্কৃতি চর্চায় ইহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

আখড়াই, হাফ-আখড়াই আখড়াই ও কবিগান পৃথক, যদিও আখড়াইয়ের প্রভাব কবিগানে পড়িয়াছিল।

কবিগান লোকরুচির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আখড়াই একপ্রকার বৈঠকী গান। আখড়াই নাম হইতেই বুঝা যায় আখড়ার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ জন্মসম্পর্ক ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন : 'শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে।' বৈষ্ণবদের আখড়ায় ইহার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়।

আখড়াই গানের প্রথম যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহাতে দুইটি মাত্র অংশ থাকিত, খেউড় ও প্রভাতী। এই সময়ে ইহা যেমন ছিল অশ্রাব্য, ইহার যন্ত্র ও সুরও ছিল তেমনই অকিঞ্চিৎকর।

শান্তিপুরের আখড়াই গানের দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়িল। এই পর্যায়ে ইহাতে দুইটির স্থলে তিনটি গান গাওয়া হইত— ভবানী-বিষয়, খেউড় ও প্রভাতী। কুরুচির শব্দসকল ক্রমশঃ বর্জিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আখড়াই গান এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। সেই সময় চুঁচুড়ার দলেরা বৎসরে দুই বার কলিকাতায় গান গাহিতে আসিত। ইহারা নাকি হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি বাইশখানি যন্ত্র বাজাইত এবং সেইজন্যে চুঁচুড়ার দলের নাম হইয়াছিল বাইশেরা। আখড়াই তখন পর্যন্ত পেশাদারি দলের হাতেই ছিল।

আখড়াই গানের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের (?-১৭৯৭ খ্রী) সভায় নিধুবাবুর মাতুল (মতান্তরে মাতুলপুত্র) কলুইচন্দ্র সেনের দ্বারা। আখড়াই গানের সংস্কার ও সংশোধন করিয়া কলুইচন্দ্র ইহাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নিধুবাবু ছাপরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শখের আখড়া স্থাপন করেন। এখানে তিনি সংশোধিত পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষা দিতেন। নিধুবাবু ইহার আরও উৎকর্ষসাধন করেন। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে অনেকগুলি আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতে আখড়াই গান ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিল। লোপ পাইবার প্রধান কারণ ছিল হাফ-আখড়াইয়ের প্রবর্তন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য মোহনচাঁদ বসু আখড়াইয়ের সহিত দাঁড়াকবি মিশাইয়া হাফ-আখড়াইয়ের সৃষ্টি করেন। প্রথমে রুষ্ট হইলেও নিধুবাবু পরে ইহা মানিয়া লন। এইভাবেই আখড়াইয়ের প্রচলন কমিয়া গিয়া হাফ-আখড়াইয়ের প্রচলন হইয়াছে।

আখড়াই গানের তিনটি অংশ, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে দেবী-বিষয়ক গান গাহিয়া তার পরে মিলনের আকাঙ্ক্ষামূলক লৌকিক প্রেমের গান গাওয়া হইত ; সবশেষে প্রভাতীতে থাকিত রজনী-প্রভাতের আশাভঙ্গসূচক আক্ষেপ। প্রতি গানই সংক্ষিপ্ত। ভবানী-বিষয়ের মহড়ায় ছাব্বিশ অক্ষরে একটি ত্রিপদী, চিতেনে ঐরূপ একটি ত্রিপদী এবং অন্তরাতে দুইটি ত্রিপদী। খেউড় ও প্রভাতীর মহড়া চিতেন ও অন্তরার অন্ততঃ প্রথম দুইটিতে চৌদ্দ অক্ষর অর্থাৎ একটি করিয়া পয়ার-পঙ্‌ক্তি। আখড়াইতে দুই দলে গান হইত বটে কিন্তু উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। গানে ও বাদ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইলেই জয়ী হওয়া যাইত। ইহাতে যেমন ধ্রুপদী ইত্যাদির মত আলাপ ও রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্য ছিল তেমনই বাদ্যযন্ত্রেরও বৈচিত্র্য ছিল। তানপুরা বেহালা মন্দিরা ঢোল মোচং করতাল সিটি সপ্তসারা জলতরঙ্গ বীণা বেণু সেতার প্রভৃতি একসঙ্গে বাজানো হইত। সংগতের গতি ছিল পাঁচ রকমের। পিড়েবন্দি, দোলন, দৌড়, সবদৌড় এবং মোড়। রাগ-রাগিণীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের এই পরিবর্তন আখড়াই সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হাফ-আখড়াইতে এত কৌশল ও কারুকার্য রক্ষিত হয় নাই। ইহার পদরচনাপ্রণালী অনেকটা কবিগানকে অনুসরণ করিয়াছে ; ইহার সাফল্যও নির্ভর করিয়াছে কবিগানের মতই উত্তর-প্রত্যুত্তরে। হাফ-আখড়াইয়ের পদরচনা ও মিল এইরূপ : চিতেন-ক, পরচিতেন-ক, ফুকা-খখ, ডবল ফুকা-গ, মেলতা-ঘ, মহড়া-ঘ, খাদ-ঘ, দ্বিতীয় ফুকা-ঙঙ, দ্বিতীয় ডবল ফুকা-চ, দ্বিতীয় মেলতা-ঘ। দাঁড়াকবির সহিত ইহার পার্থক্য ডবল ফুকার প্রবর্তনে। ইহাতে অন্তরা থাকে না। আখড়াইতে সখী-সংবাদ ছিল না, ইহাতে আছে। আখড়াইয়ের সব বাদ্যই হাফ-আখড়াইতে চলিত। 'কবিওয়ালার গান' দ্র।

দ্র গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, প্রাচীন কবি-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, মনোমোহন-গীতাবলী, কলিকাতা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ; ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮।

ভবতোষ দত্ত

আখেরি চাহার শুম্বা হিজরা বৎসরের দ্বিতীয় মাস শফর-এর শেষ বুধবারে মহম্মদ দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে পথ্যগ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর এই দিনটি শুভদিন গণ্য করিয়া মহম্মদের অনুগামী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ উৎসব দিবস হিসাবে ইহা পালন করেন। এই উপলক্ষে কোরান শরীফ পাঠ এবং দরিদ্রকে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ

করার প্রথা আছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে উৎসবটি পালিত হয়, অন্যান্য মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে উৎসবটির তেমন প্রচলন নাই। ইসলামে উৎসবটির অনুমোদন নাই।

আবুল হায়াত

আগম তন্ত্রশাস্ত্রের নামান্তর বা প্রকারভেদ। বলা হয় আগমের আলোচ্য বিষয় সাতটি: সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের অর্চনা, সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। আগম শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। কোনও মতে আগত, গত ও মত এই তিনটি শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া আগম শব্দ গঠিত। এই মতানুসারে যাহা শিবমুখ হইতে আগত, গিরিজার মুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত তাহাই আগম অর্থাৎ ইহা শিব-পার্বতী-সংবাদরূপে নিবদ্ধ— ইহার বক্তা শিব ও শ্রোত্রী পার্বতী। এইরূপে যাহার বক্ত্রী পার্বতী ও শ্রোতা শিব তাহা নিগম —ইহা গিরিজার মুখ হইতে নির্গত, গিরিশের কর্ণে প্রবিষ্ট এবং বাসুদেবের অভিমত। পিঙ্গলামত নামক তন্ত্রের মতে আগম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে সেই শাস্ত্র যাহা হইতে চতুর্দিকের বস্তুসমূহ (আজ্ঞা) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় (গম্যতে)। সাধারণতঃ আগম ও তন্ত্র তুল্যার্থে ব্যবহৃত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আগমনী শরৎকালে দুর্গাপূজার সময় হিমালয়কন্যা পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রচিত জনপ্রিয় বাংলা গান। দুর্গাপূজার মধ্যে সাধক গৃহস্থ কর্তৃক দুর্গারূপিণী কন্যার সমাদরভাবের আভাস আছে। গানগুলিতে বাৎসল্য ও করুণরসের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙালীর ঘরের কথা— বাঙালী পরিবারের কন্যা ও জামাতৃগৃহের বিরোধের কথা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত গান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দ্র

আগরওয়ালা অগ্রবাল দ্র

আগরতলা ত্রিপুরার রাজধানী। ইহার অবস্থান ২৩° ৫০´ উত্তর, ৯১°২৫´ পূর্ব। হায়োরা নদী শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শহরের জনসংখ্যা ৫৪৮৭৮ (পুরুষ ২৯২৮১ এবং নারী ২৫৫৯৭)। নারী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৭৪ : ১০০০। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা ১৮৭৯৫ এবং নারীর সংখ্যা ১১৩৯৫। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের পরিসংখ্যান বিচার করিলে দেখা যায় জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে, গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে এবং নানা কর্মে নিযুক্ত আছেন। চীফ্ কমিশনারের দপ্তর ও অ্যাসেম্ব্লি এই শহরেই অবস্থিত। দর্শনীয় স্থান-রূপে রাজপ্রাসাদটি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বিশেষ ভক্তসমাগম হয়; দেবীমূর্তিটি স্বর্ণমণ্ডিত। শহরে সরকার-পরিচালিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে (মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ); প্রতিষ্ঠানটি শহরের একপ্রান্তে একটি টিলার উপরে মনোহর পরিবেশে অবস্থিত। এই রাজ্যে কোনও রেলপথ বা জলপথ না থাকায় এবং নিকটতম রেল স্টেশনটি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় মূলতঃ বিমান চলাচল এবং অধুনা-নির্মিত আসাম-আগরতলা রোডের সাহায্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত পরিবহন-যোগাযোগ রক্ষিত হয়; শহরের নিকটে একটি বিমানবন্দর আছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত রীতিমত বিমান চলাচল আছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Eastern Bengal & Assam*, Calcutta, 1909; *Census of India : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগস্ট আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আইনমাফিক ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করেন। কংগ্রেসের দাবি হইল, যুদ্ধের লক্ষ্য যদি ফ্যাসিজমের ধ্বংস ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তবে ভারতের স্বাধীনতার দাবি আশু স্বীকৃত হওয়া উচিত। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জাপানের কুক্ষিগত হইলে ব্রিটিশ শক্তি প্রয়োজনানুসারে ভারতের কতকাংশ হইতে পশ্চাদপসরণের জন্য প্রস্তুত হন। ভারতীয় জনসাধারণের মনে অবসাদ ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি জাপানী সৈন্য ভারতে আসিয়া পড়িলেও তাহাদের প্রতিরোধ করিবার স্পৃহাও যেন লুপ্ত হয়।

এই অধঃপতন নিবারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা করেন। তাহার মূল কথা এই: জনসাধারণ ঘোষণা করুক যে ভারতকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারত-বাসীর এবং সেই দায়িত্ব পূরণের প্রথম ধাপ হইল, অহিংস

সত্যাগ্রহের দ্বারা ব্রিটিশ শক্তির কবল হইতে আশু মুক্তি-লাভ করা। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৬/৭ আগস্ট বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজী মন্ত্র দেন— 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'— করিব না হয় মরিব। ৮ আগস্ট কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কারাগারে প্রেরিত হন। সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবাদী কর্মীবৃন্দের অধিকাংশকে বন্দীশালায় আটক করা হয়।

বঙ্গদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তাহারা আন্দোলন পরিচালনা করে। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া, রেলের লাইন অপসারণ করিয়া তাহারা গভর্নমেণ্টের যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করে। গভর্নমেণ্ট আপিশে, থানায়, ব্রিটিশ পতাকার পরিবর্তে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টায় নাগপুর প্রভৃতি শহরে বহু স্বেচ্ছাসেবী নিহত হয়। বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলাতে জনসাধারণ সুসংবদ্ধভাবে থানা অধিকার করিবার চেষ্টা করে। হাতে বন্দুক পাইয়াও তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়। অনেকে নিহত হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরা-র নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ সরকার রেল চালু রাখিবার উদ্দেশ্যে পথের দুই পাশের গ্রামগুলিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, মেদিনীপুরেও তদ্রূপ হয়। আন্দোলন দমনের জন্য ৭৮২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলি বর্ষণে নিহত হয় ৯৪০ জন, আহত হয় ১৬৩০ জন। আন্দোলনের উগ্রতা কিছুদিনের মধ্যে প্রশমিত হইলেও মারাঠা দেশে ও মেদিনীপুরে 'স্বাধীন ভারতীয় সরকার' চালু থাকে। ইংরেজের দমননীতি জনশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। দেখা গেল, যে অবসাদ দেশের মনকে পূর্বে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহার পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— ব্রিটিশ সামরিক শক্তির নিকটে সাময়িক পরাজয় ঘটিলেও মনের পরাভব ঘটে নাই।

নির্মলকুমার বসু

আগা খাঁ[১] (১৮০০-১৮৮১ খ্রী) প্রকৃত নাম হাসান আলী শাহ্; জন্ম পারস্যে। হজরত মহম্মদের কন্যা ফতিমা ও জামাতা আলীর বংশজ। পারস্যরাজ-কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত এই উপাধি বংশগত উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। পারস্যরাজের কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে তিনি আবদ্ধ হন। পারস্য দেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি কেরমান প্রদেশের গভর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু রাজরোষে তাঁহাকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আফগানিস্তান এবং সিন্ধু-প্রদেশে ইংরেজ সরকারের প্রভুত্ববিস্তারকল্পে তাঁহার সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মগুরু হিসাবে তাঁহার প্রভাব সিন্ধু প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম হিসাবে স্বীকার করিয়া লন এবং একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দৃশ্যতঃ ইমাম পদের স্বীকৃতিস্বরূপ হইলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহা ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিবার পুরস্কার। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজের প্রভাব-বিস্তারে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বোম্বাই শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করিবার পর তিনি স্থানীয় ঘোড়দৌড় সংস্থার কর্তাব্যক্তিস্বরূপ হইয়া খ্যাতিলাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত শুধু ভারতের নহে, আফগানি-স্তান খোরাসান আরব মধ্য এশিয়া সিরিয়া মরক্কো প্রভৃতি সকল দেশের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরূপে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।

আগা খাঁ[২] প্রকৃত নাম আগা আলী শাহ্, প্রথম আগা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আগা খাঁ হিসাবে ঘোষিত হন। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সম্ভাবনাপূর্ণ এক প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের অবসান হয়।

আগা খাঁ[৩] (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রী) প্রকৃত নাম মহম্মদ শাহ্, দ্বিতীয় আগা খাঁ-র একমাত্র পুত্র। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে আগা খাঁ রূপে ঘোষিত হন। নয় বৎসর বয়সে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে আজীবন মাসিক এক হাজার টাকার বৃত্তি এবং 'হিজ্ হাইনেস' উপাধি দান করেন। বিদুষী মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আদব-কায়দায় তিনি পূর্ণ-মাত্রায় অধিকারী হইয়াছিলেন। যৌবনকালেই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দাবি করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো-র নিকট আবেদনপত্র পেশ করেন। তাঁহাকে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তিনি ইংরেজ সরকারের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তুর্কী-ইটালীয় যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত,

ইংরেজের সকল সংকটেই আগা খাঁ ভারতীয় মুসলিম জনসমাজকে বিশেষ করিয়া তাঁহার অনুগামী ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়কে তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে তাঁহার অবদান সামান্য নহে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন-আইন প্রণয়নে তাঁহার হাত ছিল। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের রাউণ্ড-টেব্‌ল কনফারেন্‌সে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সভার তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনেভাস্থিত লীগ অফ্‌ নেশন্‌স-এর অ্যাসেম্ব্লির সভাপতি নির্বাচিত হন। এইরূপ রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আগা খাঁ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বারংবার মুসলমান সম্প্রদায়কে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। রেসের ঘোড়ার উন্নত প্রজনন-প্রতিষ্ঠানরূপে তাঁহার আস্তাবলের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি অনেক বার বিজয়ী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তিরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আগুরী উগ্রক্ষত্রিয় দ্র

আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানসমূহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। সে অবস্থায় উহাদের গলিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু চারিপার্শ্বের বিভিন্ন উপাদানের প্রচণ্ড চাপে সেগুলি প্রায় স্থিতিশীল ও নরম থাকে। কাজেই যখনই কোথাও ভূ-আন্দোলনের ফলে বা অন্য কারণে উপর দিকের স্তরে চাপের সমতা নষ্ট হয়, তখন ভূ-অভ্যন্তরস্থ এই নরম পদার্থসমূহ তরল হয় এবং ইহাদের আয়তনও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল বা দুর্বল অংশ থাকিলে উহা ভেদ করিয়া এই সকল গলিত পদার্থ কিছু পরিমাণ গ্যাস সহ সবেগে বাহির হইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় নির্গত পদার্থসমূহ নদীপ্রবাহের মত বহিয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে তাহা স্তূপ বা শঙ্কু-র (কোন্) আকারে জমিয়া যায়। এইরূপে ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশে বিভিন্ন ছোট-বড় পর্বতের সৃষ্টি হয়। যেগুলির মধ্য হইতে আগ্নেয় পদার্থ বাহির হয়, সেগুলিকে আগ্নেয়গিরি বা আগ্নেয় পর্বত বলে। প্রথমে আগ্নেয়গিরি থাকে শুধু সরু ফাটল বা সুড়ঙ্গ মাত্র। পরে ধীরে ধীরে ইহার আকার পরিবর্তিত হইতে থাকে। আগ্নেয়গিরি স্থলভাগ বা সমুদ্রগর্ভেও থাকিতে পারে।

আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়া বাহির হইবার পূর্বে উত্তপ্ত লাভা, ভস্ম প্রভৃতি ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নীচে কোনও গহ্বরে সঞ্চিত থাকে। এইরূপ গহ্বরকে আগ্নেয় গহ্বর (ম্যাগ্‌মা চেম্বার) বলে। লাভা প্রভৃতি পদার্থের ঊর্ধ্ব-উৎক্ষেপকে অগ্ন্যুৎপাত এবং গলিত পদার্থগুলিকে ম্যাগ্‌মা বলে। আগ্নেয় গহ্বর হইতে সরু ফাটলের মধ্য দিয়া সকল উত্তপ্ত পদার্থ উপর দিকে আসিয়া একটি মুখের মধ্য দিয়া বেগে বাহিরে আসে; ঐ মুখকে জ্বালামুখ বলা হয়। অনেক সময়ে প্রধান মুখের নিকটে অনেক অপ্রধান ছোট ছোট মুখ থাকে। উহাদের গৌণ জ্বালামুখ বলে। তাহাদের মধ্য দিয়াও লাভা, ভস্ম ইত্যাদি বাহির হয়।

পৃথিবীতে প্রায় এক হাজারেরও অধিক আগ্নেয়গিরি আছে। ইহাদের সকলের অবস্থা একরকম নহে। কয়েকটি আগ্নেয়গিরি হইতে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। তাহাদিগকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বলে। এরূপ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি চারি শতেরও অধিক। ব্রহ্মদেশের কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি হইতে কর্দম নির্গত হয়। যে সকল আগ্নেয়গিরি হইতে অবিরত উত্তপ্ত লাভা প্রভৃতি বাহির হয় তাহাদের অবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে। ইটালীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত লিপারী দ্বীপের স্ট্রম্বলী হইল অবিরাম আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরি হইতে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাদিগকে সবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে। ইটালীর ভিস্যুভিয়াস সবিরাম আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরি বর্তমান কালে অগ্ন্যুদ্গার করে না, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহাদিগকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। যথা, জাপানের ফুজিয়ামা। যে আগ্নেয়গিরি বহুদিন যাবৎ নিষ্ক্রিয় ও যাহার জীবন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা মৃত আগ্নেয়গিরি। যথা, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বতের চিম্বোরাজো (৬২৫০ মিটার)।

আগ্নেয়গিরিসমূহ ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত নহে। ভূ-ত্বকের দুর্বল এবং ক্ষীণ স্থানেই আগ্নেয়গিরির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্র-উপকূলে ভূ-ত্বক সাধারণতঃ দুর্বল বলিয়া সমুদ্র-উপকূলে, সমুদ্র-গর্ভে ও দ্বীপ-বেষ্টনীতে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রশান্ত মহাসাগরের তটদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী আগ্নেয়গিরিশ্রেণীকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা বলা হইয়া থাকে। অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের আগ্নেয়গিরিশ্রেণী আইসল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে স্কটল্যাণ্ড, আজোরস্‌ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি হইয়া গিনি উপসাগরে গিয়াছে। ইহারই অপর আর এক শাখা

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে গিয়াছে। ফ্রান্সের অভার্ন হইতে আরম্ভ করিয়া জার্মানী, ইটালী, ঈজিয়ান, ককেশাস হইয়া ইরান এবং বেলুচিস্তানের আগ্নেয়গিরির শ্রেণী রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা আগ্নেয়-গিরি সৃষ্টির তিনটি কারণ স্থির করিয়াছেন। ইহার একটি বা অধিক কারণ ঘটিলেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। একটি কারণ প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে। অপর কারণ হইল: ১. পৃথিবীর অভ্যন্তরে রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে তাপ বিকীর্ণ হওয়ার ফলে মধ্য-ভাগের কতক অংশের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে অন্যান্য উপাদানগুলির তরল হইবার সম্ভাবনা থাকে। ২. পৃথিবীর উপরিভাগের জল বিভিন্ন ফাটল দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প এবং ভূ-অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট গ্যাস ও ভূ-গর্ভস্থ উপাদানসমূহ শীতল হইবার সময় যে বাষ্প পরিত্যাগ করে তাহা সমবেতভাবে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থে প্রচণ্ড চাপ দেয়। উপযুক্ত ফাটল পাইলে তখন উহা বাহির হইয়া আসে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া মালভূমির সৃষ্টি হয়। এইভাবে সৃষ্ট দাক্ষিণাত্যে ৫১৮০০ বর্গ কিলোমিটার (২০০০০০ বর্গ-মাইল) স্থান 'কৃষ্ণ-মৃত্তিকা' অঞ্চল। আগ্নেয়গিরির ভস্ম, লাভা প্রভৃতি সমুদ্রে সঞ্চিত হইয়া কখনও মহাসাগরীয় আগ্নেয় দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এইভাবে হাওয়াই দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার মূল্যবান খনিজ পদার্থ সঞ্চিত করে। পৃথিবীর অধিকাংশ গন্ধকের উৎপত্তিস্থান আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কখনও কখনও সমুদ্রে ভীষণ তোলপাড় হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের নিকট ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে তথাকার সমুদ্রে ১৫ হইতে ৩০ মিটার উচ্চ ঢেউয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ১৬০ কিলোমিটারব্যাপী স্থানে ঝড় হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পেলি আগ্নেয় পর্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেণ্ট পিয়েরে নামক স্থান সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল।

অলক চক্রবর্তী

আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরকপূর্ণ যে সকল অস্ত্র অগ্নিসংযোগে সক্রিয় হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর বা ধাতব খণ্ডকে প্রচণ্ড বেগে দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেগুলিকেই সাধারণতঃ আগ্নেয়াস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই হিসাবে প্রধানতঃ কামান, বন্দুক প্রভৃতিকেই আগ্নেয়াস্ত্র বলা যায়। প্রজ্জলিত অগ্নিনিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্রকেও কেহ কেহ আগ্নেয়াস্ত্র আখ্যা দিয়াছেন। যাহা হউক, কোন্ সময়ে মানুষ সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শুরু করিয়াছিল, সে-কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে রামায়ণ, মহা-ভারতেও এমন কতকগুলি অস্ত্রের বর্ণনা আছে, যাহা হইতে সেগুলিকে আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়াই মনে হয়। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই থাকুক, পরবর্তী যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিবরণ হইতেও জানা যায় যে, তীরসংযোগে প্রজ্জলিত দাহ্য পদার্থ দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইত। আগ্নেয়াস্ত্র আখ্যা দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এইগুলি ঠিক আগ্নেয়াস্ত্রের পর্যায়ে পড়ে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রমবিকাশের সূচনায় আমাদের অতি পরিচিত হাউই-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্ররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যেই হাউই উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে কোনও বস্তুকে প্রচণ্ড বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে— এইরূপ চিন্তার ফলেই প্রথমে হাউইয়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। কিন্তু কোথায় এবং কাহার দ্বারা সর্বপ্রথম হাউই উদ্ভাবিত হয়, তাহা জানা না গেলেও ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা যে এই হাউইয়ের সাহায্যেই আক্রমণকারী মোঙ্গলদের বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহার নজির আছে। শুনা যায়, টিপু সুলতানও নাকি যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে হাউই ব্যবহার করিয়াছিলেন। চীনাদের হাউই ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে উপনীত হয় এবং রকেট নামে পরিচিতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রকেটের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তাহার পর নানা রকম অসুবিধার ফলে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া যায়। তখন তরবারি, বর্শা, তীর-ধনুক প্রভৃতিই প্রধানতঃ যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং ক্রস-বো ও লং-বো তখন অতি মারাত্মক অস্ত্র ছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝায়, যেমন —কামান, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি— তাহা আবিষ্কৃত হয় ইওরোপেই এবং সেখানেই এই সকল আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে থাকে। বারুদের ব্যবহার জানা থাকা সত্ত্বেও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে বারুদের সাহায্যে গোলা-গুলি নিক্ষেপের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। কেবল মাত্র গ্রীক-ফায়ারের মত অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া শত্রুদের মধ্যে ভীতি উৎপাদনের জন্য বিস্ফোরকরূপেই বারুদ ব্যবহৃত হইত। চতুর্দশ শতাব্দীর

প্রথম ভাগে অবরোধ প্রভৃতি ব্যাপারে কামানের ব্যবহার শুরু হইবার পর হইতে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকৃত অগ্রগতি লক্ষিত হইতে থাকে। ১৩৩৮-১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে প্রথম কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়। গোলা হিসাবে প্রথমে ইহাতে প্রস্তরখণ্ড, লোহার টুকরা, বোল্ট, পেরেক প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস ব্যবহার করা হইত। লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগে জলন্ত পলিতা অথবা রক্তবর্ণে উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের সাহায্যে কামানে অগ্নিসংযোগ করা হইত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ অগ্নিসংযোগের এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৩৭৬ খ্রী) প্রস্তর বা লৌহখণ্ডাদির পরিবর্তে শেলের প্রচলন হয়। এইগুলিকে গ্রেনেড বা বম্ বলা হইত।

লৌহ-নলের মধ্যে বারুদ পুরিয়া গুলি ছুঁড়িবার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা প্রায় ঐ সময়েই আবিষ্কৃত হইয়াছিল— কিন্তু অস্ত্র হিসাবে উহা তেমন কার্যকরী ছিল না। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে হ্যাণ্ড-গান ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যালটুরিও কর্তৃক অগ্নি-প্রজ্বালক শেল আবিষ্কৃত হইবার পর যুদ্ধ-বিগ্রহে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে সেকালের আগ্নেয়াস্ত্রের এই সকল উন্নতি মন্থর গতিতে চলিতেছিল। কিন্তু ধাতব পদার্থ, বিশেষতঃ ঢালাই লোহার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আগ্নেয়াস্ত্রের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ম্যাচলক কার্যকরী আগ্নেয়াস্ত্ররূপে দেখা দেয়। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ফ্লিন্টলক উদ্ভাবিত হয়, ভ্যান গ্যালেনের একজন গোলন্দাজ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে দাহ্য পদার্থ-পূর্ণ অগ্নিবর্ষী সেল প্রস্তুত করেন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী সেল উদ্ভাবিত হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্দুক ও কামানের জন্য স্র্যাপ্নেল সেল ও বুলেট উদ্ভাবিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কারি ফুলমিনেট পৃথক করা হয় এবং ফরসাইড 'পার্কাসন মিকশ্চার' প্রস্তুত করেন। ইতিমধ্যে হকিন্স কর্তৃক একরকম 'পার্কাসন ক্যাপ' উদ্ভাবিত হয়। এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের আরও উন্নতি ঘটে। ইহা হইতেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'টাইম ফিউজ' এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'পার্কাসন-ফিউজে'র উৎপত্তি হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গলিত লৌহপূর্ণ 'মার্টিন সেল' উদ্ভাবিত হয়. কিন্তু 'মাজল্ লোডিং'-এর আবির্ভাবের পর 'মার্টিন সেল', 'ক্যাফিন্স-গ্রেপ' প্রভৃতির ব্যবহার হ্রাস পাইয়া যায়। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে মাস্কেট, ব্রিচলোডার, রাইফেল, পিস্তল প্রভৃতি অনেক রকম আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভূত উন্নতি ঘটিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে মেসিনগান, সাব-মেসিন গান, অটোমেটিক রাইফেল, ব্রেন গান, শট্ গান প্রভৃতি বহুবিধ উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাজুকা, পাইপ-অরগ্যান, ব্যালিস্টিক মিজাইল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব ঘটিলেও বেশির ভাগই ছিল তখন আকাশযুদ্ধের ব্যাপার। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রাধান্য লাভের ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আগ্রা উত্তর প্রদেশের একটি রাজস্ব বিভাগ, জেলা ও জেলা-সদর; আয়তনে ৪৮২০ বর্গ কিলোমিটার (১৮৬১ বর্গমাইল)। আগ্রা রাজস্ব-বিভাগ আলীগড়, আগ্রা, মৈনপুরী, এটা ও মথুরা, এই কয়টি জেলা লইয়া গঠিত; বিভাগের শাসনকেন্দ্র আগ্রাতে অবস্থিত। আগ্রা শহরের অবস্থান ২৭°১০´ উত্তর, ৭৮°৫´ পূর্ব।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী আগ্রা জেলার লোকসংখ্যা ১৮৬২১৪২ (পুরুষ ১০১২০৫৬ ও স্ত্রী ৮৫০০৮৬); স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৪০ : ১০০০। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ১০০১। আগ্রা পৌর অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৬২০২০ (পুরুষ ২৫১৬৭৪ ও স্ত্রী ২১০৩৪৬), স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৩৬ : ১০০০। জনগণনা অনুযায়ী আগ্রা, আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট, দয়ালবাগ ও স্বামীবাগ লইয়া গঠিত আগ্রা শহর-সমষ্টির (টাউন গ্রুপ) মোট লোকসংখ্যা ৫০৮৬৮০।

আগ্রা জেলাতে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৬৪১ জন গ্রামে বাস করে এবং ৩৫৯ জন শহরবাসী। আগ্রা পৌর অঞ্চলে মোট কর্মীর সংখ্যা ১১৭৭৯৬ জন পুরুষ ও ৪৮১৪ জন নারী; ইহার মধ্যে গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে ৩০৭৫৪ জন পুরুষ ও ৫৮৮ জন নারী, ব্যবসায়ে ২৫৬৭৭ জন পুরুষ ও ৩৯৮ জন নারী ও গৃহশিল্পে ৯৬৪২ জন পুরুষ ও ৫৬১ জন নারী নিযুক্ত আছেন।

এই জেলা কাচ ও কাচের চুড়ি তৈয়ারির একটি বড় কেন্দ্র। ৫৩টি বৃহদায়তন কারখানা আছে। কিছুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং, আয়রন রোলিং এবং ফাউণ্ড্রি কারখানা আছে। উত্তরপ্রদেশের মধ্যে জুতা তৈয়ারির বৃহত্তম কেন্দ্র বলিয়া আগ্রা প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্যায়ে এখানে একটি বিশাল শিল্প এস্টেট স্থাপিত হইয়াছে। আগ্রা বহুবিধ কুটিরশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ, যথা কার্পেট ও শতরঞ্জি, মূল্যবান প্রস্তরখচিত মার্বেল পাথরের সামগ্রী ও মনোহর জালির কাজ, রেশমের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য,

বিশেষ করিয়া স্বর্ণখচিত জর্দোজি শাড়ি, নানাবিধ খেলনা, কম্বল, সুতি ও পশমের কাপড়, পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র ইত্যাদি।

এই জেলাতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২৪০ জন; পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই সংখ্যা প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৩৪১ ও ১২০। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার অনুমোদিত কতিপয় কলেজ আগ্রা শহরে অবস্থিত। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার উত্তর প্রদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলে বিস্তৃত।

যমুনার বাম তীরে অবস্থিত পুরাতন আগ্রা গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক ধ্বংস হয়। কালক্রমে আগ্রা বয়ানা-র অউহদিদের অধীন হয়। সুলতান সিকন্দর লোদীর রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী বয়ানা-র তদানীন্তন আমীর, সুলতান শরফ্ জলেশর, চন্দবর, সরেহ্‌রা এবং সকিট্-এর সহিত তাঁহার অধীনস্থ অঞ্চল বিনিময় করিতে সম্মত হন; কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় তিনি এবং আগ্রার শাসক, তাঁহার সামন্ত হৈবত্ খাঁ জিলওয়ালি ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে বহিষ্কৃত হন। রাজপুত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে আংশিক সাফল্য সিকন্দরের দৃষ্টিতে আগ্রার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আগ্রায় একটি নূতন নগরী স্থাপন করিয়া তথায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নূতন রাজধানী হইতে পার্শ্ববর্তী অশান্ত অঞ্চলগুলি শাসনে রাখা তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইল এবং এই স্থান হইতে তিনি গোয়ালিয়রের শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতেন। সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ইব্রাহিম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর আগ্রা অধিকার করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা হইতে প্রায় ৪৩ কিলোমিটার (২৭ মাইল) পশ্চিমে খানুয়াতে বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রধান শত্রু রাজপুত-প্রধান রানা সঙ্গকে পরাজিত করেন। তিনি ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে আগ্রাতে দেহত্যাগ করেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সেনাপতি তাতার খাঁ লোদীর অগ্রগামী সৈন্যগণ আগ্রার শহরতলী লুঠতরাজ করে; কিন্তু তাতার খাঁ হুমায়ুনের ভ্রাতা অস্‌করি কর্তৃক মণ্ড্রেল-এ পরাজিত ও নিহত হন।

শের শাহ্ তাঁহার রাজত্বকালে আগ্রাতে বহু প্রাসাদ ও পথ-ঘাট নির্মাণ করিয়া শহরটিকে অলংকৃত করেন; তিনি প্রশস্ত পথের দ্বারা আগ্রাকে বুরহান্‌পুর, যোধপুর ও চিতোর দুর্গের সহিত সংযুক্ত করেন।

হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আগ্রা পুনরধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা বিক্রমজিৎ (মহম্মদ শাহ্ আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমু) আগ্রা অধিকার করেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আকবর আগ্রা পুনরধিকার করেন। এই সময়ে আগ্রা অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে।

আকবর যমুনার দক্ষিণ তীরে বর্তমান আগ্রা শহর স্থাপন করেন। তিনি পনর বৎসর ব্যাপিয়া ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিখ্যাত আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করান। আবুল ফজলের বিবরণী অনুযায়ী আকবর আগ্রাতে বাংলা এবং গুজরাটের বিখ্যাত স্থাপত্যরীতিতে পাঁচ শত হর্ম্য নির্মাণ করান। আগ্রার ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) দক্ষিণে ককৃরলি গ্রামে তাঁহার শিকার এবং প্রমোদগৃহকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র শহর নগরচইন ('আনন্দনিকেতন') গড়িয়া উঠে। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার ৩৭ কিলোমিটার (২৩ মাইল) পশ্চিমে ফতেপুর সিক্রিতে আকবর তাঁহার নূতন রাজধানী নির্মাণ আরম্ভ করিতে নির্দেশ দেন। পনর বৎসর রাজধানী থাকার পর ফতেপুর সিক্রি পরিত্যক্ত হয়। পর্যটক ফিচ্-এর ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণ-বিবরণী হইতে আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রির সমৃদ্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়; দুইটি শহরই জনবহুল এবং লণ্ডন হইতেও বৃহত্তর ছিল; শহর দুইটির মধ্যবর্তী ১৯ কিলোমিটার পথ ব্যাপিয়া বাজারে এত জনসমাগম হইত যে বাজারটির দুই প্রান্তের শহর দুইটিকে একই শহর মনে হইত। আকবরের রাজত্বকালে আগ্রার রেশমী বস্ত্রবয়ন, কার্পেটবয়ন ইত্যাদি শিল্প প্রসিদ্ধ ছিল এবং সম্রাট্ এই সমস্ত শিল্পপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতেন। আকবরের বিশাল পুস্তকাগার ছিল এবং ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রাতে তিনি কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ রাজপ্রাসাদের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে বিহিস্টা-বাদের উদ্যানে সমাধিস্থ হয়; স্থানটির নূতন নামকরণ হয় সেকেন্দ্রা। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩ নভেম্বর আগ্রাতে জাহাঙ্গীরের অভিষেক হয়। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা এবং পর বৎসর ইংরেজরা আগ্রাতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে। শাহ্‌জাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রাতে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। তিনি আগ্রার নাম আকবরাবাদ-এ পরিবর্তিত করেন। তিনি আগ্রা দুর্গের বেশির ভাগ প্রাসাদ এবং গৃহ পুনর্নির্মাণ করান। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি, তাঁহার মহিষী মমতাজ মহলের সমাধি তাজমহল, মুসলমানী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়।

শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মে আগ্রার ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) পূর্ববর্তী সামুগড়ে বিদ্রোহী ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ্ দারাশুকো কর্তৃক পরিচালিত রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন ; ৮ জুন ঔরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করেন এবং পিতা শাহ্‌জাহানকে তাঁহার বাকি জীবন আগ্রা দুর্গেই বন্দী করিয়া রাখেন। জুন মাসেই আগ্রাতে ঔরঙ্গজেবের প্রথম অভিষেক হয়। তাঁহার পরবর্তী মোগল বাদশাহেরা কেহ কেহ আগ্রায় বসবাস করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগ্রার চতুর্দিকে জাঠ উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। আগ্রার শাসক রাজা দ্বিতীয় জয়সিং উহাদের দমন করেন। কিন্তু জাঠ সর্দার চূড়ামন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র বদন সিং প্রায় সমস্ত আগ্রা জেলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্রাট্ শাহ্ আলম্ আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন।

কিছুকাল পরে আগ্রা প্রদেশের শাসক মহম্মদ বেগ বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তিনি রাজধানীতে অনুপস্থিত নূতন ভকিল্-ই-মুত্‌লক্-এর (পেশোয়ার) প্রতিনিধি সিন্ধিয়ার উপর আগ্রার প্রশাসনিক ভার অর্পণ করেন ; ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া মহম্মদ বেগকে অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির দিল্লী দখল করেন, মারাঠা বাহিনী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী পুনরুদ্ধার করে এবং আগ্রা প্রদেশ মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ওয়েলেসলির শাসনকালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজ সেনানায়ক লর্ড লেক সিন্ধিয়ার নিকট হইতে আগ্রা অধিকার করেন ; সিন্ধিয়ার সহিত ইংরাজদের সুর্যি অর্জুনগাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩ খ্রী) অনুযায়ী দোয়াব ও দিল্লীর সহিত আগ্রাও ব্রিটিশ শাসনে আসে এবং বাংলা প্রেসিডেন্সির অধিকৃত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলা প্রেসিডেন্সি হইতে পৃথক করিয়া একটি নূতন প্রেসিডেন্সি গঠিত হয় ; আগ্রা তাহার রাজধানী হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে আগ্রা অঞ্চলও অশান্ত হইয়া উঠে। ইংরাজ সৈন্যবাহিনী দুর্গে আশ্রয় লইলে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ হয়। ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হন এবং শহরে দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শাহের রাজত্ব ঘোষিত হয়। স্যর কলিন ক্যাম্পবেল আগ্রা পুনরুদ্ধার করিলে বিশৃঙ্খলা দমিত হয় এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরের ইতিহাস প্রধানতঃ প্রশাসনিক পরিবর্তনের।

আগ্রার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে শ্বেত মার্বেল প্রস্তরের তাজমহল বিশ্বে অতুলনীয় ('তাজমহল' দ্র)।

আকবরের নির্দেশে কাশিম খাঁর তত্ত্বাবধানে রক্ত-প্রস্তর-নির্মিত আগ্রা দুর্গের পরিধি প্রায় ২·৪ কিলোমিটার (১½ মাইল), প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ২১ মিটার (৭০ ফুট)। প্রধান তোরণ, দিল্লী দর্‌ওয়াজার সহিত তুলনীয় তোরণ ভারতে অল্পই আছে। দুর্গাভ্যন্তরের প্রাসাদগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীরী মহল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার অলংকরণে হিন্দু এবং জৈন মন্দিরগুলির প্রভাব সুপরিস্ফুট। মোতি মসজিদের অতুলনীয় শুচিসৌন্দর্য মোগলস্থাপত্যের সর্বোচ্চ গৌরবশিখর চিহ্নিত করে। মুসম্মনবুর্জ, দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম্, খাস মহল, শিশ্ মহল, অঙ্গুরি বাগ, মাচ্ছি ভবন, ইত্যাদি মার্বেল প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদসমূহ স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ইতিমাদ-উদ্-দৌলার শ্বেতপ্রস্তরের মনোমুগ্ধকর সমাধিমন্দিরে মূল্যবান প্রস্তরের পিয়েট্রা ডুরা (*pietra dura*) অলংকরণ অতুলনীয়। এই সমাধিমন্দির সমকালীন মোগলদের সৌন্দর্যবোধের অপূর্ব সৃষ্টি।

এই জেলার অধিকাংশ উৎসব ও মেলার ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। এই মেলা ও উৎসবাদিতে বহু লোকসমাগম হয় ; বিশেষ করিয়া চৈত্র মাসে রবি ফসল তোলার পর লোকসমাগম আরও বৃদ্ধি পায়। উৎসব ও মেলাগুলি মূলতঃ আগ্রা তহশিল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই মেলা ও উৎসবাদির মধ্যে আগ্রায় দশেরা মেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম দৃষ্ট হয়। তেজগঞ্জে লালু জগধর মেলা ও বিখ্যাত সন্তরণ-উৎসব দুইটিরও নাম করা যাইতে পারে ; সন্তরণ-উৎসবটি কয়েকদিন ব্যাপিয়া চলে ও প্রচুর উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। অন্যান্য মেলার মধ্যে শাহ্‌জাহানের প্রধান অমাত্য খিদমৎখানের স্মৃতির উদ্দেশে বোদলা মেলা, বাটেশর মেলা এবং স্বামীগ্রামের কৈলাসমন্দিরে ও শীতলামন্দিরে অনুষ্ঠিত মেলা দুইটির নাম করা যাইতে পারে। 'ফতেপুর সিক্রি' ও 'সেকেন্দ্রা' দ্র।

দ্র S. M. Latif, *Agra, Historical and Descriptive*, Calcutta, 1896 ; E. B. Havell, *Handbook to Agra and the Taj*, 1912 ; E. B. Havell, *The Taj and Its Designers*, 1903 ; Muhammad Moin-ud-din, *History of the Taj*, Agra, 1905 ; *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series* ;

United Provinces of Agra and Oudh, vol. 1, Calcutta, 1908.

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

আঙুর সুস্বাদু রসাল ফল হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিচিত। আঙুর সর্বপ্রথম বিদেশ হইতে ভারতে আসে। পূর্বে সযত্নে তুলার আধারে আঙুর আমদানি করা হইত।

পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ইওরোপ, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আঙুর জন্মাইয়া থাকে। কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণে এবং বিশেষ করিয়া আরমেনিয়ায় গ্রীষ্মমণ্ডলে আঙুরের লতানো গাছ জন্মায়। লতা ছাঁটাই করিয়া দিলে প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়। কাশ্মীর, কাবুল, এমন কি হিন্দুকুশের উত্তরেও অবাধে আঙুর জন্মাইবার কথা উল্লিখিত আছে। ইওরোপ ও এশিয়াতেও মানুষের বসতির পূর্বেই হয়ত পশু-পক্ষীর সাহায্যে আঙুর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেমিটিক জাতি এবং আর্যেরা আঙুর বা দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন সুরার ব্যবহার জানিত এবং খুব সম্ভব দেশত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ, মিশর এবং ইওরোপের যে সকল দেশে তাহারা নূতন বসতি স্থাপন করিয়াছিল, সেখানে তাহারা আঙুর চাষেরও প্রচলন করে। মিশরে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আঙুর চাষের প্রচলন ছিল। কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় ইহার বিস্তারলাভ ঘটে অনেক পরে। হয়ত সুরাসক্ত ভারত-বিজয়ীরাই এ দেশে আঙুর চাষের প্রথম প্রচলন করে।

দেশবিভাগের পূর্বে আঙুরের উৎপাদন আমাদের দেশে প্রয়োজন মত ছিল, কেননা বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই ইহার চাষ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। ইহা ছাড়াও কিশমিশ-মনাক্কা বরাবরই আফগানিস্তান হইতে আমদানি করা হইত। বর্তমানে হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে প্রধানতঃ ইহার চাষ হইয়া থাকে, যদিও ভারতের বহু স্থানে চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর।

উর্বরা সরস মাটি, দোআঁশ পাথুরে মাটি এবং জল-নিকাশী জমি আঙুর চাষের উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলেই আঙুর খুব ভালভাবে জন্মাইলেও, ভারত গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী কয়েক প্রকার আঙুর জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাদের ফলন খুবই আশাপ্রদ। আঙুর বড় হইবার সময় আবহাওয়া বৃষ্টিহীন ও শুষ্ক থাকা দরকার। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টি ১০০ সেন্টিমিটারের কম অথচ মাটি সরস ও জলনিকাশী তাহাই আঙুর চাষের উপযোগী। সামান্যতম বৃষ্টি অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে বৃষ্টি ২০-২৫ সেন্টিমিটার মাত্র, সেখানেও ইহার পূর্বেই যাহাতে ফল পাকে সেই সকল জাতীয় আঙুরই সাফল্যের সহিত চাষ করা চলে।

ভারতে বর্তমানে আনাব-ই-শাহী আঙুরই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ইহা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রচুর ফলন এবং লাভের দরুন ইহার উৎপত্তির স্থান হায়দরাবাদ হইতে দ্রুত সমস্ত দক্ষিণ ভারতে, এমন কি মহারাষ্ট্রেও প্রসার লাভ করিতেছে। এক একর চাষ করিয়া ১০-১২ হাজার টাকার আঙুর বিক্রয় সম্ভব। ইহা ছাড়াও বোখরী, কান্দাহারী, কালো মসকট ইত্যাদিও সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা যায়। দিল্লী ও পাঞ্জাবেও আঙুরের চাষ প্রসার লাভ করিতেছে। হিমাচল প্রদেশে কিশমিশের উপযোগী আঙুর চাষের প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে। পশ্চিম বাংলায় এই অঞ্চলের উপযোগী আঙুরের অনুসন্ধান চলিতেছে।

আঙুরের পুরাতন ডাল কাটিয়া মাটিতে বসাইয়া নূতন চারা উৎপাদন করা হয়। এক বৎসরের পুরাতন কাটিং ৬-৭ হাত অন্তর গর্তে শীতকালে বসানো হয়। গাছ মাটিতে লাগিয়া যাওয়ার পর গ্রীষ্মকালে আগাছামুক্ত করিয়া সেচ দেওয়া উচিত। আঙুরের লতা সাধারণতঃ কংক্রিটের অথবা লোহার স্থায়ী মাচানের উপর উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লতা ছাঁটাই করিতে হয়, যাহাতে নূতন লতা বাহির হইয়া ফুল ও ফল ধরে।

রোগ দমন একটি প্রধান কাজ এবং সর্বত্রই 'বোর্দো মিশ্রণ' ধারাবাহিকভাবে সিঞ্চন করা হয়। পোকা দমনের জন্য একই সঙ্গে জলে গোলা ডি. ডি. টি. সিঞ্চন করা হয়।

সম্পূর্ণ পাকিবার পরেই গাছ হইতে আঙুর তোলা হয়, কারণ তোলার পর অন্য ফলের মত আঙুরের মিষ্টত্ব ও স্বাদের কোনও উন্নতি হয় না। বিভিন্ন জাতির আঙুরের পাকিবার সময় বিভিন্ন এবং রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন হইয়া থাকে। ফলের থোকা কাঁচি বা ধারাল ছুরি দিয়া রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কাটিয়া সযত্নে ঝুড়ির নীচে কিছু ঘাস-পাতা বিছাইয়া তাহার মধ্যে রাখা উচিত। কাঁচা, বেশি পাকা বা ক্ষতিগ্রস্ত ফল ফেলিয়া ভাল ফল ঝুড়িতে বা কাঠের বাক্সে রাখিতে হইবে।

প্রথম দিকে ফলন একর প্রতি ২-৩ হাজার কিলোগ্রাম হইলেও ক্রমে গড়পড়তা ফলন প্রায় ৫ হাজার কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইয়া থাকে। বর্তমানে ফুল ফোটার পর জিব্বা-

রেল্লিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া অল্প ব্যয়ে ফলন প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। জিব্বারেল্লিক অ্যাসিড পেনিসিলিনের মতই ধানগাছ আক্রমণকারী ছত্রাক 'জিব্বারেল্লা ফুজিকুরাই' হইতে প্রস্তুত করা হয়। জিব্বা-রেল্লিক অ্যাসিড ৫০ পি. পি. এম. প্রয়োগেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই মাত্রার প্রয়োগ মানুষ বা অন্য কাহারও পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

দ্র A. de Candolle, *Origin of Cultivated Plants*, London, 1884; G. S. Randhawa and J. P. Singh, Response of Fruit Crops to Gibberellic Acid', *Indian Horticulture*, July-September, 1962; G. S. Randhawa and K. L. Chadha, 'Grapes Can Grow in a Big Way in Northern India', *Indian Horticulture*, January-March, 1963; P. C. Bose, 'Anab-E-Shahi, the Cultivators' Choice', *Indian Horticulture*, July-September, 1961.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

আঙ্কর-টোম প্রাচীন কালে হিন্দুগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা স্থানে, প্রথমে উপনিবেশ, পরে রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কম্বুজদেশ (কম্বোজ, বর্তমান কাম্বোডিয়া) ইহার অন্যতম। দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর হইতে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দো-চীন উপদ্বীপ কম্বুজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বুজের সম্রাট্ সপ্তম জয়বর্মা ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কম্বুজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। তিনি এক নূতন বিরাট নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরীই আঙ্কর-টোম (সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'নগরধাম' শব্দের পরিবর্তিত রূপ)। ইহার বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই নগরীর চারিদিকে যে প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর ছিল তাহার পরিমাপ প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল)। ১০১ মিটার (১১০ গজ) বিস্তৃত যে পরিখা এই প্রাচীরকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহার দুই ধার বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আবৃত। এই নগরীর সিংহদ্বারের খিলান ৯ মিটার (৩০ ফুট) উচ্চ ছিল। বিশালকায় হস্তী আরোহীসহ ইহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিত। নগরীটি সম-চতুষ্কোণ। পাঁচটি রাজপথ— প্রত্যেকটি ৩০ মিটার (১০০ ফুট) প্রশস্ত— উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সরল রেখার ন্যায় বিস্তৃত ছিল। এই নগরীর মধ্যে বহু মন্দির ও প্রাসাদ ছিল। ইহার মধ্যে বেয়ন নামক মন্দিরটি কম্বুজ শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নগরীর মধ্যভাগে ৭০০ মিটার (৭৬৫ গজ) দীর্ঘ এবং ১৫১ মিটার (১৬৫ গজ) বিস্তৃত একটি মুক্ত অঙ্গন ছিল— তাহার চারিদিকে বহু সুন্দর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আঙ্কর-ভাট আঙ্কর-টোমের ১·৬ কিলোমিটার (১ মাইল) দক্ষিণে, প্রাচীন কম্বুজরাজ্যের একটি বিশাল মন্দিরের নাম। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মা ইহা নির্মাণ করান। মন্দিরটিকে ঘিরিয়া চারিদিকে পাথরের প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরের বাহিরেই ১৯৮ মিটার (৬৫০ ফুট) প্রশস্ত পরিখা চারিদিকে প্রাচীরটি বেষ্টন করিয়া আছে। ভিতরের দিক হইতে এই পরিখার দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার (২½ মাইল)। এই পরিখা পার হইবার জন্য যে প্রস্তরসেতু আছে তাহা ১১ মিটার (৩৬ ফুট) প্রশস্ত। এই সেতু পার হইয়া ভূমি হইতে ২ মিটার (৭ ফুট) উচ্চ এবং ৪৭৫ মিটার (১৫৬০ ফুট) দীর্ঘ একটি পাথরের রাস্তা মন্দিরের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে। এইখানেই মন্দিরের নিম্নতম গ্যালারির আরম্ভ। যে অপ্রশস্ত সুদীর্ঘ কক্ষ ও বারান্দা মন্দিরের চতুর্দিক ঘিরিয়া আছে তাহাই গ্যালারি নামে অভিহিত। প্রথম, অর্থাৎ সর্বনিম্ন গ্যালারিটি দৈর্ঘ্যে ২৪৪ মিটার (৮০০ ফুট) ও প্রস্থে ২০৬ মিটার (৬৭৫ ফুট) অর্থাৎ ইহার পরিসীমা প্রায় ৯১৪ মিটার (৩০০০ ফুট)। এই বিশাল গ্যালারির দেওয়াল আগাগোড়া ক্ষোদিত। প্রধানতঃ মহাভারতের আখ্যানগুলিই ইহার বিষয়বস্তু— কিন্তু তাহা ছাড়াও দেব-দেবী প্রভৃতির বহু মূর্তি ক্ষোদিত আছে। প্রথম গ্যালারি হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে গেলে আর একটি গ্যালারি— তাহার উপরে আরও একটি। তৃতীয় অথবা সর্বোচ্চ গ্যালারি যে অঙ্গনটি ঘিরিয়া আছে তাহার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিষ্ণুর মন্দির। এই মন্দিরের শিখর দেখিতে অনেকটা উড়িষ্যার মন্দিরের শিখরের ন্যায়। এই শিখরটি ৬৪ মিটার (২১০ ফুট) উচ্চ। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু কক্ষ আছে। আঙ্কর-ভাটের বিশালতা, নির্মাণকৌশল ও কারুকার্য— একসঙ্গে এই তিনের সমন্বয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আঙ্গামী নাগা নাগা দ্র

আচরণবাদ মনোবিদ্যা দ্র

আচার মানবসমাজে, বিশেষ করিয়া হিন্দুর জীবনযাত্রায়, শিষ্টজনানুষ্ঠিত আচার বা রীতি-নীতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সদাচার ধর্মের অঙ্গরূপে পরিগণিত (মনু ২।৬, ২।১২)। মনুসংহিতার মতে (২।১৭-১৮) সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত নামক দেশে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আচারই সদাচার। ইহা সকলের অনুসরণযোগ্য। বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে সদাচারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম স্বাস্থ্য নীতি -বিষয়ক সমস্ত কর্তব্যকর্মই সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। (শব্দকল্পদ্রুমে 'সদাচার' শব্দ দ্রষ্টব্য)। আচারভ্রষ্ট মানুষ সর্বথা নিন্দনীয়। সর্ববাদিসম্মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার ব্যতীত লোকপ্রচলিত লোকাচার, দেশবিশেষে প্রচলিত দেশাচার, বিভিন্ন বংশে প্রচলিত স্বতন্ত্র কুলাচার এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত স্ত্রী-আচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের গৌরবও কম নয়। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যাবিবাহ, বঙ্গ দেশে মৎস্যভক্ষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেশাচার। বিবাহাদি কার্যে নারীসমাজের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দেশ ও কুল অনুসারে পৃথক পৃথক হইলেও ইহাদের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নববধূর সীমন্তে সিন্দূরদান এই-রূপ একটি অনুষ্ঠান।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আজমগড় উত্তর প্রদেশের গোরখ্‌পুর বিভাগের একটি জেলা ও শহর। জেলার আয়তন ৫৭৫৫ বর্গ কিলোমিটার (২২২২ বর্গ মাইল)। শহরের অবস্থান ২৬°৩´ উত্তর, ৮৩°১৩´ পূর্ব।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার মোট লোকসংখ্যা ২৪০৮০৫২। তাহার মধ্যে ১১৮৫০০৮ জন পুরুষ এবং ১২২৩০৪৪ জন স্ত্রীলোক। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনুপাত ১০০০ : ১০৩২। প্রতি বর্গ কিলো-মিটারে লোকবসতি ৪১৯ (প্রতি বর্গ মাইলে ১০৮৪ জন)। আজমগড় শহরটিতে মোট ৩২৩৯১ জন লোক বাস করে; তন্মধ্যে ১৮৪৮৬ জন পুরুষ এবং ১৩৯০৫ জন স্ত্রীলোক। শহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনুপাত ১০০০ : ৭৫২।

আজমগড় জেলার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। জেলার মধ্যে নানা স্থানে পরিত্যক্ত প্রাসাদ, দুর্গ, দীঘি ইত্যাদির জীর্ণাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাদের স্থাপয়িতাদের সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিংবদন্তী অনুসারে ভার, সোয়েরিজ এবং চেরুজ -গণ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী ছিল। কালক্রমে তাহারা রাজপুত এবং ভুঁইঞাদিগের দ্বারা দেশচ্যুত হয়। স্থানটির চতুর্দিকে প্রাপ্ত মৌর্য ও গুপ্ত রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা মৌর্য ও গুপ্ত রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ইহা কনৌজের হিন্দু রাজত্বের অধীনে আসে। অতঃপর খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আজমগড় দিল্লীর সুলতানদের অধিকারভুক্ত হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝা-মাঝি (১৩৫৯-১৩৬৩ খ্রী) আজমগড়ের সীমান্তে ফিরোজ শাহ্ নির্মিত জৌনপুর নগরী অনেক দিন পর্যন্ত উত্তর ভারতে মুসলমান শক্তির অন্যতম কেন্দ্ররূপে বিরাজিত ছিল। এই সময় আজমগড়ের কর্তৃত্ব জৌনপুরের শাসনকর্তাদের হাতে চলিয়া যায়। অতঃপর বহ্‌লুল লোদী জৌনপুররাজ হুসেন শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া আজমগড়কে লোদী-রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় (১৫২৬ খ্রী) বাহাদুর খান বিহার ও জৌনপুরের নামমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। অবশেষে শের খান (পরে শের শাহ্) দিল্লী অধিকার করিয়া বিহার ও জৌনপুর স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর পানিপথে পাঠানদিগকে পরাভূত করিয়া দিল্লী জয় করিলে জৌনপুর, আজমগড় প্রভৃতি একে একে তাঁহার হস্তগত হয়। আকবরের সময় আজমগড় এলাহাবাদ সুবার জৌনপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণে আজমগড় জৌনপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব লাভ করে। গৌতম রাজপুতদিগের বংশোদ্ভূত স্থানীয় এক ক্ষমতাবান ভূস্বামীর উপর আজমগড়ের কর্তৃত্ব চলিয়া আসে। পরে ইঁহারা রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া আজমগড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত হন। এই বংশের চন্দ্রসেন গৌতমের উত্তরাধিকারী হরবন্‌স মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। হরবন্‌সের পৌত্র বিক্রমজিৎও মুসলমান পত্নী গ্রহণ করেন এবং ইঁহার গর্ভে আজম এবং আজমৎ নামে দুই পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই আজমই ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আজমগড় শহর ও আজমগড় দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। আজমের পৌত্র ইরাদতের আমলে আজমগড় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রী) বিহারের ভোজপুরের রাজপুত সর্দার কানোয়ার ধীর সিং আজমগড়ের কিয়দংশ দখল করেন। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে উহা পুনরুদ্ধার করা হয়। এই সময় দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হইয়া পড়িতে থাকিলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। আজমগড়ের রাজা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে নবাব মীর মর্তুজা আজমগড়

অধিকার করেন। ১৭৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে আজমগড়ের রাজারা তৎকালীন ষড়্‌যন্ত্র ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তালুকটির শাসনভার একজন চাকলাদারের হস্তে চলিয়া যায় এবং উহা আজমগড় চাকলা নামে পরিচিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব স্যাদাৎ খাঁ ও গভর্নর-জেনারেলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ১ নম্বর ধারা অনুসারে কোম্পানির পাওনা বাবদ আজমগড় চাকলাসহ অনেক অঞ্চল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলোচ্য জেলার ভূমিকা কম নহে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সপ্তদশ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহারা অফিসার-দিগকে হত্যা করে ও সরকারি ধন ফৈজাবাদে সরাইয়া দেয়। ইংরেজরা গাজীপুরে পলায়ন করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজদের সাহায্যার্থে প্রেরিত গুর্খা সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া আজমগড় পুনরায় অধিকার করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বিখ্যাত কুনওয়ার সিং ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া আজমগড় অধিকার করেন এবং ইংরেজ সৈন্যশিবির অবরোধ করেন। গাজীপুর ও বারাণসী হইতে ইংরেজ সৈন্য সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলে ইংরেজ সৈন্য পলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কুনওয়ার সিং মিলিত ইংরেজ সৈন্যকে আবার পরাস্ত করেন। অবশেষে আরও বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে কুনওয়ার আজমগড় পরিত্যাগ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনেও এই জেলার দান কম নহে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগস্ট ইংরেজ সরকার জেলা কংগ্রেস অফিসটি বন্ধ করিয়া দিয়া বহু স্বদেশী কর্মীকে গ্রেপ্তার করিলে শহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সমগ্র জেলায় ইহা ছড়াইয়া পড়ে। রেলগাড়ির লাইনচ্যুতি, টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করা, পোস্ট অফিস, রেল-স্টেশন ও থানা প্রভৃতি লুণ্ঠন, রাস্তা-ঘাটের ক্ষতিসাধন প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলন চলিতে থাকে। গুলিচালনা ও পাইকারি জরিমানার দ্বারা আন্দোলন দমন করার ব্যবস্থা হয়।

জেলাটিতে মোট পুরুষকর্মীর সংখ্যা ৬৪২০৩৬ জন ও স্ত্রীকর্মীর সংখ্যা ২৯৮০৯৪ জন। ইহাদের মধ্যে ৪৪৬৮১৪ জন পুরুষ ও ১৫৭৯৫৫ জন স্ত্রীলোক কৃষিকর্মে, ৭৩৩৭৯ জন পুরুষ ও ৮৩৬৮২ জন স্ত্রীলোক কৃষিমজুরিতে, ৫৫২৫৫ জন পুরুষ ও ৪১৬৪৭ জন স্ত্রীলোক গৃহশিল্পে, ১৯৩৩৬ জন পুরুষ ও ৩১১৩ জন স্ত্রীলোক ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ৬৯৩৭ জন পুরুষ ও ৮৭০ জন স্ত্রীলোক গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে, ৫৩২৪ জন পুরুষ ও ২৩ জন স্ত্রীলোক পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং ৩০৮৭৫ জন পুরুষ ও ৯৯২৫ জন স্ত্রীলোক অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আজমগড় জেলার মেলাগুলি সবই ধর্মীয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসবাদির সহিত জড়িত। মনঝি এবং টন নদীর সংগমস্থলে নিজামাবাদ পরগনায় দুর্বাসা নামক স্থানে কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে একদিনের জন্য একটি মেলা হয়। কথিত আছে, দুর্বাসা মুনি এখানেই বাস করিতেন। মুনির নাম হইতেই স্থানটির নাম হইয়াছে। ঘর্ঘরা নদীর তীরে ডোহরীঘাটে কার্তিকী পূর্ণিমায় স্নানোৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়। এই একই দিনে টন নদী ও ছোট সরযূর সংগমস্থলে সোহরাজে অনুরূপ আর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নাথুপুর পরগনার কোলহুয়াপনের দরগাতে সৈয়দ আহ্‌মদ বাদপার (সাধারণতঃ মিরন শাহ্‌ নামে পরিচিত) স্মৃতির উদ্দেশে ছয় সপ্তাহব্যাপী এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হইয়া প্রতি বৃহস্পতিবার করিয়া চলে। মহম্মদাবাদ পরগনার দেওলাস মেলাটিও উল্লেখযোগ্য। ইহা 'ললারি চ্ছাৎ' নামেও পরিচিত। ইহা কার্তিকী পূর্ণিমার ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলাটিতে শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৬৩ জন। শিক্ষিত এবং অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে যথাক্রমে ২৬৪ ও ৬৪ জন। এখানে গোরখ্‌পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত দুইটি কলেজ আছে।

জেলার শহরগুলির মধ্যে আজমগড়, ডোহরীঘাট ও মউনাথভঞ্জন -এর নাম উল্লেখযোগ্য। আজম খাঁ -নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তৈয়ারি মন্দিরটি আজমগড়ের উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আজমগড়ের জনৈক রাজার তৈয়ারি ডোহরীঘাট শহরটিতে একটি বৃহৎ মসজিদ আছে। মউনাথভঞ্জন প্রাচীন শহর, আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট্‌ শাহ্‌জাহান জাহানারা বেগমকে এই শহরটি দান করেন। জাহানারার নির্মিত একটি সরাই আজিও বর্তমান। স্থানটি বর্তমানে তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। সর্বশেষে দেওলাস স্থানটি উল্লেখযোগ্য। এখানকার হ্রদ ও সূর্যমন্দির বিখ্যাত।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : U. P.*, Calcutta, 1908 ; *District Gazetteer of the United Provinces of Agra & Oudh, Azamgarh*, vol. XXXIII, Allahabad, 1911 ; *Census*

of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census ; Final Population Totals, Delhi, 1962 ; R. H. Niblett, *The Congress Rebellion in Azamgarh,* Allahabad, 1957.

তারাপদ মাইতি

আজমল খাঁ, হাকিম (১৮৬৩-১৯২৭ খ্রী) দিল্লী নিবাসী বিখ্যাত হাকিমী-চিকিৎসক মামুদ খাঁর পুত্র আজমল খাঁ দিল্লীতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বপুরুষ মোগল সম্রাটের চিকিৎসকরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মোগল রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত তদ্‌বংশীয়গণ তাঁহাদের চিকিৎসক ছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি হাকিমী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামপুর নবাবের খাস হাকিম পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি দশ বৎসর এখানে অবস্থান করেন এবং চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের চাকুরি ত্যাগ করিয়া তিনি ইরাকে গমন করেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দিল্লীর অধিবাসী হন এবং বর্তমানে যাহা তিব্বিয়া কলেজ নামে খ্যাত তখনকার সেই তিব্বিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'জামিয়া মিল্লিয়া' নামক সংস্থার স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আজমল খাঁ আহ্‌মেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন ও ঐ বৎসরের খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স-এরও সভাপতি হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরব দেশে গমন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ বৎসরেই ২৬ ডিসেম্বর আজমল খাঁ ইহলোক ত্যাগ করেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আজমল খাঁ আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র ছিলেন।

আজমীর, অজমের রাজস্থান রাজ্যের একটি জেলা ও জেলা-সদর ; আয়তন ৮৫০৩ বর্গ কিলোমিটার (৩২৮৩ বর্গমাইল)।

ইহা পার্বত্য ও মরু অঞ্চলে অবস্থিত ; এখানে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ খুবই অল্প। আজমীর শহরের অবস্থান ২৬°২৭´ উত্তর, ৭৪°৪২´ পূর্ব।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জেলার লোক-সংখ্যা ৯৭৬৫৪৭। পুরুষ ৫১০৪৪৬ ও স্ত্রীলোক ৪৬৬১০১। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ৯১৩ : ১০০০। প্রাকৃতিক কারণে এই জেলা ঘন বসতিপূর্ণ নহে। লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১৫ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৯৭)। আজমীর শহরের লোকসংখ্যা ২৩১২৪০। পুরুষ ১২২৫৬১ ও স্ত্রীলোক ১০৮৬৭৯। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ৮৮৭ : ১০০০।

আজমীর জেলায় প্রতি হাজারে ৬২৬ জন লোক গ্রামে বাস করে, বাকি ৩৭৪ জন শহরবাসী। জেলায় মোট কর্মীর সংখ্যা ১৯৩৯০ জন পুরুষ ও ১৪৪৯৬১ জন নারী। ইহাদের মধ্যে ১৩২৬৭৫ জন পুরুষ ও ১১৭৮৪৩ জন নারী কৃষিকর্মে, এবং ২৫০০৯ জন পুরুষ ও ৯৪০১ জন নারী গৃহশিল্পে নিযুক্ত আছেন। এই জেলায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২৫৩। প্রতি হাজার পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬০ ও ১৩৬। আজমীর শহরে ৭৩২০১ জন পুরুষ ও ৩৭১৭৪ জন নারী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এখানে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষকশিক্ষণ ও মহিলা-কলেজসহ কয়েকটি কলেজ আছে। আজমীর মিউজিক কলেজে স্নাতকোত্তর মান পর্যন্ত সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

চৌহানবংশীয় রাজপুতগণ সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আজমীর অঞ্চলে রাজত্ব করেন। অজয়রাজ চৌহান অজয়মেরু (অধুনাতন আজমীর) শহর নির্মাণ করেন ১২শ শতাব্দীতে। পৃথ্বীরাজ-বিজয় কাব্যে বলা হইয়াছে যে, অজয়রাজ আজমীর শহরে বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। অজয়রাজের পুত্র অর্ণোরাজ (আনুমানিক ১১৩২ খ্রী -আনুমানিক ১১৬০ খ্রী) অনাসাগড় বাঁধ নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে ইহার উপরে মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জাহান প্রমোদগৃহরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মার্বেল পাথরের সুন্দর মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। চৌহানরাজ চতুর্থ বিগ্রহরাজ (১১৫৩-১১৬৪খ্রী) আজমীরে বিশাল-সর খনন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য একটি বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ ঘোরী আজমীর জয় করেন। তখন হইতে ঐ সংস্কৃত বিদ্যালয়টি আড়াই দিন কা ঝোপড়া নামে মসজিদে পরিণত হয়। মসজিদটির কারুকার্য সুন্দর।

মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে নিজের প্রতিভূ-রূপে আজমীরের শাসনভার দেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হরিরাজের নেতৃত্বে চৌহানগণ বিদ্রোহ করে। কুতুবুদ্দীন পুনরায় আজমীর জয় করেন ও দিল্লীর সুলতানী

সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর আজমীর পুনর্বার স্বাধীনতা লাভ করে। ইলতুৎমিসের শাসনকালে আজমীরে সুলতানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মেবারের রানা কুম্ভ আজমীর জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মালবের মুসলমান শাসকগণ আজমীর অধিকার করেন। ১৪৭০ হইতে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আজমীর মালবের অধীনে ছিল। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মালব গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর মাড়ওয়াড়ের রাঠোর মালদেব আজমীর জয় করেন।

মোগল যুগে আজমীর আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই যুগে আজমীর দুর্গের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। দুর্গটি আয়তনে বৃহৎ ও আকারে বর্গাকার। প্রতি কোণে অষ্টকোণী বুরুজ। প্রধান তোরণটি সমুন্নত ও মহিমা-ব্যঞ্জক। মোগল যুগে আজমীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ইহা মোগল সম্রাট্‌দের অন্যতম বাসস্থান ছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান দীর্ঘকাল আজমীরে ছিলেন। এইখানেই জাহাঙ্গীর ইংল্যাণ্ডের সম্রাট্ প্রথম জেম্‌সের দূত স্যর টমাস রো-কে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন (১৫১৬ খ্রী)। আজমীরের কাছেই ঔরঙ্গজেব দারাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন (মার্চ ১৬৫৯ খ্রী)।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মাড়ওয়াড়ের অজিত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে আজমীর জয় করেন। কিছু-কাল পরে আজমীরে মারাঠা আধিপত্য স্থাপিত হয় ও আজমীর লইয়া রাজপুত-মারাঠা বিরোধ চলিতে থাকে। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া আজমীর জয় করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজ শাসনাধীন হয়।

আজমীরে দরগা খ্বাজা সাহেব অবস্থিত; সাধক মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী এখানে দেহত্যাগ করেন। এই কারণে এই স্থান মুসলমানদের নিকট তীর্থস্বরূপ। প্রতি বৎসর রজব মাসে (শ্রাবণ-ভাদ্র) এখানে ছয়দিনব্যাপী উরস্‌ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসরেই এখানে বহু লোকসমাগম হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আকবর প্রতি বৎসরে এখানে তীর্থযাত্রা করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন। সাধক মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তীকে জাহাঙ্গীর বিশেষ ভক্তি করিতেন। দরগার মধ্যে আকবর ও শাহ্‌জাহান কর্তৃক নির্মিত দুইটি মসজিদ আছে। দরগার প্রবেশপথটি সুদৃশ্য। এখানে রক্ষিত বিশাল ঢাক ও বাতিদানগুলি আকবর চিতোর হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সাধকের কবর স্বর্ণ ও রৌপ্য -ভূষিত।

এই জেলায় অবস্থিত পুষ্কর হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থ। আজমীরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: Rajputana*, Calcutta, 1908; *Census of India: Paper No. 1 of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

নিমাইসাধন বসু

আজাদ, মওলানা আবুল কালাম (১৮৮৮-১৯৫৮ খ্রী) জন্ম ১১ নভেম্বর ১৮৮৮; মৃত্যু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮। মওলানা আজাদের পিতৃদত্ত নাম আহ্‌মদ, কিন্তু আবুল কালাম নামেই তিনি সুপরিচিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনের পরাজয়ের পরে তাঁহার পিতা শেখ মহম্মদ খয়েরুদ্দীন মক্কায় চলিয়া যান এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেখানে আবুল কালামের জন্ম হয়। আবুল কালামের শৈশবে তাঁহার পিতা চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন কিন্তু বহু ভক্ত ও শিষ্যের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্থায়ী-ভাবে সেখানে বাস করিতে থাকেন।

প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত মওলানা খয়েরুদ্দীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সমসাময়িক কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আস্থা ছিল না বলিয়া প্রথমে নিজে এবং পরে গৃহশিক্ষকের সাহায্যে আবুল কালামকে সনাতন রীতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ফারসী, আরবী, দর্শন, জ্যামিতি ও গণিতের সঙ্গে মুসলমান তত্ত্বকথা ও ধর্মশাস্ত্রপাঠ শেষ করিতে সাধারণতঃ ছাত্রদের চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হইত, কিন্তু অসাধারণ মেধাবী আবুল কালাম ষোল বৎসর বয়সে পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করিয়া বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতিলাভ করেন। উর্দু গদ্য রচনায় নূতন শৈলীর প্রবর্তক সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি কিশোর বয়সেই সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে।

মওলানা খয়েরুদ্দীন আবুল কালামকে প্রাচীন আদর্শ অনুসারে গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পিতার জীবদ্দশাতেই আবুল কালাম প্রাচীন পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থাকে অস্বীকার করেন, কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে স্যর সৈয়দের চিন্তাধারাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তর আনিয়া দেয়। মুসলমান উলামাসম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি ও বিচারভঙ্গীকে স্যর সৈয়দ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ না করিলে বর্তমান যুগে কোনও জাতি উন্নতি করিতে পারে না। আবুল কালাম মনে-প্রাণে সে কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

তাই তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখিয়া ইওরোপের ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া আবুল কালাম পুরাতন বিশ্বাসকে নূতনভাবে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকালের জন্য সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাসের দোলায় আবুল কালাম নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে কাটান। পরিবারের সহজ নিশ্চিত বিশ্বাস বর্জন করিয়া সত্যের সন্ধানে নিজের পথ নিজে খুঁজিবার চেষ্টা যে কি দুরূহ তাহা ভুক্তভোগী-মাত্রই জানেন। পুরাতন জীবনদৃষ্টি হইতে মুক্তির বাহিক পরিচয় হিসাবে সেই সময় তিনি আজাদ বা মুক্ত এই নাম গ্রহণ করেন।

যে সত্যজিজ্ঞাসার পরিচয় আবুল কালামের সাহিত্য ও দর্শন -বিষয়ক রচনায় পাওয়া যায়, তাহারই প্রেরণায় তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়াইয়া পড়েন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি উপলব্ধি করেন যে স্বাধীনতা ভিন্ন মানুষের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। ইংরেজের সহযোগিতায় স্যর সৈয়দ ভারতীয় মুসলমান সমাজের পুনরুজ্জীবন চাহিয়াছিলেন। আবুল কালাম বিদেশী শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট রাজনীতিতে কোনও দিনই বিশ্বাস করেন নাই। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে ভ্রমণের ফলে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেবলমাত্র ভারতবাসীর স্বার্থে নয়, সমস্ত এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই আবুল কালাম রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। সেকালের গুপ্তসমিতিও তাঁহাকে টানিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় 'আল হিলাল' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে এ দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়ের যে রাজনীতি ছিল, তাহার রূপান্তর ঘটিল। আল হিলাল প্রাচীনপন্থী ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত রাজ-ভক্তিমূলক রাজনীতি অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহমূলক রাজনীতির ভিত্তিতে এক নূতন জীবনদর্শন ঘোষণা করিল। এই নূতন রাজনীতির মর্মবাণী ছিল সমাজসংস্কার ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আবুল কালাম কলিকাতা হইতে নির্বাসিত হন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাঁচিতে অন্তরীন থাকেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার মহত্তম রচনা তরজমানুল কোরান রচনার পরিকল্পনা করেন। তিনি অন্তরীন অবস্থাতেই এই গ্রন্থের অনেকখানি লিখিয়াছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের বিপর্যয়ে আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। তাহা সত্ত্বেও কোরানের শিক্ষার আলোকে সমস্ত ধর্মের সত্যতা স্বীকার এবং সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে রচিত একাধারে অনুবাদ ও ভাষ্য -হিসাবে গ্রন্থখানি বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজে বিপুল স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে।

মুক্তির পরে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া আবুল কালাম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁহার জীবন কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশসেবায় নিয়োজিত হয়। তাঁহার আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এত অল্প বয়সে আর কেহ কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হন নাই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রিপ্‌স মিশন ও ক্যাবিনেট মিশন -এর সমস্ত আলোচনা তাঁহার সভাপতিত্বকালেই সম্পাদিত হয়।

মুসলিম লীগ যখন দেশবিভাগের দাবি তোলে তখন মওলানা আজাদ তাহার প্রাণপণ বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন জাতিধর্ম ও দলমত -নির্বিশেষে ভারতবাসী মিলন-মন্ত্রের এই মহান সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৫৮ খ্রী) হিসাবে দেশগঠনে তাঁহার দান চিরকাল স্বীকৃত হইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধির আলোকে তিনি সমস্ত সমস্যার বিচার করিতেন। প্রশ্ন যতই জটিল হউক না কেন, তাহার সমস্ত আনুষঙ্গিক উপেক্ষা করিয়া মূল সমস্যা আবিষ্কারে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের বিচারে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতেন বলিয়া বিরোধীরাও তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ন্যায়বিচারবোধ তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সকলেই তাঁহার কাছে সমান ব্যবহার পাইয়াছে।

হুমায়ুন কবির

আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার সুভাষচন্দ্র বসুকে কারারুদ্ধ করেন (২ জুলাই, ১৯৪০); কিন্তু তিনি ২৯ নভেম্বর অনশনব্রত আরম্ভ করেন এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তাঁহাকে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত কলিকাতার এল্‌গিন রোডস্থিত নিজ ভবনে বাস করিবার অনুমতি দেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র গোপনে কলিকাতা

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ত্যাগ করেন এবং আফগানিস্তান ও রাশিয়ার মধ্য দিয়া জার্মানীতে গমন করেন। জার্মান গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরের ২২ জুন জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেন, যে সমুদায় ভারতীয় সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী হইয়াছে, তাহাদের লইয়া তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করিয়া জার্মান সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার মধ্য দিয়া ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। জার্মান সরকার রাজী হইলেও প্রথমে ভারতীয় সৈন্যেরা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই, কিন্তু পরে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা দলে দলে সুভাষচন্দ্রের সৈন্যদলে যোগ দেয়। জার্মান কর্মচারীদের সাহায্যে এই সমুদায় সৈন্যকে বিশেষভাবে সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা। এই সময়েই জার্মানীর ভারতীয় সম্প্রদায় সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' উপাধি দেয় এবং 'জয় হিন্দ' বলিয়া অভ্যর্থনার পদ্ধতি প্রচলিত করে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১)। মালয় উপদ্বীপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা সিঙ্গাপুর দখল করে (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২) এবং উত্তরে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে ও রেঙ্গুন অধিকার করে (৭ মার্চ, ১৯৪২)। ইহাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থিত ভারতীয় সম্প্রদায় ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার কল্পনায় উত্তেজিত হয়। এই সময়ে ভারতের খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন। তিনি এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ২৮ মার্চ, ১৯৪২ টোকিওতে ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে এক সভায় আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হয় যে জাপানের অধিকৃত সমুদায় স্থানের ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দকে লইয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ স্থাপন করা হইবে এবং ভারতীয় সেনানায়কদের অধীনে ভারতের একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ১৫ জুন, ১৯৪২ ব্যাংককে একটি বিরাট কন্‌ফারেন্‌স হয়। ইহাতে ব্রহ্ম মালয় থাইল্যাণ্ড (শ্যাম দেশ) ইন্দো-চীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জাপান চীন বোর্নিও যবদ্বীপ সুমাত্রা হংকং এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রায় একশত ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা-প্রাঙ্গণে ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার নীচে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ২৪ জুন পর্যন্ত অধিবেশন চলিতে থাকে এবং এই সভায় ৩৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

এই অধিবেশনের পূর্বেই ঘটনাচক্রে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মালয় উপদ্বীপে জাপানীরা ইংরেজ সৈন্যকে পরাস্ত করে। ইহার ফলে ১৪ সংখ্যক পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং, আর একজন ভারতীয় এবং একজন ইংরেজ সেনানায়ক সৈন্যসহ জঙ্গলে পথ হারাইয়া জাপানী-দের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়ে নানা স্থানে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ছোট ছোট সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল— গিয়ানী প্রীতম সিং এইরূপ একটি সংঘের নায়ক ছিলেন। তিনি এবং জাপানী সেনানায়ক মেজর ফুজিহারা বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে লইয়া একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে মোহন সিংকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে মোহন সিং রাজী হইলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরের পতন হইলে ব্রিটিশ সেনানায়ক ৪০০০০ ভারতীয় সৈন্যকে জাপান গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি মেজর ফুজিহারার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফুজিহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া মোহন সিং-এর হস্তে সমর্পণ করিলেন। মোহন সিং তাহাদিগকে আজাদ হিন্দের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যাহারা স্বেচ্ছায় এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া এই ফৌজ গঠন করেন। অনেকে যোগ দিল, অনেকে যোগ দিল না। এই দুই দলকে পৃথক করিয়া রাখা হইল। পরবর্তী কালে ভারত সরকার অভিযোগ করেন যে, যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে স্বেচ্ছায় যোগদান করে নাই, তাহাদিগের উপর অনেক অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হইয়াছিল এবং দিল্লীর লাল কেল্লায় এই অপরাধের জন্য শাহ্‌ নওয়াজ প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন জন নায়ককে অভিযুক্ত ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে যে বিপুল জনক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহাতে ভীত হইয়া ভারত সরকার এই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেন। বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় সৈন্যের প্রতি নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করা হইয়াছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তবে এ কথা ঠিক যে পূর্বোক্ত ব্যাংকক কন্‌ফারেন্‌সের পূর্বেই ২৫০০০ ভারতীয় সৈন্য মোহন সিং-এর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিল এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ৪০০০০ হইয়াছিল। মোহন সিং টোকিও কন্‌ফারেন্‌স হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ভারতীয় সামরিক নায়কগণকে লইয়া

আজাদ হিন্দ ফৌজ

এক সভা করেন (এপ্রিল ১৯৪২) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ বিধিবদ্ধভাবে গঠিত হয়। ব্যাংকক কন্‌ফারেন্‌সে ভারতীয় সৈন্য এবং অন্যান্য ভারতবাসীকে লইয়া এই ফৌজ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মোহন সিং তাহার সেনাপতি নির্বাচিত হন। এই কন্‌ফারেন্‌সে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। রাসবিহারী বসু ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। অপর যে চারি জন সদস্য ছিলেন তাহার অন্যতম মোহন সিং সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। সামরিক শিক্ষা ছাড়া, ভারতের ইতিহাস, ইংরেজ শাসনের কুফল, স্বাদেশিকতা প্রভৃতিও শেখানো হইত। সৈন্যদিগকে বিশেষভাবে স্বাধীনতাব্রতে দীক্ষিত করা হইত— ইহার তিনটি মূলমন্ত্র ছিল— ঐক্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ।

কিন্তু নানা কারণে গঠনকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হয় নাই। সেনানায়কদের মধ্যে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিল না এবং ইহাদের কেহ কেহ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজের দলে যোগ দিয়াছিল। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যেও মতভেদ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অপর দিকে জাপান গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া মোহন সিং সভাপতি ও সদস্যদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জাপান গভর্নমেণ্টকে এক চরম পত্র পাঠাইলেন যে, ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি তাহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে না পারে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বতন্ত্রভাবে দেশ উদ্ধারের কার্যে অগ্রসর হইবে। সভাপতি রাসবিহারী বসুকেও তিনি এক অপমানজনক চিঠি লিখিলেন এবং একখানি সীল করা খামে নির্দেশ দিলেন যে, যদি তিনি (অর্থাৎ মোহন সিং) কারারুদ্ধ হন তবে যেন সেনানায়কগণ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙিয়া দেয় এবং নায়ক ও সৈন্যগণ এই শপথ গ্রহণ করে যে ভবিষ্যতে কেহ আর কখনও কোনও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিবে না। এই নির্দেশের কথা জানিতে পারিয়া সভাপতি রাসবিহারী বসু মোহন সিংকে বন্দী করিলেন। ফলে কার্যকরী সমিতির অন্য দুই জন সমিতি হইতে পদত্যাগ করিলেন। সভাপতি ও একজন সদস্য মাত্র সমিতিতে রহিলেন।

ক্রমে নানা কারণে আরও গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং রাসবিহারী বসুর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সকলই ব্যর্থ হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এশিয়ায় পৌছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাংকক কন্‌ফারেন্‌সে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমন্ত্রণ করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। নেতাজী বেতারের সাহায্যে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দুঃসাহসে ভর করিয়া এক জার্মান সাবমেরিনে আফ্রিকার পূর্ব দিকের সমুদ্রে এবং তথা হইতে জাপানী সাবমেরিনে সুমাত্রা হইয়া টোকিওতে গমন করেন (১৩ জুন, ১৯৪৩)। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং জাপানের বিধান-সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, জাপান ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। নেতাজী স্বাধীন ভারত সরকার (অস্থায়ীভাবে) গঠন করিবার প্রস্তাব করিলে তোজো তাঁহাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করেন। টোকিও হইতে বেতারযোগে নেতাজী ভারত-স্বাধীনতার পরিকল্পনা প্রচার করেন। ইহাতে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসিলে বিরাট জনতা তাঁহাকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়। ৪ জুলাই রাসবিহারী বসু নিজে পদত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি-পদে বৃত করিলেন। উপস্থিত ৫ হাজার ভারতীয় জয়ধ্বনিসহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং সুভাষ-চন্দ্রকে 'নেতাজী' বলিয়া অভিনন্দিত করিল। নেতাজী 'অস্থায়ী' স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ শীঘ্রই ভারত অভিমুখে রণযাত্রা করিবে এই আশ্বাস দিলেন। পরদিন নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করিলেন এবং 'দিল্লী চলো' এই আহ্বানের দ্বারা তাহাদের মনে এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিলেন।

২৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া নেতাজী ইহার সর্ববিধ উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন। নূতন সৈন্য সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। নারী ও পুরুষ উভয়বিধ সৈন্যের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ছয় মাস শিক্ষার পর ইহাদিগকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। নারী সৈনিকদের জন্য ঝাঁসির রানী ব্রিগেড গঠিত হইল।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর নেতাজী সমবেত পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিগণের সমক্ষে (অস্থায়ী) 'আজাদ হিন্দ' অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন।

দুই দিন পরে এই নবগঠিত গভর্নমেণ্ট ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি ভারতবাসী নিজ আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিবে এইরূপ স্থির হইল। অনেকে ন্যায্য দেয় অপেক্ষা অনেক বেশিও দিয়াছিল। কেহ কেহ যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিল। কোনও কোনও লোক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নেতাজী অনেকটা জোর-জবরদস্তি করিয়াই এই টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

নেতাজী ও তাঁহার মন্ত্রীগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে জাপানী সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া তাহারাও ভারত অভিযানে যোগ দিবে। কিন্তু জাপানী সেনাপতি টেরাউচি তিনটি কারণে ইহাতে আপত্তি করিলেন: প্রথমতঃ, ভারতীয় সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং তাহারা বিজয়ী জাপানী সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ সৈন্যের আরাম ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত সিপাহীরা জাপানীদের মত কষ্টসহিষ্ণু নহে। তৃতীয়তঃ, সিপাহীরা মূলতঃ ভাড়াটিয়া সৈন্য, জাপানী সৈন্যের ন্যায় দেশপ্রেম বা জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে। সুতরাং ইংরেজ যদি ভাল খাদ্য, উচ্চ বেতন ও শীঘ্র গৃহে ফিরিবার প্রলোভন দেখায় তবে তাহাদের ইংরেজ সৈন্যে পুনরায় যোগ দিবার সম্ভাবনা খুব বেশি। সুতরাং টেরাউচি প্রস্তাব করিলেন যে জাপানী সৈন্যরাই ভারতে যুদ্ধ করিবে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সিঙ্গাপুরেই থাকিবে, তবে ইহাদের এক অংশ জাপানী সেনাদলের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গুপ্তচর ও প্রচারক -হিসাবে কার্য করিবে, নেতাজীও তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা ভারতের জনমত গঠন ও সহানুভূতির উদ্রেক করিবেন। নেতাজী বলিলেন, কেবলমাত্র জাপানী সৈন্যের চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারাই যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাহা দাসত্বের নামান্তর মাত্র হইবে। ভারতবাসী রক্তপাতের বিনিময়েই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিবে। সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যের অগ্রভাগে থাকিয়াই ভারত অভিযানে যাত্রা করিবে। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রথমে মাত্র এক রেজিমেণ্ট ভারতীয় সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে মিশিয়া যুদ্ধ করিবে। যদি দেখা যায় যে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যের সমকক্ষ, তবে আরও ভারতীয় সৈন্য গ্রহণ করা হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত হইয়াছিল—গান্ধী, আজাদ ও নেহরু ব্রিগেড। পূর্বোক্ত আলোচনার পর স্থির হইল যে, এই তিন ব্রিগেডের বাছাই সৈন্য লইয়া একটি নূতন ব্রিগেড গঠিত হইবে এবং ইহাই প্রথমে যুদ্ধে যোগ দিবে। নেতাজীর নিষেধ সত্ত্বেও এই নূতন ব্রিগেডের সৈন্যদল ইহাকে সুভাষ ব্রিগেড নামে অভিহিত করিল।

এই ব্রিগেডের সৈন্যদিগকে বিশেষভাবে সামরিক ও দেশাত্মবোধক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। নেতাজী তাহাদিগকে দেশোদ্ধার-রূপ মহান সংকল্পের কথা বুঝাইয়া বলিলেন যে, সৈন্যগণকে বহুবিধ এবং অতি কঠোর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যাহারা ইহার জন্য প্রস্তুত নহে তাহাদিগকে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ একবাক্যে বলিল, 'নেতাজী, আমাদিগকে সুযোগ দিন, আমরা প্রতিপন্ন করিব যে ভারতীয় সৈন্য বেতনভোগী হইলেও দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য যে কোনও জাতীয় সৈন্যের ন্যায় বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে পারে।'

সুভাষ ব্রিগেড নভেম্বর মাসে যাত্রা করিয়া জানুয়ারির প্রথম ভাগে রেঙ্গুনে পৌছিল। নেতাজীও ঐ সময় রেঙ্গুনে গেলেন এবং প্রধান সামরিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাপানী সেনাপতি প্রস্তাব করিলেন, ভারতীয় সৈন্য ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া প্রতি দলকে বড় বড় জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হউক। নেতাজী ইহাতে আপত্তি করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল—১. ভারতীয় সৈন্যদিগকে এক ব্যাটালিয়ান অপেক্ষা ছোট দলে ভাগ করা হইবে না; ২. প্রত্যেক দল ভারতীয় নায়কের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে; ৩. নেতাজী ও জাপানী সেনাপতি পরামর্শ করিয়া যে রণ-পদ্ধতি স্থির করিবেন জাপানী ও ভারতীয় সৈন্য উভয়েই সেই অনুসারে চলিবে; ৪. আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

আরও স্থির হইল, সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটালিয়ান আরাকানে কালাদান নদীর উপত্যকায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটালিয়ান লুসাই পাহাড়ের পূর্বস্থিত চীন পাহাড়ের অন্তর্গত কালাম ও হাকা নামক দুইটি কেন্দ্রে যুদ্ধ করিবে। প্রথম ব্যাটালিয়ান, কালাদান নদীর উভয় তীর দিয়া জাপানী সৈন্যের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া প্রথমে পলেতোয়া ও পরে দলেৎমে অধিকার করিল। এখান হইতে ৬৪ কিলো-মিটার (৪০ মাইল) দূরে ভারতের সীমান্ত। ভারতীয় সৈন্যেরা দেশের মাটিতে পৌছিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল এবং একদিন অতর্কিতে মউডক নামে ভারত-সীমানার মধ্যবর্তী ব্রিটিশ সৈন্যের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ব্রিটিশ সৈন্য পলায়ন করিলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা দেখা দিল। তাহারা দেশের পবিত্র মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িয়া দেশমাতৃকাকে প্রণাম করিল এবং ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াইয়া দিল। এত দূরে অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ করা কষ্টকর দেখিয়া জাপানীরা ফিরিয়া যাইতে চাহিল। ভারতীয় সৈন্যেরা বলিল, 'জাপানীদের দেশ পূর্বে— তাহারা ফিরিয়া যাউক। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমে দিল্লী— আমরা ফিরিব না।' তখন ক্যাপ্টেন সুরযমলের অধীনে একটি কোম্পানি মাত্র মউডকে রাখিয়া বাকি সৈন্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু জাপানী সেনানায়ক ভারতীয় সৈন্যদের মনের বল দেখিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, তিনি জাপানী সৈন্যের এক প্ল্যাটুন ভারতীয় নায়কের অধীনে রাখিয়া গেলেন। জাপানী সৈন্য বিদেশী নায়কের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় এই প্রথম। জাপানী সেনাপতি নেতাজীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ভুল ভাঙিয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাড়াটিয়া সৈন্য নহে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক।' মউডকের এই ক্ষুদ্র সেনাদল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে হইতে সেপ্টেম্বর, এই পাঁচমাস কাল ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়াও এই ভারতীয় ঘাঁটিটি রক্ষা করিয়াছিল।

সুভাষ ব্রিগেডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটালিয়ান জাপানী সৈন্যের নিকট হইতে হাকা-কালাম সীমানা রক্ষার ভার গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত বহু সংঘর্ষে জয়লাভ করিয়া তাহারা এই ঘাঁটি আগলাইয়া রাখে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের পতন হইলে জাপানী সেনাপতি সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ দিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমায় অবস্থান করিবে এবং যাহাতে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া বঙ্গ দেশে প্রবেশ করিতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান্ধী ও আজাদ নামক অপর দুইটি ব্রিগেডও ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইল।

ইহার পূর্বেই জাপানী সৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া ইম্ফলের দুই মাইল দূরে পৌঁছিয়াছিল। এই ফৌজের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও এক দল ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ, ব্রহ্মদেশের সীমানা পার হইয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে ইহাদের প্রত্যেকেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, যাহাতে সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিতে পারে। ২১ মার্চ জাপানের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের যে যে অংশ হইতে ইংরেজ সৈন্য বিতাড়িত হইয়াছে তাহা নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের শাসনাধীন হইবে।

জাপানীদের ভরসা ছিল যে বর্ষা আসিবার পূর্বেই ইম্ফল অধিকার করিতে পারিবে— বর্ষাকালে ইংরেজ সৈন্য প্রতি-আক্রমণ করিতে পারিবে না। এবং ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া বর্ষা শেষ হইলেই তাহারা পূর্ব দিক হইতে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ আসামের মধ্য দিয়া বঙ্গ দেশ আক্রমণ করিবে। এইজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজকে নাগাপর্বতের রাজধানী কোহিমায় একত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বিপুল সৈন্যদল, নৌবাহিনী ও বিমানপোত দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া জাপানের দিকে অগ্রসর হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হইয়া জাপানকে ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে বহু বিমানপোত প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠাইতে হয়। ইহার ফলে ভারতের পূর্বসীমান্তের বহু সৈন্য বিমানপোতের সাহায্যে ইম্ফলে পৌঁছে। বর্ষার পূর্বে জাপানীরা ইম্ফল অধিকার করিতে পারিল না। তাহার পর যুক্তরাজ্যের সৈন্যদল প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ অধিকার করিয়া জাপান আক্রমণের উদ্যোগ করে এবং জাপানী সৈন্য ভারত আক্রমণের আশা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও হটিতে হয়। এবং তাহার পর ইংরেজ ও আমেরিকার বিপুল সৈন্যদল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিলে কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ বহু বাধাবিঘ্ন, খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও যে অতুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার খ্যাতি চিরদিন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাহারা ভারতসীমান্তের মধ্যে ২৪১ কিলোমিটার (১৫০ মাইল) অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু একবারও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে বা তাহাদের কোনও ঘাঁটি দখল করিতে পারে নাই। অন্য দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ অধিকাংশ সময়েই সফল হইয়াছিল এবং তাহারা ইংরেজ সৈন্যের অনেক ঘাঁটি দখল করিয়াছিল। তাহাদের চারি সহস্র সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল।

যদিও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি পরোক্ষভাবে এই কার্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভারতে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রধানতঃ ভারতীয় সিপাহীদলের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের সহায়তা ব্যতীত ক্ষুদ্র ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভারত জয় করা বা রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ

দেখিয়া ইংরেজ বুঝিল যে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতের উপর আধিপত্য বজায় রাখা আর সম্ভবপর নহে। ১৯২০-২১ ও ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের অহিংস আন্দোলন এবং ১৯০৮ হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সহিংস বিপ্লববাদকে ইংরেজ যেমন দমন করিয়াছিল, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানীর আক্রমণও তেমনি ব্যর্থ করিয়াছিল। তথাপি তাহারা যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় ভারতের উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দিল, তাহার জন্য অহিংস আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবও যতটা কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে, আজাদ হিন্দ ফৌজের দাবি তাহার কোনটি অপেক্ষা কম নহে।

দ্র A. C. Chatterji, *India's Struggles for Freedom*, Calcutta, 1947 ; Shah Nawaz Khan, *My Memories of I. N. A. and Its Netaji*, Delhi, 1946 ; Shah Nawaz Khan & Others, *The I. N. A. Heroes*, Lahore, 1946 ; R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. III, Calcutta, 1963.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আজান মসজিদের মিনার অথবা গম্বুজ হইতে প্রার্থনায় সমবেত হইবার জন্য মুয়াজ্জিন বা ঘোষক কর্তৃক আহ্বান। আজানে ঘোষিত হয় 'আল্লা মহান, মহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ। প্রার্থনায় সমবেত হও, সৎপথে আইস'।

আবুল হায়াত

আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুরের ২১ কিলোমিটার (১৩ মাইল) উত্তরে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহা লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত। নদীর অপর পারে জিয়াগঞ্জ শহরকে লইয়া জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌর এলাকা (মিউনিসিপ্যালিটি) জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত। এই দুইটি শহরের মিলিত জনসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ২৩৬৭৫। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ১৯১৪৮। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানের জনসংখ্যা ছিল ২১৬৪৮; ১৮৭২ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শহরে ক্রমশঃ জনবিরলতা লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব রেলপথের একটি শাখা (নলহাটি-আজিমগঞ্জ জংশন লুপ লাইন) আজিমগঞ্জে শেষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ব্যাণ্ডেল-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া লুপ লাইনেরও অন্যতম স্টেশন আজিমগঞ্জ জংশন।

আজিমগঞ্জ এককালে মুর্শিদাবাদের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। অনুমান করা হয় যে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমু-শ্-শান্-এর নাম হইতে এই শহরের নামকরণ হয়। আজিমগঞ্জ একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান এবং বর্তমানে এই অঞ্চলের বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী চাউল, ছোলা, তৈলবীজ, পাট ও যব। এই স্থানে ও গঙ্গার অপর পারে জিয়াগঞ্জে বহু ধনী জৈন বণিকের বসতি আছে। কথিত আছে যে, এই সব পশ্চিমদেশীয় বণিক অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিকানীর হইতে বাংলা দেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে শুধু সওদাগরি করিত, পরে তাহারা জমিদারও হইয়া উঠে। আজিমগঞ্জে বহু সুরম্য জৈন মন্দির আছে। এই শহরের ইহা বিশেষ গর্বের বিষয়। ধনপৎ সিং নওলক্ষার 'গোলাপবাগ' নামক মনোরম উদ্যানবাটী এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। আজিমগঞ্জ শহরের ১.৬ কিলোমিটার (১ মাইল) উত্তরে বড়নগর একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। 'বড়নগর' দ্র।

দ্র বাংলায় ভ্রমণ, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৪০ ; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Murshidabad*, Calcutta, 1914 ; *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Murshidabad*, Calcutta, 1953.

সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজিমু-শ্-শান্ (মহম্মদ আজিমুদ্দীন) মুয়াজ্জমের পুত্র। শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর ঔরঙ্গজেব পৌত্রকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬৯৭ খ্রী)। ইনি রহিম খাঁকে পরাজিত করেন ও ১৬০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারি ক্রয় করিতে অনুমতি দেন (১৬৯৮ খ্রী)। নিজের সওদা-ই-খাস (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়) ঔরঙ্গজেবের তিরস্কারে বন্ধ হইলে তিনি রাজস্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চান। দেওয়ান মুর্শিদকুলীর নিকট বাধা পাইয়া ষড়যন্ত্র করেন ও বিহারের যুক্ত-সুবাদার হিসাবে তিনি পাটনায় (আজিমাবাদ) স্থানান্তরিত হন (১৭০৩ খ্রী)। তিনি শাহাবাদের জমিদার ধীর উজ্জয়িনীয়াকে দমন করেন। বাহাদুর শাহ্ ইঁহাকে আজিমু-শ্-শান্ উপাধি দেন। ইনি অলস ও লোভী প্রকৃতির ছিলেন। সিংহাসন-দ্বন্দ্বে ইনি নিহত হন (১৭১২ খ্রী)।

জগদীশনারায়ণ সরকার

আজীবিক বৌদ্ধ এবং প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে যে সকল অ-বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অথবা পরিব্রাজকসম্প্রদায় ছিল আজীবিকসম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে) তাহাদের উদ্ভব হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, বায়ু-পুরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মক্‌খলি গোসাল ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি এবং সম্প্রদায়ভুক্ত সকল সন্ন্যাসীই নগ্ন ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধ তীব্র ভাষায় মক্‌খলি গোসাল ও তাহার মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। নদীতে জাল ফেলিয়া যেমন মাছ ধরা হইয়া থাকে তেমনই মানুষকে দুঃখ কষ্ট ও ধ্বংসের মুখে লইয়া যাওয়ার জন্যই মানুষ-ধরা জাল এই মক্‌খলি গোসাল পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে।

'আজীবিক' শব্দটির বহু ব্যাখ্যা আছে। কেহ বলেন, অপরের দান গ্রহণ করিয়া যাহারা জীবনধারণ করে তাহারা আজীবিক। কেহ আবার বলেন, ইহা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ জীবনধারণ প্রণালী, তাহারা গৃহীই হউক বা সন্ন্যাসীই হউক। কেহ আবার মক্‌খলি গোসালের আজীবন পালনীয় প্রতিজ্ঞারূপে এই শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাচীন আজীবিকসম্প্রদায় অত্যন্ত কঠোর ব্রত ও নিয়ম পালন করিত। তাহারা দলবদ্ধভাবে বাস করিলেও লোকালয়ের বাহিরেই সম্ভবতঃ তাহাদের বাসস্থান ছিল।

বার্হস্পত্য মতবাদের সহিত ইহাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এ সম্বন্ধে 'চার্বাক'-দর্শন তুলনীয়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী ছিল। তাহারা বলিত যে, 'নিয়তি দুর্লঙ্ঘ্য'। আনন্দ বা মুক্তিলাভের কোনও সহজ পন্থা নাই। নিয়তির বিধানের জন্য অপেক্ষা করা উচিত, নিয়তির নির্দেশেই মানুষ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জন্মান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত মুক্তি লাভ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা জৈন সন্ন্যাসীদের ন্যায় আজীবিকরাও ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহাদেরও বক্তৃতাগৃহ, সংঘজীবন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল।

বৌদ্ধ এবং জৈন -সম্প্রদায়ের মত সমাজের সকল স্তরের লোকই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিত। শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরাই ছিল এই সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহারা 'কুলুপক' অর্থাৎ গৃহস্থের বাটীতে যাতায়াত করিতেন এবং তাহাদের শুভাশুভ গণনা করিতেন। ধম্মপদ অথকথায় ইহাদের যে বর্ণনা স্থানে স্থানে পাওয়া যায় তাহাতে ইহাদের আচার-ব্যবহার অতি ঘৃণ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রায় সকল বড় বড় শহরেই এই সম্প্রদায়ের অনুরাগী ও উপাসক বর্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় অঞ্চলেও তাহারা বর্তমান ছিল। উত্তর ভারত অপেক্ষা এই অঞ্চলেই তাহাদের প্রভাব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেও তামিলনাদে তাহাদের অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায়।

অজণ্টার একটি গুহাচিত্রে নগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখা যায়, বিখ্যাত আজীবিক উপকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাতের দৃশ্যটি বোরোবুডুরের একটি ভাস্কর্যে দেখা যায়। বোরো-বুডুরের আজীবিক মূর্তিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। ইহা ছাড়া 'বরাবর' গুহায় অশোক-শিলালেখ, 'নাগার্জুনী' গুহার দশরথ-শিলালেখ প্রভৃতিতে আজীবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া, বীর্য, কর্ম প্রভৃতি স্বীকার না করার জন্য বুদ্ধ এই সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করেন।

দ্র B. M. Barua, *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy*, Calcutta, 1921 ; A. L. Basham, *History and Doctrines of the Ajivikas*, London, 1951.

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আজু গোঁসাই সপ্তদশ শতাব্দীর সাধক কবি রাম-প্রসাদের সমসাময়িক। ইঁহার বাস ছিল হালিশহরে। ইঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল বলা যায় না। অযোধ্যানাথ, অচ্যুত, অজয়, রাজচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ইঁহার সম্পর্কে চলিত আছে। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত ও কবি। সেকালের শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সুপরিচিত। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের সংগীত-সংগ্রামও স্মরণীয় হইয়া আছে। তবে রামপ্রসাদের বিদ্রূপাত্মক গান পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদী সংগীত কবির ধর্মভাবের স্বাভাবিক স্ফূর্তি রূপেই রচিত। আজু গোঁসাইয়ের গান যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সবই রামপ্রসাদের কোনও না কোনও গানের পরিহাসপূর্ণ কটাক্ষে বা উত্তরে রচিত হইয়াছে। এই সংগীতকলহ উপভোগ করিবার জন্য নাকি উভয় পক্ষের বহু ভক্ত উপস্থিত থাকিতেন। রামপ্রসাদের জীবনী রচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন, "রাজা [কৃষ্ণচন্দ্র] যখন কুমারহট্ট আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সংগীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন।

রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, আজু গোঁসাই আদপাগল ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য-কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদবিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্যচ্ছলে তাহারি উত্তর দিতেন।"

রামপ্রসাদের একটি গানে এবং তাহার আজু গোঁসাই-কৃত উত্তরে উভয়ের বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

এই সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি

উত্তরে আজু গোঁসাই বলিলেন—

এই সংসার রসের কুটি
খাইদাই রাজবেশ বোসে মজা লুটি।

আজু গোঁসাই সম্পর্কে তথ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার মাত্র পাঁচটি গান সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার আরও কিছু গান অন্যত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্র ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি-জীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, কলিকাতা, ১৯৫৪।

ভবতোষ দত্ত

আটকৌড়ে আঁতুর দ্র

আঁটপুর হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত একটি মৌজা। মার্টিন কোম্পানির লাইট রেলপথে হাওড়া-চাঁপাডাঙা শাখায়, হাওড়া ময়দান হইতে অনধিক ৪০ কিলোমিটার দূরে ঐ নামেই ইহার স্টেশন আছে। হরিপাল হইতে রাজবলহাট যাইবার পাকা রাস্তা দিয়াও এই গ্রামে যাওয়া যায়।

শ্রীরামপুর মহকুমার শ্রীরামপুর, হরিপাল, দ্বারহট্ট, কৈকলা, জয়নগর এবং নিকটবর্তী রাজবলহাটের মত আঁটপুরও তন্তুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থানের ন্যায় আঁটপুরেও উৎকৃষ্ট শাড়ি ও ধুতি তৈয়ারি হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আঁটপুরে জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ শিল্পোৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। তন্তুশিল্পই এখানে প্রধান জীবিকা; তবে কিছু সংখ্যক লোক সাইকেল মেরামতি, কাস্তে ও ছুরি তৈয়ারি, শোলার খেলনা এবং আসবাব নির্মাণ শিল্পেও নিয়োজিত। গ্রামে তন্তুশিল্পের একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু অধিকাংশ তন্তুশিল্পী স্বতন্ত্রভাবেই কাজ করেন। বহু শিক্ষিত এবং সম্পন্ন লোক এই জনপদে বসবাস করেন।

আঁটপুর গ্রাম স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর এখানে স্বামীজী তাঁহার আট জন অন্তরঙ্গসহ সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমাও একাধিকবার এই গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন।

স্থানীয় মিত্রপরিবারের গৃহপ্রাঙ্গণে অবস্থিত রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও অলংকরণসৌকর্যের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চালারীতিতে নির্মিত এই মন্দিরটির নির্মাণকার্য অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে সমাপ্ত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রসংলগ্ন মৃৎফলক হইতে তৎকালীন সমাজজীবনের একটি বাস্তব রূপরেখা অনুধাবন করা যায়।

উপরি-উক্ত মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে মিত্রপরিবারের কাষ্ঠনির্মিত যে চণ্ডীমণ্ডপটি আছে তাহাও গঠনবৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য। কাঠখোদাই ও অলংকারে সজ্জিত এই দোচালা মণ্ডপটি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রায় সমসাময়িক। অদ্যাবধি এই মণ্ডপ দুর্গাপূজার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দ্র সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ, হুগলী জেলার ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; *Census 1951: West Bengal: District Handbook: Hooghly*, Calcutta, 1952.

প্রণবরঞ্জন রায়

আড়কাঠি কুলি দ্র

আড়্বার একটি তামিল শব্দ। ইহার যৌগিক অর্থ—আড়্— নিমগ্ন, বার— যিনি থাকেন, অর্থাৎ নিমগ্ন ব্যক্তি। ইহার ফলিত অর্থ— ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন ব্যক্তি। এই আড়্বারগণের মধ্যে বৈরাগ্যজ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির সাক্ষাৎ অনুভবে নিমগ্ন থাকিতেন এবং নিরন্তর ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিতেন। আড়্বারগণ দ্বাদশ সংখ্যক— পোয়্গৈ, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ, নম্মাড়্বার, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াড়্বার, অণ্ডাল (মহিলা), তোণ্ডারিপ্পড়ি, তিরুপ্পান্, তিরুমঙ্গই। ব্রাহ্মণ হইতে পঞ্চম বর্ণ অবধি বিবিধ কুলে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ ছিলেন রাজা, কেহ জমিদার, কেহ বা ছিলেন দরিদ্র। ইঁহাদের আবির্ভাব-কাল অতি প্রাচীন। প্রাচীন দ্রাবিড় লিপিমতে এবং আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষকগণের মতে এ বিষয়ে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

আড়্বারগণের দিব্য উক্তিসমূহ প্রবন্ধাকারে সুরক্ষিত হইয়া আছে। এই দিব্য প্রবন্ধাবলী সমবেতভাবে 'দ্রাবিড়-বেদান্ত' নামে প্রসিদ্ধ। এই দ্রাবিড়বেদান্তটি ৪০০০ তামিল শ্লোকে সংগঠিত। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত বেদান্ত

এবং এই দ্রাবিড়বেদান্ত একত্রিতভাবে 'উভয়বেদান্ত' নামে পরিচিত। এই দ্রাবিড়বেদান্ত হইতে আড়্বারগণের বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদনুভব, প্রেম-ভক্তি এবং ভজনধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই ছিলেন ঐকান্তিক বৈষ্ণব। অর্চাবিগ্রহে এবং তাঁহাদের তীর্থস্থলে ইঁহাদের বিশেষ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। কখনও ইঁহারা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যের অনুভবে ডুবিয়া থাকিতেন (জ্ঞানদশা), কখনও বা ভগবানের মাধুর্যরসে বিভোর থাকিতেন (প্রেমদশা)। এই প্রেমদশায় তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারা প্রবাহিত হইত। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও নায়িকা-ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে দেখা গেলেও তাঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ দাস্য ও নায়িকা-ভাবের রসিক। নায়িকাদশায় কখনও স্বকীয়া কখনও বা পরকীয়া-ভাব বিদ্যমান থাকিত। অণ্ডালদেবী ছিলেন গোপীভাবময়ী।

আড়্বারদের ভজনধারায় সংকীর্তন একটি প্রধান অঙ্গ। তাঁহাদের প্রত্যেক দিব্যসূক্তিটি সুর-লয়ের নির্দেশ-সহ গীতি-আকারে রচিত। এই সকল শ্লোক অদ্যাপি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে গীত হইয়া থাকে। তিরুপ্পান্ (তিরু=শ্রী, পান=কণ্ঠসংগীত) আড়্বার ছিলেন এই সংকীর্তনের এক সজীব মূর্তি। নম্মাড়্বার-রচিত সহস্রশ্লোকাবলীর অপর একটি নাম সহস্রী-গীতি। ইহা ভগবানের, বিশেষতঃ অর্চাবতারের রূপ-গুণ-লীলা-বিভূতি এবং ভাগবতের মহিমাসূচক পদাবলীতে পূর্ণ। বঙ্গদেশীয় কীর্তনপদাবলীর ভাব সুর ও তালের সঙ্গে আড়্বারপদাবলীর ভাব সুর ও তালের সাদৃশ্য অনেক স্থলে দেখা যায়। তাঁহাদের দিব্যপ্রবন্ধে মাধব কেশব গোবিন্দ নারায়ণ প্রভৃতি নামকীর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানের মঙ্গলগান (মঙ্গলাশাসন) আড়্বার-সংগীতের আর একটি বিশেষ অঙ্গ। শ্রীরঙ্গমে প্রতিবৎসর পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত 'তিরু-অধ্যয়ন' মহোৎসবে আড়্বার-গণের ৪০০০ দিব্যশ্লোকই অভিনয়সহকারে গীত হইয়া থাকে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হয়।

শ্রীসম্প্রদায়ের ভাবধারা বহুলাংশে আড়্বারগণের ভাবধারা হইতে সংগৃহীত। এই কারণে শ্রীসম্প্রদায়ের অপর একটি নাম হইতেছে 'আড়্বারসম্প্রদায়'।

যতীন্দ্র রামানুজদাস

আডিয়ার মাদ্রাজ দ্র

আড়িয়াল খাঁ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে) উৎপন্ন জোয়ার-প্রভাবিত সুনাব্য আড়িয়াল খাঁ নদী পদ্মার শাখানদীরূপে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়। ইহার শাখা-প্রশাখা বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নদীতে পড়িয়াছে এবং অন্য দিকে মধুমতী, ধলেশ্বরী, বিশখালি, বুড়ী শওয়ার এবং তেঁতুলিয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তরাংশে ফরিদপুর ও দক্ষিণাংশে বিশখালি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত বরিশাল শহর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র।

অরবিন্দ বিশ্বাস

আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া আজমীরের প্রসিদ্ধ মসজিদের লৌকিক নাম। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলতান কুতুবুদ্দীনের রাজত্বে ইহা আরব্ধ হয় ও সুলতান ইলতুৎমিসের রাজ্যকালে সম্পূর্ণ হয়। ইহার সাধারণ অর্থ এই যে আড়াই দিনে এই বিশাল কারুকার্যশোভিত মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহা অবশ্য কোনমতেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সম্ভবতঃ যে সমুদায় হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া এই মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিতে আড়াই দিন মাত্র লাগিয়াছিল— ফার্গুসন এইরূপ অনুমান করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আতর সুগন্ধি ফুলের নির্যাস হইতে প্রস্তুত তৈলবৎ পদার্থ। বিশেষতঃ গোলাপের নির্যাস হইতে যাহা প্রস্তুত হইত তাহাই 'আতর' নামে পরিচিত ছিল। নূরজাহানের সময় হইতে আতর তৈয়ারির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, এইরূপ কথিত আছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের গাজিপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে ও পারস্য, ফ্রান্স, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে গোলাপের আতর প্রস্তুত হয়।

লৌহ বা তাম্র পাত্রে নির্মল জল ও ফুল একসঙ্গে রাখিয়া দেওয়া হইত। এক প্রকার বকযন্ত্রের সাহায্যে ঐ জল পাতনপূর্বক শ্বেতচন্দনচূর্ণসহ উহা পুনর্বার পাতন করিয়া লইলে একপ্রকার নির্যাস পাওয়া যাইত। রাত্রিকালে শীতল বাতাসে ঐ নির্যাস মসলিনে ঢাকিয়া রাখিলে জলের উপর একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ ভাসিয়া ওঠে। পাখির পালকের সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করিয়া কাচপাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইত। পূর্বকালে ইহাই ছিল আতর প্রস্তুত করিবার প্রণালী। সাধারণতঃ শীতকালই ছিল প্রস্তুতির প্রশস্ত সময়। একলক্ষ গোলাপ হইতে এইভাবে মাত্র এক তোলা বিশুদ্ধ আতর সংগৃহীত হইতে পারে।

ত্রিদিবনাথ রায়

আতশবাজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল হইতেই বিজয়োৎসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নানা প্রকার অগ্নিক্রিয়া প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগে অগ্নি-প্রজ্বালকেরা সহজলভ্য কাঠকয়লা ও সোরা -মিশ্রিত সহজদাহ্য পদার্থ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। তাহার পর এই সহজদাহ্য পদার্থের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ইহার বিস্ফোরক ও দাহিকা শক্তি বর্ধিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই অবশেষে আতশবাজী প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। আমাদের দেশেও নানাবিধ ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আতশবাজী ব্যবহারের রেওয়াজ বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। তারাবাজী, তুবড়ি, চরকিবাজী, কদমঝাড়, উড়নতুবড়ি, বিচিত্র দৃশ্য-উৎপাদক হাউই প্রভৃতি আতশবাজী সর্বজনপরিচিত।

সর্বপ্রথম কোথায়, কাহার দ্বারা আতশবাজী প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বের্থোল্ড শ্বোয়ার্ৎস বন্দুক নির্মাণের মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তখন কয়লার গুঁড়া, সোরা প্রভৃতির সহজদাহ্য মিশ্রণকেই বন্দুকের গুঁড়া বা বারুদ বলা হইত। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর সেনাবাহিনীর মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী পৃথক সৈনিকদলের সৃষ্টি হয়। তাহাদিগকেই যুদ্ধাস্ত্র ও আগ্নেয় অস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিতে হইত। অবশেষে শান্তি বা বিজয়োৎসবে আতশবাজীর নানা প্রকার দৃশ্য দেখাইবার দায়িত্বও তাহাদের উপর অর্পিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী এবং তাহার পরবর্তী কালেও সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রনির্মাতারাই উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে অধিকাংশ আতশবাজী সরবরাহ করিত। সেই সময়ের আতশবাজী অবশ্য বিভিন্ন রকম সহজদাহ্য পদার্থের সাহায্যে তীব্র আলোর ঝলক সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের মশাল তৈয়ারি প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেগুলি কিন্তু ঠিক আতশবাজীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না। আতশবাজী বলিতে যাহা বুঝায়, প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ জিনিস উৎপাদিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চতুর্দশ লুই -এর প্রচুর অর্থব্যয়ের কথা শুনিয়া বলোনিজ আতশবাজীর শিল্পী রুঘ্জিএরি ভ্রাতৃদ্বয় প্যারিসে যান। ভার্সাই ও অন্যান্য স্থানে তাঁহারা আতশবাজীর এমন সব মনোরম দৃশ্য প্রদর্শন করেন, যাহা পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই। যাহা হউক, এইভাবে ক্রমশঃ আতশবাজীর উৎকর্ষ সাধিত হইলেও তখন পর্যন্ত এই শিল্প প্রধানতঃ সোরার উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং কোনও রঙিন আলো উৎপাদন করাও তখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আতশবাজীতে কিছু কিছু রঙিন আলোকসৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই আতশবাজীতে পটাসিয়াম ক্লোরেটের ব্যবহার শুরু হয়। বস্তুতঃ ইহার ফলেই আতশবাজীশিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পটাসিয়াম ক্লোরেট আবিষ্কার করিয়াছিলেন বেয়ারতোলে। এই পদার্থটি ব্যবহারের ফলেই আতশবাজীতে রঙিন আলোর দৃশ্য উৎপাদন সম্ভব হয় এবং আতশবাজীর উন্নতিবিধানের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগনেসিয়াম এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কৃত হইবার পর সেগুলিকে আতশবাজীতে ব্যবহার করিয়া দেখা গেল তাহাতে আলোকের ঔজ্জ্বল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য-সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ইহার পর হইতেই আতশবাজী নির্মাণের পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং নূতন নূতন কলাকৌশল ও দৃশ্যাদির অবতারণা হইতে থাকে।

বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে এমন সহজদাহ্য পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, যেগুলি অক্সিজেনের সমন্বয়ে অতি ক্ষিপ্রগতিতে জ্বলিয়া উঠে এবং অতিমাত্রায় উত্তাপ সৃষ্টি করে। এই পদার্থগুলি প্রজ্বলিত হইবার সময়ে চতুর্দিকের বাতাস হইতেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাইয়া থাকে। কিন্তু উন্নত পর্যায়ের আতশবাজীতে বাহিরের বাতাস হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। ক্ষিপ্রগতিতে প্রজ্বলনশীল আতশবাজীর মশলার মধ্যে এমন একটি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যাহা সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন মুক্ত করিয়া দেয় এবং সেই অক্সিজেন অন্যান্য পদার্থগুলির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে পটাসিয়াম নাইট্রেট এবং পটাসিয়াম ক্লোরেটই বেশি ব্যবহৃত হইত।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম আতশবাজী প্রস্তুত হয় এবং বিভিন্ন আতশবাজীর মশলাও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। যেমন— শক্তি ও স্ফুলিঙ্গ -উৎপাদনকারী আতশবাজীর প্রধান উপাদান— পটাসিয়াম নাইট্রেট, গন্ধক, লৌহচূর্ণ এবং কাঠকয়লার মিহি গুঁড়া। বিস্ফোরণের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুসারে বন্দুকের বারুদের মিহি গুঁড়াও ব্যবহার করা হয়; আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য নাইট্রেট অফ লেড এবং বেরিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের সূক্ষ্ম চূর্ণ মশলার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়; রঙিন তারকা, ঘূর্ণ্যমান বা স্থির দৃশ্য সৃষ্টির জন্য পটাসিয়াম ক্লোরেট বা পারক্লোরেটের সহিত নানাবিধ ধাতব লবণ

মিশ্রিত করা হয় ; লাল আলো সৃষ্টির জন্য নাইট্রেট অথবা সালফেট অফ স্ট্রনসিয়াম, সবুজ আলোর জন্য নাইট্রেট, কার্বনেট অথবা সালফেট অফ বেরিয়াম, হলুদ আলোর জন্য অক্জালেট অথবা কার্বনেট অফ সোডিয়াম, নীল আলোর জন্য কার্বনেট, সালফাইড অথবা আর্সেনাইট অফ কপার-ক্যালোমেল ও মার্কিউরাস ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়। অতিমাত্রায় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য মিশ্রণের সহিত ম্যাগ্‌নেসিয়াম চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গালা, স্টেরিন, সুগার অফ মিল্ক, পিচ, প্যারাফিন এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্পিরিট, শ্বেতসারের মণ্ড, গঁদ, তিসির তেল ও ডেকস্‌ট্রিন প্রভৃতিও মশলার সহিত ব্যবহার করা হয়।

প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের খোলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মশলার মিশ্রণ ভর্তি করিয়া আতশবাজী প্রস্তুত করা হয়। কাগজের খোলের ব্যবহারই বেশি, তবে হালকা সরু বাঁশের চোঙ্‌, মাটির খোল, নারিকেল বা তালের আঁঠির খোলও সময়বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আঁতুড় সন্তানজন্মের জন্য স্ত্রীলোকের অশুচি অস্পৃশ্য অবস্থা। পুত্র জন্মিলে কুড়ি দিন এবং কন্যা জন্মিলে ত্রিশ দিন এই অবস্থা থাকে। শূদ্রার পক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই ত্রিশ দিন। এই অবস্থায় কোনও ধর্মকার্য করিবার অধিকার থাকে না। তবে দশ দিনের (শূদ্রার পক্ষে তের দিনের) পর গৃহকর্মের অধিকার জন্মে। অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের দিন প্রসূতিকে উঠানে তৈয়ারি করা আঁতুড় ঘর হইতে বসত ঘরে আনা হইত। এই উপলক্ষে নাপিত নখ কাটিয়া দিত— ধোপাবউ ক্ষার দিয়া স্নান করাইয়া দিত। এই দিনের অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'পাঁচটি' বা 'পাঁচ উঠানী'। ছয় দিনের সন্ধ্যায় সূতিকাষষ্ঠী বা ষেটেরা পূজা। এইদিন বিধাতাপুরুষ নবজাতকের কপালে তাহার অদৃষ্টের কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাই শিশুর শিয়রে দোয়াত কলম প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা দেখা যায়। আট দিনের সন্ধ্যায় ছেলেরা কুলা বাজাইয়া ছড়া গাহিয়া নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনা করে এবং তাহাদের ও পাড়াপ্রতিবেশীদের আটকড়াই বা আটকলাই ভাজা (মুগ কলাই ছোলা মটর খেসারি ভাজা ও চিড়া মুড়ি খই) ও মিষ্টি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম আটকড়াই, আটকলাই বা আটকৌড়ে। কোথাও কোথাও নয় দিনের দিন একটি অনুষ্ঠান হইত। তাহার নাম নস্তা। একুশ বা ত্রিশ দিনের দিন পুনরায় নখ কাটাইয়া ও স্নান করিয়া পূর্ণশুদ্ধি লাভ। এই দিনেও অনেকে ষষ্ঠীপূজা করাইয়া থাকেন।

দ্র রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব ; কৃত্তিবাসের রামায়ণ ; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আত্মা দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে নানা মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত আত্মা নামক কোনও পদার্থ আছে কিনা, যদি কিছু থাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার সহিত দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সম্পর্কই বা কি প্রকার, দেহ ইন্দ্রিয় ও মন-অতিরিক্ত যে আত্মা তাহা সর্বজীবে এক, না প্রতি জীবে বিভিন্ন, যদি এক হয় তাহা হইলে তাহার সহিত জীবনের কি সম্পর্ক, আত্মাই একমাত্র চরমতত্ত্ব কিনা— আত্মা সম্বন্ধে এই জাতীয় বহুবিধ প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং সম্ভাব্য সকল উত্তরই কোনও না কোনও দার্শনিক মতবাদে স্থান পাইয়াছে।

ভারতীয় দর্শনে আত্মতত্ত্ব নির্ধারণের এক বিশেষ প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে জীবের সর্বজাতীয় দুঃখের মূল কারণ হইল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। আমার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা যদি জানিতাম তাহা হইলে যে যে পদার্থের সহিত প্রকৃত 'আমি'র ঠিক যে প্রকার সম্বন্ধ সেই সেই পদার্থের প্রতি আমার আচরণ ও মনোভাব সেই সেই ভাবেই নিরূপিত হইত এবং বিনা বিচারে যে কোনও পদার্থের প্রতি আমার 'মম'ত্ব বোধ-হইত না। যে পদার্থের প্রতি আমার 'মম'ত্ব বোধ থাকে সেই পদার্থের অনিষ্ট ঘটিলে বা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে আমি দুঃখ পাই এবং এই দুঃখের তর-তমভাব নির্ভর করে এই 'মম'ত্ববোধের শীর্ণতা ও গাঢ়তার উপর। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে যদি এমন উপলব্ধি হয় যে আত্মা সম্পূর্ণভাবে দেহের অতীত, তাহা হইলে দেহের অনিষ্টে আমি কোনও দুঃখ পাইব না। আর যদি আত্মা মনেরও অতীত হয় তাহা হইলে তো সমগ্র দুঃখই আত্মার বাহিরে থাকিবে, কারণ দুঃখ তো মন বা অন্তঃকরণেরই ভাববিশেষ। দুঃখের নিঃশেষ দূরীকরণই জীবনের চরম কাম্য— দুঃখের ঐকান্তিক অভাবই নিঃশ্রেয়স। সুতরাং যিনি দুঃখের ঐকান্তিক অভাব কামনা করেন তাঁহাকে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিতেই হইবে। দার্শনিকদের মতে দুঃখের ঐকান্তিক নিরাসের জন্য এই যে আত্মস্বরূপ জানিবার আগ্রহ, ইহাই তত্ত্ববিচার বা দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রেরণা।

অযথার্থভাবে আত্মা ও দেহের মধ্যে (এবং দেহ-পুরস্কারে বাহিরের জগতের সহিত) অথবা অযথার্থভাবে আত্মা ও মনের মধ্যে গাঢ় সম্পর্ক স্থাপনই যে দুঃখের মূল

কারণ ইহা সাধারণ ভারতীয় মত হইলেও নির্বিশেষে ভারতীয় মত নহে। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ আত্মাকে অন্তঃকরণ=অহংকারের অতীত বলিয়া মনে করেন না। (এই প্রবন্ধে 'মন' শব্দটিকে অন্তঃকরণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং অন্তঃকরণ বলিতে সাংখ্যের 'বুদ্ধি' বা অদ্বৈতের 'অহংকার' বুঝানো হইয়াছে)। তাঁহাদের মতে আত্মা বা অহংকারের যথার্থ স্বরূপ না জানাই হইল দুঃখের দূরস্থ মূল কারণ। এই না-জানার ফলেই আত্মা ও দেহের মধ্যে গাঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাহার ফলে ফলেই দুঃখ জন্মে। বৌদ্ধদের অধিকাংশের মতে প্রকৃতপক্ষে আত্মা বলিয়া কোনও স্থায়ী নিত্য পদার্থ নাই, যাহা সাধারণ্যে আত্মা বলিয়া পরিচিত তাহা তত্ত্বের দিক হইতে আশুবিনাশী-মানসধর্ম-প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে নিত্যস্থায়ী আত্মপদার্থ স্বীকারই সর্ব দুঃখের মূল কারণ। জৈনদের মত অন্য প্রকার। তাঁহাদের মতে 'কেবলজ্ঞান'স্বরূপ আত্মা (জীব) জন্মজন্মার্জিত অদৃষ্টের ভার সংকুচিতশক্তি হইয়া অ-জীব বা জড়দেহের সহিত গাঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হইয়া থাকে এবং তখন জীব আপনার অসীমজ্ঞানরূপ স্বরূপ জানিতে পারে না। অদৃষ্টের ভার কমাইতে পারিলেই আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ তখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত-যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতাই আত্মার সমস্ত দুঃখ বা বন্ধের মূল কারণ।

দার্শনিকদের নিকট আত্মা সম্বন্ধে প্রথম বিচার্য হইল দেহ ও ইন্দ্রিয়-অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু স্বীকার করিতে হইবে কিনা এবং মন বা অন্তঃকরণ (বুদ্ধি বা অহংকার) বলিতে যদি কেবল মানস-ঘটনা-পরম্পরা বুঝায় তাহা হইলে আত্মা নামে তদতিরিক্তও কিছু আছে কিনা। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে— মানস-ঘটনা-পরম্পরার অতিরিক্ত অন্তঃকরণরূপ স্থায়ী কোনও পদার্থ স্বীকার করিলে তাহারও অতীত আত্মা বলিয়া কিছু স্বীকার করিতে হইবে কিনা।

বিশেষ কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক ব্যতীত আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করেন যে দেহ ও ইন্দ্রিয়-অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু আছে। অর্থাৎ 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমার এই দেহমাত্র বা তদধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়মাত্র নহে, নিশ্চয়ই তদতিরিক্ত অন্য কিছু। যদি কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিতে কি বুঝিতাম? দেহ ও ইন্দ্রিয় তো দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না, ইহারা নিত্য পরিবর্তনশীল; কিন্তু দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা তো চিরকাল একই থাকে, উহা অপরিণামী। অতএব, হয় বলিতে হইবে যে আত্মা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল দেহেন্দ্রিয়ের বাহিরে থাকে, না হয় বড় জোর এই কথা বলা যায় যে এই আত্মারূপ নিত্য আধারে জ্ঞান ইচ্ছা সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানস-ঘটনাগুলি ঘটে, অথচ ইহার ফলে আধাররূপ আত্মার কোনও পরিবর্তন ঘটে না, সে অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। প্রশ্ন হইতে পারে এই দুইয়ের যে কোনও অর্থে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতাকে অপরিণামী বলিব কেন। সহজ উত্তর এই যে তাহা না বলিলে স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। জ্ঞাতা যদি নিঃশেষে পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে কে কাহার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করিবে বা চিনিতে পারিবে? কিছু অংশে আত্মার পরিবর্তন হয় এবং কিছু অংশে হয় না— এমন কথা বলিয়াও কোনও লাভ হইবে না, কারণ যে অংশ অপরিবর্তিত থাকিবে সেই অংশেই আমাদের বক্তব্য প্রযোজ্য হইবে।

ভূতসর্বস্ববাদী জড়বাদী চার্বাকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দার্শনিকেরা এই সব যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বৌদ্ধেরাও অপরিবর্তী নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা চার্বাকমতবিরোধী। চার্বাকমতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, জড়ভূত ছাড়াও জ্ঞান (বৌদ্ধ পরিভাষায় 'বিজ্ঞান') নামে একজাতীয় পদার্থ আছে। বৌদ্ধমতে এই জড়ভূত-অতিরিক্ত বিজ্ঞান-ধারার নামই আত্মা।

চার্বাকদের বিরুদ্ধে আরও এক বক্তব্য এই যে ভূত-সর্বস্ববাদ স্থাপনের মূল যুক্তিটাই অচল। যুক্তিটি এই যে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমিতি (ইনফারেন্স্) প্রমুখ প্রত্যক্ষ-অতিরিক্ত অন্য কোনও জ্ঞানই প্রমাণ-পদবী লাভের যোগ্য নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সকল দার্শনিকই এই মতবাদ অনায়াসে খণ্ডন করিয়াছেন। আর চার্বাক-মতাবলম্বীগণ যে অনেক সময় লাঘবের খাতিরে অথবা অ-জড় পদার্থ না মানিয়া জ্ঞানাদি অ-জড় পদার্থকে জড়পদার্থেরই বিভিন্ন সংমিশ্রণ বা বিন্যাসজাত অভিনব ধর্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ইহাদের সকলেরই বক্তব্য এই যে, যেহেতু জ্ঞানাদি অ-জড় পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করি অতএব এ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, লাঘবের অবকাশ নাই।

অতএব দেহেন্দ্রিয়-অতিরিক্ত মানস-ব্যাপার স্বীকার

করিতেই হইবে। ভূতসর্বস্ববাদ অচল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, মানস-ব্যাপার স্বীকার করিলেই কি আত্মা স্বীকার করা হইল? আত্মা কি মানস-ব্যাপারেরও অতিরিক্ত নূতন এক তত্ত্ব নহে? যাঁহারা আত্মা স্বীকার করেন তাঁহারা ইহাকে নূতন তত্ত্বই বলেন। কিন্তু নূতন তত্ত্ব স্বীকারের হেতু কি?

আমাদের দেশে অধিকাংশ বৌদ্ধ দার্শনিক মানস-ঘটনা-পরম্পরার অতিরিক্ত কোনও আত্মা স্বীকার করেন না। আমাদের দেশে অধিকাংশ বৌদ্ধ দার্শনিক প্রথমতঃ, মানস-ঘটনা-পরম্পরার অতীত এই আত্মা কেহ প্রত্যক্ষ করেন না, যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা কোনও না কোনও মানস-ঘটনা, বড় জোর মানস-ঘটনাবলীর প্রবাহ। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষের অগোচর আত্মা মানিবার প্রয়োজনও নাই। যে অহংবোধের খাতিরে সচরাচর আত্মা স্বীকার করা হয় তাহা এই বিশিষ্ট ঘটনাবলীর নির্দিষ্ট প্রবাহমাত্র। দুই-একটি অতিরিক্ত যুক্তিও দেওয়া যাইতে পারে। অনেক সময়ে অহংবোধের উপপত্তি হইতে পারে প্রতিটি মানস-ব্যাপারের বিশেষণরূপে উপলব্ধ 'আমি'ত্বের দ্বারা, আত্মা কোনও বিশেষ্যপদবাচ্য দ্রব্য নহে। বিশেষণ কখনও তাহার আধারমুক্ত হইয়া স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পারে না। এমন কি যদি এক প্রবাহান্তর্গত সমস্ত মানস-ঘটনার সাধারণ বিশেষণরূপে এই 'আমি'কে একও বলিতে হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, আত্মা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা স্থায়ী কোনও বস্তু মানেন না, সর্ববস্তুই ইঁহাদের মতে ক্ষণিক, অতএব আত্মা বলিয়া কিছু নাই; কারণ ক্ষণিক মানস-ঘটনা-পরম্পরার অতীত আত্মা স্বীকার করিলে তাহাকে স্থায়ীই বলিতে হয়।

আত্মবাদী দার্শনিকগণ কিন্তু এই সবকয়টি যুক্তিই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আত্মা প্রত্যক্ষের অগোচর নহে, বরং প্রতিক্ষণেই আমার সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে। মানস-ঘটনা যদি প্রত্যক্ষ-গোচর বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ঘটনাটি প্রতি স্থলেই 'আমার' বলিয়া প্রত্যক্ষ করি, অথবা মৎ-কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করি। এই 'আমি'কে মানস-ঘটনাবলীর প্রবাহমাত্র বলিলে কোনও ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ, হয় এই প্রবাহ ঐ ঘটনাবলী হইতে অভিন্ন— অর্থাৎ ঐ পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ছাড়া অন্য কিছু নহে, না হয় অন্য কিছু। যদি অন্য কিছু না হয় তাহা হইলে উহাকে আত্মা বলিলে কিছু লাভ হইবে না, কারণ স্পষ্টতঃই প্রতিটি মানস-ঘটনা এক-একটি আত্মা নহে। আর প্রবাহ যদি ঘটনাবলী হইতে ভিন্ন হয় এবং উহাকে যদি আত্মা বলা হয় তাহা হইলে আত্মবাদী-গণের সহিত বৌদ্ধগণের কি প্রভেদ থাকে বুঝা দুষ্কর। আবার 'আমি'কে মানস-ঘটনার বিশেষণমাত্ররূপে বুঝিলেও চলিবে না। কারণ একটি মানস-ঘটনালগ্ন যে 'আমি' পাই, একই প্রবাহান্তর্গত অন্য একটি মানস-ঘটনায় ঠিক সেই 'আমি'টিই পাই, তজ্জাতীয় বা কেবল অসদৃশ অন্য একটি 'আমি' পাই না। অথচ ঠিক একই বিশেষণ অন্য একটি বিশেষ্যে থাকিতে পারে না। থাকে তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ অন্য একটি বিশেষণ। এই 'আমি'ত্বটি জাতি (ইউনিভার্সাল) -রূপ বিশেষণ— এ কথাও বলা চলে না, কারণ ইহার আধাররূপে সমুচিত ব্যক্তি (পার্টিকুলার) নাই। যে মানস-ব্যাপারকে কোনক্রমে ইহার আধার বলা চলিত, তাহা নিজে এককভাবে 'আমি' বা আত্মা নহে। এই 'আমি' যেহেতু সংখ্যায় এক সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা বিশেষ্যপদবাচ্য এক স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ দ্রব্য। আত্মবাদীগণ বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গবাদেরও সম্যক্ নিরাস করিয়াছেন। আত্মবাদীরা এইভাবে নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আত্মা-স্বীকারের সদর্থক যুক্তিও দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তির জন্য আশুবিনাশী ক্ষণিক মানস-ব্যাপারের অতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যুক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল, আমরা সহজ বুদ্ধিতে মানস-ব্যাপারের অতিরিক্ত যে স্থায়ী আত্মা স্বীকার করি তাহা উড়াইয়া দেওয়া অযৌক্তিক। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই আত্মাটি কি ধরনের পদার্থ, অর্থাৎ ইহার স্বরূপ কি।

এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বা সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ন্যায়বৈশেষিক, প্রাভাকর ও রামানুজ -সম্প্রদায় মনে করেন, আত্মা এমন এক আধারদ্রব্য যাহাতে জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদি মানস-ব্যাপার গুণরূপে বর্তমান থাকে। তবে এই গুণগুলি, বিশেষ করিয়া জ্ঞানরূপ গুণটি, নিত্যই ঐ আধারে বর্তমান থাকে কিনা, অর্থাৎ উহা ঐ আধারের স্বরূপ বা স্বরূপান্তর্গত কিনা, এ বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতবৈলক্ষণ্য দেখা যায়। ন্যায়বৈশেষিকের মতে জ্ঞানাদি মানস-ব্যাপারের কোনটাই আত্মার স্বরূপ বা স্বরূপান্তর্গত নহে। আত্মা আধারমাত্র, যাহাতে এই আগন্তুক গুণ-গুলির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় ঘটে। স্বরূপতঃ আত্মাকে জড়ই বলা উচিত, তবে আমরা যে উহাকে চেতন বলি তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আত্মারূপ আধারে চৈতন্যোৎ-পত্তির যোগ্যতা থাকে। 'আমি জ্ঞাতা' অথবা 'আমি

জানি' ইহার অর্থ এই যে আমি এমন একটি স্বরূপতঃ জড়সদৃশ আধার যাহাতে জ্ঞানরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে (ন্যায়বৈশেষিকের ভাষায়, যাহাতে জ্ঞানরূপ একটি গুণ উৎপন্ন হইয়াছে)।

অন্য কোনও দার্শনিক বা সম্প্রদায় কিন্তু এই জাতীয় উগ্র মত সমর্থন করেন নাই। রামানুজীরা আত্মাকে এমন এক দ্রব্যরূপে কল্পনা করেন যাহার স্বরূপের মধ্যেই জ্ঞান (বা চৈতন্য) আছে। অর্থাৎ 'আমি জ্ঞাতা'—এই বাক্যের অর্থ মাত্র এই নহে যে 'আমি'রূপ অন্ধকার আধারে জ্ঞানরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি পাত্রে আগুন থাকিলে আমরা বলি আগুনই জ্বলিতেছে, বলি না পাত্রটি জ্বলিতেছে, কেননা জ্বলন-ব্যাপারটি আগুনেরই স্বরূপ, পাত্রটির স্বরূপ নহে। সেইরূপ 'আমি জানিতেছি' বা 'আমি জ্ঞাতা' বলিলে বুঝিতে হইবে জানা বা জ্ঞান আমারই স্বরূপ, আমি ঐ অগ্নিপাত্রের মত নিছক আধার নহি। আবার, জ্বলন যেমন আগুনের গুণও বটে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যবস্থা— জ্ঞান আত্মার গুণও বটে। দীপশিখার প্রভা যেমন দীপশিখার স্বরূপগুণ হওয়া সত্ত্বেও আপন স্বভাববশে প্রসারিত হইয়া বহির্বস্তুসংলগ্ন হয় ও তাহা প্রকাশ করে, জ্ঞানও সেইরূপে আত্মার স্বরূপগুণ হইয়াও বাহিরে প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য পদার্থ প্রকাশ করে। জ্ঞান এই জাতীয় গুণ বলিয়া রামানুজ ইহাকে 'ধর্মভূতজ্ঞান' বলিয়াছেন।

প্রাভাকরসম্প্রদায় অনেকাংশে ন্যায়বৈশেষিকের মত গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও উভয় সম্প্রদায়ের মতের পার্থক্যও অনেকখানি। প্রাভাকরমতে আত্মা এমন এক দ্রব্য, জ্ঞান যাহার স্বরূপ নহে; জ্ঞান হইল আত্মার আগন্তুক গুণবিশেষ। এই পর্যন্ত ন্যায়বৈশেষিকের সহিত প্রাভাকর-মতের সাদৃশ্য। গভীরতর বৈসাদৃশ্য হইল এই যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে, যখন কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সেই জ্ঞানের আধার আত্মা সেই জ্ঞানেই প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হয় ঐ জ্ঞানবিষয়ক পরবর্তী জ্ঞানে (অনুব্যবসায়); কিন্তু প্রাভাকরমতে আত্মা সেই জ্ঞানেই সেই জ্ঞানের আধাররূপে প্রকাশিত হয়। প্রাভাকরমতে প্রতি জ্ঞানেই, ১. সেই জ্ঞানের বিষয় বিষয়রূপে, ২. সেই জ্ঞান জ্ঞানরূপে এবং ৩. আত্মা ঐ জ্ঞানের আধার-রূপে প্রকাশমান হয়— ইহাই প্রাভাকরসম্প্রদায়ের বহু-খ্যাত, ত্রিপুটিপ্রত্যক্ষবাদ। ন্যায়বৈশেষিকমতে কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞান প্রকাশ করে কেবল তাহার বিষয়কে; ঐ জ্ঞান নিজে ও উহার আধার আত্মা প্রকাশমান হয় অনুব্যবসায়রূপ পরবর্তী অন্য এক জ্ঞানে। প্রাভাকরমতে জ্ঞান স্বভাবতঃই স্বপ্রকাশ, বিষয় ও আত্মা স্বপ্রকাশ নহে —তাহারা প্রকাশ লাভ করে জ্ঞানের সাহায্যে (বস্তুতঃ তাহাদের জ্ঞানই তাহাদের প্রকাশ)। জ্ঞানের এই স্বপ্রকাশত্ব বৌদ্ধগণও স্বীকার করিয়াছেন।

সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈত -মতে আত্মা নিজেই স্বপ্রকাশ, কারণ এই দুই মতে আত্মা জ্ঞানস্বভাব এবং জ্ঞান স্বপ্রকাশ। বস্তুতঃ যে জ্ঞান রামানুজমতে আত্মার স্বরূপ, সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈত -মতে আত্মা তদতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। আত্মা দ্রব্য বা বিশেষ্য এবং জ্ঞান তাহার গুণ বা বিশেষণ— এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। আত্মা কি দ্রব্যবিশেষ, অথবা উহা গুণবিশেষ— এ তর্কে তাঁহারা মাথা ঘামাইতে চাহেন না।

আত্মা এবং জ্ঞান একই পদার্থ হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে— জ্ঞান তো উৎপত্তি-বিনাশ-শীল, আত্মাও কি তাহা হইলে বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে? তাহা হইলে তো মানস-ব্যাপার-অতিরিক্ত আত্মপদার্থ স্বীকার করা হইল না। সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈত -মতে কিন্তু এ আপত্তি নিঃসার। যে জ্ঞানকে তাঁহারা আত্মার একান্ত স্বরূপ বলেন, আত্মা যে জ্ঞান-অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, তাহা উৎপত্তি-বিনাশ-শীল অস্থায়ী মানস-ব্যাপার নহে; তাহা চৈতন্যস্বরূপ, যাহা চিরকালই জ্ঞাতৃ (সাবজেক্ট) -রূপে প্রকাশ পায়, কখনও বিষয় (অবজেক্ট) -রূপে প্রকাশিত হয় না। উৎপত্তি-বিনাশ-শীল মানস-ব্যাপার-রূপ জ্ঞান, সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈতে যাহাকে বৃত্তি বা বৃত্তিজ্ঞান বলা হয় তাহা কখনও জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশ পায় না; তাহা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার নিকট বিষয়রূপেই প্রকাশিত হয়।

যে অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞান বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কি তাহা হইলে তাহারই নামান্তর? সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈত -মতে তাহাই। কেবল দুইটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, অনুব্যবসায় নিজে উৎপত্তি-বিনাশ-শীল কোনও মানস-ব্যাপার নহে, কারণ অনু-ব্যবসায় নিজে অন্য একটি অনুব্যবসায়ের নিকট বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না— হইলে ঐ দ্বিতীয় অনুব্যবসায়কেও ঐ একই বিপাকে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় কথা এই যে, অনু-ব্যবসায়ের নিকট যে প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, অনুব্যবসায় তাহার পরবর্তী নহে— অনুব্যবসায় ঐ প্রাথমিক জ্ঞানের সমকালীন। (অনুব্যবসায় নিজে উৎপত্তি-বিনাশ-শীল মানস-ব্যাপার নহে বলিয়াই আপাত-দৃশ্যে বিভিন্নকালে উৎপন্ন বিভিন্ন অনুব্যবসায় মূলতঃ একই অনুব্যবসায়।)

সকল বৃত্তিজ্ঞানের অতীত, সকল বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভাসক

এই চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞাতা বা আত্মার অপর নাম সাক্ষী। ইহা সদা স্বপ্রকাশ, সদা জ্ঞাতা; কখনও বিষয় হইতে পারে না। 'বিষয়'য়ের অপর নাম জড় পদার্থ; অতএব এই একান্ত অ-বিষয় সাক্ষী-আত্মা একান্তরূপে অ-জড়।

এই প্রকার সাক্ষী-আত্মা মানিবার পক্ষে অদ্বৈত-বেদান্তীগণ অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তিনটি সহজ যুক্তির উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। ১. অনুব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উপপত্তির জন্য ইহা মানিতে হইবে। কি ভাবে, তাহা আমরা এখনই দেখাইয়াছি। ২. আমি আমাকে জানিতেছি — এই প্রকার প্রতীতির উপপত্তি সাক্ষী-আত্মা স্বীকার ব্যতীত সম্ভব হয় না। একই 'আমি' জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়রূপেই বর্তমান থাকিতে পারে না— তাহাতে কর্মকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব বলিতেই হইবে যে, জ্ঞাতা-আমি বিষয়-আমি হইতে ভিন্ন। তখন বিষয়-আমি হইল সেই অন্তঃকরণরূপ বস্তু যাহার বিভিন্ন বিকারের নামই জ্ঞানাদিবৃত্তি। অতএব জ্ঞাতা-আমি অন্তঃকরণের অতীত, অন্তঃকরণের জ্ঞাতা বা সাক্ষী। ৩. স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তি হইতে জাগরণের পর আমি স্মরণ করি যে, ঐ সুষুপ্ত অবস্থায় আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আমরা কেবল তাহাই স্মরণ করিতে পারি যাহা পূর্বে জানিয়াছি। অতএব সুষুপ্তিকালীন যে সর্বজ্ঞানের অভাব জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ করিতেছি, সেই সর্বজ্ঞানের অভাব আমি নিশ্চয়ই সুসুপ্তিকালে জানিয়াছিলাম। তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে একপ্রকার জ্ঞান ছিল অথচ অন্য একজাতীয় জ্ঞানের একান্ত অভাব ছিল। স্পষ্টতঃই যে জ্ঞানের অভাব ছিল তাহা বৃত্তিজ্ঞান বা মানস-ব্যাপার; অতএব যে জ্ঞান বর্তমান ছিল তাহা তদতিরিক্ত জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বা সাক্ষীজ্ঞান, যাহার অপর নাম জ্ঞাতা বা আত্মা।

ন্যায়বৈশেষিক প্রাভাকর রামানুজ সাংখ্যযোগ -মতে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এই দার্শনিকগণ সকলেই এক বিষয়ে একমত— তাহা হইল এই যে, জগতে বহু আত্মা আছে। কিন্তু অদ্বৈতমতে সাক্ষী-আত্মা পরমার্থতঃ এক। দেহ বা অন্তঃ-করণের বহুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু আত্মার বহুত্বের পরিমাপক কোনও হেতু না থাকায় তাহাকে বহু বলা যায় না। এই আত্মা যেহেতু দেহ ও অন্তঃকরণ অতিক্রম করে, অতএব তাহাদের বহুত্বকেও অতিক্রম করে। আত্মার বহুত্ব নিরাকরণে অদ্বৈতীগণ সচরাচর উপনিষদ্বাক্য স্মরণ করেন, নব্য অদ্বৈতীগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করিয়াছেন। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা এই যে, যদিও সাংখ্যযোগ-দর্শনে আত্মাকে (সাংখ্যযোগ পরিভাষায় 'পুরুষ') দেহ ও অন্তঃকরণের (সাংখ্যযোগপরিভাষায় 'বুদ্ধি') অতীত বলা হইয়াছে, তথাপি ইহার বহুত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। অস্বীকৃত তো হয়ই নাই, বরং (যেন ঔপনিষদ অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে) যুক্তিতর্কসহযোগে বিশদভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সাক্ষী-আত্মা বহু, ইহা এক হইতে পারে না। অবশ্য সাক্ষী-পুরুষকে বহু বলা হইয়াছে অন্তঃকরণ ও দেহের বহুত্বের খাতিরে, যে প্রতিটি অন্তঃকরণকে এবং অন্তঃকরণপুরস্কারে প্রতিটি দেহকে সাক্ষী-পুরুষ নির্বিকার মধ্যস্থের ন্যায় দর্শন করেন (অদ্বৈত ও সাংখ্যযোগ -মতে অন্তঃকরণও একপ্রকার দেহ, উহার নাম সূক্ষ্মদেহ। এই প্রবন্ধে 'দেহ' শব্দে স্থূলদেহ বুঝিতে হইবে।) অন্তঃকরণ ও দেহের সহিত এই প্রকার এক অতি শিথিল সম্পর্কের জন্যই সাক্ষী-আত্মাকে বহু বলিতে হয়। এই সম্পর্কের ফলে কিন্তু সাক্ষী-স্বরূপের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না— অর্থাৎ এমন কি মধ্যস্থ দ্রষ্টার ভূমিকাতেও আত্মা মুক্ত অবস্থায় থাকে। অতএব সাংখ্যযোগমতে মুক্ত আত্মাও বহু।

কিন্তু অদ্বৈতমতে এই শিথিলতম সম্পর্কও আত্মলগ্ন ক্লেশবিশেষ, যাহার অপর নাম অ-বিদ্যা বা অ-জ্ঞান। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, শুদ্ধ আত্মার পক্ষে এমন কোনও প্রয়োজন থাকে না যাহার জন্য, এমন কি নির্বিকার মধ্যস্থের ভূমিকায়ও তাহাকে অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিরূপ বিকার দর্শন করিতে হয়। আত্মা তো স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপ্রকাশকূটস্থ চৈতন্য, সে নিজ সত্তায় নিজে মগ্ন। ধাপে ধাপে জাগতিক বিষয়, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ হইতে আপনাকে উপসংহৃত করিয়া সে যখন মুক্তির আনন্দে বিভোর তখন তাহার নিকট অন্তঃকরণাদির দূরতম প্রয়োজনও থাকিতে পারে না। অবশ্য অদ্বৈতমতে সাক্ষী অবস্থায় আত্মা অন্তঃ-করণ হইতে উপসংহ্রিয়মাণ থাকে, উপসংহৃত নয়; এইজন্য তখনও সে অন্তঃকরণকে দূর হইতে নির্বিকারভাবে দর্শন করে। এই অবস্থায় তখনও অজ্ঞান আত্মসংলগ্ন থাকে, এবং অন্তঃকরণের সহিত এই দূরন্ত সম্পর্কের জন্য আত্মা তখনও বহু, যেহেতু অন্তঃকরণ বহু। কিন্তু যেহেতু উপসংহ্রিয়মাণতার পরেও উপসংহৃত অবস্থা আসে, অতএব বলিতে হইবে আত্মার পরমার্থস্বরূপ সাক্ষীরও অতীত। এবং ঐ তুরীয় অবস্থায় আত্মা অনেকত্বহীন।

অদ্বৈতমতে এই পরমার্থতঃ এক আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা চৈতন্যস্বরূপ, সংস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। যাঁহারা বহু আত্মা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে কিন্তু ব্রহ্ম (তাঁহাদের মতে ঈশ্বর) বহু জীবাত্মা হইতে পৃথক অন্য এক অশেষ

কল্যাণময় সদামুক্ত আত্মবিশেষ, অনেকের মতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণও বটে।

অদ্বৈতমতে জীবাত্মা পরমার্থস্বরূপ— অর্থাৎ খাঁটি অর্থে যাহা আত্মা তাহা ব্রহ্ম (বা ঈশ্বর) হইতে অভিন্ন। অন্য সম্প্রদায়ের বেদান্তীগণ এবং কিছু শৈব ও শাক্ত দার্শনিক আত্মার পরমার্থস্বরূপ ও ঈশ্বরের অন্য এইপ্রকার নির্বিশেষ অভেদ মানেন না। তাঁহাদের মতে পরমার্থস্বরূপেও আত্মা কিয়দংশে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিয়দংশে ভিন্ন এবং এই ভিন্নাংশে আত্মা বহু। সুফীসম্প্রদায়ে এই দুই প্রকার মতই দেখা যায়।

অদ্বৈতমতে আত্মাকে কেন যে চিৎস্বরূপ বলিতে হইবে তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ইহা যে সৎস্বরূপ, অর্থাৎ 'ইহাই সত্তা এবং সত্তাই ইহা' তাহা দেখাইবার জন্য নব্য অদ্বৈতীগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেও পূর্বাচার্যগণ প্রায়শঃই উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময়ে আবার তাঁহারা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে এবং নির্দোষ হেতুর সহায়তায় বেশ সহজ-ভাবে অনাত্ম অন্তঃকরণ-দেহাদি পদার্থের মিথ্যাত্ব অনুমান করিয়াছেন। যখনই কোনও এক বস্তু স্বরূপতঃ অপরি-বর্তিত থাকিয়াও অন্য এক পদার্থের সহিত একীভূতরূপে প্রতীয়মান হয় তখনই দেখা যায় যে, ঐ পদার্থটিই সত্য, এবং দ্বিতীয় পদার্থটি স্বয়ং এবং তাহার সহিত প্রথম পদার্থটির একীভাব— উভয়ই সমভাবে মিথ্যা, অতএব পরমার্থতঃ অসৎ, যেমনটি দেখা যায় রজ্জু-সর্পের ক্ষেত্রে। এখন এ কথা অনস্বীকার্য যে, চিৎস্বরূপ আত্মা নিজে অপরিবর্তিত থাকিয়াও অন্তঃকরণ-দেহাদির সহিত একীভূত-রূপে প্রতীয়মান হয়; অতএব এই চিৎস্বরূপ আত্মাই সত্য, এবং অন্তঃকরণ-দেহাদি জাগতিক বস্তুনিচয় মিথ্যা। আত্মা যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি; আবার এই আত্মাই যে অন্তঃ-করণ-দেহাদির সহিত একীভূত হইয়া প্রতীয়মান হয় তাহার প্রমাণ এই যে, একমাত্র আত্মসচেতন সাক্ষী অবস্থায় আত্মা চির-অপরিবর্তিত বলিয়া ধরা পড়িলেও সাধারণ (আন্‌রিফ্লেক্‌টিভ) জ্ঞানাদি ক্ষেত্রে এই আত্মাকে পৃথক ভাবে পাওয়া যায় না— চিৎস্বরূপ আত্মা সাধারণ অবস্থায় অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তির সহিত, অবস্থাবিশেষে দেহের সহিত এবং সমত্ববোধে অন্যান্য জাগতিক পদার্থের সহিত একাকার হইয়া বর্তমান থাকে।

অদ্বৈতশাস্ত্রে আত্মার স্বরূপত্ব প্রধানতঃ শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

চিৎস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থ মিথ্যা— এই মতবাদ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রশ্ন ওঠে, বিভিন্নাকার এই মিথ্যা পদার্থগুলি আসিল কোথা হইতে? অদ্বৈতী উত্তর দেন, 'অঘটন-ঘটন-সংঘটন-পটীয়সী' মায়া বা অজ্ঞান নামক নিজে মিথ্যা আত্মস্থ এক শক্তির পরিণামই এই বিচিত্র বহুবিধ ঘটনাময় জগৎ। এই শক্তি নিজেই মিথ্যা, কারণ মিথ্যা পদার্থগুলি ইহারই পরিণাম এবং নিজে মিথ্যা বলিয়া ইহা আত্মস্থ হইলেও আত্মার স্বরূপের কোনও হানি করে না। অদ্বৈতবেদান্তী 'অহমজ্ঞঃ', 'সুপ্তোঽহং ন কিঞ্চিদবেদিষম্'— এই জাতীয় কয়েকটি অদ্ভুত অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে এই অজ্ঞান অনুমান করিয়াছেন।

আত্মা ও দেহের সম্পর্ক বিবেচিত হইয়াছে প্রমেয়-বিচারশাস্ত্রে। কি ভারতীয় দর্শন, কি পাশ্চাত্ত্যদর্শন— উভয় স্থলেই একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে যে, দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; এবং যাঁহারা দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী তত্ত্বরূপে অন্তঃকরণ স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে আত্মা ও অন্তঃকরণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। এই ঘনিষ্ঠ বা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কবশেই 'আত্মাই অন্তঃকরণ', 'অন্তঃকরণই আত্মা', 'আত্মাই দেহ' এবং 'দেহই আত্মা'— এই জাতীয় একীভাব প্রত্যয় বা পরস্পরাধ্যাস হয়। অদ্বৈত পরি-ভাষায় এই ঘনিষ্ঠ বা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের নাম 'চিদচিদ্‌গ্রন্থি'।

আত্মা হইল ভোক্তা, বিষয় হইল ভোগ্য এবং দেহ হইল ভোগায়তন বা ভোগের মাধ্যম। এই দেহ প্রবৃত্তি বা প্রযত্নেরও মাধ্যম। কোনও যান্ত্রিকের দেহের সহিত ব্যবহ্রিয়মাণ যন্ত্রের যে সম্পর্ক— ব্যবহ্রিয়মাণ যন্ত্রটি প্রায় দেহের শামিল, দেহের সহিত এক সুরে এক লয়ে কাজ করে, অথচ দেহ হইতে ভিন্ন, কারণ যন্ত্র হইল দেহব্যবহার-লভ্য ইষ্টফল লাভের মাধ্যম— আত্মার সহিত দেহেরও ঠিক সেই সম্পর্ক। আত্মা বা অন্তঃকরণ ইষ্টফল লাভের জন্য দেহরূপ যন্ত্র ব্যবহার করে। এইভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, দেহ এক দৃষ্টিকোণ হইতে জাগতিক অন্যান্য বস্তুর সমপর্যায়ী হইলেও আত্মা বা অন্তঃকরণের দৃষ্টিতে উহার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে— সর্ব বস্তুর পুরোধারূপে উহা জাগতিক সর্ব বিষয়কে এবং স্থলবিশেষে তৎসহ আপনাকেও, আত্মা বা অন্তঃকরণের নিকট নৈবেদ্যরূপে সমর্পণ করে।

বলা বাহুল্য, দেহের সহিত আত্মার যে সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কও তাহাই। ভোগায়তনরূপে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, দেহ ভোগায়তন হইয়াও ভোগ্যপর্যায়ী, কিন্তু ইন্দ্রিয় নিজে কখনও ভোগ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ভোগের মাধ্যম

মাত্র, দেহের ন্যায় কখনও মাধ্যম কখনও বা ভোগ্যবিষয় নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সর্বদাই সূক্ষ্ম; দেহ এক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম, কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে স্থূল।

দেহ অথবা দেহপুরস্কারে বহির্জগতের সহিত আত্মা সদা সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকুক বা নাই থাকুক, উহা যে দেহাদি অন্য কিছু, ইহাই আত্মার মৌলিক স্বাতন্ত্র্য। এই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির নামই হইল মোক্ষ বা মুক্তি।

কালিদাস ভট্টাচার্য

আত্মারাম পাণ্ডুরং তরখড় (১৮২৩-১৮৯৮ খ্রী) মারাঠী সমাজসংস্কারক। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ দাদোবা পাণ্ডুরং তরখড় বিদ্যাচর্চা ও সমাজসেবার জন্য পরিচিত ছিলেন। আত্মারাম পাণ্ডুরং গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ (১৮৫১ খ্রী) প্রথম পাঁচ জন ছাত্রের অন্যতম।

তিনি প্রার্থনা সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল মার্চ, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি আমরণ ইহার সভাপতি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সমস্ত সংস্কার-আন্দোলনে তিনি পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণা বা অ্যানা বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম হিন্দু রমণীদের অন্যতম। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম-বার বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে ইঁহার নিকট কিছুকাল ইংরেজী ভাষা ও আদব-কায়দা শিখিয়াছিলেন। আত্মারাম পাণ্ডুরং ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের শেরিফ-পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে অ্যালবার্ট হলে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্ট্রে থট্‌স অন্ ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভলপ্‌মেণ্ট অফ রিলিজন' (ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে ইতস্ততঃ ভাবনা) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

এস. আর. টিকেকর

আত্মীয়-সভা রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ তাঁহার মানিকতলার বাসভবনে 'আত্মীয়-সভা' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। রামমোহন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম, সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা সকলে প্রতি সপ্তাহে একবার এই সভার অধিবেশনে মিলিত হইতেন। সভার অধিবেশন সাধারণতঃ রামমোহনের গৃহে হইত, আবার কোনও কোনও সময়ে অপরাপর সভ্যের বাসভবনে হইত। সভায় পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করিতেন এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসংগীত গাহিতেন। প্রতীকোপাসনার অসারতা, সতীদাহ, জাতিভেদ এবং বহুবিবাহ -প্রথার অনিষ্টকারিতা, বিধবাবিবাহের উপযোগিতা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশ্নসকল সভার অধিবেশনে সভ্যগণ কর্তৃক আলোচিত হইত। এই সভারই এক অধিবেশনে ডেভিড হেয়ার সর্ব-প্রথম হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, বৃন্দাবন মিত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা কালীশংকর ঘোষাল, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি আত্মীয়-সভার অধিবেশনে যোগ দিতেন। ধর্ম ও সমাজসংস্কার -বিষয়ে আলোচনার জন্য এইরূপ মণ্ডলীস্থাপন রামমোহনের পক্ষে নূতন নহে। ইতিপূর্বে কার্যোপলক্ষে রংপুরে বাসকালেও (১৮০৯-১৮১৫ খ্রী) তিনি ধর্মালোচনার জন্য বন্ধু-সভা সংগঠন করিয়াছিলেন। আত্মীয়-সভাকে নানা দিক হইতে রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮ খ্রী) অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভার বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। ইহার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্রভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু উহার প্রেরণায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ বাসভবনে 'আত্মীয়-সভা' নামক দ্বিতীয় এক সভা স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী সভ্যগণের মিলনস্থল ছিল। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

দ্র নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, এলাহাবাদ, ১৯২৮; প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আত্মীয়-সভার কথা, তত্ত্বকৌমুদী, ৭৬ খণ্ড, সংখ্যা ৩-১১, ১৩-১৭, ১৯-২১, ২৩-২৪; ৭৭ খণ্ড, সংখ্যা ১ এবং ৫; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম-জীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৯৬২;

Brajendranath Banerji, 'Societies Founded by Rammohun Roy for Religious Reform,' *Modern Review,* April, 1935; S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli, ed., Calcutta, 1962.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আত্রাই উত্তর বঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া প্রধানতঃ বর্ষাপুষ্ট আত্রাই নদী দিনাজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সুনাব্য অবস্থায় পূর্ববর্তী তিস্তার গতিপথরূপে গঙ্গা নদীতে মিলিত হইত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তার গতি পরিবর্তনের ফলে এই নদীর বহনশক্তি, নাব্যতা ও ব্যাবসায়িক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং মধ্য বঙ্গে এই নদীর গতিপথে 'চলন বিল' নামক জলাভূমির সৃষ্টি হয়। চলন বিল হইতে ইহার বর্তমান জলধারা বড়াল নদীরূপে পশ্চিমে গঙ্গায় ও পূর্বে যমুনা নদীতে মিলিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে নদীখাত আরও উন্নীত হইলে সংস্কারের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। অবিভক্ত বঙ্গে ইহার তীরে সান্তাহার, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, পাতিরাম প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গবিভাগের পর ইহার নিম্নাংশ পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব কমিয়া যায়।

অরবিন্দ বিশ্বাস

আদম ইসলামী, খ্রীষ্টীয় ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম। বাইবেলের 'আদিপুস্তক' বইখানিতে জগৎ-সৃষ্টির বর্ণনার পরে প্রথম নর-নারীর সৃষ্টি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে: 'তখন পরমেশ্বর বলিলেন, এবার আমরা নিজ প্রতিচ্ছবিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করি আমাদের সাদৃশ্যে···তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিলেন নর ও নারীরূপে' (১।২৬-২৭) এবং 'প্রভু পরমেশ্বর মৃত্তিকার ধূলি লইয়া মানুষ গড়িলেন এবং তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু নিঃশ্বসিত করিলেন। মানুষ তখন জীবন্ত প্রাণী হইয়া উঠিল' (২।৭)। এখানে মানুষ শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ হইল 'আদম'। ইহা ব্যক্তিবাচক নহে, জাতিবাচক। আরবী প্রভৃতি অন্যান্য সেমিটিক ভাষাসমূহেও 'আদম' শব্দের এই অর্থ। তবে বাইবেলের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এবং ইসলামী ও ইহুদী শাস্ত্রে আদম নামটি ব্যক্তিবাচক, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির আদিপিতার ব্যক্তিগত নাম।

আদমের সৃষ্টি, সুখোদ্যানে প্রথম নর-নারীর বাস, শয়তানের প্ররোচনায় ঐশ আদেশের লঙ্ঘন, পতনের শাস্তিরূপে ইডেন উদ্যান হইতে আদমের নির্বাসন ইত্যাদি বাইবেলে ও কোরানে পুরাণজাতীয় রীতি অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে। সকল খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মুসলমানের ধর্মগত বিশ্বাস এই যে সমগ্র মনুষ্যজাতির উৎপত্তি একই আদি-পিতা-মাতা হইতে। আদম নিষ্পাপ অবস্থায় সৃষ্ট হইয়া ইচ্ছাকৃত অপরাধের দ্বারাই পাপ ও দুঃখের স্রোত জগতে আনিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানরা ত্রাণকর্তা ও নবজীবনদাতা যীশু খ্রীষ্টকে 'নব আদম' বলিয়া অভিহিত করেন।

ইসলামী ইতিকথায় আদম সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 'তিনি নাকি ইডেন হইতে নির্বাসিত হইয়া সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। সেইজন্য আজ অবধি ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী শৈলমালা 'আদম-সেতু' এবং সিংহলের এক উচ্চ পর্বত 'আদম-গিরি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'বিষাদ-সিন্ধু' নামক বিখ্যাত বাংলা পুস্তকে আর একটি সুপ্রাচীন কিংবদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে: প্রধান ফেরেশ্‌তা আজাজীল আদি-পুরুষ হজরত আদমকে প্রণাম ও পূজা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গচ্যুত শয়তানে পরিণত হন।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি প্রাচীন কিংবদন্তী আছে যে, আদমকে কবর দেওয়া হইয়াছিল কালভাবি পর্বতে। যীশুও ক্রুশবিদ্ধ হন ঐ একই স্থানে। তাই ক্রুশমূর্তির তলায় প্রায়ই একটি নর-কপাল চিত্রিত হইয়া থাকে।

বাংলায় আদম শব্দটির এক বিকৃত রূপ 'শূন্য পুরাণে' পাওয়া যায়— 'ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকম্বর, আদম্ফ হৈল শূলপাণি'। প্রবাদবাক্যরূপে ব্যবহৃত 'বাবা আদমের সময়' বচনটি 'মান্ধাতার আমল' -এর অর্থ বহন করে।

অনেক খ্রীষ্টান আদমকে 'সেন্ট' (সাধু)-রূপে শ্রদ্ধা করে। প্রাচী-মণ্ডলীতে ১৯ ডিসেম্বর সেন্ট আদমের পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পিয়ের ফাল্লোঁ

আদমশুমার, -রি আদমশুমার অথবা জনগণনা শব্দের দ্বারা কোনও দেশের জনসংখ্যা নিরূপণ ও তৎসহ প্রতিটি অধিবাসী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বুঝায়। আদমশুমার রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে হইয়া থাকে; কারণ কোনও নাগরিক অথবা কোনও বেসরকারি সংস্থার পক্ষে এই কার্য সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্তমান কালে আদম-শুমার বা জনগণনা বলিতে শুধু জনসংখ্যা নিরূপণ এবং

প্রতিটি অধিবাসী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহই বুঝায় না, সংগৃহীত তথ্যাবলী বিভিন্নভাবে সাজাইয়া বিভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করা এবং সেই সকল তালিকার ভিত্তিতে দেশের জনসমষ্টি বিষয়ে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত -সংবলিত বিবরণী প্রকাশ করাও জনগণনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

বর্তমানে জনগণনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার উৎপত্তি কত বৎসর পূর্বে তাহা সঠিক বলা কঠিন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্বে ব্যাবিলন, চীন, পারস্য ও মিশর দেশে জনগণনার বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও আদমশুমারের উল্লেখ আছে। যখন মোজেস ইহুদীগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া মিশর হইতে লইয়া আসেন, তখন তাহাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে যাওয়ার পথে সিনাই পর্বতের নিকট তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করেন। গণনার ফলে যাহাতে কোনও বিপদ না হয় সেইজন্য তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে পূজা দিবার জন্য প্রতিটি লোকের নিকট হইতে অর্ধ শেকেল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেন। এই গণনা ইহুদীদের বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে হইয়াছিল। এক-একটি পরিবার ধরিয়া গণনা করা হইয়াছিল। গণনার বিষয়বস্তু ছিল আদিপুরুষ হইতে পরিবারের কর্তা পর্যন্ত পুরুষসংখ্যা, প্রতি পরিবারের জনসংখ্যা ও প্রতি জনের নাম এবং ২০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক যুদ্ধক্ষম পুরুষের সংখ্যা। ইহার পর বাইবেলে আংশিক জনগণনার উল্লেখ পাওয়া যায় ইহুদীদের রাজা সলের রাজত্বকালে। রাজা হওয়ার পর তিনি যুদ্ধক্ষম লোক কত তাহা গণনার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন। সলের পর ডেভিড ইহুদীদের রাজা হইয়াছিলেন, তিনিও ইহুদীদের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে, ইহাতে ঈশ্বর বিরূপ হইয়া ইহুদীদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করেন; ফলে বহু লোকের প্রাণনাশ হয়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যেও জনগণনার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই আদমশুমার পাঁচ বৎসর অন্তর হইত। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আদমশুমারের প্রথা লুপ্ত হইয়া যায়। লুক-লিখিত সুসমাচারে বলা হইয়াছে যে সম্রাট্ সিজার অগস্টাসের রাজত্বকালে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে প্রথম জনগণনা হয় এবং প্রতি পরিবারকে এইজন্য স্বীয় নগর বা দেশে যাইতে হইয়াছিল। জোসেফ ও তাঁহার পত্নী মেরি এই আদমশুমারের জন্য বেথ্‌লিহেম নগরে আসিয়াছিলেন; সেই সময় যীশুর জন্ম হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক পুস্তক হইতে অবগত হওয়া যায় যে কৌটিল্যের পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদমশুমারের স্থান ছিল। রাজস্ব আদায়ের ভার যে সকল কর্মচারীর উপর ছিল তাহাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল স্বীয় সীমার অন্তর্গত সমস্ত বাড়ির সংখ্যা নিরূপণ করা এবং কোন্ বাড়িতে কত লোক, তাহাদের জাতি কি, তাহারা কৃষক, গোপালক, বণিক কিংবা শিল্পী— ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কর ধার্য করা। এই ব্যবস্থা পল্লী অঞ্চলে এবং নগরে, রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ছিল (অর্থশাস্ত্র, ২য় অধিকরণ, ৩৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্যকে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলে ভারতে খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে আদমশুমারের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে করা যায়। মেগাস্থেনেসের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজধানী পাটলিপুত্রে তখন জন্ম এবং মৃত্যু পঞ্জীভূত করার ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আদমশুমারের অনুরূপ পদ্ধতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নগরে ছিল, কারণ প্রতিটি গৃহের সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণের প্রাথমিক কার্য প্রতি গৃহে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা। ভারতে ইহার পর জনগণনার উল্লেখ পাওয়া যায় সম্রাট্ আকবরের সভাসদ আবুল ফজল -বিরচিত আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে। ঐ পুস্তক হইতে জানা যায় যে নগরের কোতোয়ালের একটি কর্তব্য ছিল নগরের অধিবাসীদের সংখ্যা নিরূপণ করা।

ইংরেজগণ যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে তখন তাহারা আদমশুমার যে নিয়মিত হইত সে বিষয়ে কোনও সংবাদ পায় নাই। ভারতের অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোনও ধারণা ছিল না। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের বিখ্যাত 'পঞ্চম বিবরণী'তে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যে মন্তব্য করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা বলেন, "ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত দেশসমূহে যে বিচারপদ্ধতি এবং ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার বিবরণ দেওয়ার পূর্বে আপনাদের কমিটি ঐ সকল দেশের জনসংখ্যার বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলে খুশি হইতেন, কারণ, তাহা হইলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন দ্বারা যে বিচারব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে তাহা কতদূর যথোপযুক্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইত। কিন্তু আপনাদের কমিটি এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার ফলে কোম্পানির পুরাতন রাজ্যসমূহেও অর্থাৎ বারাণসীসহ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতেও কত লোক আছে তাহা সঠিক বলিতে পারেন না।"

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত অসুবিধা দূরীকরণার্থে ইংরেজগণ ভারতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর জনগণনার ব্যবস্থা করেন। প্রথম যে জনগণনা হয় উহা সারা ভারতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই প্রথম গণনা হইয়াছিল। তবে ইহারও পূর্বে দুই-একটি প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে জনগণনা হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি পাঞ্জাব প্রদেশে আদমশুমার হইয়াছিল। কলিকাতা শহরের অধিবাসীসংখ্যা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি সর্বপ্রথম গণনার দ্বারা নিরূপিত হয়। বাংলা দেশে প্রথম আদমশুমার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হয়। তখন বাংলা দেশ বলিতে অবিভক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বুঝাইত।

আদমশুমার দ্বারা জনসংখ্যা নিরূপণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকারান্তরে জনসংখ্যা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে ডাক্তার ফ্র্যান্সিস বুকানন-হ্যামিল্টনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে যে জেলার জনসংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে, সেই জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ বাহির করিতেন। তাহার পর, জমির প্রকৃতি অনুসারে, তিনি প্রতি ৫ অথবা ৬ একরে একটি লাঙ্গল হিসাবে জেলার আবাদী জমি চাষ করিতে কয়টি লাঙ্গল দরকার তাহা গণনা করিতেন। প্রতি লাঙ্গলের জন্য পাঁচ জনের একটি পরিবার ধরিয়া লাঙ্গলের সংখ্যাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া তিনি কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকেদের সংখ্যা নিরূপণ করিতেন। ইহার পর অকৃষিজীবী পরিবারের লোকসংখ্যা আনুপাতিকভাবে বাহির করিতেন। কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী পরিবারের অনুপাত তিনি সেই জেলায় অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া স্থির করিতেন। পূর্বোক্তভাবে জনসংখ্যা নিরূপণ করার পর তিনি সেই নিরূপিত জনসংখ্যা সঠিক কিনা তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে সেই জেলার উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির হিসাব সংগ্রহ করিতেন। অতঃপর মাথাপিছু এবং নির্দিষ্ট হারে বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ধরিয়া নিরূপিত জনসংখ্যার জন্য কত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিতেন এবং উৎপন্ন এবং আমদানি-রপ্তানি খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিতেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে নিরূপিত জনসংখ্যা নির্ভুল হইতে পারে না এবং এইরূপে জনসংখ্যা নিরূপণ করাকে আদমশুমার বা জনগণনা বলে না।

নির্ভুলরূপে জনগণনা করিতে হইলে দেশের সর্বত্র একই সময়ে গণনা করিতে হয়। যেহেতু ভারতের প্রথম আদমশুমার সর্বত্র একই সময়ে হয় নাই, সেই হেতু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারকে বর্তমান আদমশুমারের পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয় না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেশের সর্বত্র একই সময়ে যে জনগণনা হইয়া আসিতেছে তাহা এই পর্যায়ের অন্তর্গত। ভারতে এ পর্যন্ত দশ বৎসর ব্যবধানে মোট নয়টি আদমশুমার হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারটি সর্বশেষ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক আদমশুমারের প্রচলন হয় এবং তাহার ১১ বৎসর পূর্বে, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হইয়াছিল।

আদমশুমার অথবা জনগণনা নির্ভুলরূপে পরিচালিত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আদমশুমারের ব্যবস্থা এরূপভাবে করিতে হইবে যেন দেশের কোনও লোক গণনার সময় বাদ না যায় এবং কাহাকেও যেন একাধিকবার গণনা করা না হয়। দ্বিতীয় যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় তাহা হইতেছে, গণনাকৃত জনসংখ্যা যেন কোনও এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে দেশের লোকসংখ্যা সূচিত করে। কাহাকেও বাদ দিলে অথবা কাহাকেও একাধিকবার গণনা করিলে নিরূপিত জনসংখ্যা ভুল হইবে। আবার যেহেতু প্রতি প্রহরে জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে সেই হেতু জনসংখ্যা কোনও মাসে বা কোনও বৎসরে এত ছিল ইহা বলিলেও তাহার কোনও অর্থ থাকিবে না। শেষোক্ত কারণে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে সর্বত্র একই নির্দিষ্ট সময়ে গণনা করা হইত। এই ব্যবস্থায় বহু গণনাকারীর প্রয়োজন হইত। সেইজন্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণনা পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় যে সময় দেশের জনসংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে তাহার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই গণনাকার্য আরম্ভ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরে দুই-এক দিনের মধ্যে পুনর্গণনা দ্বারা পূর্বনিরূপিত জনসংখ্যা জন্ম, মৃত্যু ও অতিথির আগমনহেতু যোগ-বিয়োগ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। এই নূতন ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম গণনাকারী হইলে চলে এবং নিরূপিত জনসংখ্যাও নির্ভুল হয়।

জনগণনার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে, তাহা তৎকালীন সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে জনগণনালব্ধ তথ্যাদি কেবল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আসে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঐ সকল তথ্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি আদমশুমারের পূর্বে একটি করিয়া এতৎসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হইত। এই আইনে গণনাকারীর এবং জনসাধারণের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইত। আদমশুমার শেষ হওয়ার পর ঐ আইনের আর কোনও অস্তিত্ব থাকিত না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আদমশুমার সংক্রান্ত একটি স্থায়ী আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনাদ্বয় এই আইনের বলে করা হইয়াছে। 'জনসংখ্যা' দ্র।

যতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত

আদালত মুসলমান রাজাদের শাসনকালে বিচারালয়ের সাধারণ নাম ছিল আদালত। ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্বে চুরি, ডাকাতি, মারপিট প্রভৃতি অপরাধের বিচার যেখানে হইত তাহার নাম ছিল ফৌজদারী আদালত। অন্য বিষয়ে বিবাদ মিটাইবার জন্য নাম ছিল শুধু আদালত। মফস্বলে জমিদারগণ বিচারকের কার্য করিতেন। তবে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইলে নবাবের অনুমতি লইতে হইত।

এইরূপ আদালত হইতে ইংরেজ আমলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালত একটু ভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান আমলে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক বিচার-বিভাগ ছিল বলিয়া জানা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে রাজ-সভাতেই বিচার হইত বলিয়া উল্লেখ আছে। 'প্রাড্-বিবাক' বলিয়া একটি পদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্তব্য কি ছিল, বিচার করা অথবা ব্যবহারশাস্ত্র অনুযায়ী রাজাকে উপদেশ দেওয়া, তাহা পরিষ্কার বোঝা যায় না। 'প্রাড্‌বিবাকো রাজ্ঞা ব্যবহারদর্শনাধিকৃতো রূঢ়োচ্যতে'— মেধাতিথির এই টীকা হইতে জানা যায় যে প্রাড্‌বিবাক ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ হইতেন। মুসলমান আমলে স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া শহরে, এক-একজন কাজী থাকিতেন। কাজী মুসলমান আইন অনুসারে দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচার করিতেন। কিন্তু বিচারের প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল নবাব বা বাদশাহের। 'কাজীর বিচার' কথাটি পরবর্তী কালে যে অর্থে প্রচলিত তাহাতে মনে হয় কাজীর বিচার সব সময় নিরপেক্ষ বা আইনসংগত হইত না।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রথমে কোম্পানির কর্মচারীরা দেওয়ানী বিচার করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মফস্বলের আদালতগুলি সংগঠনের জন্য এক প্রস্তাব করেন। তাহার ফলে প্রতি জেলায় একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার ইওরোপীয় কালেক্টর জেলার দেওয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীর সাহায্যে দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। জেলার কাজী ও মুফ্‌তী এবং দুইজন মৌলবী ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। কলিকাতায় দুইটি উচ্চ আদালত ছিল— সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামৎ আদালত। প্রথমটির প্রধান বিচারপতি ছিলেন কলিকাতা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সভাপতি। দ্বিতীয়টির প্রধান বিচারপতি এদেশীয়দের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার পদবি ছিল দারোগা-ই-আদালত। নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে এই দুই আদালতে আপিল বা পুনর্বিচার হইত। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। তাহার পূর্বে মেয়রস্ কোর্ট নামে এক আদালত ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালত একসঙ্গে যুক্ত করিয়া হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়। জেলা আদালতগুলিও নানা স্তরে ভাগ করা হয়, যেমন দেওয়ানীতে জেলা জজ, সাব জজ ও মুন্সেফ আদালত। ফৌজদারীতে সেশন জজ ও নানা স্তরের ম্যাজিস্ট্রেট।

বর্তমানে আদালতের সংগঠন এইরূপ: সর্বোচ্চ আদালত হইতেছে সুপ্রিম কোর্ট। ইহা দিল্লীতে অবস্থিত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক-সংখ্যা সংবিধানে নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে যে কয়জন স্থায়ী বিচারক আছেন, তাঁহারা ব্যতীত হাইকোর্টের কোনও বিচারক অথবা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারককে আমন্ত্রণ করা যায়। হাইকোর্টে অন্যূন পাঁচ বৎসর জজিয়তির অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীরূপে অন্যূন দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা -সম্পন্ন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই। সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভা এই দুই সভা, তাহাদের নিকট অসদাচরণ বা অক্ষমতা প্রমাণিত হইবার পর, রাষ্ট্রপতিকে আবেদন করিলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে বরখাস্ত করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের সমস্ত হাইকোর্ট বা অন্যান্য বিচারালয় হইতে সুপ্রিম কোর্টে আপিল চলে। তাহা ছাড়া মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও আদেশ (রিট্) জারি করিতে পারেন। আইন বা সাক্ষ্যপ্রমাণ -ঘটিত কোনও জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ লইতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের নীচে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া

হাইকোর্ট আছে। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও বরখাস্তের নিয়ম প্রায় সুপ্রিম কোর্টের মত। আপিলের বিচার করা ছাড়া হাইকোর্টেও কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার প্রতিবিধানার্থে বা অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করিতে পারেন। কলিকাতা হাইকোর্ট কলিকাতা নগরের আদিম মামলাও বিচার করেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই হাইকোর্টের নির্দিষ্ট এলাকায় অনুরূপ ক্ষমতা আছে। হাইকোর্টের নীচে দেওয়ানীতে জেলা জজের আদালত ও সাব জজ ও মুন্সেফের আদালত। মোকদ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য অনুসারে জেলা জজ, সাব জজ বা মুন্সেফ আদালতের এক্তিয়ার নির্ধারিত হইয়া থাকে। মুন্সেফের আদালত হইতে সাব জজ আদালতে আপিল চলে। জেলা জজ বা সাব জজের আদালত হইতে হাইকোর্টে আপিল হয়। ফৌজদারীতে সেশন জজ ও বিভিন্ন স্তরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে সেশন আদালতে ও সেশন জজের আদালত হইতে হাইকোর্টে আপিল হয়।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

আদি আসামের উত্তর-পূর্ব ভাগে অবস্থিত, নেফার (N. E. F. A.) অন্তর্গত সিয়াং সীমান্ত এলাকায় আদিদের বাস। এই এলাকার পশ্চিমে শুবনসিরি ও পূর্বে ডিহাং নদী প্রবাহিত। আদি জাতির সংখ্যা ৬৮০০০-এর মত। পদম্‌, মিনিয়ং, পাসি, পঙ্গি, কায়কো, মিলাঙ, সিমঙ ও বোমোজানবো উপজাতি লইয়া আদি জাতি গঠিত। ইহাদের ভাষা ভোটবর্মী ভাষার সহিত সম্পর্কিত; দেহের লক্ষণ মঙ্গোলীয়, খর্বকায়, বলিষ্ঠ গড়ন।

পাহাড়ের উপর স্থায়ী এবং সুরক্ষিত গ্রামে ইহারা বাস করে। ঘরগুলি মাচার উপরে গঠিত। শূকর ও কুকুর পালন করে এবং দেবতাদের উদ্দেশে মিথান নামক বন্য মহিষজাতীয় জীব বলি দেয়।

শাসনের জন্য গ্রামে পঞ্চায়েতের মত ব্যবস্থা আছে; ইহার নাম কেবাং। যুবক এবং যুবতীদের জন্য মোশূপ ও রাশেং নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয় এবং নানাবিধ শিক্ষালাভ করে।

তুলা হইতে সুতা কাটিয়া নিজেরাই পোশাক-পরিচ্ছদ বুনিয়া লয়। মেয়েরা বোনার কাজ ভাল জানে। ভাতই প্রধান খাদ্য, কিন্তু কয়েকপ্রকার ক্ষুদ্রশস্যের প্রচলনও দেখা যায়। মাছ ধরা, শিকার করা ইহারা ভালবাসে। ফাঁদ পাতিয়া বা তীর-ধনুকের দ্বারা শিকার করার পদ্ধতি প্রচলিত। মাছ ধরিবার জন্য ও শিকারের সময়ে তীরের ফলায় কখনও কখনও বিষ ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রশস্য হইতে পচাই তৈয়ারি হয়। ইহাকে আপঙ বলে। আপঙ আদিদের অত্যন্ত প্রিয়। নাচ ও গান ইহারা খুব ভালবাসে।

নানাবিধ উপদেবতায় ইহাদের বিশ্বাস আছে। অসুখের সময়ে কাহার ক্রোধ হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিয়া মিথান, শূকর, মুরগি বা কুকুর বলি দিয়া ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করে। ইহারা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে। আত্মীয়স্বজন মৃতের উদ্দেশে কিছুদিন ধরিয়া খাদ্য ও পানীয় নিবেদন করিয়া থাকে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

আদিগঙ্গা ভাগীরথী নদীর একটি প্রাচীন প্রবাহপথ। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ গঠনের দুর্নিবার্য প্রাকৃতিক নিয়মে অধুনা লুপ্ত। কর্নেল টলি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুর (৮৮° ২০´ পূব ও ২২' ২৩´ উত্তর) হইতে গড়িয়া পর্যন্ত কয় মাইল আংশিক পুনরুদ্ধার করেন। সেইজন্য 'টালির নালা' নামকরণ। ইহার তটে কালীঘাটের মন্দির। ওলন্দাজ ফান্‌ডেনব্রোকের (১৬৬০ খ্রী) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের উত্তর-পূর্বে বর্তমান কাকদ্বীপ গ্রাম পর্যন্ত এই জলপথ চিহ্নিত দেখা যায়। একশত বৎসর পরে রেনেলের মানচিত্রে ইহা অঙ্কিত নাই। কিন্তু জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্যন্ত আজিও এই লুপ্ত নদীপথের সাক্ষ্য, মন্দির ঘাট প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ। টালির নালার নীচে ভাগীরথী-হুগলীর মূলপ্রবাহের গঙ্গা-মাহাত্ম্য নাই, কিন্তু আদিগঙ্গায় হিন্দু পুণ্যার্থী আজিও স্নান করে। এমন কি জয়নগর-বিষ্ণুপুর থানায় ইহার মজা খাতে প্রাচীন পুষ্করিণীগুলির জলেরও গঙ্গাজল মাহাত্ম্য আজ পর্যন্ত স্বীকৃত। মথুরাপুর থানায় চক্রতীর্থ অথবা চক্রঘাটার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে (১৪৯৫ খ্রী) এই পথে বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তুগীজ এবং মগ জলদস্যুগণ অবশ্যই এই পথ ব্যবহার করিত। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য নৌকায় আদিগঙ্গা বাহিয়া চক্রতীর্থ, সেখান হইতে রূপনারায়ণের তটে তমলুক এবং তমলুক হইতে স্থলপথে পুরীধামে পৌছেন।

কপিল ভট্টাচার্য

আদিগ্রন্থ শিখদের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ইহার প্রকৃত নাম 'গ্রন্থসাহেব'। শিখসম্প্রদায়ের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৮ খ্রী) -রচিত 'দশম পাদশাহী দা গ্রন্থ' হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য ইহা আদিগ্রন্থ নামে অভিহিত হয়।

পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩-১৬০৬ খ্রী) এই গ্রন্থ-সংকলন সম্পন্ন করেন ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬০১ খ্রী)। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন প্রদেশের সন্তপদাবলী হইতে গুরু অর্জুন তাঁহার সংকলনের জন্য বাণী নির্বাচন করেন। এই-গুলির রচনাকাল দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয় শত বৎসর বিস্তৃত। পরবর্তী কালে গুরু গোবিন্দ নবম গুরু তেগ বাহাদুরের (১৬২২-১৬৭৫ খ্রী) রচনাও আদি-গ্রন্থের অন্তর্গত করিয়া লন।

এই বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থ কয়েকটি অংশে বিন্যস্ত। 'মূলমন্ত্র' দিয়া সূত্রপাত। অতঃপর জপুনীসাণু, সো-দরু, সুণিবড়া, সো-পুরখু এবং সোহিলা নামক পাঁচটি 'বাণী'। বাণীগুলি আবার ৩১টি ভিন্ন রাগ অনুসারে সজ্জিত। 'ভোগ' অথবা 'ভোগ দা বাণী' দিয়া গ্রন্থের উপসংহার।

অপর একটি শ্রেণীকরণ অনুসারে সুণিবড়া অংশ সো-দরুর অন্তর্গত, আবার সো-দরু এবং সো-পুরখু মিলিয়া একত্রে রহিরাস নামে অভিহিত। এইভাবে জপজী, রহিরাস ও সোহিলা এই তিন নামেই শ্রেণীগুলি অধিকতর পরিচিত। ধর্মপ্রাণ শিখগণ প্রভাতে জপজী, সন্ধ্যায় রহিরাস এবং শয্যাগ্রহণকালে সোহিলা আবৃত্তি করেন।

গ্রন্থটি আদ্যন্ত প্রাকৃত মাত্রা-ছন্দে ও মিত্রাক্ষরে রচিত। রচনার কাল ও অঞ্চল এক নয় বলিয়া ইহার মধ্যে একাধিক ভাষা আসিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দীই ব্যবহৃত, তবে পাঞ্জাবী মারাঠী গুজরাটী অবধী এমন কি আরবী ফারসী শব্দাবলীও অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে। গুরুমুখীতে এই গ্রন্থ প্রথম লিপিবদ্ধ করেন ভাই গুরুদাস। শ্রীরাগ প্রমুখ ৩১টি রাগের শেষতম জয়-জয়ন্তী রাগটির যোজনা করেন তেগ বাহাদুর।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রী), অঙ্গদদেব (১৫০৪-১৫৫২/৫৩ খ্রী), অমরদাস (১৪৭৯-১৫৭৪ খ্রী), রামদাস (১৫৩৪-১৫৮১ খ্রী), অর্জুনদেব, তেগ বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ—আদিগ্রন্থে এই সাতজন শিখগুরুর রচনা পাওয়া যায়। ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম গুরুর কোনও রচনার সন্ধান জানা নাই। উত্তরকালে অনেকেই ভণিতা হিসাবে নানকের নাম ব্যবহার করিতেন। ফলে প্রত্যেকের রচনাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য সংকলনে মহলা ১, মহলা ২ ইত্যাদি ক্রম ব্যবহৃত হইয়াছিল। অর্থাৎ মহলা ১-এ প্রথম গুরুর রচনা, মহলা ২-এ দ্বিতীয় গুরুর রচনা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এইভাবে দেখা যায় জপজী অংশে আছে গুরু নানকের ৪০টি পৌরী বা শ্লোক, রহিরাস এবং সোহিলা অংশে নানকের সঙ্গে আছে রামদাস এবং অর্জুনদেবের রচনা। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে অপরাপর গুরুর বাণী, শিখ ভক্ত বা 'ভগত'গণের রচনা এবং সম্প্রদায়বহির্ভূত অনেক ভক্তসাধকের বাণী ব্যবহৃত। মধ্যযুগীয় এই ভক্তগণের অনেকেই স্বনামখ্যাত। জয়দেব, নামদেব, রামানন্দ, কবীর, সুরদাস ইঁহাদের অন্যতম। এই সুরদাস অবশ্য প্রসিদ্ধ অন্ধকবি সুরদাস নন। তবে জয়দেব বলিতে গীতগোবিন্দের বিখ্যাত কবিকেই বুঝিতে হইবে। মারাঠী সন্তদের মধ্যে নামদেব ছাড়াও আছেন ত্রিলোচন ও পরমানন্দ। রামানন্দের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কবীর, ধন্না, পীপা, সঈন ও রুইদাসের বাণী আদিগ্রন্থে সংকলিত। ধন্না ছিলেন জাঠ, পীপা এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতি, সঈন ছিলেন রেওয়া-র রাজদরবারে ক্ষৌরকার এবং রুইদাস ছিলেন চর্মকার। গুরু অর্জুন আরও যে সব ভক্তের বাণী সাগ্রহে তাঁহার সংকলনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শেখ ফরিদ ও শেখ ভিখন ছিলেন মুসলমান, সধনার জীবিকা ছিল কশাইবৃত্তি এবং বেণী নামক অপর এক ব্যক্তি অজ্ঞাতপরিচয়। এই তালিকা হইতে অর্জুনদেবের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে যেন তিনি সমগ্র মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্মের নির্যাসটুকু ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন।

আদিগ্রন্থের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন এর্নস্ট ট্রুম্প (১৮৭৭ খ্রী)। কিন্তু তিনি এই প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত ভাবধারার প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। 'দি শিখ রিলিজন' (শিখধর্ম) নামক ছয় খণ্ডের বিরাট গ্রন্থে ম্যাক্স আর্থার মেকলিফ ট্রুম্পের ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেন এবং আদিগ্রন্থের নিপুণতর অনুবাদ করেন (১৯০৯ খ্রী)। বাংলাভাষায় এখনও ইহার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ গুরু নানকের দুই-একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত গদ্যে এবং কিরণচাঁদ দরবেশ পদ্যে কয়েকটি অংশের অনুবাদ করেন। সম্প্রতি হারানচন্দ্র চাকলাদার রচিত আদিগ্রন্থের অনুবাদ অংশতঃ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৬৪ ও ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)।

দ্র হারানচন্দ্র দেবশর্মা চাকলাদার, শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বহরমপুর (উড়িষ্যা), ১৩৬৪ ও ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ; Max Arthur Macauliffe, *The Sikh Religion*, vols. I-VI, Oxford, 1909 ; Surindar Singh Kohli, *A Critical Study of Adi Granth*, New Delhi, 1961.

ভাগ সিং
গুরনেক সিং

আদিত্য সাধারণ অর্থে সূর্যের প্রচলিত নামসমূহের অন্যতম। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'আদিত্য' বলিতে প্রধানতঃ একটি বিশিষ্ট দেবমণ্ডলীকে বুঝাইত। বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী আদিত্যসংজ্ঞক দেবমণ্ডলী অদিতির সন্তান। এই অদিতি পরবর্তী কালের কশ্যপপত্নী অদিতি নহেন; অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতিরূপে ইনি সকল দেবতার জনয়িত্রী। ঋগ্‌বেদে (২।২৭।১) মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ— এই ছয় জন আদিত্য উল্লিখিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের অপর দুই স্থানে (৯।১১৪।৩ ও ১০।৭২।৮) আদিত্যগণের সংখ্যা যথাক্রমে সাত ও আট নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদিও সেই দুই স্থলে স্বতন্ত্রভাবে ইঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অথর্ববেদ সংহিতার মতেও (৮।৯।২১) আদিত্যগণের সংখ্যা আট; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৯।১) এই আট জনের তালিকা দেওয়া হইয়াছে— মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতা, ইন্দ্র ও বিবস্বান্‌। শতপথ ব্রাহ্মণে দুই স্থলে (৬।১।২।৮ ও ১১।৬।৩।৮) আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আদিত্যমণ্ডলীর অন্তর্গত সকল দেবতা প্রত্যক্ষতঃ সূর্যের সহিত সম্পৃক্ত না হইলেও সূর্যের ন্যায় ইঁহারা দ্যুস্থানভুক্ত দেবতারূপেই কল্পিত হইয়াছেন। বেদোত্তর যুগে আদিত্যগণ সকলেই সৌর-দেবতারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পূজাও তখন সূর্যপূজার অঙ্গীভূত হইয়াছিল। মহাভারত-পুরাণাদিতে প্রায় সর্বত্র আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ও তাঁহারা কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ('অদিতি' দ্র)। আদিত্যমণ্ডলীর জন্ম সম্পর্কে কোনও কোনও পুরাণে কিছু ভিন্ন কাহিনী লক্ষিত হয়। হরিবংশে কথিত হইয়াছে, সূর্যের নির্দেশে ত্বষ্টা ভ্রমিযন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার তেজশাতন করেন ও তৎকালে সূর্যের অঙ্গভ্রষ্ট মুখরাগ হইতে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। শিবপুরাণের মতে আদিত্যগণের জননী কশ্যপপত্নী ভানু। মহাভারত-পুরাণাদিতে নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁহারা 'তুষিত' নামে দেবমণ্ডলী ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই আদিত্যরূপে আবির্ভূত হন। বিভিন্ন পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। যে নাম-তালিকা সর্বাধিক প্রচলিত, তাহার অন্তর্ভুক্ত দেবতা এই কয়জন: অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, ভগ, বিবস্বান্‌, পূষা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অংশ, সবিতা ও শক্র। মহাভারত, হরিবংশ, এবং বায়ু, কূর্ম, অগ্নি, গরুড়, স্কন্দ, কালিকা, সৌর প্রভৃতি পুরাণের বিভিন্ন অংশে মূল সংখ্যা দ্বাদশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপরি-উক্ত তালিকার কোনও কোনও নামের পরিবর্তে পর্জন্য, অংশু, ভাস্কর, যম, রবি, অংশুমান্‌, সূর্য, ধনদ, জয়ন্ত, শুক্র, চণ্ড, সোম, উরুক্রম প্রভৃতি দেবতাকে আদিত্য-পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে আদিত্য-গণের মূর্তি নির্মাণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু-ধর্মোত্তরকার বলিয়াছেন, দ্বাদশ আদিত্যের মূর্তি সূর্যমূর্তির অনুরূপভাবে গঠিত হইবে। বিশ্বকর্মশাস্ত্রের মতে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে পূষা ও সম্ভবতঃ বিষ্ণু হইবেন দ্বিভুজ ও অবশিষ্ট সকলে হইবেন চতুর্ভুজ। আদিত্যমণ্ডলীভুক্ত কোনও দেবতার প্রাচীন স্বতন্ত্র মূর্তির মধ্যে উড়িষ্যার কোণার্কে প্রাপ্ত বিবস্বানের মূর্তিদ্বয় উল্লেখযোগ্য। সমবেত-ভাবে আদিত্যগণের মূর্তিসংবলিত দুই-একটি শিলাপট্ট পশ্চিম ভারতের গুজরাট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আদিনা মসজিদ মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলির মধ্যে পাণ্ডুয়ার এই বিখ্যাত মসজিদটি বিশালতম এবং সুদৃশ্যতম। হিন্দু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই মসজিদটি ১৩৬৪ হইতে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। ইহাতে উৎকীর্ণ সিকন্দর শাহের লিপির তারিখ ১৩৬৯ খ্রী। উত্তর-দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ১৫৫ মিটার (৫০৭½ ফুট), এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ৮৭ মিটার (২৮৫½ ফুট); মসজিদটি ইঁট ও পাথরে নির্মিত। মসজিদের চতুর্দিকে ঘোরানো বহিঃপ্রাচীরের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত খোদাইয়ের কাজ আছে। পূর্বে প্রাচীরটির উপরে ৩০৬টি মিনার ছিল। মসজিদটির পশ্চিমাংশে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত প্রার্থনাকক্ষ এবং প্রার্থনা-মঞ্চটি অতীব সুন্দর। পশ্চিমে প্রাচীর বরাবর একটু উত্তরের দিকে কৃষ্ণ প্রস্তরের ২১টি স্তম্ভের উপর কৃষ্ণ প্রস্তরের (অধুনা কাষ্ঠের) একটি উচ্চ মঞ্চ আছে, নাম বাদশাহ্‌-কা-তখ্‌ত্‌; ইহার উপরের মিনারগুলি এখনও বর্তমান। সুলতানের অন্তঃপুরিকাগণ এই মঞ্চে নমাজ পড়িতেন। পশ্চিম প্রাচীরের প্রার্থনাকক্ষ তিনটিতে উৎকীর্ণ লিপি ও নকশাগুলি সুন্দর। পশ্চিম প্রাচীরের বহির্দিকে— বাদশাহ্‌-কা-তখ্‌ত্‌-এর বিপরীত দিকে— একটি ঘর আছে। ইহা সিকন্দর শাহের ঘর নামে পরিচিত।

দ্র G. E. Lambourn, *Malda District Gazetteer*, Calcutta, 1918; *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Malda,* Calcutta, 1954;

Khan Sahib M. Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, H. E. Stapleton, ed., Calcutta, 1924.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আদিবাসী বলিতে মানবগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনগ্রসর আদিম সংস্কৃতিবিশিষ্ট গোষ্ঠী বুঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া বর্তমান সভ্যতার অন্তরালে অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর ক্লিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে, এই সমস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ নূতন অবস্থার চাপে ইহাদের জীবনে বহুবিধ আলোড়ন আসিয়াছে। সেইজন্য আদিবাসীসমাজেও একেবারে অনড় সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা বা স্থিতিশীল সংস্কৃতিজীবন দেখা যায় না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও আদিবাসীগোষ্ঠী বা আফ্রিকার কোনও উপজাতির জীবনে এই রকম মন্থরতা অনুভব করা যায়। আদিবাসী অর্থে সাধারণতঃ 'আদিম বাসিন্দা' ('অটকথোনিস্') বুঝায়। বর্তমানের উন্নতিশীল মানবগোষ্ঠী ইহাদের উত্তরপুরুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম বাসিন্দাদের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলিকে কখনও কখনও 'উপজাতি' বা 'খণ্ডজাতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

নৃ-বিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যামত আদিবাসী-সমাজে গোষ্ঠীসচেতনতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষার জন্য দলবদ্ধভাবে আক্রমণ বা অভিযান ইহাদের আর এক বৈশিষ্ট্য। নিজেদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যে সমাজ-কাঠামো রহিয়াছে, সামাজিক বিধি বা অনুশাসনের যথোপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য নিজেদের সরকার বা পঞ্চায়েতও রহিয়াছে। এক-একটি গোষ্ঠীর কেবল আকৃতিগত সমতা নহে, ভাষা ও সংস্কৃতি-গত ঐক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আদিবাসীসমাজের সামাজিক কাঠামোর নানা প্রকারভেদ দেখা যায়। কখনও বা এক-একটি সম্প্রদায় জনসংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। দলের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংস্থা হইল পরিবার। আন্দামানের উপজাতিগুলির এই রকম পাঁচ-ছয়টি পরিবারের যাযাবর দলগুলিকে 'স্থানীয় দল' (লোক্যাল গ্রুপ) বলা হয়। প্রতি দল স্বীয় সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া থাকে। সিংহলের ভেদ্দাদের মধ্যে এইরূপ যাযাবর দল রহিয়াছে। কোনও কোনও উপজাতিসমাজ প্রধানতঃ দুইটি দলে বিভক্ত। দুইটি দল সামাজিক মর্যাদায় সমান নহে। একদল অপর দলের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে। এই দ্বিধা-বিভক্ত দলকে দ্বৈতদল (ময়ইটি) বলা হয়। প্রতি দল কতকগুলি গোত্র বা কুলে (ক্ল্যান) বিভক্ত। আবার প্রতি গোত্রের অধীনে কতকগুলি পরিবার থাকে। মধ্য ভারতের গণ্ড উপজাতিদের সমাজ-ব্যবস্থা কতকটা এই ধরনের। আসাম অঞ্চলের কুকীগোষ্ঠীর আনালদের মধ্যেও এই রকম সমাজগড়ন লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতির দুই প্রধান সামাজিক-দল ও তাহাদের অধীনে কয়েকটি করিয়া গোত্র এবং গোত্রের মধ্যে কয়েকটি পরিবার আছে। টোডা উপজাতির টারথার দল সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ। কিন্তু টারথার দল নিজ গোত্রগুলির মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করে। ইহা অনেকটা হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথার মত।

যখন সমাজ দুইয়ের অধিক দলে বিভক্ত হয় তখন তাহাকে ভ্রাতৃদল বা গণসংঘ (ফেট্রি) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সব দলগুলির মধ্যে কুল, পবিবার প্রভৃতি থাকে। আসাম অঞ্চলের কুকীগোষ্ঠীর কোনও কোনও উপজাতি, গারো, মধ্য ভারতের পাহাড়ী মাড়েয়া হইল ইহার উদাহরণ। আসাম অঞ্চলের আইমল কুকীদের সামাজিক গঠন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাহাদের দুইটি প্রধান দ্বৈতদল; প্রতি দ্বৈতদলের দুইটি করিয়া উপ-দ্বৈতদল বা ভ্রাতৃদল এবং তাহাদের কয়েকটি করিয়া কুল এবং কুলের মধ্যে কয়েকটি করিয়া পরিবার রহিয়াছে। মণিপুরের আদিম কুকীগোষ্ঠীর পুরুষদের তিনটি প্রধান কুল, তাহাদের কয়েকটি উপগোত্র এবং ঐ সব উপগোত্রে কয়েকটি করিয়া পরিবার আছে। খাসিয়াদের মধ্যেও উপগোত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়।

হিন্দুসমাজের কোল ঘেঁষিয়া অনেক আদিবাসী-সমাজের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন উপজীবিকা অনুসরণকারী এক-একটি উপজাতির বিরাট অংশ নিজ-দিগকে হিন্দুদের অন্ত্যজ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্য প্রদেশের গণ্ড উপজাতির বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো লক্ষ্য করিলে এই গতিশীল পরিবর্তন বুঝা যাইবে। পরধান, আগারি, ওঝা, সোলাহা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কালক্রমে এক পৃথক সম্প্রদায় বা জাতিতে পরিণত হইতেছে। কাহারও মতে সরাইকেলার ভূমিজদের মধ্যে অথবা উত্তর বঙ্গের মেচ উপজাতির মধ্যে বর্ণভেদ-প্রথার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল।

উপজাতিসমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার বা পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা দেখা যায়। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা মাতব্বরদের অথবা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের

হাতে তাহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। সরকার বা পঞ্চায়েত দোষী-নির্দোষ সাব্যস্ত করে, শাস্তি দেয়, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। পূজাপদ্ধতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব —সমস্ত কিছু এই সব পঞ্চায়েত বা সরকার পরিচালনা করিয়া থাকে।

সমাজের প্রতিটি মানুষ যাহাতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা দক্ষতা লাভ করিতে পারে সেইজন্য অনেক উপজাতি-সমাজে সংঘ বা পরিমেল (অ্যাসোসিয়েশন) গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজের প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে নানা-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছোটনাগপুরের উরাঁও উপজাতিদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে রাত্রিযাপনের জন্য 'ঘুমঘর' প্রচলিত আছে। বয়স অনুযায়ী উরাঁওদের তিনটি শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। সেইভাবে মধ্যপ্রদেশের গণ্ডদের 'গোটুল', গারোদের 'লোকপাণ্ডে', মুণ্ডা বা বিরহড়দের 'গিতিওড়া' রহিয়াছে। অঙ্গনাগাদের এই পরিমেল গঠনবৈচিত্র্য বয়সের দিকে লক্ষ্য করা হয়। প্রতিটি মানুষ কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবন পর্যন্ত পরিমেলের বিভিন্ন বয়স-স্তরে থাকিয়া বিশেষ সামাজিক মর্যাদা পাইয়া থাকে।

প্রাচীন যুগ হইতে জীবনযাত্রার তাগিদে মানুষ কেবল যে যূথবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, তাহার জৈবপ্রেরণা বা সহজাত প্রবৃত্তির জন্য মানুষের মনে নানা রীতি-নীতি বা অনুশাসনের কল্পনা আসিয়াছে। সামাজিক পরিবেশে এই সকল সহজাত প্রবৃত্তির সংযত প্রশমন ঘটে এবং স্থান-কালভেদে এই সবের বিভিন্ন বিকাশ রীতি-নীতির মাধ্যমে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চাতে সামগ্রিক মূল্যবোধ বা গোষ্ঠীমূল্যবোধের ভূমিকা অন্যতম। বিভিন্ন রীতি-নীতির মধ্যে আদিমতাও লক্ষণীয়। অনেকে এই সমস্ত রীতি-নীতি দেখিয়া সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিকতা দেখিবার চেষ্টা করেন। প্রাণী মাত্রেরই যে সকল সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল ভয়, ক্ষুধা, কাম ও ক্রোধ। জীবনযাত্রার প্রতিটি ছন্দের সঙ্গে এইগুলির সংগতি রহিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনেচ্ছা এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানুষের সমাজে ইহা বিবাহরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। স্থান ও কাল -ভেদে এই বিবাহের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের মাধ্যমে সাহচর্য, আনুগত্য ছাড়া সমাজগত-ভাবে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়, কঠোর বাস্তব জীবনে তাহার গুরুত্ব কম নহে। বিবাহ যখন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে অন্তর্বিবাহ (এন্‌ডোগ্যামি), আর স্বীয় গোষ্ঠীর বাহিরে এই বন্ধন স্থাপিত হইলে তাহাকে বহির্বিবাহ (এক্সোগ্যামি) বলা হয়— যেমন সাঁওতাল উপজাতি নিজেদের মধ্যে বিবাহ করে। সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠী। আবার ঐ উপজাতির যে কয়টি কুল বা গোত্র (হাঁসদা, হেমরম, টুডু ইত্যাদি) আছে সকুলে বা সগোত্রে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে না বলিয়া এইগুলি বহির্বিবাহকারী গোষ্ঠী। সগোত্রে বিবাহ করা বা না করার পশ্চাতে অনেক ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তি বা মতবাদ আছে। বিবাহ দুই প্রকারের হয়— একবিবাহ (মনোগ্যামি) ও বহুবিবাহ (পলিগ্যামি)। বহুবিবাহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এক পুরুষের সহিত অনেক নারীর বিবাহকে বহুপত্নীক বিবাহ বলা হয়। উরাঁও, মুণ্ডা অথবা লোধাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত। আবার একজন স্ত্রীর অনেক স্বামী থাকিতে পারে ; তাহাকে বহুপতিক (পলিঅ্যান্‌ড্রি) বিবাহ বলা হয়। এই বিবাহে স্বামীরা সহোদর ভ্রাতা হইলে ভ্রাতৃত্বমূলক এবং ভ্রাতা না হইলে অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহ বলা যায়। হিমালয় অঞ্চলের খস এবং দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতিরা ভ্রাতৃত্বমূলক এবং নায়ার অথবা তিব্বতীয়রা অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহের উদাহরণ। বহুপতিক বিবাহে সন্তানের পিতৃত্ব নির্বাচন এক সামাজিক অনুষ্ঠানের উপরে নির্ভর করে।

সভ্যতার প্রাক্কালে গোষ্ঠী বা যৌথ -বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অনগ্রসর ডেয়েরী বা মার্কুসীয়দের মধ্যে অসংলগ্ন নারীমিলনকে গোষ্ঠীবিবাহের স্মারক বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বিবাহের স্বীকৃতির জন্য নানা অনুষ্ঠান রহিয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানের সহিত ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস মিলিত রহিয়াছে। বিবাহের বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। বলপূর্বক বিবাহ বা পৈশাচ রাক্ষস বিবাহ ছোট-নাগপুরের হো, ভূমিজ বা মুণ্ডাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমবিনিময়ে বিবাহ আসাম অঞ্চলের কুকীগোষ্ঠীর মধ্যে অথবা মধ্য ভারতের কুরকু উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই বিবাহে পুরুষকে ভাবী স্ত্রীর পিত্রালয়ে কয়েক বৎসর মজুরি করিতে হয়। কোথাও কোথাও মেলায় বা বাজারে অনূঢ়া যুবতীর কপালে সিঁদুর ছোঁয়াইবার রীতি রহিয়াছে। সাঁওতাল, হো প্রভৃতির সমাজে তাহাই বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত। সমাজগতভাবে বিবাহে আপত্তি থাকিলে যুবক-যুবতী দেশান্তরী হইয়া যায়। তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা যায়। উরাঁও, লোধা, মুণ্ডা প্রভৃতির সমাজে এই রীতি প্রচলিত। হো, বিরহড়দের

সমাজে কখনও কখনও যুবতী কোনও পুরুষকে বিবাহ করিতে চায়। ভাবী শাশুড়ীর নিকট অনেক গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা খাইবার পর সেও বধূ বলিয়া স্বীকৃতা হয়।

এই সমস্ত প্রথা ছাড়া অনেক সমাজে বর-কন্যা পূর্ব হইতে নির্ধারিত থাকে। সেই বিবাহকে 'বাঞ্ছনীয় বিবাহ' বলা যায়। মাতুলকন্যা বা পিতৃস্বসাকন্যা বিবাহ, খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত -কন্যা বিবাহ এই পর্যায়ের। টোডা, গারো, গণ্ড, ভেদ্দাদের মধ্যে এই রকম মাতুলকন্যা বা পিতৃস্বসা-কন্যা বিবাহ প্রচলিত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করাকে দেবরন এবং স্ত্রীর ভগিনীদের বিবাহ করাকে শালীবরন বলা হয়। এইগুলিও বাঞ্ছনীয় বিবাহ। এই বিবাহে বর-কন্যার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করার সামাজিক বিধান রহিয়াছে। পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে চলিয়া যায়, আর গারো, খাসিয়া প্রভৃতি মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বামীই স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করে। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সন্তান-সন্ততিরা মাতামহীর কুল, বংশমর্যাদা, এমন কি সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়।

উপজাতিসমাজে বিবাহের বেলায় বয়সকে সকল সময় প্রাধান্য দেওয়া হয় না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাহার বিধবাকে গারো-জামাতা বিবাহ করিতে পারে আর পিতার মৃত্যুর পর বিধবা বিমাতাকে লাখের যুবক বিবাহ করিতে পারে।

সৃষ্টির প্রথম হইতে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার বিবর্তন ঘটিয়াছে। আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে সহায়হীন দুর্বল মানুষকে স্বাভাবিকভাবে পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইয়াছে। তাই আদি মানুষের প্রথম উপজীবিকা হইল খাদ্য -আহরণ বা -সংরক্ষণ। বিচ্ছিন্ন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী জীবনে খাদ্যসংগ্রহের উপজীবিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা গ্রহণ করে। কালক্রমে পশু-পক্ষী বশ মানানো ও প্রতিপালন মানবসমাজের ইতিহাসে 'এক বিপ্লব আনে। কেবলমাত্র পশুপালনের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি উপজাতিকে বর্তমানে বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতের টোডা উপজাতি মহিষ প্রতিপালন করে। তাহারা কৃষিকার্য করে না। সাইবেরিয়ার চুকচি উপজাতি বল্‌গা হরিণ প্রতিপালন করিয়া থাকে। এইভাবে প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ ধীরে ধীরে জীবকুলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। সৃষ্টিধর্মী মানবমন নানাবিধ আয়ুধ আবিষ্কার করিয়া কৃপণা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ফসল ফলাইল। আরণ্যক যাযাবর মানুষ গৃহী গ্রামীণ মানুষ হইয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইল। কিন্তু সেই আদিম কৃষি ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত ছিল। তাই কৃষিকার্যের তারতম্য লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বা পাহাড় ও জংলা অঞ্চলে এখনও বন্যপ্রথায় চাষ দেখা যায়। ইহাকে আসামের নাগা-কুকীরা 'ঝুম' চাষ বলে, গণ্ড উপজাতিরা 'দাহিয়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। চাষের পদ্ধতি এইরূপ: শীতের শেষে নির্বাচিত জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আগুন ধরানো হয়; বর্ষার প্রারম্ভে ঐ সকল কৃষিক্ষেত্রে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং খন্তা, কোদালি প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা বীজ বপন করা হয়। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া গাছ বাঁচে। একই চাষের জমি একাদিক্রমে দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত ঐ সব উপজাতিরা ব্যবহার করে। তাহার পর নূতন জঙ্গল সংগ্রহ করে এবং সেইখানে ঐভাবে চাষ করিয়া থাকে। এ ছাড়া লাঙ্গল দিয়া চাষ কৃষির আর এক উন্নত অবস্থা। সাঁওতাল, উরাঁও, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীগুলি লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত প্রধান উপজীবিকা ব্যতিরেকে কোনও কোনও আদিবাসী নানাবিধ শিল্পকার্যে রত, বিশেষ করিয়া বিরহড়গণ গাছের ছালের দড়ি তৈয়ারি করে, আসামের কোনও কোনও উপজাতি বাঁশ ও বেতের কাজ বা তাঁতের কাজ করিয়া থাকে। আবার অনেক উপজাতিগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের জন্য রেল লাইনের কুলির কাজ, চা-বাগানের কাজ, শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ —ইত্যাদি জীবিকা গ্রহণ করিয়া নিজ পরিবেশের বাহিরে আসিতে হইয়াছে। মোটকথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে উপজাতিগোষ্ঠীকে তাহার নিভৃত আবাসের মোহ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, কোথাও বা উন্নততর গোষ্ঠীর সহিত প্রতিযোগিতা পর্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে অনেকেই 'জড়োপাসনা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে আদিম মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুনিচয়ের মধ্যে শক্তি বা প্রাণের কল্পনা করিত। জীবনযাত্রায় সফলতার জন্য নানা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়া ঐ সমস্ত অশরীরী বা অতিপ্রাকৃত শক্তি-

গুলির তুষ্টিসাধনের চেষ্টায় নানা ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান রূপ লইয়াছে। নানা প্রকার উৎসর্গ, জড়পূজা, স্তব-স্তুতি বা জাদুমন্ত্র হইল এই ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন প্রকাশ। পরের যুগে সভ্য মানুষ এই ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু দার্শনিক চিন্তা মিশাইয়া এক নূতন রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নীরবে-নিভৃতে আচার-অনুষ্ঠানকারী উপজাতিগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও পৃথিবীর উন্নত ধর্মবিশ্বাসের বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রকে উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাসের অনেক কিছুই বর্তমান হিন্দু ধর্মের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পূজাপদ্ধতির জন্য প্রত্যেক উপজাতিসমাজে বিশেষজ্ঞ আছে। তাহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের উপজাতিগুলির ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মতামত রহিয়াছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'জড়োপাসক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য থাকা হয়ত অসম্ভব নহে। কেননা আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু ধর্মের প্রায় অনেক কিছুই আছে— এই অর্থে ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া তাহাদিগকে হিন্দু বলিলেও আপত্তি হইবার কথা নহে। দীর্ঘদিনের ফলে হিন্দু ধর্ম প্রাক্-আর্য ধর্মসংস্কৃতির মূলে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা ছাড়া হিন্দু ধর্ম নিজ বৈশিষ্ট্যে কঠোর নয় বলিয়া স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার বা অনুষ্ঠান অতি সহজেই ইহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। স্যর হার্বার্ট রিজলি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে বলিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্ম ও জড়োপাসনার মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টানা সম্ভব নয়। এতদ্ভিন্ন উপজাতিসম্প্রদায়গুলিও ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় জে. এইচ. হাটন উপজাতীয় ধর্মসমূহ বলিতে বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের কথা বলিতে চাহেন— তাহাতে জড়োপাসনা ও হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই রহিয়াছে। তাঁহার মতে যতক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসীসমূহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ না করে ও গোরুকে পবিত্র জীব বলিয়া মনে না করে এবং হিন্দু মন্দিরে বিগ্রহের পূজার্চনা না করে ততক্ষণ তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করা সংগত নয়।

যেভাবে তাহাদিগকে বিচার করা হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে অন্য ধর্মের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। বহু আদিবাসী খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। বরং বহু আদিবাসী ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। উরাঁও আদিবাসীদের সমাজজীবনে 'টানাভগত' আন্দোলনের দ্বারা আদি সংস্কারের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। গণ্ড উপজাতির মধ্যে 'সনাতন গান্দ' নামক প্রচার পুস্তিকায় যে আন্দোলন সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয় তাহাতে গো-ব্রাহ্মণ ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। ভীল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠীরা নিজদিগকে 'শবর' অর্থাৎ হিন্দুসমাজের এক শ্রেণী বলিয়া অভিহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই ধর্মবিশ্বাসের ফলে তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বা আচার-আচরণে পরিবর্তনও লক্ষণীয়। এইভাবে উপজাতিসমাজে হিন্দু ধর্মের প্রভাব পরপর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীগুলির নিজস্ব ভাষা রহিয়াছে। কিন্তু নানা অবস্থার চাপে তাহাদের ভাষার স্বকীয়তা নষ্ট হইয়াছে। আঞ্চলিক ভাষা তাহাদের ভাষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করায় তাহাদের প্রাক্তন ভাষার মধ্যেও হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার প্রভাব দেখা যায়। মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৩৪ রকম ভাষা প্রচলিত। সেইগুলি আবার কয়েকটি মূলভাষার অন্তর্গত। মূলভাষা মোন্-খ্মের -এর মধ্যে প্রায় নয়টি উপভাষা আছে। আসামের উপজাতিদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। মুণ্ডারী মূলভাষার মধ্যে প্রায় সাতটি উপভাষা রহিয়াছে। ছোটনাগপুর, মধ্য ভারত ও উত্তর ভারতের উপজাতিদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। দ্রাবিড় মূলভাষার প্রায় পনরটি উপভাষা রহিয়াছে। উড়িষ্যা, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। ভীল, লোধা প্রভৃতি গোষ্ঠী স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার বহু আদিবাসী নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। এখনও বহু আদিবাসীগোষ্ঠী রহিয়াছে যাহাদের ভাষার বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করা হয় নাই। সেই সবগুলির যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইলে ভারতসংস্কৃতির নবমূল্যায়ন সার্থক হইবে। ইহাদের স্তব-স্তুতি বা পূজা-পার্বণের প্রার্থনায় অথবা তাহাদের নিজস্ব সংগীতের মধ্যে ভাষার স্বকীয়তা অনেকাংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্য, বংশানুক্রমিক মৌলিক লক্ষণের জন্য আদিবাসীগোষ্ঠীগুলির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। এই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইল জাতি (রেস্) -বিচারের বিভিন্ন দিক। দৈহিক বা আকৃতিগত লক্ষণ অনেকটা বংশগত। ব্যাপক মিশ্রণ

ও পুনর্মিশ্রণের ফলে বর্ণসংকর মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়। ভারতবর্ষের উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষভাবে আসাম অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে মঙ্গোল প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্য ভারত, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিড় প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ গোষ্ঠী, যথা দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতির মধ্যে ককেশীয় প্রভাব রহিয়াছে। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিতেছেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে নানা সংজ্ঞায় উপজাতিদের বিভাগ করা হইয়াছে। সর্বত্রই একপ্রকার সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয় নাই। আসাম অঞ্চলের ভোটবর্মী ও মঙ্গোলজাতির প্রভাবান্বিত গোষ্ঠীগুলিকে আদিবাসী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে গ্রামগোষ্ঠীমূলক পৃথক সংস্কৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বোম্বাই অঞ্চলে পর্বত বা অরণ্য -বাসী, অনগ্রসর অধিবাসীদিগকে আদিবাসী বলিয়া গণ্য করা হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলেও সেইরূপ। পশ্চিম বাংলায় আদিবাসীগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত সম্প্রদায়গুলিকে (যদিও তাহারা ভাষা বা সংস্কৃতি হারাইয়া থাকে) আদিবাসী বলা হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে তাহাদের জীবনযাপনের ও সমাজজীবনের নানা তথ্য অনুসন্ধান করার পর তাহাদিগকে তফসিলী উপজাতি বলিয়া গণ্য করা হয়। কেননা অনগ্রসর বলিয়া উপজাতিগুলিকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষভাবে লেখাপড়া শিখিবার জন্য, চাকুরি ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের বিভিন্ন চেষ্টায় সরকার হইতে তাহাদের জন্য খরচ করা হয় বলিয়া তাহাদিগকে তফসিলী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে উপজাতিসম্প্রদায়গুলির অবস্থানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান অঞ্চলে প্রায় ৩ কোটি উপজাতিগোষ্ঠী বসবাস করিয়া আসিতেছে : ১. উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল : হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিস্তৃত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল হইল লেপচা, রাভা মেচ, কাছাড়ী, মিকির, গারো, খাসিয়া, নাগা, কুকী, আবর আদি, মিশমী, দফলা, লুশাই প্রভৃতি খণ্ডজাতির বাসস্থান। ২. মধ্য ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল : উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। আবার দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চল হইতেও এই অঞ্চল পৃথক। এই অঞ্চল বিন্ধ্যের পর্বতসংকুল প্রদেশ, অথবা সাতপুরা, আরাবল্লী ও ছোটনাগপুরের অরণ্যাবৃত অঞ্চল লইয়া গঠিত। পূর্ব দিক হইতে আরম্ভ করিলে শবর, গদবা, জুয়াং, ফড়িয়া, কন্দ, হো, ভূমিজ, সাঁওতাল, উরাঁও, মুণ্ডা, গণ্ড, ভীল, কইগা, মুড়িয়া ও মাড়েয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি অন্যতম। ৩. দক্ষিণ অঞ্চলের আদিবাসী অঞ্চল প্রধানতঃ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারতের পর্বতাকীর্ণ অঞ্চল বুঝায়। এই অঞ্চলে চেনচু, টোডা, বাডাগা, কোটা, পানিয়ান, ইরুলা, কুরুম্বা, কাডার, কানিকার প্রভৃতি উপজাতির বাস। ইহা ছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আন্দামানী, জারাওয়া, ওঙ্গী প্রভৃতি উপজাতির বাস।

মোটকথা, যতদূর সম্ভব নৈসর্গিক পরিবেশে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিয়া এই আদিবাসীগোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও উপজাতি-সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক অগ্রগতি ও স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন কর্মযোজনা তাহাদের জীবনসংস্কৃতিতে নূতন চিন্তা ও প্রভাব আনিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই এই সমস্ত আদিবাসীদের সমাজজীবনে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুসমাজের নানা আকর্ষণ তাহাদের বস্তুকেন্দ্রিক জীবনধারাকে চঞ্চল করিয়া দিতেছে। জীবনযাত্রার দ্রুত পরিবর্তন আদিবাসীসমাজের মানসলোকে নানা আলোকপাত করায় তাহাদের প্রাচীন সমাজপরিধির বিলুপ্তিসাধন, এমন কি আদিবাসী-সমাজবৈশিষ্ট্য বিলোপন দ্রুত ঘটিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর বঙ্গের মেচ উপজাতিগুলি রায় বা চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। আকৃতিবৈষম্য না থাকায় স্বল্পকালের মধ্যে তাহারা হিন্দুবর্ণাশ্রমে অতি সহজেই আসন করিয়া লইবে সন্দেহ নাই। কোনও কোনও আদিবাসীগোষ্ঠী 'কচ্ছপ' গোত্রকে 'কাশ্যপ' (হিন্দুদের কশ্যপ মুনি) গোত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কোনও কোনও আদিবাসীগোষ্ঠী বিশেষভাবে সাড়া দিতেছে। এইভাবে তাহাদের সমাজপরিধির ক্ষেত্র বর্ধিত হইতেছে। এই পরিবর্তন হয়ত সত্বর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে উন্নীত করিবে ও ঐক্য-সংহতি দৃঢ় করিবে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

আদিবুদ্ধ বজ্রযানের আবির্ভাবের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে আদিবুদ্ধবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। বজ্রযানীরা আদি অর্থাৎ একজন প্রথম বুদ্ধের কল্পনা করেন এবং এই আদিবুদ্ধই বজ্রযানীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইঁহাকে নিরঞ্জন, নিরাকার ও নিরাধার -রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত বজ্রযানী গ্রন্থ 'গুহ্যসমাজ'-এ আদিবুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। কালচক্রযানে আদিবুদ্ধের একটি বিশিষ্ট স্থান দেখিয়া মনে হয় এই মতবাদ উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরবর্তী

কালের এই বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির মতে আদিবুদ্ধই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ এই আদিবুদ্ধ হইতেই উদ্ভূত। অনুমান করা হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই এই আদিবুদ্ধ মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম মতভেদজনিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর। ঐ দিবস কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্তীগণ রামমোহন রায় -প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তদীয় মতাবলম্বীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামক নূতন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন করেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এই নূতন সমাজ হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার (আদি, নববিধান ও সাধারণ) মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত মূল ব্রাহ্মসমাজের ভাবগত ঐক্য সর্বাধিক। উদার সর্বজনীন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়াও রামমোহন বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সহিত নিজের বা ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাহেন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের এই আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্ম ধর্মের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদকে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করেন। অবশ্য একটি বিষয়ে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মৌলিক পার্থক্য আছে। রামমোহনের কালে ব্রাহ্মসমাজ কার্যতঃ সর্বসম্প্রদায়ের উদার একেশ্বরবাদীগণের মিলনক্ষেত্ররূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৭৬৫ শকাব্দ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি একুশজন ধর্মানুরাগী যুবক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে দীক্ষিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পত্তন হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মসম্প্রদায়ের রূপ গ্রহণ করে। আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্মকালে এই নবরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

সামাজিক মতামতে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে উদার হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখাদ্বয়ের তুলনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল। সমাজসংস্কারের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ইঁহারা এই বিষয়ে ধীরপদে চলিবার পক্ষপাতী। ভিতর হইতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ইঁহাদের আশঙ্কা ছিল আইনের সাহায্যে বা অন্য কোনও বাহ্য উপায়ে কোনও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাইলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। এই বিষয়েও রামমোহন রায়ের সহিত এই শাখার পরিচালকবর্গের মনোভাবের ঐক্য ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সহিত মৌলিক মতপার্থক্য দেখা যায়। বস্তুতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীগণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল প্রধানতঃ দুইটি কারণে। প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র প্রমুখ অগ্রসর দল জাতিভেদের বাহ্য চিহ্ন উপবীত ধারণ করা অন্যায় মনে করিতেন এবং উপবীতধারী কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কার্য করিতে দিতে সম্মত ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতার মত ছিল, যোগ্যতা থাকিলে উপবীতধারী বা উপবীতত্যাগী যে কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ অগ্রসর দল ব্রাহ্ম ধর্মের সর্বজনীনতার উপর অধিক জোর দিতেন, হিন্দু ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের বিশেষ সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের তাহা মনঃপূত হয় নাই। স্মরণ রাখা উচিত, এবংবিধ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের নিরোধ প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন। জাতিভেদ-প্রথাও যে কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে ইহাও এই সমাজের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করিতেন।

প্রতি বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের ‘ব্রহ্মোপাসনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে এই উপাসনার ক্রমগুলি দেওয়া হইয়াছে। সেইগুলি এই: অর্চনা, প্রণাম, সমাধান, ধ্যান, স্তোত্র, প্রার্থনা, স্বাধ্যায় ও উপসংহার। সাধারণতঃ সামাজিক উপাসনায় স্বাধ্যায় ও উপসংহার অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে আচার্য কর্তৃক একটি উপদেশ বিবৃত হয়। সংগীত এই উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ‘ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি’ গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক অনুষ্ঠানসকল নির্বাহ হইয়া থাকে। অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস না করিলেও আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুগামীবৃন্দ বেদ, উপনিষদ, গীতা, পরবর্তী মনু প্রভৃতি সংহিতাদি, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকেন।

বঙ্গ দেশে একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মবাদের প্রচার ভিন্ন স্বদেশানুরাগের সঞ্চার, জাতীয়তার উদ্দীপন, সাহিত্যসৃষ্টি ও রাগাশ্রয়ী ব্রহ্মসংগীতের ব্যাপক প্রচলনে আদি ব্রাহ্মসমাজের দান অপরিসীম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় এবং কৃতী পুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে ইহার কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। ইহার ভূতপূর্ব সম্পাদকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুযায়ী উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। 'ব্রাহ্মসমাজ' দ্র।

দ্র অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৭৮৬ শক; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্ম, নবম সংস্করণ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী; G. S. Leonard, *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta, 1879; Sibnath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, vol. 1, Calcutta, 1911; Rajnarayan Basu, *The Adi Brahmo Samaj as A Church*, Calcutta, 1873.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আদিলশাহী বংশ (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রী) দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের মুসলমান রাজবংশ। ইউসুফ আদিল খাঁ (১৪৯০-১৫১০ খ্রী) এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পশ্চিম এশিয়া হইতে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসেন। পরে নিজ প্রতিভাবলে বাহমনী রাজ্যের অন্তর্গত বিজাপুরের শাসনকর্তা হন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। পারস্য, তুর্কীস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে বহু জ্ঞানী-গুণী ও শিল্পীকে তিনি রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগরের রাজার সহিত অনেক যুদ্ধ হয়। প্রথমে তিনি পরাজিত হন, পরে শাঠ্যনীতি অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে আটজন নৃপতি রাজত্ব করেন— ইস্মাইল আদিলশাহ্ (১৫১০-১৫৩৪ খ্রী), মল্লু আদিলশাহ্ (১৫৩৪ খ্রী), ১ম ইব্রাহিম আদিলশাহ্ (১৫৩৪-১৫৫৮ খ্রী), ১ম আলী আদিলশাহ্ (১৫৫৮-১৫৮০ খ্রী), ২য় ইব্রাহিম আদিলশাহ্ (১৫৮০-১৬২৭ খ্রী), মহম্মদ আদিলশাহ্ (১৬২৭-১৬৫৭ খ্রী), ২য় আলী আদিলশাহ্ (১৬৫৭-১৬৭২ খ্রী) এবং সুলতান সেকেন্দর (১৬৭২-১৬৮৬ খ্রী)। ইস্মাইল আদিলশাহ্ বিজয়নগর, আহ্মদনগর, বিদর এবং গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আলী আদিলশাহ্ রামরাজার সহায়তায় আহ্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে আহ্মদনগর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত মিলিত হইয়া তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের শক্তি বিনষ্ট করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিলশাহ্ সুযোগ্য এবং জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আহ্মদনগরের সুলতান পরাজিত ও নিহত হন এবং বিদর বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহারই নির্দেশে ফেরিশ্তা ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিলশাহের সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠে; এবং ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র কোঙ্কন প্রদেশ কাড়িয়া লয়। এই সময়ে শাহ্জাহানের সহিতও বিজাপুরের সংঘর্ষ বাধে। পরিশেষে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বংশের রাজত্বকাল স্থাপত্যশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজনকান্তি বিশ্বাস

আদিশূর গৌড়ের রাজা। বাংলা দেশে কুলশাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানা জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিবরণ, বিভিন্ন পরিবারের বংশপরিচয় প্রভৃতি পাওয়া যায়। মহারাজা আদিশূরকে কেন্দ্র করিয়াই এই সমুদায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী বিভিন্ন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ: আদিশূর একটি যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন কিন্তু গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হয়। বাংলা দেশে আগমনহেতু কনৌজের ব্রাহ্মণসমাজ এই পাঁচ জনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ফলে ইঁহারা যাহাতে বাংলা দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আদিশূর পাঁচ জনকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করিলেন। বাংলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী ব্যতীত আর যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা সকলেই এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, বাংলার কুলীন কায়স্থগণ তাঁহাদের মধ্যে চারি জনের বংশধর।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া

মনে হয় না। প্রথমতঃ বাংলা দেশে আদিশূর নামক কোনও রাজা ছিলেন, অদ্যাবধি ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কুলশাস্ত্রে আদিশূরের বংশাবলী ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়। কোনও কোনও কুলশাস্ত্রমতে আদিশূর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, কোনও গ্রন্থ অনুসারে তিনি সমগ্র বঙ্গ দেশ ও উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। কোনও কুলগ্রন্থে আদিশূরকে বল্লাল সেনের মাতামহ বলা হইয়াছে, অন্যত্র বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রকুলজাত বলিয়া বর্ণিত। তিনি কোন্ সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন সে বিষয়েও বিভিন্ন মত আছে। সর্বপ্রাচীন তারিখ ৬৫৪ শকাব্দ। সর্বাপেক্ষা আধুনিক ৯৯৯ শকাব্দ। এই দুই সীমার মধ্যে আরও বহু তারিখ আছে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা দেশে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে ৬৫৪ শকাব্দে বা তাহার পরে কোনও সময়েই বাংলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল, বিভিন্ন কুলগ্রন্থে তাহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা, চান্দ্রায়ণ ব্রত, অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অনাবৃষ্টি নিবারণকল্পে বাজপেয় যজ্ঞ, প্রাসাদোপরি গৃধ্রপতনজনিত অমঙ্গল দূর করিবার জন্য ভগবৎপ্রীতি-সাধনের ইচ্ছা ইত্যাদি। এই সমুদায় বিভিন্ন মত হইতে মূল কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।

তৃতীয়তঃ আদিশূরের কাহিনী বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আদিশূরের পূর্বে বাংলা দেশে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহাদের বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছে— আর তিনি যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশেই বর্তমানে বাংলা দেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকিলে এইরূপ অস্বাভাবিক অনুমান বিশ্বাস করা যায় না।

চতুর্থতঃ আদিশূর কর্তৃক আনীত যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাংলার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ, কুলশাস্ত্রে তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। বাচস্পতি ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণের মতে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ভট্ট-নারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, হর্ষ ও বেদগর্ভ। বারেন্দ্র কুলাচার্যগণের মতে তাঁহাদের নাম নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর। এডুমিশ্র, হরিমিশ্র, দেবীবর প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কুলাচার্যগণের মতে উক্ত ব্রাহ্মণগণের নাম ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, তিথিমেধ (অথবা মেধাতিথি) ও সৌভরি।

পঞ্চমতঃ যে সমুদায় কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনটিই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু এডুমিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্র -প্রণীত মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরের কোনও উল্লেখ নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সংগৃহীত হরিমিশ্রের কারিকায় আদিশূরের উল্লেখযুক্ত শ্লোক কয়টি প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রের কারিকা একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ। কিন্তু লালমোহন বিদ্যানিধি, মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিত পূর্বে হরিমিশ্রের কারিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই সমুদায় শ্লোকের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বসু মহাশয় তাঁহার জীবিতকালে হরিমিশ্রের পুথিখানি বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও সাধারণের দৃষ্টিগোচর করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমুদায় সংগৃহীত পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করে। ইহার মধ্যে হরিমিশ্রের কারিকাও আছে, কিন্তু তাহাতে আদিশূর সম্বন্ধীয় কোনও শ্লোকই নাই।

এই সমুদায় বিবেচনা করিলে আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। সুতরাং এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বাহির হইতে একাধিক ব্রাহ্মণ আসিয়া বাংলাদেশে বসবাস করিয়াছিলেন ইহা অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। কারণ প্রাচীন বহু শিলালিপিতে ব্রাহ্মণদের এইরূপ দেশান্তরে প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশ হইতেও যে বহু ব্রাহ্মণ অন্যত্র গিয়া বসবাস ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, প্রাচীন লিপিতে তাহারও উল্লেখ আছে। আদিশূর নামে কোনও রাজা হয়ত এদেশে ছিলেন, ইহা অসম্ভব মনে করিবার কোনও যুক্তি নাই। কিন্তু আদিশূরের যে কাহিনী কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করা যায় না।

দ্র রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, রাজশাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ; নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, প্রথমাংশ, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধনির্ণয়, কলিকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ; মহিমাচন্দ্র মজুমদার, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ', ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, কলিকাতা; R. C.

Majumdar ed., *The History of Bengal*, vol. I, Dacca, 1943.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আদি সপ্তগ্রাম সপ্তগ্রাম দ্র

আদ্যশ্রাদ্ধ প্রেতের (মৃতের) অশৌচকাল শেষ হইবার পরদিন যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা আদ্যশ্রাদ্ধ বা আদ্য একোদ্দিষ্ট। এই শ্রাদ্ধের একটি মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য অন্নের সহিত আমিষ প্রদান। পুরুষ ও সধবা নারীর স্থলে শ্রাদ্ধান্নের সহিত পোড়া মাছ বা কোথাও রান্না-করা মাছ এবং বিধবার স্থলে পোড়া কাঁচা কলা দেওয়ার প্রথা আছে। আদ্যশ্রাদ্ধের দিন পূর্বাহ্নে চতুর্ধাশান্তি বা চার রকম শান্তিমন্ত্র পাঠ, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত বা স্বর্ণদান, তিলকাঞ্চনদান এবং শক্তি অনুসারে ষোড়শ দান (ভূমি আসন জল বস্ত্র প্রদীপ অন্ন তাম্বূল ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গাভী স্বর্ণ রৌপ্য), ছয় দান (ভূমি আসন জল বস্ত্র প্রদীপ অন্ন) বা তিন দান (অন্ন জল বস্ত্র) দান -এর নিয়ম আছে। এই কার্যগুলি আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত না হইলেও সাধারণতঃ ইহার সঙ্গেই বৃষোৎসর্গ, চন্দনধেনু দান, দানসাগর, মহাশয্যাদান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। প্রেতত্ব মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের পর একবৎসর পর্যন্ত প্রতি মাসে মৃত্যুতিথিতে মাসিক একোদ্দিষ্ট, ছয় মাস পরে প্রথম ষাণ্মাসিক, বৎসরান্তে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করণীয়। সপিণ্ডীকরণে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডের সহিত প্রেতের পিণ্ডের সমন্বয়সাধন করা হয়। পতিপুত্রহীনা নারীর সপিণ্ডীকরণ নাই। প্রেতশ্রাদ্ধ অর্থাৎ উল্লিখিত সমস্ত শ্রাদ্ধ মুখ্যাধিকারীরই কর্তব্য— ইহা প্রতিনিধির দ্বারা করা যায় না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আন্‌ডেরসেন, হান্‌স খ্রিস্টিয়ান (১৮০৫-১৮৭৫ খ্রী) ডেনমার্কের বিখ্যাত রূপকথাকার। জন্ম ওদেন্‌স-এর এক দরিদ্র পরিবারে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ এপ্রিল। পিতা ছিলেন চর্মকার, মা রজকিনী। ১৮১৬ সালে পিতার মৃত্যু ঘটিলে মাতা পুনরায় বিবাহ করেন। ভাবুক প্রকৃতির এই নিঃসঙ্গ বালক তখন নিঃস্ব ও নির্বান্ধব অবস্থায় রাজধানী কোবেনহাভ্‌নে চলিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ খ্রী)। নাট্যবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল আবাল্য। তাই এখানে রাজকীয় নাট্যালয়ে যোগ দিয়া অভিনয়ে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাশা সফল হয় নাই, উক্ত নাট্যালয় তাঁহাকে অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। তবে, নাট্যশালার অন্যতম পরিচালক ইয়োনাস কোলিন কুরূপ এই গ্রাম্য বালকটির অধ্যয়নের সুযোগ করিয়া দেন। বহু বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া স্ল্যাএল্‌স-এর এক বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষাপর্বের (১৮২২-২৮ খ্রী) সমাপ্তি ঘটে।

১৮২২ সালেই আন্‌ডেরসেনের প্রথম গ্রন্থ 'জেন্‌ফোএর-ডেট্‌ ভেড্‌ পাল্‌নাটোকেস্‌ গ্রাভ্‌' (পালনাটোকের কবরে ভূত) প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতাও তিনি লেখেন ছাত্রাবস্থায়। 'ফোড্‌রেইসে ফ্রা হোলমেন্‌স কানাল টিল্‌ ওস্‌টপ্যিন্‌টের্‌ আফ্‌ আমাগের' (হোলমেন্‌স খাল হইতে আমাগেরের পূর্ব পর্যন্ত পদচারণা) নামক কৌতুক উপাখ্যানটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮২৯ খ্রী) তিনি নামজাদা লেখক হইয়া উঠিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে বাসকালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ইম্‌প্রোভিসাটোরেন্‌ (সে আপনি পারে) এবং রূপকথার চারটি গল্প 'এভেন্‌ট্যির ফোর্‌টাল্‌টে ফোর বোর্ন' (ছোটদের জন্য রূপকথা) প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ ও ১৮৪৫ সালে তাঁহার রূপকথার আরও দুইটি খণ্ডের সূত্রপাত হয়। যে ১৬৮টি রূপকথা তিনি লিখিয়াছেন, তার দশ-বারটি মাত্র প্রচলিত উপকথার পুনর্বিন্যাস, বাকি সবই তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি। অনেকগুলি রচনায় তাঁহার আত্মজীবনের মেদুর প্রতিচ্ছায়া আছে। ঘরোয়া লাবণ্যময় ভাষায় রচিত এই রূপকথাগুলি কৌতুকে ও আমোদে ভরপুর, শিশু ও বয়স্ক পাঠকের অফুরন্ত বিনোদের আকর। সাহিত্যের প্রায় সকল প্রকরণেই তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রখর, কবিতা গান নাটক উপন্যাস ভ্রমণকথা স্মৃতিচিত্র এ সবই তাঁহার রচনাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি রূপকথাগুলিরই উপর নির্ভরশীল।

আন্‌ডেরসেনের প্রিয় নেশা ছিল দেশভ্রমণ। ইওরোপের প্রায় সব দেশেই তিনি ঘুরিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়াছেন দুই বার, সেখানে তাঁহার অন্তরঙ্গতা হয় চার্লস ডিকেন্‌স-এর সঙ্গে। ইটালী ছিল তাঁহার প্রিয় দেশ। 'হান্‌স আন্‌ডেরসেন সংগ্রহশালা' নামে ওদেন্‌স-এর এক বিচিত্রাভবনে এই পরিব্রাজকটির ব্যাগ আর স্যুটকেস, ছাতা আর ছড়ি, টুপি আর জুতা একত্র সাজানো আছে। ইহা যেন চিরপথিক আন্‌ডেরসেনের যোগ্য প্রতীক। তাঁহার একাধিক ভ্রমণকথা এবং স্মৃতিচিত্রে এই সব পর্যটনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তার মধ্যে 'ই স্পানিএন্‌' (স্পেনদেশে), 'এট্‌ বেসোগ ই পর্টুগাল' (পর্তুগালে ভ্রমণ), 'মিট্‌ লিভ্‌স এভেন্‌ট্যির' (আপনকথা রূপকথা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আন্‌ডেরসেনের গল্প তাঁহার জীবদ্দশাতেই অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগেও

তাঁহার গল্পের অনুবাদ করেন (১৮৫৭ খ্রী) মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। উত্তরকালে শিবনাথ শাস্ত্রী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, মণীন্দ্রলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি আন্ডেরসেনের রূপকথাগুলির বঙ্গানুবাদ করেন। প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ড, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনায় আন্ডেরসেনের প্রভাব অনুভব করা যায়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের এক বিরাট সংবর্ধনায় আন্ডেরসেনকে উপাধি দেওয়া হয় 'নগরীর স্বাধীন আত্মা'। ইহা তাঁহার যোগ্য উপাধি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগস্ট কোবেনহাভ্নে এক বন্ধুর গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। গৌতমের জন্মদিবসেই তাঁহার খুল্লতাত অমিতোদনের ঔরসে আনন্দের জন্ম হয়। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির দ্বিতীয় বর্ষে ভদ্দীয়, অনুরুদ্ধ, ভগু প্রভৃতিসহ সংঘে যোগদান করিয়া তিনি বুদ্ধ কর্তৃক প্রব্রজিত হন। পুণ্ণমন্তানিপুত্তের নিকট ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি স্রোতাপন্ন হন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরে বিশ বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধের কোনও নির্দিষ্ট পরিচারক ছিল না। স্বেচ্ছায় পরিচর্যাকারীদের পরিহার করিয়া আনন্দকে এই ভার গ্রহণ করিতে বলা হইলে তিনি কয়েকটি শর্ত আরোপ করিলেন। বুদ্ধ ইহাতে স্বীকৃত হইলে আনন্দ তাঁহার পরিচর্যার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিন পরিচর্যা করিয়া নিশাকালেও বারংবার গন্ধকুঠি পরিবেষ্টন করিতেন। আনন্দ ছিলেন অপূর্ব শ্রুতিধর। বুদ্ধের উপদেশাবলী তিনি অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখিতেন। এইজন্য তাঁহাকে 'ধম্মভণ্ডাগারিক' বলা হইত। বুদ্ধের সেবায় রত থাকিয়া তিনি সকলকেই বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা করিয়া সকলের সংশয় দূর করিতেন। আনন্দেরই প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণী সংঘ গঠিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮১৯-১৮৭৫ খ্রী) চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে ইহার জন্ম। পিতা গৌরহরি চূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা। তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশীতে যে চারি জন যুবককে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। যুবকচতুষ্টয়ের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরই বেদবেদান্তে সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। ১৮৪৪-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ তিনি কাশীতে অথর্ববেদ ও বেদান্ত চর্চা করেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সভা উঠিয়া গেলে তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক এবং আচার্যরূপে কার্য করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, তাহার স্বপক্ষে তিনি 'ব্রাহ্ম বিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা?' পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। তদ্‌রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ—'বৃহৎকথা' ১ম ও ২য় খণ্ড; মহাভারতীয় 'শকুন্তলোপাখ্যান', 'দশোপদেশ'; সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদান্তসার'; 'বেদান্তদর্শন' ১ম খণ্ড; 'বেদান্তদর্শন অধিকরণমালা'; সটীক সংস্কৃত গ্রন্থ 'ভগবদ্গীতা', 'মহা-নির্বাণতন্ত্রম্' (পূর্বকাণ্ড)। ইহা ব্যতীত তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্গত 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা'-র কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলিকাতা, ১৯৬২; যোগেশচন্দ্র বাগল, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯৫, কলিকাতা, ১৯৫৬।

যোগেশচন্দ্র বাগল

আনন্দচন্দ্র মিত্র (আনুমানিক ১৮৫৪-১৯০৩ খ্রী) বিক্রম-পুর জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে আনন্দচন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র। আনন্দচন্দ্র প্রথম জীবনে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ও শেষ জীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকুরি করেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আনুমানিক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে একটি গুপ্ত চক্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সদস্য বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তী জীবনে বৃন্দাবনের সুবিখ্যাত সন্তদাস বাবাজী), গগনচন্দ্র হোম ও কালিশংকর শুকুলের সঙ্গে একত্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ও নিজের বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া কবি আনন্দচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের ও জীবনব্যাপী ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম প্রতিজ্ঞা ছিল, জীবনে যতই দুঃখ-কষ্ট আসুক, কোনও দিন বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবেন না। শেষ প্রতিজ্ঞা ছিল, জীবনে কখনও সঞ্চয় করিবেন না, সংসার পালন করিয়া উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকিবে, তাহা সকলই দেশের ও দশের কাজে

ব্যয় করিবেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দচন্দ্র প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক 'মিত্রকাব্য' ১ম খণ্ড (১৮৭৪ খ্রী)। তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের নাম : 'মিত্রকাব্য' ২য় খণ্ড (১৮৭৭ খ্রী); 'হেলেনাকাব্য' ১ম খণ্ড (১৮৭৬ খ্রী), ২য় খণ্ড (১৮৭৮ খ্রী); 'রাজকুমারী' (১৮৭৯ খ্রী); 'মাতৃধর্ম' (১৮৮১ খ্রী); 'দুই ভাই' (১৮৮৫ খ্রী); 'ভজহরি' (১৮৮৬ খ্রী); 'ভারতমঙ্গল' পূর্বখণ্ড (১৮৯৪ খ্রী); 'প্রেমানন্দ কাব্য' (১৮৯৭ খ্রী); 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' (১৯০০ খ্রী); 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা' (১৯০১ খ্রী); 'মাতৃমঙ্গল' (১৯০৩ খ্রী)। ইহা ছাড়া গদ্যে ও পদ্যে তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত একাধিক রাগপ্রধান সংগীত আছে।

মিত্রকাব্য ও হেলেনাকাব্যেই আনন্দচন্দ্র সর্বপ্রথম কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পূর্বে এবং বিশেষভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরে বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনার দিকে একটা ঝোঁক আসিয়াছিল। ঐ সব মহাকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে কবি আনন্দচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। নবীনচন্দ্র সেন ছাড়া অন্য প্রায় সকল মহাকাব্য-রচয়িতার উপাদান প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনী। আনন্দচন্দ্রের মহাকাব্য 'ভারত-মঙ্গল' পূর্বখণ্ড আধুনিক যুগ লইয়া রচিত। ইংরেজ আমলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের পরে কবির মতে যে সামাজিক 'মহাবিপ্লব' ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার বিষয়বস্তু। এই মহাকাব্যের উত্তরখণ্ড আর তিনি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইনি বাল্যকাল হইতেই অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। ইঁহার জীবিতকালেই কোনও কোনও পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল।

যোগানন্দ দাস

আনন্দবর্ধন কহ্লণকৃত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের একটি শ্লোকে আচার্য আনন্দবর্ধনকে কাশ্মীরাধিপতি অবন্তিবর্মার সম-সাময়িকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—

মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্মণঃ॥

—রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৪

অবন্তিবর্মার রাজত্বকাল ঐতিহাসিকগণের মতে ৮৫৫-৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং আনন্দবর্ধন যে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্য ভাগে কাশ্মীর দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। আনন্দবর্ধন তাঁহার 'দেবীশতক'-সংজ্ঞক স্তোত্রকাব্যে 'নোণসুত' নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের কোনও কোনও পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকাতেও 'নোণোপাধ্যায়াত্মজ' (ক্বচিৎ 'জোনো-পাধ্যায়') -রূপে তাঁহার পরিচয় লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দবর্ধন একাধারে কবি, দার্শনিক ও সাহিত্য-মীমাংসক ছিলেন। 'দেবীশতক', 'বিষম-বাণলীলা', 'অর্জুন-চরিত' প্রভৃতি রচনা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরি-চায়ক। তন্মধ্যে 'বিষম-বাণলীলা' প্রাকৃতভাষায় রচিত। আনন্দবর্ধন তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের বহু স্থলে স্বকৃত শ্লোক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। দার্শনিক গ্রন্থ রচনার দ্বারাও যে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও দুর্লভ নহে। কেননা, অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁহার 'লোচন'-টীকায় আনন্দবর্ধনকে 'তত্ত্বালোক' নামক অদ্বৈততত্ত্ব-প্রতিপাদক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি-বিরচিত বৌদ্ধন্যায়বিষয়ক 'প্রমাণ-বিনিশ্চয়' নামক গ্রন্থের উপর আচার্য ধর্মোত্তর-রচিত 'প্রমাণ-বিনিশ্চয়-টীকা' নামক যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে, আনন্দবর্ধন তদুপরি 'ধর্মোত্তমা' নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা অভিনবগুপ্তের উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু আনন্দবর্ধনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নামক সাহিত্যবিচারসম্বন্ধীয় নিবন্ধ। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন'-টীকার এক স্থলে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন : "স আনন্দবর্ধনাচার্য এতচ্ছাস্ত্রদ্বারেণ সহৃদয়-হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠাং দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি।"

'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থখানি চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত— একটি কারিকা অংশ অপরটি বৃত্তি অংশ। বৃত্তি অংশের রচয়িতা যে আচার্য আনন্দবর্ধন, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। তবে কারিকা অংশের প্রণেতা প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদের এখনও পর্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। অধ্যাপক কানে, সুশীল-কুমার দে প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কারিকাকার ও বৃত্তিকারের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন'-টীকার নানা স্থানে কারি-কাকার ও বৃত্তিকারের উক্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সেই সকল উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কানে ও দে মহোদয় তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৃত্তিকার আনন্দবর্ধনের

আনন্দবর্ধন

আবির্ভাবের বহু পূর্বেই ধ্বনিকারিকাগুলি রচিত ও আলোচিত হইয়াছিল। এই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে কাব্যতত্ত্বজ্ঞ বিদগ্ধ সামাজিকগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল, 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রথম কারিকাতেই ('কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ') এবং তদুপরি অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-ব্যাখ্যায় তাহা সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। তবে ধ্বনিকারিকাগুলিতে কারিকাকারই সর্বপ্রথম সেই সকল প্রচলিত মতবাদকে একটি পরচ্ছিন্নরূপে শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন এবং আনন্দবর্ধন তাঁহার 'আলোক' নামক বৃত্তি গ্রন্থে সেগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। আনন্দবর্ধন বৃত্তি অংশে যে সকল 'সংক্ষেপ-শ্লোক', 'সংগ্রহ-শ্লোক', 'পরিকর-শ্লোক' উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাও অনুমান করা নিতান্ত অনুচিত হইবে না যে, আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবের পূর্বেও ধ্বনিকারিকাগুলির পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল এবং সহৃদয়গণ ঐ সকল কারিকার তাৎপর্য 'সংক্ষেপ-শ্লোক' প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিশদভাবে প্রকাশ করিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন। সুতরাং কারিকাকারই প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন বৃত্তিকার মাত্র। এই কারিকাকার প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে সোভানি প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার নাম 'সহৃদয়' ছিল, এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নানা কারণে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে, আর একদল পণ্ডিত আছেন যাঁহারা আনন্দবর্ধনকেই কারিকা ও বৃত্তি— উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় তাঁহার এক প্রবন্ধে এই উভয় গ্রন্থের সমানকর্তৃকত্ব সিদ্ধান্ত নানা যুক্তির সাহায্যে অতি নিপুণভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। যাহাই হউক, এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা মনে রাখা দরকার যে, পরবর্তী প্রায় সকল আলংকারিকই— যেমন মহিমভট্ট, রাজশেখর, রুয্যক, হেমচন্দ্র, ক্ষেমেন্দ্র, জয়রথ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি— আনন্দবর্ধনকেই 'ধ্বনিকার' বা 'ধ্বনিকৃৎ' রূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই কারিকা ও বৃত্তি উভয় অংশের রচয়িতা রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কারিকাকার প্রকৃতপক্ষে যিনিই হউন না কেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না যে, বৃত্তি অংশ রচিত না হইলে ধ্বনিবাদের নিগূঢ় রহস্য ও কাব্যবিচারে ইহার অনন্যসাধারণ মহিমা বিদগ্ধ-সমাজে এইরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইতে পারিত না।

'ধ্বন্যালোক'-এর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা কঠিন। তথাপি দিগ্‌দর্শনরূপে চারিটি উদ্দ্যোতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করা যাইতেছে। প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনিকার অভাববাদী-গণের সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিয়া 'ধ্বনি'র লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা যে অভিধা, লক্ষণা প্রভৃতি পূর্বাচার্যসম্মত শব্দব্যাপার হইতে বিলক্ষণ তাহাও নানা যুক্তি এবং উদাহরণ-প্রত্যুদাহরণের সাহায্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধ্বনি যে উপমা রূপক প্রভৃতি কাব্যশোভাকর ধর্মসমূহের, অথবা শ্লেষপ্রসাদাদি গুণের, বা বৈদর্ভী-গৌড়ীয়া-পাঞ্চালী প্রমুখ রীতির, কিংবা পরুষা-মধ্যমা-ললিতা প্রভৃতি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, ইহা যে সর্বথা অভিনব একটি কাব্যতত্ত্ব এবং ইহাই যে কাব্যের আত্মভূত ধর্ম, তাহাও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আনন্দবর্ধনাচার্য ইহাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই যে, এই সাহিত্যবিষয়ক ধ্বনিবাদ ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের সম্মত 'স্ফোটবাদ' হইতেই সংগৃহীত। সহৃদয় সামাজিকগণ কাব্যের বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থের প্রতি ততখানি আকৃষ্ট হন না, যতখানি ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি হইয়া থাকেন। কেননা, অভিধেয়ার্থ শুধু ধ্বনি বা প্রতীয়মানার্থের উপলব্ধির উপায় মাত্র, যেমন দীপশিখা প্রিয়ার মুখমণ্ডল দর্শনের উপায়।

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের অবিবক্ষিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য রূপে মৌলিক ভেদদ্বয় এবং উহাদেরও আবার—অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য, অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য এবং সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যরূপে অবান্তর-ভেদ উদাহরণাদির সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। রসধ্বনির সহিত পূর্বাচার্যসম্মত রসবদ্ অলংকারের ভেদও বহুবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে। উপমা রূপক প্রভৃতি অলংকার যখন ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সাহায্যে প্রধানভাবে ধ্বনিত হয়, তখন বাচ্য অলংকার হইতে উহাদের কিরূপ বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হয়, তাহাও সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ -সংজ্ঞক ভামহসম্মত গুণত্রয় যে রসধর্ম, অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলংকারের ন্যায় শব্দার্থধর্ম নহে, তাহাও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

তৃতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গ্য অর্থের কত বিভিন্ন ব্যঞ্জকের সাহায্যে অভিব্যক্তি সম্ভব তাহা অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। কোন্ কোন্ ব্যঙ্গ্য পদপ্রকাশ্য, কোন্-গুলিই বা বাক্যপ্রকাশ্য, বর্ণ সংঘটনা প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহায্যেই বা কাহার অভিব্যক্তি সম্ভব— এই সকল বিষয় সুচারুরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই উদ্দ্যোতেই শৃঙ্গারাদি

নবরসের মধ্যে পরস্পর বিরোধের স্বরূপ এবং সেই বিরোধ পরিহারের উপায়ও সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামক দ্বিতীয় কাব্যপ্রকারের স্বরূপ ও ভেদ-নিরূপণও এই উদ্দ্যোতেরই প্রতিপাদ্য। ইহা ছাড়া, ব্যঞ্জনা-ব্যাপার যে অনুমান হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ তাহাও ধ্বনিকার অপূর্ব মনীষার সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন। রস-ভাবার্থ বিবক্ষাশূন্য শব্দালংকার ও অর্থালংকার-প্রধান রচনা, যাহা 'চিত্র' এই সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যে মুখ্যতঃ কাব্যরূপেই স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা যে 'কাব্যানুকার' মাত্র তাহা অবিচলিত কণ্ঠে ধ্বনিকার ঘোষণা করিয়াছেন।

অন্তিম বা চতুর্থ উদ্দ্যোতে কবির প্রতিভার স্পর্শে অতি পুরাতন পূর্ব পূর্ব কবি-বর্ণিত কাব্যার্থও ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া কিভাবে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের আকারে নব-নব রূপে আবির্ভূত হইয়া সহৃদয়চিত্ত হরণ করিতে পারে তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্যদ্বয়ে করুণ ও শান্তরস কিভাবে মুখ্যরূপে ধ্বনিত হইয়াছে এবং অন্য রসসমূহ কেমনভাবে এই দুই রসের প্রতি গুণীভূত তাহা অপূর্ব রসবোধ ও মনীষার সাহায্যে আনন্দবর্ধন আলোচনা করিয়াছেন। সর্বশেষে প্রতিবিম্বকল্প, আলেখ্যপ্রখ্য ও তুল্যদেহিতুল্য— কাব্যবস্তুর এই ত্রিবিধ ভেদের আলোচনার দ্বারা গ্রন্থের সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে।

উপরি-বর্ণিত পরিচিতি হইতে 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের অনন্যসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কে অতি অল্প ধারণাই পাঠকের হৃদয়ে জন্মাইতে পারে। ধ্বনিবাদের বিরোধী আচার্যগণও আনন্দবর্ধনকে কিরূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ 'ব্যক্তিবিবেক'কার মহিমভট্টের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি স্মরণীয় .

ইহ সম্প্রতিপত্তিতোঽন্যথা বা
ধ্বনিকারস্য বচোবিবেচনং নঃ।
নিয়তং যশসে প্রপৎস্যতে যন্
মহতাং সংস্তব এব গৌরবায়॥

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' নামক সুবিখ্যাত অলংকারনিবন্ধে ধ্বনিকারকে অলংকার-শাস্ত্রের প্রমাণপুরুষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন—'ধ্বনিকৃতাম্ আলংকারিকসরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ।'

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদিও ধ্বনিকার বস্তু, অলংকার এবং রস— ধ্বন্যমান অর্থের এই ত্রিবিধ রূপ স্বীকার করিয়াছেন এবং যদিও এই ত্রিবিধ অর্থই কাব্যের আত্মারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, তথাপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে ধ্বনিকারের মতে রসই কাব্যের একমাত্র আত্মারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। রসই 'পরম ব্যঙ্গ্য', রসই কবিকর্মের একমাত্র চরম লক্ষ্য। সেইজন্য ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতের একটি প্রসিদ্ধ কারিকায় বলা হইয়াছে—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

আবার চতুর্থ উদ্দ্যোতের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটিতে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্॥

সুতরাং আনন্দবর্ধনাচার্য-প্রবর্তিত ধ্বনিপ্রস্থান ভরতমুনির রসপ্রস্থানেরই পরিপূরকরূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। তাই ধ্বনিবাদ রসবাদেরই পরিণতি— আচার্য কানের এই মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে।

'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের উপর বর্তমানে অভিনবগুপ্তপাদাচার্য-বিরচিত 'লোচন'-টীকাখানিই কেবল সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। তবে, তাঁহারও পূর্বে 'চন্দ্রিকা' নামে যে আর একখানি টীকা প্রচলিত ছিল এবং তাহা যে অভিনবগুপ্তেরই কোনও অজ্ঞাতনামা এক পূর্ববংশ্য কর্তৃক বিরচিত, ইহা লোচনের বিভিন্ন উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয়—

কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াঽপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥

তবে মহিমভট্টের সময়েও যে এই 'চন্দ্রিকা'-ব্যাখ্যা দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অবতরণিকা শ্লোকটি—

ধ্বনিবর্ত্মন্যতিগহনে স্খলিতং বাণ্যাঃ পদে পদে সুলভম্।
রভসেন যৎ প্রবৃত্তা প্রকাশকং চন্দ্রিকাদ্যদৃষ্ট্বৈব॥

এই প্রাচীন টীকাটি আবিষ্কৃত হইলে 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের আলোচনার উপর অনেক নূতন আলোক-সম্পাত হইতে পারে।

দ্র P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, 1951; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, vols. I & II, Calcutta, 1960.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

আনন্দময়ী (১৭৫২-১৭৭২ খ্রী) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

পিতার নাম লালা রামগতি সেন। শৈশবেই আনন্দময়ী বিদ্যাশিক্ষায় তীব্র অনুরাগ ও মেধার পরিচয় দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহারাজা রাজবল্লভ একবার রামগতি সেনের নিকট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠাইলে পিতার ব্যস্ততার জন্য আনন্দময়ী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে অঙ্কিত যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি মহারাজাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নয় বৎসর বয়সে পয়গ্রাম নিবাসী অযোধ্যারামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অযোধ্যারামও সুশিক্ষিত ছিলেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষে রচিত আনন্দময়ীর গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁহারই সহ-যোগিতায় তাঁহার খুল্লতাত জয়নারায়ণ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অবলম্বনে 'হরিলীলা' কাব্য রচনা করেন। পিত্রালয়ে অবস্থানকালে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া অনুমৃতা হন।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা বঙ্গ দেশ ও ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, আনন্দমোহন বসু তাঁহাদিগের অন্যতম। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব বঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে এক বিত্তশালী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পদ্মলোচন বসু ও মাতার নাম উমাকিশোরী দেবী। আনন্দমোহন অসাধারণ মেধা-সম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৈমনসিংহ জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ক্রমান্বয়ে এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। এম. এ. পরীক্ষায় তাঁহার বিষয় ছিল গণিতশাস্ত্র। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যাণ্ডে গমনপূর্বক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিষয়ক সর্বোচ্চ ও সুকঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য হইয়া সর্বপ্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হইবার সম্মান লাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও আইন ব্যবসায়কেই জীবিকাস্বরূপ অবলম্বন করেন। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য, এম. এ. পরীক্ষার পূর্বেই ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহোদরা স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

আনন্দমোহন ছিলেন মুখ্যতঃ ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ, ভক্তিরসাপ্লুতচিত্ত ধার্মিক পুরুষ। তাঁহার জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা এই সাত্ত্বিক ধর্মভাবের লক্ষণমণ্ডিত। ব্রাহ্ম-ধর্মের আদর্শ অতি তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন সস্ত্রীক কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন ও কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত সর্ববিধ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকর্মে তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু শীঘ্রই কেশবচন্দ্রের সহিত আনন্দমোহন, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রগতিশীল তরুণ ব্রাহ্মগণের মতবিরোধ দেখা দিল। কেশবচন্দ্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ পরিচালিত করিতে বা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ন্যাসরক্ষক (ট্রাস্টি)-গণের হাতে দিতে সহজে স্বীকৃত হইলেন না; 'আদেশবাদ', 'মহাপুরুষবাদ' প্রভৃতি তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহাতে আনন্দমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে এরূপ আশঙ্কা করিলেন; এবং সর্বশেষে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের সহিত কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার বিবাহে স্বয়ং কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত ব্রাহ্মবিবাহবিধি ভঙ্গ হওয়ায়, কেশবচন্দ্রের সহিত আনন্দমোহন প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদলের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে, বিরোধীদল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথক হইলেন। আনন্দমোহন এই প্রতিবাদকারীগণের অগ্রণী ছিলেন এবং তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে আনন্দমোহন ও তাঁহার সহকর্মীবর্গ একাধিপত্যবিমুক্ত পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠন করিয়াছিলেন ও ইহারই মাধ্যমে ব্রাহ্ম-সমাজের সর্বতোমুখী স্বাধীনতার আদর্শটিকে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সর্বসমেত তিনি ত্রয়োদশবর্ষকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবন নির্মাণাদি কার্যের ব্যয়ভার কিয়দংশে তিনি বহন করেন এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দুইটি বিখ্যাত শিক্ষায়তন, কলিকাতাস্থ সিটি কলেজ ও সিটি স্কুল স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

ছাত্রগণের চরিত্রগঠন ও তাহাদিগের অন্তরে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ এপ্রিল আনন্দমোহন তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত 'ছাত্রসমাজ' (স্টুডেন্টস্ উইকলি সার্ভিস) নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ইহার অধিবেশনগুলিতে তিনি নিয়মিত বক্তৃতা করিতেন।

ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রেও আনন্দমোহন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও তৎপ্রসূত রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁহার গভীর ধর্ম-বিশ্বাসেরই অঙ্গ ছিল। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে লণ্ডন, কেমব্রিজ, ব্রাইটন প্রভৃতি স্থানে ভারতবর্ষের হিতাহিত -বিষয়ক যে সকল সভা আহূত হইয়াছিল, তিনি তাহার প্রায় সকলগুলিতেই যোগদান করিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও বাগ্মিতাশক্তি শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছিল। সমসাময়িক ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের পরস্পর একতা ও আত্মীয়তা -বিধানার্থ আনন্দমোহন ইংল্যাণ্ডে নিজ বাসগৃহে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক একটি সভা সংস্থাপন করেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি নানাবিধ দেশহিতকর কার্যের সহিত নিজেকে জড়িত করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রগণের মধ্যে স্বদেশানুরাগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি ছাত্রসংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং তাহার সভাপতি হন। এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনগুলিতে আনন্দমোহনের বন্ধু ও সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় 'শিখ শক্তির অভ্যুদয়', 'চৈতন্যদেব', 'মাৎসিনি ও 'তরুণ ইটালী' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বঙ্গীয় যুবসম্প্রদায়ের মনে জাতীয়ভাবের উন্মাদনা সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন ও পরবর্তী কালের 'ছাত্রসমাজে'র প্রতিষ্ঠাতারূপে আনন্দমোহনকে বঙ্গ দেশের ছাত্র আন্দোলনের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধু ও সহকর্মীর সহায়তায় আনন্দমোহন সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইবার ও সাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লইয়া সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত-সভা' স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বাংশে ভারতের জাতীয় মহাসভা 'কংগ্রেস'-এর অগ্রদূত মনে করা যাইতে পারে। আনন্দমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ (প্রতিষ্ঠা-বৎসর) হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত সংস্থার সম্পাদকতা করেন ও পরে ১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উহার সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের কার্যে গুরুতর পরিশ্রম করিবার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর ভাঙিয়া পড়িতে থাকে ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল (২০ আগস্ট, ১৯০৬ খ্রী) পর্যন্ত তিনি প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। তথাপি নির্বাপিত হইবার পূর্বে দীপশিখা আর একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর অখণ্ড বঙ্গভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বর্তমান ফেডারেশন হলের জমিতে যে বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে জাতির সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা আনন্দমোহন মৃত্যুশয্যা হইতে শয়নাবস্থায় বাহিত হইয়া আসিয়া সভাপতিত্ব করেন। সেদিন তাঁহারই নাম স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাবাক্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সভায় পঠিত হয়।

আনন্দমোহন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের সদস্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রখর মনীষা ও শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত প্রবল উৎসাহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার অন্যতম উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। আনন্দমোহন বিশ্বাস করিতেন নারীজাতিকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামক এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যে এই বেসরকারি বিদ্যালয়টি নারীগণের উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বিদ্যালয়ের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় ছিল। তাই উহার উন্নতিকল্পে বেথুন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এবং আনন্দমোহন ও তাঁহার সহযোগীবর্গের সম্মতিক্রমে বেথুন স্কুল ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় একত্র মিলিত হইল। পরবর্তী কালে সুপরিচিত বেথুন বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের ইহা অন্যতম কারণ।

আনন্দমোহনের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য, সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উচ্চ আদর্শবাদ। এই গুণাবলী তাঁহার সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টাকে একটি সাত্ত্বিকতার মহিমা দিয়াছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি আনন্দমোহনের বন্ধু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে 'সাধু (সেন্ট) আনন্দমোহন' বলিতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, দুই শত বৎসর পূর্বে জন্মিলে

আনন্দমোহন একজন ব্রহ্মজ্ঞ ভারতীয় ঋষিরূপে পরিচিত হইতেন। উনবিংশ শতকের যুগধর্মে সেই ঋষিসুলভ ব্রহ্মানুভূতি জ্ঞানে, ধর্মসংস্কারে, লোকসেবায় নানা ভাবে ও রূপে মূর্ত হইয়া জাতিকে নব নব ভাব ও কর্ম -সম্পদে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে।

দ্র শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; নববার্ষিকী, কলিকাতা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ; Hemchandra Sarkar, *A Life of Anandamohun Bose*, Calcutta, 1929; Sibnath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, vols. I & II, Calcutta, 1911, 1912; Jogeschandra Bagal, *History of the Indian Association : 1876-1951*, Calcutta, 1953.

রমা চৌধুরী

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮৩০-১৮৫৯ খ্রী) বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্যিক। গৌহাটিতে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা হালিরামের ন্যায় তিনিও ইংরেজী, আসামী ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং আসামে ডেপুটি কমিশনার -পদে কার্য করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে আসামের স্কুল ও আদালতে বঙ্গভাষার স্থানে অসমীয়া ভাষা গৃহীত হয়। বাংলা ভাষায় তিনি 'আইন ও ব্যবস্থা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আনন্দরাম বড়ুয়া (১৮৫০-১৮৮৯ খ্রী) গৌহাটিতে জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গর্গরায় বড়ুয়া। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া আনন্দরাম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গিল-ক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত গমন করেন। সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম আই. সি. এস.। আনন্দরাম আসাম ও বঙ্গ দেশের বিভিন্ন জেলায় উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিলাতে পাঠসূত্রে যাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁহাদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষাতেও তিনি দুই হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ-স্যান্‌স্ক্রিট ডিক্‌শনারি' নামে তিন খণ্ড ইংরেজী-সংস্কৃত অভিধান (১৮৭৭-১৮৮১ খ্রী) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আনন্দলহরী বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ছোট ঢোলকের মত কাঠের খোল, তাহার একমুখ চওড়া এবং পাঁঠার চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত; অপর মুখটি অপেক্ষাকৃত সরু। স্বতন্ত্র একটি ছোট মাটির ভাঁড়ের মুখেও ঐরূপ চামড়ার আচ্ছাদন। একগাছি মোটা তাঁত উভয় যন্ত্রের চামড়ার মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া লাগানো থাকে। কাঠের খোলটি বাম কক্ষে আটকাইয়া ধরিয়া এবং বাম হস্তে ভাঁড়টি ধরিয়া ছোট একটি কাঠির সাহায্যে দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাঁতটি বাজাইতে হয়। ইহা লোকসংগীতের তাল রাখার যন্ত্র, দুই যন্ত্রের সংযোগকারী তাঁতটি ঢিলা বা টান করিলে শব্দে বা বোলে বৈচিত্র্য আনা যায়। ইহা অনেকটা গোপীযন্ত্রের মত।

আনন্দীবাঈ যোশী (১৮৬৫-১৮৮৭ খ্রী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কল্যাণ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গণপত রাও অমৃতেশ্বর যোশী। বিবাহের পূর্বে আনন্দীবাঈয়ের নাম ছিল যমুনা, স্বদেশীয় রীতি অনুসারে বিবাহের পর শ্বশুরকুলদত্ত নাম আনন্দীবাঈ হয়। অল্পবয়সে (১৮৭৪ খ্রী) ডাকঘর বিভাগের কর্মচারী গোপাল বিনায়ক যোশীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার স্বামী অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। আনন্দীবাঈ পিতৃগৃহে সংস্কৃতভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, বিবাহের পর স্বামীর প্রেরণা ও উৎসাহে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। সে সময় চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞা নারীর একান্ত অভাব থাকায় তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারংগম হইবেন স্থির করিলেন এবং স্বামীর পরামর্শে বিদেশ হইতে শিক্ষিতা হইয়া ফিরিবেন মনঃস্থ করিলেন। কলিকাতা হইতে বিদেশ যাত্রা সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীরামপুরে অল্প সময় বসবাস করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি একাকী আমেরিকায় যাত্রা করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় পেন্‌সিলভানিয়ার মেডিক্যাল কলেজ হইতে তিনি এম.ডি.উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্বামী আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কিছুদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। স্বদেশে কোল্‌হাপুরে

অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালে স্ত্রীবিভাগের চিকিৎসক-রূপে তিনি স্বল্পকাল কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আনসারী, মুখতার আহ্‌মদ (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রী) গাজীপুরের যুসুফপুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ হাকিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন ও সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ চেয়ারিং ক্রস্ হাসপাতালের সহিত যুক্ত হন। ইহার পূর্বে কোনও ভারতীয় এই হাসপাতালে কাজ শিখিবার সুযোগ পান নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্‌কান যুদ্ধে রেড-ক্রসের কাজ করিবার জন্য তুরস্কে গমন করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার আনসারী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বদল-সম্মিলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে তাঁহার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আনাতোল ফ্রাঁস ফ্রাঁস, আনাতোল দ্র

আনারস আদি উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্তু-গীজদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে আনারসের প্রচলন হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত হইতে কলিকাতা হইয়া আসাম ও ব্রহ্ম দেশে আনারস বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ কাঁঠালের মত আনারসও ফলের সমষ্টি। তাজা আনারসে প্রচুর পরিমাণে (প্রতি ১০০ গ্রামে ৬৩ গ্রাম) ভিটামিন সি থাকে; ভিটামিন এ এবং বি-ও প্রচুর পরিমাণে থাকে। আনারস খুব সহজে টিনবন্দী করা যায় এবং আনারসের চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার হইতেছে। পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ আনারসের চাষ হাওয়াই দ্বীপে হইয়া থাকে। সেখানকার প্রায় সমস্ত আনারসই টিনবন্দী করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হয়। আনারসের প্রধান জাত কিউ বা জায়েণ্ট কিউ। ইহারা আকারে সর্ববৃহৎ। পাতায় কোনও কাঁটা থাকে না। ভারতেও ইহাদেরই প্রাধান্য। ভারতে ইহা ছাড়া জলঢুবি বা কুমলা জাতের আনারস পাওয়া যায়। ইহারা কুইন জাতের অন্তর্গত। ইহাদের পাতার কিনারায় কাঁটা আছে এবং কিউ অপেক্ষা আকারে ছোট কিন্তু অনেক বেশি মিষ্ট। তাপ বার্ষিক গড়ে ২১°-২৪° সেণ্টিগ্রেডের (৭০°-৭৫° ফারেন-হাইট) মধ্যে হইলেই ভাল, বৃষ্টিপাত গড়ে বৎসরে ১৫-১৫০ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া দরকার।

আনারসের শিকড় খুবই ছোট। কাজেই মাটির রস এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য হাওয়াই দ্বীপে পূর্বে আল-কাতরা মাখানো মোটা কাগজ এবং বর্তমানে কালো অ্যালকাথিনের চাদর মাটির উপর বিছাইয়া তাহার দুই-পাশে চারা বসানো হইয়া থাকে। কলাগাছের মত আনারসেরও তেউড় বসাইতে হয়। এই তেউড় ফলের মাথায়, ফলের পাশে এবং গাছের গোড়ায় জন্মায়। গাছের গোড়ার তেউড় হইতে এক বছরে ফল পাওয়া যায়, অন্য ক্ষেত্রে দেরি হইতে পারে। আনারসের বাগানের পত্তন করিলে তাহা অন্ততঃ ৪-৫ বৎসর রাখা হয় এবং তাহার পর সমস্ত চারা উপড়াইয়া আবার নূতন করিয়া চারা বসানো হইয়া থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস চারা বসাইবার প্রশস্ত সময়। আনারস চাষে প্রচুর পটাশের প্রয়োজন। জৈব সার দিয়া চারা বসাইবার পর বর্ষার আগে ও পরে গাছের গোড়ায় রাসায়নিক সার দিয়া ভাল ফল পাওয়া যায়। কিছু নাইট্রোজেন, কিছু ফসফেট এবং প্রায় ৪ গুণ পটাশ দিতে হয়। প্রয়োগের পরিমাণ অবশ্য স্থানবিশেষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। শীতের শেষে ফুল ধরে এবং বর্ষার মধ্যে ফল পাকে।

হাওয়াই দ্বীপে গড়ে এক হেক্টরে ১০১ মেট্রিক টন (একর প্রতি ৪০ টন) ফলন পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে গড়ে মোট ১০।১২ মেট্রিক টন (একর প্রতি ৪-৫ টন) জন্মায়। আসামে ২৫-৩০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলিতে দেখা যায়। আসাম বা উত্তর বঙ্গে একই জমিতে ৩০-৪০ বৎসর ধরিয়া আনারসের চাষ করা হয়।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

আন্তর্নক্ষত্র জগৎ। আকাশবিদ্যা দ্র

আন্তর্জাতিক আইন কোনও ব্যক্তির পক্ষে যেমন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন সম্ভবপর নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনই সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যতীত অসম্ভব। এই সহযোগিতা

রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার অন্যতম মূল সংগঠক হইল আন্তর্জাতিক আইন। এই কারণেই রাষ্ট্রবর্গ এই আইনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া চলে। এই আইন একাধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংগঠন করিয়া এবং রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রবর্গের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পথ সুগম করিয়া দেয়। যে নিয়মাবলী, প্রথা ও নীতির মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

যদিও আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক নির্ধারণই আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান উদ্দেশ্য, এই আইনের বাস্তব প্রয়োগে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণও বিশেষ লাভবান হইয়া থাকে। জলপথে দস্যুবৃত্তি নিবারণ, দাসপ্রথার অবসান, মানবতার নামে অত্যাচারী রাষ্ট্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বৈদেশিকদের যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন ও যুদ্ধের সময়ে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বকল্যাণ প্রসারে নিযুক্ত আছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচীতে আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ পদমর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলিতেছে। আন্তর্জাতিক আদালত রাষ্ট্রসংঘকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে রূপায়িত করিয়া (১৯৪৯ খ্রী) এই আইনের মূল উপাদান বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র উপাদান, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপ সফলতা লাভ করিলে ব্যক্তি ও সংস্থাও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতর উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে রাষ্ট্রিক আইনের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের পার্থক্য স্বভাবতঃই ধরা পড়ে— প্রয়োগপদ্ধতি ও ব্যাপকতা। রাষ্ট্রীয় আইন সার্বভৌম শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের এইজাতীয় প্রয়োগব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। প্রয়োগক্ষেত্রে ইহাকে এখনও রাষ্ট্রবর্গের সততা ও শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই পার্থক্যের জন্য অস্টিন, হল্যাণ্ড, উড্রো উইল্‌সন ইত্যাদি চিন্তানায়ক আন্তর্জাতিক আইনকে সঠিক আইনের পদমর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে এই ধরনের সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। প্রথমতঃ, একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ফলে যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তাহারই প্রত্যুত্তরে আন্তর্জাতিক আইন গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, এই আইন আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পরিপূরক অঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ, এই আইনকে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আইনের মর্যাদা দিয়া থাকেন এবং এক্ষেত্রে কোনও দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের সময়, সাধারণ আইনের মতই, ঈষৎ বিশিষ্ট রীতিতে ভাষা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন আইনের উপযোগী ভাষাতেই প্রণীত হয়। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ রক্ষা ও প্রসারিত করিতে হইলে এই আইনের মাধ্যমেই অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সংযোগস্থাপন করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, এই আইন কোনও রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রমাগত লঙ্ঘিত হইলে অপরাপর রাষ্ট্র প্রতিশোধাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিলাভও আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রয়োগক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হিসাবে পদমর্যাদা না দিবার কোনও অকাট্য যুক্তি নাই।

রাষ্ট্রীয় আইন সর্বগ্রাসী ; অর্থাৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি অংশই ইহার এক্তিয়ারভুক্ত। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি শুধুমাত্র আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ, নিরপেক্ষতা এবং শান্তি আন্তর্জাতিক আইনের মূল বিষয়বস্তু। বাকি অংশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তবে আভ্যন্তরীণ বিষয়টির সীমারেখাও খুব স্পষ্ট নহে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিস্তার, কোনও সমস্যার গুরুত্ব এবং তাহার আন্তঃরাষ্ট্রিক প্রভাব এই তিনটি কারণের সমন্বয়ে আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রসংঘের কল্যাণধর্মী কার্যকলাপের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলির সীমা আরও সংকুচিত হইতেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকিলে বর্তমানে ব্যাপকতার দিক হইতে রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের যে পার্থক্য আছে তাহা ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের পার্থক্য ঠিক গুণগত নয়, শুধুমাত্র পরিমাণগত।

বিভিন্ন ধরনের উৎস হইতে আন্তর্জাতিক আইন গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনতন্ত্রের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত অনুচ্ছেদে চুক্তিপত্রাবলীকে এই আইনের প্রথম উৎসস্থল হিসাবে ধরা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন রচনার জন্য কোনও নির্দিষ্ট আইনসভা না থাকার জন্য চুক্তিকেই

আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দী হইতে বহু রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মিলিতভাবে গৃহীত বহু চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

এই আইনের দ্বিতীয় উৎস হইল সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথাবলী। বহুকাল ধরিয়া যে প্রথা অনুযায়ী বহু রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তার করিয়াছে এবং যে প্রথাকে তাহারা বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করে, তাহাই প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া পরিচিত।

সভ্যজাতিবর্গের মধ্যে প্রচলিত আইনের সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ নিয়মাবলীকে এই আইনের তৃতীয় উৎস রূপে ধরা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিচারসম্মত যুক্তির সাহায্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনকে বিস্তারলাভের যথাযথ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ ও বিশেষজ্ঞদের রচনাবলী আন্তর্জাতিক আইনের চতুর্থ উৎস। তবে ইহাদের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র মামলাভুক্ত রাষ্ট্রদের প্রতি এবং সেই মামলাটির জন্যই প্রযোজ্য। ইঙ্গ-মার্কিন বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের মত পরবর্তী শুনানিতে ইহাদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় না। তবে আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একই ধরনের মামলায় সাধারণতঃ একই ধরনের রায় দেওয়া হইতেছে। এই আদালত সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদদের লইয়া গঠিত বলিয়াও ইহার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ে উদ্ধৃত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে ইহার পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞদের প্রামাণিক রচনাবলীও আন্তর্জাতিক আইনের উৎসরূপে পরিগণিত হয়। অবশ্য প্রমাণ হিসাবে ইহাদের রচনাবলী উদ্ধৃত করার পূর্বে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। যেদিন হইতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনুভব করিয়াছে প্রায় সেইদিন হইতে এরূপ সম্পর্ক রচনার নীতি নির্ধারণের এবং দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রীতি-নীতি প্রচলনের আভাস পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে এই নিয়মাবলী প্রধানতঃ নীতিধর্মভাবাপন্ন ছিল। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেই সবিশেষ মনোযোগ-সহকারে বিভিন্ন নিয়ম গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, চীনে, ভারতবর্ষে, গ্রীসে ও রোমে এই ধরনের রীতি-নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌম শক্তি-সম্পন্ন বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্মকাল হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার সুসংবদ্ধ রূপ ও নীতিধর্মের প্রভাবমুক্ত অবস্থা দেখা যায়। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ওলন্দাজ মনীষী গ্রোটিয়াসের (১৫৮৩-১৬৪৫ খ্রী) যুদ্ধ ও শান্তি-সম্পর্কিত আইনের পুস্তকে আন্তর্জাতিক আইনের আধুনিক রূপ আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ব্যাবহারিক নীতিতে ও বিভিন্ন আইনবিদদের রচনায়, রোমান যুগের প্রাকৃতিক আইনের নীতি অনুসরণে আন্তর্জাতিক আইন ক্রমশঃ বর্তমান রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কয়েকটি চুক্তিপত্র (প্যারিস ১৮৫৬ খ্রী, জেনিভা ১৮৬৪ খ্রী) ও ঘোষণাবলীর (সেণ্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৮ খ্রী, লণ্ডন ১৯০৯ খ্রী) সাহায্যে এবং দুইটি হেগ শান্তি সম্মিলনে (১৮৯৯ খ্রী, ১৯০৭ খ্রী) গৃহীত চুক্তির সহায়তায় আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই যুদ্ধ, নিরপেক্ষতা ও শান্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সাধারণভাবে গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের বৃহৎ একটি অংশই হইল যুদ্ধ-সংক্রান্ত আইন। যুদ্ধ ঘোষণা, পরিচালনা, বিজিত ও নিরপেক্ষদের প্রতি ব্যবহার, আহতদের সেবাশুশ্রূষা, যুদ্ধবন্দীদের ব্যবস্থা ও যুদ্ধাবসান পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই আইন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নিয়মাবলী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লঙ্ঘিত হইলেও যুদ্ধের মর্মান্তিক রূপকে অনেকাংশে সংযত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধ করিবার অধিকারকে সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির নিজস্ব অধিকাররূপে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এই স্বীকৃতিতেই এই আইনের চরম দুর্বলতা নিহিত। তবে জাতিসংঘের ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের গঠনতন্ত্রে এই অধিকারকে সংযত করিবার চেষ্টা করা হয় এবং ১৯২৮ সালের প্যারিস চুক্তিতে মোট ৬১টি রাষ্ট্র জাতীয় নীতি হিসাবে যুদ্ধকে পরিহার করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রচেষ্টাগুলি প্রহসনে পরিণত হয়। সেই কারণেই রাষ্ট্রসংঘের সনদে (১৯৪৫ খ্রী) চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গের যুদ্ধ করিবার অধিকার নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার ঠিকই থাকিবে। সনদের যথাযথ ব্যাখ্যায় বিশ্বনিরাপত্তা রক্ষার জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘের সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের অধিকার থাকিবে এবং এই যুদ্ধে

প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রই সমান অংশীদাররূপে পরিগণিত হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের যুগে নিরপেক্ষতার আর কোনও আইনগত ভূমিকা রহিল না। এই কারণেই সুইট্জারল্যাণ্ড রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে নাই এবং ঐ দেশে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠায় সুইস সরকার আপত্তি জানাইয়াছিলেন।

শান্তি-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক সম্পর্ক-বিস্তারের প্রথা, সার্বভৌম শক্তির বিশেষ মর্যাদা, আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও সাম্যরক্ষা, নূতন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, বৈদেশিকদের প্রতি ব্যবহার, বিমান ও নৌপথে চলাচল, শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসা, বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তি ও চুক্তি সম্পাদন পদ্ধতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের নিয়মাবলী সময়-বিশেষে লঙ্ঘিত হইলেও শান্তির নিয়মাবলী সচরাচর লঙ্ঘিত হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে সমস্ত বিশ্ব-সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে ধারার ব্যাপক রূপ দেখা দিয়াছে বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে, তাহাও ইতিমধ্যেই শান্তি-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গতিশীলতা। বিভিন্ন শতাব্দীতে আন্তঃরাষ্ট্রিক সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া এই আইন আপনা হইতে যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছে ও রূপান্তরিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক আইন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে এই আইনের পরিবর্ধন ও সুনির্দিষ্ট-করণের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কাজ কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। জলপথের আইনের যুগোপযোগী পরিবর্তনের জন্য ১৯৫৮ ও ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের দুইটি জেনিভা সম্মিলন এবং কূটনৈতিক যোগাযোগের জন্য গৃহীত ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা চুক্তি এইরূপ অগ্রগতির নিদর্শন। রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দায়িত্ব, জাতিত্ব ও পররাষ্ট্র আক্রমণের সংজ্ঞা, ন্যুরেমবার্গ বিচার অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নীতি সংরচন, বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি; চুক্তি-সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি বিষয়ে আইন কমিশনের বিশ্লেষণমূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক আইনের জটিল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গঠনমূলক হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতির সোপান হইয়া থাকিবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন আকাশপথ লইয়া নূতন আইন গৃহীত হইয়াছিল, আধুনিক কালে বহির্বিশ্ব আবিষ্কার ও মহাকাশবিজয়ও সেইরূপ নূতন এক সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক আইনের সম্প্রসারণের নূতন এক সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যত বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে মহাকাশে চিরাচরিত সার্বভৌম শক্তির দাবি এখনও উঠে নাই। এই প্রচেষ্টার সহিত অ্যাণ্টার্টিক চুক্তি (১৯৫৯ খ্রী) এবং পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (১৯৬৩ খ্রী) সংযুক্ত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে— এবং পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়— আধুনিক কালে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রতাপ ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃত কল্যাণধর্মী আন্তর্জাতিক সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে সার্বভৌম সমতার এই সীমিত রূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির শাশ্বত বিরোধ মীমাংসার এই যুগসন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিক আইন কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা বহুলাংশে রাষ্ট্রসংঘের উপর নির্ভর করিতেছে।

দ্র J. L. Brierly, *The Law of Nations*, Oxford, 1963; H. W. Briggs, *The Law of Nations: Cases, Documents, and Notes*, London, 1953; R. Chakravarti, *Human Rights and the United Nations*, Calcutta, 1958; B. Cheng, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, London, 1953; T. Gihl, *International Legislation*, London, 1937; G. H. Hackworter, *Digest of International Law*, Washington, 1940; E. Hambro, *The Case Law of the International Court*, Leyden, 1952; C. W. Jenks, *The Common Law of Mankind*, London, 1958; A. Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, New York, 1954; Q. Wright, *Contemporary International Law: A Balance Sheet*, New York, 1955.

রঘুবীর চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিকতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বারা জাতীয়তার (ন্যাশন্যালিজ্‌ম) ঊর্ধ্বে মানবজাতির ঐক্যসূচক যে ভাবের উৎপত্তি হয় তাহাকে আন্তর্জাতিকতা (ইণ্টার-ন্যাশন্যালিজ্‌ম) বলা যায়। স্বভাবতঃই জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতিকতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; জাতীয়তার মূল

দৃঢ় না হইলে আন্তর্জাতিকতার উন্মেষ হয় না। অর্থাৎ কোনও একটি মানবগোষ্ঠী সুসংহত জাতিরূপে পরিণতি লাভ করিলে এবং অনুরূপ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ক্রমশঃ এই সহযোগিতা আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হইতে পারে। সুতরাং এক হিসাবে আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয়তার পরিণত রূপ বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন এবং মধ্য -যুগে ইওরোপের জনসমষ্টির মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নাই। গ্রীকেরা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একসূত্রে গ্রথিত হইলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিভিন্ন গ্রীক রাষ্ট্রের মধ্যে সাময়িকভাবে যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহাকে আন্তর্জাতিকতার পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব ছিল না। গ্রীক ব্যতীত অন্যান্য জাতিকে গ্রীকেরা বর্বর রূপে গণ্য করিত। প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদের পরিচিত জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; গ্রীক এবং অ-গ্রীক বা বর্বর। এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত জগতে আন্তর্জাতিকতার বিকাশ ঘটিতে পারে না।

রোমক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং এই সকল জাতির মধ্যে সাম্রাজ্যভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঐক্য প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবিরোধী ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ভূ-খণ্ডের জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় নাই। রোমের আইন, শাসনপদ্ধতি ও ভাষা তাহাদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার সম্বন্ধ নহে— প্রভুর নির্দেশে বাধ্যতামূলক সহযোগিতা মাত্র। মূলতঃ এইরূপ বাধ্যতামূলক ঐক্য জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা উভয়েরই বিরোধী।

মধ্য যুগে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর, তথাকথিত অন্ধকার যুগের অবসানে, যে রোমক সাম্রাজ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও অনেকাংশে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। সম্রাট্ এবং পোপের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে খ্রীষ্টান জগতে যে ঐক্যের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল তাহার সহিত জাতীয়তা বা আন্তর্জাতিকতার সম্বন্ধ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ইওরোপে ঐ ঐক্যের আদর্শ কখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সম্রাট্ এবং পোপ পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এবং অন্যান্য কারণে দুর্বল হইয়া পড়িলে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ইওরোপে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে, ইওরোপের জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতে থাকে এবং আন্তর্জাতিকতার অনুকূল মনোভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এই যুগে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল ছিল যে, রাজ্যশাসকগণ স্ব স্ব সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রধানতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই সম্বন্ধ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ পণ্ডিত গ্রোটিয়াস আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি স্থাপন করেন। জার্মান পণ্ডিত পুফেনডর্ফ, ওলন্দাজ পণ্ডিত বিন্‌কেরশেক প্রভৃতি আইনজ্ঞ মনীষীগণ নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়া আন্তর্জাতিক আইনকে সুসংহত আকার প্রদান করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ ইওরোপের ইতিহাসে একটি নূতন ধারার সূচক। এই যুগে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে আন্তর্জাতিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ডের খণ্ডীকরণ ইওরোপে জাতীয়তাবোধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই খণ্ডীকরণের প্রতিবাদে পোল জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়া উঠে। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন কর্তৃক বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা-লোপ ইওরোপের সর্বত্র— বিশেষতঃ জার্মানী, ইটালী এবং স্পেনে— জাতীয়ভাবে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। আপাতদৃষ্টিতে এই নবজাগ্রত জাতীয় ভাব আন্তর্জাতিকতার প্রতিকূল হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপে শান্তিস্থাপন ও রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় বিজয়ী শক্তিবর্গের যে বৈঠক বসিয়াছিল সেখানেই আন্তর্জাতিকতার বাস্তব রূপ গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এই শক্তিবর্গ (অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং পরে ফ্রান্স) সম্মিলিত হইয়া ব্যবস্থা করে যে, সমগ্র ইওরোপে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিবে এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহারা কয়েক বৎসর পর পর বৈঠকে সম্মিলিত হইবে। এই ব্যবস্থা ইওরোপের সংহতি (কন্‌সার্ট অফ ইওরোপ) নামে পরিচিত। কার্যতঃ ইওরোপে সর্ব-প্রকার বিপ্লবী আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু প্রগতিবিরোধী হইলেও এই শক্তিসম্মিলনের

ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা যায় না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার এইরূপ বাস্তব প্রচেষ্টা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু সম্মিলিত শক্তিবর্গের আভ্যন্তরীণ স্বার্থসংঘর্ষের ফলে এই প্রচেষ্টা মাত্র কয়েক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির মধ্যে বণ্টন করিবার উদ্দেশ্যে বার্লিনে এক বৈঠক বসে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বণ্টনকার্য নিষ্পন্ন হয়। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য নিন্দার্হ হইলেও ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটি কঠিন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ শহরে যে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে সেখানে আন্তর্জাতিক আইনের কোনও কোনও অংশ বিধিবদ্ধ হয় এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিকতার ইতিহাসে ইহা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দ্বিতীয় হেগ বৈঠক বসে। নবজাগ্রত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শান্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল সাধারণ সমস্যার উদ্ভব হইত সেগুলিও পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা সমাধান করা হইত। যথা, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ডাক সংঘ (ইণ্টারন্যাশন্যাল পোস্ট্যাল ইউনিয়ন) ও আন্তর্জাতিক তার সংঘ (ইউনিভার্সাল টেলিগ্রাফিক ইউনিয়ন), মাল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রেলওয়ে সংঘ (ইউনিয়ন অফ রেলওয়ে ফ্রেট ট্র্যান্সপোর্টেশন ইন ইওরোপ), জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সংঘ (ইণ্টারন্যাশন্যাল অফিস অফ পাবলিক হেল্‌থ), কৃষির উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সংঘ (ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার) প্রভৃতি বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও তাহারা যে সাধারণভাবে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করিতে পারে ইহাতে তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতা মানুষের মনে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন সম্বন্ধে নূতন অনুভূতি জাগ্রত করিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য এই যুদ্ধ (অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ঘটিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঘোষণার দ্বারা পৃথিবীকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মুক্ত রাখা যায় না; রাষ্ট্রগুলিকে স্থায়ী শান্তির পথে চালনা করিতে হইলে স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন। এই আন্তর্জাতিক সংগঠন ভিয়েনা কংগ্রেসের পরবর্তী রাষ্ট্রসংঘের মত বিজয়ী শক্তিসমূহের সংঘমাত্র হইবে না, সমুদায় শান্তিকামী জাতির এখানে প্রবেশাধিকার থাকিবে। ইহা পৃথিবীতে শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে, যে সকল মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ ঘটে তাহা দূর করিতে প্রয়াসী হইবে। তৃতীয়তঃ, কোনও ক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনা বা অন্য পদ্ধতি দ্বারা তাহার সমাধান করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, যদি কোনও রাষ্ট্র ইহার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে সংগঠনের সমবেত শক্তি সেই রাষ্ট্রকে শাস্তিদানের জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে জাতিসংঘ (লীগ অফ নেশন্‌স) স্থাপিত হয়। কিন্তু নানা কারণে জাতিসংঘ এই সকল নীতি কার্যকরী করিতে পারে নাই। জাপান, ইটালী ও জার্মানী জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। জাতিসংঘের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যালীলার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বেই বিজয়ী শক্তিবর্গ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ব্রিটেন) একটি নূতন আন্তর্জাতিক সংগঠনের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। ইহার মূলনীতিগুলি জাতিসংঘের মূলনীতির অনুরূপ হইলেও ইহার পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রতি ইহার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। বর্তমানে একমাত্র সাম্যবাদী চীন ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের (ইউনাইটেড নেশন্‌স) অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বৃহৎ ও শক্তিশালী সংগঠন এবং আন্তর্জাতিকতার এইরূপ বাস্তব প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতিকতার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, একটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরটিকে দেখা যায় না। রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হইলেও ইহার সংবিধানে (চার্টার) সভ্য-রাষ্ট্রসমূহের 'সার্বভৌম সমতা' সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি সভ্য সার্বভৌম ক্ষমতার (সভ্‌রেনটি) অধিকারী এবং আইনের দিক হইতে—

বাস্তব পরিস্থিতির দিক হইতে না হইলেও— প্রত্যেক সভ্যই অপর যে কোনও সভ্যের তুল্য। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রসংঘে জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্র (ইউনাইটেড নেশন্স নামটি লক্ষণীয়) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র স্ব স্ব সার্বভৌম অধিকার ও মর্যাদা বিসর্জন দেয় নাই, সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি মহাসার্বভৌম রাষ্ট্রের (সুপার স্টেট) অধীনতা স্বীকার করে নাই।

বহু আশাবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তির ধারণা এই যে, আন্তর্জাতিকতার যে রূপ রাষ্ট্রসংঘে প্রকাশিত তাহা ইহার অপরিণত রূপ মাত্র. ভবিষ্যতে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় রাষ্ট্রের আংশিক বা সামগ্রিক বিলোপ ঘটিবে এবং সমগ্র মানবজাতি পৃথিবীব্যাপী এক মহা-রাষ্ট্রের অধীন হইয়া জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন যে, জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিতে পারে না এবং ঘটিলে তাহা মানবজাতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক হইবে না। আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের জন্য আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য, তবে আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলিকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে এবং স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জন দিয়া একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। এই দিকেই রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির লক্ষ্য রহিয়াছে। সেইজন্য রাষ্ট্রসংঘের সাফল্যের উপর আন্তর্জাতিকতার ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলীয় বিপ্লবের পরেই আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান সূচিত হয়। অন্য দিকে বহির্বাণিজ্যের উপর বিবিধ বাধানিষেধ আরোপের ক্ষমতা তখনও সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হস্তচ্যুত হয় নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ইডেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহাতেই সর্বপ্রথম বহির্বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৯৩ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দব্যাপী দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। যুদ্ধকালীন কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের কাজ সুসম্পন্ন হয়। অথচ ইওরোপের অন্যান্য দেশে যুদ্ধের জন্য শিল্পায়নের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। যুদ্ধের অবসানে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষমতা ইওরোপের একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। নূতন বাজারের জন্য তখন যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনে তাহারই ফলে শক্তিশালী মতবাদ গঠিত হইল। তদানীন্তন বহু অর্থনীতিবিদের চিন্তাধারায় ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট।

অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বপ্রথম জোরাল যুক্তি দেখাইলেন অ্যাডাম স্মিথ। তাঁহার মতে অবাধ বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইহার মূলে আছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। যুক্তির জৌলুষ সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে স্মিথের মতামত স্থায়ী মূল্য লাভ করিতে পারে নাই। পরবর্তী অর্থনীতিবিদেরা প্রমাণ করিয়াছিলেন, যে অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া স্মিথ তাঁহার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, বস্তুতঃপক্ষে তাহার কোনও ভিত্তি নাই। সমপরিমাণ উপাদানে প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ রপ্তানি করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে, ইহাই ছিল স্মিথের মত। এই যুক্তি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিকে তাহা হইলে সমস্ত দেশ হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। অবশেষে এই সমস্যার একটি কিনারা পাওয়া যায় স্মিথের পরবর্তী অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বে।

রিকার্ডো তাঁহার অভিনব মূল্যতত্ত্বের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মতে দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণের উপর। এমন যদি দেখা যায় যে, কোনও দেশে ক-নামক বস্তু উৎপাদনে দুইটি জায়গার একটিতে ৬০ দিনের ও অপরটিতে ১০০ দিনের শ্রমের প্রয়োজন এবং অনুরূপভাবে খ-নামক বস্তু উৎপাদনে প্রয়োজন যথাক্রমে ৩০ ও ৯০ দিনের শ্রমের, তাহা হইলে সেই দেশে উভয় বস্তুই উৎপন্ন হইবে প্রথম জায়গাটিতে। এই অবস্থায় উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই প্রথম জায়গাটির প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য বস্তুতঃপক্ষে এই ধরনের ব্যাপার খুব কমই ঘটিবে। ক, খ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু উৎপাদনের সুযোগ হয়ত দ্বিতীয় জায়গাটিতে বেশি থাকিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উপকরণের স্থানপক্ষপাতিত্ব সম্ভবপর হইবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবশ্য শ্রমব্যয়ের এই নীতি বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে না। সেখানে রিকার্ডোর পরিকল্পনা অন্য রকমের। ধরা যাউক, গ ও ঘ -নামক

স্থানে ক ও খ -নামক বস্তু উৎপাদনে নিম্নরূপ শ্রমব্যয় প্রয়োজন—

উৎপাদনের শ্রমব্যয় (দিনের এককে)

	ক	খ
গ	৮০	৯০
ঘ	১২০	১০০

ক ও খ -নামক উভয় বস্তুর উৎপাদনব্যয় ঘ অপেক্ষা গ-এ অপেক্ষাকৃত কম। ইহা সত্ত্বেও গ-এর ক-নামক বস্তু এবং ঘ-এর খ-নামক বস্তুর উৎপাদন অধিকতর লাভজনক। ইহার কারণ, ৮০ দিনের শ্রমব্যয়ে গ যে বস্তু সংগ্রহ করিবে, স্বদেশে তাহা উৎপন্ন করিতে লাগিবে ৯০ দিনের শ্রম। এই প্রকার বিনিময়ব্যবস্থায় ঘ-ও বিশেষ লাভবান হইবে। শুধুমাত্র খ উৎপন্ন এবং বিনিময় করিয়া ঘ ১০০ দিনের খাটুনিতে যে বস্তু লাভ করিবে স্বদেশে তাহার উৎপাদনব্যয় ১২০ দিন।

স্পষ্টতঃই দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্য একই নীতি অনুসরণ করে না। ইহার কারণ শ্রম, উদ্যোগ এবং মূলধন সর্বসময় স্থানপরিবর্তনের আকর্ষণ অনুভব করে না। বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের স্থানীয়করণ, আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে বস্তুর উৎপাদনব্যয় তুলনা-মূলকভাবে সবচেয়ে কম, প্রত্যেক দেশ সেই বস্তু উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। রিকার্ডোর তত্ত্ব স্মিথের তত্ত্বের চেয়ে শক্তিশালী, আপেক্ষিক মূল্যের যে ধারণা রিকার্ডো-তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ স্মিথের তত্ত্বে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই। এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, রিকার্ডো-তত্ত্ব আন্তর্জাতিক বিনিময়হার নির্ধারণের কোনও উপায় স্থির করিতে পারে নাই। এই তত্ত্ব মোটামুটি ভাবে বলিয়াছিল যে, গ ও ঘ -এর মধ্যে ক ও খ -এর পারস্পরিক বিনিময় ঘটিবে। কিন্তু ইহাতে কোনও হার সঠিক কিভাবে স্থিরীকৃত হয় তাহার কোনও নির্দেশ ছিল না। রিকার্ডোর পরবর্তী স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল -এর তত্ত্বে আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ধারণের উপায় প্রথম বর্ণিত হইয়াছিল।

রিকার্ডোর তত্ত্বে আপেক্ষিক শ্রমব্যয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাখ্যায় প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অপর-পক্ষে মিল -এর তত্ত্বে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে আপেক্ষিক সুযোগ বা সুবিধার উপরে। উভয় দেশে প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ প্রদত্ত অথচ শ্রমব্যয় বিভিন্ন, এই অনুমানের পরিবর্তে মিল ভাবিলেন, প্রত্যেক দেশে শ্রমের পরিমাণ প্রদত্ত অথচ উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন। সমপরিমাণ শ্রমে মিল-এর কল্পনায় দুই দেশের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :

	ক	খ
গ	১০	১৫
ঘ	১০	২০

আপেক্ষিক সুবিধা বিচার করিলে এই স্থলে খ-এর উৎপাদনে ঘ-এর যোগ্যতা বেশি আর ক-এর উৎপাদনে উভয় দেশের যোগ্যতা অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে গ-এর পক্ষে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ লাভজনক কেননা ক-এর ১০ এককের পরিবর্তে স্বদেশে যেখানে মাত্র ১৫ একক খ পাওয়া যাইবে, সেখানে বিদেশ হইতে মিলিবে ২০ একক। ঘ-এর পক্ষেও একই কথা সত্য কেননা বাণিজ্যের মাধ্যমে ঘ খ-এর ২০ এককের কমেই ক-এর ১০ একক লাভ করিতে পারে। আপেক্ষিক সুবিধার অবস্থাই বিনিময়ের হারের সীমা নির্ণয় করিবে। মিল ধরিয়া লইলেন যে, বিনিময়ের হার ১০ক=১৭ঘ। বাণিজ্য যদি এই দুইটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং দুইটি দ্রব্যই মাত্র বাণিজ্যপণ্য হয়, তাহা হইলে এই বিনিময়-হার স্থায়ী হইবে যদি গ-এর খ আমদানি ঘ-এর ক আমদানিমূল্যকে পরিশোধ করিতে পারে। এই শর্ত পূরণ করা যায় তখনই যখন প্রত্যেক দেশের চাহিদা হয় বাণিজ্যহারের একটি সাধারণ গুণিতক, যেমন গ যখন ১৭০০০খ অর্থাৎ ১০০০×১৭খ আমদানি করিবে, তখন ঘ আমদানি করিবে ১০০০০ক অর্থাৎ ১০০০×১০ক। কিন্তু ধরা যাউক যে, ১০ : ১৭ এই বিনিময়হারে গ-এর চাহিদা ১৩৬০০খ অর্থাৎ ৮০০×১৭খ। এই অবস্থায় ঘ মাত্র ৮০০×১০ক অর্থাৎ ৮০০০ক পাইতে পারে। ঘ-এর আরও প্রয়োজন ২০০০ক-এর। এই ক্ষেত্রে ঘ-কে আরও অনুকূল বাণিজ্যহারের প্রস্তাব করিতে হইবে যথা— ১৮খ=১০ক। এই হারে গ ৯০০×১৮খ অর্থাৎ ১৬২০০খ নিতে পারে এবং ঘ ৯০০×১০ক অর্থাৎ ৯০০০ক নিতে পারে। এই হার চালু হইলে পুনরায় বাণিজ্য শুরু হইবে। অপর পক্ষে, ক-এর জন্য ঘ-এর চাহিদার তীব্রতা যদি কম হয়, তাহা হইলে বিনিময়হার হয়ত ১০ক=১৬খ-ও হইতে পারে। এই যুক্তির ভিত্তিতে মিল স্থির করিলেন, আপেক্ষিক ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত দুই সীমার মধ্যে প্রকৃত হার নির্ণীত হইবে দুই দেশের পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা।

আধুনিককালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব অর্থ-নীতিবিদ্ বার্টিল ওলিনের হস্তে আরও সুষ্ঠু রূপ ধারণ করিয়াছে। আধুনিক তত্ত্ব মূল্যের জাতীয় পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় মূল্য এবং

ব্যয় সমান বলিয়া আন্তর্জাতিক মূল্যবিভেদের হেতুস্বরূপ ব্যয়ের পার্থক্যকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যয়বিভেদের প্রধান কারণ জাতীয় উপাদান সরবরাহের বৈষম্য। এই বৈষম্য আবার দীর্ঘস্থায়ী, কেননা বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানের আদান-প্রদান নানারূপ বাধানিষেধের দ্বারা কণ্টকিত। উপাদান সরবরাহের বৈষম্য আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ভিত্তিস্বরূপ। জমি-বহুল দেশে জমিপ্রধান সামগ্রীর উৎপাদন (যেমন শস্য অথবা পশুপালন) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইবে এবং এই কারণে অধিক জমি ব্যবহারকারী সামগ্রীর উৎপাদনে দেশটি তাহার অধিকাংশ উপাদান নিয়োগ করিবে।

দ্র Jaroslav Vanek, *International Trade*, Homewood, 1962; Richard Caves, *Trade and Economic Structure*, Cambridge; Jacob Viner, *International Economics: Studies*, Glencoe, 1951.

প্রবুদ্ধনাথ রায়

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট দ্র

আন্তর্জাতিক ভূপ্রকৃতি নির্ণয় বর্ষ ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার দ্র

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড দ্র

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশন দ্র

আন্ত্রিক রোগ অন্ত্রে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয় তাহাদের আন্ত্রিক রোগ বলে। টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। সময়ে সময়ে ইহা সংক্রামক হইতে পারে। টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড ছাড়া অন্য অনেক রোগের জীবাণু অন্ত্র আক্রমণ করিতে পারে। অনেক সময়ে ঐ সমস্ত রোগের আক্রমণের ধারা ও লক্ষণের মিল দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্র টাইফয়েড রোগের বিবরণ দেওয়া হইল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই রোগ দেখা যায়। প্রাচীন কাল হইতেই এই রোগ বিদ্যমান। একসময় ইওরোপের বড় বড় শহরও ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কিন্তু বর্তমান কালে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অনেক উন্নত হওয়ায় ইহার প্রসার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবার্থ (Eberth) প্রথম এই রোগের জীবাণু দেখিতে পান। কিন্তু গ্যাফকি (Gaffky) কোনও এক আন্ত্রিক জ্বরের রোগীর প্লীহা হইতে ইহার জীবাণু লইয়া পরীক্ষাগারে ইহাকে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডারহ্যাম (Durham), গ্রুবার (Gruber) এবং ভিডাল (Widal) ও গ্রুনবাউম (Grunbaum) কিভাবে এই রোগের জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়িতে পারে সেই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন। ইহাই 'ভিডাল টেস্ট' (Widal Test) নামে পরিচিত।

এই রোগের জীবাণু লম্বায় ২ হইতে ৪ মাইক্রন এবং চওড়ায় প্রায় ০·৫ মাইক্রন হয়। যদিও অক্সিজেন ব্যতীত ইহাদের বৃদ্ধি হইতে পারে তবুও বাতাসের উপস্থিতিতে ইহাদের বৃদ্ধি আরও দ্রুত হয়। তাপমাত্রা ৪৬° সেন্টিগ্রেড হইলে ইহাদের বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং ইহার উপর হইলে ধ্বংস হয়। ৪° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বহুকাল কার্যক্ষম অবস্থায় ইহারা থাকিতে পারে এবং শুষ্ক অবস্থায় বন্ধ করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল থাকে।

ব্যাসিলাস টাইফোসাস (*bacillus typhosus*) নামক একপ্রকার জীবাণুর আক্রমণে টাইফয়েড জাতীয় আন্ত্রিক জ্বর হয়। অপরিস্রুত জল বা দূষিত পানীয় জল এই রোগের জীবাণু বহন করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুধ বা খাবারের মধ্য দিয়াও ইহার জীবাণু সংক্রামিত হইতে পারে। বছরের যে কোনও সময় ইহার আক্রমণ সম্ভব হইলেও বর্ষা বা শরৎ-কালে ইহার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ শিশু বা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই রোগের আক্রমণ খুব কম হয়। এই রোগের জীবাণুর আক্রমণের সময় হইতে দেহে ইহার লক্ষণগুলির আবির্ভাবের সময় সাধারণতঃ ৮ হইতে ১৪ দিন। রোগ ধরা পড়িবার আগে রোগী ৭ হইতে ১০ দিন পর্যন্ত অসুস্থ হইতে পারে।

ইহাতে প্রথমে সামান্য জ্বর হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা শীত শীত ভাব, ক্ষুধামান্দ্য কোমরে বা গায়ে ব্যথা হয়। অনেক সময় পেট ফাঁপে ও পেটে বেদনা হয়। রোগের প্রথম সপ্তাহে দেহের তাপ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়, জিহ্বার দুই পার্শ্ব লাল হয়। ৭-১০ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ পেটের উপর, বুকের দুই পাশে, অথবা পিঠে লাল লাল গোল দাগ দেখা যায়। সময় সময় মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে। প্রথম সপ্তাহে প্লীহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহা অনেকখানি বাড়িয়া যায়। এই সপ্তাহে দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, নাড়ী ক্রমশঃ দ্রুত হয়। রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ

হয়। এই সময় রোগী মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয় ও ভুল বকে। অনেক সময় উদর বা অন্ত্র হইতে রক্তক্ষরণের জন্য রোগী মারা যায়। তৃতীয় সপ্তাহে কোনও কোনও রোগীর ক্ষেত্রে তাপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে পারে। চতুর্থ সপ্তাহে রোগীর অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হয়।

রোগীকে সম্পূর্ণ আলাদা ও সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী রাখা উচিত এবং রোগীর ঠিকমত শুশ্রূষা হওয়া দরকার। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোনও কঠিন খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। মধ্যে ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছাইয়া দেওয়া উচিত। যেহেতু রোগীর মল-মূত্রে এই রোগের জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং মাছি এই জীবাণু বহিয়া লইয়া খাদ্যদ্রব্য দূষিত করিতে পারে, সেইজন্য মল-মূত্র মাটিতে পুঁতিয়া বা অন্যভাবে নষ্ট করা উচিত। আগে কাহারও এই রোগের আক্রমণ হইলে তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করা প্রায় অসম্ভব হইত। এখন ক্লোরোমাইসিটিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া অনেক সহজ হইয়াছে।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্যতম ইউনিয়ন টেরিটরি। বঙ্গোপসাগরে ৬° ও ১৪° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২° ও ৯৪° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। মোট স্থল-আয়তনের পরিমাণ ৮৩২৭ বর্গ কিলোমিটার (৩২১৫ বর্গ মাইল)। আন্দামান ছোট-বড় বিভিন্ন আয়তনের ২০৪টি এবং নিকোবর ১৯টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। সর্বাপেক্ষা উত্তরে অবস্থিত ল্যাণ্ডফল দ্বীপ হুগলী নদীর মুখ হইতে ৯০১ কিলোমিটার (৫৬০ মাইল) দূরে অবস্থিত। শাসন-কেন্দ্র পোর্ট ব্লেয়ার কলিকাতা হইতে ১২৫৫ কিলোমিটার (৭৮০ মাইল) ও মাদ্রাজ হইতে ১১৯১ কিলোমিটার (৭৪০ মাইল) দূরে। আন্দামানের প্রধান অংশ গ্রেট আন্দামান পাঁচটি বৃহদায়তন দ্বীপ (নর্থ আন্দামান, মিড্‌ল আন্দামান, সাউথ আন্দামান, বারাটঙ্গ এবং রুথল্যাণ্ড দ্বীপ) লইয়া গঠিত। গ্রেট আন্দামানের দক্ষিণে লিট্‌ল আন্দামান দ্বীপ। গ্রেট আন্দামান দ্বীপনিচয়ের দৈর্ঘ্য কোথাও ৪৬৭ কিলোমিটার (২৯০ মাইল) -এর অধিক নহে, প্রস্থেও ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) -এর অনধিক এবং মোট স্থল-আয়তন কমবেশি ৬৬৪২ বর্গ কিলোমিটার (২৫৮০ বর্গ মাইল)।

নিকোবর দ্বীপসমষ্টির উত্তরতম দ্বীপ কার নিকোবর, দক্ষিণতম গ্রেট নিকোবর; এই দ্বীপসমষ্টি লিট্‌ল আন্দামান এবং সুমাত্রার মধ্যবর্তী। গ্রেট নিকোবর সুমাত্রার উত্তর প্রান্ত হইতে প্রায় ১৯৩ কিলোমিটার (১২০ মাইল) ; কার নিকোবর এবং লিট্‌ল আন্দামানের দূরত্ব প্রায় ১২৯ কিলোমিটার (৮০ মাইল)। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দৈর্ঘ্য কোনস্থানেই ২৬২ কিলোমিটার (১৬৩ মাইল) -এর অধিক নহে, প্রস্থ ৫৮ কিলোমিটার (৩৬ মাইল) -এর অনধিক।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতপক্ষে একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত, সমস্তটিই একটি পর্বতশ্রেণী। পর্বতশ্রেণীর উর্ধ্বাংশ সাগরের উপরে দৃশ্যমান, নিম্নাংশ সাগরগর্ভে নিহিত। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপসমষ্টি দুইটি পৃথক পর্বতশিখরের অংশ।

পর্বতশিখরের উচ্চতা কোনস্থানেই ৭৮২ মিটার (২৫০০ ফুট) -এর অধিক নহে। এই পর্বতসংকুল দ্বীপগুলি গভীর বনে সমাকীর্ণ এবং কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাড়ি ও পর্বতশ্রেণী -নিঃসৃত জলধারার দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। এই দ্বীপগুলিতে কয়েকটি ভাল ভাল বন্দর আছে, যথা পোর্ট ব্লেয়ার, পোর্ট কর্নওয়ালিস, মায়াবন্দর এবং পোর্ট এল্‌ফিন্‌স্টোন ; নিকোবর দ্বীপসমষ্টির নানকৌড়ি বন্দর প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ-পরিবেষ্টিত (ল্যাণ্ড-লক্‌ড্) বন্দর বলিয়া প্রখ্যাত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু উষ্ণ ও মৌসুমীবায়ু -প্রভাবিত ; এখানে সব সময়েই আরামদায়ক সমুদ্রবাতাসের প্রাচুর্য। টলেমি হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এই দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন ; ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার অধুনালুপ্ত বন্দীপল্লীটি স্থাপিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৬৩৫৪৮ (পুরুষ ৩৯৩০৪ ও নারী ২৪২৪৪)। প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ২০। নিকোবর দ্বীপসমষ্টির ১৯টি দ্বীপের মধ্যে মাত্র ১২টিতে লোকবসতি আছে ; ইহাদের মধ্যে কার নিকোবরের (১৩১ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৪৯ বর্গ মাইল) জনসংখ্যা সর্বাধিক। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৬১৭ : ১০০০ ; ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ঐ দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী বহু পরিবারের স্ত্রীলোকগণ ভারতের মূল ভূমিতেই বসবাস করিতেছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৪১২২ জন উপজাতীয়। আন্দামানের আদিম অধিবাসীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিমতম জনসমষ্টি। ইহারা মূলতঃ জারাওয়া ও সেন্টেনেলিজ এই দুইটি শাখা

লইয়া গঠিত বনবাসী এরিমটাগা গোষ্ঠী এবং ওঙ্গী ও আন্দামানী এই দুইটি শাখাবিশিষ্ট উপকূলবাসী আর্বোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আন্দামানীদের সংখ্যা বর্তমানে ২৩ জন মাত্র। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় ওঙ্গীদের সংখ্যা ছিল ১৫০। জারাওয়া এবং সেণ্টেনেলিজ এই দুইটি উপজাতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সভ্যজগতের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি দুষ্প্রাপ্য। নিকোবর দ্বীপসমষ্টিতে বসবাসকারী নিকোবরীগণ জাতিগতভাবে আন্দামানের আদিম অধিবাসীগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত কয়েদিদের, প্রধানতঃ যাবজ্জীবন দণ্ডভোগকারী কয়েদিদের জন্য বিশাল বন্দীপল্লী ছিল; স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু বীর সংগ্রামীও এখানে তাঁহাদের উৎসর্গীকৃত জীবনের দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়াছেন। এখানে শান্ত জীবনযাপনকারী যাবজ্জীবন দণ্ডভোগকারী কয়েদিদের দশ বৎসর দণ্ডভোগের পর কিছু স্বাধীনতা এবং কিছু কিছু সামাজিক অধিকার দেওয়ার ফলে বন্দী ও তাহাদের পরিবার-সন্তান-সন্ততিদের লইয়া এক অদ্ভুত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের অধিকারে থাকার পর এই দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরধিকৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই অক্টোবর মাসে বন্দীপল্লীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় মূল ভূমি হইতে বিভিন্ন কারণে আগমনকারীদের 'আন্দামান ইণ্ডিয়ান্‌স' বলিয়া দেখানো হইয়াছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মূল ভূমি হইতে ৩০০০-এর অধিক পরিবারকে আন্দামানে পুনর্বসতি দেওয়া হইয়াছে এবং এই পুনর্বাসন এখনও চলিতেছে; যাহাদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কৃষক-পরিবার।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে জনসংখ্যার প্রতি হাজারে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৩৩৬; পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই অনুপাত যথাক্রমে ৪২৪ ও ১৯৪।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিশাল বন-এলাকা হইতে প্রতি বৎসর ভারতের মূল ভূমিতে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের আনুমানিক ৩০০০০ টন পাদাউক (আন্দামান রেডউড), গুরজান (প্লাইউড), পাপিতা (ম্যাচউড) ইত্যাদি কাঠ চালান আসে। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য; প্রচুর পরিমাণ নারিকেল, রবার এবং কাজু বাদাম উৎপাদন সম্ভব; টিকৃউড ও কফির চাষ লাভজনক। চা উৎপাদনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাধীন। এখানকার সরকারি করাতকলটি প্রতীচ্যের মধ্যে বৃহত্তম। এখানে একটি নারিকেল তৈলের কল আছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৬৬৪৮ জন পুরুষ ও ৪৫৪৬ জন নারী কর্মী; ইহাদের মধ্যে ৫২২৮ জন পুরুষ ও ১২২৭ জন নারী কৃষিকর্মে, ৬৯৮৬ জন পুরুষ ও ৩০৭ জন নারী বন-সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যে এবং ৫৪২৬ জন পুরুষ ও ১৬ জন নারী নির্মাণকার্যে নিযুক্ত আছেন (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার হিসাব অনুসারে)।

মূল ভূমির সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য কলিকাতা ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে এবং মাদ্রাজ ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে ১৪ দিন অন্তর জাহাজ, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে সপ্তাহে একবার বিমান এবং বেতার-সংযোগের ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি অনুযায়ী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা হইতেছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল; চীফ কমিশনার এবং পাঁচ জন সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ইহার প্রশাসনকার্য পরিচালনা করেন।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: Andaman and Nicobar Islands*, Calcutta, 1909; *The Andaman and Nicobar Islands*, Ministry of Information and Broadcasting, Delhi, 1957; *The Statesman's Year-Book*: 1962, S. H. Steinberg ed., London, 1962; *The Andaman and Nicobar Islands*: 1951 *Census Report*, vol. XVII (Parts I & II), Delhi, 1955.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আপদ্ধর্ম নিজের বৃত্তিদ্বারা জীবনধারণে অসমর্থ ব্যক্তির অগত্যা করণীয় কর্ম। ব্রাহ্মণের জীবিকার্জনের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি যাজন (পৌরোহিত্য), অধ্যাপন (পড়ানো) ও প্রতিগ্রহ (সজ্জনের নিকট হইতে দানগ্রহণ); ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ; বৈশ্যের বাণিজ্য, পশু-পালন ও কৃষি এবং শূদ্রের দ্বিজাতির সেবা। উচ্চবর্ণের লোক বিপন্ন হইয়া নিম্নবর্ণের কিছু কিছু বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিলেও নিম্নবর্ণের লোক কখনও উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। দ্বিজাতির সেবার দ্বারা শূদ্র জীবিকার্জনে অসমর্থ হইলে তন্তুবায়-সূত্রধারাদির কর্ম ও অন্য শিল্পকর্মের

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। আপৎকাল অতিক্রান্ত হইলেই প্রত্যেকে নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ করিবে। আপদ্ধর্মের সম্যক্ পরিপালনের দ্বারা মানুষ পরমগতি-লাভ করে (মনুসংহিতা ১০।৭৪-১৩০)। আপদ্ধর্মের চমৎকার দৃষ্টান্ত হইতেছে ক্ষুধাপীড়িত বিশ্বামিত্র কর্তৃক চণ্ডালগৃহ হইতে কুক্কুরমাংস গ্রহণ (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৪১)। পরবর্তী কালে আপদগ্রস্ত ব্যক্তির কৃত কার্যও প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে আপৎকালে শূদ্রান্নভোজনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আপস্তম্ব একজন ধর্মসূত্রকার। আপস্তম্বধর্মসূত্রের অন্তর্গত প্রমাণে মনে হয় তিনি সংহিতার পরবর্তী যুগের লোক। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত আপস্তম্বকল্পসূত্র ইহার প্রসিদ্ধ রচনা। এই গ্রন্থ ৩০টি প্রশ্নে বিভক্ত। প্রথম ২৩টি প্রশ্ন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-বিষয়ক এবং আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র নামে পরিচিত। ২৪ ও ২৫ -সংখ্যক প্রশ্নে পরিভাষা, প্রবরখণ্ড ও হৌত্রকমন্ত্র রহিয়াছে। ২৬ ও ২৭ -সংখ্যক প্রশ্নে গৃহ্য সংস্কারসমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াবিধির আলোচনা আছে। এই অংশের নাম আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র। ২৮ ও ২৯ -সংখ্যক প্রশ্ন আপস্তম্বধর্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। ৩০ সংখ্যক প্রশ্নের নাম শুল্বসূত্র। এই অংশে যজ্ঞকুণ্ডের মাপ, যজ্ঞবেদির মাপ প্রভৃতির আলোচনা আছে। জ্যামিতি ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে ইহা সুপ্রাচীন গ্রন্থ।

আপস্তম্বধর্মসূত্র গৌতম ও বৌধায়ন -ধর্মসূত্রের পরবর্তী এবং হিরণ্যকেশী ও বসিষ্ঠ -ধর্মসূত্রের পূর্ববর্তী। অর্থাৎ আপস্তম্বধর্মসূত্রের সংগ্রহকাল ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে নির্ধারণ করা যায়। নর্মদার দক্ষিণ অঞ্চলে আপস্তম্ব-মতাবলম্বীর প্রাধান্য দেখা যায় বলিয়া অনেকের মতে তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন।

অন্যতম ধর্মসংহিতা-রচয়িতা রূপে প্রসিদ্ধ আপস্তম্ব প্রাচীন আপস্তম্বের বংশধর হইতে পারেন।

আপাপন্থী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলের মুন্নাদাস নামে এক স্বর্ণকার এই ধর্মপন্থা প্রবর্তন করেন। তিনি কাহারও নিকটে উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, নিজেই এই পন্থা প্রচলন করেন; এইজন্য তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় আপাপন্থী নামে পরিচিত হয়। নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া ইহারা নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে, কোনও দেবতার অর্চনা করে না। রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ইহারা প্রথমে দীক্ষিত হইলেও এই মন্ত্রের 'রাম' রামায়েত-সম্প্রদায়ের রামের ন্যায় বিরাট ব্যক্তি বা দেবতা নহেন, ইনি নির্গুণ ঈশ্বরের প্রতীক। সাধনায় অগ্রসর হইলে ইহাদের সাধু বা ফকিরগণ গায়ত্রীক্রিয়ার অধিকারী হয়, গৃহীদের এই ক্রিয়ায় অধিকার নাই। এই ক্রিয়া অত্যন্ত গুহ্য, সাধারণের নিকটে কিঞ্চিৎ বীভৎস বলিয়াও মনে হইতে পারে। বাউলগণ যেমন দেহকে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করে ইহাদের মধ্যেও তদনুরূপ মত প্রচলিত দেখা যায়। গায়ত্রীক্রিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শুক্রাদি সঞ্চালন এবং গ্রহণরূপ কতকগুলি গুহ্যক্রিয়া ইহারা পালন করিয়া থাকে। ইহা অনেকাংশে বাউলদের চারিচন্দ্রসাধনার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। অযোধ্যা, নেপাল ও তরাই অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে এই মতবাদ অনুসৃত হইতে দেখা যায়। সৎনামী, পল্টদাসপন্থীদের সহিত ইহাদের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহাদের ফকির বা উদাসীনগণ পীতবর্ণের কোর্তা ও টুপি ব্যবহার করে। কেহ কেহ গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করে এবং নাসাপৃষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে কেশের নিকট পর্যন্ত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র করিয়া থাকে। গৃহস্থ বা ফকিরের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিয়া দেহ সমাধিস্থ করা হয়। ইহারা মৎস্য, মাংস ও মদ্য গ্রহণ করে না। কবীরের মতবাদের দ্বারা ইহারা প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৭০।

আপেক্ষিকবাদ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পদার্থবিদ্যায় এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। সীমাবদ্ধ অর্থে একটি আপেক্ষিকবাদ গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যাতেও (মেকানিক্স) ছিল। আইনস্টাইন এই তত্ত্বকে আরও ব্যাপকতা দেন এবং এইজন্য দেশ (স্পেস) ও কালের ধারণায় তাঁহাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করিতে হয়। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় এই পরিবর্তনের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছে ও হইতেছে।

গালিলিও-নিউটনীয় আপেক্ষিকবাদ— গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যায় একটি পরমস্থির (অ্যাট অ্যাবসল্যুট রেস্ট) কাঠামোর (বা স্থানাঙ্কতন্ত্রের— কো-অর্ডিনেট্ সিস্টেম -এর) এবং সমভাবে প্রবহমান একটি পরমকালের (অ্যাবসল্যুট টাইম) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই বলবিদ্যায় একটি বস্তুকণার উপর প্রযুক্ত বল (ফোর্স) এবং বস্তুকণার ত্বরণের (অ্যাক্সেলারেশন) সম্পর্ক হইল :

প্রযুক্ত বল = বস্তুকণার ভর × ত্বরণ

এই ত্বরণ চরমস্থির কাঠামোর অপেক্ষায় (অর্থাৎ তুলনায়) ত্বরণ। এখন যদি এমন আর একটি কাঠামো কল্পনা করা হয় যাহা পরমস্থির কাঠামোর তুলনায় সমগতিতে ধাবমান অর্থাৎ সর্বদা একই দিকে এবং একই দ্রুতিতে নিজের বিভিন্ন অবস্থানে সমান্তরাল থাকিয়া চলমান, তাহা হইলে সেই কাঠামোয় প্রযুক্ত বল ও বস্তুকণার ত্বরণের সম্পর্ক একই রূপ থাকিবে। তবে এবার ত্বরণ অর্থে চলমান কাঠামোর তুলনায় ত্বরণ বুঝিতে হইবে —অবশ্য উভয়ের মান সমান। যদি পূর্বের অনুরূপ আরও একটি কাঠামোর কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এই চলমান কাঠামো দুইটি পরস্পরের তুলনায় সমগতিতে (অর্থাৎ সর্বদা একই দিকে, একই দ্রুতিতে এবং বিভিন্ন অবস্থানে স্বীয় সমান্তরাল থাকিয়া) ধাবমান হইবে এবং প্রত্যেকটিতে প্রযুক্ত বল ও ত্বরণের সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকিবে। ধরা যাউক একখানি ট্রেন সরল গতিতে সমান বেগে ধাবমান। অর্থাৎ এই ট্রেনখানি সমগতিতে ধাবমান একটি কাঠামো। এই কাঠামো হইতে দেখা যাইবে প্ল্যাটফরম, গাছ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলি ইহার গতির বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহার ভিতরে একটি বস্তুকণা লইয়া গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্রানুসারে পরীক্ষার দ্বারা আমরা স্থির করিতে পারি না, ট্রেনখানি ধাবমান কি পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলি ধাবমান। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বল্প স্থিতিকালের জন্য আমরা ধরিয়া লইব যে পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলির গতি (যাহা পৃথিবীর গতির সমান) চরম কাঠামোর তুলনায় সমগতি। অর্থাৎ পরস্পরের তুলনায় সমগতিতে ধাবমান দুইটি কাঠামোর মধ্যে গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যার দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য নাই— উভয় কাঠামোই তুল্য; এই বলবিদ্যার সূত্র অনুসারে কল্পিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পরমস্থির কাঠামো এবং পরমসমগতি নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর তুলনায় সমস্ত সমগতিই আপেক্ষিক। ইহাই গালিলিও-নিউটনীয় আপেক্ষিকবাদ।

বিশেষ আপেক্ষিকবাদ (স্পেশাল থিয়োরি অফ রেলেটিভিটি)— আলোকের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এক সর্বব্যাপী আলোকবাহী ঈথরের কল্পনা করেন; আলোক এই ঈথরে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। স্বভাবতঃ মনে হয়, এই ঈথরকে পরমস্থির কাঠামো হিসাবে লওয়া যাইতে পারে। আলোক-সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ঈথরের তুলনায় পৃথিবীর গতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল যে এই গতি নির্ণয় করা যায় না— পার্থিব আলোক কিংবা পৃথিবীর বাহির হইতে আগত আলোকের বেগের উপর পৃথিবীর গতির কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না। অনেক বিজ্ঞানী নানাবিধ কল্পনার সাহায্যে এই জাতীয় নেতিবাচক ফলসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ফিট্জেরাল্ড (১৮৯৩ খ্রী) এবং লরেন্ৎস (১৮৯৫ খ্রী) নিরপেক্ষভাবে কল্পনা করেন যে, যদি কোনও বস্তু v বেগে সরল রেখায় সমান গতিতে চলিতে থাকে এবং যদি আলোকের বেগ হয় c, তবে বস্তুটির দৈর্ঘ্য গতির দিকে $\sqrt{1-v^2/c^2}$: 1 অনুপাতে কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই কল্পনায় আরও এমন কতকগুলি ফল পাওয়া যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে যাহাদের সংগতি নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লরেন্ৎস আবার একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বে উপরি-উক্ত নেতিবাচক ফলগুলির ব্যাখ্যা করা গেল এবং পরমদেশ ও পরমকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করিল।

স্থির বস্তুতে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনাবলীর এবং চলমান বস্তুতে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনাবলীর তত্ত্বের অসামঞ্জস্য আইনস্টাইনের নিকট অসন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। আলোকের গতি সম্পর্কে নেতিবাচক পরীক্ষালব্ধ ফলও তিনি অবগত ছিলেন। তাঁহার মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, তবে কি বলবিদ্যায় এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বে ভিন্ন প্রকার আপেক্ষিকবাদের প্রয়োজন? উভয় তত্ত্বকে তিনি একই আপেক্ষিকবাদের সীমায় আনেন। তিনি (লরেন্ৎস-নিরপেক্ষভাবে) নিম্নোক্ত দুইটি স্বীকার্যের ভিত্তিতে চলমান বস্তুতে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনাবলীর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০৫ খ্রী)।

স্বীকার্য ১. (আলোকের বেগের ধ্রুবতা): আলোকের বেগ আলোকবিকিরণকারী বস্তুর গতির উপর বা কোন্ দিকে আলোক বিকীর্ণ হইল তাহার উপর নির্ভর করে না।

স্বীকার্য ২. (আপেক্ষিকতাতত্ত্ব): কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পরমসমগতি (ইউনিফর্ম অ্যাবসল্যুট মোশন) নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। পরস্পরের তুলনায় সমগতিতে ধাবমান দুইটি কাঠামো প্রদত্ত থাকিলে তাহাদের একটিতে ভৌত ঘটনাবলী (ফিজিক্যাল ফেনমেনা) যে সকল সূত্র মানিয়া চলিবে, অপরটিতেও ঠিক সেই সকল সূত্র মানিয়া চলিবে। ইন্দ্রিয়গোচর পরমস্থির কাঠামোর অস্তিত্ব নাই।

আপাতদৃষ্টিতে এই স্বীকার্য দুইটি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে আমরা গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যার দৃষ্টিতে বিচার করিতেছি। উহাতে স্বীকার করা হইয়াছে:

ক. দুইটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কাঠামোর গতিনিরপেক্ষ (পরমকালের ধারণা)।

খ. একটি দৃঢ় পিণ্ডের (রিজিড বডি) উপর দুইটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব কাঠামোর গতিনিরপেক্ষ (চরম-দেশের ধারণা)।

কিন্তু আলোকের গতিসংক্রান্ত পরীক্ষার নেতিবাচক ফল এই ইঙ্গিতই করে যে, পরমকালের ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। আইনস্টাইন বলেন, যে সকল বিচারে সময় জড়িত আছে সেইগুলি এককালীন (সিমালটেনিয়াস) ঘটনার বিচার মাত্র। আলোকের গতি সসীম, তাই যে ঘটনাগুলি এক কাঠামোয় এককালীন, অপর একটি চলমান কাঠামোয় তাহারা এককালীন নহে। এককালীনতা আপেক্ষিক, পরম নহে। প্রত্যেক কাঠামোয় স্থির পর্যবেক্ষকের নিজ নিজ সময়ের মান আছে। কাল আপেক্ষিক, পরমকাল নাই।

এই সকল বিচারের গাণিতিক ফল হিসাবে নিম্নোক্ত সূত্রগুলি পাওয়া গেল। যদি একটি দণ্ড তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে v বেগে সমানভাবে চলিতে থাকে এবং যে পর্যবেক্ষক ইহার সহিত সমবেগে চলিতেছেন তাঁহার মতে ইহার দৈর্ঘ্য হয় l_0, তবে যে পর্যবেক্ষক ইহাকে v বেগে চলিতে দেখিতেছেন তাঁহার পরিমাপমতে ইহার দৈর্ঘ্য হইবে $l=l_0\sqrt{1-v^2/c^2}$ (লরেন্ৎস-সংকোচন)। ঐ দণ্ডটির সঙ্গে আবদ্ধ একটি ঘড়ির এক সেকেণ্ড সময় দণ্ডটির সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষকের এক সেকেণ্ডই মনে হইবে, কিন্তু অপর পর্যবেক্ষকের নিকট উহা $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ সেকেণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইবে (আইনস্টাইনের সময় দীর্ঘীকরণ) মহাজাগতিক রশ্মিতে বর্তমান মিউমেসনের জীবিতকাল হইতে ইহার সাক্ষ্য মেলে। স্থির অবস্থায় একটি মিউমেসনের জীবন $2{\cdot}2\times10^{-6}$ সেকেণ্ড, কিন্তু চলমান অবস্থায় এই সময় দশ গুণেরও অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। সময়ের এই দীর্ঘতা ইহার উচ্চ বেগের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরও একটি সূত্র পাওয়া গেল, আলোকের বেগই সর্বোচ্চ বেগ। ইহার বেগের সহিত আর যে কোনও বেগই যোগ করা যাউক না কেন, ফল আলোকের বেগই হইবে। যদি একটি সমগতিতে ধাবমান কাঠামোয় একটি প্রদীপ আলোক দিতে থাকে তবে অন্য যে কোনও অনুরূপ কাঠামো হইতে আলোকের একই বেগ c লক্ষিত হইবে। ধরা যাউক, একটি কাঠামো অপর একটি কাঠামোর তুলনায় সমগতিতে v বেগে চলিতেছে এবং এই চলমান কাঠামোর তুলনায় একটি বিন্দুর বেগ u। u এবং v, c হইতে মানে ছোট কিন্তু তাহারা c-এর যত নিকটেই হউক না কেন, বেগ দুইটির যোগের সূত্র অনুযায়ী প্রথম কাঠামো হইতে বিন্দুটির বেগ c-এর তুলনায় ছোট বলিয়া মনে হইবে। অর্থাৎ আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি দুইটি বেগকে যোগ করিলেও তাহা আলোকের বেগ অপেক্ষা ছোট থাকিবে। এই যোগসূত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষালব্ধ অন্য ফলসমূহেরও ব্যাখ্যা করা যায়।

বিশেষ আপেক্ষিকবাদের অপর একটি ফল হইল ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার। শক্তির সঙ্গে ভর (ম্যাস্) এবং ভরের সহিত শক্তি সংশ্লিষ্ট। সূত্রটি এই :

$$E=mc^2$$

E=শক্তির মান, m=ভরের মান, c=আলোর গতি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষেত্রে ভর শক্তিতে পরিণত হয়। সূর্যের শক্তি, পারমাণবিক শক্তি এবং হাইড্রোজেন বোমার শক্তি— এই সবেরই উৎস ভর। আমরা আলোককণায় (ফোটনে) যে ভর আরোপ করি তাহাও এই সূত্র অনুসারে এবং ইহা পরীক্ষাসম্মত। ইলেক্‌ট্রনের চলমান অবস্থায় ভরের বেগের উপর যে নির্ভরতা বিশেষ আপেক্ষিকবাদ হইতে পাওয়া যায়, তাহাও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত।

গাণিতিক মিন্‌কোভ্‌স্কি আইনস্টাইন-প্রবর্তিত বিশেষ আপেক্ষিকবাদের চতুর্মাত্রিক রূপ দেন (১৯০৮ খ্রী)।

তিনটি সাধারণ দেশ-স্থানাঙ্ক (স্পেস কো-অর্ডিনেট্‌স) x, y, z এবং একটি কাল-স্থানাঙ্ক (টাইম কো-অর্ডিনেট্) t, মোট এই চারিটি স্থানাঙ্ক দিয়া যে কোনও ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ আমরা বলি, অমুক ঘটনাটি অমুক স্থানে অমুক সময়ে ঘটিয়াছে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকবাদ অনুসারে এক চলমান কাঠামো হইতে অন্য চলমান কাঠামোয় গেলে $x^2+y^2+z^2-c^2t^2$ অপরিবর্তিত থাকে। মিন্‌কোভ্‌স্কির চতুর্মাত্রিক দেশে (বা দেশ-কালে) ঘটনার স্থানাঙ্করূপে লওয়া হয় $x_1=x$, $x_2=y$, $x_3=z$, $x_4=\sqrt{-1}\,ct$। এখন এক কাঠামো হইতে অন্য কাঠামোয় পরিবর্তনে $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2$ অপরিবর্তিত থাকে। গণিতের ভাষায় এক চলমান কাঠামো হইতে অন্য চলমান কাঠামোয় পরিবর্তনের জ্যামিতিক রূপ হইল চতুর্মাত্রিক দেশে স্থানাঙ্ক-অক্ষের ঘূর্ণন। এই চতুর্মাত্রিক দেশে একটি সমবেগে ধাবমান কণার কক্ষপথ হইবে একটি সরল রেখা, বেগ সমান না থাকিলে সেই পথ হইবে বক্র রেখা। এই রেখার নাম কণার জগৎ-রেখা। সাধারণ আপেক্ষিকবাদের আলোচনার পক্ষে এই চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিক ধারণা বিশেষ সুবিধাজনক।

সাধারণ আপেক্ষিকবাদ (জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি, ১৯১৫-১৭ খ্রী)— বিশেষ আপেক্ষিকবাদে শুধু সমগতির আপেক্ষিকতাই আলোচিত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা পরমদেশের ধারণা যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু আবর্তনের ক্ষেত্রে :

প্রযুক্ত বল = ভর × ত্বরণ

এই সূত্রটি পরমদেশের অস্তিত্ব নির্দেশ করে; কেন্দ্রাতিগ বল ও করিওলি বল এই পরমদেশের তুলনায় উপস্থিত হয়। দেখা যাইতেছে, চরমদেশ এক ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাহিরে, অথচ অপর ক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব আছে। ইহা এক অসন্তোষজনক অবস্থা। আইনস্টাইনের মতে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহ অবশ্যই এইরূপ হইবে যে, তাহারা যেন যে কোনভাবে চলমান কাঠামোয় প্রযোজ্য হয়। ইহাই তাঁহার সাধারণ আপেক্ষিকবাদ। তবে এই সাধারণ ক্ষেত্রে চতুর্মাত্রিক দেশের স্থানাঙ্ক অক্ষসমূহ আর সরল রেখা থাকে না, বক্র রেখায় পরিণত হয়। সাধারণ আপেক্ষিকবাদের গাণিতিক রূপ এই যে, চতুর্মাত্রিক দেশে সমস্ত বক্ররৈখিক স্থানাঙ্কতন্ত্র (কার্ভিলিনিয়ার কো-অর্ডিনেট্ সিস্টেম) প্রকৃতির সাধারণ সূত্র প্রকাশের জন্য তুল্য। সাধারণ আপেক্ষিকবাদে চতুর্মাত্রিক দেশের যে কোনও দুইটি নিকটস্থ বিন্দুর দূরত্ব সমস্ত বস্তুর বেগ এবং বণ্টন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকবাদ প্রতিষ্ঠার সময় দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লন :

১. যাহার উপর কোনও তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র ক্রিয়া করিতেছে না এমন একটি বস্তুকণা বা আলোকরশ্মির জগৎ-রেখা হইবে হ্রস্বতম (চতুর্মাত্রিক দেশে)। হ্রস্বতম রেখা সকল ক্ষেত্রেই সরল রেখা হইবে এরূপ নহে। একটি গোলকের তল লইয়া আলোচনা করিলে দেখিব, ঐ তলের উপর দুইটি বিন্দুর সংযোজক যে হ্রস্বতম রেখা তাহা সরল রেখা নহে; ঐ বিন্দু দুইটির সংযোজক সরল রেখা তলের বাহিরে।

২. চতুর্মাত্রিক দেশের স্বল্প অংশের জন্য বিশেষ আপেক্ষিকবাদ প্রযোজ্য। গতির আপেক্ষিকবাদ যে কিভাবে মহাকর্ষের (গ্র্যাভিটেশন-এর) ব্যাখ্যা দিতে পারে তাহা আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নহে। এমন একটি কাঠামোর কথা কল্পনা করা যাউক, যাহাতে একটি বস্তুকণা অন্যান্য বস্তু হইতে বহু দূরে থাকিলে সরল রেখায় সমান বেগে চলিতে থাকিবে। মনে করা যাউক ইহাতে একটি বড় লিফ্ট্ সমান ত্বরণের সহিত উপরে উঠিতেছে। এখন যদি একটি বস্তুকণা লিফ্টের ছাদ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা নিম্নদিকে সমান ত্বরণের (যাহার মান লিফ্টের ত্বরণের সমান) সহিত লিফ্টের মেঝেয় আসিয়া পড়িবে। লিফ্টের ভিতরে যদি একজন পর্যবেক্ষক থাকেন এবং তিনি যদি লিফ্টের গতি সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন, তবে তিনি বলিবেন যে বস্তুকণাটি একটি অভিকর্ষজ সমক্ষেত্রে (অর্থাৎ সমান ত্বরণক্ষেত্রে) চলিতেছে। লিফ্টের ত্বরণ অভিকর্ষজ ত্বরণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই ঘটনাটিকে বিপরীত দিক হইতেও দেখা যাইতে পারে, অর্থাৎ অভিকর্ষজ ক্ষেত্র ত্বরণ-সংযুক্ত কাঠামো বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারে। আইনস্টাইন ইহার নাম দেন তুল্যতার তত্ত্ব (প্রিন্সিপ্ল অফ ইকুইভালেন্স, ১৯১১ খ্রী)। এই তত্ত্ব তিনি অসম অভিকর্ষজ (ও মহাকর্ষজ) ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করেন। এইরূপে অভিকর্ষের (ও মহাকর্ষের) সমস্যাসমূহ সকল প্রকার গতির আপেক্ষিকতায় গিয়া দাঁড়ায়। তুল্যতার তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় স্বীকার্যটির সহায়তায় আইনস্টাইন অভিকর্ষজ (ও মহাকর্ষজ) ক্ষেত্র-সমীকরণসমূহ দেন। আলোকের গতির উপরও যে তুল্যতার তত্ত্ব প্রযোজ্য, তাহা তিনি স্বীকার করিয়া লন।

পরে তিনি এই ক্ষেত্রসমীকরণসমূহ হইতে একটি বস্তুকণার গতির সমীকরণ নির্ধারণ করেন. সেটি অতিরিক্ত স্বীকার্যরূপে লওয়ার প্রয়োজন নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তুর বেগ ও বণ্টন চতুর্মাত্রিক দেশের দুইটি নিকটস্থ বিন্দুর ভিতর দূরত্ব নির্ধারণ করে। এইরূপে তাহারা চতুর্মাত্রিক দেশের বক্রতা নির্ধারণ করে। এই বক্র চতুর্মাত্রিক দেশে হ্রস্বতম রেখা সরল রেখা নহে। সরল রেখা হইতে ইহার যে প্রভেদ তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য গালিলিও-নিউটনীয় বলবিদ্যায় বলের ধারণা আনিতে হইয়াছিল। আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্বে উহার প্রয়োজন নাই।

নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্বের প্রথম আসন্নমান (অ্যাপ্রক্সিমেশন)। গ্রহগুলির অনুসূর (পেরিহিলিয়ন) অবস্থানের গতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নিউটনের তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় নাই— কিছুটা অব্যাখ্যাতই থাকিয়া গিয়াছিল। আইনস্টাইনের তত্ত্বে এই ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। বুধগ্রহের বেলায় এই অবশিষ্ট গতি প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ সেকেণ্ড কোণ। আইনস্টাইন তাঁহার তত্ত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সূর্যের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আলোকরশ্মি ১.৭ সেকেণ্ড কোণ দিয়া বাঁকিয়া যাইবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষার দ্বারা ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষজ (ও অভিকর্ষজ) ক্ষেত্র দিয়া আলোক যাইবার

সময়ে তাহার স্পন্দনসংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) কমিয়া যায়, আলোক রক্তাভ মনে হয়। এতদিন পরীক্ষার দ্বারা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারা যায় নাই। মোসবাউয়ার গামারশ্মির উপর পরীক্ষা করিয়া ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (১৯৫৮ খ্রী)।

আইনস্টাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্পনা এই যে, চতুর্মাত্রিক জগৎ সসীম। এইজন্য তিনি তাঁহার মহাকর্ষজ ক্ষেত্রসমীকরণগুলিকে সামান্য একটি পদ যোগ করিয়া সংশোধন করেন। ইহারই ভিত্তিতে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (কস্‌মলজি) গড়িয়া উঠিয়াছে।

জীবনের শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইন মহাকর্ষতত্ত্ব ও তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের সমন্বয়সাধনে ব্রতী ছিলেন। তাহার ফল তাঁহার একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব (ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি)। তবে ইহা কতদূর সফল তাহার বিচার করিবেন ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা।

দ্র এল. লান্দাও এবং ওয়াই রুমার, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, বিনয় মজুমদার অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৬৩; A. Einstein, *Relativity, The Special and the General Theory*, London, 1960; A. Einstein, *The Meaning of Relativity*, London, 1956; P. G. Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity*, New York, 1942.

পরিমলকান্তি ঘোষ

আপ্পা সাহেব ভোঁসলে দ্র

আফগানিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের এই রাজ্যটি ২৯° ও ৩৮°৩৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬০°৫০′ ও ৭১°৫০′ (কতক অংশ ৭৫) পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত; উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত আফগানিস্তানের সর্বাধিক প্রস্থ ১১২৬ কিলোমিটার (৭০০ মাইল), হেরাত সীমা হইতে খাইবার পাস পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬৬ কিলোমিটার (৬০০ মাইল)। আনুমানিক আয়তন ৬৪৭৫০০ বর্গ কিলোমিটার (২৫০০০০ বর্গ মাইল)। আফগানিস্তানের পূর্বে— ডুরাণ্ড লাইনের ('ডুরাণ্ড লাইন' দ্র) অপর পারে— এবং দক্ষিণে পাকিস্তান, উত্তর-পূর্বে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরে চীন ও রাশিয়া -অধিকৃত তুর্কিস্তান, পশ্চিমে ইরান।

হিন্দুকুশ আফগানিস্তানের প্রধান পর্বতমালা। উহার গড় উচ্চতা ৪২০০ মিটারের (১৪০০০ ফুট) অধিক— বহুস্থানে উচ্চতা ৫৪০০ মিটারের (১৮০০০ ফুট) অধিক। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে উচ্চ শিখরগুলি তুষারাবৃত থাকে। কোহ্-ই-বাবা পর্বতমালা হিন্দুকুশ হইতে বাহির হইয়া উত্তর আফগানিস্তানকে বিভক্ত করিয়া পশ্চিমে বিস্তৃত। বন্দ্-ই-তুর্কিস্তান, বন্দ্-ই-বাবা ও বন্দ্-ই-বৈয়ান পর্বতমালা কোহ্-ই-বাবার শাখা। পূর্ব আফগানিস্তানে সফেদ-কোহ্ পর্বতমালা সর্বপ্রধান। কাবুল, ঘোরবন্দ্, হেলমন্দ্, পঞ্জ্‌শির, অক্‌সস্, ঘুরখার, হরিরুদ ইত্যাদি এখানকার প্রধান নদী। নদী-উপত্যকাগুলিই উর্বর। ইহা ব্যতীত রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি পর্বতসংকুল, শুষ্ক ও অনুর্বর।

রাজ্যের রাজধানী কাবুলে অবস্থিত। এই রাজ্যে ২৫টি প্রদেশ আছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের আনুমানিক লোকসংখ্যা ছিল ১৩৫০০০০০০। আফগানিস্তানে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্য আফগানিস্তানের আফগান জাতিভুক্ত লোকেরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। পূর্ব আফগানিস্তানের পশ্‌তোভাষী ওয়াজিরি, আফ্রিদি ইত্যাদি, কাবুল উপত্যকার কাফিরিজনভুক্ত উপজাতি পাঠান নামে পরিচিত। মধ্যাঞ্চলের হাজারাগণ মোঙ্গল মহাজাতি হইতে উদ্ভূত। উত্তর আফগানিস্তানের বাল্‌খ্, শিবারঘান, কাটাঘান ও মৈমানা অঞ্চলের লোকেরা তুরানীভাষী তুর্কজাতিভুক্ত। পশ্চিম আফগানিস্তানের তাজিকরা পারসীকভাষী। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আছে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বদকৃচিরা ও দক্ষিণের যাযাবর বালুচরা। সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু। তুর্ক মঙ্গোলগণের মধ্যে কিছু শিয়া ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ও অক্‌সস্ লোক আছে। তাজিকদের মধ্যেও কিছু শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত সুফীভাবাপন্ন মুসলমান আছে। বহু গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ করিয়া দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের এবং যাযাবরদিগের মধ্যে, ইসলাম ধর্ম বিরোধী অনেক লৌকিক ধ্যান-ধারণা রীতি-নীতি প্রচলিত। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা এবং যাযাবরদিগের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী, বেশবাস ও স্ত্রীলোকের ভূমিকার পার্থক্য যথেষ্ট প্রকট।

আমানুল্লার রাজত্বকাল (১৯১৯-১৯২৯ খ্রী) হইতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষিত হইলেও জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের হার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন ও সোভিয়েট সাহায্যে দেশের জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং পরিবহনব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শুরু হইয়াছে।

রাজ্যের উপত্যকা অঞ্চলগুলি উর্বরা। ক্ষুদ্র নদী ও কূপ হইতে জলের সাহায্যে এই সমস্ত অঞ্চলে ভাল ফসল হয়। বহু এরণ্ড, ম্যাডার ও হিঙ্গু বৃক্ষ এই রাজ্যে আছে। প্রচুর

পরিমাণে গম, যব, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য এবং বাদাম, পেস্তা, আখরোট ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় ফল উৎপন্ন হয়। মেষচর্ম, দুম্বার মাংস, চর্বি ও পশম উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য। কিছু তুলাও উৎপন্ন হয়। সরকারি উদ্যোগে এই শতকের তৃতীয় দশক হইতে কাবুল, কান্দাহার ও হেরাত প্রদেশে এবং আফগানিস্তানের অন্যত্র বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, কার্পেটশিল্প, অস্ত্রশিল্প প্রভৃতির বিভিন্ন কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক সাহায্যে পরিবহন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। হেরাতের নিকট ও উত্তর আফগানিস্তানে খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংরক্ষিত ফল, পশম, পারসীক মেষচর্ম, তুলা ইত্যাদি রপ্তানি হয়।

সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে ভারতের সহিত আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঋগ্বেদে আফগানিস্তানের অনেক নদ-নদী ও প্রাচীন জাতির উল্লেখ আছে।

পারস্যসম্রাট্ কাইরাস আফগানিস্তানের কতক অংশ জয় করেন। পরে সমগ্র দেশই পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে পারস্য-সম্রাট্‌কে পরাজিত করিয়া সমগ্র আফগানিস্তান অধিকার করেন। আলেকজাণ্ডার এই দেশে কয়েকটি সুরক্ষিত নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের উত্তরাধিকারী সেলুকস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নিকট পরাজিত হন এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে আরিয়া (হেরাত), আরকোসিয়া (কান্দাহার) ও পরোপনিসদৈ (কাবুল) চন্দ্রগুপ্তের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। আফগানিস্তানের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অংশগুলি এবং সগ্‌ডিয়ানা (বুখারা অঞ্চল) সেলুকসের বংশধরদের হস্তে থাকিয়া যায়। ইহাদের সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে ব্যাকট্রিয়ার (বাল্‌খ্) অঞ্চলের গ্রীক শাসন-কর্তা এবং পার্থিয়া বা কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বের (খোরাসান অঞ্চলের) পহ্লবগণ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আফগানিস্তানের যে অংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, তাহা অশোকের মৃত্যুর পর ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরাজা অধিকার করেন। এই সময়ে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শক্তি ছিল। ব্যাকট্রিয়গণের অন্তর্বিবাদের সুযোগে পহ্লবগণ আরিয়া ও আরকোসিয়া এবং শকগণ ব্যাকট্রিয়ার অংশবিশেষ ও সগ্‌ডিয়ানা দখল করিয়া লয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মধ্য এশিয়ার ইউ-চি জাতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া শকগণ দ্রাঙ্গিয়ানা অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিতে শুরু করিয়া দিল; তাহাদের নামানুসারেই ঐ স্থান শকস্তান বা সিস্তান বলিয়া পরিচিত হয়। আরকোসিয়ার পহ্লব শাসনকর্তা গণ্ডোফারনেসের নেতৃত্বে পহ্লবগণ কাবুল উপত্যকায় যবনশাসনের অবসান ঘটায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার ইউ-চি জাতি আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদের পাঁচটি শাখার অন্যতম কুষাণগণ সমগ্র ইউ-চি জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই শাখার প্রথম পরাক্রান্ত নৃপতি কুজুল ক্যাডফিসেস্ কাবুল উপত্যকা হইতে পহ্লবদের বিতাড়িত করেন। কুষাণ-সম্রাট্ কনিষ্ক পুরুষপুরে (বর্তমান পেশওয়ার) রাজধানী স্থাপন করিয়া আফগানিস্তান, বাল্‌খ্ এবং ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অংশ লইয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত হয় এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় শতকে পারস্যের সামানীয় সাম্রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং পারসীকগণ ২২৬ হইতে ২৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাল্‌খ্, খোরাসান, শকস্তান ও কাবুল উপত্যকা সামানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করে। কাবুল উপত্যকায় কুষাণগণ পারসীক সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া আরও একশত বৎসর রাজত্ব করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার শ্বেতকায় যাযাবর হূণগণ অক্‌সস্ বা আমুদরিয়া অতিক্রম করিয়া আফগান তুর্কিস্তান বা তুখারিস্তানের অনেকাংশ অধিকার করিয়া ব্যাকট্রিয়ায় তাহাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করে। উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফগানি-স্তানে শক এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম আফগানিস্তানে পারসীক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ আফগানিস্তানে আসিয়া উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব আফগানিস্তানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি শক-তুখার রাজ্য এবং ঐ রাজ্যগুলিতে বহু বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারাম দেখিতে পান। নবম শতকের পূর্বভাগে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে হিন্দু রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরবীয় মুসলমানগণ পারস্য দেশ জয় করিবার পর বহুবার কাবুল ও কান্দাহার আক্রমণ করে কিন্তু স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে কান্দাহার বিজিত হয়। কাবুলের শাহীবংশীয় হিন্দু রাজগণ ইহার পরও বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল এবং পাঞ্জাবের এক অংশ পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত থাকায় ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়।

গজনীর তুর্কিদেশীয় মুসলমান সুলতান সবুক্তগীন ও মামুদ শাহীবংশীয় জয়পালকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্তানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গজনী হইতেই মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সুলতান মামুদ প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার বুখারা অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব পারস্য এবং পাঞ্জাবের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজধানী গজনীর উন্নতিকল্পে তিনি শহরে পয়ঃপ্রণালী খনন করান, জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং অনেক সুরম্য প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করান। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'শাহনামা' রচয়িতা বিখ্যাত কবি ফিরদৌসী তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যের পশ্চিম ভাগ তুরস্কের সেলজুগগণ এবং পরে অন্যান্য অংশ ঘোর (হেরাতের পূর্বভাগ)-এর ঘোরীবংশীয় আফগানগণ অধিকার করে। ঘোরীবংশের সাহাবুদ্দীন মহম্মদই উত্তর ভারতে প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গ্রামশীর-এর খলজ উপজাতীয় তুর্কগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং কালক্রমে এই খলজীরা (খিলজী) দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুর্ক ও আফগান রাজ্যগুলি অতঃপর দিল্লী সুলতানের অধীন হয়। কিয়ৎকালের জন্য কাবুলে শক্তিশালী খোয়ারজিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই চেঙ্গিজ খাঁর (১১৬২-১২২৭ খ্রী) আক্রমণে উহার রাজ্যের পতন ঘটে। আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে চেঙ্গিজ খাঁর উত্তরাধিকারী মঙ্গোলগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের আরম্ভ পর্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের সহিত আফগানিস্তানের সকল সম্পর্ক রহিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈমুরলঙ সমগ্র আফগানিস্তানকে বিধ্বস্ত করিয়া ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বাল্‌খ্, গজনী, কাবুল, কান্দাহার এবং হেরাতে কতিপয় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইহাদেরই অন্যতম, কাবুল ও কান্দাহারের নৃপতি বাবর, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে লোদীবংশীয় শেষ সুলতানকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। সম্রাট্ আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী) পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যরাজ কান্দাহার অধিকার করেন।

১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের খিলজাই ও হেরাতের আবদালী বা দুররানীরা পারসীক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারসীক যোদ্ধা নাদির শাহ্ মোগলদের অধীনস্থ অঞ্চলসহ সমগ্র আফগানিস্তান কবলিত করেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের অপঘাত মৃত্যুর পর আবদালী বা দুররানী বংশীয় আহ্‌মদ্ শাহ্ আবদালী সর্বপ্রথম সমগ্র আফগানিস্তানে একটি আফগান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আহ্‌মদ্ শাহ্ আবদালী (১৭৪৭-১৭৭৩ খ্রী) বর্তমান খোরাসান, কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদিগকে পরাজিত করেন।

তাঁহার পুত্র তৈমুরের রাজত্বকালে (১৭৭৩-১৭৯৩ খ্রী) বাল্‌খ্ ও খোরাসান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তৈমুরের পুত্রসংখ্যা ছিল ২৩। ইহারা অন্তর্বিবাদে লিপ্ত হইলে জামানের রাজত্বকালে (১৭৯৩-১৭৯৯ খ্রী) পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাঞ্জাব আফগান শাসনমুক্ত হয়। সুজা-উল-মুল্‌কের রাজত্বকালে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর এবং পারসীকগণ হেরাত অধিকার করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং আফগানিস্তানে রুশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া বিবদমান এক পক্ষের সমর্থনে দুইটি ব্রিটিশ বাহিনী যুগপৎ আফগানিস্তান আক্রমণ করে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার ইংরেজবাহিনীর অধিকারে আসে। আমীর দোস্ত মহম্মদ পরাজিত হন ও ইংরেজগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন; শাহ্ সুজা-উল-মুল্‌ক্ ইংরেজ কর্তৃক আফগানরাজরূপে স্বীকৃত হন। কিন্তু ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া কাবুলস্থ ইংরেজ সেনানিবাসের সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করে এবং সমগ্র আফগানিস্তান হইতে ইংরেজ বিতাড়নে কৃতসংকল্প হয়। অবশেষে ইংরেজগণের সহিত দোস্ত মহম্মদের এক চুক্তি হয় এবং ইংরেজ বাহিনী (৪৫০০ সৈন্য এবং ১২০০০ স্ত্রী-পুরুষ) আফগানিস্তান ত্যাগ করে; কিন্তু পথিমধ্যে এই বিপুল বাহিনী আফগানদের হস্তে নিহত হয়—মাত্র একজন জীবিত ইংরেজ এই শোচনীয় দুর্ঘটনার বার্তা বহন করিয়া ভারতে পৌঁছান (১৮৪২ খ্রী)।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে পেশোয়ার জয়ের আশায় আফগানগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে শিখ পক্ষে যোগদান করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ বাল্‌খ্ ও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পারসীকগণের নিকট হইতে হেরাত জয় করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের সহিত ইংরেজের এক বন্ধুত্ব চুক্তি হয়।

মধ্য এশিয়ায় রুশ শক্তির দ্রুত প্রসারে শঙ্কিত হইয়া

ইংরেজগণ কাবুলে এক রাজদূত রাখিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু আমীর শের আলী ইহাতে সম্মত না হওয়ায় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সহসা আফগানিস্তান আক্রমণ করেন (১৮৭৮ খ্রী)। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হয় কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আফগানিস্তানে গোলমাল চলিতে থাকে। ইংরেজরা আবদুর রহমানকে নূতন আমীর ঘোষণা করিয়া নূতন এক সন্ধি করে (১৮৮০ খ্রী)।

এই সন্ধির প্রধান শর্ত ছিল দুইটি : ১. আফগানিস্তানের আমীর ইংরেজদের অনুমতি ব্যতীত কোনও বৈদেশিক গভর্নমেণ্টের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না; ২. কোনও বিদেশী শত্রু আফগানিস্তান আক্রমণ করিলে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আমীরকে সাহায্য করিবেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আমীরকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তিদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ভবিষ্যতে রাশিয়ার আক্রমণ রোধ করিবার জন্য ১৮৮৭-৮৮ এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কতকগুলি পার্বত্য জাতি বাস করে। ইহারা আফগানজাতীয় মুসলমান, কিন্তু আমীরের অধীনতা স্বীকার করিত না— ব্রিটিশের প্রভুত্বও মানিত না। ইহাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আমীরের সহিত এক সন্ধি করেন (১৮৯৩ খ্রী)। ইহার দ্বারা এক ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়— তাহার পশ্চিমে আমীরের এবং পূর্বে ইংরেজের আধিপত্য উভয় পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হয়। স্যর মার্টিমার ডুরাণ্ড এই সীমা চিহ্নিত করেন বলিয়া ইহা 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে খ্যাত। কিন্তু এই সীমারেখার পূর্বস্থিত দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিসমূহ সহজে ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করে নাই। ভারত গভর্নমেণ্ট ইহাদের বিরুদ্ধে বহু সামরিক অভিযান করিয়া ইহাদিগকে দমন করেন। ইহার মধ্যে চিত্রল অভিযান (১৮৯৫ খ্রী) এবং ১৮৯৭ সালের ব্যাপক অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমীর আবদুর রহমান ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন। তাঁহার পুত্র হবিবুল্লা ইংরেজদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করিলেও কার্যতঃ নিরপেক্ষ নীতিই অনুসরণ করিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেকের উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তিনি আফগানিস্তানে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন (১৯১৯ খ্রী)। সিংহাসনের অধিকার লইয়া কিছুদিন বিবাদ-বিসংবাদ চলে। অতঃপর হবিবুল্লার পুত্র আমানুল্লা আমীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আফগান সৈন্য সহজেই পরাজিত হয় এবং কাবুল ও জালালাবাদ শহরের উপর ইংরেজ সৈন্য বোমা বর্ষণ করে। ফলে দুই মাসের মধ্যেই এই তৃতীয় ইংরেজ-আফগান যুদ্ধ শেষ হয় (এপ্রিল-মে ১৯১৯ খ্রী)। সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আফগানিস্তানকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। আমীরের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ হয়— ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের রাজদূত কাবুলে এবং কাবুলের রাজদূত লণ্ডনে বাস করিবেন এইরূপ স্থির হয়।

আমীর আমানুল্লা পিতার ন্যায়— অথবা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক— পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক ইওরোপ ভ্রমণ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া নানাবিধ সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় (জানুয়ারি ১৯২৯ খ্রী)। আমানুল্লা রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

রাজধানী কাবুল বাচ্চা-ই-সাকাও নামক এক দস্যুর করায়ত্ত হয়। বাচ্চা-ই-সাকাও হবিবুল্লা নাম ধারণ করিয়া নয় মাস কাল কাবুল ও তৎসন্নিহিত এলাকা, হেরাত এবং উত্তরাঞ্চল শাসন করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নাদির শাহ্ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু আমানুল্লার পরিণাম স্মরণ করিয়া অতিশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র মহম্মদ জহীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জহীর শাহের আমলে (১৯৩৩ খ্রী) আফগানিস্তানে উন্নয়ন প্রচেষ্টা নবোদ্যমে শুরু হয়। এই প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের উদ্যোগ স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করে। প্রধানতঃ জার্মানীর নিকট প্রাপ্ত ঋণে যন্ত্রপাতি কেনা হয় এবং কলকারখানা ও মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্মিত হয়। কিছু সেচ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কার্যও সমাধা হইয়াছে। রাজ্য জুড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন জহীর শাহের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তান লীগ অফ নেশনস্-এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে আফগানিস্তান নিরপেক্ষ থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর (১৯৪৭ খ্রী) পাকিস্তানের

সহিত আফগানিস্তানের বিরোধ দেখা দেয়। ডুরাণ্ড লাইনের পূর্ব দিকে যে পশ্‌তোভাষী অঞ্চল রহিয়াছে, তাহার পাকিস্তানভুক্তি আফগানিস্তানের মনঃপূত হয় নাই। আফগানিস্তান ডুরাণ্ড চুক্তির (১৮৯৩ খ্রী) বৈধতা অগ্রাহ্য করায় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাক-আফগান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তবে ভারতের সহিত আফগানিস্তানের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। ভারত-আফগান মৈত্রী -সম্পর্কিত একটি সন্ধিপত্র ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India,* vol. V (New Edition), Oxford, 1908; W. K. Fraser-Tytler, *Afghanistan,* Oxford, 1950; D. N. Wilber, *Afghanistan,* New Haven, 1956; R. C. Majumdar ed., *The History and Culture of the Indian People,* vols. I-VI, and vol. IX, part I, Bombay, 1951-63.

প্রণবরঞ্জন রায়

আফজল খাঁ (আবদুল্লাহ্‌ ভত্তারী) বিজাপুরের বিশিষ্ট ওমরাহ ও বিচক্ষণ সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতা ছিলেন। বন্ধুত্বের ভান করিয়া আবশ্যক হইলে শিবাজীকে হত্যা করিবারও নির্দেশ তিনি পাইয়াছিলেন। সৈন্যস্বল্পতার জন্য পার্বত্য প্রদেশে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কূটনীতিবিদ্‌ আফজল প্রলোভনপূর্ণ সন্ধিপ্রস্তাবসহ কৃষ্ণাজী ভাস্করকে শিবাজীর নিকট পাঠান। প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। বলিষ্ঠ আফজলই প্রথমে অতর্কিতে বামহস্তে শিবাজীর গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার পার্শ্বদেশে ছুরিকাঘাত করেন। শিবাজী গুপ্ত বর্মের দ্বারা এই আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত বাঘনখ ও 'বিছুয়া' (ছোরা) দ্বারা আফজলকে আঘাত করেন। শিবাজীর এক অনুচর আফজলের শিরশ্ছেদ করেন (১০ নভেম্বর, ১৬৫৯ খ্রী)।

জগদীশনারায়ণ সরকার

আফ্‌তাব্‌ উদ্দীন খাঁ (১৮৬২-১৯৩৩ খ্রী) সংগীতশিল্পী ও গুণী। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, (মতান্তরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে জন্ম। ইনি রবাবী কাসিম আলী খাঁর ছাত্র, সেতারবাদক সদু খাঁর দ্বিতীয় পুত্র ও বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর অগ্রজ। আফ্‌তাব্‌ উদ্দীন খাঁ প্রথমে তবলা ও বেহালা শিক্ষা করেন ও পরে সুমধুর বংশীবাদকরূপে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ইনি কালী-সাধক ছিলেন ও পরিচিত মহলে 'আফ্‌তাব্‌ উদ্দীন সাধু' নামে আখ্যাত হইতেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আফিম আরবী শব্দ 'আফয়ূন' হইতে আফিম বা অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ আরবীয় বণিকদের সাহায্যেই ভারতে আফিম-এর চাষ প্রবর্তিত হইয়াছিল। আরবীয় বণিকেরা সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম এশিয়া মাইনর হইতে ভারতে আফিম-এর বীজ আমদানি করে এবং কাম্বে ও মালোয়ারে আফিম-এর চাষ শুরু হয়। প্রথমে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এবং পরে দেশের অভ্যন্তরভাগে আফিম চাষ বিস্তার লাভ করে। প্রায় সকল রকমের জমিতেই আফিম-এর চাষ করা চলে, তবে বেলে বা দো-আঁশ মাটিই চাষের পক্ষে উপযোগী। শণের সবুজ সার আফিম গাছের পক্ষে খুবই ভাল; তবে গোবর সার, কাঠের ছাই অথবা পটাশ প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতের জমিতে একর প্রতি গড়ে প্রায় ৭ কিলোগ্রামের কিছু বেশি আফিম পাওয়া যায়। আফিম ব্যতীত বীজ অর্থাৎ পোস্তদানা পাওয়া যায় একর প্রতি গড়ে প্রায় ৭৫ কিলোগ্রাম। অবশ্য উপযুক্ত সার প্রয়োগে ইহা অপেক্ষা বেশি পাওয়া যাইতে পারে। চারাগাছ বৃদ্ধি পাইয়া ফুল ফুটিতে প্রায় ৭০ হইতে ৮০ দিন সময় লাগে। ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়িবার পর 'পড্‌' অর্থাৎ বীজাধার পরিপুষ্ট হইলে তাহার উপর হইতে নীচে কয়েকস্থানে চিরিয়া দেওয়া হয়। ঐ কর্তিত স্থান হইতে দুধের মত শাদা রস বাহির হইয়া বীজাধারের গায়েই শুকাইয়া কালো হইয়া যায়। এই কালো পদার্থই হইল আফিম। আফিমে অন্যান্য জিনিস ছাড়াও প্রায় ২৫ রকমের উপক্ষার আছে। এই উপক্ষারগুলির মধ্যে মর্ফিনই প্রধান। আফিম-এর মধ্যে শতকরা ৫-১৫ ভাগ মর্ফিন, ২-৫ ভাগ নার্কোটিন, ০·১-২·৫ ভাগ কোডিন, ·৫-২ ভাগ প্যাপাভারিন, ০·১৫-০·৫ ভাগ থিবেন, ও ০·১-০·৪ ভাগ নার্সিন আছে। এতদ্ব্যতীত অল্প-মাত্রায় ক্রিস্টোপিন, লন্ডেমিন এবং অন্যান্য উপক্ষার পাওয়া যায়। এইগুলি কাঁচা রসের মধ্যে বেকোনিক ও ল্যাকটিক অম্লের সহিত যুক্ত অবস্থায় থাকে। আফিম ব্যবহারে বেদনা-বোধ ও অস্বস্তি দূরীভূত হয় এবং গভীর নিদ্রা আকর্ষণ করে। ঘুমের পূর্বে আফিম ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে অল্পাধিক মানসিক উত্তেজনা হ্রাস পায় এবং আরাম বোধ হয়। ঘুম ভাঙিবার পর প্রায়ই মাথা ধরে, বমির ভাব থাকে বা বমি হয়। খুব অল্প মাত্রায় না হইলেও সাধারণ মাত্রায়

ইহাতে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াও যথেষ্ট শ্লথ হয়। আফিম পেটে বেদনা বা কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া চর্ম ব্যতীত সকল রসগ্রন্থির রস-নিঃসরণ কমাইয়া দেয়। চোখের তারা ছোট হইয়া যায় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে রোগীকে জাগাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিদ্রা অতিরিক্ত গভীর হয় এবং শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ীর গতি মন্থর হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে সর্বাঙ্গে নীলাভা দেখা যায়— নাড়ী অতি ক্ষীণ ও দ্রুত হইতে থাকে। অতিরিক্ত আফিম সেবনে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। সেবনে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহা বর্জন করা প্রায় অসম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রধানতঃ অসহ্য যন্ত্রণা, অন্ত্র বা অন্য রসস্রাবী তন্তুর প্রদাহ, প্রবল সর্দি-কাশি, বমি, বার বার তরল মলত্যাগ এবং হৃদ্‌যন্ত্রের দোষঘটিত শ্বাসকষ্টে আফিম সেবনের ব্যবস্থা আছে। সামান্য পরিমাণে আফিম বর্তমান থাকায় ফলের শুষ্ক খোসাও অহিফেনসেবীদের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়।

বীজাধারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বীজ থাকে সেগুলিকে পোস্তদানা বলা হয়। এই পোস্তদানা আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। পোস্তদানা হইতে একপ্রকার তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। ইওরোপে আফিম ও তৈলের জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে। শাদা সীসার রঙের সহিত এই তৈল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে রং বেশ তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় এবং রং বিকৃত হয় না। ইওরোপ ও আমেরিকায় বার্নিশ প্রস্তুত করিবার জন্য এই তৈলের প্রচুর চাহিদা আছে।

একটি বিবরণ হইতে দেখা যায়, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে মর্ফিনের চাহিদা ছিল ১১০৪৫৮ কিলোগ্রাম এবং তাহার মধ্যে ইংরেজ সরকারের প্রয়োজন ছিল ১৫৫৫০ কিলোগ্রাম। ভারতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন ছিল ৭৬২৭১৬ কিলোগ্রাম এবং তাহার মধ্যে ৭৪৮৯১৬ কিলোগ্রাম বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সর্বাণীসহায় গুহসরকার

আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তরে ব্লাংকো অন্তরীপ (৩৭°২১´ উত্তর) হইতে দক্ষিণে আগলহাশ অন্তরীপ (৩৪°৫১´ দক্ষিণ) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আয়তনে প্রায় ৩০০ কোটি বর্গ কিলোমিটার (১১·৭ কোটি বর্গ মাইল)। অক্ষাংশের বিস্তৃতির গুণে নিরক্ষরেখাটি প্রায় মধ্য ভাগে অবস্থিত হইলেও উত্তর ভাগ অধিকতর প্রশস্ত হইবার ফলে মহাদেশের ⅔ ভাগ উত্তর গোলার্ধের অংশ। কর্কট ও মকর -ক্রান্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ এত অধিক স্থল-ভাগের পরিমাণ অন্য কোনও মহাদেশে নাই। প্রধানতঃ অ্যাটল্যান্টিক ও ভারত মহাসাগর এবং তাহাদের বিভিন্ন উপসাগরদ্বারা বেষ্টিত এই মহাদেশটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল কাটিবার পূর্বে স্থলপথে এশিয়ার সহিত যুক্ত ছিল। সমুদ্র হইতে কোনও বিস্তৃত খাঁড়ি দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই।

উপকূলভাগ হইতে খাড়াই মালভূমি উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া নাব্য জলপথ নাই। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮২ মিটারের (৬০০ ফুট) কম উচ্চ অঞ্চলের মোট পরিমাণ নগণ্য। বস্তুতঃ মহাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই মালভূমিসদৃশ, যদিও উচ্চতা ও ভূপ্রকৃতির স্থানীয় পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। সর্ব উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে অ্যাটল্যাস, স্বয়ার্টবার্গেন ও লান্‌জবার্গেন ভঙ্গিল পর্বতজাতীয় হইলেও মহাদেশের সর্বোচ্চ অঞ্চলগুলি মালভূমি অথবা আগ্নেয়গিরি মাত্র। মোটামুটি ৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার উত্তরের মালভূমি অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নীচু (৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুটের কম)। দক্ষিণের মালভূমির উচ্চতা ৬১০ হইতে ১২২০ মিটার (২০০০ ফুট হইতে ৪০০০ ফুট)। সাধারণভাবে এই সব মালভূমিগুলির প্রান্তদেশ অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা উচ্চতর। তাহাদের মধ্যে গিনি উপসাগরের সমান্তরাল ফুটাজালোন পর্বত, সাহারা অঞ্চলে আহাগার, তাসিলি ও টিবেস্টি পর্বত, লোহিত সাগরের সমান্তরাল নূবিয়া ও ইথিওপিয়ার মালভূমি, দক্ষিণে নামাকুয়াল্যাণ্ড, ডামারা-ল্যাণ্ড ও বিহে মালভূমি এবং ড্রাকেন্‌সবার্গ ও নিউভেল্ড পর্বত উল্লেখযোগ্য। মালভূমির অধিকাংশ অঞ্চলই কেলাসিত আগ্নেয়শিলা দ্বারা গঠিত, যদিও অপেক্ষাকৃত নিম্ন অঞ্চলে এইরূপ আগ্নেয়শিলাগুলি অনির্দিষ্ট গভীরতা বিশিষ্ট স্তরীভূত পাললিক শিলার দ্বারা আচ্ছাদিত। আগ্নেয়শিলাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাতব খনিজে পূর্ণ। ইহা ছাড়া একটি অসাধারণ ভূগঠন মহাদেশটিকে বিখ্যাত করিয়াছে। মহাদেশের পূর্বভাগে, দক্ষিণে নিয়াসা হ্রদ হইতে উত্তরে লোহিত সাগর হইয়া এশিয়া মহাদেশের জর্ডন উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বহু শাখা-প্রশাখাসহ একটি গ্রস্ত উপত্যকা অবস্থিত। দুইটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী স্থান বসিয়া যাইয়া এইরূপ গ্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। গ্রস্ত উপত্যকার দৃষ্টান্ত অন্যান্য মহাদেশেও পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া গ্রস্ত উপত্যকা অন্যত্র কোথাও নাই। চ্যুতি সৃষ্টির সহিত অগ্ন্যুৎপাত ও আগ্নেয়গিরি সৃষ্টিও জড়িত ছিল। বস্তুতঃ মহাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলি এইরূপ আগ্নেয়গিরিমাত্র, যথা, কিলিমাঞ্জারো (৫৯০০ মিটার বা ১৯৩২০ ফুট), কীয়িনা

(৫২০০ মিটার বা ১৭০৪০ ফুট) এবং এলগন (৪৩২৮ মিটার বা ১৪১৭৬ ফুট)। এই উপত্যকা অঞ্চলে বহু দীর্ঘ, শীর্ণ ও গভীর হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ট্যাঙ্গ্যানিঈকা, নিয়াসা, রুডল্‌ফ্‌ ও অ্যালবার্ট প্রধান। এইগুলির প্রত্যেকটিই অসম চ্যুতির ফলে গঠিত। কিন্তু এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে মহাদেশের সর্ববৃহৎ হ্রদ ভিক্টোরিয়া ভূগঠনে ইহাদের তুল্য নহে। একটি প্রায়-চতুষ্কোণ অগভীর স্থান জলপূর্ণ হইয়া ভিক্টোরিয়া হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে।

মালভূমির প্রান্তভাগ উচ্চতর হইবার ফলে মহাদেশের ⅔ অঞ্চল নদীপথে সমুদ্রের সহিত যুক্ত নয়। ভূগোলবিদ্‌গণের মতে অতীতে এইরূপ অন্তর্দেশীয় জলভাগের পরিমাণ অধিক ছিল। সমুদ্রপ্রান্তে অধিক বর্ষণের সুযোগে খরস্রোতা কয়েকটি নদী ক্ষয়ীভবনের মাধ্যমে প্রান্তদেশীয় পর্বত ভেদ করিয়া পরবর্তী কালে এই সব অন্তর্দেশীয় জলভাগের সহিত যুক্ত হয়। তাহার ফলে মহাদেশের অন্তর্ভাগে স্থায়ী জল-ভাগের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বর্তমানে সাহারা অঞ্চলে চ্যাড্‌ হ্রদ অঞ্চলের জল ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বেনো নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে যাইতেছে। দক্ষিণে ন্‌গামি হ্রদ অঞ্চলে জাম্বেজী ও কুনেন নদীর মারফত শুষ্কতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তুতঃ নাইজার, নীল, কঙ্গো, জাম্বেজী, অরেন্‌জ প্রভৃতি প্রত্যেকটি নদী-উপত্যকার মধ্য ভাগ পূর্বে এইরূপ অন্তর্দেশীয় জলভাগমাত্র ছিল। বর্তমানে কয়েকটি হ্রদ বা জলাভূমি তাহাদের নিদর্শনরূপে রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ হ্রদ বা জলাভূমির মধ্যে নীল উপত্যকায় বাহর-এল্‌-গজল, কঙ্গো উপত্যকায় টুম্‌বা ও দ্বিতীয় লিওপোল্‌ড হ্রদ, জাম্বেজী উপত্যকায় মাকারিকারির জলাভূমি এবং নাইজার উপত্যকায় ডেবো হ্রদ উল্লেখযোগ্য। প্রান্তবর্তী পার্বত্যভূমি ভেদ করিবার সময় প্রতিটি নদীই জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ফলে সমুদ্র হইতে দেশাভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য এই সব বৃহৎ নদীগুলি কখনই ব্যবহৃত হয় না, যদিও অন্তর্ভাগে এই সব নদীই বহুদূর পর্যন্ত নাব্য। অবশ্য নীল ও কঙ্গো ব্যতীত সমস্ত নদীর জলধারা গ্রীষ্মকালে অতি ক্ষীণ হইয়া যায়। কঙ্গো নদীর স্রোত প্রবল হইবার ফলে নদীমুখে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয় নাই। অন্যান্য সমস্ত নদীতে ব-দ্বীপ আছে।

কর্কট-ক্রান্তি (২৩° ৩০´ উত্তর অক্ষাংশ) ও মকর-ক্রান্তির (২৩° ৩০´ দক্ষিণ অক্ষাংশ) মধ্যবর্তী অঞ্চলে বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে শীতকাল কোনও অঞ্চলেই তীব্র নহে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার দৈনিক পার্থক্য অনেক অঞ্চলেই তাপের ঋতুগত পার্থক্য অপেক্ষা অধিক তীব্র বস্তুতঃ বৃষ্টিপাতের তারতম্যের সূত্রেই এই গ্রীষ্মপ্রধান মহাদেশের জলবায়ুর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি অনুভূত হয়। অবশ্য যে কোনও স্থানেই এই বর্ষণের পরিমাণ ও প্রকৃতির কোনও স্থিরতা নাই। তথাপি ১০-১৫ বৎসর ধরিয়া অনুধাবন করিলে বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বর্ষা ঋতুর ব্যাপ্তির হিসাবে মহাদেশটিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ১. সারা বৎসর বৃষ্টিপাতের অঞ্চল, ২. গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের অঞ্চল, ৩. বৃষ্টিহীন অঞ্চল এবং ৪. শীতকালীন বৃষ্টিপাতের অঞ্চল। মহাদেশের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তুর আঞ্চলিক প্রভেদ প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

সারা বৎসর বৃষ্টিপাতের অঞ্চলটি বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় ৫° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৎসরের গড় উত্তাপ ২৪° সেন্টিগ্রেড (৭৫° ফারেনহাইট্‌) হইতে ২৭° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট্‌) এবং দৈনিক উষ্ণতার পার্থক্য ৭° সেন্টিগ্রেড (২০° ফারেনহাইট্‌) পর্যন্ত। অবশ্য এই অঞ্চলের পূর্বভাগের উচ্চ মালভূমিতে বৃষ্টিপাতের ও উষ্ণতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে বাত্যাহীন বজ্রপাতের সহিত পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার (৮০ ইঞ্চি)। সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিবার সময়ে ঐ বৃষ্টিপাতে ঈষৎ আধিক্য ঘটে। ফলে নিরক্ষ-রেখার উপর অবস্থিত স্থানগুলিতে বৎসরে দুইটির অধিক বৃষ্টিপাতের ঋতু দেখা যায় (চৈত্র ও আশ্বিন মাসে)। এই অঞ্চলে তৃণভূমির একান্তই অভাব। কঠিন কাষ্ঠযুক্ত অতি দীর্ঘ চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারময় ও অতিকায় লতা এবং আগাছায় পরিপূর্ণ। জীব-জন্তুর অধিকাংশই বৃক্ষশাখায় বসবাস করে। তাহাদের মধ্যে বানরজাতীয় জীব, সরীসৃপ ও নানাবিধ বিষধর কীট-পতঙ্গ প্রধান।

সারা বৎসর বৃষ্টিপাত অঞ্চলের ক্রমদূরবর্তী স্থানে অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত মাস দুইটির, অর্থাৎ সূর্যের মধ্য গগনে অবস্থিতির সময়ের, ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়া একক বর্ষা-ঋতুর সৃষ্টি হয় এবং শীতকালটি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। প্রায় ৫° হইতে ২০° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এইরূপ জল-বায়ুকে এই মহাদেশে সুদানীয় জলবায়ু বলে। নিরক্ষরেখা হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণও ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কর্কট ও মকর-ক্রান্তি অঞ্চলে বৃষ্টিহীন মরুভূমির সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের এইরূপ

ক্রমক্ষীয়মাণ প্রকৃতির ফলাফল লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের আঞ্চলিক চরিত্রে। বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গলের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমিয়া প্রথমে সৃষ্ট হয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বক্র ও খর্বাকৃতি বৃক্ষযুক্ত দীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চল ; পরে এই তৃণও ক্রমশঃ কর্কশ ও খর্বাকৃতি হইতে থাকে এবং বৃক্ষের পরিবর্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁটাঝোপের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। মরুপ্রান্তে এইরূপ কাঁটাঝোপই একমাত্র স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। তৃণভূমি অঞ্চলে হরিণ, জিরাফ, গণ্ডার, জেব্রা, বাইসন, ঘোড়া, মহিষ, নূ প্রভৃতি দ্রুতগামী তৃণভোজী প্রাণী এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীল সিংহ, চিতা, নেকড়ে, হায়েনা প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীই প্রধান। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে হস্তী, নদী ও জলাভূমিতে হিপোপটেমাস (জলহস্তী) ও কুমির দেখিতে পাওয়া যায়। চামড়া ও গজদন্তের ব্যবসায়ের সূত্রে এই সব অঞ্চলে অকারণ প্রাণীহত্যা হয় বলিয়া বহু রাষ্ট্রেই বিশেষ আইনের দ্বারা এই সব পশু সংরক্ষিত হইতেছে। এই অঞ্চলে বহুপ্রকার পাখি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সারসজাতীয় পাখিই প্রধান। বর্ষাকাল বলিয়া একটি নির্দিষ্ট ঋতু থাকিলেও সুদানীয় জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও প্রকৃতির কোনও স্থিরতা নাই। তাই বর্ষানির্ভর এই বৃহৎ প্রাকৃতিক অঞ্চলে প্রাণীজগতের অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা মহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। রুক্ষ গ্রীষ্মকালে যখন নদী, কূপ ও তৃণভূমি পর্যন্ত শুকাইয়া যায়, তখন সমগ্র প্রাণীজগৎ অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলের দিকে চলিতে থাকে। কিন্তু কৃষিনির্ভর অপেক্ষাকৃত স্থাণু উপজাতিগুলির সে সুযোগ নাই। তাই তাহাদের সামাজিক উৎসবাদিতে, স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্যস্থলে আশু বৃষ্টিপাতের প্রার্থনায় ইন্দ্রজালের উপর নির্ভরতা, প্রকৃতির এই নিদারুণ অনিশ্চয়তারই নির্দেশ দেয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের (২০°-৩০° অক্ষরেখা) পশ্চিম ভাগে বৎসরের প্রায় কোনও সময়েই বৃষ্টিপাত হয় না। আয়ন বায়ু-অধ্যুষিত এই অঞ্চলে সমুদ্রবায়ু প্রবেশ করে না। কেবলমাত্র উচ্চ পার্বত্যদেশে অল্প বৃষ্টিপাত ও প্রচুর শিশিরপাত হয়। কোনও কোনও স্থানে ৯।১০ বৎসরে ১০-১৩ সেন্টিমিটার (৪-৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। ফলে উত্তরে সাহারা ও দক্ষিণে কালাহারির দুইটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার তারতম্য ১৬° সেন্টিগ্রেড (৬০° ফারেনহাইট্) বা তদূর্ধ্ব। দীর্ঘমূল অথচ নীরস তৃণ ও কাঁটাঝোপ প্রধান উদ্ভিদ। মরূদ্যানে ও অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে খেজুর ও ঝাউজাতীয় গাছ জন্মে। সরীসৃপ, বিছা, উটপাখি এবং উট এই অঞ্চলের প্রধান জীব।

মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে (৩০° অক্ষরেখার উর্ধ্বে) শীতকালে ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) হইতে ১০২ সেন্টিমিটার (৪০ ইঞ্চি) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং জলবায়ুর প্রকৃতি ইওরোপের ভূমধ্যসাগরতীরস্থ অঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকিবার ফলে উদ্ভিদসমূহ দীর্ঘমূল, তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট এবং কর্কশ ও পুরু ত্বকে আচ্ছাদিত। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে ওক্, পাইন-জাতীয় দীর্ঘ এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মিলেও সাধারণভাবে এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি ঝোপসদৃশ ও বৃক্ষগুলি খর্ব এবং বক্র। তৃণভূমির পরিমাণ খুবই কম।

মহাদেশের জনসংখ্যা অথবা অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনও ব্যাপক সমীক্ষা কখনও হয় নাই। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত সংখ্যাতত্ত্বে বলা হয় যে আদমশুমারের জন্য কেবলমাত্র মিশর, মরক্কো, টিউনিসিয়া, পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহ, সিয়েরা লিওন, নিয়াসাল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের শুধু শ্বেতকায় অধিবাসীদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে সমস্ত অঙ্কই আনুমানিক এবং পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রেই ঐ সব আনুমানিক হিসাব ভ্রান্ত। উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণাগুলিও বিচ্ছিন্ন-ভাবে কিছু কিছু অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংবাদ দেয়। কিন্তু সমগ্র মহাদেশ সম্পর্কে কোনও সার্বজনীন মতবাদ প্রয়োগ করিবার পক্ষে ঐ সব খণ্ড রচনাগুলি যথেষ্ট নহে। কিন্তু সকল নৃতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন যে, প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব দিক হইতে উপজাতিরা পর্যায়ক্রমে আসিয়া মহাদেশে বসতি স্থাপন করে। হ্যামিটিক উপজাতির হস্তে পর্যুদস্ত হইয়া সুদানীয় নিগ্রো উপজাতিরা দক্ষিণে সরিয়া আসে। তাহাদের চাপে বান্টু ভাষাভাষী নিগ্রোরা আরও দক্ষিণে আসিয়া বুশমেন ও হটেনটটদের মরুপ্রায় অঞ্চলে কোণঠাসা করে। এই জন-জোয়ারের গতি অতি ক্ষীণ অথচ নিশ্চিতভাবে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়।

ইতিহাসের সকল পর্যায়েই মহাদেশের উত্তর ভাগটি প্রাচীন এশিয়া ও ইওরোপের সভ্যতার সংস্পর্শে থাকে। কিন্তু সে সভ্যতার ক্ষীণ হাওয়া মহাদেশের বিভিন্ন উপজাতির সামাজিক মনে নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে আপনি পল্লবগ্রাহী অবস্থায় প্রাকৃত মতবাদের অপভ্রংশরূপে বিরাজমান। ইথিওপিয়ার খ্রীষ্টধর্ম কিংবা নাইজার উপত্যকার ইসলাম ধর্ম তাহারই নিদর্শন।

কিংবা আরও প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কতটুকুই বা উত্তর আফ্রিকা ধারণ করিতে পারিয়াছে? অবশ্য এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই যে, মহাদেশে নিজস্ব সভ্যতার আলোক কখনও স্ফুরিত হয় নাই। দক্ষিণ রোডেসিয়ায় জিমবাব্বে এবং ট্যাঙ্গ্যানিইকায় এনগারুকার প্রস্তরনির্মিত শহরের ধ্বংসাবশেষ কিংবা ট্রান্সভালের মাপুঙ্গুব্বে-র কবরস্থান নিশ্চিতভাবে স্থানীয় সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু কেন সেই সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাহা বর্তমানে জানিবার উপায় কি?

ইতিহাসের নজিরে মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ) নীল উপত্যকায় গড়িয়া উঠে। এশিয়া মহাদেশ হইতে আগত হ্যামিটিক উপজাতিরা এই সভ্যতার পত্তন করে। ভূগোলবিদ্‌গণের মতে সে সময়ে সাহারা অঞ্চল অনেক বেশি আর্দ্র ছিল এবং নিগ্রো উপজাতিরা ঐ স্থানের আদিমতর অধিবাসী। হ্যামিটিক-দের হাতে পরাস্ত হইলেও ঐ সব নিগ্রো শ্রমিক দ্বারাই প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে। হ্যামিটিক উপ-জাতিরা প্রথমতঃ নীল উপত্যকা বাহিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব ভাগে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাদেশের উত্তর প্রান্ত দিয়া অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কার্থেজের সভ্যতা প্রধানতঃ হ্যামিটিক। বর্ণসংকরদের কথা মনে রাখিয়া বলা যায় যে প্রাচীন মিশরীয়, বেজা, নুবিয়, সোমালি, ডানাকিল, গালা এবং হাবসীগণ (ইথিওপিয়) এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগে বার্বারি, তুয়ারেগ ও ফুলানীগণ ঐ সব হ্যামিটিক উপজাতির বংশধর।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে গ্রীক সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের হাতে মিশরের হ্যামিটিক শাসনব্যবস্থার পতন হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৮ অব্দে রোমকদের হাতে কার্থেজের পতন ঘটে। মিশরের গ্রীক সাম্রাজ্যও অবশেষে রোমক সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর আফ্রিকায় রোমক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব প্রায় ৬০০ বৎসর কালব্যাপী। কিন্তু গ্রীক ও রোমক সভ্যতা কোনও সময়েই হ্যামিটিক সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তৃতি পায় নাই, প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের তীরে সীমাবদ্ধ থাকে। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনসেরিফের নেতৃত্বে ভ্যান্‌ডালগণ কার্থেজের রোমক সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। কিন্তু ভ্যান্‌ডাল সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। বাই-জান্টিয়াম শক্তির হাতে এই সাম্রাজ্য পরাজিত হয়। এই সময়ে বার্বারিগণ পুনরায় স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে এবং প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরিয়া উত্তর আফ্রিকায় রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতা চলে। এই অরাজকতার সুযোগে আমীর ইবনে অল্ অসির নেতৃত্বে সেমিটিক আরবগণ ৬৩৯ মিশর আক্রমণ করে এবং ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে আরব সাম্রাজ্যের পত্তন করে। সেমিটিক আরবদের পশ্চিমমুখী অগ্রগতিতে বার্বারিগণ বাধা দিলেও ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অপরাজিত সাম্রাজ্য ইওরোপের স্পেন পর্যন্ত গ্রাস করে। মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে (আরবদের মার্ঘের অল্ আক্‌সা, অর্থাৎ জগতের সর্ব পশ্চিম প্রান্ত) মরক্কো দেশে এই সেমিটিক সভ্যতার তীর্থ ও শিক্ষা-কেন্দ্র ফেজ নগরী গড়িয়া উঠে। সেমিটিক উপ-জাতিরা উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করে। কিন্তু ঐ সভ্যতার বিস্তৃতি হ্যামিটিকদের অপেক্ষা কম। একাদশ শতকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বার্বারিদের হাতে ফেজের পতন ঘটে এবং মারাকেশ শহরে হ্যামিটিক গোঁড়া ইসলাম ধর্মের তীর্থ ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এই দুর্ধর্ষ বার্বারিগণ ক্রমে মরক্কো হইতে ট্রিপোলি পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকেই ঐ সাম্রাজ্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। হ্যামিটিক ইসলামের গোঁড়ামির আর একটি ফল স্পেন দেশে খ্রীষ্টানদের বিদ্রোহ। ঐ ধর্মযুদ্ধের শেষ পরিণতি হিসাবে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন হইতে ইসলাম ধর্ম নির্মূল হইয়া যায়।

মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে যখন পর পর সাম্রাজ্য সৃষ্টি ও ধ্বংস হইতেছিল তখন হ্যামিটিক ও সেমিটিক বণিকগণ ধীরে ধীরে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সুদানীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নিগ্রো জাতির অন্তর্গত। ইহাদের গাত্র কৃষ্ণবর্ণের, কেশ পশমতুল্য, আয়তনে দীর্ঘ, নাসা বিস্তৃত ও চ্যাপ্টা এবং ওষ্ঠদ্বয় পুরু; জীবনধারণের জন্য প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর, কিন্তু পশুপালনও প্রচলিত ছিল। হ্যামিটিক ও সেমিটিক বণিকদের আগমনের ফলে ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বহু বর্ণসংকর জাতির জন্ম দেয়। এই অঞ্চলেও বহু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ও সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দে সাইরেনাইকার ইহুদিরা ঘানা সাম্রাজ্যের পত্তন করে। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ঘানা সাম্রাজ্য কানিয়াগার সোসো সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে সোসো সাম্রাজ্য মালি সাম্রাজ্যের এবং মালি সাম্রাজ্য সোনঘাই সাম্রাজ্যের নিকট পরাস্ত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে মরক্কো সাম্রাজ্যের নিকট সোনঘাই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই সবকয়টি সাম্রাজ্যসৃষ্টির মূলেই ছিলেন কয়েক জন অসম-সাহসী সেনাপতি। তাঁহাদের শক্তির মূলে ছিল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী। অনুমান করা যায় যে, সেই কারণেই গভীর বনাঞ্চলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত আসিয়া সবকয়টি

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শেষ হয়। কারণ বনাঞ্চলে অশ্ব অচল। এই সব সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্রগুলি বর্তমানেও স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে টিম্‌বাক্‌টু, কানো, কাৎসিনা, জারিয়া ও সোকোটো উল্লেখযোগ্য। বনাঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে, অর্থাৎ গিনি উপকূল ও ফুটাজালোন পার্বত্যভূমির মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকটি বিশুদ্ধ নিগ্রো সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে ওয়লোফ, মানডেঙ্গা, অ্যাশান্টি ও ইওরুবা সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বর্তমান লাইবেরিয়া অঞ্চলের কুরু রাজ্য এবং গোল্ড্‌কোস্ট অঞ্চলের ফান্তি রাজ্য বেশ প্রতাপশালী ছিল। এই সব নিগ্রো সাম্রাজ্যগুলি বৃহৎ গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। তাহাদের মধ্যে ইও-রুবা সাম্রাজ্যের ইবাদান ও আবেওকুটা বর্তমানেও বর্ধিষ্ণু।

নীল উপত্যকার দক্ষিণে একপ্রকার দীর্ঘাকৃতি (প্রায় ২ মিটার বা ৬½ ফুট লম্বা) নিগ্রো উপজাতি বসবাস করে। ভিক্টোরিয়া হ্রদ অঞ্চলের লুও এবং কাভিরনডো এবং নীল উপত্যকায় শিলুক ও ডিংকা এই উপজাতিদের নিদর্শন। ইহারা প্রধানতঃ পশুপালক। এই সব উপজাতির সহিত হ্যামিটিক রক্তের মিশ্রণে বর্তমানে কীনিয়া রাজ্যের মাসাই, নান্দি, লুম্‌বাওয়া, সুফ, তুরকানা ও কারমোজং, দক্ষিণ সুদানের ডিডিঙ্গা ও তোপোথা এবং উগান্ডার ইতেসো উপজাতিরা সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারাও প্রধানতঃ পশুপালন করিয়া জীবনধারণ করে।

মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা বান্টু নিগ্রো নামে পরিচিত। যদিও নৃতাত্ত্বিক বিচারে ও ভাষার গঠনে ইহাদের এক গোত্রভুক্ত করা যায়, কিন্তু উপজীবিকার বৈচিত্র্যে ইহারা অনন্য। উগান্ডা রাজ্যের বুগান্ডা, কীনিয়া রাজ্যের কিউ কিউ ও আকাম্‌বা উপজাতিরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, কিন্তু পশুপালনও করে। কিন্তু বাসুতো, বেচুয়ানা ও স্বোয়াজিরা প্রধানতঃ পশুপালক। জুলু, মাতাবেল ও মাশোনা উপজাতিদের গোষ্ঠীসমাজ প্রধানতঃ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহারা বর্তমানে খনি ও কল-কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইওরোপীয় ও বান্টু নিগ্রোরা প্রায় একই সময়ে আসিয়াছিল। দক্ষিণ দিক হইতে ইওরোপীয় এবং উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বান্টুদের চাপে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বুশমেন ও হটেনটটরা পশ্চিমের মরুপ্রায় অঞ্চলে হটিয়া যায়। নৃতাত্ত্বিকরা বুশমেন ও হটেনটটদের একত্রে খোইসান নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে বুশমেনদের সহিত হ্যামিটিক রক্তের মিশ্রণে হটেনটটদের উৎপত্তি হয়। খোইসানরা নিগ্রো নহে। ইহাদের রং পীতাভ এবং মাথার কেশ ভুট্টার দানার ন্যায় অসংলগ্ন গুচ্ছের মত দেখিতে। বস্তিদেশে অস্বাভাবিক মেদবৃদ্ধি এই উপজাতিদের বৈশিষ্ট্য। বুশমেনগণ শিকারী ও খাদ্যসংগ্রাহক মাত্র। কিন্তু সুকুমার শিল্পে, বিশেষ করিয়া চিত্রাঙ্কনে তাহাদের আশ্চর্য দক্ষতা দেখা যায়। হটেনটটরা পশুপালক এবং বুশমেন অপেক্ষা দীর্ঘকায়। ইহাদের চিত্রাঙ্কনে কোনও বিশেষ দক্ষতা নাই।

মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো উপত্যকায় বান্টু জাতীয় নিগ্রোরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করে। তাহাদের মধ্যে ফাঙ্গ উপজাতি উল্লেখযোগ্য। ইহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য করিলেও যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই। জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাইলেই তাহারা পুরাতন কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন অঞ্চলে চলিয়া যায়। কঙ্গো অঞ্চলে এক খর্বাকৃতি উপজাতি বসবাস করে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ১·৪ মিটার (৪ ফুট ৬ ইঞ্চি) এবং শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। নৃতত্ত্বের অপরাপর বিচারে ইহারা নিগ্রোগোষ্ঠীর। মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসীরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে এশিয়া মহাদেশের মালয় অঞ্চলের তুল্য।

উত্তর আফ্রিকায় যে সময় পর পর সাম্রাজ্যের গঠন ও পত্তন হইতেছিল সে সময় আরব নাবিকদের নেতৃত্বে মহাদেশের পূর্ব উপকূলের সহিত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার, মেসোপটেমিয়া হইতে চীন দেশ পর্যন্ত, এক ব্যাপক বাণিজ্য চলিতেছিল। পেরিপ্লাসে আনুমানিক ৮০ খ্রীষ্টাব্দে, এই বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। মোটামুটি পঞ্চম শতক হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্য আরবদের একচেটিয়া ছিল। বণিকগণ এই উপকূলে বহু উপনিবেশ স্থাপন করিলেও (যাহার ফলে সোয়াই-ইলি ভাষা এবং ঐ বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব ঘটে), বিস্তৃত সাম্রাজ্য সৃষ্টি কখনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বণিক-উপনিবেশগুলি সর্বদাই একটি সুরক্ষিত নগরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের শাসনব্যবস্থা নগরপ্রাচীর অতিক্রম করিত না। এইরূপ নগর-উপনিবেশগুলির মধ্যে কিলওয়া, জান্‌জিবার, মোম্‌বাসা, ওজা, বারাওয়া এবং মোগাডিসু উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশ শতকে পর্যটক ইব্‌ন বতুতা মোগাডিসু ও কিলওয়া-র ঐশ্বর্যের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেন। এই বণিকসভ্যতা মোটামুটি লুণ্ঠনধর্মী ছিল এবং স্বভাবতঃই বাণিজ্যের প্রধান উপাদান ছিল নিগ্রো দাসগণ। এই সূত্রে উল্লেখ প্রয়োজন যে এই সময়ে ইওরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য প্রধানতঃ স্থলপথে হইত এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে অটোমানদের দখলে ছিল।

পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী-কে (১৩৯৪-১৪৬০ খ্রী) নাবিক উপাধি দিবার কারণ ইহাই নহে যে তিনি সপ্ত সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। বাস্তবে তিনি ট্যানজিয়ারের দক্ষিণে কখনও আসেন নাই। কিন্তু তাঁহারই চেষ্টার ফলে সমগ্র মহাদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সমুদ্রপথে পশ্চিম ইওরোপ হইতে দক্ষিণ এশিয়ায় আসিবার পথ আবিষ্কৃত হয় এবং আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় উপনিবেশের গোড়াপত্তন ঘটে। তৎকালীন ভূগোলবিদ্দের একত্র করিয়া তিনি নৌবিদ্যার একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে প্রত্যেক অভিযানের অভিজ্ঞতা ও তথ্য পরবর্তী অভিযানগুলিকে পুষ্ট করিয়াছিল। এই সব নৌ-অভিযানগুলিতে হেনরীর উৎসাহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি : ১. তাঁহার ধারণা ছিল যে পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিলে পশ্চিম আফ্রিকার স্বর্ণবাণিজ্য পর্তুগালের দখলে আসিবে, ফলে মরক্কোর ইসলাম সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িবে ; ২. পূর্ব আফ্রিকা উপকূলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি দখল করিলে ইওরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যে পর্তুগালের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে, ফলে মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হইবে এবং ৩. পূর্ব উপকূল দিয়া ইথিওপিয়ার খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে। যুবরাজ হেনরীর জীবদ্দশাতেই পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে বহু পর্তুগীজ উপনিবেশ বা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিয়েগো কাও ক্রস্ অন্তরীপে (২১°৫০´ দক্ষিণ) এবং ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্থলমিও ডায়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছান। ইহার ফলে ভারত মহাসাগরে পৌছাইবার পথটি পর্তুগীজদের প্রায় দখলে চলিয়া আসে। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভাস্কো-ডা-গামা, রাই লুরেন্জো রাভাস্কো, আলমেইডা, ত্রিস্তাও ডা কুন্হা ও আলবুকেরকো নামে দুর্দান্ত পর্তুগীজ নাবিকদের হাতে পর পর কিলওয়া, জান্জিবার, সোফালা, মোম্বাসা, ওজা, বারওয়া প্রভৃতি আরব বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়। সৌভাগ্যক্রমে মোগাডিসু ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ মোজাম্বিক নগরের পত্তন করে এবং ঐ সময়ে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য তাহাদের হাতে চলিয়া আসে। পূর্ব উপকূলের ভূতপূর্ব আরব বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি হইতে নূতন পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি মূলতঃ পৃথক ছিল না। দাস-ব্যবসায় ও লুণ্ঠনের মারফত পর্তুগীজগণ আরবদেরই পদানুসরণ করে।

পশ্চিম আফ্রিকায় পর্তুগীজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ এমন কি দিনেমার, সুইডিশ ও জার্মান ব্রেন্ডেনবুর্গীয়রা এই অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। পর্তুগীজদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজগণ। প্রতিটি ইওরোপীয় জাতিই স্বর্ণ অপেক্ষা দাসব্যবসায়ে অধিক লিপ্ত থাকে। উপকূলস্থ ওইয়া, অ্যাশ্যান্টি, ডাহোমি, বেনিন প্রভৃতি নিগ্রো রাজ্যগুলি এই দাসব্যবসায়ে সাহায্য করে এবং কালে আপনাদেরই পতন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রথম দিকে কোনও বণিকসম্প্রদায়ই বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের সূত্রে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারে উৎসাহী ছিল না।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের যুবক রাজা সেবাস্টিয়ান মরক্কো সাম্রাজ্যকে ধর্মযুদ্ধের নামে আক্রমণ করেন। অল্ কসর্ অল্ কেবিরের যুদ্ধে ২৬ হাজার পর্তুগীজ সৈন্যসহ তিনি নিহত হন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের নিকট পর্তুগাল স্বাধীনতা হারাইল এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা শেষ হইল। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ যখন হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, তখন পূর্ব উপকূলের উত্তর ভাগে আরবগণ পুনরায় নিজেদের রাষ্ট্রশাসন কায়েম করিয়াছে এবং পশ্চিম উপকূলে ওলন্দাজগণ তখন প্রবল প্রতাপশালী। ওলন্দাজদের এই নৌ-প্রতাপ অবশ্য ফলপ্রসূ হয় নাই। ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণও তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে (৬ এপ্রিল ১৬৫২ খ্রী) বর্তমান কেপ টাউনের নিকট একটি ওলন্দাজ বসতি স্থাপিত হয়। এই বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য সমুদ্র-গামী জাহাজগুলিকে খাদ্য ও জল সরবরাহ করা। খাদ্য -সংগ্রহ ও -উৎপাদনের তাগিদে প্রথমতঃ হল্যাণ্ড হইতে আগত কৃষকগণ (বুঅর নামে পরিচিত) এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় পশুপালক হটেনটট উপজাতিদের সহিত ব্যবসায় শুরু হয়। ক্রমে বুঅরগণ পশু-পালন আরম্ভ করে এবং উত্তরোত্তর নূতন ও বিস্তৃত জমির প্রয়োজন অনুভব করে। এই বুঅরগণ ক্যালভিনপন্থী এবং তাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয় ও একমাত্র নির্বাচিত জাতি হিসাবে ভাবিত। যেহেতু ওল্ড টেস্টামেণ্ট তাহাদের ধর্মের মূল উৎস, সেইহেতু অধিকতর জমির তাগিদে যে যে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে তাহাদেরই, ইহুদিদের অনুকরণে, দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে থাকে। এইভাবে ক্রমে তাহারা ভাল্ ও অরেন্জ নদী অতিক্রম করে এবং সর্বত্র শ্রেষ্ঠ জমিগুলিকে নিজ অধিকারে আনে। সেই সময়ে তাহারা উত্তর দিক হইতে আগত বান্টু নিগ্রোদের

(বিশেষ করিয়া জুলু ও কাফিরদের) সংস্পর্শে আসে। এই নিগ্রো উপজাতিরাও পশুপালক এবং তাহাদেরও বিস্তৃত জমির প্রয়োজন ছিল। ফলে বুঅরগণ বুঝিতে পারে যে যদৃচ্ছ ভ্রমণ ও জমি-সংগ্রহের একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে যুদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য এই যুদ্ধে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই এবং ইতিহাসে ইহা 'কাফির যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় জুলু ও কাফিরদের রাজনৈতিক সংগঠন সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ এই কালভিনপন্থী বুঅরদের সামাজিক নীতিবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে প্রচলিত অ্যাপারথাইড মতবাদের মূল্যবিচার চলে।

বুঅরগণ যখন 'প্রতিশ্রুত দেশে'র সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময়ে ইওরোপ মহাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লববাদীরা হল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ কেপ টাউন উপনিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই দায়িত্ব ওলন্দাজ সরকারকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইংরেজগণ এই উপনিবেশ পুনরায় দখল করে এবং এই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ওলন্দাজরা আর কখনও ফিরিয়া পায় নাই। এই যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর নীল নদের মোহনায় ইংরেজ সেনাপতি নেলসনের হাতে পরাস্ত হয়। ফলে মহাদেশের নৌবাণিজ্যে ইংরেজের প্রতাপ প্রবলতর হইল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উপকূলভাগ ইওরোপীয় শক্তিগুলির পরিচিত ছিল। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ দেশের অভ্যন্তরভাগে ধর্মপ্রচার ও বিভিন্ন প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল। ঐ সব সংবাদ কৌতূহল বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিলেও মহাদেশের ভৌগোলিক গঠন ও প্রাকৃতিক সম্পদ পরিমাপ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই সূত্রে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে 'আফ্রিকা অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ইওরোপীয় ভৌগোলিক সংগঠনগুলি মহাদেশের অন্তর্ভাগের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত পর্যটকদের পাঠাইতে থাকে। নাইজার উপত্যকা ও সাহারা অঞ্চলের ভূগোল সম্বন্ধে মঙ্গোপার্ক (১৮০৫ খ্রী), ডেনহ্যাম ও ক্ল্যাপারটন (১৮২৩ খ্রী), রেনে কাইলে (১৮২৪ খ্রী), গর্ডন লেইং (১৮২৬ খ্রী), ল্যান্ডার (১৮৩০ খ্রী), হাইনরিখ বার্থ (১৮৫০-৫৫ খ্রী), পল দ্যু চাইলু (১৮৬৩ খ্রী) প্রভৃতি পর্যটকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। নীল উপত্যকা ও ইথিওপিয়া সম্পর্কে ক্রস (১৭৬৯-৭২ খ্রী), কেইলিয় ও লেটেরজেক (১৮২১ খ্রী), লিনান দ্য বেলেফন্দ (১৮২৭ খ্রী), রুপেও (১৮৩৭-৩৯ খ্রী), দ্য আবাদি ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি পর্যটকগণ গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করেন। গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলের মানচিত্র প্রস্তুত করেন ক্রাফ (১৮৪৯ খ্রী), বেরম্যান (১৮৪৯ খ্রী), বার্টন, স্পেক ও গ্রাণ্ট (১৮৫৬-৬৩ খ্রী), বেকার (১৮৬৩ খ্রী), অলব্রেখ্ট্ রস্চার (১৮৬০ খ্রী), ব্যারন কার্ল ফন ডের ডেকেন (১৮৬৫ খ্রী) প্রমুখ পর্যটক। দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলে যে সব পর্যটকেরা কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডেভিড লিভিংস্টোন (১৮৪৯-৭৩ খ্রী), গ্যাল্টন ও অ্যান্ডারসন (১৮৪৯-৫৩ খ্রী), চ্যাপম্যান, বেইন্স ও মাউচ (১৮৬৬ খ্রী) এবং স্ট্যানলি (১৮৭৬-৭৭ খ্রী) প্রধান। স্ট্যানলির নাম সর্বদাই কঙ্গো উপত্যকা আবিষ্কারের সহিত জড়িত আছে। এই সব পর্যটনের ফলে উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যে মহাদেশের ভৌগোলিক গঠন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ ইওরোপীয় শক্তিগুলির গোচরীভূত হইল।

নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ইংরেজদের হাতে পরাজিত হইলে মহাদেশে বহির্বাণিজ্যে ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমশঃই প্রবল হইতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির ফলে এই বাণিজ্যে, সেই সময়ে প্রচলিত অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি, অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে অসম দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে। স্বভাবতঃই ঐ সব শক্তিগুলি নিজ নিজ বাণিজ্যাধিকার বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশাসনের সাহায্য লইল। উনবিংশ শতকের অষ্টম দশক হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে প্রায় সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইল। পরবর্তী কালে ইওরোপীয় রাজনীতির খেলায় জার্মান উপনিবেশগুলি প্রধানতঃ ফরাসী ও ইংরেজদের হাতে চলিয়া যায়।

ঔপনিবেশিক শাসন ও গণজাগরণ বর্তমানে এই মহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মহাদেশের ভৌগোলিক গঠন, নৃতাত্ত্বিক সমস্যা ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার তীব্রতা এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র দিয়াছে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি উপনিবেশেই সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি বলিতে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিকদেরই বুঝায়। আফ্রিকাবাসীরা নিজ নিজ সংগঠনের প্রতি অনুগত, উপরন্তু একই গোষ্ঠীভুক্ত আফ্রিকাবাসী দুই বা ততোধিক উপনিবেশে বিভক্ত এবং একই উপনিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী কৃত্রিম ভাবে একত্রে বসবাস করে। ফলে জাতীয়তাবাদ ও গোষ্ঠীজীবনের

আফ্রিকার রাজ্য ও নগর

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	বৈশিষ্ট্য
স্পেনীয় মরক্কো	৪৬১০৩/১৮০০৯	৯৯১০০০ (১৯৪০ খ্রী)	স্পেনীয় উপনিবেশ সংরক্ষিত	তেতুয়ান	৯৪০০০	রাজধানী
				মেলিল্লা	৭৮০০০	বন্দর ও বাণিজ্য
ট্যানজিয়ার	৫৭৬ ২২৫	১০০০০০ (১৯৪১ খ্রী, অনুমান)	আন্তর্জাতিক অঞ্চল	ট্যানজিয়ার	১৮৫০০০	রাজধানী ও বন
				সিউটা	৬০০০০	বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র
মরক্কো	৩৯৪২৪০ ১৫৪০০০	৭৯৯১০০০ (১৯৪১ খ্রী, অনুমান)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ	কাসাব্লাংকা	৬৪২০০০	রাজধানী ও দর ; ফসফেট, খনিজ সার, ডিম, চামড়া, শম, সব্জি ও ফল রপ্তানি করে
				ফেজ্	২১০০০০	প্রাচীন রাজ নী ও ধর্মস্থান
				মারাকেশ	২৫০০০০	প্রাচীন রাজ নী ও ধর্মস্থান
				রাবাট	৮৪০০০ (	প্রাক্তন রা উপনিবেশের রাজধানী
				মেকনেস	৭৫০০০ (	ইতিহা প্রসি স্থান
		৬৫৯,২০৩৩ (১৯৩৬ খ্রী)		অলজিয়র্স	৪১৭০০০	রাজধা ও বন্দর ; লোহা ও খেজুর রপ্তানি করে
				ওরান	৩৬২০০০	বন্দর ; লোহা, খেজুর ও এসপার্টো ঘাস রপ্তানি করে
				ফিলিপ্পিভিল	৭০০০০	বন্দর ফসফেট রপ্তানি
				বোন্	১১৪০০০	বন্দর ফসফেট রপ্তানি
				কন্স্টানটাইন	১৬০০০০	বাণিজ্যকেন্দ্র ; শস্য রপ্ত
	৮ ৪৮	২৬০৮৩১৩ (১৯৩৬ খ্রী, অনুমান)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ফরাসী সংরক্ষিত উপনিবেশ	টিউনিস	৩৭০০০০	রাজধানী ও বন্দর ; নিকটে কার্থেজের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত
				স্ফাক্স	৪৩৩৩৩ (১৯৩৬ খ্রী, অনুমান	বন্দর ; অলিভ তেল, ফসফেট ও স্পঞ্জ রপ্তানি করে

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
লিবিয়া	১৭৩৯১৫৬ ৬৭৯৩৫৮	৮৮৮৪০১ (১৯৩৮ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ইটালীয় উপনিবেশ	ট্রিপোলি	১৪৫০০০	রাজধানী ও বন্দর
				বেনগাজি	৭০০০০	বন্দর ; স্পঞ্জ রপ্তানি করে
মিশর	৯৮৭১০৭/৩৮৬১৯৮	১৫৭২০৬৯৪ (১৯৩৭ খ্রী)	স্বাধীন	কাইরো	২১০০০০০	রাজধানী ; মহাদেশের সর্ববৃহৎ নগর ; ধর্মস্থান
				অ্যালেগজ্যান্দ্রিয়া	৯২৮০০০	রাজ্যের প্রধান বন্দর ; শিল্পকেন্দ্র ; তুলা রপ্তানি করে
				পোর্ট সঈদ	১৭৮০০০	বন্দর ; সুয়েজ খালের নৌ-পথ পরিচালনা করে ; জাহাজ মেরামত হয়
				সুয়েজ	১০৮০০০	বন্দর ; তৈলশোধনাগার ; সুয়েজ খাল পরিচালনা করে
				তান্তা	৯৫২৬০ (১৯৩৭ খ্রী)	ধর্মস্থান
				এল মনসুর	৬৯০৩৮ (১৯৩৭ খ্রী)	শিল্প ও বাণিজ্য -কেন্দ্র
সুদান	২৪৪৪৪৪২/৯৫০৯৫০	৬১৮৬৫২৯ (১৯৩৮ খ্রী, অনুমান)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ইঙ্গ-মিশর সংরক্ষিত অঞ্চল	খার্টুম	৮৩০০০	রাজধানী ; শিক্ষা ও বাণিজ্য -কেন্দ্র
				ওমডুরমান	১৩০০০০	বাণিজ্যকেন্দ্র
ইথিওপিয়া	২০৬০০০ ৩৫০০০০	১৭০০০০০০ (১৯৫৫ খ্রী)	স্বাধীন	আদ্দিস আবাবা	৪০০০০০	রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র
ইরিট্রিয়া	১১৬২০০/৪৫০০০	১০০০০০০ (১৯৫৫ খ্রী, অনুমান)	স্বাধীন ; বর্তমানে ইথিওপিয়ার সহিত যুক্ত	আসমারা	১২০০০০	রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র
ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড	১৭৪০৮০/৬৮০০০	৮০০০০০ (১৯৫০ খ্রী)	উপনিবেশ	বারবেরা	৩০০০০	রাজধানী ও বন্দর ; ভেড়া ও চামড়া রপ্তানি করে
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	২৩২২২/৯০৭১	৬৮০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	উপনিবেশ	জিবুতি	৩১০০০	রাজধানী ও বন্দর

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
সোমালিয়া	৬৯৬৬৪০ ১৯৪০০০	১৩০০০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ইটালীয় উপনিবেশ	মোগাডিস্থ	৭৭০০০	রাজধানী ও বন্দর
কীনিয়া	৫৭৫৮৯৮'২২৪৯৬০	৬৩৬০০০০ (১৯৫৫ খ্রী)	স্বাধীন , প্রাক্তন উপনিবেশ	মোম্বাসা	১০২০০০	বন্দর ; তুলা, কফি, সিসল ও চামড়া রপ্তানি করে
				নাইরোবি	২০০০০০	রাজধানী
উগান্ডা	২৪০২৯১/৯৩৯৮১	৫৭৭০৫০০ (১৯৫৫ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ব্রিটিশ সংরক্ষিত অঞ্চল	এনটেবে	৮০০০	রাজধানী
				কাম্পালা	৪৫০০০	বাণিজ্যকেন্দ্র
ট্যাঙ্গ্যানিঙ্গকা	৯২৬২০৮ ৩৬১৮০০	৮৯২৬০০০ (১৯৫৫ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ট্রাস্ট অঞ্চল	ডার-এস-সালাম	১২৯০০০	রাজধানী ও বন্দর ; সিসল, তুলা, কফি, কাজু বাদাম, হীরক, স্বর্ণ, চামড়া ও কাঠ রপ্তানি করে
জান্জিবার ও পেম্বা (দ্বীপ)	২৬১১/১০২০	২৮৫০০০ (১৯৫৫ খ্রী)	সুলতান ও ব্রিটিশ সংরক্ষিত	জান্জিবার	৪৫০০০	রাজধানী ও বন্দর ; লবঙ্গ ও এলাচি রপ্তানি করে
নিয়াসাল্যাণ্ড	৯৭২৮০/৩৮০০০	২৫৯৬০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ব্রিটিশ উপনিবেশ	জোম্বা	৫৫০০	রাজধানী
উত্তর রোডেসিয়া	৭৪২৪০০/২৯০০০০	২১৮৩১০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ব্রিটিশ উপনিবেশ	লুসাকা	৩০০০	রাজধানী
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৩৯৪০০০/১৫০০০০	২৪৮১০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	ব্রিটিশ ডমিনিয়ন	সল্জ্বেরি	৭০০০০	রাজধানী
				বুলাওয়াইও	৫৩০০০	বাণিজ্যকেন্দ্র
মোজাম্বিক	৭৬২৮৮০/২৯৮০০০	৬১০৫০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	পর্তুগীজ উপনিবেশ	লুরেন্সো মার্কেস	৭০০০০	রাজধানী ও বন্দর ; চিনির কল, তুলার আঁশ ছাড়াইবার কারখানা ও তৈল-নিষ্কাশন কল আছে

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
মাদাগাস্কার (দ্বীপ)	৬১৭২০১/২৪১০৯৪	৩৬৬৯৩২৮ (১৯৩৬ খ্রী)	ফরাসী উপনিবেশ	তান্নানারিভে	১৮৭০০০	রাজধানী
মরিশাস (দ্বীপ)	১৮৪৩/৭২০	৫৪০০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ব্রিটিশ উপনিবেশ	পোর্ট লুই	৯১০০০	রাজধানী ও বন্দর ; চিনি রপ্তানি করে
ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা (নিম্নলিখিত অঞ্চল লইয়া গঠিত) :	১২০৯১২৮/৪৭২৫৫০	৯৫৮৯৮৯৪ (১৯৩৬ খ্রী)	স্বাধীন	কেপ টাউন	৬৩৩০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	রাজধানী ও বন্দর ; ফল ও মদ্য রপ্তানি করে
				প্রিটোরিয়া	২৮৫০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	শাসনকেন্দ্র ; হীরকখনি ও লৌহশিল্প আছে
১. কেপ অফ গুড হোপ	৭০৯৫৫৩/২৭৭১৬৯	৩৫২৯৯০০ (১৯৩৬ খ্রী)		জোহানেস্বার্গ	৯১২০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	সর্ববৃহৎ নগর ; স্বর্ণখনি ও শিল্পকেন্দ্র
২. ট্রান্সভাল	২৮২৭৫২/১১০৪৫০	৩৩৪১৪৭০ (১৯৩৬ খ্রী)		ডারবান	৪৮০০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	বন্দর ; বাণিজ্য ও শিল্প -কেন্দ্র
৩. অরেন্জ ফ্রি স্টেট	১২৭০২৯৬/৪৯৬৪৭	৭৭২০৬০ (১৯৩৬ খ্রী)		ঈস্ট লণ্ডন	৯১০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	বন্দর ; দুগ্ধজাত দ্রব্য ও চামড়া রপ্তানি করে
				পিটার মরিৎসবার্গ	৭৫০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	বাণিজ্যকেন্দ্র
				কিম্বালি	৬৩০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	হীরকখনি
৪. নাটাল	৯১৩২৭/৩৫২৮৪	১৯৪৬৪৬৮ (১৯৩৬ খ্রী)		ওয়েলকম	৭৫০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	স্বর্ণখনি
				ব্লুমফণ্টেন	৬৩০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	বাণিজ্য ও শিক্ষা -কেন্দ্র ; পশম ও ভেড়ার বাজার
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৮১৩৩৭৬/৩১৭৭২৫	২৮৩৭৮৪ (১৯৩৬ খ্রী)	ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা পরিচালিত ম্যানডেট রাজ্য ; প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ	ভিন্টহোয়েক	১০৫৪৮ (১৯৩৬ খ্রী)	রাজধানী ও বন্দর ; সীসা, রুপা ও তামা রপ্তানি করে।

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
বাসুতোল্যাণ্ড	২৯৯৯৩/১১৭১৬	৬৬২৪০০ (১৯৩৬ খ্রী, অনুমান)	ব্রিটিশ রক্ষিত অঞ্চল	মাসেরু	—	রাজধানী
স্বোয়াজিল্যাণ্ড	১৭১৬৫/৬৭০৫	১৫৬৭১৫ (১৯৩৬ খ্রী)	ব্রিটিশ রক্ষিত অঞ্চল	ম্বা-বান্	১৬০০ (১৯৩৬ খ্রী, অনুমান)	রাজধানী
বেচুয়ানাল্যাণ্ড	৭০৫০০০/২৭৫০০০	২৬৫৭৫৬ (১৯৩৬ খ্রী)	ব্রিটিশ রক্ষিত অঞ্চল	সেরোই	৩০০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	রাজধানী
আঙ্গোলা	১২৪১৬০০/৪৮৫০০০	৪১৪৫০০০ (১৯৫০ খ্রী)	পর্তুগীজ উপনিবেশ	লুয়ান্‌ডা	৪০০০০	রাজধানী ও বন্দর ; কফি, ভুট্টা, চিনি ও হীরক রপ্তানি করে
কাবিন্দা	৭৬৮০/৩০০০ (অনুমান)	—	পর্তুগীজ উপনিবেশ	কাবিন্দা	১২০০০ (১৯৩৬ খ্রী অনুমান)	রাজধানী
কঙ্গো	২৩১৬৮০০/৯০৫০০০	১২৯৫৪৫০০ (১৯৫৭ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন বেলজিয়াম উপনিবেশ	লিওপোল্‌ডভিল এলিজাবেথভিল জাডোটভিল মাতাদি	৩০০০০০ ১৩০০০০ ৬০০০০ ৬০০০০	রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র কয়লা ও তামার খনি তামার খনি প্রধান বন্দর ; রবার, পাম তেল ও ইউরেনিয়াম রপ্তানি করে
রুয়ান্‌ডা-উরুন্‌ডি	৫৪৩৫৯/২১২৩৪	৪৫০৯০০০ (১৯৫৬ খ্রী)	আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট রাজ্য	উসুম্‌বুরা	—	রাজধানী
ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকা	২৪৪৬৮০৮/৯৫৯৩০০	৩৪১৮০০৬ (১৯৩৬ খ্রী অনুমান)	উপনিবেশ	ব্রাজাভিল	৮৭০০০	শাসনকেন্দ্র
(নিম্নলিখিত প্রদেশ লইয়া গঠিত) :						
১. ক্যামেরুন্‌স	৪২৬৩৪০/১৬৬৫০০	৩১৬৫০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ট্রাস্ট রাজ্য			

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
২. গ্যাবন	২৬৬২৪০/১০৪০০০	৪০৪০০০ (১৯৫৭ খ্রী)				
৩ মিড্‌ল্ কঙ্গো	৪৪০৩২০/১৭২০০০	৭৫৯৪০০ (১৯৫৭ খ্রী)				
৪. উবাঙ্গি পারি	৬০৪১৬০/২৩৬০০০	১১৩৪৯০০ (১৯৫৭ খ্রী)				
৫. চ্যাড্	১০২৪০০০/৪০০০০০	২৫৮০৯০০০ (১৯৫৭ খ্রী)				
গিনি	২৭৬৪৮০/১০৮০০০	২৪৯২০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	স্বাধীন; প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ	কনাক্রি	৫৫০০০	রাজধানী ও বন্দর
টোগোল্যাণ্ড	৪৮৫৪০/১৯০০০	১০৯৬০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	স্বাধীন	পোর্টো-নোভো	৩৫০০০	রাজধানী ও বন্দর
স্পেনীয় গিনি বা রিওম্যুনি	২৭৭৭৬/১০৮৫০	২১১০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	উপনিবেশ	রিওম্যুনি	—	রাজধানী ও বন্দর
পর্তুগীজ গিনি	৩৫৮৪০ ১৪০০০	৫৫৩০০০	উপনিবেশ	বিসাউ	—	রাজধানী ও বন্দর
লাইবেরিয়া	১১০০৮০/৪৩০০০	১০০০০০০ (১৯৫৭ খ্রী, অনুমান)	স্বাধীন	মনরোভিয়া	—	রাজধানী ও বন্দর
গ্যাম্বিয়া	১০৪৯৬/৪১০০	২৮৬০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ব্রিটিশ উপনিবেশ	বাথার্স্ট	২১০০০	রাজধানী ও বন্দর ; চীনাবাদাম ও ইলমেনাইট্ রপ্তানি করে
সিয়েরা লিওন	৬৫৬৮০/২৮০০০	২৫০০০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	ব্রিটিশ উপনিবেশ	ফ্রিটাউন	৭০০০০	রাজধানীওবন্দর ; খনিজ লোহা, হীরক, ক্রোম্, সোনা, পাম তেল, কোকো ও আদা রপ্তানি করে

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার/ বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য	প্রধান নগর	নগরের জনসংখ্যা	নগরের বৈশিষ্ট্য
ঘানা (নিম্নলিখিত প্রদেশ লইয়া গঠিত) :	২৩৫৫২০/৯২০০০	৪৭৬৩০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ	আক্রা	১৩৬০০০	রাজধানী ও বন্দর ; কোকো, সোনা, হীরক, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, পাম তেল রপ্তানি করে
১. অ্যাশান্টি	৬২৪১০/২৪৩৭৯			কুমাসী	৭৮৫০০	বাণিজ্যকেন্দ্র
২. উত্তর টেরিটরি ৩. জার্মান টোগোল্যাণ্ড ৪. গোল্ড কোস্ট	৬১২৭৯/২৩৯৩৭					
ফেডারেশন অফ নাইজেরিয়া (নিম্নলিখিত প্রদেশ লইয়া গঠিত) :	৯৫৬৮৮০/৩৭৩০০০	৩২৪৩৩০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	স্বাধীন ; প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ	লাগোস	৩৫০০০০	রাজধানী ও বন্দর ; কোকো, পাম তেল, চীনাবাদাম, টিন, কাঠ, চামড়া ও রবার রপ্তানি করে
				পোর্ট হারকার্ট	৭২০০০	বন্দর ; কয়লা রপ্তানি করে
				কানো	১৫০০০০	বাণিজ্যকেন্দ্র; কার্পাস বয়নশিল্প (কুটির-শিল্প) -কেন্দ্র
১. পশ্চিম প্রদেশ ও লাগোস	১১৬৫৬৯/৪৫১৪৪			ইবাদান	৫০০০০০	প্রাক্তন ইওরুবা সাম্রাজ্যের রাজধানী, বাণিজ্য ও শিল্প -কেন্দ্র
২. পূর্ব প্রদেশ	১১৮১৩৫/৪৫৭৫২					
৩. উত্তর প্রদেশ ও জার্মান ক্যামেরুন্স	৭২১৩৫২/২৮১৭৭৮					

সামাজিক মূল্যবোধ পরস্পরবিরোধী সমস্যার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের সম্পদ বহির্বাণিজ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রচুর পুঁজি নিয়োগ করিয়াছে। এই প্রকার পুঁজি ও উৎপাদন ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন খনি, শিল্প ও আবাদগুলিতে ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

ইংরেজগণ উপনিবেশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় গোষ্ঠী-সংগঠনগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, যদিও ঔপনিবেশিকদের জন্য ব্রিটেনে প্রচলিত বিচারপ্রথা প্রযোজ্য। ফরাসীগণ গোষ্ঠী-সংগঠনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ফ্রান্সে প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কায়েম করিবার চেষ্টা করে। বেলজিয়াম উপনিবেশে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিন্ন কোনও প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে নাই এবং ইওরোপীয় কিংবা আফ্রিকাবাসী কাহাদেরও কোনও রাজনৈতিক অধিকার নাই। পর্তুগীজগণ সাধারণ আফ্রিকাবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু যেহেতু তাহারা বর্ণ-বৈষম্য স্বীকার করে না সেইহেতু শিক্ষিত আফ্রিকাবাসী ঐ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে। এইরূপ শিক্ষিত আফ্রিকাবাসীগণ 'অ্যাসিমিলাডো' বা সমন্বয়কারী নামে পরিচিত। গণতান্ত্রিক অধিকার চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে ইওরোপীয় মননের প্রতিফলন; সেইজন্য গোষ্ঠীসমাজের সংস্কারমুক্ত এবং ইওরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত এই অ্যাসিমিলাডোগণ স্বভাবতঃই গণজাগরণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারিতেছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব, উপরি-উক্ত কারণের জন্যই প্রথম দিকে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে কোনও উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নীতি চালু করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণভাবে মহাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবন অ্যাসিমিলাডোদের উদারপন্থী মতবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর উগ্রপন্থী মতবাদের পারস্পরিক সাংগঠনিক শক্তির দ্বারাই সম্ভবতঃ নির্ধারিত হইবে।

মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অঞ্চল এবং তাহাদের প্রধান নগরগুলির বিবরণ ২৯২-২৯৮ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইল।

নগরজীবনের অনুপাত বুঝিবার জন্য তালিকাগুলিতে বহু ক্ষেত্রে জনসংখ্যার পুরাতন হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার সাম্প্রতিকতম আনুমানিক হিসাব (১৯৬০ খ্রী, রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক সংগৃহীত) পরবর্তী তালিকায় উল্লিখিত হইল :

রাষ্ট্র	জনসংখ্যা (০০০)
মরক্কো	১১৬২৬
অলজিরিয়া	১১০২০
টিউনিসিয়া	৪১৬৮
লীবিয়া	১১৯৫
মিশর (সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র)	২৫৯২৯
সুদান	১১৭৭০
ইথিওপিয়া	২০০০০
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	৬৭
সোমালিয়া	১৯৯০
কীনিয়া	৭১৩১
উগান্ডা	৬৬৭৭
ট্যাঙ্গ্যানিঈকা	৯২৩৯
জান্‌জিবার ও পেম্‌বা	৩০৭
নিয়াসাল্যাণ্ড	২৮৩০
উত্তর রোডেসিয়া	২৪২০
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৩০৭০
মোজাম্‌বিক	৬৪৮২
মাদাগাস্কার	৫৩৯৩
মরিশাস্	৬৩৯
ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা	১৫৭৮০
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৫২২
বাসুতোল্যাণ্ড	৬৮৫
স্বোয়াজিল্যাণ্ড	২৫৯
বেচুয়ানাল্যাণ্ড	৩৫০
আঙ্গোলা	৪৬৪২
কঙ্গো	১৫০৫০
রুয়ান্ডা-উরুন্ডি	৪৯০১
ক্যামেরুন্‌স	৪০৯৭
গ্যাবন	৪৪০
চ্যাড্	২৬৩৯
মরিটানিয়া	৭২৭
সেনেগাল	২৯৭৩
আইভরি কোস্ট	৩২৩০
আপার ভোল্‌টা	৪৪০০
ডাহোমি	১৯৩৪
নাইজার টেরিটরি	২৮৭০
গিনি	৩০০০
টোগোল্যাণ্ড	১৪৪০
রিওম্যুনি	১৮৩
লাইবেরিয়া	১২৯০

রাষ্ট্র	জনসংখ্যা (০০০)
গ্যাম্বিয়া	২৮৪
সিয়েরা লিওন	২৪৫০
ঘানা	৬৬৯১
ফেডারেশন অফ নাইজেরিয়া	৩২০৯১

দ্র L. D. Stamp, *Africa : A Study of Tropical Geography*, New York, 1955 ; C. J. Seligman, *Races of Africa*, London, 1957 ; A. Sillery, *Africa : A Social Geography*, London, 1961 ; E. W. Bovill, *The Golden Trade of the Moors*, London, 1958 ; R. Couplerd, *East Africa and Its Invaders*, London, 1939 ; W Fitzgerald, *Africa : A Social, Economic and Political Geography of Its Major Region*, London, 1957.

সন্তোশ চক্রবর্তী

আবগারি ফারসী 'আবকার' হইতে শব্দটি বাংলায় আসিয়াছে। মদ চোয়ানোর কাজ, ব্যবসায় ও তৎসম্পর্কীয় রাজস্ব ও সরকারি দপ্তর বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত 'অন্তঃশুল্ক' ইংরেজী 'এক্সাইজ' -এর অর্থগত অনুবাদ। তবে অন্তঃশুল্ক বা এক্সাইজ-এর অর্থ আবগারি কথাটির অর্থ হইতে ব্যাপকতর। অন্তঃশুল্ক যে কোনও জিনিসের উপরে বসানো যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ইস্পাত, চিনি, বনস্পতি, সুতিবস্ত্র ইত্যাদি বহু জিনিসের উপরে অন্তঃশুল্ক বসানো হইয়াছে। মাদকদ্রব্যের উপরে যে অন্তঃশুল্ক বসানো হয় তাহাকেই আবগারি বলে।

মৌর্যযুগে মদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পান কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উহার বিশদ বিবরণ আছে। মুসলিম শাসনেও সুরাসার মদিরা হইতে রাজস্ব আদায় হইত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই শুল্ক মকুব করেন। অনেকে অনুমান করেন যে ইংরেজ আমলের পূর্বে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ ছিল না। প্রকৃত তথ্য বোধ হয় এইরূপ যে মদ্যপান প্রচলন যেরূপই থাকুক না কেন, উহা হইতে সরকারি রাজস্ব আদায় নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া সর্বসাধারণ মনে করিত। সেইজন্য ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে অবিচ্ছিন্নরূপে আবগারি কর সংগৃহীত হয় নাই। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের আবগারি প্রবিধান (রেগুলেশন) ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩৪ -সংখ্যক প্রবিধান দ্বারা 'আবগারি সয়ার' ও উহার রাজস্ব শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মাদকদ্রব্যের শুল্কধার্যজনিত মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা উহার অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো। এই ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত মাদকদ্রব্যের প্রস্তুতি ও বিক্রয় জেলা কালেক্টরের লাইসেন্স বা পাট্টা ব্যতিরেকে নিষিদ্ধ হয় : ১. সুরাসার মদিরা ২. তাড়ি ৩. ভাঙ ৪. গাঁজা, চরস ও অন্যান্য মাদকতাবর্ধক ভেষজদ্রব্য। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে আফিম সম্বন্ধে আলাদা ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই অবলম্বিত হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মাদক ভিন্ন অন্যবিধ দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি কর ধার্য করা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত মাদকদ্রব্যাদি অথবা উক্ত যে কোনও মাদকদ্রব্যমিশ্রিত ঔষধ বা প্রসাধনদ্রব্যের উপর প্রাদেশিক সরকার পূর্বের ন্যায় শুল্ক ধার্য ও আদায় করিতে থাকেন। ইহার ফলে মাদকদ্রব্যমিশ্রিত ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্যের শুল্কের হার এবং ঐ সব দ্রব্য নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইন বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ছিল। যাহাতে শুল্কের হার ভারতের সর্বত্র একই থাকে, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে (১৯৫০ খ্রী) মাদকদ্রব্যমিশ্রিত ঔষধ বা অঙ্গরাগের উপর শুল্ক ধার্য করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ শুল্ক আদায় এবং গ্রহণের ভার রাজ্য-সরকারের উপর ন্যস্ত আছে। মাদকদ্রব্যমিশ্রিত ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্য ছাড়া নিছক মাদকদ্রব্যনিয়ন্ত্রণ এবং তাহার উপর শুল্ক ধার্য ও সংগ্রহের দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় রাজ্যসরকারের উপর অর্পিত আছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দেশময় যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তাহার অন্যতম কার্যসূচী ছিল মাদক-দ্রব্য বর্জন। উত্তরকালে এই আন্দোলন ভারতীয় সংবিধানে মাদক বর্জনের নির্দেশমূলক ৪৭ ধারায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মাদ্রাজ রাজ্যে মাদকদ্রব্য বর্জননীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যেও মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

অবনীচরণ বসু

আবদর রহীম (১৮৬৭-১৯৫২ খ্রী) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক ধনী জমিদার পরিবারে জন্ম। মেদিনী-পুরের সরকারি হাই স্কুলে ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং চার বছরের মধ্যে কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

১৯০০ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমানী ব্যবহারশাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা-মালা পরে 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ মহম্মেডান জুরিস্প্রুডেন্স্' নামে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন এবং দুইবার (১৯১০ ও ১৯২০ খ্রী) প্রধান বিচারপতিরূপেও কাজ করেন। মাদ্রাজ যাইবার পূর্বে তিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লীগের গঠনতন্ত্র রচনায় তাঁহার দান কম নহে। আবদর রহীম ১৯২১-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নরের এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন পরিষদের এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিরোধী দলের নেতা ও ১৯৩৫-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বিলাতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কন্‌ফারেন্‌সে (১৯৩৫ খ্রী) তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট করাচীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবদুর রজ্জাক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদীর উপত্যকায় বিজয়নগর নামক একটি শক্তিশালী হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দীকাল পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া ইহা আপনার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল এবং মহারাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি যে সকল বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল আবদুর রজ্জাক তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার পুরা নাম কামালুদ্দীন আবদুর রজ্জাক বিন্ জালালুদ্দীন ইশাক্ অস্ সমরখন্দি। পারস্যসম্রাট্ শাহ্ রুখের দূতরূপে তিনি ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সংগমবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজসভায় আসেন। ফারসী ভাষায় রচিত তাঁহার 'মাত্‌লা-উস্ সা' দেইন্ ওয়া মাজ্‌মা-উল্ বাহ্‌রেইন্' নামক গ্রন্থের কিয়দংশে তিনি তাঁহার বিজয়নগর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন। আবদুর রজ্জাক প্রথমে বিজয়নগররাজ কর্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, যদিও পরে বিরোধী পক্ষের চক্রান্তে তাঁহাকে অনাদর ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইয়া-ছিল। তিনি দ্বিতীয় দেবরায়ের ব্যক্তিগত সৌজন্য ও অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিজয়নগরের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বিজয়নগর রাষ্ট্রের রাজধানীকে বৃত্তাকার, সপ্ত পাষাণপ্রাকারবেষ্টিত সপ্ত দুর্গসমন্বিত ও অতিশয় সুরক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন, এইরূপ সমৃদ্ধিশালী মহানগরী পৃথিবীর অন্য কোথাও তিনি দেখেন নাই। দ্বিতীয় দেবরায়ের অগাধ ধনৈশ্বর্য, তাঁহার রাজসভার জাঁকজমক, বিচারবিভাগের অধ্যক্ষ 'দনাইক' (দণ্ডনায়ক) -এর অধীনে কেন্দ্রীয় বিচারালয়ের কার্যকলাপ, কেন্দ্রীয় কোষাগার ও টাঁকশালের পরিচালনপদ্ধতি, রাষ্ট্রের করগ্রহণনীতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থা -সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্যও তিনি প্রসঙ্গতঃ পরিবেশন করিয়াছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি, মুখর রাজপথের উভয়পার্শ্বে বিপণিশ্রেণীতে সুসজ্জিত পণ্য-সম্ভার, সুন্দরী গণিকা ও নর্তকীগণের বিভ্রমবিলাস, বাজীকরগণের সুনিপুণ ক্রীড়াকৌতুক, মহানবমী উৎসবের বিপুল সমারোহ প্রভৃতি তাঁহার লেখনীস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের নিষ্ঠাবান মুসলমান হইয়াও এই হিন্দুরাষ্ট্রে ও তত্রস্থ হিন্দু অধিবাসীগণের জীবনযাত্রায় যাহা কিছু প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে আবদুর রজ্জাক দ্বিধা করেন নাই। সংক্ষিপ্ত হইলেও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও সরস বর্ণনাভঙ্গীহেতু তাঁহার বিবরণ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাসরচনায় মূল্যবান উপাদানরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্র আবদুর রজ্জাকের মূল ফারসী 'মাতলা-উস সা' দেইন্ ওয়া মাজ্‌মা-উল্ বাহ্‌রেইন্', গ্রন্থের বিজয়নগর-সম্পর্কিত অংশের ইংরেজী অনুবাদ; H. M. Elliot, and J. Dowson, *History of India As Told by Its Own Historians*, vol. IV; Robert Sewell, *A Forgotten Empire*, London, 1900; B. A. Salatore, *Social and Political Life in the Vijayanagara Empire*, vols. I & II, Madras, 1934.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আবদুর রহীম খান খানান (১৫৫৬-১৬২৭ খ্রী) আকবরের সুপ্রসিদ্ধ অভিভাবক ও সেনানায়ক বৈরাম খানের পুত্র। তাঁহার মাতা মেওয়াটের জামাল খানের দুহিতা। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর লাহোরে তাঁহার

জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যখন গুজরাটে আততায়ীর হস্তে নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স চারি বৎসর। আকবর তাঁহাকে লালন-পালন করেন এবং ক্রমশঃ তিনি আকবরের সভার একজন বিশিষ্ট আমীর হইয়া উঠেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং মুজফ্‌ফর শাহের বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ আকবর তাঁহাকে 'খান খানান' উপাধি দান করেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে একাত্তর বৎসর বয়সে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দী কবিতা, বিশেষতঃ 'রহীম সৎসয়' নামক কবিতা-গ্রন্থখানি অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষাও তিনি জানিতেন এবং গ্রিয়ার্সনের মতে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তিনি যে কেবল সুলেখক ছিলেন তাহা নহে, তিনি সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

সুকুমার রায়

আবদুল কাদের বদায়ূনী (১৫৪০-১৫৯৬ খ্রী) আকবরের রাজত্বকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত। পিতার নাম মুলুক শাহ্‌। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আগস্ট জয়পুরের অন্তর্গত টোডা ভীম নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বদায়ূনী ছিলেন সুপণ্ডিত। আকবরের আদেশে তিনি ইতিহাস রচনা এবং ফারসী ভাষায় হিন্দুগ্রন্থের অনুবাদকার্যে নিযুক্ত থাকেন। সিংহাসনবত্তিশী, রামায়ণ এবং কথাসরিৎসাগরের অনুবাদ ব্যতীত তিনি মহাভারত, কাশ্মীরের ইতিহাস ও অথর্ববেদের অনুবাদকার্যে এবং তারিখ-ই-আলফী ইতিহাসগ্রন্থ প্রভৃতি রচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার খ্যাতি তাঁহার রচিত মুসলিম ভারতের ইতিহাস 'মুন্‌তখা-উৎ-তোওয়ারিখ'-এর জন্য। ইহাতে ৯৯৭ হইতে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম রাজত্বের ঘটনা বর্ণিত আছে। মুসলমানদের নিকট আকবরের চরিত্র এবং শাসনের ত্রুটি নির্দেশ করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

সুকুমার রায়

আবদুল বারি (১৮৯৪?-১৯৪৭ খ্রী) শ্রমিক নেতা। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা জেলার শোণ নদীর তীরবর্তী কৈকিওর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন ও সুভাষচন্দ্র বসুকে সংগঠন তৈয়ারির কাজে সাহায্য করিবার জন্য জামশেদপুরে আসেন। পরে জামশেদপুর, বার্নপুর, ঝরিয়া ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে বহু ধর্মঘটে নেতৃত্ব করেন। ইস্পাতশিল্পের ও কোলিয়ারির শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে ও নির্যাতন সহিতে হয়।

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবদুল বারি বিহার বিধান সভার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। টাটা শ্রমিক ইউনিয়ন -সহ বহু শ্রমিক সংস্থার তিনি সভাপতি ছিলেন। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর গান্ধীজী বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসিলে আবদুল বারি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মোটরযোগে পাটনায় আসিতেছিলেন। পথে বেআইনি মাল চলাচল নিরোধকারী সিপাহীদলের (অ্যান্টি স্মাগলিং ফোর্স) সহিত তাঁহার বচসা হয়। তাহাদের একজনের গুলিতে ৫৩ বৎসর বয়সে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ এই বরেণ্য নেতার মৃত্যু হয়।

মণি ঘোষ

আবুল কালাম আজাদ আজাদ, মওলানা আবুল কালাম দ্র

আবর আদি দ্র

আবহবিদ্যা যে বিদ্যায় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা এবং তৎসম্পর্কিত তথ্যাদির বিষয় পর্যালোচনা করা হয়, তাহাকে আবহবিদ্যা বলে। বিশেষভাবে বলিতে গেলে দীর্ঘ ও স্বল্পস্থায়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডলে পরিলক্ষিত ঘটনাসমূহ এবং বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা প্রভৃতি আ ব হ বি দ্যা র অন্তর্গত।

সর্বপ্রথম ঠিক কোন্‌ সময়ে আবহাওয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব না হইলেও অতি প্রাচীন বর্ণনাদিতে এ বিষয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। খুব সম্ভব আরিস্তোতল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) আবহতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নিয়মিত পদ্ধতিতে

আলোচনা করেন। 'মেটিওরলগিকা' নামক গ্রন্থে তিনি আবহবিদ্যার সহিত ধূমকেতু, উল্কাপাত, ছায়াপথ প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। আরিস্তোতলের শিষ্য থিওফ্রাস্টাস বায়ু এবং আবহাওয়া প্রভৃতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে গালিলিও যখন থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন তখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আবহবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে টরিচেল্লি ব্যারোমিটার বা বায়ুর চাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট বয়েল নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর আয়তন ও চাপের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। প্রায় ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে হুক কর্তৃক হুইল ব্যারোমিটার উদ্ভাবিত হয়। আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থায় ব্যারোমিটারে প্রদর্শিত চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এডমাণ্ড হ্যালী বলিলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে সূর্যরশ্মিপাতের ফলেই বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, সৌর-তাপে উত্তপ্ত হইবার ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য বাণিজ্য-বায়ু সেই দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার অনেক কাল পরে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ হ্যাডলি সৌরতাপ ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফল বিচার করিয়া বাণিজ্য-বায়ুর গতিবিধির প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেলসিয়াস উন্নত ধরনের সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার উদ্ভাবন করেন। পরবর্তী কালে ডি-সস্যুর (১৭৪০-১৭৯৯ খ্রী) থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটারের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং দেখান যে, জলীয় বাষ্প -সমন্বিত বায়ু একই চাপ ও তাপমাত্রায় শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা হালকা। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাভয়াজিয়া প্রমাণ করেন, বায়ুমণ্ডলের বাতাস বিভিন্ন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের সাধারণ মিশ্রণ মাত্র। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ড্যালটন বাতাসে জলীয় বাষ্পের চাপের নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া বিরলীভবন এবং বাষ্পীভবন সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই আধুনিক ভৌত আবহবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮০০ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লাপ্লাস, লাভয়াজিয়ার সহযোগিতায় শেভালিয়া দ্য লামার্ক কয়েকটি আবহ-ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনিই প্রথম আবহাওয়ার মানচিত্র তৈয়ারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডিস দৈনিক আবহাওয়ার চার্ট রাখিবার ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি ১৮২০, ১৮২১ এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের বড় রকম কয়েকটি ঝড়ের মানচিত্র প্রকাশ করেন। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অবনমিত বায়ুর ('ব্যারোমেট্রিক ডিপ্রেশন'-এর) ভূপৃষ্ঠে অগ্রগতিই যে এই সকল ঝড় উৎপত্তির কারণ, ইহা তিনি প্রমাণ করেন এবং ঝড়-বৃষ্টির তথ্যাদির বিষয় নিয়মিতভাবে অনুশীলনের জন্য আবহতথ্যানুসন্ধান সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। এই সকল বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাউরি সামুদ্রিক বায়ু এবং স্থলভাগের বায়ুপ্রবাহের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ইহার ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় (১৮৫৪-৫৬ খ্রী) কৃষ্ণ সাগরের উপর একটি প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হয় এবং যুদ্ধ-জাহাজগুলি প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লেভেরিয়ার এই ঝড়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সময় অনুযায়ী পর পর আবহ-চিত্র (ওয়েদার-চার্ট) নির্মাণ করেন এবং ঝড়ের গতিবিধি অনুসরণে সক্ষম হন। ইহার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত যথেষ্ট সংখ্যক আবহ-ঘাঁটিতে যদি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং পর্যবেক্ষণের বিবরণ যদি দ্রুতগতিতে কোনও কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করা যায়, তবে ধারাবাহিক আবহ-চিত্র তৈয়ারি করা সম্ভব। এই চার্টগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। এই সকল কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে আবহ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইহার ফলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পৃথিবীর নানা স্থানে কিছু কিছু আবহ-ঘাঁটি স্থাপিত হয়। লণ্ডনে প্রথম হাওয়া অফিস অ্যাডমিরাল ফিজরয়ের তত্ত্বাবধানে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ফ্রান্সে হাওয়া অফিস স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফিজরয় টেলিগ্রাফের মারফত দৈনিক আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আবহাওয়ায় মানচিত্র প্রকাশ করিতে শুরু করেন। তিনি দৈনিক আবহাওয়ার সংবাদ, ঝড়-বৃষ্টি এবং আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাসও প্রকাশ করিতেন। আমেরিকাতেও এস্পি, ইলিয়াস লুমিস প্রভৃতি কর্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ঝড়ের প্রকৃতি-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সম্যক্ না জানার ফলে আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তেমন কোনও সুবিধা না হইলেও আবহ-বিজ্ঞানীরা নিরুৎসাহ হইলেন না, পূর্ণোদ্যমেই গবেষণা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন বারংবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার ফলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেও একটি কেন্দ্রীয় আবহ-সংস্থা গঠিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত আন্তর্জাতিক আবহ-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-

সদস্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই আন্তর্জাতিক আবহ-সংস্থা 'বিশ্ব আবহ-সংস্থা' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, ইহার পর আবহবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আবহাওয়া সংক্রান্ত নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হার্টজ জলীয় বাষ্প -সমন্বিত বায়ুর তাপজনিত পরিবর্তন নির্ধারণের উপায় নির্ণয় করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিউহফ এই ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাম্ফার্ট স্থলভাগের বায়ুপ্রবাহের গতিবিধির বিবরণী প্রণয়ন করেন এবং বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহ উৎপত্তির কারণ নির্ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইহার পর আবহবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আবহাওয়া বিশ্লেষণ, উৎপত্তির কারণ এবং বিশেষভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ডায়নামিক্স, হাইড্রোডায়নামিক্স ও থার্মোডায়নামিক্স -এর নিয়মগুলি বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব হইতেই এই বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা লক্ষিত হয়। বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত বায়ুর গতিবেগের একটা মোটামুটি ধারণা পাইবার পর আবহবিদেরা বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট সঞ্চরমাণ আলোড়নগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এই আলোড়নগুলিকে বলা হয় 'ডিস্টারবেন্স'। ডিস্টারবেন্সের প্রকৃতি অনুসারে ইহাদিগকে 'গভীর অবনমন' 'নিম্নচাপযুক্ত অবনমিত স্থান', 'ঘূর্ণিবাত্যা', 'প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা', ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল, ওয়েদার-চার্টের নিদর্শনগুলি পরস্পরবিরোধী। অনুসন্ধানে ধরা পড়িল— আবহাওয়ার যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা একই স্থানে স্থিতিশীল হয় না— 'লো প্রেশার এরিয়া' বা 'ট্রাফ লাইন' প্রভৃতির জন্য আজ যেখানে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ওয়েদার-চার্টে কাল হয়ত তাহাকে কোনও দূরবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যাইবে। আবার হয়ত কয়েক দিন ধরিয়া একই স্থানে থাকিয়া যাইতে পারে এবং তখন সেখানে ৩।৪ দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টিপাতও ঘটিতে পারে। বায়ুমণ্ডল অস্থির প্রকৃতির। ভূপৃষ্ঠের দিক হইতে হঠাৎ কোনও উষ্ণ প্রবাহের আগমনে আবহাওয়ার একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। কাজেই নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করিয়াও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

আবহাওয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জলীয় বাষ্প না থাকিলে আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না। আবহবিজ্ঞানীরা বহু পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ জানিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের অবস্থা অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে কেহ কেহ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার উইলসন ঘুড়ির সঙ্গে থার্মোমিটার বাঁধিয়া উপরের তাপমাত্রা নিরূপণের চেষ্টা করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জেফ্রিস এবং ব্ল্যানচার্ড মনুষ্যবাহিত বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশের তাপমাত্রা পরিমাপ করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিউক হাওয়ার্ড মেঘের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন। তারপর আরও অনেকে এই বিষয়ে চেষ্টা করেন। হারমাইট এবং বেসাঙ্কন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং যন্ত্র বেলুনের সাহায্যে আকাশে প্রেরণ করেন। ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অনুসন্ধানের ব্যাপারে উন্নতি সাধিত হইবার পর বুজার্কনেস ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউমেরিক্যাল ফোরকাস্টিং -এর উপযোগিতার কথা বলেন। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বা গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জানা থাকিলে গাণিতিক উপায়ে তাহার ভবিষ্যৎ গতিবিধি জানা সম্ভব। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ডসন এই পদ্ধতিতে আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা গেল, 'নিউমেরিক্যাল ফোরকাস্টিং, গ্র্যাফিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, বা অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগে যে পরিমাণ জটিলতা ভেদ করিতে হয়, তদনুযায়ী সাফল্য লাভ হয় না।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ু সম্বন্ধে জানিবার জন্য ক্রমশঃ অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে প্রায় ১১৯২ কিলোমিটার (৭৪৫ মাইল) পর্যন্ত বায়ুর সন্ধান পাওয়া যায়। সৌরতাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিবার ফলেই বায়ুমণ্ডল নীচের দিক হইতে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। কাজেই যতই উপরে ওঠা যায়, তাপমাত্রা ততই কমিতে থাকে। এইজন্যই উত্তপ্ত বায়ুর সহিত জলীয় বাষ্প উপরে উঠিয়া যাইবার পর উপরের শীতল স্তরের সংস্পর্শে আসিয়া মেঘে পরিণত হয়। উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা কমিতে থাকিলেও বায়ুর গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কাজেই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় যদি তাপমাত্রা সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে বজ্র, বৃষ্টি, মেঘ প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে যন্ত্রবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাস প্রদানের ব্যাপারে যান্ত্রিক কৌশলের সহায়তায় বহুবিধ জটিলতার সমাধান করা সম্ভব হইতেছে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের অবস্থা ও তাপ-

মাত্রা সংগ্রহ করিবার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস-ভর্তি বেলুন প্রত্যহ আকাশে প্রেরণ করা হইতেছে। বেলুনের সহিত থাকে রেডিও-মিটিওরোগ্রাফ নামক যন্ত্র। রেডিও-মিটিওরোগ্রাফ ঊর্ধ্ব বলয়স্তরের যে সকল সংবাদ পাঠায়, চার্টে অঙ্কন করিয়া তাহা হইতে বায়ুমণ্ডলের স্থির বা অস্থির প্রকৃতির কথা জানিবার চেষ্টা করা হয়। বায়ুমণ্ডল অস্থির প্রকৃতির হইলে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত সমস্ত আবহ-ঘাঁটি হইতে একই সময়ে আবহাওয়া-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই সকল পর্যবেক্ষণের বিবরণ সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং সেখানে তৎক্ষণাৎ সেগুলি ওয়েদার-চার্টে অঙ্কিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞেরা বিভিন্ন ঘাঁটির চাপাঙ্কগুলি দেখিয়া বাইজ-ব্যালট সূত্রানুযায়ী সমচাপ রেখা টানিয়া উচ্চ-চাপ এবং নিম্ন-চাপ অঞ্চলগুলি স্থির করিয়া ফেলেন। সাধারণতঃ উচ্চ-চাপ অঞ্চলে আবহাওয়া পরিষ্কার এবং নিম্ন-চাপ অঞ্চলে আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হইয়া থাকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিবার জন্য আজকাল যে কত রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিণ্টার, বেতার যোগাযোগ, রেডিওসনড যন্ত্রপাতি, বিশেষ ধরনের থিওডোলাইট প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, হাই-স্পিড কম্পিউটিং মেসিন প্রভৃতিও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি আসন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যার আগমন সংবাদ পাইবার জন্য রেডার ব্যবহৃত হইতেছে। এই সম্বন্ধে এখানে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা আবহবিদ্যার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র।

পরিশেষে ভারতবর্ষের আবহাওয়াবার্তা প্রেরণের সংগঠন বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে। পুনায় অবস্থিত 'কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অফিস' হইতে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। বলা বাহুল্য এই প্রচার মুখ্যতঃ সর্বসাধারণের জন্য। ফলে ইহার ভাষা যথাসম্ভব জটিলতাবর্জিত ও প্রাঞ্জল। এইজাতীয় প্রচার খুব বিশদ হওয়াও সম্ভব নয়। অথচ এই আবহবার্তার বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষের কাছে আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বজ্ঞানের উপযোগিতা সামান্য— যেমন, ছাতা লইয়া বাহির হইবার প্রয়োজন আছে কিনা। কিন্তু একজন বিমানচালকের কাছে আবহাওয়া বিষয়ে খোঁজখবর আবশ্যিক, তাহা না হইলে সমূহ বিপদ। তেমনই আকাশের অবস্থার উপর কৃষকের শস্যরোপণ ও উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে। জাহাজ আবহবার্তা না পাইলে চলিতে পারে না, মৎস্যজীবীর পক্ষেও আবহাওয়ার খবর প্রয়োজনীয়। হিমালয় অভিযাত্রীদের প্রতি মুহূর্তে আবহাওয়ার খবর জানা দরকার। সুতরাং আবহবার্তা ব্যতীত আধুনিক জগতের অনেক কিছুই অচল।

আবহাওয়া সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহের জন্য সারা ভারতবর্ষে পাঁচটি 'আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র' রহিয়াছে। এইগুলি দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুরে অবস্থিত। বিমানবাহিনীকে সতর্ক করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের তিনটি শাখা— নৌ, বিমান ও স্থল -বাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই আবহবার্তা সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ও জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্যও বিশেষ বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা আছে।

আবহবার্তা প্রচারের মাধ্যম বেতার ও সংবাদপত্র। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ঘন ঘন আবহাওয়ার সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। অন্যদিকে সংবাদপত্র হয়ত মফস্বল অঞ্চলে একদিন পরে প্রেরিত হয়। ফলে পূর্বদিনের আবহাওয়া ঘোষণার কোনও উপযোগিতা থাকে না। এই কারণে ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা আবহাওয়ার সংবাদ পূর্বাহ্ণে পাইতে উৎসুক, তাঁহারা তারবার্তার নির্দিষ্ট মূল্য দিয়া দিলে ঘরে বসিয়াই প্রয়োজনীয় সংবাদ পাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ ঘরে বসিয়া পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বভারতীয় আবহাওয়ার খবর পাইতে হইলে মাসিক আটচল্লিশ টাকা চাঁদা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। দুই মাসের কম গ্রাহক হয় না। পূর্বকথিত 'আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র' -গুলির অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের আবহবার্তা লইলে চাঁদার হার মাসিক বার টাকা।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আবু ২৪°৪০' উত্তর, ৭২°৪৫' পূর্ব। রাজস্থানের সিরোহি জেলায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ শহর। ইহা পশ্চিম রেলপথের আমেদাবাদ (আমদাবাদ) -দিল্লী লাইনের উপর আবু রোড (খরাডি) স্টেশন হইতে উত্তর-পশ্চিমে ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) এবং আমেদাবাদ হইতে ১৮৫ কিলোমিটার (১১৫ মাইল) উত্তরে অবস্থিত। যে পর্বতমালার উপর আবু অবস্থিত তাহা আরাবল্লী পর্বতমালা হইতে বনাস নদীর নাতিদীর্ঘ উপত্যকার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। আবু পর্বতমালা গড়ে ১২১৯ মিটারের (৪০০০ ফুট) মত উচ্চ, সর্বোচ্চ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭২২ মিটার (৫৬৫০ ফুট) উচ্চ।

আবুর প্রাচীন নাম অর্বুদ বা অর্বুদাচল। ঋগ্বেদে অর্বুদের উল্লেখ আছে (১০।৬৮।১২, ১।৫১।৬)। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি হইতে অনুমিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা নাগ উপজাতির বাসস্থান বা নাগ-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মহাভারত এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলিতে আবুকে অপরান্তে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরান্ত পশ্চিম উপকূলের অংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; ইহার বাসিন্দাগণ আনর্ত দেশের অধিবাসী বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান গুজরাটের প্রাচীন নাম আনর্ত। গুজরাটে যখন সোলাঙ্কিদের রাজত্ব চলিতেছে, তখন আবু চন্দ্রাবতীর পরমার সামন্তগণের অধীন ছিল।

আবু পাহাড়ের উপর এক গুহার মধ্যে অর্বুদা দেবীর মন্দির অবস্থিত। আবু রোড স্টেশনের দক্ষিণে ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) গিয়া অম্বা দেবী মন্দির। আবু জৈন সম্প্রদায়ের এক প্রধান তীর্থ। ইহার সহিত তীর্থংকর ঋষভনাথ এবং নেমিনাথের নাম বিশেষভাবে জড়িত।

বিমল শাহ্ নির্মিত বিমলবসহী (১০৩০ খ্রী) ও বাস্তুপাল-তেজপাল নির্মিত লূণবসহী (১২৩০ খ্রী) নামক শ্বেতপাথরের মন্দিরের কারুকার্য জগদ্বিখ্যাত। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে বিমলবসহী ও লূণবসহী নির্মাণ করিতে যথাক্রমে ১৮৫৩০০০০০ ও ১২৫৩০০০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

আবু স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবেও গণ্য হয়। ভারতীয় পুলিস কৃত্যকের নবনিযুক্ত অফিসারগণের জন্য এখানে একটি শিক্ষণকেন্দ্র আছে। 'দিলওয়াড়া' দ্র।

আবু-বকর (৫৭৩-৬৩৪ খ্রী) প্রথম খলিফা। হজরত মহম্মদ তাঁহার কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করেন। আবু-বকর মক্কার ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মহম্মদের প্রথম শিষ্যদের অন্যতম। ইসলাম ধর্মে সুগভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার জন্য তিনি 'অল্ সিদ্দিকী' নামে খ্যাত হন। আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে তিনি হজরতের পাশে থাকিতেন। মহম্মদের মক্কাত্যাগকালে আবু-বকর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহম্মদ যখন শেষবার রোগশয্যায়, তখন তাঁহারই নির্দেশে আবু-বকর প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ওমরের প্রস্তাবক্রমে তখন আবু-বকর খলিফাপদে আসীন হন (৬৩২ খ্রী)। অবশ্য হজরতের জামাতা আলীর ইহা মনঃপূত হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী নামক সম্প্রদায় দুইটির উদ্ভবের অন্যতম কারণ এই মতান্তর। শিয়াগণ আলীকেই মহম্মদের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য করে। আবু-বকরের আমলে (৬৩২-৬৩৪ খ্রী) মুসলমানবাহিনী আরব ও আরবের বাহিরে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে। খলিফা হইবার পরেও আবু-বকর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে হজরতের কবরের পাশে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

আবুল হায়াত

আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খ্রী) মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত এবং প্রকৃতপক্ষে সম্রাট্ আকবরের সচিব ও প্রধানমন্ত্রী। ইনি শেখ মুবারকের দ্বিতীয় পুত্র এবং সুবিখ্যাত কবি ফৈজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি আগ্রায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন আরবদেশীয়, মাতা পারসীক। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সেই তাঁহার গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকবরের সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন। দাক্ষিণাত্যে মোগল অভিযান পরিচালনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যুবরাজ সেলিম তাঁহাকে ব্যক্তিগত শত্রু মনে করিতেন এবং দাক্ষিণাত্য হইতে সম্রাটের আহ্বানে আগ্রায় প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সরাইবীর নামক স্থানে সেলিমের আদেশে বীরসিং বুন্দেলা তাঁহাকে হত্যা করেন (২২ আগস্ট, ১৬০২ খ্রী)। নিকটস্থ অন্ত্রী গ্রামে আবুল ফজলের সমাধি এখনও বর্তমান। 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবরনামা', 'ইয়ার-ই দানিশ' এবং দুই খণ্ড পত্রাবলী— এই রচনাবলী তাঁহার রচনাকুশলতা ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

দ্র H. Blochmann, *Ain-i-Akbari*, vol. I, Calcutta, 1939; H. M. Elliot & J. Dowson, *The History of India, As Told by Its Own Historians*, vol. VI, London, 1875.

সুকুমার রায়

আবেগ অনুরাগ বা বিরাগ আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক সঙ্গী। ভাল লাগার বিষয় সর্বদাই আকর্ষণীয় এবং প্রিয় ; তাহাকে ঘিরিয়া মানুষের আগ্রহ এবং আনন্দ। অন্য দিকে

বিরাগের উৎস হইতে মানুষ স্বভাবতঃই সরিয়া আসে। যাহা ভাল লাগে না তাহা আমরা চাহি না।

এই সহজ ভাল লাগা বা মন্দ লাগা জটিল মানসিক ক্রিয়ারূপে দেখা দিলে তাহাকে আবেগ বলা হয়। আবেগের উদাহরণস্বরূপ ক্রোধ ভয় রাগ প্রেম আনন্দ ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব আবেগের প্রকাশ প্রকট। ভয়ের বস্তু সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক বিরাগ। এই বিরাগের অনুভূতি আবেগে পরিণত হইবে— যখন ঐ বস্তু হইতে সেই মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই বিরাগ ভয়রূপে দেখা দিলে আমরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিব, ক্রোধরূপে দেখা দিলে আক্রমণ করিয়া বিপদের বিনাশ করিব। আবার আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তু সম্পর্কে সুখের অনুভূতি লাভ করিবার মুহূর্তে আনন্দ আবেগে পরিণত হইবে।

আবেগ মানুষকে উত্তেজিত ও বিচলিত করিয়া তোলে। সাময়িকভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা কম-বেশি আচ্ছন্ন হওয়াও সম্ভব। অনেকের মতে আবেগের প্রকাশ তখনই হয় যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। আবেগের প্রভাবে আমরা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলি এবং বাহিরের জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ আবেগের সহিত বিশেষ বিশেষ দৈহিক প্রকাশ দেখা যায়। ক্রোধের সময় চোখ-মুখ লাল হয়, হাত-পা কাঁপে, আবার ভয়ে মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। আবার এমন দৈহিক প্রকাশও রহিয়াছে যাহা একাধিক আবেগের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, রাগ ও ভয়, উভয় ক্ষেত্রেই শরীর কাঁপিতে পারে। আবার বিভিন্ন সময় একই আবেগে বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়। অত্যধিক ক্রোধে যেমন চিৎকার করিতেও দেখা যায়, তেমনই কথা বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে। আবেগের দৈহিক প্রকাশ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। আবেগের সহিত দৈহিক পরিবর্তন প্রায়ই দেখা গেলেও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে যেখানে দৈহিক প্রকাশ আছে অথচ আবেগ অনুপস্থিত। যেমন কাঁদানে গ্যাসের সংস্পর্শে আসিলে চোখে জল আসে, চোখ লাল হইয়া যায়। কিন্তু এখানে দুঃখের কোনও অনুভূতি থাকে না। আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে কোনরূপ দৈহিক পরিবর্তন নাই অথচ আবেগের অনুভূতি আছে।

লৌকিক মতে আবেগ মুখ্যতঃ একটি মানসিক অবস্থা এবং অনেক ক্ষেত্রে এই মানসিক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনও আসে। কিন্তু দৈহিক প্রকাশের সহিত ইহার কোনও কার্য-কারণ যোগ নাই। দুইটি ভিন্ন আবেগের পার্থক্য মানসিক অবস্থার ভিন্নতায়; তাহাদের দৈহিক পরিবর্তনের ভিন্নতায় নয়।

জেম্‌স-লাঙ্গে মতানুসারে (১৮৮৪-৮৫ খ্রী) আবেগের বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার ফলে দৈহিক পরিবর্তন আসে। এই দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যক্তির যে অনুভূতি হয় তাহাই আবেগ।

পরবর্তী যুগে ক্যানন, শেরিংটন, ডানা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া জেম্‌স-লাঙ্গে মতবাদের সমালোচনা করেন। ক্যানন (১৯২৭ খ্রী) আবেগের কেন্দ্রস্থল হিসাবে হাইপোথ্যালামাস -এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ক্যানন-বার্ড মতবাদে বলা হয় যে অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহের দ্বারা হাইপোথ্যালামাসে এবং তথা হইতে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে যায়। সরাসরি স্নায়ু-প্রবাহ নানাপ্রকার শারীরিক পরিবর্তন আনে। আবেগের বিষয় প্রত্যক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকার শারীরিক পরিবর্তন মিলিয়া মস্তিষ্কে যে আলোড়ন বা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ক্যানন-এর মতে আবেগ। বর্তমানে আরও উন্নত ধরনের কাজের মধ্য দিয়া, বিশেষ করিয়া এন্‌কেফেলোগ্রাম -এর সাহায্যে কাজ করিয়া অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে প্রায় সমগ্র মস্তিষ্কই আবেগকালীন অবস্থার সময় কাজ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র হাইপোথ্যালামাস নহে।

সাধারণভাবে আবেগের সামান্য ধর্ম ও বিভিন্ন আবেগের বিশেষ ধর্ম দৈহিক লক্ষণের সাহায্যে নিরূপণ করা এতই কঠিন যে কোনও এক মতে আবেগের পূর্ণ ব্যাখ্যা হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে আবেগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই।

দ্র J. P. Sartre, *Sketch For A Theory of the Emotions*, tr., Philip Marinet, London, 1962; S. S. Stevens ed., *Handbook of Experimental Psychology*, New York, 1951; R S. Woodworth & H. Schlosberg, *Experimental Psychology*, New York, 1964.

বাসন্তিকা লাহিড়ী

আবেস্তা, অবেস্তা ভারতবর্ষ 'বেদ' এবং 'সংস্কৃত' এই নাম দুইটি রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ঋষি জরথুশ্‌ত্রের সময়কার প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থের ও উহার ভাষার মূল নাম লুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। পারসীক মত অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর ১৫০০ বৎসর পরে সাসানীয় 'অথ্রবান্' বা পুরোহিতগণ জরথুশ্‌ত্রের ভাষা এবং তাঁহার পূর্বকালীন ধর্মোপদেশকদের ও তাঁহার নিজের রচিত ধর্মগ্রন্থাদি বুঝাইতে 'অবেস্তা' শব্দটি প্রয়োগ করেন। অবেস্তা ভাষা ঋগ্‌বেদের সংস্কৃত ভাষার সহিত নিকটসম্পৃক্ত, দুই ভাষার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্য দুই ভাষার তাবৎ ধাতু, প্রত্যয় ও শব্দের মধ্যে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরেরও পূর্বে ইরান বা তদুত্তর দেশে একটি মূল ইন্দো-ইরানীয় আর্য ভাষা বর্তমান ছিল। প্রাক্-গাথা যুগের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ) প্রাচীনতম অবেস্তা ভাষার মধ্যে কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যাহা গাথায় অথবা ঋগ্‌বেদে প্রযুক্ত শব্দগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর। তাহার পর খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত গাথায় সাধারণ বা সত্যকার অবেস্তা ভাষা প্রযুক্ত হয়। জরথুশ্‌ত্র-রচিত গাথা এবং অবেস্তায় রক্ষিত ভাষা হইতে সামান্য পৃথক অন্য একটি ভাষা প্রাচীন ইরানে প্রচলিত ছিল। এই ভাষাকে 'প্রাচীন পারসীক' বলা হয়। 'বেহিস্তূন' পর্বতগাত্রে হখামনীষীয় (Achaemenian) সম্রাট্‌দের লেখ এই ভাষায় লিখিত (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-তৃতীয় শতক)। বেদের তথা মহাভারতের সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। তাহার পরে পার্‌থীয় রাজগণের পহ্লবী ভাষার (আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দ) যুগ, পরে সাসানীয়গণের পাজন্দ্ ভাষা (আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচলিত হয়। ইহার পর আধুনিক ফারসী ভাষার (৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) যুগ। এই ফারসী ভাষা মুসলমান তুর্কি বিজেতাদের দ্বারা উত্তর ভারতে আনীত হয় এবং ইহা সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন মুসলমান রাজদরবারের ও পরে দপ্তরের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দীর উপরে এই ফারসী ভাষার প্রভাবের ফলে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতকে।

ধর্মগ্রন্থরূপে অবেস্তা-গ্রন্থাবলীকে পশ্চিম এশিয়ায় আর্যদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান বলা যায়। যদি আর্যভাষার ধাতু 'বিদ্' (=জানা) হইতে 'অবেস্তা' শব্দটি সমুৎপন্ন বলিয়া ধরা হয়, তবে অবেস্তার অর্থ হইল 'জ্ঞান'। 'উপস্তা' এই শব্দের সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ধরিলে অবেস্তার অর্থ '(জ্ঞানের) মূলাধার'। 'অবস্তা' বা 'অবেস্তা' শব্দটি আধুনিক ফারসী হইতে গৃহীত : 'অ-বস্-তঃ'। ইহার মূল রূপ প্রাচীন ইরানীয়তে (জন্দাবস্তা গ্রন্থের যুগে) কি ছিল তাহা অজ্ঞাত। এক মতে, ইহা প্রাচীন ইরানীয় 'আবিস্ত' শব্দ হইতে আসিয়াছে— আ+বিদ্ ধাতু 'জানা'-অর্থে+ত, আবিত্ত, আবিস্ত। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে সংস্কৃত 'বেদ' শব্দের মত। দ্বিতীয় মতে, ইহার মূল হইতেছে প্রাচীন ইরানীয় 'পিস্' ধাতু, সংস্কৃত প্রতিরূপ 'পিশ্', অর্থ, 'রঙ করা, রঞ্জিত বা চিত্রিত করা, লেখা'; 'আপিস্ত-ক'=পূর্ণরূপে লিখিত। পহ্লবী বা মধ্যযুগের ইরানীতে 'আপিস্তক্-উ-জন্দ' (অর্থাৎ মূল লিখিত পুস্তক, ও তাহার টীকা)=ফারসীতে 'আবেস্তা-উ-জন্দ', অথবা 'জন্দ-আবেস্তা'। তৃতীয় মতে অবেস্তা ভাষার শব্দ 'উপস্তা'র বিকারে 'অবেস্তা'। 'উপস্তা' মানে 'আশ্রয়, ভিত্তি'। শব্দটির সত্য নিরুক্তি কি, তাহা বলা যায় না।

সংক্ষেপতঃ অবেস্তা সাহিত্য বলিতে এইগুলি বুঝায় : ১. 'অমেষ' (সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অমৃত') -বিষয়ক প্রাক্-গাথা যুগের অবেস্তা ভাষায় রচিত 'হপ্তং হৈতি' গদ্যরচনা; ২. বেদের 'গায়ত্রী'র মত অহুনাবর্য নামে প্রাচীন পদ; ৩. জরথুশ্‌ত্র-রচিত 'গাথা' বা 'স্বর্গীয় সংগীত'। ইহা আদিম আর্য বহুদেবতাবাদের আমূল সংস্কার বা পরিবর্তন করিয়া বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়; ৪ মঘ্‌বান্ বা প্রাচীন দেবগণের জন্য 'য়শ্ন' (সংস্কৃত প্রতিরূপ যজ্ঞ) অর্থাৎ পূজামন্ত্রপাঠাদি; ৫. বিস্পেরেদ (সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়সমূহ); ৬. বেন্দিদাদ্ ('বি-দএব-দাত' অর্থাৎ দানবগণের বিরুদ্ধে শাস্ত্র), স্মৃতিসংগ্রহ; ৭. 'য়শ্ৎ'= দেবস্তুতি, 'অহুর-মজ্‌দা', 'হওম' (=সোম), 'অষ (বা অর্ত) বহিশ্‌ত' (=ঋত-বসিষ্ঠ), জলের দেবী আর্দ্বিসূর অনাহিত, মাহ (বা চন্দ্রমাঃ), নক্ষত্রদেব তিশ্‌ত্র্য, মিথ্ (মিত্র), গোষ্ (গৌঃ), স্রওষ, বেরেথ্রঘ্ন (=বৃত্রঘ্ন) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ইরানীয় দেবতার স্তব ও তাঁহাদের অবদান এই খণ্ডে আছে। জরথুশ্‌ত্রের পূর্বযুগের ইন্দো-ইরানীয় ধর্মের দেবতাবাদ এই খণ্ডে অনেকটা সংরক্ষিত হইয়া আছে। ইরানীয় আর্যজাতির ধর্ম ও জীবনাদর্শ ইহা হইতে জানা যায়; ৮. দীন্‌কর্ত্ (ধর্ম ও রাজনীতির বিধানাবলী) অর্থাৎ জন্দ্ টীকাটিপ্পনী সংবলিত অবেস্তার অনুবাদ; ৯. 'অথর্‌পতিস্তান' (পুরোহিত কাহিনী); ১০. 'নিরঙ্গিস্তান' (চিকিৎসা ও শোধন -শাস্ত্র); ১১. 'খোর্দহ্ অবেস্তা' (সংক্ষিপ্ত আহ্নিক প্রার্থনা স্তোত্রাদি); এবং ১২. জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, সদাচরণবিধি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক আরও নানা গ্রন্থ অবেস্তার অংশীভূত।

ফারসী ভাষায় মহাকবি ফিরদৌসী রচিত 'শাহ্‌নামা' মহাকাব্যে প্রাক্-মুসলমান যুগের পুরাণকথা উপাখ্যান ও ইতিহাস মনোহর কাব্যাকারে সংগ্রথিত হইয়াছে।

অবেস্তা গ্রন্থে ও নানা পহ্লবী পুস্তকে এই সব উপাখ্যানের কিছু কিছু প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 'জরথুশ্‌ত্র' দ্র।

আর্দেশীর দীনশা

আভাসবাদ শৈব ও শাক্ত দর্শন দ্র

আভীর প্রাচীন বহিরাগত উপজাতিগুলির অন্যতম। সম্ভবতঃ মধ্য প্রাচ্য হইতে শক জাতির সঙ্গে ভারতে আসে এবং প্রথমে পাঞ্জাবে, রাজপুতানায় ও নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। ইহাদের নামানুসারে এই শেষোক্ত অঞ্চল আভীর রাজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রেয়ি'-এর গ্রন্থকার (প্রথম শতাব্দী) ও টলেমি (দ্বিতীয় শতাব্দী) প্রমুখ লেখক আভীরগণের নামানুসারে ইহাকে আবিরিয়া বলিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণেও ইহা সমর্থিত হয়। ক্রমশঃ আভীরগণ আরও দক্ষিণাঞ্চলে তাপ্তী নদীর মোহনা হইতে কোঙ্কণ পর্যন্ত অপরান্ত দেশে বিস্তৃত হয়। পূর্বমালবের একটি আঞ্চলিক নাম 'আহিরওয়ার'ও আভীরগণের স্মৃতিবাহী।

কালক্রমে আভীরগণ তাহাদের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ আভীরদের ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিলেও, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তাহাদের শূদ্র বলা হইয়াছে। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে পাওয়া যায় যে আভীরগণ ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়নির্দিষ্ট আচারাদি পালন না করায় শূদ্রপদবাচ্য হয়। মনুস্মৃতিতে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠা রমণীর গর্ভজাত সংকরবর্ণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। গোচারণ ও গোপালন আভীরদের প্রধান পেশা ছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিও তাহারা গ্রহণ করে। বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে মাঠরিপুত্র ঈশ্বরসেন/ঈশ্বরদত্ত প্রমুখ আভীর রাজার নামোল্লেখ আছে। সাতবাহনদের পরে দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আভীরগণ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আভীরদের কিছু দান আছে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে 'আহিরী' রাগিণীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বহু আখ্যান-রচনাতেও আভীরদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিশিরকুমার মিত্র

আভ্যুদয়িক কোনও অভ্যুদয় (নবগৃহ প্রবেশ, তীর্থযাত্রা, পুত্র-কন্যার বিবাহাদি সংস্কার) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (বৃদ্ধির জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়) বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ (যে শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের মুখে নান্দী বা প্রশস্তি উচ্চারিত হয়) নামেও ইহা পরিচিত। ইহাতে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। ইহা আমান্ন শ্রাদ্ধ; তাই ইহাতে অন্নপাকের প্রয়োজন নাই। ইহা অন্য শ্রাদ্ধের মত দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী (উপবীত ডান কাঁধ হইতে ঝুলাইয়া) হইয়া মধ্যাহ্নে করিতে হয় না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আম[১] ভারতবর্ষই আমের জন্মস্থান। পাকা আম সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। এইজন্য ইহাকে ফলের রাজা বলা হইয়া থাকে। পাকা আমে ০·৬% প্রোটিন, ১১·৮% কার্বোহাইড্রেট ও ০·১% ফ্যাট আছে। পাকা আমের প্রতি ১০০ গ্রামে ক্যালরির পরিমাণ ৫০ ও ভিটামিন এ-র পরিমাণ ৪৮০০; প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন সি-র পরিমাণ ১৩ গ্রাম। কন্যাকুমারী হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই আমের চাষ হইয়া থাকে। দোআঁশ মাটি চাষের উপযুক্ত। উত্তর ভারতে এবং পশ্চিম বাংলায় গাঙ্গেয় পলিমাটির অঞ্চলেই সর্বোৎকৃষ্ট আম

জাতি অনুসারে আম বৈশাখ মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ করে। ঋতুর প্রথম দিকে পাকে গোলাপখাস; মাঝামাঝি সময়ে পাকে প্রায় একই জাতীয় হিমসাগর, গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি ও বোম্বাই। ল্যাংড়া এবং শেষেরদিকের ফজলি অনেকের মতে সর্বোৎকৃষ্ট। ফজলি আম মালদহ জেলার অর্থকরী ফসল। ইহা ছাড়া উত্তর-প্রদেশের দশেরী, বোম্বাইয়ের আলফানসো এবং দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গানপল্লের (আমাদের দেশে বেগুনফুলি নামে প্রসিদ্ধ) নাম করা যাইতে পারে।

টাটকা ও শুকনা অবস্থায় কাঁচা ও পাকা আমের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। আমচুর, আমকাসন্দি, আমের আচার, আমসত্ত ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কচি আমের অম্বল ও আমদুধ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য।

আম পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে এবং পাকা আম ও আম্রজাত নানা প্রকার দ্রব্যের রপ্তানি ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে। ভারত সরকারের বিদেশী বাণিজ্যের হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত ১২ মাসে ৩৮ লক্ষ কিলোগ্রামের বেশি আম বিদেশে চালান হইয়াছে, মূল্য প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

আম[2] হিন্দুর নানা অনুষ্ঠানের সহিত নানাভাবে আমের যোগ আছে। দেব-দেবীর পূজায় ও মঙ্গলকার্যে ঘটের উপর আমের পল্লব দিতে হয়; বাড়ির দরজায় মালার মত করিয়া আমের পাতা টাঙাইয়া দেওয়া হয়। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার সময় অন্যান্য ফুলের সঙ্গে আমের মুকুল ব্যবহারের প্রথা আছে। আমাদের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চূতকুসুম পানের ব্যবস্থা আছে। বাংলার বাহিরে কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা চৈত্রী শুক্লা প্রতিপদে মদন পূজা উপলক্ষে। চৈত্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বারুণী স্নানের শুভ অবসরে কচি আমের প্রথম ব্যবহার। তাই ইহার নাম আম-বারুণী। এই দিনের পূর্বে অনেকে আম ব্যবহার করেন না। বৈশাখ মাসে আম ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে পবিত্র-ভাবে কাসন্দি তৈয়ারি করিবার পর্ব— এই মাসেই মহিলারা চার বৎসর চারটি ফল দিয়া যে ফল দানের ব্রত করেন তাহাতে তৃতীয় বৎসর আম দান করিবার রীতি আছে। আম পাকিলে আম্রোৎসর্গ। এই অনুষ্ঠানে কিছু আম আনুষ্ঠানিকভাবে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া গৃহস্থের নিজের ব্যবহার করিবার বিধান। কোথাও কোথাও আমকাঠে দিয়াই শবদাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাই আমকাঠের পিঁড়ি বা চৌকি সকলে ব্যবহার করেন না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আমতা হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার একটি থানা ও থানা-সদর। দামোদর নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত আমতা থানার আয়তন ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটার (১৪১ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী থানা-সদরের লোকসংখ্যা ৮০৮৬ (পুরুষ ৪১৬৮ ও স্ত্রী ৩৯১৮); স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯৪০ : ১০০০।

দামোদর যতদিন শীর্ণ হয় নাই, আমতা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখনও অবশ্য ইহা একটি বড় গঞ্জ। রেল ও জল -পথে ধান, খড়, পাট, তরিতরকারি ও মাছ চালান যায়। হাওড়া হইতে রেলপথে আমতার দূরত্ব ৪৪ কিলোমিটার (২৭ মাইল) এবং ইহা হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের দ্বারা যুক্ত। আমতায় একটি মুনসেফি আদালত, একটি হাসপাতাল ও কয়েকটি সরকারি অফিস আছে। ইহা ছাড়া এখানে তিনটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (তাহার মধ্যে একটি বালিকা বিদ্যালয়) ও একটি ডিগ্রি কলেজ রহিয়াছে। আমতার মিষ্টান্নের, বিশেষতঃ পান্তুয়ার খ্যাতি আছে। আমতার মেলাই চণ্ডীর মন্দির প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত এই মন্দিরটিকে অনেকে হাওড়া জেলার প্রাচীনতম মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিংবদন্তী অনুসারে দেবী পূর্বে দামোদরের অপর পারে জয়ন্তী গ্রামে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে এই জয়ন্তীই তন্ত্রোক্ত জয়ন্তী মহাপীঠ— দেবীর জানুসন্ধি এখানে পড়িয়াছিল। অনাদিলিঙ্গ ক্রমদীশ্বর এই স্থানের ভৈরব। দুর্গোৎসবে, মাঘী ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে বিশেষ উৎসবাদি হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা-গুলিতে বহু-লোকসমাগম হয়।

আমতা থানার অন্যান্য গ্রামের মধ্যে রসপুর, জয়পুর, থলিয়া, পানপুর, ঝিকড়া, নারিট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমতার নিকটেই মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়োর গড় বা পেঁড়ো-বসন্তপুর অবস্থিত। এখানে কানা নদীর তীরে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

আমদাবাদ আমেদাবাদ দ্র

আমলী অব্দ দ্র

আমানত ব্যাঙ্ক দ্র

আমীর আলী, সৈয়দ (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রী) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলমান আইনের অধ্যাপক ছিলেন। আমীর আলী ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি (১৮৯০-১৯০৪ খ্রী)। আমীর আলী ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন; ইতিপূর্বে আর কোনও ভারতীয় এই সম্মান পান নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন করেন আমীর আলী তাহার সমর্থক ছিলেন। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের দিকেই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। মর্লি-মিন্টো (১৯০৯ খ্রী) ও তৎপরবর্তী শাসনসংস্কারে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবির উপর যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মূলে আমীর আলীর দান কম নহে। তিনি মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের সমর্থক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহার লণ্ডন শাখার উৎসাহী কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'এ ক্রিটিক্যাল

এগ্‌জামিনেশন অফ দি লাইফ অ্যাণ্ড টিচিংস্ অফ মহম্মদ', 'দি স্পিরিট অফ ইসলাম', 'এ শর্ট হিস্টরি অফ দি স্যারাসেন্‌স', 'মহাম্মেডান ল', 'হিস্টরি অফ মহাম্মেডান সিভিলিজেশন ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমীর আলীর পূর্বে আর কোনও বাঙালী ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে এত ব্যাপক আলোচনা করেন নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের রাজউইকে (সাসেক্‌স্) নিজ ভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আমীর খুসরৌ, -খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী) ফারসী ভাষার ভারতীয় কবি। প্রকৃত নাম, আমীর আবুল-হাসান খুস্‌রৌ দিহ্‌লবী। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পাতিয়ালী নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা লাচিন-তুর্কী-জাতীয় সৈফুদ্দীন ভারতে আসিয়া সুলতান ইলতুৎমিসের আশ্রয়লাভ করেন। মাতা ভারতীয় মহিলা। অল্প বয়স হইতেই সাহিত্য ও সংগীতে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তিনি দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদ, জালালুদ্দীন ও আলাউদ্দীন খিল্‌জী এবং গিয়াসুদ্দীন তোগলকের প্রধান রাজকবি ও সভাসদরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রভাবে খুসরৌ-এর রচনায় মিষ্টিক সুরের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

'মৎলা-উল-আনওয়ার', 'শিরিন-উ-খুসরৌ', 'মজনুন-উল-লায়লা', 'আয়না-ই-সিকান্দরী', 'হশ্‌ত্-বহিশ্‌ত্', 'দুবলরানী খিজির খাঁ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির অন্যতম। পঞ্চকাব্য-সংবলিত 'খামশেহ্' পারসীক কবি নিজামীর (১১৭০-১২০২ খ্রী) অনুসরণে রচিত। বহুসংখ্যক গাথা ও চতুর্দশপদী এবং কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক কাব্য ও গদ্য-রচনাও আমীর খুসরৌ-এর রচনাবলীর অন্তর্গত।

ইনি প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর দরবারে সংগীতজ্ঞ নায়ক গোপালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কওল, তরানা প্রভৃতি গীতরীতির উদ্ভাবন এবং পারসীক সংগীতের সহিত ভারতীয় সংগীতের মিশ্রণ তাঁহার বিশিষ্ট কীর্তি। গুরু নিজামউদ্দীনের তিরোভাবের অল্পদিন পরে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমীর খুসরৌ-এর মৃত্যু হয়। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধিপার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

আমেদাবাদ, আমদাবাদ গুজরাটের জেলা। ঐ নামধেয় জেলার সদর এবং রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী। জেলায় আয়তন ৮৯৬৪ বর্গ কিলোমিটার (৩৪৬১ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ২২১০১৯৯ (পুরুষ ১১৮৮২৬৯, স্ত্রী ১০২১৯৩০)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ২৪৫ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৬৩৯)। শহরের লোকসংখ্যা ১১৪৯৯১৮ (পুরুষ ৬৩৭০৬১, স্ত্রী ৫১২৮৫৭)। জেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৪১·৯ জন। পুরুষের মধ্যে শতকরা ৫২·৭ জন ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ২৯·৩ জন। শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা এইরূপ : পুরুষ ৩৯৪১০০ ও স্ত্রী ২১২৩৮১ জন।

শহরটি (২৩°২´ উত্তর, ৭২°৩৮´ পূর্ব) সাবরমতী নদীর উভয় কূলে অবস্থিত। জনপ্রবাদ অনুসারে আসা ভীল নামক এক ভীল-প্রধানের নামানুসারে ইহার প্রাচীন নাম আসাওয়ল হয়; তাঁহার নামে একটি প্রাচীন টিলা এখনও পরিচিত। অণহিলবাড় রাজবংশের আমলে (৭৪৬-১২৯৮ খ্রী) অরণ্যময় এই অঞ্চলটি কৃষিবাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তখন সুন্দর ভাস্কর্যে খচিত বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরে ইহা মুসলমান শাসকবৃন্দের অধীন হয়। ১৫শ শতকে (১৪০৩ খ্রী) গুজরাটের শাসনকর্তা মজফ্‌ফরের (জাফর) পুত্র তাতার খাঁ বিদ্রোহী হইয়া পিতাকে আসাওয়লে বন্দী করিয়া মহম্মদ শাহ্ নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং মজফ্‌ফর পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পৌত্র অলপ্ খাঁ ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ্ শাহ্ নাম ধারণ করেন এবং প্রতিবেশী রাজপুত-গণকে ও মালবরাজকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমগ্র গুজরাট স্বীয় করায়ত্ত করেন। তিনিই স্বাধীন গুজরাটের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই নামানুসারে শহরের নাম আহ্‌মেদাবাদ বা আমেদাবাদে পরিণত হয় এবং রাজধানী-রূপে বিবেচিত হয়।

আহ্‌মদ শাহের পরবর্তী সুলতানগণের মধ্যে মামুদ বেগড়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার পৌত্র বাহাদুর শাহের সময়ে (১৫২৬-১৫৩৭ খ্রী) গুজরাট কিছুদিনের জন্য হুমায়ুনের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাটকে পাকাপাকিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন, তখন ইহা মোগল সাম্রাজ্যের একটি 'সুবা' রূপে গণ্য হয়। জাহাঙ্গীর যখন আমেদাবাদের শাসনকর্তা তখন তাঁহার মহিষী নূরজাহান শহরের শাসনভার পরিচালনা করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর আমেদাবাদে অবস্থানকালে ইংরেজদূত টমাস রো-কে বাণিজ্য ও বসবাসের অধিকার প্রদান করেন। ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যসম্পর্কের ইহাই সূত্রপাত।

মোগল আমলে আমেদাবাদ নূতন সমৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বহু যুদ্ধের পরে ইহা মারাঠাশক্তির করায়ত্ত হয়। শহরের অর্ধাংশ পেশোয়া এবং অপরাংশ গাইকোয়াড়ের শাসনাধীন হইল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি অনুসারে পেশোয়া স্বীয় অংশ ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গাইকোয়াড়ের নিকট হস্তান্তরিত করেন। উপরন্তু ইংরেজের নিকট পেশোয়ার যে অর্থ প্রাপ্য ছিল তাহাও পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে এক সন্ধি অনুসারে গাইকোয়াড় ইংরেজের হাতে আমেদাবাদ অর্পণ করার বিনিময়ে ডাভোই পরগনার অধিকার লাভ করেন।

আমেদাবাদ শহরের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্বন্ধে বলা চলে যে ১৪১১ হইতে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার বৃদ্ধির সময়। ১৫১২ হইতে ১৫৭২ পর্যন্ত রাজবংশের শক্তিক্ষয়ের সহিত ইহারও ক্ষয় হইতে থাকে। ১৫৭২ হইতে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল অধিকারের কালে ইহার অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে। পুনরায় ১৭০৯ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পতন হইতে থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শহরটির উন্নতি ঘটিতেছে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতের মধ্যে এই শহরে সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রথম বিদ্যুৎচালিত কাপড়ের কল নির্মিত হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মিলের সংখ্যা ২৭টিতে দাঁড়ায়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ৭২টি মিলে ২১৩১৪৮৬ টাকু এবং ৪২৩১৯ তাঁত চালু ছিল। বস্ত্রশিল্পে মোট নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ৯১০ কোটি টাকা। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মোট কাপড়ের শতকরা ৫৭·২৫ ভাগ ও মিহি বস্ত্রের শতকরা ৩৮ ভাগ আমেদাবাদে উৎপন্ন হয়।

আমেদাবাদ কুটিরশিল্পের জন্যও বিখ্যাত। মুসলমান রাজত্বকালে ইহা মধ্য এশিয়ার মালয়, খোরাসান, আরব, আবিসিনিয়া ও মিশরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, বহুবিধ শিল্পবস্তুও এখানে নির্মিত হইত। আজও সেই খ্যাতি অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। সোনা-রুপার কাজ, তামা ও কাঁসার নানাবিধ বস্তু, কাঠখোদাই, পাথরের কাজ, হাতির দাঁতের শিল্প, সোনা-রুপার সুতা ও জরি প্রভৃতি বহুবিধ বস্তু আজও এখানে তৈয়ারি হয়।

আমেদাবাদ সংস্কৃতি ও শিক্ষার ব্যাপারেও গুজরাটের কেন্দ্রস্বরূপ। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় এইখানে অবস্থিত এবং ইহার অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ৭২; তন্মধ্যে ২১টি এই শহরেই বর্তমান। একটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং, দুইটিতে চিকিৎসাবিদ্যা, চারটিতে আইন এবং দুইটিতে শিক্ষণপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত শেঠ ভোলাভাই জেসিংভাই ইন্‌স্টিটিউট অফ লার্নিং অ্যাণ্ড রিসার্চ, শ্রীকানাইয়ালাল মোতিলাল স্কুল অফ পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যাণ্ড রিসার্চ, দি বি. এম. ইন্‌স্টিটিউট অফ সাইকোলজি অ্যাণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এবং দি ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে পারমাণবিক গবেষণা হইয়া থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী জাতীয় শিক্ষার এক কেন্দ্রস্বরূপ এখানে গুজরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপনা করেন। এখন সেখানে সমাজসেবায় স্নাতক ও হিন্দীভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিদানের ব্যবস্থা আছে। রাজনীতিবিজ্ঞানের পঠনপাঠনের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে 'হ্যারল্ড ল্যাস্কি ইন্‌স্টিটিউট অফ পোলিটিক্যাল সায়েন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আমেদাবাদ টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন কাজ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন সমিতির মধ্যে আমেদাবাদ এডুকেশন সোসাইটি, আমেদাবাদ মেডিক্যাল সোসাইটি, গুজরাট ইন্‌স্টিটিউট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাণ্ড আর্কিটেক্ট্‌স্ ও সংগীত-নাটক-কলা-নৃত্যকেন্দ্র 'দর্পণা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীদেরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে, যথা টেক্সটাইল লেবর অ্যাসোসিয়েশন, আমেদাবাদ মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, দি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি।

রাজনীতিক্ষেত্রেও আমেদাবাদের দান কম নহে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী শহরের কোচরাব নামক পল্লীতে প্রথম সত্যাগ্রহাশ্রম স্থাপিত করেন। পরে জুন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সাবরমতী নদীর তীরে স্থানান্তরিত হয়। ইহা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমেদাবাদে নূতন ধরনের শ্রমিক সংগঠনের সূত্রপাত হয়। তাহার লক্ষ্য ছিল, শ্রমিক এবং মালিক উভয়ে সম্মিলিত হইয়া কার্য পরিচালনা করিবে, অবশেষে কারখানার উপরে শ্রমিকদের মালিকানাস্বত্বও স্থাপিত হইবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রম হইতে লবণ আইন অমান্যের জন্য গান্ধীজী ডাণ্ডী অভিযানে যাত্রা করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলনের সময়ে মিলের শ্রমিকগণ একাদিক্রমে ১০৫ দিন ধর্মঘট চালাইয়াছিল।

আমেদাবাদ হইতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে লোথাল নামক স্থানে হরপ্পা-সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৫০-১৪০০

অব্দের পূর্বেও নিকটবর্তী স্থানে নগরকেন্দ্রিক এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। মুসলমান অধিকারের পূর্বে এই স্থানে জৈন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সুন্দর কারুকার্যে খচিত দেউল নির্মিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকে মুসলমান রাজশক্তি এগুলিকে ভাঙিয়া মসজিদে পরিণত করেন; উপরন্তু কারিগরদিগকে মসজিদ নির্মাণে নিযুক্ত করেন। ফলে মসজিদের মধ্যেও মূর্তি বাদ দিয়া আলংকারিক নকশায় দেশী শৈলীর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেদাবাদে দর্শনীয় পুরাকীর্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : জামা মসজিদ; আহ্মদ শাহ এবং তাঁহার মহিষীদের সমাধি; রানী সিপ্রির মসজিদ ও সমাধি; দস্তুর খানের মসজিদ; তিন দরওয়াজা; ভদ্দর আজম খানের প্রাসাদ; সিদি সৈয়দের মসজিদ; আহ্মদ শাহের মসজিদ; শেখ হাসানের মসজিদ; রানীর মসজিদ; মুহাফিজ খানের মসজিদ। এতদ্ভিন্ন হাতি সিংহের মন্দির (১৮৪৮ খ্রী), স্বামী নারায়ণের মন্দির (১৮৫০ খ্রী); ভদ্রার মন্দির, পিঞ্জরাপোল এবং শাহীবাগও দর্শনযোগ্য স্থান।

শাহীবাগ ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে দুইটি প্রাসাদ আছে এবং প্রবাদ অনুসারে উভয়ের মধ্যে ভূগর্ভে এক সুড়ঙ্গ যোগ-সূত্রের আকারে বর্তমান। শাহীবাগ ব্রিটিশ আমলে কমিশনারের বাসভবনে পরিণত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এখানে চাকুরি করিতেন (১৮৬৪-১৮৬৭ খ্রী ও ১৮৭৬-১৮৮০ খ্রী) তখন শাহীবাগ তাঁহার বাসভবন ছিল। বিলাত যাইবার পথে (১৮৭৮ খ্রী) রবীন্দ্রনাথ এই প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পটভূমি এই শাহীবাগ প্রাসাদ।

জামা মসজিদ (১৪২৩ খ্রী) গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। আহ্মদ শাহের ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য মসজিদটি (১৪১০ খ্রী) বহু বিনষ্ট মন্দিরের উপাদান লইয়া গঠিত হয়; একটি স্তম্ভগাত্রে ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক লিপি আছে। বর্তমানে মসজিদটিতে গুজরাট ক্লাব অবস্থিত। রাজদুর্গের বহিরঙ্গণের প্রধান তোরণদ্বার 'তিন দরওয়াজা' উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি। কথিত আছে, ইহার উপর হইতে সুলতান আহ্মদ শাহ্ তাঁহার রাজসভার সমারোহ প্রত্যক্ষ করিতেন। জামা মসজিদের পূর্বদিকে সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহের পত্নী মুঘলাই বিবির ও তাঁহার ভগ্নী মিরকী বিবির কালো পাথরে নির্মিত সমাধি দর্শনীয়। সিদি সৈয়দের মসজিদে জানালার কারুকার্য, ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।

কাঙ্ক্‌রিয়া হ্রদ নামে ৩০ হেক্টর (৭৬ একর) আয়তনের এক জলাশয় আমেদাবাদের গৌরবস্থল। ইহার ঘাট, নিকটবর্তী উদ্যান, পশুশালা, শিশুদের ক্রীড়াস্থল প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসীদের অত্যন্ত আদরণীয় স্থান।

এতদ্ভিন্ন আমেদাবাদের স্থাপত্যে এক বিশিষ্ট বস্তু হইল 'বাপী' বা 'বাও'। এই কূপগুলিতে জলতল পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য ভূগর্ভে সিঁড়ি রচিত থাকে। উত্তম বাপীগুলির উপরে গম্বুজের আচ্ছাদন এবং ভূগর্ভে কিয়দ্দূর নামিবার পর উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবস্থা থাকে। গুজরাটের মত শুষ্ক, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এরূপ বাপী বিশেষ উপযোগী। হিন্দু এবং মুসলিম অধিকারকালে অনেকগুলি সুন্দর বাপী নির্মিত হইয়াছিল। দাদাহরির বাপী (১৪৯৯ খ্রী) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখানকার কয়েকটি উৎসব ও মেলা উল্লেখযোগ্য। তিন বৎসর অন্তর 'অধিক' বা মলমাসে অনুষ্ঠিত একটি উৎসবে স্ত্রীলোকেরা নগ্নপদে সতরটি পবিত্র স্থানে (অধিকাংশই সাবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত) উপাসনা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কাতিকের শুক্লা একাদশীতে প্রত্যূষে নদীতীরে দেব-উঠি-আগিয়ারস্ (দেবোত্থান একাদশী) মেলানুষ্ঠানে বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। কাঙ্ক্‌রিয়া হ্রদে বিজয়াদশমীর দিন দশেরা মেলায় সকল শ্রেণীর হিন্দু যোগদান করে; দক্ষিণী এবং মারাঠী ব্রাহ্মণেরা শমীবৃক্ষে পূজা দেয়। শ্রাবণ মাস, বিশেষ করিয়া ইহার সোমবারগুলি, শিবের বার বলিয়া স্থানীয় হিন্দুরা মনে করে। এই উপলক্ষে শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার বস্ত্রালের সুখরায়দেবের মন্দিরে, তৃতীয় সোমবার শাহাবাদির মহাদেবের মন্দিরে এবং শ্রাবণের শেষদিন— 'অমাস'-এ অসারবর নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে বহুসংখ্যক পুণ্যার্থী আসে। নবরাত্রি (দুর্গাপূজা) উপলক্ষে নয় রাত্রি ধরিয়া রাস ও গরবা নৃত্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে। কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদে নববর্ষোৎসব উপলক্ষে গোমতীপুরের নরসিংহ মন্দিরে এবং শুক্লা নবমীতে সারবতে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া কথিত আচার্যি মহারাজার গদিতে প্রচুর ভক্তের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মেলার মধ্যে জমালপুর প্রবেশপথে অনুষ্ঠিত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্রপঞ্চমীতে ঋষিপঞ্চমী এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রাবক মেলা, শাহীবাগে শ্রাবণ মাসে গোকল অঠম্ অর্থাৎ গোকুলাষ্টমী ও ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে দরো অঠম (দূর্বাষ্টমী), দুধেশ্বর কাজিপুরে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা দিবসে এবং চৈত্রের শুক্লা নবমীতে

রামচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে দরিয়াপুরের স্বামী নারায়ণের মন্দিরে অনুষ্ঠিত রামনবমী মেলা উল্লেখযোগ্য। মুসলমান উৎসব ও মেলাগুলির মধ্যে মহরম উৎসব এবং পিরান মেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। আমেদাবাদ শহরের দক্ষিণে গিরনাথ গ্রামে পিরানের দরগায় সৈয়দ ইমাম্ শাহের (পঞ্চদশ শতাব্দী) মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধানতঃ রমজান মাসে অনুষ্ঠিত মেলায় অনেক হিন্দু দর্শনার্থীও দেখিতে পাওয়া যায়। অসারবতে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান মোল্লা কুতবুদ্দীনের, রথিয়াল গ্রামে মালিক সরফের, শাহাপুরে পিরমদ শাহের, দানিলিমব্দা গ্রামে ফকিরশাহ্ আলমের, মানেকচকে আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আহ্‌মদ্ শাহের এবং সরখেজে আহ্‌মদ খত্রী ও নগ্ন ফকির বাবা আলিশা'র পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত মেলাগুলির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল মেলায় যে শুধু পুণ্যলাভের বা সামাজিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাই নহে, প্রতি মেলায় নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচাও ঘটিয়া থাকে।

দ্র *Census of India : Paper No 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962 ; *Gazetteer of the Bombay Presidency*, vol. IV : *Ahmedabad*, Bombay, 1879 ; *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Bombay Presidency*, vol. 1, Calcutta, 1908 ; *Archaeological Survey of India* (New Imperial Series) : vol. XXXIII : *Muhammedan Architecture of Ahmedabad*, London, 1905 ; B. Jhote Ratnamonirao, *Ahmedabad and Other Places of Interest in Gujarat*, Ahmedabad ; Department of Tourism, Government of India, *Maharastra and Gujarat*, New Delhi, 1962. R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. I-VI, 1951-60.

তারাপদ মাইতি

আমেরিকা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা দ্র

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর নূতন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চল প্রধানতঃ স্পেনের দখলে আসিলেও উত্তর ভাগ অনধিকৃত থাকিয়া যায়। এই সুযোগে অ্যাটল্যান্টিক উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে একটির পর একটি ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মোট সংখ্যা অনুসারে ইহারা তের-কলোনি নামে পরিচিত। প্রথমটির (ভার্জিনিয়া) তারিখ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ, সর্বশেষটির (জর্জিয়া) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

অনুকূল আবহাওয়া, অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, সচ্ছলতর জীবনযাত্রা ইত্যাদির আকর্ষণে দলে দলে ইংরেজ ও ইওরোপের অন্য অঞ্চলের কিছুসংখ্যক লোক নূতন জগতের এই অংশে বসবাস আরম্ভ করে। মুষ্টিমেয় আদিবাসী তাহাদের রোধ করিতে পারে নাই। পুরাতন জগতের আর্থিক দুরবস্থা, ধর্মান্ধতার অত্যাচার, সংকীর্ণ স্থিতিশীল সমাজের বন্ধন প্রভৃতি হইতে মুক্তির আশা ছিল ইহাদের প্রেরণা। নূতন জীবন গঠনের উদ্দীপনা তাহাদের শক্তি জোগাইল; প্রাকৃতিক বাধার অতিক্রমণ তাহাদের আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করিল; কলোনির আদি সীমানা ছাপাইয়া গিয়া ক্রমে তাহারা অনুপ্রবেশ করিতে লাগিল মহাদেশের অজানা অভ্যন্তরে।

উপনিবেশগুলি এক ছাঁচে গড়িয়া উঠে নাই। ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা প্রভৃতি দক্ষিণী কলোনি কৃষিপ্রধান; তামাক ও পরে তুলা চাষের বাগিচা সেখানে লক্ষণীয়; আফ্রিকা হইতে আগত নিগ্রো দাস ক্রমে উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা; পরশ্রমভোগী মালিকদের আভিজাত্য উল্লেখযোগ্য। উত্তরের কলোনিগুলির যৌথ নাম নিউ ইংল্যাণ্ড। সেখানে স্বাধীন ছোট চাষীদের প্রাধান্য; বাণিজ্য ও শিল্প -প্রবণতা সুস্পষ্ট; আদি বসতিকারী পিওরিটানদের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির আদর্শ প্রবল; জমি-নির্ভর আভিজাত্য অনুপস্থিত। মধ্য অঞ্চলের প্রথম জনপদগুলি (যেমন নিউ ইয়র্ক) ওলন্দাজদের সৃষ্টি, ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নানা পার্থক্য সত্ত্বেও সব কয়টি কলোনির মূলগত ঐক্য অবিসংবাদী।

তের-কলোনির প্রত্যেকটির শাসনব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু এক ধাঁচের। প্রতি উপনিবেশে একজন গভর্নর নিযুক্ত হইতেন, তবে আসল ক্ষমতা থাকিত কলোনির নির্বাচিত ব্যবস্থাসভার হাতে। সভার সিদ্ধান্ত ইংরেজ সরকার নাকচ করিতে পারিত বটে, কিন্তু দুস্তর মহাসমুদ্রের পরপারে সুদূরস্থিত উপনিবেশ শাসনে হস্তক্ষেপের রেওয়াজ ছিল না বলিলেও চলে। ইংল্যাণ্ডের জনগণ ক্রমান্বয়ে নিজেদের যে সব অধিকার অর্জন করিয়াছিল, তের-কলোনির বাসিন্দারা নূতন দেশেও সেই অধিকারভোগে অভ্যস্ত হয়, তেমন অধিকারে তাহাদের জন্মগত দাবি সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস ছিল অবিচল। স্বায়ত্তশাসন তের-কলোনির বৈশিষ্ট্য; অন্য ইওরোপীয়, এমন কি অপর ইংরেজ উপনিবেশে ইহার অস্তিত্ব অনুপস্থিতপ্রায়।

সাম্রাজ্যের প্রধান বন্ধন ছিল আর্থিক বিধিনিষেধ, প্রশাসনিক নয়। কলোনির বন্দরে বিদেশী জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; তামাক ইত্যাদি প্রধান উৎপন্ন সামগ্রী রপ্তানি করিতে হইত ইংল্যাণ্ডের বাজারে; বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রী ইংরেজ বণিকের মাধ্যমে আমদানি করা ছাড়া উপায় ছিল না; কলোনিতে ইংরেজদের প্রতিযোগী কোনও শিল্প গড়িয়া তোলা ছিল বে-আইনী। এই আর্থিক আইন-কানুনের আওতায় সাম্রাজ্যের মুনাফা আসিত ইংল্যাণ্ডের হাতে, পরিবর্তে কলোনির আভ্যন্তরীণ আত্ম-শাসনে মাতৃভূমির আপত্তি হয় নাই। কলোনির শৈশবে সাম্রাজ্যের আর্থিক বন্ধন ঔপনিবেশিকদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হয় নাই। কিন্তু এমন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ নিঃসন্দেহে রুদ্ধ হইয়া যাইত।

গোলযোগ আরম্ভ হইল আঠার শতকের মাঝামাঝি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আর্থিক অনুশাসন সব সময়ে কার্যকরী হইত না, ফাঁক সম্বন্ধেও এতদিন ঔদাসীন্য ছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ সরকার কঠোর হস্তে কলোনির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিল, হঠাৎ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হইল আমেরিকাবাসীর প্রতিবাদ। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেন্‌ভিল মন্ত্রিসভা স্থির করে যে যুদ্ধের খরচ ও সৈন্যবৃদ্ধির দরুন কলোনি হইতে আরও টাকা তুলিতে হইবে, বাণিজ্যশুল্ক বাড়াইতে হইবে, শুল্কসংগ্রহে ফাঁকি চলিবে না। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট স্ট্যাম্প আইন জারি করিল; কলোনিগুলিতে সকল দলিলপত্রে সরকারি নূতন স্ট্যাম্প লাগাইতে হইবে, ফলে ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইবে। প্রবল প্রতিরোধ স্ট্যাম্প-আইনকে অচল করিয়া ফেলিল; রব উঠিল যে আভ্যন্তরীণ কর বসানোর অধিকার একমাত্র নির্বাচিত স্থানীয় ব্যবস্থাসভার আয়ত্তাধীন, ইংরেজ সরকারের নহে। স্ট্যাম্প-আইন বাতিল হইলেও মন্ত্রী টাউন্‌শেন্‌ড বাণিজ্যের উপর নূতন শুল্ক বসাইলেন (১৭৬৭ খ্রী), শুল্ককর নয়। অর্থসংগ্রহের এই নূতন চেষ্টাকেও ব্যর্থ করিয়া দিল দেশব্যাপী অসহযোগ ও বয়কট অভিযান। নূতন শুল্ক প্রত্যাহার করা হইলেও টাকা আদায়ের অধিকারের চিহ্ন হিসাবে চা আমদানির উপর শুল্কটি বজায় রাখা হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বস্টন বন্দরে একদল লোক চায়ের সিন্দুকগুলি জাহাজ হইতে সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। অবাধ্যতা দমনে কৃতসংকল্প রাজা তৃতীয় জর্জ ও প্রধানমন্ত্রী নর্থ আইন করিয়া বস্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন। গোটা ম্যাসাচুসেট্‌স্ কলোনিতে স্বায়ত্ত-শাসন নিষিদ্ধ হইল এবং দখলকারী নূতন ইংরেজ সৈন্যদল প্রেরিত হইল— পশ্চিম অঞ্চলে নূতন বসতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল (১৭৭৪ খ্রী)। পর বৎসর লড়াই শুরু হয় লেক্‌সিংটন ও কনকর্ড জনপদের পাশে।

তের-কলোনির মিলিত প্রতিনিধিসভা-কংগ্রেস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করে। তাই আজও এই তারিখে স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হয়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল, অস্ত্রব্যবহার ঔপনিবেশিকদের কিছু অজানা ছিল না। প্রতিভাধর সেনাধ্যক্ষ না হইলেও ওয়াশিংটনের ধৈর্য ও অটল সংকল্প নবজাত স্বাধীন জাতির স্বদেশপ্রেমের প্রতীক হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে দূরাগত ইংরেজ সৈন্যের উৎসাহ ছিল ক্ষীণ, পথঘাট ছিল অজানা, নেতৃত্ব দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত, জনমত বিভক্ত। ক্রমে ইংরেজবৈরী ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড বিদ্রোহীদের পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। সারাটোগা-তে ইংরেজ সেনাপতি বার্গয়েন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৭ খ্রী), ইয়র্কটাউনে কর্নওয়ালিসকে সসৈন্য অনুরূপ ভাগ্যই বরণ করিতে হইল (১৭৮১ খ্রী)। বিব্রত ইংরেজ সরকার অবশেষে ভের্সাই সন্ধিপত্রে (১৭৮৩ খ্রী), তের-কলোনির স্বাধীনতা মানিয়া লয়। অ্যাটল্যাণ্টিক হইতে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড এইভাবে আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্ররূপে সংগঠিত হইল।

দ্র E. Channing, *History of The United States*, vol. III, 1921; R. G. Adams, *Political Ideas of the American Revolution*, 1922; S. E. Morrison, *The American Revolution: Documents*, 1927; S. E. Morrison, *Oxford History of The United States*, 1927; H. B. Parkes, *United States of America*, 1953; S. E. Morrison & H. S. Commager, *The Growth of the American Republic*, 1955.

সুশোভন সরকার

আমোদ-প্রমোদ চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়া থাকে তাহাকেই আমোদ-প্রমোদ বলা যাইতে পারে। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা হইতে আরম্ভ করিয়া ফুটবল, ক্রিকেট, তাস-পাশা, দাবাখেলা, শিকার, ঘোড়দৌড়, বুলবুলির লড়াই, ভোজবাজী, বাইনাচ এমন কি হেঁয়ালি, ছড়াকাটা পর্যন্ত সব কিছুই আমোদ-প্রমোদের পর্যায়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ঋতুতে বাড়ির বাহিরে গিয়া সমবেতভাবে আমোদ-আহ্লাদ করিবার রীতি ছিল।

মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বংশযুদ্ধ, রথের দৌড়-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে বহু লোক উপস্থিত থাকিত। বাৎস্যায়নের সময়ে নাগরকগণ আধুনিক কালের ন্যায় অপরাহ্ণে 'গোষ্ঠী' বা ক্লাবে গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত। নাগরকের নিত্যকার্যের মধ্যে গোষ্ঠী-সমবায় ও সমস্যা-ক্রীড়া সমাদৃত অনুষ্ঠান। সমস্যা-ক্রীড়া অর্থে যাহাতে নাগরকগণ মিলিত হইয়া ক্রীড়া করে। উহা দুই প্রকার, 'মাহিমান্য' এবং 'দেশ্য'। বাৎস্যায়ন কয়েকটি সমস্যা-ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন (কামসূত্র ৪।৪২) যথা, যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর, সুবসন্তক, সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, আগোলচতুর্থী, মদনোৎসব, হোলাকা, অশোকত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্বযুদ্ধ। টীকাকার যশোধর ইহার মধ্যে প্রথম তিনটিকে মাহিমান্য-ক্রীড়া বলিয়াছেন; এই সকল ক্রীড়ায় নৃত্য-গীত ও বাদ্যাদি হইয়া থাকে এবং এইগুলি আঞ্চলিক নহে, দেশব্যাপী। যাহা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ ক্রীড়া তাহা দেশ্য-ক্রীড়া।

মাহিমান্য-ক্রীড়ার মধ্যে যক্ষরাত্রি-ক্রীড়া কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে (কাহারও কাহারও মতে কার্তিক অমাবস্যার রাত্রে বা কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে) এই উৎসবে সমস্ত রাত্রিব্যাপী দ্যূতক্রীড়া ও নৃত্য-গীতাদি হইত। দীপাবলী উৎসবে নানা প্রকার আতশবাজী ছোঁড়া হইত। গৃহসকল আলোকবর্তিকা দ্বারা সজ্জিত হইত। কৌমুদী-জাগর উৎসব আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হইত। ইহাকে মদনোৎসবও বলা যাইতে পারে। কেননা প্রেমিক-প্রেমিকাগণ দোলা-ক্রীড়া ও দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া এই রাত্রি যাপন করিত। পুরুষগণ নিজেদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া করিত। উৎসবটির অপর নাম দ্যূত-পূর্ণিমা। সুবসন্তক উৎসব মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী বা বসন্তপঞ্চমীর রাত্রে নৃত্য-গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া -সহযোগে অনুষ্ঠিত হইত। এই তিথিতেও মদনোৎসবের আসর বসিত। 'উপরি-উক্ত তিনটি উৎসবই উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র অদ্যাপি পালিত হইয়া থাকে।

গাছপালা নদী পাহাড় প্রভৃতির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া আনন্দ-উৎসব করিবার রীতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষিজাত শস্যাদি ঘরে তুলিবার সময়েও অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বৎসরে কয়েকবার দল বাঁধিয়া বনভোজনে গিয়া রান্না-বান্না গান-বাজনা করিয়া আমোদ করা চলিত। পুষ্পিত শিমুল গাছকে ঘিরিয়া তাহারই ফুলে সজ্জিত হইয়া নৃত্য-গীত করা হইত। বসন্তকালে আম্রমঞ্জরী এবং চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে অশোকপুষ্পের ভূষণে সজ্জিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করা হইত। কদম্বফুল লইয়া ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া দল বাঁধিয়া যুদ্ধ হইত। প্রথম বৃষ্টির পর বনভোজনে গিয়া গাছে গাছে বিবাহ দেওয়া হইত। কচি আম উঠিলে, ইক্ষু মিষ্টতা লাভ করিলে, কিংবা ছোলা, মটর, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য পাকিলে গাছশুদ্ধ পোড়াইয়া সেইগুলি এবং পদ্মের মৃণাল তুলিয়া তাহা দল বাঁধিয়া খাওয়া, আমোদ করিবার অঙ্গ ছিল। ইহার প্রত্যেকটি এক-একটি উৎসবের ব্যাপার এবং ইহাদের স্বতন্ত্র আখ্যা ছিল।

গ্রীষ্মকালে বাঁশের পিচকারি দিয়া পরস্পরকে জলে ভিজানো আর একটি আমোদের ব্যাপার। বর্তমানে ইহা রং-মিশ্রিত জলে হোলি খেলায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে বৈশাখী শুক্লা চতুর্থীতে সুগন্ধি যবচূর্ণ পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করা হইত, আজকাল দোলের সময় ইহার পরিবর্তে আবীর ব্যবহৃত হয়। পূর্বে শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী তিথিতে দোলা-ক্রীড়া হইত, অধুনা শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল-উৎসবে কিংশুক বা অন্য পুষ্পের সুগন্ধি জল অথবা সুগন্ধি যবচূর্ণপূরিত লাক্ষানির্মিত কুঙ্কুমের ন্যায় দ্রব্য পরস্পরের প্রতি ক্ষেপণ করা হইত। হোলাকা (হোরি) বা দোল-উৎসব বর্তমানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া গেলেও প্রাচীন লৌকিক উৎসবের চিহ্ন এখনও ইহার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতেই নাগর এবং আঞ্চলিক উৎসব ব্যতিরেকে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলার ব্যবস্থা ছিল। বহু লোক বিশেষ উদ্দেশ্যে সমবেত হইত বলিয়া এই মেলাগুলিকে 'সমাজ' বলা হইত। বিশেষ লোকপ্রিয় হওয়ায় ইহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে, এই সম্ভাবনার ফলে সমাজগুলি রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিত। রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, উৎসব সমাজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও যাত্রা, সমাজ, উৎসব এবং প্রবহণের ব্যবস্থা আছে। যাত্রা বলিতে দেব-দেবীর রথারোহণে মিছিল বা শোভাযাত্রা, সমাজ বলিতে সমবেত জনতাক্ষেত্র, উৎসব বলিতে ইন্দ্র, মদন প্রভৃতি দেবতার পূজা বা ঋতু-উৎসবাদি এবং প্রবহণ বলিতে উদ্যান বা বনভোজনাদি আনন্দানুষ্ঠান বুঝায়।

সাধারণতঃ নগর হইতে দূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা

সমতল গিরিশিখরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাজের অনুষ্ঠান হইত। মৃগয়া বা শিকার যেখানে সহজে সম্ভবপর সেই সকল স্থানই নির্বাচিত হইত। নানারূপ প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়া— যেমন, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, দৌড়, রথের দৌড়, বাদ্য ও কণ্ঠসংগীত, নৃত্য, রথে সজ্জিত দেব-দেবীর রঙ্গাঙ্গনে প্রদক্ষিণ ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ইহাতে থাকিত। নানা আকারের মঞ্চ এবং বেদি স্থাপিত হইত এবং তদুপরি নৃত্য, গীত-বাদ্য, ভাঁড়ের রঙ্গ-তামাশা, বীরগাথা আবৃত্তি, বৈতালিকদিগের গান, পুতুলনাচ, নাট্যাভিনয় ও তিতির প্রভৃতি পাখির এবং হস্তী, অশ্ব, মহিষ, ষণ্ড প্রভৃতির লড়াই হইত। নানাবিধ জাদু, ভোজবাজী ও ভেলকিবাজী, বাজীকরের খেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা তো ছিলই, অধিকন্তু সামরিক কুচকাওয়াজ এবং সৈনিকদের নকল যুদ্ধও দেখানো হইত। মদ্যপান এবং মাংসাদি ভক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, একাদিক্রমে চারদিনব্যাপী মদ্যপানেও রাষ্ট্রের আপত্তি ছিল না। সম্রাট্ অশোক পরবর্তী কালে এই প্রথাগুলির বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। সমাজ-অঙ্গনে ধর্মালোচনা এবং যজ্ঞাদিরও ব্যবস্থা থাকিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহাভারতে যে বর্ণনা আছে তাহা শৈব ধর্মাবলম্বীদের সমাজের বর্ণনা, তাহাতে শুধু মদ্যপান, নৃত্য-গীতাদির কথাই আছে। লৌকিক সমাজগুলি কিন্তু একটি বৃহৎ রঙ্গাঙ্গন বা প্রেক্ষাগারে অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে সমাগত দর্শকদের অবস্থানের জন্য শিবির বা তাঁবু এবং মঞ্চ নির্মিত হইত; বিভিন্ন প্রকারের মাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণকে ভোজ দেওয়া হইত; বিভিন্ন অস্ত্রাদি লইয়া নানা প্রকারের খেলা দেখানো হইত; সামরিক কুচকাওয়াজ এবং নৃত্য গীত বাদ্য -সহকারে স্বয়ংবর সভা বসিত।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে সরস্বতী দেবীর মন্দিরে স্থানীয় ও আমন্ত্রিত সংগীত ও নৃত্য -শিল্পীদের মাসিক বা পাক্ষিক যে অধিবেশন হইত তাহাকেই সমাজ বলা হইয়াছে।

পালি সাহিত্যে নক্ষত্র-ক্রীড়া নামে একপ্রকার উৎসবের উল্লেখ আছে। আজীবকগণ নক্ষত্রবিচার করিয়া শুভদিন স্থির করিয়া দিলে দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হইত এবং নানা প্রকারের আমোদ-আহ্লাদ করিয়া জনসাধারণ দিনটি পালন করিতেন।

অশোকের শিলালিপিতে 'মঙ্গল' নামক উৎসবের উল্লেখ আছে। বিবাহ বা পুত্রসন্তান লাভ হইলে নানা প্রকারের আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন করিয়া মঙ্গল-উৎসব পালিত হইত।

মুসলমান আধিপত্যকালে ঘরের বাহিরে সম্মিলিত স্ত্রী-পুরুষের মদনোৎসবসমূহ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায়। তবে ঋতু-উৎসবগুলির কয়েকটি সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব হইতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে আরম্ভ করে এবং এই আমলে সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া প্রাচীন ঐতিহ্যকে কতকাংশে বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কোজাগরী, বসন্ত প্রভৃতি মদনোৎসবগুলি সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। নূতন কোনও উৎসবের প্রবর্তন এই সময়ে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, তবে কৃষ্ণকীর্তন, কালীকীর্তন, চণ্ডীর গান, পটের গান ইত্যাদি দ্বারা সমবেতভাবে আনন্দলাভের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন কালের সমাজ মেলা নাম লইয়া প্রধানতঃ বেচা-কেনার ক্ষেত্র হইয়া উঠে, অবশ্য কিছু কিছু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিত।

নবাবী এবং ইংরেজ আমলের সন্ধিক্ষণে বাংলা দেশের নাগরিক আমোদ-আহ্লাদের রূপ সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায়। নাচ-গান তামাশা মদ্যপান তখন আমোদ-প্রমোদের এক-মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে; উৎসাহের অভাবে পুরুষোচিত ক্রীড়াদি ক্রমশঃ অবহেলিত হইতে থাকে। প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়াদির মধ্যে পাখি ও ঘুড়ির লড়াই সে যুগের বাবুদের বিশেষ প্রিয় ছিল। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য কিছু কিছু প্রাচীন ক্রীড়ার চর্চা হইত কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিকৃত রুচির ফলে এই সমস্ত আমোদ-আহ্লাদের উপায়গুলি অনাদৃত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশে ধনীর বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় মদ্যপানসহ বাইজীর নাচ প্রভৃতিই প্রাধান্য লাভ করিত। সম্ভ্রান্ত এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা অন্য সময়েও নিজ বাড়িতে বাইজী নাচের ব্যবস্থা করিতেন।

সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে আমোদ-আহ্লাদ করিবার রুচি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। পলাশির যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত এ দেশে অনেক ইংরেজ দুর্গোৎসবে যোগদান করিয়া মদ্যপান, ভোজন, বাইনাচ প্রভৃতি উপভোগ করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বিদেশী আমোদ-প্রমোদের চর্চা বাড়িতে থাকে। তদুপরি খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ এ দেশের শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফলে যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ এ দেশের সকলেরই উপভোগ্য ছিল সেগুলি অশালীন বিবেচনায় অবহেলিত হইতে লাগিল। লোকপ্রিয় আখড়াই, কবিগান, তরজা, পাঁচালি ইত্যাদি অনাদরে বিলুপ্ত হইতে চলিল এবং থিয়েটার, ম্যাজিক, সার্কাস ইত্যাদি সেগুলির স্থলাভিষিক্ত হইতে থাকিল। ঋতুপর্যায়ের উৎসবসমূহ মুসলমান যুগেই অবহেলিত হইতে

আরম্ভ করিয়াছিল, এখন সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অবশ্য কয়েকটি ছোটখাটো আমোদ-আহ্লাদ লুপ্ত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। যেমন বিবাহের সভায় বর ও কন্যাপক্ষীয়দের মধ্যে হেঁয়ালি বা সমস্যাপূরণের প্রতিযোগিতা। কিছুদিন আগেও বিভিন্ন রকমের ভূত-প্রেত, চোর-ডাকাত বা অদ্ভুত হাস্যরসের গল্প নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গী ও পদ্ধতিতে বিবৃত করিয়া আনন্দ দান করিবার মত কিছু কিছু লোকের দেখা মিলিত। এখন সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির প্রচলন হইবার ফলে ইহাদের সাক্ষাৎ বিরল হইয়া উঠিয়াছে। খরিদ্দারগণের নিকট ঈশ্বরবৃত্তি নামে চাঁদা আদায় করিয়া কোনও বিশেষ দেবতার পূজা উপলক্ষে আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করার রেওয়াজ ব্যবসায়ী সমাজে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে বারোয়ারি পূজা বলা হয়। ইহাতে যাত্রা, পুতুলনাচ, খেমটানাচ, স্থানীয় শিল্পীর নির্মিত দেব-দেবী বা নানারকম মাটির পুতুলের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকিত এবং মাসাধিক কাল ধরিয়া ইহা চলিত। নবাবী আমলের শেষ দিক হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত আনন্দোৎসবের ইহা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। সর্বজনীন পূজা প্রবর্তনের ফলে বারোয়ারি পূজা ইদানীং হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্র ত্রিদিবনাথ রায়, বঙ্গশ্রী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৪৪; বাৎস্যায়নের কামসূত্র; B. M. Barua, *Inscriptions of Asoka*, Part II, Calcutta, 1943; R. K. Mookerji, *Asoka*, Delhi, 1955.

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমোদর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদী তারাজুলি নদীর সহিত মিলিতভাবে হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে পড়িয়াছে। ইহার খাত কঙ্করময়। নদীর তীরে 'গড় মান্দারন' অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ও দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ইহার উল্লেখ আছে।

অরবিন্দ বিশ্বাস

আম্বালা পাঞ্জাবের বিভাগ, জেলা ও জেলা-সদর। জেলার আয়তন ৫৪৭২ বর্গ কিলোমিটার (২১৩৪ বর্গ মাইল)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার লোকসংখ্যা ১৩৭৩৩৭৭। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৫৮১২৭ ও নারী ৬১৫৩৫০ জন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনুপাত ১০০০: ৮১২। প্রতি বর্গ মাইলে লোকবসতি ৬৪৪ জন। আম্বালা শহরের জনসংখ্যা ৭৬২০৪। তন্মধ্যে পুরুষ ৪১৪৬২ ও নারী ৩৪৭৪২ জন।

আম্বালা জেলায় বিভিন্ন কর্মে ৪০৮৫৬৪ জন পুরুষ শ্রমিক ও ৩৯৯৮২ জন নারী শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। ১৬০৫৬১ জন পুরুষ ও ২০৩৭১ জন নারী কৃষিকর্মে; ২৬৫২৬ জন পুরুষ ও ৬৩৫ জন নারী খেত-মজুররূপে; ৩৪৬৪১ জন পুরুষ ও ১৩৬০ জন নারী শ্রমশিল্পে; ২৯৫০৭ জন পুরুষ ও ৭২৮৬ জন নারী গৃহশিল্পে; ২৭৯০৭ জন পুরুষ ও ২৬৭ জন নারী ব্যবসায়-বাণিজ্যে; ১৯৮১১ জন পুরুষ ও ১১১ জন নারী পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ এবং ১৮:১৯ জন পুরুষ ও ১১৭৫ জন নারী পূর্ত ও গৃহনির্মাণ কার্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ও আম্বালা লইয়া গঠিত আম্বালা শহর-সমষ্টিতে (টাউনগ্রুপ) মোট কর্মীর সংখ্যা ৫৩৯৯২ জন পুরুষ ও ২৯৭২ জন নারী। ৮৫৮৫ জন পুরুষ ও ১০৪ জন নারী ব্যবসায়-বাণিজ্যে; ৭১৮৬ জন পুরুষ ও ১৩৮ জন নারী উৎপাদন শ্রমশিল্পে, এবং ৬২৯৪ জন পুরুষ ও ৫১ জন নারী পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিযুক্ত আছেন। আম্বালায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং কাচশিল্পের কারখানা আছে। ইহা ছাড়া এখানকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা এবং কাগজের কল উল্লেখযোগ্য। হাঁস-মুরগী পালনের কেন্দ্রও এখানে স্থাপিত হইয়াছে। আম্বালা একটি রেলওয়ে জংশন স্টেশন। আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে নর্দার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স অবস্থিত।

প্রাচীন সরস্বতী এবং বর্তমান যমুনা নদীর মধ্যে অবস্থিত আম্বালা ভারতভূমিতে আর্যদের অন্যতম আদি বাসস্থান। আম্বালা সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণিক বিবরণ সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পর্যটক হিউএন্-ৎসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেই পাওয়া যায়। সেখানে ইহা একটি সমুন্নত ও সুসভ্য রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজধানী ছিল স্রুগ্ন— কানিংহ্যাম ইহাকেই জগাধ্রির নিকটবর্তী বর্তমান সুঘ গ্রাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হিউএন্-ৎসাঙ তাঁহার ভারতভ্রমণকালে (৬৩০-৬৪৪ খ্রী) সন্ন্যাসী জয়গুপ্তের সহিত এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। আম্বালা শহর সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতেই গড়িয়া উঠে, কিন্তু তখন উহা কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল। সেই সময়ে ইহার স্বতন্ত্র গুরুত্ব কিছুই ছিল না। আধুনিক আম্বালার যাহা কিছু গুরুত্ব, তাহা সবই সাম্প্রতিক কালের। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শিখগণ আম্বালা অধিকার করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই আম্বালার বর্তমান ইতিহাসের

সূচনা। যখন এক দিকে মারাঠা ও অন্য দিকে আফগান আক্রমণে কেন্দ্রীয় মোগলশক্তি শিথিল হইয়া আসিতেছিল তখন পাঞ্জাব হইতে একদল শিখ অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় শতদ্রু নদী পার হইয়া শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী ভূমির কেন্দ্রীয় অঞ্চল দখল করিয়া লইল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের নিকট মারাঠাগণ পরাজিত হইলে সমস্ত অঞ্চলটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিখসর্দারদের হস্তে বিভক্ত হইয়া পড়িল। পরে রণজিৎ সিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ রাজ্যগুলিকে একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত করিতে গেলে শিখসর্দারগণ ভীত হইয়া ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের সহিত রণজিৎ সিংহের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে গভর্নর জেনারেলের আম্বালাস্থিত এজেন্টের অধীনে শিখসর্দারগণ স্ব স্ব রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের সময়ে কিছু কিছু শিখসর্দার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন এবং তাহারই ফলস্বরূপ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশের করতলগত হইল এবং শিখসর্দারগণের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইল। ব্রিটিশ অধিকারে আসার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেনানিবাস 'আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট' স্থাপিত হয়।

মেলার মধ্যে বাওয়ান দ্বাদশীর মেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাদ্র মাসে সাড়ম্বরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি শোভাযাত্রাসহকারে বাহির করা হয়। ইহা ছাড়া মনসাদেবীর মেলা, পাখা মেলা, সধৌরাতে শাহ্ কুমাইর মেলা এবং বৈশাখী মেলা ও চৈত-চৌদস্ মেলার মত কয়েকটি বাৎসরিক মেলা উল্লেখযোগ্য। উৎসবাদির মধ্যে দেওয়ালি ও দশেরা উৎসবই প্রধান। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেওয়ালি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ছোট দেওয়ালির দিনে পাত্রে চাউল ও চিনির উপর পয়সা দিয়া ব্রাহ্মণ ও কুমারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এই দিনে মৃত পূর্বপুরুষরা গৃহপরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই উৎসব পালিত হয়। পরদিন গোবর্ধন দিবসে সন্ধ্যাকালে গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বালানো হইয়া থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। পরের দিন সমস্ত আবর্জনা ও প্রদীপগুলি গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করা হয় এবং গৃহে নূতন দীপ আনা হয়। আশ্বিন মাসের দশেরা উৎসব প্রায় মাসাধিককাল ব্যাপিয়া চলে। এই উৎসব নরাধ্স, নৌরৎ এবং দশেরা এই তিনটি অনুষ্ঠানে বিভক্ত। দশেরার দিনে দই এবং ভাতের সহিত 'কড়হ' (চিনি ময়দা ও ঘৃত -সহযোগে প্রস্তুত) ভোজন উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। দশেরা উৎসবের পাঁচ দিন পরে অনুষ্ঠিত গর্বরা উৎসবটিও উল্লেখযোগ্য।

আম্বালা জেলা প্রধানতঃ হিন্দীভাষী অঞ্চল। এখানে শতকরা ৩০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। আম্বালা শহরে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা ২৫৭০৫ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২৪৮৫ জন। এখানে সাতটি কলেজ, তিনটি মহিলা কলেজ, দুইটি ট্রেনিং কলেজ, দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং একটি আইন কলেজ আছে।

আম্বালার ৭২ কিলোমিটার (৪৫ মাইল) উত্তরে শতদ্রু নদীর তীরে রূপার অবস্থিত। ইহা একটি সুপ্রাচীন শহর— পূর্বনাম রূপনগর। এখানে হরপ্পার সমকালীন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রূপারে একটি সরকারি কলেজ আছে। রূপার শহরের ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) পূর্বে শিবালিক পর্বতে অবস্থিত বর্দারে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। এখানে প্রায় ৭৫০ বৎসরের প্রাচীন দুর্গা ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনসা দেবীরও একটি মন্দির আছে। আকবর ও মহম্মদ শাহের আমলের মুদ্রা এখানে এখনও যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শিখ আমলে শিশোয়ান, আফিম, চরস, পশম ও অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফিদই খাঁর পরিকল্পিত মনোরম মোগল-উদ্যানের জন্য পিঞ্জোর বিখ্যাত। এখানে একটি মেশিন টুল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আম্বালার ৪২ কিলোমিটার (২৬ মাইল) পূর্বে পর্বতের সন্নিকটে ক্ষুদ্র গ্রাম সধৌরা গজনীর মামুদের সমকালীন একটি প্রাচীন শহর। নারায়ণগড়ের নিকট হুসেইনী গ্রামের জামকেশর পুষ্করিণীটি হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র। কথিত আছে হিমালয়ের পথে পাণ্ডবেরা এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নিকটে রামচন্দ্র ও শিবের মন্দির বর্তমান। আম্বালা জেলার অন্যান্য শহরের মধ্যে আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট ও চণ্ডীগড় উল্লেখযোগ্য। 'চণ্ডীগড়' দ্র।

আম্বালা জেলার নিম্নলিখিত স্থাপত্যকীর্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য: বুরিয়াতে অবস্থিত শাহ্ জাহানের নির্মিত রঙমহল; সধৌরার শাহ্ কুমাইর স্মৃতিসৌধ (১২৫০ খ্রী)। এতদ্ভিন্ন সধৌরার মসজিদ এবং লাল ইটের তোরণ দুইটিও (১৬১৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: Punjab*, vol. I, Calcutta, 1908; *Punjab*

District Gazetteers: volume VII, Part A: Ambala District, 1923-24; *Census of India: Paper No. I of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

তারাপদ মাইতি

আম্বেদকার, ভীমরাও রামজী (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রী) মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণ এলাকার মাহার পরিবারের সন্তান। ইঁহার পিতার নাম রামজী সাকপাল ও মাতার নাম ভীমাবাঈ।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের এলফিন্স্টোন কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম. এ. (১৯১৫ খ্রী) ও ডি. ফিল. (১৯১৭ খ্রী) ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর লণ্ডনে আইন ও অর্থনীতি অধ্যয়নপূর্বক তিনি এম. এস্‌সি. (১৯২১ খ্রী) ও ডি. এস্‌সি. (১৯২৩ খ্রী) ডিগ্রী অর্জন করেন। সুবক্তা ও সুলেখক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ্‌ ও রাজনীতিজ্ঞ আম্বেদকার ছিলেন তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজের অবিসংবাদিত নেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে তিনি কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া অস্পৃশ্য ও নিগৃহীত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রিক অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। অপরিমিত মানসিক শক্তি ও যোগ্যতাবলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের আইন পরিষদের ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের সাহায্যার্থে গঠিত প্রাদেশিক কমিটির সভ্য মনোনীত হন। বিলাতে অনুষ্ঠিত 'গোল টেবিল বৈঠকে' (১৯৩০-৩১ খ্রী) তিনি মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা করিয়া অস্পৃশ্যদের জন্য আইনসভায় স্বতন্ত্র আসন দাবি করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনানুযায়ী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বোম্বাইয়ে যে নূতন আইনসভা গঠিত হয়, তাহাতে আম্বেদকারের 'ইনডিপেনডেন্ট্‌ লেবার পার্টি' ১৫টি আসন লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পর নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সংবিধান সভা (কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্‌লি) কর্তৃক গঠিত ড্রাফ্‌টিং কমিটির সভাপতিরূপে ভারতীয় সংবিধান রচনায় ব্রতী হন। ভারতীয় সংবিধান রচনায় তাঁহার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। একদা যৌবনে যিনি জাতিভেদ-প্রথার সংরক্ষক মনুসংহিতা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তিনি ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ সাধন করেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার উপর আম্বেদকার অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্র Dhananjay Keer, *Dr. Ambedkar: Life and Mission*, Bombay, 1954; K. Santhanam, *Ambedkar's Attack*, New Delhi, 1946.

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

আম্রপালী অম্বপালী দ্র

আয় দৈনন্দিন ভাষায় আয় শব্দের অর্থ অত্যন্ত সহজ। কোনও ব্যক্তি মাসে, বৎসরে (বা অন্য কোনও নির্ধারিত সময়-বিশেষে) যতটা অর্থ পায় তাহাকেই সাধারণ ভাষায় তাহার সেই সময়-বিশেষের আয় বলা হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে যে এই অর্থ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে। কোনও এক মাসে প্রাপ্ত অর্থ সেই মাসে উপার্জিত অর্থ হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, শেয়ার, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ আয় নহে, উহা সম্পত্তির রূপান্তরীকরণ মাত্র। অনুরূপভাবে অন্য কোনও মাসে উপার্জিত অর্থ বর্তমান মাসে পাওয়া যাইতে পারে এবং এই মাসে উপার্জিত অর্থ অন্য মাসে পাওয়া যাইতে পারে। আবার দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের ফলে একই পরিমাণ অর্থে বিভিন্ন পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত আয় জানিতে হইলে আর্থিক আয়কে মূল্যস্তরের সূচক দিয়া সংশোধন করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, আয় অংশতঃ টাকায় এবং অংশতঃ ভোগ্যদ্রব্যে হওয়া সম্ভব। যেমন, অনেকে বেতনের অংশ হিসাবে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে বাসস্থান পাইয়া থাকেন; আয়ের হিসাবে এই সব বস্তুর মূল্য যোগ করা উচিত। তেমনই আবার স্বেচ্ছাকৃত সেবার (যেমন, গৃহিণীর কাজকর্ম) মূল্যও ধরা প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজের মূল্য আয়ের ভিতরে ধরিতে আরম্ভ করিলে আয়ের অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং আয়ের সর্বতোভাবে গ্রহণীয় একটা পরিমাপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

অর্থনীতির দৃষ্টি হইতে আয়ের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: কোনও ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিবার পরেও পূর্বেকার আর্থিক অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহাকে সেই ব্যক্তির সেই সময়ের আয় বলা যাইতে পারে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ব্যক্তি-বিশেষের আয় তাহার ভোগক্ষমতার নির্দেশক; কিন্তু সে যে সেই সময়ে ঐ

পরিমাণ ভোগ করিবেই এমন কোনও কথা নাই। সর্বাধিক ভোগক্ষমতার কম যদি ভোগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির সংগতি বৃদ্ধি পাইবে; বিপরীতভাবে আয়ের অধিক ভোগ করিলে সংগতি হ্রাস পাইবে।

এই সংজ্ঞা শেয়ার, জমি ইত্যাদি সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন ধরা যাউক একজন ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য ১০১০ টাকা এবং তাহার অন্য কোনও আয় নাই। এই সম্পত্তি হইতে সে মাসে শতকরা এক টাকা হারে সুদ পায়। এখন সে যদি মাসে ১০ টাকা ব্যয় করে তাহা হইলে অবশিষ্ট ১০০০ টাকা হইতে এক মাসে সে ১০ টাকা সুদ পাইবে এবং মাসের শেষে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। শ্রমলব্ধ আয়ের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সংজ্ঞা প্রয়োগ করা কিছুটা কঠিন। সাধারণতঃ মেশিন ইত্যাদির বেলায় যেমন অবচয় (ডিপ্রিসিয়েশন) ধরা হয়, মানুষের বেলায় তেমন কোনও খরচ বাদ দেওয়া হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দাসপ্রথার অবসানের পর মানুষের ক্রয়মূল্য নিরূপণ করিবার কোনও সঠিক উপায় নাই। এই কারণে শ্রমলব্ধ আয়ের প্রচলিত পরিমাপে সম্পত্তিলব্ধ আয়ের তুলনায় একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা (আপওয়ার্ড বায়াস্) থাকে। এই আয় হইতে শুধু যে অবচয় হিসাবে কিছু বাদ দেওয়া হয় না তাহাই নহে— কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার জন্যও কিছু বাদ দেওয়া হয় না।

আয়ের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা প্রয়োগকালে আর একটি সমস্যা দেখা দেয় যখন ভবিষ্যতে দ্রব্যাদির মূল্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানকালীন আর্থিক আয়কে মূল্যস্তরের সূচক দিয়া সংশোধন করিতে হয়। তেমনই যখন ভবিষ্যতে মূল্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে তখন সম্পত্তি অটুট আছে কিনা ইহা দেখিতে হইলে ভবিষ্যৎ আর্থিক আয়ের পরিমাণকে মূল্যস্তরের সূচক দিয়া সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যাপারে ভবিষ্যতের মূল্যস্তরের সূচক কি হইবে বলা কঠিন। আরও একটি সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যবস্তুকে লইয়া। কোনও এক সময়ের ব্যয় এবং ভোগ এক নহে। ধরা যাউক একজন লোক একটা রেডিও ক্রয় করিল। এই ব্যক্তি বহু বৎসর ধরিয়া এই রেডিও হইতে সুবিধা ভোগ করিবে; কোনও এক বৎসরের সুবিধা রেডিওর পূর্ণমূল্যের তুলনায় কম। এক বৎসরে রেডিওর মূল্য যতটা অবচিত হইবে ততটাই ভোগের মধ্যে পড়ে। বাকি মূল্য ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অতএব সম্পত্তি অটুট আছে কিনা ইহা নির্ধারণ করিবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধিও ধরা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে তাত্ত্বিক বিচারে গ্রহণীয় আয়ের সংজ্ঞা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন। এবং আসলে কার্যক্ষেত্রে (যেমন সরকারি কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে) আয়ের যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয় তাহা তাত্ত্বিক সংজ্ঞা হইতে অনেকটা ভিন্ন। সাধারণতঃ যে আয় নিয়মিতভাবে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়, তাহাকেই আয়ের মধ্যে ধরা হয়। মূলধনের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধিহেতু যে সাময়িক লাভ হয় তাহাকে বাৎসরিক আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। আয়ের যে অংশ টাকায় পাওয়া যায় একমাত্র তাহাকেই আয় না ধরিয়া অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যও (যেমন বিনামূল্যে বাসস্থান, গাড়ির ব্যবহার ইত্যাদি) যাহা বেতন ইত্যাদির অংশ হিসাবে পাওয়া যায়, তাহাও উহার সহিত যোগ করা হয়। উপার্জনের জন্য যে সব খরচ করিতে হয় তাহারও কিয়দংশ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শ্রমলব্ধ আয়ের হিসাবে পূর্বোক্ত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সংশোধন করিবার জন্য অনুপার্জিত (অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত) আয়কে শ্রমলব্ধ আয় হইতে ভিন্ন করিয়া দেখা হয়। এই সবই অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সমস্যানিষ্পত্তির প্রচেষ্টামাত্র। আয়ের কোনও পরিমাপই সম্ভবতঃ তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে।

উপরি-উক্ত আলোচনা ব্যক্তিগত আয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য। জাতীয় আয় নির্ধারণে আরও সমস্যা দেখা দেয়। 'জাতীয় আয়' দ্র।

রামগোপাল আগরওয়ালা

আয়কর লোকের আয়ের উপর যে কর সরকার ধার্য করেন তাহাকেই আয়কর বলে। বর্তমানে অধিকাংশ দেশে সরকারি রাজস্বের একটা প্রধান উৎস আয়কর। কিন্তু আয়করের এই গুরুত্ব সত্ত্বেও ইহা অনেকটা নূতন কর। শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের পরই ইহা গৃহীত হইতে আরম্ভ করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইহাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আগেকার দিনে সম্পত্তিই করদান ক্ষমতার প্রধান সূচক ছিল। কিন্তু শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে যখন শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে এবং মুদ্রার মাধ্যমে আদান-প্রদান প্রচলিত হয় তখন আর সম্পত্তি করদান ক্ষমতার সূচক হিসাবে গ্রহণীয় থাকে না। ব্যবসায়ী, মজুর, চাকুরিজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর করদান ক্ষমতার প্রধান সূচক হইয়া দাঁড়ায় তাহাদের আয়ের

প্রবাহ, সম্পত্তির পরিমাণ নয়। কেননা সম্পত্তি বলিতে তাহাদের প্রধান বস্তু হইল দৈহিক বা মানসিক কার্যক্ষমতা এবং তাহার পরিমাপ আয় ছাড়া দেওয়া কঠিন। এই সব কারণে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সম্পত্তিকরের গুরুত্ব কমিয়া যাইতে থাকে এবং আয়কর প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ আয়কর আরোপ ও আদায় করিতে জমিকর ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অতএব যখন কিছুটা উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হয় তখনই আয়কর গুরুত্ব লাভ করে।

ব্রিটেনে আয়কর প্রথমে আরোপিত হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই কর তৎকালীন ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য আরোপিত হইয়াছিল এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যাহৃত হয়। ইহার পর মাঝে মাঝে স্বল্পকালের জন্য এই কর আরোপিত হইতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের কঠোর সমালোচনার ফলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহাকে একটা স্থায়ী রাজস্ব-ব্যবস্থা হিসাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর স্বল্পকালের জন্য প্রথম আরোপিত হয় গৃহ-যুদ্ধের সময় (১৮৬৪ খ্রী)। তারপর ১৮৯৩ সালের মন্দার ফলে রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য আয়কর আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৮৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট আয়করকে বেআইনী ঘোষণা করে। ইহার ফলে ১৯০৯ সালে সংবিধানে পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং ১৯১৩ সাল হইতে ফেডারেল আয়কর স্থায়ী হয়।° ভারতে সাময়িকভাবে আয়কর প্রথম আরোপ করা হয় ১৮৬০ সালে। স্থায়ী আয়করের বিল আনা হয় ১৮৮৬ সালে এবং ইহার পর হইতে ক্রমশঃ আয়করের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে সরকারি রাজস্বের একটা মোটা অংশ ব্যক্তিগত আয়কর ও কর্পোরেশন কর হইতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত আয়কর অবিবাহিত ও বিবাহিত ব্যক্তির আয় ব্যতীত হিন্দু যৌথ পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আয়করের দুইটি প্রধান অংশ : আয়কর ও উচ্চ আয়কর (সুপার ট্যাক্স)। করপ্রদানকারীর বাৎসরিক আয় ২০০০০ টাকার অধিক না হইলে উচ্চ আয়কর আরোপিত হয় না। মোট আয়কে কতকগুলি খণ্ডে (স্ল্যাব) বিভক্ত করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ধার্য করা হয়। অর্থাৎ সর্বনিম্ন খণ্ডে আবদ্ধ না হইলে সমগ্র আয় একই হারে করভার বহন করে না। তবে দেয় করকে মোট আয়ের ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করিলে গড় করহার নির্ণয় করা যায়। ইহা স্পষ্ট যে, বর্তমান ব্যবস্থায় আয়বৃদ্ধির সহিত গড় করহারভার বৃদ্ধি পায়।

আয় ২০০০০ টাকার অধিক হইলে প্রথম ২০০০০ টাকার উপর পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী আয়কর ধার্য করা হয়। অবশিষ্ট আয়ের উপর সর্বোচ্চ খণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট আয়কর ব্যতীত উচ্চ আয়করভার (সুপার ট্যাক্স) আরোপিত হয়। অবশিষ্ট আয়কে কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে উচ্চ আয়কর আরোপ করা হয়। আয়কর এবং উচ্চ আয়কর ব্যতীত আয়করের ও উচ্চ আয়করের উপর সারচার্জও ভারতীয় আয়করের অঙ্গ। এই সারচার্জ অবশ্য উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের উপর ভিন্ন রকম।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আয়কর ধার্য হইয়া থাকে : ১ অবিবাহিত ও নিঃসন্তান বিবাহিত ব্যক্তির বার্ষিক আয় যদি ৩০০০ টাকার বেশি হয় ; ২. যদি এক সন্তানের পিতা কোনও বিবাহিত ব্যক্তির আয় ৩৩০০ টাকার উপর এবং ৩. দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতা বিবাহিত ব্যক্তির আয় ৩৬০০ টাকার উপর হয়। কয়েক শ্রেণীর হিন্দু যৌথ পরিবারের আয় ৬০০০ টাকার অধিক না হইলে উহাদের উপর আয়কর বসানো হয় না। আয়কর হিসাব করিবার সময় আয়ের কিয়দংশ বাদ দেওয়া হয়। মোট আয় ২০০০০ টাকার কম হইলে এই বাদ দেওয়া অংশের পরিমাণ অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এবং যে বিবাহিত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক সন্তান আছে তাহার ক্ষেত্রে সর্বাধিক। ২০০০০ টাকার কম আয় হইলে হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া অংশের পরিমাণ অপ্রাপ্তবয়স্ক শরিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মোট আয় ২০০০০ টাকার বেশি হইলে সকল শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর হিসাব করিবার সময় বাদ দেওয়া অংশের পরিমাণ সমান।

উপরি-উক্ত আলোচনা ব্যক্তিগত আয়ের উপর আরোপিত করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আয়কর অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত আয়কর। অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির উপর আয়কর ভিন্ন রকম।

আয়করের ক্ষেত্রে একটা প্রধান সমস্যা আয়ের একটি যুক্তিযুক্ত পরিমাপ স্থির করা। এই বিষয়ে আলোচনা 'আয়' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। বর্তমানে কৃষিজ আয় কেন্দ্রীয় সরকারের আয়করের আওতায় পড়ে না। কৃষিজ আয়ের উপর কর ধার্য করে রাজ্যসরকার। কিন্তু এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যসরকারে অনেকটা বৈষম্য আছে। এই

বৈষম্য দূর করিয়া একটা সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য কর অনুসন্ধান কমিটি (ট্যাক্সেশন এন্‌কোয়্যারি কমিটি) পরামর্শ দিয়াছেন। মূলধনের মূল্যবৃদ্ধিকে (ক্যাপিট্যাল গেন্‌স) আয়ের অংশ হিসাবে ধরা উচিত কিনা এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত আছে। ব্রিটেনে মূলধনের মূল্যবৃদ্ধিকে আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়, কেননা আয় বলিতে শুধু তাহাই বুঝায় যাহা নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় এবং মূলধনের মূল্যবৃদ্ধি নিয়মিত নয়। আমেরিকায় কিন্তু ইহাকে আয়ের মধ্যে ধরা হয়। সেখানে যুক্তি এই যে, মূলধনের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক সংগতি তেমনই বৃদ্ধি পায় যেমন পায় আয়ের ফলে। ভারতীয় করব্যবস্থায় মূলধনের মূল্যবৃদ্ধিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন। যে সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে ১২ মাসের অনধিক কাল বিক্রেতার নিকট ছিল, তাহার মূল্যবৃদ্ধি স্বল্পকালীন মূল্যবৃদ্ধি বলিয়া ধরা হইবে এবং এই হেতু যে লাভ হইবে তাহা অন্য আয়ের মত গণ্য হইবে এবং ইহার উপর ঐ হারে আয়কর ধার্য হইবে। অন্যান্য মূল্যবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন মূল্যবৃদ্ধি বলিয়া ধরা হইবে এবং ইহার উপর শতকরা ২৫ ভাগ কর ধার্য করা হইবে, তবে যদি এই মূল্যবৃদ্ধিকে স্বল্পকালীন মূল্যবৃদ্ধি বলিয়া ধরিলে করদাতার সুবিধা হয় তাহা হইলে সেইভাবে ইহার উপর কর ধার্য করা যাইতে পারে।

আয়করের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি বণ্টনের দৃষ্টি হইতে। ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইয়া আয়করকে অন্য কর অপেক্ষা ভাল ভাবে ব্যক্তিবিশেষের করদান ক্ষমতা অনুসারে আরোপ করা যায়। আয়কর সাধারণতঃ অন্যের উপর চালনা করা যায় না। আয়, খাজনা, মজুরি, সুদ বা মুনাফা -রূপে হইতে পারে। অর্থবিদ্যার সংজ্ঞায় খাজনা একটা উদ্বৃত্ত আয়। অতএব খাজনার উপর কর আদায় করিলেও খাজনার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এবং এই করের ভার খাজনা আদায়কারীর উপরেই পড়িবে। মজুরির উপর আরোপিত আয়কর অন্যের উপর চালনা করা যায় যদি মজুরি জীবনধারণের উপযোগী স্তর (সাবসিস্‌টেন্‌স) হইতে অধিক না হয়। তবে সাধারণতঃ জীবনধারণোপযোগী একটি আয় আয়কর হইতে মুক্ত থাকে বলিয়া মজুরির (এবং বেতনের) উপর আরোপিত আয়করও চালনা করা যায় না। সুদও বর্তমানে কেইন্‌সিয় মতে অনেকটা উদ্বৃত্ত আয় এবং সুদের উপর আরোপিত করও চালনা করা যায় না। মুনাফাকর চালনা করা যায় কিনা এই সম্বন্ধে কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। মুনাফাকে যদি উৎপাদনের একটা আবশ্যক ব্যয় ধরা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, মুনাফার উপর কর বসাইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অনেকের মতে মুনাফা একটা অবশিষ্ট (রেসিডিউয়াল) আয় এবং ইহার উপর কর ধার্য করিলে তাহা চালনা করা যায় না। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর আয়ের উপর আরোপিত করও তেমনই চালনা করা যায় না।

আয়করের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইহাতে বিক্রয়-করের মত কোনও অতিরিক্ত ভার নাই। কোনও এক বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রয়কর বসাইলে শুধু যে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যায় তাহাই নহে, আয়ের বিনিয়োগ-ব্যাপারেও একটা পরিবর্তন আসে। যে দ্রব্যের উপর কর বসানো হয়, লোকে তাহা অন্য দ্রব্যের তুলনায় কম ক্রয় করে এবং লোকের বিনিয়োগব্যবস্থার এই পরিবর্তনের ফলে তাহাদের তৃপ্তি হ্রাস পায়। এই পরিমাণ কর আয়করের মাধ্যমে সংগ্রহ করিলে এই অতিরিক্ত ভার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। অবশ্য আয়করের এই সুবিধা তখনই পাওয়া যায় যখন করের হার এত অল্প যে ইহার ফলে উপার্জনের ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। যদি করের হার অধিক হয় তাহা হইলে আয়কর কর্মপ্রচেষ্টা, সঞ্চয় এবং ব্যবসায়ে ঝুঁকি লইবার ইচ্ছাকে ব্যাহত করে। উচ্চ-প্রান্তীয় আয়করের ফলে প্রান্তীয় কর্মপ্রচেষ্টার প্রতিদান কমিয়া যায় এবং অধিক আয়ের বদলে অধিক বিশ্রাম বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তেমনই সঞ্চয়ের ফলে প্রাপ্য সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে ঝুঁকি লইবার ইচ্ছাও ব্যাহত হয়, কেননা যদি ঝুঁকির ব্যবসায়ে সফলতা আসে তাহা হইলে সরকার এই মুনাফার একটা মোটা অংশ লইবে। কিন্তু যদি ইহাতে ক্ষতি হয় তাহা হইলে সরকার কোনও ক্ষতিপূরণ দিবে না। অন্যরকম করের কি প্রভাব এই বিষয়ে আলোচনা 'কর' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, আয়করের হার যখন অত্যধিক হয় তখন তাহা আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। ক্যাল্ডর প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌-গণের মতে বর্তমানে অনেক দেশে আয়করের উচ্চতম প্রান্তীয় হার কম করিয়া ব্যয়কর, দানকর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি কর আরোপ করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া নীতির দিক হইতেও বলা যায় যে আয়ই ব্যক্তির করদান ক্ষমতার একমাত্র সূচক নয়। সম্পত্তি, মূলধনের মূল্যবৃদ্ধি (ক্যাপিট্যাল গেন্‌স) ইত্যাদিকেও করের আওতায় আনা প্রয়োজন। প্রশাসনের দৃষ্টি হইতেও বলা যায় যে সঠিকভাবে আয়কর নির্ধারণ এবং আয়সংগ্রহ, বিক্রয়কর

ইত্যাদির তুলনায় অনেকটা কঠিন। এই সকল কারণে ইহা স্পষ্ট যে আয়কর (বিশেষতঃ অনুন্নত দেশে) বহুমুখী করব্যবস্থার একটা অংশ মাত্র হইতে পারে ; শুধু এই করের উপর করব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আবার ইহাও স্পষ্ট যে দেশের আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশে লোকের আয় বৃদ্ধি পায় তখন এই করের ফলে রাজস্ব সমানুপাতের অধিক হারে বাড়িতে থাকে এবং আয়করের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব ভারতের মত অনুন্নত দেশে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে আয়করের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

রামগোপাল আগরওয়ালা

আয়ন পদার্থের পরমাণু ও পরমাণু-গ্রথিত অণু স্বভাবতঃ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ইহাদের উপর যখন স্থির তড়িতের আধান (চার্জ) হয়, তখন তাহাদিগকে সেই সেই পদার্থের আয়ন বলা হয়। যতক্ষণ এই তড়িৎ আয়ন হইতে দূরীভূত না হয় ততক্ষণ বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম ফিরিয়া আসে না। এই সঞ্চারিত তড়িৎ ধনাত্মক (পজিটিভ) হইলে সেই আয়ন ধনায়ন এবং ঋণাত্মক (নেগেটিভ) হইলে ঋণায়ন নামে অভিহিত হয়।

উচ্চ তাপ, অতিবেগুনী রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি, রেডিও-অ্যাক্টিভ্ রশ্মি ইত্যাদি বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকে তড়িৎ-যুক্ত বা অচলিত বা আয়নিত করিতে পারে। এই কারণেই বাতাসে আয়নিত বায়ুকণিকা ও জলীয়-বাষ্পের আয়ন, আয়নিত ধূলিকণিকা উপজাত হয়। বায়ুস্তরের ঊর্ধ্বে একটি স্তর আছে যেখানে আয়নিত বস্তুকণিকার পরিমাণ খুব বেশি, এই স্তরের নাম আয়নোস্ফিয়ার। ধনায়ন ও ঋণায়ন পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিক কারণে আকর্ষণ করে এবং সাক্ষাৎ-মাত্র পরস্পর তড়িৎ-মুক্ত হইয়া যায়। আয়নোস্ফিয়ারে এইরূপে আয়ন যেমন সৃষ্টি হইতেছে তেমনই আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রশমিতও হইতেছে।

ক্ষার, অম্ল ও লবণ জাতীয় পদার্থ বিশেষ বিশেষ দ্রাবকে দ্রবীভূত করিলে উহাদের অণু দুই খণ্ডে বিয়োজিত হইয়া যায়। এক খণ্ডে ধনতড়িতের সমাবেশ থাকে, ইহা ধনায়ন এবং অপর খণ্ডে ঋণতড়িতের সমাবেশ সম-মাত্রায় থাকে, ইহা ঋণায়ন। উভয়ে সমমাত্রায় থাকে বলিয়া দ্রবণটি তড়িৎ-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। পদার্থের এইরূপ দুই বিপরীত তড়িদাবিষ্ট আয়নে বিয়োজনকে বলা হয় আয়নিজেশন বা আয়নবিয়োজন। এইরূপে সাধারণ লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, কিন্তু এই দ্রবণের মধ্যে অণুগুলি ভাঙিয়া সোডিয়াম ধনায়ন ও ক্লোরাইড ঋণায়ন-রূপে ভাসিতে থাকে।

শ্যামল সেনগুপ্ত

আয়ন বায়ু বায়ুমণ্ডল দ্র

আয়নমণ্ডল (আয়নোস্ফিয়ার) পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া বাতাসের একটা পুরু আস্তরণ রহিয়াছে। ইহাকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত, তুষারপাত প্রভৃতি ঘটনাগুলি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই কারণে আবহবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল হইতে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে নানাবিধ অনুসন্ধানের কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর অঞ্চল সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজ ত্বরান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পূর্বেই বায়ুমণ্ডলকে ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামে দুইটি অংশে ভাগ করা হইয়াছিল। বায়ুস্তর ঊর্ধ্বদিকে প্রায় ছয় শত মাইলেরও বেশি বিস্তৃত। তাহার পর বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ শূন্যতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের উপরে ৬৪-৭২ কিলো-মিটারের (৪০-৪৫ মাইল) পর বায়ুমণ্ডলের যে অংশ রহিয়াছে তাহাকে বলা হয় আয়নমণ্ডল।

সূর্য হইতে আগত অতিবেগুনী (আল্‌ট্রাভায়োলেট) রশ্মির প্রভাবে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পদার্থগুলি আয়নিত হইয়া পড়ে ('আয়ন' দ্র)। এই আয়ননের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে— কয়েকটি স্তরেই সর্বাধিক হইয়া থাকে। এই সকল আয়নায়িত স্তরগুলিই একত্রে আয়নমণ্ডল নামে অভিহিত হয়। আয়নোস্ফিয়ার কথাটির প্রবর্তন করেন ওয়াট্‌সন ওয়াট্। এই আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডলের জন্যই রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। আয়নমণ্ডল না থাকিলে দীর্ঘ ব্যবধানে বেতার-যোগাযোগ সম্ভব হইত না।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কোনি যখন কর্নওয়াল হইতে নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডে বেতারসংকেত প্রেরণে কৃতকার্য হন, তখন অ্যাটল্যান্টিকের বক্রপৃষ্ঠের উপর দিয়া বেতার-তরঙ্গ কেমন করিয়া এই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করিল, সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-মহলে প্রবল আলোচনা আরম্ভ হয়। যেহেতু রেডিও-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের মত সোজা পথে চলে, সেহেতু তাহার পক্ষে বক্রপৃষ্ঠের উপর দিয়া বাঁকিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হইয়াছিল যে, ডিফ্র্যাক্‌শনের ফলেই হয়ত ব্যাপারটা ঘটিয়া থাকে। ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যালে, পঁয়কারে এবং অন্যান্য পদার্থ-বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রজ্ঞগণ পৃথিবীর মত গোলাকার

আয়নমণ্ডল

পৃষ্ঠদেশের দ্বারা রেডিও-তরঙ্গের ডিফ্র্যাক্‌শনের পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু হিসাবে দেখা গেল, ডিফ্র্যাক্‌শনের ফলে রেডিও-তরঙ্গের পক্ষে পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠের চতুর্দিক ঘুরিয়া আসা সম্ভব নহে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় কেনেলী এবং ইংল্যাণ্ডে হেভিসাইড প্রায় একই সময়ে পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের একটি পরিবাহী স্তরের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই স্তরটিই সম্ভবতঃ রেডিও-তরঙ্গের গতিপথকে বাঁকাইয়া দিয়া পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠদেশকে ঘুরিয়া আসিতে সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বলেন, খুব সম্ভব সৌর বিকিরণের প্রভাবে উৎপন্ন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের উপস্থিতির ফলেই এই স্তরটির পরিবাহিতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তড়িৎ-আধানযুক্ত কণিকা কিভাবে রেডিও-তরঙ্গের গতিপথকে প্রভাবিত করে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইকল্‌স্‌-ই তাহা প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইকল্‌সের প্রতিপাদ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লারমোর তাহা পূরণ করেন। এই ইকল্‌স্‌-লারমোর তত্ত্ব এবং অ্যাপ্‌ল্‌টন, হারট্রি, গোল্ডস্টোন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী কর্তৃক পরিপুষ্ট তথাকথিত ম্যাগনেটোআয়নিক তত্ত্বই হইল এখন আয়নমণ্ডলের রেডিও-তরঙ্গ পরিচলনবিষয়ক জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কেনেলী এবং হেভিসাইড যদিও ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে এই পরিবাহী স্তরের কথা বলিয়াছিলেন, তথাপি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহার অস্তিত্বের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ওয়াট্‌সন-একার্সলির ফরমুলার সাহায্যে দীর্ঘ-তরঙ্গের পরিমাণমূলক ক্ষেত্রশক্তি এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত হ্রস্ব-তরঙ্গ বিস্তারের বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া এইরূপ একটি স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কিন্তু ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা চলে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন একই সময়ে ‘লুপ’ এবং খাড়া এরিয়েলে প্রাপ্ত রেডিও-সংকেতের তীব্রতা হ্রাসের তুলনা করিয়া অ্যাপ্‌ল্‌টন ও বার্নেট দেখিতে পাইলেন যে, রেডিও-তরঙ্গ একটি স্তরে প্রতিফলিত হইয়া নীচের দিকে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পর স্মিথ, রোজ ও বারফিল্‌ড নিজেদের তৈয়ারি দিক-নির্ধারক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া প্রতিফলিত তরঙ্গের নিম্নাভিমুখে আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হন। এই সকল পরীক্ষার ফলে কেবল স্তরটির অস্তিত্বই নয়, তাহার উচ্চতা এবং প্রতিফলনক্ষমতার বিষয়ও জানা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু ব্রেইট ও টিউভের পরীক্ষার ফলে আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা জানা গেল। তাঁহারা দেখাইলেন, কোনও একটি ট্র্যান্সমিটার অর্থাৎ প্রেরকযন্ত্র হইতে ক্ষণস্থায়ী একটি তরঙ্গ প্রেরিত হইলে কয়েক কিলোমিটার দূরবর্তী রিসিভার অর্থাৎ গ্রাহকযন্ত্রে একটির পরিবর্তে দুইটি বা আরও বেশি সাড়া পাওয়া যায়। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল যে, প্রথম তরঙ্গটি আসে আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হইবার পর। সুতরাং দেখা যায়, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের অবস্থার বিষয় জানিবার পক্ষে রেডিও-তরঙ্গই সর্বাধিক উপযোগী।

অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আয়নমণ্ডল প্রধানতঃ চারটি স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলিকে ডি, ই, এফ, ও এফ, নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। দিনের বেলায় সময়ে সময়ে ই স্তরের ঠিক উপরে ই, নামে আর একটি আয়নিত স্তর গঠিত হয়। ডি স্তরটিকে শোষণ-স্তর বলা যাইতে পারে। রাত্রিবেলায় এই স্তরটি অন্তর্হিত হয় এবং এফ, ও এফ, স্তর দুইটি একত্র হইয়া এফ নামে একটি স্তর গঠন করে। ডি স্তরটি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫৬-৬৪ কিলোমিটার (৩৫-৪০ মাইল) ঊর্ধ্বে। বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে ইহারই স্থিরতা বেশি। উপরের দিকে ইহা প্রায় ১১২ কিলোমিটার (৭০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এফ, স্তরটি থাকে প্রায় ১৯৩ কিলোমিটার (১২০ মাইল) ঊর্ধ্বে। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে এবং শীতকালে এই স্তরটি উপরের এফ, স্তরের সহিত মিলিয়া যায়। এফ, স্তরটি ২৪১ হইতে ৪০২ কিলোমিটার (১৫০ হইতে ২৫০ মাইল) বা আরও বেশি বিস্তৃত। এই স্তরটি খুবই অস্থির প্রকৃতির। ইহার তুলনায় ই স্তরটি বেশি স্থিরভাবে থাকে।

অতিবেগুনী রশ্মির মত সূর্য হইতে কণিকাস্রোতও নির্গত হইয়া থাকে। এই কণিকাস্রোতের সংঘাতেও বায়ুমণ্ডল কিয়ৎপরিমাণে আয়নায়িত হইয়া থাকে। কাজেই সূর্যদেহের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হইলেই আয়নমণ্ডলের উপর তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাব ঘটিলে সেই সকল অঞ্চল হইতে তীব্র শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মি ও প্রচুর পরিমাণ সৌরকণিকা নির্গত হইতে থাকে। ইহার ফলে পৃথিবীর বৈদ্যুতিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটে। সময়ে সময়ে সৌরদেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুদ্গারের ঘটনা দেখা যায়। সেই সময়েও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সৌরকলঙ্ক আবির্ভাবের সময় মেরুঅঞ্চলে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মেরুজ্যোতি দেখা যায় এবং চৌম্বক ঝটিকার সৃষ্টি হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আয়রন লাংস কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাইবার যন্ত্র। আমেরিকার শারীরতত্ত্ববিদ্ ফিলিপ ড্রিংকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা ইস্পাতের তৈয়ারি একটি প্রকোষ্ঠ-বিশেষ। যন্ত্রটির একদিকে রবার অথবা নমনীয় কোনও দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত একটি বেষ্টনী থাকে। রোগীকে ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যে শায়িত অবস্থায় রাখা হয়। তাহার গলা বেষ্টনীটির ভিতর দিকে আবদ্ধ থাকে, মাথা প্রকোষ্ঠের বাহিরে একটি গদির সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হয়। মোটর-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে ঐ প্রকোষ্ঠের ভিতরের বায়ুর চাপের তারতম্য করা হয়। প্রকোষ্ঠে বায়ুর চাপ হ্রাস পাইলে রোগীর বক্ষ প্রসারিত হয়। ফলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হয়। এইভাবে ফুসফুস ক্রমশঃ কার্যকরী হইতে থাকে। আধুনিক কালে বাটির আকারের রেস্‌পিরেটর যন্ত্র রোগীর বক্ষপিঞ্জরের উপরে স্থাপন করা হয়। পোলিওসায়েলাইটিস, এনসেফালাইটিস্ ও বিষক্রিয়ার জন্য শ্বাসকষ্টে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রের অপর নাম ড্রিংকার্‌স্-রেস্‌পিরেটর।

অমিয়কুমার মজুমদার

আয়ুধ প্রাচীন কালে এ দেশে যে সব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহাদের চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে (অস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্, বনপর্ব ১০৮।১১; যস্মিন্ মহাস্ত্রাণি…চতুর্বিধানি, কর্ণপর্ব ৭।৬; শিশুপাল-বধ ১৮।১১ ইত্যাদি)। নীতিপ্রকাশিকায় (২।১১-১৩) এই চতুর্বিধ অস্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও মন্ত্রমুক্ত। অগ্নিপুরাণে (২৪৯।২) চার ভাগের পরিবর্তে অস্ত্র-শস্ত্রকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তসন্ধারিত, অমুক্ত ও বাহুযুদ্ধ।

এই সব বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের প্রস্তুতপ্রণালী ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ধনুর্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে পাই। ইহার মধ্যে যে সব অস্ত্র-শস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল:

১. ধনুর্বাণ— সাধারণতঃ চার প্রকারের ধনু ব্যবহৃত হইত, যথা কার্মুক (তালের তৈয়ারি), কোদণ্ড (বাঁশের তৈয়ারি), দ্রূণ (কাঠের তৈয়ারি) ও ধনু (শৃঙ্গের তৈয়ারি)। শর বা বাণের মুখ ধাতু, হাড় অথবা কাঠের তৈয়ারি হইত ও তাহাদের আকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইত, যথা আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্ধচন্দ্র, সূচী-মুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, কর্ণিক, কাকতুণ্ড ইত্যাদি। ২. খড়্গ —কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আকৃতি অনুসারে তিন প্রকার খড়্গের উল্লেখ আছে, যথা নিস্ত্রিংশ, অসি-যষ্টি ও মণ্ডলাগ্র। ৩. শক্তি— মহাভারতে নানা প্রকার শক্তির বর্ণনা আছে (শক্তীশ্চ বিবিধাস্তীক্ষ্ণাঃ, আদিপর্ব ৩০।৪৯; শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ, বনপর্ব ২৮৯।২৪)। তোমর, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল প্রভৃতি আয়ুধও মোটামুটি শক্তিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। ৪. গদা— কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গদাজাতীয় তিন প্রকার আয়ুধের উল্লেখ আছে, যথা মুষল, যষ্টি ও গদা। মহাভারতে গদাকে 'অয়োময়ী' বা 'আয়সী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধনুর্বেদে আকৃতি অনুসারে গদাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, স্থূলাগ্র, চতুরগ্র, তালমূলাকৃতি। ৫. পরশু, পরশ্বধ, কুঠার ও কুলিশ মোটামুটি একই ধরনের অস্ত্র বলা যায়। পরশুর অগ্রভাগ অর্ধচন্দ্রের মত বক্রাকৃতি হইত (নীতিপ্রকাশিকা ৫।৯-১০)। ৬. চক্র— মহাভারতে চক্রকে পরিভ্রমন্ত, অয়সময় ও তীক্ষ্ণধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের কথা সর্বজনবিদিত। ৭. শতঘ্নী— প্রাচীন সাহিত্যে দুই প্রকার শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। একপ্রকার শতঘ্নী নগররক্ষার উপকরণ হিসাবে নগরপ্রাচীরের উপর রক্ষিত হইত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় শত্রুবাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত হইত। বৈজয়ন্তীতে এই প্রকার শতঘ্নীকে কণ্টকাকীর্ণ মহাশিলা ও মহাভারতে সচক্রা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর একপ্রকার শতঘ্নী ছিল কণ্টকাকীর্ণ মুদ্গরের মত। যোদ্ধারা গদা অসি ইত্যাদি অস্ত্রের মত এইগুলি হাতে লইয়া যুদ্ধ করিতেন। ৮. যন্ত্র— রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধোপকরণ হিসাবে নানাবিধ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। কৌটিল্য প্রথমতঃ এই যন্ত্রগুলিকে 'স্থির' ও 'চল' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং পরে নয়টি 'স্থির' যন্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই যন্ত্রগুলির অধিকাংশ নগরদ্বারে রক্ষিত হইত; আকারে বৃহৎ এই যন্ত্রগুলি চালনা করিলে ভীষণ শব্দ হইত এবং এইগুলির সাহায্যে বড় বড় শর অথবা প্রস্তরখণ্ড শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা হইত। ইহাদের আকৃতি ও কার্যকারিতা অনেকটা প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের ক্যাটাপাল্ট ও বালিস্টা-র মত ছিল।

উল্লিখিত অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া যোদ্ধারা আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার বর্ম, কবচ, আবরণ, শিরস্ত্রাণ, কণ্ঠত্রাণ, কূর্পাস, কাঞ্চুক, পট্ট ও অঙ্গুলিত্রাণ ব্যবহার করিতেন।

দ্র P. C. Chakravarti, *The Art of War in Ancient India*, Dacca, 1941; V. R. R. Dikshitar, *War in Ancient India*, Madras. 1944.

পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী

আয়ুর্বেদ, বৈদ্যক প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান। আয়ুসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্বেদ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে আয়ুর্বেদই চারিটি বেদের সার এবং কশ্যপমুনির মতে প্রখ্যাত বেদ-চতুষ্টয়ের পরবর্তী পঞ্চম বেদই হইল আয়ুর্বেদ। আবার কাহারও কাহারও মতে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই একটি উপাঙ্গ। দেহ ও চিকিৎসা -সম্বন্ধীয় জ্ঞান সব কয়টি বেদের মধ্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রহিয়াছে; যেমন, ঋগ্‌বেদে ত্রিধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) এবং অথর্ববেদে নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যক শব্দটি পুংলিঙ্গে চিকিৎসার্থক কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রেরই নামান্তর।

আয়ুর্বেদ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত এইরূপ ধারণা প্রচলিত। ব্রহ্মা তাঁহার ধ্যানলব্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেন প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। ঐ দুই জন দেব-চিকিৎসকের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিদ্যা অর্জন করিয়া ঋষি ভরদ্বাজ প্রভৃতিকে তাহা দান করেন। ভরদ্বাজ হইতে আত্রেয়, আত্রেয় হইতে অগ্নিবেশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ এবং অগ্নিবেশের পরে চরক চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। আবার ধন্বন্তরির (কাশীরাজ দিবদাস) সুশ্রুত ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং তৎপরবর্তী কালে সেই সূত্র হইতে নাগার্জুন প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রথম অবস্থায় শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর শিক্ষাদাতা ঋষি হইতে শিক্ষার্থী ছাত্র শুধু মুখে মুখে শুনিয়াই নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া পরবর্তী কালে একই ভাবে নিজ নিজ ছাত্রগণের নিকট সেই জ্ঞান হস্তান্তর করিতেন। আত্রেয়-শিষ্য অগ্নিবেশ প্রথমে সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া সংহিতার আকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে মহর্ষি আত্রেয়ের অন্যান্য শিষ্যগণ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতিও অনুরূপভাবে নিজেদের জ্ঞান বিশেষ বিশেষ 'সংহিতা'-রূপে প্রচার করেন। অগ্নিবেশের পরবর্তী কালে মহর্ষি চরক অগ্নিবেশসংহিতা বিশেষভাবে সংকলন করেন; তাহাই বর্তমানে 'চরকসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া খরনাদ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, মাধব-সংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য সংকলন-গ্রন্থও প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। একই ভাবে প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক সুশ্রুত প্রসিদ্ধ সুশ্রুত-সংহিতা সংকলন করেন।

আয়ুর্বেদের এই বৈদিক চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়াও তান্ত্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি নামে আর একটি অংশ আছে। কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষে আর্যপূর্ব যুগে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বৈদিক পদ্ধতিতে যেমন দুইটি বিশিষ্ট অর্থাৎ আত্রেয় ও ধন্বন্তরি -সম্প্রদায় ছিলেন, তান্ত্রিক পদ্ধতিতেও রসসাধক ও বিষসাধক নামে তেমনই দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল। রসসাধকগণ রসসাধনা অর্থাৎ পারদশোধন, মারণ প্রভৃতির দ্বারা জরা ও ব্যাধি দূর করিতে পারিতেন। বিষসাধকগণও নানা বিষের প্রয়োগে রোগের যন্ত্রণা ও ব্যাধির উপশম করিতে সক্ষম ছিলেন। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিসম্বন্ধীয় চিকিৎসাগ্রন্থগুলিই সাধারণতঃ তন্ত্র নামে খ্যাত। মহাজ্ঞানী মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে রসদর্শনের সমালোচনায় রসার্ণবতন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসহৃদয়তন্ত্র, রসরত্ন প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ঔপধেনবতন্ত্র, ঔরভ্রতন্ত্র, নিমিতন্ত্র, শৌনকতন্ত্র, বিদেহতন্ত্র প্রভৃতি বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।

কুষাণ সম্রাট্ কনিষ্কের রাজসভায় মহর্ষি চরক রাজবৈদ্য ছিলেন এইরূপ কোনও কোনও ঐতিহাসিকের ধারণা। এ অবস্থায় তিনি রোমক চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেন-এর (আনুমানিক ১৩০-২০০ খ্রী) সমসাময়িক হইলেও হইতে পারেন। কয়েক শতাব্দী পরে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ধন্বন্তরি; তাঁহার লিখিত একখানি ভেষজবিদ্যা (মেটেরিয়া মেডিকা) পাওয়া যায়। নবরত্নের অন্যতম অমরসিংহ লিখিত অমরকোষ নামক গ্রন্থে বহু ঔষধের বিকল্প নামের উল্লেখ আছে। গ্রন্থচ্ছলে পুরাণগুলিতে আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রলাভের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচের ছাত্র হিসাবে গমন, জরাগ্রস্ত যযাতির পুত্রের নিকট হইতে পুনর্যৌবন লাভ, গৌতমের শাপে ইন্দ্রের নপুংসকত্ব ও মেষদেহ হইতে গৃহীত অণ্ডকোষ সংযোগে আরোগ্য লাভ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ ঘটে। কথিত আছে, বাগদাদের খলিফা হারুন অল্-রশীদ (৭৬৩-৮০৯ খ্রী) আয়ুর্বেদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আরবী ভাষায় চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থের অনুবাদ করান। তাঁহার রাজসভায় রাজবৈদ্য মঙ্ক নামে একজন ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন। কথিত আছে যে, খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনিই নাকি আয়ুর্বেদের বিষক্রিয়াসম্বন্ধীয় অংশগুলির ফারসী অনুবাদ করেন। একই ভাবে চরকসংহিতার আরবী ভাষায়

অনুবাদ করেন আলী ইব্‌ন জৈন। আরবী ভাষায় অনূদিত সুশ্রুতসংহিতার নাম দেওয়া হয় 'কিলল সশুর অল্ হিন্দী'। তাহা ছাড়া বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্' ও মাধবকরের নিদান প্রভৃতিও আরবী ভাষায় ঐ সময়েই অনূদিত হয়। বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক অল্ বীরূনী ১০১৭ হইতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বাস করেন।

এদেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া আয়ুর্বেদ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীতে চোলাইকরণ, সত্ত্বপাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতে হারুন অল্-রশীদের রাজত্বকালে তিনি বহু বিদ্যার্থীকে চিকিৎসাবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং অন্যভাবে বহু ভারতীয় চিকিৎসাবিশারদকে নিজ দেশে আহ্বান করিয়া বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বহু ভারতীয় পুস্তকের আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির উপর প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রভাবের মতই ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সেঁকো বিষ (আর্সেনিক), লৌহ ও পারদ -ঘটিত ঔষধের প্রচুর ব্যবহার সত্ত্বেও মুসলমান বাদশাহ্‌দের শ্রেষ্ঠ হাকিমগণও ঐগুলির ব্যবহার যে জ্ঞাত ছিলেন না, তাহা 'তালীফ শারীফ', 'লেপ্রে আরাবাম্' প্রভৃতি পুস্তকের উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত আছে।

ব্রহ্মসংহিতার মতে বৈদ্যক বা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদকে নিম্নলিখিত কয়টি মুখ্য অংশে ভাগ করা যায় :

১. কায়চিকিৎসা, ২. শল্যচিকিৎসা, ৩. শালাক্যচিকিৎসা, ৪. ভূতবিদ্যা, ৫. কৌমারভৃত্য, ৬. অগদচিকিৎসা, ৭. রসায়নচিকিৎসা, ৮. বাজীকরণচিকিৎসা এবং ৯. পশুচিকিৎসা। পশুচিকিৎসার অংশটি বাদ দিলে যে আটটি অংশ থাকে, তাহাদের নাম অষ্টাঙ্গ।

১. কায়চিকিৎসা— আয়ুর্বেদমতে সর্বাঙ্গ ব্যাধিচিকিৎসারই নাম কায়চিকিৎসা। রোগনিদানে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. শারীরিক ও ২. মানসিক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যেমন মনের গুণ তেমনই বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহের তিনটি দোষ। ইহারা 'ত্রিদোষ' বলিয়া পরিচিত। সত্ত্বগুণই জীবদেহের আসল সত্তা এবং মনুষ্যদেহের রোগ নিরাময়ের সহায়ক। সুচিকিৎসকগণ এই সত্তা অবলম্বন করিয়াই দেহের স্বাভাবিকতা আনয়নপূর্বক রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন। জ্বর, কাশি, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি শারীরিক ব্যাধির এবং উন্মাদ রোগ, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি মানসিক রোগের দৃষ্টান্ত। শারীরিক ব্যাধি আবার তিন প্রকারের, যেমন ১. স্বাভাবিক, ২. সংক্রামক ও ৩. আগন্তুক। 'ত্রিধাতু' অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার (কফ) প্রকোপ হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদের নাম 'স্বাভাবিক' রোগ। হাম, বসন্ত, চর্মরোগ, অভিষ্যন্দ প্রভৃতি যে সকল রোগ অন্য রোগাক্রান্ত দেহ হইতে সংক্রামিত হয় তাহাদের নাম 'সংক্রামক ব্যাধি' এবং অগ্নি বা বাষ্পদাহ কিংবা পতনাদি আকস্মিক কারণজনিত রোগকে 'আগন্তুক রোগ' বলে।

দেহে বায়ু, পিত্ত ও কফের সুসমঞ্জস অবস্থার নামই স্বাভাবিকতা, সমাগ্নি বা স্বাস্থ্য। এক বা একাধিক ধাতুর অস্বাভাবিকতা রোগের কারণ। বায়ু পিত্ত বা কফের আধিক্য -ভেদে তিন প্রকার বিশিষ্ট অবস্থার নাম বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি। বিষমাগ্নি দ্বারা বাতজ ব্যাধি, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পিত্তজ ব্যাধি ও মন্দাগ্নির দ্বারা কফজ ব্যাধি জন্মে। সত্ত্বগুণপ্রধান লোকের ঈষৎ বায়ুপ্রাবল্য দেখা যায়। সূর্য ও অগ্নির প্রতীক রূপে পিত্ত দেহের তাপ ও পরিপাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পিত্তের প্রকোপ সত্ত্বগুণের দ্বারা দমিত হয়। চন্দ্রের প্রতীক কফ বা শ্লেষ্মা শরীরের স্নিগ্ধতা, জলীয় ভাগ এবং পিচ্ছিল গতি নিয়ন্ত্রণ করে। কফের প্রকোপ দমন রজঃগুণের দ্বারাই সম্ভব।

চরকসংহিতার সূত্রস্থানের দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে 'বায়ুরেব ভগবান্' অর্থাৎ বায়ুই ভগবান্ এবং উপনিষদের মতে বায়ুই 'প্রত্যক্ষম্ ব্রহ্ম' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং আয়ুর্বেদমতে বায়ু একাধারে যম, প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা ও বিশ্বরূপের প্রতীক। আয়ুর্বেদে শারীরক্রিয়ার কর্তারূপে বায়ুকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে— প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। চেতনবায়ুই জীবের প্রাণবায়ুরূপে মানব আত্মার সৃষ্টি করে ; স্ত্রী-ডিম্বাণুর সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে শুক্রকীটের প্রবেশ ঘটাইয়া নিষেকের ফলে প্রাণের সৃষ্টি করে। তৎপরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ -গুণান্বিত ঐ চেতনবায়ুই প্রাণবায়ুরূপে গর্ভমধ্যে ভ্রূণের বিশিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টির জন্য মাতৃদেহ হইতে শোণিত ও নানা পুষ্টি গ্রহণে যথোচিত বর্ধনের সহায়তা করে। সংগমকালে মাতা-পিতার মনের গুণ ও দেহের দোষ অনুসারে গর্ভস্থ সন্তানের মনে ও দেহে যথাক্রমে গুণ ও দোষগুলি সঞ্চারিত হয় এবং সুস্থ ও অসুস্থ সন্তান জন্মলাভ করে। সাত্ত্বিকভাবসম্পন্ন জনক-জননীর সন্তান সত্ত্বগুণে শক্তিশালী ও বিচক্ষণ, রজঃগুণসম্পন্ন হইলে দেহ

ও মনের শক্তিতে মধ্যম এবং তমোগুণসম্পন্ন হইলে দেহে ও মনে জড়ভাবাপন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

কাল্পনিক ভয় বায়ুরোগগ্রস্ত লোকের একটি বিশেষ লক্ষণ। শারীরিক ও মানসিক (কামজ) ক্ষুধাজনিত দুইটি শক্তিশালী প্রবৃত্তির বিরোধই এরূপ কাল্পনিক ভয়, সন্দিগ্ধচিত্ততা, মূর্ছা, শুচিবায়ু, উন্মাদ প্রভৃতি রোগের মূল কারণ। অতি সূক্ষ্ম বিচারে ৮০ প্রকার বায়ুরোগের নিদানসহ চিকিৎসা আয়ুর্বেদে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

চরকের মতে বস্তি, মলাশয়, কোমর, পদযুগল ও পায়ের অস্থিসমূহ এবং মুখ্যতঃ পক্বাশয়েই বায়ুর অধিষ্ঠান।

আবার মুখ্যতঃ আমাশয়ে এবং স্বেদ, রস, লসিকা ও শোণিতেই পিত্তের স্থান। পিত্তের উষ্মাই অগ্নি এবং কাহারও কাহারও মতে পিত্ত ও অগ্নি সমার্থক। কোষ্ঠস্থিত পাচকপিত্তের উষ্মা দ্বারাই ভুক্তান্নের পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়। যে কোনও কারণে ঐরূপ উষ্মা বিকৃত হইলে অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্নি ঘটিলে পরিপাকশক্তি ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অগ্নিমান্দ্য জন্মায় এবং পরিণামে অজীর্ণ, গ্রহণী, জ্বর, চক্ষুরোগ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিয়া চিরতরে স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়।

শ্লেষ্মার মুখ্য স্থান বক্ষোদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইল শিরোদেশ, গ্রীবা, অস্থিসন্ধি ও মেদ। কফের প্রকোপে মন্দাগ্নিজনিত সর্দি, কাশি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের রোগ জন্মে।

রোগ ছাড়াও বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্যহেতু লোকের স্বাভাবিক আকৃতি ও প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বায়ু-প্রকৃতি লোকের দেহে ক্ষিতি ও অপ্-এর প্রভাব কম থাকে, পুষ্টির অভাবে দেহের ত্বক্ ও কেশ হয় শুষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয় ক্ষীণ ও লঘু, দেহ ও মন হয় অদৃঢ় এবং স্নায়ুতন্ত্র থাকে উত্তেজনাপ্রবণ। শৈত্য, শীতল খাদ্য ও পানীয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম (শারীরিক অথবা মানসিক), শারীরিক কিংবা মানসিক আঘাত, নিদ্রাহীনতা কিংবা উপবাস এবং শোক, দুঃখ প্রভৃতির প্রভাবে বিষমাগ্নিহেতু অতি সহজেই ইহাদের বাতজ ব্যাধি জন্মে।

পিত্ত-প্রকৃতির লোকেদের দেহের গঠন হয় মধ্যমাকার, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে প্রচুর এবং সেই অনুসারে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিলেও শরীর হইতে প্রচুর ঘাম, মল ও মূত্র নির্গত হয়। দেহের ত্বক্ থাকে উজ্জ্বল ও মসৃণ কিন্তু তাহা সহজেই কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক চকচকে কেশে অকালেই পাক ধরে কিংবা মাথায় টাক দেখা দেয়। গ্রীষ্মে ইহারা সহজেই কাবু হইয়া পড়ে এবং দুর্ধর্ষ সাহসের অধিকারী হইলেও ইহারা কষ্টসহিষ্ণু হয় না এবং তাহাদের শরীরের পেশী ও অস্থিসন্ধিগুলিও যথাযথভাবে দৃঢ় থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি জরা ও বার্ধক্য আসিয়া দেখা দেয়।

কফ-প্রকৃতি লোকদের দেহ সুগঠিত, কান্তি লালিত্যপূর্ণ হয়। তাহাদের কেশ হয় ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ এবং আহারে ও চলাফেরায় থাকে মন্থর ও সংযত ভাব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘর্ম বা গ্রীষ্মে ইহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। ইহাদের প্রজনন-ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত অধিক।

২. শল্যচিকিৎসা— কথিত আছে স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় একাধারে কায় এবং শল্য -চিকিৎসায় পারংগম ছিলেন। অস্থিসম্বন্ধীয় শল্যচিকিৎসায়ও তাঁহারা নাকি অতীব কুশলী ছিলেন এবং লৌহনির্মিত কৃত্রিম পদসন্নিবেশেও পটু ছিলেন। সুশ্রুতসংহিতায় শল্যচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। ক্যাস্টিপ্রিয়োনির মতে হিপোক্রেটিসের (৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বহু পূর্বেই ভারতীয়-গণ শল্যচিকিৎসায় বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতসংহিতায় অস্ত্রোপচারকল্পে শতাধিক যথাযোগ্য অস্ত্র এবং চতুর্দশ প্রকারের পট্টবন্ধনীর (ব্যাণ্ডেজ) বিশেষ বিবরণ আছে। অস্থিভঙ্গ ও সন্ধিগুলিতে অস্থিচ্যুতির বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানচ্যুত অস্থি বা অস্থির ভগ্নাংশগুলিকে পুনঃস্থাপনার জন্য বাঁশ ও কাঠের বন্ধফলক (স্প্লিন্ট) দ্বারা বিভিন্ন অবস্থানে টানিয়া রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ছুরিতে কাটা, বল্লমের আঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার ক্ষতের বর্ণনাও আছে। কনুইয়ের সম্মুখস্থ শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ, জোঁকের সাহায্যে রক্তমোক্ষণ, উপযুক্ত পট্টবন্ধনী ও চাপের সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করা, উদরী এবং জলাণ্ডকোষ (হাইড্রোসিল) রোগে ছিদ্রীকরণের দ্বারা জলের বহিষ্কার প্রভৃতি তৎকালীন শল্যচিকিৎসার অঙ্গ ছিল। দুর্ঘটনায় অত্যধিক আহত কিংবা নিরাময়ের অতীত রুগ্ন ও অকর্মণ্য হস্ত-পদাদির কর্তন ও কর্তিত দেহাংশের অগ্রভাগে ফুটন্ত তৈল লেপনের পর উপযুক্ত পট্টবন্ধনী প্রয়োগ করা হইত। অর্বুদ ও বর্ধিত লসিকাগ্রন্থিকে উৎপাটিত করিয়া ক্ষতস্থানে সেঁকোবিষের প্রয়োগে তাহাদের পুনরাবির্ভাবকে ব্যাহত করার ব্যবস্থা ছিল। গণ্ড হইতে ত্বক্ কাটিয়া লইয়া কর্তিত কর্ণের পুনঃসংস্কারসাধনেও ভারতীয় শল্যবিদেরা অভ্যস্ত ছিলেন। নাভির একটু নীচে এবং বাম দিকে নাতিদীর্ঘ কৃন্তনের (ইনসিশন) দ্বারা পেটের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার করা হইত। অন্ত্রের কোনও অংশকে ছিন্ন করার পর অপর দুই অংশকে যথাযোগ্যভাবে সীবনের দ্বারা জোড়া দিয়া, তাহার উপর ঘৃত ও মধুর প্রলেপসহ তাহাকে নিজস্থানে স্থাপন করা হইত। দেহের যে কোনও নলীয় বা

থলীয় অংশ হইতে বহিঃপ্রবিষ্ট বস্তু বাহির করিতে পারিতেন ভারতের প্রাচীন শল্যচিকিৎসকগণ। এই উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আকর্ষণীয় বস্তুকে চুম্বকের সাহায্যেও বাহির করা হইত। যথাসময়ে গর্ভস্থ সন্তানের প্রসব দুঃসাধ্য কিংবা অসাধ্য হইলে, পেটে অস্ত্রোপচারের সাহায্যেও সন্তানপ্রসবের ব্যবস্থা ছিল। ছানিপড়া চোখ হইতে অস্বচ্ছ লেন্সকে বাহির করিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনা হইত। ভোজ-প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে যে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পূর্বে সম্মোহনী নামক একপ্রকার চূর্ণের সাহায্যে রোগীর সংজ্ঞা-লোপ করা হইত।

৩. শালাক্যচিকিৎসা— কণ্ঠার হাড়ের উপর যে কোনও অংশে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে চিকিৎসার নামই শালাক্যচিকিৎসা। চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও কণ্ঠের অভ্যন্তর প্রভৃতি দেহাংশ এই চিকিৎসার অঙ্গীভূত। বিভিন্ন তন্ত্রে এইরূপ চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। সুশ্রুত-সংহিতায় কর্ণ, নাসা ও গলবিল -রোগের বিবরণ-সম্পর্কিত অধ্যায়টির ভিত্তি যে বিদেহরাজ-সংকলিত বিদেহতন্ত্র, তাহা সুশ্রুত নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ডহ্লন, বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি মনীষীগণও নিজ নিজ পুস্তকে এই বিশেষ তন্ত্রের নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

৪. ভূতবিদ্যা— ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসার কথা চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থান (অষ্টম অধ্যায়), সুশ্রুতসংহিতার উত্তরস্থান (ষষ্ঠ অধ্যায়) এবং বাগ্‌ভট্ট-রচিত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উত্তরস্থানে (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়) বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। সেইজন্য এবং প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া কোনও পুস্তকে ইহার স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকাতে, কেহ কেহ এইরূপ চিকিৎসাকে সাধারণ কায়-চিকিৎসারই অংশবিশেষ মনে করেন। অন্যদের মতে, ব্যবহার ও প্রয়োগের অভাবে কালক্রমে ইহার অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। বায়ু কুপিত হইলেই মৃত্যুভয়, সন্দিগ্ধচিত্ততা, মূর্ছা ও উন্মাদ -রোগ জন্মায় সে কথার উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে।

৫. কৌমারভৃত্য— সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রে বারটি পরিচ্ছেদে কৌমারভৃত্য বা শিশুরোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্যপসংহিতা বা বৃদ্ধজীবকতন্ত্রের বিষয়ও একই। কৃত্রিম শ্বাসপ্রক্রিয়ার দ্বারা সদ্যোজাত শ্বাস-প্রশ্বাসহীন জীবন্মৃত শিশুর দেহে প্রাণসঞ্চারের বিবরণও আছে।

৬. অগদচিকিৎসা— কাশ্যপসংহিতা, অলম্বায়ন-সংহিতা, সনকসংহিতা, লাট্যায়নসংহিতা, উশনঃসংহিতা প্রভৃতিতে নানারকম বিষের ক্রিয়াজনিত রোগ ও তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার কথা বর্ণিত আছে। রোগের লক্ষণ ও মৃত্যুপরবর্তী পর্যবেক্ষণ-বিবরণেরও উল্লেখ আছে। যবন ভাষায় সনকসংহিতার অনুবাদ প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্তিম সময়ে দৃষ্টি ও শ্রুতিহীনতা, বাক্‌লোপ, শীতলাঙ্গ, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত অবস্থায় সূচিকাভরণ, অঘোরনৃসিংহ, ব্রহ্মরন্ধ্ররস প্রভৃতি উৎকট বিষাক্ত ঔষধের যথামাত্রায় ও যথাসময়ে প্রয়োগে মন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

৭. রসায়নচিকিৎসা— রসায়ন ও তাহার সাহায্যে রোগের চিকিৎসা বৈদিক যুগ হইতেই এই দেশে প্রচলিত। অথর্ববেদের কতকগুলি মন্ত্রে 'আয়ুষ্যম্' অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের উপায়, এই কথাটির উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে তাহারই সমার্থক শব্দ রসায়ন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। পারদ, লৌহ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ঔষধ দুই হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত। পতঞ্জলি লৌহশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন বিশারদ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত রসায়নবিদ্ নাগার্জুন চিকিৎসাকল্পে কজ্জলীর প্রবর্তন করেন। চোলাইকরণ ও সত্ত্বপাতন সম্বন্ধে এবং ঔষধের বড়ি ও পিষ্টক -রূপে ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। ঔষধরূপে সেঁকোবিষের ব্যবহার নাগার্জুনের আগেও এ দেশে জানা ছিল। আয়ুর্বেদে গন্ধক ও পারদের মিশ্রণে কজ্জলী, রস-কর্পূর, পীতভস্ম, স্বর্ণ ও বিজয় -পর্পটী, রসতালক, স্বর্ণসিন্দূর, বলীজারিত মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রভৃতি বহু ঔষধ আছে। স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজ বিভিন্ন অনুপানসহযোগে নানা রোগের, বিশেষতঃ হৃদরোগের মহৌষধ। স্বর্ণপর্পটী ও বিজয়পর্পটী আন্ত্রিক ক্ষয়রোগের অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ঔষধ, কারণ ইহারা পিত্তনিঃসারক, অগ্নিবর্ধক অথচ বিষক্রিয়াহীন। হরিতালভস্ম ক্ষয়রোগের একটি অমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। একই ভাবে মুক্তাভস্ম, প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম প্রভৃতি ক্যাল্‌সিয়ামঘটিত ভস্মগুলিও ক্ষয়রোগ ও ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত অন্যান্য রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। লৌহঘটিত ঔষধগুলি রক্তপ্রস্তুতকারক বলিয়া পরিচিত। কেবল সম্যক্‌রূপে শোধিত পারদ ও গন্ধকঘটিত ঔষধগুলিই অমোঘ কার্যকরী হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ পারদ প্রস্তুতির জন্য অতীব কষ্টকর ও দুঃসাধ্য আয়ুর্বেদোক্ত বিধি অনুসারে 'অষ্টাদশ শোধন' আবশ্যক।

৮. বাজীকরণচিকিৎসা— বীর্যধারণক্ষমতা, যৌন-সম্ভোগক্ষমতা, প্রজননশক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত

চিকিৎসাপদ্ধতিরই নাম বাজীকরণ। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এরূপ চিকিৎসাসম্বন্ধীয় বহু সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুচুমারতন্ত্র, শ্বেতকেতুতন্ত্র এবং পাঞ্চালতন্ত্র প্রভৃতি বাজীকরণচিকিৎসাসম্বন্ধীয় প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া উল্লিখিত হয়।

এই আটটি বিশেষ চিকিৎসাবিভাগ ছাড়াও মানবের রোগচিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদে পশুরোগচিকিৎসারও বিবরণ পাওয়া যায়। পশুরোগের চিকিৎসাসম্বন্ধীয় সংহিতাগুলির মধ্যে হস্তিরোগসম্বন্ধীয় পালকাপ্যসংহিতা, গোরোগসম্বন্ধীয় গোতমসংহিতা এবং অশ্বরোগসম্বন্ধীয় শালিহোত্রসংহিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশুচিকিৎসা ছাড়া যে সেকালে বৃক্ষাদিরও একধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন মেলে বৃক্ষায়ুর্বেদে।

দ্র গণনাথ সেন, আয়ুর্বেদ-পরিচয়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১৩৫, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; গুরুপদ হালদার, বৈদ্যক-বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪; ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য, কলিকাতা, ১৯৫০; A. F. R. Hoernle, *Studies in Medicine in Ancient India,* Oxford, 1907; B. N. Seal, *Positive Sciences of Ancient Hindus,* Delhi, 1958; G. N. Mukherjee, *History of Indian Medicine*, vols. I & III, Calcutta, 1923; G. N. Mukhopadhyay, *Surgical Instrument of the Hindus*, Calcutta, 1913-14; H. Zimmer, *Hindu Medicine*, Mortimore, 1948.

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

আরকট উত্তর আরকট ও দক্ষিণ আরকট মাদ্রাজ রাজ্যের দুইটি জেলা। আয়তন যথাক্রমে ১২৮০০ বর্গ কিলোমিটার (৪৯৪২ বর্গ মাইল) ও ১০৪২২ বর্গ কিলোমিটার (৪০২৪ বর্গ মাইল)। উত্তর আরকটের সদর ভেল্লোর ও দক্ষিণ আরকটের কুড্ডালোর।

পূর্বাংশ দিয়া পূর্বঘাট পর্বতমালা গিয়াছে। পালার উত্তর আরকটের এবং কোলেরুন ও গিংগী দক্ষিণ আরকটের প্রধান নদী। পেন্নার নদী উভয় জেলার মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। পালার নদীর তীরে আরকট শহর (১২°৫৬′ উত্তর, ৭৯°২৪′ পূর্ব) মাদ্রাজ হইতে ১০৫ কিলোমিটার (প্রায় ৬৫ মাইল) দূরে অবস্থিত। উত্তর আরকটের প্রায় সর্বত্র এবং দক্ষিণ আরকটের কোনও কোনও স্থানে বাড়ি তৈয়ারির উপযুক্ত উত্তম গ্র্যানিট শিলা পাওয়া যায়।

এই অঞ্চল পূর্বে মোগল আমলের আরকট সুবার অন্তর্গত ছিল। অনেকে ইহাকে তামিল 'আরু কাড়ু' অর্থাৎ 'ছয় অরণ্য' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কথিত আছে, এখানে ছয় জন ঋষিও বাস করিতেন।

দক্ষিণ আরকট অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক মানবের বাসস্থান ছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ পাথরের বহু অস্ত্র-শস্ত্র এবং স্মৃতিসৌধ এই জেলার কয়েকটি স্থানে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাতে এই জেলা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চোলরাজগণ দক্ষিণ আরকট অঞ্চল শাসন করেন। ইহার পর এ দেশে পল্লবদের আগমন ঘটে। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরকট অঞ্চল পল্লবদের অধীনে ছিল। পল্লবরাজগণের সময়ে এই অঞ্চলের ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নরসিংহ বর্মার রাজত্বকালে মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরম্ নামক স্থানে পাহাড় কাটিয়া যে সাতটি মন্দির বা রথ নির্মিত হইয়াছিল, উহা পল্লব-ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শৈব পরমেশ্বর বর্মা তাঁহার রাজ্যে অগণিত শৈব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবলিপুরমের বিখ্যাত গণেশ মন্দিরটি তাঁহারই কীর্তি। পল্লবরাজগণ সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এই অঞ্চল চোল, পাণ্ড্য, কেরল, যাদব, রাষ্ট্রকূট, হোয়সল ও বিজয়নগরের হিন্দু শাসকদের অধীন ছিল। দক্ষিণ আরকট অঞ্চলে পাণ্ড্য রাজাদের রাজত্ব মাত্র ৮০ বৎসর স্থায়ী হয়। তাঁহাদের পর মাদুরাই-এর মুসলমান সুলতানগণ প্রায় ৪৫ বৎসর ধরিয়া এই জেলা শাসন করেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ পরাভূত হইলে উহা ক্রমান্বয়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের পদানত হয়। আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চল বিজাপুর সুলতানদের হস্তগত হয় এবং ত্রিশ বৎসর পরে মারাঠা অধিপতি শিবাজী কর্তৃক বিজিত হয়। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের শাসনকর্তা সেন্ট জর্জ দুর্গের অধিপতিকে তাঁহার এলাকায় বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের জন্য আহ্বান জানান। তদনুযায়ী কুড্ডালোর কুনিমেড্ এবং পোর্টোনোভোতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ মারাঠাদের নিকট হইতে সেন্ট ডেভিড দুর্গ ও উহার চতুর্দিকের বহু জায়গা ক্রয় করিয়া লন। মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব সেনাপতি জাফর খাঁকে প্রেরণ করিলে উত্তরাঞ্চল কর্ণাট-এর নবাবদের অধীন হয় এবং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি

মাসে গিংগীর পতনের পর দক্ষিণাঞ্চল মোগলশক্তির অধীনে আসে। পরবর্তী শতক ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ ও হায়দরের সহিত যুদ্ধের ইতিহাস। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অ্যাডমিরাল লা বোর্দো কর্তৃক সেণ্ট জর্জ দুর্গ অধিকৃত হইলে করোমণ্ডল উপকূলের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ ছয় বৎসর পর্যন্ত কোম্পানির কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রেই ইংরেজ ও ফরাসীদের অনুপ্রবেশের এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের পটভূমিতে কর্ণাট যুদ্ধে (১৭৪৯-৬১ খ্রী) এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাহাদের আক্রমণের ও প্রতি-আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল কুড্ডালোর, সেণ্ট ডেভিড দুর্গ, গিংগী, তিয়াগ দুর্গম্, বৃদ্ধাচলম, তিরুভন্নামলৈ প্রভৃতি স্থান। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ জা-এর দৌহিত্র মজঃফর জঙ্গ ও পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর ডুপ্লের (Dupleix) সহায়তায় আরকটের নবাব আন্-ওয়ারু-দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদা সাহেব আন্-ওয়ারু-দীনকে অম্বুরে পরাস্ত ও নিহত করিয়া নিজেকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন। সুযোগ বুঝিয়া ক্লাইভ আন্-ওয়ারু-দীনের পুত্র মহম্মদ আলীর পক্ষ লইয়া রাজধানী আরকট অধিকার করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আরকট পুনরায় ফরাসী-দের হস্তগত হয় এবং ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কুড্ডালোর ও সেণ্ট ডেভিড দুর্গ ফরাসীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলে দুর্গপ্রাকারাদি ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ আয়ার কূট্ ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ লালীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়া হৃত দুর্গসমূহের পুনরুদ্ধার করেন। ফরাসীরা সেণ্ট ডেভিড দুর্গও পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দর আলী এই জেলার উত্তর-পশ্চিমের চঙ্গম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া কর্ণাটে প্রবেশের চেষ্টা করিলে কর্নেল জোসেফ স্মিথ কর্তৃক পরাজিত হন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হায়দর আরকট আক্রমণ ও দখল করেন। কিন্তু ভেল্লোর ও বন্দীবাস আক্রমণকালে তিনি লেফটেনাণ্ট ফ্লিণ্ট কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং স্যর আয়ার কূট্ ভেল্লোরের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই পোর্টোনোভোতে কূটের নিকট হায়দর শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হন এবং তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য নিহত হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কূট্ বন্দীবাস মুক্ত করিলে ইহা পুনরায় হায়দর কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু হায়দর যথারীতি ফ্লিণ্ট কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কুড্ডালোর পুনরায় ফরাসীদের হস্তগত হইলেও (১৭৮২ খ্রী) ইংরেজগণ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনরুদ্ধার করেন। হায়দর আলীর পুত্র টিপু সুলতান ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিরুভন্নামলৈ ও পেরুমক্কল অধিকার করেন। হায়দরের সহিত যুদ্ধের সময় আরকটের নবাব ইংরেজদিগকে কর্ণাটের রাজস্ব পাইবার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রথম দক্ষিণাঞ্চল মাত্র কিছুকালের জন্য ইংরেজদের শাসনাধীনে আসে (১৭৮১-৮৫ খ্রী এবং ১৭৯২-৯৯ খ্রী)। অবশেষে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আজিমুদ্দৌলা কর্ণাটের সার্বভৌম ক্ষমতা ইংরেজদের উপর অর্পণ করেন। এইরূপে দক্ষিণ আরকট অঞ্চল এবং কর্ণাটের অন্যান্য জেলাসমূহ ইংরেজদের অধীনে আসে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেল্লোর বিদ্রোহী সিপাহীদের একটি ঘাঁটি ছিল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে উত্তর আরকটের জনসংখ্যা ৩১৪৬৩২৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১৫৮১৮২৬ এবং নারী ১৫৬৪৫০০। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯৮৯ : ১০০০। দক্ষিণ আরকটের লোকসংখ্যা ৩০৪৭৯৭৩। তন্মধ্যে পুরুষ ১৫৩৫৯২৮ ও নারী ১৫১২০৪৫। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯৮৪ : ১০০০। উত্তর আরকটে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ২৪৬ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৬৩৭ জন) এবং দক্ষিণ আরকটে ২৮০ জন (প্রতি বর্গমাইলে ৭২৫ জন)।

এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা তামিল। তারপর যথাক্রমে তেলুগু, কানাড়ী, উর্দু, হিন্দী, মালয়ালম ও মারাঠী ভাষার স্থান। উত্তর আরকটে চারিটি অনুমোদিত কলেজ আছে। এতদ্ভিন্ন একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি নার্সিং স্কুল, একটি ট্রেনিং কলেজ ও একটি পলিটেক্‌নিকও বর্তমান। এই জেলায় প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে ৩৭১ জন ও প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ১২২ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। দক্ষিণ আরকটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (অন্নামলৈ), একটি বেসরকারি কলেজ, একটি তামিল কলেজ ও একটি সংস্কৃত কলেজ আছে। এই জেলায় প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে ৪০৬ জন এবং প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ১২৭ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন।

অন্যান্য তামিল-অধ্যুষিত অঞ্চলের মত এখানকারও প্রধান উৎসব পোঙ্গল (মকর-সংক্রান্তি)। পৌষ মাসে তিনদিনব্যাপী এই উৎসব চলে। প্রথম দিন ভোগী-পোঙ্গল। ইহা তামিলদের পারিবারিক উৎসব। দ্বিতীয় দিন মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে সূর্যের উদ্দেশে পোঙ্গল (মিষ্টান্ন) উৎসর্গ করা হয়। তৃতীয় দিবস মাত্তু-পোঙ্গল। ঐ দিন গ্রামদেবতাকে নিবেদিত পোঙ্গল গবাদি পশুকে

(মাত্তু) খাইতে দেওয়া হয়। রাত্রিকালীন ভোজানুষ্ঠানে সর্বস্তরের লোক যোগ দেয়। রবির মেষ-সংক্রমণ দিবসে তামিলদের নববর্ষের উৎসব প্রতিপালিত হয়।

তিরুভন্নামলৈয়ের অরুণাচলমে মহাদেবের তেজোমূর্তি বিরাজিত। এখানকার শিবমন্দিরের সম্মুখে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড বহুদিন ধরিয়া জলন্ত অবস্থায় রক্ষিত থাকে। মহাবলী-অনুষ্ঠানে প্রজ্বলিত দীপ ও মশাল -সমন্বিত শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং মহাবলীর জয়ধ্বনি দ্বারা অনুষ্ঠানটি প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

এই অঞ্চলের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান্য, ভারাগু, চোলাম, কুম্বু, রাগী, কোর্‌রা, মুগ, কলাই, ছোলা এবং মটর প্রধান। চীনাবাদাম ও ইক্ষুর চাষও প্রচুর।

উত্তর আরকটে সমবায়ভিত্তিতে একটি চিনির কারখানা নির্মিত হইতেছে। নেভেলির লিগ্‌নাইট প্রকল্প (ইন্‌টিগ্রেটেড লিগ্‌নাইট প্রজেক্ট) ভবিষ্যতে একটি সুবৃহৎ শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়। আরকটের সাথানূর জলাধার প্রকল্পটির (সাথানূর রেজার্ভয়্যার প্রজেক্ট) নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং সমাপ্ত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। মোট ব্যয় হয় ২৫৮ লক্ষ টাকা। এই পরিকল্পনার ফলে অতিরিক্ত ২১০০০ একর অনাবাদী জমি চাষযোগ্য হইবে। উত্তর আরকটের মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৪৬৯০১৪। তন্মধ্যে পুরুষ ৯৪২৮২০ জন ও নারী ৫২৬১৯৪ জন। ৪৯৬৬১২ জন পুরুষ ও ২৬২১০৪ জন নারী কৃষিকর্মে, ১০৭৩১৬ জন পুরুষ ও ২৬২১০৪ জন নারী কৃষি-মজুররূপে এবং ৬৮২৫৮ জন পুরুষ ও ৩৩৮৯৪ জন নারী গৃহশিল্পে নিয়োজিত। দক্ষিণ আরকটে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ১৩৯৭০৫৭। তন্মধ্যে পুরুষ ৯৪২১৯৪ জন ও নারী ৪৫৪৮৬৩ জন। ৪৯৮১৫৬ জন পুরুষ ও ১৯২৭৭২ জন নারী কৃষিকর্মে, ২০৫৯৩০ জন পুরুষ ও ১৯৪৪২৯ জন নারী কৃষি-মজুররূপে এবং ৪১৮৬৬ জন পুরুষ ও ১৪২৮৮ জন নারী গৃহশিল্পে নিয়োজিত আছে।

দক্ষিণ আরকটে ৩৮২৩ কিলোমিটার (২৩৭৬ মাইল) রাস্তা ও প্রায় ৪০৩ কিলোমিটার (২৫১ মাইল) মিটার-গেজ রেলপথ আছে। পালারু নদীতীরে অবস্থিত ভেল্লোর দক্ষিণ রেলওয়ের বিল্লিপুরম-কাটপাদি শাখার অন্তর্গত। মাদ্রাজ হইতে ভেল্লোরের রেলপথে দূরত্ব ১৪০ কিলোমিটার (৮৭ মাইল)। মাদ্রাজ ও ভেল্লোরের মধ্যে বাস সার্ভিসও চালু আছে। মাদ্রাজ হইতে গিংগী পর্যন্তও বাস চলাচল করে। চিদাম্বরম, কুড্ডালুর, পনরুটিতে দিণ্ডিভানম, বিল্লিপুরম এবং বৃদ্ধাচলম-এ টেলিফোন-ব্যবস্থা চালু আছে।

দ্র *The Cambridge History of India*, vols. IV & VI (The Mughal Period and the Indian Empire), Delhi; P. E. Roberts, *History of British India Under the Company and the Crown*, Oxford, 1941; *Madras District Gazetteers: South Arcot*, Madras, 1906; A. F. Cox, *A Manual of the North Arcot District in the Presidency of Madras*, Madras, 1881; *Madras District Gazetteers : South Arcot*, Madras, 1962; *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series vol. II, Madras*, Calcutta, 1908; *Census of India : Paper No. I of 1962 : 1961 Census, Final Population Totals*, Delhi, 1962.

দিনেনকুমার সোম

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল ‘বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ’ নামে এই কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তখন এখানে মাত্র পঞ্চাশ জন ছাত্র এবং রোগীদের জন্য একশত শয্যার ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষে ইহাই প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম স্যর নীলরতন সরকার প্রমুখ কতিপয় চিকিৎসাবিদের নিকট এই আরোগ্যনিকেতন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে ঋণী। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটির নাম হয় ‘কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ’। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ইহার নূতন নামকরণ হয় ‘আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ’। রাধাগোবিন্দ কর ছিলেন কলেজটির প্রথম সম্পাদক এবং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি পরে কলেজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে। বর্তমানে এখানে এম.বি.বি.এস., ডি.জি.ও., ডি.ও.এম. এস.,ডি.এ. এবং প্রি-মেডিক্যাল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক হাজার। হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগে এখন যথাক্রমে এক হাজার এবং আটশতাধিক রোগীর চিকিৎসাব্যবস্থা আছে।

হেমন্তকুমার ইন্দ্র

আরণ্যক বেদের ব্রাহ্মণভাগের এক অংশ। অপর দুই অংশ— শুদ্ধব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্। শুদ্ধব্রাহ্মণ মুখ্যতঃ কর্মাশ্রয়ী এবং উপনিষদ্ মুখ্যতঃ জ্ঞানাশ্রয়ী বলিয়া যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নামে পরিচিত। মধ্যবর্তী আরণ্যককে উভয়াশ্রয়ী বলা চলে। ইহা কর্ম ও জ্ঞানের সন্ধিসাধক সেতুস্বরূপ। আরণ্যকে যাগানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, কিন্তু সে অনুষ্ঠান বহু স্থলেই মানস ব্যাপার মাত্র। তাহাতে হবন অপেক্ষা মননের প্রাধান্য অধিক।

'অরণ' শব্দের অর্থ দূরদেশ, বহির্দেশ— সুতরাং লোকালয়বর্জিত বনপ্রদেশ। অরণ হইতে অরণ্য শব্দের উৎপত্তি। উহা সুগভীর তত্ত্বানুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। অরণ্যে পাঠ্য গ্রন্থ আরণ্যক। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী সমাবর্তনের পূর্বে অরণ্যে কিংবা যে স্থান হইতে বাসগৃহের ছাদ দেখা যায় না এইরূপ 'অচ্ছদিদর্শ' প্রদেশে বসিয়া নিরাকুল চিত্তে গুরুর নিকট আরণ্যক-বিদ্যা গ্রহণ করিত। ইহা ছাড়া গৃহস্থ যখন বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, তখন অরণ্য হইত তাঁহার আশ্রয়স্থল। গৃহহীন বানপ্রস্থ ব্যয়সাধ্য উপকরণের অভাবে তখন আর যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু তিনি প্রথম স্তরে কর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া আরণ্যকনির্দিষ্ট মানস যজ্ঞের ভাবনা করিতেন। এইরূপে দুই প্রকারে অরণ্যের সঙ্গে আরণ্যকের সম্পর্ক ঘটিত। ব্রহ্মচারী অরণ্যে গমন করিয়া আরণ্যকের পাঠ লইতেন এবং বানপ্রস্থ অরণ্যাশ্রমে বসিয়া আরণ্যকবিদ্যার প্রয়োগ করিতেন।

আরণ্যক রূপকবহুল রহস্যবিদ্যা। বেদের অন্যান্য অংশে কিছু কিছু রূপকযজ্ঞের বিধান থাকিলেও আরণ্যকেই তাহার প্রাচুর্য দেখা যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'চতুর্হোত্রযাগ' একটি রূপক যজ্ঞ; চেতনা সেখানে স্রুক্, মন আজ্য, বাক্ বেদি। শাঙ্খায়ন আরণ্যকের 'আন্তর' অগ্নিহোত্রও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্ম।

আরণ্যকের উক্তির মধ্যে বিভিন্ন উপনিষদের 'মহাবাক্য'গুলির বীজ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে উপনিষদের পূর্বে আরণ্যকের স্থান। উভয়ের চিন্তাধারার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, গ্রন্থের বিন্যাসব্যবস্থায়ও যেমন আরণ্যক উপনিষদের পূর্বভাগ, বস্তুভাবনাতেও তেমন উহা উপনিষদের পূর্বরূপ।

পৃথক কোনও গ্রন্থাংশ বুঝাইবার জন্য আরণ্যক নামের প্রাচীন প্রয়োগ পাওয়া যায় না। পাণিনির সূত্র অনুসারে গ্রন্থ অর্থে আরণ্যক পদ সিদ্ধ হয় না। পদসিদ্ধির জন্য পরবর্তী কালে বার্তিক রচনা করিতে হইয়াছে।

আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই অংশ। কিন্তু আজ পর্যন্ত যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়াছে, আরণ্যকের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। ঋগ্বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ প্রচলিত— ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন। উভয়েরই আরণ্যক আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও আরণ্যক বর্তমান। শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় শতপথব্রাহ্মণের শেষ অংশ বৃহদারণ্যক; এই গ্রন্থভাগ একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপে গণ্য হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদে মৈত্রায়ণীয় চরকশাখারও একখানা বৃহদারণ্যক পাওয়া যায়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ-গুলির কোনও আরণ্যক এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সামবেদের জৈমিনীয় শাখার উপনিষদ্ব্রাহ্মণখানি অনেক অংশে আরণ্যকধর্মী। ইহা হয়ত তলবকার জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের আরণ্যক। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণের কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় না। ঐতরেয়, শাঙ্খায়ন ও তৈত্তিরীয় এই তিনখানিই প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ আরণ্যক।

দ্র বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।৮।৩, ৩।৭।১৬; ঐতরেয় আরণ্যক, সায়ণভাষ্য ভূমিকা; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৩২, ৩।১; গোভিলগৃহ্যসূত্র ৩।২।৩৩; আরুণিকোপনিষদ্ ২।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

আরতি দেবপূজার অঙ্গবিশেষ। আরাত্রিক নীরাজন নির্মঞ্ছন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে দেবমূর্তির সম্মুখে প্রদীপাদি আবর্তিত হয়। আরতির উপকরণ প্রধানতঃ পাঁচটি— দীপমালা বা পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, চূতঅশ্বত্থাদি পত্র বা পুষ্প বিল্বপত্র এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। ধূপধুনা ও কর্পূরের বাতিরও ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমে দেবতার পদতলে চারিবার, তৎপরে ক্রমান্বয়ে নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার এই সমস্ত বস্তু ঘুরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা আছে। আরতির অনুষ্ঠান ও দর্শন বহুফলপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রহীন ও অঙ্গহীন দেবপূজা নীরাজনের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুদৃশ্য দীপাবলির দ্বারা বিষ্ণুর নীরাজন অনুষ্ঠিত হইলে তমোবিকার বিনষ্ট হয় ও ফলে পুনর্জন্ম নিরস্ত হয়। (শব্দকল্পদ্রুমে আরাত্রিক ও নীরাজন শব্দ দ্রষ্টব্য)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আরব সাগর মোটামুটি ৮° উত্তর হইতে ২৪° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫১° পূর্ব হইতে ৭৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে আফ্রিকা ও

এশিয়া মহাদেশ; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। সুয়েজ খালের দ্বারা ইহা ভূমধ্যসাগরের সহিত যুক্ত। তজ্জন্য আরব সাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। তবে ইহার প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য জানা নাই। ভূতাত্ত্বিকদের মতে টার্সিয়ারি যুগের প্রথম ভাগে ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ বসিয়া যাইয়া ভারত মহাসাগরের জলরাশি দ্বারা পূর্ণ হয় এবং ক্রমে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আরব সাগরের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ আরব সাগরের উপকূলভাগে ১৮৩ মিটারের (১০০ ফ্যাদম) কম গভীর মহীসোপানের বিস্তৃতি খুবই শীর্ণ এবং তাহার পরেই সমুদ্রতল হঠাৎ ২০১৩০ মিটার (১১০০০ ফ্যাদম) গভীর। এইরূপ ভূগঠন চ্যুতির ফলেই সম্ভব। অবশ্য সাগরতল সমান গভীর নহে। ১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মারে-অভিযানের ফলে সাগরতলে কয়েকটি শৈলশিরা ও খাত আবিষ্কৃত হয়। ভারতের রত্নগিরি জেলার পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত একটি শৈলশিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারই উপর প্রবালস্তূপ জমিয়া লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও মালদ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরে মাকারান উপকূলের ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) দূরে কয়েকটি সমান্তরাল এবং প্রায় ৩০৪৯ মিটার (১০০০০ ফুট) উচ্চ জলমগ্ন শৈলশিরা দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে উহারা পাকিস্তানের খিরথর পর্বতের সহিত ভূ-সংশ্লিষ্ট। তাহা ছাড়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি গিরিশিরা প্রায় মধ্যভাগ দিয়া প্রসারিত আছে। অভিযানের নায়ক মারে-র নামে ইহা পরিচিত। পশ্চিম প্রান্তে সোকোত্রা, কুরিয়া, মুরিয়া, মোসেরা দ্বীপগুলি নিকটস্থ মহাদেশের বিচ্ছিন্ন খণ্ডমাত্র। সিন্ধু নদের মোহনার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ৩৬৬০ মিটার (২০০০ ফ্যাদম) গভীর খাত করাচী হইতে ওমান উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ারে আরব সাগরের প্রায় মধ্য ভাগে একটি মালভূমিসদৃশ ভূগঠন আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ব্যাসল্ট লাভার অনুরূপ প্রস্তরে গঠিত। আরব সাগরের গড় গভীরতা প্রায় ৫৪৯০ মিটার (৩০০০ ফ্যাদম)।

নদীধৌত পারস্য উপসাগর, পাকিস্তান ও ভারতের উপকূলের নিকটে সমুদ্রতলে মহাদেশীয় সবুজ কর্দম পাওয়া যায়। ওমান উপসাগরের গভীরতর অঞ্চলে এই কর্দমের রং ধূসর এবং ইহা মধ্যে মধ্যে উত্তর-পূর্ব বায়ুতাড়িত সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে আরব উপকূল ও এডেন উপসাগরে ঢুকিয়া পড়ে। আরব সাগরের দক্ষিণ ভাগে রক্তাভ কর্দম পাওয়া যায়। লাক্ষাদ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের মধ্যে গ্লোবিজারিনা সিন্ধুমল পাওয়া গিয়াছে। রাস-এল-হাদ ও মালদ্বীপের নিকটে সমুদ্রতলের কর্দম ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় আছে।

সাগরপৃষ্ঠের জলরাশির গড় তাপমাত্রা ঋতু অনুযায়ী প্রায় ২৭·৫° সেন্টিগ্রেড ও ২৯·২০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে কোনও কোনও স্থলে এই তাপ সহসা ২° হইতে ৪° সেন্টিগ্রেডে নামিয়া যায়। জলে লবণের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ।

আরব সাগরের জলরাশির বিভিন্ন স্তরে প্রধানতঃ তিনটি সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত। যথা, ১০০০ মিটার পর্যন্ত গভীর স্তরে লোহিত ও পারস্য উপসাগর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধাবমান ক্রান্তীয় মাধ্যমিক স্রোত (ট্রপিক্যাল ইণ্টার-মিডিয়েট কারেণ্ট), ২০০০ হইতে ২৫০০ মিটার গভীরতায় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত উত্তরভারতীয় গভীরস্রোত (ঈস্ট ইণ্ডিয়ান ডীপ কারেণ্ট) এবং সমুদ্রের একেবারে তলদেশে উত্তর দিকে প্রবহমান অ্যাণ্টার্কটিক তলস্রোত (অ্যাণ্টার্কটিক বটম্ ড্রিফ্ট্)।

আরব সাগরের সহিত মৌসুমী বায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরব সাগরের উপর দিয়া আসিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। মৌসুমী বায়ুর কথা প্রাচীন যুগ হইতে আরব সাগরের নাবিকেরা জানিত এবং এই বায়ুচালিত পোতের সাহায্যে আরব ও পূর্ব আফ্রিকার সহিত পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য চলিত। সুয়েজ খাল খনন করার পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য জলপথে আরব সাগরের উপর দিয়াই সাধিত হয়।

দ্র D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1961; R. B. Seymour Sewell, 'The Oceans Round India', *An Outline of the Field Sciences of India*, Calcutta, 1937; *Scientific Reports of the John Murray Expedition 1933-34*, British Museum, 1935; J. D. H. Wiseman & R. B. Seymour Sewell, 'The Floor of the Arabian Sea.' *Geological Magazine*, vol. LXXIV, 1937.

অভিজিৎ গুপ্ত

আরা বিহার রাজ্যের শাহাবাদ জেলার সদর শহর আরা গঙ্গা নদী হইতে দক্ষিণে ১৬ কিলোমিটার এবং শোণ নদী হইতে পশ্চিমে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরা শহরের রেলওয়ে স্টেশন পাটনা জংশন এবং কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ৫০ ও ৫৯৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সাসারাম লাইট রেলওয়ের জন্য এই স্থানে গাড়ি বদল করিতে হয়।

আরা মিউনিসিপ্যালিটিতে ৫০টি মহল্লা আছে এবং উহা ২৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। যে সকল রাস্তাঘাট্ উহাকে বিভক্ত করিয়াছে তাহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৯·৫৩ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ২৪·৩৩ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ১৫·২০ কিলোমিটার কাঁচা। একটি পিচঢালা রাস্তার দ্বারা বক্সার এবং সাসারামের সহিত ইহার সংযোগ থাকাতে যাত্রীবাহী বাস এবং প্রচুর মালবাহী গাড়ি চলাচল করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত একটি পাকা রাস্তা আরা হইতে ডেহিরী পর্যন্ত নালার বাঁধের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আরা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়।

শহরের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ৭৬৭৬৬; তন্মধ্যে ৪১৭৪৮ জন পুরুষ এবং ৩৫০১৮ জন স্ত্রীলোক। সাধারণতঃ অন্যান্য জেলার সদর শহরগুলির সরকারি দপ্তরগুলির ন্যায় এখানেও ঐ সকল দপ্তর অবস্থিত। জনাকীর্ণ বাজারটির অবস্থান শহরের মধ্যস্থলে। পুরুষদের জন্য এই শহরে তিনটি ডিগ্রি কলেজ আছে এবং উহাদের মধ্যে এস. ডি. জৈন কলেজে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। মহিলাদের জন্য মহা মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি কলেজ আছে। ইহা ব্যতীত একটি কারিগরি, কুটিরশিল্প এবং একটি কৃষি-বিদ্যালয় বর্তমান। এখানে অবস্থিত দুষ্প্রাপ্য হস্তাক্ষর -সংবলিত পুথি-পুস্তকে পূর্ণ একটি জৈন পুস্তকাগারে প্রায় ১৭০০০ পুস্তক আছে।

হাসপাতালের মধ্যে সদর এবং পুলিশ হাসপাতাল ব্যতীত একটি পশু-চিকিৎসালয়ও বর্তমান। আরা শহরের মধ্যে আরা সদর, নবাদা এবং মফস্বল নামে তিনটি থানা ব্যতীত পাঁচটি ফাঁড়ি আছে। স্ত্রীলোকদের রৌপ্য অলংকার আরাতে আমদানি এবং সেখান হইতে বারাণসীতে রপ্তানি হইয়া থাকে। আরাতে প্রস্তুত কর্নিক (রাজমিস্ত্রিদের ব্যবহার্য যন্ত্র) কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণ সুতি কাপড় এবং কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভগবান্ মহাবীর তাঁহার যাত্রাপথে যে স্থানে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করেন তাহাই বর্তমানে 'বিশ্রাম' নামে পরিচিত। জৈন ধর্মাবলম্বীরা প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিয়া মিলিত হয়। আরা শহরে ৪৫টি জৈন মন্দির আছে। অরণ্যদেবীস্থান সম্পর্কে জন-প্রবাদ এই যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়ে তাঁহারা গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে মাতৃমূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। কালক্রমে 'অরণ্য' এখন 'আরা'-য় পরিবর্তিত হইয়াছে। রামনবমীর সময়ে প্রতিবৎসর এই স্থানে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা হয় এবং হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশে পূজা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

আরা শহর মন্দির ও মসজিদে পরিপূর্ণ। ঔরংজেবের আদেশে যে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল এখন উহাই জুম্মা মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে কয়েকটি খ্রীষ্টান মিশনও আছে।

প্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী

আরাকান উচ্চ শৈলমালার দ্বারা ব্রহ্ম দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার (৩৫০ মাইল) দীর্ঘ এই জনপদে প্রাচীন কাল হইতেই— সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে হিন্দুরা বসবাস করিত। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে রামাবতী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া কাশীরাজের পুত্র আরাকানে প্রথম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৈশালী নামক নগরে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। এই শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত শিলালিপি অনুসারে অন্ততঃ কুড়ি জন রাজা ইহার পূর্বে ৩৫০ বৎসর রাজত্ব করে। যে রাজার (আনন্দচন্দ্র) সময়ে এই লিপি লিখিত হয়, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাম্রপট্টনরাজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাই আরাকানের প্রাচীন নাম এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। আরাকানে কয়েকটি প্রাচীন লিপি ও বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে— ইহাতে 'চন্দ্র' উপাধিধারী বহু রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন রাজধানী বৈশালীর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এই রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধির এবং গুপ্ত ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিল্প-কলার প্রভাবের পরিচয় দেয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্ম দেশের রাজা আরাকান অধিকার করিলে আরাকানরাজ বাংলা দেশের মুসলমান সুলতানদের সাহায্যে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং সুলতানের সামন্তরূপে রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণ নামের সঙ্গে মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করে। কিন্তু আরাকানের পরবর্তী রাজা বাংলার অধীনতা অস্বীকার করেন। তাঁহার পুত্র চট্টগ্রামও অধিকার করেন এবং অনেক বৎসর পর্যন্ত কখনও বাংলার সুলতান এবং কখনও আরাকানরাজ চট্টগ্রাম দখল করেন। ১৫৮৪ হইতে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী উদয়পুর দখল করেন।

বাংলা দেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে আরাকানরাজ বাংলার বিরুদ্ধে বহু অভিযান করেন এবং শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভুলুয়ায় বিস্তর লুটপাট করিয়া বহু গ্রাম জ্বালাইয়া অনেক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যান। বাংলার মোগল শাসনকর্তার সহিত আরাকানরাজের কয়েকটি বড় যুদ্ধও হয়। চট্টগ্রামের নিকট কাঠগড় নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আরাকানরাজের চারি লক্ষ পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী, বহু রণহস্তী ও এক হাজারের অধিক রণতরী ছিল। যুদ্ধে মোগল বাহিনী পরাস্ত হয়।

চট্টগ্রাম ও সন্দীপে আরাকানীদের দুইটি ঘাঁটি ছিল। ইহার আশ্রয়ে ও পর্তুগীজদের সহায়তায় দক্ষিণ ও পূর্ব -বঙ্গে আরাকানীদের অত্যাচার চরমে ওঠে। বহু জনপদ ধ্বংস হয়, বহু সহস্র লোক বন্দী হইয়া কতক দাসরূপে বিক্রীত হয়— কতক আরাকানে দাসত্ব করে। শায়েস্তা খাঁ এই দুই ঘাঁটি দখল করিলে আরাকানী অত্যাচার অনেক কমে।

মুসলমান যুগে দুইজন বাঙালী মুসলমান কবি আরাকানের রাজসভা অলংকৃত করেন। দৌলৎ কাজী 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' এবং আলাওল 'পদ্মাবতী' ও আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্ম দেশের রাজা পুনরায় আরাকান দখল করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মরাজ্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে আরাকান ব্রিটিশ ভারতের অধীন হয়।

দ্র সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলিকাতা, ১৯৬২ ; J. N. Sarkar ed., *The History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948 ; G. E. Harvey, *History of Burma*, 1925 ; S. N. Ghoshal, *Beginning of Secular Romance in Bengali Literature*, 1960.

রমেশচন্দ্র মজুমদার
সুখময় মুখোপাধ্যায়

আরাকান য়োমা হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পর্বতগ্রন্থি হইতে উদ্ভূত কয়েকটি সমান্তরাল শৈলশিরা ভারত ও ব্রহ্ম দেশের সীমান্তে বিস্তৃত আছে। চীন-পর্বতমালার দক্ষিণে এই শৈলমালাটি ক্রমশঃ নিচু হইয়া নেগ্রাইস্ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা আরাকান য়োমা নামে পরিচিত। সমান্তরাল শৈলশিরার মধ্যবর্তী গভীর গিরিখাত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীগুলি সাধারণভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। কিন্তু দৈর্ঘ্য বা জলধারণের ক্ষমতার হিসাবে তাহারা কেহই উল্লেখযোগ্য নহে। এই পর্বতমালার গড় উচ্চতা ৯১৪-১০৬৭ মিটার (৩০০০-৩৫০০ ফুট)। ট্রায়াসিক যুগের শেষ দিক পর্যন্ত এই অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। উহা ক্রমশঃ বালি ও পলিমাটির দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে। পরবর্তী কালে ভূ-সংকোচনের ফলে ঐ বালি ও পলিমাটির স্তর কুঞ্চিত হইয়া এই ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। ভূতাত্ত্বিক গঠনে ইহা আল্‌প্‌স ও হিমালয় পর্বতের সমগোত্রীয় এবং ঐরূপ পর্বতসৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত।

বেলে পাথর ও 'শেল' ভিন্ন এই অঞ্চলে রামখড়ি (ষ্টিয়াটাইট) ও কয়লা পাওয়া যায়। মিনবু ও হেনজাদা অঞ্চলের কয়লা এবং মিনবুর রামখড়ি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। সাধারণভাবে শৈলশিরাগুলির পশ্চিম ভাগে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যে ঐ শিরাগুলির উপত্যকা ঘন বনে আচ্ছন্ন। এই অঞ্চলের বনজ সম্পদের মধ্যে সেগুনকাঠ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা নিম্নমানের কৃষিকার্যে লিপ্ত। জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইলেই তাহারা পুরাতন কৃষিক্ষেত্র-গুলি পরিত্যাগ করে। এই চাষ 'ঝুম'প্রথা নামে ভারতে পরিচিত। আলানটঙ্গ একমাত্র উল্লেখযোগ্য বসতি। পর্বতশৃঙ্গে আবৃত বলিয়া গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা আবহাওয়া অনুভূত হয়।

সত্যকাম সেন

আরাবল্লী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন পর্বতগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা বর্তমানে নগ্নীভূত। গুজরাট হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ৬৯২ কিলোমিটার (৪৩০ মাইল) দীর্ঘ এই শৈলশিরাটি পূর্বে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং পশ্চিমে সিন্ধু সমভূমি ও থর মরুভূমির মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকা হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকাদ্বারা বিচ্ছিন্ন। উদয়পুরের নিকট ইহার উচ্চতা ১০৬৭-১২১৯ মিটার (৩৫০০-৪০০০ ফুট) এবং দিল্লীর নিকট ৩০৫ মিটার (১০০০ ফুট)। এই পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট আবু ১৭২৯ মিটার (৫৬৪৫ ফুট) উচ্চ।

ধারওয়ার যুগের শেষ ভাগে শীর্ণ ও দীর্ঘ খাতে সঞ্চিত পললরাশি উন্নীত হইয়া উচ্চ ভঙ্গিল পর্বতে পরিণত হয়। কিন্তু পরবর্তী যুগে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান আরাবল্লী পর্বতের আকার ধারণ করে। এই ভূ-গঠন দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চ্যুতির দ্বারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন। হেরনের মতে আরাবল্লী পর্বতের নীচের

শ্রেণীটি আরাবল্লী ধারা নামে পরিচিত। এই ধারায় কোয়ার্ট্জাইট, কনগ্লোমারেট শ্লেট, শেল, ফিলাইট এবং নাইস্ শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপরের ধারাটি রায়োলাইট ধারা নামে পরিচিত। এই ধারায় কোয়ার্ট্জাইট ও কেলাসিত চুনাপাথর পাওয়া যায়। মাকরানার এইরূপ চুনাপাথর প্রসিদ্ধ।

বর্ষার প্লাবনে নদী দ্বারা পর্বতের পাদদেশে পলল বা বালুকণা সঞ্চিত হয়। এই অবক্ষেপণের প্রকৃতির উপরই কৃষিকার্যের সফলতা নির্ভর করে। অনেক পার্বত্য নদীতে এবং পর্বতের নিম্নাংশে সারা বৎসর জল থাকে। কিছু কিছু নদীর জল লুনী নদীকে পুষ্ট করে। বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (২৫৪ হইতে ৬৩৫ মিলিমিটার অথবা ১০ হইতে ২৫ ইঞ্চি)। মাউণ্ট আবুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫২৩ মিলিমিটার (৬০ ইঞ্চি)। এই অঞ্চলে রবিশস্যের মধ্যে গম এবং খরিফ (হৈমন্তিক) -শস্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা ও ডাল প্রধান। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ভীল উপজাতিরা পর্বতের ঢালে ঝুমপ্রথায় চাষ করে।

এখানে কোনও কোনও স্থানে জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও গাছগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, কোথাও বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তৃণ, বাবলা এবং অন্যান্য কাঁটাজাতীয় গাছও এখানে জন্মায়।

আরাবল্লী খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। যোধপুরে মার্বল, আজমীরে তাম্র, অভ্র ও বেরিল ধাতু পাওয়া যায়। মারোয়াড়েও কিছু কিছু অভ্র পাওয়া যায়।

মাউণ্ট আবু একটি স্বাস্থ্যনিবাস ও জৈনদের তীর্থস্থান। আজমীর মুসলমানদের তীর্থস্থান। উদয়পুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার সুরম্য রাজপ্রাসাদটি একটি হ্রদের মধ্যে অবস্থিত।

দ্র O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957 ; D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1960, A. M. Heron, 'Synopsis of Vindhyan Geology of Rajputana,' *Transactions, Natural Institute of Science*, vol. I, no. 2, 1935.

দীপ্তি সেন

আরামবাগ হুগলী জেলার একটি মহকুমা ও মহকুমা শহর। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী এই শহর এবং সমগ্র মহকুমাটির পরিবেশ বিশেষভাবে গ্রামীণ। শহরটি ওল্ড্ বেনারস, ওল্ড্ নাগপুর, আরামবাগ-বর্ধমান ইত্যাদি রাস্তার উপরেই এবং নিয়মিত বাস-সার্ভিস দ্বারা সংযুক্ত। শহরটির পূর্বনাম জাহানাবাদ। ১৯০০ সালে একটি বাগানের নাম অনুসারে শহরটির নাম পরিবর্তিত হয়। শহরটি পুরাতন বর্ধমান-মেদিনীপুর বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত আসিয়া বর্ষাকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত এইখানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই মহকুমার রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের আদি বাটী ও জন্মস্থান। আরামবাগ শহরের ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) পশ্চিমে গড় মান্দারনের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দ্র *West Bengal District Handbooks : Hooghly : 1951 Census*, Delhi, 1952 ; L.S.S. O'Malley, *Hooghly District Gazetteer* Calcutta, 1912.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আরিয়ান (৯৬-১৮০খ্রী) প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃত নাম ফ্লাভিয়ুস আরিয়ানুস। আরিয়ান নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন এশিয়া মাইনরে অবস্থিত বিথিনিয়ার অন্তর্গত নিকোমেদিয়ার অধিবাসী। আনুমানিক ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। রোম-সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে আরিয়ান কাপাদোসিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৩১-১৩৭ খ্রী)। তাঁহার কর্ম-জীবনের কিছুকাল অ্যাথেন্স নগরীতেও অতিবাহিত হয়, সেখানে তিনি ১৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম নগরশাসক বা আর্কনের কার্য করিয়াছিলেন। কর্মজীবনের অন্তে তিনি বাসভূমি নিকোমেদিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনা -কার্যে তাঁহার শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। আনুমানিক ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যৌবনে আরিয়ান দার্শনিক এপিকৃতেতুসের (৬০ খ্রী) শিষ্য ছিলেন। পরবর্তী কালে 'দিয়াত্রিকই' নামে আট-খণ্ড গ্রন্থে তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশসমূহ প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকের প্রথম চারি খণ্ড এখনও বর্তমান। গ্রীসের স্টোয়িক দার্শনিক সম্প্রদায়ের নীতিশাস্ত্রবিষয়ে ইহা সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। ম্যাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের ইতিহাস লইয়া আরিয়ান সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আনাবাসিস' রচনা করেন। ইহা তাঁহার সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানেরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে আরিয়ান 'ইন্দিকা' নামক ভারতবর্ষের নানা বিবরণ -সংবলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রধানতঃ আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক প্রাচীন

লেখকগণের ও মেগাস্থিনিসের ন্যায় পূর্বতন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। সেই কারণে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসবিষয়ে ইহা অতি মূল্যবান আকরগ্রন্থ। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আরিয়ান-রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

দ্র যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সমসাময়িক ভারত, প্রথম কল্প, তৃতীয় খণ্ড, পাটনা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ; E. J. Chinnock, tr., *Arrian's Anabasis and Indica*, London, 1893; J. W. McCrindle, *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*, Calcutta, 1960; R. C. Majumdar ed., *Classical Accounts of India*, Calcutta, 1961.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আরিস্তোতল, -লিস, অ্যারিস্টটল (৩৮৫-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব) গ্রীক দার্শনিক। পাশ্চাত্ত্য চিন্তারাজ্যে এবং প্রাচ্যের কিছু অংশে ন্যূনাধিক দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ইঁহার মতামত বেদবাক্যের সম্মান পাইয়াছে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী মাত্র এই দার্শনিকের প্রভাব বহুলাংশে অস্বীকৃত। ন্যায়, দর্শন, শিল্প, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি চিন্তা-রাজ্যের প্রায় সকল শাখাতেই তাঁহার লেখা পুথি পাওয়া যায়।

৩৮৫/৩৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থ্রেস দেশের স্ট্যাগাইরা নগরীতে আরিস্তোতলের জন্ম। ইঁহার পিতা নিকোম্যাকাস ম্যাসিডনের রাজদরবারে প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। মাত্র সতর বৎসর বয়সে আরিস্তোতল প্লেটোর আকাদেমিতে যোগ দেন এবং ২০ বৎসর কাল এখানেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর ৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি আকাদেমি ত্যাগ করিয়া রাজা হারমিয়াসের রাজ-সভায় আশ্রয় নেন এবং উক্ত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে (মতান্তরে পালিতা কন্যাকে) বিবাহ করেন। ৩৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আরিস্তোতল সম্রাট্ ফিলিপের আমন্ত্রণে তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডারের (পরবর্তী কালের বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী) শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ম্যাসিডনে আসেন। ইহারও প্রায় ৯ বৎসর পরে আলেকজাণ্ডারের সহিত মতবিরোধ হওয়ায় আরিস্তোতল পুনরায় অ্যাথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাইসিয়াম নামক স্থানে তাঁহার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এক অধ্যাপনাকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন (৩৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এক অর্থে এই কেন্দ্রটিই আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি সংস্করণ। এই সময়েই আরিস্তোতল তাঁহার যত গুরুত্বপূর্ণ লেখা সমাপ্ত করেন।

ইতিমধ্যে অ্যাথেন্সে ম্যাসিডন-বিরোধী মনোভাব ক্রমে প্রকট হইতে থাকে। ম্যাসিডন-দরবারের সহিত একদা তাঁহার সংস্রব ছিল বলিয়া অ্যাথেন্সবাসীর রোষের কারণ হইতে পারেন, এ আশঙ্কায় আরিস্তোতল তাঁহার টোল ছাড়িয়া আবার চ্যালসিসে পলায়ন করেন (৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন (৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

আরিস্তোতলকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের, বিশেষ করিয়া গ্রীক দর্শনের, পূর্ণ প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। গণিতে উৎসাহের ফলে তদানীন্তন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশুদ্ধ-চিন্তা-রূপ (ফর্ম অফ থট্) চর্চায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। রূপন্যায় (ফর্মাল লজিক) প্রাচ্যে কোনদিনই আলোচিত হয় নাই। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে দর্শনের প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক। যে-কোনও অভিব্যক্ত চিন্তাকে বিশ্লেষণ করিলে দুইটি ধারা স্পষ্টই ধরা পড়ে, যথা ১. বাক্যার্থ (কন্টেন্ট) ও ২. বাক্যভঙ্গী (ফর্ম)। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক এই বাক্যটি : 'মানুষ মরণশীল'। এই বাক্যে ১. মানুষ সম্বন্ধে, বা ঐ অর্থবিস্তারে জগৎ সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে। ইহাই বাক্যের উপাদান (ম্যাটার / কন্টেন্ট)। ২. এ বাক্য প্রকাশিত হইতেছে এক বিশেষ ভঙ্গীতে অর্থাৎ 'ক-সম্বন্ধ-খ' এই রূপে (উদ্দেশ্য-বিধেয় রূপে)। আবার বাক্যের উপাদান এক রাখিয়া রূপ-পর্যায় পরিবর্তিত করিলে অর্থ ভিন্ন হইবে, যথা : 'মরণশীলরা মানুষ'। তেমনই, উপাদান বদল করিয়া একই রূপে বিভিন্ন বাচ্যার্থ প্রকাশ করা যায়। সে ক্ষেত্রে এ দুই ধারাকে বিচ্ছিন্নরূপে চিন্তা করা অসম্ভব নয়। গ্রীক দর্শনের এই চিন্তাবৈশিষ্ট্য আরিস্তোতলকে ন্যায় ও বিশ্বদর্শনের নবনির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। উপাদান ও রূপ, চিন্তার এই দুই ধারা তাঁহার সমগ্র দর্শনকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে এই বিভাগকে বলা যায় তাঁহার দার্শনিক চিন্তার মূল ধর্ম।

উপাদান স্বাধীনভাবে অর্থপ্রকাশে অক্ষম, রূপই তাহাকে অর্থদান করে। অতএব সার্থকতাবিচারে রূপ-প্রাধান্য মানিতেই হয়, আরিস্তোতলের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। রূপ যেন চিন্তা-সারথি, তাহারই প্রকৃত সক্রিয়তা থাকিতে পারে। একটি মৃৎপিণ্ড বিশেষরূপে রূপায়িত হইলে তবেই অর্থবান হয়। অবশ্য জড় ও জগৎ এই দুই লইয়াই পূর্ণ। একটিকে ছাড়া অপরটিকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। এই আলোকে আরিস্তোতল তাঁহার পূর্বসূরী প্লেটোর প্রখ্যাত ভাবসত্তাবাদের তীব্র সমালোচনা করিলেন। প্লেটো বলিয়াছিলেন বস্তুজগতে 'বিশেষ' কখনও সত্য হইতে পারে না— কেননা উহাদের বৈশিষ্ট্য মূলতঃ জাতি-অনুস্যূত।

যা সত্য তাহা হইল বিষয়ের স্বরূপ। মানুষের স্বরূপ তাহার মনুষ্যত্ব, কুঠারের স্বরূপ কুঠারত্ব। অর্থাৎ কোনও বিষয়ের স্বরূপ তাহার সামান্যধর্ম, কেননা তাহা অপরিবর্তনীয়; এবং যাহা সত্য তাহা চিরন্তন, অর্থাৎ অব্যয়। অতএব সামান্যই সৎ বা মূল সত্য, বিশেষ তাহারই অসৎ প্রতিচ্ছবি। এই হইল প্লেটোর ভাবসত্তাবাদ।

ইহার বিরুদ্ধে আরিস্তোতলের বিখ্যাত সমালোচনা সংক্ষেপে এই: জাতি বা সামান্য, ব্যক্তি বা বিশেষ ছাড়া থাকিতে পারে না। ব্যক্তি যেমন জাতিধর্মে জ্ঞাতব্য, জাতিও সেইপ্রকার ব্যক্তিরূপে রূপায়িত। উপরন্তু আরিস্তোতলের মতে, প্লেটোর এই মত অনবস্থাদোষে (ইন্‌ফিনিট রিগ্রেস) দুষ্ট। যদি বিশেষ বিশেষ কুঠারের কুঠারত্ব এক কুঠার-সামান্যে আশ্রয়ী হয়, তাহা হইলে 'কুঠার-সামান্য' ও 'কুঠার-বিশেষে'র মধ্যে অপর এক 'পরা-কুঠার-সামান্য' থাকিতে হইবে এবং এইভাবে 'পরা-পরা…' ক্রমশঃ চলিতে থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, ভারতীয় ন্যায়দর্শনে এই আশঙ্কায় জাতি-বাধক ধর্মের মধ্যে জাতিত্বও উল্লিখিত আছে। অতএব আরিস্তোতলের মতে স্বরূপ ও সত্তাবিশেষ একাশ্রয়ী ও অবিচ্ছেদ্য। মাত্র এই নয়, তিনি আরও বলিলেন, এ দুই অভিন্ন। অতএব সামান্যের স্বাশ্রয়ী (সাবস্ট্যানশিয়াল) সত্তায় আরিস্তোতল অবিশ্বাস করিলেও প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপসত্তায় তিনি আস্থাবান। অর্থাৎ স্বরূপই বিশেষ-বিশেষ বস্তুর সত্তাপ্রদায়ক। যখন আমরা কোনও কিছু সৃষ্টি করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহার রূপ বা উপাদান কোনটাই সৃষ্টি করি না, তাহাদের একাশ্রয়ী করি মাত্র। এ কথা অবশ্য মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে আরিস্তোতল প্লেটোর ভাবসত্তা (ইউনিভার্সাল / আইডিয়া) না মানিলেও রূপসত্তা মানিয়া লইয়া একই ধরনের চিন্তা-বিচ্যুতি ঘটাইলেন। যাহা হউক, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে আরিস্তোতলের রূপ সর্বত্র আকার অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়। ছুরি বা কুঠার, এই সকল ক্ষেত্রে অবশ্য রূপকে আকার অর্থেই নিতে হইবে; কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মা হইল রূপ আর দেহ হইল উপাদান। এ ক্ষেত্রে রূপ সক্রিয় ঐক্যের কারণ হিসাবে পরিগ্রাহ্য। আরিস্তোতলের মতে যেহেতু রূপ সত্তাবান ও স্বাশ্রয়ী অতএব যে পদার্থ যত অধিক পরিমাণে রূপময়, তাহা তত অধিক সত্য। উপাদান নিষ্ক্রিয়— রূপই তাহাকে ক্রিয়াশীল করে। অতএব যাহা পূর্ণভাবে সক্রিয় তাহাকে রূপমাত্র হইতেই হইবে। ঈশ্বর সর্বক্রিয়, অতএব তিনিও রূপমাত্র। আরিস্তোতলের দর্শন, নীতি ও পদার্থবিদ্যায় ঈশ্বরই মূলাধার, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বর সব কিছুর কারণ— তিনি নিজে আর কার্য হইতে পারেন না। তিনি অনাদি, অনন্ত, স্বয়ংক্রিয় ও রূপসর্বস্ব। এই দার্শনিকের মতে কারণ চার প্রকার: ১. উপাদান-কারণ (মেটেরিয়াল), যেমন ঘটের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা, ২ রূপ-কারণ (ফর্মাল), যেমন ঘটের ঘটাকার, ৩. সাধক-কারণ (ইফিশেণ্ট), যেমন ঘটকারের দণ্ড-সংযোগ, ৪. নিমিত্ত-কারণ (ফাইনাল), কুম্ভকারের ঘট-লক্ষ্য। পদার্থজগতে এই নানা কারণের মেলা। তার মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরই যুগপৎ রূপ, সাধক ও নিমিত্ত-কারণ। যিনি ঈশ্বর তিনি রূপসর্বস্ব, অতএব চিৎ-মাত্র— সব কিছুর হেতু এবং সেই সর্ব-ঘটন-সাধকেই সব কিছু আশ্রয় অন্বেষণ করে। আর এই অর্থে জগৎ প্রগতিশীল, উৎকর্ষের পথে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সমতা লাভ করিবে, সে অবশ্যই তাহার ব্যক্তিরূপ হারাইবে, ঈশ্বরের রূপাশ্রয়ী হইয়া সে অমর।

আরিস্তোতলের পদার্থবিদ্যাও এই রূপ ও উপাদানের বিভেদ-পরিকল্পনায় প্রভাবিত। পরিবর্তনশীল বিশ্বজগৎ উপাদানময়; উপাদান প্রধানতঃ রূপাশ্রয়ী; যাহার রূপ নাই সে রূপান্বেষণে চঞ্চল। উপাদান ও রূপের এই যাতায়াতের জন্যই প্রকৃতি 'জগৎ' (গমনশীল)। এই চাঞ্চল্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অতএব নিরুদ্দেশ কার্য-কারণ বা সাংগঠনিক কারণত্বে (মেকানিক্যাল কজ্) আরিস্তোতলের অনাস্থা। এ অর্থে, আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট তাঁহার পদার্থবিদ্যা একেবারেই অগ্রাহ্য। প্রকৃতি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও, উদ্দেশ্যসচেতন নয়। আরিস্তোতলের ব্যাখ্যা অনুসারে কোনও বস্তুর স্বরূপ-সম্ভাবনার (পোটেন্‌শিয়াল এসেন্স) বাস্তবে রূপায়ণই হইল গতি (মোশন) —অর্থাৎ গতি হইল উপাদানের রূপ-পরিগ্রহণ।

দেশ (স্পেস) সদাই পূর্ণ— কোথাও শূন্য নাই। কাল হইল গতির গণনা। অর্থাৎ সময়সম্বন্ধীয় বাক্যমাত্রই সংখ্যাসূচক, পরিগণনীয় ক্ষণসমষ্টি।

আরিস্তোতল ছিলেন সত্তা-ক্রমে বিশ্বাসী। এই ক্রম-বিচারের এক মূল্যমানও তিনি দিলেন; ফলে সত্তা (ফ্যাক্ট) ও মূল্যায়ন অঙ্গাঙ্গী হইয়া থাকিল। যে বস্তু যত বেশি সংগঠিত, তাহা তত বেশি রূপসমন্বিত এবং সেই কারণেই তত বেশি সক্রিয়। আবার ক্রিয়ামাত্রই যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক, অতএব যাহা যত অধিক সক্রিয় তাহা তত অধিক পরিমাণে উদ্দেশ্যলাভে সক্ষম, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তত অধিক মূল্যবান। প্রকৃতিরাজ্যে এই অন্তর্নিহিত মূল্যায়ন মানিয়া লওয়ায় আরিস্তোতলের পক্ষে বিশ্বে বিবর্তন (ইভল্যুশন) স্বীকার করাও সহজ হইয়াছিল।

জ্যোতির্জগৎ সম্বন্ধে আরিস্তোতলের মতামত প্রায় রূপকথার মতই অবৈজ্ঞানিক ও অবিশ্বাস্য।

ন্যায়ে তাঁহার বক্তব্য আজও সশ্রদ্ধ পঠনের দাবি রাখে, যদিও তাহা সর্বস্বীকৃত নহে। ন্যায়েও তিনি রূপ-প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। তাঁহার মতে, বাক্যের সত্যাসত্য-বিচার বহুলাংশে সহজ ও সঠিক হয় রূপ-যাথার্থ্য বিচারে। অনুমানের যে সঠিক ও বৈধ রূপ তিনি মানিলেন তাহা আজও আমাদের পরিচিত ও অন্যতম ন্যায়পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। যদিও আরিস্তোতলের ত্রুটি ঘটিল অন্যতম রূপকে একতম ভাবায়। এই ন্যায়পদ্ধতি বা ন্যায়রূপ হইল সিলজিজ্‌ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

সমস্ত মানুষ মরণশীল
রাম একজন মানুষ
সুতরাং, রাম মরণশীল।

এইপ্রকার অনুমানের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই রূপকে একতম রূপ মানিলেই যে কোনও ন্যায় অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইতে বাধ্য। আধুনিক ন্যায়ে তাই আঙ্গিক বৈচিত্র্য মানা হয় এবং এজন্য আরিস্তোতলের ন্যায়ের মূল্য এখন অনেকখানি অস্বীকৃত। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে আরিস্তোতল-প্রবর্তিত রূপবিচারের আগ্রহ পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রকে নবতর বিস্তারের পথেই লইয়া গিয়াছে। এই অর্থে আরিস্তোতল ন্যায়শাস্ত্রের এক প্রভাবশালী পথিকৃৎ।

নীতিধর্মে তাঁহার মত কিঞ্চিৎ মহামানবপন্থী মনে হইতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে তিনিই প্রখ্যাত 'মধ্যম পন্থা'র (গোল্ডেন মীন) প্রতিষ্ঠাতা। আদর্শ ধর্ম আর কিছুই নয়— দুই আত্যন্তিক বিরোধী ধর্মের মধ্যবর্তী পথ। যে কোনও বৃত্তিরই ঐকান্তিকতা অবৈধ। সর্বাপেক্ষা মহান ধর্ম ন্যায়পরায়ণতা। আরিস্তোতলের মতে আদর্শ মানব হইবে স্বনির্ভর, জ্ঞানী ও বুদ্ধিধর্মী। জ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম। অজ্ঞানই অধার্মিকতার জনক। সঠিক বিচারের উপর নির্ভরশীল যে ন্যায়পরায়ণতা, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই নৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে— কোনও ব্যক্তির নির্জন ও নিঃসঙ্গ মনোরাজ্যে নয়। আর আরিস্তোতলের গুণবর্ণনায় জ্ঞানের প্রাধান্য-স্বীকৃতি দেখিয়া ইহাও মনে হয় যে আদর্শ মানব হওয়া সকলের পক্ষে নয়, মাত্র কতিপয়ের পক্ষেই সম্ভব।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আরিস্তোতলের সাম্প্রতিক মূল্য না থাকিলেও ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। তদানীন্তন গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা হুবহু ধরা পড়িয়াছে তাঁহার রাষ্ট্রনীতি গ্রন্থে। তাঁহার মতে রাষ্ট্র কেবল ব্যক্তিগত সঙ্গস্পৃহাজন্যই নয়— আদর্শ কর্মানুপ্রেরণা দানেরও উৎস। সমাজের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি রাষ্ট্র, কল্যাণকারিতাই ইহার আদর্শ। সময়ের দিক দিয়া অবশ্য পরিবার রাষ্ট্রের পূর্বসূরী। স্ত্রী ও পুরুষ, প্রভু ও দাস, এই দ্বিবিধ সম্বন্ধের দ্বারা পরিবার নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র যদিও পরিবারের পরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তথাপি পূর্ণতাবিচারে রাষ্ট্রের কথাই ভাবিতে হইবে সর্বাগ্রে। অর্থাৎ সমাজজীবনের উদ্দেশ্য বিচার করিতে গেলে রাষ্ট্রসত্তাই সর্বদা মানিয়া নিতে হয়। প্রাণী যেরূপ বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের নায়ক— সমাজ বা ব্যক্তিও সেইরূপ রাষ্ট্রীয় অঙ্গ হিসাবে অর্থবান। আরিস্তোতল ছিলেন মানুষের উৎকর্ষ-অসাম্যে বিশ্বাসী। কিছুসংখ্যক লোক স্বভাবতঃই গুণবিচারে হীন; তাহাদের দাসরূপে গণ্য করা যথাযোগ্য ও স্বাভাবিক। তাই তিনি ছিলেন প্লেটোর সাম্যবাদী রাষ্ট্রের বিরোধী। এ ধরনের সাম্য-প্রচার তাঁহার মতে রাষ্ট্রকে দুর্নীতিপরায়ণ, অলস ও পঙ্গু করিয়া দেয়। পরিবারপ্রথা এতই স্বাভাবিক, মানুষে মানুষে ভেদও এতই গভীর, যে তাহাদের অস্বীকার করিয়া কোনও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না।

যাহা নিজের অপেক্ষা সমাজের কল্যাণচেষ্টায় অধিকতর নিয়োজিত থাকে, তাহাই হইবে আদর্শ রাষ্ট্র। এই দার্শনিকের মতে রাষ্ট্ররূপ তিন প্রকার: ১. রাজতন্ত্র (মনার্কি), ২. অভিজাততন্ত্র (অ্যারিস্টক্রেসি), ৩. সাধারণতন্ত্র (কনস্টিট্যুশনাল গভর্নমেণ্ট অথবা পলিটি)। এই তিন প্রকারের বিকৃত রূপ যথাক্রমে: ১. স্বৈরাচার (টিরানি), ২. সামন্ততন্ত্র (অলিগার্কি) ও ৩. গণতন্ত্র (ডিমক্রেসি)। রাজতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট; তারপর অভিজাত-তন্ত্র; তাহারও পরে সাধারণতন্ত্র। বিকৃতির ক্রমও এই রকম। যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহার বিকার হইবে সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। অতএব কার্যতঃ মধ্যপথ অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রই শ্রেয়।

বিপ্লব রোধ সম্পর্কে আরিস্তোতলের উপদেশ অতি সারবান। এই তিন প্রকার কার্যের দ্বারা অসন্তোষ ও বিপ্লব রোধ করা যায়: ১. শিক্ষার প্রসার ও প্রচার, ২. প্রচলিত বিধির প্রতি শ্রদ্ধা, ৩. বিচার ও আইন প্রয়োগে পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা।

নন্দনতত্ত্বে আরিস্তোতলের বক্তব্য প্রাথমিক ধরনের হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ মনে হইতে পারে। তাঁহার মতে শিল্প দুই প্রকার: ১. প্রয়োজনীয় (ইউজ্‌ফুল) এবং অনুকৃতিশীল (ইমিটেটিভ)। দ্বিতীয় প্রকার শিল্পের উদ্দেশ্য হইল আবেগময় উত্তেজনার লাঘব (ক্যাথার্‌সিস্‌)।

সর্বশেষে, এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে আরিস্তোতলের মূল ত্রুটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রকৃতির প্রধান সত্যের

মর্যাদা দেওয়ায়। অর্থাৎ, আর্যভাষার উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্বন্ধ চিন্তাধারাকে তিনি প্রাকৃতিক সত্যের নির্ধারক মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা এই যে তিনি উপাদান ও রূপ এই দুই ধারাকে সার্বিক স্বীকৃতি দিয়াছেন ও রূপের স্বয়ংক্রিয়তা মানিয়া লইয়াছেন। তবে আধুনিক দর্শন তাঁহার যতই সমালোচনা করুক, তৎকালীন বিচারে আরিস্তোতলকে মহত্তম দার্শনিক প্রতিভা বলিলে অন্যায় হয় না।

দ্র B. Russell, *History of Western Philosophy*, London, 1946 ; D. J. Allan, *Philosophy of Aristotle*, Oxford, 1952 ; F. Ueberweg, *History of Philosophy*, London, 1880 ; A. E. Taylor, *Aristotle*, London, 1943 ; F. Zeller, *Aristotle and the Earlier Peripatetics*, 1897.

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আরিস্তোফানেস, অ্যারিস্টোফেনিস (৪৪৫-৩৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীক নাট্যকার। ৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্স নগরীতে ইঁহার জন্ম। অ্যাথেন্সের সমৃদ্ধি এবং স্পার্টার কাছে পরাজয়ের পর উহার পতন (৪০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এ দুই-ই তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আবার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সূত্রপাতে যখন নগরীটির পুনরুদ্ধার হয়, তখনও আরিস্তোফানেস জীবিত।

আরিস্তোফানেসের সময়ে মানবপ্রকৃতির ত্রুটি বা দুর্বলতাই অ্যাথেনীয় কমেডির মূল বিষয় ছিল না। সে সময়ে কমেডি ছিল লঘু কল্পনায় ভরা, চটুল ও বাক্‌চাতুর্যময়, প্রগল্‌ভ ও বিদ্রূপপূর্ণ। সমকালীন রাজনীতি এবং জনমতের সমালোচনাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। চরিত্রায়ণে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে ইহার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ছিল যে কোনও নব্য প্রথার বিরুদ্ধাচরণে। ইহার মধ্য দিয়া নূতন ফ্যাশন বা নূতন নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রূপ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য জনতার অসন্তোষ ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া এই কমেডিগুলি যেন বিরোধীদলের মুখপাত্র-স্বরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই নূতন শিল্পাঙ্গিকের প্রতি ইহার এক ধরনের প্রতিকূলতা গড়িয়া উঠে। ইউরিপিদিসও আরিস্তোফানেসের অন্ততঃ দুইখানি নাটকে তীব্রভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

'প্রাচীন কমেডি' নামে চিহ্নিত কমেডির ধারায় আরিস্তোফানেসই ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সাধারণের যোগ্য প্রহসন রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রথম নাটক লেখেন। জনজীবনে তাঁহার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার উচ্চাশা ছিল। পদাধিকার বা বাগ্মিতার দ্বারা নয়, এ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন নাটকের ক্ষমাহীন শাণিত আক্রমণের মধ্য দিয়া। সেনাবাহিনীর প্রধানগণ, পেরিক্লেস বা ক্লেওন, সেনেট, জনতার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা— কিছুই তাঁহার ঐ আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এইভাবে তাঁহার নাটকের অনেকটাই ছিল ব্যঙ্গচিত্র, তাঁহার দর্শকেরাও তাহা জানিত। তাৎক্ষণিকের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে বলিয়াই তিনি অতীতের প্রশস্তি করেন, ঈস্কাইলাসের সমর্থনে ইউরিপিদিসকে অবজ্ঞা করেন। কোনও নীতি বা সূত্রের উদ্ভাবনে নহে, তাঁহার সংশয়ী মনের আকর্ষণ ছিল কেবল বিদ্রূপ সৃষ্টিতে।

আরিস্তোফানেস-রচিত কমেডির সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক। তন্মধ্যে এইগুলি এখনও পাওয়া যায়: 'আখার্নেস' (আখার্ন্‌বাসী), 'হিপ্‌পেস' (যোদ্ধা), 'নেফেলায়' (মেঘ), 'স্ফেকেস' (পতঙ্গ), 'আইরেনে' (শান্তি), 'ওর্নিথেস' (বিহঙ্গ), 'বাত্রাখোই' (ভেক), 'থেস্মফরিয়াজুসায়' 'এক্‌ক্লেসিয়াজুসায়' 'লুসিস্ত্রাতে' 'প্লুতস্'।

রবেয়ার আঁতোয়ান্

আরুণি পঞ্চালের প্রখ্যাত ঋষি। ঋষি গোতমের বংশে ঋষি উপবেশির পৌত্র ও অরুণের পুত্র আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আয়োদ-ধৌম্য ঋষির শিষ্য এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। ইঁহার পুত্র শ্বেতকেতু ও পৌত্র নচিকেতার নাম উপনিষদে বিখ্যাত। আরুণির দার্শনিক মতবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। বিখ্যাত উপনিষদ্-বাক্য 'তত্ত্বমসি' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আত্মাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। আরুণি তাঁহার গুরুভক্তির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরুর আদেশে বেতের আল বাঁধিতে গিয়া জলের বেগ নিবারণে অসমর্থ হওয়ায় তিনি আলের মুখে নিজ দেহ স্থাপন করিয়া জলস্রোত রোধ করেন। গুরুর আহ্বানে আল বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়া আসিলে গুরু প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখেন উদ্দালক। গুরুর বরে সমগ্র বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

দ্র মহাভারত, আদি পর্ব, তৃতীয় অধ্যায়; কাঠক সংহিতা, ১৩।১২ ; ঐতরেয় আরণ্যক, ২।৪।১।

সংযুক্তা গুপ্ত

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

পাদে ভারতীয় প্রত্নসম্পদ সর্বপ্রথম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সাহিত্যরথী স্যামুয়েল জনসন পত্রযোগে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রাচ্য জগতের ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রত্নকীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার দশ বৎসর পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের প্রণোদনায় ও পরিচালনায় কলিকাতায় বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল এশিয়ার ইতিহাস, প্রত্নবস্তু, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুসংবদ্ধ অনুশীলন। সংস্থাটি স্থাপিত হইবার ফলে এশিয়াবিষয়ক জ্ঞানার্জনে প্রভূত অনুসন্ধিৎসা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই বৎসরই আবার চার্লস উইলকিন্‌স সে যুগের অবোধ্য, গুপ্ত ও কুটিল লিপির পাঠোদ্ধারপন্থা প্রদর্শন করেন। হোরেস হেম্যান উইলসন আফগানিস্তানে প্রশংসনীয়ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলনকার্য পরিচালনা করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির কর্মীবৃন্দের সংগৃহীত বস্তুরাজি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণের জন্য একটি সংগ্রহালয়ের পত্তন হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সারগর্ভ কার্য সাধিত হয় সত্য, তবে অতীত নিদর্শনের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা অর্থে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা সোসাইটির বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্যে অল্পই স্থান পাইত। প্রত্নকীর্তি (মনুমেণ্ট) বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সীমাবদ্ধ কার্যটিও অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসৃত হইত না।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফ্র্যান্সিস বুকানন-হ্যামিল্‌টনের উপর মহীশূর পর্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। বঙ্গদেশের ভূ-সংস্থান, ইতিহাস ও প্রত্নবস্তুরাজি পর্যবেক্ষণের জন্য ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার বুকানন-হ্যামিল্‌টনকে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী আট বৎসর ব্যাপিয়া বুকানন-হ্যামিল্‌টন দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, বিহার, শাহাবাদ এবং গোরক্ষপুর জেলার বিবরণ সংগ্রহ করেন।

১৮২৯ হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থাপত্যকীর্তি বিষয়ে অক্লান্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা জেম্‌স ফার্গুসন প্রত্নকীর্তিসমূহকে রূপ ও রীতি অনুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাঁকশালের ধাতু-পরীক্ষক জেম্‌স প্রিন্সেপ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতীয় প্রাচীন লেখের রহস্য উন্মোচন করিলেন। ইহার ফলে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের লেখরাজির পাঠোদ্ধার সম্ভব হইল এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সন-তারিখ -সংবলিত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

বুকানন-হ্যামিল্‌টনের নিয়োগ এবং বিক্ষিপ্তভাবে আগ্রা ও দিল্লীর প্রত্নকীর্তিগুলির ক্বচিৎ সংস্কারসাধন ছাড়া এই পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে সরকারের বিশেষ কোনও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটান আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম। সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এই প্রত্নতাত্ত্বিক লর্ড ক্যানিংকে বুঝাইলেন যে দেশে অন্বেষণকার্য সুপরিকল্পিত-ভাবে পরিচালনা করা একান্তই প্রয়োজন। ইহার ফলেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। কানিংহ্যাম উহার সার্ভেয়র পদে নিযুক্ত হন। দেশের পুরাকীর্তি ও ইহার ভগ্নাবশেষ সম্পর্কে সরকার এই প্রথম প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনও প্রত্নকীর্তি-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও জীর্ণোদ্ধার এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-তালিকাভুক্ত হয় নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও হিউএন্‌-ৎসাঙের বিবরণী অনুসরণ করিয়া কানিংহ্যাম নভেম্বর ১৮৬১ হইতে জানুয়ারি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এতৎসত্ত্বেও সরকার কোনও অজ্ঞাত কারণে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগটি তুলিয়া দিলেন।

প্রত্নকীর্তিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য -সমূহের প্রতিকৃতি নির্মাণ বিষয়ে পরবর্তী পাঁচ বৎসরে কিছু দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভারতসচিব লর্ড আরগাইল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে অধিকতর সারগর্ভ কার্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং একমাত্র কেন্দ্রীয় বিভাগ দ্বারাই যে ইহা সম্ভবপর তাহাও উপলব্ধি করেন। ইহারই ফলস্বরূপ, 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ' সংস্থা পুনরুজ্জীবিত হইল এবং কানিংহ্যাম মহাধিকর্তা (ডিরেক্টর-জেনারেল) রূপে নিযুক্ত হইলেন ১৮৭১ সালে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইটি (পরে তিনটি) সহায়ক পদেরও সৃষ্টি হইল।

এই সময় হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর সহকারীদের সঙ্গে লইয়া কানিংহ্যাম উত্তর ও পূর্ব ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন করেন এবং অজস্র মুদ্রা, লেখ, ভাস্কর্যকৃতি এবং অপরাপর পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, সঙ্কিশা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন নগরীর অবস্থানও তিনি নির্ণয় করিলেন। বৌদ্ধযুগের বহু ধর্মস্থান পুনরুদ্ধার এবং তিগোওয়া, কুথেরা, দেওগড় প্রভৃতি স্থানের মন্দির বিশ্লেষণ করিয়া গুপ্তযুগের স্থাপত্যরীতির স্বরূপ নির্ণয় তাঁহার কীর্তি।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

কয়েকটি বৌদ্ধ কেন্দ্রে তিনি খননকার্যও আংশিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কানিংহ্যামের পর্যবেক্ষণ উত্তর ও পূর্ব ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম ভারতে ইহার প্রসারের জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স বার্জেসের তত্ত্বাবধানে 'পশ্চিম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ' সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'দক্ষিণ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণে'র সৃষ্টি হইলে তাহারও ভার অর্পিত হইল বার্জেসের উপর।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শীর্ষ সরকার (সুপ্রিম গভর্নমেণ্ট) স্থানীয় সরকারগুলিকে (লোক্যাল গভর্নমেণ্টস) পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন। ১৮৭৮ সালে গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিটন উপলব্ধি করেন যে প্রত্নকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে অধিকতর সংগতিসম্পন্ন শীর্ষ সরকারের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। ফলে ১৮৮১ সালে প্রত্নকীর্তির কিউরেটর (রক্ষক) পদে নিযুক্ত হইলেন এইচ. এইচ. কোল। পরবর্তী দুই বৎসর কোলের কাজ সন্তোষজনক হইলেও ১৮৮৩ সালে পদটি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্নকীর্তির দায়িত্ব পুনরায় স্থানীয় সরকারগুলির উপরই অর্পিত হয়।

লেখ-সংগ্রহ ও তাহাদের অর্থোদ্ঘাটনের প্রতি কানিংহ্যাম বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। সংগৃহীত লেখরাজিকে রাজবংশানুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে তিনি উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন কেথফুল ফ্লীটকে তিন বৎসরের জন্য সরকারি লেখতত্ত্ববিদ্ (গভর্নমেণ্ট এপিগ্রাফিস্ট) পদে নিয়োগ করা হইল। ১৮৮৬ অব্দে ই. হুল্‌ৎস্ দক্ষিণ ভারতের লেখতত্ত্ববিদ্‌রূপে সরকারি কার্যে যোগদান করিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহ্যাম অবসর গ্রহণ করেন এবং পর বৎসর মহাধিকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন জেম্‌স বার্জেস। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে বার্জেসের উপর থাকায় এবং পূর্ব ও উত্তর ভারতে তিন জন স্থানীয় পর্যবেক্ষক (সার্ভেয়র) থাকায় মহাধিকর্তার কার্যাবলী বিকেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। তিন বৎসর পরে বার্জেসের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সরকার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে না রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এইভাবে স্থানীয় সরকারসমূহের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হইবার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের অগ্রগতি প্রায় রুদ্ধ হইল।

১৮৯৮ সালে সরকার আবার স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলেন। ১৮৯৯ সালে প্রত্নকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি মণ্ডলে (সার্কল) বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলে একজন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়র) নিযুক্ত করা হইল। স্থানীয় সরকারের অধীন থাকিয়া প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাঁহার মণ্ডলের অন্তঃস্থ মুখ্যতম কর্মচারী হিসাবে কার্য পরিচালনা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। হুল্‌ৎস্‌কে দক্ষিণ ভারতের লেখতত্ত্ববিদ্‌রূপে কার্য চালাইতে অনুমতি দেওয়া হইল। এই পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের জন্য অনুমোদিত হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন লর্ড কার্জন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে ভারতের প্রত্নতত্ত্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে প্রায় সকল প্রাদেশিক সরকারের উদাসীনতা, ইহার কুফলস্বরূপ প্রত্নকীর্তির বিনষ্টি এবং জীর্ণসংস্কার ক্ষেত্রে নীতি ও ঐক্যের অভাব কার্জন অবিলম্বে উপলব্ধি করিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি) তিনি ঘোষণা করিলেন, 'গবেষণার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এবং লেখতত্ত্বকে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় মনে করিয়া যেমন লেখতত্ত্বকে গবেষণার পশ্চাতে রাখা উচিত হইবে না, তেমনই গবেষণাকেও জীর্ণসংস্কারের পিছনে ফেলিয়া রাখা সংগত নহে। আমার মতে, খনন করা ও আবিষ্কার করা, শ্রেণীবিন্যাস করা, নকশাচিত্রের সাহায্যে প্রদীপিত করা— এ সমস্তই সমানভাবে অবশ্যকরণীয়।' স্পষ্টই, প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল সর্বাত্মক— অর্থাৎ একাধারে খনন, অন্বেষণ, গবেষণা, লেখতত্ত্ব, প্রকাশনা এবং জীর্ণসংস্কার ও মেরামতির মাধ্যমে পুরাকীর্তিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ। প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহী কার্জন প্রত্নতাত্ত্বিক কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বার্ষিক একলক্ষ টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহারই প্রস্তাবমত মহাধিকর্তার পদটি পুনরুজ্জীবিত করা হইল। পুনর্গঠিত এই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণার প্রথম মহাধিকর্তারূপে ভারতে আসিলেন (১৯০২ খ্রী) ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক জন্ মার্শাল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মার্শাল দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যাবলীর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় অসামান্য সাফল্যলাভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দিল্লী, আগ্রা, এবং অন্যান্য স্থানের বিশিষ্ট পুরাকীর্তিগুলির জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইল এবং সংগ্রহালয়ের কার্যেও নব উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। ১৯০৪ সালে প্রত্নকীর্তি সংরক্ষণ (এন্‌শেণ্ট মনুমেণ্টস

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্নকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে খননকার্যের নিয়ন্ত্রণ, পুরাকালীন শিল্পদ্রব্য ও ঐতিহাসিক বস্তুসম্ভারের সংরক্ষণ ও প্রয়োজনবোধে উহার ক্রয় অথবা অধিকার অর্জন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য পাঁচটি মণ্ডল অনুমোদিত হইয়াছিল। মার্শাল 'পর্যবেক্ষণ' বিভাগটিকে চিরস্থায়ী করিবার দাবি করিলেন। কারণ তাঁহার মতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্মচারীদের কার্যাবলীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে তাহা অন্য কোনও সংস্থা দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যদি সরকার দেশের পুরাকীর্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করেন, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই এই বিভাগের অস্তিত্ব বিলোপ করা যাইতে পারে। ১৯০৬ সালে বিভাগটি স্থায়ী রূপে পরিগণিত হইল। ছয়টি মণ্ডলে সমগ্র ভারতবর্ষ (ব্রহ্ম দেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; ছিল না মহীশূর, কারণ এই রাজ্যটির নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠান ছিল) বিভক্ত হইল।

স্থায়িত্বের মর্যাদা লাভ করিয়া এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপ্রণালীর দ্বারা পরিচালিত হইবার সুযোগ পাইয়া এই সংস্থাটি অধিকতর উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত স্বীয় কর্তব্যে ব্রতী হইল। শত শত প্রত্নকীর্তি ও প্রত্নস্থল সংরক্ষিত (প্রোটেক্টেড) বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় সেগুলি প্রত্নকীর্তি-সংরক্ষণ আইনের আওতায় আসিল।

সংস্থার কর্মীবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্-সম্মেলনে এ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হওয়ায় পর বৎসর সরকার সুযোগ্য ভারতীয়দেরও প্রত্নতত্ত্ববিভাগে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ম হইল যে বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন হইবে ইওরোপীয় এবং অবশিষ্টাংশ ভারতীয়। এই নীতিও পরে অচল হয় এবং বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন (গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯) অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব কেন্দ্রীয় বিষয়ভুক্ত হয় ; ফলে বিভাগটি পরিপূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সংস্থায় পরিণত হইল। তবে 'প্রত্নকীর্তি-সংরক্ষণ' আইন অনুসারে পুরাকীর্তি ও প্রত্নস্থলসমূহকে সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার তখনও প্রাদেশিক সরকারের হাতেই থাকিল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন (গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫) অনুসারে এই ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলিয়া আসে।

মার্শাল বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন খননকার্যে। ফলে ১৯২০ সালের মধ্যে সারনাথ, রাজগির, সাঁচী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, নালন্দা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশ কয়েকটি প্রত্নস্থলে বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। প্রাচীন নগরের সন্ধানে পাটনা, এলাহাবাদের নিকটবর্তী ভীটা এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশিলাতে ব্যাপকভাবে খননকার্য চলিতে থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের হরপ্পায় ব্রোঞ্জ-যুগের সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইল। ঐ বৎসরই হরপ্পায় এবং পরবর্তী বৎসর সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জো-দড়োতে খননকার্য শুরু হয়। কয়েক বৎসর ব্যাপী খননের ফলে এখানে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের দুইটি নগরের ধ্বংসাবশেষ এবং আনুষঙ্গিক প্রত্নবস্তুরাজি পাওয়া গেল।

ক্রমবর্ধমান খনন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য ১৯২৬ সালে 'অন্বেষণ' শাখাটির (এক্সপ্লোরেশন ব্রাঞ্চ) সৃষ্টি হয়। ১৯২৮ সালে মার্শাল অবসর গ্রহণ করিলেন। তিন বৎসর পরে দেশে এক অর্থ-সংকট দেখা দেয়। ফলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অন্বেষণ শাখাটির লোপ করা হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, অন্বেষণ এবং খনন এই উভয়বিধ কার্যের নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উপদেষ্টা হিসাবে আহূত হন ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যর লেনার্ড উলী। প্রাচীন পদ্ধতিতে খনন-প্রকরণ ও অনুসৃত অপরাপর নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। কারণ এই সময় পর্যন্ত সুগভীর খননের দ্বারা সংস্কৃতিসমূহের পৌর্বাপর্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা হয় নাই এবং খননস্থল নির্বাচনেও সুসংগত পরিকল্পনার একান্তই অভাব ছিল। এই কারণেই দেশের অনেক অংশের প্রত্নতত্ত্ব তমসাবৃত থাকিয়া গিয়াছিল।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চার বৎসরের জন্য মহাধিকর্তা-রূপে অধিষ্ঠিত হন রবার্ট এরিক মর্টিমার হুইলার। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভাগটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মণ্ডল ও সংগ্রহালয়ের পুনর্বিন্যাস করিলেন এবং তক্ষশিলা, পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকামেডু, হরপ্পা ও মহীশূর রাজ্যের ব্রহ্মগিরিতে তৎপরিচালিত খননকার্যের মাধ্যমে বিভাগীয় ও বহিরাগত কর্মীদের আধুনিক খনন-পদ্ধতিতেও শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সংবিধানের (কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া) ফলে প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিষয়ভুক্ত ছিল ; কিন্তু এই অবস্থার খানিকটা রদ-বদল করিয়া এইরূপ বিধিব্যবস্থা করা হইল :

১. পার্লামেণ্ট কর্তৃক অথবা পার্লামেণ্ট দ্বারা প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী যে সব প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কীর্তি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল ও ধ্বংসাবশেষ জাতীয় গৌরব বলিয়া ঘোষিত হইবে, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকিবে।

২. প্রথমোক্ত শ্রেণীবহির্ভূত প্রাচীন কীর্তিরাজি রাজ্যসরকারের দায়িত্বে থাকিবে।

৩. প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল এবং ধ্বংসাবশেষের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই অধিকার থাকিবে।

১৯৫৯ সালে অনুরূপভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান প্রধান প্রত্নকীর্তির দায়িত্বও ভারতসরকার গ্রহণ করিলেন। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক একীকরণ এতদিনে পূর্ণতা লাভ করিল।

রাজ্যসরকার তাহাদের অধীন পুরাকীর্তি ও প্রত্নস্থলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য যাহাতে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সংস্থা স্থাপন করিতে পারেন, সংবিধানের কয়েকটি ধারায় তাহার বিধিও নির্দেশিত হইয়াছে। স্ব স্ব প্রত্নতত্ত্ববিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা প্রমুখ কতিপয় রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের বর্তমান সংস্থাপন ও কর্মপ্রণালী নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রীয় কার্যালয় নূতন দিল্লীতে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্বের মহাধিকর্তার (ডিরেক্টর-জেনারেল অফ আর্কিওলজি) সহায়করূপে রহিয়াছেন একজন সংযুক্ত মহাধিকর্তা (জয়েণ্ট ডিরেক্টর-জেনারেল), তিন জন উপ-মহাধিকর্তা (ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল), একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ার (আর্কিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার), একজন সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ার (অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আর্কিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং একজন সহ-অধীক্ষক (অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)। ব্যাবহারিক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর হইতে এই বিভাগ একটি প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন একজন অধিকর্তা (ডিরেক্টর)।

২. মোট দশটি মণ্ডল (সার্কল); প্রতিটি মণ্ডলেই একজন করিয়া অধীক্ষক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) ও সহ-অধীক্ষক (অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) আছেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি চক্রে এক বা একাধিক সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। চক্রগুলির ও তাহাদের মুখ্য কর্মস্থানের নাম এইরূপ: উত্তর-পশ্চিম মণ্ডল— দেরাদুন; উত্তর মণ্ডল— আগ্রা; মধ্য-পূর্ব মণ্ডল— পাটনা; পূর্ব মণ্ডল— কলিকাতা; দক্ষিণ-পূর্ব মণ্ডল— বিশাখপট্টনম্; দক্ষিণ মণ্ডল— মাদ্রাজ; দক্ষিণ-পশ্চিম মণ্ডল— ঔরঙ্গাবাদ; পশ্চিম মণ্ডল— বরোদা; মধ্য-মণ্ডল— ভূপাল; এবং সীমান্ত মণ্ডল (জম্মু ও কাশ্মীর; এই মণ্ডলে সহ-অধীক্ষক নাই)— শ্রীনগর। মণ্ডলের মুখ্য করণীয় বিষয় হইতেছে সম্পালন এবং জীর্ণোদ্ধার -পূর্বক পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণ; স্ব স্ব এলাকার অন্তর্গত সাধারণ ধরনের কার্যকলাপের দায়িত্ব ইঁহাদের। প্রয়োজনবোধে ইঁহারা প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও খননকার্য করিয়া থাকেন। গত বার বৎসরে মণ্ডলগুলি নিম্নলিখিত স্থানসমূহে উৎখননকার্য পরিচালনা করিয়াছেন: উত্তর-পশ্চিম মণ্ডল— নূতন দিল্লীর পুরাতন কেল্লা; দিল্লীর দুর্গাদি এবং যমুনা নদীর অববাহিকাস্থ আলমগীরপুর; উত্তর মণ্ডল— মথুরা ও আউধের অন্তর্গত শ্রাবস্তী; মধ্য-পূর্ব মণ্ডল বিহারের রাজগির; পূর্ব মণ্ডল— পশ্চিম বঙ্গের বীরভানপুর ও তমলুক এবং উড়িষ্যার জৌগড়, রত্নগিরি ও উদয়গিরি এবং নেপাল-তরাইয়ের কুদান ও তিলৌরাকোট; দক্ষিণ-পূর্ব মণ্ডল— অন্ধ্র প্রদেশের শালিহুণ্ডম্, ধরণীকোট ও কোট্টরু; দক্ষিণ মণ্ডল— মাদ্রাজের সানুর, পল্লবমেডু, অমির্থমঙ্গলম্ এবং কুম্নত্তুর; দক্ষিণ-পশ্চিম মণ্ডল — গোদাবরী অববাহিকাস্থ দাইমাবাদ, তাপ্তী অববাহিকায় বাহাল-তেকোয়াডা এবং প্রকাশ ও মহীশূরের মাস্কি; পশ্চিম মণ্ডল— গুজরাটের আম্রেলি, রংপুর, মোটা-মাচিয়ালা, লোথাল এবং নাগলে এবং সীমান্ত মণ্ডল— বুরজাহোম।

৩. একজন অধীক্ষকের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) অধীনে উৎখনন শাখাটি (এক্সক্যাভেশন্স ব্রাঞ্চ) নাগপুরে অবস্থিত। এই শাখাটি বৃহদায়তন খননকার্য পরিচালনা করে। হুইলারের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল খননক্রিয়াই এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরবর্তী কালে উড়িষ্যার শিশুপালগড়, উত্তরগাঙ্গেয় অববাহিকায় হস্তিনাপুর, শতদ্রুতীরবর্তী রূপড়, বারা ও সলৌরা, মালবের নাগদা ও উজ্জয়িনী, নাগপুরের সমীপবর্তী জুনাপানি এবং রাজস্থানের কালিবঙ্গা— এ সকল স্থানের খননকার্যও এই শাখা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে।

৪. উতকামণ্ডে অবস্থিত লেখতত্ত্ব শাখা (এপিগ্রাফি ব্রাঞ্চ) গঠিত হইয়াছে একজন সরকারি লেখতত্ত্ববিদ্, দুইজন অধীক্ষক এবং তিনজন সহ-অধীক্ষক লইয়া। এতদ্ব্যতীত আরবী ও পারসীক লেখের জন্য নাগপুরে একজন অধীক্ষক রহিয়াছেন। দেশের সর্বস্থান হইতে লেখ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্পাদনা ও প্রকাশ করাই এই

শাখার কাজ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতীত অধ্যায় উদ্ঘাটনে ইহার দান অপরিমেয়, কারণ লেখমালাকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান উপাদান বলিয়া গণ্য করা যায়।

৫. প্রত্নতাত্ত্বিক রাসায়নিকের (আর্কিওলজিক্যাল কেমিস্ট) অধীন রসায়ন শাখাটির অবস্থান দেরাদুনে। প্রত্নকীর্তি, ভাস্কর্যকলাকৃতি, চিত্র ও সংগ্রহালয়ের বস্তু-সম্ভারকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করা ও তত্ত্বাবধান করা এবং স্বকীয় ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করাই তাঁহার কার্য। ইঁহাকে সহায়তা করেন দুইজন সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক রাসায়নিক; ইঁহাদের মধ্যে একজন থাকেন দেরাদুনে এবং অপরজন হায়দরাবাদে। এই দুই জনের প্রত্যেকেরই অধীনে দুই জন করিয়া অবর প্রত্নতাত্ত্বিক রাসায়নিক রহিয়াছেন। দেরাদুন, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ ও ঔরঙ্গাবাদে ইঁহাদের অফিস।

৬. প্রাগিতিহাস শাখাটি (প্রিহিস্ট্রি ব্রাঞ্চ) নাগপুরে। এখানে একজন অধীক্ষক ও একজন সহ-অধীক্ষক রহিয়াছেন। প্রস্তর-যুগের প্রত্নতত্ত্বসম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা করাই এই শাখার মুখ্য কর্ম। ইহার অবস্থিতিকালের নাতিদীর্ঘ পরিসরে এই শাখা তাপ্তীর, বুন্দেলখণ্ডের নদীসমূহের এবং বিপাশা-বাণগঙ্গার অববাহিকাগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক অন্বেষণকার্য করিয়াছে।

৭. সংগ্রহালয় শাখার (মিউজিয়াম ব্রাঞ্চ) কার্য পরিচালনা করা হয় কলিকাতা হইতে। একজন অধীক্ষক ও একজন সহ-অধীক্ষকের উপর ইহার ভার ন্যস্ত। এই শাখার দায়িত্বে রহিয়াছে বিভাগীয় সংগ্রহালয়গুলি, যেমন দিল্লীর ফোর্ট মিউজিয়াম, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ মিউ-জিয়াম, শ্রীরঙ্গপট্টনমের টিপু সুলতান মিউজিয়াম এবং সার-নাথ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, সাঁচী, খজুরাহো, অমরাবতী, হাম্পি এবং কোণ্ডাপুরস্থিত প্রত্নতত্ত্বীয় সংগ্রহালয়সমূহ। এতদ্ব্যতীত সারনাথ, সাঁচী এবং নাগার্জুনকোণ্ডা সংগ্রহালয়ে একজন করিয়া অবর রক্ষক (জুনিয়ার কীপার) রহিয়াছেন; স্ব স্ব এলাকার অন্তঃস্থ সংগ্রহালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে ইঁহারাই দায়ী।

৭. একজন অধীক্ষক ও তিনজন সহ-অধীক্ষকের তত্ত্বাবধানে উদ্যান শাখাটির (গার্ডেন্‌স ব্রাঞ্চ) উপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রত্নকীর্তিসংলগ্ন উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের ভার। সহকারীদের মধ্যে একজন থাকেন আগ্রায়, দ্বিতীয় জন দিল্লীতে এবং তৃতীয় জন মহীশূরে।

অধিকন্তু, প্রয়োজনানুসারে সাময়িক কর্মের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে বিশেষ সংস্থা গঠন করা হয়। যেমন, নাগার্জুনকোণ্ডায় ব্যাপক উৎখনন পরিচালনার জন্য একজন অধীক্ষক ও চারি জন সহ-অধীক্ষক -সমন্বিত একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানটি জলসেচন পরিকল্পনায় আশু জলপূর্ণ হইবে। তাই ব্যাপক খননকার্যটির দ্রুত সম্পাদনের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের রূপ ও রীতি সম্যক্‌-ভাবে অনুধাবন করিবার জন্য যথাক্রমে ভূপাল ও মাদ্রাজে একজন করিয়া অধীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্ন-তাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য একটি মানচিত্র শাখার সৃষ্টি করা হইয়াছে নাগপুরে।

বর্তমানে 'পর্যবেক্ষণে'র কার্যকলাপ বহির্ভারতেও কিছু-কিছু প্রসারিত হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে মধ্য এশিয়ায় আউরেল স্টাইনের কৃতিত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের বহুদিন পর ১৯৫৬ সালে একবার অল্প দিনের জন্য আফ-গানিস্তানে অন্বেষণকার্য চলে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক পর্যবেক্ষণকার্য সম্পন্ন করে প্রাগিতিহাস শাখাটি। পরবর্তী বৎসর নেপাল-তরাইয়ের ভৈরাহাওয়া এবং তৌলিহাওয়া জেলায় অন্বেষণের ফলে অনেকগুলি খ্রীষ্টপূর্ব অধিবসতির সন্ধান মিলে। তৌলিহাওয়া জেলার তিলৌরাকোট এবং কুদানে আংশিক খননকার্যও চলে। ১৯৬২ সালেই আবার সুদূর মিশরের নূবিয়া অঞ্চলে নীলনদীতটে আফ্‌ইয়া এবং টিউমাস নামক গ্রামদ্বয়ে খননকার্য এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অন্বেষণকার্য পরিচালিত হয়।

দ্র A. Ghosh ed., *Ancient India*, New Delhi, 1953.

দেবলা মিত্র

আর্খিমেদেস, আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীসদেশের বিখ্যাত গাণিতিক। ২৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিরাকিউজে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুপদী গ্রীক চিন্তায় মন্ময় ও তন্ময় ধারা দুইটির মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়োক্ত ধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়নিষ্ঠ পদ্ধতির অন্যতম পুরোধারূপে বলবিদ্যা (মেকানিক্স), স্থিতিবিদ্যা (স্ট্যাটিক্স), ঔদস্থিতিবিদ্যা (হাইড্রোস্ট্যাটিক্স) ও গণিতে তাঁহার অবদান অবিনশ্বর। প্লুতার্ক বলিয়াছেন যে, আর্খিমেদেস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ তথা ব্যাবহারিক প্রয়োজনে নিয়োজিত সব কিছুকেই নিকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন। তথাপি বহু সমর-সরঞ্জামের উদ্ভাবকরূপে তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধি কালজয়ী। বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গী, এই মতধারার

সর্বশেষ গ্রীক প্রবক্তা আর্খিমেদেস। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচনাবলী পুনরাবিষ্কৃত হয়। টার্টাগ্লিয়ার সম্পাদনায় 'মেথোদস্' (পদ্ধতি) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে জানা গেল যে, আর্খিমেদেস তাঁহার গাণিতিক প্রতিপাদ্য প্রমাণের পূর্বে যন্ত্রাদির সাহায্যে উহার প্রয়োগসিদ্ধি পরখ করিয়া লইতেন, যদিও গাণিতিক প্রমাণটি প্রয়োগ-লব্ধ ফলাফল বাদ দিয়াই লিপিবদ্ধ করিতেন। সেইজন্য রেনেসাঁস বিজ্ঞানে এই গ্রন্থের প্রভাব কোপার্নিকাসের 'দ্য রেভলিউশনিবাস অর্বিয়াম কয়েলেস্তিউম' (১৫৪৩ খ্রী) ও ভেসালিয়াসের 'দ্য হিউমানি কর্পরিস ফাব্রিকা'র (১৫৪৩ খ্রী) সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত। রেনেসাঁস-পরবর্তী আধুনিক বিজ্ঞানের মৌল পদ্ধতির অন্যতম পূর্বসূরী আর্খিমেদেস। এউক্লিদেস ও হিপারকাস -এর সহিত আর্খিমেদেসের নামেই গ্রীক বিজ্ঞানের তৃতীয় পর্যায় হেলেনীয় যুগের আত্মপরিচয়। হেলেনীয় যুগে গাণিতিক মানদণ্ডে প্রামাণিক বিজ্ঞানের বিকাশ এতদূর উৎকর্ষ লাভ করে যে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তাহার অনায়াস-সেতুবন্ধ সম্ভব। এই গাণিতিক মানদণ্ডে প্রামাণিক বিজ্ঞানের অন্যতম জন্মদাতা আর্খিমেদেস।

বলবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যার তিনি একজন পুরোধা এবং ঔদস্থিতিবিদ্যার তিনি জনক। ঔদস্থিতিবিদ্যায় 'আর্খিমেদেসের সূত্র' বিজ্ঞানের সেই মুষ্টিমেয় মৌলিক আবিষ্কারগুলির অন্যতম, দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও যাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। সূত্রটি হইল : 'কোনও বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিলে তাহা ঐ তরল বা বায়বীয় পদার্থের যতটা ওজন স্থানচ্যুত করে, বস্তুটির ওজন ততটা কমিয়া যায়।' কথিত আছে সিরাকিউজের রাজা তাঁহাকে একটি সোনার মুকুটে রুপার খাদ মিশানো আছে কিনা তাহা নিরূপণ করিতে বলেন ; একদিন স্নানের টবে শরীর ডুবাইবার সময় এই সূত্রটির কথা তাঁহার মনে হয় এবং তখনই তিনি 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' অর্থাৎ 'পেয়েছি', 'পেয়েছি' বলিতে বলিতে নগ্নাবস্থায় সিরাকিউজের রাস্তা দিয়া রাজবাড়ির দিকে দৌড়াইতে থাকেন। এই সূত্রটির সাহায্যে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি) পরিমাপ করা যায় ও তদ্দ্বারা ধাতব পদার্থে খাদ মিশানো আছে কিনা বলিয়া দেওয়া যায়। জাহাজ নির্মাণের প্রযুক্তিবিদ্যায় এই সূত্রটির তাৎপর্য মৌলিক। বলবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে আর্খিমেদেস গাণিতিক পরিমাপসহ সরল যন্ত্রপাতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন। যে লিভারের ব্যবহার ব্যতিরেকে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অচল তাহারও আবিষ্কর্তা তিনিই। এউডক্সস-এর পদ্ধতির সাহায্যে আর্খিমেদেস 'π' নামক স্থির সংখ্যাটিকে পঞ্চম স্থান পর্যন্ত হিসাব করেন। এউডক্সস-এর সরল রেখা ও আয়ত ক্ষেত্র মাপিবার ক্রমান্বয়ী আসন্ন মান নিরূপণ-পদ্ধতির (সাক্সেসিভ অ্যাপ্রক্সিমেশন) অনুসরণে আর্খি-মেদেস বৃত্তাকার, স্তম্ভক (সিলিণ্ডার) ও জটিলতর আকৃতির বস্তুর আয়তন ও তল হিসাব করেন। এইভাবে তিনি পরবর্তী কালে নিউটন-লাইব্‌নিৎস -প্রবর্তিত অণুকলন গণিতের (ইনফিনিটেসিম্যাল ক্যাল্‌কুলাস) বিকাশপথ খুলিয়া দেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'পেরি স্ফেরাস কে কিলিনড্রু' (গোলক ও স্তম্ভক প্রসঙ্গে), 'কিক্‌লু মেত্রিসিস্' (বৃত্তের পরিমাপ), 'পেরি ওখুমেনন্' (স্পাইরাল প্রসঙ্গে), 'তেত্রাউয়োনিস্‌মস্ পারাবোলিস্' (অধিবৃত্তের পাদসংস্থান) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আলেকজাণ্ড্রিয়ার যে বিখ্যাত সংগ্রহশালাটি ঘিরিয়া পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানচর্চার বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র গড়িয়া উঠে, আর্খিমেদেস তাহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। হেলেনীয় যুগে শাসকদের নিকট বৈজ্ঞানিকদের কদর ছিল, তাঁহাদের উদ্ভাবিত কৌশলাদি প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হইত। কথিত আছে আর্খিমেদেস একবার কতকগুলি বিশাল আয়না বিশেষভাবে স্থাপন করিয়া সূর্যকিরণ প্রতিফলনের দ্বারা শত্রুপক্ষের জাহাজে অগ্নিসংযোগ ঘটাইয়া নগররক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। সিরাকিউজের শেষ স্বৈরতন্ত্রী শাসক দ্বিতীয় হাইয়েরোর আত্মীয় ছিলেন তিনি। রোমানদের বিরুদ্ধে নগররক্ষার সংগ্রামে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। বালির উপর একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানরত অবস্থায় তিনি জনৈক রোমান সৈন্য কর্তৃক নিহত হন (২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

আর্থিক উন্নতি আর্থিক উন্নতির কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মাপ্‌কাঠি নাই। তবে অধিকাংশ লোকই আর্থিক উন্নতি বলিতে জনপ্রতি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বোঝেন। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসাব করিবার সময় দেখা প্রয়োজন যে দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে তাহা যেন নিরর্থক সংকুচিত বা স্ফীত আকারে দেখা না দেয় ; মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা ইহাই লক্ষণীয়। মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ বাদ দিয়াও যদি দেখা যায় যে জনপ্রতি জাতীয় আয় বাড়িয়াছে তবে তাহাকে আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

অনগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এ সমস্ত দেশে বহু দ্রব্যই বাজারে

আর্থিক উন্নতি

বেচা-কেনা হয় না। যেমন, চাষীরা নিজেদের তৈয়ারি শস্যাদি অনেকটা নিজেরাই ব্যবহার করে, বাজারে বিক্রয় করে না। জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময়ে এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। অগ্রসর দেশগুলিতে যেমন বাজার দরের সাহায্যে সহজেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ মুদ্রার হিসাবে মাপা যায়, অনগ্রসর দেশগুলিতে তাহা যায় না ('জাতীয় আয়' দ্র)। তাই অনগ্রসর দেশগুলির জাতীয় আয়ের হিসাবে নির্ভর-যোগ্য তথ্য অনেক থাকিলেও, সংখ্যাবিদ্‌গণের অনুমান ও জল্পনার ছাপও কিছুটা থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দেশজ দ্রব্যের কি পরিমাণ অংশ বাজারে বিক্রয় হয় তাহাও অনেকে আর্থিক উন্নতির একটি মাপকাঠি মনে করেন। অতি অনগ্রসর দেশে অর্থ দিয়া বেচা-কেনা নাই বলিলেই চলে এবং আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দ্রব্যাদি বাজারের মধ্য দিয়া হাতবদল হইতে থাকে। ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে এই বাজার-ব্যবস্থার বিশেষ বিকাশ হয় না।

জনপ্রতি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইতে পারে শুধু তখনই, যখন যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহার অপেক্ষা অধিক হারে সমগ্র জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয়। যদি সমগ্র জাতীয় আয় বৎসরে শতকরা পাঁচ ভাগ করিয়া বাড়ে এবং যদি জনসংখ্যা বাড়ে বৎসরে শতকরা তিন ভাগ করিয়া, তবে মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে জনপ্রতি জাতীয় আয় বৎসরে শতকরা দুই ভাগ করিয়া বাড়িবে। মল্‌থস্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা সর্বদাই অতিরিক্ত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে চায়, ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই অর্থনৈতিক দুর্দশা স্থায়ী হয়। মল্‌থস্-এর এই নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় নাই। এক-এক করিয়া বহু দেশেই উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি জাতীয় আয় বহুগুণে বাড়িয়াছে। এমন কি অনুন্নত এবং তুলনায় স্থাণু দেশগুলিতেও জাতীয় আয়বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কিছু দ্রুতগতিতেই হইতে দেখা যায়। তবে ইহা হইতে এমন মনে করা উচিত নয় যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আর্থিক উন্নতির পথে কোনও অসুবিধারই সৃষ্টি হয় না। জনপ্রতি আয়বৃদ্ধি শুধু জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারের উপরই নয়, জনসংখ্যা বাড়িবার গতির উপরেও নির্ভর করে। তাই জনসংখ্যার অতি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে (যাহাকে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ') জনপ্রতি জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার তুলনায় স্তিমিত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শুধু যে খাওয়াইবার লোক বাড়ে এমন নয়, কাজ করিবার লোকও বাড়ে। প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে উৎপাদন-সহায়ক এই শ্রমের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ও কেন অনুরূপ পরিমাণে বাড়ে না। তাহার একটি কারণ এই যে উৎপাদনের জন্য শুধু যে শ্রমেরই প্রয়োজন হয় এমন নয়, যন্ত্রপাতি, মালমসলা, প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদক দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়। ফলে শুধু শ্রমের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ বাড়াইলে উৎপাদনের পরিমাণ অনুরূপ হারে বাড়ে না, বরঞ্চ দশ ভাগের তুলনায় কম হারেই বাড়ে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যে দেশে প্রচুর ব্যবহারযোগ্য কিন্তু অব্যবহৃত জমি আছে, সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নূতন নূতন অঞ্চলে উৎপাদনের বিস্তার হইতে পারে। উনবিংশ শতকের আমেরিকায় অথবা অস্ট্রেলিয়ায় এবং এই শতকের রাশিয়ায় যে জনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে আর্থিক উন্নতির পথ পরিষ্কারই হইয়াছে, কঠিন হয় নাই। অন্য দিকে ভারতবর্ষের মত জনসমৃদ্ধ দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধি সামান্যই ঘটে, তাই এই সমস্ত দেশে 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ' দেখিলে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটু বেশি ভয় পান ('জনসংখ্যা' দ্র)।

দেশে উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান উপায় দুইটি। প্রথমতঃ, উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি, মালমসলা ইত্যাদির পরিমাণ বাড়াইলে অধিক পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ইহা শিল্পজাত দ্রব্যের বিষয়েও যেমন খাটে, তেমনি কৃষিজাত ও খনিজদ্রব্য বিষয়েও খাটে। সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীটনাশক ঔষধের প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বাড়ানো যায়। খনিজদ্রব্যের ব্যবহারও নির্ভর করে যন্ত্রপাতি এবং মূলধনের প্রয়োগের উপর। জাতীয় উৎপাদন বাড়াইতে তাই প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ঘটে। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় হইতেছে উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে উৎপাদনের রীতিতে অনেক সময় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এবং একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অনগ্রসর দেশে নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার সামান্যই হয়। মহেঞ্জো-দড়ো সভ্যতার সময়ে আমাদের দেশে যে ভাবে কাপড় বোনা হইত, জমি চাষ হইত, এখনও ভারতবর্ষের কোনও কোনও জায়গায় সেই ভাবে কাপড় তৈয়ারি হয়, চাষ-আবাদ চলে। এই সব দেশে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার প্রধান উপায় নানা রকমের নূতন

পদ্ধতির প্রয়োগ। নূতন পদ্ধতির সাহায্যেই আধুনিক অগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয় আয় প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি এবং মূলধন নিয়োগের পরিমাণ-বৃদ্ধি এই দুই উপায়কে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করা যায় না। নূতন উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইলে সাধারণতঃ নূতন যন্ত্রপাতি ও মূলধনের প্রয়োজন ঘটে। অন্য দিকে নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারও নির্ভর করে উৎপাদনকেন্দ্রগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর। এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ মূলধনের নিয়োগের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যে সমস্ত শিল্পে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ে, দেখা গিয়াছে যে, সে সমস্ত শিল্পেই নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা বেশি হয়।

ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে নূতন পদ্ধতি বলিতে অবশ্য প্রায়ই বিদেশ হইতে আমদানি করা পদ্ধতি বোঝায়। কিন্তু অনেক সময় ভারতবর্ষের বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আরও বিশিষ্ট ধরনের পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করি। সম্পূর্ণ নূতন উৎপাদনপদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন ভারতবর্ষে আমেরিকা বা রাশিয়ার মত অগ্রসর দেশের তুলনায় কম হইলেও এই প্রয়োজনকে একেবারে উপেক্ষা করাও মারাত্মক। সব দিক বিবেচনা করিলে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনকে অনগ্রসর দেশের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন বলিলে ভুল হয় না। কিন্তু এইখানেই অনগ্রসর দেশগুলিতে দুইটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, অনুন্নত দেশে জনপ্রতি জাতীয় আয় সামান্য হওয়ায় জনসাধারণের টাকা বাঁচাইবার ক্ষমতা অতি অল্প। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য কিনিতেই তাহাদের প্রায় সব আয় ব্যয়িত হইয়া যায়। তাই লোকের মূলধন নিয়োগের ক্ষমতা খুব বেশি থাকে না। ধনীর সংখ্যা অবশ্য দরিদ্র দেশেও কম নয়। কিন্তু তাহারা অনেক সময়েই শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন নিয়োগ অপেক্ষা নিজের বা পরিবারের জীবনযাত্রার মান উঁচু রাখিবার জন্য রকমারি ব্যবহার্য জিনিস কেনা পছন্দ করে। যদি-বা তাহাদের উপর কর বসাইয়া বা অন্য উপায়ে তাহাদের আয় হইতে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেও সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান হয় না, কারণ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ধনীদের ধনের পরিমাণ অনগ্রসর দেশে কমই থাকে। তবু এই উপায়ে মূলধন সংগ্রহের সুযোগকে সব অনগ্রসর দেশ সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়াছে এমনও বলা চলে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি মূলধনের অভাবেরই আর একটি দিক। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শুধু মূলধনের নয়, বিদেশ হইতে আমদানি করা যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন। এই আমদানি যদি রপ্তানি দিয়া মিটাইতে হয় তবে রপ্তানিও অনুরূপ হারে বাড়ানো দরকার। অনগ্রসর দেশগুলি কিন্তু তাহাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টায় বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই, ফলে তাহাদের আর্থিক উন্নতি অনেকটাই বিদেশের দান এবং ঋণের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বিদেশে রপ্তানি বাড়াইবার প্রচেষ্টা আরও জোরাল করা উচিত। এই প্রচেষ্টায় যদি সাফল্যের সম্ভাবনা কম থাকে, তবে দেশে নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। মুশকিল হইতেছে যে, দেশে যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হইলেও বিদেশ হইতে প্রথমে কিছুদিন প্রচুর যন্ত্রপাতি আনিতে হয়। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমুখ দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি সুচারুরূপে করা যায়, তবে বিদেশী আমদানির উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির নির্ভরশীলতা দ্রুত কমাইয়া ফেলা যায়।

আর্থিক উন্নতির অন্তরায় হিসাবে মূলধনের অভাব এবং বিদেশী মুদ্রার অভাবের কথা উপরে বলা হইয়াছে। ইহা তো গেল অর্থনৈতিক দিকের সমস্যা। পরিকল্পনার সাহায্যে আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টার একটি সাংগঠনিক দিকও আছে। পরিকল্পনার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে সরকারের প্রশাসনদক্ষতার উপর। অনগ্রসর দেশে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল প্রশাসকের সংখ্যা কম হইবে ইহা স্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে যে সব দেশ এক সময় বিদেশী শাসনের অধীনে ছিল (যেমন ভারতবর্ষ) সেখানে প্রশাসনব্যবস্থার প্রবণতা ছিল কেবল শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে। সেই পুরাতন ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আর্থিক উন্নতির জন্য মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, নূতন উৎপাদন-রীতির প্রবর্তন যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনই প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার, প্রশাসনব্যবস্থার যথোপযুক্ত সংস্কার এবং সামাজিক উন্নতির সংকল্পে উদ্বুদ্ধ এক ধরনের বিশিষ্ট জনমত। এই নানাবিধ উপাদানের সুবর্ণসংযোগ হইতেই আর্থিক উন্নতির গতিবেগ কোনও বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে ত্বরান্বিত হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে যে কোনও উপাদানের অভাবেই সেই গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিতে পারে। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' দ্র।

দ্র United Nations Organisation, *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*, New York, 1951 ; W. A. Lewis, *The Theory of Economic Growth*, London, 1955 ; A. N. Agarwal & S. P. Singh, *The Economics of Underdevelopment*, Bombay, 1958 ; Amlan Datta, *Essays on Economic Development*, Calcutta, 1961 ; Bhabatosh Datta, *The Economics of Industrialisation*, Calcutta, 1957 ; Maurice Dobb, *An Essay on Economic Growth and Planning*, London, 1960 ; D. R. Gadgil, *Planning and Economic Policy in India*, Poona, 1962 ; Ragner Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford, 1958 ; United Nations Organisation, *World Economic Survey, 1961*, New York, 1962.

অমর্ত্যকুমার সেন

আর্থিক পরিকল্পনা প্ল্যানিং দ্র

আর্নল্ড, এড্উইন (১৮৩২-১৯০৪ খ্রী) প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ইংরেজ কবি ও সংবাদপত্রসেবী। ইংল্যাণ্ডের গ্রেভস্‌এণ্ড-এ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লণ্ডনের কিংস্ কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আর্নল্ড পুনা ডেকান কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিলাতের ডেলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগদান করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন। বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁহার ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ 'লাইট অফ এশিয়া' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে কবি হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বুদ্ধচরিতের বিকৃত উপস্থাপনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম ভিন্ন অপরাপর ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এই মর্মে কাব্যখানির বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু এদেশবাসী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং পরবর্তী যুগের থিওজফিস্টদের নিকট কাব্যখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যিশু খ্রীষ্টের জীবন অবলম্বনে রচিত তাঁহার পরবর্তী কাব্য 'দি লাইট অফ দি ওয়ার্লড' তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত ভ্রমণবিষয়ক কয়েকটি রচনা ('সীজ্ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস্' ১৮৯১ খ্রী, 'জাপানিকা' ১৮৯২ খ্রী) গদ্যলেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মহাভারত, জয়দেব ও হিতোপদেশের অনেক অংশ তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে. সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। থাইল্যাণ্ড, জাপান, তুরস্ক ও পারস্য দেশের রাজগণ কর্তৃক আর্নল্ড বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

আর্মানী, আর্মেনিয়া এশিয়া মাইনর এবং কাস্পিয়ান হ্রদের অন্তর্বর্তী দেশ। এই দেশের অধিবাসীরা ককেশীয় নামে অভিহিত সুপ্রাচীন নরগোষ্ঠীর একটি শাখা। ইহারা প্রাচীন কালে পারসীকদের দ্বারা বিজিত হয় এবং পরবর্তী কালে সিরিয়ায় গ্রীক নরপতিদের বশ্যতা স্বীকার করে। রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের পর চার শতাব্দী আর্মেনিয়া রোমের বশীভূত থাকিলেও নিজের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় নাই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে আর্মেনিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হয়। চতুর্থ শতকে আর্মেনিয়া পারস্যের অধিকারে আসে, তাহার পর মুসলমানগণ ইহা দখল করে। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক জাতি আর্মেনিয়া অধিকার করে। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের শাহ্ আব্বাস আর্মেনিয়া আক্রমণ করিয়া বহু সহস্র আর্মানীকে বলপূর্বক পারস্যে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় অনেক আর্মানী পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং সম্প্রদায়গতভাবে তাহারা এশিয়ার বাণিজ্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্মেনিয়াতে বহু হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিত এবং সেখানে তাহারা মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি মন্দিরের দেবমূর্তি যথা-ক্রমে ১২ হাত ও ১৪ হাত উচ্চ ছিল। ৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট গ্রেগরি হিন্দুগণের বাধা সত্ত্বেও ঐ মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন।

ভারতবর্ষের সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে আর্মানীদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট্ আকবর ইহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে আগ্রায় একটি আর্মানী বসতি গড়িয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতিকালে গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীতে জনৈক আর্মানী উচ্চপদ অধি-কার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবেই আর্মানী-দের প্রতিষ্ঠা ছিল বেশি। দিল্লী, ফতেপুর সিক্রী, লাহোর, সুরাট, বোম্বাই প্রভৃতি শহর ও বন্দরে আর্মানী বণিক-গোষ্ঠী বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পূর্ব ভারতে চুঁচুড়া, চন্দননগর, বহরমপুরের নিকট সৈদাবাদ, মুঙ্গের

এবং ঢাকা তাহাদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজেও তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কলিকাতা শহরের আদিযুগ হইতে আর্মানীরা এখানে বসতি স্থাপন করে। তাহারা প্রধানতঃ কার্পাসবস্ত্র এবং রেশমের ব্যবসায় করিত। আর্মানীদের প্রতি নবাব আলীবর্দীর আনুকূল্য ছিল। নবাব-সরকারে তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং ইংরেজ বণিকেরাও তাহাদের খাতির করিয়া চলিত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্মানীদের অবনতি আরম্ভ হইল। বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কড়া নিয়মকানুন প্রবর্তনের ফলে ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে আর্মানীরা দ্রুত অপসারিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহাদের পূর্বগৌরবের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রহিল না। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতেও কোনও কোনও আর্মানী বণিক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রদায়গতভাবে তাহাদের পূর্ব প্রাধান্য আর ফিরিয়া আসে নাই। কলিকাতা, মাদ্রাজ, ঢাকা, সৈদাবাদ প্রভৃতি শহরে আর্মানীঘাট, আর্মানীয়ান স্ট্রীট, আর্মানীটোলা, আর্মানী গির্জা আর্মানীদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

নীলমণি মুখোপাধ্যায়

আর্য[১] এশিয়া ও ইওরোপখণ্ডের অধিবাসী এক প্রাচীন ও সুবিখ্যাত জাতির ও তাহার ভাষার নাম। এই নাম আমরা প্রথম পাই ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে ('আর্য' অর্থাৎ 'আরিয়' রূপে), ইরানের অনুরূপ প্রাচীন অবেস্তাগ্রন্থে ('ঐরিয়' রূপে) এবং প্রাচীন পারসীক গিরিলিপিতে ('অরিয়' রূপে)। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কাল হইতে ইরানে এবং পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে যে পরাক্রান্ত সুসংহত জাতি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, 'আর্য' ছিল তাহাদের স্বকীয় নাম। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণার ফলে দেখা গেল যে, ভারতের প্রাচীনতম আর্য-ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) এশিয়ার আর্মানী, ইওরোপের গ্রীক, লাতিন, গথিক, প্রাচীন আইরিশ, প্রাচীন ওয়েলস্, প্রাচীন স্লাব প্রভৃতি ভাষার সহিত সংযুক্ত ও তাহাদের ভগিনী-স্থানীয়। এই সমস্ত ভাষা যে এক মূল আদিভাষা হইতে উদ্ভূত, স্যর উইলিয়াম জোন্‌স-এর এই যুক্তিপূর্ণ অনুমান সর্বজনগৃহীত হইল। তখন এই সমস্ত ভাষার ও এই ভাষাগুলি যাহারা বলে তাহাদের এক সাধারণ নাম হিসাবে ভারতীয় 'আর্য' শব্দের প্রসার ঘটিল। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, আইরিশ (কেলতিক), স্লাব প্রভৃতি ভাষার সাধারণ নাম হিসাবে 'আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা' এই সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইতে লাগিল; এবং অধুনালুপ্ত যে আদিভাষা বা মূলভাষা হইতে এই ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব, ইংরেজীতে তাহার নাম দেওয়া হইল প্রিমিটিভ এরিয়ান। কিন্তু আর্য শব্দের এই প্রসৃত ব্যাপকতর অর্থে আপত্তি উঠিল। 'আর্য' মাত্র ভারত ও ইরানে উপনিবিষ্ট আর্য (বা ঐরিয়, অরিয়) জাতিরই নাম, এই নাম এশিয়ার পশ্চিমের জাতিগুলি সম্বন্ধে ব্যবহার করা অনুচিত। সমগ্র ভাষাগোষ্ঠীর জন্য নূতন যৌগিক নাম পরিকল্পিত হইল ইন্দো-জার্মানিক। অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে আসাম হইতে ইওরোপের পশ্চিম প্রান্ত আইসল্যাণ্ড (যেখানে জার্মানিক শ্রেণীর ভাষা আইসল্যাণ্ডিক প্রচলিত) পর্যন্ত বিরাট ভাষাভূমির নাম জার্মান পণ্ডিতেরা দিলেন ইন্দো-গ্যেরমানিশ্ (Indogermanisch); কিন্তু অন্য ইওরোপীয়-গণ এই নাম পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা ইহার সংজ্ঞা দিলেন— 'ইন্দো-ইওরোপীয়' বা 'ভারত-ইওরোপীয়'। যদিও সমগ্র ইন্দো-ইওরোপীয়গোষ্ঠীর সম্বন্ধে কেহ কেহ (বিশেষতঃ, ইংরেজীতে) স্থূলভাবে 'আর্য' শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এখন সাধারণতঃ এই ব্যাপক অর্থে 'আর্য' শব্দ ব্যবহৃত হয় না, ইন্দো-ইওরোপীয় শব্দই সমধিক প্রচলিত। 'আর্য' শব্দ এখন কেবল ভারতের ও ইরানের আর্যদের জন্যই সীমিত হইয়াছে। এই হিসাবে, যৌগিক নাম ইন্দো-ইরানীয় ও আর্য এখন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা (প্রিমিটিভ ইন্দো-ইওরোপীয়ান, জার্মানীতে উর্. ইন্দোগ্যেরমানিশ্— Ur. indogermanisch) কোথায়, কবে এবং কাহারা বলিত, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। আজকাল যে মতবাদ সাধারণ্যে গৃহীত, তাহা হইতেছে যে রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণাচ্ছন্ন শুষ্ক সমতল ভূখণ্ডে এখন হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এক শ্বেতকায় জাতির মানুষ বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। অনুমিত হয় যে, ইহারাই ছিল আদি 'নর্ডিক' বা 'উদীচ্য' জাতির মানুষ— দীর্ঘকায়, নীলচক্ষু, হিরণ্যকেশ, দীর্ঘকপাল, সরলনাসিক। পরে নানা কারণে আদি পিতৃভূমি হইতে এই জাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন যুগে পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রসৃত হয়। ইহাদের মূলভাষা ছিল বৈদিক সংস্কৃত, হোমরের গ্রীক, প্রাচীন লাতিন, গথিক, আইরিশ, স্লাব, মধ্য এশিয়ার তোখারী (বা তুষার) প্রভৃতির

আদি জননী। একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্বে কাউকাসস্ (Caucasus) পর্বত অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের পরে উত্তর ইরাকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ইহারা অর্ধ-যাযাবর এবং অর্ধ-প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবী ছিল; মানসিক উৎকর্ষ এবং অতি শক্তিশালী ভাষার অধিকারী হইয়াও ইহারা পার্থিব সভ্যতায় ততটা উন্নতি লাভ করে নাই। ঘোড়াকে পোষ মানানো ও মানুষের কাজে লাগানো ইহাদেরই কৃতিত্ব। যে শাখাটি উত্তর ইরাকে উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের নামই ছিল 'আর্য'। এই আর্যদের বিভিন্ন গোত্র ছিল। যথা— মদ বা মদ্র, পর্শু, পার্শ্ব বা পার্স, পুলস্ত, শক, ভারত, কাশ্ব বা কাশ্যপ, বশ, তুর্ব প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শাখা ভারতেও আসে।

আধুনিক মতে ভারতে আর্য-আগমন ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী নহে। এ দেশে আসিয়া শ্বেতকায় আর্যগণ স্থানীয় কৃষ্ণকায় (নিষাদ), শ্যামল বা কপিল (দ্রাবিড়) ও পীত (কিরাত), অর্থাৎ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল জাতির অনার্যদের বিষয়ে জানিতে পারে। প্রথমেই নিজেদের শ্বেতবর্ণ ও আর্যেতর জাতির অশ্বেতবর্ণ (আর্যং বর্ণম্, দাসং বর্ণম্) সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ সচেতন হয়। আর্যের ভাষায় অনার্যদের 'দাস, দস্যু, শূদ্র, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ' ও পরে 'অন্ধ্র, দ্রমিড় বা দ্রবিড়, কোল্ল, ভিল্ল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। কালক্রমে অনার্যের দেশে আর্যগণ যখন স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিল তখন অনার্যের পরিবেশ-প্রভাব এবং আর্য-অনার্যের মধ্যে অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের ফলে পারস্পরিক রক্ত-সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। এই জাতি-মিশ্রণের ফলে মহাভারতের যুগে নূতন এক মিশ্রজাতির— প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুজাতির উদ্ভব হইল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথম অর্ধের মধ্যেই এই মিশ্রণ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তখন আর আর্যের জাতিগৌরব রহিল না। 'আর্য'-শব্দ তখন নূতন অর্থ গ্রহণ করিল। রক্তের দ্বারা, আকৃতি ও বর্ণের দ্বারা যাহার লক্ষণ সূচিত হইতে পারে তখন হইতে 'আর্য' শব্দে আর এমন কোনও বিশিষ্ট জাতির মানুষ বুঝায় না; 'আর্য' শব্দ এখন মানসিক গুণ ও উৎকর্ষ -বাচক হইয়া দাঁড়াইল, বর্ণবাচক বা জাতিবাচক রহিল না। জাতিবাচক 'আর্য' শব্দের এই নূতন গুণবাচক অর্থ ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় এবং রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি লক্ষণীয় বস্তু।

ভারতীয় ও ইরানীয় 'আর্য' শব্দের মূল অর্থ লইয়া বিতর্ক আছে। 'আর্য' মূলতঃ একটি গৌরবদ্যোতক জাতীয় নাম (যেমন 'স্লাব' = সংস্কৃত 'শ্রবঃ' = 'গৌরব'। স্লাব জাতি = গৌরবময় জাতি)। গ্রীকে 'আরিস্তস্' শব্দ আছে— অর্থ 'শ্রেষ্ঠ'। কোনও কোনও পণ্ডিত 'আরিস্তস্'-কে 'আর্য' শব্দের প্রতিশব্দ মনে করেন। আরিস্তস্ যেন সংস্কৃত 'আর্যিষ্ঠঃ'; গ্রীক 'আরেতে'র অর্থ উৎকর্ষ, সদ্‌গুণ। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রাচীন নাম এরিউ; এরিন শব্দ

- আদি ইন্দো-হিত্তী
  - হিত্তী (কানিসীয়)
  - আদি ইন্দো-ইওরোপীয়
    - আর্য (বা ইন্দো-ইরানীয়)
      - ভারতীয় আর্য
        - বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ
      - দরদ
        - শীর্ণা, কাশ্মীরী প্রভৃতি
      - ইরানীয়
        - অবেস্তা, প্রাচীন পারসীক পহ্লবী, ফারসী, (পশ্‌তো, বলোচী, কুর্দী ওস্‌সেৎ প্রভৃতি)
    - আলবানীয়
    - আর্মেনীয়
    - বালতিক
    - হেল্লেনিক (গ্রীক)
    - ইতালিক (লাতিন)
      - ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি
    - জার্মানিক (গথিক)
      - জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি
    - কেলতিক
      - আইরিশ, ওয়েলস প্রভৃতি
    - স্লাব
      - রুশ প্রভৃতি
    - তোখারীয়
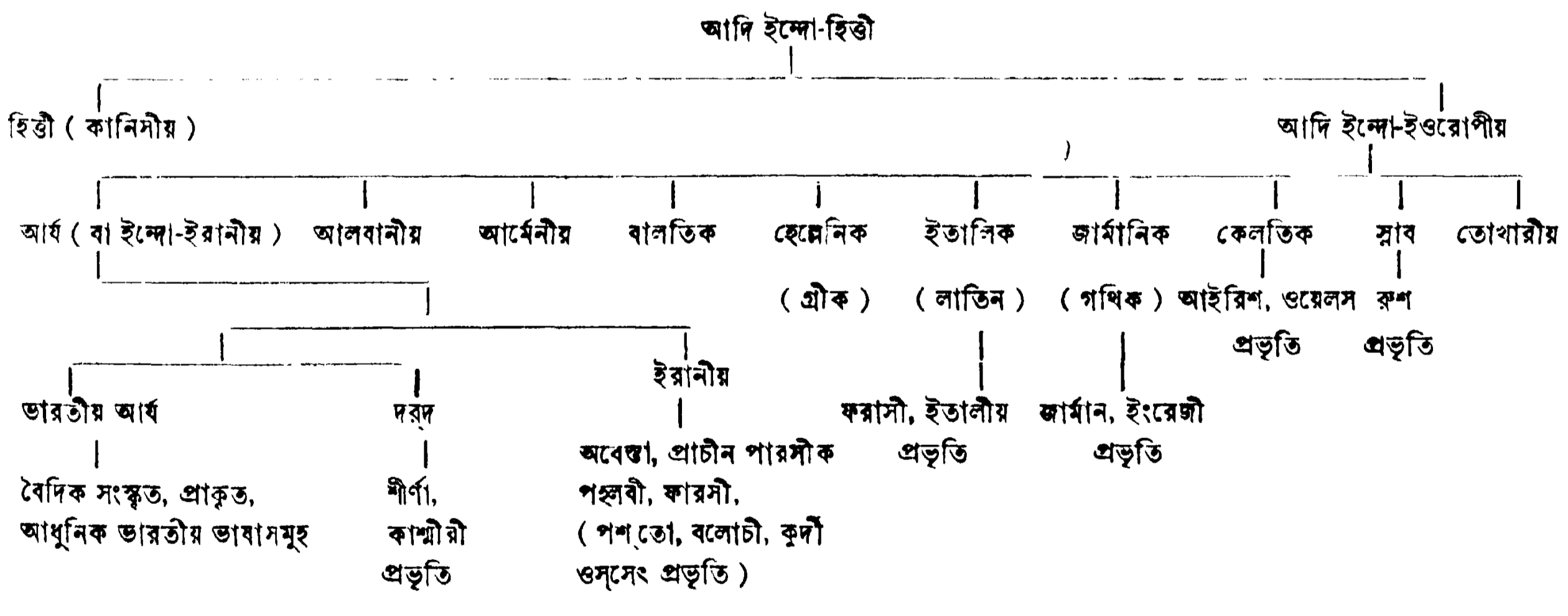
ইহা হইতে জাত। অনেকে 'আর্য',শব্দের সহিত ইহার সংযোগ অনুমান করেন। প্রাচীন আয়র্ল্যাণ্ডে অভিজাত-শ্রেণীর মানুষ 'আইরে' নামে অভিহিত হইত। আর্যরা তাহাদের আদি পিতৃভূমিতে যাযাবর মেষপালক মঙ্গোল জাতির লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কেবল আর্যরাই অল্পস্বল্প কৃষিকার্য করিত, সেইজন্য 'চাষ করা' অর্থে একটি প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় ধাতু হইতে 'আর্য' নামের উৎপত্তি— এ মতও প্রচারিত হয়। এই ধাতু সংস্কৃতে আর মেলে না, কিন্তু লাতিনে 'আরারে' ও প্রাচীন ইংরেজীতে 'এরি-আন' er-ian (যাহা হইতে ইংরেজী আর্থ earth, জার্মান এয়ার্ডে erde) রূপে পাওয়া যায়। যাহা হউক এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি হয় নাই, তবে গ্রীক আরিস্তস্-আরেতে এবং আইরিশ আইরে, এরিউ-র সঙ্গে 'আর্য' শব্দের যোগ মানিয়া লওয়া যায়।

সংস্কৃত গ্রীক লাতিন গথিক আইরিশ স্লাব তোখারীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং যুক্তি-তর্ক ও বাক্তত্ত্বের বিচার অনুসারে সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া গবেষণার ফলে আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার স্বরূপ বা তাহার সম্ভাব্য রূপ অনেকটা নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। আর্যভাষা ও অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপীর ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধও নির্ধারিত হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল এশিয়া মাইনরের এক অধুনালুপ্ত প্রাচীন ভাষা হিত্তীর (অথবা কানিসীয়) প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নূতন একটি পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রভৃতি আর্য ভাষার এবং তাহাদের স্বস্থানীয় গ্রীক লাতিন তোখারী স্লাব প্রভৃতি অন্য ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার ইতিহাস আদি ইন্দো-ইওরোপীয়তে গিয়া পৌঁছায়, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু হিত্তী ভাষার আলোচনায় ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার পিছনে ইহার পটভূমিকা বা উৎপত্তি-ক্ষেত্র হিসাবে আর একটি প্রাচীনতর স্তর বা অবস্থা পাওয়া যাইতেছে, তাহার নামকরণ হইয়াছে 'ইন্দো-হিত্তী' বা 'ভারতহিত্তী'। ৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশপীঠিকা হইতে আর্যভাষার পারিপার্শ্বিক ও আধার বা উদ্ভবভূমির একটা ধারণা করা যাইবে।

দ্র সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৬২; Suniti Kumar Chattopadhyay, *Indo-Aryan and Hindi,* Calcutta, 1960; T. Burrow, *The Sanskrit Language,* London, 1955; W. Jackson, *Avesta Grammar in Comparison with Sanskrit,* Stuttgart, 1892; E. H. Sturtevant, *A Comparative Grammar of the Hittite Language,* vol. I, Newhaven, 1951; C. D. Buck, *A Comparative Grammar of Greek and Latin,* Chicago, 1948; E. L. Johnson, *Historical Grammar of the Ancient Persian Language,* Vanderbilt Oriental Series, 1917.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আর্য[২] 'আর্য' শব্দটি মূলতঃ ভাষাবাচক অথবা জাতি-বাচক এ বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। বিগত শতাব্দীতে ম্যাক্স্ মূলার প্রমুখ সুধীবর্গ বহু বিতর্কের পর স্থির করিয়াছেন যে আর্য বলিতে একটি ভাষাগোষ্ঠীই বুঝিতে হইবে, শব্দটি জাতিবাচক নহে। অপর পক্ষে পেন্‌কা প্রভৃতি একদল পণ্ডিত উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলেন, ভাষা স্বয়ম্ভূ বস্তু বা মানুষের অন্তঃস্থিত কোনও জন্মগত গুণ নহে; প্রাকৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিকাশের নিয়মসমূহের অন্তর্গত কোনও বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সমবেত ও সক্রিয় আত্মপ্রকাশ-চেষ্টার ফলস্বরূপই উক্ত গোষ্ঠী ভাষাবিশেষ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয়। সুতরাং 'আর্য' বলিতে যদি কোনও ভাষা বুঝায় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার পশ্চাতে উহার স্রষ্টা ও ব্যবহারকারী একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর অস্তিত্বও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। বর্তমান শতাব্দীতে প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি মোটের উপর প্রাধান্যলাভ করিলেও দ্বিতীয়টি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ইহা প্রমাণিত হয় নাই। অবশ্য পেন্‌কা ও তাঁহার অনুবর্তীগণ যেভাবে তাঁহাদের মতবাদটির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, এই শতাব্দীতে উহারই ভিত্তিতে জার্মানীর নাৎসীবাদে 'বিশুদ্ধরক্ত' 'অপরাজেয়' নর্ডিক জাতি (রেস) -সৃষ্ট সভ্যতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয় এবং একটি ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উক্ত 'জাতিবাদ' ব্যবহৃত হয়। এই কারণে পেন্‌কার মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুগণের মনে একটি স্বাভাবিক ভীতি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত মতের এইরূপ ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ নিতান্ত অযৌক্তিক। নর্ডিক বা অন্য কোনও বিশিষ্ট জাতির মধ্যে আদি ইন্দো-ইওরোপীয় বা আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে যে কালক্রমে সেই জাতি লুপ্ত হইয়াছে বা ভাষান্তর গ্রহণ করিয়াছে বা অন্যান্য জাতির সহিত মিশ্রণে আপন বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে। উত্তরকালে মূল আর্যভাষার

শাখা-প্রশাখাগুলির বিশ্বব্যাপী বিস্তারের সহিত সর্বত্র তাহার কোনও অচ্ছেদ্য যোগ নাই। বর্তমান ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মধ্যে নৃতত্ত্ববিদ্গণ 'নর্ডিক' উপাদান কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন; এইরূপও অনুমিত হইয়াছে যে মূলতঃ 'নর্ডিক'-গোষ্ঠী কর্তৃক আর্যভাষা ও সংস্কৃতি ভারতে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভূখণ্ডে 'নর্ডিক' জাতি আরও বহু জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া আপনার বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষব্যাপী আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার মাত্র মুষ্টিমেয় 'বিশুদ্ধরক্ত' নর্ডিকগণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই।

আর্যভাষী-গোষ্ঠীর আদিনিবাস কোথায় ছিল ও ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এই প্রশ্নদ্বয়ের সম্পূর্ণ তর্কাতীত মীমাংসা এখনও হয় নাই। অবিনাশচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, কাহ্নাইয়ালাল মুনশী, ত্রিবেদ, কল্ল প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষই আদি আর্যভূমি। কিন্তু এই মত সাধারণ্যে গৃহীত হয় নাই। স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর টিলকের মতে উত্তর সাইবেরিয়া অঞ্চলই ছিল আর্যগণের আদি বাসভূমি। মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার শাখা-প্রশাখাগুলির তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অধ্যাপক জাইল্স্ দেখাইয়াছেন যে ইওরোপের কার্পেথীয় পর্বতমালা, বলকান অঞ্চল, অষ্ট্রীয় আল্প্স ও এর্জবার্গ পরিবেষ্টিত ভূখণ্ড আর্যদের বাসস্থান। কিন্তু পণ্ডিতসমাজে এই মতগুলিও সমাদর লাভ করে নাই। ভারতে আর্যসভ্যতা ও তৎসৃষ্ট বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তিকালকে কেহ কেহ ২৫০০০ বা ১৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক উপাদানের ভিত্তিতে টিলক ও জার্মান পণ্ডিত হেরমান য়াকোবি যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ ও খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসরকে বেদরচনা তথা ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তনের আরম্ভকাল কল্পনা করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে হ্যুজিং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ভারতবর্ষে আর্যগণ কর্তৃক বেদরচনা সমাপ্ত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার অনুমোদিত গবেষণাপ্রণালীর নিকট উক্ত সিদ্ধান্তসকল মূল্যহীন প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্তমানে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাক্ষ্য মিলাইয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ড আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্মস্থান। এই স্থান হইতে আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিত্তীভাষী একটি গোষ্ঠী এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোসিয়া অঞ্চলে ও ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষী অপর একটি গোষ্ঠী মধ্য এশিয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। এডোয়ার্ড মাইয়ারের মতে ইন্দো-ইরানীয়গণ বাস করিত মধ্য এশিয়ার পামির অঞ্চলে। হের্জফেল্ড বলেন, ইহাদের বাসস্থান ছিল শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় -বিধৌত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে। হের্জফেল্ডের সিদ্ধান্তটি অধুনাতন পণ্ডিতমহলে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই ভূভাগ হইতে ক্রমশঃ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ইন্দো-ইরানীয়গণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে উত্তর ভারতে ও ইরানে প্রবেশ করে। এশিয়া মাইনরের বোঘাজ্ কোই নামক স্থানে প্রাপ্ত হিত্তী লেখমালায় বা বাবিলনের কাস্সুবংশীয় নরপতিগণের অনুশাসনে বা মিশরের অন্তর্গত তেল-এল-অমর্না নামক স্থানে আবিষ্কৃত ক্ষোদিত মৃৎফলকসমূহে আদিম ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে সকল শব্দ দৃষ্ট হয় তাহাও মধ্য এশিয়া হইতে ইন্দো-ইরানীয়গণের পশ্চিমাভিমুখী প্রসারের ফল বলিয়াই আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে মনে করিতেছেন।

আর্যগণের উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশকে এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বৎসরের ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইলে সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত আর্যসভ্যতার সম্পর্ক কি ছিল— এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর্যগণই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা অর্থাৎ মূলতঃ সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক আর্যসভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু দুই কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ প্রত্নবিজ্ঞানীগণের সাম্প্রতিক মতানুযায়ী ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক আর্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর; সিন্ধুসভ্যতার আয়ুষ্কাল আনুমানিক ২৫০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ— এই এক সহস্র বৎসর; অথচ ভারতে আর্যগণের আগমনকালকে ২০০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পশ্চাতে কিছুতেই লইবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সহিত বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত ভারতবর্ষীয় আর্যসভ্যতাসম্পর্কিত তথ্যাবলী মিলাইয়া দেখিলে স্বভাবতঃ মনে হয় উভয় সভ্যতার স্ব স্ব প্রকৃতিতে কতকগুলি মৌলিক বৈপরীত্য আছে। সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টাগণ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ও নগরনির্মাণে দক্ষ ছিলেন; বৈদিক সভ্যতার অন্ততঃ আদিযুগে আর্যগণ নগর নির্মাণ করিতেন এমন কোনও প্রমাণ নাই, তাঁহাদের গোষ্ঠীজীবন ছিল বহুল পরিমাণে গ্রামকেন্দ্রিক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীবৃন্দ

লৌহের ব্যবহার জানিতেন না ও যুদ্ধে সম্ভবতঃ বর্ম ব্যবহার করিতেন না ; বৈদিক যুগে আর্যগণ সম্ভবতঃ লৌহের ব্যবহার জানিতেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ম পরিধান করিতেন। সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টাগণ অশ্বের পরিচয় জানিতেন কিনা সন্দেহ ; কিন্তু ইহা সুপরিজ্ঞাত যে আর্যগণ বন্য অশ্বকে বশীভূত করিয়া ব্যাপকভাবে গৃহকার্যে ও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকায় প্রতীকোপাসনা, মূর্তিপূজা, লিঙ্গোপাসনা প্রভৃতির প্রচলন ছিল ; সম্ভবতঃ শিব-পশুপতি ও মহাশক্তিরূপিণী জগন্মাতা তথায় পূজিত হইতেন ; অথচ আদি বৈদিক ধর্মে মূর্তি-পূজা অজ্ঞাত, দেব-দেবীরূপে শিব ও শক্তি অখ্যাত এবং সম্ভবতঃ লিঙ্গপূজা নিন্দিত। এই সকল তথ্য আলোচ্য সভ্যতা দুইটির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই সূচিত করে। অধিকন্তু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ২০০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংঘটিত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে আর্যগণের অভিযানই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ। ঋগ্বেদে (৬।২৭।৫) উল্লিখিত হইয়াছে সৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখবংশীয় যজ্ঞপাত্রধ্বংসকারী বৃচীবৎ-গণকে নিধন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন এই ক্ষেত্রে 'হরিয়ূপীয়া' বলিতে সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার অন্তর্গত আধুনিক হরপ্পা নামক স্থান বুঝিতে হইবে এবং ইন্দ্রপূজক আর্যগণের সহিত যাগযজ্ঞমূলক বৈদিক ধর্মের বিরোধী সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টাগণের সংঘর্ষ অর্থে ঐ সমগ্র উক্তিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা সত্য হউক বা না হউক, কালক্রমের দিক হইতেও সিন্ধুসভ্যতার বিলয় (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০) ও আর্যগণের ভারত অভিযান (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০) মিলিয়া যাইতেছে ; এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও তৎসহ প্রাপ্ত নরকঙ্কাল-সমূহ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ শেষ পর্যন্ত উক্ত সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটাইয়াছিল। সুতরাং, অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে স্বীকার করা যাইতে পারে, আর্যগণই এই বহিঃশত্রু এবং তাহারাই ভারত অভিযানের মুখে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতাকে ধ্বংস করিয়াছিল।

ভারতে আর্যসভ্যতাবিস্তারের ঐতিহাসিক উপাদান-সমূহ মুখ্যতঃ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঋগ্বেদ, পরবর্তী সংহিতাগুলি, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ -গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত তথ্যরাজি হইতে আনুমানিক ১৫০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আর্য অধিকার প্রসারের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্য সূত্রসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতেও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বতন বহির্ভারতীয় বাসভূমি সম্পর্কে ভারতে সমাগত আর্যগণের কোনও স্পষ্ট স্মৃতি ছিল কিনা সন্দেহ। তবে বৈদিক ও বেদোত্তর ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ -সাহিত্যের কয়েকটি বর্ণনা ও উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয় আর্যগণ সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও মধ্যএশিয়ার বাল্‌খ্ (প্রাচীন 'বাহ্লীক') অঞ্চলের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। ঋগ্বেদসংহিতা হইতে সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানা যায়, ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ পূর্ব আফিগানিস্তান ও সমগ্র সিন্ধু উপত্যকায় (অর্থাৎ সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চলে) দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশেও তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান কাবুল নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাসকারী পখ্‌থ (পখ্‌থুন) ও গান্ধারি নামক জাতিদ্বয় ঋগ্বেদে সুপরিচিত। সিন্ধু ও তাহার শাখা-প্রশাখা -বিধৌত পাঞ্জাব ঋগ্বেদ যুগের ভারতীয় আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। সিন্ধু, সুষোমা, আর্জীকীয়া, বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণী, বিপাশা, শুতুদ্রী প্রভৃতি এই অঞ্চলের নদী ও সেখানকার অধিবাসী পুরু ও শিব জাতির কথা ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে কাশ্মীর উপত্যকার কিয়দংশ যে আর্যগণ অধিকার করিয়াছিল তাহা তাহাদের স্থানীয় নদী মরুদ্‌বৃধা-র (বর্তমান 'মরুওয়ার্‌দোয়ান') সহিত পরিচয় হইতেই প্রমাণিত হয়। পূর্বদিকে এই যুগে তাহারা যে সর্‌হিন্দ্, থানেশ্বর ও তন্নিকটবর্তী সমতল অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছিল ইহারও প্রমাণ আছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, অপায়া, গোমতী, সরযূ প্রভৃতি নদী ও মধ্যদেশের অধিবাসী রুশম, উশীনর, দালভ্য, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি জাতির সহিত ঋগ্বেদ-রচয়িতৃগণের সম্যক্ পরিচয় ছিল। এই যুগে তাহারা সম্ভবতঃ বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে নাই। রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলকে তাহারা ধন্বন্ নামে অভিহিত করিত। ভারতবর্ষের পূর্বতন আর্যেতর অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ যে ভূভাগ আয়ত্তে আনিয়া-ছিল, যজুস্ ও অথর্ব নামধেয় পরবর্তী সংহিতাদ্বয় ও ব্রাহ্মণসমূহে বর্ণিত যুগে মুখ্যতঃ তাহার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই যুগে তাহারা গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করে। যমুনার প্রবাহপথ অনুসরণপূর্বক 'ভরত'-গোষ্ঠী

এবং সরস্বতী ও সদানীরার স্রোতের অনুবর্তী হইয়া 'বিদেঘ' বা 'বিদেহ'গণ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। মধ্য ভারতের মালব অঞ্চলে সম্ভবতঃ এই সময়েই 'কুন্তি' 'বীতহব্য' প্রমুখ গোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেন। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে রচিত ব্রাহ্মণগুলিতে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌সমূহে এই চিত্র আরও স্পষ্ট। সমগ্র ভারতবর্ষ এই সময়ে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি অখণ্ড ভৌগোলিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে: ১. ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ্ (মধ্যাঞ্চল); ২. প্রাচী দিশ্ (পূর্বাঞ্চল) ৩. দক্ষিণা দিশ্ (দক্ষিণাঞ্চল); ৪. প্রতীচী দিশ্ (পশ্চিমাঞ্চল); ৫ উদীচী দিশ্ (উত্তরাঞ্চল)। ইহার মধ্যে 'ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ্' বা মধ্যাঞ্চলটিই ছিল আর্যসভ্যতার পীঠভূমি; কুরু, পঞ্চাল, বশ, উশীনর প্রভৃতি সুপরিচিত খ্যাতিসম্পন্ন আর্যগোষ্ঠীর আবাসস্থান। পূর্বাঞ্চলের কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি আর্যজনপদগুলি অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র প্রভৃতি অনার্যদেশের সহিত সংস্রবযুক্ত ছিল। দক্ষিণ বিভাগে সত্বতগণ ও বেরার অঞ্চলে বৈদর্ভগণ আর্যসভ্যতার প্রভাব বহন করিয়া লইয়া গেলেও দক্ষিণ ভারতের সভ্যতায় তৎকালে অনার্য প্রভাবই বলবৎ ছিল; অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় শক্তিশালী অনার্য জাতির উল্লেখেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মণ্য সূত্রগ্রন্থগুলিতে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে আর্যসভ্যতাবিস্তারের পরবর্তী স্তরটির পরিচয় আছে। পূর্বোক্ত ভারতবর্ষের মধ্যাঞ্চল তখন 'মধ্যদেশ', 'মজ্ঝিম দেশ', 'শিষ্টদেশ' বা 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত ও আর্যসংস্কৃতির বিচ্ছুরণকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত। ইহার সীমান্তও সুনির্দিষ্ট হইয়াছে— উত্তরে হিমালয়, পূর্বে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের সন্নিকটবর্তী কালকবন, দক্ষিণে পারিযাত্র পর্বত (বা বিন্ধ্য পর্বতমালার পশ্চিমাংশ) ও পশ্চিমে সরস্বতীতটস্থ অদর্শন এবং থুন। পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সূত্রগ্রন্থে অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলকে অপবিত্র ও অনার্যদেশরূপে গণ্য করা হইয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতিজড়িত বলিয়া বৌদ্ধগণ মগধ প্রভৃতি ভূখণ্ডকে অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই, মধ্যদেশ বা আর্যভূমির পূর্বসীমা কজঙ্গল (বা রাজমহল) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) সর্বদা আর্যসভ্যতার পরিমণ্ডলের বহিঃস্থিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই পর্বে দক্ষিণ দিকে বিদর্ভ (বেরার) অতিক্রম করিয়া আর্যগণ গোদাবরী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং উক্ত অঞ্চলে পঞ্চবটী, জনস্থান, অশ্মক, মূলক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপনিবেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ শূর্পারক প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বন্দর নগরী স্থাপন করিয়াছিল। কলিঙ্গ নামে পরিচিত উড়িষ্যার বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ কিন্তু তখনও অনার্যদেশ বলিয়াই চিহ্নিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে এই যুগেই অবন্তী, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি কতিপয় আর্য-অনার্য মিশ্র জনপদের অভ্যুত্থান ঘটে। রামায়ণে সুদূর দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা প্রসারের পরবর্তী অধ্যায়টি বর্ণিত হইয়াছে। এই যুগে গোদাবরী অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ ঋষিগণ দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং রামায়ণের কাহিনী অনুসারে উত্তর ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের ইক্ষ্বাকুবংশীয় আর্য রাজপুত্রগণ সিংহল দ্বীপ অবধি জয় করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেগাস্থিনিস ইঙ্গিত করিয়াছেন দক্ষিণ ভারতে মাদুরা অঞ্চলের পাণ্ড্যগণ উত্তর ভারতের মথুরা অঞ্চল হইতে সমাগত। বার্তিককার কাত্যায়ন (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) পাণিনির একটি সূত্রের উপর (৪।১।১৬৮) 'পাণ্ডোর্ড্যণ্' নামক যে বার্তিক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেও অনেকে মনে করেন যে উত্তর ভারতীয় আর্যবংশজ পাণ্ডুগোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ ভারতের সুপরিচিত পাণ্ড্যগণের উৎপত্তি। এইভাবে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক পর্যন্ত ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতার বিস্তার সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আর্য উপনিবেশের সম্প্রসারণের সময়ে বাণিজ্যবিস্তার, ধর্মপ্রচার ও সামরিক বিজয়— এই ত্রিবিধ উদ্যমকে ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়। আর্যসমাজে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত বণিক ও শ্রেষ্ঠীগণ বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্যসম্ভার লইয়া পূর্ব ও দক্ষিণে অনার্য-অধ্যুষিত দূর অঞ্চলগুলিতে যাতায়াত বা বসতিস্থাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ ঋষিগণ অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রণী হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যসহ দূর অনার্যদেশে আশ্রম স্থাপনপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করিতেন। রামায়ণে দেখা যায়, রামচন্দ্র গোদাবরী উপত্যকা ও পম্পাতীরে এইরূপ বহু মুনি-ঋষির আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রামায়ণে, মহাভারতে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া সর্বপ্রথম অগস্ত্য মুনির দাক্ষিণাত্যগমনের যে কাহিনী আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সুত্তনিপাতে উল্লিখিত আছে বাভরিন নামক জনৈক ত্রিবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগুরু ষোড়শ শিষ্যসমেত উত্তর ভারতের কোশল জনপদ হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া গোদাবরী তীরে অশ্মকদেশে বসতি স্থাপন করেন। সর্বোপরি আর্য ও অনার্যগণের সহিত অবিরত সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা আর্যগণ

ক্রমাগত পূর্বে ও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে ; বৈদিক ও পরবর্তী সাহিত্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতা বিস্তারের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে এখানে আর্য অভিযানের প্রকৃতিটিকেও উত্তমরূপে অনুধাবন করিতে হইবে। আর্য অভিযান কোনও বিশেষ একটি দল কর্তৃক কোনও বিশেষ এক সময়ে আক্রমণ নহে। সম্ভবতঃ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কালে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল, এই মাত্র। তাহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ আর্যগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বা সম্প্রীতির পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে কমই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এক-একটি গোষ্ঠী ছিল এক-একটি গোষ্ঠীপতি বা রাজার অধীন, এক-একটি বিশিষ্ট বৈদিক দেবতার পূজক এবং এক-একটি বিশিষ্ট পুরোহিত বংশের যজমান। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ সংঘাত লাগিয়াই থাকিত। এই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের অবস্থা বৈদিক আর্য-সমাজের একটি দিকের চিত্র। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় বৈদিক যুগের কিছুকাল কাটিয়া গেলে যখন মধ্যদেশ আর্যসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলরূপে পরিচিত হইল তখন এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ পরবর্তী কালে আগত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আর্যগোষ্ঠীগুলিকে ঘৃণ্য ও অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে। অপর পক্ষে, অনার্যগণের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আর্যগোষ্ঠীগুলি ক্রমান্বয়ে ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে— ইহা সমকালীন ইতিহাসের আর একটি দিক। এই অনার্যবিরোধী সংগ্রাম ভারতবর্ষস্থ আর্যগণের সমুদায় রাষ্ট্র মিলিতভাবে পরিচালনা করে নাই। আর্যগণের বিভিন্ন উপজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘকালস্থায়ী এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে।

আর্যবিজয়ের ফলে কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে আর্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও আর্যসংস্কৃতির প্রভাব এই দেশের সর্বত্র সমান ভাবে পড়ে নাই। কাবুল, সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই প্রভাব যত গভীর, ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে তেমন নহে। আর্যপ্রভাবিত মধ্যদেশের সীমান্তবর্তী ভূভাগগুলিতে এবং বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সহিত আর্যগণকে বহু পরিমাণে আপস করিতে হইয়াছে। এই-জন্যই মধ্যদেশ বা আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিগর্বিত গ্রন্থকার-গণ অনার্যপ্রভাবমণ্ডলের অন্তর্গত অধিবাসীগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কীকট বা মগধকে (দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা) যাস্ক 'অনার্য-নিবাস' বলিয়া (নিরুক্ত ৬।৩২) এবং পরবর্তী পুরাণকারগণ 'পাপভূমি' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শ্রৌতসূত্রসমূহে মগধবাসী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত হীনমর্যাদা-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌধায়ন তাঁহার ধর্মসূত্রে অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ (পূর্ব), সিন্ধু, সৌবীর, সুরাষ্ট্র (পশ্চিম) এবং দাক্ষিণাত্যের জনগণকে বৈদিক আর্য-সভ্যতার পরিমণ্ডলের বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির একটি শ্লোকের (৩।২৯২) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা-টীকায় যে দেবল-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও প্রত্যন্তবাসী সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ ও সেইগুলির অধিবাসী সম্পর্কে অনুরূপ তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব প্রতিফলিত। ইহা হইতে বুঝা যায় আর্যাবর্ত বা মধ্যদেশের সীমানার বাহিরে বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে আর্যপ্রভাব দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলের সভ্যতায় ভারতের আর্যেতর অধিবাসীগণ সমধিক পরিমাণে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অবিমিশ্র আর্যসভ্যতা বলা চলে না, ইহা প্রকৃতপক্ষে আর্য-অনার্য মিশ্র সভ্যতা। ভারত-বর্ষের অভ্যন্তরে আর্যসভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই মিশ্রণপ্রক্রিয়াও সমানে চলিয়াছিল। অনার্য পরিবেশের প্রভাব ও আর্য ও অনার্যের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ ইহার নিমিত্ত অনেকটা দায়ী। মহাভারত ও পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঋষি দীর্ঘতমস ও অসুররাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার মিলনের ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ ভ্রাতার জন্ম হইয়াছিল (মহাভারত ১।১০৪।৪১-৫৫ ; বায়ুপুরাণ ৯৯।২৬-৩৪ ; মৎস্যপুরাণ ৪৮।৬০-৭৮ ; ভাগবত পুরাণ ৯।২৩।৫)। এই জন্মকাহিনী কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উক্ত নামধেয় পাঁচটি জনপদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য ও অনার্য রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই গঠিত হইয়াছে। সর্বত্র এইরূপ মিশ্রণের ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক কাঠামোটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।

তবে আর্যদের অবিমিশ্র প্রভাব না থাকিলেও ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তির ইতিহাসে ইহাদের ভূমিকা বিরাট। আর্যগণ বৈদিক সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার স্রষ্টা। যদিও এই সভ্যতা কালক্রমে বহু অনার্য উপাদান আত্মসাৎ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিয়াছে, তথাপি যাহাকে আধুনিক ভাষায় হিন্দু সংস্কৃতি বলা হয় ইহা তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ। বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে পৌরাণিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য

ষড়্‌দর্শন বেদকে অন্যতম প্রমাণস্বরূপ মানিয়াছে। আর্যসৃষ্ট বর্ণাশ্রমপ্রথা হিন্দুসমাজবিবর্তনের আদিতে। পরবর্তী কালে সমাজে যখনই বৃত্তিনির্ভর নব নব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে, হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপকগণ সেগুলিকে বর্ণাশ্রম-ধর্মের পরিধির মধ্যে উপযুক্ত স্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই ধারায় হিন্দুসমাজের বিবর্তন হইয়াছে। আর্যসৃষ্ট বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির কাহিনী অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকারগণ তাঁহাদের কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়াছেন; এই সকল কাহিনী ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহে অনূদিত ও অনুসৃত হইয়া যুগে যুগে জনচিত্তকে সরস রাখিয়াছে। আর্যগণের এই সকল কীর্তির সহিত পরিচয় না থাকিলে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না।

দ্র V. G. Childe, *The Aryans*, New York, London, 1926; V. G. Childe, *The Prehistory of European Society*, London, 1958; O. R. Gurney, *The Hittites*, London, 1952; E. Herzfeld, *Iran in Ancient East*, Oxford, 1941; E. J. Rapson ed., *Cambridge History of India*, vol. I, Cambridge, 1935; R. C. Majumdar ed., *History and Culture of the Indian People*, vol. I, London, 1951; D. R. Bhandarkar, *The Carmichael Lectures, 1918*, Calcutta, 1919; H. C. Raychaudhuri, *Studies in Indian Antiquities*, Calcutta, 1932; N. K. Dutt, *Aryanisation of India*, Calcutta, 1925; H. C. Chakladar, *Aryan Occupation of Eastern India*, Calcutta, 1963; R. Girshman, *Iran*, London, 1954.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আর্যভট (৪৭৬ খ্রী-?) ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌। তাঁহার বাসস্থান ছিল কুসুমপুর (পাটনা)। কালক্রিয়ার দশম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন যে কলিযুগের ৩৬০০ বর্ষে তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল ২৩ বৎসর। অতএব তাঁহার জন্মকাল ৩৫৭৭ কল্যব্দ, ৩৯৮ শকাব্দ বা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। আর্যভটের গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' মাত্র ১২১টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং চারিটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত: গীতিকাপাদ (১৩ শ্লোক), গণিতপাদ (৩৩ শ্লোক), কালক্রিয়া (২৫ শ্লোক) এবং গোলপাদ (৫০ শ্লোক)। গণিতপাদ, কালক্রিয়া ও গোলপাদ লইয়া যে ১০৮টি শ্লোক তাহা একত্রে আর্যাষ্টশত নামেও অভিহিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গীতিকাপাদে চতুর্যুগে অর্থাৎ এক মহাযুগে গ্রহাদির ভগণ, গণিতপাদে পাটীগণিত ও অন্যান্য গণিত, কালক্রিয়া-পাদে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ এবং গোলপাদে গ্রহ ও গোল বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে গণিতপাদে বিশুদ্ধ গণিত এবং অন্যান্য পাদে জ্যোতির্বিদ্যা ও তৎসংক্রান্ত গণিত আলোচিত হইয়াছে।

পরবর্তী কালে (৮৭৫ শক বা ৯৫৩ খ্রী) আর্যভট নামধেয় অপর এক জ্যোতির্বিদ্‌ আর্যসিদ্ধান্ত নামে এক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। আর্যভটের প্রতিপত্তি দেখিয়া স্বকৃত গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই পরবর্তী ব্যক্তি আর্যভট ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। তবে প্রথম আর্যভট হইতে এই পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌কে পৃথক করিবার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় আর্যভট নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এখনও তাঁহার আর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারেই পঞ্জিকা গণনা হয়।

প্রথম আর্যভটই ভারতীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের (সায়েন্টিফিক অ্যাস্ট্রনমি) প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীকদিগের নিকট ইনি অন্দুবেরিয়স বা অর্দুবেরিয়স এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার খ্যাতি ছিল ভূ-ভ্রমণ-প্রতিপাদক নামে। বাসস্থান কুসুমপুরেই তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। অল্‌-বীরূনী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কুসুমপুরের আর্যভট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর্যভটই সর্বপ্রথম দিন-রাত্রি ভেদের কারণস্বরূপ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা (ভূ-ভ্রমণবাদ) প্রচার করেন। তাঁহার প্রায় হাজার বৎসর পরে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী) কর্তৃক এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হয়। আর্যভট-প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতি পরবর্তী কালে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল প্রভৃতি অনেকেই ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

অক্ষর দ্বারা সংখ্যা প্রকাশের এক অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া আর্যভট তাঁহার গ্রন্থে উহা ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিতে ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্গাক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ পর্যন্ত সংখ্যা এবং য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ এই ৮টি অবর্গাক্ষর দ্বারা ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ এবং ১০০ সংখ্যা নির্দেশিত হয়। এই ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির সহিত নিম্নোক্ত স্বরবর্ণগুলি সংযুক্ত হইলে ইহাদের

স্থানীয় মান যথাক্রমে ১০০ গুণ করিয়া বর্ধিত হয়: ই=১০০, উ=১০০০০, ঋ=১০০০০০০, এই প্রকারে ৯, এ, ঐ, ও, ঔ। অ প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই যুক্ত বলিয়া অ=১ ধরিতে হইবে। এইভাবে, ক=ক্.অ=১.১ =১। উদাহরণস্বরূপ, ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ এক কল্পের (কাহঃ) বিভাগ বর্ণনায় তিনি লিখিলেন, কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শখ···, অর্থাৎ এক কল্পে ১৪টি মনু এবং প্রতি মনুতে ৭২টি মহাযুগ।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মগুপ্তাদি পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণ এক মনুতে ৭২টি মহাযুগের পরিবর্তে ৭১টি মহাযুগ স্বীকার করিয়াছেন। যদিও ৪৩২০০০০ বৎসরে এক মহাযুগ সর্বসম্মত কিন্তু আর্যভটের যুগবিভাগ পদ্ধতির সহিত পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের স্বীকৃত পদ্ধতির প্রভেদ আছে। আর্যভটমতে ১০০৮ মহাযুগে এক কল্প, অন্যান্য মতে ১০০০ মহাযুগে। আর্যভটমতে কলিযুগের মান মহাযুগের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১০৮০০০০ বৎসর, কিন্তু অন্যান্য মতে ৪৩২০০০ বৎসর মাত্র।

আর্যভটের পূর্বে প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া এ দেশে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের স্থূল পদ্ধতি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করা হইত। শেষ দিকে গ্রহগতির পর্যবেক্ষণও এ দেশে চলিতে থাকে এবং পর্যবেক্ষণের ফলে বহুকালের গ্রহাবস্থান পাওয়া সম্ভব হয়। ইহার মধ্যে স্থূল ও শুদ্ধ দুইই মিশ্রিত ছিল। সম্ভবতঃ এই সকল শুদ্ধাশুদ্ধ পরিদর্শন ফল বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাঁহার পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্তশাস্ত্র রচনা করেন। গোলপাদের দুইটি শ্লোক (৪৯, ৫০) হইতে এই সম্ভাবনার কথাও মনে হয় যে 'সায়ম্ভুব' নামে পূর্বপ্রচলিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করিয়াই 'আর্যভটীয়' প্রকাশ করা হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, আর্যভটই যুগবিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং কলিযুগের আরম্ভদিবস নির্দেশিত করেন। রবি প্রমুখ সকল গ্রহ এক মহাযুগে (৪৩২০০০০ বৎসরে) কতবার আবর্তন করে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। গ্রহগণের মন্দোচ্চ এবং পাতসমূহের কোনও গতি অবশ্য তিনি দেন নাই। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে যুগভগণ-প্রবর্তক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। আর্যভট দুই প্রকার গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, ঔদয়িক (অর্থাৎ লঙ্কায় মধ্যম সূর্যোদয় কাল হইতে গণনা আরম্ভ) এবং আর্ধরাত্রিক (অর্থাৎ লঙ্কা-উজ্জয়িনীতে মধ্যম মধ্যরাত্রি হইতে গণনা আরম্ভ)। পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণ আর্ধরাত্রিক পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর্যভট-প্রবর্তিত ও সর্বস্বীকৃত কলিযুগের আরম্ভকাল ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, ফেব্রুয়ারি ১৭।১৮ মধ্যরাত্রি। এই সময়ে সকল গ্রহ মধ্যগতিতে মেষাদিতে অবস্থিত ছিল, ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য গণনা দ্বারা দেখা যায় যে তৎকালে প্রকৃত গ্রহমধ্য স্বীকৃত স্থান হইতে অনেক দূরবর্তী ছিল, যেমন রবিতে ৯ অংশ, চন্দ্রে ৫ অংশ, বুধে ৪২ অংশ— এই প্রকারের ভুল ছিল। আর্যভটের কালে অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দে কিন্তু গণিত গ্রহস্থান প্রকৃত গ্রহস্থানের অতি সন্নিকটেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর্যভট শকাব্দ ব্যবহার করিতেন না, তিনি তাঁহার প্রবর্তিত কল্যব্দই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির শকাব্দ ব্যবহার করিতেন।

হিন্দু জ্যোতিষে আর্যভটের আর একটি অবদান, পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহগতির ব্যাখ্যা প্রদান। আর্যভট 'লক্ষ'র পরের স্থান নিযুতকে প্রযুত এবং ১০ কোটিকে অব্জ বলিয়াছেন। বর্তমান ত্রিকোণমিতিতে আমরা যাহাকে 'সাইন' বলি আর্যভট তাহাকে জ্যার্ধ বলিয়াছেন এবং এই জ্যার্ধের মান ৩ ৪৫ অন্তরে গণনা করিয়া এক সারণী দিয়াছেন।

গণিতে বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি তিনি বিবৃত করেন। বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের যে অনুপাত (অর্থাৎ π) আর্যভটই বোধ করি তাহা সর্বপ্রথম সঠিক ভাবে নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে $\pi = \frac{৬২৮৩২}{২০০০০} = ৩.১৪১৬$। সমান্তর শ্রেণীর যোগফল এবং একাদি প্রাকৃত সংখ্যার বর্গসমূহ ও ঘনসমূহের যোগফল তিনি শুদ্ধভাবে দিয়াছেন।

আর্যভটের কয়েকজন শিষ্য টীকাকার হিসাবে হিন্দু জ্যোতিষে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তন্মধ্যে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর ও লল্ল-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাটদেব আর্যভটের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করেন। আচার্য আর্যভট পরে বৃদ্ধ আর্যভট নামে খ্যাত হন। গুণগ্রাহীরা তাঁহার নাম দিয়াছিল 'সর্বসিদ্ধান্তগুরু'।

দ্র *The Aryabhatiyam*, tr. Probodhchandra Sengupta, Calcutta, 1927 ; Prabodhchandra Sengupta, *Aryabhata : The Father of Indian Epicyclic Astronomy*, Calcutta, 1928.

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

আর্যসমাজ উনবিংশ শতকে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শ হেতু ভারতবর্ষে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার-আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, আর্যসমাজ-আন্দোলন তাহাদের অন্যতম।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৫-১৮৮৩ খ্রী) পশ্চিম ভারতে কাঠিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত মোরভি শহরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম মূল শংকর। শিবোপাসনা তাঁহার কুলধর্ম ছিল কিন্তু শৈশবেই তিনি প্রতীকপূজায় বিশ্বাস হারাইয়া মোক্ষলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেন। সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক প্রথমে তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরে বেদান্তমতে আস্থাহীন হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন করেন ও অবশেষে মথুরাবাসী সন্ন্যাসী স্বামী বিরজানন্দের নিকট বেদাধ্যয়নপূর্বক বেদে সুপণ্ডিত হন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বেদে যে ধর্ম বিবৃত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম, পরবর্তী কালের পৌরাণিক ধর্ম বিশেষতঃ প্রতিমাপূজা একটি বিকৃত কুসংস্কার মাত্র। বেদকে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত আপ্তশাস্ত্র এবং সর্ববিধ মানবজ্ঞানের আধার মনে করিতেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌরাণিক ধর্মকে অপসারিত করিয়া বিশুদ্ধ বেদসম্মত হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল বোম্বাইয়ে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ানন্দ ও তৎপরবর্তী নেতৃবৃন্দের আদর্শনিষ্ঠা ও সংগঠনপ্রতিভা -হেতু আর্যসমাজের এই আন্দোলন উত্তর ভারতে দ্রুত বিস্তারলাভ করে এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল ইহার শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ইহা তেমন জনপ্রিয় হয় নাই।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে আর্যসমাজের গঠনতন্ত্র ও ধর্মমত চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়। নিম্নলিখিত দশটি নীতির মাধ্যমে এই সময়ে ইহার মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছিল: ১. ঈশ্বর সর্ববিধ জ্ঞানের উৎস। ২. ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়বান, দয়াবান, অজাত, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, অনাদি, অতুলনীয়, সর্ব প্রাণীর প্রভু ও সহায়, সর্বত্রস্থিত, সর্বজ্ঞ, অক্ষয়, অমর, ভয়রহিত, অনন্ত, পবিত্রস্বরূপ ও জগৎকারণ। তিনিই একমাত্র পূজনীয়। ৩. আপ্তশাস্ত্র চতুর্বেদ সর্বজ্ঞানের আকর। ইহা পাঠ করা, শ্রবণ করা ও প্রচার করা প্রত্যেক আর্যের (আর্যসমাজের সভ্যের) কর্তব্য। ৪. প্রত্যেক আর্য সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জন করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। ৫. ন্যায়-অন্যায় বিচারপূর্বক ধর্মসংগত ভাবে সর্বদা কার্য করিতে হইবে। ৬. আর্যসমাজ মানবজাতির দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। ৭. প্রীতি ও ন্যায়দৃষ্টি -সহকারে গুণবিচারপূর্বক লোকের সহিত ব্যবহার কর্তব্য। ৮. অজ্ঞান দূরীকরণ ও জ্ঞানের প্রসার সর্বথা কর্তব্য। ৯. কেবলমাত্র নিজের মঙ্গলচিন্তা মানুষের কাম্য নহে, সর্বসাধারণের স্বার্থের সহিত নিজ স্বার্থ মিলাইয়া দেখা উচিত। ১০. জাতির সর্বাত্মক সামাজিক কল্যাণসাধনের প্রশ্নে ব্যক্তিগত স্বার্থবশতঃ প্রতিকূলতা করা উচিত নহে; অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রত্যেকেরই আচরণের স্বাধীনতা আছে। উক্ত দশটি নীতি প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আর্যের অবশ্যপালনীয়।

আর্যসমাজ বেদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানেন বটে, কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার নিজস্ব রীতিতে বেদের যে বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন একমাত্র তাহাই এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত। এই গোষ্ঠী অদ্বৈতবাদ বা একতত্ত্ববাদ স্বীকার করেন না। ইঁহারা ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ইঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী দয়ানন্দ রচিত 'সত্যার্থপ্রকাশ' নামক ধর্মগ্রন্থকে এই সম্প্রদায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর করেন।

আর্যসমাজ প্রচলিত অর্থে জাতিভেদপ্রথা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার জন্যই মূলতঃ চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, ধর্মের সহিত এই ব্যবস্থার কোনও সম্পর্ক নাই। যে কোনও বর্ণের হিন্দু আর্যসমাজের সভ্য হইতে পারেন। হিন্দুসমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যগণকে সভ্য হইবার অধিকার দান করিয়া এবং 'শুদ্ধি' ক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ দিয়া এই সম্প্রদায় হিন্দুর সামাজিক সংহতি রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ মতভেদহেতু আর্যসমাজ প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। মাংসাহারের ঔচিত্য ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের আদর্শ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এই মতভেদের কারণ। প্রাচীনপন্থীগণ মাংসাহার পাপ মনে করিতেন এবং বেদমূলক শিক্ষা ও বৈদিক ঐতিহ্যের প্রচার প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিতেন। আধুনিকপন্থীগণ মাংসাহার নিন্দনীয় মনে করেন না এবং তাঁহারা বৈদিক আদর্শ বিসর্জন না দিয়াও যুগোপযোগী পাশ্চাত্ত্য উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। প্রাচীনদলের আদর্শ হরিদ্বারের সুবিখ্যাত গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রূপগ্রহণ করিয়াছে; নবীনদল তাঁহাদের অনুমোদিত কর্মপন্থানুসারে লাহোরের বিখ্যাত 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ' নামক প্রতিষ্ঠান (দেশবিভাগের

পরে ভারতে স্থানান্তরিত) গড়িয়া তুলিয়াছেন। সাধারণভাবে আর্যসমাজের নবীন দল উচ্চশিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি কল্যাণকর্মে উৎসাহী।

কার্যপরিচালনার জন্য আর্যসমাজের একটি নিখিল ভারতীয় সংস্থা আছে। ইহার অধীনে প্রাদেশিক সংগঠনসমূহ ও সেগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে উপাসক-সংঘসকল পরিচালিত হয়। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে আর্যসমাজের উপাসনাকার্য নির্বাহ হয়। ইহাদের কোনও পুরোহিত সম্প্রদায় নাই, তবে বেতনভোগী প্রচারকদল আছেন। 'দয়ানন্দ সরস্বতী' দ্র।

দ্র. পণ্ডিত লেখ্‌রাম ও লালা আত্মারাম, মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ কা জীবনচরিত্র, ১৮৯৭; দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থপ্রকাশ, বঙ্গানুবাদ, কলিকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। Pandit Kharak Singh & H. Martyn Clark, *The Principles and Teaching of the Arya Samaj*, 1887; J. C. Oman, *Cult, Customs and Superstitions of India*, 1908; Lajpat Rai, *The Arya Samaj : An Account of Its Origin, Doctrines, and Activities with a Biographical Sketch of the Founder*, London, 1915.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আর্যাবর্ত আর্যাবর্ত বলিতে মূলতঃ আর্যজাতি-অধ্যুষিত দেশ বুঝাইত। আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে উহার নিকটবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমশঃ পূর্বদিকে আর্য অধিকার প্রসারিত হইতে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে রচিত বৌধায়নধর্মসূত্রে (২।২।১৬) সর্বপ্রথম আর্যাবর্তের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইয়াছে— পশ্চিমে অদর্শন (বিনশন বা কুরুক্ষেত্র), পূর্বে কালকবন (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলবিশেষ), উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে পারিযাত্র (পশ্চিম বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বত)। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও আর্যাবর্তের ঐরূপ সীমানির্দেশ করিয়াছেন (২।৪।১০)।

পরবর্তী কালে ভৌগোলিক সংজ্ঞা হিসাবে আর্যাবর্তের অর্থবিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত মনুস্মৃতিমতে (২।২২-২৩) আর্যাবর্তের চতুঃসীমা এইরূপ : উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র অর্থাৎ পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর। এই আর্যাবর্তের মধ্যভাগে বিনশনের পূর্বে এবং প্রয়াগ বা এলাহাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত জনপদের নাম মধ্যদেশ। সুতরাং প্রাচীন যুগে যাহাকে আর্যাবর্ত বলা হইয়াছে, মনুস্মৃতিতে উহারই নাম মধ্যদেশ। মনুর সময় হইতে উত্তর ভারতকে আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণ ভারতকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ বলা হইতে থাকে।

সমগ্র ভারতকে অখণ্ড 'চক্রবর্তিক্ষেত্র' কল্পনা করা হইত এবং অনেক সময় উহা পৃথিবী নামে উল্লিখিত হইত। প্রাচীন ভারতীয় সম্রাটেরা গতানুগতিকভাবে আপনাদিগকে এই পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। আবার উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজগণ অনুরূপভাবে কখনও কখনও আপনাদিগকে কেবলমাত্র আর্যাবর্ত অথবা দক্ষিণাপথের সম্রাট্ বলিয়া দাবি করিতেন। ভোজপ্রবন্ধে একাদশ শতাব্দীর পরমারবংশীয় নরপতি ভোজকে 'দক্ষিণাপথ ও গৌড়ের অধীশ্বর' বলা হইয়াছে। এখানে গৌড় বলিতে আর্যাবর্ত বুঝিতে হইবে; সুতরাং ভোজরাজকে অখণ্ড চক্রবর্তিক্ষেত্র অর্থাৎ সমগ্র ভারতের অধিপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর্যাবর্ত অর্থে গৌড় নাম ব্যবহারের কারণ এই যে, মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্য এবং আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণসমাজকে যথাক্রমে পঞ্চদ্রাবিড় এবং পঞ্চগৌড় বলা হইত।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient & Medieval India*, London, 1927; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient & Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

আলওয়ার রাজস্থানের জেলা ও জেলা-সদর। আয়তন ৮২৯৭ বর্গ কিলোমিটার (৩২৪১ বর্গমাইল)। আলওয়ার শহর (২৭°৫৪´ উত্তর, ৭৬°৩৮´ পূর্ব) রেলপথে দিল্লী হইতে ১৫৮ কিলোমিটার, বোম্বাই হইতে ১২৭৪ কিলোমিটার এবং কলিকাতা হইতে ১৬৮৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর।

এই জেলায় আলওয়ার, বেহরোর, রাজগড় ও তিজারা— এই চারিটি মহকুমা আছে।

স্বাধীন ভারতের প্রশাসনব্যবস্থার সহিত অঙ্গীভূত হইবার পূর্বে আলওয়ার পূর্বতন রাজপুতানার পূর্বপ্রান্তে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। আলওয়ারের রাজন্যবর্গ চতুর্দশ শতকের শেষভাগে অম্বরের সিংহাসনে সমাসীন উদয়করণের জ্যেষ্ঠপুত্র বর সিং-এর বংশধর। এই বংশের প্রতাপ সিং আলওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপ সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র বখ্‌তাওয়র সিং রাজা

হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় (১৮০৩-১৮০৫ খ্রী) তিনি ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দত্তক পুত্র বন্নি সিং সিংহাসন লাভ করেন। আলওয়ার শহরের 'বন্নি বিলাস' রাজ-প্রাসাদ বন্নি সিং-এরই কীর্তি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র শিওদাঁ সিং মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে রাজ্য লাভ করেন। তাই শাসনকার্য চালনার জন্য ইংরেজ সরকার একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং কাউন্সিল অফ রিজেন্সি গঠিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিওদাঁ সিং-এর মৃত্যু হইলে মঙ্গল সিং, জয় সিং প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজপদ লাভ করেন। আলওয়ারের মহারাজা ১৫ তোপের সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার জনসংখ্যা ১০৯০০২৬। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৭৬২৩৪ এবং স্ত্রীলোক ৫১৩৭৯২ জন। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৯২ : ১০০০। তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির লোক-সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৪০২৮ ও ৮৮৪৫৪। প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে ২৪৬ জন ও প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ৪৯ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। আলওয়ার শহরের জনসংখ্যা ৭২৭০৭। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৯১০২ ও স্ত্রীলোক ৩৩৬০৫। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৫৯ : ১০০০।

আলওয়ার জেলায় বাঘ, চিতাবাঘ, হায়েনা, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে তাঁত, পাগড়ির রঞ্জনকার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিজার-এ কাগজ তৈয়ারি হয়। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকাসঞ্জাত লবণ হইতে একপ্রকার অপকৃষ্ট কাচ ও তদ্দ্বারা বোতল, কাচের চুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। খনিজ-দ্রব্যে সমৃদ্ধ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে তাম্র, লৌহ ও সীসা পাওয়া যায়। আলওয়ার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শ্বেত ও কৃষ্ণ -মর্মরপ্রস্তর বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাস্কর্যশিল্পের কাজে ঝিরি অঞ্চলের মর্মরপ্রস্তর ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমানে এই জেলায় কুটির-শিল্পে ২৪৫৬২ জন কর্মী (পুরুষ ১৬৫১১ ও স্ত্রীলোক ৮০৫১) নিযুক্ত আছে।

দ্র *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962 ; *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Rajputana*, Calcutta, 1908.

দিনেনকুমার সোম

আলকাতরা আলকাতরা শব্দটি পর্তুগীজ অলকাত্রো শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অভিধানগত অর্থ হইল পাথুরে কয়লা পাতন করিয়া প্রস্তুত কালো নির্যাস।

কয়লা নানা প্রকারের হয়; যেমন, পিট (কার্বনের পরিমাণ ২৯%), লিগ্‌নাইট (কার্বনের পরিমাণ ৪৩%), বিটুমিনাস বা কাঁচা কয়লা (কার্বনের পরিমাণ ৬৪%), অ্যানথ্রাসাইট (কার্বনের পরিমাণ ৮৭%) ইত্যাদি। কাঁচা কয়লার মূল উপাদান কার্বনের সহিত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যুক্ত থাকে। তৎসহ সামান্য পরিমাণে ধাতব উপাদানও থাকে— কয়লা পুড়িলে ইহা ভস্মাকারে অবশিষ্ট থাকে। বদ্ধপাত্রে তাপ দিয়া কাঁচা কয়লা পাতন করিলে কালো গাঢ় চটচটে আলকাতরা পাওয়া যায়।

বায়ুর সংস্পর্শ এড়াইয়া কেবল একটিমাত্র নলপথ খোলা রাখিয়া বদ্ধপাত্রে কাঁচা কয়লা রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণে তাপ দিয়া (৩৫০° হইতে ১০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত) পাতন করিলে কয়লার উপাদানগুলি বিয়োজিত হয়। এবং বিয়োজিত অংশগুলি বিভিন্ন উষ্ণতায় পৃথক হইয়া আসে। যে অংশগুলি উদ্বায়ী (ভোলাটাইল), তাহাদের পাত্র হইতে নলপথে বাহিরে জলের মধ্যে আনা হয়। তপ্ত বদ্ধপাত্রে পড়িয়া থাকে শতছিদ্রযুক্ত কোক কয়লা। এই প্রণালীকে অন্তর্ধূম পাতন বা কাঁচা কয়লার অঙ্গারীভবন বলে। জলের মধ্যে ঝাঁঝাল গন্ধের অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্রবীভূত হয়। কয়লার গ্যাস জল হইতে বুদ্‌বুদ্ আকারে বাহিরে আসে। পাত্রে জলের উপর উগ্রগন্ধযুক্ত কালো চটচটে গাঢ় পদার্থ জমে। ইহাই আলকাতরা বলিয়া পরিচিত।

১০০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক টন কাঁচা কয়লার অঙ্গারীভবনে পাওয়া যায় :

কয়লা গ্যাস	১০০০০	ঘনফুট
অ্যামোনিয়া-ঘটিত জলীয় অংশ	৮	গ্যালন
ইহা হইতে পাওয়া যায় :		
অ্যামোনিয়া সালফেট	২৫	পাউণ্ড
আলকাতরা	১০০	পাউণ্ড
কোক কয়লা	১৫০০	পাউণ্ড

আলকাতরা বেশি পরিমাণে পাইতে হইলে ৫০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অঙ্গারীভবন করা বাঞ্ছনীয়, তাহাতে প্রায় টন প্রতি ২০০ পাউণ্ড আলকাতরা উৎপন্ন হয়।

আলকাতরা অনেকগুলি যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ। ইহাতে তাপ দিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে চুয়াইলে বা আংশিক পাতন করিলে বিভিন্ন উষ্ণতায় বিবিধ অংশ

পৃথক হয়। পরে প্রত্যেকটি অংশ আবার আংশিক পাতন করিলে প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া আসে।

এক টন আলকাতরা আংশিক পাতনে কতকগুলি তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ পৃথক হয়:

প্রথম অংশ	১৭০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত	১২ গ্যালন
দ্বিতীয় . . .	১৭০° ২৩০° সেন্টিগ্রেড	২০ . . .
তৃতীয় . . .	২৩০-২৭০° সেন্টিগ্রেড	১৭ . . .
চতুর্থ . . .	২৭০° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বে	৩৮ . . .
কঠিন পিচ		১১ হন্দর

প্রথম অংশ হইতে বেন্‌জিন, টলুইন, জাইলিন প্রভৃতি তরল পদার্থ পৃথক করা যায়। দ্রাবক হিসাবে এইগুলির উপযোগিতা আছে। বেন্‌জিন, জাইলিন রেশমি বস্ত্র কাচিতে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি হইতে ঘি, তেল ইত্যাদির দাগ উঠাইতেও এইগুলি কাজে লাগে। বিভিন্ন রঞ্জক-দ্রব্য প্রস্তুতিতে ও যৌগিক বিশ্লেষণেও বেন্‌জিন, টলুইন, জাইলিন প্রয়োজন। আজকাল কীটনাশক ডি. ডি. টি -প্রস্তুতিতে বহুল পরিমাণে বেনজিন লাগিতেছে।

দ্বিতীয় অংশ হইতে ন্যাপথলিন ও কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। ন্যাপথলিন চূর্ণ কীট নিবারণে ও রঞ্জক উৎপাদনে কাজে লাগে। কার্বলিক অ্যাসিডের জীবাণু-নাশক ব্যবহার বহুপ্রচলিত। আর ইহা হইতে প্রাপ্ত পিরিডিনের দ্বারা বিভিন্ন যৌগিক সংশ্লেষণ করা সম্ভব। ইহাদের অনেকগুলি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত।

তৃতীয় অংশ হইতে কার্বলিক অ্যাসিড, ক্রেসল প্রভৃতি জীবাণুনাশক পদার্থ পাওয়া যায়। সাবানের দ্রবণ ও ক্রেসলের মিশ্রণ লাইজল ও ফিনাইল নামে তরল জীবাণু-নাশকরূপে পরিচিত। নির্জলা ক্রেসল ক্রিয়োজোট তেল নামে কীট-পতঙ্গ হইতে কাঠের কড়ি বরগা তক্তা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এই অংশে কুইনোলিন পাওয়া যায়।

চতুর্থ অংশ হইতে অ্যানথ্রাসিন, ফিনান্‌থ্রিন প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়। বিবিধ রঞ্জক উৎপাদনে এইগুলি প্রয়োজনীয়।

পিচ প্রধানতঃ রাস্তার আস্তরণের জন্য এবং ছাদের জল পড়া বন্ধ করিতে লাগে।

আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় পদার্থ (শতকরা পরিমাণ):

কার্বন ও হাইড্রোজেন -যুক্ত		কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন -যুক্ত	
বেন্‌জিন	০.১	কার্বাজল	১.১
টলুইন	০.২	পিরিডিন	০.১
জাইলিন	১.০	অন্যান্য পিরিডিন, কুইনোলিন জাতীয় পদার্থ	২.০
ন্যাপথলিন	১০.৯		
ফিনান্‌থ্রিন	৪.০		
অ্যানথ্রাসিন	১.১		

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন -যুক্ত	
অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ	২.৫
তন্মধ্যে কার্বলিক অ্যাসিড	০.৭
ক্রেসল	১.১

আমাদের দেশে কাঁচা কয়লা অঙ্গারীভবন করা হয়। তবে বেশি উষ্ণতায় করা হয় বলিয়া তাহাতে ভাল কোক কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপন্ন আলকাতরা পরিমাণে কম হয়। কোক কয়লা ভাল জাতির হইলে তাহা লৌহ উৎপাদনে ব্যবহার হয়। জামসেদপুর টাটা কোম্পানি, কুলটির লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, গিরিডিতে রেলওয়ে কোম্পানি, ঝরিয়ায় বরাকর কোলিয়ারি প্রভৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কোক কয়লা উৎপাদনের জন্য কাঁচা কয়লা অঙ্গারীভবন করিয়া থাকে। আলকাতরা উৎপাদন ও তাহা হইতে বিবিধ পদার্থ পৃথকীকরণ সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে শুরু হইয়াছে। দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত কোক চুল্লি বেন্‌জিন ইত্যাদি পৃথক করিতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল বহুকাল হইতে ন্যাপথলিন পৃথক করা চালু রাখিয়াছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট অনেক লৌহ শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে। কুসুন্দায় বারারি কোক কোম্পানি, লোদনায় শালিমার টার প্রোডাক্ট্‌স্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আলকাতরা হইতে বিবিধ যৌগিক পৃথক করে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম যখন কোক কয়লা তৈয়ারি শুরু হইল, তখন উপজাত আলকাতরা ফেলিবার স্থান লইয়া সমস্যা দেখা দিল। ইহার মধ্যে যে এত অমূল্য সম্পদ আছে তাহা জানিতে বহু দিন সময় লাগিয়াছে। ১৮২০ সালে প্রথম আলকাতরার আংশিক পাতন করিয়া মাত্র কয়েকটি বস্তুতে পৃথক করা হয়। উপাদানগুলির আবিষ্কার-সাল বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হইল, যথা, অ্যানথ্রাসিন (১৮৩২ খ্রী), কার্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন, কুইনোলিন ও পাইরল (১৮৩৪ খ্রী), আরও ৪৬টি পদার্থ পাওয়া গেল (১৮৬০-১৮৯১ খ্রী), ৭৯টি অতিরিক্ত যৌগিক পাইতে ১০ বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে (১৯৩১-১৯৪০ খ্রী)। আজ আলকাতরা হইতে প্রায় ১৫০টি বিভিন্ন মূল্যবান যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

বর্তমান কালকে আলকাতরা-লব্ধ বিবিধ রাসায়নিকের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। সংক্ষেপে-বলিতে গেলে উৎপন্ন যৌগিকের সাহায্যে রঞ্জক, ঔষধ, বিস্ফোরক, প্লাস্টিক্‌স

প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আলট্রাসনিক্‌স সুপারসনিক্‌স দ্র

আলপনা ঘরের মেঝে, দেওয়াল বা উঠানে পিটুলির সাহায্যে সম্পাদিত মাঙ্গলিক অঙ্কন। সংস্কৃত আলিম্পন শব্দ হইতে আলিপনা বা আলপনা শব্দের উৎপত্তি, এইরূপ অনুমান করা হয়। সাধারণতঃ গৃহবধূরা এই অঙ্কনকার্য করিয়া থাকেন। বৌছত্র নামেও ইহা কোথাও কোথাও পরিচিত। বাংলার বাহিরে ইহার নাম রঙ্গোলি। মঙ্গল বা মন্ত্রের মত ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অঙ্কিত হয় না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই ইহার প্রচলন দেখা যায় কিন্তু বঙ্গ হইতে গুজরাট পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলের সমীপবর্তী একটি বেষ্টনীর মধ্যেই ইহার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশে ও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আলপনা সুপ্রচলিত। উপকূলভূমির অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃই ইহার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটে। হিন্দুর সামাজিক উৎসবে মণ্ডনশিল্প হিসাবে আলপনার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। ধর্মানুষ্ঠানে, বিশেষতঃ পুরাণপ্রভাবশূন্য মেয়েলি ব্রত আচারে আলপনা নিতান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। কেহ কেহ তাই মনে করেন যে আর্য আগমনের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে আলপনা অঙ্কনের রীতি চলিয়া আসিতেছে। অনেকের মতে বঙ্গ দেশেই ইহার সর্বাধিক উন্নতি। তবে মাদ্রাজ বা গুজরাটের আলপনার কাজও বেশ উন্নত ধরনের।

আলপনার পশ্চাতে প্রায়শঃই একটি আভিচারিক অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে। পূর্বকালে জনসাধারণের ধারণা ছিল যে কামনার বস্তুর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করিয়া কিংবা প্রতিমূর্তি গড়িয়া তাহার নিকট আন্তরিক কামনা ব্যক্ত করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

সমতল ক্ষেত্রই আলপনার উপযোগী। সাধারণতঃ গৃহপ্রাঙ্গণে বা ঘরের মেঝেতে ইহা অঙ্কিত হয়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কুলা ও পিঁড়ি অঙ্কিত করার প্রথা আছে। ধর্মানুষ্ঠানে কিংবা সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে মাটি বা কাঁসার ঘটজাতীয় পাত্রের উপরও আলপনা আঁকা হয়। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর চৌকি, ঘরের খুঁটি, মাটির সরা প্রভৃতিও চিত্রিত হয়। সরার পিঠে থাকে লাল নীল সবুজ হলুদ কালো রঙে লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আলপনা।

সাধারণতঃ আতপ চাউল দুই তিন ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর খুব মিহি করিয়া বাটিয়া তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইয়া প্রস্তুত করা শাদা পিটুলিই আলপনার মূল রং। অবশ্য পিটুলির সহিত অন্যান্য রং মিশাইবার রীতিও দেখা যায়। নানা রকমের পাতা ও শস্যাদির গুঁড়া কোনও কোনও আলপনা আঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পিটুলি দিয়া আঁকিবার পদ্ধতিটি অত্যন্ত সরল। দক্ষিণ হস্তের চারিটি অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ধরিয়া পিটুলিতে ডুবাইয়া লইয়া মধ্যমার সাহায্যে অঙ্কনকার্য করা হয়। অন্যান্য অঙ্গুলির তুলনায় মধ্যমা অপেক্ষাকৃত প্রসারিত বলিয়া অঙ্কনের বিশেষ সহায়ক। আলপনার কেন্দ্রস্থল হইতেই শিল্পী সর্বদা অঙ্কন আরম্ভ করেন এবং ধাপে ধাপে পার্শ্বের স্থানগুলি নানা প্রকারের নকশা দিয়া অলংকৃত করেন। আলপনায় সাধারণতঃ দুই রকমের নকশা ব্যবহৃত হইয়া থাকে— আনুষ্ঠানিক ও আলংকারিক। আনুষ্ঠানিক নকশাগুলির চিত্রণ লোকপরম্পরাগত প্রথা অনুযায়ী হওয়া এবং সঠিক স্থানে বসানো প্রয়োজন, শিল্পীর কোনও রকম স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে চলে না। কিন্তু অলংকরণ ভাগে শিল্পী তাঁহার কল্পনা চরিতার্থ করিতে পারেন।

আলপনার বিষয়বস্তু যদিও নানা প্রকারের, তথাপি তাহার প্রায় সবগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উপাদানের উপর ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন লতা-পাতা শঙ্খ পদ্ম মৎস্য ইত্যাদি। অবশ্য এগুলি সব সময়ে বাস্তব রূপে অঙ্কিত হয় না।

দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৪, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; Ananda K. Coomaraswamy, 'The Nature of Folklore and Popular Art', *Indian Art and Letters*, *vol XI, No. II*; Tapanmohan Chatterjee, *Alpona*, Calcutta, 1948.

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আলফা-কণা তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত এক বিশেষ ধরনের রশ্মির (আলফা-রশ্মির) উপাদান। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড আলফা-কণাকে হিলিয়াম অণুর নিউক্লিয়াসে (কেন্দ্রে) অবস্থিত ক্ষুদ্র কণা বলিয়া নিরূপিত করেন। ইহা দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইহার বৈদ্যুতিক চার্জ ধনাত্মক। ইহার প্রতীক চিহ্ন $_2He^4$। নীচের 'দুই' সংখ্যাটি বুঝায় কণাটির বৈদ্যুতিক চার্জ ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক চার্জের দ্বিগুণ এবং উপরের 'চার'

সংখ্যাটি বুঝায় যে ইহার ভর একটি প্রোটনের (এবং মোটামুটিভাবে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর) ভরের চার-গুণ। ইহার ব্যাস মোটামুটি ৩·২২ × ১০$^{-১৩}$ সেন্টিমিটার এবং ভর ৬·৬৫ × ১০$^{-২৪}$ গ্রাম।

আলফা-রশ্মি বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত আলফা-কণার স্রোতকে আলফা-রশ্মি বলে। কত বেগে আলফা-কণা নির্গত হইবে অর্থাৎ আলফা-রশ্মি প্রবাহিত হইবে, তাহা তেজস্ক্রিয় পদার্থটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৬১০০ কিলোমিটার (১ ০০০ মাইল) পর্যন্ত হইয়া থাকে। বাতাসের মধ্যে ইহারা কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভেদ করিয়া যাইতে পারে। যে গ্যাসীয় পদার্থের ভিতর দিয়া আলফা-রশ্মি প্রবাহিত হয়, তাহার অণু-পরমাণুসমূহ আয়নায়িত হয়। তখন ইহা ফোটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়া করে। ফ্লোরেসেন্ট পর্দায় যখন এই রশ্মি পড়ে তখন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ছোট জানালাবিশিষ্ট গাইগার কাউণ্টার দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'তেজস্ক্রিয়া' ও 'গাইগার কাউণ্টার' দ্র।

অলক চক্রবর্তী

আলবুকের্ক (১৪৫৩-১৫১৫ খ্রী) পর্তুগীজ-ভারতের গভর্নর এবং ভারতে পর্তুগীজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক স্কোয়াড্রনের অধিনায়করূপে তিনি প্রথম ভারতে আসেন। নৌবিভাগীয় কার্যে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে গোয়া এবং পর বৎসর মলাক্কা রাজ্য অধিকার করেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে আরবের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র অর্মুজ দ্বীপও তাঁহার অধিকারে আসে। এইরূপে তাঁহার চেষ্টায় পর্তুগীজেরা পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিক শক্তিশালী নৌশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্মচ্যুত হন এবং ঐ বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আলমগীর ঔরঙ্গজেব দ্র

আলমোড়া উত্তর প্রদেশ রাজ্যের কুমায়ুন বিভাগের অন্যতম জেলা ও ঐ জেলার সদর মিউনিসিপ্যাল শহর। আলমোড়া হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এই জেলার আয়তন ৭০২৭ বর্গ কিলোমিটার (২৭১৩ বর্গ-মাইল) এবং ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ৬৩৩৪০৭ অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৩৩ জন)। সদর পৌর এলাকার কাছে একটি সৈন্যাবাস (ক্যান্টনমেণ্ট) আছে। গত জনগণনা অনুযায়ী আলমোড়া শহরের জনসংখ্যা ১৬৬০২ এবং সৈন্যাবাসের জনসংখ্যা ৫৯৮।

আলমোড়া জেলা উত্তর প্রদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহার একটি বিস্তীর্ণ অংশ তুষারাবৃত পর্বতমালায় বেষ্টিত। এই জেলার পশ্চিমে ত্রিশূল (৭১২০ মিটার) এবং তাহার উত্তর-পূর্বে ভারতের সর্বোচ্চ শিখর নন্দাদেবী (৭৮১৭ মিটার)। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি অন্যূন ৬০০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শৃঙ্গ নন্দাঘুণ্টি ও নন্দাকোট আলমোড়ার অন্তর্বর্তী। জেলার প্রধান নদীগুলি দুই ধারের উন্নত গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী গভীর খাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কোশী, পিণ্ডারী, সরযূ এবং সরযূর প্রধান শাখা গোমতী এই জেলার প্রধান নদী।

আলমোড়ায় অল্প পরিমাণে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে গভীর অরণ্যই এ জেলার প্রধান সম্পদ। এখানকার অরণ্যে দেবদারু, চীড়, পাইন, রডোডেনড্রন প্রভৃতি বহু প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, কিন্তু বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ হইতেছে শাল। শাল কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা অনুপনগর, বেরিলী, মীরাট, মোরাদাবাদ, কানপুর ও আগ্রা প্রভৃতি উত্তর প্রদেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে চালান যায়। আলমোড়া জেলায় আপেল, নাশপাতি, চেরী, আখরোট, পীচ, কমলা, আম, জাম, কলা প্রভৃতি ফল জন্মায়। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ফালির মত কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারি করিয়া আলু, ধান, গম প্রভৃতির চাষ শুরু হইয়াছে। উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলে চাষ-আবাদ সম্ভব নয়— সেখানে পশুচারণ করা হয়। পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়া আসিলেও আলমোড়ার অরণ্য অঞ্চলে এখনও বহুপ্রকার বন্য পশু এবং হিংস্র শ্বাপদ নেকড়ে আছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে চমরী, অশ্ব, ছাগ এবং মেষই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার নকশা করা কাঠের কাজ, বেতের ঝুড়ি, মাদুর ও পশমদ্রব্য প্রসিদ্ধ। আলমোড়ায় সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ রাজ্য-সরকারের উদ্যোগে একটি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। বাগেশ্বরে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

আলমোড়ার পার্বত্য জাতিদের মধ্যে ভোট ও খস প্রধান। স্থানীয় প্রবাদে বলা হইয়া থাকে যে শকগণ

কুমায়ুন গিরি-অঞ্চলের প্রাচীনতম শাসকগোষ্ঠী এবং আধুনিক যুগেও বহুদিন পর্যন্ত অনেক স্থানীয় ভূম্যধিকারী শালিবাহনদের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, যদিও তাহার সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন। তবে খসদের সংখ্যাধিক্য এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট ছিল। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে মধ্য এশিয়া হইতে ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু ইহাদের নিজেদের আখ্যান অনুযায়ী ইহারা পতিত রাজপুত।

যাহাই হউক, বহুদিন পর্যন্ত কুমায়ুনে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী-দেরই আধিপত্য চলিয়াছিল। পরে চাঁদবংশীয় রাজারা বহু যুদ্ধবিগ্রহের পর সমগ্র অঞ্চলে তাহাদের সার্বভৌমত্ব বিস্তার করে; তাহার পূর্বে কাটজুরিগণ কিয়দংশ শাসন করিত। কিংবদন্তী আছে যে ইহাদের উৎখাত করিয়া সোমচাঁদ নামক জনৈক চাঁদবংশীয় রাজপুত নৃপতি, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে (আনুমানিক ৯৫৩ সালে) তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করেন, কিন্তু দোতি-র রাজগণের কাছে তাঁহাকে আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহার পর খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাঁদ রাজবংশের সহিত খসদের বিবাদ চলে এবং এক সময়ে খসরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবশেষে বীরচাঁদ নামক এক রাজা খসদের পরাজিত করিয়া চাঁদবংশের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। চাঁদবংশের কল্যাণচাঁদ আলমোড়া শহরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

মোগল আমলে চাঁদবংশীয় নৃপতিগণ সম্রাট্‌দের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আইন-ই-আকবরীতে এই পার্বত্য অঞ্চল হইতে কোনরূপ রাজস্ব আদায়ের কথা উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যায় যে আলমোড়ার শাসকবর্গ ঐ সময়েও নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। চাঁদরাজগণ প্রশাসনব্যবস্থা এবং জমি ও রাজস্ব -ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে।

মোগল রাজত্বের শেষভাগে কুমায়ুন পর্বত অঞ্চলের প্রতি রোহিলাদের দৃষ্টি পড়ে এবং আলমোড়া ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কয়েকবার রোহিলাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অবধ (আউধ) -এর নবাবের সহিত চুক্তি করিয়া চাঁদরাজগণ তখন আত্মরক্ষার আয়োজন করে। কিন্তু অবশেষে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নেপাল হইতে গুর্খা সেনাবাহিনী কুমায়ুন আক্রমণ করিয়া আলমোড়া অধিকার করিয়া লয় তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসকরাও তৎপর হইয়া উঠে। লর্ড হেস্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কর্নেল গার্ডনারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ফৌজ কুমায়ুন অধিকার করে। ইহার পর হইতে সমগ্র কুমায়ুন অঞ্চল ও তৎসহ আলমোড়া ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলিয়া যায়।

পশ্চিমে কোশী নদী বেষ্টিত আলমোড়া গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত আলমোড়া শহর একটি মনোরম স্বাস্থ্য-নিবাস। এখানে একটি ডিগ্রি কলেজ আছে। রানীখেত আলমোড়া জেলার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পার্বত্য শহর এবং জনপ্রিয় স্বাস্থ্য-নিবাস। ব্রিটিশ আমল হইতে রানীখেতে একটি সামরিক আবাস আছে বলিয়া শহরটি সেই দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। কুমায়ুনের অন্যান্য অঞ্চলের মত আলমোড়া জেলাতেও অসংখ্য মন্দির ও হিন্দুদের তীর্থস্থান আছে। বৈজনাথের পার্বতী মন্দির ও বাগেশ্বরের শিব মন্দির বিখ্যাত। আলমোড়া জেলায় শক্তিপূজার প্রাধান্য।

দ্র *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962 ; *Almora District Gazetteer*, Allahabad, 1911.

সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আলাউদ্দীন খিলজী, -খলজী (?-১৩১৬ খ্রী) খলজীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা; কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা। তিনি মালব (১২৯২ খ্রী) ও দেবগিরি (১২৯৪ খ্রী) জয় করেন এবং দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দীন ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি বারংবার মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতি প্রায় পঁচিশ বৎসর দেশের শান্তি রক্ষা করে। আফগানপুরায় 'নব্য মুসলমান'-দের বিদ্রোহও তিনি দমন করেন।

আলাউদ্দীন ধর্মপ্রবর্তক পয়গম্বর ও বিশ্বজয়ী 'সিকন্দর' হইবার স্বপ্ন দেখিতেন। কাজী আলাউল-মুল্‌কের পরামর্শে উভয় আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেও মুদ্রায় 'সিকন্দর-সানি' উপাধি লইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর মতে তিনি নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু; কিন্তু ইব্‌ন বতুতার মতে তিনি দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। ভারতের অনেকাংশে তিনিই প্রথম মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করিয়া দিল্লী সুলতানদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধি-যুগের গোড়াপত্তন ও বলবনের সামরিক আদর্শকে কার্যে পরিণত করেন। কাশ্মীর, নেপাল, বিহার, বাংলা ও আসাম ব্যতীত গুজরাট (১২৯৯ খ্রী), রনথম্বোর (১২৯৯-১৩০১ খ্রী), মেবার (১৩০৩ খ্রী), মালব, উজ্জয়িনী, মাণ্ডু, ধার ও চন্দেরী (১৩০৫ খ্রী), জয় করিয়া সমগ্র উত্তরাপথে তিনি

সাম্রাজ্যবিস্তার করেন। মেবারের প্রবল প্রতিরোধ কাব্য-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কথিত আছে, রানী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্যই আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জৌহরব্রত পালন করিয়া পদ্মিনী আত্মসম্মান রক্ষা করেন। উত্তরাপথ বিজয়ের পর আলাউদ্দীন অগ্রসর হন দক্ষিণ দিকে। দাক্ষিণাত্যের অগাধ ধন-সম্পত্তির লোভে ও আভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগে সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরির যাদবরাজ্য (১৩০৭ খ্রী), বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য (১৩০৯-১০ খ্রী), দ্বারসমুদ্রের হোয়সলরাজ্য (১৩১০ খ্রী) ও মাদুরার পাণ্ড্য-রাজ্য (মা'বার, ১৩১০-১১ খ্রী) আক্রমণ করিয়া সম্ভবতঃ সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন। পাণ্ড্যরাজ্য অবশ্য আধিপত্য স্বীকার করে নাই।

সার্বভৌম শক্তির নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম সামরিক জায়গীর -সমন্বিত তুর্কীসাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনকে সংহত ও সুদৃঢ় করেন। রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মকানুনের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি শাসন-পদ্ধতিকে গোঁড়া ধর্মযাজক (উলেমা) দলের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস করেন। কাজী মুগীসুদ্দীনকে স্পষ্ট বলেন 'রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাহা আমি আবশ্যক মনে করি তদনুসারেই আদেশ জারি করি।' অবশ্য ইসলাম ধর্মকে তিনি আঘাত করেন নাই। বিদ্রোহ-ষড়্‌যন্ত্রের কারণ নির্মূল করিবার জন্য সুলতান রাজ্যসংগঠন কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। আমীরদের মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং সুলতানের বিনা অনুমতিতে তাঁহাদের সামাজিক সম্মেলন ও বিবাহাদি নিষিদ্ধ করা, প্রজার অর্থাধিক্য হ্রাস করিবার জন্য জমিদান বন্ধ করা, রাজস্বহার বৃদ্ধি ও প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন বিভিন্ন উপায়ে বাজেয়াপ্ত করা তাঁহার কর্মনীতির অন্যতম ছিল। সামরিক বিভাগে ব্যয়হ্রাসের জন্য সৈন্যদের বেতন নিম্নহারে নির্দিষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয়। দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ ও শাহানা-ই-মণ্ডী (তত্ত্বাবধায়ক) কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি সত্ত্বেও বাজারে খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অসুবিধা হইলেও উৎ-পীড়নটা হিন্দুদের উপরই বেশি হয়, কেননা তাহাদিগকে জিজিয়া ছাড়াও অর্ধেক শস্য রাজস্ব দিতে হইত।

আলাউদ্দীনের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ছিল দুর্বল। ইহার মূলে ছিল সৈন্যবল ও শাসকের দৃঢ়তা ও কঠোরতা, —শাসিতের শুভকামনা নহে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইহাতে ভাঙন ধরে। লাঞ্ছিত আমীর-সর্দারগণ লুপ্তশক্তি পুনর্লাভের সুযোগ খুঁজিতেছিল। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দের পর অকৃতজ্ঞ মালিক কাফুর বৃদ্ধ সুলতানকে ক্রীড়নকে পরিণত করেন ; বিদ্রোহ ও প্রাসাদ-ষড়্‌যন্ত্র বৃদ্ধি পায়।

আলাউদ্দীন উচ্চাভিলাষী, উদ্যোগী ও দৃঢ়চেতা পুরুষ হইলেও অকৃতজ্ঞ, নির্মম ও বিবেকহীন ছিলেন। সম্ভবতঃ নিরক্ষর হইলেও তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। কবি আমীর খুসরৌ (সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য) ও মীর হাসান দিহলভী তাঁহার দরবার অলংকৃত করেন। কুতুব-ইলতুতমিস রচিত মসজিদে সুলতান সুন্দর তোরণ (আলাই দরওয়াজা) নির্মাণ করেন ও সিরিনগর স্থাপন করেন। ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়।

জগদীশনারায়ণ সরকার

আলাউদ্দীন শাহ্ বাহ্মনী বাহ্মনী দ্র

আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। কবির আসল বা পুরা নাম জানা যায় না। আলাওল তাঁহার ছদ্মনাম বা অন্য কোনও নামের বিকৃতিও হইতে পারে। মালেক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে সুলতান আলাউদ্দীনকেও আলাওল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখান হইতেও কবি তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন।

আলাওলের পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিম বা মধ্য বঙ্গের অন্তর্গত জালালপুর নামক স্থানে। পরে তিনি আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আরাকানে আসিবার সঠিক সময় জানা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সেবাস্টিঅও গঞ্জালেস টিবাউ যখন আরাকান-রাজ মিনারজগিরি (১৫৯৩-১৬১২ খ্রী) রণপোতগুলির অধিনায়ক নিযুক্ত হন, সেই সময়েই আলাওল আরাকানে অবতরণ করেন। কিন্তু এ অনুমান ভিত্তিহীন। 'দারা-সেকেন্দরনামা' কাব্যের একটি ছত্রের পাঠবিকৃতিতে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ছত্রটি এই : 'না পাইল সংপদ আছে আঙ্গলেস'। ইহার বিশুদ্ধ পাঠ : 'না পাইল সহিদপদ আছিল আয়ুলেশ'। অর্থাৎ জলদস্যুর হস্তে কবির পিতা নিহত হইলেও কবি নিতান্ত পরমায়ুর বলে শহীদ হইতে পারেন নাই।

আরাকানে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরে আলাওল রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদলে চাকুরি পান এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগীতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য জনপ্রিয় হইয়া ওঠেন। ইহার উপর কবিত্বশক্তির খ্যাতি বিস্তৃত হইলে রাজদরবারে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেখানে

অমাত্য ও ওমরাহ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহার কাব্যচর্চার সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহে আলাওল অন্ততঃ এই ছয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছেন: ১. পদ্মাবতী ২ সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল ৩. দৌলত কাজীর অসমাপ্ত সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী কাব্যের শেষাংশ ৪. সপ্ত পয়কর ৫. তোহ্‌ফা ৬. দারাসেকেন্দরনামা।

প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' রাজা থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রী) মুখ্যমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচিত। কেহ কেহ মনে করেন মাগন নিজেও কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচিতি সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তাঁহার কবি-পরিচয়ের জনশ্রুতিমূলক যৎসামান্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নহে। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে রাজপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং থদো-মিন্তার ও তাঁহার পরবর্তী রাজা সান্দ-থুধম্ম বা চন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রী) রাজত্বকালে শাসনকার্য মূলতঃ তাঁহারই হাতে ছিল।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' হিন্দী কবি ও সুফী সাধক জায়সীর পদুমাবৎ কাব্য (রচনাকাল ১৫২০-১৫৪০ খ্রী ?) অবলম্বনে রচিত। তবে ইহাতে আলাওলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহু স্থানেই লক্ষিত হয়। কাহিনীতে তিনি বহু পরিবর্তন করিয়াছেন, একাধিক চরিত্রের নামকরণেও পার্থক্য রহিয়াছে। জায়সীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা। সেই হিসাবে আলাওলের কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাও বলা চলে। আলাউদ্দীন খিলজীর পদ্মিনী-হরণ উপাখ্যান এই কাব্যের উপজীব্য। 'পদ্মাবতী'র শেষাংশ আলাওলের রচনা বলিয়া মনে হয় না। কেননা কাব্যের প্রথমাংশে আলাওল তাঁহার কাহিনীর যে সারাংশ দিয়াছেন তাহা জায়সীর কাহিনীরই সম্পূর্ণ অনুরূপ অথচ আলাওলে প্রাপ্ত কাব্যের শেষাংশ কেবল ভিন্ন নহে, হাস্যকর এবং অসম্ভব। ইতিহাসেও এই উপসংহারের সমর্থন নাই।

মাগন ঠাকুরের অনুরোধেই ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল'-এর রচনা শুরু করেন। তখন আরাকানরাজ ছিলেন সান্দ-থুধম্ম বা চন্দ্র সুধর্ম। অর্ধপথে এই কাব্য রচনা স্থগিত রাখিতে হয়। কবির বিবরণ অনুযায়ী ইহার প্রধান কারণ মাগন ঠাকুরের মৃত্যু। তাহা ছাড়া তিনি তখন অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনাতেও ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১২ মে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ্‌ সুজা আরাকানে আসিলে আলাওলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই সুজা সহসা আরাকানরাজ সান্দ-থুধম্মের বিরাগভাজন হইয়া সপরিবারে নিহত হন এবং তাঁহার স্বজন-বন্ধুরাও রাজার রোষভাজন হন। আলাওলকেও এই কারণে কিছুদিনের জন্য কারাবরণ করিতে হয়। মুক্তির পর সৈয়দ মুসা নামে জনৈক সুফী পীরের উৎসাহে তিনি 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিবার চেষ্টায় মন দেন (১৬৭০ খ্রী)। উক্ত কাব্যের কাহিনী আরব্যোপন্যাস হইতে গৃহীত হইলেও বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে মূল গ্রন্থের সহিত পার্থক্য রহিয়াছে। এমন কি সয়ফুল ও বদিওজ্জ-মালের ইসলামী পদ্ধতিতে বিবাহের মধ্যেও শুভদৃষ্টি, মঙ্গলাচার, সপ্তপদীগমন প্রমুখ অসংখ্য হিন্দু আচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে।

মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুতে 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল'-এর রচনা অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেলেও আলাওল অবিলম্বে মাগনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোলেমানের অনুরোধে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী' সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হন। আলাওলের বিবরণ হইতে জানা যায় ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। তবে, সুধীজনের মতে দৌলত কাজীর তুলনায় আলাওলের রচিত অংশ কবিত্বগুণে নিষ্প্রভ।

আলাওলের চতুর্থ রচনা 'সপ্ত পয়কর' অর্থাৎ সাতটি ছবি বা প্রতিমূর্তি আনুমানিক ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সান্দ-থুধম্মের রাজত্বকালেই লিখিত হয়। এই গ্রন্থে আলাওল আরাকানে শাহ্‌ সুজার আগমনের কথা (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যকাল) উল্লেখ করিয়াছেন। ফারসী কবি নিজামির (আনুমানিক ১১৪০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) পঞ্চম বা শেষ গ্রন্থ 'হফ্‌ত্‌ পয়কর' অবলম্বনে আলাওলের এই কাব্য রচিত। আরাকানরাজের মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ খান এই কাব্য রচনায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সসেনীয় রাজা পঞ্চম বহারাম বা বহারাম গুরের (গুর— বন্য গর্দভ; বন্য গর্দভ শিকারে প্রসিদ্ধির জন্য তাঁহার এই গুণবাচক নামের প্রচলন হয়; প্রসিদ্ধিকাল ৪২০ খ্রীষ্টাব্দ) জনশ্রুতিমূলক কাহিনী লইয়াই নিজামি ও আলাওলের কাব্য রচিত। সাত মহিষীর নিকট বহারাম সাত দিনে যে সাতটি গল্প শুনিয়াছিলেন, সেগুলির সংগ্রহই সপ্ত পয়কর। আলাওল তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় এই গ্রন্থেও রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর ভারতীয় সাহিত্য হইতে অসংখ্য উপমা, রূপক ও আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। উপরন্তু ইহার মধ্যে ইসলাম ধর্মতত্ত্বে প্রচলিত অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ফারসী সাহিত্য হইতে অনেক চিত্র গৃহীত হইয়াছে।

আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা' ইসলাম ধর্ম -সম্পৃক্ত নানা নীতি-উপদেশে পূর্ণ। যাঁহার অনুরোধে তিনি দৌলত কাজীর সতী ময়নার কাহিনী সমাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সোলেমানের অনুরোধেই তিনি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিও আলাওলের মৌলিক রচনা নহে। য়ুসুফ গদা নামক ফারসী লেখক ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'তুহ্‌ফুল-উন্‌-নসা' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, আলাওল তাহারই পদ্যানুবাদ করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে নামাজ, স্নান, রোজা, বিবাহিত জীবন, বাণিজ্য-নীতি, দানশীলতা, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, ঋণের অপকারিতা, কৃপণতা প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমূলক উপদেশ আছে।

'তোহ্‌ফা' রচনার আট বৎসর পরে আলাওল 'সয়ফুল-মুলুক বদিওজ্জমালে'র দ্বিতীয়াংশ রচনা করেন এবং আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'দারাসেকন্দরনামা' লেখেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে কবি শাহ্‌ সুজার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার পরিণাম সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনাকালে কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজদরবারের সহিত সম্পর্কশূন্য বিদ্যোৎসাহী মজলিস নওরাজ নামক জনৈক আমীর। ফারসী কবি নিজামির চতুর্থ কাব্য 'ইস্কন্দরনামা' অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। নিজামির সুবৃহৎ গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের (ইস্কন্দর) যে সমস্ত সত্য, মিথ্যা, জনশ্রুতিমূলক ও কাল্পনিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে, আলাওল তাহারই সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। নিজামি বা আলাওল কাহারও গ্রন্থেই আলেকজাণ্ডারের কাল সম্বন্ধে কোনও ধারণা পাওয়া যায় না। এই গ্রীক বীরকে নিজামি বারবার ইব্রাহিমের ধর্মশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আলাওল তাঁহাকে পুরাপুরিই মহম্মদীয় ধর্মভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দুই কবির রচনাতেই স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডারের কথা আছে, তবে অধিকাংশ স্থলেই কেবল কাল্পনিক কাহিনীর সমাবেশ। এই কাব্যেও আলাওলের গভীর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্র মুহম্মদ্‌ এনামুল্‌ হক্‌ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫; সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'কবি দৌলৎ কাজী ও তাঁহার সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী', সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; Satyendra Nath Ghoshal, 'Beginning of Secular Romance in Bengali Literature,' *Visva-Bharati Annals* vol. IX, June, 1959.

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

আলাপ গীতের প্রারম্ভে স্বরসমূহের অনুলোম ও বিলোম গতিতে মীড়-গমক-মূর্ছনাদি অলংকার-সহযোগে রাগ বা রাগিণীর সুবিন্যস্ত রূপ প্রদর্শন করার রীতিকে সাংগীতিক পরিভাষায় আলাপ বলে। পদের পরিবর্তে আকারাদি বর্ণ কিংবা নে, তে, তেরি, তোম, নোম প্রভৃতি শব্দকে আশ্রয় করিয়া সুরের বিস্তার সাধন করিতে হয়। ধ্রুপদের মত আলাপও আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ— এই চারি তুকে বিভক্ত এবং মৃদু, মধ্য ও দ্রুত ত্রিবিধ লয়ে গীত হইয়া থাকে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

আলার কালাম, আড়ার-, আরাড়- গৌতম বুদ্ধের গুরু। মজ্‌ঝিমনিকায়, মিলিন্দপঞ্‌হো, বুদ্ধচরিত, থেরীগাথা-ভাষ্য, মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গৃহত্যাগের পর এবং বোধিলাভের পূর্বে গৌতম আলার বা আড়ার কালাম নামক গুরুর কাছে কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে না পারিয়া তিনি উদ্দক রামপুত্র নামক অপর গুরুর নিকট গমন করেন। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে আলারের গভীর ধ্যানমগ্নতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তিনি গৌতমকে ধ্যানপ্রক্রিয়া এবং যোগসাধনায় শিক্ষা দেন। মজ্‌ঝিমনিকায়ে 'আলার-মত' 'অকিঞ্চঞ্ঞায়তন' (জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য সাধন অবস্থা) নামে উল্লিখিত। বুদ্ধচরিতে আলারের দার্শনিক মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাকে হুবহু সাংখ্যমত বলা সংগত কিনা এ প্রশ্নে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে, তবে সাংখ্যমতের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য স্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতেই উৎপন্ন। বুদ্ধঘোষের মতানুসারে 'আরাড়' তাঁহার নিজ নাম ও 'কালাম' তাঁহার গোত্রনাম। বোধিলাভের পর গৌতম প্রথমেই আলার কালামকে তাঁহার সিদ্ধিলাভের বার্তা জ্ঞাপন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু সন্ধান করিয়া জানেন যে সাত দিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্র মজ্‌ঝিমনিকায়— 'অরিয়-পরিয়েসনসুত্ত' ও ভাষ্য, পালি টেক্সট সোসাইটি; G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. I, London, 1937.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আলিপুর চব্বিশ পরগনা জেলার সদর ও মহকুমা। সদর কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ('কলিকাতা' দ্র)। বাংলার নবাব মীরজাফর আলী খাঁ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে গদিচ্যুত হওয়ার পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি লইয়া আলিপুর অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম আলিপুর। মহকুমার উত্তরে হুগলী নদী, কলিকাতা নগরীর অন্যান্য অংশ ও বারাসত মহকুমা, পূর্বে বসিরহাট মহকুমা, দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা এবং বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে হুগলী নদী।

উত্তরে আলিপুর হইতে দক্ষিণে জয়নগর পর্যন্ত পথের পশ্চিমার্ধে নাবাল জমি, জলা ও বিল আছে। পূর্বার্ধের মধ্য দিয়া নদী এবং খালগুলি প্রবাহিত হওয়ায় জল নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং জলাভূমির পরিমাণ অল্প ; কিন্তু স্থানে স্থানে জমি অত্যন্ত নিচু হওয়ায় বাঁধ দিয়া কৃষিভূমিকে প্লাবন হইতে রক্ষা করা হয়। দক্ষিণে ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দীর্ঘ ও ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) প্রশস্ত সুন্দরবনের একাংশ সমুদ্রতীরে বুলচেরী দ্বীপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সুন্দরবনের এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি বহুদিন পূর্বেই চাষের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। কর্ষিত ভূমি 'লট'-এ, অর্থাৎ নদী বা খাড়ি -পরিবেষ্টিত এবং উঁচু বাঁধ দ্বারা প্লাবন হইতে রক্ষিত খণ্ড খণ্ড ভূমিতে বিভক্ত। দক্ষিণ প্রান্ত অরণ্যসংকুল ও বন্যজন্তু -অধ্যুষিত। হুগলী নদী পশ্চিম সীমা বরাবর প্রবাহিত। মহকুমার পূর্ব ভাগে বিদ্যাধরী প্রধান নদী ছিল ; টালির নালার মধ্য দিয়া হুগলীর সহিত ইহার পুরাতন সংযোগ-পথ ছিল। বিদ্যাধরী সর্পিল গতিপথে বসিরহাট মহকুমার মধ্য দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া এই মহকুমায় প্রবেশ করিয়াছে। তারপর দক্ষিণে বাঁক ঘুরিয়া বেলেঘাটা খাল ও টালির নালার সংগমে যোগ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। শেষে ক্যানিং-এর নিকট ইহা মাতলা নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। মাতলাতে এখন স্টীমার চলাচল করিতে পারে, এক সময় ক্যানিং পর্যন্ত সমুদ্রগামী পোতও যাতায়াত করিতে পারিত। ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) দীর্ঘ পিয়ালী নদী বিদ্যাধরী ও মাতলার মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ। ভাঙ্গড় খালের মাধ্যমে বেলেঘাটা খালের সহিত বিদ্যাধরী নদীর যোগ আছে। বিদ্যাধরীর যে অংশ কলিকাতার নিকট প্রবহমান তাহা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মজিয়া যাইতেছে।

ডায়মণ্ড হারবার রোড আলিপুর ও ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যেকার সংযোগপথ। তারাতলা রোড হইতে বাহির হইয়া বজবজ রোড ডাকঘর ও মুন্সি হইয়া বজবজ পর্যন্ত গিয়াছে। গড়িয়াহাট রোড, সুবোধ মল্লিক রোড এবং গড়িয়া-মথুরাপুর রোড এতদঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ। কলিকাতা-সোনারপুর-মগরাহাট-ডা য় ম ণ্ড হা র বা র, সো না র পু র-ক্যানিং, বালিগঞ্জ-বজবজ ও বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর লোক্যাল রেলপথগুলি আলিপুর মহকুমার বিভিন্ন অংশকে চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যান্য অংশ ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে।

১১টি থানা লইয়া মহকুমাটি গঠিত : বিষ্ণুপুর, বজবজ, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, যাদবপুর, সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিং, ভাঙ্গড় ও মহেশতলা। বারুইপুর, বজবজ, জয়নগর-মজিলপুর, রাজপুর, সাউথ সুবার্বন, গার্ডেনরীচ এবং ক্যানিং পৌরাঞ্চলগুলি আলিপুর মহকুমার উল্লেখযোগ্য শহর। কলিকাতা পৌরাঞ্চলের অংশবিশেষ —পূর্বতন টালিগঞ্জ পৌরাঞ্চল— এই মহকুমার অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, বাটানগর শহরটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহকুমার সদর আলিপুর, কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম ওয়ার্ড। ইহা কলিকাতা পুলিশেরও এক্তিয়ারভুক্ত।

আলিপুর মহকুমা শিল্পোন্নত অঞ্চল। বজবজ ও তৎসন্নিহিত এলাকায় পাটকল আছে। সদরে ও মহকুমার অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও অন্যান্য কারখানা বর্তমান। গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ্স ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোদ্যোগ। এখানে সর্বপ্রকার জলযান মেরামত, অগভীর জলের উপ-যোগী প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ওজনের জলযান নির্মাণ ও নানাবিধ সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হইয়া থাকে। বাটানগরে 'বাটা'-র জুতা তৈয়ারির কারখানা উল্লেখযোগ্য। যাদবপুরে অবস্থিত ভারত সরকারের শিল্পোদ্যোগ 'ন্যাশন্যাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট্‌স লিমিটেড' বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। কলিকাতা বন্দর বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং উহার বৃহৎ অংশ আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত। কলিকাতা বন্দরের ডকগুলি আলিপুর মহকুমায় অবস্থিত। বজবজে জাহাজ হইতে কেরোসিন ও পেট্রোলিয়াম নামানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। টালিগঞ্জে ৮টি চলচ্চিত্র নির্মাণের স্টুডিও আছে।

এই মহকুমা কৃষিতেও উন্নত। সোনারপুর-আরাপাচ-মাতলা জলনিষ্কাশন পরিকল্পনার (১৯৫৯-৬০ সালে পরি-সমাপ্ত) দ্বারা সোনারপুর অঞ্চলে প্রায় ১৬৮ বর্গ কিলো-মিটার (৬৫ বর্গ মাইল) পরিমাণ জলমগ্ন জমি উদ্ধার করিয়া তাহাতে ধান্য উৎপাদন করা হইতেছে। 'ভেড়ি'-গুলিতে প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হয়।

জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মহকুমাশাসক এবং অন্যান্য

জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের আধিকারিকদের দপ্তর, জেলা সেশন জজের আদালত, মহকুমা আদালত, প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ইত্যাদি আলিপুরে অবস্থিত। আলিপুরে অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাওয়া অফিস (মিটিওরলজিক্যাল সেন্টার), ভারত সরকারের টেস্ট হাউস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস, স্টেশনারি অফিস, ল্যাণ্ড রেকর্ডস অ্যাণ্ড সার্ভেজ ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অফিস, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অফিস, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার 'ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি' আলিপুরের বেলভিডিয়ারে অবস্থিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের এই উদ্যান-বাটিকা ১৮৫৪-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরদের সরকারি বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে আলিপুর রোডে যেখানে বেলভিডিয়ারের পশ্চিম প্রবেশপথ, সেখানে হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। পথের অপর পারে ডুয়েল লেন-এর নামের মধ্যে ইহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে দশ লক্ষাধিক গ্রন্থ আছে। বেলভিডিয়ারের নিকটেই 'হেস্টিংস হাউস'। ইহা হেস্টিংস-এর প্রিয় বাসভবন ছিল। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের পূর্বে এই ভবনটি ভারত সরকারের বিশিষ্ট অতিথিদের অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে এখানে সরকারি 'ইন্‌স্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন' অবস্থিত। বেলভিডিয়ারের দক্ষিণে রয়্যাল এগ্রিকাল্‌চারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির মনোরম উদ্যান এবং উত্তরে আলিপুরের চিড়িয়াখানা।

এই মহকুমায় অবস্থিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যাণ্ড এক্‌সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, স্কুল অফ প্রিন্টিং টেক্‌নলজি, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির টেক্‌নলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ, ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশন রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ও ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। মহকুমায় কতিপয় ডিগ্রী কলেজ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেক্‌নিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পলিটেক্‌নিক ও অন্য কয়েকটি কারিগরি স্কুল আছে। সরকারি টাঁকশাল— 'ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট মিণ্ট'— আলিপুরে অবস্থিত। যাদবপুরের কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল ভারতের বৃহৎ যক্ষ্মা হাসপাতালগুলির অন্যতম।

মহকুমার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ধপ্‌ধপিতে দক্ষিণরায়ের মন্দির, ঘুটিয়ারী শরীফে দরগা ও মসজিদ, বজবজে মুসলমানী দুর্গ, বোড়ালে পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠ, বারুইপুরের প্রায় আড়াই কিলোমিটার (দেড় মাইল) দক্ষিণে আটিসারায় 'মহাপ্রভুবাটী' ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। ফলতায় জগদীশচন্দ্র বসুর একটি উদ্যান আছে। এখানে তিনি উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। ফলতার দুর্গটিও দর্শনীয়।

বড় মেলা ও উৎসবাদির মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতি মঙ্গলবার বেহালার চণ্ডীতলায় মঙ্গলচণ্ডীর মেলা, চৈত্র মাসে বিষ্ণুপুরের কীর্তনখোলায় বারুণীর মেলা, আষাঢ় মাসে বারুইপুরে রথের মেলা ও অগ্রহায়ণ মাসে টালিগঞ্জে রাসের মেলা উল্লেখযোগ্য। এই সকল মেলায় বহু লোকসমাগম হয়। ঘুটিয়ারী শরীফে সুবিখ্যাত পীর গাজী মোবারক আলী সাহেবের স্মরণে প্রতিবৎসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দু ভক্ত উপস্থিত হইয়া পীরের দরগায় শিরনি দিয়া থাকে।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : 24 Parganas*, Calcutta, 1914 ; *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : 24 Parganas*, Calcutta, 1954 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আলী (আনুমানিক ৬০০-৬৬১ খ্রী) সম্পূর্ণ নাম আলী বেন আবু তালিব্‌; হজরত মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। মুসলিম সমাজের উপর আলী অশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। সুফীগণ তাঁহাকে আধ্যাত্মিকতায় শীর্ষ স্থান দিয়া থাকেন এবং ইসলাম-ধর্মতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত বলিয়া গণ্য করেন। যদিও সর্বসম্মতিক্রমে আলী চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন (৬৫৬ খ্রী), তাঁহার নির্বাচনের পর মুয়াবিয়া নামক মহম্মদের জনৈক সহচর কর্তৃক তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কর্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য আলীকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হয়। রমজান মাসে তিনি যখন মসজিদে প্রার্থনায়

রত, তখন এক মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। 'আবু-বকর' দ্র।

আবুল হায়াত

আলী ইমাম (১৮৬৯-১৯৩২ খ্রী) বড়লাটের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম মুসলমান সভ্য এবং দ্বিতীয় ভারতীয় আইন মন্ত্রী। আলী ইমাম ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বড়লাটের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। আলী ইমাম ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সরকারের শাসন পরিষদের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অফ নেশন্‌স-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইংরেজ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজামের পরামর্শদাতারূপে বেরার-সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান ও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম জীবনে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরফ হইতে যে প্রতিনিধিদল লর্ড মিণ্টোর সহিত আলোচনা করেন, আলী ইমাম সেই দলের একজন। তবে পরবর্তী কালে এই মত তিনি পরিবর্তন করেন এবং হিন্দু-মুসলমানের একত্র নির্বাচন সমর্থন করেন। কোনও বিশেষ জন-সমষ্টির জন্য ব্যবস্থাপক সভার পদসংখ্যা সংরক্ষিত রাখারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

আলীগড় উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আগ্রা বিভাগে জেলা এবং ঐ জেলার সদর। গঙ্গা ও যমুনার দোয়াবে অবস্থিত এই জেলার বর্তমান আয়তন ৫০২৭ বর্গ কিলোমিটার (১৯৪১ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ১৭৬৫২৭৫ (১৯৬১ খ্রী) অর্থাৎ এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫১ জন (বর্গ মাইলে ৯০৯ জন)। সাধারণভাবে আলীগড় জেলার ভূমি খুবই উর্বর এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঈষৎ ঢালু। গঙ্গা এই জেলার উত্তর-পূর্ব ও যমুনা ইহার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। জেলার অন্যতম জলপথ এবং প্রধান সেচ-খাল গঙ্গা ক্যানাল জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত। জেলার নিম্নার্ধে ইহা দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উহা ব্যতীত খালটির শাখা-প্রশাখা জেলার বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত।

শহরের নাম নিকটবর্তী একটি দুর্গ বা গড়ের নাম হইতে গৃহীত। বর্তমান আলীগড় (২৭°৫৪´ উত্তর, ৭৮°৬´ পূর্ব) নবগঠিত সিভিল লাইন্‌স ও পুরাতন নগরী কৈল লইয়া গঠিত। উত্তর রেলপথে আলীগড় রেলওয়ে স্টেশন কলিকাতা-হাওড়া হইতে ১৩১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মোটরপথে ইহা দিল্লী হইতে ১৩৪ কিলোমিটার (৮৩ মাইল) ও আগ্রা হইতে ৮২ কিলোমিটার (৫১ মাইল)। আলীগড় হইতে জেলার অন্যান্য শহরে যাইবার রাস্তা আছে। শহরের সমগ্র পৌর এলাকার লোক-সংখ্যা ১৮৫০২০ জন (১৯৬১ খ্রী)। আলীগড় জেলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। খাদ্যশস্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, শূকর-মাংস এবং কার্পাসজাত সামগ্রীই বর্তমানে এই জেলার বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। আলীগড়ের তালা-চাবি, সতরঞ্চি ও ঢালাইয়ের কাজের খ্যাতি আছে। এখানকার রেশম ও কার্পাস-শিল্পও উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে আলীগড় অঞ্চলে নীলের চাষ হইত। এখন অবশ্য তাহা লুপ্ত হইয়াছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য আলীগড়ের প্রসিদ্ধি বহুদিনের। বর্তমানে ভারত সরকার এখানে একটি বড় ডেয়ারি স্থাপন করিয়াছেন। এই জেলায় দুইটি বিদ্যুৎ শক্তি ও দুইটি ডিজেল শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র আছে।

শহরটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। জেলার নানা স্থানে বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চল মথুরার ক্ষত্রপদিগের অধীনে ছিল, পরে কুষাণসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে তোমরগণের রাজত্বকালে দোর রাজপুতগণ বুলন্দ শহরে কর্তৃত্ব করেন। এই দোর বংশের অন্যতম নৃপতি বুধসেন সম্ভবতঃ কৈল নগরীতে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন আইবাক কৈল আক্রমণ করেন ও দোরদের বিতাড়িত করেন। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক ইব্‌ন বতুতা চীন যাইবার পথে কৈলে আসেন এবং ইহাকে আম্রকুঞ্জ পরিবেষ্টিত এক মনোরম নগরী বলিয়া বর্ণনা করেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই শহরের অন্য এক নাম 'সব্জাবাদ' বা 'সবুজ নগরী' হয়। তোগলক সম্রাট্‌ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়।

আকবরের রাজত্বকালে কৈল আগ্রা প্রদেশের অন্তর্গত

একটি সরকারের সদর ছিল। প্রধানতঃ চৌহান ও জাঙ্গহারা জাতীয় রাজপুত জমিদারদের অধ্যুষিত তৎকালীন কৈলের ৫৪৮৬৫৫ বিঘা কর্ষিত জমির উপর বাৎসরিক খাজনা আদায় হইত ১০৪১২৩০৫ দাম। এই আয় হইতে ৪৫০ অশ্বারোহী ও ২৯০৫০ পদাতিক সৈন্য প্রতিপালিত হইত। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী বর্তমান আলীগড় জেলা এলাকায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৯২২৪৭১ একর— তবে এই হিসাবে ভুল থাকার সম্ভাবনা আছে। এই এলাকার উপর ২৫৭৫ অশ্বারোহী ও ৫৮৭৫০ পদাতিক বাহিনী জোগান দিবার দায়িত্ব ছিল।

মোগল শাসনের শেষাংশে আলীগড়ের বহু ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। কখনও জাঠ, কখনও ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ এই শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহের প্রারম্ভে আলীগড়েও মে মাসে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জুলাই মাসের মধ্যে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিতাড়িত করিয়া কৈল এবং আলীগড় কেল্লা হস্তগত করে এবং তথায় তাহারা একটি বিপ্লবী সরকার বা পঞ্চায়েত গঠন করে। কিন্তু ইংরেজরা সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় পুনরধিকার করে।

আধুনিক যুগে আলীগড়ের সর্বাধিক খ্যাতি স্যর সৈয়দ আহ্মদ এবং তাঁহার আন্দোলনের জন্য। মুসলমানদের একটি উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আলীগড়ে তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্কুল ও দুই বৎসর পরে 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ'-এর পত্তন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোর বেক নামে জনৈক ইংরেজ শিক্ষাবিদ্কে এই প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকদের উৎসাহে মুসলিম রাজনীতি একটি বিশেষ দিকে চালিত হইতে থাকে। স্যর সৈয়দ আহ্মদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'আলীগড় আন্দোলন' মুসলিম রাজনৈতিকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতে মুসলমানদের পৃথক জাতীয়তায় বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের চিন্তার ধারক ও বাহক হইয়া দাঁড়ায়। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজটিকে আবাসিক 'আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'ইন্স্টিটিউট অফ অফথ্যালমলজি' নামক প্রতিষ্ঠানটি চক্ষুরোগ-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: U. P.*; H. R. Nevill, *Aligarh District Gazetteer*, Allahabad, 1909; *Census of India: Paper No. I of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আলীবর্দী খাঁ (১৬৭৬?-১৭৫৬ খ্রী) প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলী। আলীবর্দীর পূর্বপুরুষ আরবদেশীয়। তাঁহার পিতামহ ঔরঙ্গজেবের একজন মনসবদার ছিলেন। আলীবর্দীর পিতা ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের অধীনে তাঁহার রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আলীবর্দী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহ্মদ আজম শাহের গৃহস্থালিতে সামান্য কর্ম করিতেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য তাঁহার পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আজম শাহ্ সসৈন্যে নিহত হন। তখন আলীবর্দীর পরিবারবর্গের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া পড়ে এবং অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আলীবর্দী ঘুরিতে ঘুরিতে বঙ্গ দেশে আগমন করেন।

তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। আলীবর্দী তাঁহার নিকট চাকুরি প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হন। মুর্শিদকুলী খাঁ বিদেশাগত এই সব ভাগ্যান্বেষণকারীকে আদৌ পছন্দ করিতেন না। অতঃপর আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া গিয়া উড়িষ্যার কটকে উপস্থিত হন। তখন মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ উড়িষ্যার নায়েব সুবা অর্থাৎ ছোট নবাব। কটকে তাঁহার রাজধানী। আলীবর্দীর মাতা তুর্কী রমণী ছিলেন। সুজাউদ্দীনের সহিত এই সূত্রে আলীবর্দীর সামান্য কিছু আত্মীয়তা ছিল; তিনি সুজাউদ্দীনের সরকার হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া নায়েব সুবার দরবারের একজন পারিষদ হন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজকার্যে প্রখর বুদ্ধি ও যুদ্ধ-ব্যাপারে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া আলীবর্দী উড়িষ্যা প্রদেশের একটি জেলার ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহ্মদের সহিত সমুদায় পরিবারকে দিল্লী হইতে কটকে আনাইয়া লইলেন। আহ্মদ সেই সময়ে হজ সমাপনান্তে মক্কা হইতে ফিরিয়া আসায় হাজী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাজী আহ্মদ ও আলীবর্দী উভয়ে মিলিয়া রাজকার্য সম্পাদনে এতই কর্মকুশলতা দেখান যে সুজাউদ্দীন রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ব্যাপারেই ঐ দুই ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিতেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে (সুজাউদ্দীনের পুত্র)

বাংলার নবাব মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু হাজী আহ্‌মদ ও আলীবর্দীর বুদ্ধিকৌশলে বিনা রক্তপাতেই সুজাউদ্দীন বাংলার মসনদ অধিকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার হইবার পর সুজাউদ্দীন মীর্জা মহম্মদ আলীকে 'আলীবর্দী' উপাধি দান করিয়া রাজমহলের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা সুবার সহিত যুক্ত হইলে আলীবর্দী বিহারের নায়েব সুবা পদে উন্নীত হইলেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হন। তিনি অপদার্থ ও দুর্বলচিত্ত ছিলেন। আলীবর্দী ও তাঁহার ভ্রাতা এই সুযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতায় ও দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই আলীবর্দীকে বাংলার উপযুক্ত নবাব বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সহায়ক হইলেন। ফলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত আলীবর্দীর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সরফরাজ খাঁ ও তাঁহার প্রধান সৈন্য-সামন্ত নিহত হয়। আলীবর্দী তখন অনায়াসেই বাংলার মসনদ দখল করিয়া লইলেন। নবাব হইবার পর তাঁহার সরকারি নাম হয় সুজা-উল্-মুল্‌ক্ হেসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্গ বাহাদুর।

সুবাদার হইয়া আলীবর্দী বঙ্গ দেশকে সুশাসনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের নয় বৎসর-কাল (১৭৪২-১৭৫১ খ্রী) বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলা দেশে শান্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ আলীবর্দী সত্তর বৎসর বয়সেও বর্গীদের সঙ্গে পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, তাহাদের সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে না সরাইতে পারিলে আর রক্ষা নাই। সন্ধি করিবার ছলে তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকট মনকরা নামক স্থানে আনাইয়া কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যে বর্গীদল আসিয়াছিল তাহারা সকলেই আলীবর্দীর সেনাদের হস্তে নিহত হইল (১৭৪৪ খ্রী)। কিন্তু এইখানেই হাঙ্গামার শেষ হইল না। আরও সাত বৎসর হাঙ্গামা চলিয়া অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। আলীবর্দী মারাঠাদিগকে চৌথ হিসাবে প্রতি বৎসর বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং উড়িষ্যা প্রদেশে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল।

ইওরোপীয় বণিকদের প্রতি আলীবর্দী খাঁর সমদৃষ্টি ছিল, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহের কোনও তারতম্য ছিল না। ঐ বিদেশী বণিকদের কাহাকেও উচ্ছেদ করিবার বাসনা আলীবর্দীর ছিল না; তাঁহার ইচ্ছা ছিল উহাদের সকলেই যেন সমানভাবে নিজেদের ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারে। তিনি তাহারই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল ইহাতে বঙ্গ দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। কিন্তু ঐ সব বণিক-সম্প্রদায়ের কাহারও বেয়াদবি তিনি কখনও সহ্য করেন নাই, সর্বদাই তাহাদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন। বহু হিন্দুকে তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু কর্মচারীরাও যে সুচারুরূপে সরকারি কার্য — বিশেষ করিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ— নিষ্পন্ন করিয়া দিতেন, তাহার নিদর্শন সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়।

আলীবর্দী খাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সংযত ছিল। একমাত্র ধর্মপত্নীতে অনুরক্ত থাকিয়া তিনি সমস্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। রাজনীতি ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান কৌশলী ও পারদর্শী ছিলেন। প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। জ্ঞানী-গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তিরা জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার দাক্ষিণ্য লাভ করিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল ভোর পাঁচটায় প্রায় আশি বৎসর বয়সে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আলু স্যর ওয়ালটার র‍্যালে কর্তৃক ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইংল্যাণ্ডে আলুর প্রথম আমদানি হয়। ভারতে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে আলুর কথা প্রথম শোনা যায়। অতি অল্প সময়ে আলু পৃথিবীর অপরাপর ফসলের উৎপাদন ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে আলুর উৎপাদন ধানের দ্বিগুণ এবং গমের তিন গুণ। সমপরিমাণ জমি হইতে আলুর ফলন কমপক্ষে ধান ও গমের ১০ গুণ করা সম্ভবপর।

পাহাড়ি অঞ্চলে শীত এবং গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই আলুর চাষ হয়, তবে গ্রীষ্মকালেই প্রধান ফসল তোলা হয়। ভারতের সমতলভূমিতে শীতকালীন ফসল হিসাবেই আলুর চাষ হইয়া থাকে। আলু চাষের জন্য উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। যদিও এঁটেল বা জল দাঁড়ায় এমন মাটি ছাড়া প্রায় জমিতেই আলুর চাষ করা সম্ভব। যে মাটি সামান্য অম্লধর্মী তাহাই আলু চাষের উপযোগী, সামান্য ক্ষারত্বেও ক্ষতি হইতে পারে। আলু বসাইবার এক-দেড় মাস আগেই অন্ততঃপক্ষে ৮।১০ বার চাষ দিয়া মাটি একেবারে ধুলার মত তৈয়ারি করা হয়।

বর্তমান যুগে হিমঘরের (কোল্‌ড স্টোরেজ) প্রচলন

হওয়ায় আলুবীজের অভাব পূরণ হইয়াছে। পাহাড়ি বীজের আলু হইতে সমতল জমিতে উৎপন্ন ভাল আলু হিমঘরে রাখিয়া পরবর্তী ঋতুতে বীজ হিসাবে ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাটি ও ফসল তোলার সময় অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের আলু চাষ করা হয়। রোগসহনশীলতা ইত্যাদির দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সিমলায় আলু গবেষণার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন; পশ্চিম বাংলায় দার্জিলিঙে অনুরূপ কেন্দ্র আছে।

বহুদিন চাষ করার ফলে নানা জাতের আলুর মিশ্রণ হয়। যেমন, নৈনিতাল আলু, রয়্যাল কিড্‌নি, আপ-টু-ডেট এবং ম্যাগনাম বোনাম-এর মিশ্রণ। রেঙ্গুন-ও এইরূপ মিশ্রণ। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি বিভিন্ন জাতের আলু তোলার সময় অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইল:

জলদি	মাঝারি	নাবি
রং বুল ৯	ফোয়ান	আপ-টু-ডেট
		রয়াল কিড্‌নি
ট্যাবারকি		একার সিগেন

টুকরি আলুর বীজ বিহার হইতে আসে, নৈনিতাল হিমাচল প্রদেশ হইতে আসে, আর রেঙ্গুন বীজ আসে ব্রহ্ম দেশ হইতে। এতদ্ব্যতীত গ্রেটস্কট মাদ্রাজের উটকামণ্ড হইতে আসে।

আলুর প্রতি চোখ হইতে একটি করিয়া গাছ হয় এবং ২।৩টি চোখ রাখিয়া কাটিয়া লাগাইলে বীজ কম লাগে, তবে ভাইরাসের আক্রমণে কুট রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। কাটিবার সময় হাতিয়ার স্পিরিট দিয়া প্রতিবার মুছিলে ভয় থাকে না। একহাত বা ৪৮ সেন্টিমিটার অন্তর লাইনে ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) দূরে দূরে বীজ বসাইতে হয় এবং বীজ ৮ সেন্টিমিটার (৩ ইঞ্চি) গভীর করিয়া বসাইয়া আড়াই সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) পরিমাণ মাটি দিয়া ঢাকা দিতে হয়। আয়তন অনুসারে বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে প্রায় ৪৬১ হইতে ১১০৬ কিলোগ্রাম (একরে প্রায় ৫ হইতে ১২ মন) পর্যন্ত লাগিতে পারে। কাটিয়া লাগাইলে ৪০০০০ টুকরা প্রয়োজন হয়।

সবুজ সার না দিলে এক হেক্টরে ১৮৪৩৮ কিলোগ্রাম (একরে ২০০ মন) আবর্জনার সার দেওয়া উচিত। প্রতি হেক্টরে ৯০ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৮০ পাউণ্ড) নাইট্রোজেন, ১৮০ কিলোগ্রাম (১৬০ পাউণ্ড) ফসফেট এবং ৯০ কিলোগ্রাম (৮০ পাউণ্ড) পটাশ প্রয়োগে পশ্চিম বাংলায় ভাল ফলন পাওয়া যায়। অন্যত্র নাইট্রোজেন ও ফসফেট সমপরিমাণ দিয়া ও পটাশ দ্বিগুণ পরিমাণ দিয়া ভাল ফলন পাওয়া গিয়াছে। বীজ লাইনে বসাইবার সময় দুই ধারে ১০-১৫ সেন্টিমিটার (৪-৬ ইঞ্চি) দূরে মাটির নীচে সার প্রয়োগ করা যায়। অথবা গাছ এক বিঘৎ পরিমাণ বড় হইবার পর মাটি তোলার সময়েও উহা প্রথম প্রয়োগ করা যায়। ঐ সময় ⅔ অংশ সার দিয়া বাকিটা দ্বিতীয় বার মাটি চাপান দিবার সময় দেওয়া চলে। মাটি দুইবার চাপান দিলে আলু বড় হয়। বীজ বসাইবার ২।৩ সপ্তাহ পরে যখন চারাগাছ মাটি হইতে ১০-১২ সেন্টিমিটার (৪-৫ ইঞ্চি) বড় হইয়া ওঠে তখন জমি আগাছামুক্ত করিয়া মাটি চাপান দিয়া সেচ দেওয়া আরম্ভ করা উচিত। সেচের জন্য হেক্টর প্রতি ৮০-৯০ হেক্টর-সেন্টিমিটার জল প্রয়োজন। আলু তোলার কম পক্ষে ১৫-২০ দিন আগেই সেচ বন্ধ করা কাম্য।

জলদি ও নাবি আলুর প্রধান রোগ ধসা। আধুনিক রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ পেরেনকস বা ফাইটোলান ৪৫৫ লিটার (১০০ গ্যালন) জলে ১½-২ কিলোগ্রাম (৩-৪ পাউণ্ড) গুলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে ২।৩ বার সিঞ্চন করিলেই ফসল রক্ষা পাইবে। এইসঙ্গে প্রায় ১ কিলোগ্রাম (২ পাউণ্ড) জলে গোলা ডি. ডি. টি. মিশাইয়া সিঞ্চন করিলে পোকার হাত হইতেও আলু রক্ষা করা যায়।

আলুর কন্দ পাকিলেই তোলা উচিত। পাতার রং হলুদ হইয়া শুকাইতে আরম্ভ করিলে আলু তোলার সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পশ্চিম বাংলায় আলুর গড় ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৯৭০০ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ১০৭ মন)— যদিও ভারতবর্ষের গড় ফলন মাত্র ৭৪৪৩ কিলোগ্রাম বা ৮১.৭৮ মন।

বর্তমানে হিমঘরের প্রচলন হওয়ায় আলু-সংরক্ষণ সহজ হইয়া গিয়াছে। এই হিমঘর চাষীদের উৎপাদনক্ষেত্রের নিকটে হইলে আলু বহনের খরচ কম হইবে। শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে আলু শুধু গুদামজাত করিয়া রাখিলেই চলে। কাঁচা আলু গুদামজাত করিলে পচনে বেশি নষ্ট হয়।

বিকল্প ফসল হিসাবে মিষ্টি আলু এবং কচু ইত্যাদির চাষও বর্তমানে যথেষ্ট হইতেছে।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

আলেক্‌সান্দর, আলেকজাণ্ডার (৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) ফিলিপের পুত্র মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিশ বৎসর বয়সে ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অনতিকাল-মধ্যে প্রায় সমগ্র

গ্রীসদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যসম্রাট্ তৃতীয় দারয়বউষকে (Darius) পরাজিত করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রাজধানী পার্সিপোলিস ধ্বংস করেন। ইহার পর অপ্রতিহত গতিতে কাবুল উপত্যকায় পৌছিয়া সেখানে আলেকজাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি কয়েকটি নগরী স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে বিপুল সৈন্যসমাবেশ করিয়া প্রথমে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের বহ্লীক (বাক্‌ত্রিয়ানা) ও সোগ্‌ডিয়ানা প্রদেশ জয় করেন। তিনি যখন বুখারায় যুদ্ধরত, তখনই পাঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলার বৃদ্ধ রাজার পুত্র আম্ভি (অম্‌ফিস) কতকটা ভয়ে ও কতকটা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীশ্বর পুরুর (পোরাস) শক্তি খর্ব করিবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আনুগত্য স্বীকার করেন।

৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারত অভিযান আরম্ভ করেন। তাঁহার এই অভিযানের সমকালীন যে সকল মূল বিবরণী ছিল তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্তী কালের লেখকদের বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি হইতেই আমরা যাহা কিছু অবগত হইয়াছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় রাজা, জাতি ও স্থানসমূহের নাম বৈদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে সেগুলিকে শনাক্ত করা কঠিন।

ভারত অভিযানকালে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০০০, এইরূপ অনুমিত হয়। দ্বিধাবিভক্ত এই সৈন্যের এক অংশ আলেকজাণ্ডারের অধীনে কুণার বা চিত্রল নদী ধরিয়া উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল দিয়া এবং দ্বিতীয় অংশ আম্ভিসমভিব্যাহারে অন্য দুই গ্রীক সেনাপতির অধীনে কাবুল নদের দক্ষিণ তীর ধরিয়া শেষ পর্যন্ত আটকের নিকট সিন্ধুতীরে মিলিত হয়।

গ্রীক সৈন্যের কোনও দলের অগ্রগতিই নিরঙ্কুশ ছিল না। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার-পরিচালিত সৈন্যদেরও কুণার, পাঁজকোরা ও সুবাস্তু (সোয়াৎ) উপত্যকার দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আলেকজাণ্ডার সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা পান অশ্বকায়ন জাতির বিপুল সৈন্যবাহিনীর নিকট। রাজমাতা ক্লেওফেস স্বয়ং এই সৈন্য পরিচালনা করিয়া অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই সব পার্বত্য জাতিকে নির্মমভাবে দমন করিতে করিতে আলেকজাণ্ডার শেষ পর্যন্ত সিন্ধুতীরে পৌছান। অপর দিকে দ্বিতীয় গ্রীক সৈন্যবাহিনীও বাধা পাইতে পাইতে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু উপত্যকার পুষ্কলাবতীর অষ্টকরাজ কর্তৃক খুবই বিপর্যস্ত হয়। প্রায় ত্রিশ দিন যুদ্ধের পর অষ্টকরাজ নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য আম্ভির পার্শ্বচর সঞ্জয়কে দেওয়া হয়। অতঃপর আলেকজাণ্ডার ঘোরতর যুদ্ধে কাবুল ও সিন্ধুনদের সংগমের অনতি-দূরবর্তী বরণের (আওর্‌নস) গিরিদুর্গ অধিকার করেন। গ্রীকরা এই বিজয়কাহিনী অতিশয় গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছে।

৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ওহিন্দ হইতে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে সিন্ধু অতিক্রম করেন। তক্ষশিলায় পৌছিলে নবাভিষিক্ত আম্ভি তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং অচিরে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু বিতস্তা (ঝিলম) ও চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের অধীশ্বর পুরু বশ্যতা স্বীকার না করায় আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর সহিত পুরুর বিপুল সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীরের সুপরিচালিত সৈন্যরা একে একে পুরুর পুত্রদের ও প্রধান সেনাপতিদের পরাজিত ও নিহত করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর দিনান্তে স্বীয় অঙ্গে নয়টি ক্ষতচিহ্ন লইয়া নিরুপায় পুরু আত্মসমর্পণ করেন। বন্দী পুরু আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে নীত হইলে তিনি পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কিরূপ ব্যবহার আশা করেন?' পুরু সগর্বে উত্তর দেন, 'রাজার মত।' এই বীরত্বব্যঞ্জক উক্তিতে আলেকজাণ্ডার চমৎকৃত হন এবং পুরুকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তারপর আলেকজাণ্ডার চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী (রাবি) নদী অতিক্রম করেন। এতদঞ্চলের অধিপতি দ্বিতীয় পুরু পালাইয়া নন্দরাজ্যে আশ্রয় লওয়ায় তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া প্রথম পুরুকে দেওয়া হয়। ইহার পর আলেকজাণ্ডার যে কয়টি গণরাজ্য অধিকার করেন, তন্মধ্যে কঠরা (কাথায়অয়) তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দেয় ও বহু প্রাণহানির পর আত্মসমর্পণ করে। দুইটি নিকটবর্তী রাজ্যের রাজা সৌভূতি (সোফিতেস) ও ভগলা (ফেগেলাস) আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন।

পরিশেষে বিপাশাতীরে (বিয়াস) পৌছানোর পর গ্রীক সৈন্যেরা আলেকজাণ্ডারের অনুরোধ সত্ত্বেও আর অগ্রসর হইতে চাহে না। ফলে তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই বিতস্তাতীরে ফিরিয়া যান।

ভারতত্যাগের পূর্বে আলেকজাণ্ডার পুরুকে বিতস্তা ও বিপাশার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ এবং আম্ভিকে বিতস্তার পশ্চিমে তাঁহার অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের ভার দিয়া যান। বিতস্তাতীর হইতে আলেকজাণ্ডার নদীপথে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে কখনও বিনা বাধায়, আবার কখনও যুদ্ধ

করিতে করিতে অগ্রসর হন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা পান মালব (মাললয়), ক্ষুদ্রক (অক্সিড্রাকয়) ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র গণরাজ্যের একটি সংঘের নিকটে। অপর পক্ষে, শিবি-রা (সিবি) তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে, কিন্তু অগলস-রা (আগালস্‌সয়) বাধা দেয়। ক্রমে আরও বহু রাজ্য অতিক্রম করিয়া গ্রীকবীর দ্বিধাবিভক্ত সিন্ধুতীরস্থ পতল নগরীতে পৌছান। এই স্থান হইতে তাঁহার সৈন্যের এক অংশ বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া পারস্যাভিমুখে যাত্রা করে এবং অপর অংশ আলেকজাণ্ডারের সহিত অগ্রসর হইয়া করাচীর নিকট ভারতত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীর ধরিয়া ব্যাবিলনের দিকে যায়। ব্যাবিলনে পৌছিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডার মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

আলেখিয়া অলখনামী দ্র

আলেয়া রাত্রির অন্ধকারে জলাভূমি, নির্জন পতিত অঞ্চল, সমাধিক্ষেত্র বা আবর্জনাপূর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরে কখনও কখনও মাটি হইতে প্রায় চার-পাচ হাত উঁচুতে অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত ইতস্তত: সঞ্চরণশীল অগ্নিগোলকের মত একটা অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও এই অগ্নিশিখা স্তিমিত বা নির্বাপিত হয় না। যেমন আকস্মিক-ভাবে আবির্ভূত হয়, দুই-এক মিনিটের মধ্যে তেমন আকস্মিকভাবেই ইহা অদৃশ্য হইয়া যায়। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা ইহাকে ভুতুড়ে আলো বা ভৌতিক আলো মনে করে। ইহাই আলেয়া নামে পরিচিত। ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ ভৌতিক আলো জ্যাক-ও-ল্যাণ্টার্ন, উইল-ও-দি-উইস্‌প, ইগ্‌নিস-ফ্যাচুয়াস, স্পার্কি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, নির্জন অঞ্চলের স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় উদ্ভিজ্জ অথবা জান্তব পদার্থের পচনের ফলে মিথেন বা মার্শ গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের স্বতঃপ্রজ্বলনের ফলেই আলেয়ার দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মার্শ গ্যাস বা মিথেন আপনা-আপনি প্রজ্বলিত হয় না। কাজেই মনে হয়, ফস্‌ফরাস-সমন্বিত উদ্ভিজ্জ বা জান্তব পদার্থের পচনের ফলে উদ্ভূত ফস্‌ফিন (PH_3) বা ফস্‌ফরেটেড হাইড্রোজেন নামক গ্যাসই আলেয়া উৎপত্তির কারণ।

কাচের ফ্লাস্কের মধ্যে কষ্টিক পটাশ দ্রবণে শাদা ফস্‌ফরাস দিয়া অক্সিজেনের সম্পর্কশূন্যভাবে উত্তপ্ত করিলে ফস্‌ফিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বুদ্‌বুদের মত জল হইতে বাহির হইয়া অঙ্গুরীয়ের আকারে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। জল হইতে বাহির হইয়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই ইহা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অন্ধকারের মধ্যে এই গ্যাস উৎপাদন করিলে ঠিক আলেয়ার মতই প্রতীয়মান হইবে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আলোক যে শক্তির সাহায্যে পার্থিব বস্তুসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তাহাকেই আলোক বলা হয়। আলোকবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রীস দেশে। এই প্রসঙ্গে প্রায় ৫০০-৪২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যানাক্সাগোরাস ও এম্পিডোক্লেসের বিভিন্ন মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞানী হিরো আলোর প্রতিফলনের নিয়ম অবগত ছিলেন।

স্নেলিয়াস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিসরণের (রিফ্র্যাকশন) বিখ্যাত সূত্র প্রবর্তন করেন। আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের 'সাইন' পরস্পর সমানুপাতিক এবং বিশেষ কোনও মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই অনুপাত অপরিবর্তনীয় থাকে। মনে হয়, প্রাচীন আরব দার্শনিকেরাও এই সূত্র অবগত ছিলেন। দেকার্তে স্নেলিয়াসের রচনা প্রকাশ করেন এবং দার্শনিক তর্কের সূত্র ধরিয়া তিনি বিকিরণের কারণ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। আলোকরশ্মি যে হ্রস্বতম পথ ধরিয়া চলে, ফারম্যাট তাহা প্রচার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গ্রিমল্‌ডি আলোর ডিফ্র্যাকশন আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে হুকের স্বাধীনভাবে নিরীক্ষার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। রোমার এই সময়ে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণকালের সময়ের পরিবর্তন নির্ণয় করিয়া আলোর নির্দিষ্ট গতিবেগের পরিমাপ করেন।

এই সময়ে আলোকবিজ্ঞানের প্রতি নিউটনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি স্পেকট্রাম বা বর্ণালী আবিষ্কার করেন। তৈলজাতীয় বস্তুর সূক্ষ্ম আস্তরণে যে রঙের উৎপত্তি হয়, নিউটন তাহার কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তথাকথিত নিউটনীয় আলোকবলয়েরও তিনি আবিষ্কর্তা। আলোর তরঙ্গ-ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে ইহার ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য, তথাপি আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জোরের সহিত কোনও কথা বলেন নাই। আলোর কণাবাদের (কর্পাস্কুলার থিয়োরি) প্রবর্তক বলিয়া নিউটনের সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তাহার জন্য তাঁহার পরবর্তী অনুসরণকারীরাই দায়ী। অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে এই কণাবাদই প্রচলিত ছিল।

আলোক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলোকবিজ্ঞানে একমাত্র ব্র্যাডলির আবিষ্কারই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখেন যে, দূরবর্তী নক্ষত্রের নিকট দিয়া আসিবার সময় আলোকরশ্মির পথ বাঁকিয়া যায়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই তথ্যের গুরুত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

হাইজেন্‌স (১৬৭৮ খ্রী) হইলেন আলোর তরঙ্গবাদের জনক। তিনি আলোর সমবর্তনের (পোলারিজেশন) বিষয় আবিষ্কার করেন, কিন্তু আলোর সরল গতির ব্যাখ্যা করিতে না পারায় তাঁহার তরঙ্গবাদ তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়ং তরঙ্গবাদকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আলোর 'ইণ্টারফিয়ারেন্স'-এর বিষয়ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একই আলোকের উৎসকে দুইটি কৃত্রিম উৎসে ভাগ করিয়া তাহা হইতে নিঃসৃত আলোককে পুনরায় একত্রিত করিয়া তিনি দেখাইলেন যে তাহার ফলে অন্ধকারেরও সৃষ্টি হইতে পারে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেনেল (Fresnel) বলিলেন যে, আলোক ঈথরের মাধ্যমে পরিচালিত তরঙ্গবিশেষ। এই তরঙ্গ গতিপথের লম্বতলে বিস্তারিত হয়। ফ্রেনেল আলোর সমবর্তনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন এবং তরঙ্গবাদ মানিয়া লইয়া আলোর সরল গতির ব্যাখ্যা দিতেও সক্ষম হইলেন। আলোক যে তরঙ্গধর্মী, ইণ্টারফিয়ারেন্স এবং ডিফ্র্যাক্‌শন-সম্পর্কিত বহু পরীক্ষায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইল। বিভিন্ন রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে বিভিন্ন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গেল। নিউটনীয় বলয়ের পরিমাপ করিয়া ইয়ং বিভিন্ন রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। ডিফ্র্যাক্‌শন-গ্রেটিং নির্মাণ করিয়া ফ্রনহফার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপের আরও সুবিধা করিয়া দিলেন।

তরঙ্গবাদ অনুসারে ইণ্টারফিয়ারেন্সের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সরলীকৃত একটি চিত্র দেওয়া হইল।
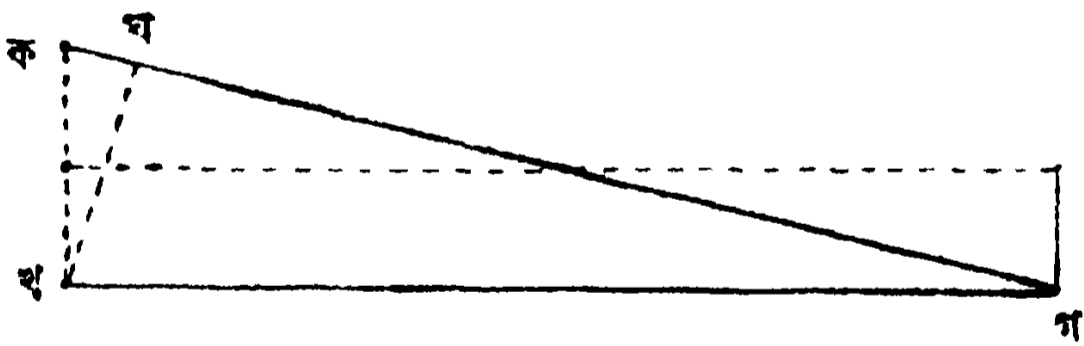
মনে করা যাক, ক ও খ দুই বিন্দুতে দুইটি আলোক-উৎস হইতে সম-অবস্থাসম্পন্ন ও সম-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ নির্গত হইয়া গ বিন্দুতে মিলিত হইতেছে। খগ পথের মধ্যে যতগুলি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ থাকিবে, কগ পথের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বেশি থাকিবে। সুতরাং ক ও খ উৎস হইতে দুইটি তরঙ্গ একই অবস্থায় নির্গত হইলেও গ বিন্দুতে উভয়ে সেই একই অবস্থায় মিলিত হইবে না। একটির শীর্ষদেশ যদি অপরটির অবনমনে মিলিত হয়, তবে উভয় তরঙ্গের মিলিত ফল হইবে অন্ধকার, অর্থাৎ গ বিন্দুতে ঈথরে তখন কোনও আন্দোলন ঘটিবে না।

নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, শাদা আলো সাতটি বিভিন্ন রঙের সমষ্টি। ইয়ং দেখাইলেন, ঐ সাতটি রং সাতটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ। লাল আলোর তরঙ্গ দীর্ঘতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০০ × ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার। তার পরে হইল কমলা, সবুজ, নীল, জরদ ও বেগুনী। বেগুনী আলোর তরঙ্গ ক্ষুদ্রতম। ইহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০০ × ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার (১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটারকে ১ অ্যাংস্ট্রম বা অ্যাংস্ট্রম একক বলা হয়)।

ডিফ্র্যাক্‌শন : আলোক-তরঙ্গ অস্বচ্ছ বাধার প্রান্তদেশ ঘুরিয়া যায় বলিয়া উক্ত বাধার জ্যামিতিক ছায়ার মধ্যেও আলোকের উপস্থিতিকে ডিফ্র্যাক্‌শন বলা হয়। একই তরঙ্গের অগ্রভাগে অবস্থিত বিভিন্ন বিন্দু হইতে নিঃসৃত গৌণ তরঙ্গসমূহের মিশ্রণের ফলে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সৃষ্টি হয়। ইহাই হইল ফ্রনহফারের ডিফ্র্যাক্‌শন তত্ত্ব।

সমবর্তন : আলোক-তরঙ্গের কম্পন কোনও একটি নির্দিষ্ট তলে আবদ্ধ থাকিবার ঘটনাকে সমবর্তন বলা হয়। কয়েকটি প্রাকৃতিক কেলাসের (ক্রিস্ট্যাল) মধ্য দিয়া আলোক যাইবার সময়ে তাহাদের কম্পন বিশেষ একটি তলে আবদ্ধ হয়।

আলোকের চাপ : ম্যাক্সওয়েল তাঁহার তাত্ত্বিক গবেষণাতেই আলোকের চাপের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। ক্রুক্‌স তাঁহার রেডিওমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে আলোকের চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বিচ্ছুরণ : একই প্রতিসরক বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর প্রতিসরক-সূচক বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। ইহাই বিচ্ছুরণের মূল কথা।

সংঘাত বিকিরণ : আলোর সহিত পরমাণুর (আরও বিশদভাবে বলিলে ইলেকট্রনের) সংঘাতের সাধারণ ফল। আলোকপাত করিলে কোনও পদার্থ হইতে যদি ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরিত হয়, তবে সেই ঘটনাকে বলা হয় উদ্ভাসন (ফ্লুরেসেন্স)। উদ্ভাসনের বিশেষ ঘটনা হইল স্বতোদ্ভাসন (ফস্‌ফোরেসেন্স)। বেকেরেল এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন।

বর্ণালীবীক্ষণ : বর্ণালীবীক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্মদাতা হইলেন

কিরকফ (১৮৫৯ খ্রী)। তাঁহার আবিষ্কারে প্রতিপন্ন হইল যে, কোনও পদার্থের পরমাণুকে উপযুক্ত উপায়ে উত্তেজিত করিলে সেই পরমাণু বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক উৎসারিত করে। যেমন প্রতিটি মানুষের কণ্ঠস্বরই তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ বিভিন্ন পরমাণু-নিঃসৃত বর্ণালীরেখা সেই সেই পরমাণুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কিরকফের আবিষ্কারের পর হইতে আজ পর্যন্ত বর্ণালী-রেখার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। বর্ণালীবীক্ষণলব্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞানীদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করিল। বিভিন্ন পরমাণু হইতে নিঃসৃত বহুবিধ রেখাযুক্ত বর্ণালী দেখিয়া তাঁহারা ভাবিতে বাধ্য হইলেন যে, পরমাণুর গঠন অতি জটিল এবং বর্ণালী পরীক্ষার দ্বারাই হয়ত পরমাণুর জটিলতার রহস্য ভেদ করা সম্ভব হইবে।

ফ্রনহফার কর্তৃক নির্মিত গ্রেটিং যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালীবীক্ষণ ও মিশ্র তরঙ্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। নিকল তাঁহার প্রিজ্‌মের সাহায্যে সাধারণ আলোককে এক তলে আবদ্ধ করিবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সময়েই স্টোক্‌স অতিবেগুনী রশ্মি আবিষ্কার করিয়া তাহার ধর্ম নির্ধারণের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং ফ্যারাডে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা আলোর কম্পন-তলের আবর্তন-সম্পর্কিত বিখ্যাত পরীক্ষা সম্পাদন করেন। ফিজু ও ফোকো আলোর গতিবেগ নির্ধারণের পরীক্ষা করেন (আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০-১০ সেন্টি-মিটার)।

তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব : আলোকশক্তির সহিত চৌম্বক শক্তির সম্পর্কের বিষয় ফ্যারাডেই সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রমাণ করেন। চৌম্বক ক্ষেত্রে রক্ষিত একটি ভারি কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া সমবর্তিত আলো প্রেরণ করিয়া ফ্যারাডে দেখাইলেন যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য সেই আলোর কম্পন-তল আবর্তিত হইতেছে।

কোলরাউস ও ভেবার দেখাইলেন যে, বিদ্যুতাধান, বিদ্যুৎ-চাপ, ক্যাপাসিটি প্রভৃতি বৈদ্যুতিক বিষয়সমূহের ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট (স্থির-বিদ্যুতের আকর্ষণশক্তির হিসাবের উপর নির্ভরশীল একক) ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইউনিটের (চল-বিদ্যুৎ পরিচালকের চতুষ্পার্শ্বে যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তাহার হিসাবের উপর নির্ভরশীল একক) অনুপাত সব সময়েই আলোর গতিবেগের সংখ্যাটির সাধারণ গুণিতক।

এই সময়ে কোলরাউস ও ভেবার -এর কাজের প্রতি ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক উপায়ে প্রমাণ করিলেন, কম্পনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং কম্পনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র, উভয়ে মিলিয়া একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তাহা উভয়েরই কম্পন-তলের লম্বের দিকে আলোর সমান গতিবেগে ধাবিত হয়। তিনি আরও বলিলেন, দৃশ্য আলোও শূন্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমাত্র।

হার্ৎজের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বা ইলেকট্রিক ডিসচার্জ হইতে শূন্যে এরূপ অদৃশ্য তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। তিনি এই তরঙ্গ সৃষ্টির যন্ত্র বা রেজোনেটার এবং গ্রাহক যন্ত্র উভয়ই নির্মাণ করেন। পরে ঐ সূত্রে কাজ করিয়া রিঘি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র বসু ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রমাণ করেন যে, ম্যাক্সওয়েল-বর্ণিত এবং হার্ৎজ কর্তৃক সৃষ্ট তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গে আলোক-তরঙ্গের সকল ধর্মই বিদ্যমান।

সমগ্র তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী নিম্নে একটি বিস্তারিত ছক দেওয়া হইল :

রশ্মি	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (A° অর্থাৎ অ্যাংস্ট্রম এককে)
নভোরশ্মি	·০০০০০০০১ হইতে ·০০১A°
গামা রশ্মি	·০০১ হইতে ·০৯A°
এক্স-রে	·০১ হইতে ২০০A°
দূরস্থ আলট্রাভায়োলেট	২০০ হইতে ১০০০A°
নিকটস্থ আলট্রাভায়োলেট	১০০০ হইতে ৪০০০A°
দৃশ্য আলোক	৪০০০ হইতে ৭০০০A°
ইনফ্রারেড	৭০০০A° হইতে ০·৪ মিলিমিটার
মাইক্রোওয়েভ	১ হইতে ১০ মিলিমিটার
বেতার তরঙ্গ	১ মিলিমিটার হইতে ঊর্ধ্বে ১০০০ মিটার ও তদূর্ধ্বে

লোরেন্‌জের তাত্ত্বিক গবেষণা : লোরেন্‌জ পরমাণুর মধ্যে গতিশীল ইলেকট্রনকে হার্ৎজের রেজোনেটার যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করিয়া বিচ্ছুরণের সমগ্র তত্ত্ব ইলেকট্রন-রেজোনেটারের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

জিম্যানের পরীক্ষা : চৌম্বক বলক্ষেত্রে আলোক-উৎস রাখিলে বর্ণালীরেখা দুই বা তিন অংশে বিভাজিত হয়। লোরেন্‌জের তত্ত্ব অনুযায়ী ইহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইল।

কণাবাদের নূতন রূপ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব : হার্ৎজ কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত ও পরে রিঘি, হলওয়াক্‌স, লেনার্ড প্রভৃতি কর্তৃক পরীক্ষিত ‘ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট’-এর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে পুনরায় নূতন রূপে কণাবাদের প্রচলন হইল। সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে লুমার ও প্রীন -এর ‘ব্ল্যাক

বডি'র তাপীয় বিকিরণ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ম্যাক্স প্লাঙ্ক এক সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলিলেন, ঐ বিকিরণের ব্যাখ্যার জন্য যে আণবিক আয়তনের হার্ৎজীয় রেজোনেটারের কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার শক্তি উহার কম্পনসংখ্যার সমানুপাতিক। সুতরাং ঐ শক্তি যদি E হয়, তবে উহাকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়: $E=h\upsilon$ (h=ধ্রুবক সংখ্যা, যাহা প্লাঙ্কের ধ্রুবক নামে পরিচিত; υ=কম্পনসংখ্যা)। সুতরাং যে বিকিরণ হার্ৎজীয় রেজোনেটার হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই $h\upsilon$ এই 'কোয়াণ্টাম' (ক্ষুদ্র পরিমাণ) শক্তিসম্পন্ন কণাসমষ্টি হইবে। উহার শক্তি নিরবচ্ছিন্ন নহে। আইনস্টাইন উক্ত কোয়াণ্টাম তত্ত্বের দ্বারা ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট, অর্থাৎ আলোক কর্তৃক পরমাণুর ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করিবার ঘটনা ব্যাখ্যা করেন। পরে কম্পটন এক্স-রের ক্ষেত্রে প্রমাণ করেন যে, আলোর মত এক্স-রের কণিকা (কোয়াণ্টাম) পদার্থের ইলেকট্রনের সহিত সরাসরি সংঘাতে নিজেও বিক্ষিপ্ত হয় এবং ইলেকট্রনকেও কিছুটা শক্তিব্যয়ে কক্ষচ্যুত করিয়া বিকিরিত করে।

বিমলেন্দু মিত্র

আলোকচিত্রণ ইওরোপে আলোকচিত্রণ (ফোটোগ্রাফি) আবিষ্কারের অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে লেন্স ও দৃষ্টিবিজ্ঞান লইয়া নানা পরীক্ষা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রোজার বেকন (১২১৪-১২৯২ খ্রী) প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রী) ক্যামেরা অব্‌সকিউরার সাহায্যে নিসর্গদৃশ্য প্রতিফলনের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

অন্ধকার ঘরে পিন-হোল ক্যামেরায় বাহিরের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়, ইহাই প্রথম আবিষ্কার। তাহার পর আসে ক্যামেরা অব্‌সকিউরা— ছিদ্রের বদলে লেন্স ও আয়না ব্যবহার করিয়া দৃশ্যকে স্পষ্টতর করিবার কৌশল। ষোড়শ শতাব্দীতে বাপতিস্তা পোর্তা এই কৌশলের উন্নতি সাধন করেন।

বাহিরের প্রতিফলনকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখিবার এই সব নানা চেষ্টা হইতেই আলোকচিত্রণ বা ফোটোগ্রাফির জন্ম। ধরিয়া রাখিবার এই কাজে তিনটি জিনিসের মিলন ঘটাইতে হইয়াছে: ১. ক্যামেরা ২. লেন্স এবং ৩ এই দুইয়ের যোগে প্রাপ্ত চিত্রকে স্থায়ী করিবার জন্য রাসায়নিক পদার্থ। আলোকচিত্রণের এই তিনটি মূল অঙ্গ। ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গের দীর্ঘ বিবর্তন-ইতিহাস আছে।

আলোকচিত্র প্রথমে ধরা পড়ে রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপযুক্ত ধাতুর প্লেটে। কিন্তু এই প্রাথমিক চিত্র ক্ষণস্থায়ী। ইহাকে স্থায়ী করিবার কৌশলও ক্রমে বাহির হয়। কিন্তু তবু ইহা একখানি মাত্র চিত্র, দুইখানির দরকার হইলে দুই বার তুলিতে হইবে। অতএব যে দিন হইতে ধাতুর প্লেটে সোজা ছবির বদলে কাচের প্লেটে উলটা ছবি ও তাহা হইতে কাগজে যত ইচ্ছা সোজা ছবির ছাপ সম্ভব হইল, সেইদিন হইতে আলোকচিত্রণের নবযুগের সূচনা। উলটা ছবি ও সোজা ছবি যথাক্রমে নেগেটিভ ও পজিটিভ নামে পরিচিত।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস ওয়েজউড, সার হামফ্রি ডেভির সঙ্গে সিলভার নাইট্রেটের উপর আলোর ক্রিয়া ও তাহার সাহায্যে মুখের পার্শ্ব-অবয়বের ছাপ তোলা অথবা অঙ্কিত চিত্রের ছাপ লওয়ার নানা পরীক্ষা করেন। কিন্তু এই আলোর ছাপ স্থায়ী করিবার কৌশল তাঁহারা জানিতেন না। কারণ সিলভার নাইট্রেটের যে অংশে আলোর ক্রিয়া হয় নাই, তাহা বাদ দিবার পদ্ধতি তখনও অনাবিষ্কৃত ছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিসেফোর নিয়েপ্‌স আরও কিছু নূতন পরীক্ষা করেন। তিনি লিথোগ্রাফ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। এক সময় তাঁহার লিথোর পাথরের অভাব ঘটে। তখন তিনি বিটুমেনযুক্ত ধাতুর প্লেটের উপর ক্যামেরা অব্‌সকিউরার সাহায্যে প্রায় ৮ ঘণ্টা আলোর ছাপ লাগাইয়া ছবি পাইতে সক্ষম হন। তিনি ইহার নাম দিলেন হেলিওগ্রাফ। হেলিওগ্রাফ এবং ফোটোগ্রাফ দুইয়েরই অর্থ এক। পরবর্তী কালে তিনি দাগেয়ারের সঙ্গে একত্রে নানা পরীক্ষা চালান। নিয়েপ্‌সের মৃত্যুর (১৮৩৯ খ্রী) ছয় বৎসর পরে দাগেয়ার তাঁহার পদ্ধতির কথা প্রকাশ করেন। এই পদ্ধতির নাম দাগেয়ারোটাইপ। এই পদ্ধতিতে সিলভার আইওডাইডের প্রলেপযুক্ত ধাতুর প্লেটে আলোর ছাপ গ্রহণের পর অন্ধকার ঘরে পারদ বাষ্প (মার্কারি ভেপার) দ্বারা সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ইহা সোজাসুজি পজিটিভ চিত্রের পদ্ধতি। দাগেয়ারোটাইপের পজিটিভ ছবি অনেক দিন পর্যন্ত ইওরোপ ও আমেরিকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যদিও বর্তমান আলোকচিত্রণের সঙ্গে ইহার ইতিহাসগত কোনও সম্পর্ক নাই। আধুনিক আলোকচিত্রণ প্রধানতঃ ফক্স টলবটের পদ্ধতি হইতে উদ্ভূত। টলবট দাগেয়ারের সমসাময়িক। দাগেয়ারের পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার আর কোনও পথ ছিল না। বিবর্তনের সূত্রপাত হয় টলবটের পদ্ধতি হইতে।

দাগেয়ারোটাইপ ছবি তুলিতে প্রথম দিকে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিত। সুতরাং মানুষের ছবি তোলা বড়ই

কষ্টকর ছিল। পরে অবশ্য এই সময় কমিয়া আধ ঘণ্টায় দাঁড়ায়। ইহার জন্য যে সরঞ্জাম দরকার হইত, তাহা বহন করাও দুঃসাধ্য ছিল। তবে আড়ম্বর যত জটিলই হউক, দাগেয়ারোটাইপ পদ্ধতির প্রতিকৃতি চিত্রধর্মিতার দিক হইতে আজও অপরাজেয় আছে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফক্স টলবট একটি নূতন পদ্ধতির কথা প্রকাশ করেন। ইহা সিলভার ক্লোরাইডের প্রলেপ দেওয়া কাগজের উপর প্রতিফলিত ছবির ছাপ গ্রহণ ও পরে তাহা সিলভার ক্লোরাইড ও পটাশিয়াম ব্রোমাইডের দ্রবণে স্থায়ী করিবার পদ্ধতি। ইহার নাম দেওয়া হয় ফোটোজেনিক বা আলোজনিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির চিত্র স্থায়ী করিবার জন্য পরে হাইপোসালফাইট অফ সোডা (সোডিয়াম থাইওসালফেট) ব্যবহৃত হয়।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে টলবট তাঁহার পদ্ধতির পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। ইহার নাম হয় টলবটোটাইপ ও পরে ক্যালোটাইপ। ক্যালোটাইপের মূল অর্থ সুন্দর চিত্র। টলবট প্রথমে কাগজের নেগেটিভ ও পরে আর একখণ্ড কাগজে তাহা হইতে পজিটিভ ছাপ গ্রহণ করেন। ছবিকে আরও স্পষ্ট করিবার রাসায়নিক ব্যবহার করেন জে. বি. রীড। এই স্পষ্টতাবর্ধক বা ডেভেলপার পরে অদৃশ্য আলোকছাপকে দৃশ্য করিবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট ভিক্টরের নিয়েপ্‌স (নিসেফোর নিয়েপ্‌সের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনুচর) কাগজের নেগেটিভের পরিবর্তে অ্যালবুমেনের প্রলেপযুক্ত কাচের নেগেটিভ ব্যবহারের ইঙ্গিত দেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ল্য গ্রে ও স্কট আর্চার পৃথকভাবে আলোকস্পর্শগ্রাহী বা সেন্সিটিভ রাসায়নিক কলোডিওন বাহনে ব্যবহারের ইঙ্গিত দেন (কলোডিওন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত— ঈথর ও গান্‌কটনের দ্রবণ।) এই বৎসর স্কট আর্চার তাঁহার কলোডিওনযুক্ত ভিজা-প্লেট-পদ্ধতি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেন। ইহা এক নবযুগের সূচনা। যদিও ভিজা প্লেটের অসুবিধাটি থাকিয়াই গেল। শুষ্ক প্লেট আবিষ্কার হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু ইহার পূর্বে অ্যামব্রোটাইপ নামক একটি পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়। কলোডিওন নেগেটিভে ছবি তুলিয়া প্রথমে তাহাকে একটি বিশেষ রীতিতে ব্লীচ বা বিরঞ্জন করিতে হয় ও পরে পিছনে কালো কাগজ রাখিয়া তাহারও পিছনে আর একখানা কাচ আঁটিয়া দিতে হয়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আর. এল. ম্যাডক্স প্রথম জেল্যাটিন মণ্ডের (ইমালশন) প্রলেপ ব্যবহার করেন। এই মণ্ডযুক্ত কাচের প্লেটে ছবি তুলিবার আগেই তাহা শুকাইয়া লওয়া যাইত। পরে ইহার দ্রুতত্বের অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা ও লেন্স এবং আনুষঙ্গিক শাটার ও ডায়াফ্রামের উন্নতি উল্লেখযোগ্য। ক্যামেরা একটি কামরা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে আলোকচিত্রণের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ অর্থ। ক্যামেরার অভ্যন্তর সম্পূর্ণ অন্ধকার, ইহার এক দিকে শাটার ও ডায়াফ্রামযুক্ত লেন্স ও তাহার বিপরীত দিকে নেগেটিভের স্থান। ডায়াফ্রামকে স্টপও বলা হয়, অর্থাৎ লেন্সে আলোক প্রবেশপথের বিভিন্ন মাপের ছিদ্র। শাটার— এই লেন্সের মুখ খোলা ও বন্ধ করিবার কৌশল। ছিদ্রপথকে অ্যাপারচার বলা হয়।

আলোকচিত্রণের প্রথম অবস্থায় ক্যামেরার মাপ ছিল ৩০৫ × ২৫৪ মিলিমিটার (১২ × ১০ ইঞ্চি)। তাহার পরের মাপ ২১৬ × ১৬৫ মিলিমিটার (৮½ × ৬½ ইঞ্চি), ইহাকে হোল প্লেট বা ফুল প্লেট বলা হয়। পরবর্তী মাপ ১৬৫ × ১২১ মিলিমিটার (৬½ × ৪¾ ইঞ্চি), ইহা হাফ সাইজ বা ক্যাবিনেট সাইজ। তার পর ১০৮ × ৮৩ মিলিমিটার (৪¼ × ৩¼ ইঞ্চি) বা কোয়ার্টার সাইজ এবং সর্বশেষ ৮৯ × ৬৪ মিলিমিটার (৩½ × ২½ ইঞ্চি) বা কার্ড সাইজ। এই আকারগুলি সবই প্লেট ক্যামেরার।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ঈস্টম্যান প্রথমে সেলুলয়েডে রোল ফিল্ম প্রস্তুত করেন এবং অস্বচ্ছ মোটা কালো কাগজের আবরণে মুড়িয়া এই ফিল্মকে দিনের আলোয় ক্যামেরায় পুরিবার উপযুক্ত করেন (১৮৯১ খ্রী)। ইহা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কারের পর হইতেই নানাবিধ আকারের পকেট ক্যামেরা আবিষ্কার এবং চলচ্চিত্র তোলা সম্ভব হয়।

দাগেয়ারোটাইপ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে এবং তাহার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিচিত্র বন্ধন হইতে আলোকচিত্রণের মুক্তি। দাগেয়ারোটাইপ ক্যামেরার জন্য যে ট্রাইপড ব্যবহৃত হইত তাহার উপরে একখানা বাংলো বাড়ি খাড়া রাখা যায়! কিন্তু রোল ফিল্ম ও ঈস্টম্যান কোডাক ক্যামেরা পকেটে বহনযোগ্য এবং এই ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ছবি তোলা খুবই সহজ ব্যাপার।

লেন্সেরও দ্রুত উন্নতি একই সঙ্গে ঘটিয়াছে। প্রথমে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি লেন্স ব্যবহৃত হইত। ইহার নাম মিনিস্‌কাস্‌ লেন্স। কিন্তু ইহার অনেক ত্রুটি ছিল, যথাস্থানে ফোকাস ঠিকমত হইত না। সেইজন্য মাত্র ইহার মধ্যস্থলের আলোটি ছোট স্টপের সাহায্যে ব্যবহার করা হইত। ইহাতে চতুর্দিকের আলো কাটিয়া যাইত। কিন্তু তবু ইহাতে সকল রং একই সঙ্গে প্লেটের সর্বত্র

যথাযথ ফোকাস হইত না। ইহার ত্রুটি কিছু পরিমাণ সংশোধিত হইল দুইখানা লেন্স একত্র জুড়িয়া। তখন ইহার নাম হইল অ্যাক্রোম্যাটিক মিনিস্কাস্। কিন্তু আরও অন্য রকম অনেক ত্রুটি থাকিয়া গেল। তখন দুইখানা মিনিস্কাস্ বিপরীতভাবে স্থাপন করিয়া উভয়ের মাঝখানে শাটার স্থাপন করা হইল। ইহাতে খাড়া রেখা ও আড় রেখা একত্র ফোকাস না হইবার ত্রুটি কিছু দূর হইল। রেখার ত্রুটি সংশোধিত হইল বলিয়া ইহার নাম হইল রেকটিলিনিয়ার লেন্স বা সংশোধিত লেন্স, অথবা সিমেট্রিক্যাল লেন্স। বেক্-এর প্রস্তুত র‍্যাপিড রেকটিলিনিয়ার লেন্সের নাম ছিল বেক্‌সিমেট্রিক্যাল লেন্স। ইহার প্রায় ২০ বৎসর আগে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহার ৩৮১ × ৩০৫ মিলিমিটার (১৫ × ১২ ইঞ্চি) প্রসেস ক্যামেরায় ব্যবহৃত রস্‌সিমেট্রিক্যাল লেন্সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। খাড়া রেখা ও আড় রেখা একত্র ফোকাস না হইবার ত্রুটিকে বলে অ্যাস্টিগ্‌ম্যাটিজম। অনেকগুলি কাচের সংযোগে পরে যে লেন্স প্রস্তুত হইল তাহাতে এই ত্রুটি সম্পূর্ণ শোধিত হইয়া লেন্সের নাম হইল অ্যানাস্টিগ্‌ম্যাট।

প্লেট ও লেন্সের উন্নতি একই সঙ্গে সম্ভব হওয়ায় শাটারেরও বিবর্তন ঘটিল। পূর্বে লেন্সের মুখে ক্যাপ থাকিত। ক্যাপটি খুলিয়া যথাপ্রয়োজন আলোকছাপ লাগাইয়া বন্ধ করিলেই চলিত। দাগেয়ারোটাইপের এক ঘণ্টার স্থলে এখন এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে ছবি তোলা সম্ভব বলিয়া শাটারকে যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় করিতে হইয়াছে। বৈদ্যুতিক উপায়ে এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা আরও অনেক কম সময়েও ছবি তোলা সম্ভব।

বড় ফিল্ড ক্যামেরা (থর্নটন-পিকার্ড) প্রথম এদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাহার সঙ্গে অলডিস অ্যানাস্টিগ্‌ম্যাট এফ/৭·৭ ব্যবহৃত হইত। অনেকে রোলার ব্লাইণ্ড শাটার ব্যবহার করিতেন। প্রয়োজনীয় এক্সপোজারে নির্দেশক কাঁটা রাখিয়া সুতা টানিলে আপনা হইতেই কাজ হইত। প্লেট ব্যবহৃত হইত ইলফোর্ড স্পেশাল র‍্যাপিড। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এদেশে শৌখিন ছোট ক্যামেরার আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। এদেশে আলোকচিত্রণের প্রথম নিদর্শন সম্ভবতঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বিচিত্র সব ছবি। এই উৎকৃষ্ট ছবিগুলি তুলিয়াছিলেন এফ. বিয়াটো।

আধুনিক কালে আলোকচিত্রের বিস্তার সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের গভীরে, মহাশূন্যে, দিনে অথবা রাত্রে, দৃশ্যজগতে অথবা অদৃশ্য ভাইরাসের জগতে ইহার অধিকার বিস্তৃত। এমন কি নিরেট অন্ধকার ও দুর্ভেদ্য কুয়াশাকে ভেদ করিয়াও আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে। ইহার অগ্রগতি আরও কতদূর হইবে এখনই তাহা বলা কঠিন।

পরিমল গোস্বামী

আলোকবর্ষ দূরত্ব পরিমাপের জন্য আমরা ইঞ্চি, ফুট, মাইল প্রভৃতি একক ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু মহাকাশে যে সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রহিয়াছে, তাহাদের দূরত্ব এতই বেশি যে মাইল, ফুট ইত্যাদির দ্বারা হিসাব করা খুবই অসুবিধাজনক। এইজন্য দূরবর্তী জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব পরিমাপের জন্য আলোকবর্ষের একক ব্যবহার করা হয়। আলোক এক সেকেণ্ডে প্রায় ২৯৯৭৩০ কিলোমিটার (১৮৬০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করে। এই হিসাবে আলো এক বৎসরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহাই এক আলোকবর্ষ।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আলোকস্তম্ভ সমুদ্রগামী জাহাজ অথবা আকাশপথে বিচরণকারী বিমানকে সতর্কতামূলক সংকেত জ্ঞাপন করিবার অথবা পথের নির্দেশ দিবার জন্য সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রমধ্যে তীব্র আলোকবর্তিকাযুক্ত স্তম্ভাকৃতির সু-উচ্চ মঞ্চ থাকে। ইহাকে আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘর (লাইটহাউস) বলা হয়।

কোথায় সর্বপ্রথম আলোকস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও অতি প্রাচীন কালে মিশরের নিম্নাঞ্চলে লিবিয়ান ও কুসাইটদের নির্মিত কয়েকটি আলোকস্তম্ভের কথা জানা গিয়াছে। তখনকার দিনের পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপ কোনও কোনও স্তম্ভের উপর সংকেতজ্ঞাপক অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। কিন্তু আলোকস্তম্ভ বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝায়, সেইরূপ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দর -সংলগ্ন ফ্যারোস নামক ছোট একটি দ্বীপে, দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালে (২৮০-২৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই আলোকস্তম্ভটি তখনকার দিনে পৃথিবীর অন্যতম 'আশ্চর্য'রূপে পরিগণিত হইত। শোনা যায়, স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এই আলোকস্তম্ভ নির্মাণের মূলে ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা।

প্রখ্যাত ম্যাসিডোনীয় স্থপতি ডাইনোক্রেটাসের প্রিয় ছাত্র সস্ট্রেটাসের সহিত এক সুন্দরী অ্যাথেনীয় কুমারীর

পরিণয়ের কথা স্থির হইয়াছিল। বাগ্‌দত্তা কুমারী পিতা-মাতার সহিত গ্রীস হইতে সমুদ্রপথে মিশরের দিকে রওনা হন। তাঁহারা মিশরের নিকটবর্তী হইলে হঠাৎ সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। রাত্রির অন্ধকারে তখন কাছের জিনিসও দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গের তাড়নায় জাহাজখানা নিমজ্জিত পাথরের সহিত প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। দারুণ মর্মবেদনায় সস্ট্রেটাস একেবারে ভাঙিয়া পড়েন। প্রিয় শিষ্যের এই অবস্থা দেখিয়া ডাইনোক্রেটাস তাঁহাকে এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মারক হিসাবে সমুদ্র-পথের দিশারী এক আলোকস্তম্ভ নির্মাণের পরামর্শ দিলেন। পরিকল্পনাটি সস্ট্রেটাসের খুবই মনঃপূত হইল। সুষ্ঠুভাবে ইহার রূপায়ণের জন্য রাজা যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলেন। পোতাশ্রয়ে প্রবেশের মুখে ফ্যারোস দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে বহু অর্থব্যয়ে ১৮৩ মিটার (প্রায় ৬০০ ফুট) উঁচু কয়েকটি তলাবিশিষ্ট এই সুদৃশ্য আলোকস্তম্ভটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে তখনকার দিনের যে কোনও আলোকস্তম্ভই ফ্যারোস নামে অভিহিত হইত। এই আলোকস্তম্ভটির সর্বোচ্চ তলায় রক্ষিত অগ্ন্যাধার হইতে অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রের বুকে আলো ছড়াইয়া পড়িত। সমুদ্রযাত্রীরা বহু দূর হইতে সেই আলো দেখিতে পাইত। দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর সমুদ্রপথের অতন্দ্র প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সস্ট্রেটাসের এই অপূর্ব কীর্তি ভাঙিয়া পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও ইহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইত। এই আলোকস্তম্ভ হইতেই পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আলোকস্তম্ভ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর যে সকল আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্রাট্ ক্লডিয়াস নির্মিত অস্ট্রিয়ার আলোকস্তম্ভ (৫০ খ্রী), র‍্যাভেনা, পজোলি, মেসিনা এবং রোমানদের নির্মিত ডোভার ও বোলোনার আলোকস্তম্ভগুলির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল প্রাচীন আলোকস্তম্ভের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে তাহাদের স্থলে নূতন নূতন স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইওরোপের উপকূল-ভাগে বহুসংখ্যক আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হয়। এই সকল আলোকস্তম্ভে ওক কাঠের আগুন জ্বালাইয়া আলোক-সংকেত দেওয়া হইত, তারপরে কয়লা পোড়াইয়া অগ্নি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য উভয় রকমের জ্বালানি সুবিধামত ব্যবহৃত হইত। ঐ সময় হইতে আমেরিকায়ও কিছু কিছু আলোকস্তম্ভ নির্মিত হইতে থাকে। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বস্টন আলোকস্তম্ভটি বোধ হয় প্রাচীনতম। ইহার পূর্বে ও পরে কয়েকটি আলোক-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় পর্যবেক্ষণকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়াখণ্ডেও কতকগুলি আলোক-স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে হর্সবার্গ (সিঙ্গাপুর, ১৮৫১ খ্রী), অ্যালগুয়াডা রিফ (বঙ্গোপসাগর, ১৮৬৫ খ্রী), গ্রেট বাসেস (সিংহল, ১৮৭৩ খ্রী), দি প্রংস (বোম্বাই, ১৮৭৪ খ্রী) প্রভৃতি আলোকস্তম্ভগুলি উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সবই সমুদ্রবক্ষে নির্মিত।

আলোকস্তম্ভ সাধারণতঃ দুই রকমের হইয়া থাকে, সমুদ্রবক্ষে নির্মিত এবং উপকূলভাগে স্থাপিত। সমুদ্রবক্ষে নির্মিত আলোকস্তম্ভকে সর্বদাই সমুদ্রতরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে হয়। উপকূলভাগে স্থাপিত আলোকস্তম্ভই সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও অনেক। সমুদ্র-তরঙ্গাহত আলোকস্তম্ভ চার রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্মিত হয়: ১. সর্বোৎকৃষ্ট ইট, চুন, সুরকি ও কংক্রিটের গাঁথুনি; ২. লৌহ ও ইস্পাতের উন্মুক্ত কাঠামো; ৩. ঢালাই লোহার পাতের আচ্ছাদনযুক্ত এবং ৪. ভারি এবং শক্ত পদার্থ-পূর্ণ নিমজ্জিত বৃহৎ আধারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গঠিত। এই সকল আলোকস্তম্ভের উপরে প্রকাণ্ড লণ্ঠনে ৪ হইতে ৬টি প্রশস্ত পলিতাযুক্ত তেলের বাতি ব্যবহৃত হইত। কোনও কোনও আলোকস্তম্ভ হইতে ঘন কুয়াশার মধ্যে জাহাজকে সতর্ক করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিবার ব্যবস্থা থাকিত। আবার কখনও কখনও গান্ কটনের বিস্ফোরণ ঘটাইয়া সতর্কতার জন্য সংকেত দেওয়া হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন আলোকস্তম্ভগুলিতে কাঠ অথবা কয়লা পোড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইত। এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এমন কি, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর কয়লার পরিবর্তে লণ্ঠনের মধ্যে বৃহদাকৃতির চর্বিবাতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আলোকস্তম্ভের বাতির জন্য চওড়া ফিতার পলিতা ব্যবহার শুরু হয়। ১৭৮০-১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নলের মত গোলাকার পলিতা উদ্ভাবিত হইবার পর একই অক্ষের উপর ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় ব্যাসার্ধের ৪-৬টি বা ততোধিক পলিতা ব্যবহার করা হইত। বাতির জন্য তিমি মাছের তেল, কোলজা তেল, জলপাই তেল, নারিকেল তেল ও চর্বি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। খনিজ তেল আমদানি হইবার ফলে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তেলের ব্যবহার হ্রাস পাইল। ক্যাপ্টেন ডোটি কর্তৃক বার্নার উদ্ভাবিত হইবার ফলে সাফল্যের

সহিত হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেল এবং যাবতীয় আলোকস্তম্ভের কর্তৃপক্ষই খনিজ তেল ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত আলোকস্তম্ভসমূহে একমাত্র খনিজ তেলের ব্যবহারই চলে। ইহার পর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আলোকস্তম্ভের জন্য কয়লার গ্যাসের প্রচলন হয়। ওয়েল্‌স্‌বাক ম্যাণ্ট্‌ল উদ্ভাবিত হইবার পর গ্যাসের স্থানীয় সরবরাহ অনুযায়ী আলোকস্তম্ভগুলিতে গ্যাসের আলোই ব্যবহৃত হইতে থাকে। তেলের বার্নার উদ্ভাবনের পর পেট্রোলিয়ামকে গ্যাসে পরিণত করিয়া ম্যাণ্ট্‌লের মধ্য দিয়া জ্বালাইলে তীব্র আলোক উৎপন্ন হয়। আলোকস্তম্ভের জন্য এই আলোই তখন সর্বাধিক উপযোগী বিবেচিত হইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বয়া এবং সাধারণ সংকেতবাতির জন্য অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাহার পর হইতে সাধারণ আলোকস্তম্ভগুলির জন্যও অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার হইতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রিনিটি হাউসে ইংল্যাণ্ডের সাউথফোরল্যাণ্ডে আলোকস্তম্ভের জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের পরীক্ষা হয়। ইহার পর আরও কয়েকটি আলোকস্তম্ভে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিলেও পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অতি সংহত কুণ্ডলীকৃত উচ্চশক্তির ফিলামেণ্ট ল্যাম্প উদ্ভাবিত হইবার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আলোকস্তম্ভসমূহে এইরূপ বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার চলিতে থাকে। আলোকস্তম্ভ হইতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকেত দেওয়া হইয়া থাকে। কোথাও ঊর্ধ্ব-অধঃভাবে অথবা পাশাপাশি, কোথাও দিক্‌চক্রবালে আলো ছড়াইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত ঘূর্ণায়মাণ আলো অথবা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আলো-আঁধার সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থাও আছে। কোনও কোনও আলোকস্তম্ভ হইতে সংকেত দিবার জন্য রঙিন আলোকও প্রক্ষেপ করা হয়।

সমুদ্রবক্ষে নির্মিত আলোকস্তম্ভগুলির দৈনন্দিন কাজ চালাইবার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাকে স্তম্ভের মধ্যেই নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতে হয়। কিছুদিন পর পর তাহার রসদাদি প্রেরণ করা হয়। মাসখানেক বা ঐরূপ কোনও নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোকবিনিময় হইয়া থাকে। আবার কোনও কোনও আলোকস্তম্ভে স্থলভাগের স্টেশন হইতে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকেত দেওয়া হয়। আজকাল অনেক আলোকস্তম্ভেই এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়া থাকে।

সমুদ্রবক্ষে বিচরণকারী জাহাজের সতর্কতার জন্য আলোকস্তম্ভ ছাড়া অন্য কয়েক রকম উপায়েও আলোক-সংকেত দিবার ব্যবস্থা অনেক কাল হইতেই প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে সংকেতপ্রদানকারী জাহাজই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এইরূপ আলোকবহনকারী জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল জাহাজে তখনকার দিনে প্রচলিত সাধারণ আলোই ব্যবহৃত হইত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির জাহাজ এই কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল জাহাজে আধুনিক উন্নত ধরনের আলোর ব্যবস্থাদি ছাড়াও ঘন কুয়াশার মধ্যে সংকেত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সাইরেন, ডায়াফোন, ঘণ্টা ও অন্যান্য শব্দ-উৎপাদনকারী যন্ত্রাদির ব্যবস্থা থাকে। সমুদ্রপথে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিবার জন্য এই সকল জাহাজ ব্যতিরেকে সমুদ্রের বিপদসংকুল স্থানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি -সমন্বিত ছোট-বড় বিভিন্ন রকমের জলযান এবং আলোক-প্রক্ষেপক ও ঘণ্টাধ্বনি বা তীব্র শব্দ-উৎপাদক বয়ার ব্যবস্থা থাকে। কেবলমাত্র সমুদ্রপথেই নহে, রাত্রির অন্ধকারে আকাশপথে যাতায়াতকারী উড়োজাহাজকে সতর্কতামূলক সংকেত জ্ঞাপনের জন্য আজকাল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সু-উচ্চ আলোকমঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘর বলিতে যাহা বুঝায় এইগুলি সেই রকমের কিছু না হইলেও সমুদ্র ও আকাশপথে বাতিঘরের মতই কাজ করিয়া থাকে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুসংখ্যক বাতিঘর বা আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতেও ১৯০০টি আলোকস্তম্ভ আছে। ভারতের প্রায় ৭২৫০ কিলোমিটার (সাড়ে চার হাজার মাইল) দীর্ঘ উপকূল বরাবর জনমানবহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বা উপকূলবর্তী নির্জন স্থানে সমুদ্রে নিশানা দিবার কাজে কয়েক হাজার লোক নিঃসঙ্গভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। জাহাজ চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রথম পরিকল্পনায় ৩৫টি নূতন আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭০টিরও বেশি আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। কাণ্ড্‌লা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য রেডার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৬০টি আলোকস্তম্ভ নির্মাণ, ৩০টি বাতিঘরে আধুনিক বাতি সংস্থাপন, হ্রস্বতরঙ্গের ৩টি বিপদজ্ঞাপক বেতারকেন্দ্র স্থাপন, ১০০টি বয়া ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থাদি করা হইবে। বর্তমানে ভারতের বাতিঘর বা আলোকস্তম্ভ -বিভাগের জন্য যুগোস্লাভিয়ায় আধুনিক ব্যবস্থা -সমন্বিত একটি আলোকবাহী জাহাজও নির্মাণ করা হইতেছে। এই জাহাজ হইতে সমুদ্রবক্ষে বয়া স্থাপন ও অন্যান্য সতর্কতা-

মূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন সহজসাধ্য হইবে। ইহাতে হেলিকপ্টার অবতরণের জায়গা এবং আলোর সাজ-সরঞ্জাম মেরামতের কারখানাও থাকিবে। বাতিঘরের সাধারণ সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণ ও মেরামতের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও জয়নগরে ৪টি কারখানা আছে। কিন্তু এখনও প্রধান প্রধান সরঞ্জাম বিদেশ হইতেই আমদানি করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাতিঘর-বিভাগ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য কলিকাতায় একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাতিঘর পরিচালনার কাজে কর্মীদের সুদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য এই বিভাগ কলিকাতায় একটি বাতিঘর-কর্মী-শিক্ষণ-কেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আল্লা, আল্লাহ্ আরবী শব্দ। 'অল্ ইলাহ্' হইতে অল্লাহ্ বা আল্লাহ্ শব্দ আসিয়াছে। 'অল্' বিশিষ্টার্থক আরবী উপসর্গ (ইংরেজী 'দি'-এর সমার্থক)। ইহা মূল সেমিটিক ভাষার শব্দ এবং হিব্রু 'এল্' ও ব্যাবিলনীয় 'ইল্' শব্দদ্বয়ের সমগোত্রীয়। 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ উপাস্য, দেবতা। সুতরাং অল্ ইলাহ্ (আল্লা) =একমাত্র উপাস্য। কোরানের সূয়াতুল-ইখ্‌লাস অধ্যায়ে আছে:

বলো, সেই আল্লা এক। আল্লা একমাত্র উপায়। তিনি কাহারও জন্মদাতা নহেন, কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই। তাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

'ইসলামী দর্শন' দ্র।

আবুল হায়াত

আল্লেপী,-পেই কেরল রাজ্যের অন্যতম জেলা এবং ঐ জেলার সদর। ইহা দক্ষিণ ভারতের মালাবার বা পশ্চিম উপকূলের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ইহা প্রধান বন্দর ছিল। কেরল রাজ্যের বিশিষ্ট বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র এর্নাকুলম হইতে আল্লেপী প্রায় ৫৬ কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দক্ষিণে এবং কোল্লম্ (কুইলন্) শহর এবং রেলওয়ে জংশন হইতে ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে আল্লেপী জেলার আয়তন ১৮০৮ বর্গ কিলোমিটার (৬৯৮ বর্গ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা ১৮১১২৫২, অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০০২ (প্রতি বর্গ মাইলে ২৫৯৫)। আল্লেপী বন্দর সমেত পৌর-এলাকার জনসংখ্যা ১৩৮৮৩৪ (১৯৬১ খ্রী)।

বন্দরটি ১৭৭০ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন মহারাজা রাম বর্মা। মহারাজা রাম বর্মার বিখ্যাত দেওয়ান রাজা কেশবদাস ইহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এই সময়ের কিছু পূর্বে, মহারাজা মার্তণ্ড বর্মার রাজত্বকালে, ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের বাণিজ্যে ওলন্দাজ হস্তক্ষেপের অবসান ঘটে। কিন্তু ওলন্দাজ রণতরীর দৌরাত্ম্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য তখনও ত্রিবাঙ্কুরের আয়ত্তে আসে নাই। মালাবার উপকূলের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য গোলমরিচ স্থলপথে পূর্ব উপকূলে পাঠাইতে হইত। আল্লেপী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ান কেশবদাস ওলন্দাজদের সামুদ্রিক অবরোধ ভাঙিয়া দেন। এখানে অন্য বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কিছুকালের মধ্যেই ফলপ্রসূ হয় এবং ক্রমশঃ বন্দরে বহির্বাণিজ্যের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মহীসোপানে উপকূলের সমান্তরাল বাঁধ-সদৃশ দ্বীপমালা থাকার জন্য ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আরবসাগরের তরঙ্গরাশি হইতে বন্দরটি সুরক্ষিত। সমুদ্র হইতে প্রতীপ জলে (ব্যাক-ওয়াটার্স্) আসিবার পথটি কাটিয়া সুগম করিবার ফলে প্রায় সব ঋতুতেই অর্ণবপোতের পক্ষে এখানে নিরাপদে আশ্রয় লওয়া সম্ভব হয়। ফলে আল্লেপী শহর এবং বন্দরের সমৃদ্ধি বাড়িতে থাকে এবং ১৯শ শতকের প্রথম ভাগে ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্বপ্রধান বন্দরে পরিণত হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ হইতেই ত্রিবাঙ্কুর রাজ-সরকারের উদ্যমে এই স্থানে বহু গুদামঘর এবং বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলের যাবতীয় আরণ্য-সম্পদ উক্ত বাণিজ্যকেন্দ্রে লইয়া আসার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করা হয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে আল্লেপী বন্দরের যতদূর সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই।

ছোবড়ার মাদুর নির্মাণ আল্লেপীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প। ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য এই স্থানের তৈল ব্যবসায় এবং তৈল নিষ্কাশন শিল্প। এই শহরে হইতে নারিকেলজাত নানাবিধ দ্রব্য, ছোবড়া এবং ছোবড়ার মাদুর রপ্তানি হয়। ইহা ভিন্ন চা, কফি এবং রবার প্রভৃতি দ্রব্যও চালান যায়।

আল্লেপী শহরে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত দুইটি ডিগ্রী কলেজ আছে; ইহাদের মধ্যে একটি ছাত্রীদের জন্য।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. V, Oxford, 1903; *Census of India: Paper No. 1 of 1962*:

1961 Census: *Final Population Totals*, New Delhi, 1962 ; V. Nagam Aiya, *The Travancore State Manual*, vols. I-III, Trivandrum, 1906 ; Shungoonny P. Menon, *A History of Travancore*, Madras, 1878.

সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আশানন্দ ঢেঁকি (মুখোপাধ্যায়) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা এবং বীরত্বের কাহিনী বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত গর্বের সহিত আলোচিত হইত। দেশে সে সময়ে ডাকাতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ধমান হুগলী নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণ কালেক্টরিতে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব পাঠাইবার সময়ে আশানন্দের সাহায্য লইতেন। ডাকাতেরা তাঁহার হাতে কিরূপ লাঞ্ছিত হইত সে সম্বন্ধে বহু অবিশ্বাস্য গল্প প্রচলিত আছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে তাঁহার 'ঢেঁকি' উপাধি লাভ হইল সে সম্বন্ধে কাহিনীটি নিম্নরূপ : এক জমিদারের দেয় কিস্তির টাকা কালেক্টরিতে জমা দিবার উদ্দেশ্যে গমনকালে পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় আশানন্দ এক গৃহস্থের বাড়িতে পাইক-বরকন্দাজসহ আশ্রয় লন। খবর পাইয়া ডাকাতেরা গৃহস্থের বাড়ি আক্রমণ করে। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া তখন আশানন্দ গৃহস্থের ঢেঁকিটি উপড়াইয়া লইয়া উহার সাহায্যেই ডাকাতদের তাড়াইয়া দেন। সেই হইতে ঢেঁকি উপাধিতে তিনি খ্যাত।

আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪ খ্রী) রাজশাহী (পরে পাবনা) জেলার হরিপুর গ্রামের এক প্রখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১২ জুন ১৮৬০, মৃত্যু ২৩ মে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা দুর্গাদাস, মাতা মগ্নময়ী। এক বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া আশুতোষ কেমব্রিজে সেণ্ট জন্স কলেজে যোগ দেন। সেখানকার পরীক্ষাতেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরিয়া তিনি ক্রমশঃ ব্যবহারজীবীরূপে যেমন প্রতিষ্ঠালাভ করেন তেমনই কংগ্রেস প্রভৃতি নানা সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের কর্মে আত্মনিয়োগেও অগ্রণী হন।

উত্তরকালে তিনি দেশব্রতী রাজনীতিক, শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী, নানা কল্যাণকর্মে উদ্যোগী, সুদক্ষ আইনব্যবসায়ী এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারপতিরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি যে সাহিত্যালোচনাতেও নিমগ্ন ছিলেন তাহার সাক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের কবিতাগুলি তিনিই যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া প্রকাশ করেন। ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। যৌবনে ভারতী পত্রে 'কাব্যজগৎ' প্রবন্ধমালায় (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) কীট্স, পো, বার্ন্স, আঁদ্রে শেনিয়ে প্রভৃতি বিদেশী কবি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ না হওয়ায় তাহা বিস্মৃত, কিন্তু বিস্মরণযোগ্য নহে। কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় 'সাভানারোলা' নামে একটি দীর্ঘ ইংরেজী কবিতাও লিখিয়াছিলেন, গুণীজনের সমাদর লাভ করিয়া তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি তখন ইংরেজী কাব্যচর্চা বিষয়ে নিরুৎসাহ করিতেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০) পাঠ করেন তাহাতে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস হইতে অভিজাতবর্গের ভাষা ও সাধারণের ভাষার দ্বন্দ্ব ও 'কথার জাতিভেদে'র বিবরণ উল্লেখ করিয়া তিনি সাহিত্যে সাধারণের ভাষা ব্যবহার সমর্থন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার তর্কের সূচনা হইয়াছে।

১৩১৯-২০ ও ১৩২৫-২৮ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

যেমন সাহিত্য, তেমনি বিবিধ ললিতকলার চর্চাতেও আশুতোষের উৎসাহ ছিল। প্রাচ্যকলানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত (১৯০৭ খ্রী) ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সহধর্মিণী প্রতিভা দেবীর উদ্যোগে পরিচালিত সংগীতসংঘের তিনি বিশেষ পোষকতা করিয়াছেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের বর্ধমান অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার উক্তি 'পরাধীন জাতির কোনও রাজনীতি নাই' ('এ সাবজেক্ট রেস হ্যাজ নো পলিটিক্স') সেকালে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। আশুতোষ অবশ্য চরমপন্থার সমর্থনে এই উক্তি করেন নাই। তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের 'ভিক্ষাবৃত্তি' ত্যাগ করিয়া, আত্মশক্তিতে নির্ভরপূর্বক দেশকে গড়িয়া তুলিতে সকলকে আহ্বান

করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি জেলায় জেলা পরিষদ্ বা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ইহার অন্যতম কর্তব্য হইবে অর্থসংগ্রহ করিয়া শিল্পশিক্ষার্থে বিদেশে ছাত্রপ্রেরণ, যাহাতে দেশের লোককে চাকুরির উপর আত্যন্তিক নির্ভর করিতে না হয়। অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশনের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহার সুহৃদ্ রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে (১৯০৪ খ্রী) আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিবার প্রস্তাব করেন এবং এজন্য পল্লীসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পাবনা জেলা সম্মেলনে আশুতোষ সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণে তিনি স্বদেশী ব্রত ও তাঁতশিল্পরক্ষায় এবং আত্মচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন -নিরপেক্ষভাবে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবনায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্‌সের যে অধিবেশন হয় আশুতোষ ছিলেন তাহার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহুসংখ্যক ছাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে অস্বীকৃত হইলে, কলিকাতায় যে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠায় আশুতোষ অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর এই সম্পর্কে বাঙালী প্রধানদের যে সভা হয় আশুতোষ তাহার আহ্বায়ক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্পাদক, সহকারী সভাপতি, সভাপতি প্রভৃতি নানা পদ গ্রহণ করিয়া তিনি আজীবন এই পরিষদের সহিত যুক্ত থাকেন এবং ইহার আনুকূল্যবিধানে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন এবং সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে ইহার সেবা করেন।

বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। এই সভা তাঁহার নেতৃত্বে নানা দেশকল্যাণকর্মের কেন্দ্র হইয়াছিল; ইহার পক্ষ হইতে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধতা করিয়া যে মন্তব্যপত্র প্রেরিত হয় তাহার যুক্তি সরকারপক্ষও স্বীকার করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশসেবার স্বীকৃতি-রূপে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজেরও তিনি সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় তিনিও আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগস্থাপনে বিশেষ উদ্‌যোগী হন।

দ্র প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী', জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী', প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ; মন্মথনাথ ঘোষ, 'স্যর আশুতোষ চৌধুরী', মানসী ও মর্মবাণী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ; চারুচন্দ্র মিত্র, 'আশুতোষ চৌধুরী', মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ; The National Council of Education, Bengal, *Journal of the College of Engineering and Technology*, December, 1938; Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, *The Origin of the National Education Movement*, Jadavpur University, 1957; 'Sir Asutosh Chaudhuri, the Centenary of a Great Indian', *Hindusthan Standard*, June 12, 1960.

পুলিনবিহারী সেন

আশুতোষ দেব (১৮০৫-১৮৫৬ খ্রী) বিশিষ্ট দাতা ও বিদ্যোৎসাহী। সাতুবাবু বা ছাতুবাবু নামে সুপরিচিত। ইনি ধনকুবের রামদুলাল দেব সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আশুতোষ প্রথম দেশীয় জুরিদের অন্যতম (১৮৩৪ খ্রী) এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কমিটির সদস্য ছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি পণ্ডিতদের সাহায্যে পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত লিপির পরিবর্তে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করান। তাঁহার বাসভবনে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঞ্চেই শকুন্তলা নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। বিডন স্ট্রীটের বাজার এবং শালকিয়ার স্নানের ঘাট তাঁহারই নামানুসারে যথাক্রমে ছাতুবাবুর বাজার ও ছাতুবাবুর ঘাট নামে পরিচিত। বিভিন্ন হিন্দু তীর্থে তাঁহার বহু দানের নিদর্শন এখনও বর্তমান।

সংগীতবিষয়েও ছাতুবাবুর খ্যাতি ছিল। বিখ্যাত সেতারী ওস্তাদ রেজা খাঁ তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষায় ছাতুবাবু বাংলার আদি সেতারবাদকগণের অন্যতমরূপে বিবেচিত হন। অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কলাবৎবৃন্দ তাঁহার

সংগীতের আসরে যোগদান করিতেন। উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ মিউজিয়াম ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ্‌গণের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামের স্মৃতি লইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে এই সংগঠন ভারতীয়— বিশেষ করিয়া পূর্ব ভারত ও বঙ্গ দেশের, শিল্পকলার সংগ্রহশালা, সংরক্ষণাগার ও গবেষণাকেন্দ্ররূপে কাজ করিয়া আসিতেছে। প্রস্তর, ধাতু ও দারু নির্মিত ভাস্কর্য ও কারুকার্য, লোকশিল্প, পোড়ামাটির মূর্তি ও দ্রব্য, প্রাচীন পুথির চিত্রিত আবরণ, মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রিত পুথি-পুস্তক ও চিত্রাবলী এই প্রতিষ্ঠানের দর্শনীয় সংগ্রহ। এই সংস্থার চেষ্টায় উত্তর বঙ্গে বাণগড়ের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালিত ও সম্পন্ন হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের নদী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত পোড়ামাটির দ্রব্য-গুলি এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের প্রমাণ; উহারা বঙ্গ দেশের তিন হাজার বৎসরের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারও সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ের (বেড়াচাঁপা, বারাসত) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক অভিযান চালাইয়া বহু ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করিয়াছে। আঠার হাজারের উপর প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে শিল্পকলারও দুর্লভ সংগ্রহ রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত 'শিল্পানুভূতির মূল্যায়ন' -বিষয়ক পাঠ্যক্রম এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম-বিদ্যা-বিভাগও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। নির্বাচিত শিল্পসামগ্রীর রঙিন ছবি -সংবলিত পোস্টকার্ড, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ও বাংলা দেশের লোকশিল্প-নিদর্শনের তালিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থে রক্ষিত আছে।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রী) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন কলিকাতা বৌবাজারে মলঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে আশুতোষের জন্ম। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। স্নেহময় ও সদাসতর্ক পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

আশুতোষ প্রথমে চক্রবেড়িয়া এবং পরে সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার অভিনিবেশের শক্তি ছিল অসাধারণ এবং গণিতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্কুলজীবনেই 'কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথিম্যাটিক্‌স'-এ তাঁহার দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা সমস্যা লিখিয়া পাঠাইতেন, কখনও কখনও সমাধানও প্রকাশিত হইত। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতার ও আশ্চর্য সমাধান-ক্ষমতার স্বীকৃতি আছে এডওয়ার্ডসের 'ডিফারেন্‌শল ক্যালকুলাস' ও ফরসাইথের 'ডিফারেন্‌শল ইকুয়েশন'-এ। ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উচ্চ গণিতের বিষয়ে তিনি প্রায় কুড়িটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। কলেজে পড়িবার সময় গণিতে পারদর্শিতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বুথ সাহেবের প্রিয়পাত্র হন। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁহার সাফল্য দেখা গিয়াছিল প্রথম হইতেই। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় এবং দুই বৎসর পরে এফ. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় হন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছয় মাস পরেই এম. এ. পরীক্ষায় তিনি অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহারই পরের বৎসর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তি পান এবং ফিজিক্সেও এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম দুইটি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আইন-শাস্ত্রেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অনুরূপ; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ডক্টর অফ ল' ডিগ্রি লাভ করেন। টেগোর ল প্রফেসর -রূপে 'ল অফ পারপিটুইটিজ'-এর এক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যার্থী হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া সরকার হইতে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে কর্ম লইবার জন্য ডাকা হয়। কিন্তু ভারতে শিক্ষিত অধ্যাপককে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত অধ্যাপকের সমমর্যাদা দানে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখনকার দিনে, বিশেষ করিয়া ওকালতিতে ভাল পসার হওয়ার পূর্বে, ইহা খুবই সাহসের কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালে লর্ড কার্জন ও লর্ড রোনাল্ড্‌সে-র বিলাত যাত্রার অনুরোধ প্রত্যাখ্যানে এবং সেনেট হলে লর্ড লিটনের জবাবে তাঁহার তেজস্বিতার

পরিচয়ে লোকে তাঁহাকে নরশার্দূল বা 'বেঙ্গল টাইগার' বলিয়া জানিত।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যথারীতি উকিল হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হাই-কোর্টের বিচারপতি হন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছু-কালের জন্য প্রধান বিচারপতির পদও অলংকৃত করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এবং ১৮৯৮ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার পর হইতে তাঁহাকে এই সকল জনসংস্থা হইতে সরিয়া কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয় ও হাইকোর্ট লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হয়। হাইকোর্টে তাঁহার রায়ে স্বাধীন ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। সমগ্র ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়-গুলিতে এই দিক দিয়া তাঁহার খ্যাতি ও প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং অল্পকাল পরেই সিণ্ডিকেটের সভ্য হইতে পারিলেন ; তখন হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও উপবিধি— সকলই তাঁহার নখদর্পণে রহিল। তিনি ভাল বলিতে ও বিতর্ক করিতে পারিতেন, সুতরাং সেনেট-সিণ্ডিকেটে একটা প্রধান আসন শীঘ্রই তাঁহার আয়ত্তে আসিল। এই সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। উপাচার্য হওয়ার পূর্বে, এমন কি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন কি করিয়া বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনিই প্রথম মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। উপাচার্য হিসাবে না থাকিলেও তাঁহার প্রচণ্ড শক্তি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে নিযুক্ত থাকিত। তিনিই স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রথম সংগঠন করেন। পূর্বে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে এম. এ. পড়ানো হইত। নবগঠিত স্নাতকোত্তর বিভাগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এরূপ অধ্যাপনা কেন্দ্রীভূত করিলেন যাহাতে সকল ছাত্রই শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের সংস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে নূতন নূতন শাস্ত্রের চর্চা হইতে লাগিল, যেমন তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান, ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামের সংস্কৃতি ইত্যাদি। ভারতীয় ভাষাগুলির উচ্চতর পরীক্ষা ও তদনুসারে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় সংহতির এক পরম সুন্দর উপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই সকল বিভাগের পণ্ডিতেরা ছিলেন বিশেষজ্ঞ, ইঁহাদের ছাত্ররাই আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া শিক্ষাজগতে নেতৃত্ব করিতেছেন এবং ভারতের সকল ক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করিতেছেন। শুধু পরীক্ষা-গ্রহণ নহে, অধ্যাপনাও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এবং বিদ্যা-চর্চার পরিধি যে সুবিশাল, ইহা বাঙালী তথা ভারতবাসী নূতন করিয়া হৃদয়ংগম করিতে লাগিল। স্যর আশুতোষ শুধু আদর্শের কথা ঘোষণা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, তিনি পূর্ব হইতেই বিষয়গুলির পরিধি নির্দেশ করিয়া রাখিতেন এবং তাহার পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষক ও অধ্যাপক নির্বাচন— সব বিষয়েই ভারতীয়ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। অন্য দিক দিয়াও তাঁহার ব্যবস্থায় ছাত্রগণ সন্তুষ্ট থাকিত, তাহারা উপকৃত হইত। বড় বড় অধ্যাপক-দের দিয়া তিনি প্রশ্নপত্র দেখাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরীক্ষার প্রশ্ন যাহাতে ছাত্র ঠকাইবার মত না হয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাহাতে ছাত্রদের পক্ষে কঠিন না হয়, শিক্ষার প্রসার যাহাতে সমধিক হয় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ইহা ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও ভবিষ্যতের কর্মনীতি আলোচনার জন্য যখন স্যাড্‌লার কমিশন ভারতবর্ষে আসেন তখন কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ান এবং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অন্য মতের আলোচনায় তৎপরতা ও পরিকল্পনার বিশালতা দেখিয়া কমিশনের অন্য সদস্যেরা চমৎকৃত হন।

স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংকর্তৃত্বের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা চাই, ইহা রাষ্ট্রের অর্থসাহায্য লইবে কিন্তু দাসমনোভাবে দুষ্ট হইবে না, এই ছিল তাঁহার আদর্শ। এজন্য বঙ্গীয় সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিকূলতা তাঁহার প্রবর্তিত শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। দেশময় তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাঁহার আহ্বানে দানবীরেরা উচ্চশিক্ষার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সাগরপারেও তিনি তাঁহার অনুরাগী শিক্ষাবিদ্‌-গণের সমর্থন পাইলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। তিনি তিন বার এশিয়াটিক সোসাইটির

সভাপতি হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত পরীক্ষাগ্রহণ সমিতি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাষ্টি বোর্ডেরও সভাপতি ছিলেন। তাঁহার 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধসংগ্রহে স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় আছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনিই প্রথম সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা-গণের একজন। বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য গঠিত ভারত-সমিতিরও তিনি সভাপতি ছিলেন। পালি, ফরাসী, রুশ প্রভৃতি বহু ভাষা তাঁহার জানা ছিল। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি হইতে তাঁহাকে 'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি দেওয়া হয়। নবদ্বীপ ও পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যথাক্রমে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে ভারত সরকারের নিকট তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সি. এস. আই. ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নাইট উপাধি লাভ করেন।

জজিয়তি হইতে অবসর লইয়া প্রসিদ্ধ ডুমরাঁও মোকদ্দমা উপলক্ষে আশুতোষ পাটনায় গিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দেশসেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনাময় মুহূর্তে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ মে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রিয়রঞ্জন সেন

আশ্বলায়ন ঋগ্বেদের অন্যতম শাখার প্রবর্তক আশ্বলায়ন একজন প্রসিদ্ধ কল্পসূত্রকার। আশ্বলায়ন শাখার অনুগামী ঋগ্বেদীগণ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ও আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র অনুসারে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, আশ্বলায়নের গুরু শৌনকঋষি প্রথম ঋগ্বেদের কল্পসূত্র রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শিষ্যকৃত সূত্রের উৎকর্ষদর্শনে তিনি স্বরচিত গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন। কল্পসূত্র ছাড়া ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যকটিও আশ্বলায়নের রচনা বলিয়া কথিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে দর্শপূর্ণ-মাসযাগ, অপরাপর ইষ্টিযোগ, পশুযাগ, চাতুর্মাস্য এবং সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত একাহ, অহীন ও সত্র— এই তিন শ্রেণীর যজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বর্ণিত আছে।

চারি অধ্যায়ে বিভক্ত আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় পাকযজ্ঞ ও সংস্কারগুলির বিবরণ আছে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

আশ্রম জীবনের অবস্থা বা ধর্ম -বিশেষ। আশ্রম চারিটি —ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই সমস্ত আশ্রম যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা যথাক্রমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। একমাত্র ব্রাহ্মণই চারিটি আশ্রমের অধিকারী; ক্ষত্রিয় সন্ন্যাস ব্যতীত অপর তিন আশ্রমের, বৈশ্যও এই তিন আশ্রমের বা কোনও মতে গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ্য এই দুই আশ্রমের এবং শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিকারী। কাহারও কাহারও মতে কলিকালে সকলের পক্ষেই শেষ দুই আশ্রম নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমটিই দীর্ঘকাল যাবৎ মুখ্য আশ্রমরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ইহার আনুষঙ্গিক হিসাবে ব্রহ্মচর্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। ফলে আশ্রমহীন অবস্থায় কখনও থাকিবে না (অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ)— এই নির্দেশের বলে বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীবিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিবার রীতি আচারনিষ্ঠ সমাজেও সমর্থন লাভ করিয়াছে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী নিয়মনিষ্ঠ হইয়া গুরুগৃহে বাস করেন, গুরুশুশ্রূষা করেন, গুরুর নির্দেশ অনুসারে বেদ পাঠ করেন এবং গুরুর আদেশ গ্রহণপূর্বক ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গুরুর আদেশ লইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন ও যথা-নিয়মে বিবাহ করেন। তখন তাঁহাকে শক্তি অনুসারে গৃহস্থের সমস্ত কর্তব্য পালন করিতে হয়। তর্পণের দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের, অন্নের দ্বারা অতিথিগণের, বেদাধ্যয়নের দ্বারা মুনিগণের, অপত্যোৎপাদনের দ্বারা প্রজাপতির, বলিকর্ম বা আনুষ্ঠানিক ভোজ্যদ্রব্য দানের দ্বারা প্রাণীগণের এবং বাৎসল্যের দ্বারা সমস্ত জগতের অর্চনা ও সন্তোষ বিধান করিবার ব্যবস্থা আছে। গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম— ভিক্ষাজীবী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করে। সমস্ত প্রাণী যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন আশ্রমবাসী গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। পরিণত বয়সে যখন গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্যকর্ম সমাপ্ত হইয়া যায়, পৌত্র জন্মগ্রহণ করে, কেশের পক্বতা ও চর্মের লোলতা দেখা যায়, তখন স্ত্রীকে পুত্রের কাছে রাখিয়া বা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিয়া বানপ্রস্থ্য অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণভাবে বলা হয়, বয়স পঞ্চাশের অধিক হইলে বনগমন বিধেয় (পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ)। এই অবস্থায় কেশশ্মশ্রুজটাধারী হইয়া ফলমূল পাতা আহার করিতে ও ভূমিকে শয্যারূপে গ্রহণ করিতে হয়। বসন ও উত্তরীয়রূপে চর্ম কাশ ও কুশ ব্যবহৃত হয়। দেবার্চনা, হোম, অতিথিসেবা, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি বান-প্রস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য। তপস্যা করিতে করিতে ক্রমশঃ

শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা জন্মে। তপস্যা সুসম্পন্ন ও বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হইলে, মোটামুটিভাবে সত্তর বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কথা। সন্ন্যাসী কাম ক্রোধ দর্প মোহ লোভ প্রভৃতি দোষমুক্ত ও মমত্ববোধরহিত হইবেন। ব্রাহ্মণাদির করণীয় সমস্ত কর্ম তিনি ত্যাগ করিবেন। শব্দকল্পদ্রুমে 'বর্ণ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

দ্র P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. II, Part I, Poona, 1941.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আসতেক মেক্সিকো দ্র

আসফুদ্দৌলা (?-১৭৯৭ খ্রী) আউধ বা অযোধ্যার নবাব নামে খ্যাত বংশের চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলা, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত ফৈজাবাদ-সন্ধিপত্র নামে খ্যাত এক নূতন চুক্তিনামায় আবদ্ধ হইয়া অযোধ্যায় অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে তিনি স্বীকৃত হন। ফলে ইংরেজের নিকট তাঁহার পূর্বতন ঋণ আরও বাড়িয়া যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার মাতা এবং পিতামহী পরলোকগত নবাবের নিকট হইতে প্রভূত ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। কোম্পানির চাপে পড়িয়া আসফুদ্দৌলা বলপূর্বক এই বিপুল অর্থ দখল করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অজুহাত ছিল, অন্যায়ভাবে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির ইংরেজ প্রতিনিধির উপরোধক্রমে আসফুদ্দৌলার মাতা পুত্রকে পূর্বে প্রদত্ত আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের অতিরিক্ত আরও তিন লক্ষ পাউণ্ড দান করেন। অযোধ্যায় ইংরেজ প্রতিনিধি এবং কলিকাতাস্থ কাউন্সিল রাজমাতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে এই অর্থ দান করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার উপর আর কোনও দাবি-দাওয়া থাকিবে না। হেস্টিংস এই প্রতিশ্রুতি দানের বিরোধী ছিলেন কিন্তু ভোটাধিক্যে তিনি পরাজিত হন।

বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি পীড়াপীড়ি করিলে আসফুদ্দৌলা প্রস্তাব করেন যে বেগমদের বিশাল জায়গির ও বিপুল অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলে তিনি কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন। এই অন্যায় প্রস্তাব সমর্থন করিতে এবং বেগমদের নিরাপত্তার জন্য কোম্পানি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে হেস্টিংসের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হয় নাই। বেগমদের ভয়ে নবাব প্রথমে কিছুটা ইতস্তত: করিলেও ইংরেজের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত তিনি সাহস সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। বেগমগণের আবাসস্থান ফৈজাবাদে ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হয় এবং ধনরাশি সমর্পণ করিতে তাঁহাদের বাধ্য করা হয়।

আসফুদ্দৌলা ফৈজাবাদ হইতে লখনৌ শহরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং দেশান্তর হইতে শিল্প ও বাণিজ্য -দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণকে আনয়ন করাইয়া সমাদরে স্বীয় রাজধানীতে বসান। লখনৌয়ের ঐশ্বর্যের খ্যাতি এই সময়েই সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। দানশীলতার জন্য আসফুদ্দৌলা বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাঁহারই নির্মিত লখনৌয়ের বিখ্যাত ইমামবাড়ায় আসফুদ্দৌলাকে সমাহিত করা হয়।

আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা ও মহকুমার সদর। মহকুমার আয়তন ১৬১৬ বর্গ কিলোমিটার (৬২৪ বর্গ মাইল)। আসানসোল শহরের অবস্থান ২৩°৪২´ উত্তর, ৮৭°১´ পূর্ব। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শহরের লোকসংখ্যা ১০৩৪০৫। এখানকার মাটি বর্ধমানের অন্যান্য মহকুমার মত পলিমাটি নয়, লাল মাটি। গত এক শত বৎসরে এই মহকুমা অরণ্যময় ভূখণ্ড হইতে দ্রুত একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে আসানসোল মহকুমা ভারত ও পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত অঞ্চলের অন্যতম। বস্তুতঃ এই মহকুমা কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, বিভিন্ন রিফ্র্যাক্টরি শিল্প, পাথর, কাগজ, বিদ্যুৎ, রেলইঞ্জিন ইত্যাদি মৌলিক এবং বৃহৎ শিল্পে পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধতম অঞ্চল। রানীগঞ্জের বিখ্যাত কয়লাখনি এলাকা এই মহকুমায় অবস্থিত, এবং আসানসোল শহরই এতদঞ্চলের কয়লাবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। আসানসোল মহকুমায় প্রায় দুই শতাধিক কয়লাখনি আছে, এবং ১৯১৯ সালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ লক্ষ লোক এই খনিগুলিতে কাজ করিত। ঐ সালে এই অঞ্চলে প্রায় ১৪২২৪০০০ মেট্রিক টন (১ কোটি ৪০ লক্ষ টন) কয়লা উৎপন্ন হয়। কয়লা ব্যতীত রানীগঞ্জ অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ ও বিভিন্ন রিফ্র্যাক্টরি শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল পেপার মিল্‌স রানীগঞ্জে অবস্থিত। আর এই শহরের নিকটেই রহিয়াছে অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের কারখানা। বরুল এই মহকুমার আকরিক লৌহের প্রধান কেন্দ্র; এই খনি অঞ্চলের সমস্ত আকরিক লৌহ কেন্দুয়ার বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্ক্‌স-এ চালান যায়। ১৮৮৯ সালে মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি বরাকরের তিন কিলোমিটার (দুই মাইল) দূরে কেন্দুয়ায় অবস্থিত বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্ক্‌স (কুলটি ওয়ার্ক্‌স)-এর ভার

গ্রহণ করে। এই কারখানাটি ছাড়া আসানসোল শহরের ২ কিলোমিটারের কিছু বেশি (১½ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে বার্নপুরে মার্টিন বার্ন শিল্পগোষ্ঠীর একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। কেন্দুয়া (সাধারণতঃ কুলটি বলিয়া পরিচিত) এবং বার্নপুরের ইস্পাত কারখানা ছুইটিকে কেন্দ্র করিয়া ছুইটি বিশিষ্ট শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনে ১৯৪৮ সালে নির্মিত সুপরিচিত রেল ইঞ্জিন কারখানাটি অবস্থিত। এখানে বর্তমানে ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জনের নিকটে রূপনারায়ণপুরে ভারত সরকারের হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স লিমিটেডের টেলিফোন তারের কারখানাটি অবস্থিত। আসানসোল শহরের উপকণ্ঠে কল্যাপুরে অবস্থিত সেন-র‍্যালে কোম্পানির কারখানায় সাইকেল ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়।

এই মহকুমার শ্রেষ্ঠ গৌরব ছুর্গাপুর নামক নূতন শিল্পনগরীটি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নির্মিত এই নগরী আসানসোল মহকুমার গুরুত্ব অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। ভারত সরকারের হিন্দুস্থান স্টীল প্রজেক্টের ছুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় বর্তমানে ৩৫৭০০০ মেট্রিক টন (৩½ লক্ষ টন) লৌহপিণ্ড এবং ১০২০০০০ মেট্রিক টন (১০ লক্ষ টন) ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদিত হয় এবং ইহার দ্বারা ৮১৬০০০ মেট্রিক টন (৮ লক্ষ টন) ইস্পাত-দ্রব্য প্রস্তুত হয়; নগরীটি নির্মাণের মূল্য লইয়া ইস্পাত কারখানাটি নির্মাণের মোট মূল্য ১৮৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ছুর্গাপুর ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ডের পরিচালনাধীন সামগ্রিক ছুর্গাপুর প্রজেক্টের অন্তর্ভূত ছুর্গাপুর কোকচুল্লি এবং উপজাত দ্রব্যের কারখানা প্রথম শ্রেণীর হার্ড কোক এবং কোকচুল্লি গ্যাস, অপরিশুদ্ধ আলকাতরা, টলুয়েন, থাইলিন, ন্যাপথালিন, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপাদন করে। ছুর্গাপুর দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ময়ূরাক্ষী এবং কংসাবতী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিশাল সেচখাল এলাকার কেন্দ্রস্থলও বটে। ছুর্গাপুর জলাধারটি উল্লেখযোগ্য; ডি. ভি. সি.-র ১২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তিসম্পন্ন একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রও এখানে অবস্থিত। প্রধানতঃ এই কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ছুর্গাপুর প্রজেক্টের অন্তর্গত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছুইটি উৎপাদন ইউনিটে ৩০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; এই বিদ্যুৎও ছুর্গাপুর ব্যতীত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং ডি. ভি. সি. বৈদ্যুতিক গ্রিড-এ সরবরাহ করা হয়। ছুর্গাপুরে একটি অগ্নিসহ ইষ্টকের কারখানা আছে। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছুর্গাপুরে অবস্থিত। অধুনা এখানে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও খোলা হইয়াছে।

এই মহকুমার উল্লেখযোগ্য রেল-কেন্দ্র হইল আসানসোল, অণ্ডাল, সীতারামপুর ইত্যাদি। এই সকল স্থান হইতে কয়লা, লৌহপিণ্ড, বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাঁচা-মাল এবং এতদঞ্চলে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যাদি বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। অণ্ডালে বিভিন্ন রিফ্র্যাক্টরি শিল্প ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে।

আসানসোল অঞ্চল দ্রুতগতিতে আরও শিল্পায়িত হইতেছে। ছুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা আরও ৬১২০০০ মেট্রিক টন (৬ লক্ষ টন) বৃদ্ধি করা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। কোকচুল্লিতে উৎপন্ন গ্যাস কলিকাতায় সরবরাহের জন্য পাইপ স্থাপন, কোকচুল্লির প্রথম শ্রেণীর হার্ড কোক উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করা, একটি কয়লা ধোতাগার প্রতিষ্ঠা, তাপবিদ্যুৎ স্টেশনে ছুইটি ৭৫ মেগাওয়াটের ইউনিট স্থাপন, একটি আলকাতরা পরিশোধনাগার এবং সরকারি উদ্যোগে বৈদেশিক সহযোগিতায় একটি আধুনিক রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠা ছুর্গাপুর প্রজেক্টের অন্তঃপাতী। এতদ্ভিন্ন, কয়লাখনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য হেভি এঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের একটি কারখানা, ৮১৬০০ মেট্রিক টন (৮০০০০ টন) উৎপাদনের প্রাথমিক সামর্থ্য-বিশিষ্ট অ্যালয় ও বিশেষ ধরনের ইস্পাতের কারখানা, চশমার কাচ ইত্যাদি নির্মাণের কারখানা, এ. ভি. বি. নামে সংঘবদ্ধ অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ভিকার্স এবং ব্যাব্‌কক উইলকক্‌স— এই তিনটি কোম্পানি কর্তৃক বয়লার ও সিমেণ্ট তৈয়ারির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং ফিলিপ্‌স কার্বন ব্ল্যাক কোম্পানির কারখানা আসানসোল মহকুমার উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রকল্প।

এই মহকুমার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বও কম নয়। উদাহরণস্বরূপ গৌরাঙ্গপুরে ছুইশতাধিক বৎসরের পুরাতন ইছাই ঘোষের ইষ্টকনির্মিত দেউল, কাঁকসায় শ্যামারূপার গড়, রাজগড় ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। কাঁকসা থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রাম কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান।

দ্র J. C. K. Peterson, *Bengal District Gazetteers: Burdwan*: Calcutta, 1910; A Mitra, *Census 1951: West Bengal: District Handbooks: Burdwan*, Calcutta, 1957.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আসাম ভারতের অন্যতম রাজ্য। ইহা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত (২৬° উত্তর, ৯৩° পূর্ব) ; আয়তন ১২১৯৬৬ বর্গ কিলোমিটার (৪৭০৯১ বর্গ মাইল)। আসামের উত্তরে ভুটান ও নীফা, পূর্বে নাগাভূমি, মণিপুর ও ব্রহ্ম দেশ, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গ।

শিলং আসামের রাজধানী। এই রাজ্যে এগারটি জেলা আছে: ১. গোয়ালপাড়া, ২ কামরূপ, ৩. দরং, ৪. লখীমপুর, ৫. নগাঁও, ৬. শিবসাগর, ৭. কাছাড়, ৮. গারো পার্বত্য অঞ্চল, ৯. সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য অঞ্চল, ১০. সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল এবং ১১. মিজো পার্বত্য অঞ্চল।

শিলং ও শিলং ক্যান্টনমেণ্ট ব্যতীত রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলির মধ্যে তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড়, উত্তর লখীমপুর, শিলচর, ধুবড়ি, গৌহাটি, নংথিম্মাই, মউলাই, ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, হুনমাটি এবং চেরাপুঞ্জী উল্লেখযোগ্য।

আসাম প্রধানতঃ তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত: ১. উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে ব্রহ্মপুত্র বা আসাম উপত্যকা ; উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার (৫০০ মাইল) কিন্তু প্রস্থে মাত্র ৮১ কিলোমিটার (৫০ মাইল)। এই অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র খুব প্রশস্ত। হিমালয় হইতে মানস, গদাধর, চম্পামান, সুবনশিরি ও লুহিত আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ২. দক্ষিণে পলিগঠিত সুর্মা বা বরাক উপত্যকা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অপেক্ষা সুর্মা উপত্যকা অধিকতর প্রশস্ত। বরাক নদী ও ইহার দ্বিধাবিভক্ত স্রোত— সুর্মা ও কুশীয়ারা— এই উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ৩. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকার মধ্যে গারো, খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের উচ্চ অঞ্চল। আসামের প্রায় অর্ধাংশ পর্বতময়। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ১৮৯৭ সালে এখানে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ১৫ আগস্টের ভূমিকম্পে উত্তর-পূর্ব আসামের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে ; ইহা পৃথিবীর প্রবলতম পাঁচটি ভূমিকম্পের অন্যতম।

সমগ্র আসাম রাজ্যটি মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভারতের আর্দ্রতম রাজ্য। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়— বৎসরে গড়ে প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার (৮০ ইঞ্চি)। খাসি পার্বত্য অঞ্চলে চেরাপুঞ্জীর নিকটবর্তী মৌসিনরামে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়— বৎসরে প্রায় ১২৭০ সেন্টিমিটার বা ৫০০ ইঞ্চির অধিক। ১৮৬১ সালে এখানে ২২৯৯ সেন্টিমিটার (৯০৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

আসাম ভারতের অন্যতম অরণ্যবহুল রাজ্য। এখানে প্রধানতঃ সরলবর্গীয়, চিরহরিৎ এবং মৌসুমী বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বনভূমির এক বৃহৎ অংশ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ; লোকবসতি খুবই কম। কয়েকটি বিশিষ্ট বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য পাঁচটি সংরক্ষণাগার (স্যাংচুয়ারি) ও দুইটি সংরক্ষিত শিকারক্ষেত্রসহ প্রায় ১৫০২ বর্গ কিলোমিটার (৫৮০ বর্গ মাইল) বনাঞ্চল সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। কাজিরঙ্গা ও মানস সংরক্ষণাগার দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইহাদের আয়তন যথাক্রমে ৪৩০ বর্গ কিলোমিটার (১৬৬ বর্গ মাইল) ও ২৭২ বর্গ কিলোমিটার (১০৫ বর্গ মাইল)। আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাজিরঙ্গায় দর্শকেরা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া খুব নিকট হইতে একশৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার দেখিতে পায়। ভুটান পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত মানস সংরক্ষণাগারটি প্রাকৃতিক শোভার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। এই রাজ্যের গণ্ডার, হস্তী, বন্যমহিষ, বাইসন, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ, বাঘ, চিতাবাঘ, গোক্ষুর সর্প, নানা প্রকার হাঁস ও বৃহদাকার বক্রচঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষী উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের যুগে আসাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের বহু সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ; অমূর্তরায় ধর্মারণ্য দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে ইহা এক শক্তিশালী ও বিখ্যাত রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং হরিবংশে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহরূপী বিষ্ণু ও ধরিত্রীর পুত্র মিথিলার নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা হইয়া কামাখ্যাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলে ইহার নাম কামরূপে পরিবর্তিত হয় বলিয়া কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষার্ধে হরিষেণের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে কামরূপ রাজ্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কামরূপকে সমুদ্রগুপ্তের করদ-মিত্ররাজ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যে কামরূপের বর্ণনা আছে। নরকের উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণিত রাজবংশ কামরূপের সিংহাসনে ৩৫০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে বলিয়া জানা যায়। এই বংশের পুষ্যবর্মা ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহার অল্প কিছু পূর্বে কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্যবর্মার পর এই বংশের

বার জন রাজা কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাজা ভাস্করবর্মা ছিলেন হর্ষবর্ধনের (রাজ্যকাল ৬০৬-৬৪৬/৪৭ খ্রী) সমসাময়িক। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি রাজত্ব করেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের সহায়তায় তিনি পশ্চিম বঙ্গের উপর কিছুদিন আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউএন্-ৎসাঙ্ কামরূপে আসেন। ভাস্করবর্মার রাজত্বে এক সুসংবদ্ধ শাসনপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর কামরূপের শতাব্দীকালের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সময় শালস্তম্ভ নামে এক ম্লেচ্ছ রাজা কামরূপের রাজা হন। তাঁহার পর শালস্ত বা প্রালম্ভ -রাজবংশ কামরূপে ৮০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রালম্ভ অথবা তাঁহার পুত্র হর্জর গৌড়ের সম্রাট্ দেবপালের (৮১০-৮৫০ খ্রী) সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। প্রালম্ভবংশ ছিল শৈব— লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে হরূপেশ্বর তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর একেবারে শেষে শালম্ভবংশের শেষ নৃপতি ত্যাগসিংহের মৃত্যু হইলে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার এক জ্ঞাতি ব্রহ্মপাল প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা হন। তাঁহার রাজধানী ছিল দুর্জয়া ; ইহা বর্তমান গৌহাটি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই বংশের শেষ রাজা ধর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি গৌড়ের রামপালের বাহিনীর নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। গৌড়ের কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ভুক্তি ও কামরূপ-মণ্ডল জয় করেন এবং শীঘ্রই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাবধি চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা কামরূপ শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে (১২০৫ খ্রী) তিব্বত অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কামরূপরাজের সহিত সংঘর্ষে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ কামরূপে অভিযান করেন, কিন্তু কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুগীসুদ্দীন ইউজবক কামরূপ আক্রমণ করিয়া প্রথমে সাফল্য লাভ করিলেও শেষে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে ও পরিবারবর্গ বন্দী হয়। ভারতে মুসলমান আধিপত্যের প্রথম যুগে তাহাদের এইরূপ শোচনীয় পরাভব আর ঘটে নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শানজাতির অন্যতম শাখা আহোমরা সুকাফার নেতৃত্বে পাটকাই অঞ্চল পার হইয়া পূর্ব আসামে প্রবেশ করে এবং ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চরাইদেওতে আধিপত্য স্থাপন করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে 'আসাম' নামটি 'আহোম' হইতেই উদ্ভূত।

এই সময় কামতারাজ্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কথিত আছে, কামতার রাজা দুর্লভনারায়ণের রাজত্ব বাংলা দেশের করতোয়া হইতে আসামে বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামতারাজ্য আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় ; কিছুদিন শত্রুতা চলিবার পর সন্ধি অনুযায়ী আহোমরাজ সুখাংফা-র সহিত কামতারাজ-কন্যা রজনীর বিবাহের দ্বারা দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

কিংবদন্তী আছে যে মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট সহ পুরাতন কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণাংশ বাংলার সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আক্রান্ত হয় এবং মুসলমান বাহিনী শ্রীহট্ট দখল করে (সম্ভবতঃ ১৩০৩ খ্রী)। ইলিয়াস শাহ্ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আক্রমণ করেন এবং কামরূপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করেন। এতদঞ্চল সেই সময় কামতারাজ্যের অধীন ছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না।

কামরূপে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কর্তৃত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, পশ্চিমে মুসলমান এবং পূর্বে আহোম আক্রমণ সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী খেন্ উপজাতীয়দের নেতৃত্বে কামতা-রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের রাজ্য পূর্বে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং দক্ষিণ-পূর্বে মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী (বর্তমান কুচবিহারের নিকটবর্তী) কামতাপুর সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। প্রচলিত বিশ্বাস, তিনি কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করান। নীলাম্বর বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্‌কে পরাজিত করেন। কিন্তু ১৪৯৮ হইতে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নীলাম্বর হুসেন শাহের নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত হন এবং বরনদী পর্যন্ত সমগ্র কামতারাজ্য হুসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার প্রতিনিধি কামরূপে হাজো-তে রাজধানী স্থাপন করেন। হিন্দুরাজ্য কামতা এইরূপে ধ্বংস হয় এবং দশ বৎসরের কিছু পরেই এই ধ্বংসের মধ্য হইতে একটি নূতন রাজ্যের (কুচবিহার রাজ্য) উদয় হয়।

ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্বের আহোম রাজ্যে সুখাংফা-র পৌত্র সুদাংফা (১৩৯৭-১৪০৭ খ্রী) কতিপয় শক্তিশালী উপজাতিকে দমন করেন। তিনি কামতারাজ্যের বিরুদ্ধে

একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কামতারাজ নিজকন্যা ভাজনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। পরবর্তী শতাধিক বৎসর ধরিয়া আহোম রাজারা বিভিন্ন উপজাতিকে দমন করেন; সমগ্র চুটিয়া অঞ্চল তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কাছাড় রাজ্য অধিকৃত হয়। রাজা স্থহুংমুং-এর রাজত্বকালে ১৫২৭ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আহোমরাজ্যে বারংবার মুসলমান অভিযান ঘটে। মুসলমানেরা সম্পূর্ণ পরাভূত হয় এবং ভরলিতে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আহোমরা করতোয়া নদী পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। রাজা স্থহুংমুং শক্তিমান নরপতি ছিলেন। চুটিয়া ও কাছাড়ীদের সহিত যুদ্ধে রত থাকা সত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের যেভাবে প্রতিরোধ করেন তাহা বিস্ময়জনক। মুসলমানদের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং আহোমরা এই সময় বারুদের ব্যবহার জানিত না। রাজা স্থহুংমুং নাগাদেরও দমন করেন। রাজা স্থহুংমুং-এর রাজত্ব আসামের ইতিহাসে এক অতি গৌরবময় অধ্যায়। তিনি আহোমদের ক্ষমতা সর্বদিকে প্রসারিত করেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই দুঃসাহসিক প্রতিরোধের জন্যই আসামকে পরবর্তী ১৩০ বৎসর নূতন মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালে আহোমদের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং শংকরদেবের বৈষ্ণব মত প্রাধান্য লাভ করে।

কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচ উপজাতির বিশ্বসিংহ একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুচবিহার উহার রাজধানী হয়। বিশ্বসিংহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী নরনারায়ণ এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকালে কামতারাজ্য সমৃদ্ধি এবং গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে সোনকোষ নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং কোচ রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মুসলমানেরা এই দুইটি বিভাগকে কোচবিহার এবং কোচ হাজো বলিয়া অভিহিত করিত। এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ঘাতী বিবাদের ফলে আহোম এবং মুসলমানগণের হস্তক্ষেপ ঘটে; অবশেষে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচ হাজোতে (বর্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল) মুসলমান এবং কুচবিহারে আহোম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে আহোমগণ কোচ হাজোর সীমান্তে অভিযান করে এবং মোগলদের সহিত তাহাদের তীব্র যুদ্ধ হয়। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে সন্ধির ফলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের জন্য তদীয় পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আহোমগণ গৌহাটি অধিকার করে। ১৪০টি অশ্ব, ৪০টি কামান, ২০০টি গাদাবন্দুক এবং প্রভূত সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হয়। আহোমগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলার সুবেদার মীর জুম্‌লা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঢাকা হইতে ১২০০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০০০ পদাতিক সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী, কামান, অবরোধের সরঞ্জাম এবং নৌবাহিনীসহ যাত্রা করেন। পথে কুচবিহার এবং আসাম জয় করিয়া ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ আহোমরাজ্যের রাজধানী গড়গাঁও দখল করেন ও ধনসম্পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে মীর জুম্‌লার বাহিনী অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং রসদ ও ঔষধাদির অভাবে তীব্র কষ্টের সম্মুখীন হয়। ইহাতে সাহস পাইয়া পলায়নপর আহোমগণ মোগলদের নাজেহাল করিতে আরম্ভ করে। মোগল শিবিরে রোগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তৎসত্ত্বেও মীর জুম্‌লা যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং বর্ষা শেষ হইলেই পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করেন। আর প্রতিরোধে কোনও লাভ হইবে না বুঝিতে পারিয়া আহোমগণ মোগলদের সহিত সন্ধি করে। সুতরাং ইহা বলা চলে যে, মীর জুম্‌লার আসাম আক্রমণ সফল হইয়াছিল। তবে বহু মোগল সৈন্যের জীবনের মূল্যে এই জয় অর্জিত। আহোম রাজা জয়ধ্বজ বার্ষিক রাজস্ব এবং যুদ্ধ বাবদ মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুত হন। শর্ত অনুযায়ী এই ক্ষতিপূরণের একাংশ সঙ্গে সঙ্গেই এবং বাকিটা এক বৎসরের মধ্যে তিনটি সমান কিস্তিতে দেয় ছিল; মোগলরা ভরং প্রদেশ অর্ধেকের অধিক দখল করিবে, ইহাও ঠিক হয়। ঔরঙ্গজেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীর জুম্‌লা স্বয়ং ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোগলদের এই সামরিক সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; কয়েক বৎসর পরেই আহোমগণ কামরূপ পুনরধিকার করে। মোগলরা দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইয়া যায়, কিন্তু কোনও স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আসাম রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বংশানুক্রমে নিযুক্ত তিন জন সভাসদ (গোহাঁই) এবং দুই জন মন্ত্রীর (বড় বড়ুয়া ও বড় ফুকন) অত্যধিক ক্ষমতাই ইহার জন্য দায়ী। রাজা চন্দ্রকান্তের রাজত্বে গৌহাটির পলায়নপর শাসক বড় ফুকন বদনচন্দ্রের আমন্ত্রণে রাজ্যের প্রকৃত শাসক বুড়া গোহাঁই পূর্ণানন্দের বিরুদ্ধে ব্রহ্মরাজ বোদায়পয় (Bodawpaya)

আসামে অভিযান প্রেরণ করেন। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যবাহিনী অসমীয়া সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ও আসামের তৎকালীন রাজধানী জোড়হাট দখল করে। বদনচন্দ্র নিজ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং চন্দ্রকান্ত বর্মীদের সন্তোষবিধান করিয়া সিংহাসন রক্ষা করেন। কিন্তু বর্মী বাহিনী আসাম ত্যাগ করার অব্যবহিত পরে বদনচন্দ্র নিহত হন এবং মৃত পূর্ণানন্দের পুত্র রুচিনাথ রাজ্য দখল করেন ও চন্দ্রকান্তকে বিতাড়িত করেন। বদনচন্দ্রের বান্ধবদের আমন্ত্রণে একটি বর্মী সৈন্যবাহিনী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আসামে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকান্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আসামকে ব্রহ্মসাম্রাজ্যভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বর্মীরা বর্বরোচিত অত্যাচার চালায়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে চন্দ্রকান্তের ঐক্যের আহ্বানে রুচিনাথ ও অপরেরা সাড়া না দিলেও তিনি ব্রহ্মরাজ্যের প্রাধান্য ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ব্যর্থ হইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত গোয়ালপাড়ায় পলায়ন করেন। চন্দ্রকান্ত তাঁহার রাজ্য পুনরধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বর্মী সেনাপতি মহা বাণ্ডুলার নিকট কালিয়ানি পাথরে এবং আসাম চোকিতে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হন। এইভাবে আসামে আহোম সার্বভৌমত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আসামের পুরাতন করদরাজ্য কাছাড়ের বিতাড়িত রাজা গোবিন্দচন্দ্র বর্মীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বর্মীরাও তাঁহাকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করিতে একটি বাহিনী প্রেরণ করে। ব্রিটিশ রাজ্যের, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত শ্রীহট্টের, নিরাপত্তার অজুহাতে লর্ড অ্যামহার্স্ট নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করিয়া কাছাড়ের 'আশ্রিত' রাজারূপে গোবিন্দচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লন। গোবিন্দচন্দ্র ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন, ১০০০০ টাকা বাৎসরিক কর দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে ব্রিটিশ শক্তিকে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার প্রদান করেন। ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য জয়ন্তীয়াও কাছাড়ের পথ অনুসরণ করে।

ব্রহ্ম সরকার ব্রিটিশ শর্তগুলি অগ্রাহ্য করেন এবং একটি বর্মী বাহিনী কাছাড়ে প্রবেশ করে, কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত একাধিক সংঘর্ষের পর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; ইহাই প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। তীব্র কষ্টের সম্মুখীন হইলেও ব্রিটিশ বাহিনী ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জোড়হাট দখল করে; তৎকালীন রাজধানী রংপুরের পতনের পর সমগ্র আসামই অধিকৃত হয়। ব্রিটিশ বাহিনী কাছাড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। অবশেষে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি য়ান্দাবো-র সন্ধি অনুযায়ী ব্রহ্মরাজ আসাম, কাছাড় এবং জয়ন্তীয়ার উপর তাঁহার সমস্ত দাবি ত্যাগ করেন।

সমস্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজগণ ডুয়ার্সসহ নিম্ন আসাম কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। খোওয়া গোহাঁই-এর শাসনাধীন সদিয়ার খাম্‌তি, বড় সেনাপতির অধীনস্থ মটক (লখীমপুর) -এর মোয়ামারিয়া এবং সিংফো উপজাতি -অধ্যুষিত মটক-এর সীমান্ত হইতে পূর্ব দিকে ডিহিং নদী পর্যন্ত অঞ্চলও ইংরেজদের অধিকারে আসে। কিন্তু কতকগুলি শর্তে তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। মধ্য আসাম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে। তাহাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জন্য আসামে কতিপয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে গদাধরের বিদ্রোহ (১৮২৮ খ্রী), খাসি বিদ্রোহ (১৮২৯ খ্রী), সিংফো বিদ্রোহ (১৮৩০ খ্রী) এবং কুমার রূপচাঁদের নেতৃত্বে সামন্তদের বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বার্ষিক ৫০০০০ টাকা কর প্রদান এবং অন্যান্য কতিপয় শর্তে পুরন্দর সিংহকে বড়হাট হইতে ধানশিরি নদী পর্যন্ত উত্তর আসামের শাসকরূপে স্বীকার করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে জোড়হাট বিভাগের জায়গিরদারে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ তাঁহার জায়গির হইতে অপসারিত হন। আসামের সীমান্ত জেলাগুলি এবং কাছাড় ও জয়ন্তীয়া একে একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সমগ্র আসাম ব্রিটিশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া দাঁড়ায়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামকে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যুক্ত করা হয় এবং নূতন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশটি গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের চাপে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থা রদ করা হয়, এবং আসাম পুনরায় চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত হয়।

আদি বা আবর উপজাতীয়েরা গোলযোগ সৃষ্টি করায় এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে মিনিয়ং শাখার লোকেরা উইলিয়ামসন সাহেব ও ডাক্তার গ্রেগরসনকে হত্যা করায় ভারত সরকার তাহাদের দমন করিতে উত্তর-

পূর্ব সীমান্তের ডিহং উপত্যকায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন; অভিযানটি সফল হয়। মিরি ও মিশমিদের সহিত ইংরেজ শাসকশক্তির হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আসাম নন্‌-রেগুলেশন প্রদেশ হইতে গভর্নরের প্রদেশে উন্নীত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী অন্যান্য প্রদেশের মত আসামেও তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আসামের অবদান উল্লেখযোগ্য। অসহযোগের যুগে আসাম 'কর বন্ধ' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে চা-বাগানের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২-এর আগস্টে আসামবাসীদের গণবিক্ষোভ থানা, বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ ইত্যাদির রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য দিকে উহা দমন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অত্যাচারও চরমে ওঠে। নেতাদের গ্রেপ্তার, নিরস্ত্র জনগণের উপর পুলিস ও সৈন্যদের আক্রমণ, বেপরোয়া গুলিবর্ষণ প্রভৃতি চলিতে থাকে; বহু পুরুষ ও নারী মৃত্যুবরণ করে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের ফলে আসামের শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানের অংশভুক্ত হয়; অবশিষ্টাংশ ভারতের সহিত যুক্ত থাকে।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ১১৮৭২৭৭২ জন। তন্মধ্যে ৬৩২৮১২৯ জন পুরুষ ও ৫৫৪৪৬৪৩ জন নারী। পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০০ : ৮৭৬। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ৯৭ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৫২ জন)। পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক বাস করে এমন শহর রাজ্যে মাত্র তিনটি আছে— গৌহাটি শিলং ও ডিব্রুগড়। গৌহাটি শহরে লক্ষাধিক লোকের বাস।

আসামে বহু জাতি ও উপজাতি বাস করে। বাসস্থান অনুযায়ী উপজাতিগুলিকে পার্বত্য উপজাতি ও সমভূমি অঞ্চলের উপজাতি— এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। গারো পাহাড়ে গারো ও খাসি, জয়ন্তীয়া পাহাড়ে খাসি ও জয়ন্তীয়া, মিকির পাহাড়ে মিকির, মিজো পাহাড়ে মিজো এবং নাগা পাহাড়ে নাগা উপজাতির বাস। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে বড়ো গোষ্ঠীর কাছাড়ী, রাভা, লালুং ইত্যাদি উপজাতি দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত দেউরী, চুটিয়া, মরান, মিরি, ফাকিয়াল, আইটন, তুরুং, আহোম প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির নাম করা যাইতে পারে।

নৃতত্ত্বের বিচারে আসামে ককেশীয় ও মঙ্গোলীয় প্রবংশের লোক দেখা যায়। আসামের উপজাতিরা প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় প্রবংশের লোক। ভাষা বিশ্লেষণে মনে হয় অস্ট্রিকভাষী লোকই আসামের আদিম অধিবাসী ছিল। আসামের উপত্যকা অঞ্চলের অসমীয়ারা ককেশীয় জাতির অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ, কলিতা, কায়স্থ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের লোক এই শাখার অন্তর্গত।

অসমীয়া ও বাংলা আসামের প্রধান ভাষা। এতদ্ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন উপজাতির নিজ নিজ ভাষা বর্তমান।

এই রাজ্যে মোট ২৩৬১৭২৪ জন পুরুষ ও ৮৮৬৩৩১ জন নারী শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন; প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ঐ সংখ্যা ২৭৪; প্রতি হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে যথাক্রমে ৩৭৩ ও ১৬০। রাজ্যে ৭১০৮৪২ জন ছাত্র ও ৪১৪৭৪২ জন ছাত্রী যথাক্রমে ১৫৩১০টি বালক- ও ৬৬৯টি বালিকা -বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছে। ১৭৩৩৩৯ ছাত্র ও ৫৫১৭৬ ছাত্রী ৪১৯টি বালক- ও ৬৮টি বালিকা -শিক্ষালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিতেছে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ৪৫। উহাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, পশুচিকিৎসাবিদ্যা, আইন ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যও কলেজ আছে। রাজ্যসরকার দ্বারা পরিচালিত ৬৭৬টি সমাজশিক্ষণকেন্দ্র আছে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আসাম সাহিত্যসভা (গৌহাটি), আসাম সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি (শিলং) এবং পাস্তুর ইনস্টিটিউট অ্যাণ্ড মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (শিলং) উল্লেখযোগ্য।

আসামের 'বিহু উৎসব' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা আসামের জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিহু উৎসব তিন ভাগে বিভক্ত— আশ্বিন মাসে 'কাতি-বিহু', পৌষ-সংক্রান্তিতে 'মাঘ-বিহু' এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে 'ব'হাগ-বিহু'। কাতি-বিহুকে বলা হয় 'কঙালী-বিহু' এবং এই উৎসবে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান বা সংগীত নাই। মাঘ-বিহুকে বলা হয় 'ভোগালী-বিহু'। ইহার প্রধান অঙ্গ ভোজন। ইহা বাংলা দেশের নবান্ন উৎসবের মত। ব'হাগ-বিহুই হইল প্রধান— এবং ইহা 'রঙালী-বিহু' নামে পরিচিত। নৃত্য-গীতসহ সাড়ম্বরে এই উৎসব পালিত হয়। ইহাই আসামের নববর্ষোৎসব। পার্বত্য অঞ্চলে ও সমভূমির উপজাতীয়দের উৎসবগুলির মধ্যে বড়োদের 'খেরাই পূজা', খাসিয়াদের 'নংখ্রেম পূজা', গারোদের 'ওয়াঙ্গালা' এবং নাগাদের 'সেক্রেনি গেন্না' প্রধান। ইহা ব্যতিরেকে আসামে বিষহরিপূজা এবং বৈষ্ণবধর্ম সংস্কারক শংকরদেব

ও মাধবদেবের মৃত্যুবার্ষিকীও সাড়ম্বরে পালিত হয়। গৌহাটি হইতে ৮১ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে দরং-এ নভেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দরং-মেলাতে প্রচুর দর্শকের সমাবেশ হয়। ভুটিয়ারা সমভূমিতে আসিয়া পশমবস্ত্র, চামর, অশ্ব, লবণ, শুষ্ক মৎস্য, বস্ত্র প্রভৃতি বেচা-কেনা করে।

অসমীয়া উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হইল লোকনৃত্য ও লোকসংগীত। এই প্রসঙ্গে 'বিহু' উৎসবের বিহু নৃত্য প্রথমেই উল্লেখ্য। বিহু নৃত্য দুই শ্রেণীর, হুচরি আর বিহু। শেষেরটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৃক্ষতলে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অথবা আরণ্যক পরিবেশে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের তরুণ-তরুণীরা সমবেত হইয়া বিহু নৃত্য করে এবং এই উপলক্ষে যে ক্ষুদ্র প্রেমগীতগুলি গীত হয় তাহা 'বনগীত' বা 'বনঘোষা' নামে পরিচিত। হুচরি কোনও গ্রাম বা লোকালয়ের গৃহ-সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতেও তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করে— নববর্ষের আবাহন এবং গৃহস্থের কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনা-গীত গাওয়া হয়। সর্পদেবী মনসার পূজা উপলক্ষে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান 'ভর নৃত্য' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ওঝা (উঝা) নাচ বা বেহুলা নাচ কাছাড় জেলায় অতি জনপ্রিয়। আসামের পশ্চিমাঞ্চলে বড়োদের মধ্যে সর্পদেবী মনসার পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার সংগীত এবং নৃত্যের প্রচলন আছে। বসন্তের দেবী 'আই' বা মাতারূপে পরিচিতা শীতলার উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনা-সংগীতকে বলা হয় 'আই-নাম'। এতদ্ব্যতীত ঢুলিয়া নৃত্য, হাস্য-পরিহাসের জন্য জনপ্রিয় ভাওনা বা বহুয়া নৃত্য, বিবাহ উপলক্ষে বউ-নাচ, বড়োদের বাগরুম্বা ও মাইগাইনাই নৃত্য এবং মাঝিদের নৌকা-প্রতিযোগিতার গান, প্রোষিত-ভর্তৃকার 'বারমাস্যা', 'জনাগাভরুর গীত', 'ফুলকোঁয়রর গীত', সতীলক্ষ্মী ডুবলার কাহিনী অবলম্বনে 'ডুবলা শাস্তির গীত', কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনে 'গোঁসাই-নাম', শিবদুর্গা-কাহিনী অবলম্বনে 'পগলা-পার্বতীর গীত' এবং ছেলে-ভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গানগুলি উল্লেখযোগ্য।

আসামে ২৫৭০২টি গ্রাম ও ৬০টি শহর আছে। আসামের মোট জনসংখ্যার ১০৯৫৯৭৪৪ জন গ্রামে ও ৯১৩০২৮ জন শহরে বাস করে, অর্থাৎ প্রতি হাজার জন লোকের মধ্যে ৯২৩ জন গ্রামে ও মাত্র ৭৭ জন শহরে বাস করে।

চা, পেট্রোলিয়াম এবং বনজ সম্পদ আসামের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। চা-ই আসামের বৃহত্তম ও প্রধান শিল্প। ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ চা আসামেই উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৮২০৬৬ মেট্রিক টন (প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড) চা উৎপন্ন হইয়াছে। বর্তমানে ১৫৮১১৬ হেক্টর (৩৯৫২৮৯ একর) জমি জুড়িয়া ৭১৭টি চা-বাগান আছে। চা-বাগানগুলিতে দৈনিক গড়ে ৪৮০৯৩৮ জন এবং চা-কলগুলিতে ৫৮৩৫১ জন শ্রমিক কাজ করে। চা-শিল্পের জন্য বিভিন্ন স্থানে চায়ের বাক্স তৈয়ারির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম বর্তমানে ভারতের তৈলশিল্পে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৬১ সালে ৫৩০৪৭১ কিলোলিটার (১১৬৭০৩৭০২ গ্যালন) পেট্রোল উত্তোলন করা হইয়াছে। লখীমপুর জেলার ডিগবয়ে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে এবং সেখানেই তৈলশোধনের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি নাহারকাটিয়াতেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নুনমাটিতেও একটি তৈলশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খনিজ-দ্রব্যের মধ্যে কয়লা ও চুনাপাথরই প্রধান। ১৯৬১ সালে ৬১২০০০ মেট্রিক টন (৬০০০০০ টন) কয়লা ও ১৯৬০ সালে আনুমানিক ৮০৯২৬৮ মেট্রিক টন (২১৭৯৩৪০০ মন) চুনাপাথর পাওয়া গিয়াছে। শিবসাগর, লখীমপুর ও মিকির পাহাড়ে কয়লাখনি আছে। খাসি-জয়ন্তীয়া পাহাড়ে চুনাপাথর পাওয়া যায়। আসাম মূল্যবান কাষ্ঠ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। ১৯৫৭-৫৮ সালের প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে, আসামের ৪৫১৫৪ বর্গ কিলোমিটার (১৭৪৩৪ বর্গ মাইল) অরণ্য-ভূমি হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (১৯৫৯-৬০ খ্রী) ১৯২৮৯০০০ টাকা। বনজ দ্রব্যের মধ্যে শাল, সেগুন, হলক. হলং, ব্যানসান, অমরী, গমরী, আজহার, শিমূল, শিশু, বেত, বাঁশ, জ্বালানি কাষ্ঠ, রবার, লাক্ষা, কাশ, সুগন্ধি দ্রব্য, তন্তু (ফাইবার) এবং বহু প্রকারের ভেষজ উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য। ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে সিন্‌কোনা প্রধান। আসামের শিমূল কাষ্ঠ প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বনাঞ্চলে গুটিপোকার চাষ হয় এবং এই রাজ্যে এণ্ডি, মুগা ও তসর -জাতীয় রেশমের উন্নত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসামের রপ্তানি-বাণিজ্যে হস্তিদন্তও উল্লেখযোগ্য।

গ্রামীণ জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। রাজ্যে ৩৩২৩১০০ জন চাষী ও ১৮৭৪৯৬ জন কৃষিমজুর আছে। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, তৈলবীজ, আখ, আলু, ডাল এবং ভুট্টা প্রধান। চা ব্যতীত পাট, তুলা এবং তামাক রাজ্যের প্রধান রপ্তানিশস্য। ১৯৬০-৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ২৭১৯৪১ মেট্রিক টন

(২৬৬৬০৯ টন) আউশ ধান্য, ১৩৯৪২৭৬ মেট্রিক টন (১৩৬৬৯৩৭ টন) শালি ধান্য এবং ৬৯৯০ মেট্রিক টন (৬৮৫৩ টন) বোরো ধান্য, ৪৩৪৫৯ মেট্রিক টন (৪২৬০৭ টন) তৈলবীজ এবং ৫৯০৬ মেট্রিক টন (৫৭৯০ টন) ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছে। রপ্তানিশস্যের মধ্যে ১৯৬১-৬২ সালে ১১৩১২১২ বেল পাট, ৫২০৮ বেল তুলা, ১৬৭৪২ বেল মেস্তা ও ৬৯২১ মেট্রিক টন (৬৮১২ টন) তামাক উৎপন্ন হইয়াছে। এই রাজ্যে প্রচুর কমলালেবু উৎপন্ন হয়।

আসামে ভারি শিল্প তেমন গড়িয়া উঠে নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি সমবায় চিনিকল, একটি সরকারি বাঁশ ও বেতের কারখানা, ব্যক্তিগত মালিকানায় একটি রি-রোলিং মিল এবং বহু ছোট আকারের শিল্পসংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। জাগিরোডে একটি সরকারি রেশমকল, চেরাপুঞ্জীতে রাজ্যসরকারের সহযোগিতায় দৈনিক ২৫৪ মেট্রিক টন (২৫০ টন) উৎপাদনের সামর্থ্যবিশিষ্ট একটি সিমেণ্ট কারখানা এবং একটি সুতাকাটার কল স্থাপিত হইতেছে। ধুবড়িতে একটি দিয়াশলাই কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন স্থানে পিতল ও অন্যান্য ধাতুশিল্প ও মৃৎ-শিল্প এবং নৌকা, আসবাবপত্র ও কাচ তৈয়ারির কারখানা, এবং চালকল ও কাঠ-চেরাইয়ের কল এবং চুনাপাথর পোড়াইবার ভাঁটি আছে। চারটি কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ারির কল, প্লাইউড, স্টীল ফ্যাব্রিকেশন ও হালকা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, গ্যালভ্যানাইজড তার, ক্যাফিন তৈয়ারির কারখানা এবং ময়দা কল স্থাপন অথবা সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে।

গ্যাসের সাহায্যে নাহারকাটিয়ায় ৫০০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প ও কামরূপে বাৎসরিক ৫০০০০ টন ইউরিয়া ও ৫০০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সারের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শিলং হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা সমগ্র শিলং শহরে এবং গৌহাটির নিকট উমক্রু হাইডেল প্রজেক্টটি কামরূপ ও কন্দ্‌ঝিল অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইতেছে।

শিল্পসমিতিগুলির মধ্যে শিলংয়ে আসাম চেম্বার অফ কমার্স ও আসাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, গৌহাটিতে আসাম ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স এবং জোড়হাটে আসাম টি প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন কাল হইতেই আসাম কুটিরশিল্পে উন্নত। এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে রেশম, রেশমগুটির চাষ, এণ্ডি, মুগা, তসরের কাপড়, কার্পাসবস্ত্র (তাঁতের) এবং বেত ও বাঁশের নানা প্রকার কাজ উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে ২৮২৯৩ জন পুরুষ ও ২৫২০৬০ জন স্ত্রীলোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত আছে। শিবসাগর, নগাঁও, গোয়ালপাড়া, সংযুক্ত খাসি-জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চল, সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পাহাড় অঞ্চল এবং লখীমপুর জেলা প্রধানতঃ রেশমশিল্পের কেন্দ্র। কর্মসংস্থানের দিক দিয়া তাঁতশিল্প আসাম রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বয়নকারীদের মধ্যে অধিকাংশই নারী— অবসরসময়ে তাহারা ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য তাঁত বোনে। তাঁত ও তন্তুবায়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৯৭০ ও ৩৮৩৬৪ (১৯৬১ খ্রী)। আসামে কোনও কাপড় কল নাই— মিলের কাপড়ের সমস্ত চাহিদা অন্যান্য রাজ্য হইতে আমদানি করিয়া মিটানো হইয়া থাকে। তাঁতশিল্পে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩৪০ (১৯৬১ খ্রী)।

আসামের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকাংশই নদীপথে চলে। নীমাটি, ডিসাংমুখ, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়াল-পাড়া, ধুবড়ি, করিমগঞ্জ, শিলচর এবং অন্যান্য স্থানের মধ্যে স্টীমার সার্ভিস চালু আছে। শীতকালে নদীতে চর পড়ার ফলে স্টীমার চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হয়; বিশেষ করিয়া ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পের পর হইতে আসামের পূর্বাঞ্চল হইতে মাল চলাচলের জন্য নদী ছাড়িয়া অন্যতর পরিবহনের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ভারতবিভাগের পর আসামের সহিত ভারতের অবশিষ্টাংশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সমস্যা বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অংশতঃ দূরীভূত হইয়াছে। গৌহাটির নিকট মালিগাঁও-এর পাণ্ডুতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর কার্যালয় অবস্থিত। আসামের রেল-ব্যবস্থা ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-দক্ষিণে ব্যাপ্ত; আমিনগাঁও ও পাণ্ডুর মধ্যে রেলসেতু থাকিলেও খেয়া পারাপারের ব্যবস্থাও আছে। পাণ্ডু হইতে ৫২২ কিলোমিটার (৩২৪ মাইল) পূর্বা-ভিমুখে তিনসুকিয়া পর্যন্ত রেলপথ আছে। ডিব্রুগড়, নগাঁও, জোড়হাট, শিবসাগর, তেজপুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে ছোট শাখা লাইন সংযোগ রক্ষা করিতেছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মপুত্রের উপর সেতু নির্মিত হইয়াছে। আসাম ও ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত সংযোগপথটি অতি সংকীর্ণ হওয়ায় বিমান পরিবহন এই রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে প্রত্যহ একাধিক সার্ভিস চালু আছে। আসামের প্রায় সমস্ত বড় বড় শহর— তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড়, নর্থ লখীমপুর, শিলচর, ধুবড়ি এবং গৌহাটি প্রাত্যহিক বিমান সার্ভিসের দ্বারা সংযুক্ত। ১১৮০ কিলোমিটার (৭৩৩ মাইল) ন্যাশন্যাল

হাইওয়ে সহ ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই রাজ্যে মোট ১৩৩৫০ কিলোমিটার (৮২৯২ মাইল) মোটরপথ ছিল। এই পথের মধ্যে ১০৬৫৫ কিলোমিটার (৬৬১৮ মাইল) সমভূমিতে ও ২৬৯৫ কিলোমিটার (১৬৭৪ মাইল) পথ পার্বত্য অঞ্চলে বর্তমান। গারো পর্বত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহু ব্যয়ে পথঘাট নির্মাণ করিতেছেন।

অরণ্য ও পর্বতের দেশ আসাম ভ্রমণকারীদিগের এক অবশ্যদর্শনীয় স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শিলং শহরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫২৪ মিটার (৫০০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত। দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে সুশোভিত উদ্যানসহ ওয়ার্ড লেক, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ গল্‌ফ কোর্স, বড়বাজার, হ্যাপি ভ্যালি, শিলং চূড়া, ক্রিনোলিন, সুইট ও এলিফ্যাণ্টা জলপ্রপাত, রেসকোর্স, রোমান ক্যাথলিক চ্যাপেল এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন -এর নাম করা যাইতে পারে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত গৌহাটি বন্দরও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। নগরীর আশে-পাশে অনেকগুলি মন্দির আছে। নীলাচল পর্বতে প্রাচীন কামাখ্যাদেবী ও ভুবনেশ্বরীর মন্দির, ব্রহ্মপুত্র নদের পিকক্‌ দ্বীপে অবস্থিত উমানন্দমন্দির, চিত্রাচল পর্বতে নবগ্রহমন্দির, শুক্রেশ্বরে জনার্দনমন্দির এবং বশিষ্ঠ-আশ্রমের নাম করা যাইতে পারে। ভারতের একান্ন-পীঠের অন্যতম কামাখ্যায় অম্বুবাচীর তিন দিন ধরিয়া একটি বড় মেলা হয়। উমানন্দমন্দিরেও শিবরাত্রির মেলা হয়। এতদ্ব্যতীত গৌহাটি শহরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, পশুশালা এবং জাতীয় স্টেডিয়াম দর্শনযোগ্য। গৌহাটির ২৩ কিলোমিটার (১৪ মাইল) দূরে হাজোতে অনেকগুলি মন্দিরের মধ্যে হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। হাজোতে পীর গিয়াসুদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ আছে।

তেজপুরের এক মাইল পূর্বে বামুনী পাহাড়ের উপর একটি রেখমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। মন্দিরের আমলক ও নিকটস্থ তোরণের অংশবিশেষের সহিত উত্তর প্রদেশের বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত এক মন্দিরের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। উড়িষ্যা বা বঙ্গ দেশ হইতে রেখমন্দির নির্মাণের রীতি আসামে পৌঁছায় নাই, উত্তর ভারত হইতে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই বামুনী পাহাড়ে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সপ্ত দেবতার মন্দির ছিল। একটি প্রস্তরে নরসিংহ, পরশুরাম, বলরাম ও বরাহের সুন্দর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। এতদ্ব্যতীত তেজপুরে কাছাড়ীবংশের হজর বর্মা কর্তৃক নির্মিত হজর পুষ্করিণী ও বিশ্বনাথমন্দিরের নাম করা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ-মন্দিরে বিহু উৎসবের সময় একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় জেলার ভুবন পর্বতে শিব-পার্বতীর মন্দির এবং সিদ্ধেশ্বরে শিবমন্দিরটি হিন্দু পুণ্যার্থীদের দর্শনীয় স্থান। ভুবন পর্বতের শিবালয়ে শিবরাত্রি, দোলপূর্ণিমা এবং বারুণী উপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে। এখানকার আর একটি দর্শনীয় স্থান অরুণাচল আশ্রম— শিলচর হইতে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে বরাক নদীর তীরে ক্ষুদ্র একটি টিলার উপর অবস্থিত। আসাম জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত জোড়হাট চা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানে চা-গবেষণাকেন্দ্র টোকলাই এক্সপেরি-মেণ্টাল স্টেশন, আসাম এগ্রিকালচারাল কলেজ, একটি টেকনিক্যাল স্কুল এবং দুইটি কলেজ আছে। শিবসাগর একটি প্রাচীন নগরী ; পূর্বনাম ছিল রংপুর। আহোমরাজ শিবসিংহ শিবসাগর দীঘি ও শিবমন্দির শিব-ডোল নির্মাণ করেন। শিবমন্দিরটি আসামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে চেরাপুঞ্জী, ছন্দুবি বিল, বড়পেটার বৈষ্ণবসাধক শ্রীমাধবদেবের মন্দির, বনভোজনের চমৎকার স্থান মউফলং, উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য জোয়াই, বৈষ্ণবধর্মসংস্কারক শংকর-দেবের জন্মস্থান বাটাদ্রব বা বড়দোওয়া, শিবসাগরে আহোমরাজ প্রমত্তসিংহ -নির্মিত রং-ঘর, রাজা রাজেশ্বর -নির্মিত কারেং-ঘর এবং শিবসাগর জেলার কাজিরঙ্গা, কামরূপ জেলার মানস ও দরং জেলার সোনাই-রূপা এই তিনটি বন্য পশু সংরক্ষণাগারের নাম করা যাইতে পারে।

পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে কাছাড়ী রাজবংশের রাজধানী শিবসাগর জেলায় আহোম রাজগণের নির্মিত চিকন ইটের তৈয়ারি উদ্‌গত চিত্র (বেস রিলিফ) -খচিত মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলি বড় বড় সরোবরের তীরে নির্মিত। শিবসাগরের মন্দিরগুলিকে উত্তর ভারতের রেখমন্দিরের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। তবে মন্দিরের পাদভাগের সহিত উড়িষ্যার মন্দিরের পাদভাগের কিছু কিছু মিল আছে। ভালুকপুং-এ একটি ও সদিয়ার কিছু উত্তরে দুইটি বড় দুর্গ আসামরাজগণের হিমালয় অবধি রাজ্যবিস্তারের সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্তৃক শিলা সিন্দুরীগোফা মৌজায় নির্মিত প্রস্তরসেতু, ঐ একই শতাব্দীতে রাজা অরিমত্ত কর্তৃক নির্মিত কামরূপের বৈদারগড় দুর্গ এবং নগাঁওতে তাঁহার পুত্রের নির্মিত জুঙ্গাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি খননকার্যের ফলে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রস্তরনির্মিত সমাধিকক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তেজপুরে দহ-পর্বতীয়াতে গুপ্তরীতিতে ক্ষোদিত ও সদিয়ার পূর্বে

ভীষ্মকনগরে পোড়ামাটির কাজ করা মধ্যযুগের তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'অসমীয়া জাতি' 'অসমীয়া লোকনৃত্য' ও 'অসমীয়া লোকসংগীত' দ্র।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. III-VI & IX (Part 1), Bombay ; E. A. Gait, *The History of Assam*, Calcutta, 1906 ; *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Eastern Bengal and Assam*, Calcutta, 1909 ; K. N. Dutta, *Landmarks of the Freedom Struggle in Assam*, Gauhati, 1958 ; Birinchikumar Barua, *Early Geography of Assam*, Nowgong, 1952 ; Hem Barua & J. D. Banerjee, *The Fairs and Festivals of Assam*, Gauhati, 1956 ; The Directorate of Tourism, Assam, *Tourists' Assam*, Shillong, 1962.

তারাপদ মাইতি

আস্তিক বেদের প্রামাণ্য, পরলোক, অথবা কর্মফলের অস্তিত্ব যাহারা স্বীকার করে তাহারা আস্তিক— যাহারা স্বীকার করে না তাহারা নাস্তিক। বেদপ্রামাণ্যবাদী সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদান্ত এই ছয় দর্শন আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। বেদপ্রামাণ্যবিরোধী লোকায়ত বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যাহারা স্বীকার করে, সাধারণ জনসমাজে তাহারাই আস্তিক নামে পরিচিত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আস্তীক জরৎকারু মুনির পুত্র। মাতা সর্পরাজ বাসুকির ভগিনী, পিতার সমনাম্নী জরৎকারু (মহাভারত ১।৪৬)। কাশীদাসী বাংলা মহাভারতে ইহার নাম জরৎকারী। মতান্তরে ইনি কশ্যপের মানসী কন্যা সর্পমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা (দেবীভাগবত ৯।৪৮।১৩)। পত্নীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া জরৎকারু পত্নীত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার পুত্রসম্ভাবনা সম্পর্কে 'অস্তি' (আছে) এই কথা বলিয়া যান। তাই পুত্রের জন্ম হইলে তাঁহার নাম হয় আস্তীক। ইনি বাল্যাবস্থায়ই বেদবিদ্যা ও তপশ্চর্যায় খ্যাতিলাভ করেন (মহাভারত ১।৪৭-৪৮)। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পকুলের নিধন আরম্ভ হইলে আস্তীকের অনুরোধে জনমেজয় যজ্ঞ বন্ধ করেন এবং সর্পগণের জীবন রক্ষা হয় (মহাভারত ১।৫৮)। সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আস্তীকের নাম স্মরণ করিবার প্রথা আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আহ্‌মদ খাঁ, সৈয়দ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রী) ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দিল্লীতে এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে সৈয়দ আহ্‌মদের জন্ম হয়। প্রপিতামহ সৈয়দ হাজী হেরাত হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। দ্বিতীয় আলমগীরের সময়ে পিতামহ 'জওয়াহিদ আলী খাঁ' ও 'জওয়াদুদ্দৌলা' উপাধি পাইয়াছিলেন। পিতা সৈয়দ মহম্মদ তকি ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মাতামহ খ্বাজা ফরিদুদ্দীন আহ্‌মদ কৃতী পুরুষ ছিলেন। সম্রাট্ দ্বিতীয় আকবর সৈয়দ মহম্মদ তকির অনুরোধে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল এবং নবাব দবীরউদ্দৌলা আমিন উল্ মুল্‌ক খ্বাজা ফরিদুদ্দীন খাঁ বাহাদুর মসলে-জং উপাধি অর্পণ করেন। সৈয়দ আহ্‌মদের পিতা মহম্মদ তকি মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় আকবরের ঘনিষ্ঠ অনুচরদের অন্যতম ছিলেন।

বাল্যকালে সৈয়দ আহ্‌মদ প্রায়ই রাজ-দরবারে যাইতেন এবং কয়েক বার সম্রাটের নিকট হইতে 'খেলাত' (সম্মানজনক পোশাক ও মুক্তার মালা উপহার) লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে সৈয়দ আহ্‌মদ দিল্লীর শেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহের নিকট হইতে পিতামহের দুইটি উপাধিসহ আরিফ-জং উপাধিটিও লাভ করেন। বাল্যকালে গৃহে মাতার নিকট সৈয়দের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। সৈয়দ আহ্‌মদ উর্দু, আরবী ও ফারসী ভাষাতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন— ইংরেজী তিনি শেখেন নাই।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দিল্লীতে সেরেস্তাদারের চাকুরি গ্রহণ করেন। পরের বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে নায়েব মুনশী বা ডেপুটি রীডার হিসাবে আগ্রা ডিভিসনের কমিশনার রবার্ট হ্যামিল্‌টন (পরে স্যর) সাহেবের অধীনে বদলি হন। ফতেপুর সিক্রিতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুনসেফ হিসাবে বদলি হন। পরে উক্ত পদেই ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বদলি হইয়া দিল্লীতে আসেন। রবার্ট হ্যামিল্‌টনের অধীনে চাকুরি করার কালেই বিভিন্ন আইন -সংক্রান্ত নথি ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও অনুলিপির কাজে তাঁহার প্রথম সাহিত্যকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ইংল্যাণ্ডে প্রথমে কোনও প্রশংসা পায় নাই। ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও

প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রচনার জন্যই তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুনসেফ হিসাবে রোহ্‌টকে বদলি হন। পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদেই বিজনৌরে বদলি হইয়া আসেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের শুরু পর্যন্ত ঐ স্থানেই থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় বিজনৌরে অবস্থানরত ইংরেজদের জীবন রক্ষা এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখার জন্য সৈয়দ আহ্মদ যে প্রচেষ্টা করেন তাহা শাসকসম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত হয়। বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের সহযোগিতা করিবার জন্য বিজনৌর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বহু মুসলমান তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। ফলে সৈয়দ আহ্মদকে প্রাণভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া বেড়াইতে হয়। পরে মীরাটের ক্যান্টনমেন্টে গিয়া তিনি আশ্রয় লন এবং বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য রোহিলখণ্ড কলাম (রোহিলখণ্ড বাহিনী) গঠিত হইলে তাহাতে তিনি যোগদান করেন। বিদ্রোহ দমিত হইবার পর তিনি বিজনৌরে নিজের পুরাতন কাজে যোগ দেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদে মোরাদাবাদে বদলি হইয়া যান। বিদ্রোহে ইংরাজ সরকারকে সহায়তা করার জন্য তাঁহার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনকাল পর্যন্ত তিনি বাৎসরিক দুইশত টাকা পেনশন লাভ করেন। তাহা ছাড়া সরকারের পক্ষ হইতে পোশাক, মুক্তার মালা, তরবারি প্রভৃতি খেলাত পাইয়াছিলেন। স্যর সৈয়দ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ বিষয়ে উর্দুতে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে একই বিষয়ে তাঁহার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতেই স্যর সৈয়দ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার কথা চিন্তা করিতে শুরু করেন। তিনি ইংরেজদের সহযোগিতায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদাবাদে আধুনিক ইতিহাস পড়াইবার জন্য প্রথম স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাব-জজ হিসাবে বদলি হন গাজীপুরে। সেখানে তিনি তিন খণ্ডে বাইবেলের ধারাবাহিক ভাষ্য লেখেন। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ আহ্মদই প্রথম উর্দু ভাষায় বাইবেলের ব্যাখ্যান লিখিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুরে ট্রান্সলেশন সোসাইটির (অনুবাদ সমিতি) প্রথম সভা করেন। ইহাই পরে সায়েন্টিফিক সোসাইটি অফ আলীগড়-এ (আলীগড় বিজ্ঞান সমিতি) পরিণত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় আমদরবারে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একনিষ্ঠ সেবা ও ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার জন্য তদানীন্তন ভাইসরয় সৈয়দ আহ্মদকে মেকলের গ্রন্থাবলী ও একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। উক্ত দরবার উপলক্ষে ভাইসরয় লর্ড লরেন্সের সহিত স্যর সৈয়দের আলোচনার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় যুবকদের ইংল্যাণ্ডে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯টি বৃত্তি দানের সংকল্প ঘোষণা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির একটি নিজ পুত্র সৈয়দ মামুদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দুই পুত্র সৈয়দ মামুদ ও সৈয়দ হামেদকে লইয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে থাকাকালীন মহম্মদের জীবনী-সংক্রান্ত বারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধাবলী ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তুর্কির সুলতান ও মিশরের খলিফার নিকটও প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া নেটিভ জজ হিসাবে বারাণসীতে চাকুরিতে যোগ দেন। তখন হইতে 'মুসলমান সমাজ সংস্কারক' নাম দিয়া প্রায় নয় বৎসর ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত রচনার মাধ্যমেই মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনা গোঁড়ামিমুক্ত করার উপযোগী ভাবধারা সৃষ্টি করিতে তিনি সক্ষম হন। কিন্তু খ্রীষ্টান ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার জন্য মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তাঁহাকে বিধর্মী ঘোষণা করিয়া মক্কা হইতে ফতোয়াও আসে। অনেকে বেনামী পত্র লিখিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভীতিপ্রদর্শন করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার -রচিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' (ভারতীয় মুসলমান) নামক পুস্তকের জবাবে মুসলমানদের সমর্থন করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবার ফলে তিনি তাহাদের আস্থা কিয়ৎপরিমাণে ফিরিয়া পান।

কাশীতে অবস্থান করিবার সময় আলীগড় কলেজ স্থাপনের জন্য প্রথম অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করেন। প্রথমে একজন বিদেশী, জন মুর কেনেডি, এক হাজার টাকা চাঁদা দেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আলীগড়ে মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিটন ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রী)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর চাকুরি করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে আলীগড়ে বসবাস শুরু করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে লর্ড লিটন তাঁহাকে ভাইসরয় কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত করেন। সভ্য থাকার মেয়াদ দুই বৎসর পরে শেষ হইলে লর্ড রিপন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে আরও দুই বৎসরের জন্য ঐ পদে বহাল করিয়াছিলেন। ২ মার্চ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলীগড়ে নিজভবনে সৈয়দ আহ্মদের মৃত্যু হয়।

দ্র G. F. I. Graham, *The Life and Work of Sir Saiyad Ahmed Khan*, London, 1885,

হোসেন্থর রহমান

আহ্‌মদনগর মহারাষ্ট্র রাজ্যের জেলা এবং ঐ জেলার সদর। জেলার উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে গোদাবরী নদী, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ভীমা ও তাহার শাখানদী ঘোড় প্রবাহিত। জেলার অন্যান্য নদীর মধ্যে সিনা, প্রবর ও মূলা উল্লেখযোগ্য। জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিদ্যমান। জেলার সদর আহ্‌মদনগর শহর (১৯°৫′ উত্তর, ৭৪°৪৮′ পূর্ব) সিনা নদীর তীরে, পুণা হইতে অনধিক ১২১ কিলোমিটার (৭৫ মাইল) পূর্বে মধ্য রেলপথের ধোণ্ড-মানমড় শাখা লাইনের উপর অবস্থিত। সমগ্র জেলার আয়তন ১৭০৫৮ বর্গ কিলোমিটার (৬৫৮৬ বর্গ মাইল)। মোট লোকসংখ্যা ১৭৭৫৯৬৯। তন্মধ্যে পুরুষ ৯০৫৩১৩ এবং নারী ৮৭০৬৫৬ জন। নারী-পুরুষের অনুপাত ৯৬২ : ১০০০। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫৬২৯৯ ও ১১৩৪৩০ জন। জনসংখ্যার ৫২৪৩৪৫ জন চাষী, খেতমজুরের সংখ্যা ১৯৬১০৭। গৃহশিল্পে নিযুক্ত আছে ৩৭১৯৮ জন। অন্যান্য শ্রমশিল্পে নিযুক্ত আছে ৩৫৪৬৪ জন কর্মী। ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২১৮২২ জন। এই জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৪ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৭০ জন) লোক বাস করে। আহ্‌মদনগর শহরে স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৯০২০। তন্মধ্যে ৬৩১২২ জন পুরুষ এবং ৫৫৮৯৮ জন নারী। এই এলাকায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ৬৪৩২৯। কৃষি-কার্যে ১৪০৫ জন, গৃহশিল্পে ২৩১৮ জন এবং অন্যান্য শ্রম-শিল্পে ৮৪৭৬ জন নিযুক্ত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ৫৫৭০ জন, পরিবহনে ২২১০ জন এবং অন্যান্য চাকুরিতে আছে ১৫৩৬২ জন। জেলার অন্যান্য শহরের মধ্যে শ্রীরামপুর (জনসংখ্যা ২২৮০২), সঙ্গমনের (জনসংখ্যা ২১৭২৯), কোপারগাঁও (জনসংখ্যা ১৬৮৬৯) ও ওয়াড়ী (জনসংখ্যা ৬৮৯৫) উল্লেখযোগ্য।

জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে আখ, তুলা, জোয়ার, বাজরা ও রাগী প্রধান। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদনগর জেলায় প্রথম তুলার চাষ প্রবর্তিত হয়। অনিয়মিত বৃষ্টি-পাতের ফলে এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইত। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডারদ্বোয়ারা নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া এবং অন্যান্য নদী-নালা হইতে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একই উদ্দেশ্যে বারেগাঁও-মাণ্ডুর নিকট মূলা নদীর উপর আর একটি বাঁধ নির্মিত হইতেছে। আহ্‌মদনগর জেলায় ১১টি চিনির কল আছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে এত চিনির কল আর কোথাও নাই। ছয়টি চিনিকলের মালিকানা ইক্ষু উৎপাদকদের সমবায়-সমিতির হস্তে রহিয়াছে। রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টায় ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিতালিতে একটি অ্যালকোহল উৎপাদনের কারখানা নির্মিত হইতেছে। ইহা ছাড়া আহ্‌মদনগর শহরের চতুষ্পার্শে বহু নাতিবৃহৎ কারখানা আছে। এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার শাড়ি জেলার বাহিরেও রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সালি ও কোষ্টি -জাতিভুক্ত লোকেরাই শুধু এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। বর্তমানে কুন্‌বি, কোঙ্গাড়ি, মালি প্রভৃতি জাতিভুক্ত লোকেরাও তাঁত চালাইয়া থাকে। এখানকার তামা ও কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ। আহ্‌মদ-নগরের সরকারি টেকনিক্যাল স্কুলে উৎকৃষ্ট ধরনের কার্পেট বোনা হয়।

আহ্‌মদনগর শহরে একটি কলেজ, একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল, একটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও অনেকগুলি হাই স্কুল আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আহ্‌মদনগর জেলা সম্ভবতঃ সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎপরে অঞ্চলটি ক্রমান্বয়ে আভীর, বাকাটক, বাদামির চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, কল্যাণের চালুক্য, কলচুরি ও যাদবগণের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজী ইহা জয় করেন। মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে দৌলতাবাদের অমাত্যগণ বিদ্রোহী হয়। তাঁহাদের অন্যতম নেতা আবুল মজফ্‌ফর আলাউদ্দীন বহ্‌মন ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বাহ্‌মনী রাজ্যের জুন্নার প্রদেশের শাসনকর্তা মালিক আহ্‌মদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজামশাহী বংশের রাজত্বের সূচনা হইল। ইহার অনতিকাল পরে তিনি নূতন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার নামানুসারে শহরটির নাম হয় আহ্‌মদনগর। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মালিক আহ্‌মদ দৌলতাবাদ দখল করেন। এই সময় হইতে আহ্‌মদনগর রাজ্যের ইতিহাস অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। এই সব যুদ্ধের মধ্য দিয়া আহ্‌মদনগর রাজ্যের সীমা কল্যাণ হইতে দৌলতাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নিজামশাহী রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিল খান্দেশ ও

বিজয়নগর। শত্রুর আক্রমণ হইতে নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য আহ্মদ নিজামের পৌত্র হুসেন নিজাম শাহ্ ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে নগরের চারিপার্শ্বে ৪ মিটার (১২ ফুট) উচ্চ মৃত্তিকানির্মিত প্রাচীর তৈয়ারি করেন। মজিয়া যাওয়া পরিখা, ভগ্ন দরজা এবং প্রাকারসহ এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। হুসেন নিজাম শাহ্ বিজয়নগররাজ রাজারামের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণভাবে পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং বিদরের নৃপতিদের সহযোগে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া হুসেন নিজাম রাজারামকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বংশের অন্য এক নৃপতি ইব্রাহিম নিজাম শাহ্ বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত ও নিহত হন। ইব্রাহিম নিজাম শাহের নাবালক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার পিতামহী বিজাপুরের আদিল শাহের বিধবা পত্নী ও আহ্মদনগরের মূর্তজা নিজাম শাহের ভগ্নী চাঁদবিবি কার্যতঃ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে, রাজপুত্র মুরাদ ও আব্দুর রহীমের নেতৃত্বে মোগল বাহিনী ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর অবরোধ করিলে চাঁদবিবি স্বয়ং অত্যন্ত সাহসের সহিত নগর রক্ষা করিতে থাকেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হইয়া মোগলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন (১৫৯৬ খ্রী)। চুক্তির শর্তানুসারে বেরার অঞ্চল মোগলদের নিকট অর্পণ করিতে হয় ও আহ্মদনগরের নৃপতিকে সম্রাট্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু মোগল সৈন্য চলিয়া যাইবার পর চাঁদবিবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আহ্মদনগর বাহিনী বেরার আক্রমণ করে। এই সময়ে চাঁদবিবির মৃত্যু হয়। চাঁদবিবির মৃত্যুর পর আকবরের পুত্র দানিয়েল মীর্জার নেতৃত্বে এক মোগল বাহিনী ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর আক্রমণ করিয়া তদানীন্তন নৃপতিকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। অবশ্য তখনও আহ্মদনগরকে পুরাপুরি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তার পর চারি জন অক্ষম নৃপতি আহ্মদনগরে রাজত্ব করেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার পুত্র খুর্‌রম্‌কে প্রেরণ করেন। খুর্‌রম্ আহ্মদনগর আক্রমণ করিয়া উহা দখল করেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর নিজামশাহী রাজ্যের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অম্বর, আহ্মদনগর হইতে ঔরঙ্গাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যটি প্রায় স্বাধীন হইয়া ওঠে। মালিকের মৃত্যুর পর তাঁহার অযোগ্য পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র আহ্মদনগর রাজ্য মোগল সম্রাট্ শাহ্জাহানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর শহরেই সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব দেহত্যাগ করেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের মোগল শাসনকর্তা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যটি পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর হস্তে তুলিয়া দেন। অতঃপর ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া গোয়ালিয়রের মারাঠা-প্রধান দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে ইহা জায়গির হিসাবে দান করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর দুর্গ ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তবে কিছুদিন পর দুর্গের অধিকার ইংরেজগণ পেশোয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় (১৮১৭ খ্রী) আহ্মদনগর পুনরায় ইংরেজদের অধিকারে আসে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্যতম জেলায় পরিণত হয়।

আহ্মদনগর জেলায় অনেকগুলি গুহামন্দির আছে। পারনারের ধোকেশ্বর গুহামন্দিরগুলি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অনুমিত হয় যে চালুক্যগণের রাজত্বকালে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রগড়ের গুহামন্দিরগুলি এবং শ্রীগোণ্ডা, পেড়গাঁও, হরিশ্চন্দ্রগড়, আকোলা, জামখেড়, রাশিন, তেলাঙ্গসি ও অন্যান্য অনেক মন্দির দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যাদববংশীয় রাজাদের এবং তাঁহাদের সামন্ত নৃপতিদের আজ্ঞায় ও উৎসাহে নির্মিত। পেড়গাঁও-এর লক্ষ্মী-নারায়ণ-মন্দিরটির ভাস্কর্য প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধটেক ও মিরির মন্দিরদ্বয়ও উল্লেখযোগ্য। জেলায় প্রচুর ভগ্ন দুর্গ এবং দুর্গাবশেষ দেখা যায়। আহ্মদনগর দুর্গ শহরের পূর্বপ্রান্তে ৪ বর্গ কিলোমিটার (দেড় বর্গ মাইল) ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। ইহা প্রস্তরনির্মিত। দুর্গের পরিখাটি এখন জলশূন্য। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্মনী রাজ্যের জুন্নার প্রদেশের শাসনকর্তা আহ্মদ নিজাম শাহ্ প্রথমে এখানে দুর্গ নির্মাণ করেন। অবশ্য বর্তমান দুর্গটি নির্মিত হয় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদ নিজামের পৌত্র হোসেন নিজামের রাজত্বকালে। মুসলমানী আমলে নির্মিত অনেক বাসগৃহ, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ আহ্মদনগরে আজিও বিদ্যমান। এই সব বাসগৃহের অধিকাংশই নিজামশাহী রাজগণের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত। ইংরেজ আমলে কাছারি হিসাবে যে গৃহটি ব্যবহৃত হইত, তাহা ষোড়শ শতকে নির্মিত একটি মসজিদ। আহ্মদনগর-সৈবাগাঁও রাস্তার উপর আহ্মদনগরের ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) উত্তরে পাহাড়ের উপর দুর্গপ্রাকারের মধ্যে অবস্থিত নিজামশাহী রাজ্যের

মন্ত্রী সলাবত খাঁর স্মৃতিসৌধটি মোগলরীতিতে নির্মিত। সাধারণের নিকট এই অষ্টকোণ সমাধিগৃহ চাঁদবিবির মহল নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন দামরী মসজিদ ও ফরিয়াবাগে আহ্‌মদ নিজাম শাহের সমাধিগৃহ মুসলমানী স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে হাস্‌ত্‌ বিহিস্ত্‌বাগ এবং বিঙ্গার মৌজায় অবস্থিত আলমগীর দরগা উল্লেখযোগ্য। আলমগীর দরগার নিকটে সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেব দেহত্যাগ করেন।

প্রণবরঞ্জন রায়

আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী (১৭২৪?-১৭৭৩ খ্রী) আফগানিস্তানের দুর্‌রানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারত আক্রমণকারী। আবদালী উপজাতির সর্দার সাম্মাউ খাঁর ঔরসে হেরাতে ১৭২৪? খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহের জন্ম। তিনি পারস্যরাজ নাদির শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন। নাদির শাহের মৃত্যুর (১৭৪৭ খ্রী) পরে তিনি স্বাধীন নৃপতিরূপে কান্দাহারে আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন (অক্টোবর ১৭৪৭ খ্রী)। রাজা হইয়া তিনি দুর্‌র-ই-দুর্‌রান (যুগের মুক্তা) নাম ধারণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার বংশ 'দুর্‌রানী' বংশ নামে খ্যাত হয়। তিনি ১৭৪৮-১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাত বার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মতান্তরে, তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন। শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি বারংবার ভারত আক্রমণ করেন তাহা নহে— ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই-উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় নাই।

কান্দাহার, কাবুল ও পেশোয়ার জয় করিয়া আহ্‌মদ শাহ্‌ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ১২০০০ সুদক্ষ সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু মানপুরের যুদ্ধে ভাবী সম্রাট্‌ আহ্‌মদ শাহ্‌ এবং লোকান্তরিত উজীর কমরুদ্দীনের পুত্র মীর মন্নু কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মীর মন্নু পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার পূর্বেই ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহ্‌ দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করেন এবং মীর মন্নুকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাবের অধীশ্বর হন। মোগল দরবারের কোনরূপ সাহায্য লাভ করিতে না পারায় মন্নুর প্রতিরোধ-চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আবদালী তৃতীয়বার ভারত আক্রমণ করিয়া মীর মন্নুকে পুনরায় পরাজিত করেন এবং কাশ্মীর জয় করেন। তদুপরি তিনি সম্রাট্‌ আহ্‌মদ শাহ্‌কে শিরহিন্দ্‌-এর পশ্চিম সীমা পর্যন্ত অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। মীর মন্নুকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া আবদালী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মীর মন্নু এবং তাঁহার শিশুপুত্রের মৃত্যু হইলে পাঞ্জাবে অরাজকতা দেখা দেয়। পাঞ্জাবের নাবালক শাসনকর্তার অভিভাবিকা ও মাতা মোগলানী বেগমের আহ্বানে দিল্লীর প্রবল প্রতাপান্বিত উজীর ইমাদুল মুল্‌ক তাঁহার সাহায্যে আসিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন এবং লাহোরের 'অভিজাত-শ্রেষ্ঠ' মীর মুনিমকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আবদালী ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে উপনীত হইয়া রাজধানী লুণ্ঠিত করেন। ইমাদুল মুল্‌ক আত্মসমর্পণ করিলে আবদালী তাঁহাকে মার্জনা করেন কিন্তু পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং শিরহিন্দ্‌ জেলার কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করিতে মোগল সম্রাট্‌কে বাধ্য করেন। দিল্লীর দক্ষিণস্থ জাঠ-অধ্যুষিত অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া এবং বহু বন্দী ও লুণ্ঠন-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্বে পুত্র তাইমুর শাহ্‌কে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। তাইমুর শাহের এক বৎসরের শাসনকালে দেশে অরাজকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জলন্ধরের শাসনকর্তা আদিনা বেগ খাঁ এই অরাজকতা বন্ধ করিবার উদ্দেশে মারাঠাদিগকে আমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ রাও-এর নেতৃত্বাধীনে বিরাট মারাঠা সৈন্যবাহিনী লাহোর অধিকার করে এবং আফগানদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া আদিনা বেগ খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। কিন্তু লাহোর ছয় মাসের বেশি মারাঠাদের অধিকারে ছিল না। প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী পঞ্চমবার ভারত আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য মারাঠা শক্তির সহিত তাঁহার প্রবলতর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এই সংঘাত পরিণতি লাভ করে। মারাঠা শক্তিকে চূর্ণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে ভারতবর্ষের সম্রাট্‌ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে আদেশ দেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে নজিবুদ্দৌলা ও মুনিরুদ্দৌলা তাঁহাকে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন। মারাঠা শক্তি স্তিমিত হইলে পাঞ্জাবে শিখ-জাতি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ওঠে। লাহোরের দুর্‌রানী প্রতিনিধিকে হত্যা করিয়া তাহারা লাহোর অধিকার করিলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবদালী লাহোরে উপস্থিত হন। কিন্তু পক্ষকাল সেখানে অবস্থান করিয়া

স্বদেশে বিদ্রোহ ও গৃহবিবাদ দমনার্থে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন কিন্তু শিখশক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে না পারিয়া ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং শিখগণ পুনরায় লাহোর ও আটক পর্যন্ত ভূখণ্ড তাহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর অভিযানের ফলে ভারত ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত ধ্বংসসাধনে ইহা সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে আবদালীর অভিযান প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, শিখ শক্তির জাগরণে ইহা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষেও আবদালীর অভিযান বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আহ্‌মদিয়া মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। ধর্মগুরু মীর্জা গোলাম আহ্‌মদের ভক্তবৃন্দকে আহ্‌মদিয়া বলা হয়। মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ দাবি করেন, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা যাঁহার সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ আছে। আহ্‌মদিয়াগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক দল মীর্জা গোলাম আহ্‌মদকে পয়গম্বর বলিয়া মানে। তাহারা অন্যান্য মুসলমানের সহিত একত্রে নামাজ পড়ে না। এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান; সেইজন্য ইহাদিগকে কাদিয়ানীও বলা হয়। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের রাব্‌ওয়াতে কাদিয়ানী-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। অপর সম্প্রদায় গোলাম আহ্‌মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা শুধু মানে যে তিনি ধর্মসংস্কারক। ইহারা অন্যান্য মুসলমানের সহিত নামাজ পড়ে। লাহোর এই সম্প্রদায়ের কর্মকেন্দ্র।

দ্র H. A. Walker, *The Ahmadiyah Movement*, Calcutta, 1918; H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, Chicago, 1947.

আবুল হায়াত

আহ্‌মেদাবাদ আমেদাবাদ দ্র

আহার বৃষ্টির তারতম্য এবং স্থানের উচ্চতা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধান বা গম যব ভুট্টা জোয়ার অথবা বাজরার চাষ হয়। আসাম, বাংলা, বিহার, উত্তর ও মধ্য প্রদেশের অংশবিশেষ, উড়িষ্যা হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এবং মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে চাউল জন্মায়। কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের নিম্ন উপত্যকাতেও চাউলের চাষ আছে। তবে সেখানে ব্যবহার অপেক্ষা বিক্রয়ের প্রয়োজনই অধিক।

চাউল সাধারণতঃ সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। আসামে কোমল চাউল নামে এক প্রকার চাউল আছে, তাহা চিঁড়ার মত ভিজাইয়া খাওয়া চলে। কেরলে চাউল ভাজিয়া গুঁড়া অবস্থায় রাখা হয় এবং তাহা হইতে কয়েক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। আখের রস বা গুড়ের সহযোগে চাউলের গুঁড়া হইতে নাড়ু করিবার প্রথা বাংলা দেশে পূর্বে খুবই প্রচলিত ছিল।

ইহা ছাড়া ভারতের সর্বত্র চিঁড়া এবং বহু স্থানে মুড়ি ও খই তৈয়ারি হয়। চিঁড়া ভিজাইয়া অথবা ঘি-তেলে ভাজিয়া খাওয়া চলে। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে মুড়ির চলন বেশি, দক্ষিণে কম।

গমজাত আটায় রুটি ও পুরি তৈয়ারি হয়। হিন্দী ভাষায় আধভাঙা গমের নাম ডলিয়া। ইহার দ্বারা চাউলের পায়েসের মত পায়েস হয়। সুজি হইতে পায়েস ও মোহনভোগ তৈয়ারি করা যায়। আটার ন্যায় ময়দারও নানা ব্যবহার আছে। ইহা হইতে লুচি মালপোয়া প্রভৃতি খাবার করা চলে। আবার ময়দা মাখিয়া কলসির গায়ে ঘষিয়া সরু সরু সুতার মত সেমুই তৈয়ারি করা যায়। চীন দেশে, মধ্য এশিয়ায় এবং ইটালীতেও ইহা হইতে বিবিধ আহার্য প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে সেমুই দিয়া পায়েস রান্নাই অধিক প্রচলিত।

ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরার আটা হইতেও রুটি গড়া হয়। কিন্তু তাহা গমের রুটির মত ফোলে না এবং অত সুস্বাদুও নহে। শুকনা বালি ও খোলায় এই সকল শস্যের খই ভাজা হয়। বিহার প্রদেশে ভুট্টার খইয়ের যথেষ্ট চলন আছে। সমগ্র মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও মহীশূরে সাধারণ গ্রামবাসী জোয়ার ও বাজরার রুটির উপরেই বেশি নির্ভর করে। উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশে জোয়ার বাজরার মত কয়েকটি ক্ষুদ্র শস্যকে ভাতের মত রান্না করিবার প্রথা আছে।

ভারতের সর্বত্র ডালের ব্যবহার দেখা যায়। নুন-মসলা দিয়া ডাল রান্না হয়। পাঞ্জাব অঞ্চলে মাষকলাইয়ের চলন বেশি, উত্তর ভারতে অড়হর ও ছোলা এবং বাংলায় মুগ মসুর ও স্থানবিশেষে কলাইয়ের আদর আছে। উত্তর ভারতে ডাল ঘন করিয়া রাঁধা হয়, বাংলায় মাঝামাঝি, কিন্তু অন্ধ্র ও মাদ্রাজে সম্বরম্‌ বলিতে পাতলা ডালই বুঝায়।

ডালের অন্যান্য ব্যবহারও আছে। যবের মত ছোলা ভাজিয়া গুঁড়াইলেও ছাতু হয়। ডাল হইতে বেসন তৈয়ারি হয়। ছাতু ও বেসনের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। সমস্ত দক্ষিণ দেশে চাউলের সহিত কলাইয়ের ডাল বাটিয়া ফেনাইয়া ইডলি ও ধোসে নামক প্রাতরাশ প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া ডাল বাটিয়া নানাবিধ মসলা -সহযোগে বড়ি ও পাঁপর তৈয়ারি হয়।

ভারতবর্ষে মাংস পাশ্চাত্ত্যদেশের মত নিত্য-আহার্য নহে। নিয়মিত মাংস ব্যবহার করিতে হইলে পশুপালনের জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন, আমাদের ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিনির্ভর দেশে তাহার সংকুলান অসম্ভব। সেইজন্য সাধারণতঃ উৎসব বা পাল-পার্বণ উপলক্ষেই মাংসাহার প্রচলিত। মাছের বেলায় চাষের জমির উপরে বিশেষ টান পড়ে না। কারণ মাছ হয় নদী খাল বিল ও সমুদ্রে; পুকুরেও মাছের চাষ করা যায়।

বাংলা আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে মাছের ব্যবহার অবৈষ্ণব সকল বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত। বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত মাছের ব্যবহার কিছু কিছু থাকিলেও ইহাকে অপকৃষ্ট, কোথাও বা ঘৃণ্য খাদ্যরূপে গণ্য করা হয়। সমগ্র দক্ষিণ দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকে মাছ খায়, উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার কোনও কোনও অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া কেরল পর্যন্ত সমগ্র উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে শুঁটকি মাছের চলন আছে। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলেও পার্বত্য জাতিবৃন্দের জন্য হাটে শুঁটকির আমদানি হয়। আসাম বা হিমালয় অঞ্চলে মাংসের শুঁটকিও বিক্রয় হয় এবং গৃহস্থ নিজের ব্যবহারের জন্য উহা সঞ্চয় করিয়া রাখে।

শহর অঞ্চলে আজকাল ইংরেজী প্রথার প্রভাবে ডিমের চলন বাড়িতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে কিছুদিন পূর্বেও মুরগির ডিমকে অশুদ্ধ মনে করা হইত। এখন সেই সংস্কার কাটিয়া যাইতেছে, হিন্দু গৃহস্থও মুরগি পালনের দিকে মন দিতেছে। পূর্বে ইহা কেবল মুসলমান গৃহস্থের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পার্বত্য জাতিবৃন্দের মধ্যে দেবতার উদ্দেশে মুরগি বা শূকর বলি দিবার প্রথা আছে। বলির পর ইহাদের মাংস খাওয়া হয়।

যাহারা প্রধানতঃ চাউল বা অন্যান্য শ্বেতসারবহুল শস্যের উপরে নির্ভর করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পলীয় বা আমিষ উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না, স্নেহপদার্থের জন্য তাহাদিগকে তৈলের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতের অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ তৈলের প্রচলন আছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামে সরিষার তৈল এবং অন্ধ্র মাদ্রাজ মহীশূর মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে তিলের তৈলের চলন আছে। তবে ক্রমশঃ ঘানি উঠিয়া যাইতেছে এবং কলে পেষা (চীনা) বাদাম তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘি প্রায় অদৃশ্য হইতে চলিয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত গন্ধবিহীন ও ঘনীভূত তৈল এখন প্রায় সর্বত্র ঘিয়ের বিকল্প রূপে ব্যবহৃত হয়। কেরলে রন্ধনের কাজে নারিকেল তৈলের প্রচলন আছে; মহীশূরে কোনও কোনও সমুদ্রকূলবর্তী জেলাতেও রন্ধনক্রিয়ায় নারিকেল তৈলের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা দেশে তরকারি বা ডালে নারিকেল-কোরা দিয়া খাদ্যে কিছু পলীয় ও স্নেহ-পদার্থের সংযোগ করা হয়। কাশ্মীর এবং বিহারের স্থান-বিশেষে রন্ধনে অল্প পরিমাণ তিসির তৈল ব্যবহৃত হয়। কোথাও বা কুসুম তৈলের অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

দুধের আদর প্রায় সর্বত্র। কেবল আসামের পার্বত্য জাতি এবং উড়িষ্যা ও বিহারের আদিবাসীদের মধ্যে দুধের ব্যবহার নাই। এতদ্ভিন্ন ভারতের সর্বত্রই লোকে দুধ সংগ্রহ করিতে পারিলে খুশি হয়। দুধ বেশিক্ষণ ভাল অবস্থায় রাখা কঠিন। সেইজন্য উত্তর ভারতে দুধ হইতে খোয়া ক্ষীর করিয়া নানাবিধ খাদ্য তৈয়ারি করা হয়। দুধকে দধিতে পরিণত করিলে আরও ভাল রাখা চলে। দই ভারতের সর্বত্র চলে। কোথাও ইহা বেশি টক, কোথাও কম। বাংলা দেশেই কেবল চিনিপাতা দইয়ের প্রচলন আছে। বাংলা ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতেই দুধ হইতে ছানা কাটানোর বিরুদ্ধে একটি সংস্কার আছে। কিন্তু এখন সর্বত্র বাংলার রসগোল্লা-সন্দেশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ছানার প্রতি বিরূপতা অপসৃত হইতেছে।

তরকারি ভারতের সর্বত্রই চলে, তবে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে ইহার পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। এই সকল অঞ্চলে আবার কয়েক প্রকার জিনিস মিশাইয়া তরকারি রাঁধা হয়। অন্যত্র এমন নহে। পশ্চিমে একটি-মাত্র জিনিস দিয়া শাক ও ভাজি রান্না হয়।

ফলের ব্যবহার এবং কাঁচা মূলা, শাক, পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়া ভারতে অপেক্ষাকৃত কম। পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে কাঁচা তরকারি খাওয়ার রেওয়াজ বেশ দেখা যায়। আম, কাঁঠাল, ফুটি, তরমুজ, পেয়ারা ও আখ যখন হয় তখন লোকে ইহা খায় বটে, তবে ফলকে নিত্য খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলের চাষ হয় না। আম-কাঁঠাল খাওয়ার পর তাহার বীজের অন্তর্গত শাঁস গুঁড়াইয়া রাখা এবং সময়কালে তাহাও রাঁধিয়া খাওয়ার রীতি অরণ্যবাসী জাতিবৃন্দের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ভারতে বহু অঞ্চলে নিরামিষ আহারের প্রাধান্য দেখা যায়। বিধবাদের পক্ষে বিধিনিষেধ আরও কঠিন। বাংলা আসাম উড়িষ্যা ও কাশ্মীর ব্যতীত অন্যত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। বাংলায় রসুন নিষিদ্ধ, কিন্তু ভারতের অন্যত্র তাহা নহে। বাংলায় বিধবাদিগকে মসুর ডাল খাইতে নাই, মটর ডাল খাওয়াই বিধি। দরিদ্র জাতিবৃন্দের মধ্যে গেঁড়ি-গুগলির মাংস চলে, উচ্চবর্ণের মধ্যে নিষেধ না থাকিলেও ইহার চলন প্রায় নাই।

এইরূপ নানাবিধ বিধিনিষেধের সমর্থনে সকল সময়ে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইগুলি প্রথমে হয়ত ঐতিহাসিক কারণবশে প্রচলিত হয়। পরে সে কারণ সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিধিনিষেধগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে কোনও কোনও ঐতিহাসিক পারম্পর্য সংগ্রহ করা সম্ভব। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রসাদরন্ধনে আলু, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। খামালু, কুমড়া, পেঁপে, কয়েক প্রকার শাক, কচু প্রভৃতির সহযোগে তরকারি রাঁধা হয়। উপরন্তু বাংলা দেশে সচরাচর যেমন তৈলে কষিয়া লওয়ার পর তরকারিতে জল দেওয়া হয়, শ্রীক্ষেত্রের প্রথা সেরূপ নহে। সিদ্ধ করার পর মসলা দেওয়ার ফলে আস্বাদের তারতম্য সাধিত হয়। কোন্ দেবতার উদ্দেশে কি ধরনের ভোজ্য দিবার বিধি তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত নানাবিধ সংস্কারের ইতিহাসও উদ্ধার করা সম্ভব।

আহারের সময় সম্পর্কে ভারতে নানাবিধ প্রথা প্রচলিত আছে। কর্মব্যস্ত কৃষককে প্রাতরাশ হিসাবে কিছু ভারি খাদ্য খাইতে হয়, কিন্তু অবস্থাবিপাকে সকল সময়ে তাহা জোটে না। মহীশূর হইতে মহারাষ্ট্র গুজরাট ও রাজস্থান পর্যন্ত মোটা জোয়ার বা বাজরার রুটি, কোথাও কাঁচা পেঁয়াজ, কোথাও বা আচার এবং মাঠা তোলা দইয়ের ঘোল -সহযোগে খাওয়া হয়। পশ্চিম বাংলায় গুড় ও মুড়ি এবং বিহারে রাঙা-আলু সিদ্ধ অথবা ছাতু জলে মাখিয়া লবণ ও লঙ্কা -সহযোগে খাওয়া হয়। অন্ধ্র মাদ্রাজ ও কেরলে ইডলির বহুল প্রচার আছে। ইহা পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য। ইহার সহিত নারিকেল-বাটার চাটনি খাওয়া হয়।

দুপুরের খাদ্য ভাত রুটি বা অবস্থাবিশেষে ছাতু। ভাত বা রুটির সঙ্গে প্রত্যহ ডাল সকলের জোটে না; অন্ততঃ কিছু শাক বা তরকারি তাহার সহিত খাইতে হয়। সময় সম্পর্কে স্থিরতা নাই। তবে কৃষকের আহার সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে হয় না, অনেক সময়ে বেলা দুইটাও বাজিয়া যায়। যাহারা স্কুল-কলেজে অথবা অফিসে যায় তাহাদের আহারের সময় অবশ্য স্বতন্ত্র। বাড়ির মেয়েদের সময়ও পৃথক। সচরাচর গৃহের সকলকে খাওয়াইবার পর তাঁহারা খাইতে বসেন।

রাত্রের আহার সম্বন্ধেও সময়ের যথেষ্ট তারতম্য আছে। বৌদ্ধ বা জৈন -সম্প্রদায় সূর্যাস্তের পরে সাধারণতঃ আহার করেন না। কিন্তু অন্যেরা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দেড় বা দুই প্রহর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ভোজন করেন।

চীন জাপান ও বিলাতের তুলনায় ভারতীয় রান্নায় মসলার ব্যবহার বেশি। হলুদ লঙ্কা তেজপাতা পাঁচফোড়ন জিরা ধনিয়া প্রভৃতি মসলার মাত্রা এবং কাঁচা অথবা ভাজিয়া ব্যবহার করা সম্পর্কে দেশে দেশে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রচুর লঙ্কা অথবা তেঁতুলের ব্যবহারের জন্য অন্ধ্র দেশ এবং মহীশূরের স্থানবিশেষ প্রসিদ্ধ। পশ্চিম বাংলায় মিষ্টের ব্যবহার অধিক।

এই সকল রীতি ব্যতীত আহারের বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ প্রথাও বর্তমান। অশৌচের সময়ে যেমন নানাবিধ নিষেধ পালন করিতে হয়, সামাজিক ক্রিয়াকরণেও তেমনই বিশেষ বিশেষ খাদ্য বা পেয় পরিবেশনের বিধি আছে। আবার খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে পরিবেশিত হইবে, সে সম্বন্ধেও নানাবিধ নিয়ম দেখা যায়। রাজস্থানে ও মাদ্রাজে মিষ্টান্ন দিয়া নিমন্ত্রণের আরম্ভ হয়, কিন্তু বাংলায় উহার দ্বারা শেষ করা বিধি। গুজরাটে রুটির পর ভাত পরিবেশিত হয়, না হইলে নিমন্ত্রণের অঙ্গহানি ঘটে।

ইদানীং শহরাঞ্চলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। বাংলা দেশে পূর্বে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কাজে মাছ রান্না হইত না। কোনও কোনও বাড়িতে যদি বা মাছ হইত, মাংস আদৌ হইত না। এখন সে বাধা উঠিয়া যাইতেছে। বাংলা দেশে মাংস রান্নার চলতি প্রথা খানিক মুসলমানী পাকপ্রণালী হইতে গৃহীত হয় এবং খানিক মাছের ঝোলের অনুকরণে করা হয়। আজকাল আবার পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারেও মাছ ও মাংসের কিছু কিছু রান্না প্রচলিত হইতেছে।

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার রীতি অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কৃষকের ঘরে হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ আহারে খুব বেশি তারতম্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকরণ উপলক্ষে খাদ্যের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। পোলাও কাবাব কোর্মা প্রভৃতি রন্ধন মুসলমান রাজত্বকালেই এ দেশে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শহরবাসী ও গ্রামের বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের মধ্যে ইহার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

সেইরূপ ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরেজদের রন্ধনপ্রণালীও এ দেশে অল্প অল্প ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নির্মলকুমার বসু

আহিতাগ্নি অগ্নিহোত্র দ্র

আহোম ব্রহ্মের শান ও তাই জাতির একটি শাখা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইরাবতী উপত্যকার উত্তরাংশ হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপস্থিত হয়। এখানে ইহারা আহোম নামে পরিচিত। রাজ্যবিস্তারের পরে ক্রমশঃ স্বীয় ধর্মের পরিবর্তে ইহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধীন হয়। ইহাদের ভাষাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল কিছু প্রাচীন পুথিতে পুরাতন ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। বুরঞ্জী গ্রন্থে এই বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। এক সময়ে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা হইতে ইয়ুনান পর্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগলদের সহিত সংঘর্ষের ফলে আহোম রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

দৈহিক লক্ষণে মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও স্থানীয় জাতিবৃন্দের সহিত ইহাদের সংমিশ্রণের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেহ কেহ মনে করেন আহোম শব্দ হইতেই আসাম শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতীয় সম্প্রদায়বিশেষ। ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ ধারার ২ নম্বর উপধারায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে : যাঁহার পিতা অথবা পৈতৃক ধারায় কোনও পূর্বপুরুষ ইওরোপীয় ছিলেন অথচ যাঁহার ভারতেই জন্ম ও স্থায়ী নিবাস এবং যাঁহার পিতা-মাতাও ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন, তিনিই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বর্তমানে এই সংজ্ঞাটি সাধারণভাবে গৃহীত হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উনবিংশ শতকে বহু ইংরেজ ও ভারতীয় লেখক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিতে ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সম্প্রদায়কেই নির্দেশ করিতেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ১১১৬৩৭। তন্মধ্যে ৫৪ হইতে ৫৫ হাজার জন পুরুষ এবং ৫৭ হাজারেরও কিছু বেশি স্ত্রীলোক। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় সম্প্রদায়গত হিসাব গৃহীত হয় নাই, সুতরাং গত দশকে এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি হ্রাস পাইয়াছে তাহা জানা যায় না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সারা ভারতে ছড়াইয়া থাকিলেও, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই তাহাদের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। পশ্চিম বঙ্গে ৩১৬১৬ জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাস করে। তন্মধ্যে ২২১৮৬ জন বাস করে কলিকাতায়। দক্ষিণ ভারতেও প্রায় ৫০ হাজার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বসবাস করে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় প্রায় সমগ্রভাবে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। শতকরা আনুমানিক ৮০ জন রোমান ক্যাথলিক এবং শতকরা ১৫ জন অ্যাংলিকান (প্রোটেস্ট্যান্ট) খ্রীষ্টান। ইহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী, তবে হিন্দুস্থানীরও ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। অধিকাংশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

আর্থিক বিচারে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ প্রধানতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পাইলট সার্ভে অফ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কমিউনিটির বিবরণী (ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস) হইতে জানা যায় যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ১৫% পরিবারের মাসিক আয় পাঁচশত টাকা বা তদূর্ধ্ব। ৮৫% অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের আয় মাসিক পাঁচশত টাকার কম। ইংরেজ আমলে রেল, টেলিগ্রাফ, শুল্কবিভাগ ও পুলিশবাহিনীতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চাকুরি পাইবার বিশেষ সুবিধা ছিল। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এই সব বিশেষ সুবিধা আকস্মিকভাবে লোপ করা হয় নাই বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে হ্রাস করার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় (৩৩৬ ধারা, ১ উপধারা)। সংবিধান অনুযায়ী, চাকুরিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসর পরে লোপ পাইবে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই বিধান কার্যকর হইয়াছে।

কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য ভারতীয় সংবিধানে কয়েকটি বিশেষ ধারা বিধিবদ্ধ হয়। ৩৩১ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যে, কেন্দ্রে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে লোকসভায় দুই জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারেন। ৩৩৩ ধারা অনুযায়ী স্থির হয় যে কোনও রাজ্যপাল রাজ্যের আইন-সভায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বর্তমানে ভারতের লোকসভায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত এইরূপ দুই জন সদস্য আছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মনোনীত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যের সংখ্যা এখন ১০ জন। আর একটি আসন আপাততঃ শূন্য। তন্মধ্যে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিধানসভায় একজন করিয়া মনোনীত সদস্য আছেন। মহারাষ্ট্রের সদস্যপদটি বর্তমানে শূন্য। পশ্চিম বঙ্গ

বিধানসভায় মনোনীত সদস্যের সংখ্যা চার। সংবিধানের এই সব বিশেষ বিধান প্রথমে দশ বৎসরের জন্য চালু করা হয়; বর্তমানে এগুলির কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার পূর্বে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় শিক্ষার জন্য যে সব বিশেষ সরকারি সাহায্য পাইতেন, স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও সেগুলি সাময়িকভাবে রক্ষিত হয়। ৩৩৭ ধারা অনুযায়ী স্থির হয় এই সব বিশেষ সাহায্য তিন বৎসর অন্তর শতকরা দশ ভাগ করিয়া হ্রাস করা হইবে। কিন্তু কার্যকালে সেইরূপ করা হয় নাই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলরূপে পরিচিত ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রদত্ত বিশেষ সাহায্য পূর্ববৎ বজায় রহিয়াছে। অবশ্য এই সব বিদ্যালয়ে ৪০% আসন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় -বহির্ভূত ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত না রাখিলে কোনও সরকারি সাহায্য দান করা হইবে না, তাহা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। এই সব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অপেক্ষা অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতে পর্তুগীজদের পদার্পণের পর হইতেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। স্বীয় সাম্রাজ্যে পর্তুগীজ ও স্থানীয় জাতির মিলনে মিশ্রজাতির সৃষ্টি করা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যনীতির অন্যতম ভিত্তি ছিল। পরে ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ভারতে আগত বিভিন্ন ইওরোপীয় জাতির সৈনিক, বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা বিস্তার করেন। ১৮শ শতকে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে ইওরোপ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বিপদসংকুল, সময়সাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। তজ্জন্য এ দেশে ইওরোপীয় পুরুষের তুলনায় নারী অনেক কম আসিত এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক আমলাই এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিত। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক অনুরূপ একজন ইংরেজ ছিলেন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ প্রথমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে ও শিক্ষায় ইওরোপীয়দের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণেরও শিক্ষা ও চাকুরিতে সর্ববিধ অধিকার হরণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮শ শতকের শেষ কয় দশকে এই সামাজিক দমননীতির প্রয়োগ শুরু হয়।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আইন করা হয় যে, ক্যালকাটা আপার অর্ফ্যানেজ নামে পরিচিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদ্যালয়ের পিতৃহীন ও অনাথ ছাত্রগণ বিলাতে উচ্চশিক্ষালাভার্থে গমন করিতে পারিবে না। শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে কোম্পানির কাভেন্যান্টেড পদ হইতেও তাহারা বঞ্চিত হয়। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য ভারতীয়ের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটর্স সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পিতৃকুল বা মাতৃকুলের বিচারে কোনও ব্যক্তি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হইলে তাহাকে কোম্পানির সামরিক, অসামরিক বা জাহাজি বিভাগে কোনও চাকুরি দেওয়া হইবে না। ঐ বৎসর (১৭৯১ খ্রী) নভেম্বর মাসে এই বিধিনিষেধের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিয়া স্থির করা হয় যে ইওরোপ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী কোম্পানির জাহাজগুলিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাহাকেও অফিসারের চাকুরি দেওয়া হইবে না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল আইন করেন যে কোম্পানির ফৌজে বাদক, নিশানদার প্রভৃতি পদ ছাড়া উচ্চতর কোনও পদে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রার্থীর মাতা-পিতা উভয়েরই ইওরোপীয় হওয়া চাই।

এই সব পীড়নের ফলে ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তা, জরাজনৈতিক স্বাধীন চিন্তা, বাগ্মিতা ও সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটে। ইহার পূর্বে বা পরে এইরূপ বিকাশ আর ঘটে নাই। হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রী), জে. ডব্লু. রিকেট্স (১৭৯১-১৮৩৫ খ্রী) প্রভৃতির নেতৃত্বে সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় আপন অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে থাকে। তাহাদের আন্দোলন কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতীয়দের, বিশেষতঃ যুবকদের, মানবিক অধিকার সম্বন্ধে ডিরোজিও সচেতন করিয়া তোলেন এবং সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক আলোচনার রীতি-নীতিতে দীক্ষা দেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির প্রাক্তন সনদ (১৮১৩ খ্রী) রদ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নূতন সনদ দিবেন বলিয়া ইহারা তৎপূর্বে লণ্ডনে আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহাই ইতিহাসে 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া পিটিশন' নামে খ্যাত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ইহাদের সভা হয় এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বরে জে. ডব্লু. রিকেট্স অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে উপনীত হন। অ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ানদের আবেদন পার্লামেন্টে পৌঁছায় এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ রিকেট্‌সকে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হাউস অফ লর্ডসের সিলেক্ট কমিটিও তাঁহাকে জুন মাসের ২১ ও ২৪ তারিখে অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পর বৎসর (১৮৩১ খ্রী) মার্চ মাসে রিকেট্‌স ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ সময় ভারত হইতে আর একজন মাত্র ব্যক্তি বিলাতে গিয়া ভারতের দাবি-দাওয়া পার্লামেন্টের সমক্ষে পেশ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী)।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে ঘোষণা করা হয় যে, অতঃপর কোম্পানির চাকুরিতে জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে কাহারও নিয়োগে ভেদবিচার করা হইবে না। ভারতীয়দের পক্ষে এই ঘোষণা কার্যতঃ ফলপ্রদ হয় নাই। পরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ইহা হইতে অংশতঃ লাভবান হইতে থাকে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট ২৪, পাশ হইবার পর ভারতে দূরপ্রসারী টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে থাকে এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ টেলিগ্রাফ-বিভাগে চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান শুরু হইলে এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। ইহার ফলে ইংরেজরা আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সৈন্য চলাচল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। এই সময়ে টেলিগ্রাফ-বিভাগে নিযুক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা সরকারের বিশেষ উপকারে আসে। এই সহযোগিতার ফলে বিলাতী কর্তৃপক্ষ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্বেকার নীতি বর্জন করিয়া আপেক্ষিক সুবিধা দানের নীতি গ্রহণ করেন।

ভারতে প্রথম রেলপথের পত্তন ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হইলেও পরবর্তী দশক হইতেই ব্যাপকভাবে রেলপথ বিস্তারের কাজ শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ তখন রেল-বিভাগের বিভিন্ন চাকুরিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিয়োগ করিতে থাকেন। কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হইয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় পুলিশ এবং শুল্ক-বিভাগের চাকুরিতেও বিশেষ সুবিধা পাইতে থাকেন। বিশেষ ধরনের চাকুরিতে এই সব সুবিধা পাওয়ার ফলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আর্থিক স্বার্থ কিছুটা রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে বহুলাংশে উদ্যমহীন, সরকার-নির্ভর, নিম্নমধ্যবিত্ত এক বিশেষ গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। সরকারি পীড়ন ও উপেক্ষার সময় ১৯শ শতকের প্রথম অংশে তাহাদের মধ্যে প্রতিভার যে স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল, পরবর্তী যুগে আর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের (১৮৮৫ খ্রী) পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে আরও কাছে টানিবার চেষ্টা করেন। ১৯শ শতকের শেষ দিকে আইন করা হয়, বিলাত হইতে ভারতীয় চাকুরিতে নিযুক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ আইনতঃ ভারতীয় হইলেও চাকুরির নানা ব্যাপারে ইওরোপীয়দের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে।

বর্তমানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে উপার্জনশীল স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট। স্বীয় বৃত্তিতে তাহারা অনেকেই প্রচুর উদ্যম ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। রেল ও শুল্ক-বিভাগ ছাড়াও বর্তমানে ভারতের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নিযুক্ত আছে। পুলিশ ও দমকল বাহিনীতেও অনেকে কাজ করে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উপর একাধিক মূল্যবান নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়াছে। ১৯শ শতকের শেষ দশকে মাদ্রাজের সরকারি মিউজিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থার্সটন ও তাঁহার সহকারী রঙ্গচারী মাদ্রাজ শহর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায়, সেই সময়ে মাদ্রাজ শহরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ৬৯ প্রকার বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত। এই সকল বৃত্তির ১৭টি ছিল রেলওয়ে -সংক্রান্ত; ১৪টি বৃত্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর; ২৯টি ছিল দক্ষ অথবা অর্ধদক্ষ মজুরের এবং ৯টি ছিল সাধারণ অদক্ষ মজুরের। থার্সটনের তথ্যাদি হইতে আরও জানা যায় যে, সেই সময়ে মাদ্রাজ শহরে সাধারণভাবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরুষদের বিবাহের বয়স ছিল গড়-পড়তা ২৬-২৭ বৎসর এবং স্ত্রীলোকদের ১৯-২০ বৎসর। রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিবাহের গড় বয়স স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সাধারণ গড় হইতে এক বৎসর করিয়া কম ছিল। থার্সটন মালাবার অঞ্চলেও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিষয়ে গবেষণা করেন। কালিকট (কজিকোড) শহরে তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ১৮টি বৃত্তিতে নিযুক্ত দেখিতে পান। তন্মধ্যে ১১টি দক্ষ অথবা অর্ধদক্ষ শ্রমিকের এবং ৭টি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত (যথা কেরানি, গার্ড, দরখাস্ত-লেখক) শ্রেণীর।

দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ ও মালাবার প্রভৃতি সর্বত্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরুষদের শরীরে উল্কির বহুল প্রচলন থার্সটনকে বিস্মিত করিয়াছিল।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস কমিশনার উল্লেখ করেন যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইওরোপীয়দের তুলনায় কুষ্ঠ ও উন্মাদ -রোগের প্রাবল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। থার্স টন ও রঙ্গচারী তাঁহার এই মত সমর্থন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ফাইলেরিয়া রোগের প্রাবল্যও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনায় বেশি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শারীরিক নৃতত্ত্বের বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তাঁহার গবেষণার ফলাফল 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল অব্‌জার-ভেশন্‌স অন দি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌স অফ ক্যালকাটা' এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয় (প্রথম খণ্ড, এপ্রিল ১৯২২; দ্বিতীয় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৩১; তৃতীয় খণ্ড, মার্চ ১৯৪০)। দুইশত জন ব্যক্তির নিম্নোক্ত সাতটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে তিনি সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা করেন ও তাহার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন: ১. শারীরিক দৈর্ঘ্য ২. মস্তকের দৈর্ঘ্য ৩. মস্তকের প্রস্থ ৪. নাসার দৈর্ঘ্য ৫. নাসার প্রস্থ ৬. হনুর প্রসার ও ৭. মুখের দৈর্ঘ্য। অধ্যাপক মহলানবিশের গবেষণার ফল হইতে জানা যায় যে, শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে কলিকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের সহিত উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের সাধারণ সাদৃশ্য আছে।

দ্র *The Constitution of India*; *Pilot Survey of Anglo-Indian Community*, Calcutta, 1957-58; E. Thurston & K. Rangachari, *Castes and Tribes of Southern India*, vol. II, Madras, 1909; H. A. Stark, *Hostages to India or The Life-Story of the Anglo-Indian Race*, Calcutta, 1926.

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

অ্যাকুমুলেটর রাসায়নিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দুইটি সীসার পাতে লেড সালফেটের প্রলেপ দেওয়া থাকে এবং পাত দুইটি সালফিউরিক অ্যাসিডে নিমজ্জিত থাকে। পাত দুইটি অপরিবর্তী তড়িৎ-বাহী উৎসের সহিত যুক্ত করিলে ধনাত্মক পাত লেড পারঅক্সাইডে এবং ঋণাত্মক পাত ধাতব সীসায় পরিণত হয়। এখন যদি এই দুই পাত কোনও বর্তনীর (সার্কিট) সহিত যুক্ত করা হয় তাহা হইলে বিপরীত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দেখা দিবে এবং বর্তনীর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। অনেক সময়ে পটাশে নিমজ্জিত একটি নিকেলের ও একটি লোহার পাত দিয়াও অ্যাকুমুলেটর তৈয়ারি করা হয়।

যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চিত রাখিবার যন্ত্রবিশেষকে বলে হাইড্রলিক অ্যাকুমুলেটর। ইহাতে পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রে শক্তি সঞ্চিত করা হয় এবং সেই শক্তি লিফ্‌ট বা ক্রেন চালাইবার কার্যে ব্যবহৃত হয়।

অলক চক্রবর্তী

অ্যাজবেস্টস ইহা সহজে বিভাজ্য অথচ দীর্ঘ তন্তুযুক্ত খনিজ পদার্থ। অ্যাজবেস্টস দুই প্রকার: ১. জলযুক্ত ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট (হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট) বা ক্রাইসোটাইল অ্যাজবেস্টস, ২ জলযুক্ত লৌহ ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট বা অ্যাম্‌ফিবোল অ্যাজবেস্টস। সারপেনটিনাইট নামক একপ্রকার কৃষ্ণ-বর্ণ, গুরুভার, লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম -যুক্ত আগ্নেয়শিলায় ক্রাইসোটাইল অ্যাজবেস্টস পাওয়া যায়। অ্যাজবেস্টস শিলার মধ্যে শিরার ন্যায় সঞ্চিত থাকে। শিরার ভিতর অ্যাজবেস্টস তন্তুগুলি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে। অ্যাম্‌ফিবোল অ্যাজবেস্টস সিস্ট্‌ নামক একপ্রকার পরিবর্তিত শিলার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ইহার তন্তুগুলি শিরার সমান্তরাল ও দীর্ঘ হইলেও, ভঙ্গুর হওয়ার জন্য বয়নকার্যের অনুপযোগী। তন্তুর দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, টান সহ্য করিবার ক্ষমতা, তাপ ও বিদ্যুৎ -সহনক্ষমতা, অ্যাসিডে অদ্রবণীয়তা ও বয়নকার্যে উপযোগিতার উপর অ্যাজবেস্টসের উৎকর্ষ ও মূল্য নির্ভর করে।

অ্যাজবেস্টসের দীর্ঘ তন্তুগুলিকে পাকাইয়া এক আঁশ-যুক্ত কিংবা বহু আঁশযুক্ত সুতা প্রস্তুত করিয়া চাদর, দড়ি ও ফিতা তৈয়ারি হয়। অ্যাজবেস্টসের চাদর অগ্নি-নিবারক ও তাপনিরোধক। অ্যাসিডের ছাঁকনি হিসাবে ও বাষ্পের ভ্যালভের প্যাকিং হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে।

সিমেণ্ট ও অন্যান্য জমাট বাঁধিবার উপকরণের সহিত মিশ্রিত করিয়া হ্রস্বতন্তুবিশিষ্ট অ্যাজবেস্টস দ্বারা বোর্ড প্রস্তুত করা হয়। ইহা পাটা (প্যানেল), মুদ (সীলিং) ও পার্টিশন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চাহিদা অনুযায়ী ভারতের অ্যাজবেস্টস উৎপাদন খুবই কম। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১১০০০ টন অ্যাজ-বেস্টস ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উৎপন্ন হয় মাত্র ২০৮ টন। ভারতে প্রাপ্ত অ্যাজবেস্টস অধিকাংশই অ্যাম্‌ফিবোল জাতীয়। ইহার তন্তুর দৈর্ঘ্য যথেষ্ট। কিন্তু ভঙ্গুর হওয়ার ফলে বয়নকার্যে ইহা ব্যবহার করা যায় না। প্রধানতঃ

মহীশূরের বিভিন্ন অঞ্চলে (বৃহত্তম খনি হাসান জেলার হোল নরসিমপুরে) এবং উড়িষ্যার সেরাইকেলায় ইহা পাওয়া যায়। বয়নকার্যের উপযোগী ক্রাইসোটাইল অ্যাজবেস্টস মাদ্রাজে কুড্ডাপা জেলার পুলিভেণ্ডলা তালুকে পাওয়া যায়। এখানে অন্ততঃ ২৫০০০০ টন অ্যাজবেস্টস সঞ্চিত আছে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাটম পরমাণু দ্র

অ্যাটম বোমা পারমাণবিক বোমা দ্র

অ্যাট্‌মস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডল দ্র

অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর রিঅ্যাক্টর দ্র

অ্যাটর্নি-জেনারেল মহাব্যবহারদেশক। আইনবিষয়ক পরামর্শ ও কার্যাদি সম্পর্কে ইনি ভারত সরকারের প্রধান পদাধিকারী, ভারতীয় সংবিধানের ৭৬ ধারায় ইঁহার নিয়োগ ও কর্তব্যাদি নির্ধারিত করা আছে। ইনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী পদ অধিকার করিয়া থাকেন, অবশ্য এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হন। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ইঁহার পারিশ্রমিক রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

অ্যাটর্নি-জেনারেলের কার্য রাষ্ট্রপতির দ্বারা বা সংবিধান বা অন্য আইনবলে স্থিরীকৃত হয়। আইন-সংক্রান্ত কোন্ বিষয়ে ইনি পরামর্শ দিবেন বা কি কাজ করিবেন রাষ্ট্রপতিই তাহা স্থির করেন; তবে কার্যতঃ রাষ্ট্রপতি-প্রণীত নিয়মানুযায়ী ভারত সরকারই এইরূপ পরামর্শ চাহিতে পারেন বা আইন সংক্রান্ত কর্তব্য নির্দিষ্ট করেন। যখনই প্রয়োজন হয় ইনি সর্বোচ্চ আদালত বা উচ্চ আদালতে ভারত সরকারের পক্ষ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি কোনও ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের মতামত জানিতে চাহিলে এই ব্যাপারেও অ্যাটর্নি-জেনারেল ভারত সরকারের পক্ষে হাজির হন, এমন কি সংবিধানের অর্থ নির্ধারণ-সংক্রান্ত কোনও গুরুতর প্রশ্ন থাকিলে এবং উহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ জড়িত হইলে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে নোটিশ না দিয়া কোনও আদালত ঐ প্রশ্ন বিচার করিতে পারে না। কার্যব্যপদেশে ইনি ভারতের সমস্ত আদালতেই স্বীয় বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। ইনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বা পরামর্শ দিতে পারেন না। ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত ইনি ফৌজদারী মামলায় কোনও দোষী ব্যক্তির পক্ষ লইতে বা কোনও কোম্পানির ডিরেক্টর হইতেও পারেন না। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হইলেও অন্যত্র ইনি বেসরকারি ব্যক্তিদের পক্ষ গ্রহণ করিতে পারেন। ইনি সচরাচর নয়া দিল্লীতে বাস করেন। প্রয়োজন হইলে লোকসভায়, রাজ্যসভায় বা সংশ্লিষ্ট কোনও কমিটির সভ্য হইলে উহাতে ইনি ভাষণ দিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অনুরূপ পদাধিকারীর ব্যবস্থা আছে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। অ্যাটল্যান্টিকের মোট আয়তন প্রায় ১০.৫ কোটি বর্গ কিলোমিটার (৪.১ কোটি বর্গ মাইল)। ইহার গড় গভীরতা ৩৩০০ মিটার (১৮০০ ফ্যাদম)। পূর্বে ইওরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দ্বারা এই মহাসাগর পরিবেষ্টিত।

অ্যাটল্যান্টিকের তলদেশ দিয়া দুই উপকূলের প্রায় সমদূরবর্তী এবং মোটামুটি সমান্তরালভাবে মধ্য অ্যাটল্যান্টিক শৈলশিরা (মিড্ অ্যাটল্যান্টিক রিজ) উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই শৈলশিরাটি মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। সমুদ্রতল হইতে ইহা ১৮২৯ মিটার (১০০০ ফ্যাদম) উচ্চ। এই শৈলশিরা আজোর্স, সেন্ট পল, ট্রিস্টান ডা কুনহা, সান ডিয়েগো আলভারেজ ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ রচনা করিয়াছে। এই দ্বীপগুলিতে যথেষ্ট গ্র্যানিট জাতীয় প্রস্তরের অবস্থিতি ইহাদিগকে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে পৃথক করিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন যে অ্যাটল্যান্টিকের তলদেশে কয়েকটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন গ্র্যানিট জাতীয় প্রস্তরে আবৃত স্থান ইহার একটি বিশেষত্ব। মহাসাগরের মধ্য-পশ্চিম প্রান্তে আরও কয়েকটি শৈলশিরা সমুদ্রপৃষ্ঠে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে। অ্যাটল্যান্টিকের দুই দিকের উপকূল হইতে বিস্তৃত কয়েকটি জলমগ্ন শৈলশিরা ম্যাডেইরা, ক্যানারী, কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই শৈলশিরাগুলি সমুদ্রস্রোতকে কতকাংশে প্রভাবান্বিত করে।

পোর্টো রিকোর উত্তরে অবস্থিত ৮৭০০ মিটার (৪৭৫০ ফ্যাদম) গভীর ব্রাউনসন খাত এই মহাসমুদ্রে আবিষ্কৃত গভীরতম স্থান। অ্যাটল্যান্টিকের খাতগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় খাতগুলির তুলনায় অগভীর। এই খাতগুলি ব্যতীত সমুদ্রের তলদেশে কয়েকটি ৫৫০০ মিটারের

(৩০০০ ফ্যাদম) কম গভীর ডিম্বাকৃতি বেসিন রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নর্থ আমেরিকান বেসিন, কেপ ভার্ড বেসিন, ব্রাজিল বেসিন, আর্জেন্টিনা বেসিন ও গিনি বেসিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অ্যাটল্যান্টিকের গড় লবণতা ৩৪·৬% হইতে ৩৫% এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশির গড় তাপমাত্রা ১৬·৯° সেন্টিগ্রেড। মহীসোপানের (কন্টিনেন্ট্যাল শেল্‌ফ) উপর দিকে নীলাভ কর্দম এবং গভীরতর প্রদেশে গ্লোবিজারিনা সিন্ধুমল (ooze) পাওয়া যায়। মধ্য অ্যাটল্যান্টিক শৈলশিরার স্থানে স্থানে টেরোপড (ptero-pod) সিন্ধুমল এবং খাতগুলির মধ্যে রক্তাভ কর্দম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তরমুখী বেঙ্গুয়েলা স্রোত আয়নবায়ুর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। ইহার এক শাখা ব্রাজিল স্রোত নামে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়া দক্ষিণে ঘুরিয়া যায়। অন্য শাখা ক্যারিবিয়ান ও মেক্সিকো উপসাগর ঘুরিয়া ফ্লোরিডা প্রণালী দিয়া গাল্‌ফ স্ট্রীম (উপসাগরীয় স্রোত) নামে উত্তর-পূর্বে চলিয়া যায়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণে ল্যাব্রাডর স্রোতের সহিত মিলিত হইবার পর ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশ গাল্‌ফ স্ট্রীম ড্রিফট নামে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে প্রবেশ করে। অপরাংশ পর্তুগাল ও পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল দিয়া ঘুরিয়া নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যভাগে বিখ্যাত স্রোতহীন সারগ্যাসো বা শৈবাল সাগরের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্র F. P. Shepard, *Submarine Geology*, New York, 1948; H. V. Sverdrup, H. W. Johnson & R H. Fleming, *The Oceans*, New Jersey, 1942; A. Defant, *Physical Oceanography*, vols. I & II, 1961.

অভিজিৎ গুপ্ত

অ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ দ্র

অ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতামূলক দৌড়, ঝাঁপ, লম্ফন, বর্শা ও গোলক নিক্ষেপ ইত্যাদি। দেহ গঠনে ও সুস্বাস্থ্য অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞানে গ্রীকেরা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে স্বদেশে ব্যায়াম অনুশীলন পরিকল্পনায় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছিল। সেই দৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করিয়া ও প্রেরণা পাইয়া এ কালেও দেশে দেশে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে নিয়মিত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক কালে অপেশাদার ও পেশাদার উভয়বিধ সম্প্রদায়ভুক্ত ক্রীড়াবিদ্‌ বা অ্যাথলিটদের যোগদানের সূত্রে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। তবে অনাবিল আনন্দ উপভোগের সহজ উপকরণ হিসাবে অপেশাদারী অ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা বেশি এবং সেই হিসাবে ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠান।

একসময় অ্যাথলেটিকচর্চা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে মহিলা-মহলেও ইহার প্রসার ঘটে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার-দামের ওলিম্পিক আসরে সর্বপ্রথম মহিলা অ্যাথলিটদের উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়।

ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক ক্রীড়াসূচীতে পুরুষদের জন্য বর্তমানে চব্বিশটি প্রতিযোগিতা (১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০, ১৫০০, ৫০০০ ও ১০০০০ মিটার দৌড়, ম্যারাথন দৌড়, ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ, ১১০ ও ৪০০ মিটার হার্ডল, হাই জাম্প, পোল ভল্ট, ব্রড জাম্প, হপ-স্টেপ জাম্প, শটপুট, ডিসকাস, বর্শা ও হ্যামার নিক্ষেপ, ডেকাথলন, ৪ × ১০০ মিটার ও ৪ × ৪০০ মিটার রিলে দৌড়, ২০ কিলোমিটার ও ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ) এবং মহিলাদের জন্য মোট দশটি প্রতিযোগিতা (১০০, ২০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডল, ৪ × ১০০ মিটার রিলে দৌড়, হাই জাম্প, ব্রড জাম্প, শটপুট, ডিসকাস ও বর্শা নিক্ষেপ) বিভাগীয় অনুষ্ঠানরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, আধুনিক কালে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় পুরুষবিভাগে আমেরিকার এবং মহিলা-বিভাগে রুশ প্রতিনিধিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ভারত-শ্রেষ্ঠ মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলিট। রোম ওলিম্পিকে তিনি ৪৫·৬ সেকেণ্ডে নির্ধারিত প্রতিযোগিতার পথ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছেন।

অ্যাথলেটিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্ববিশ্রুত অনেক অ্যাথলিটের ক্রীড়াকৃতির স্বর্ণ-স্বাক্ষর পড়িয়াছে। যে চারি জন ক্রীড়াবিদ্‌ ওলিম্পিকের এক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে চারিটি করিয়া স্বর্ণপদক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এখানে তাঁহাদের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে। এই চারি জন হইলেন আমেরিকার আল্‌ভিন ক্রেনজ্‌লিন (১৯০০ খ্রী), ফিনল্যাণ্ডের পাভো নুরমি (১৯২৪ খ্রী), আমেরিকার নিগ্রো প্রতিনিধি জেসি ওয়েন্স

অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

(১৯৩২ খ্রী) এবং নেদারল্যাণ্ডের শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (১৯৪৮ খ্রী)।

ভারতীয় অ্যাথলিটরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য তৎপূর্বে ভারতীয়-রূপে বর্ণিত নর্ম্যান প্রিচার্ড নামক জনৈক অ্যাথলিট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ওলিম্পিকে ২০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার হার্ডল দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, এইরূপ শোনা যায়। তবে সে সময়ে ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই বলিয়া নর্ম্যান প্রিচার্ডকে ভারতের সরকারি প্রতিনিধিরূপে গণ্য করায় অসুবিধা আছে।

যুগধর্মের প্রভাবে অ্যাথলেটিকের মানও উন্নয়নমুখী। একালে প্রায় নিত্যনিয়মিতই পুরাতন রেকর্ডের পরিবর্তে নূতন নজির গড়িয়া উঠিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়টি নিদর্শন ক্রমোন্নতির দিকচিহ্নরূপে স্বীকৃত, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দশ সেকেণ্ডে শত মিটার দৌড়, চার মিনিটের কমে এক মাইল দৌড়, হাই জাম্পে পুরুষবিভাগে সাত ফুট ও মহিলাবিভাগে ছয় ফুট এবং পোল ভল্টে ষোল ফুট উর্ধ্বারোহণ, ব্রড জাম্পে সাতাশ ফুট অতিক্রম এবং ২০০ ফুটের সীমানা অতিক্রম করিয়া ডিসকাস নিক্ষেপ।

দশ সেকেণ্ডে শত মিটার দৌড়াইবার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম অর্জন করেন জার্মানীর আর্মিন হ্যারি (১৯৬০ খ্রী); এক মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা ভাঙিয়াছেন সর্বপ্রথম ব্রিটেনের রজার ব্যানিস্টার (১৯৫৪ খ্রী); হাই জাম্পে সর্বপ্রথম সাত ফুট উর্ধ্বে উঠিয়াছেন নিগ্রো চার্লস ডুমাস (১৯৫৬ খ্রী) এবং মহিলা বিভাগে ছয় ফুটের উপরে প্রথম উঠিয়াছেন রুমানিয়ার ইওলাণ্ডা বালাস (১৯৬০ খ্রী); পোল ভল্টে ষোল ফুট উর্ধ্বারোহণ করিয়াছেন সর্বপ্রথম আমেরিকার জন উল্‌সেস (১৯৬২ খ্রী); ব্রড জাম্পে সাতাশ ফুট অতিক্রম করিয়াছেন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ্‌ রাল্‌ফ বস্টন (১৯৬১ খ্রী) এবং ২০০ ফুটের ওপারে ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়াছেন সর্বপ্রথম আমেরিকার আল্‌ফ ওর্টার (১৯৬২ খ্রী)।

অজয় বসু

অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ-বিভাগ। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন ভারতে এই বিজ্ঞান অনুশীলনের যে সুযোগ আছে, অন্য কোনও দেশে সেরূপ সুযোগ দুর্লভ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতের নানা জাতি-উপজাতি ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া বহু বৈজ্ঞানিক এককভাবে গবেষণা করিতে থাকেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি প্রাণীতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ-বিভাগে নৃতত্ত্বের জন্য এক শাখা খোলা হয়, বিরজাশংকর গুহকে ঐ শাখার ভার দেওয়া হয়। মহেঞ্জো-দড়ো তখন আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেখানে উদ্ধার করা নরকঙ্কাল লইয়া প্রথম কাজ আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে দুইটি রিপোর্ট ১৯৩১ ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তক্ষশিলায় লব্ধ নর-কঙ্কালের বিবরণ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারের সময় ব্যাপকভাবে ভারতের জাতিতত্ত্ব লইয়া অনুসন্ধান চলে এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরজাশংকর গুহ সে বিষয়ে স্বীয় বিবরণী প্রকাশ করেন। জীবতত্ত্ব পর্যবেক্ষণে থাকাকালীন তিন জন নৃতত্ত্ববিদ্‌ উপরি-উক্ত কাজে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

যে বীজ এইভাবে উপ্ত হইল, তাহাই ক্রমে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণের আকারে এক স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হইল। বারাণসীতে প্রথম অফিস স্থাপিত হয় এবং তখন অধিকর্তাকে (ডিরেক্টর) লইয়া ১৮ জন গবেষক ও ৪ জন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। পর্যবেক্ষণের কাজ উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে এবং বিভিন্ন প্রদেশে শাখা গবেষণাগার স্থাপিত হয়। আন্দামানে ১৯৫১, আসামে ১৯৫৩, মধ্য প্রদেশে ১৯৫৫ ও দক্ষিণ ভারতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাখা স্থাপিত হয়। পোর্ট ব্লেয়ার, শিলং, নাগপুর ও মহীশূর হইতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। মূল অফিস কলিকাতায় অবস্থিত; সেখান হইতে ভারতের সর্বত্র গবেষণা বা গবেষণাপরিদর্শনের কাজ চালিত হয়। উপস্থিত (১৯৬৪ খ্রী), শাখাগুলিসহ মূল অফিসে সর্বসমেত ৮৯ জন নানা স্তরের বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন। তদ্ভিন্ন অল্পদিনের মেয়াদে উপস্থিত ১২ জন গবেষক কাজ করিতেছেন; কখনও ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২০ পর্যন্ত উঠে, কখনও বা কমিয়া যায়।

নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণের মৌলিক কাজ হইল ভারতের মানুষ, তাহাদের জাতি, দেহের গঠন, সমাজ, সমাজের পরিবর্তন, বিভিন্ন কৌমের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উপজাতিদের ভাষা, প্রাচীন কালের ভারতে অধিবাসীগণের দেহের গঠন ও বিবর্তন প্রভৃতি লইয়া গবেষণা করা। যাহাতে সমগ্র ভারতে মানুষের দেহ ও সামাজিক সংস্কারাদির বিষয়ে সর্বতোভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষকগণ বিশেষভাবে অবহিত থাকেন।

নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন কালে কি ধরনের গবেষণা

অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিমলা পাহাড়ের নিকটে জৌনসর-বাওয়ারে সামাজিক পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হয়। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে আদি-জাতির বিষয়ে ('আদি' দ্র) নানা দিক দিয়া গবেষণা চলে। ১৯৪৮-৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরে কয়েকটি আরণ্য জাতির দেহতত্ত্ব এবং সামাজিক বন্ধন ও সংস্কার বিষয়েও অনুসন্ধান করা হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপজাতির খাদ্য এবং মানসিক লক্ষণাদি বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণা করানো হয়। বাংলা দেশের এক অংশে ছেলেদের অস্থি বছরের পর বছর কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এই বিষয়ে এক্স-রের সাহায্যে পরীক্ষার এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সূচনা হয়। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লিডিও সিপ্রিয়ানি নামক এক ইটালীয় বৈজ্ঞানিককে আন্দামান দ্বীপের ওঙ্গি জাতির বিষয়ে গবেষণার ভার দেওয়া হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিরজাশংকর গুহ অবসর গ্রহণ করিবার পর অধিকর্তা নিযুক্ত হন নবেন্দু দত্ত মজুমদার। তাহার কিছু পূর্ব হইতেই আসামে খাসিয়াদের বিভিন্ন শাখার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছিল। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার রিয়াঙ্গ জাতির চাষ-আবাদ ও সমাজগঠন লইয়া ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা চলিতে থাকে। নবেন্দু দত্ত মজুমদার পূর্বতন সকল কর্মসূচী বজায় রাখেন। উপরন্তু চামোলি জেলায় ত্রিশূল শিখরের নিকটে অবস্থিত রূপকুণ্ড নামক স্থানে অনেক নরকঙ্কালের সন্ধান পাইয়া সে বিষয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেন।

আরও একটি নূতন কাজের মধ্যে নাগপুর শাখার অধীনে বস্তার জেলায় গবেষণা আরম্ভ হয়। উদ্দেশ্য, বিভিন্ন উপজাতি ও হিন্দু জাতি কিভাবে পরস্পরের সহিত সামাজিক ও আর্থিক বন্ধনে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, তাহা আবিষ্কার করা। ইহার ফলে জাতিভেদপ্রথা ও বর্ণ-ব্যবস্থার বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়। নাগপুরের কর্মীগণ, বিশেষতঃ সুরজিৎ সিংহ, মানভূম জেলায় অনু-সন্ধানের ফলে আবিষ্কার করেন, কিভাবে আরণ্য উপজাতি-বৃন্দ ক্রমে হিন্দুসমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত হইয়াছে। ফলে, হিন্দুসমাজের গড়ন সম্বন্ধেও নূতন আলোকপাত হয়।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলকুমার বসু অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হন। পূর্বের গবেষকগণ যে সকল গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তাহা মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখিয়া নূতন কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানে উৎখনিত নরকঙ্কালগুলির নূতন পরিমাপ করিয়া এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সর্বভারতের ৩২২টি জেলায় মানুষ কিভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, গ্রাম বাঁধে, কি রকম পোশাক পরে, তাহাদের লাঙল, তেলের ঘানি, গোরুর গাড়ি, পূজা-পার্বণাদি কি রকম - এ বিষয়ে প্রায় কুড়ি জন বিভিন্ন ভাষাভাষী গবেষক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। প্রাথমিক রিপোর্ট ইংরেজীতে প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহাই চিত্রসহ 'ভারতের গ্রামজীবন' নামে প্রকাশ করেন।

এতদ্ভিন্ন কয়েকজন গবেষক সর্বভারতে কুমোরের শিল্প লইয়া এবং কাঁসা, পিতল প্রভৃতির ঢালাই-পদ্ধতি লইয়াও সূক্ষ্ম সন্ধান করিতেছেন। উক্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, ভারতের কোন্ অঞ্চলের সহিত কোন্ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেশি অথবা কম।

বর্ণব্যবস্থা লইয়াও সর্বভারতে অনুরূপ গবেষণা চলিতেছে। উড়িষ্যার জাতিগত পঞ্চায়েত বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ, কেরল, মহীশূর ও মাদ্রাজের রিপোর্টও অনেকদূর লেখা হইয়াছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারের সময়ে বিরজাশংকর গুহ ভারতীয়দের শারীর লক্ষণ লইয়া যে গবেষণা করেন, নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণের পরবর্তী কালে কেহ বিহারে, কেহ আসামে বা দক্ষিণ ভারতে তাহার অনুসরণ করেন। রক্তের বিশ্লেষণ, হাত বা আঙুলের ছাপ লইয়াও নূতন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান চলিতে থাকে।

উপরন্তু সর্বভারতের মোটামুটি দেহগঠনের লক্ষণ কিরূপ তাহার বিষয়ে, কিঞ্চিৎ স্থূল ধরনের হইলেও, ব্যাপক অনু-সন্ধান আরম্ভ করা হয়। উদ্দেশ্য হইল, ৩২২টি জেলার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের দেহ পরিমাপ করিয়া সর্ব-ভারতের একটি নৃতাত্ত্বিক চিত্র তৈয়ারি করিতে হইবে। আজ পর্যন্ত যত গবেষণা হইয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর ভারতের বিষয়েই অধিক তথ্য জমা হইয়াছে, মধ্য বা দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কম। আবার হয়ত, উপজাতিবৃন্দের সম্বন্ধে কিছু জানা আছে, হিন্দু-মুসলমানদের দৈহিক গঠন সম্পর্কে তত জানা নাই। এইজন্য ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সুচিন্তিত উদ্দেশ্য লইয়া পরিমাপের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ ও মহীশূরে এ কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যায় ইহা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। অবশিষ্ট ভারতবর্ষে মাপ লইবার পর নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ-বিভাগ জাতিতত্ত্ব বিষয়ে নূতনভাবে কিছু বলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

নৃতত্ত্ব-পর্যবেক্ষণের কাজ মৌলিক গবেষণা করা এবং

এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। এই জ্ঞানের প্রয়োগ যথাকালে হইবে। এখনই দেখা যাইতেছে, ভারতীয় সমাজ নানা প্রদেশে অসমানভাবে পরিবর্তিত হইতেছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মিলে পরিবর্তনের ধারাকে অভিলষিত পথে পরিচালিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন। নূতন জগতে নূতন জীবনের উপযোগী করিয়া ভারতের প্রাচীন সমাজকে পরিবর্তিত করার ব্যাপারে এরূপ জ্ঞান বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

নির্মলকুমার বসু

অ্যানাটমি শারীর সংস্থান দ্র

অ্যানার্কিজম নৈরাজ্যবাদ দ্র

অ্যানি বেসাণ্ট (১৮৪৭-১৯৩৩ খ্রী) ইংরেজ মহিলা, থিওসফিস্ট। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর লণ্ডনে জন্ম। পিতার নাম উইলিয়াম পেজ উড্। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজক ফ্রাঙ্ক বেসাণ্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর নিকট হইতে পৃথক হইয়া যান। ১৮৭৪ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চার্লস ব্র্যাড্ল-র সহায়তায় অ্যানি বেসাণ্ট খ্রীষ্টান ধর্মমতের প্রতি অবিশ্বাস প্রচার করিতে থাকেন। সংবাদপত্রে তিনি অ্যাজাক্স ছদ্মনামে লিখিতেন। বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্র্যাড্ল-র সহিত তাঁহার মতান্তরের সূত্রপাত হয় এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে থিওসফি আন্দোলনে যোগদান করিলে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। মাদাম ব্লাভাৎস্কির অনুরাগী শিষ্য হইয়া অ্যানি বেসাণ্ট ভারতবর্ষে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল (১৯৩৩ খ্রী) পর্যন্ত থিওসফির উন্নতি ও প্রচারে শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া তিনি সমিতি ও সমিতির পত্রিকা 'দি থিওসফিস্ট'-এর কার্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেন। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৮ খ্রী)।

প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎসাহী হইলেও অ্যানি বেসাণ্ট ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'কমন-উঈল' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ উদারনীতিক দলের মুখপত্র 'সিটিজেন' প্রকাশিত হইলে কমন-উঈলের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ম্যাড্রাস স্ট্যাণ্ডার্ড' নামক দৈনিক পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া তিনি উহা 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে প্রকাশ করেন। ভারতের রাজনীতি -সংক্রান্ত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অনেক প্রবন্ধ তদানীন্তন ভারত সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহার নিকট দুই হাজার টাকা জামানত চাওয়া হয়। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের সরকারও তাঁহাদের এলাকায় পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষ যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের (হোম রুল) অধিকার লাভ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে বক্তৃতা এবং পুস্তিকা প্রচারে রত হন এবং পরে হোম রুল লীগ নামে রাজনীতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' উক্ত দলের প্রচারপত্র হইয়া উঠে।

সভা-সমিতির বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধ দ্বারা এই লীগের আদর্শ প্রচার ও ভারতীয় জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের প্রেরণা দিবার জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং যেরূপ বাগ্মিতা, নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন, তাহার জন্য ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

তাঁহার কার্যকলাপ সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় দুই জন সহকর্মীসহ তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্তরীন হন। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। অ্যানি বেসাণ্ট ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হন। কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়া তিনি ইহার বাৎসরিক অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, তাহা ছিল তদানীন্তন সরকারের দমনমূলক কার্যের কঠোর সমালোচনা। তবে গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। সেই কারণে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তিনি ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশনে যোগদান করেন। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কমনওয়েল্‌থ অফ ইণ্ডিয়া বিল' নামে আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহাতে ভারতবাসীকে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অধিকার দিবার প্রস্তাব ছিল। ব্রিটিশ শ্রমিকদল বিলটি সমর্থন করিয়া প্রথম দফা আলোচনার জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করে কিন্তু দ্বিতীয় দফা আলোচনা না হওয়ায় বিলটি বাতিল হয়। বেসাণ্টও এই সময়ে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে, জগতে শীঘ্রই এক নূতন অবতারের আবির্ভাব হইবে। মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ তাঁহার দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বেসাণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। তাহাদের মধ্যে জে.

অ্যানেস্‌থেসিয়া

কৃষ্ণমূর্তিই যে এই ভাবী অবতার, বেসান্ট ইহা প্রচার করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া বেসান্ট আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি কৃষ্ণমূর্তির পিতার সহিত মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টে পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত আপিলে প্রিভি কাউন্সিলে জয়লাভ করেন।

অ্যানি বেসান্ট হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। বেশভূষা ও আহারাদি ব্যাপারেও তিনি হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ভারতীয় জনসাধারণের চিত্তে তাঁহাকে একটি বিশেষ স্থান দিয়াছে। বেসান্টের রচনাবলীর মধ্যে 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', 'দি রিলিজাস প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্র Annie Besant, *An Autobiography*, London, 1893; Sri Prakasa, *Annie Besant*, Bombay, 1954.

অ্যানেস্‌থেসিয়া অবেদন। স্নায়ুমণ্ডলীর স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করিয়া কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিপ্রবাহের গতি সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করাই অ্যানেস্‌থেসিওলজি বা অবেদনবিদ্যার লক্ষ্য। বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে বিষক্রিয়ার ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা-প্রবাহের অনুভূতিশক্তি সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হইলে উহাকে স্নায়ুশাখার অবেদন (লোক্যাল অ্যানেস্‌থেসিয়া) বলে। একই প্রক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রের উপর বিস্তারিত হইয়া অচেতন অবস্থা আনয়ন করিলে উহাকে স্নায়ু-কেন্দ্রের অবেদন (জেনারেল অ্যানেস্‌থেসিয়া) বলে। স্নায়ুশাখার অবেদন সচরাচর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়: ১. চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি স্থানের ঝিল্লীতে কোকেন-জাতীয় তরল ঔষধ লেপন করিয়া, ২. নভোকেন ইন্‌জেকশন দিয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুশাখা অবশ করিয়া, ৩. মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ডের বেষ্টনীগুলির মধ্যে (সাব-অ্যার্যাক্‌নয়েড স্পেস) অথবা বেষ্টনীগুলির বাহিরে (এপিডিউর‍্যাল স্পেস) ঔষধ প্রয়োগ করিয়া। শেষোক্ত পদ্ধতিকে স্পাইনাল অ্যানেস্‌থেসিয়া বা মেরুদণ্ডস্থানের অবেদন বলে। নিওপার্কেন জাতীয় ঔষধের সাহায্যে সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বহির্গামী স্নায়ুশাখাসমূহকে ইচ্ছানুরূপ সংখ্যায় অবরুদ্ধ করা যায়।

স্নায়ুকেন্দ্রের অবেদন এইরূপ পদ্ধতিতে সাধিত হয়: ১. ক্লোরোফর্ম, ঈথর, ট্রাইলিন, ফ্লুওথেন প্রভৃতি তরল ঔষধ বাষ্পীভূত হইয়া প্রশ্বাসবায়ুর সহিত ফুসফুসে নীত হয়। সেখানে উহা রক্তের সহিত স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। ২. নাইট্রাস অক্সাইড, সাইক্লোপ্রোপেন প্রভৃতি বায়বীয় ঔষধ (গ্যাস) সরাসরি প্রশ্বাসবায়ুর সঙ্গে ফুসফুসে যায় এবং রক্তবাহিত হইয়া স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া উহাকে প্রভাবিত করে। ৩ পেণ্টোথ্যাল সোডিয়াম, ইনট্রাভ্যাল সোডিয়াম প্রভৃতি কঠিন (সলিড) ঔষধ পরিস্রুত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। উহা রক্তের সহিত সোজা স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়া কাজ করে। প্রয়োজন হইলে অ্যানেস্‌থেসিয়া প্রয়োগের কালে অনেক সময়ে দেহের উত্তাপ অথবা রক্তের চাপ কমানো হয়।

স্নায়ুকেন্দ্রের অবেদনকারক ঔষধগুলি রক্তের সঙ্গে স্নায়ুকেন্দ্রে আসিয়া উহার সূক্ষ্ম কার্যকরিতা (যথা চিন্তা-শক্তি, বেদনাবোধ ইত্যাদি) ব্যাহত করে। তবে মৌলিক জীবনরক্ষার প্রয়োজনে স্নায়ুকেন্দ্র যে সকল কার্য করে সেগুলি অব্যাহত থাকে। অক্সিজেন না পাইলে স্নায়ুতন্ত্র কার্যক্ষম থাকে না। অবেদনকারক ঔষধ হয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিমাণমত অক্সিজেন যাইতেই দেয় না, নয়ত স্নায়ুতন্ত্রকে এরূপভাবে অবসন্ন করিয়া দেয় যে উহা পরিমাণমত অক্সিজেন লইতে পারে না। অবেদন প্রয়োগ বন্ধ করিলে অবেদনকারক ঔষধ স্নায়ুমণ্ডলী হইতে রক্তের সঙ্গে ফুসফুসে আসে এবং নিশ্বাসবায়ুর সহিত বাহির হইয়া যায়। কতক ক্ষেত্রে যকৃৎ-ও ঔষধের বিষক্রিয়া নষ্ট করে। অতঃপর স্নায়ুমণ্ডলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। বিভিন্ন অবেদনকারক ঔষধ মানসিক ক্রিয়া, অনুভূতিক্রিয়া, মাংসপেশীর আকুঞ্চনক্রিয়া এবং রিফ্লেক্স (প্রতিবর্ত) -ক্রিয়া রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখে। অস্ত্রো-পচারের সময় বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ে যাহাতে এই সবকয়টি কাজই পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

ঔষধ প্রয়োগের সময় রোগীর সহনশীলতা বিচার করা প্রয়োজন। ঔষধের কোনও প্রতিকূল ক্রিয়া দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। যে সব অস্ত্রোপচারে দীর্ঘ সময় লাগে অথবা অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ হয়, সেই সব ক্ষেত্রে রোগীর দেহে অপরের রক্ত বা লবণজল প্রবিষ্ট করানোর ব্যবস্থা করিতে হয়। অস্ত্রোপচারকালে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি এবং পুনরুজ্জীবিত করার পদ্ধতির জ্ঞান থাকাও একান্ত প্রয়োজন। অবেদন প্রয়োগের সময়ে কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্য গৃহীত হয়। যথা, অ্যানেস্‌থেটিক মেশিন, আয়রন

লাংস ও পাল্‌মোক্লেটার। হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময়ে উহার স্পন্দন সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া যন্ত্রের (এক্সট্রা-কর্পোরিয়াল সার্ক্যুলেশন) সাহায্যে দেহের রক্তসঞ্চালন অব্যাহত রাখা হয়।

হরিগোপাল বরাট

অ্যান্টিবায়োটিক্‌স জীবাণুর, সাধারণতঃ ছত্রাকের, দেহনিঃসৃত যে জৈব পদার্থ অন্য জীবাণুকে বিনষ্ট অথবা উহার বৃদ্ধি রোধ করে, তাহাকে অ্যান্টিবায়োটিক্‌স বলা হয়। বিভিন্ন জীবাণুর উপর অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটাকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োসিস। বিভিন্ন রকমের জীবাণুর উপর প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে যে ১৫ রকমের অ্যান্টিবায়োটিক্‌স প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের মধ্যে ব্যাসিট্রাসিন, কার্বোমাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন, পেনিসিলিন এবং টাইরোথ্রাইসিন, গ্র্যাম-পজিটিভ ব্যাক্‌টিরিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কার্যকরী। ক্লোরোমাইসেটিন (রাসায়নিক নাম ক্লোর‍্যামফেনিকল), নিওমাইসিন, পলিমিক্সিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন এবং এই সম্পর্কিত অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন এবং ভায়োমাইসিন, গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম-নেগেটিভ উভয়বিধ ব্যাক্‌টিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী। সাইক্লোহেক্সিমাইড (অ্যাক্‌টিডিয়োন) ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদকে আক্রমণ করে এবং ফিউমাজিলিন অ্যামিবা ধ্বংসে বিশেষ কার্যকরী। এতদ্ব্যতীত চারশতাধিক এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্বল্পজ্ঞাত অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের খবর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিষক্রিয়া এবং অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে সেগুলি উৎপাদিত হয় নাই। ভাইরাস, টিউমার, ছত্রাক কর্তৃক উৎপাদিত রোগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ অ্যান্টিবায়োটিক্‌স উৎপাদনের জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর অ্যান্টিবায়োটিক্‌স উৎপাদনের জন্য পৃথিবীব্যাপী বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাপানই ছিল সর্বাধিক অ্যান্টিবায়োটিক্‌স উৎপাদনকারী দেশ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু দেশেই অ্যান্টিবায়োটিক্‌স উৎপাদনের জন্য এক বা একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে ভারতেও অ্যান্টিবায়োটিক্‌স উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। একমাত্র ক্লোরোমাইসেটিন (যাহা একটি সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ) ব্যতীত ব্যবসায়ভিত্তিক অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক্‌স 'ফারমেণ্টেশন' বা গাঁজন-প্রক্রিয়ায় স্ট্রেপ্‌টোমাইসেস গ্রেসিয়াস, পেনিসিলিয়াম নোটাটাম প্রভৃতি বিভিন্ন ছত্রাকজাতীয় জীবাণু হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক্‌সই মনুষ্য ও পশ্বাদির রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্বাদির খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক্‌স মিশ্রিত করিবার ফলে হাঁস, মুরগী, শূকরছানা ও গো-বৎসাদির ১০ হইতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। উদ্ভিদ-রোগ নিরাময় এবং হাঁস-মুরগীর কাঁচা মাংস সংরক্ষণের জন্যও অ্যান্টিবায়োটিক্‌স ব্যবহৃত হয়। ফল-মূল, শাক-সবজি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির পচননিবারণের জন্যও ইহা কার্যকরী হইতে পারে।

দেখা যাইতেছে যে পূর্বাবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের বিরুদ্ধে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর প্রতিরোধশক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য অধিকতর শক্তিশালী নূতন নূতন পদার্থ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

দ্র H. W. Florey, E. Chain, N. G. Heatley, M. A. Jennings, A. G. Saunders, E. P. Abraham & M. E. Florey, *Antibiotics*, vols. I & II, Oxford, 1949; L. A. Underkofler & R. J. Hickey, ed., *Industrial Fermentations*, vols. I & II, New York, 1954.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অ্যান্টিমনি ধাতুবৎ পদার্থ। অ্যান্টিমনি ও সালফার -ঘটিত যৌগিক অ্যান্টিমনি সালফাইড প্রাচীন ভারতীয়েরা কাজলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিতেন। পাঞ্জাবের ঝিলম অঞ্চলে এই আকরিক পাওয়া যায়। চরকসংহিতায় ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কেবল তাহাই নহে, এই আকরিকের সহিত ঢালাই লোহার টুকরা মিশাইয়া তাপ দিয়া ভারতীয়েরা অ্যান্টিমনি নামক ধাতুবৎ মৌলিক পদার্থ নিষ্কাশন করিতেন। সোমদেব -সংকলিত রসেন্দ্রচূড়ামণি গ্রন্থে এই প্রণালী বর্ণিত আছে। বিস্ময়ের বিষয় যে এখনও এইভাবে অ্যান্টিমনি প্রস্তুত করা হয়। সোমদেব অ্যান্টিমনিকে ভাল জাতের সীসা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ধর্ম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহা সহজে গলে এবং ইহার রং ফিকা কালো।

অ্যান্টিমনি সালফাইডের কালো অঞ্জন ভ্রূ-প্রসাধন

হিসাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচ্যদেশের মহিলারা ইহার ব্যবহার করিতেন, গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। মিশরীয় এবং আরবীয়রাও ইহার চূর্ণ ব্যবহার করিত। মুসলমানদের মধ্যে আজিও সুর্মারূপে ইহার প্রচলন আছে। জবীর ইহার কথা বলিয়াছেন। জবীরের রচনার লাতিন অনুবাদে ইহাকে অ্যান্টিমোনিয়াম বলা হইয়াছে। অথচ তখন অ্যান্টিমনি সালফাইড আকরিক 'স্টিবনাইট' বলিয়া বেশি পরিচিত ছিল। ইংরেজীতে ধাতুবৎ মৌলিক পদার্থটি অ্যান্টিমনি নামে অভিহিত হইল, লাতিন শব্দ স্টিবিয়াম হইতে ইহার সংকেত সংক্ষেপ করা হইল।

অ্যান্টিমনির গলনাঙ্ক ৬২৯° সেন্টিগ্রেড। ধাতুর মত ইহার জলুস আছে, কিন্তু ইহা ধাতুর মত শক্ত নহে। ইহাকে পিটিয়া কাগজের মত পাতলা করা যায় না বা টানিয়া তারের মত সরু করা যায় না। ইহা ঘাতসহ নহে, পিটিলে চূর্ণ হইয়া যায়। ধাতুর মত ইহা তাপ-পরিবাহী নহে। তাই ইহাকে ধাতু না বলিয়া ধাতুবৎ পদার্থ বলা হয়।

তরল অ্যান্টিমনি শীতল হইলে কঠিন অ্যান্টিমনি খণ্ডের চারিধার বেশ স্পষ্ট তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ঢালাই লোহার মত তরল অ্যান্টিমনির আয়তন অপেক্ষা কঠিন অ্যান্টিমনির আয়তন সামান্য বড়। কঠিনীকৃত ঢালাই লোহার মত ইহার ছাঁচও স্পষ্ট উঠে। অ্যান্টিমনির এই ধর্ম ইহার অ্যালয় বা মিশ্র ধাতুতেও দেখা যায়। তাই অ্যান্টিমনির অ্যালয় ছাপাখানার হরফ গড়িতে ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি অ্যান্টিমনি অ্যালয় নিম্নের তালিকায় উল্লিখিত হইল :

নাম	শতকরা উপাদান	ব্যবহার
ব্যাবিট ধাতু	টিন ৯০, অ্যান্টি ৭, তামা ৩	ঘর্ষণ সহিবার বেয়ারিং
ব্যাটারি প্লেট	সীসা ৯৪, অ্যান্টি ৬	তড়িৎ ব্যাটারি
হোয়াইট ধাতু	টিন ৮২, অ্যান্টি ১২, তামা ৬	বেয়ারিং
টাইপ ধাতু	সীসা ৮২, অ্যান্টি ১৫, টিন ৩	ছাপাখানার হরফ
পিউটার	টিন ৮৫, তামা ৬·৮, বিসমাথ ৬, অ্যান্টি ১·৭	থালা, পানপাত্র ইত্যাদি

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন হইতে ছাত্রদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বাংলা সরকারের সেক্রেটারি কার্লাইল ১০ অক্টোবরে এক দমনমূলক সার্কুলার জারি করেন। ছাত্রদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, বয়কট বা পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ, এমন কি, বন্দেমাতরম্ উচ্চারণও নিষিদ্ধ হইল। এই অপমানকর সার্কুলারের পালটা জবাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর কলিকাতা গোলদীঘির এক প্রকাশ্য সভায় অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

এই সোসাইটির কর্মসূচী ছিল কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করিয়া পিকেটিং ও অর্থসংগ্রহ, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় ভাবধারার প্রচার, বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আন্দোলন এবং বাড়ি বাড়ি স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় ও স্বদেশী প্রচার। বস্তুতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সম্প্রসারণে এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি সেই যুগে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

দ্র যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাঞ্ছিতের সম্মান, কলিকাতা, ১৯০৬; Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom*, Calcutta, 1958.

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

অ্যান্টিসেপ্‌টিক বীজবারক। ব্যাক্‌টিরিয়া অর্থাৎ জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধকারী বিভিন্ন রকমের কতকগুলি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থকে অ্যান্টিসেপ্‌টিক বলা হয়। জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য চিকিৎসকেরা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ও কেমোথেরাপিউটিক পদার্থগুলিকে অ্যান্টিবায়োটিক্‌স, সালফোন্যামাইড্‌স, অর্গ্যানিক আর্সেনিক্যাল ড্রাগ্‌স প্রভৃতি পৃথক পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ বা বহির্দেশের সংক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কতকগুলিকে খাওয়ানো বা ইন্‌জেকশন করা হয় আবার কতকগুলিকে স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করা চলে।

মনুষ্যদেহে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যৌক্তিকতা বিবেচনা করিয়া জোসেফ লিস্টার (পরে লর্ড লিস্টার) সর্বপ্রথম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন। জীবন্ত ব্যাক্‌টিরিয়া বা গাঁজলা (ঈস্ট) যে গাঁজন বা পচনের কারণ, লুই পাস্তুরের (১৮২২-৯৫ খ্রী) এই পরীক্ষা হইতে, বহিরাগত আক্রমণকারী জীবাণু এবং আক্রান্ত দেহতন্তুর মধ্যস্থলে জীবাণু প্রতিরোধক কোনও রকমের বাধা সৃষ্টির কথা লিস্টারের মনে উদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে

ক্ষতস্থানের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন শক্তির কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল ব্যবহার করেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তিনি হাসপাতালে জীবাণু-আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে সক্ষম হন।

অ্যান্টিসেপ্‌টিকের কার্যকরিতা নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহার গাঢ়তার মাত্রা, তাপ এবং সময়ের উপর। সর্বাপেক্ষা কত কম গাঢ়তায় জিনিসটি অ্যান্টিসেপ্‌টিক হিসাবে কার্যকরী হইবে, তাহা জানা দরকার। নির্দিষ্ট একটি মাত্রা অপেক্ষা বেশি লঘু করিলে ফেনলের মত কতকগুলি অ্যান্টিসেপ্‌টিকের ক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ প্রতিষেধ-ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়; অথচ পারদঘটিত মিশ্রণ অতি উচ্চমাত্রায় লঘু করিলেও তাহার দ্বারা ব্যাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত করা যায়। কোনও একটি অ্যান্টিসেপ্‌টিকের পক্ষে কার্যকরী হইয়া উঠিতে কতটা সময় লাগিবে, তাহা কতকটা প্রতিষেধক পদার্থটির গাঢ়তার মাত্রার উপর নির্ভর করে; তাহা ছাড়া বিভিন্ন অ্যান্টিসেপ্‌টিকের পার্থক্য অনুযায়ী তাহাদের দ্বারা জীবাণু ধ্বংস হইবার ব্যাপারেও সময়ের যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন, হ্যালোজেন শ্রেণীর পদার্থগুলি (আয়োডিন, ক্লোরিন প্রভৃতি) পারদঘটিত অ্যান্টিসেপ্‌টিক অপেক্ষা দ্রুততর কাজ করিয়া থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ অ্যান্টিসেপ্‌টিকই দ্রুততর গতিতে ক্রিয়াশীল হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আলকাতরা হইতে উৎপন্ন অ্যান্টিসেপ্‌টিকের কথা বলা যাইতে পারে। এই পদার্থগুলির ক্রিয়ার গতি ঠাণ্ডা ঘর অপেক্ষা শরীরের তাপমাত্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। আবার হাইপোক্লোরাইট্‌স প্রভৃতি কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় অস্থায়ী অবস্থায় উপনীত হয়।

অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করিতে হইলে অধিকতর গাঢ় অ্যান্টিসেপ্‌টিক ব্যবহার করা যাইতে পারে। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু কোনও ক্ষত বা গাত্রচর্মকে জীবাণু-মুক্ত করিতে হইলে জৈব পদার্থের সংস্পর্শে ইহা কতটা নিষ্ক্রিয় হইবে, কার্যকরী ক্ষমতা কতক্ষণ বলবৎ থাকে, কতটা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে নির্বীজন-ক্ষমতা কতটা, প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— ২% আয়োডিন এবং ৭০% ইথাইল অ্যালকোহল প্রভৃতি কতকগুলি অ্যান্টিসেপ্‌টিক ইন্‌জেকশন বা অস্ত্রোপচারের পূর্বে দেহ-চর্মের উপর প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। সাধারণ ক্ষত এবং অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষতের জীবাণু ধ্বংস করিবার পক্ষে অ্যান্টিসেপ্‌টিক রঞ্জক-পদার্থ ফ্লেভিন্‌ প্রভৃতি খুবই ফলপ্রদ। তবে একটা কথা হইতেছে এই যে, কোনও উন্মুক্ত ক্ষতের গভীরে জীবাণু-সংক্রমণ ঘটিলে এই সকল অ্যান্টিসেপ্‌টিক ব্যবহারে তেমন কোনও সুফল লাভ হয় না, অধিকন্তু ক্ষতস্থানে নূতন তন্তুকোষ এবং ফ্যাগো-সাইটগুলিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া শরীরের স্বাভাবিক প্রতি-রোধশক্তি ব্যাহত করে এবং কোষগুলির পুনর্গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবে পেনিসিলিন, সালফোন্যামাইড জাতীয় জৈব পদার্থগুলি সহজেই পরিব্যাপ্ত হইতে পারে এবং জীবন্ত তন্তুর উপর ইহাদের কোনও বিষক্রিয়া নাই বলিয়াই জীবাণুধ্বংসে অথবা জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধে এগুলি আশ্চর্য সুফল প্রদর্শন করে।

সাধারণতঃ যে সকল অ্যান্টিসেপ্‌টিক ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে প্রধানতঃ নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. অ্যাসিড ও অ্যালকালি (অম্ল ও ক্ষার -জাতীয় পদার্থ) — এই জাতীয় পদার্থগুলি অ্যান্টিসেপ্‌টিক হিসাবে বিশেষ কার্যকরী নহে এবং তন্তুকোষের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। তবে বহুকাল হইতে ক্ষতস্থান ড্রেস করিবার জন্য ব্যবহৃত অ্যাসেটিক অ্যাসিড (ভিনিগার) সম্ভবতঃ একটি ব্যতিক্রম। ২. সাবান এবং বিস্রাবণ (ডিটারজেন্ট) — পরিষ্করণের কাজে সাবান ব্যবহৃত হয় এবং ইহার জীবাণুনাশক ক্ষমতাও আছে। সাবান-জলে ধৌত করিলে দেহচর্ম এবং অন্যান্য পদার্থের উপরিভাগের জীবাণু বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অ্যানায়নিক ও ক্যাটায়নিক— এই দুই রকমের বিস্রাবণ বা ডিটারজেন্ট আছে। অ্যানায়নিক শ্রেণীর ডিটারজেন্টগুলিই অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকাংশ জীবাণু, বিশেষ করিয়া পাইয়োজেনিক কক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া থাকে। দেহচর্মের উপর ইহাদের বিষক্রিয়া নাই বলিলেই চলে, তবে স্বল্পসংখ্যক লোক ইহাতে স্পর্শকাতরতা অনুভব করে। ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্টগুলি ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংসের সহিত পরিষ্করণের কাজও করিয়া থাকে। তবে একটি অসুবিধা এই যে, সাবানের সংস্পর্শে এইগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং জৈব পদার্থের দ্বারাও আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। ৩ জারক পদার্থ (অক্সিডাইজিং এজেন্ট)— এই শ্রেণীর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড প্রভৃতি ন্যাসেন্ট অক্সিজেন মুক্ত করিবার ফলে জীবাণুর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধান অসুবিধা হইল, এইগুলি জৈব পদার্থের সংস্পর্শে বিশেষ-ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এই কারণে এবং লঘু দ্রবণে অস্থায়িত্বের জন্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড অ্যান্টিসেপ্‌টিক

হিসাবে তেমন কার্যকরী নহে। ৪. হ্যালোজেন গ্রুপ—হ্যালোজেন শ্রেণীর মধ্যে ক্লোরিন ও আয়োডিন অ্যান্টিসেপ্টিক হিসাবে খুবই কার্যকরী এবং জৈব পদার্থের অনুপস্থিতিতে খুব বেশি লঘু দ্রবণরূপেও ব্যবহার করা চলে। হাইপোক্লোরাইটের বিভিন্ন মিশ্রণও অ্যান্টিসেপ্টিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরিন মুক্ত হইয়া তাহাই অক্সিডাইজিং এজেন্ট অর্থাৎ জারক পদার্থরূপে কাজ করিয়া থাকে। এইগুলিও জৈব পদার্থের দ্বারা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। জীবন্ত তন্তুর উপর যদিও আয়োডিনের বিষক্রিয়া আছে তথাপি ৭০% ইথাইল অ্যালকোহলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেহচর্মের উপর প্রয়োগ করিলে উহা শক্তিশালী বীজবারক হিসাবে কাজ করে। অ্যান্টিসেপ্টিকরূপে ক্ষত স্থানে আয়োডোফর্মও ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু ইহার কার্যকরিতা নাই। ৫. ভারি ধাতব পদার্থ—পারদ, রৌপ্য, তাম্র ও দস্তার লবণ অ্যান্টিসেপ্টিক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পারদের সাধারণ লবণ ক্ষতস্থানে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী নহে। জীবাণুধ্বংসের জন্য গাঢ় দ্রবণরূপে ব্যবহার করিলে ইহা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু লঘু দ্রবণ জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে মাত্র। ৬. ইথাইল অ্যালকোহল—জলের সহিত ৭০% গাঢ়ত্বে ব্যবহার করিলে ইথাইল অ্যালকোহল গাত্রচর্মের পক্ষে উৎকৃষ্ট অ্যান্টিসেপ্টিক। মেথিলেটেড স্পিরিটে ৯০% হইতে ৯৫% অ্যালকোহল থাকে, ইহাকে ৭০%-এ লঘু করিলে কার্যকরী হইয়া থাকে। ৭. আলকাতরার উপজাত পদার্থ— বিষক্রিয়া ও কার্যকরী শক্তিতে পৃথক অনেক রকমের অ্যান্টিসেপ্টিক এই জাতীয় পদার্থের শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ফেনল অথবা কার্বলিক অ্যাসিড সর্বাপেক্ষা কম কার্যকরী এবং দেহতন্তুর পক্ষে অতিমাত্রায় বিষাক্ত। ক্রেসল্স্ (যেমন লাইসল) অতি সামান্য মাত্রায় জলে দ্রবণীয়; কাজেই সাবানে দ্রবীভূত করা হয়। ফেনল অপেক্ষা ইহার কিছু বেশি জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা আছে এবং ইহার বিষক্রিয়াও কিছুটা কম। তেল অথবা গঁদের মধ্যে দ্রবীভূত ক্রেসলজাতীয় পদার্থ জীবাণুদুষ্ট পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিন-মিশ্রিত জাইলেনল একটি কার্যকরী জীবাণুধ্বংসী পদার্থ। বিষক্রিয়া খুব কম হইলেও জৈব পদার্থের দ্বারা ইহা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ৮. রঞ্জক পদার্থ—অ্যানিলিন রঞ্জক পদার্থ, যেমন উজ্জ্বল সবুজ জেনসিয়ান ও ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট মন্থর গতিতে ক্রিয়াশীল অ্যান্টিসেপ্টিক; এইগুলি তন্তুর অনেক ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহারা বিভিন্ন রকমে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইহারা দেহতন্তুর উপর বিষক্রিয়া করে।

অ্যাক্রিডাইন শ্রেণীর রঞ্জক-পদার্থগুলি (যেমন ফ্লেভিন্) পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদিত ক্ষত নির্বীজনে মন্থর গতিতে ক্রিয়াশীল হইলেও খুবই কার্যকরী। ইহাদের বিষক্রিয়া প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং জৈব পদার্থের দ্বারাও খুব সামান্যই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। ৯. ফরম্যালিন (ফরম্যালডিহাইড ৪০%)— রোগীর ঘর এবং আসবাবপত্র নির্বীজনের উদ্দেশ্যে বায়বীয় অবস্থায় সালফার ডাইঅক্সাইড এবং ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। অবশ্য কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র ইত্যাদি উত্তাপপ্রয়োগেও জীবাণুশূন্য করা যাইতে পারে। সালফার ডাইঅক্সাইড ফরম্যালিনের মত কার্যকরী নহে। ক্লোরিন গ্যাসের সংস্পর্শে অনেক জিনিসই বিবর্ণ হইয়া যায়।

দূষিত বায়ু বিশুদ্ধীকরণে বাষ্পীয় অবস্থায় কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন— হাইপোক্লোরাইট, রিসোর্সিনল অথবা হেক্সিল-রিসোর্সিনল, গ্লাইকল, ল্যাকৃটিক অ্যাসিড দ্রবণ প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদের কার্যকরিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কিছু বলা যায় না।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশের একজন কবিওয়ালা। ইনি পর্তুগীজ। ব্যবসায়কর্ম উপলক্ষে ইঁহার পিতা এ দেশে আসিয়া ফরাসী-অধিকৃত ফরাসডাঙায় বসবাস করিতে থাকেন। অ্যান্টনির এক ভাই ছিলেন মিস্টার কেলি, তিনি কালুসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ব্যবসায়ের ভার এই দুই ভাইয়ের হাতে আসে। কিন্তু স্থানীয় এক ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ায় অ্যান্টনির আর ব্যবসায়ে মন রহিল না। কালুসাহেব ভ্রাতার অমনোযোগিতার সুযোগে যথেষ্ট লাভবান হইতে থাকেন। অন্য দিকে অ্যান্টনি প্রণয়িনীকে লইয়া ফরাসডাঙার নিকটস্থ গরিটির বাগানবাড়িতে দিনযাপন করেন।

অ্যান্টনির প্রণয়িনী কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই। ব্রত নিয়ম পূজা যথারীতি অ্যান্টনির বাড়িতে চলিতে থাকে। অ্যান্টনি নিজেই বরং স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়াও হিন্দু ধর্মে শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। তাঁহার গানেই সে পরিচয় আছে। ব্রাহ্মণীবধূর অভিপ্রায় অনুযায়ী অ্যান্টনি কলিকাতা বৌবাজারে 'ফিরিঙ্গি কালী' নামে পরিচিত কালীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অ্যান্টনির বাড়িতে কবিগাহনা হইত। ক্রমে তিনি নিজে কবিগানের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন এবং এক শখের দল গঠন করেন। অ্যান্টনি এত ভাল বাংলা শিখিয়াছিলেন

যে বাংলায় তিনি গানও রচনা করিতে পারিতেন। কবি-ওয়ালা গোরক্ষনাথ তাঁহার দলে প্রথমে বাঁধনদার ছিলেন। কবিগানে তিনি এত মত্ত হইয়া পড়েন যে পৈতৃক অর্থ সব তাহাতে ব্যয়িত হইয়া যায়। অর্থাভাবে পরে তাঁহার দলকে পেশাদারী করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার যথার্থ অর্থাগম হইতে থাকে।

যাঁহাদের সহিত অ্যাণ্টুনির লড়াই হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ঠাকুর সিংহ, ভোলা ময়রা এবং রাম বসুর দল উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর সিংহের দলে যখন রাম বসু গান বাঁধিতেন, সেই সময় একবার অ্যাণ্টুনির সহিত তাঁহার লড়াই হয়। তাহাতে রাম বসুর আক্রমণের উত্তরে অ্যাণ্টুনি বলেন : 'এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি / হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।' আর একবার দুর্গোৎসবের সময় অ্যাণ্টুনি শখের দল লইয়া চুঁচুড়ায় গিয়াছেন, গোরক্ষনাথ তখন তাঁহার বাঁধনদার। কিন্তু গোরক্ষনাথ হঠাৎ বলেন যে পূজার আগে সারা বছরের মাহিনা মিটাইয়া না দিলে তিনি গান দিবেন না। ইহাতে গোরক্ষনাথকে বাদ দিয়াই অ্যাণ্টুনি গান বাঁধিলেন : 'আমি ভজন সাধন জানিনে মা, নিজে ত ফিরিঙ্গি / যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিবে মাতঙ্গী।'

১২৪৩ বঙ্গাব্দে অ্যাণ্টুনির মৃত্যু হয়।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৯০৪ ; ব্রজসুন্দর সান্যাল, 'কবিওয়ালা (৫)', নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ; Sushil Kumar De, *History of Bengali Literature in the 19th Century*, Calcutta, 1963.

ভবতোষ দত্ত

অ্যাণ্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র (১৮৭১-১৯৪০ খ্রী) জন্ম ইংল্যাণ্ডের 'নিউক্যাস্‌ল-অন-টাইন'-এ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি। পিতা জন এডুইন অ্যাণ্ড্রুজ ও মাতা মেরি শার্লটের বহু সন্তানের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটির পেমব্রোক কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র হন। ভেদবুদ্ধিহীন জনসেবা ও ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা— তাঁহার জীবনের এই দুই প্রধান সাধনার সূত্রপাত এইখানে। ডিগ্রিলাভের পর কিছুকাল ধর্মযাজকের কাজ এবং পরে কেম্‌ব্রিজের ফেলো হিসাবে অধ্যাপনার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ মিশনের সহায়তায় ভারতে আসেন। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের প্রভাবে তিনি ভারত সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও রচনায় ভারতপক্ষ সমর্থন এবং খ্রীষ্টান সমাজের ধর্মে-কর্মে নানা অসাম্য ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা ক্রমশঃ তাঁহাকে আপন সমাজে অপ্রিয় ও সর্বভারতে খ্যাতিমান করিয়া তোলে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠ-সভায় তাঁহার সাক্ষাৎলাভের মুহূর্ত হইতে অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হন। ভারতে ফিরিয়া ধর্মবিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের ফলে অবশেষে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে যোগাযোগের সেতু (দ্বিজেন্দ্রনাথ্ ঠাকুরের ভাষায় 'হাইফেন')। পৃথিবীর যেখানেই দুঃস্থ অত্যাচারিত জনসমাজের সংবাদ পাইয়াছেন সেখানেই তিনি ছুটিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম-তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ফিজিদ্বীপে ভারতীয় শ্রমিক 'ইনডেনচার' প্রথার উৎসাদন, রাজপুতানায় 'বেগার' প্রথা ও হংকং-এ ভারত হইতে বেআইনি আফিম রপ্তানির বিরোধিতা, ভারতের রেলওয়ে ধর্মঘটে মধ্যস্থতা, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ স্বীকার প্রভৃতি। গান্ধীজীর কর্মজীবনের অনেক সংকটে তাঁহার সহযোগিতা, রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণের সময়ে কয়েকবার তাঁহার সহচর হিসাবে ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কখনও কখনও শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ— তাঁহার স্মরণীয় কাজ। ধর্মভাবের অসাধারণ স্ফুরণের জন্য তাঁহার শেষজীবনে খ্রীষ্টান সমাজ আবার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক সংগতির প্রতি নিরাসক্তি, আর্ত ও অত্যাচারিতের প্রতি কারুণ্য, নিম্নতম সমাজে ভালবাসার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা, ভেদবুদ্ধির প্রকাশ দেখিলেই নির্ভীক সংগ্রাম, ইংরেজ শাসকমহলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও মনীষার সাহায্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতের আনুকূল্য-সাধন— ইত্যাদি কারণে অ্যাণ্ড্রুজ 'দীনবন্ধু' নামে আখ্যাত হন। তাঁহার প্রকাশিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'দি রেনেসাঁস ইন ইণ্ডিয়া', 'হোয়াট আই য়ো টু ক্রাইস্ট', 'দি ট ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল কলিকাতার এক হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুনীলচন্দ্র সরকার

অ্যাণ্ড্রোমিডা আমাদের ছায়াপথরূপী নক্ষত্রজগতের বাহিরে, আপাতদৃষ্টিতে অ্যাণ্ড্রোমিডা-মণ্ডলের মধ্যে

অবস্থানকারী, অপর একটি নক্ষত্রজগতের নাম অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা। খালি চোখে ইহাকে মনে হয় একটি অস্পষ্ট আলোর অবলেপ। কিন্তু দূরবীক্ষণে গৃহীত চিত্রের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আনুমানিক ১০০০০ কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি এই নীহারিকা। দশম শতাব্দীতে অল্‌ সুফী ইহার বিষয়ে জানিতেন। তবে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন মারিয়াসই প্রথম ইহাকে দূরবীক্ষণে দেখিতে পান। চার্লস মেসিয়ার -রচিত মহাকাশের মেঘরূপী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তালিকায় ইহার নম্বর ৩১। সেইজন্য এই নীহারিকা 'এম-৩১' নামেও পরিচিত।

অ্যাণ্ড্রোমিডা প্রায় ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। বিপুল কুণ্ডলাকৃতি এই ছায়াপথটি স্বীয় কক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান। অধিকাংশ নক্ষত্রজগৎই আমাদের ছায়াপথরূপী নক্ষত্রজগৎ হইতে দূরে অপসরমাণ। কিন্তু অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা সেরূপ নহে। ইহার চতুর্দিকে লাল নক্ষত্ররাজির জ্যোতির্বলয় এবং কুণ্ডলাকার বাহুগুলিতে উজ্জ্বল নীলাভ নক্ষত্র দেখা যায়। এই নীহারিকা হইতে রেডিও-তরঙ্গ বিকিরিত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অ্যাম্‌হার্স্ট, উইলিয়াম পিট (১৭৭৩-১৮৫৭ খ্রী) ভারতের গভর্নর-জেনারেল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট কলিকাতায় আসেন। তাঁহার পূর্ববর্তী শাসক হেস্টিংসের আমলে (১৭৭২ ৭৩-১৭৮৫ খ্রী) ভারতের অধিকাংশ স্থানে ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রহ্ম দেশ, আসাম প্রভৃতি স্থান তখনও পর্যন্ত স্বাধীন। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্ম দেশের সহিত রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। সাইম্‌স, কক্স, ক্যানিং প্রভৃতি ইংরেজ ব্রহ্ম দেশে প্রেরিত হন কিন্তু তাঁহাদের আগমন ব্রহ্মবাসীরা বিশেষ সুনজরে দেখে নাই। অবশেষে বাংলা দেশের নিকটবর্তী স্থানসমূহ ব্রহ্ম দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি অ্যাম্‌হার্স্ট উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরেজরা রেঙ্গুন, মার্তাবান ও প্রোম অধিকার করিয়া লয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্দাবুর সন্ধির দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলে আরাকান, টেনাসেরিম, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তীয়া ও মণিপুর প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারে আসে। ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও সম্মত হন। তাঁহার সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভরতপুর অধিকার করেন (জানুয়ারি, ১৮২৬ খ্রী) এবং দুর্জন সালকে সরাইয়া বলবন্ত সিংকে রাজপদে বসান। গভর্নর-জেনারেল হিসাবে অ্যামহার্স্ট-ই প্রথম সিমলাতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন (১৮২৭ খ্রী)। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ তিনি ভারত ত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

অ্যামিবা অতি ক্ষুদ্র এককোষী জীব। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাদের দেখা যায় না। জলজ উদ্ভিদপূর্ণ নালা-ডোবা প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয় অথবা সমুদ্রের তলদেশে এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে ইহাদের স্বচ্ছ এক বিন্দু শ্লেষ্মার মত দেখায়। ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই— অনবরত বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করে। চলিবার সময়ে শরীরের যে কোনও স্থান হইতে শুঁড়ের মত এক বা একাধিক উপাঙ্গ বাহির করিয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে এক-একটা শুঁড়ের আবার শাখা-প্রশাখা বহির্গত হয় এবং এক-একটা শুঁড় ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া মূল শরীরে পরিণত হয়। এই শুঁড়গুলিকে বলা হয় সিউডোপোডিয়া। বিভিন্ন প্রজাতির অ্যামিবা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অ্যামিবা-জাইগাস সর্বাধিক বৃহৎ আকৃতির হইয়া থাকে। ইহাদিগকে খালি চোখেও অতি ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাবিন্দুর মত দেখা যায়। অ্যামিবা-হিস্টোলিটিকা নামে এক প্রজাতির অ্যামিবা মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে।

অ্যামিবার খাদ্যসংগ্রহের রীতিও অদ্ভুত। অতি সূক্ষ্ম জলজ জীবাণু-উদ্ভিদই ইহাদের খাদ্য। চলিবার সময় কোনও খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা সম্পূর্ণ শরীরটা বা শরীরের যে কোনও অংশ শুঁড়ের আকারে বাড়াইয়া দিয়া খাদ্যবস্তুকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলে এবং শরীরের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লয়। পুষ্টিলাভ করিয়া বড় হইবার পর শরীরের খানিকটা অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া ছোট বড় দুইটি মূল অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই-ভাবেই অ্যামিবা বংশবিস্তার করিয়া থাকে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অ্যাম্বুলেন্স আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার স্থানে লইবার জন্য যানবাহন। সেনাবাহিনীর সহিত ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালকেও অ্যাম্বুলেন্স বলা হয়। অ্যাম্বুলেন্স যানবাহনে এবং কর্মীদের ইউনিফর্মে ক্রস চিহ্ন সেবাধর্মের প্রতীক। ইহা থাকে বলিয়া শত্রু-মিত্র কেহই ইহাদের আঘাত করে না এবং ইহারা শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সকলেরই সেবা করে। অ্যাম্বুলেন্সের কাজ

প্রথমতঃ আরম্ভ হয় সামরিক প্রয়োজনে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে যখন ইওরোপের খ্রীষ্টান নরপতিরা খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তিস্থান জেরুজালেম রক্ষার জন্য ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন খুব সীমাবদ্ধভাবে আহত ও পীড়িতদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণকার্যের সূচনা হয়। পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রচেষ্টায় এই কার্যের আরও কিছু সম্প্রসারণ হয়।

কিন্তু উন্নত ও সুষ্ঠু উপায়ে অ্যাম্বুলেন্সের কার্য পরিচালনা আরম্ভ হয় আরও পরে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ জুন ইটালীর উত্তর প্রদেশে অবস্থিত সলফেরিনো গ্রামে সম্রাট্ ভিক্টর ইম্যানুয়েলের (দ্বিতীয়) অধীনে সার্ডিনিয়া-বাহিনী ও সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসী বাহিনী সম্মিলিতভাবে অষ্ট্রিয়া-সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর সহিত এক প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামে হতাহত বহু সহস্র সৈন্যকে নির্মমভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। পরদিন ২৫ জুন প্রভাতে জীন্ হেনরি ডুনাণ্ট নামক একজন সুইডিশ বণিক হঠাৎ কার্যোপলক্ষে ঐ স্থানে গিয়া আহত সৈনিকদের এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে তাহাদিগকে নিকটবর্তী চার্চে ও অন্যান্য গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে বহু আহতের প্রাণ রক্ষা পায়।

ইহার পর অনেক আন্দোলন করিবার পর ডুনাণ্ট ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জেনিভা শহরে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে সক্ষম হন। এই প্রতিষ্ঠানই পরে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই সময় হইতে আহত ও পীড়িতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নিকটবর্তী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার আধুনিক প্রথার সূচনা হয়।

ক্রমশঃ অ্যাম্বুলেন্সের কার্য অসামরিক জনগণের সাহায্যার্থে বিস্তার লাভ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান বা মেলাজাতীয় জনসমাগমে বর্তমানে এই কাজ সাধারণের উপকারার্থে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে জনসাধারণের উপকারার্থে অ্যাম্বুলেন্সের কাজ প্রথম আরম্ভ হয় বোম্বাই শহরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সালে সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বোম্বাই শহরে দুইটি ব্রিগেড গঠিত হয়। একটি পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া, অপরটি প্রধানতঃ সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের লইয়া গঠিত হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদিগকে পীড়িত এবং আহতদের আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুরূপ দুইটি সংস্থা গঠিত হয় এবং অতি সত্বর ইহার প্রসার ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলিকাতায় বেঙ্গলী অ্যাম্বুলেন্স কোর্ নামে একটি অ্যাম্বুলেন্স-সংস্থা গঠিত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে প্রেরিত হইলে তাহারা সেখানে যথেষ্ট সুনামের সহিত কার্য নির্বাহ করে।

ইহার পর বাংলা দেশে অতি দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সের প্রসার ঘটে। বহু বিদ্যালয়, বিভিন্ন সংস্থা, রেলকর্মীসংঘ, পুলিশ-বাহিনী এবং বিভিন্ন সমিতিতে অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড গঠিত হয়। এক-এক করিয়া ভারতের সকল প্রদেশেই অ্যাম্বুলেন্স প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। সমগ্র ভারতে সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা এখন প্রায় তিন হাজার। ইহারা সকলেই অবৈতনিক।

অ্যাম্বুলেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান কাজ হইল আপৎকালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা এবং তৎপরে পীড়িত ও আহতদের নিকটবর্তী শুশ্রূষালয়ে লইয়া যাওয়া। এই কাজের জন্য তাহাদিগকে বহন করিবার রীতি-নীতি ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে পীড়িতকে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে তাহার কোনও ক্ষতি না হয়।

সর্বপ্রথম যখন ভারতে অ্যাম্বুলেন্স প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তখন ইহা লণ্ডন শহরের সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের প্রধান কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত একটি শাখা ছিল। তৎকালে অ্যাম্বুলেন্সের যে সকল স্বেচ্ছাসেবক অনেক বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেন, তাঁহাদের যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের পদক দান করিয়া সম্মানিত করা হইত। যাঁহারা দশ বৎসর একাদিক্রমে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য নির্বাহ করিতেন, তাঁহাদের 'লং সার্ভিস মেডাল' (দীর্ঘ কর্মের পদক) দেওয়া হইত। ইহার পরও যোগ্যতা অনুযায়ী 'সার্ভিং ব্রাদার' (কর্মী-ভ্রাতা), 'অফিসার ব্রাদার' (পদস্থ ভ্রাতা), 'কম্যাণ্ডার ব্রাদার' (প্রধান ভ্রাতা) প্রভৃতি পদক দিয়া সম্মানিত করা হইত।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে লণ্ডনের প্রধান কার্যালয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হইয়াছে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক। বর্তমানে অ্যাম্বুলেন্সের কাজে বিশেষ দক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি অঙ্কিত সেবাপদক প্রদান করা হয়।

সম্প্রতি আমাদের দেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান

অ্যাম্বুলেন্সের কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে 'রিলিফ ওয়েলফেয়ার অ্যাম্বুলেন্স কোর্' (R.W.A.C.) অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে কলিকাতায় যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার সহিত সেবাকার্য করিয়া যাইতেছে।

প্রবোধচন্দ্র রায়

অ্যারিস্টটল আরিস্তোতল দ্র

অ্যারিস্টোফেনিস আরিস্তোফানেস দ্র

অ্যালকালয়েড ক্ষার শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ অ্যালকালি। উদ্ভিদ হইতে কতকগুলি পদার্থ পাওয়া যায় যাহাদের রাসায়নিক গুণ অনেকাংশে ক্ষারের রাসায়নিক গুণের মত। এইগুলি সবই কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন -ঘটিত পদার্থ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইহাদের অণুতে অক্সিজেনও সংযুক্ত আছে। ইংরেজীতে ইহাদের অ্যালকালয়েড বলে ; আমরা বলি উপক্ষার।

অ্যাট্রোপিন, স্ট্রিক্নিন, কোকেন, কুইনিন, মর্ফিন প্রভৃতি ভেষজগুলি আমাদের জানা, এইগুলি সবই অ্যালকালয়েড। ইহাদের মত সব অ্যালকালয়েডই উদ্ভিদ-জাত, স্বাদে তিক্ত, সবগুলির অণুর কাঠামো নাইট্রোজেনযুক্ত ; মাত্রাসংরক্ষণে ভেষজগুণসম্পন্ন, মাত্রাধিক্যে মারাত্মক।

গাছপালা হইতে প্রস্তুত ঔষধের ব্যবহার স্মরণাতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেদে গাছপালাজাত অনেক ভেষজের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অ্যালকালয়েড বা উপক্ষারপ্রসবিনী গাছের কথা বলা যাইতে পারে, যেমন—ভাঙ (লাতিন 'ক্যানাবিস্'), ইহাতে ট্রিগোনেলিন অ্যালকালয়েড আছে ; বিল্বতে আছে স্কিমিয়ানিন, তিল্বকে (লোধ্র বা লাতিন 'সিম্প্লকস্') আছে হার্মান আর এরণ্ডতে (লাতিন 'রিসিনস্') রিসিনিন। বৈদিকোত্তর যুগে কৌটিল্য উপক্ষারপ্রসবিনী অনেক গাছের উপর বিদেশে রপ্তানিকালে শুল্ক ধার্য করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন দারুহরিদ্রা (কালেয়ক, লাতিন 'বার্বেরিস'), ইহাতে বার্বেরিন উপক্ষার আছে। এই উপক্ষারের ভেষজগুণের জন্য দারুহরিদ্রাসত্ব বা রসাঞ্জন এত ফলপ্রদ বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আরও উল্লেখ আছে, কাকমাচী (লাতিন 'সোলানাম') ; ইহার উপক্ষার সোলানিন ; দাড়িম্ব, উপক্ষার পেলেটিয়ারিন ; লোধ্র ও বিষ (অ্যাকোনাইট)।

আফিমের অ্যালকালয়েড রাসায়নিক প্রণালীতে নিষ্কাশন করিয়াছিলেন ডেরোস্নে, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বোধ করি ইহাই অ্যালকালয়েড নিষ্কাশনের প্রথম উদাহরণ। ইহার দুই বৎসর পরে, ডেরোস্নে-র গবেষণার কথা অবগত না হইয়াও সারটুর্নের আফিমজাত অ্যালকালয়েড আবিষ্কার করেন ও নাম দেন মর্ফিয়াম ; ইহাকে এখন মর্ফিন বলা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পেলেটিয়ে ও কাভেণ্ট্ নাক্স ভোমিকা বা কুচিলার বীজ হইতে স্ট্রিক্নিন ও পরে ব্রুসিন অ্যালকালয়েড এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্কোনার ছাল হইতে কুইনিন নিষ্কাশন করিয়া যশস্বী হন।

অ্যালকালয়েড সংক্রান্ত রাসায়নিক গবেষণার গোড়ার দিকে কেবলমাত্র ঔষধের কাজে লাগাইবার জন্য গাছপালা হইতে অ্যালকালয়েড অনুসন্ধান ও আহরণের চেষ্টা চলে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজও গাছপালার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় কাজ চলিতেছে।

অ্যালকালয়েডের উপর গবেষণার বিভিন্ন দিক আছে। আবশ্যকীয় অ্যালকালয়েডের জন্য গাছের চাষ করা দরকার। কোন্ ঋতুতে অ্যালকালয়েডের পরিমাণ বেশি হয়, তাহা দেখা হয়। উপরন্তু যাহাতে গাছে বেশি পরিমাণে অ্যালকালয়েড জন্মাইতে পারে, তাহার জন্য জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া হয়। কুইনিন-প্রসবিনী সিন্কোনা গাছের আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকায়। চেষ্টা করিয়া সিন্কোনার চাষ করা হইয়াছে যবদ্বীপে, বঙ্গ দেশে ও দক্ষিণ ভারতে। বৈজ্ঞানিক মতে চাষ করিয়া সিন্কোনায় কুইনিনের পরিমাণও বাড়ানো গিয়াছে। হায়োসিয়ামাস, অ্যাট্রোপা ও ধুতুরায় হায়োসিয়ামিন অ্যালকালয়েড আছে। ইহা হইতে অ্যাট্রোপিন প্রস্তুত করা হয়। অ্যাট্রোপা বেলেডোনা ও ডটুরা স্ট্র্যামোনিয়াম চাষ করিয়া ইহাদের অ্যালকালয়েডের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জ উপক্ষারগুলির অণুর গঠনের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তাহাতে বিবিধ অ্যালকালয়েডের অণুর বিভিন্ন কাঠামোর কথা জানা গিয়াছে। এই সব কাঠামো অনুসারে উপক্ষারগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হইয়াছে। যেমন, কুইনিনকে বলা হয় কুইনোলিন শ্রেণীর অ্যালকালয়েড, মর্ফিন আইসোকুইনোলিন শ্রেণীর ইত্যাদি। অ্যালকালয়েডের অণুর গঠন জানিবার পর চেষ্টা চলিল কি করিয়া পরীক্ষাগারে সেগুলিকে সংশ্লেষণ করা যায়। কুইনিনের মত জটিল কাঠামোর পদার্থও সংশ্লেষিত

হইয়াছে। তাহার পর ভেষজগুণসম্পন্ন অ্যালকালয়েডের গঠন অনুসরণ করিয়া ঐ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতির প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। কুইনিন-অণুর গঠনের অনুকরণে বিবিধ ম্যালেরিয়ানাশক পদার্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে। বেদনানাশক হিসাবে কোকেন উপক্ষার খ্যাত, ইহার অনুকরণে উৎপন্ন হইয়াছে নোভোকেন। পেথিডিন সংশ্লেষিত হইয়াছে। ইহার যন্ত্রণালাঘবশক্তি অনেকটা মর্ফিনের মত।

গাছে অ্যালকালয়েড জন্মাইবার কারণ : ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পিক্‌টে বলিলেন, প্রাণীর মল-মূত্রাকারে আহার্যের বর্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করার মত কোনও কোনও উদ্ভিদ উপক্ষার আকারে আহার্যের বর্জনীয় অংশ ত্যাগ করে। উদ্ভিদ খাদ্যমাধ্যমে বৃহত্তর প্রোটিন-অণু আত্মীকরণ (অ্যাসিমিলেশন) করিতে গিয়া অণুগুলিকে কখনও নাইট্রোজেনযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড, কখনও বা নাইট্রোজেন যৌগিক অ্যামিনের ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত করে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরে রাসায়নিক রূপায়ণে উপক্ষাররূপে উদ্ভিদের কোষে সঞ্চিত হয়। পরে সেখান

কতকগুলি প্রয়োজনীয় অ্যালকালয়েড

অ্যালকালয়েড	গাছ	অংশ	প্রাপ্তিস্থান	ব্যবহার
অ্যাট্রোপিন	অ্যাট্রোপা বেলেডোনা	শিকড়	কাশ্মীর	চোখের মণি
	ডটুরা স্ট্র্যামোনিয়াম (ধুতুরা)	বীজ, শিকড়	উত্তর ভারত	সম্প্রসারণে
আর্গোমেট্রিন	আর্গট (ক্ল্যাভিসেপ্‌স ছত্রাক হইতে)	—	রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল	জরায়ু সংকোচনে
এফিড্রিন	এফিড্রা	গাছ	চীন ; ভারতে চাষ হয়	হাঁপানির শ্বাসকষ্ট-লাঘবে
এমেটিন	ইপিকাক	শিকড়	ব্রাজিল ; ভারতে চাষ হয়	আমাশয়ে
কলচিসিন	জাফরান	বীজ ও কন্দ	কাশ্মীর	গেঁটেবাতে
কোকেন	কোকা	পাতা	দক্ষিণ আমেরিকা	বেদনানাশনে
কুইনিন	সিন্‌কোনা	ছাল	দক্ষিণ আমেরিকা ; ভারতে চাষ হয়	ম্যালেরিয়ায়
কোডিন	পোস্তগাছ	আফিম	মিশর, মধ্যপ্রাচ্য। ভারতে চাষ হয়	কাশি নিবারণে
কোনেসিন	কুর্চি	ছাল	ভারত	আমাশয়ে
ক্যাফিন	চা	সবুজ পাতা হইতে তৈয়ারি চা-পাতা চূর্ণ	চীন ; ভারতে চাষ হয়	উত্তেজক, মূত্রবর্ধক
পিলোকার্পিন	পিলোকার্প	পাতা	দক্ষিণ আমেরিকা	চোখের মণি সংকোচনে
বার্বেরিন	বার্বেরিস	ছাল	ভারতের পার্বত্য অঞ্চল	ওরিয়েণ্টাল ক্ষতে
ভ্যাসিসিন	বাসক	পাতা	ভারত	কফ তুলিয়া দিতে
মর্ফিন	—	আফিম	—	তীব্র যন্ত্রণায়
নিকোটিন	তামাক	পাতা	আমেরিকা, ভারতে চাষ হয়	—
রেজার্পিন	সর্পগন্ধা	শিকড়	ভারত	রক্তের চাপ হ্রাসে
স্ট্রিক্‌নিন	নাক্স ভোমিকা (কুচিলা)	বীজ	ভারত	স্বাস্থ্যপ্রদ, উত্তেজক
হাইড্রাস্টিনিন	হাইড্রাস্টিস	শিকড় ও কন্দ	আমেরিকা	জরায়ুর রক্তস্রাব রোধে
হেরোইন	মর্ফিন হইতে প্রস্তুত	—	—	মর্ফিনের গুণযুক্ত
হোমাট্রপিন	সংশ্লেষিত	—	—	অ্যাট্রোপিনের গুণযুক্ত

হইতে পরিত্যক্ত হয়। ত্বক বা পত্রের কোষে সঞ্চিত হইলে পরে ত্বক বা পত্র ঝরার সঙ্গে উপক্ষারও বর্জিত হয়। উত্তরকালের বিজ্ঞানীরাও বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন উপক্ষার-গুলি উদ্ভিদকোষে শর্করার মত সঞ্চিত ভোজ্য নয়, প্রাণীর মল-মূত্রের মত ত্যাজ্য পদার্থ।

আফিমের যে যাতনা উপশম করিবার শক্তি আছে তাহা অনেক প্রাচীন কালে জানা গিয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্য হইতে আফিমের ব্যবহার নানা দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। গ্যালেন (আনুমানিক ১২৯-৭০ খ্রীষ্টপূর্ব) আফিমকে 'প্ল্যাণ্ট অফ জয়' বলিয়া অভিহিত করেন। সিডেনহ্যাম বলিয়াছিলেন, 'আফিমের অপেক্ষা ভাল ঔষধ ঈশ্বর আর মানুষকে দেন নাই।' আফিমের জনপ্রিয়তা আর এক কারণে হইয়াছিল— ইহার মাদকধর্ম। ইহা নিয়মিত সেবনে নেশা হয়, তখন আর ইহা সেবন না করিলে চলে না। তাই ডেরোস্নে কর্তৃক আফিমের উপাদান উপক্ষার আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বিচিত্র নয়। ঘুমপাড়ানি গুণের জন্য আফিম বা পোস্তগাছের নাম দিতে লাতিন 'সম্‌নিফেরম' (নিদ্রাকর্ষক) কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছিল। উহার অন্যতম অ্যালকালয়েড মর্ফিনের নাম গ্রীক-পুরাণের স্বপ্নদেবতা মর্ফিউসের নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছিল।

অনুরূপ অন্য কোনও ঔষধে মর্ফিনের মত যন্ত্রণা লাঘব করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, ইহা ব্যবহারে বিপদও আছে; বারংবার সেবনে এই অভ্যাস আর ত্যাগ করা সহজ হয় না। মর্ফিন তীব্র বিষ। মাত্রা ছাড়াইলে প্রাণহানিকর। ইহার অপপ্রয়োগ যে হয় না তাহা নহে।

কোকেনও ভাল বেদনানাশক, ইহা সেবনেও নেশা হয়। নেশা করার জন্য মাদক উপক্ষারগুলির চাহিদা এত বাড়িয়াছে যে দেশ-বিদেশের সরকার ইহাদের বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে ইহাদের চালান দিবার গুপ্ত কারবার পুরামাত্রায় প্রসারিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পুলিশ-সংস্থা অবৈধ চালান দমনে প্রবৃত্ত আছে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যালকালি আমাদের ভাষায় ক্ষার বলিয়া পরিচিত। অ্যালকালি শব্দটি আরবী শব্দ অল্‌-কালি (ভস্ম) হইতে গঠিত। প্রাচীন ভারতে তেঁতুল, তিসি, কলা, আদা, পলাশ, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের অংশ রৌদ্রে শুকাইয়া ও দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম দিয়া ক্ষার প্রস্তুত হইত। চরক ও সুশ্রুত -সংহিতায় এবং রসরত্নসমুচ্চয়, রসার্ণব প্রভৃতি রসায়নশাস্ত্রে এইরূপ প্রস্তুতির উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতীয়েরা তীক্ষ্ণ, মধ্যম ও মৃদু এই তিন শ্রেণীর ক্ষারের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালের তীক্ষ্ণ ক্ষার আজিকার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড। যবক্ষার হইল আধুনিক পটাসিয়াম কার্বনেট। সেকালে কদলীবৃক্ষের পত্র বা কাণ্ডের অংশ শুকাইয়া দগ্ধ করা হইত এবং উহার ভস্মে জল মিশাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া হইত। সেই দ্রবণ হইতে জল বাষ্পীভূত করিলে একপ্রকার কঠিন পদার্থ পাওয়া যাইত। ইহাই পটাসিয়াম কার্বনেট। যবক্ষার ও চুন একত্রে মিশাইয়া তাপ দিলে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। তেমনই সর্জিকাক্ষার (সাজিমাটি বা সোডিয়াম কার্বনেট) হইতে চুন সহযোগে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়।

যবক্ষার বা সর্জিকাক্ষারের দ্রবণ ও চুনের মিশ্রণকে সেকালে বলা হইত মধ্যম ক্ষার। যবক্ষারের লঘু দ্রবণকে বলা হইত মৃদু ক্ষার। সেকালে এই দুইটি ও সোহাগা বারবার ক্ষার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আধুনিক মতে সোহাগা মৃদু ক্ষার। অ্যালকালি বলিতে বিশেষ করিয়া সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, সোডিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম কার্বনেট বুঝায়। আধুনিক মতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড তীক্ষ্ণ ক্ষার। ইহাদের দ্রবণের সংস্পর্শে গাত্রত্বকে ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাদের তাই কস্টিক (বা বিদাহী) অ্যালকালি বলে। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম কার্বনেট মৃদু ক্ষার, ইহাদের দ্রবণ গাত্রত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করে না।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, সোডিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম বাইকার্বনেট বহুব্যবহৃত অ্যালকালি বলিয়া পরিচিত। কাচ, কাগজ, সাবান, কৃত্রিম তন্তু ও বস্ত্র -শিল্পে ইহাদের বহুল ব্যবহার আছে। সালফার ডাইঅক্সাইড -ঘটিত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কাগজের মণ্ড প্রস্তুত ও বিরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরিন-ঘটিত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড জীবাণুনাশক। সোডিয়াম বাইকার্বনেট অম্লরোগ প্রশমনে ব্যবহৃত। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস -উৎপাদনশিল্পে ইহার প্রয়োজন প্রচুর। সোডা, লেমনেড প্রভৃতি পানীয় বাতান্বিত করিবার জন্য উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজন হয়।

সোডিয়াম সালফেট, খড়িমাটি ও কয়লা মিশাইয়া তাপ দিলে সুলভে প্রায় শুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়।

এই প্রণালী উদ্ভাবক ব্ল্যাঁর প্রণালী বলিয়া খ্যাত। খাদ্য-লবণ দ্রবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের দ্রবণ মিশাইলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট কঠিন পদার্থরূপে দ্রবণ হইতে পৃথক হয়। সোডিয়াম বাইকার্বনেট চূর্ণে তাপ দিলে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। ইহার উদ্ভাবক সলভের নামে এই প্রণালী পরিচিত। এই প্রণালীতে প্রত্যেক পদে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কাঠিয়াওয়াড়ে প্রথম সোডিয়াম কার্বনেট বা অ্যালকালি-শিল্পের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে আর একটি রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইহা ক্রয় করে ও অ্যালকালি উৎপাদন চালু করে। পরবর্তী কালে আরও একটি প্রতিষ্ঠান (ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ) পাঞ্জাবে চালু হইয়াছে। টাটা কেমিক্যাল্‌সও অ্যালকালি-শিল্প শুরু করিয়াছে।

আমাদের দেশে তড়িৎ-বিশ্লেষণ-প্রণালীর ব্যবহারে সোডিয়াম ক্লোরাইড (বা খাদ্য-লবণ) দ্রবণ বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। টাটা ও মেত্তুর কেমিক্যাল্‌স অ্যালকালি উৎপাদনে প্রবৃত্ত আছে। বলা বাহুল্য দেশজ অ্যালকালি আমাদের চাহিদা মিটাইতে পারে না। কাগজ, সাবান ইত্যাদি শিল্প চালু রাখিবার জন্য বিদেশ হইতে অ্যালকালি আমদানি করিতে হয়।

রাসায়নিক দিক দিয়া ক্ষার অ্যাসিডের বিপরীত-ধর্মী। লাল লিটমাস দ্রবণ ও ক্ষার দ্রবণ মিশাইলে নীল রং দেখা দেয়। বর্ণবিহীন ফিনলথ্যালিন দ্রবণের সহিত ক্ষার দ্রবণ মিশাইলে দ্রবণের রং গোলাপী হয়। ক্ষার দ্রবণ দুই আঙুলে ঘষিলে সাবান-জলের মত পিচ্ছিল স্পর্শের অনুভূতি হয়। ক্ষারের গাঢ় দ্রবণে পশম দ্রবিত হয়। কাগজের টুকরা ক্ষার দ্রবণে মিশাইয়া তাপ দিলে কাগজমণ্ডরূপে জেলির মত থকথকে হইয়া যায়।

ক্ষারক ও ক্ষার— ক্ষারক বলিতে ধাতুর অক্সাইড ও ধাতুর হাইড্রক্সাইড বা অনুরূপ পদার্থ বুঝায়। ইহাদের প্রধান ধর্ম, অ্যাসিডের সহিত ইহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। তবে ধাতব অক্সাইড হইলেই ক্ষারক হইবে না ; কেননা, অনেক ধাতুর অক্সাইড আছে যাহাদের সহিত অ্যাসিডের ক্রিয়ায় লবণ ও জল ছাড়াও অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। সব ক্ষারক জলে দ্রবিত হয় না। যে ক্ষারক জলে দ্রবিত হয়, তাহাকে ক্ষার বলে। ক্ষার জলে দ্রবিত হয় বলিয়া ক্ষারক অপেক্ষা বেশি কাজে লাগে।

ক্ষারের শক্তি— ক্ষার জলে দ্রবিত হইলে হাইড্রক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়। যে ক্ষার দ্রবণে বেশি পরিমাণে হাইড্রক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষারের শক্তি বেশি। যেমন সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড। অ্যামো-নিয়াম হাইড্রক্সাইড কিংবা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ (চুনের জল) হইতে স্বল্প পরিমাণে হাইড্রক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়। ইহাদের শক্তি কম।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যাল্‌কেমি কিমিয়া। আদিযুগে মিশরীয়গণ রসায়ন-বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। আরবী ভাষায় মিশরকে বলা হইত 'অল্ কিমিয়া', অর্থাৎ কালো মাটির দেশ। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই 'অ্যাল্‌কেমি' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রাচীন ও মধ্য যুগের রসায়ন বুঝাইতে কথাটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আজ পর্যন্ত যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার সূচনা হইয়াছিল মিশর, ক্রীট, গ্রীস, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলে। খ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল পূর্ব হইতেই যে এই সকল দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসক প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তবে সে যুগের মানুষ সোনা বেশি পরিমাণে খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়া বেশি কাজে লাগাইতে পারে নাই। কিন্তু সোনার কাঁচা হলুদ রং মানুষের চোখে ধরিয়াছিল, দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহার খুব আদর ছিল।

কি করিয়া তামা, লোহা বা সীসাকে দুর্লভ সোনায় পরিণত করা যায়, এই চেষ্টা হইতে শুরু হইল অ্যাল্‌কেমির চর্চা। গোপন জাদুবিদ্যার সহিত পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের ইহা এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। বিভিন্ন দ্রব্য মিশানো, পোড়ানো বা সিদ্ধ করা, গুপ্ত গাছ-গাছড়া জড়িবুটির ঔষধ প্রয়োগ করা, এই সব পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের ফলাফল বিচিত্র সংকেতের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার পদ্ধতি প্রচলিত হইল।

ইহার পর একদল মানুষের আবির্ভাব হইল যাঁহারা এই কিমিয়াবিদ্‌দের মত গুপ্তবিদ্যা, লৌহ-স্বর্ণ রূপায়ণের চমকপ্রদ চাতুর্যের প্রচেষ্টায় পড়িয়া রহিলেন না। জনহিত-কল্পে তাঁহারা অমৃতের (ইলিক্‌সর্) সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহাতে জরা-ব্যাধি দূর হয়। সেই হইতে শুরু হইল ভেষজ-রসায়নের (আইয়াট্রোকেমিস্ট্রি) অনুশীলন।

ভারতবর্ষেও অ্যাল্‌কেমি যথেষ্ট প্রসার এবং উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এ দেশেও সোনা তৈয়ারির প্রচেষ্টায় পারদ লইয়া অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমসময়ে হইয়াছিল। অবশ্য

পাশাপাশি ভেষজ-রসায়নের অনুশীলনও এখানে আরম্ভ হইয়াছিল। চরক এবং সুশ্রুত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুন ও শার্ঙ্গধরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম শতাব্দীতে জবীর ছিলেন আরব দেশের অন্যতম কিমিয়াবিদ্‌। আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইওরোপে রজার বেকন ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী কিমিয়াবিদ্‌। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে প্যারাসেল্‌সাস চিকিৎসক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি তদানীন্তন চিকিৎসা-তত্ত্বের অনেক ভ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার দুঃসাহসিকতার ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তিনিই প্রথম বলেন, ধাতু এবং অধাতুর ধর্ম পৃথক। সোনা উৎপাদন নয়, ঔষধ তৈয়ারিই অ্যাল্‌কেমির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত— এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া প্যারা-সেল্‌সাস এই বিদ্যাকে নূতনতর লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দিলেন।

কিমিয়াবিদ্‌গণ বিশ্বাস করিতেন, প্রতিটি বস্তুতেই আছে একটি মূল উপাদান (মেটিরিয়া মেডিকা), তবে তাহার সঙ্গে সবসময়েই কোনও না কোনও অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। অগ্নির সাহায্যে শোধন করিতে করিতে (নিস্তাপন, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে) একসময় হয়ত সেই মূল উপাদানটি পৃথক হইয়া আসিবে। এই-ভাবে শেষ পর্যন্ত হয়ত পাওয়া যাইবে পরশ পাথর, যাহার স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হইবে, অথবা পাওয়া যাইবে অমৃত, যাহা পান করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। জড়বস্তুর পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বও প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরে জানা যায় যে, এইগুলি আদিম মৌলিক পদার্থ নয়।

বলা বাহুল্য, সেই যুগের কিমিয়াবিদ্‌দের তামা লোহা বা সীসা হইতে সোনা তৈয়ারি করা যেমন সফল হয় নাই, তাঁহাদের পরবর্তী কালের লোকেরা তেমনই অমৃতের সন্ধানও পান নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিবৃত্ত। দুঃখের বিষয় তাঁহারা এত বেশি গোপনীয়তার আশ্রয় লন এবং পরীক্ষালব্ধ ফল এমন দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মানুষের বিশেষ কাজে আসে নাই। এজন্য দেখা যায় যে, প্রায় এক হাজার বৎসর ধরিয়া চর্চা হওয়া সত্ত্বেও সে যুগে রসায়নের তেমন উন্নতি হইতে পারে নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই একদল বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হইল যাঁহারা অকারণ অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত করিবার জন্য কেবলমাত্র পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। মনের গূঢ়তম জিজ্ঞাসারও উত্তর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে তথ্য পাওয়া গেল, সহজবোধ্য ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহা হইতে তত্ত্ব গড়িয়া উঠিল। আবার তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া নব নব তথ্যের অনুসন্ধান শুরু হইল। এইভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের পরস্পরের নির্ভরতায় রসায়ন ক্রমে গতিশীল হইয়া উঠিল। এইভাবে একদিকে রসায়ন যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিল, রসায়নের নবযুগের উন্মেষ হইতে থাকিল, অন্য দিকে অ্যাল্‌কেমি তেমনই জাদুবিদ্যা বা ভেলকিবাজীরূপে ক্রমশঃ অখ্যাতি লাভ করিতে লাগিল এবং শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

অ্যালকোহল ইংরেজী অ্যালকোহল কথাটি সুরাসার অর্থে ব্যবহৃত। ইহা আরবী 'অল্‌ কোহ্‌ল' শব্দ হইতে গৃহীত। আরবী ভাষায় অল্‌ কোহ্‌ল কথাটি কিন্তু অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ অঞ্জন হিসাবে ব্যবহৃত এক ধরনের মিহি পাউডার বা চূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুরাসারের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। ভাত বা ফলের রস সহজেই সন্ধিত হয় বা গাঁজিয়া ওঠে। তাই মধু, ফুলের মধু, গুড়, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, আপেল বা অন্য ফলের রসে এবং আলু, চাউল, যব, গম প্রভৃতি শস্য সিদ্ধে গাঁজলা (ফার্মেন্ট) ব্যবহার করিয়া সুরা প্রস্তুত হইত। মূলতঃ এইভাবে আজও সুরা ও তাহা হইতে পাতন (ডিস্‌টিলেশন) করিয়া অ্যালকোহল প্রস্তুত হয়।

অ্যালকোহল বলিতে সাধারণতঃ ইথাইল অ্যালকোহল বুঝায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অ্যালকোহলের অর্থ আরও ব্যাপক। মিথাইল (কাঠ হইতে উৎপন্ন), ইথাইল (যব, গম, চাউল ইত্যাদি শস্য হইতে উৎপন্ন), প্রোপাইল, বিউটাইল, এমাইল (স্টার্চ বা শ্বেতসার হইতে উৎপন্ন) প্রভৃতি অ্যালকোহলশ্রেণীভুক্ত। গ্লিসারলও (গ্লিসারিন) এই শ্রেণীর অন্তঃপাতী।

ইথাইল অ্যালকোহল তরল যৌগিক পদার্থ। ইহার কোনও বর্ণ নাই, তবে বিচিত্র গন্ধ আছে। ইহা সহজে উবিয়া যায়। সেইজন্য ইহাকে স্পিরিট বলে। ইহাতে সহজে আগুন ধরে বলিয়া ইহা সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার স্ফুটনাঙ্ক ৭৮·৩° সেন্টিগ্রেড। অনেক পদার্থ, বিশেষ করিয়া জৈব পদার্থ, যেমন গালা, ভেষজাদি ইহাতে

সহজে দ্রবিত হয়। তাই ঔষধ-প্রস্তুতিশিল্পে অ্যালকোহল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। এসেন্স প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও রঞ্জন, লাক্ষা প্রভৃতির দ্রাবক হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ শ্রেণীর সুরা প্রস্তুত করিতেও ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালকোহল হইতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করা হয়। যেমন ঈথর ও ক্লোরোফর্ম (যাহা অস্ত্রচিকিৎসাকালে রোগীর চেতনাহরণে ব্যবহৃত হয়), অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা ভিনিগার অ্যাসিড, ইথাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যৌগিক। এমন কি, পেট্রলের সহিত শতকরা ২০ ভাগ অ্যালকোহল মিশাইয়া উহা মোটরের তেল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এসেন্স, আসব, অরিষ্ট, টিঞ্চার প্রভৃতিতে কি পরিমাণ অ্যালকোহল আছে তাহা নির্ধারণ করিয়া তবে শুল্ক ধার্য করা হয়। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে অ্যালকোহল-পরিমিতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শুল্কনির্ধারণের জন্য 'প্রুফ স্পিরিট' বলিয়া এক সংজ্ঞার অবতারণা করে। মদ্য, টিঞ্চার প্রভৃতি কোনও দ্রবণে (সলিউশন) ১৫·৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় শতকরা ৫৭·১ আয়তন অ্যালকোহল থাকিলে তাহাকে প্রুফ স্পিরিট (বা শতকরা ১০০ প্রুফ স্পিরিট) বলা হয়। দেখা গিয়াছে, যে দ্রবণে অন্ততঃ ৫৭·১% আয়তন অ্যালকোহল (বাকিটা জল) আছে, তাহাতে ভিজানো বারুদ অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠে। যদি ইহার অপেক্ষা কম পরিমাণ অ্যালকোহল থাকে, তবে ভিজা বারুদ আর আগুন দিলে জ্বলে না। কাজেই দ্রবণে স্পিরিট যথার্থ পরিমাণে আছে কিনা, জ্বলন্ত বারুদ তাহার প্রমাণ। প্রাচীন কালে ইংল্যাণ্ডের যোদ্ধারা মদ্যে অধিক মাত্রায় জল মিশানো হইয়াছে কি না নির্ধারণ করিবার জন্য এই সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিল। উত্তরকালে সেই প্রণালীকে পরিমার্জিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিভিন্ন উষ্ণতায়, বিভিন্ন পরিমাণে অ্যালকোহল ও জল মিশাইয়া উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত তালিকার সাহায্যে অ্যালকোহল-পরিমিতি সহজ হইয়াছে। ১৫·৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় প্রুফ স্পিরিটের গুরুত্ব ০·৯১৯৭৬।

নির্জলা (অ্যাবসোলিউট) অ্যালকোহলে অবশ্যই প্রুফ স্পিরিট অপেক্ষা বেশি আয়তনে অ্যালকোহল থাকে। ইহাতে অ্যালকোহল ছাড়া আর কিছু থাকে না, তাই ইহাতে ১০০% আয়তন অ্যালকোহল আছে বলা হয়। প্রুফ স্পিরিটের মাপ অনুসারে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল অর্থে শতকরা ১৭৫·৩৫ প্রুফ স্পিরিট বলা হয়। ১৫·৫° সেন্টিগ্রেডে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৭৯৩৬। আজকাল যে সকল সুরা প্রচলিত আছে, তাহাতেও বিভিন্ন আয়তনে অ্যালকোহল থাকে।

স্বল্প পরিমাণে নিয়মিত সেবন করিলে অ্যালকোহল বা সুরার ভেষজগুণ দেখা যায়। টনিক ঔষধে কিছু পরিমাণে অ্যালকোহল থাকে। আহারের পূর্বে টনিক পান করিলে, অ্যালকোহল থাকার ফলে পাকস্থলীতে জারক রস সহজে নিঃসৃত হয়। পরে আহার করিলে খাদ্য ঐ জারকরসে সহজে পরিপাক হয়। চর্বির মত, দেহে অ্যালকোহল গেলে সহজে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উহা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। তৎসহ বেশ কয়েক হাজার ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। তাই চর্বির মত অ্যালকোহলও শক্তিদায়ক। ইহা দেহ গরম রাখিতে সাহায্য করে। শীতের দেশে লোকে তাই মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়। শক্তিদানে ১০০ গ্রাম অ্যালকোহল ৭৮ গ্রাম চর্বির সমতুল্য। কিন্তু পাকস্থলী ও অন্ত্রে অ্যালকোহল গেলে অন্যান্য উপকারী রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

আমাদের দেশে অ্যালকোহল শিল্প ও মদ্যপ্রস্তুতির ব্যবস্থা আছে। অ্যালকোহল উৎপাদন করা হয় চিটা গুড় হইতে। এইভাবে অ্যালকোহল উৎপন্ন হইলে আংশিক পাতন প্রণালীর সাহায্যে ইহা পৃথক ও শোধন করা হয়। ভাল ভাবে আংশিক পাতন করিলে শতকরা ৯০-৯৫ আয়তন অ্যালকোহল (বাকিটা জল) পাওয়া যায়। ইহাকে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট বলে, ইহা জীবাণুনাশক। ঔষধ প্রস্তুতি ও অন্য শিল্পে ইহার ব্যবহার হয়। তাই বিনা শুল্কে সস্তায় স্পিরিট সরবরাহ করা দরকার। অথচ স্পিরিট মদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবারও আশঙ্কা আছে। তাই রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটকে পানের অযোগ্য করিবার জন্য তাহাতে বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ মিশানো হয়। মিথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন মিশ্রিত রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটকে মেথিলেটেড স্পিরিট বলা হয়। ইহা পান করিলে চক্ষু নষ্ট হয়। বেশি পরিমাণে পান করিলে প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে এখন রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে পিরিডিন ও তৎজাতীয় পদার্থ (০·৫%) ও কাউটস্থিন বা দুর্গন্ধযুক্ত রবারের নির্যাস (০·৫%) মিশানো হয়। মিশ্রণটি ডিনেচার্ড স্পিরিট বলিয়া পরিচিত।

মদ, এসেন্স, টিঞ্চার প্রভৃতি অ্যালকোহল -ঘটিত দ্রব্যসম্ভার হইতে ভারত সরকারের বৎসরে প্রায় সত্তর কোটি টাকা শুল্ক আদায় হয়। সারা ভারতে প্রায় চল্লিশটি

অ্যালকোহল প্রস্তুতির কারখানা আছে। উত্তর প্রদেশে কারখানার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কতকগুলি অ্যালকোহলের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। 'মদ' দ্র।

নাম	রাসায়নিক সংকেত	আকর
মিথাইল অ্যালকোহল	CH_3OH	কাঠ
ইথাইল অ্যালকোহল	C_2H_5OH	ফল, শস্য, (স্টার্চ), গুড়
বিউটাইল অ্যালকোহল	C_4H_9OH	স্টার্চ, গুড়
এমাইল অ্যালকোহল	$C_5H_{11}OH$	স্টার্চ, গুড়
গ্লিসারল	$C_3H_5(OH)_3$	চর্বি, তেল

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India: Industrial Products*, Part I, New Delhi, 1948.

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যালবার্ট হল বহু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সভার স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স -রূপে সপ্তম এডওয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে তাঁহার পিতা প্রিন্স অ্যালবার্টের নামে দুইটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। একটি 'অ্যালবার্ট টেম্পল অফ সায়েন্স', অন্যটি 'অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট' বা 'অ্যালবার্ট হল'। 'অ্যালবার্ট হল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। বাংলা সরকারের নিকট পাঁচ হাজার ও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজার নিকট তেইশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়া তিনি কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে গোলদীঘির নিকট এই হলটির প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল)। অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাসভায় পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন ছোট লাট স্যর রিচার্ড টেম্পল। ইহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, শ্রেণী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সভা, সাহিত্যসভা ও জনহিতকর বিভিন্ন সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য এই হলটির প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ স্থাপনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা হয়। কমিটি বা অধ্যক্ষসভায় ছিলেন: সভাপতি ছোটলাট স্যর অ্যাশলি ইডেন, সহ-সভাপতি মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন; সহ-সম্পাদক আনন্দমোহন বসু। সভ্য হিসাবে ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আর্কডিকন জন বেলি, চার্লস হেনরি টনি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবাব আমীর আলী, নবাব আসগর আলী, মৌলবী আবদুল লতিফ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি।

কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন দুইটি বাড়ি লইয়া অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের ভবন গঠিত হয়। দক্ষিণ দিকের বাড়িটি ছিল কেশবচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেনের। এই বাড়ির নম্বর ছিল ১৫ কলেজ স্কোয়্যার। ইহার পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার নাম ছিল রতন মিস্ত্রি লেন। এই গলির ২০ নম্বর বাড়িটি পূর্বোক্ত বাড়িটির উত্তর দিকে সংলগ্ন। এই দুই বাড়ির জমির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক এক বিঘা। অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের পক্ষ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তেইশ হাজার একশত ত্রিশ টাকায় উক্ত জমি ও বাড়ির স্বত্ব কিনিয়া লওয়া হয়।

১৫ নম্বর কলেজ স্কোয়্যারের গৃহটি ইতিপূর্বেই ঐতিহাসিক মর্যাদা পাইয়াছিল। এই বাড়ির দ্বিতলে এক সময়ে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন বাস করিতেন। নিম্নতলে মেডিক্যাল কলেজ, বাংলা পাঠশালা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি শ্রেণী বসিত।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই অ্যালবার্ট হল শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের পরিচালনায় অ্যালবার্ট স্কুলের আবাসস্থল ছিল অ্যালবার্ট হল। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটি কলেজ-শাখাও স্থাপিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য এই দুইটিই উঠিয়া যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন ১৮৮১ হইতে আমরণ (১৮৯৫ খ্রী) অ্যালবার্ট হলের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' -এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

বর্তমান শতাব্দীর সূত্রপাত হইতে পরিচালনা-ব্যবস্থায় নানারূপ ত্রুটি দেখা দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পাঠাগার-বিভাগ বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমে অপরাপর কার্যও বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। কিছুদিন পরে নীলরতন সরকার, অরুণচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টার ফলে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইল। তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটির উদ্যোগে বর্তমান অ্যালবার্ট বিল্ডিংসটি নির্মিত হয়। ইহার দ্বিতল ও ত্রিতলের কিয়দংশে অ্যালবার্ট হল বা ইনস্টিটিউটের স্থান হইল। কিন্তু 'অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট' ইহার পর বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি দেনার দায়ে বিলুপ্ত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অ্যালবার্ট হলে ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গোড়াপত্তন করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া ভারত-সভা প্রথমবার যে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে তাহারও স্থান এই হল। এতদ্ব্যতীত ভগিনী নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বেদান্ত দর্শন -বিষয়ক প্রসিদ্ধ বক্তৃতাবলী এই হলেই প্রদত্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেসাণ্ট, অমৃতলাল বসু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বহু মনীষীর স্মৃতিবিজড়িত অ্যালবার্ট হল আজ অতীত ইতিহাসে পর্যবসিত।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

অ্যালয় ধাতব গুণবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ দুই বা ততোধিক ধাতুর সম্মিলনে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অ্যালয় বা মিশ্র ধাতু বলা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধাতুর সহিত এক বা একাধিক অধাতুও অ্যালয়ের উপাদান হইতে পারে। ব্যাপক অর্থে সকল মিশ্র ধাতুকে অ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাহাদের অ্যালয় রূপে গণ্য করা হয় না। এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে উপাদানগুলির ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেইজন্য বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট ব্যবহার-উপযোগী পদার্থ পাইবার জন্য অ্যালয় উৎপাদন করা হয়। প্রায় বাহান্নটি ধাতু হইতে পাঁচ হাজারেরও অধিক অ্যালয় প্রস্তুত করা গিয়াছে।

অ্যালয়ের বিশেষ লক্ষণ এই যে দুই বা অধিক ধাতু -মিশ্রিত অ্যালয় তপ্ত গলিত অবস্থায় সমসত্ত্ব (হমোজিনিয়াস) এবং শীতল হইয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও দুইটি পৃথক স্তরে বিভক্ত হয় না। তবে দেখা গিয়াছে, গলিত অবস্থায় সমসত্ত্ব হইলেও কঠিন অবস্থায় উহা সমসত্ত্ব অথবা অসমসত্ত্ব (হেটেরোজিনিয়াস) দুই-ই হইতে পারে। কোনও অ্যালয়-বিশেষের বিভিন্ন উপাদান সর্ব ক্ষেত্রে একই অনুপাতে বর্তমান থাকে বলিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার অসমসত্ত্বতা ধরা পড়ে না। কিন্তু রঞ্জন-রশ্মি দিয়া পরীক্ষা করিলে অথবা অ্যালয়ের উপবিভাগ উত্তমরূপে পালিশ করিবার পর বিশেষ দ্রবণ ব্যবহার করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহার অসমসত্ত্বতা ধরা পড়ে। জলের মত তরল সমসত্ত্ব দ্রবণ (সল্যুশন), দ্রাব্য (সল্যুট) ও দ্রাবকের (সল্ভেণ্ট) মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। কঠিন (সলিড) অ্যালয়কে সেইরূপ কঠিন দ্রবণ বলা চলে; ইহার মধ্যে যে ধাতু অধিক পরিমাণে বর্তমান আছে তাহাই দ্রাবক ও স্বল্প পরিমাণে বর্তমান অন্য ধাতু বা অধাতুই দ্রাব্য।

অ্যালয়ের উপাদানসমূহ যৌগিক পদার্থরূপে অবস্থান করিতে পারে। দুই বা ততোধিক ধাতু মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ধাতু-যৌগিক (ইণ্টারমেট্যালিক কম্পাউণ্ড) বলা হয়।

সুতরাং সমসত্ত্ব অ্যালয় ইহাতে বর্তমান ধাতুসমূহের কঠিন দ্রবণ অথবা ধাতুযৌগিক হইতে পারে। অসমসত্ত্ব অ্যালয় এক বা একাধিক ধাতুযৌগিক অথবা ধাতুসমূহের কঠিন দ্রবণ দ্বারা গঠিত হইতে পারে। সমসত্ত্ব অ্যালয় অপেক্ষা অসমসত্ত্ব অ্যালয়ের প্রয়োগ অধিক। বিশেষ প্রণালীতে তাপ প্রয়োগ করিয়া অ্যালয়ের মধ্যস্থ বিভিন্ন ধাতু-যৌগিকের আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, যাহার ফলে একই অ্যালয় হইতে বিভিন্নধর্মী পদার্থসমূহ উৎপাদন করা যায়।

ধাতুসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে লইয়া একত্র গলাইয়া কিংবা কোনও গলিত ধাতুর সহিত অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া অ্যালয় প্রস্তুত করা হয়। আবার দুইটি ধাতু-ঘটিত দুইটি লবণের দ্রবণ একত্রে মিশাইয়া তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারে ঐ দুই ধাতুর অ্যালয়ের প্রলেপ পড়ে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অনুপাতে ধাতুচূর্ণ ভালভাবে মিশাইয়া তাপপ্রয়োগে অ্যালয় প্রস্তুত করা যায়। এই প্রণালীতে লৌহ, নিকেল, কোবাণ্ট ও অ্যালুমিনিয়ামচূর্ণ হইতে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের চুম্বক প্রস্তুত করা হয়। আবার কখনও দুইটি ধাতুর অক্সাইড, কোক কয়লা বা অন্য কোনও বিজারক মিশাইয়া তপ্ত করিয়া অ্যালয় প্রস্তুত হয়। ফেরোম্যাঙ্গানিজ, ফেরোসিলিকন প্রভৃতি লোহার অ্যালয় বা লৌহমিশ্র ধাতু এইভাবে উৎপন্ন হয়।

লৌহঘটিত অ্যালয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ অ্যালয়সমূহকে দুই শ্রেণীভুক্ত করা হয়: ১ লৌহঘটিত (ফেরাস) অ্যালয় ২. লৌহবিহীন (নন্-ফেরাস) অ্যালয়। কাঁচা লোহা, ইস্পাত ও ঢালাই লোহা সবই লৌহ ও কার্বন -ঘটিত অ্যালয়। আবার ইস্পাতের সহিত ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, কোবাণ্ট, মলিবডিনাম ও টাংস্টেন প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া বিবিধ অ্যালয়-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়।

কার্বনের পরিমাণের উপর ইস্পাতের ধর্ম নির্ভর করে। ইস্পাতে শতকরা ০·২ ভাগের কম কার্বন থাকিলে তাহা

প্রায় কাঁচা বা পেটা লোহার মত নরম ও ঘাতসহ হয়। কার্বনের পরিমাণ শতকরা ১·৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ইস্পাতকে আর সহজে টানিয়া তারের মত লম্বা করা যায় না, অথচ শক্ত ও ভারসহ হয়। ঢালাই লোহা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র দশ টনের বেশি ভার সহ্য করিতে পারে না। পেটা লোহা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঁচিশ টন এবং ইস্পাত প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ টন ভার সহ্য করিতে পারে। তাপপ্রয়োগপদ্ধতি (হিট ট্রিটমেণ্ট) দ্বারা ইস্পাতের গুণের প্রভূত উৎকর্ষসাধন সম্ভব। ইস্পাতের সহিত ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশ্রিত করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, অর্থাৎ মরিচা প্রতিরোধক গুণ জন্মায়। নিকেলের পরিবর্তে ক্রোমিয়ামের সহিত ম্যাঙ্গানিজ ও নাইট্রোজেন থাকিলেও সেই অ্যালয়-ইস্পাতে মরিচা ধরে না। এইভাবে উপাদানের অদল-বদল করিয়া কলঙ্ক-না-পড়া (স্টেনলেস) ইস্পাত গড়া হইয়াছে।

লৌহবিহীন অ্যালয়ের মধ্যে কপার অ্যালয়সমূহের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মধ্যে পিতল ও ব্রোঞ্জ যথাক্রমে কপার ও জিঙ্ক এবং কপার ও টিনের অ্যালয়। সীসার অ্যালয় ও টিনের অ্যালয়সমূহ ঝালাই করার কাজে ব্যবহৃত হয়। চলতি সলডার বা রাংঝালে চল্লিশ-পঞ্চাশ ভাগ টিন থাকে। সীসা ও অ্যান্টিমনির (১৩%) অ্যালয় তড়িৎ-ব্যাটারির পাতরূপে ব্যবহৃত হয়। বিয়ারিং অ্যালয়সমূহে ৪-৮% অ্যান্টিমনি, ৩-৮% কপার ও বাকি অংশ টিন থাকে। ছাপাখানার হরফ গড়ার অ্যালয় ১১-২৫% অ্যান্টিমনি, ৩-১৩% টিন ও বাকি অংশ সীসা বা লেড। দস্তা বা জিঙ্কের অ্যালয় ছাপাখানায় ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই অ্যালয়ে ৪% অ্যালুমিনিয়াম, ০·১-১% কপার, ০·০৪% ম্যাগনেসিয়াম ও বাকি অংশ জিঙ্ক থাকে। অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয়সমূহকে হালকা অ্যালয় বলে। প্রধানতঃ বিমানের অংশসমূহ নির্মাণে এই অ্যালয়সমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে। অলংকার ও মুদ্রা -নির্মাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অ্যালয় ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণের সহিত কপার, জিঙ্ক ও সিলভার মিশ্রিত করিয়া বিভিন্ন অ্যালয় প্রস্তুত করা হয়। স্বর্ণের অ্যালয়ে স্বর্ণের অংশ 'ক্যার‍্যাট' (carat) হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ স্বর্ণকে চব্বিশ ক্যার‍্যাট ধরা হয়। চৌদ্দ ক্যার‍্যাট স্বর্ণে $\frac{১৪}{২৪}$ অথবা শতকরা ৫৮·৩৩ ভাগ স্বর্ণ থাকে।

দ্র Lord James Osbern, *Alloy System*, New York, 1949; E. Gilbert Doan & M. Elbert Mohla, *Principle of Physical Metallurgy*, New York, 1941; H. Carl Samans, *Engineering Metals and Their Alloys*, New York, 1949.

হরিহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অ্যালার্জি স্বভাবতঃ নির্দোষ এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিলে বা শরীরের সংস্পর্শে আসিলে এক বা একাধিক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে অ্যালার্জি বলে। এমন অনেক লোক দেখা যায়, ডিম খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাদের ঠোঁট, মুখ সব ফুলিয়া উঠে এবং সর্বশরীরে চাকা চাকা স্ফীতি দেখা দেয়, অথচ সেই ডিম অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ক্ষতিকারক নহে। সামান্য মাত্র টার্পিনের স্পর্শেই কোনও কোনও লোকের শরীরে ফোস্কা পড়ে। র‍্যাগউইড, গোলাপ বা অন্য কোনও ফুলের রেণু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে কাহারও কাহারও হে ফিভার হয় অথবা শরীরে অবাঞ্ছিত উপসর্গ দেখা দেয়। শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ, যেমন— ফুলের পরাগরেণু, পশম, পালকের অংশ, ধুলা, বিড়াল, ঘোড়া প্রভৃতির মরামাস— শরীরে প্রবেশ করিয়া অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। কোনও কোনও ঔষধ হইতেও অ্যালার্জি হইতে পারে। প্রসাধনদ্রব্য হইতেও অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ লোকের কোনও না কোনও রকমের অ্যালার্জি আছে। যে পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহাকে বলে অ্যালার্জেন। মোটের উপর বহিরাগত অনেক পদার্থই অ্যালার্জেনরূপে অধিকাংশ লোকের শরীরেই মৃদু বা প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। নাক ও গলার অ্যালার্জি কোনও কোনও জীবাণুর আক্রমণ হইতে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই ঐ ধরনের জিনিসের সংস্পর্শে আসে, কিন্তু খুব কম লোকেরই অ্যালার্জি হয়। শিশু ভ্রূণাবস্থাতেও অ্যালার্জি-প্রবণতা লাভ করিতে পারে। উপরে যে সমস্ত কারণ বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি অথবা একটির বেশি হইতে অ্যালার্জি হইতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, অধিকাংশ অ্যালার্জেন-ই প্রোটিন জাতীয় পদার্থ।

রোগীর ত্বক, শ্বাসনালী বা পাকযন্ত্রের মাধ্যমে দেহে অ্যালার্জেন প্রবিষ্ট হয়। ইহার ফলে শরীরে যে প্রতিষেধক তৈয়ারি হয় তাহা শরীর-তন্তুর (টিস্যু) ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। হিস্টামিন, সেরোটনিন বা ঐ জাতীয় পদার্থ

ইহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই অ্যালার্জি উৎপত্তির প্রক্রিয়া।

সাধারণতঃ হে ফিভার, শরীরে চাকা চাকা স্ফীতি, মিগ্রেন (এক ধরনের মাথা ধরা), হাঁপানি, সর্দি-হাঁচি, অজীর্ণরোগ, একজিমা, বিবমিষা, সিরামজনিত অসুস্থতা প্রভৃতি অ্যালার্জির ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অতি সামান্য পরিমাণ পদার্থও শরীরে প্রবেশ করিয়া বিপদের সৃষ্টি করিতে পারে। সামান্য দুই-একটি পরাগ-রেণু শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে হে ফিভার হইতে পারে। ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিরামের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয়।

অ্যালার্জির কারণ বিভিন্ন হওয়ায় চিকিৎসাপদ্ধতিও বিভিন্ন। তবে সকল ক্ষেত্রেই প্রথমে কোন্ পদার্থের জন্য অ্যালার্জি হইতেছে, তাহা দেখিতে হইবে। তখন প্রধান কর্তব্য হইবে, সেই পদার্থটি ব্যবহার না করা বা তাহার সংস্পর্শে না আসা। অনেক সময়ে ইন্‌জেকশনের দ্বারা ত্বকের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়া উহা অ্যালার্জির কারণ কিনা তাহা নির্ণয় করা হয়। মোটের উপর আজ পর্যন্ত অ্যালার্জির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি সামান্যই জানা গিয়াছে। ইহাকে আয়ত্তে আনিতে এই সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যালুমিনিয়াম পৃথিবীর উপরিভাগের আস্তরণ শিলা দিয়া গড়া। কঠিন স্তরের শতকরা ৯৫ ভাগই আগ্নেয় শিলা। গ্র্যানিট আগ্নেয় শিলা। কোন্ স্মরণাতীত কালে ভূগর্ভ হইতে তপ্ত গলিত পদার্থ তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার পর শীতল হইয়া গ্র্যানিট শিলার রূপ নিল।

উৎসারিত গলিত তরল পদার্থ ক্রমে শীতল হইতে থাকে। তাহার পর বিভিন্ন কঠিন পদার্থ পৃথক হইয়া যায়। ক্রমে অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকেট -ঘটিত খনিজ পৃথক হইল। আগ্নেয় শিলায় পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিল বিবিধ ধাতুর আকরিক। শিলার মধ্যে যেগুলির রাসায়নিক সংযুতি (কেমিক্যাল কম্পোজিশন) নিরূপিত হইয়াছে তাহাদের বলা হয় খনিজ। কতকগুলি খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। তাহাদের বলা হয় আকরিক। যেমন বক্সাইট ; ইহা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। ইহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। বক্সাইট আকরিক ক্যানাডা, আমেরিকা, জার্মানী ও রাশিয়ায় খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিহারে (রাঁচি), মাদ্রাজে (সালেম), বোম্বাইয়ে (থানা জেলা) ও মধ্য প্রদেশে (কাটনি) বক্সাইট উত্তোলিত হয়।

কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের এক ঘন সেন্টিমিটার টুকরার ওজন পাঁচ গ্রামের অধিক। ইহাদের বলা হয় ভারি ধাতু। লোহা তামা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের এক ঘন সেন্টিমিটার টুকরার ওজন পাঁচ গ্রামের কম, তাহাদের বলা হয় হালকা ধাতু। অ্যালুমিনিয়াম (২·৭), ম্যাগনেসিয়াম এই পর্যায়ের। লোহা তামা প্রভৃতি ভারি ধাতু সহজে আকরিক হইতে নিষ্কাশন করা যায়। অথচ হালকা ধাতুগুলি করা যায় না। তড়িৎ-প্রণালী উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর নিষ্কাশন সহজ ও সুলভ হয় নাই।

তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮০৮-৭৩ খ্রী) দরবারে ভোজের সময়ে নিমন্ত্রিতদের সোনার কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত, সম্রাট্ স্বয়ং ব্যবহার করিতেন অ্যালুমিনিয়ামের কাঁটা-চামচ। অ্যালুমিনিয়াম সে যুগে অতি বিরল ছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের অধিবাসী উরস্টেড অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে সমর্থ হন। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীতে ইহা বেশি পরিমাণ উৎপাদন করা সহজ ছিল না। তখন অ্যালুমিনিয়াম ছিল বিজ্ঞানীর ব্যয়বহুল বিস্ময়। এক পাউণ্ডের দাম ছিল দুই হাজার টাকারও বেশি। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজপুত্রের জন্য ঝুমঝুমি গড়া হইয়াছিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়া।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিদ্যার ছাত্র চার্লস মার্টিন হল্ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড চূর্ণ গলিত ক্রাইওলাইটে দ্রবিত করিয়া তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেন। ক্রাইওলাইট হইল সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফ্লুওরাইড যৌগিক। এই প্রণালীর সাহায্যে আজও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। সস্তায় তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হওয়াতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের খরচও কম হইল। ক্রমে ইহার দাম আশাতীতভাবে কমিয়া গেল। এক পাউণ্ডের দাম এক টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল। রাজকুলের ভোজনাগারে ইহার ব্যবহার আর রহিল না। আজকাল সকলেই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহার করে।

চলতি ভাষায় যাহাকে আমরা মাটি বলি তাহা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট যৌগিক। পৃথিবীতে মাটি সুলভ, কিন্তু ইহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম সহজলভ্য নয়। বিচিত্র বর্ণসুষমামণ্ডিত রত্নাদির মধ্যে অনেকগুলি অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড যৌগিক, সেগুলি খুব কঠিন। শুভ্র অ্যালুমিনিয়াম

অক্সাইড ব্যতীত অন্য পদার্থযুক্ত (সেইহেতু বর্ণাঢ্য) দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা চলে না। তাই আকরিক হিসাবে বক্সাইট বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

নেপোলিয়ন ভারি ইস্পাতের পরিবর্তে হালকা অ্যালুমিনিয়াম দিয়া যুদ্ধ-সরঞ্জাম গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা তৎকালে পূর্ণ হয় নাই। উত্তরকালের রাষ্ট্রনেতারা বিমানের গাত্রাবরণে ইহার অ্যালয় ব্যবহার করিয়াছেন। শুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম নরম ধাতু, ইহার অ্যালয় শক্ত। আজকাল প্রায় ত্রিশ প্রকারের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে ড্যুরালুমিন (অ্যালুমিনিয়াম শতকরা ৯৫·৫, কপার ৩, ম্যাঙ্গানিজ ১, ম্যাগনেসিয়াম ০·৫) বেশ শক্ত অ্যালয়। বিমানের বিভিন্ন অংশ গড়িবার জন্য জার্মানীতে ইহা প্রথম উদ্ভাবিত হয়। জেপেলিনের গাত্রাবরণ ইহাতে গড়া হইয়াছিল।

তড়িৎপ্রবাহ চালনার জন্য তামার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের তার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ শুভ্র, রৌদ্র ঝড় বৃষ্টিতে ইহা ক্ষয় হয় না, তাই অ্যালুমিনিয়ামের মিহি চূর্ণে তেল মিশাইয়া প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার হয়। হাওড়ার পুলে আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ মাখানো। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের শিরোভাগ অ্যালুমিনিয়াম দিয়া মণ্ডিত হইয়াছিল। আজও তাহা বিকৃত হয় নাই।

অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের সহিত অন্য ধাতুর অক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। তাহাতে ঐ অক্সাইড হইতে ধাতু মুক্ত হইয়া গলিত তরল অবস্থায় পাওয়া যায় (থার্মাইট প্রণালী)। যেমন, ফেরিক অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের মিশ্রণে প্রজ্বলিত ম্যাগনেসিয়াম তার দিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে প্রচণ্ড রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে লৌহ ধাতু তরল অবস্থায় মুক্ত হয়। তরল লোহা দুইটি লৌহদণ্ডের যোগস্থলে গড়াইয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ পরে শীতল হইয়া শক্ত হইয়া গেলে, দণ্ড দুইটি জুড়িয়া একাঙ্গীভূত হয়। রেলপথ যোগ করিতে এই প্রণালী ব্যবহৃত হয়।

অ্যালুমিনিয়ামের পাত পিটিয়া কাগজের মত পাতলা করা যায় (অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল)। মোড়ক হিসাবে এই পাত বা ফয়েলের বহুল ব্যবহার চলিতেছে।

বিজলিবাতির ঢাকনা, কৌটা ইত্যাদি শৌখিন সুদৃশ্য করিতে অ্যালুমিনিয়ামের উপর তড়িৎপ্রবাহ দিয়া (অ্যানোডাইজিং) রঞ্জনের প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ারি আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশন হইতেছে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। মুরিতে ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি, আসানসোলে অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই ধাতু উৎপাদন করে। বেলুড়ে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে। ভেনেস্টা কোম্পানি অ্যালুমিনিয়াম-কাগজ প্রস্তুত করে। ত্রিবান্দ্রমে অ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ তড়িৎ-বাহী তার উৎপাদন করে।

বয়সে নবীন হইলেও প্রচলনে অ্যালুমিনিয়াম প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্যানাডা ও আমেরিকায় অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। ওহাইওতে ওবারলিন কলেজের রসায়নাগারে যেখানে চার্লস মার্টিন হল্ তড়িৎ-প্রণালীতে প্রথম প্রচেষ্টায় অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর কতকগুলি ক্ষুদ্র বোতাম আহরণ করিয়াছিলেন, সেখানে পরবর্তী কালে হলের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, আর তাহা গড়া হইয়াছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ঢালাই করিয়া। শিল্পীর সুযোগ্য স্মারক সন্দেহ নাই।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যালোপ্যাথি সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী লিউয়েন হোয়েকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার ও ইংরেজ চিকিৎসক হার্ভির রক্তসংবহনপ্রক্রিয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির আরম্ভ। তাহার পর দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। আয়ুর্বেদ, ইউনানি প্রভৃতি পুরাতন এবং হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক প্রভৃতি নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলি তেমন আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে না পারিয়া অনেকটা পূর্ব অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। লেন্নেক, ক্লড বার্নার্ড, কক্, ভিরসো, এচার্লিক, পাস্তুর, লর্ড লিস্টার, শার্পি, শেফার, আইনথোভেন, মেচনিকফ, প্যাভ্লভ, শেরিংটন, রোনাল্ড্ রস্ প্রভৃতির মধ্যে কাহারও কাহারও অভিনব আবিষ্কারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানও এইভাবে সমান তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। সেইজন্য প্রথম যুদ্ধোত্তর কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে বিজ্ঞানসাধকদের একনিষ্ঠ সাধনালব্ধ সাফল্যের কয়েকটি চমকপ্রদ ইতিহাস উল্লিখিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও আবিষ্কার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে

বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়িয়াছে, যেমন পেনিসিলিন, আলকাতরা হইতে প্রস্তুত ভেষজ প্রভৃতি। আবার কতকগুলি বহুবর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ফল, যেমন উপদংশের ঔষধ স্যালভার্সন বা '৬০৬' ও নূতন স্যালভার্সন বা '৯১৪', কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া ষ্টিবামাইন, ষ্টিলবামিডিন প্রভৃতি।

সালফাজাতীয় ঔষধসমূহ: জার্মানীতে পল এর্লিকই প্রথম রাসায়নিক ভেষজ প্রয়োগে জীবাণুঘটিত রোগ নিরাময়ের প্রবর্তক। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সবেমাত্র একটি একটি করিয়া কয়েকটি জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইতেছিল। কিন্তু এই সময়ে কতকগুলি জীবাণুর উপর ঔষধের কোনও প্রভাবের কথা জানা না থাকায় নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি রোগে চিকিৎসকদের বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। জার্মানীর আই. জি. ফারবেন নামক এক ঔষধ কোম্পানির বিজ্ঞানী ডাঃ গারার্ড ডোমাক ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে একটি অতি ফলপ্রদ জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কার করেন। এই ঔষধ আলকাতরা হইতে উৎপন্ন একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত। তাহা হইতে একটি অংশকে পৃথক করিয়া লইয়া টেস্ট টিউবে উৎপাদিত জীবাণুর উপর এবং জীবাণু-সংক্রামিত প্রাণীদেহের উপর তিনি উহার প্রয়োগ করেন। ইহাতে দেখা যায় যে টেস্ট টিউবে জীবাণু নষ্ট করার ক্ষমতা অপেক্ষা রোগাক্রান্ত প্রাণীদেহে জীবাণুসংহারের ক্ষমতাই ইহার বেশি। এই জিনিসটির নাম দেওয়া হইয়াছিল প্রোস্টোসিল। সেই হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আশ্চর্য মহৌষধের দ্বারা ন্যূনপক্ষে কুড়ি হাজার লোকের প্রাণরক্ষা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ কিংবা জীবাণুদূষিত ক্ষতস্থানের চিকিৎসায় সালফাজাতীয় এই ঔষধের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। পরবর্তীকালে এম্. বি '৬৯৩', প্রোসেস্টাসিন, থিয়াজামাইড, সিবাজোল, এল্‌কোসিন প্রভৃতি সালফাজাতীয় ঔষধ না থাকিলে কত লোকের যে প্রাণহানি ঘটিত, তাহা বলা কঠিন।

পেনিসিলিন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন ইংরেজ ডাক্তার অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার ফ্লেমিং। যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা, বন্দুকের গুলি প্রভৃতি নানা মারণাস্ত্রে আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশের ফলে অকালে বহু অমূল্য জীবনের হানি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডনের সেন্ট মেরী হাসপাতালে তিনি রক্তে জীবাণুদুষ্টির প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিন স্ট্যাফাইলোকক্কাস জাতীয় জীবাণু সম্বন্ধে পরীক্ষাকালে হঠাৎ তিনি দেখিতে পান যে, জীবাণুর 'কলোনি'-সমন্বিত পেট্রিডিশের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ বাতাস হইতে উড়িয়া আসিয়া সেখানে ছাতার মত কিছু গজাইতেছে ও ক্রমে কলোনিগুলির দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের বিস্তারকে বাধা দিতেছে। সবুজ বর্ণের ঐ ছত্রটিকে ঘিরিয়া একটি চক্রাকার স্বচ্ছ বেষ্টনী রহিয়াছে, আর সেই স্বচ্ছ বেষ্টনীর মধ্যস্থিত মারাত্মক জীবাণুগুলি যেন নির্জীব বলিয়া দেখাইতেছে। সম্ভবতঃ এই ছত্রাকের দ্বারা নিঃসৃত কোনও রসের ক্রিয়ার ফলেই ঐরূপ হইয়াছে, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। আরও পরীক্ষায় বোঝা গেল যে ইহা পেনিসিলিয়াম জাতীয় ছত্রাক। তৎপরে তাহার ক্বাথের একটি অংশকে ফিল্টার করিয়া স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর কলোনিপূর্ণ পেট্রিডিশে দিয়া দেখা গেল যে, তাহার প্রভাবে মারাত্মক জীবাণুগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ফ্লেমিং সেই ক্ষুদ্র ছত্রাকের কলোনি হইতে যতটুকু সম্ভব যত্নসহকারে রক্ষা ও বর্ধন করিতে লাগিলেন।

স্বাভাবিক রক্তের উপর এই পেনিসিলিয়াম-এর নির্যাসের কোনও ক্ষতিকর প্রভাব আছে কিনা, অতঃপর তাহারই পরীক্ষা শুরু হইল। যখন তিনি দেখিলেন যে ইহার দ্বারা স্লাইডের উপর গৃহীত রক্তের শ্বেত বা লোহিত কণিকার কোনও ক্ষতি হইল না, তখন তিনি খরগোশের শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশনের দ্বারা তাহা প্রবেশ করাইয়া খরগোশটির শরীরে কোনও অস্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং মানুষের পক্ষে ইহার প্রয়োগে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই জানিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। এইভাবে জীবাণু সংক্রমণের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ পেনিসিলিনের আবিষ্কারে অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার ফ্লেমিং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ জার্নাল অফ এক্সপেরিমেণ্টাল প্যাথোলজি'-তে তাঁহার নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার কথা বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবাণুনাশক সালফাজাতীয় ঔষধগুলির আবিষ্কার ও প্রয়োগ এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনুরূপ ঔষধের চাহিদা এতকালের অনাদৃত ও অবহেলিত বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অক্সফোর্ডে অস্ট্রেলিয়ান অধ্যাপক ডাঃ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাঃ আর্নেস্ট বেইন ও তাঁহাদের সহকর্মীরা ছত্রাক নির্যাস হইতে সংশোধিত ভেষজাংশ 'পেনিসিলিন' বাহির করিতে সক্ষম

হইলেন এবং যাহাতে তাহা সহজে নষ্ট না হয় এইরকম পেনিসিলিন-লবণও প্রস্তুত করিলেন। যে স্বল্প পরিমাণ পেনিসিলিন ২৫০০০০ স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুকে নষ্ট করিতে পারে, তাহাকেই তাহার 'ইউনিট' বলিয়া নির্ধারিত করিলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় এই বিষয়ে খুবই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখা দেয়। ডাঃ ফ্লোরি ও ডাঃ হিটলি একটি টেস্ট টিউবের মধ্যে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক সঙ্গে লইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। সেখানে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ডাক্তার হিটলি ও মার্কিন ডাক্তার ময়ার শস্য-ভিজানো জলে ছত্রাকের চাষ করিয়া পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ ছত্রাক উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন। তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই ফলপ্রদ ঔষধটির উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান (O.S R.D.) স্থাপন করিয়া প্রচুর পেনিসিলিন উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং-এর তত্ত্বাবধানে ইংল্যাণ্ডেও একটি পেনিসিলিন প্রস্তুতির কারখানা স্থাপিত হইল। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই এই অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধের প্রস্তুতি চলিতেছে এবং এককালে যাহা ছিল অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য, আজ তাহা অতি সুলভ এবং ইহার দৌলতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু নিবারিত হইতেছে। এই আবিষ্কারের জন্য ফ্লেমিং নাইট উপাধিতে এবং ফ্লেমিং ও ফ্লোরি একই সঙ্গে নোবেল প্রাইজের দ্বারা সম্মানিত হন।

স্ট্রেপটোমাইসিন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নিউ জার্সির বিজ্ঞানীদের নিশ্চিত ধারণা হয় যে, মৃত্তিকাজাত অন্যান্য ছত্রাক হইতেও পেনিসিলিনের মত ফলপ্রদ অন্যান্য ঔষধের আবিষ্কার সম্ভব হইতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা এই বিষয়ে গবেষণাকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ইহারই ফলে রাটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ জার্সি কৃষি গবেষণা বিভাগের ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেপটোমাইসিন নামে যক্ষ্মা-জীবাণু-ধ্বংসকারী ঔষধটি আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে ঐ জীবাণুর পুষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ হইল।

ডাঃ ওয়াক্সম্যানের ছাত্র রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডাঃ দুবো-র গবেষণাকে স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কারের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। ডাঃ দুবো কয়েকটি পাত্রে জীবাণুসহ মাটি লইয়া তাহাদের মুখ এমন ভাবে ঢাকিয়া দিলেন যাহাতে তাহাদের মধ্যে অন্য কোনও জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে। তাহার পর যে পর্যন্ত না তাহারা ঐ মাটি হইতে লভ্য খাদ্যগুলি খাইয়া শেষ করে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। সেই অবস্থায় প্রত্যেকটি পাত্রে নিউ-মোনিয়া জীবাণুকে মিশাইয়া কয়েকদিন পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি পাত্রে নিউমোনিয়া জীবাণুকে খাদ্যরূপে গ্রহণ না করিয়াই আগেকার জীবাণুগুলি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি পাত্রের জীবাণু নিউমোনিয়া জীবাণুকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই শেষোক্ত জীবাণুগুলির চাষবৃদ্ধির দ্বারা তাহাদের দেহ হইতে নিউ-মোনিয়ার জীবাণু-ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থ, অর্থাৎ টাইরোথ্রিসিন এবং গ্রামিসিডিন নামে জীবাণুধ্বংসী ঔষধ আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োগের পর রক্ত-কণিকার অনিষ্ট হয় বলিয়া টাইরোথ্রিসিন নিউমোনিয়া রোগে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে অপর ঔষধটি ব্যবহৃত হইতেছে। ক্ষত ও চর্মরোগে এই দুইটি ঔষধই ফলপ্রদ। ডাঃ দুবো-র গবেষণা কিন্তু পেনিসিলিনের ভবিষ্যতের পক্ষে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ঐ গবেষণার ভিত্তিতেই নিউ জার্সির বিজ্ঞানীরা জীবাণুধ্বংসী ছত্রাক বা অন্য জীবাণু -নিঃসৃত রাসায়নিক ভেষজ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হন এবং ওয়াক্সম্যান স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারে সক্ষম হন। নিউ জার্সির রওয়ে-র মার্ক কোম্পানি ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলে এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। এই ঔষধটি কিন্তু পেনিসিলিনের মত প্রতিক্রিয়াশূন্য নহে। এই আবিষ্কারের জন্য ওয়াক্সম্যানও নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন।

ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন ও অরিয়োমাইসিন : পেনিসিলিন একটি অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ হইলেও, কারণে-অকারণে বারবার প্রয়োগে ইহার প্রতিরোধক শক্তি গড়িয়া উঠে। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে আপাতঃ সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় জীবাণুগুলি শুধু যে পেনিসিলিন প্রতিরোধক শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এমন নহে, অনেক সময়ে ঐ কারণেই মাথা চাড়া দিয়া রোগের সৃষ্টিও করিতে পারে। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্বে ডাঃ ফ্লেমিং অকারণে কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে পেনিসিলিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, এইভাবে অযৌক্তিক ব্যবহারের ফলে পেনিসিলিন যখন অকেজো বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তখনও জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এই রকম অলৌকিক গুণসম্পন্ন কয়েকটি ঔষধও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আরও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য বলিয়া ব্রড-স্পেক্ট্রাম অ্যাণ্টিবায়োটিক নামে খ্যাত।

নিম্নে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এইরূপ কয়েকটি ঔষধের উল্লেখ করা গেল।

ডাঃ মিলড্রেড রেব্‌স্টক নামক একজন মহিলা চিকিৎসকই ক্লোরোমাইসেটিনের রাসায়নিক প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং বর্তমানে ইহা পার্ক-ডেভিস কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ব্যাসিলারি আমাশয়, মাম্প্‌স প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ কিং এইরকম আর একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নাম টেরামাইসিন। এই ঔষধটি গলা, শ্বাসনালী, ফুসফুস প্রভৃতির এবং অন্যান্য বহু জীবাণুঘটিত রোগের ঔষধরূপে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। আমেরিকার ফাইজার কোম্পানি ইহার প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক।

অনুরূপভাবে লেডারলে কোম্পানির কয়েকজন অক্লান্তকর্মী গবেষকের (তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারতীয় ডাঃ সুব্বা রাও) দ্বারা আর একটি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য শক্তিশালী জীবাণুনাশক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম অরিয়োমাইসিন। বি-কোলাই প্রভৃতি মূত্র-সংশ্লিষ্ট জীবাণু-সংক্রমণে ও অন্যান্য বহু রোগে এই ঔষধটি মহৌষধরূপে পরিচিত।

ব্যাসিট্র্যাসিন: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যবিদ্যা কলেজের দুইজন চিকিৎসক ডাঃ ফ্রাঙ্ক মিনিলি ও মিস বলবিনা জনসন এই জীবাণুনাশক ঔষধটির আবিষ্কারক। মার্গারেট ট্র্যাসি নামক একজন রোগীর পায়ের হাড় ভাঙার পর জীবাণুদূষিত ক্ষতস্থান হইতে সংগ্রামরত কিছু জীবাণুকে গবেষণাগারে লইয়া আসা হয়। বারবার তাহাদের চাষবৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহাদের দেহ হইতে জীবাণু-নাশক একটি পদার্থ বাহির করিয়া নাম দেওয়া হইল ব্যাসিট্র্যাসিন (অর্থাৎ ট্র্যাসির দেহ হইতে প্রাপ্ত ব্যাসিলাই-প্রতিষেধক ঔষধ)। প্রথমে ইহার প্রয়োগ হইত বাহ্যিক ক্ষতস্থানে, ফোড়ার মধ্যে ইন্‌জেকশনের সাহায্যে কিংবা ক্ষতস্থানে মলমরূপে। বর্তমানে পেশীতে কিংবা প্রয়োজন-মত শিরার মধ্যে দ্রবণকে ইন্‌জেকশন করিয়া রক্তপ্রবাহে যথাস্থানে বাহিত অবস্থায় জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামের জন্যও ব্যবহৃত হইতেছে। অতি আধুনিক ঔষধ হইলেও ইতিমধ্যেই ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার সংক্রমণ-প্রতিষেধকক্ষমতা ও বেদনা-নাশক শক্তি অসাধারণ।

টোম্যাটিন: টোম্যাটো, বাঁধাকপি, রসুন, মিষ্টি আলু, সয়া বীন, বুনো আদা প্রভৃতি নানা উদ্ভিজ্জ উপাদান হইতেও জীবাণুনাশক নানা পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের মধ্যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে টোম্যাটো গাছের পাতা ও ডাঁটার রস হইতে আবিষ্কৃত 'টোম্যাটিন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের দুইজন বিজ্ঞানী ডাঃ আর্ভিংস্টোন ও ডাঃ ডি. টি. ফন্‌টেন ঐ রস হইতে সবুজ রঙের পদার্থটি বাহির করিয়া, বায়ুশূন্য পাত্রে পাতনপ্রক্রিয়ার দ্বারা অবশিষ্ট তরল পদার্থকে ঘনীভূত করিয়া এই ঔষধটি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। ক্রীড়াবিদদের পায়ে দূষিত ছত্রাক বা ঈস্ট-জনিত যে সকল ব্যাধি পূর্বে দুরারোগ্য ছিল, বর্তমানে টোম্যাটিনের সাহায্যে অনায়াসেই তাহার চিকিৎসা হইতেছে। অন্যান্য অনেক রোগেও ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশকে 'অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ' বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। লিউয়েনহোয়েক হইতে আরম্ভ করিয়া পাস্তুর, কক্‌ প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ অনেক রোগের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আজ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনায় ছত্রাক, মৃত্তিকাজাত জীবাণু কিংবা উদ্ভিজ্জ উপাদান হইতে এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে নিত্য-নূতন জীবাণুনাশক ভেষজ আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সকল যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

অ্যাসিড স্মরণাতীত কাল হইতে জানা ছিল তেঁতুল, লেবু, দই প্রভৃতি টক। কেন টক, জানা ছিল না। পরে জানা গেল তেঁতুল, লেবু, দই প্রভৃতিতে কোনও না কোনও অ্যাসিড থাকে বলিয়া তাহা টক হয়। জীব হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া অ্যাসিডগুলিকে বলা হয় জৈব অ্যাসিড। সিট্রিক, টার্টারিক ও ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড, (যথাক্রমে লেবু, তেঁতুল ও দই হইতে প্রাপ্ত) সবই জৈব অ্যাসিড। অজৈব বা খনিজ অ্যাসিডের সন্ধান আসিল অন্য ভাবে। আমাদের দেশের আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর রসশাস্ত্রগুলিতে শঙ্খদ্রাবকের উল্লেখ আছে। ইহা একপ্রকার অ্যাসিড (বোধ করি হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ), ইহার সহিত শঙ্খের রাসায়নিক ক্রিয়ায় শঙ্খ ক্ষয় হয়। যে রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা অ্যাসিড দ্রবণে দ্রবীভূত থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রে অ্যাসিডকে দাহজল বলা হইয়াছে। অনেক খনিজ অ্যাসিড, যেমন নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড গায়ে

লাগিলে প্রদাহ হয় বলিয়া বোধ করি দ্রবণটিকে দাহজল বলা হইয়াছে। আর একটি কথার উল্লেখ আছে, ভিদ। ইহাও অ্যাসিড ; ইহা ধাতুঘ্ন, ইহার প্রভাবে ধাতু ক্ষয় হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড তামা ধাতু অনায়াসে ক্ষয় করে, তামা নীল বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ কপার নাইট্রেটে পরিণত হয়। ইহা অ্যাসিডে দ্রবিত হইয়া নীল দ্রবণ উৎপাদন করে। ফটকিরি, হীরাকস, নিশাদল ও সোরার মিশ্রণে তাপ দিয়া পাতন করিয়া মহাদ্রাবক রস (আধুনিক যুগের হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ) উৎপাদন করা হইত। এইরূপ মিশ্রণে তাপ দিলে ফটকিরি হইতে জল, হীরাকস হইতে জল ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড নামক তরল পদার্থ সহজে উৎপন্ন হয়। উক্ত সালফার যৌগিক ও জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত নিশাদলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, আর সোরার ক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। আজও অনুরূপ প্রণালীতে হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য সালফার বা গন্ধক বায়ুতে দহন করিয়া সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করিয়া পুনরায় তাহার সহিত নির্মল বায়ু মিশাইয়া তপ্ত প্ল্যাটিনাম (৪৫০° সেন্টিগ্রেড) চূর্ণের উপর প্রবাহিত করিলে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। ধাতুর মত কঠিন পদার্থকে ক্ষয় বা দ্রবণ করিতে পারে বলিয়া সেকালে খনিজ অ্যাসিডকে বলা হইত দ্রাবক।

পদার্থের অম্ল আস্বাদ হইলে তাহাকে অ্যাসিড বলা হয়। প্রদাহক বলিয়া কোনও কোনও খনিজ অ্যাসিড আস্বাদ করা সম্ভব নয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অবশ্য ব্যতিক্রম, জল মিশাইয়া লঘু করিয়া ইহা আস্বাদ করা চলে। পাকস্থলীতে জারকরসে শতকরা অর্ধভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। ইহা খাদ্য পরিপাক করিতে সাহায্য করে, পরিমাণ কম পড়িলে চিকিৎসকেরা দুই-দশ ফোঁটা অত্যন্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

লিটমাস এক প্রকার উদ্ভিজ্জ নীল রঞ্জন। অ্যাসিডের সংস্পর্শে ইহা লাল রঞ্জনে পরিণত হয়। জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সংস্পর্শে লঘু অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। যে কোনও অ্যাসিডের অণুতে অন্ততঃ একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। উহা ধাতুর সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় অ্যাসিড অণু হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ধাতুর পরমাণু উক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থান গ্রহণ করে। অ্যাসেটিক অ্যাসিডে সর্বসমেত চারিটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি ধাতুর ক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, দুইটিই বিচ্ছিন্ন হয়। যে কোনও অ্যাসিডের সহিত ক্ষারের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

জিঙ্কের টুকরার উপর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া দেখা যায় না। ঐ টুকরা সমেত প্রায় তিনগুণ জলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে অ্যাসিড লঘু হয়, তখন ধাতুর সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। বলা হয় গাঢ় অ্যাসিডের শক্তি কম, কেননা ইহা আয়নায়িত নয়। ইহাতে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ কম। অ্যাসিড দ্রবণের শক্তি বেশি, কেননা ইহাতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের শক্তি বেশি, জৈব অ্যাসিড অ্যাসেটিকের শক্তি কম।

দেশের বিবিধ রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক শিল্পে অ্যাসিডের ব্যবহার আছে। বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় নাইট্রিক, সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি অজৈব অ্যাসিড এবং অ্যাসেটিক, ল্যাকৃটিক, সিট্রিক, স্টিয়ারিক, টার্টারিক, স্যালিসিলিক প্রভৃতি জৈব অ্যাসিড। আমাদের দেশে প্রায় পঞ্চাশ বছর হইল সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদির উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গত মহাযুদ্ধের পর অ্যাসিড-উৎপাদন-শিল্পের প্রচার ও প্রসার হইয়াছে। সালফিউরিক অ্যাসিড কৃত্রিম সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। ইহা হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনেও কাজে লাগে। কেবল তাহাই নয়, ফটকিরি, তুঁতে, এপসম সল্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন। কৃত্রিম রেশম, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড অপরিহার্য। ভারতের প্রায় বারটি প্রদেশে সালফিউরিক অ্যাসিড -শিল্পের প্রসার হইয়াছে।

নাইট্রিক অ্যাসিড বিস্ফোরকশিল্পে, কৃত্রিম তন্তু ও কাগজ -শিল্পে, নাইট্রো-সেলুলোজ উৎপাদনে, রুপা ও সোনা -শোধনে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করিয়া জিঙ্ক ক্লোরাইড উৎপাদন করা হয়। জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণ তন্তু ও বস্ত্র -শিল্পে সুতা ভিজাইতে দরকার হয়। বিবিধ ক্লোরাইড রাসায়নিক প্রস্তুতিতে লাগে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অ্যাসিরিয়া অসুর ও সুমের দ্র

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া ভারতের অন্যতম সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর বাঙালী সাংবাদিক কে. সি. রায় দেশীয় সংবাদ সরবরাহ করার কথা প্রথম চিন্তা করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়টারের প্রতিনিধি ও অন্যান্য দুই-এক জন বন্ধুর সহিত 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' (এ পি. আই) নামে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। কে. সি. রায়কে এই বিষয়ে সাহায্য করেন তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী উষানাথ সেন। তিনি এ. পি. আই. -এর প্রথম শাখা স্থাপন করেন মাদ্রাজে। কিছুদিন পরেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ভারত সরকারের পরামর্শে সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দেশীয় সংবাদ টেলিগ্রামের সাহায্যে পরিবেশন করার জন্য 'ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সি' (আই. এন. এ) নামে আরও একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

কিছুকাল পরে এ পি. আই. -এর ইংরেজ সহকর্মীগণ কে. সি. রায়কে এ পি আই. -এর অংশীদার করিতে অস্বীকার করিলে তিনি এ. পি. আই ছাড়িয়া দেন ও ভারতীয় সহকর্মীদের লইয়া 'নিউজ বিউরো' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রয়টার 'ঈস্টার্ন নিউজ এজেন্সি' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ও কে. সি. রায়ের সম্মতি লইয়া এ. পি আই., আই. এন. এ., নিউজ বিউরো— এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বই কিনিয়া লয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কে. সি রায় এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা (ডিরেক্টর) ছিলেন। তাহার পর স্যর উষানাথ সেন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উষানাথ সেন এ. পি. আই. -এর অধিকর্তা ও নির্বাহী প্রতিনিধি (ম্যানেজিং এজেণ্ট) ছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে নিজস্ব সংবাদ পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ঐ বৎসরই ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিকদের সংস্থা 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ঈস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি'-র উদ্যোগে 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া' (পি. টি. আই.) নামে একটি যৌথ কোম্পানি গঠিত হয়। এই সংস্থাই রয়টারের ভারতীয় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মালিকগণই এই প্রতিষ্ঠানের অছি বা ট্রাস্টি।

বিগত ১৪ বৎসরে ভারতের জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পি. টি. আই. প্রভূত প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাহার টেলিপ্রিণ্টারে সংযুক্ত প্রায় ৪৭টি শাখা আছে। মোট কর্মীসংখ্যা ৯০০। ইহা ছাড়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রায় ২৫০ জন সংবাদদাতা আছেন। নিজস্ব সংবাদ ছাড়াও রয়টার ও এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস হইতে বৈদেশিক খবর ক্রয় করিয়া পি. টি. আই. তাহার তিন শতাধিক দৈনিক সংবাদপত্রের গ্রাহকদের উহা বণ্টন করে।

অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাস্ট্রনমি জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্র

ইউ. এন. ও. রাষ্ট্রসংঘ দ্র

ইউক্লিড এউক্লিদেস দ্র

ইউ-চি মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইহারা চীন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত। পরে হুন জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। যাযাবর-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া তাহাদের জীবনধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। ইউ-চি জাতির একটি ছোট শাখা সম্ভবতঃ তিব্বতের দিকে চলিয়া আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর শাখা অনুকূল অঞ্চলের অন্বেষণে শকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া শিরদরিয়া নদীর অববাহিকাতে কিছুকাল বসবাস করে। হূনদিগের দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হইয়া আমুদরিয়া (অক্সাস্) নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। সম্ভবতঃ এই সময়ে যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কৃষিকর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ইউ-চিগণ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই পাঁচটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাখাটির নাম কুষাণ। একদা-অনুন্নত এই যাযাবর জাতিই কাবুল-কান্দাহার হইতে বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহারা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করে।

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া ভারতের অন্যতম সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত। দক্ষিণী সাংবাদিক সদানন্দ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ফ্রি প্রেস নামে প্রথম যে স্বদেশী সংবাদ প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তাহার কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। ফ্রি প্রেস আর্থিক কারণে বন্ধ হইয়া গেলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের

১ সেপ্টেম্বর বিধুভূষণ সেনগুপ্ত উহার কলিকাতা কেন্দ্রকে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ায় (ইউ পি. আই) রূপান্তরিত করেন। তাঁহার প্রভূত শ্রম ও দক্ষতায় অল্প দিনেই সমগ্র ভারতে ইহার ত্রিশটি শাখা স্থাপিত হয়। টেলিপ্রিণ্টারযোগে সর্বত্র সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। শাসকশক্তির প্রবল বিরোধিতার মুখে নির্ভয়ে সত্য সংবাদ প্রচার করিয়া ইউনাইটেড প্রেস স্বাধীনতাসংগ্রামের বিশেষ সহায়তা করে। এজন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। পরিচালনা-সমিতির সদস্যদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কর্মধারা বহুমুখে বিস্তৃত হইবার ফলে ব্যয় যেভাবে বাড়িয়া যায় সেই অনুপাতে আয় না হওয়ায় ইহা দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। উপযুক্ত অর্থানুকূল্যের অভাবে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে এই সম্মানিত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ইউনানি অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে অপর দুইটি প্রাচ্যদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি প্রাচীন ভারতীয় বা আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতি এবং অপরটি ইউনানি, তিব্ব বা প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি। সাধারণ কথায় এই দুইটি যথাক্রমে কবিরাজি ও হাকিমি চিকিৎসা নামে পরিচিত।

আরবী ভাষায় প্রাচীন গ্রীসের নাম ছিল 'ইউনান'। প্রাচীন আরবীয় চিকিৎসাপদ্ধতির (এবং বর্তমান অ্যালো-প্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতিরও) জনক ছিলেন হাকিম বোক্‌রাৎ বা হিপোক্রেতিস। তিনি ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীস দেশের অন্তর্গত কাস্‌ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক বা ইউনানবাসী ছিলেন বলিয়াই আরবীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি 'ইউনানি' নামে খ্যাত। আরবীয় চিকিৎসাপদ্ধতি মূলতঃ হিপোক্রেতিস ও রোমদেশবাসী গ্যালেন -এর (দ্বিতীয় শতক) দ্বারা প্রভাবিত হইলেও আয়ুর্বেদীয় এবং চৈনিক চিকিৎসাপদ্ধতির কাছেও অনেকটা ঋণী। আয়ুর্বেদোক্ত তিনটি ধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ ইউনানিতে রুহ্‌, সফ্‌রা ও বল্‌গম্‌ নামে পরিচিত। এক বা একাধিক ধাতুর অস্বাভাবিকতার ফলে রোগের উদ্ভব হয় বলিয়া ইউনানিতে স্বীকৃত। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের মত ইউনানিতেও বায়ু শুধু শ্বসনই নয়, বস্তুতঃ তাহা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান— এই পাঁচ প্রকার বায়ুর সমন্বিত ক্রিয়া। সফ্‌রা বা পিত্ত দুই প্রকার: ১. তাবায়ী বা স্বাভাবিক এবং ২. গায়ের তাবায়ী বা বিকৃত। তাবায়ী বা স্বাভাবিক সফ্‌রার বর্ণ লাল ও পীতের আভাযুক্ত, তরল বা লঘু এবং তেজস্কর। কিন্তু গায়ের তাবায়ী অর্থাৎ বিকৃত সফ্‌রা পাঁচ প্রকার: ১. মেরাতল সফ্‌রা— তরল কফমিশ্রিত, ২ মহিয়া— কফমিশ্রিত ও গাঢ় ডিমের কুসুমের মত, ৩. সফ্‌রা কারাসি— কায়লুস (কাইল) -এর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া মেরাতল সফ্‌রা পাকস্থলীতে কতকটা পরিপক্ক অবস্থায় কালো সবুজ রং ধারণ করে, ৪. সফ্‌রায়ে জাঙ্গারি লোহার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বিকৃত ও অবিকৃত সফ্‌রার মিশ্রণ এবং ৫. সফ্‌রায়ে মোহতারেক- অর্থাৎ বিকৃত ও অবিকৃত সফ্‌রার মিশ্রণে গাঢ় লালবর্ণ সফ্‌রা।

এইরূপ, তাবায়ী বল্‌গম্‌ বা কফ শাদা ও সুমিষ্ট আস্বাদযুক্ত। বিকৃত বা গায়ের তাবায়ী বল্‌গম্‌ আস্বাদ অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত: ১. সামান্য রক্তমিশ্রিত বল্‌গমে শিরীন (মিষ্ট) বল্‌গম্‌, ২. অল্প সফ্‌রা মোহতারেক -যুক্ত নেমকিন (লবণ) বল্‌গম্‌, ৩ তোর্শ (অম্ল) বল্‌গম্‌, ৪ কাসেলা (কষায়) বল্‌গম্‌ এবং ৫ বল্‌গম্‌ ফিকা (আস্বাদহীন)।

আবার গায়ের তাবায়ী বল্‌গম্‌ সমভাবে তরল বা সমভাবে গাঢ় হইলে মস্তাবী উল্‌ কেওয়াম এবং কতকাংশ তরল ও কতকাংশ গাঢ় হইলে মখ্‌তালে ফুল কেওয়াম নামে পরিচিত। নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত কতকাংশ তরল ও কতকাংশ গাঢ় হইলে তাহার নাম হয় বল্‌গমে মোখাতী। আবার আপাততঃ সমভাবে তরল বলিয়া বোধ হইলে তাহাকে বলে বল্‌গমে খাম।

ইউনানি পদ্ধতিতে, নানাকারণঘটিত এইরূপ রোগের চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম এল্‌মে তিব্ব, যেমন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম আয়ুর্বেদ। ইহার মধ্যে আবার দুইটি বিশিষ্ট অংশ আছে: ১. নজরী— অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তথ্য— ক উমুর তাব্‌য়ীয়া (শারীরবৃত্ত), খ. আহওয়াল বাদান (অবস্থা), গ. আস বাব (নিদান) এবং ঘ. আলামাৎ (লক্ষণ)। প্রথমটি হইল বর্তমান শারীরসংস্থান, শারীরবিদ্যা এবং ত্রিধাতুসম্বন্ধ-জ্ঞান। ২. আমলী— রোগ, তাহার কারণ ও লক্ষণগুলির চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন ও চিকিৎসা -সম্বন্ধীয় অন্যান্য নির্দেশযুক্ত অংশ।

ইউনানি পদ্ধতিতে শরীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য:

১. আর্‌কান (উপাদান)— দেহের অবিভাজ্য উপাদানসমূহ। এইগুলি অনেকটা আয়ুর্বেদোক্ত পঞ্চভূতের

অনুরূপ। যেমন আর্দো বা খাক (ক্ষিতি), মায়ো বা আব্ (অপ্ বা জল), নারো বা আতস্ (তেজঃ), হাওয়া বা বাদ (মরুৎ বা বাতাস)। শরীরে ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থার নাম মেজাজ মোতাদেল এবং অস্বাভাবিক অবস্থার নাম গায়ের মোতাদেল।

২. আজম বা অস্থিসমূহ— ইহাদের সংখ্যা ২৪৮।

৩. আখ্লাৎ বা ধাতুসমূহ— ভুক্তদ্রব্য যে চারি স্তরে পরিপাকের পর বিশিষ্ট রূপান্তর গ্রহণ করে সেগুলি হইল: ক. হজম মেয়েদি (পাকস্থলীতে), খ. হজমে কাবাদি (যকৃতে), গ. উরুকী বা রতুবতে সানিয়া (বৃহৎ শিরায়) এবং ঘ আজওয়ি (প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে)।

৪. আজা বা অঙ্গসমূহ— চারিটি আখ্লাৎ হইতে উৎপন্ন দেহাংশসমূহ। শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ইহাদের নাম: ক. আজায়ে রয়িসা, যেমন— দেল (হৃৎপিণ্ড), দেমাগ (মস্তিষ্ক), জেগের বা কাবাদ (যকৃৎ) এবং উন্সায়ায়েন (অণ্ডকোষ); খ. আজায়ে রয়িসার সাহায্যকারী খাদেমোর রয়িসা, যেমন— শিরা ও পেশীসমূহ; গ আজায়ে মরুসা (ঐরূপ সাহায্যকারী নহে), যেমন— মেদা (পাকস্থলী), গুরদা (মূত্রাশয়) প্রভৃতি; এবং গায়ের মরুসা অর্থাৎ ঐগুলি ভিন্ন অপরাপর যেমন— ঘ. মোফারেদা আজম: ওয়াতার (কণ্ডরা), রেবাৎ (সন্ধিবন্ধনী), শহাম (চর্বি), জেলদ (ত্বক), মোয় (চুল), নাখুন (নখ), গুজরফ (তরুণাস্থি) প্রভৃতি এবং ঙ. আজায়ে মোরাক্কাব্বা: আয়েন (চোখ), ওজান (কান), জবান (জিহ্বা), রিয়াহ্ (ফুসফুস), সাদি (স্তন), তেহাল (প্লীহা), আমা (অন্ত্রসমূহ), কাজীব (লিঙ্গ), রেহেম (জরায়ু) প্রভৃতি।

৫. খুন বা দাম যখন হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়ার পর পরিপক্ব সূক্ষ্ম অংশ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তখনই তাহাকে বলা হয় রুহ্ বা বায়ু। হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত অংশের নাম রুহ্-হায়ওয়ানী, মস্তিষ্কে উপনীত ও পরিবর্তিত অংশের নাম রুহ্-নাফ্সানী এবং যকৃতের দ্বারা পরিবর্তিত অংশের নাম রুহ্-তাবায়ী।

৬. কোওয়া বা শক্তি তিন প্রকার: ক. কুয়তে তাব্য়ীয়া (প্রাকৃতিক), খ. কুয়তে হায়ওয়ানীয়া (শারীরিক) এবং গ. কুয়তে নাফ্সানিয়া (মানসিক)।

যকৃতের কুয়তে তাব্য়ীয়া গাজিয়ার দ্বারা দেহের পুষ্টি, নামিয়ার দ্বারা দেহবৃদ্ধি, মৌলেদার দ্বারা শুক্র উৎপাদন এবং মোসৌবেরা দ্বারা অঙ্গসমূহের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়। কুয়তে হায়ওয়ানীয়া বায়ু শোধনহেতু হৃৎপিণ্ডকে স্নিগ্ধ রাখে এবং প্রয়োজনমত মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার শক্তি জোগায়। যথাক্রমে উপকারিতা ও অপকারিতা উপলব্ধি অনুসারে কুয়তে নাফ্সানিয়ার নাম হয় মোদাররেকা ও মোহররেকা। মোদাররেকা আবার দুই প্রকারের: ক. জাহেরি বা কর্মেন্দ্রিয়— বাসেরা (দৃষ্টিশক্তি), সামেয়া (শ্রবণশক্তি), শামেয়া (ঘ্রাণশক্তি), জায়েকা (আস্বাদশক্তি) এবং লামেসা (স্পর্শনশক্তি)। ইহাদের স্থান মস্তিষ্কের বহির্ভাগে। খ. বাতেনি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়— হিসমোশতারেক (বহিরিন্দ্রিয়গুলির শক্তির সমন্বয়), খেয়াল (কল্পনা), মোতাসাররেকা (দৃষ্টিবোধগম্যতা), ওহাম (কল্পনাশক্তি) ও হাফেজা (স্মৃতিশক্তি)। ইহাদের অবস্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।

৭. আফ্য়লি (ক্রিয়া)— একটি শক্তির দ্বারা সম্পন্ন দৈহিক ক্রিয়ার নাম ফেল মোরাক্কাব এবং দুই বা ততোধিক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন দেহক্রিয়ার নাম ফেল মোফরাদ।

এল্মে তিব্বের দ্বিতীয় বা আমলী অংশের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ রোগের বিবরণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাপ্রণালীর উল্লেখ আছে।

আমরাজ দেমাগ বা শিরোরোগ যেমন সোদা বা শিরঃপীড়া, শাকিকা বা অর্ধ শিরঃপীড়া, সোবাৎ বা গাঢ় নিদ্রা, সাহার বা অনিদ্রা, সোবাৎ সাহরি বা সংজ্ঞাহীন গাঢ় নিদ্রা, সাদার ও দাওয়ার বা শিরোঘূর্ণন, নিস্ইয়ান বা স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মালেখুল্লিয়া বা বিমর্ষ রোগ, সার্সাম (মেনিন্জাইটিস), সেরা (মৃগী), উম্মুস সিব্ইয়ান (শিশুর তড়কা), কাবুস (দুঃস্বপ্ন) এস্তেরেখা, ফালেজ ও লাক্ওয়াহ্ (পক্ষাঘাত, একাঙ্গবাত ও মুখের পক্ষাঘাত), রাশা (তাণ্ডব রোগ) প্রভৃতি। তাহা ছাড়া নাসারোগ, চক্ষু-রোগ, কর্ণরোগ, দন্তরোগ, জিহ্বারোগ, মোহ, হাতুস সত্তৎ (স্বরভঙ্গ), জিকুথাফাস (শ্বাসরোগ), সোয়াল ও শাদিদ সোয়াল (সাধারণ কাশ ও ব্রঙ্কাইটিস), সুজাক (প্রমেহ), আতশক হাকিকী (কঠিন উপদংশ) এবং আতশক মেজাজী (নরম উপদংশ) প্রভৃতি রোগের যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাবুল আদ্বিয়া বা ঔষধ অধ্যায়ে, সেরেফ দাওয়া বা কেবল ঔষধ জাতীয় উপাদান খুবই কম আছে। গেজায়ে দাওয়ায়ীর (খাদ্য অথচ ঔষধ) সংখ্যাই অধিক এবং ঐগুলিই সাধারণতঃ দাওয়া বা ঔষধরূপে পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির যথাযথ ব্যবহারে শরীরের অবস্থা সকল সময়ে সমভাবে থাকে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে বারবার সেবন করিলেও আরওয়াহ্ বা কোওয়ার ক্রিয়া নষ্ট হয় না অথবা দেহের ক্রিয়া বা অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে না।

এইগুলিকে প্রকৃত ঔষধ বা মোতাদেল বলে। কয়েকটিতে বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাদের নাম গায়ের মোতাদেল।

গায়ের মোতাদেলের কয়েকটি শ্রেণী আছে। দর্জা আউওয়ালের প্রয়োগে শরীরের যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটিলেও স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহ ঠিকই চলিতে থাকে। দর্জা দুওয়াম অল্পমাত্রায় সেবন করিলে শরীরের কোনও না কোনও ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। দর্জা সুওয়াম-এর অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে কোনও না কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলেও জীবনসংশয় হয় না। আর দর্জা চাহারাম বা চতুর্থশ্রেণীর ঔষধগুলি শরীরের ক্রিয়াসমূহকে নষ্ট করিয়া পরিণামে মৃত্যু ঘটায়। এইগুলিই জহর বা বিষবৎ ক্রিয়াযুক্ত বলিয়া গণ্য।

ইউনানি ঔষধ প্রয়োগবিধিতে ঔষধগুলি রোগের বিজ্‌জিদ বা বিপরীত স্বভাব বা গুণ -সম্পন্ন হইবে। গর্মি ও তরী (উষ্ণ ও সিক্ত) -রোগে ঔষধ হইবে সর্দি ও খুশকি এবং সর্দি ও খুশকি -রোগের ঔষধ হইবে গর্মি ও তরী -গুণবিশিষ্ট। একটি খেলৎ বা একাধিক আখ্‌লাতের কম-বেশি বিকৃতির ফলে রোগ হয়। প্রত্যেক খেলৎ বা ধাতুর যেমন দুইটি মেজাজ, প্রতিটি ঔষধেরও তেমনই দুইটি করিয়া মেজাজ থাকে। সুতরাং অস্বাভাবিক খেলৎ অনুসারে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগে রোগ নির্মূল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক আখ্‌লাৎকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নের জন্য এমন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে খেলৎগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে।

ইউনানি দাওয়াগুলি বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক দুইভাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে। বাষ্পাকারে প্রশ্বাসের দ্বারা কিংবা গলা নাক চোখ বা কানের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা প্রয়োগ করিয়া এবং ত্বকের উপর মালিশ, প্রলেপ বা সেকের দ্বারা ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে। আবার চূর্ণ, বটিকা, আরক প্রভৃতির আকারে কোনও কোনও ঔষধ খাইতেও দেওয়া হয়। যে ঔষধ নিজ স্বাভাবিক মেজাজ অনুসারে কোনও বিকৃত খেলৎকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া, উহার বিকৃত অংশকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে সাহায্য করে, তাহাকে মোঞ্জেজ বলে।

সফ্‌রার (পিত্ত) বিকৃতিতে ইসবগুল, সন্দল সোফেদ (শ্বেতচন্দন), গোলে সোর্খ (গোলাপ ফুল), মোকো (কাকমাচী), গোলে নীলুফার (শাপলার ফুল) ইত্যাদির ব্যবহার আছে। বল্‌গমের (কফ) মোঞ্জেজরূপ ব্যবহৃত হয়, বাদীয়ান (মৌরী), আস্‌লেসুস্‌ (যষ্টিমধু), পরসিয়াওর্শা (কালীঝাঁপ), মনাক্কা, শোকায়ী, গোলকন্দ প্রভৃতি। খুন বা রক্তের বিকৃতিতে মোঞ্জেজের ব্যবহার অবিধেয়। পিত্ত ও কফ একই সঙ্গে বিকৃত হইলে পিত্ত ও কফ -দোষ নাশক মোঞ্জেজগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীর বয়স ও ধাতু অনুসারে সেবন করা বিধেয়।

যে সকল দাওয়া আপন তারিফের (গুণ) দ্বারা আকর্ষণশক্তির প্রভাবে শরীরের শিরা ও অন্যান্য দেহযন্ত্র হইতে বিকৃত ধাতুকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তাহাদের আরবী ভাষায় মোসহেল বা জোলাপ বলে। সানায়েমাক্কী (সোনাপাতা), সাহমে হেঞ্জেল (মাকাল ফলের শাঁস), হলিলাজ্জাৎ (বড় হরীতকী), আফ্‌তীমূন (আলোকলতা) প্রভৃতি এইরূপ। আবার যে সকল ঔষধের দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে বিকৃত ধাতু ও মল বহির্গত হওয়াতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় তাহাদের বলে মোলায়েম। আলুবোখারা, তামারে হিন্দ্‌ বা তেঁতুল, মোয়েজ বা বীচি ফেলা মনাক্কা, শিরখিস্ত্‌ প্রভৃতি এই প্রকার।

দ্র মসিহর রহমান, তিব্বে মসিহা বা সহজ হাকিমী-শিক্ষা, কলিকাতা; সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮; Campbell Donald, *Arabian Medicine*, London, 1926; Cameron Gruner, *The Canon of Medicine of Avicenna*, London, 1930; H. E. Stapleton, R. F. Azo & M. Hidayat Husain, 'Chemistry in Iraq and Persia in the 10th century A. D.' *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, vol. VIII, no. 6, 1927; C. G. Comston, *An Introduction to the History of Medicine*, London, 1926.

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব দ্র

ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট্স কমিশন (ইউ. জি. সি.) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের (রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামে পরিচিত) সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত একটি আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বয়ংশাসিত বিধিবদ্ধ সংস্থার রূপ লাভ করে। ঐ আইন মঞ্জুরি কমিশনের উপর যে সব দায়িত্ব ন্যস্ত করে, তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি,

শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, শিক্ষাদানের মাননির্ণয় এবং শিক্ষাদান, পরীক্ষা, গবেষণাকর্ম প্রভৃতির মান সংরক্ষণ।

লোকসভা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আর্থিক সাহায্য দানের অধিকার লাভ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কমিশন যে সব উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বর্ধিত হারে বেতনের ব্যবস্থা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণাকার্যে উৎসাহ দান, ছাত্রাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্টুডেণ্ট হোম, হবি ওয়ার্কশপ স্থাপন প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যম, ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থাও কমিশনের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইউনিয়ন বোর্ড ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ-গভর্নমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে তদানীন্তন বাংলা প্রদেশে তথাকথিত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী বাংলায় পাঁচ হাজারের অধিক ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া এক-একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, ময়লা-নিষ্কাশন,• নালা-নর্দমা নির্মাণ, পুষ্করিণী ও নলকূপ খনন, পথঘাট ও সেতু নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দান, জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ রাখা ইত্যাদি কার্যের ভার ইউনিয়ন বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। প্রাদেশিক সরকার ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য কোনও কোনও ইউনিয়ন বোর্ডের দুই বা ততোধিক সদস্য লইয়া ইউনিয়ন কোর্ট ও ইউনিয়ন বেঞ্চ গঠন করিতেন। উল্লিখিত কার্যাবলী যাহাতে নির্বাহিত হয় তজ্জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে 'ইউনিয়ন কর' (ইউনিয়ন রেট) আদায় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। খেয়াঘাট, খোঁয়াড় ইত্যাদি হইতেও কিছু আয়ের ব্যবস্থা ছিল। আইনে প্রাদেশিক সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে অর্থ সাহায্যের বিধানও থাকে। মোট আয়ের ৫০% শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, অবশিষ্ট ৫০%-এর ২৬% কল্যাণমূলক কার্যে এবং বাকি অংশ ইউনিয়ন কোর্ট, দপ্তর ইত্যাদি বাবত ব্যয় হইত। ৬ হইতে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া এক একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বৎসরে অন্ততঃ ছয় আনা কর বা আট আনা সেস্ দিত এবং যাহারা মধ্য ইংরেজী অথবা জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শুধু তাহাদেরই ভোট দিবার অধিকার ছিল। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের এক অতি ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত সংগতিসম্পন্ন অংশকে বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। কার্যতঃ এই সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেও আবার শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই বোর্ডগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত। জেলা বোর্ডগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান করিত। তদ্ভিন্ন সরকারি সার্কল অফিসারগণও ইহাদের কাজ বিশেষরূপে তদারক করিতেন। ফলে, বিদেশী আমলে গ্রামীণ জনমানসে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আদৌ কোনও নৈতিক মর্যাদা ছিল না। অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার এবং সাধারণভাবে বিদেশী সরকারের সমর্থক কায়েমি স্বার্থ গড়িয়া ওঠে, এই অভিযোগ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হয়। এই প্রকার ব্যর্থ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ করে এবং উহার আহ্বানে বোর্ডের নির্বাচন বর্জনের আন্দোলন কতকগুলি জেলায় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে; মেদিনীপুরে ইহা সার্থক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। কংগ্রেসের আঞ্চলিক সংগঠনগুলি পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, তদানীন্তন প্রাদেশিক কংগ্রেসনেতৃত্বের এই দাবি সর্বতোভাবে সত্য। বিদেশী সরকারের স্থানীয় প্রতিভূ মনে হইত বলিয়া আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ইউনিয়ন বোর্ডকে প্রাপ্য কর না দিয়া গ্রামীণ জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করিত। চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ড বিদেশী সরকারের দমনমূলক শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কল্যাণমূলক কার্যে অধিকাংশ বোর্ডের ভূমিকা যে অতি নগণ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বিলুপ্ত করা হইতেছে।

দ্র *The Bengal Village Self-Government Act, 1919.*

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ইউনেস্কো রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত একটি বিশেষ সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইহার পুরা ইংরেজী নাম ইউনাইটেড নেশন্স এডুকেশনাল সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল

অর্গানাইজেশন অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এই নামকরণের মধ্যেই ইউনেস্কোর ক্রিয়াকলাপের দুইটি মূলসূত্র ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, ইহা রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ; সেই কারণে ইহা রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহায়ক—আন্তর্জাতিক সংস্থা বলিয়া ইহার কার্যাবলী বিশ্বের সকল মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বলিতে অতি ব্যাপক অর্থে যাহা বুঝায় এই সংস্থা তাহার পরিপোষক ও সমৃদ্ধিসাধক।

ইউনেস্কোর প্রথম সাংগঠনিক কাজ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে নিষ্পন্ন হয়। পর বৎসর পারী (প্যারিস) শহরে ইহা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি আপন আদর্শ অনুযায়ী ইহা কাজ করিয়া আসিতেছে। কায়রো, জাকার্তা, মন্টে-ভিডো, হাভানা, রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক শহরে এবং ভারতের নয়া দিল্লীতে ইহার শাখা রহিয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নয়া দিল্লীতে ইউনেস্কোর এক সাধারণ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এট্লির এই কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে: ‘যুদ্ধের আরম্ভ মানুষের মনে, সুতরাং মানুষের মনেই শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন গড়িয়া তোলা কর্তব্য’। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে মানুষের মন হইতে অজ্ঞতা দূরীকরণই হইল শান্তিরক্ষার অন্যতম উপায়। ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞতাই সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস যুদ্ধবিগ্রহের কারণ। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক বিধিব্যবস্থার সাহায্যে যে শান্তির উদ্ভব ঘটে তাহা অসম্পূর্ণ ; কারণ এ জাতীয় শান্তি কখনই বিশ্বের সকল মানবের স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিক ও স্থায়ী সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। অতএব প্রকৃত শান্তির ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে মানুষের বুদ্ধিগত ও চরিত্রগত উৎকর্ষের উপর। এমন কথা ইউনেস্কোর পূর্বে সরকারিভাবে ঘোষিত হয় নাই।

ইহার আদর্শ ও লক্ষ্য হইল : শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমুন্নতির মাধ্যমে ন্যায়ের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধি ; আইনের শাসন, মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ; জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা যে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য, তাহার সহায়তা করা। এই মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের নিমিত্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিকগণ ইউনেস্কোয় যোগদান করিয়াছেন।

আপন লক্ষ্য চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ এই : ১. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মৌলিক শিক্ষায় উৎসাহদান। ২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষিত করিয়া তোলা এবং সমাজের প্রয়োজনমত উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন করা। ৩. শিক্ষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও জাতির মনে মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত ও বর্ধিত করা। ৪. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি, ভাবধারা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ গতা-য়াতের বাধা দূরীভূত করা। ৫. বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহার প্রয়োগ ঘটানো। ৬. সামাজিক সমস্যাবলীর সম্যক পরিচয় ও তাহাদের সমাধানের উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞানের যথাবিধি চর্চা করা। ৭. বিশ্বের জ্ঞান ও শিল্প-ভাণ্ডার তথা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কীর্তিস্তম্ভ ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা এবং এই সব সাংস্কৃতিক উপাদান সর্বসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা ও সকলপ্রকার সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনকে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলা। ৮. সংবাদপত্র, রেডিও ও চলচ্চিত্র মারফত সত্য, স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। ৯. বিশ্বের বিভিন্ন জাতি যাহাতে পরস্পরকে ভালভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে তাহার সুযোগ তৈয়ারি করা এবং কেন তাহারা রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে থাকিয়া একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত ও সহযোগিতামূলক আচরণ বজায় রাখিবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। ১০. এই সংস্থার সকল বিভাগে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বিনিময়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানো এবং পুনর্গঠন ও আর্তত্রাণ-সম্পর্কিত আয়োজনের সহায়তা করা।

ছয় বৎসর অন্তর ইউনেস্কোর নূতন অধিকর্তা নিযুক্ত হন, তবে একই অধিকর্তা পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন। ইউনেস্কোর প্রথম অধিকর্তা ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি।

দ্র J. Huxley, *Unesco : Its Purpose & Its Philosophy*, Washington, 1948 ; W. H. C. Laves & C. A. Thomson, *Unesco : Purpose, Progress, Prospects*, London, 1958.

আদিত্য ওহদেদার

ইউ. পি. আই. ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া দ্র

ইউরিপিডিস এউরিপিদেস দ্র

ইউরেনাস সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে উপবৃত্তপথে প্রদক্ষিণরত

নয়টি গ্রহের অন্যতম। সূর্য হইতে পর পর গ্রহগুলিকে গণনা করিলে ইহার স্থান হইবে সপ্তম। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হার্শেল গ্রহটি আবিষ্কার করেন। সূর্যকে ইহা ৮৪ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। নিজের অক্ষে একবার আবর্তনের জন্য লাগে ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব প্রায় ২৮৬৪৬ লক্ষ কিলোমিটার (১৭৮০০ লক্ষ মাইল)। গড় ব্যাসার্ধ ৪৬৬৭০ কিলোমিটার (২৯০০০ মাইল)। মেরুর ব্যাসার্ধ বিষুবরৈখিক ব্যাসার্ধ হইতে শতকরা ৭ ভাগ কম। ইউরেনাসের পৃষ্ঠের তাপ প্রায় ১৬৮° সেন্টিগ্রেড। ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ১৪·৫৮ গুণ বেশি।

ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলে মিথেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। ইহার গড় ঘনত্ব ১·৫৬ (জলের ঘনত্বকে ১ ধরা হয়)। ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহ। গ্রহকেন্দ্র হইতে উপগ্রহগুলির দূরত্ব ১৩০৩৫৩ কিলোমিটার (৮১০০০ মাইল) হইতে ৫৮৫৭৮৫ কিলোমিটার (৩৬৪০০০ মাইল)। ইহাদের আবর্তনের সময় ১ দিন ১০ ঘণ্টা হইতে ১৩ দিন ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত। নিকটবর্তী উপগ্রহ মিরাণ্ডাই ক্ষুদ্রতম। অন্যান্য উপগ্রহগুলি ৩২২ কিলোমিটার (২০০ মাইল) হইতে ১১২৭ কিলোমিটার (৭০০ মাইল) পর্যন্ত ব্যাসবিশিষ্ট।

অলক চক্রবর্তী

ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাকটিভ) ধাতব মৌল (এলিমেণ্ট)। প্রতীক U, আণবিক সংখ্যা ৯২, আণবিক ভার ২৩৮·০৭, গলনাঙ্ক ১১৩৩° সেন্টিগ্রেড, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৮·৬৮, যোজ্যতা ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এম এইচ. ক্ল্যাপরথ পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থে ইহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। নব-আবিষ্কৃত ইউরেনাস গ্রহের নামানুসারে ইহার নাম হয় ইউরেনিয়াম। ঐ পিচ্‌ব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াসের অক্সাইড (UO_2) ছিল।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিম্নলিখিত আইসোটোপগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে. U^{230}, U^{232}, U^{233}, U^{234}, U^{235}, U^{237}, U^{238} এবং U^{239}। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামে তিনটি আইসোটোপ দেখা যায়: U^{238}, U^{235} এবং U^{234}। ইহাদের মধ্যে U^{238} থাকে শতকরা ৯৯·২৮ ভাগ।

ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে U^{235} পরমাণু -কেন্দ্রকের (নিউক্লিয়াস) বিভাজন ঘটিয়া থাকে। বিভাজনের ফলে কেন্দ্রকটি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং গড়ে দুই হইতে তিনটি নিউট্রন এবং কিছু পরিমাণ শক্তির নির্গমন ঘটে। নির্গত নিউট্রনগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য কেন্দ্রককে অনুরূপ বিভাজন প্রক্রিয়া ঘটাইতে পারে। পরমাণু চুল্লিতে এই চক্রবৃদ্ধি বিক্রিয়াকে (চেন রিঅ্যাক্‌শন) কাজে লাগানো হইয়া থাকে। চুল্লির জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়ামই প্রধান উপাদান। আণবিক বোমাতেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের ব্যবহার হয়।

এই মুখ্য প্রয়োজন ছাড়াও কতকগুলি গৌণ কারণে ইউরেনিয়ামের ব্যবহার আছে। যথা, ইলেকট্রিক বাল্‌বের ফিলামেণ্টে, সিরামিক শিল্পে রঞ্জকরূপে এবং কৃত্রিম অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে ক্যাটালিস্ট হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খনিজদ্রব্যের মধ্যে পিচ্‌ব্লেণ্ডেই ইউরেনিয়াম সর্বাধিক পরিমাণে থাকে। মুখ্যতঃ বেলজিয়ান কঙ্গো, গ্রেট্‌বেয়ার লেকের আশেপাশে ও ক্যানাডায় এবং স্বল্প পরিমাণে চেকোস্লোভাকিয়া, ইংল্যাণ্ড, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপে পিচ্‌ব্লেণ্ড পাওয়া যায়।

ইওরোপ এশিয়া ও ইওরোপ মিলিয়া যে ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পশ্চিম-উত্তরের উপদ্বীপসদৃশ অঞ্চল ইওরোপ মহাদেশ নামে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। ইহার মধ্যেও আবার বহু উপদ্বীপ বর্তমান। ফলে কোনও অংশই সমুদ্রকূল হইতে ৮০০ কিলোমিটারের (৫০০ মাইল) অধিক দূরে অবস্থিত নহে। সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ জলবায়ু কোথাও চরমভাবাপন্ন নহে।

সর্ব উত্তরে নোরকুন অন্তরীপ (৭১°৮′ উত্তর), দক্ষিণ-সীমায় টারীফা অন্তরীপ (৩৮° উত্তর) অবস্থিত। দ্বীপগুলির অবস্থিতি ধরিলে অক্ষাংশের বিস্তৃতি আরও ১°৭′ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা যথাক্রমে উত্তর মহাসাগর, অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও তাহাদের উপসাগরগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট। পূর্ব দিকে উরাল পর্বত, উরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর (হ্রদ) ও ককেশাস পর্বতের দ্বারা এশিয়ার সহিত ব্যবধান নির্দিষ্ট হইলেও ভূমির গঠন, জলবায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি অনুসারে এই ব্যবধানকে অস্পষ্ট বা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে। ইওরোপের আয়তন প্রায় ৯৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল), ভারতের প্রায় সাড়ে তিনগুণ। অক্ষাংশ অনুসারে ইওরোপের উত্তরাংশে সুমেরু হিমমণ্ডলের প্রভাব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব তটভাগে অবস্থিত অঞ্চল উষ্ণ উপসাগরীয় সমুদ্র-স্রোতের দ্বারা বিধৌত বলিয়া হিমমণ্ডলের প্রভাব কেবল-

মাত্র শীতকালে ইওরোপের উত্তর-পূর্ব কোণে অনুভূত হয়। অপরাপর অংশে শীতকালের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিও অনুরূপ অক্ষাংশে অবস্থিত দেশসমূহ হইতে কম হয়। কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব হইতে দূরে অবস্থিত ইওরোপের পূর্বাঞ্চলে দিনগত এবং ঋতুগত তাপের তারতম্য উত্তরোত্তর অধিক হইতে দেখা যায়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে ৪৫° ও ৬০° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের চাপ নিম্ন হয়। ইওরোপের মধ্যস্থলে চাপের নিম্নতার জন্য হিমমণ্ডল হইতে শুষ্ক অথচ শীতল বায়ু এবং অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর হইতে উষ্ণ অথচ আর্দ্র বায়ু সেইদিকে প্রবাহিত হয়। উভয় বায়ু-তরঙ্গের সংঘাতে পশ্চিম ইওরোপে বৎসরের সকল সময়েই ঘূর্ণিবাত্যাসহ বারিপাত ঘটিয়া থাকে। অ্যাটল্যান্টিক হইতে ক্রমদূরবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি কমিয়া যায় এবং শীতকালে তুষারপাতের আধিক্য হয়। কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে বৎসরে গড়ে মাত্র ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) বৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে চাপের উচ্চতা লক্ষিত হয়। সেই সময়ে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু শীতকালে সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটিলে চাপ নামিয়া যায় এবং অ্যাটল্যান্টিক হইতে আগত আর্দ্র বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিচার করিলে ইওরোপকে জল-বায়ুর হিসাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা চলে : ১. উত্তর-পশ্চিমে শীত তীব্র নহে, গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ; কিন্তু সংবৎসরে তাপের তারতম্য ইওরোপের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। সারা বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি হইলেও শীত-ঋতুতে আর্দ্রতা বেশি। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২. দক্ষিণে ইটালীর মত দেশে শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে তাপের মাত্রা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশি ; বৃষ্টি কেবল শীতের সময়েই হয়। ৩. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে (দক্ষিণ রাশিয়া) শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই তীব্র এবং তাপের তারতম্য সমগ্র মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। গ্রীষ্ম-কালেই বৃষ্টি হয় এবং তাহার পরিমাণও সর্বাপেক্ষা কম। ৪. মস্ক্ভা (মস্কো) শহরের আশেপাশে, অর্থাৎ ইওরোপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শীত তীব্র, গ্রীষ্মকালকে শীতল বলা চলে। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে সীমাবদ্ধ। জার্মানীর মত মধ্য ইওরোপে অবস্থিত দেশসমূহে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে উপরি-উক্ত চারি প্রকার জলবায়ুর সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। ৫. উত্তর মহাসাগরের কূলে মহাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে হিমমণ্ডলীয় জলবায়ু পরিদৃষ্ট হয়।

সমগ্র জলবায়ুর প্রকৃতি বিচার করিলে বলা চলে যে ইওরোপের অধিকাংশ অঞ্চলই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধীন।

বহুশতাব্দীব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষের বসবাস ঘটিয়াছে বলিয়া ইওরোপের অনেকাংশে স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে তারতম্য আজিও লক্ষ্য করা যায়। হিমমণ্ডলে বৃক্ষাদি নাই, কেবল গ্রীষ্মকালে বরফ গলিলে কিছু গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। আরও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ উত্তর-পূর্ব ভূমিখণ্ড জুড়িয়া সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য বর্তমান। আরও দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অল্প বৃষ্টিপাত ও অধিক বাষ্পীভবনের দেশে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তৃণ জন্মায়। ইহাকে স্তেপ বলে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতকালে পত্রমোচনকারী বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দীর্ঘমূল, তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট খর্বাকৃতি উদ্ভিদ জন্মায়।

প্রতি পৃথক অঞ্চলের মধ্যেও আবার উচ্চতা অনুসারে স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে তারতম্য ঘটে। যেমন, দক্ষিণাঞ্চলেও পর্বতের শিখরদেশ চিরতুষারাচ্ছন্ন এবং তথাকার উদ্ভিদ হিমমণ্ডলের অনুরূপ।

ইওরোপে বহু নদ-নদী আছে। তন্মধ্যে পেচোরা ও উত্তর দ্বিনা উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে ; পশ্চিম দ্বিনা, ভিস্টুলা এবং ওডার বাল্টিক সাগরে ; সেইন, লোয়ার, গারোন, দ্বারো, টেগাস (তাহো) ও গুয়াথিয়ানা অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে ; এব্রো, রোন-সোন এবং পো ভূমধ্যসাগরে ; দানিয়ুব, নিস্টার, নীপার ও ডন কৃষ্ণসাগরে এবং ভল্‌গা ও উরাল কাস্পিয়ান সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

পূর্বাঞ্চলের নদীতে শীতের পর বসন্তকালে বরফ গলিবার সময়ে বন্যা হয়। অ্যাটল্যান্টিকের নিকটবর্তী অঞ্চলে শীত ও বসন্ত -কালে এবং ভূমধ্যসাগরের নিকট শীতকালে বৃষ্টি হয় বলিয়া বন্যাও হয়। উত্তর মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত নদীগুলি শীতের সময়ে জমিয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন সেই সকল নদীর দক্ষিণাংশে বরফ গলিতে থাকে তখনও উত্তর ভাগে বরফ জমিয়া থাকার ফলে কূল ছাপাইয়া বন্যা হয় এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমির সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ও অন্তে তুষার ও বৃষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইবার ফলে রাইন ও দানিয়ুব নদীতে প্রচুর জল নামে এবং ঐ কারণে নৌ-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুসারে ইওরোপের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ হইল ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন এবং নরওয়ে, অর্থাৎ ফেনোস্ক্যাণ্ডিয়া।

এখানে কেলাসিত আগ্নেয় শিলার উপরে পরবর্তী কালে বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট স্তরীভূত শিলারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। ইহাদের স্বাভাবিক ক্ষয়প্রাপ্তি ভিন্ন আর বিশেষ কোনও বিকৃতি ঘটে নাই। ইওরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূগঠন কিন্তু এত সরল নহে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাঞ্চলে এবং ফেনোস্ক্যাণ্ডিয়ার উত্তরাংশে সিলুরীয় যুগে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। আরও পরবর্তী কালে কার্বনিফেরাস যুগে দ্বিতীয়বার কয়েকটি ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এগুলিও অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে এখনও মালভূমির আকার ধারণ করে নাই। নিম্নলিখিত অঞ্চলে দ্বিতীয় যুগের পর্বতাবশেষ লক্ষিত হয়: ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, ফ্রান্সের মধ্যে ব্রতাইন্ (ব্রিটানি) ও মধ্য অঞ্চল, স্পেন ও পর্তুগালের পশ্চিমাংশ, জার্মানীর দক্ষিণ, চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিম এবং উরাল অঞ্চল। টারশিয়ারি যুগে মহাদেশে তৃতীয়বার ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্ট হইতে থাকে। এগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষয় হইয়াছে। বস্তুতঃ ইওরোপের সর্বোচ্চ পর্বতমালা এই যুগেই গঠিত হয়। মোঁ ব্লাঁ (৪৮১৩ মিটার বা ১৫৭৮২ ফুট) ইহারই উচ্চতম শৃঙ্গ। নিম্নোক্ত স্থানসমূহে সর্বাধুনিক ভঙ্গিল পর্বতমালা দৃষ্ট হইয়াছে: আইবেরিয়া উপদ্বীপের (স্পেন-পর্তুগাল) পূর্ব ও উত্তরভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স, সমগ্র ইটালী, বল্‌কান উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ (যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস), চেকোস্লোভাকিয়ার দক্ষিণাংশ, হাঙ্গেরীর উত্তর ও পূর্ব প্রান্ত, রুমানিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত, ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং ককেশাস পর্বতশ্রেণী।

প্লাইস্টোসিন যুগে ইওরোপের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল গভীর বরফের আস্তরণে আবৃত ছিল। আজ সুমেরু অঞ্চল যে হিম-আস্তরণের দ্বারা আবৃত, তখন সেই আচ্ছাদন দক্ষিণে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় দক্ষিণতম অংশ এবং জার্মানী, পোল্যাণ্ড বা রাশিয়ার সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভাগের উপর দিয়া বিস্তীর্ণ ছিল। সুমেরু অঞ্চল এত দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকার ফলে তখনকার জলবায়ু অন্য প্রকার ছিল। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে সাহারা তখনও মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই, সেখানে ঝড়-বৃষ্টি হইত, গাছও জন্মাইত। যাহাই হউক, উত্তর ইওরোপের বরফের আচ্ছাদনটি কিন্তু অবিচল থাকে নাই। চার বার তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়, মধ্যে তিন বার তাহা সংকুচিত হইয়া যায়।

এই বিস্তীর্ণ হিম-আচ্ছাদনের গতিজনিত ঘর্ষণের ফলে ইওরোপের উত্তরাংশ অসমানভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং স্থানে স্থানে ঘর্ষণজাত পাথরের টুকরা সঞ্চিত হইয়া পরবর্তী কালে, অর্থাৎ মেরুমণ্ডলের আয়তন সংকুচিত হইবার পর, বহু হ্রদের সৃষ্টি হয়। এক ফিনল্যাণ্ডেই ছোট-বড় হ্রদের সংখ্যা অন্ততঃ ৬০০০০ হইবে।

উত্তর মেরুর বিস্তার এবং হিমবাহের গতির ফলে সমগ্র উত্তর ইওরোপে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল; ইহার সহিত মানববসতি ও সভ্যতার বিস্তারও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিমবাহের ঘর্ষণজনিত কর্দম ক্রমশঃ দক্ষিণের বহু অঞ্চলকে আচ্ছাদিত করে এবং পরবর্তী কালে মানুষের পক্ষে উত্তম চাষের জমিতে পরিণত হয়। উপরন্তু হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট ভাঙা পাথরের টুকরা শেষ সংকোচনের সময়ে এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে উত্তরাভিমুখী নদীর গতি পরবর্তী কালে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কোথাও জলাভূমির সৃষ্টি করে, কোথাও বা পশ্চিমে নূতন পথ খুঁজিতে থাকে।

সুমেরুর বরফের আস্তরণ যখন বিস্তীর্ণ ছিল তখন দক্ষিণের পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত বরফের আচ্ছাদনও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। আজ যেখানে হিমবাহ থাকিতে পারে না, উষ্ণতার জন্য গলিয়া যায়, সেখানেও তখন বরফ স্থায়ীভাবে জমিয়া থাকিত। উপত্যকাগুলিও হিমবাহের ঘর্ষণের ফলে আরও বিস্তৃত হইয়া যাইত। নরওয়ের ফিয়র্ডগুলি এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। সুমেরু সংকুচিত হইবার ফলে যখন সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ আরও উঁচু হইয়া ওঠে, তখন নরওয়ের ক্ষয়িত উপত্যকাগুলিতে সমুদ্রজল বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। এইরূপ ফিয়র্ডে গভীর জল থাকে এবং জাহাজ চলাচলের পক্ষে তাহাতে সুবিধা হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্লাইস্টোসিন যুগে সুমেরুর বিস্তীর্ণ বরফের আচ্ছাদনটি কয়েকবার সম্প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়। সম্প্রসারণের যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলবায়ু হয়ত আজিকার সাইবেরিয়ার অনুরূপ ছিল। আবার সংকোচনের যুগে বর্তমান অপেক্ষা অধিক উষ্ণতা থাকায় গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার কোনও কোনও উদ্ভিদ তখন ইওরোপে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। প্লাইস্টোসিনের বিভিন্ন খণ্ডযুগে জীবজন্তু অথবা উদ্ভিদাদির পরম্পরায় এইভাবে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু আশ্চর্য তথ্য ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্লাইস্টোসিন যুগে ইওরোপের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাচীন মানববংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে জলবায়ু এখনকার তুলনায় গরম ছিল। তখন মানুষ তাহার পাথরের গড়া অস্ত্র লইয়া নদীর সন্নিকটে বাস করিত এবং

শিকার ও ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত। এই সব অস্ত্রের সহিত পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার পাথরের অস্ত্রাদির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্লাইস্টোসিনের শেষ ভাগে শীতের প্রাবল্য হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীবজন্তুর পরিবর্তে মেরুপ্রদেশের বল্‌গা হরিণ, লোমশ অতিকায় হস্তী প্রভৃতি জন্তু ইওরোপের দক্ষিণে বিচরণ করিতে থাকে। মানুষও খোলা নদীর তটভূমি ছাড়িয়া পর্বতগুহা আশ্রয় করে।

ইওরোপের তদানীন্তন অধিবাসীদের শারীরিক গঠন মোটামুটি জানা আছে। প্রথম যুগের সকল জাতিই আজ বিলুপ্ত। কিন্তু এই আদিম মানবজাতিগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহাদের দেহগঠনের বিকাশই বা কিভাবে সংঘটিত হইল, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। ইওরোপের বাহিরে আফ্রিকায়, ভারতে বা যবদ্বীপে যে সকল গবেষণা হইয়াছে তাহার ফলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ইওরোপের আদিম অধিবাসীগণ আফ্রিকা বা এশিয়া হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানব লইয়া এশিয়ায় গবেষণার পরিমাণ এত কম যে, কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে এখনও বহু সময় লাগিবে।

প্লাইস্টোসিন যুগের অবসান ঘটিলে উত্তর ইওরোপ বরফের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। তখন বাল্‌টিক সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও অন্যত্র যে সকল মানববসতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারা প্রধানতঃ মাছ ধরিয়া, শিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। তীর-ধনুকের ব্যবহার, মাছ ধরিবার ঘুনি বা বঁড়শি, ট্যাটা প্রভৃতির ব্যবহার তখন হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

যখন ইওরোপীয়দের এই অবস্থা, তখন পশ্চিম এশিয়াতে, প্যালেস্টাইনে (জেরিকো নগরে আনুমানিক ৭০০০ খ্রীষ্টপূর্ব) ও ইরাকের সন্নিকটে মানুষ গমের চাষ আরম্ভ করে। ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুপালনও আরম্ভ হয়। অর্থাৎ মানববংশ প্রকৃতিজাত খাদ্যসামগ্রীর উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া খাদ্য উৎপাদন করিতে শেখে। মনে হয়, ইওরোপে পশ্চিম এশিয়া হইতে আগত চাষীকুল প্রথম চাষের প্রবর্তন করে। জার্মানীর এল্‌বে নদীর মধ্য ভাগে ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। বল্‌কান উপদ্বীপে, ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, দানিয়ুব নদীর পার্শ্বে মধ্য ইওরোপে ও অ্যাটল্যান্টিক সাগরের সন্নিকটে ক্রমে ছোট ছোট কৃষিজীবী বসতির বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণ শুধু পশ্চিম এশিয়ার সংস্কৃতির অনুকরণ করে নাই, প্রত্যেকে স্বীয় প্রতিভা অনুসারে এক-এক খণ্ড সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

মানুষের উৎপাদনব্যবস্থায় পরবর্তী বিপ্লব সাধিত হয় মিশর, ইরাক ও সিন্ধুবিধৌত সমতলভূমিতে। ধাতুর উৎপাদন এবং পাথরের পরিবর্তে তামা, ব্রঞ্জ প্রভৃতির প্রয়োগে যে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তাহা বিস্ময়কর। বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিল, শিল্পীকুলের উদ্ভব হইল, মানুষের বসতি আরও ঘন আকার ধারণ করিল, শহরের পত্তন হইল, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আরও উগ্ররূপে দেখা দিল। এশিয়ার এই নূতন উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমে ইওরোপের বল্‌কান উপদ্বীপ ও ক্রীট দ্বীপকে আশ্রয় করিয়া মধ্য ইওরোপে বিস্তারলাভ করে। এই সময়ের পুরাকীর্তির সহিত এশিয়া বা উত্তর আফ্রিকার পুরাকীর্তির তুলনা করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলিয়াছেন যে, অন্য দেশ হইতে উৎপাদনব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিলেও তখন হইতে ইওরোপে নূতন সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট ও মৌলিক আকার ধারণ করে। অবশ্য ইহা সর্বজনবিদিত যে পরবর্তী অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে, উৎপাদনের সমৃদ্ধিতে ইওরোপ তাহার গুরুস্থানীয় এশিয়া বা উত্তর আফ্রিকাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে স্থানীয় বৈসাদৃশ্যের বীজ উপ্ত হয় রোমক সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। মোটামুটি হিসাবে প্লাইস্টোসিন তুষার-আচ্ছাদনের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত রোমক সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। কারণ, ঐতিহাসিক তাসিতুসের মতে (৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইওরোপ, হয় ঘন জঙ্গলাকীর্ণ, নতুবা পঙ্কময় জলাভূমিপূর্ণ ছিল। মধ্য ইওরোপে জার্মান এবং উত্তর-পূর্ব ইওরোপে স্লাব উপজাতি বসবাস করিত। সংস্কৃতির দিক দিয়া জার্মানদের পূর্ব ও পশ্চিম জার্মান নামে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পূর্ব জার্মানগণ প্রধানতঃ পশু-পালক ও ধীবর ছিল এবং সাধারণতঃ কৃষিকার্যে দক্ষ বা ধৈর্যশীল ছিল না। উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইলে জমি ত্যাগ করিত। পশ্চিম জার্মানগণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নততর ছিল এবং তাহারা স্থায়ী কৃষিকার্যের সুযোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করিত। স্লাবদের রাজনৈতিক সংগঠন বলিয়া বিশেষ কিছুই ছিল না। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল শূকরপালন এবং পশু ও মৎস্য -শিকার। ইহাদের গৃহপালিত ঘোড়া, গবাদি পশু বা ভারি লাঙল ছিল না।

কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিম ইও-রোপের রোমক সাম্রাজ্যে নানা প্রকার নূতন ফসলের চাষ শুরু হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপকতর হয় এবং ঐ ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বহু নগরের পত্তন হয়। পশ্চিম

জার্মান উপজাতিগুলি সহজতর জীবনের লোভে রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করিতে চাহিলে বহু সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ফলে রোমক রাজনৈতিক সীমান্ত ক্রমে সংস্কৃতিগত সীমান্তে পরিণত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ফলে প্রথমে জার্মানগণ ও পরে স্লাবগণ পশ্চিম দিকে ফিরিতে থাকে এবং রোমক সাম্রাজ্যের অনুকরণে নিজ নিজ উপনিবেশে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করিতে থাকে।

পশ্চিম জার্মানগণ রোমক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অতি সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারে এবং পরে পশ্চিম ফ্রাঙ্ক, লোথারিঙ্গিয়া ও পূর্ব ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পত্তন করে। পূর্ব জার্মানগণ চেকোস্লোভাকিয়া, ইটালী, রুমানিয়া ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। জার্মানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলিতে স্লাবগণ বসতি স্থাপন করে এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য -শাসিত বল্‌কান উপদ্বীপে চলিয়া যায়। প্রধানতঃ অর্থনীতির দুর্বলতায় ও রাজনৈতিক সংগঠনের অভাবে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পর পূর্ব ফ্রাঙ্কদের আক্রমণে স্লাবগণ মধ্য ইওরোপ অঞ্চলে পরাজিত হয় এবং বেশ কিছু স্লাব উপজাতি আরও পূর্বে রাশিয়ার সরলবর্গীয় বনাঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। সেই সময়ে রাশিয়ার সমগ্র স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল মধ্য এশিয়ার অশ্বারোহী মঙ্গোলদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়াছিল; স্লাবগণ এই আক্রমণও প্রতিহত করিতে পারে নাই। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের হাতে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তাহার ফলে প্রায় সমগ্র বল্‌কান উপদ্বীপ অটোমান তুর্কিদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু চতুর্দশ শতকেই ভারাঙ্গিয়ান স্লাবদের হাতে রাশিয়ার মঙ্গোল রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির পরাজয় ঘটে।

প্রবংশের এইরূপ মিশ্রণ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিলতায় বর্তমান ইওরোপে বহু ভাষা প্রচলিত; যদিও বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সহিত প্রবংশ ও বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই। মহাদেশে প্রচলিত ভাষার মূল চরিত্রগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :

ক. ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা : ১. কেলতিক (অ্যাটল্যান্টিক উপকূল অঞ্চলে)—আইরিশ, স্কটিশ, গেলিক, ওয়েল্‌শ, ব্রেটন ও কর্নিশ। ২. রোমক (লাতিন হইতে উদ্ভূত)— ইটালীয়, ফরাসী, ওয়ালুন, প্রভঁসাল, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, গ্যালিসীয়, কাতালান, রুমানীয় এবং আল্‌প্‌স অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা। ৩. টিউটন (উত্তর ইওরোপ অঞ্চলে)— জার্মান, ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ, ফ্রিজীয়, ইংরেজী, ডেনিশ, নরওয়েজীয়, সুইডিশ, আইসল্যাণ্ডীয় ও ফারোয়ীয়। ৪. বাল্‌তিক-ল্যাটভীয় ও লিথুয়ানীয়। ৫. স্লাব (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে)— রুশ, বেলোরুশ, ইউক্রানীয়, রুথেনীয়, বুলগেরীয়, সার্বোক্রোট, ডালমেশীয়, স্লোভেন, মোরাভীয়, স্লোভাক, পোলিশ ও সার্বীয়। ৬. হেলেনিক— গ্রীক। ৭. থ্‌রাসো ইল্লিরিয়ান— আলবানীয়।

খ. উরাল-আলতিক ভাষা : ১ ফিনো-উগ্রীয়— ম্যাগিয়ার, ফিনিশ, কারেলীয়, এস্তোনীয়, ল্যাপ, মর্ডভিনীয়, কোমি, পারমিয়াক, উদমুর্ট, মারি, ভোগুল, অস্টিয়াক ও নেন্‌ট্‌সি। ২. তুর্কী-তাতার— তুর্কী (বল্‌কান উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত ভাষা), কাজান, তাতার, বাসখির, চুবাশ, কালমিক ও কাজাখ।

গ. সেমিটিক ভাষা : মন্টীজ। মন্টা দ্বীপের শিক্ষিতরা ইংরেজী অথবা ইটালীয় ভাষায় কথা বলে।

ঘ. বাস্ক্‌ : পীরেনিজ পর্বতে ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কথিত ভাষা।

নগরসভ্যতার ব্যাপক প্রসার বর্তমান ইওরোপের ভৌগোলিক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এত অল্পস্থানের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক নগর বা শহর অন্য কোনও মহাদেশে গড়িয়া ওঠে নাই। নগরকেন্দ্রের এই বাহুল্য এক হিসাবে মহাদেশে বিনিময়-অর্থনীতির (এক্সচেঞ্জ ইকনমি) প্রাধান্যই প্রমাণ করে। আবার আরও ব্যাপক অর্থে সম্ভবতঃ বলা চলে যে, বাণিজ্য ও উৎপাদনের মধ্যে পৌনঃপুনিক সমন্বয়ের বিভিন্ন সূত্রেই প্রাচীন গ্রীক সমৃদ্ধি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব পর্যন্ত ইওরোপীয় আর্থিক প্রগতির প্রতিটি পর্যায়ের বনিয়াদ নির্মিত হইয়াছে।

ইওরোপের ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নগরসভ্যতার প্রসার ঘটে গ্রীক সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে। এই সব নগর মূলতঃ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী বিবিধ অঞ্চলে গ্রীকদের উপনিবেশ বিস্তৃত হয়। বহুমূল্য ধাতু ও মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তনেও তাহারা সাফল্যলাভ করে। বৃহত্তর নগরসমূহে হস্তশিল্পের প্রসার এবং তাহা হইতে উৎপন্ন পণ্য লইয়া বিস্তৃত ঔপনিবেশিক অঞ্চলের সহিত রপ্তানি বাণিজ্যে গ্রীক সভ্যতার বিশেষ আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। হস্তশিল্পের উদ্ভব ও প্রসারের ফলে ক্রীতদাসপ্রথার পরিধিও বিস্তার লাভ করিল। এইভাবে গৃহকর্ম ও ক্ষুদ্রপরিসর কৃষিকর্মের

গণ্ডি ছড়াইয়া ক্রীতদাসদের শ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া প্রাচীন নাগরিক শিল্পব্যবস্থার আরম্ভ ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এইরূপ যুগান্তকারী ঘটনাবলীর ফলে আর্থিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রসংস্থায় যে সকল নূতন প্রকরণের সূচনা হইল, গ্রীক নগররাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এবং রোমক সাম্রাজ্যের নগরকেন্দ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির উপর তাহাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

রোমকগণ গ্রীক প্রভাবে উত্থিত বহু নগর আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করে এবং কেন্দ্রীয় শাসন চালু রাখার জন্য আরও বহু নগরের পত্তন করে। উত্তর-পশ্চিম ইওরোপে রোমকগণই নগরসভ্যতার জনক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। যদিও রোমক নগরসভ্যতার ঐতিহ্য পরবর্তী যুগে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রবাহিত হয় নাই, তথাপি বর্তমান ইওরোপের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর মূলতঃ রোমক নগরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; যেমন— মিলানো, নাপোলি, বর্দো, সেণ্ট আলবান্স, লিঙ্কন, ক্যাণ্টারবেরি, হ্বীন (ভিয়েনা), বেল-গ্রেদ, সোফিয়া, নীস, ডুব্রভনিক, স্থালোনাইকা ইত্যাদি।

রোমক নগরগুলি প্রধানতঃ তিনটি কারণে স্থাপিত হয়। সর্ববৃহৎ নগরগুলি সাধারণতঃ প্রাদেশিক শাসন-কেন্দ্র ছিল, যেমন কন্‌স্তান্তিনোপল, অ্যাথেন্স, রোমা, লিয়ঁ ইত্যাদি। কিছু নগর সৈন্যাবাস ও বাণিজ্যের জন্য স্থাপিত হয়, যেমন লণ্ডন, কোলোন, মাইন্‌ৎস ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার নগরগুলি যানবাহনের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন মার্সেই, হ্বীসবাডেন, বাথ ইত্যাদি। তবে এই তিন ধরনের শহরেই কিছু কিছু শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য হইত।

রোমক শাসনকালে বহু বিস্তৃত জমিদারির সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে এই সব জমিদারিতে ক্রীতদাস নিয়োগের একটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। দলবদ্ধ-ভাবে বহু ক্রীতদাসের মিলিত নিয়োগের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন বাড়ানো সম্ভব হইল। এই দলবদ্ধ ক্রীতদাস নিয়োগের প্রথাটি কার্থেজ হইতে অনুকৃত। উক্ত ব্যবস্থার ফলে ক্রীতদাসভিত্তিক বৃহত্তর আবাদ, কৃষিজ উৎপাদনকেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গণ্ডি হইতে মুক্তি দিয়া বিনিময়-অর্থনীতির অধিকতর সুবিধা করিল। আবার নানাবিধ আঞ্চলিক সম্পদ লেন-দেনের মাধ্যমেও রোমক সাম্রাজ্যে বিনিময়-অর্থনীতির বহুধাবিস্তার ঘটিয়াছিল।

পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর শাসনব্যবস্থার প্রারম্ভিক অরাজকতার জন্য আগন্তুকদের কাছে রোমক নগরগুলির বিশেষ কোনও মূল্য ছিল না। ঐ সব ঔপনিবেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-অর্থনীতি-নির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার বাহক ছিল। তাহারা সাধারণতঃ রোমক নগরের একটি ক্ষুদ্র অংশে বসবাস করিত এবং বহু ক্ষেত্রেই অপর অংশ হইতে বাড়ি ভাঙিয়া ঐ প্রস্তর দ্বারা নিজেদের মন্দির বা গির্জা বানাইত। এইভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বহু রোমক নগর ধ্বংস হইয়া যায়। রোমক লণ্ডনের ধ্বংসাবশেষের ৩।৪ মিটার (১০।১২ ফুট) উপরে বর্তমান লণ্ডন নগরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য হ্বীন, বেলগ্রেদ, রেগেন্সবুর্ক প্রভৃতি নগরের রোমক রাস্তার নকশা আজিও সংরক্ষিত আছে।

রোমক সভ্যতার নাগরিক বৈভব ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির তুলনায় বর্বর উপজাতিদের অপকর্ষ যেমন ইতিহাসে সুবিদিত, তেমনই রোমক সাম্রাজ্যের কয়েকটি অন্তিম সংকটের সহিত তাহার পরবর্তী যুগান্তরের যোগা-যোগও আমাদের স্মর্তব্য। বৃহৎ জমিদারদের মাত্রাহীন শোষণে নিপীড়িত ক্রীতদাসগণ বারংবার বিদ্রোহ করিত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সিসিলি, ইটালী এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। তৎকালে প্রচলিত মানবমৈত্রীর স্টোইক চিন্তাধারায় এবং উদীয়মান খ্রীষ্টান ধর্মমতে ক্রীতদাসদের প্রতি মানবিক ব্যবহারের দাবি আদর্শগত স্বীকৃতি পাইয়াছিল। আবার ক্রীতদাসপ্রথার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল নানা প্রকার আবিষ্কারের সুযোগ এবং প্রয়োগ ব্যাহত হইতেছিল। কারণ সস্তায় প্রচুর ক্রীতদাস নিয়োগের দ্বারা কার্য নির্বাহের সুযোগ থাকিলে নূতন কোনও যান্ত্রিক উপায় প্রবর্তনার উদ্যম প্রবল হইতে পারে না। ফলে কোনও কোনও যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও প্রয়োগের জ্ঞান অর্জিত হইলেও ক্রীতদাসপ্রথার গণ্ডিতে তাহাদের নিয়োজন সম্ভব হয় নাই। এই প্রসঙ্গে গম প্রভৃতি শস্য পেষাইয়ের জন্য জলসেচের দ্বারা চালিত জাঁতাকলের (ওয়াটার মিল) উদ্ভাবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রকারের কল ব্যবহারের যন্ত্রবিদ্যা খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেই রোমকদিগের অনেকটা আয়ত্তে আসিয়াছিল। কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরিবেশে ক্রীতদাস-প্রথার প্রতিকূলতায় সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অন্যপক্ষে ক্রীতদাসপ্রথা ক্রমাগত ব্যয়বহুল হইয়া উঠিতে-ছিল এবং সস্তা দরে অজস্র ক্রীতদাসের জোগান আর সম্ভব হইতেছিল না। ক্রীতদাসভিত্তিক অর্থনীতির এই উভয় সংকটের পটভূমিতেই রোমক সাম্রাজ্যের পতন এবং বর্বর উপজাতিদের মহাদেশবিস্তৃত অভিবাসনের তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করিতে পারি। উল্লেখযোগ্য যে, ইওরোপীয় ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া উঠে, অপরিণত হইলেও তাহার খানিকটা

সাংগঠনিক প্রাক্-পরিচয় বহু ক্ষেত্রে ঐ সকল উপজাতির কৃষিপ্রধান আর্থিক ব্যবস্থায় এবং গোষ্ঠীবদ্ধ কর্মের বিপুল উদ্যমে বর্তমান ছিল।

পঞ্চম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ইওরোপে বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। মধ্য ইওরোপে স্লাব গ্রামগুলিতে পূর্ব ফ্রাঙ্ক জার্মানগণ বসতি স্থাপন করে। স্লাব 'ইন' ও 'ৎসিগ্' ভাগান্ত স্থানের নাম, যেমন বার্লিন, ডান্‌ৎসিগ্, লাইপ্‌ৎসিগ্ ইতিহাসের এই পর্বের সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর উপজাতিগুলি রাষ্ট্রীয় অধিকার সংস্থাপনায় উদ্যোগী হইলে শাসনকেন্দ্ররূপে নগরসমূহের প্রয়োজন স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় এই সব উপজাতি রোমক শাসনব্যবস্থা হইতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের আদর্শটি গ্রহণ করে। আর আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কৃষিপ্রধান সামন্ততন্ত্রের কাঠামো গড়িয়া ওঠে। সামন্ততন্ত্র ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণে শহরগুলির সার্থকতা নূতন করিয়া স্বীকৃত হয়। ক্রমবিকাশের এই ধারায় আবার দক্ষিণ রাশিয়ার স্লাব দুর্গ বা 'গরদ' নামধারী বহু স্থানই ভারাঙ্গিয়ান স্লাবদের দ্বারা নূতন নূতন নগরে পরিণত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও রোমক আদর্শের অনুরূপ কেন্দ্রীয় শক্তির মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছিল। সামন্তপ্রভুদের আবাসস্থানের প্রতিবেশে তাঁহাদের মালিকানাভুক্ত বিস্তৃত জমিতে গ্রামীণ কৃষিসমাজ সংগঠিত হইত। ঐ ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতিতে ধাপে ধাপে কর্তৃত্ব ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যের বন্দোবস্ত গড়িয়া উঠিল। কৃষিকর্মে ভূ-সম্পদের গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার কোনও একটি স্তরে পুরাপুরি বর্তায় নাই। জমিতে দেশের রাজা হইতে শুরু করিয়া ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরের সামন্তবর্গ এবং সর্বনিম্নে ভূমিদাস (সার্ফ) কৃষকগণের বহুতর স্বত্বের সমাবেশ ঘটিত। যুদ্ধের সময়ে রাজাকে অর্থ ও জনবল জোগাইবার শর্তে সামন্তগণ ভূ-সম্পত্তির অধিকার পাইতেন। ভূমিদাস কৃষকগণ সামন্তপ্রভুদের গৃহকর্মে ও খাসজমিতে খাটিবার বাধ্যবাধকতা মানিয়া লইত এবং তাহার বিনিময়ে নিজেদের ভরণপোষণের নিমিত্ত কিয়ৎ পরিমাণ জমি ভোগ করিবার অধিকার পাইত। একজন সামন্তপ্রভুর আবাদযোগ্য জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাঁহার খাস দখলে থাকিত, অবশিষ্টাংশ ভূমিদাসদের মধ্যে পূর্বোক্ত শর্তে বিলি করা হইত। একজন ভূমিদাসের মোট জমির অবস্থান এক জায়গায় ছিল না, তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন ফালিতে ছড়াইয়া থাকিত। সামন্তপ্রভুর পরিবর্তন ঘটিলেও ভূমিদাসদের আপন আপন জমির অধিকার অটুট থাকিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বৃত্তি, অধিকার ও আনুগত্য নির্ণয়ের ব্যাপারে উত্তরাধিকারের নিয়ম ও প্রচলিত প্রথার প্রভাব বলবৎ ছিল। ফলে সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমারেখা স্থাণুত্ব লাভ করে। নিজ নিজ সামন্তপ্রভুদের এক্তিয়ার বর্জনপূর্বক অন্যত্র বৃত্তির অন্বেষণ বা বসতি স্থাপনের অধিকার ভূমিদাসদের ছিল না। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ও কার্যক্রমের উপর সামন্তদের প্রভুত্ব ছিল কঠোর ও সর্বাত্মক। রাজশক্তির সহিত বিশেষ শর্তে আবদ্ধ সামন্তগণ নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলগুলির প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব উপভোগ করিতেন। ভূমিদাসদের গ্রামীণ গোষ্ঠী-জীবন সম্পর্কে অবশ্য সামন্তপ্রভুদের কয়েকটি দায়িত্ব বহন করিতে হইত। অন্য সামন্তদের বিরুদ্ধে ভূমিদাসদের সংরক্ষণ, আইন ও শৃঙ্খলার অনুমোদন, গির্জার সম্পত্তির প্রতি স্বীকৃতি এবং পশুচারণের জন্য এজমালি জমির বন্দোবস্ত ঐ সকল দায়িত্বের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল।

ইওরোপের নানা দেশে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রকারভেদ থাকিলেও উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে সর্ব ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল। আবাদযোগ্য জমি প্রচুর, কিন্তু কৃষিকর্মোপযোগী জনবল তদনুযায়ী অপর্যাপ্ত নহে—এমতাবস্থাতেই ভূমিদাসপ্রথার উপযোগিতা স্বীকৃতি পাইয়াছিল। সরাসরি ক্রীতদাস নিয়োগের পরিবর্তে ভূস্বামীর প্রভুত্ব ও প্রজাস্বত্বমূলক ভোগদখলের একটি প্রাথমিক প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় একাধারে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিজ উৎপাদন এবং সামন্তপ্রভুদের বিস্তৃত জমিতে খাসচাষের অনুকূল ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে জলশক্তি ও বায়ুশক্তি দ্বারা চালিত কলের ব্যাপক নিয়োজন সম্ভবপর হয়। অধিক পশুবলের প্রয়োগসাপেক্ষ উন্নত ধরনের লাঙলের প্রচলন সেই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভূমিদাসদিগকে আপন জমিতে কৃষিকার্যের সুযোগ দেওয়ার ফলে তাহারা নিজেরাও চাষের প্রয়োজনেই পশুপালনে মনোযোগী হইয়াছিল। ইহাতে সামন্তপ্রভুদের খাসজমিতে আবাদের নিমিত্ত মোট পশুবলের জোগান বৃদ্ধি পায়। কৃষিকর্ম ও অন্যান্য প্রয়োজনে অশ্বাদি পশুদের সার্থকতম ব্যবহারের তাগিদে বিবিধ সাজসরঞ্জামের যুগান্তকারী উন্নতি মানবসভ্যতায় মধ্য যুগের বিশিষ্ট অবদান।

পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর সামন্ততন্ত্র -অধ্যুষিত মধ্য যুগের আদি পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের বিনিময়-অর্থনীতির প্রতিপত্তি ও গতিবেগ স্তিমিত হইয়া পড়ে। এইভাবে শহরের কারিগরি শিল্পীরা প্রধানতঃ স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির ক্ষুদ্র কাঠামোয় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে কয়েক শতাব্দী পার হইয়া যায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নগরের জমিও রাজা, সামন্তপ্রভু, যাজক এবং অভিজাতশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মালিকানার অন্তর্গত ছিল। কৃষি-অর্থনীতির ন্যায় নাগরিক সংগঠনও নানাবিধ বিধিনিষেধে আবদ্ধ স্থাণুভাব পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক নগরের শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিধি তাহার নিকটতম আঞ্চলিক সীমার বাহিরে ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। উল্লেখযোগ্য যে, সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধের আঙ্গিকেই আবার কারিগর ও বণিকদের নিকট বৃত্তির ভিত্তিতে যৌথ সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঐ প্রয়োজনের তাগিদেই কারিগর ও বণিকদের লইয়া বিভিন্ন গিল্ড বা হান্স নামক যৌথ সংগঠনগুলির সূত্রপাত ঘটে। এবংবিধ সংগঠনসমূহের প্রসারণশীল ভূমিকা পরবর্তী রূপান্তরের গতি-প্রকৃতির উপর নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে অবশ্য আবার বাণিজ্যবিস্তার শুরু হয়। মুসলমান-অধিকৃত জেরুজালেমের পুণ্যভূমি পুনরধিকারের নিমিত্ত ইওরোপের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রসমূহ যে ধর্মযুদ্ধে (ক্রুসেড) যোগ দিয়াছিল তাহার জন্য বিপুল সরবরাহ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে বাণিজ্যের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়া যায়।

প্রথম দিকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বাণিজ্য ব্যাপ্তি লাভ করে। ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ কারিগরি শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। বাইজান্তিয়াম, অ্যাথেন্স, করিন্থ, ভেন্যাৎসিয়া (ভেনিস) ও মিলানো (মিলান), জেনিভা প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রধানতঃ ক্রীতদাসের সাহায্যে নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বাণিজ্যের সুফলগুলি মুখ্যতঃ সমুদ্রোপকূলবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে মহাদেশের মধ্য ও উত্তর ভাগে শিল্পজ পণ্য উৎপাদনের প্রসার ঘটে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনের সূত্রে ঐ সব অঞ্চলের উৎপাদনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃষিজ ফসল ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনিময়কেন্দ্র হিসাবে বহু মেলা ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী বাজার গড়িয়া উঠিতে থাকে। ফ্রান্সের ত্রোয়া-সুর্-সেইন, শাঁলো-সুর্-মার্ন, বার্-সুর্-ওব্; ফ্ল্যাণ্ডার্সের ব্রুজ, গাঁ, অ্যান্টওয়ার্প; বাল্টিক উপকূলে হামবুর্ক, ব্রেহেম, ল্যুবেক, ডান্ৎসিগ্ (ড্যানজিগ), ক্যোনিক্সবের্ক; মধ্য ইওরোপীয় জলাভূমিতে বার্লিন, ব্রাণ্ডেনবুর্ক, পোজনান; তাহার দক্ষিণে লোয়েস মৃত্তিকা অঞ্চলে ডোর্টমুণ্ট্, মাক্ডেবুর্ক, হানোভার, ব্রাউন্শ্ভিক্, লাইপ্ৎসিগ্, (লাইপসিগ), ক্রাকাউ; রাশিয়াতে নিজ্নি, নোভগরদ, রাস্টভ্ প্রভৃতি বহু নগর ঐ সব মেলাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে।

উত্তর-পশ্চিম ইওরোপীয় বাণিজ্যের এই সম্প্রসারণকালে জার্মানীর বাণিজ্যরত নগরসমূহের বণিকেরা তাঁহাদের হান্স নামক যৌথ সংগঠনগুলিকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বহুবিধ পারস্পরিক চুক্তি ও সমবেত ক্ষমতা প্রয়োগের বলে ঐ সংঘটি সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিপুল প্রতিপত্তি বিস্তার করে। সংঘটির নাম ছিল হান্সিয়াটিক লীগ। ক্ষমতার পরিমাণে তাহা প্রায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমকক্ষ ছিল। হান্সিয়াটিক লীগের অধীন বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে যে শুধু বিপুল পণ্যসম্ভারের গুদাম থাকিত তাহা নহে, সংঘবদ্ধ সামরিক ক্ষমতার পরাক্রান্ত প্রস্তুতিতে ঐ সকল কেন্দ্র সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় অবস্থিত ছিল।

হান্সিয়াটিক লীগভুক্ত বণিকসম্প্রদায় ফেনোস্ক্যাণ্ডিয়া, রাশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের অন্তর্বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। ফেনোস্ক্যাণ্ডিয়া হইতে কাঠ, লোহা, তামা, লোমশ চামড়া, মাছ, মাংস ও শস্য; রাশিয়া হইতে নানা প্রকার চামড়া, শস্য ও মোম; দক্ষিণ ইওরোপ হইতে মদ, লবণ, তেল, ফল, রেশম ও চিনি আমদানি করিয়া তাহারা বিনিময়-অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার করে। উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের, বিশেষ করিয়া ফ্ল্যাণ্ডার্স ও বেলজিয়ামের বহু বাণিজ্যকেন্দ্রে সেই সময়ে কারিগরি-সংগঠনের তত্ত্বাবধানে নানা প্রকার শিল্পোৎপাদন হইত। কারিগরি সংগঠনগুলি বহু স্বায়ত্তশাসিত নগরের পত্তন করে। পঞ্চদশ শতকে বাইজান্তিয়াম ও মূর সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সব শিল্প-উৎপাদনকারী অঞ্চলের উপরেই মহাদেশীয় বাণিজ্যের নেতৃত্ব বর্তায়।

হান্সিয়াটিক লীগের বণিকগণ, শিল্পজ দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য মহাদেশের বিভিন্ন গ্রামের কারিগরদের অগ্রিম দাদন দিতেন। দাদন পাইবার ফলে ঐ সব কারিগরদের পণ্যের বাজার স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির সংকীর্ণ কাঠামো হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে এবং পরে কারিগরি সংগঠনের প্রতিপত্তিমূলক নূতন ধরনের নাগরিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনাও স্পষ্ট

হইতে থাকে। হান্‌সিয়াটিক লীগের কর্মপ্রক্রিয়ায় অবশ্য কারিগরগণ সর্বতোভাবে বণিকস্বার্থের অধীনে ছিল। বৃহৎ বণিকদের ধনবল ও অন্যান্য অধিকারের বিরুদ্ধে কারিগরদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল তখনও সুদূরপরাহত।

অন্ততঃ প্রথম দিকে কারিগরি-সংগঠন -পরিচালিত নগরস্থাপনে রাষ্ট্রীয় শাসকদের সমর্থন ছিল। ফলে ফ্ল্যাণ্ডার্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড ঐ সময়ে সংগঠিত শিল্পোৎপাদনে অগ্রণী ছিল। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ধর্ম ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে ঐ শিল্পকেন্দ্রগুলির উন্নতি ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মমতাবলম্বী কারিগরগণ দেশত্যাগ করে।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পশ্চিম ইওরোপের বহু রাষ্ট্রে হান্‌সিয়াটিক লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ বণিকশক্তি গড়িয়া উঠে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভেনিসীয় বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি পূর্ব হইতেই ছিল। পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের বণিকেরা পৃথিবীর বহু অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য শুরু করিয়াছিল। এই বণিক-গণ প্রায়শঃ আপন আপন রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিত। বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে যাতায়াতের নিমিত্ত সমুদ্রপথগুলির যুগান্তকারী আবিষ্কারে বাণিজ্যবিস্তারের সুযোগ অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বণিকশক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে হান্‌-সিয়াটিক লীগের মহাদেশীয় প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। বহি-র্বাণিজ্যের প্রসারে এক দিকে যেমন ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিপুল ধনসঞ্চয়ের সুযোগ অর্জন করে, তেমনই এই বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াতেই অন্যান্য মহাদেশে ইওরোপীয় উপনিবেশগুলির পত্তন ঘটে। তাই ইওরোপের ইতিহাসে বাণিজ্যবিস্তারের গুরুত্ব সর্ববাদীসম্মত। ইওরোপের দেশে দেশে বণিকশক্তির উত্থান এবং বাণিজ্যের প্রসারে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যাপকতর ও বৃহত্তর রূপান্তরের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাণিজ্যের বিস্তার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নূতন গতি-বেগ সঞ্চার করিল। ইহার প্রভাব গ্রামীণ ও নাগরিক অর্থনীতির উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়। বাণিজ্যবিস্তারের সহিত মুদ্রাতন্ত্রের বিকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মুদ্রা ও বিনিময়ের প্রচলন ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে ভূমিদাসগণ সামন্ত-প্রভুদের পাওনা মুদ্রায় মিটাইয়া তাহাদের অধীনতা হইতে মুক্তি পাইতে প্রয়াসী হইয়াছিল। নাগরিক অর্থ-নীতির বিকাশের ফলে ক্রমশঃ কৃষি ও শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে আবার নিজেদের জমির উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিয়া ভূমিদাসেরা অর্থ উপার্জনের সুযোগ লাভ করে। অন্য পক্ষে নূতন নূতন ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত সামন্তপ্রভুদের আর্থিক প্রয়োজন বাড়িতে থাকে এবং এই তাগিদে অনেক সময়ে তাঁহারা অর্থ আদায়ের শর্তে ভূমিদাসদিগকে বাধ্যতামূলক খাটুনি ও অন্যান্য বহুবিধ বাধানিষেধ হইতে মুক্তি দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর প্লেগ মহামারীর (ব্ল্যাক ডেথ) প্রকোপে অপরিমেয় প্রাণবিনাশ ও জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তির পর অবশ্য আবার সামন্তপ্রভুদের নিকট ভূমিদাসপ্রথার প্রয়োজন প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় জোগানের বিপুল ঘাটতির পরিস্থিতিতে আর বলপূর্বক সামন্ততন্ত্রের আদিরূপে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল বিরোধ ও বারংবার বিদ্রোহের মধ্য দিয়া ভূমিদাসপ্রথা ঐতিহাসিক বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বাণিজ্যের বিস্তার অনেক ক্ষেত্রে নিছক খাদ্যশস্য অপেক্ষা অন্যবিধ পণ্যের উৎপাদন বিশেষ লাভজনক করিয়া তোলে। সেই পরিস্থিতিতে আপন স্বার্থেই ভূস্বামীরা আবাদযোগ্য জমির ব্যবহার বদলাইতে উদ্যোগী হইলে ভূমিদাসপ্রথার প্রয়োজনও ফুরাইয়া যায়। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের (রেফর্মেশন) দ্বন্দ্বময় অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে টিউডর নৃপতি অষ্টম হেনরি ক্যাথলিক গির্জার জমি দখল ও পুনর্বণ্টন করিয়া বাণিজ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ভূস্বামীদের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে পশমের বাণিজ্য, আবাদযোগ্য জমির মেষচারণক্ষেত্রে রূপান্তর এবং টিউডর আমলের কৃষিবিপ্লবের মধ্যে যোগাযোগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ধরনে পরিবর্তন বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট ধনীদের দ্বারা জমিতে অর্থ বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের কার্যক্রমে তৎসংশ্লিষ্ট পুনর্বিন্যাসের সহিত জড়িত ছিল। কৃষি-আবাদের পশুচারণক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ভূমিদাস কৃষকগণ নির্মমভাবে উৎসাদিত হইল। ইহারই পরিণামে উদ্বাস্তু, নিঃসম্বল কৃষকগণের নির্বিত্ত মজুরশ্রেণীতে রূপান্তরের সূচনা হইল।

সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-অর্থনীতিতে এবংবিধ পরিবর্তনের পাশাপাশি নাগরিক আর্থিকব্যবস্থা ও শক্তিবিন্যাসেও রূপান্তর ঘটিতেছিল। বহুতর বিধিনিষেধ হইতে মুক্তির জন্য কারিগর ও বণিকদের গিল্‌ডগুলির নিরন্তর প্রয়াসেই পরিবর্তনের উৎস রচিত হইতেছিল। সামন্তপ্রভুদের সহিত নগরের কারিগর ও বণিকদের বিরোধে রাজশক্তির সমর্থন অনেক সময়ে শেষোক্ত পক্ষে বর্তাইত। মধ্য যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজার স্থান বিধিগতভাবে সর্বোপরি হইলেও সামন্তপ্রভুদের উপর আর্থিক ও সামরিক

নির্ভরতার ফলে রাজশক্তির কার্যকরী ক্ষমতা নিতান্ত শিথিল ও সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কারিগর ও বণিকদের প্রতিবাদের সুযোগ লইয়া রাজারাও নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির একটি পথ খুঁজিত। আর সমুদ্রপথে দূরদূরান্তরে বাণিজ্যের উপযুক্ত বৃহৎ বণিক কোম্পানিগুলির উৎপত্তির পর এই দিক হইতে একটি নূতন রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আঞ্চলিকতার বন্ধন ছাড়াইয়া বৃহৎ কোম্পানিগুলি জাতীয় বাজার এবং শক্তিশালী সংহত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। এই অবস্থায় নানা বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্যসাধন এবং জাতীয় রাষ্ট্র ও অর্থ -ব্যবস্থার পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া রাজশক্তি আপন পরাক্রম বাড়াইবার উপায় খুঁজিল। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার এইরূপ সমন্বয়ের মধ্যেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক উৎস। বাণিজ্যের বিপুল অভিঘাতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বণিকস্বার্থের দিগ্বিজয়কে উৎপাদনের বৃদ্ধি ও উন্নতির অনুকূল বন্দোবস্তের সহিত মিলাইবার সার্থকতাতেই সেই সমন্বয়ের প্রগতিশীল তাৎপর্য নিহিত ছিল। অন্য দিকে যে সব রাজ্য কারিগরদের বাধা-বিপত্তি না সরাইয়া বা মধ্যযুগীয় গিল্‌ডগুলিকে কালোপ-যোগী সম্প্রসারণের সুযোগ না দিয়া কেবলমাত্র বৃহৎ বণিকস্বার্থের নিরঙ্কুশ অনুমোদনের মারফত সম্পদবৃদ্ধির পথে চলিয়াছিল, তাহারা বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিতে পারিলেও পরবর্তী যুগান্তরের প্রবর্তন করিতে পারে নাই। ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথীয় আইনসমূহে এই দিক হইতে সার্থক সমন্বয়ের পরিচয় আমাদের দ্রষ্টব্য। তুলনায় ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী বিধি-প্রকরণ অনেক বেশি পশ্চাদ্বর্তী ছিল। আর হল্যাণ্ড, স্পেন বা পর্তুগালের ন্যায় দেশ প্রাগুক্ত সমন্বয়ের অভাবে অপর্যাপ্ত বাণিজ্যবিস্তার সত্ত্বেও শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতিতে পিছাইয়া পড়িল। জার্মানীতেও শিল্পবিপ্লবের বিলম্ব ঘটিবার জন্য ইতিহাসের পশ্চাৎপটে হানসিয়াটিক লীগের আমলে কারিগরি স্বার্থের পর্যুদস্ত অবস্থার বিষয়টি কার্য-কারণ-চিন্তায় সাহায্য করে।

কারিগরপ্রধান নগরের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং সমগ্র আর্থিকব্যবস্থায় কারিগর ও অন্তর্বাণিজ্যে নিযুক্ত মাঝারি বণিকদের প্রতিপত্তি বিস্তার ইওরোপের সর্বত্র সমানভাবে হয় নাই। বিকাশের এই সকল তারতম্যের সহিত ইওরোপীয় ইতিহাসের রেনেসাঁস-পরবর্তী প্রগতির ধারা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। গিল্‌ডগুলির সংগঠনে নানা পরিবর্তন ঘটিতেছিল। ওস্তাদ কারিগর এবং তাহার শাগরেদদের মধ্যে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ বাজারের স্থানীয় অবরোধ হইতে মুক্তির ফলে উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি গিল্‌ডগুলির নূতন সমৃদ্ধির সূচনা করে। ফলে ওস্তাদ কারিগরদের কায়িক শ্রমে বিরতি ঘটে এবং তাহারা ক্রমশঃ পুঁজিসম্পন্ন নিয়োজকের (অঁত্‌রপ্রনয়র্‌) ভূমিকা পরিগ্রহ করিতে অগ্রসর হয়। কারিগরি উৎপাদনের ভিত হইতে এই নিয়োজক-শ্রেণীর আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাহাদের দৃষ্টিকোণ এবং কার্যক্রমে উৎপাদনের উন্নতির প্রশ্ন ছিল সর্বাগ্রগণ্য। কৃষি-অর্থনীতিতেও ভূমিদাসত্বের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত কৃষকদের অনুরূপ ভূমিকা ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত মাঝারি বণিকরা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সর্বপ্রকার বাধানিষেধ এবং রাজানুগৃহীত বৃহৎ কোম্পানি-সমূহের একচেটিয়া ক্ষমতার বিরুদ্ধে ছিল। এই ত্রিবিধ আর্থিক ধারার ভিত্তির উপরে ধনতন্ত্রের উদীয়মান শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল। রাজশক্তি, অবক্ষয়প্রাপ্ত সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া বণিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিরোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারাতেই ধনতান্ত্রিক যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন হইতে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিন-চার শতাব্দীব্যাপী যুগপরিবর্তনের গতি-প্রকৃতিতে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যে সব দেশে বাণিজ্যের প্রাথমিক বিস্তার সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন হইতে পূর্ণ মুক্তি, সর্বপ্রকার একচেটিয়া ক্ষমতার বিলোপ এবং উৎপাদনমুখী নিয়োজনের অনুকূল হয় নাই, সেই সব জায়গায় বিনিময়-অর্থনীতির সংঘাত সত্ত্বেও শিল্পবিপ্লবের নূতন দিগন্ত উন্মোচনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। আর যে সব দেশে বাণিজ্যবিস্তারের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক প্রতিক্রিয়ায় বিনিময় ও উৎপাদনের মধ্যে অন্যোন্য পরিপূরণের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহারা কৃষি ও শিল্প -বিপ্লবের সেতুবন্ধনে সর্বাগ্রে সাফল্য লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আবার বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহাদের সম্পদ চূড়ান্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবার বুদ্ধি ও সামর্থ্য সকল পত্তনকারী ইওরোপীয় রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসে নাই। কেবলমাত্র শিল্পবিপ্লবোত্তীর্ণ রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে উপনিবেশগুলিকে কাঁচা মালের উৎস, শিল্পপণ্যের বাজার এবং অল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্র রূপে পুরাপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া-ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উৎপাদনব্যবস্থার সংগঠনে পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলির পর অষ্টাদশ শতকে

ইওরোপের রাজ্য ও রাজধানী

রাজ্য	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা	রাজধানী	রাজধানীর লোকসংখ্যা
অস্ট্রিয়া	৮৩৮৫৬/৩২৩৭৭	৭০৯০০০০ (১৯৪৯ খ্রী)	হ্বীন (ভিয়েনা)	১৭৩১৫৫৭ (১৯৪৯ খ্রী)
আইসল্যাণ্ড	৯২৯৭৩/৩৯৭৫৮	১৬৬৮৩১ (১৯৫৭ খ্রী)	রেকিয়াভিক	৬৭৫৮৯ (১৯৫৭ খ্রী)
আয়ারল্যাণ্ড	৬৮৮৯৯/২৬৬০২	২৮৯৮২৬৪ (১৯৫৬ খ্রী)	ডাবলিন	৫৩৯৪৭৬ (১৯৫৬ খ্রী)
অ্যানডোরা	৩৯৫/১৯১	৫৪০০ (১৯৫০ খ্রী)	অ্যানডোরা	৬০০ (১৯৫০ খ্রী)
অ্যালবেনিয়া	২৭৫২৮৯/১০৬৯২৯	১৩৯৪৩১০ (১৯৫৫ খ্রী)	তিরানে	৫০০০০ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)
ইওরোপীয় তুরস্ক	১৩৯৭৩/৯২৫৬	১৫৯৮২৫৫ (১৯৫০ খ্রী)	ইস্তাম্বুল	১২১৪৬১৬ (১৯৫৫ খ্রী)
ইটালী	৩০১০২০/১১৬২২৪	৪৮৫৯৪০০০ (১৯৫৮ খ্রী)	রোমা (রোম)	১৭০১৯১৩ (১৯৫১ খ্রী)
গ্রীস	৫৫০১২/২১২৪৬	৮১২৪৬০৬ (অনুমান, ১৯৫৬ খ্রী)	অ্যাথেন্স	৬৫২৩৮৫ (১৯৫০ খ্রী)
চেকোস্লোভাকিয়া	১২৭৮২৭/৪৯৩৫৪	৯৪৮০২০৬ (১৯৫৭ খ্রী)	প্রাহা (প্রাগ)	৯৭৮৬৩৪ (১৯৫৭ খ্রী)
পূর্ব জার্মানী	১০৯৮০৫/৪২৩৯২	১৭৪১০৬৭০ (১৯৫৭ খ্রী)	বের্লিন (বার্লিন)	১১১০০০০ (১৯৫৭ খ্রী)
পশ্চিম জার্মানী	২৪৭৬৬৭/৯৫৬২৫	৫১৮৩২০০০ (১৯৫৭ খ্রী)	বন্	১৪০৮৬১ (১৯৫৭ খ্রী)
ডেনমার্ক	৪২৯৩২/১৬৫৭৬	৪৪৪৯০০০ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)	ক্যোবেনহাভ্ন (কোপেনহেগেন)	৯৬০৩১৯ (১৯৫৫ খ্রী)
নরওয়ে	৩২২৬০০/১২৪৫৫৬	৩৪৭৭৭৮৬ (১৯৫৭ খ্রী)	ওস্লো	৪৫৫১১৩ (১৯৫৭ খ্রী)
নেদারল্যাণ্ড্স	৩৩৩২৮/১২৮৬৮	১১০৯৫৭২৬ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)	আমস্টারডাম	৮৭১৫৭৭ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)
পর্তুগাল	৮৯০৬০/৩৪৩৮৬	৮৪৪১৩১২ (১৯৫০ খ্রী)	লিজবোয়া (লিস্বন)	৭৯০৪৩৪ (১৯৫০ খ্রী)
পোল্যাণ্ড	৩১১৮৩০/১২০৩৫৯	২৯০০০০০০ (অনুমান, ১৯৫৯ খ্রী)	ভারশাভা (ওয়রশ)	১০০১০০০ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)
ফিনল্যাণ্ড	৩৩৭১১২/১৩০১৫৯	৪২৫৭৩০০ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)	হেলসিংফোর্স (হেলসিংকি)	৪৩৬৮৫২ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)

রাজ্য	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা	রাজধানী	রাজধানীর লোকসংখ্যা
ফ্রান্স	৫৪৯৭৭৭/২১২৬৫৯	৪২৭৭৭১৭৪ (১৯৫৪ খ্রী)	পারী (প্যারিস)	২৮৫০১৮৯ (১৯৫৪ খ্রী)
বুলগেরিয়া	১১০৮৪২/৪২৭৯৬	৭৬২৯২৫৪ (১৯৫৬ খ্রী)	সোফিয়া	৭২৫৭৫৬ (১৯৫৬ খ্রী)
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	২৪৪১৮৩/৯৪২৭৯	৫০২৭৮০০০ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)	লণ্ডন	৩২২৫০০০ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)
বেলজিয়াম	৩০৫১৮/১১৭৮৩	৮৬২৫০৮৪ (১৯৪৯ খ্রী)	ব্রাস্‌ল্‌জ	৯২৫০৩১ (১৯৫০ খ্রী)
ভ্যাটিক্যান সিটি	৪৪ হেক্টার/১০৮·৭ একর	৯৪০ (১৯৪৭ খ্রী)	-	-
মোনাকো	১৪৯ হেক্টার/৩৬৮ একর	২০৪২২ (১৯৫৬ খ্রী)	মোনাকো	-
যুগোস্লাভিয়া	২৪৭৫৪২/৯৫৫৭৬	১৬৯৩৬৫৭৩ (১৯৫৩ খ্রী)	বেলগ্রেদ	৫২০০০০ (অনুমান, ১৯৫৮ খ্রী)
রুমানিয়া	২৩৭৪২৮/৯১৬৭১	১৭৮২৯০০০ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)	বুকুরেশ্‌তি (বুখারেস্ট)	১২৩৭০০০ (১৯৫৬ খ্রী)
লিক্‌টেনস্টাইন	১৬১/৬২	১৪৭৫৭ (১৯৫৫ খ্রী)	ফাডুট্‌স্‌	২৭৭২ (১৯৫০ খ্রী)
লুক্সেমবুর্ক	২৫৮৭/৯৯৯	৩১৭৮৫৩ (১৯৫৮ খ্রী)	লুক্সেমবুর্ক	৭০১৫৮ (১৯৫৮ খ্রী)
সানমারিনো	৯৮/৩৮	১৩৫০০ (১৯৫৩ খ্রী)	-	-
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৪১২৯৫/১৫৯৪৪	৪৭১৪৯৯২ (১৯৫০ খ্রী)	বের্ন (বার্ন)	৮০১৯৪৩ (১৯৫০ খ্রী)
সুইডেন	৪৪৯০৮০/১৭৩৩৯০	৭৩৯২৮৭২ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)	স্টক্‌হোল্‌ম	৭৯৮৯১৩ (অনুমান, ১৯৫৭ খ্রী)
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র	২২৫৪৩১৪১/৮৭০৪০৭০	২০১৩০০০০০ (১৯৫০ খ্রী)	মস্ক্‌ভা (মস্কো)	৪৮৪৭০০০ (অনুমান, ১৯৫৬ খ্রী)
স্পেন	৪৯১৮১৫/১৮৯৮৯০	২৯৩৬২৩৪৪ (১৯৫৭ খ্রী)	মাথ্‌রিথ (মাদ্রিদ)	১৮৭৯০৩৭ (১৯৫৭ খ্রী)
হাঙ্গেরী	৯৩৩০৪/৩৫৯০৯	৯৮৬৮০০০ (১৯৫৮ খ্রী)	বুদপেশ্‌ত (বুডাপেস্ট)	১৮৫০০০০ (১৯৫৮ খ্রী)

কয়েকটি যুগান্তকারী যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সমগ্র শিল্প ও উৎপাদনপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইওরোপীয় অর্থ-নীতির ইতিহাসে এই যুগ 'শিল্পবিপ্লব' নামে পরিচিত ('শিল্পবিপ্লব' দ্র)। শিল্প-উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও শ্রমবিভাগের সূত্রে পৌনঃপুনিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি এই শিল্পবিপ্লবের মূল লক্ষণ। কিন্তু এই উৎপাদনব্যবস্থার নেতৃত্ব বণিকদের হাত হইতে পুঁজিপতিদের হাতে চলিয়া যায়। নূতন সব যন্ত্রের ব্যবহার উৎপাদন হইতে মুনাফার সুযোগ বিপুল পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। তাই বাণিজ্যকর্ম অপেক্ষা উৎপাদনসংস্থায় সরাসরি মূলধন বিনিয়োগের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করে।

মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে এই শিল্পবিপ্লব অতি দ্রুত সম্পূর্ণ হয়। কেবল কারিগরিশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির শক্তিই শিল্পবিপ্লবের মূল কথা নহে। যন্ত্র প্রস্তুতের জন্য লৌহ ধাতু এবং শক্তি হিসাবে কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবার ফলে সমগ্র শিল্প-অর্থনীতি কারিগরিশিল্পের কাঠামো হইতে মুক্ত হইয়া ভারি শিল্পে কেন্দ্রীভূত হয়। শিল্প-অর্থনীতির উৎপাদক শক্তি স্থানীয় কয়লা ও লৌহ-সম্পদের দ্বারা নির্ধারিত হইতে থাকে। স্বভাবতঃই হার্সিনিয়ান ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চলে ঐ সব খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় বহু শিল্পনগরী ঐ সব অঞ্চলে গড়িয়া উঠিতে থাকে। প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ফ্রান্স, দক্ষিণ বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্ক, দক্ষিণ জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, দক্ষিণ পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের হার্সিনিয়ান ভূগঠন তাই বর্তমান ইওরোপীয় শিল্পসভ্যতার মেরুদণ্ডরূপে অবস্থিত। মহাদেশের পূর্ব ভাগে এই শিল্পবিপ্লব আজও সম্পূর্ণ হয় নাই।

মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা ৪৫৮-৫৯ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইল। নগরের আধিক্য-বশতঃ কেবল রাজধানীগুলির লোকসংখ্যা বর্ণিত হইল।

নগরজীবনের অনুপাত বুঝিবার জন্য তালিকাতে বহু ক্ষেত্রে জনসংখ্যার পুরাতন হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার সাম্প্রতিকতম হিসাব (১৯৬০ খ্রী, রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক সংগৃহীত) নিম্নের তালিকায় উল্লিখিত হইল :

রাষ্ট্র	জনসংখ্যা (০০০)
অস্ট্রিয়া	৭০৮১
আইসল্যাণ্ড	১৭৬
আয়ারল্যাণ্ড	২৮৩৪
অ্যানডোরা	৮
অ্যালবেনিয়া	১৬০৭
ইওরোপীয় তুরস্ক	২২৭১
ইটালী	৪৯৩৬১
গ্রীস	৮৩২৭
চেকোস্লোভাকিয়া	১৩৬৫৪
ডেনমার্ক	৪৫৮১
নরওয়ে	৩৫৮৬
নেদারল্যাণ্ড্স	১১৪৮০
পশ্চিম জার্মানী	৫৩৩৭৩
পর্তুগাল	৮৯২১
পূর্ব জার্মানী	১৬১৬৪
পোল্যাণ্ড	২৯৭০৩
ফিনল্যাণ্ড	৪৪৪৯
ফ্রান্স	৪৫৫৪২
বুলগেরিয়া	৭৮৬৭
বেলজিয়াম	৯১৫৩
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	৫২৫৩৯
ভ্যাটিক্যান সিটি	১
মোনাকো	২৩
যুগোস্লাভিয়া	১৮৫৩৮
রুমানিয়া	১৮৪০৩
লিক্‌টেনস্টাইন	১৬
লুক্সেমবুর্ক	৩১৪
সানমারিনো	১৭
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৫৩৫১
সুইডেন	৭৪৮০
স্পেন	৩০১২৮
হাঙ্গেরী	৯৯৯৯
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৪ খ্রী)	২২৬০০০

দ্র M. R. Shakleton, *Europe : A Regional Geography*, London, 1959 ; V. Gordon Childe, *The Prehistory of European Society*, London, 1958 ; H. M. Chadwick, *The Nationalities of Europe & the Growth of National Ideologies*, London, 1945 ; R. E. Dickinson, *The West European City*, London, 1951 ; C. S. Coon, *The Races of Europe*, New York, 1939 ; W. G. East, *A Historical Geography of Europe*, New York, 1950 ; D. Whittlesey, *Environmental Foundations of European History*, New York,

ইংরেজ, ভারতে

1949; S. V. Valkenberg & C. C. Held, *Europe*, New York, 1952; Leo Huberman, *Man's Worldly Goods*, Bombay, 1948; E. M. Carus-Wilson, ed., *Essays in Economic History*, London, 1954. M. Bloch, *Feudal Society*, London, 1961; E. F. Heckscher, *Mercantilism*, vols. I & II, London, 1955; G. Unwin, *Industrial Organisation in the 16th and 17th Centuries*, London, 1957; P. M. Sweezy & Others, *Transition from Feudalism to Capitalism*, London, 1954.

সত্যেশ চক্রবর্তী
অশোক সেন

ইংরেজ, ভারতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ 'দি গভর্নর অ্যাণ্ড কোম্পানি অফ মার্চেন্ট্‌স অফ লণ্ডন ট্রেডিং ইন্‌টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ'কে যে দলিল দান করেন, তাহাতে ভারতে ইংরেজ আগমনের সম্ভাবনা প্রথম সূচিত হয়। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর এক ফরমানের দ্বারা সুরাটে ইংরেজদের স্থায়ী কুঠি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের নিকট ইংরেজদের প্রথম রাষ্ট্রদূত হইয়া আসেন স্যর টমাস রো এবং স্বজাতির জন্য তিনি নানাবিধ সুবিধা আদায় করেন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ এবং ব্রোচ -এ ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়।

ইংরেজরাজ দ্বিতীয় চার্লস বৈবাহিক সূত্রে বোম্বাই দ্বীপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহা কোম্পানিকে সমর্পণ করেন। ক্রমে বোম্বাই ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুরাট অপেক্ষা বোম্বাই এই দিক দিয়া বহুলাংশে উপযুক্ত ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা মসুলিপট্টমে কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজপট্টমে আর একটি সুরক্ষিত কুঠি স্থাপিত হয়। উহাই কোম্পানির আমলের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ এবং আধুনিক কালের মাদ্রাজ। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টো নোভো ও কুদ্দালোরে ইংরেজরা বাণিজ্যিক কেন্দ্র উন্মুক্ত করে।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কটকে আসে। কিন্তু পরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কটক পরিত্যাগ করিয়া হুগলিতে চলিয়া যায় এবং ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থানে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়। মোগল আক্রমণের ফলে জোব চার্নক হুগলি ছাড়িয়া সুতানুটিতে আসেন এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক কলিকাতার সূচনা হয়। ইংরেজরাজ তৃতীয় উইলিয়ামের সম্মানার্থে কলিকাতা কুঠির নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নানাবিধ বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইংল্যাণ্ডে শত্রুদের ঈর্ষাপরতা তাহাদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে 'দি ইংলিশ কোম্পানি ট্রেডিং টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ' নামে আর একটি কোম্পানি গঠিত হয়। বহু কলহের পর দুই কোম্পানি সংযুক্ত হয় (১৭০২ খ্রী) এবং 'ইউনাইটেড কোম্পানি অফ মার্চেন্ট্‌স অফ ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ' নামে অভিহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হইলে কোম্পানির শাসন সমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের সাম্রাজ্য গঠনে প্রথম বাধা সৃষ্টি করে ফরাসীরা। ক্লাইভ, লরেন্স, আয়ার কূট ও ফোর্ড প্রভৃতি প্রখ্যাত ইংরেজ সেনাপতিদের কর্মকুশলতায় ইংরেজদের জয়লাভ সহজ হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট ফরাসীদের পরাজয় হয় এবং সেই-সঙ্গে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় বাংলা-দেশকে কেন্দ্র করিয়া। অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া ইংরেজরা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে এবং পরবর্তী নবাবগণ ইংরেজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজরা অপরিসীম মনোবল লইয়া মারাঠা ও মহীশূরবাসীদের সহিত সংগ্রাম করে। মারাঠাদের সহিত তিনবার এবং মহীশূরবাসীদের সহিত চারবার সংগ্রাম হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস কূটনৈতিক চালে মারাঠাদের সংহতি নষ্ট করেন এবং ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের সহিত সালবাই-এ সন্ধি করেন। মহাদজী সিন্ধিয়ার প্রচেষ্টার ফলে এই সন্ধি সম্পাদিত হয়। সেইজন্য মহাদজী সিন্ধিয়াকে ইংরেজরা 'মারাঠা সাম্রাজ্যের সহিত প্রাথমিক যোগসূত্র' হিসাবে গণ্য করে। ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তির সহিত কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজরা মলেট নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পুণাতে প্রেরণ করেন। স্যর জন শোর ও লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ইঙ্গ-মারাঠা রাজনৈতিক সম্বন্ধের মধ্যে বিশেষ কোনও ভাঙন দেখা

ইংরেজ, ভারতে

দেয় নাই। ইহার কারণ নানা ফড়নবিশের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মহাদজী সিন্ধিয়ার শক্তি-সামর্থ্য এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজদের নিরপেক্ষ নীতি। ১৭৯৪ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে মহাদজী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশের মৃত্যুতে মারাঠাশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। মহাদজীর দত্তকপুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও তুকোজী হোলকারের পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার, এই দুই মারাঠা-প্রধানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বাধ্য হইয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন (১৮০২ খ্রী)। ইহা বেসিনের চুক্তি নামে খ্যাত। কিন্তু মারাঠা-প্রধানগণ— বেরারের রঘুজী ভোঁসলে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকার— ইংরেজদের সার্বভৌম ক্ষমতা এত সহজে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের যে যুদ্ধ হয় তাহা দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধের প্রথম ভাগে হোলকার সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত যোগ দেন নাই। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনী আসাই-এর যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩ খ্রী) পরাজিত হয়। আরগাঁওয়ের যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৮০৩ খ্রী) পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। দেওগাঁয়ের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ভোঁসলের নিকট হইতে ইংরেজরা কটক প্রাপ্ত হয়। উত্তর ভারতবর্ষে লাসোয়ারির যুদ্ধে সিন্ধিয়া পরাজিত হন এবং সুর্যি অর্জুনগাঁও সন্ধিসূত্রে (ডিসেম্বর ১৮০৩) অধীনতা-মূলক মিত্রতা চুক্তি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। যমুনা ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং জয়পুর, যোধপুর ও গোহাডের উত্তরবর্তী সমস্ত জেলা সিন্ধিয়া ইংরেজদের সমর্পণ করেন। যশোবন্তরাও হোলকার ইহার পর স্বীয় শক্তিবলে প্রথমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও পরে পরাজিত হন। কয়েক বৎসর পরে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৮ খ্রী) পুনরায় মারাঠাশক্তির পরাজয় ঘটে। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া পদের দাবি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে এবং কানপুরের নিকট বিঠুরে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী-সৃষ্ট মারাঠা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল।

দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলী এক নূতন শক্তির সৃষ্টি করিতেছিলেন। ইংরেজরা প্রথমে তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৮০-৮৪ খ্রী) মাদ্রাজ কাউন্সিল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরে হায়দারের পুত্র টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯০-৯২ খ্রী) কর্নওয়ালিস নিজাম ও মারাঠাদের সহায়তা অর্জন করেন। টিপু পরাজিত হন এবং শ্রীরঙ্গপট্টনমের সন্ধিতে সাম্রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে ওয়েলেস্‌লি টিপুকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও নিহত করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইংরেজরা শিখ ও আফগানদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং-এর সহিত অমৃতসরের সন্ধি করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর শিখদের আভ্যন্তরীণ সংহতি নষ্ট হইয়া যায় এবং সামরিক বাহিনী রাজ্যের প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে প্রথম শিখ যুদ্ধে (১৮৪৫-৪৬ খ্রী) শিখরা মুদ্‌কি, ফিরোজশাহ্‌, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ-এর যুদ্ধে পরাজিত হন। রণজিৎ সিং-এর কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিং ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হন। লর্ড ডালহৌসি দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯ খ্রী) চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে শিখদের পরাজিত করেন এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ এক ঘোষণাবলে পাঞ্জাব অধিকার করেন।

রাশিয়াভীতি ইংরেজদের আফগানিস্তান আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করে। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ রুশ অফিসার ভিটকিয়েভিচ্‌-কে রাজদূতরূপে গ্রহণ করায় ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। প্রথম আফগান যুদ্ধে (১৮৩৯-৪২ খ্রী) ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৮৭৮-৮০ খ্রী) তাহাদের উদ্দেশ্য কিয়দংশে সফল হয়। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার উচ্চাশা ক্রমশঃ প্রতিহত হয়, আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতির উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালাত, কোয়েটা এবং গিলগিট অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে আসে। ব্রিটিশ বালুচিস্তান প্রদেশেরও সৃষ্টি হয় এই যুদ্ধের ফলে। তৃতীয় আফগান যুদ্ধে (১৯১৯ খ্রী) আফগানিস্তান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত হইলেও ইংরেজরা এক বৎসরের মধ্যে ইহা দমন করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমনের পর ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির রাজত্বের অবসান হয়। তখন হইতে গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি রূপে পরিচিত হইলেন।

দেশীয় রাষ্ট্রগুলিও ক্রমে ইংরেজদের প্রভাবাধীন হইয়

পড়ে। কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স কোম্পানির অধীন দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিবার অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করে। স্থির হয় উক্ত রাজ্যগুলির রাজগণের যদি কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। ড্যালহৌসি এই নীতির সার্থক রূপ দিয়াছিলেন তাঁহার স্বত্ব-বিলোপ নীতিতে। এই নীতির মূল কথা হইল, যদি ব্রিটিশের অধীন দেশীয় রাজ্যের রাজবংশে কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে তাহা হইলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই নীতির প্রয়োগ করিয়া তিনি সাতারা (১৮৪৮ খ্রী), জৈৎপুর ও সম্বলপুর (১৮৪৯ খ্রী), উদয়পুর (১৮৫২ খ্রী), ঝাঁসি (১৮৫৩ খ্রী) এবং নাগপুর (১৮৫৩ খ্রী) অধিকার করেন। শাসনব্যবস্থায় অক্ষমতার অজুহাত দেখাইয়া ড্যালহৌসি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা দখল করেন। অবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলি ইংরেজ শাসনে ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতে ইংরেজশাসন সুদৃঢ় করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্যই ক্যানিং ইহাদের 'ব্রেক-ওয়াটার্স ইন দি স্টর্ম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি ইংরেজরা উদার মনোভাব প্রদর্শন করে। এইসব রাজ্যের সীমানাও পরিবর্ধিত করা হয়। লর্ড ডাফ্‌রিনের আমলে (১৮৮৪-৮৮ খ্রী) ইম্পিরিয়াল সার্ভিস কোর্ গঠিত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রচেষ্টায় যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাহার সংখ্যা হয় সাতাশ হাজার।

ভারতে ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, ইহা সত্য। আবার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার ও জাতীয় জাগরণেও ইংরেজদের অবদান স্বীকার্য। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়ারেন হেস্টিংসও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে উইলিয়াম উইল্‌কিন্‌সকে উৎসাহ দেন। গীতার ইংরেজী অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। উইলিয়াম জোন্‌স ও হেস্টিংসের উৎসাহে কলিকাতায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্থাপিত হয়। আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়নের জন্য হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জোনাথন ডানকান বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। আবার অন্য দিকে এদেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ বাংলা দেশে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের প্ররোচনায় বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও চিন্তাধারা ভারতবাসীর মনে যে নবজাগরণের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার ফলেই এক নব্যভারত অর্থাৎ বর্তমান ভারতের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উড্‌ ভারতে ইংরেজী ভাষার বিশেষ প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার পরিণতিস্বরূপ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

কোনও জাতির পক্ষে চিরদিন বিদেশী শাসন সহ্য করা সম্ভব নয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয়রা পাশ্চাত্ত্য দেশের উদার রাজনীতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে থাকে এবং দেশে ক্রমে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ দেখা দিতে থাকে। তদানীন্তন এই রাজনৈতিক কার্যের অন্যতম উৎস ছিল কলিকাতা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১ খ্রী)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন'। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমুদায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ক্রমে ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের ফলে বঙ্গ দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তাহাই ক্রমে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত ও সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন দেশের উদ্ভব ঘটে। 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ও 'ভারতবর্ষ' দ্র।

দ্র P. E. Roberts, *History of British India*, Oxford, 1938; H.H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India*, vol. VI, Cambridge, 1932.

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

ইংরেজবাজার ২৫° উত্তর, ৮৮°১১´ পূর্ব। মালদহ জেলা ও উহার একমাত্র মহকুমার সদর। ইহা মহানন্দার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নিকটবর্তী অঞ্চলে রেশমগুটি প্রচুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এইস্থানে কুঠি স্থাপন করে, এখানে ফরাসী ও ওলন্দাজরাও কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। এখনও এখান হইতে রেশমি সুতা বিষ্ণুপুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে চালান যায়। কিছু মটকার বস্ত্রও এখানে প্রস্তুত হয়। এখান হইতে প্রচুর

ইংরেজী ভাষা

পাটও রপ্তানি হয়। শহরের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত বড় বড় আমবাগান ইহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন এবং আধুনিককালে ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও পুরাতত্ত্ববিদ্ আবিদ আলী খাঁ এই স্থানে বাস করিতেন। 'মালদহ' দ্র।

দ্র G. E. Lambourn, *Malda District Gazetteer*, Calcutta, 1918 ; A. Mitra, *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Malda*, Delhi, 1954.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ইংরেজী ভাষা মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়। তাহার মধ্যে একটির নাম জার্মানিক (বা টিউটনিক)। জার্মানিক শাখার আবার তিনটি প্রধান প্রশাখা: পূর্ব জার্মানিক (গথিক), উত্তর জার্মানিক (নরওয়েজীয়-স্ক্যাণ্ডিনেভীয়), পশ্চিম জার্মানিক। পশ্চিম জার্মানিক কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত: হাই জার্মান, লো জার্মান, ওলন্দাজ, ফ্রিজীয় ও ইংরেজী। ইংরেজী ভাষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়: ১. প্রাচীন ইংরেজী (অ্যাংলো-স্যাক্সন) ৪৪৯-১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২. মধ্য ইংরেজী ১০৬৬-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৩. আধুনিক ইংরেজী ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

আনুমানিক ৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাঙ্গ্‌ল, স্যাক্সন ও জুট নামক জার্মানিক জাতির তিনটি যাযাবর দল ব্রিটেনে আসে এবং সেখানকার পূর্বতন কেল্‌তিক অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কেল্‌তিকরা ধীরে ধীরে কোণঠাসা হইয়া পড়ে, কিন্তু ইংরেজীতে তাহাদের ভাষার কিছু চিহ্ন থাকিয়া যায়। যেমন অ্যাস (*ass*), ব্যানক (*bannock*), ব্রক (*brock*) প্রভৃতি শব্দ কেল্‌তিক হইতে আগত।

প্রাচীন ইংরেজীর প্রধান উপভাষা চারিটি: ১. নর্দাম্‌ব্রিয়ান, ২. মার্সিয়ান, ৩. ওয়েস্ট স্যাক্সন এবং ৪. কেন্টিশ। নর্দাম্‌ব্রিয়ান ও মার্সিয়ানকে বলা হইত অ্যাংলিয়ান। প্রথমে অ্যাংলিয়ান উপভাষার প্রসার ছিল, কিন্তু অ্যালফ্রেডের (৮৪৯-৯০০ খ্রী) পর ওয়েস্ট স্যাক্সন প্রবলতর হইয়া উঠে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ইংলিশ (*English*) এবং ইংল্যাণ্ড (*England*) শব্দ দুইটি দলবাচক অ্যাঙ্গল (*Angle*) শব্দজাত।

প্রাচীন ইংরেজী তথা জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষাগত বিশিষ্টতা এইগুলি— ১. গ্রিমের সূত্রানুসারে কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন: $p > f$, $t > \theta$, $b > p$, $d > t$ ইত্যাদি; ২. ভার্নারের সূত্রানুসারে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন: $\theta > d$, $s > r$, $x > g$ ইত্যাদি; ৩. সরল (উইক) ক্রিয়াপদের অতীতকাল গঠন; ৪. পদান্তে মূল ইন্দো-ইওরোপীয় s-এর লোপ; ৫. বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব; ৬. অপশ্রুতির (অ্যাব্‌লাউট) বহুল ব্যবহার; ৭. ব্যাকরণগত লিঙ্গভেদ।

প্রাচীন ইংরেজীর যুগে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষার উপর যাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা গিয়াছে। ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় আক্রমণ— এইরূপ দুইটি ঘটনা। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে ইংরেজীতে বহু গ্রীক এবং লাতিন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইহার বহু পূর্বেই রোমক অধিকারের ফলে কিছু কিছু লাতিন শব্দ ইংরেজীতে চলিয়া আসিয়াছিল। যেমন স্ট্রীট (*street*), কাস্‌ল্ (*castle*), ওয়াইন (*wine*),

ইন্দো-ইওরোপীয়

ইন্দো-ইরানীয় | আলবানীয় | আর্মেনীয় | বাল্‌তিক-স্লাবিক | হেলেনিক | ইতালিক | জার্মানিক | কেল্‌তিক | তোখারীয়

ইন্দো-ইরানীয়: ইরানীয় | প্রাচীন ভারতীয় আর্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্য: মধ্য ভারতীয় আর্য

মধ্য ভারতীয় আর্য: বাংলা | হিন্দী | অসমীয়া | ইত্যাদি

(নব্য ভারতীয় আর্য)

জার্মানিক: উত্তর জার্মানিক | পূর্ব জার্মানিক | পশ্চিম জার্মানিক

পশ্চিম জার্মানিক: হাই জার্মান | লো জার্মান | ওলন্দাজ | ফ্রিজিয়ান | ইংরেজী
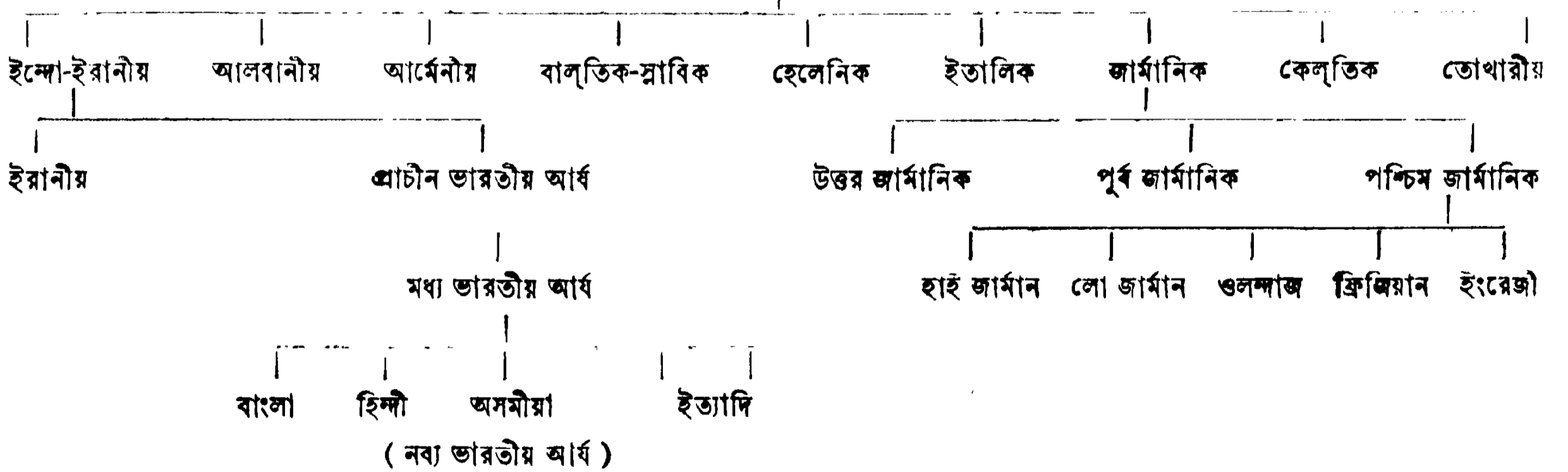
কুক (*cook*) প্রভৃতি। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় আক্রমণের ফলে ইংরেজীর শব্দসম্ভার অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে। আধুনিক ইংরেজীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দ স্ক্যাণ্ডিনেভীয়। আধুনিক ইংরেজীর সর্বনামে মধ্যমপুরুষ বহুবচন রূপগুলির অধিকাংশই স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রূপজাত।

নর্ম্যান বিজয়ের সময় হইতে (১০৬৬ খ্রী) প্রাচীন ইংরেজীর শেষ এবং মধ্য ইংরেজীর শুরু ধরা হয়। মধ্য ইংরেজীর সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা ফরাসী ভাষার প্রভাব। ইংরেজীতে এই সময়ে বহু ফরাসী শব্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যেমন: এস্টেট (*estate*), এস্টীম (*esteem*), কাউন্ট (*count*), কোর্ট (*court*) ইত্যাদি।

মধ্য ইংরেজীর রূপ ও ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। ইহাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়: আদিমধ্য, মধ্য-মধ্য এবং অন্ত্যমধ্য। মধ্য ইংরেজীর তিনটি প্রধান উপ-ভাষাগুচ্ছ: উত্তরাঞ্চলিক, মধ্যদেশীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলিক। মধ্য ইংরেজীর ভাষাগত বিশিষ্টতা এইগুলি— আদি-মধ্য যুগে: ১. প্রাচীন ইংরেজীর অনুরূপ জটিল ব্যাকরণ-পদ্ধতি; ২. স্বল্পসংখ্যক ফরাসী শব্দের প্রচলন; ৩. স্বরধ্বনির পরিবর্তন: æ < a, ā < ō; ৪ i এবং u স্বরধ্বনির সাহায্যে নূতন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি। মধ্যমধ্য যুগে: ১. পদান্তে স্বরধ্বনির সরলীকরণ ও লোপ; ২. একাধিক সাহিত্যিক উপভাষার উদ্ভব; ৩. অ্যাংলো নর্ম্যান লিপিমালার প্রভাব; ৪. ফরাসী শব্দের বহুল প্রচলন। অন্ত্যমধ্য যুগে: ১. বিভিন্ন উপভাষার লোপ এবং লণ্ডন শহরের ভাষার ক্রমবিকাশ; ২. ব্যাকরণের প্রায় আমূল সরলীকরণ।

১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম ক্যাক্সটন (১৪২২-৯১ খ্রী) কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ইংরেজীর সূচনা। আধুনিক ইংরেজীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: ১. সাধারণীকৃত (স্ট্যাণ্ডার্ড) ইংরেজীর উদ্ভব ও বিকাশ; ২. ব্যাকরণের সরলীকরণ; ৩. উপসর্গের (প্রিপোজিশন) বহুল ব্যবহার; ৪. নূতন শব্দসৃষ্টির ক্ষমতা; ৫. স্বর-ধ্বনির বিবর্তন ও পরিবর্তন।

আধুনিক ইংরেজীর যুগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমেরিকায় ইহার প্রসার। আমেরিকায় ইংরেজীর রূপ কতকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। উচ্চারণের সহিত সমতা রক্ষার জন্য বানানের অনেক ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে, অনেক নূতন পদসমষ্টি ও বাগ্‌ধারার প্রচলন হইয়াছে।

ভারতের সহিত ইংরেজীর যোগাযোগ প্রায় দুই শত বৎসরের। আধুনিক ইংরেজীতে অনেক ভারতীয় শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, যেমন বাবু (*baboo*), কারি (*curry*), ডেকয়্ট (*dacoit*), পাণ্ডিট (*pundit*)। আবার ভারতে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারেরও একটি সুনির্দিষ্ট পথরেখা দেখা দিতেছে। প্রবন্ধে প্রদত্ত বংশপীঠিকা হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহের সহিত ইংরেজীর সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা করা যাইবে।

দ্র H. C. Wyld, *A Short History of English*, London, 1927; Otto Jespersen, *Growth & Structure of the English Language*, New York, 1929; J. & E. M. Wright, *Old English Grammar*, London, 1925; J. & E. M. Wright, *An Elementary Middle English Grammar*, London, 1928; J. B. Greenough & G. L. Kittredge, *Words and Their Ways in English Speech*, London, 1902; G. L. Brook, *A History of English Language*, London, 1958.

শুভদ্রকুমার সেন

ইকনমিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড দি ফার ঈস্ট
ইকাফে দ্র

ইকনমেট্রিক্‌স অর্থনীতি দ্র

ইকবাল, মহম্মদ (১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ উর্দু কবি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ মহম্মদ নূর। পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

আরবী, ফারসী ও উর্দু— এই তিন ভাষাতেই ইকবালের পূর্ণ অধিকার ছিল। ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য কেমব্রিজে অবস্থানকালে তিনি আরবী-পণ্ডিত আর. এ. নিকল্‌সনের দ্বারা প্রভাবিত হন। দেশে ফিরিবার পর ক্রমে আইনব্যবসায়ে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়।

কাব্যচর্চায় ইকবাল অল্প বয়স হইতেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। মীর্জা গালিবের (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রী) গজল ছিল তাঁহার প্রধান অনুপ্রেরণা। তবে ইকবালের কবিতায় এক দিকে যেমন নম্র মিষ্টিক চেতনা দেখা যায়, অন্য দিকে তেমনই তীব্র স্বাদেশিক ভাবনার প্রকাশ। 'সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা' জনপ্রিয় এই সংগীতটির মধ্যে তাঁহার সেই নিবিড় দেশানুরাগ স্পন্দিত। পশ্চিমী জড়বাদে তাঁহার আস্থা ছিল না; শক্তিপ্রমত্ত ইওরোপ তাঁহাকে ক্রমেই আত্ম-উদ্বোধনের ব্রতে দীক্ষিত করে। তাঁহার আশা ছিল, পূর্ব দেশ হইতে প্রচারিত ইসলামের আদর্শ পৃথিবীতে আবার মৈত্রী ও মুক্তির মন্ত্র ফিরাইয়া আনিবে।

ইকবালের রচনা উর্দু গজলে নূতন গতি সঞ্চার করিয়াছে। ইহা কেবল সূক্ষ্ম প্রেমভাবনার বাহন হইয়া থাকে নাই, ইহাতে সমকালীন সমাজ ও জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে উর্দু ছিল তাঁহার কবিতার ভাষা। 'বাঙ-ই-দারা' (ক্যারাভানের ডাক) নামে সেই সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক খ্যাত কাব্য 'অসরার-ই-খুদী' (আত্মরহস্য) ফারসীতে রচিত। এই গ্রন্থের নিকল্‌সন-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'সিক্রেট্‌স অফ দি সেল্‌ফ' পাশ্চাত্ত্য জগতে ইকবালের কবিখ্যাতি ছড়াইয়া দেয়। এই সময়ে কবির ধারণা হইয়াছিল যে উর্দু অপেক্ষা ফারসীতেই তাঁহার বক্তব্য অধিকতর সামর্থ্য লাভ করিবে। ফারসীতে রচিত অপরাপর কাব্যের মধ্যে 'পয়জাম-ই-মশরিখ' (প্রাচ্যের বাণী), 'রমূজ-ই-বেখুদী' (আত্মলয়ের রহস্য), 'জবুর-ই-আজম' (ডেভিডের স্তোত্র) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর আবার তিনি উর্দু রচনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে 'বাল-ই-জিব্রাল' (গাব্রিয়েলের পাখা) ও 'জর্ব-ই-কালিম' (মোজেজের দৈবাঘাত) গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী উর্দু কবিতায় এই দুইটি গ্রন্থের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীতে তাঁহার একমাত্র গদ্যগ্রন্থ 'দি রিকনস্ট্রাক্‌শন অফ রিলিজাস থট ইন ইসলাম'-এ (১৯৩৪ খ্রী) কোরান ও ইসলামী দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামক এক পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন, ইকবাল ছিলেন এই মতবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবুল হায়াত

ইকাফে (E. C. A. F. E.) ইকনমিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড দি ফার ঈস্ট -এর সংক্ষিপ্ত নাম। রাষ্ট্রসংঘ (ইউনাইটেড নেশন্‌স অর্গানাইজেশন) স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের জন্য একাধিক আঞ্চলিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জন্য ইকাফে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ সাংহাই-এ স্থাপিত হয়। চীন দেশে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতালাভ করিলে ইকাফের সদর দপ্তর থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে স্থানান্তরিত হয়।

ইকাফের সভ্যসংখ্যা ২১: আফগানিস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম দেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও নিউজিল্যাণ্ড। এতদ্ব্যতীত হংকং ও ব্রিটিশ বোর্নিও সহযোগী সভ্য। সহযোগী সভ্যদের কমিশনের সভায় ভোট দিবার অধিকার নাই; অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ সভ্যদের সমান। ইকাফের সভ্য ও ইকাফে অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে সমস্ত দেশের সমস্যা ইকাফের গবেষণা, আলাপ-আলোচনা বা কার্যকরী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হইতে পারে সেই সমস্ত দেশ লইয়া ইকাফে অঞ্চল। আফগানিস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম দেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিঙ্গাপুর, লাওস, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, কোরিয়া, চীন, উত্তর বোর্নিও, ব্রুনাই, সারাওয়াক, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও পশ্চিম সামোয়া ইকাফে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ইকাফের প্রধান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল: ১. অঞ্চলভুক্ত দেশগুলির সংগঠন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নব্যবস্থার যুক্ত প্রয়াসে অগ্রণী হওয়া ও সাহায্য করা; ২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ইত্যাদি বিষয়ক সংবাদ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, বিচার এবং ঐ সকল তথ্যের আরও বিস্তৃত সংগ্রহে সাহায্য করা; ৩. অঞ্চলভুক্ত কোনও দেশের সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করা; ৪. জনক সংস্থা ইক্‌সক-কে (ইউনাইটেড নেশন্‌স ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল কাউন্সিল) এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যামূলক কাজে সাহায্য করা।

ইকাফে বস্তুতঃ উপদেশক সংস্থা; সদস্যশ্রেণীভুক্ত কোনও দেশের সম্মতি বিনা বাধ্যতামূলকভাবে কোনও কাজ করাইবার অধিকার ইহার নাই। যে সমস্ত প্রস্তাবের ফল ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, সেইগুলির জন্য ইক্‌সক-এর অনুমোদন পূর্বে লইতে হয়।

ইকাফের অঞ্চলভুক্ত কোনও স্থানে প্রতি বৎসর ইহার অধিবেশন হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তু লইয়া নানা সভ্যের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলে। কমিশনের সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের সরকারের হাতে ন্যস্ত। বস্তুতঃ ইকাফের অনেক প্রস্তাব অঞ্চলভুক্ত দেশগুলি

গ্রহণ করে এবং কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হয়। ইকাফের নানা দলিলপত্রের মধ্যে 'ইকনমিক সার্ভে অফ এশিয়া অ্যাণ্ড দি ফার ঈস্ট' (বার্ষিক) এবং 'ইকনমিক বুলেটিন' (ত্রৈমাসিক) উল্লেখযোগ্য। সমস্ত দলিলপত্র অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় না।

ইকাফে প্রতিষ্ঠার পর ক্রমশঃ কয়েকটি সহায়ক সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথম দিকেই শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি (কমিটি অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড ট্রেড) গঠিত হইয়া অগ্রগতির সূচনা করে। ক্রমে অন্তর্দেশীয় পরিবহন সমিতি (কমিটি অফ ইন্‌ল্যাণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট), বন্যা প্রতিরোধ সংস্থা (বিউরো অফ ফ্লাড কন্‌ট্রোল) গঠন করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য সমিতির অধীনে বৈদ্যুতিক শক্তি, লৌহ-ইস্পাত ও খনিজ সম্পদ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন উপসমিতি আছে। অন্তর্দেশীয় পরিবহন সমিতির অধীনে রেলপথ, রাজপথ ও জলপথ লইয়া পৃথক উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর অন্যান্য কন্‌ফারেন্‌স, সেমিনার ও ওয়ার্কিং পার্টির অধিবেশন হইয়া থাকে। বন্যা প্রতিরোধ ও জলসম্পদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মেকং নদী পরিকল্পনা (মেকং রিভার প্রজেক্ট) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাওস, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্ম দেশের যৌথ প্রয়াসে মেকং নদীর জলসম্পদ সেচ-কার্য, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও পরিবহনের উদ্দেশ্যে যাহাতে ব্যবহৃত হইয়া ঐ দেশগুলির উন্নয়নের সহায়ক হইতে পারে, তাহার চেষ্টা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। এই কার্যে অন্যান্য দেশের সহায়তাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

ইকাফে রাষ্ট্রসংঘের অধীন অন্যান্য সংস্থাগুলির সঙ্গে নানা ভাবে সহযোগিতা রক্ষা করিয়া কাজ করে। আঞ্চলিক ব্যাপারে সাহায্যের জন্য ইউনাইটেড নেশন্‌স টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন-এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতে হয়। ইকাফে দপ্তরের কৃষিবিভাগ (এগ্রিকালচার ডিভিসন) এফ. এ. ও. বা ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন -এর সহযোগিতায় পরিচালিত হয়।

অজিতকুমার বিশ্বাস

ইক্ষ্বাকু ঋগ্‌বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ইক্ষ্বাকুদিগের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর সন্ধান পাওয়া যায়। পুরাণ মতে অযোধ্যার রাজা পৃথুর পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। তাঁহার নামানুসারে বংশের নাম হয় ইক্ষ্বাকু বংশ। এই বংশের আর একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন ভরত; তাঁহার নামানুসারে এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। বিখ্যাত দানবীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ ও তাঁহার চারি পুত্র— রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন— এই বংশে উদ্ভূত হন। তাঁহাদের কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেকগুলি ছোট-বড় রাজশক্তির অভ্যুদয় হয়। তাহাদের মধ্যে ধান্যকটকের এক ইক্ষ্বাকু বংশ অন্যতম। এই বংশের কয়েকজন রাজা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম চান্তমূল, বীরপুরুষদত্ত ও ইহুভূল, দ্বিতীয় চান্তমূল ছিলেন প্রধান। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। প্রথম চান্তমূল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এই বংশের রাজারা উজ্জয়িনী ও বনবাসী রাজ্যের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যমধ্যে বহু চৈত্য ও মঠ নির্মাণ করান।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. 1, London, 1951; vol. II, Bombay, 1953; D. C. Sircar, *The Successors of the Satavahanas in the Lower Deccan*, Calcutta, 1934.

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

ইছাই ঘোষ ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি চরিত্র। অনেকের মতে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি অজয় নদীর তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীগড়ের সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র। জাতিতে গোপ। দেবী শ্যামারূপাকে (শ্যামরূপা) সন্তুষ্ট করিয়া ইছাই অতি অল্প বয়সে প্রবল শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। দুর্গম বন কাটিয়া অজয়ের দক্ষিণ তীরে তিনি নূতন গড় নির্মাণ করেন। ইহার নাম রাখেন ঢেকুর। এই গড়ে তিনি শ্যামারূপার কনক মূর্তি নির্মাণ করিয়া দেউল স্থাপন করেন।

সোম ঘোষ কিছুকাল গৌড়েশ্বরের বন্দী ছিলেন। পিতার এই লাঞ্ছনার কথা ইছাই কোনও দিন ভুলিতে পারেন নাই। গৌড়েশ্বরের অনুচর ঢেকুরে কর আদায় করিতে আসিলে ইছাইয়ের কাছে যার পর নাই লাঞ্ছিত হন। গৌড়েশ্বর তখন রাজা কর্ণসেনকে ইছাই-দমনে প্রেরণ করেন। ইছাইয়ের অনুচর লোহাটার হাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। ভক্তকে সাহায্য করিবার জন্য দেবী শ্যামারূপাও এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কর্ণসেনের এই পরাভবের পর ইছাই আরও দুর্ধর্ষ হইয়া ওঠেন।

কিছুদিন পর ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্য লাউসেন ও তাঁহার অনুচর কালুডোম অজয়ের তীরে উপস্থিত হন। ইছাইয়ের অনুচর লোহাটা কালুডোমের হাতে নিহত হন। কিন্তু ধর্মের বরপুত্র লাউসেনকে বধ করিবার জন্য দেবী শ্যামারূপা ইছাইকে একটি বাণ দেন। অপর দিকে স্বর্গে দেবতারা ইছাইবধের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। ইত্যবসরে অনেক যুদ্ধ ও ছল-চাতুরীর পর লাউসেন ইছাইয়ের শিরশ্ছেদ করেন। হনুমান সেই ছিন্নশির বিষ্ণুপদতলে ফেলিয়া দিলে বিষ্ণুপাদস্পর্শে ইছাই মুক্তি পান।

কাহারও কাহারও মতে একাদশ শতাব্দীর ঢেক্করীর সামন্তরাজা ঈশ্বর ঘোষ ও ইছাই একই ব্যক্তি। তবে তাম্রশাসন অনুযায়ী ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ। কাহিনীতে পাই, ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইছাই ও লাউসেন গৌড়েশ্বর দেবপালের দুই সামন্ত রাজা।

শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষকে শ্যামারূপার উপাসক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেনভূম পরগনার গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের দেউল এবং কাঁকসা থানায় শ্যামারূপার গড় এখনও প্রসিদ্ধ। দেউলটি হয়ত ইছাইয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নির্মিত হইয়াছিল।

দ্র ধর্মমঙ্গল; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩; বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৭; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

বিজিতকুমার দত্ত

ইছাপুর পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় অবস্থিত। ইহা নর্থ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে রাইফেলের কারখানা আছে। পূর্বে এখানে একটি বারুদের কারখানা ছিল। প্রধান প্রবেশ-পথে একটি প্রস্তরফলকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ফার্কুহার এবং বারুদ কারখানার অন্যান্য অধ্যক্ষের নাম লিপিবদ্ধ আছে। এই স্থানটির আদি মালিক ছিল ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা, তাহাদের নির্মিত কোনও কোনও গৃহ এখনও বর্তমান। রাইফেল কারখানায় প্রথম রাইফেলটি ১৯০৬ সালে প্রস্তুত হয় এবং পরের বৎসর নিয়মিত উৎপাদন আরম্ভ হয়। এখানকার উৎপাদনপ্রণালী উন্নত মানের, এবং পাশ্চাত্ত্যে অনুসৃত প্রণালীর সহিত তুলনীয়। গঙ্গাতীরবর্তী কারখানা-পল্লীটি সুদৃশ্য ও মনোরম।

দ্র L. S. S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*, Calcutta, 1914; A. Mitra, *Census 1951: West Bengal: District Handbooks: 24 Parganas*, Calcutta, 1954.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ইছামতী পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রবাহিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদী। পদ্মা হইতে নির্গত ভৈরব, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙার বন্যার জল এক সময়ে ইছামতীর খাতে নিকাশ হইত। বর্তমানে বনগাঁর উত্তরে নদীটি প্রায় মজিয়া গিয়াছে। ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী হইতে নির্গত, অধুনালুপ্ত যমুনার জলও ইছামতী খাতে প্রবাহিত হইত। রাইমঙ্গলের মুখে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া ইছামতীর নিম্নাংশ এখনও জীবিত রাখিয়াছে। সুন্দরবনে ইছামতীর নাম হইয়াছে কালিন্দী। শাখার দ্বারা মাতলার সহিতও ইছামতী সংযুক্ত। বসিরহাট ও সন্দেশখালি থানায় ইহা ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করিতেছে। এ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ হিসাবে ইছামতীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব পাকিস্তানে দুইটি ইছামতী নদী আছে। একটি পাবনা জেলায় আত্রেয়ী নদীর শাখা, পদ্মায় মিশিয়াছে; অপরটি দিনাজপুর জেলায়। আত্রেয়ী নদীর প্রায় ১১-১২ কিলোমিটার (৭-৮ মাইল) পশ্চিমে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া রাধানগরের নিকটে আত্রেয়ীতে মিশিয়াছে। বর্ষার জলনিকাশে ইহার সংকীর্ণ খাতের অক্ষমতা উত্তর বঙ্গে প্লাবনের কারণ।

কপিল ভট্টাচার্য

ইজ্‌তিহাদ ধর্মীয় বা লৌকিক আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোরান ও সুন্না-র নির্দেশের ভিত্তিতে স্বীয় স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগের দ্বারা ব্যবস্থা প্রণয়নকে আরবী ভাষায় ইজ্‌তিহাদ বলা হয়। মুসলিম আইনগুলির উৎপত্তিস্থলের ইহা তৃতীয় পর্যায়।

হিজরার দ্বিতীয় অব্দে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্‌ সমসাময়িক কালের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর মুসলিম আইনসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। ইঁহাদের প্রথম

হইলেন আবু হানিফা নুমান, ইনি ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেই সময়কার মুসলিম জগতের অধিকাংশের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কোরান হইতেই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের উৎস সন্ধান করিয়াছেন, হাদিসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

ইমাম মালিক ইব্‌ন আনস ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। মদিনার হাদিসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার ব্যাবহারিক আইন প্রণয়ন করেন। সেই কারণে মদিনার স্থানীয় লোকপ্রথা ও রীতি-নীতি তাঁহার প্রণীত ব্যবহারশাস্ত্রের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তৃতীয় ইমাম আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস অল্‌-শাফেই ৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত ব্যবহারবিধি প্রায়শঃ হাদিস-নির্ভর অর্থাৎ প্রধানতঃ কোরান-নির্ভর হানাফী বিধি হইতে ভিন্ন। ইমাম শাফেই শুধু মদিনার হাদিসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ব্যবহারবিধি প্রস্তুত করেন নাই, ব্যাপকতর হাদিসসমূহ তাঁহার বিধির ভিত্তি।

শেষ ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হানবল ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ব্যবহারবিধি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া হাদিস-নির্ভর হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফা কিন্তু কোরানের উপর নির্ভর করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন।

সমগ্র সুন্নী সম্প্রদায় উপরি-উক্ত চারি জন ব্যবহারবিধি-প্রণেতার ইজ্‌তিহাদকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়া থাকেন। সিয়া সম্প্রদায় ইজ্‌তিহাদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিলেও তাঁহাদের অভিমত এই যে শুধু আলী এবং ফতিমার বংশধরগণই ইজ্‌তিহাদের অধিকারী। তবে শিয়া বা সুন্নী কোনও সম্প্রদায়ই এই চারি জন ভিন্ন অপরের ইজ্‌তিহাদে আস্থাবান নহেন।

কোনও কোনও মুসলমান মনে করেন যে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে ব্যবহারবিধি চারি জন ইমাম দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল, বর্তমান প্রগতিশীল যুগেও তাহার সহিত ভিন্ন মত পোষণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। পয়গম্বর ব্যতিরেকে যে কোনও ব্যক্তির সহিত, তিনি উচ্চ কোটির ব্যক্তি হইলেও, ভিন্ন মত পোষণ করিবার জন্মগত অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই আছে। ইজতিহাদের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত।

আবুল হায়াত

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ও পেশা -বিশেষ। বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিংকে 'প্রযুক্তিবিদ্যা' বলা চলে, যদিও সকল রকম প্রযুক্তিবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। চিকিৎসাবিদ্যাও প্রযুক্তিবিদ্যা, কিন্তু তাহা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়। ফোটোগ্রাফিও নয়। কারিগরিবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং -এর অন্তর্গত হইলেও, সকল কারিগরকে ইঞ্জিনিয়ার বলা চলে না। ইংরেজী 'এঞ্জিনিয়ারিং' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লাতিন 'ইন্‌জেনিয়াম' (*ingenium*) শব্দ হইতে। উহার অর্থ 'উদ্ভাবনী ক্ষমতা'। কাজেই শুধু নকলনবিশ কারিগর হইলেই চলিবে না, ইঞ্জিনিয়ারের থাকা চাই কিছুটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা।

ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক কলা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বর্ণাবরণ, অঙ্কন প্রভৃতি ললিত কলার সহিতও ইহার সম্পর্ক আছে। অন্য দিকে বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগের তত্ত্বগুলিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। মানুষের জীবনযাত্রায় যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে মানবকল্যাণের কাজে লাগাইবার দক্ষতা অর্জন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আয়ত্তে আনয়ন আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারের লক্ষ্য।

মানুষই একমাত্র জীব যে জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার কর্মে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে। যুগে যুগে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও শক্তির ব্যবহার মানব-সভ্যতায় যুগান্তর আনিয়াছে। মানব-সভ্যতার এই বিবর্তনের যজ্ঞে যাঁহারা পৌরোহিত্য করিয়াছেন তাঁহারাই ইঞ্জিনিয়ার— যদিও ঐ নামটির প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। ব্রিটেনে সামরিক কর্মে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণকেই প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার নামে অভিহিত করা হইত। যুদ্ধের প্রয়োজনেই রাজার ইঞ্জিনিয়ারগণ রাস্তাঘাট তৈয়ারি করিতেন। কালক্রমে ব্রিটেনে যখন প্রজাদের সাধারণ কল্যাণেও পথ-ঘাট-সেতু নির্মিত হইতে শুরু করিল তখন অসামরিক ইঞ্জিনিয়ার— সিভিল ইঞ্জিনিয়ার—শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে 'ইন্‌স্টিটিউশন অফ সিভিল এঞ্জিনিয়ার্স'-কে রাজকীয় সনদ দেওয়া হয়। সেই সনদে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে: 'প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক শক্তিগুলির দ্বারা মানুষের সুখ-সুবিধা বিধান ও নানা প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম। উৎপাদনের এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে পরিবহনের ব্যবস্থা করা তাঁহার কাজ। সড়ক, সেতু, জলপথ, খাল, নদীপথ, পোতাশ্রয়, বন্দরের বিভিন্ন পৌর্তিক কাজ, আলোকস্তম্ভ, কৃত্রিম শক্তির দ্বারা চালিত জলযান প্রভৃতি

নির্মাণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি তৈয়ারি এবং ব্যবহারের ব্যবস্থা, শহরের জলনিকাশের ব্যবস্থা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের করণীয়'। আর সামরিক (মিলিটারি) ইঞ্জিনিয়ারের কাজ রহিল দুর্গ, কামান প্রভৃতি অস্ত্র এবং যুদ্ধার্থে যানবাহন, পথ ও সেতু নির্মাণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের যুগে যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) ইঞ্জিনিয়ারকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হইতে পৃথকভাবে গণ্য করা আরম্ভ হইল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ও সচল যন্ত্র লইয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ক্রমে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য সন্ধান ও উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণীর উদ্ভব হইল। বিদ্যুৎ-শক্তির প্রচলনের সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের আবির্ভাব ঘটিল। ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহু নূতন শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের অভ্যুদয় হইতেছে। জনস্বাস্থ্য (স্যানিটারি), কাঠামো নির্মাণ (স্ট্রাকচারাল), জলনিকাশ (ড্রেনেজ), ঔদক (হাইড্রলিক), সড়ক (হাইওয়ে), রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি (ইলেকট্রিক পাওয়ার), তড়িৎ-অণু (ইলেকট্রনিক্‌স), বিমান (এরোনটিক্‌স) অন্তর্দহন (ইণ্টার্নাল কম্বাশ্চন), নৌ (ম্যারিন), উৎপাদন (প্রোডাকশন), পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, অগ্নিনিবারণ (ফায়ার প্রোটেক্‌শন), জীবন-রক্ষা, (সেফটি), স্থাপত্য, তাপনিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক সংযোগ (ইলেকট্রিক কমিউনিকেশন), বাষ্প শক্তি (স্টীম পাওয়ার), শব্দ (সাউণ্ড), আণবিক (নিউক্লিয়ার), রাসায়নিক (কেমিক্যাল), ব্যবস্থাপক (অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ) প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং আধুনিক কালে প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ জ্ঞান অপরিহার্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশেষতঃ সার্ভেয়িং-এ প্রয়োজন। নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং-এও উহা আবশ্যক। খনি-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভিত্তি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভূবিদ্যা অন্যতম অবলম্বন। পানীয় ও সেচের জলের উৎসসন্ধানেও ইঞ্জিনিয়ার ভূবিদ্যার সাহায্য লইতে বাধ্য। ধাতু অথবা জনস্বাস্থ্য -ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রাণ রসায়নশাস্ত্র। উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান জনস্বাস্থ্য-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অপরিহার্য। সেচ অথবা কৃষি -ইঞ্জিনিয়ারের একাধারে জানা চাই ঔদকবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান। জনসাধারণের সমাবেশগৃহ, বাস্তুগৃহ, সিনেমা প্রভৃতির স্থপতির অন্যতম অবলম্বন শারীরবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, বস্তুর বলবিজ্ঞান (স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল্‌স), বলবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান সকল শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের অবশ্যজ্ঞাতব্য।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বহু ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত। জনসাধারণ ও শিল্পবাণিজ্যের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা, তাহাদের রূপায়ণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নানা শ্রেণীর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের। তাঁহাদের সমস্যাগুলির মধ্যে নগর ও জনপদ পরিকল্পনা, সড়ক, সেতু, সুড়ঙ্গ, পোতাশ্রয়, বিমান বন্দর, রেলপথ, বাঁধ, খাল, নদীশাসন, সেচব্যবস্থা, বন্যানিরোধ, জল অথবা তেলের পাইপ লাইন পত্তন, জল সরবরাহ, ময়লা জলনিকাশ (জনস্বাস্থ্য) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য।

বিমান-ইঞ্জিনিয়ার বিমানের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। বিমান মেরামত, রক্ষণ ও পরীক্ষণও তাঁহার কাজ। সেচ ও কৃষি -ইঞ্জিনিয়ার ভূমি ও জল সংরক্ষণ, বন্যা নিবারণ, নদীশাসন প্রভৃতি কর্মের ভার বহন করেন। বিমান-ইঞ্জিনিয়ারকে বায়ুর গতিবিজ্ঞানে (এরোডায়-নামিক্‌স) বিশেষজ্ঞ হইতে হয়। রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারকে অ্যাসিড, সার, বিভিন্ন প্ল্যাস্টিক, রঞ্জক, আলকাতরা হইতে উদ্ভূত নানা যৌগিক পদার্থ, কাগজ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা নির্মাণ ও ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদনের কাজ করিতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বিরাট ক্ষেত্র। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যুৎশক্তি পরিবহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের নানা ব্যবস্থা, আলোক ব্যবস্থা (ইলিউমিনেশন), হিমযন্ত্র (রেফ্রিজারেটর), তাপনিয়ন্ত্রণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিসন, রেডার প্রভৃতির পরিকল্পনা, নির্মাণ, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও মেরামত ইলেকট্রি-ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। নৌ-ইঞ্জিনিয়ার জাহাজ ও জাহাজের যন্ত্রপাতি, বন্দরের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির পরিকল্পনা, নির্মাণ ও মেরামত করান। শিল্প-ইঞ্জিনিয়ার (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ার) আসলে মেকানিক্যাল ইঞ্জি-নিয়ার। কারখানায় পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষ-বিধান, যন্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ইঁহার করণীয় কাজের অন্তর্গত। ধাতু-ইঞ্জিনিয়ার (মেটালার্জিক্যাল এঞ্জিনিয়ার) আকরিক লৌহ ও অন্যান্য খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন ও নানা ধাতব দ্রব্য প্রস্তুত করেন। ব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার (অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ এঞ্জিনিয়ার) কাঁচা মাল, শ্রম, অর্থ ও পদ্ধতির (know-how) সুষ্ঠু সমন্বয় ও সম্যক ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। মিশরের পিরামিড, মহেঞ্জো-দড়োর নগর পরিকল্পনা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, গ্রীক স্থাপত্য, রোমক পথঘাট, শহর, অট্টালিকা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাচীন যুগের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অগ্রগতির সাক্ষ্য। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির, সেচ-

ব্যবস্থা, সেতু ও জলপথ এখনও সেকালের বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে। মধ্য যুগের বহু স্থাপত্যকীর্তি ও পথঘাট আজিও বর্তমান। কিন্তু এই সব যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার যে কোনও সুষ্ঠু ও নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ, গুরুর নিকট হাতেকলমে কাজকর্ম শিক্ষা করিয়া তরুণ শিষ্যগণ দক্ষতা অর্জন করিতেন। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান— শ্রম-অপহারক ও সময়-সংক্ষেপক যন্ত্র— সে যুগে ছিল না। কণারকের মন্দির পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে বহু বর্ষ লাগিয়াছিল। মিশরের পিরামিড ও আগ্রার তাজমহলও বহুদিনের কাজ। সুতরাং সেকালের এই সব পরিকল্পনায় যে শত শত নবীন ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর শিক্ষিত ও নিপুণ হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, সে কথা সহজে অনুমান করা যায়।

কিন্তু সুনিয়মিত পদ্ধতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক যুগে প্রথমে ফ্রান্সে প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সেতু ও সড়ক বাহিনীর (কোর্ দে পোঁ এ শজে) জন্য 'সেতু ও সড়কের জাতীয় বিদ্যালয়' (একোল্ নাশিঅনাল দে পোঁ এ শজে) স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ব্রিটেন, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে দে জ্যাঁজিনিয়র সিভিল দ্য ফ্রাঁস' ব্রিটেনের 'ইন্‌স্টিটিউশন অফ সিভিল এঞ্জিনিয়ার্স' প্রভৃতি সংস্থার অবদান ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের উন্নয়নের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপানও এতদ্বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকে নাই।

বাংলা দেশে ব্রিটিশ আমলে প্রথম প্রথম ইংরেজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে হাতেকলমে কাজ করিয়া নিম্ন মানের ওভারসিয়ার, সার্ভেয়ার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কলেজই পরে (নভেম্বর ১৮৬৪ খ্রী) প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত যুক্ত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে ইহার নিজস্ব জমিতে উঠিয়া যায় এবং ইহার নামকরণ হয় গভর্নমেণ্ট এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া। পরে ১৮৮৭ এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজেরই নাম পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর এবং বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রাখা হয়। এখানে উচ্চ মান ছাড়াও নিম্ন মানের ইঞ্জিনিয়ারিং (বিশেষতঃ, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং -এর ক্ষেত্রে) শিক্ষণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালী ছাত্রদের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রতিষ্ঠান। অবশ্য সেই সময়ে পাটনা, ঢাকা ও কটকে ওভারসিয়ার মানের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিত্তশালী বংশের কেহ কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে বিলাত যাইত এবং দেশে ফিরিয়া উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভূমিকা উপলব্ধি করিতেছিল। সেইজন্য অনেক উদ্যোগী ছাত্র জার্মানী যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ করিয়া মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা। ভারতে ঐ সকল বিদ্যা অর্জনের তেমন সুযোগ ছিল না। কেহ কেহ আমেরিকা ও ফ্রান্সেও ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। স্বর্গীয় মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানা বিভাগে, বিশেষতঃ ইলেকট্রিক্যাল ও মাইনিং-এ উচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। বিশেষভাবে বাঙালী ছাত্রগণই প্রথম প্রথম ইহার সুযোগ গ্রহণ করে।

এদিকে রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন ভবিষ্যৎ-দর্শী বাঙালী মনীষী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মানিকতলায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট নামে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়। বাংলা দেশে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল শিল্প প্রতিষ্ঠায় বেঙ্গল টেকনিক্যালের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই বিদ্যালয়েরই পরিণত রূপ।

দেশ স্বাধীন হইবার পরে পশ্চিম বঙ্গে কয়েকটি নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গাপুর ও জলপাইগুড়ির কলেজে বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিবপুর ও যাদবপুরের কলেজও পূর্বাপেক্ষা অনেক সম্প্রসারিত। ইহা ব্যতীত খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনলজিতে (১৯৫১ খ্রী) বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখান হইতেই বাঙালী ছাত্র প্রথম নৌ-স্থাপত্য শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে (১৯৪৯ খ্রী)।

কলিকাতায় ও আশেপাশে কয়েকটি এবং পশ্চিম বঙ্গের

প্রতি জেলায় পলিটেকনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই পলিটেকনিকগুলিতে মাঝারি মানের সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার পাশ করা মেধাবী ছাত্র আবার কলেজে পড়িয়া উচ্চ মান ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যাদবপুরে নৈশ ক্লাসেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েকটি পলিটেকনিকে রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক সংযোগ, অটোমোবাইল প্রভৃতি বিশেষ বিভাগে শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বাংলা দেশে ইঞ্জিনিয়ারগণের সংঘ হিসাবে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ এঞ্জিনিয়ার্স' সর্বাপেক্ষা পুরাতন; ইহা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। অনেক কৃতবিদ্য ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষতঃ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ, এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসায়ী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতায় 'ইন্‌স্টিটিউশন অফ এঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া)' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘকে ইংল্যাণ্ডের রাজা রাজকীয় সনদ দান করেন। সকল বিভাগের যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার এই সংঘের সভ্য হইতে পারেন। ইহার অ্যাসোসিয়েট সভ্যের (এ. এম. আই.) মর্যাদা কলেজ হইতে পাশ করা স্নাতকের সমতুল্য বলিয়া স্বীকৃত। মাঝারি মানের লাইসেন্‌শিয়েট পাশ করা (এল্‌. সি. ই, এল্‌. এম. ই., এল্‌. ই. ই.) অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ইন্‌স্টিটিউশন অফ এঞ্জিনিয়ার্স-এর পরীক্ষায় পাশ করিয়া উচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ারের মর্যাদা অর্জন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় উৎসাহ দানের ব্যাপারে এই সংঘের অবদান সুপরিজ্ঞাত। কর্মনিরত যোগ্য ছাত্রগণ নানা বেসরকারি বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ে পাঠ করিয়া এই সংঘের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও প্রধানতঃ অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচিত। স্বীয় বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীকে এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি মানববিদ্যায় পাঠ লইতে হয়। কলেজ অথবা পলিটেকনিকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাতেকলমে কাজ শিখিতে হয়। ছাত্রদের মাঝে মাঝে খনি, কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মাণ কেন্দ্র, জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মলশোধন ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া শিখিবার জন্য 'শিক্ষা ভ্রমণে' (স্টাডি ট্যুর) যাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। পাশ করার পর দুই-এক বৎসর কর্মক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি করার পর ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পান। কোথাও কোথাও কলেজে চার-পাঁচ বৎসর ব্যাপী অধ্যয়নের মধ্যে দীর্ঘ ছুটির অবকাশে কলকারখানায় অথবা নির্মাণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে জটিল যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, ইলেক্‌ট্রনিক্‌স, সাইবারনেটিক্‌স প্রভৃতির উন্নতি এবং সিনেমা, টেলিভিসন প্রভৃতি শ্রবণ-বীক্ষণ (অডিও-ভিজুয়াল) পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণে যুগান্তর আসিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতি এখন অচল হইতে চলিয়াছে।

দ্র P. M. Arthur Flaming & H. J. S. Brocklehurst, *A History of Engineering*, New York, 1925 ; J. G. McGuire & H. W. Barlow, *An Introduction to the Engineering Profession*, Cambridge, Massachusetts, 1950 ; S. Rapport & H. Wright, ed., *Engineering*, New York, 1964.

কপিল ভট্টাচার্য

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদনকারী অনেক শিল্পের একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী। এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির উৎপন্নদ্রব্যের ব্যবহারে বা উৎপাদনপদ্ধতিতে কোনও একটি সাধারণ গুণ বা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত মনুষ্যশ্রমলাঘবকারী যন্ত্রের উৎপাদন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটি প্রধান কার্য। পাইপ, হ্যারিকেন লণ্ঠন, নাট-বল্টু, পেরেক, রেল লাইন, ছুরি-কাঁচি, ক্যামেরা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তালা-চাবি, কৃষিযন্ত্র, শিল্পযন্ত্র, টাইপরাইটার, ফাউণ্টেন পেন, ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাতি ও তার, বেতার যন্ত্র, উড়োজাহাজ, জলযান, রেল ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, বাইসাইকেল— এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ব্যাপ্তি বোঝা যাইবে।

ভারতীয় শিল্পব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগোষ্ঠী একটি নূতন শাখা, এই শ্রেণীভুক্ত সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরবর্তী কালের ঘটনা। সামগ্রিক শিল্পব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবদান অপরিহার্য, তেমনই সামগ্রিক শিল্পব্যবস্থার উন্নয়ন ইহার অগ্রগতির নিয়ন্ত্রক। তাত্ত্বিক বিচারে বিদেশী চাহিদার উপর নির্ভর করা সম্ভব হইলেও

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (বিশেষতঃ শিল্পযন্ত্র-উৎপাদন শিল্প) আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পের ক্রমবিকাশের ধরন পর্যবেক্ষণ করিয়া এই শিল্পের বিলম্বিত বিকাশের এইরূপ একটি আংশিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গোষ্ঠীভুক্ত কোনও কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভোগ্য দ্রব্য বা বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত দ্রব্য উৎপাদন হ্রাস বা বন্ধ করিয়া সামরিক চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকে। যুদ্ধকালীন আমদানির স্বল্পতা এক দিকে আভ্যন্তরীণ বাজার দখলের সুযোগ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অপর দিকে উহা অপরিহার্য কাঁচা মাল ও অন্যান্য উপাদানের অভাব ঘটাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তবে সামগ্রিক বিচারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে চাহিদার মন্দা এবং উপাদানের অভাবের দরুন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়। যুদ্ধকালে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছিল, যুদ্ধের পরে তাহাদের সম্ভাব্য সংকটের কথা চিন্তা করিয়া এই সকল শিল্পের সংরক্ষণ ও অন্যান্য সাহায্যের দাবি সহানুভূতিসহকারে বিবেচনা করিবার সিদ্ধান্ত সরকার পূর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সংকটকালে এই প্রসারিত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিল। ট্যারিফ বোর্ড যে সকল শিল্পের সংরক্ষণ সুপারিশ করেন তন্মধ্যে এইগুলি অন্যতম :

হ্যারিকেন লণ্ঠন শিল্প (১৯৪৬ খ্রী), বৈদ্যুতিক মোটর শিল্প (১৯৪৭ খ্রী), সেলাইকল শিল্প (১৯৪৭ খ্রী), মেশিন টুল্‌স ইণ্ডাস্ট্রি বা যন্ত্র-উৎপাদনক্ষম যন্ত্রশিল্প (১৯৪৭ খ্রী), ড্রাই ব্যাটারি শিল্প (১৯৪৭ খ্রী), স্টোরেজ ব্যাটারি শিল্প (১৯৪৮ খ্রী), বাইসাইকেল শিল্প (১৯৪৯ খ্রী) ও বৈদ্যুতিক পাখা শিল্প (১৯৫০ খ্রী)। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষিত করিয়া এবং উৎপাদনের উপাদান আমদানির সুবিধা দিয়া সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে সাহায্য করেন। এই শিল্প আমদানিকৃত উপাদানের উপর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল ছিল। তজ্জন্য শুল্কভার হ্রাস করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে আমদানি সহজলভ্য করিবার আবেদন অনেক সময়ে সরকার মঞ্জুর করেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপন্ন দ্রব্যের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য এই শিল্পগোষ্ঠীর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শাখাগুলি প্রসারিত এবং নূতন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি নূতন পদক্ষেপ : ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও যন্ত্র-উৎপাদন শিল্প গঠনের প্রচেষ্টা। লৌহপিণ্ড ও ইস্পাতের আভ্যন্তরীণ জোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতির উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নে ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রাধিকার তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয়। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগ প্রধানতঃ এই শাখার প্রসারে নিবদ্ধ। সরকারি উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় যে সকল প্রকল্প স্থান পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

লৌহ ও ইস্পাত কাস্টিং এবং ফোর্জিং— রাঁচিতে নূতন ফাউণ্ড্রি ফোর্জ স্থাপন ; শিল্পযন্ত্র— ভারি যন্ত্র উৎপাদনের জন্য রাঁচিতে, খনিতে ব্যবহারের উপযোগী যন্ত্র উৎপাদনের জন্য দুর্গাপুরে এবং ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্র উৎপাদনের জন্য ভূপালে কারখানা স্থাপন ; যন্ত্র-উৎপাদনক্ষম যন্ত্র— ভারি যন্ত্র উৎপাদনের জন্য রাঁচিতে কারখানা স্থাপন এবং জালহালিতে অবস্থিত হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স ও হায়দরাবাদে অবস্থিত প্রাগা টুল্‌স -এর সম্প্রসারণ ; রেল ইঞ্জিন— চিত্তরঞ্জনে অবস্থিত রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা হইতে বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন নির্মাণ ; জাহাজ—বিশাখপট্টনমে অবস্থিত শিপ্‌ইয়ার্ডটির সম্প্রসারণ এবং কোচিনে একটি নূতন শিপ্‌ইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা।

কয়েকটি শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মারফত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে। ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক ও সম্পূরক প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগের গণ্ডি নির্দিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাস্টিং ও ফোর্জিং জোগানের ভার সরকারি প্রচেষ্টার উপর ; মোটর গাড়ি উৎপাদন এবং বয়ন, সিমেণ্ট, চিনি, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাস্টিং ও ফোর্জিং জোগান দিবার ভার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর। অপেক্ষাকৃত ভারি জাহাজ নির্মাণের ভার সরকারি প্রচেষ্টার উপর, নদীতে এবং উপকূল ঘেঁষিয়া মাল বহনের উপযোগী নৌকা ও ক্ষুদ্রাকৃতি জাহাজ নির্মাণের ভার বেসরকারি উদ্যোগের উপর। রেল ইঞ্জিন, রেলগাড়ি ও মেশিন টুল্‌সের ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াসের অনুরূপ পরিপূরক ও সম্পূরক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উৎপাদনের হিসাব

শিল্পের নাম	একক	উৎপাদন ১৯৫০-৫১ (প্রথম পরিকল্পনার সূচনায়)	উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ (প্রথম পরিকল্পনার শেষে ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায়)	উৎপাদন ১৯৬০-৬১ (দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ও তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনায়)	তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন লক্ষ্য (১৯৬৫-৬৬)	তৃতীয় পরিকল্পনায় অগ্রগতি ১৯৬১-৬২ উৎপাদন	তৃতীয় পরিকল্পনায় অগ্রগতি ১৯৬২-৬৩ উৎপাদন
১. কাষ্টিং ও ফোর্জিং							
ক. ইস্পাত কাষ্টিং	হাজার টন	—	—	৩৪'০	২০০	৪০'০	৪৩'৫৭
খ. ইস্পাত ফোর্জিং	„	—	—	৬৫'০	২০০	৪৮'০ (খ)	৫৩'০
২. শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্র							
ক. বয়নশিল্প (তুলা)	কোটি টাকা	—	৪'০	১০'৪ (ক)	২০'০	১২'৫	১৩'০ (খ)
খ. সিমেণ্ট	„	—	০'৩৪ (ক)	০'৬	৪'৫	০'৯ (ক)	০'৭ (খ)
গ. চিনিকল	„	—	০'১৯	৪'২ (ক)	১৪	৪'৬ (ক)	৬'৪২
ঘ. কাগজ	„	—	—	—	৬'৫-৭০	০'৪ (ক)	০'৮৫ (খ)
৩. মেশিন টুল্‌স	কোটি টাকা	০'৩৪	০'৭৮	৭'২৪	৩০'০	৮'৫	১১'৪৮
৪. বয়লার	„	—	—	০'৫৩ (ক)	২৫'০	১'০৭	২'১৭
৫. রেলওয়ে রোলিং স্টক							
ক. রেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	৭	১৭৯	২৯৫	১৪৭০ (গ)	২৪৮	২৩৬
খ. মালগাড়ি	„	২৯২৪	৪১৯৬৬ (গ)	৬৯১৩০ (গ)	১১৭১৪৪ (গ)	১৯১৬৪	২৫৯৬৯
গ. যাত্রীবাহী গাড়ি	„	৪৭৯	৪৩৮৪ (গ)	৭৩২২ (গ)	৭৮৭৯ (গ)	১৬১০	১৮৪৯
৬. মোটরগাড়ি ও আনুষঙ্গিক শিল্প							
ক. যাত্রীবাহী গাড়ি	হাজার	১৬'৫	২৫'৩	১৯'১ (ক)	৩০'০	২১'৭৮	২০'৮৪
খ. লরি, ট্রাক ইত্যাদি				২৭'৫ (ক)	৬০'০	২৫'৫০	২৫'৭০
গ. জীপ, স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি				৫'৫ (ক)	১০'০	৭'৩০	৭'৪৪

৭. মোটর সাইকেল ও স্কুটার	হাজার	—	১˙৫	১৭˙৬	৫০˙০	১৯˙১৩	২৩˙৬২
৮. বল ও রোলার বেয়ারিং	দশ লক্ষ	০˙৮	০˙৯	৩˙২	১৫˙০ (ঘ)	৩˙৩	৪˙০
৯. কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি							
ক. শক্তিচালিত পাম্প	হাজার	৩৪	৩৭	১০৫˙০	১৫০˙০	১২৮˙৮	১৩১˙১
খ. ডিজেল ইঞ্জিন	”	৫˙৫	১০	৪৩˙২	৬৬ ০	৪৩˙০২	৪৫˙২৮
গ. ট্রাক্টর	”	—	—	—	১০˙০	˙৮৮	১˙৬ (খ)
১০. বাইসাইকেল	দশ লক্ষ	০˙১০	০˙৫১	১˙০৬	২˙০	১˙০৪	১˙১০
১১. সেলাইকল	হাজার	৩৩	১১১	২৯৭˙৩	৭০০	৩২৩˙০	৩৩০.০
১২. ঘড়ি ও হাতঘড়ি							
ক. ঘড়ি	হাজার	—	—	৫২˙৩ (ক)	২০০	৫৩˙৫	৬৪˙০
খ. টাইমপীস	”	—	—	—	১২০০	৪৬˙৪	১২১˙২
গ. হাতঘড়ি	”	—	—	—	১২০০	১৪˙৪	২১˙৩
১৩. ইলেকট্রিক ট্র্যান্স-ফর্মার (৩৩ কিলো ভোল্ট শক্তি পর্যন্ত)	দশ লক্ষ কে ভি এ	০˙১৮	০˙৬৩	১ ৩৯	৩˙৫	১˙৯৮	২˙৪০
১৪. বৈদ্যুতিক মোটর (২০০ অশ্বশক্তি পর্যন্ত)	দশ লক্ষ অশ্বশক্তি	০˙১০	০˙২৭	০˙৭৩	২˙৫ (ঙ)	০˙৮৬	১˙০৩
১৫. বৈদ্যুতিক পাখা	দশ লক্ষ	০˙১৯	০˙২৯	১˙০৬	২˙৫	১˙০৮	১˙১৬
১৬. বেতার যন্ত্র	হাজার	৪৯˙০	১০২˙০	২৮০˙০	৮০০˙০	৩৪৮˙০	৩৬০˙৩৬
১৭. স্টোরেজ ব্যাটারি	হাজার	২০০˙০	২৫৮˙০৮	৫২১˙২	৮০০˙০	৫৩৩˙৯	৫৮৬˙৫
১৮. ড্রাই ব্যাটারি	দশ লক্ষ	১৩৬˙৩	১৬১˙১	২১৪˙২	৩৫০˙০	২০৬˙৯	২৫১˙১৫

ক=জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ; খ=আনুমানিক ; গ=পাঁচ বৎসরের হিসাব , ঘ= তিন শিফ্টে কাজ হইবে ধরিয়া ; ঙ=তিনশত অশ্বশক্তি পর্যন্ত।

ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানি

পণ্য	১৯৬২ খ্রী (০০০ টাকা)	১৯৬৩ খ্রী (০০০ টাকা)	অঞ্চল	১৯৬২ খ্রী (০০০ টাকা)	১৯৬৩ খ্রী (০০০ টাকা)
ক. নন্‌-ফেরাস ধাতুজাত দ্রব্য	৭৭৬৩	২৩১৬১	ক. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪১৮২৮	৫০৪৫
খ. লৌহ এবং ইস্পাত -জাত দ্রব্য	২৯৬৪৭	৩৪২৮৯	খ. পশ্চিম এশিয়া	২৪২৯০	২৮৩৮৭
গ. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১২৯৮৫	১৯০৭২	গ. আফ্রিকা	১৭২৪৯	২৪০৯৫
ঘ. অন্যান্য যন্ত্রপাতি	২৩৮০৬	২১৭০৬	ঘ. ইওরোপ	৭২৩০	১৮১০৬
ঙ. পরিবহন-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	৭০৫৫	৭২৮৮	ঙ. উত্তর ও মধ্য আমেরিকা	২৩৫৬	৩৮০৬
চ. বিবিধ	১০৯৩৫	১২৭২২	চ. পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	৪৩০	৪৯২
মোট	৯২১৯১	১১৮২৩৮	ছ. অন্যান্য	২৫৯৬	২০৯৬

শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন, সামরিক সরঞ্জাম, যানবাহনের যন্ত্র ও সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই উৎপাদন মূলতঃ পরিকল্পনার যুগে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আমদানিকৃত উপাদানের মাত্রা সাধারণতঃ অধিক। এই অবস্থার পরিবর্তন তৃতীয় পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য; তজ্জন্য দেশীয় উৎপাদনের ভিত আরও মজবুত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় কাস্টিং ও ফোর্জিং উপাদানের উপর ঝোঁক পড়িয়াছে এবং কয়েক ধরনের বিশেষ গুণসম্পন্ন ইস্পাতের (টুল, অ্যালয়, স্টেনলেস স্টীল) উৎপাদন বৃদ্ধি অগ্রাধিকার পাইয়াছে। ৪৭৪-৪৭৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি বোঝা যাইবে।

নূতন ধরনের পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত করিবার অন্যতম পন্থা বলিয়া বিবেচিত। এই ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিশেষ ভূমিকা আছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানি হইতেছে তাহার মধ্যে সেলাইকল, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক তার, শিল্প ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি ইস্পাতের তৈয়ারি বাসনপত্র ও আসবাব ইত্যাদি প্রধান। বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির রপ্তানির ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পপতিরা কয়েকটি দেশে সম্পূর্ণ কারখানা স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির পরিসংখ্যান সংবলিত একটি তালিকা উপরে দেওয়া হইল। উৎপাদন-ব্যবস্থার গঠনপ্রকৃতি, আভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি, উৎপাদন-ব্যয়ের প্রকৃতি ও গতি সব ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানির অনুকূলে না হইলেও সামগ্রিক বিচারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইলে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

নবেন্দু সেন

ইডেন গার্ডেন্‌স ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড কলিকাতায় এসপ্লানেডের উত্তর-পশ্চিমে অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেন্‌স নামে একটি উদ্যান তৈয়ারি করান। বাগানটির নকশা তৎকালীন অসামরিক বিভাগের স্থপতি ক্যাপ্টেন ফিট্‌জেরাল্ড কর্তৃক প্রস্তুত হয়। পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলটি কলিকাতার ইংরেজ ও দেশীয় শৌখিন নাগরিকবৃন্দের সান্ধ্যভ্রমণের স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক নথিপত্র দেখিয়া বলা যায় যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিলের পূর্বেই উক্ত নামের পরিবর্তন করিয়া ইহার নাম রাখা হয় ইডেন গার্ডেন্‌স। কথিত আছে, রানী রাসমণি এই অঞ্চলের মালিক ছিলেন। তিনি কোম্পানিকে জমি দান করিলে তাঁহার প্রস্তাবক্রমে লর্ড অকল্যাণ্ড -এর অবিবাহিতা দুই ভগ্নীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই উদ্যানের নামকরণ হয়। লর্ড অকল্যাণ্ড -এর পারিবারিক পদবী 'ইডেন'। কাহিনীটি সম্ভবতঃ অমূলক। কেননা, সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা-ধ্বংসের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই অঞ্চলটি ইংরেজরা মীরজাফরের নিকট পাইয়াছিল। উদ্যানমধ্যস্থিত খালটি প্রাচীনতর দীর্ঘিকা হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডাটি প্রোম নগর হইতে লর্ড ড্যালহৌসি কর্তৃক আনীত (১৮৫৪ খ্রী)। তাঁহারই প্রস্তাবক্রমে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উদ্যানমধ্যে ইহা স্থাপিত হয়। ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড হইতে ফোর্ট উইলিয়াম -বাসী গোরা দলের বাজনা শুনিবার

জন্য প্রথম দিকে ইওরোপীয়দের স্বতন্ত্র সংরক্ষিত অঙ্গন ছিল। পরে এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ঘোড়ায় চড়িবার ও পদব্রজে ভ্রমণ করিবার পৃথক পৃথক রাস্তাগুলির সংযোজন ও অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে ইডেন গার্ডেন্‌স অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেন্‌স অপেক্ষা বৃহত্তর পরিধি লাভ করিয়াছে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন গার্ডেন্‌স বর্তমান সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ইতিপূর্বে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মাঠটি উদ্যানের অন্তর্গত ছিল না। আবার, ক্রিকেট মাঠটি প্রথমে ছিল বর্তমান সীমানারও বাহিরে। বর্তমান মাঠটি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদের পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাবের প্যাভেলিয়ন নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায়। রঞ্জি স্টেডিয়াম নির্মিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্র Narendranath Ganguly, *The Calcutta Cricket Club— Its Origin & Development*, Calcutta.

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইতিমাদউদ্দৌলা[১] প্রকৃত নাম মীর্জা গিয়াস বেগ। খোরাসানের উজীর খাজা মহম্মদ শরীফের পুত্র। জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহান (মেহেরউন্নিসা) ইঁহার কন্যা। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্বকালে ইনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসেন ও মোগল রাজদরবারে স্বীয় কর্মকুশলতায় উন্নতি লাভ করেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের দেওয়ান পদ পান। পরে সমগ্র সাম্রাজ্যের দেওয়ান হন এবং জাহাঙ্গীরের নিকট ইতিমাদউদ্দৌলা উপাধি লাভ করেন (১৬০৫ খ্রী)। এই নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। খসরুর বিদ্রোহকালে ইতিমাদউদ্দৌলা আগ্রার শাসনভার প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর-হত্যার ষড়্‌যন্ত্রে জড়িত হওয়ার মিথ্যা সন্দেহে কিছুকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। কুতুবের পাটনা বিদ্রোহে (১৬১০ খ্রী) কাপুরুষোচিত পলায়নের জন্য অপমানিত হন। কিন্তু ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের পর অসাধারণ দ্রুতবেগে তাঁহার উন্নতি হয় এবং ক্রমে তিনি সাতহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন (১৬১৯ খ্রী)।

ইতিমাদউদ্দৌলা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, সুলেখক, মিষ্টালাপী, আত্মসংযমী ও উদার। তবে তাঁহার প্রবল লিপ্সা ছিল। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় নির্মিত তাঁহার সমাধিভবন স্থাপত্যশিল্পের এক প্রসিদ্ধ নিদর্শন।

জগদীশনারায়ণ সরকার

ইতিমাদউদ্দৌলা[২] মোগল যুগের বিভিন্ন স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে আগ্রায় অবস্থিত ইতিমাদউদ্দৌলা সমাধি-[১] সৌধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিমাদউদ্দৌলা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মহিষী বেগম নূরজাহানের পিতা। আনুমানিক ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সৌধটি নির্মিত হয়।

সৌধের সঙ্গে উদ্যানের পরিকল্পনা মোগল যুগের স্থাপত্যকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এখানেও লক্ষিত হয়। এখানে উদ্যানের চারি ধারে স্বল্পোচ্চ প্রাচীর এবং লাল বালুকাপ্রস্তর নির্মিত প্রবেশদ্বার আছে। মূল সৌধটি শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত, চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চারি কোণে অষ্টভুজ মিনার ও প্রতি দিকে তিনটি খিলান দ্বারা নির্মিত প্রবেশপথ। একতলায় কতকগুলি ঘর, তাহার বারান্দা, অতঃপর মূল প্রকোষ্ঠ। উপরে একটি ছোট ঘর, ঘরের দেওয়াল সূক্ষ্ম জাফরি দ্বারা আবৃত।

অতি সূক্ষ্ম পাথরের জাফরির কাজ, বিভিন্ন অংশের অনুপাতজ্ঞান এবং দেওয়ালগাত্রে মূল্যবান রঙিন পাথরের টুকরা বসানো নকশা ইত্যাদির জন্য এই সৌধটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। শাহ্‌জাহান-সমকালীন মোগল স্থাপত্যকলার সূচক হিসাবেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্র Percy Brown, *Indian Architecture*, vol. II, Bombay, 1942.

সন্তোষ ঘোষ

ইতিহাস যে কোনও পরিবর্তনেরই ইতিহাস আছে। প্রাণীজগতে পরিবর্তনের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করিয়া ডারউইন চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়াছিলেন। সমাজ-বিজ্ঞানীরা কিন্তু 'ইতিহাস'কে এক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন। মানুষ ও তাহার পরিবেশের পরিবর্তনের কাহিনীই ইতিহাস। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, তাহার সৃষ্ট সমাজের পরিবর্তন, তাহার কর্মপ্রয়াস, মনন— এই সবটুকুই ইতিহাসের উপাদান।

ইতিহাসচিন্তা মানুষের এক নূতন চেতনার উন্মেষকে সূচিত করে। দিন-রাত্রির অন্তহীন পরিক্রমায়, ষড়্‌ঋতুর আবর্তনে মানুষ সময়ের প্রবাহ অনুভব করে। কিন্তু মানবিক ঘটনাতেও সময় অনুপ্রবিষ্ট— এই বোধ ইতিহাস-চিন্তার উৎস। ইতিহাসবোধ মূলতঃ স্থান-কালের বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পবিবেশকে বুঝিবার প্রয়াসের ফল।

সমসাময়িক ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কাহিনীকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে পারেন। কিন্তু ঘটনার স্থান ও কাল হইতে বহু দূরে অবস্থিত মানুষের দ্বারা বহু ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ইতিহাস রচনার

মূল সমস্যাগুলির উৎস এইখানে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগাযোগ প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ; কিন্তু ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয়বস্তু এক দূর অতীত—যাহার বহু চিহ্ন অবলুপ্ত। অতীতের মূক স্বাক্ষর এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক কোনও প্রাণীর কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের মত। নিরলস শ্রমের দ্বারা ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্ন উপকরণকে গ্রথিত করেন, মৃত অতীত আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অস্পষ্ট অতীতের কোন্ অংশকে ঐতিহাসিক উন্মোচিত করিতে চান, তাহার উপর উপকরণ সংগ্রহের রীতি ও পদ্ধতি নির্ভর করে। কোনও প্রতাপশালী রাজার জন্ম, সিংহাসনে আরোহণ অথবা মৃত্যুর সন-তারিখ সে রাজ-বংশের সমসাময়িক কোনও কাহিনী হইতে হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহু ঘটনা আরও অনেক বেশি জটিল। যেমন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্যমানে পরিবর্তন এক জটিল ঘটনা। এ ক্ষেত্রে বহু ভিন্নধর্মী উপকরণকে আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক তাঁহার তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের ইতিহাস লিখিতে গিয়া মার্ক ব্লক (১৮৮৬-১৯৪৪ খ্রী) নানা ভিন্নধর্মী উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। আঞ্চলিক নাম, জনপ্রবাদ, লোক-গাথা, প্রাচীন মানচিত্র, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত প্রাচীন যন্ত্রপাতি এবং আরও অসংখ্য ধরনের উপকরণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। ইতিহাসে উপকরণের এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে ব্লকের উক্তি স্মরণীয়: 'গবেষণা যত গভীরে যাইবে, ততই বিচিত্র ধরনের উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যের সামঞ্জস্যসাধন করিতে হইবে।'

তথ্যনির্বাচন ঐতিহাসিকের প্রাথমিক এক সমস্যা। বিশ্লেষণের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য অর্থপূর্ণ, ঐতিহাসিক তাহাকে নির্বাচন করেন—ইহাই বহু ঐতিহাসিকের মত। সীজারের পূর্বে বহু লোক রুবিকন নদী পারাপার করিয়াছে, কিন্তু সীজারের এই নদী অতিক্রম ঐতিহাসিকের কাছে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার অবহেলিত কোনও তথ্য ঐতিহাসিকের নূতন মূল্যায়নে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। তথ্যনির্বাচন সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর বহু ঐতিহাসিক জার্মান ঐতিহাসিক রাংকে-র (১৭৯৫-১৮৮৬ খ্রী) নির্দেশ অনুসরণ করিতেন। নীতিপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ইতিহাসের ব্যবহার রাংকে-র তীব্র সমালোচনার বিষয় ছিল। তাঁহার মতে এই রীতির অনিবার্য পরিণাম ইতিহাসের বিকৃতি। রাংকে-র মতে আদর্শ ইতিহাস হইবে বাস্তবের যথাযথ অনুলিপি, যেমনভাবে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার চিত্রণ। ঐতিহাসিকের প্রধানতম অন্বেষণ নির্ভুল তথ্য— ইতিহাস হইবে সর্বোচ্চসংখ্যক অভ্রান্ত তথ্যের পরিবেশন। লর্ড অ্যাক্‌টন (১৮৩৪-১৯০২ খ্রী) মনে করিতেন, ঐতিহাসিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাসঙ্গিক সব তথ্যের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাসের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করা সম্ভব। দর্শনের ক্ষেত্রে দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজ্‌ম্) ও প্রয়োগবাদের (এম্পিরিসিজ্‌ম্) প্রসার এ ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। কিন্তু অ্যাক্‌টনের ব্যর্থতা ও হতাশা সর্বজন-বিদিত। কেহ কেহ এই ব্যর্থতার উৎস খোঁজেন অ্যাক্‌টনের মনে উদারনীতিবাদের (লিবার‍্যালিজ্‌ম্) বিশ্বাস ও ক্যাথলিক বিশ্বাসের মধ্যে নিরন্তর এক দ্বন্দ্বে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের এই অসংগতি ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার এই ধারণা যে, প্রমাণসিদ্ধ নির্ভুল তথ্যের সংগ্রহ হইতেই ইতিহাস বাঙ্ময় হইয়া উঠিবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অ্যাক্‌টন-পরিকল্পিত আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাস রচিত হইবার প্রায় ৬০ বৎসর পরে জর্জ ক্লার্ক (১৮৯০- খ্রী) নূতনভাবে লিখিত আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অ্যাক্‌টনের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁহার মতদ্বৈধের কথা ঘোষণা করেন। ক্লার্কের মতে অ্যাক্‌টন-কথিত নির্ভুল 'চূড়ান্ত ইতিহাস' (আল্‌টিমেট হিস্ট্রি) রচনার কোনও সম্ভাবনা নাই। অ্যাক্‌টন নিশ্চিত, ক্লার্ক দ্বিধাগ্রস্ত। ভিক্টোরীয় আবহাওয়ায় লালিত অ্যাক্‌টনের অপরিমেয় আশাবাদ ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ ক্লার্কের সংশয়ের মাঝখানে ব্যবধান দুস্তর।

ক্লার্কের বহু আগে জার্মানী, ইটালী ও আমেরিকায় তথ্যসর্বস্ব ইতিহাস রচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যায়। দার্শনিক ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২ খ্রী) ঘোষণা করেন, ইতিহাস মূলতঃ 'সমসাময়িক ইতিহাস'। বর্তমানই অতীত ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিত। বর্তমানের চিন্তা-ধারণা এই ইতিহাস রচনাকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করে। ক্রোচে আরও বলেন যে, ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ নয়, তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের মূল্য নির্ণয় করা। আমেরিকায় কার্ল বেকার (১৮৭৩-১৯৪৫ খ্রী) একটু ভিন্নভাবে এই মতের সমর্থন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রোচের প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। অক্সফোর্ডের দার্শনিক কলিং-উডের (১৮৮৯-১৯৪৩ খ্রী) অসমাপ্ত রচনায় এই ধরনের ইতিহাসচিন্তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতকে লইয়াই শেষ হয় না, আবার অতীত

সম্পর্কে ঐতিহাসিকের বিশিষ্ট চিন্তা-ধারণাও ইতিহাস নয়। ইতিহাস এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপ। অতীত মৃত নয়, প্রাণময় বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত। ঐতিহাসিক অতীতের প্রাণস্পন্দন খুঁজিয়া পান অতীত যুগের চিন্তায়। ইতিহাস আসলে এই চিন্তার পুনরুজ্জীবন এবং উদ্ভাবিত এই চিন্তার মধ্য দিয়া ঐতিহাসিকের মন অতীতের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র আবিষ্কার করে।

ঐতিহাসিকের রচনায় ইতিহাসের যে রূপ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসার উপর। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ইতিহাস ঐতিহাসিকের কল্পনাপ্রসূত। শিশুরা যেমন কাঠের অক্ষর দিয়া আপন মনে নূতন শব্দ বানায়, আবার ভাঙিয়া ফেলে, ঐতিহাসিক ইতিহাসের তথ্য লইয়া তেমনভাবে খেয়াল-খুশিমত অতীতের মূর্তি গড়েন না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে পর্বতের রূপ ভিন্ন মনে হইতে পারে, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে পর্বতের নিজস্ব এক সামগ্রিক রূপ আছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। ঐতিহাসিকের সচেতন জিজ্ঞাসাই অতীতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। ঐতিহাসিকের অনুপস্থিতিতেও অতীতের অস্তিত্ব ঠিকই থাকিত; ঐতিহাসিক কেবল সন্ধানী আলোর সাহায্যে তাহার উপর হইতে অন্ধকারের আবরণ সরাইয়া দেন।

অনুরূপভাবে এ কথাও সত্য যে ইতিহাসের সব ব্যাখ্যাই সমান মূল্যবান নয়। প্রচলিত এক ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে ক্লার্ক আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের রূপবৈচিত্র্য অন্তহীন বলিয়া তাহার অসংখ্য ব্যাখ্যা সম্ভব। এই বৈচিত্র্যের জন্যই কোনও কোনও ঐতিহাসিক ইতিহাসের যথার্থ রূপ নির্ণয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এ সংশয় অযৌক্তিক। ইতিহাসের সব ঘটনা যেমন ঐতিহাসিকের পক্ষে সমান মূল্যবান নয়, সব ব্যাখ্যার মূল্যও তেমনই সমান নয়। যে ব্যাখ্যা ইতিহাসের সামগ্রিক রূপকে যত পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করিতে পারে তাহার মূল্যও তত বেশি। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কেহ কেহ খুঁজিয়া পান সিরাজের অর্থলোভ, অপরিমেয় দম্ভ ও অসহিষ্ণু চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক যদি প্রমাণ করেন যে এই বিরোধের মূল বহু দূর বিস্তৃত, পূর্ববর্তী নবাবদের আমলেও এই বিরোধের রূপ প্রস্ফুট হইতেছিল, তখন ব্যাপকতর পটভূমিকায় ইতিহাসের বিকাশ বোধগম্য হয়।

ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কাজ তথ্যনির্বাচন। এক বিশিষ্ট ব্যক্তিমানুষই এই নির্বাচন করেন বলিয়া স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে, ঐতিহাসিক কতখানি বাস্তবানুগ (অব্জেক্টিভ) ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। ঐতিহাসিক সচেতনভাবে তথ্যকে বিকৃত করেন না— ইতিহাস-গবেষণার ইহাই প্রাথমিক নিয়ম। তথ্যের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য ঐতিহাসিক যথাসাধ্য শ্রমও স্বীকার করেন। কিন্তু দেশ, গোষ্ঠী বা শ্রেণীস্বার্থ, সমসাময়িক চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিগত রুচি অদৃশ্যভাবে ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করে। মানুষ প্রতিটি বিশ্বাস যাচাই করিয়া দেখে না, নিজের অজ্ঞাতসারে কতকগুলি ধারণাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে গিয়া জেম্স মিল (১৭৭৩-১৮৩৬ খ্রী) সমসাময়িক উপযোগবাদের (ইউটিলিট্যারিয়ানিজ্ম) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। উপযোগই যদি বিচারের প্রধান মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিন্দনীয়। মিল বিশ্বাস করিতেন, কেবলমাত্র উপযোগবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত। ঐতিহাসিকের পক্ষে অন্য এক প্রতিবন্ধক ইতিহাস রচনার সমসাময়িক পদ্ধতি। প্রথার অনুগমন মানুষের অতি সহজ অভ্যাস; ঐতিহাসিকও হয়ত প্রচলিত পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন।

ঐতিহাসিককে এই সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। দূর আকাশে জ্যোতিষ্কের আবর্তনকে বিজ্ঞানী যে মন লইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন, ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, অনাবশ্যকও বটে। ইতিহাসে 'পরম সত্য' (অ্যাবসল্যুট্ ট্রুথ) বলিয়া কিছু নাই, এই কথা স্বীকার করিলে ইতিহাস বাস্তবানুগ কি না এ প্রশ্নের বিচার সহজ হয়। অতি সহজ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কেই এই পরম সত্যের কথা বলা যায়। যেমন ইহা পরম এবং অপরিবর্তনীয় সত্য যে পলাশি যুদ্ধের কাল ১৭৮০ নয়, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতন, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়, নূতন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম ও ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের সম্পর্ক, শিল্পবিপ্লবের জন্ম ও পরিণতি— এই সমস্ত জটিল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে কোনও বিশ্লেষণই কি অপরিবর্তনীয় সত্য? অন্য দিকে কোনও বিশ্লেষণ সমগ্র রূপকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে সর্বতোভাবে মিথ্যাও বলা যায় না। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে এড্ওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-৯৪ খ্রী) খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন না। এ কথা কেহই বলেন না যে, গিবনের মত সর্বৈব মিথ্যা।

সমালোচকেরা কেবল মনে করেন যে গিবন অন্যান্য বহু কারণকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ইতিহাসে বাস্তবানুগামিতার প্রশ্ন মূলতঃ ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং এ সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যার মধ্যে সংগতির প্রশ্ন। ঘটনা যেখানে যত বেশি জটিল, এই সংগতির প্রশ্নও তত দুরূহ।

ইতিহাসের ঘটনারাজি অসংলগ্ন নয়, তাহাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা আছে। ঐতিহাসিক আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া ঐক্যের সূত্র স্থাপন করেন। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের প্রসার সত্ত্বেও কোনও কোনও ঐতিহাসিক বা দার্শনিক মনে করেন যে ইতিহাসের ঘটনা নিয়ম-শৃঙ্খলাবিবর্জিত। কার্য-কারণসম্পর্কের অপরিবর্তনীয় নিয়মে ইতিহাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট— এই মত তাঁহারা গ্রহণ করেন না। এই বিরুদ্ধমতবাদীরা মানুষের 'স্বাধীন ইচ্ছা'র (ফ্রি উইল) কথা বলেন। এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য এক রূপ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণে আকস্মিক ঘটনার ভূমিকা যথেষ্ট। ঐতিহাসিক ফিশার (১৮৬৫-১৯৪০ খ্রী) ইতিহাসে 'আকস্মিক ও অদৃষ্ট' (দি কন্‌টিন্‌জেন্ট অ্যাণ্ড দি আন্‌ফোরসিন) ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের অবহিত হইতে বলেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ক্লিওপেট্রার নাক কুদর্শন হইলে রোমক ইতিহাসের গতি ভিন্ন হইত। অ্যাক্‌টিয়ামের যুদ্ধের অন্যান্য কারণ হয়ত ছিল, কিন্তু প্রধান কারণ ক্লিওপেট্রার জন্য অ্যান্টনির মোহ। জার্মান ঐতিহাসিক মেইনেক জার্মানীর পরাজয়ের কারণ খোঁজেন কাইজারের দম্ভ, হ্বাইমার রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট পদে হিণ্ডেনবার্গের নির্বাচন ও হিটলারের চারিত্রিক কোনও ত্রুটির মধ্যে।

আকস্মিক ঘটনা ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবকে ঐতিহাসিক অস্বীকার করেন না। কিন্তু অসংখ্য কারণের মধ্যে এই আকস্মিক ঘটনা ও স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা কতটুকু— তাহার যথার্থ বিশ্লেষণই ঐতিহাসিকের কাজ। তথ্যনির্বাচনের মত, অসংখ্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণসমূহের নির্বাচনও ঐতিহাসিকের এক গুরুতর সমস্যা। এক বিশিষ্ট শ্রেণীর কারণের উপস্থিতি ইতিহাসের গতিকে একভাবে নিয়ন্ত্রিত করে—অন্য সব কারণ থাকিলে ফল কি হইত তাহা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নয়।

ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে ঐক্য সন্ধানের প্রয়াস দীর্ঘদিনের। এক কালে মানুষের বিশ্বাস ছিল ইন্দ্রজাল বা মন্ত্রের শক্তির দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ব্রঞ্জ যুগের মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও চীনে বিশ্বাস ছিল ঐ বিশিষ্ট শক্তি কেবল রাজারই আছে। ফ্যারো-র ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় সূর্য ওঠে, নীল নদে বন্যা আসে, মিশরের মাটি উর্বর হয় ও অবাঞ্ছিত শত্রুর বিনাশ হয়—পরিবেশ পরিবর্তনের পরেও এই মতবাদ অবলুপ্ত হয় নাই। নিজের ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য স্বৈরাচারী সম্রাট্ এই মতবাদকে এক প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যখন গ্রীসের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে, গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তখন নূতন 'আইন-দাতা'র (ল গিভার) উদ্ভব হয় (অ্যাথেন্সে সোলন, স্পার্টায় লাইকারগাস)। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল, একক নায়কের প্রচেষ্টায় সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে। রেনেসাঁসের যুগে মহান নায়ক সম্পর্কে মানুষের কল্পনা হইতে অতিপ্রাকৃতের ধারণা অবলুপ্ত হয়; রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূর্ণতাসাধনে মহান নায়কের ভূমিকাকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হইত। পরবর্তী যুগেও বিভিন্নরূপে এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

সুমেরীয় রাজাদের কাহিনীকারের কাছে ইতিহাস ছিল এক অতিপ্রাকৃতের শক্তির লীলা। বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাসও এই দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত। ইজ্‌রেয়েলের যাহা কিছু বিপর্যয়, তাহার কারণ নিজের সৃষ্ট বিধি লঙ্ঘনের জন্য অধিষ্ঠাতা দেবতা জিহোবার প্রতিশোধস্পৃহা। জিহোবার বিধানকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলে পরাজিত বেদনাহত ইজ্‌রেয়েলবাসী অতীতের সুদিন ফিরিয়া পাইবে। খ্রীষ্টীয় চার্চের সঙ্গে যুক্ত সাধু-সন্তরাও ইতিহাসকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেন। সন্ত অগাস্টিন মনে করিতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষের পাপাচার। রোম সাম্রাজ্যের পতন তাঁহার কাছে বিশেষ কোনও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন মানবাত্মাকে খর্ব করিতে পারে না।

প্রাচীন গ্রীসে মানুষের বিশ্বাস ছিল, ইতিহাসের নিয়মশৃঙ্খলা প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলার সমগোত্রীয়। ইতিহাসের নিয়ম যেন অঙ্কশাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়মের মতই। গ্রীকদের কাছে জ্যামিতিশাস্ত্রের কদর ছিল খুব বেশি। স্বভাবতঃই তাহাদের ধারণা ছিল, ইতিহাসের ঘটনা জ্যামিতিশাস্ত্রের বৃত্তের নিয়মকে অনুসরণ করে। থোউকুদিদেসের (থুকিদিদেস, ৪৬০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ধারণা, ভবিষ্যৎ ইতিহাস অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। এক বিশেষ মার্জিত ভঙ্গীতে স্পেংলার এই মতবাদ প্রচার করেন। অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবের পর কোনও কোনও মনীষী বিশ্বাস করিতেন, এ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলি সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য এবং ইতিহাসের নিয়মও ইহার সমগোত্রীয়। কেহ কেহ (যেমন বাক্‌লে) ভৌগোলিক

পরিবেশের দ্বারা বিভিন্ন আঞ্চলিক সভ্যতার গতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র; ইহার প্রধান কারণ ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য। বিভিন্ন সভ্যতা যে মূলতঃ স্বতন্ত্র, আধুনিক যুগে টয়েনবি (১৮৮৯খ্রী-) এই মতবাদের সমর্থক। টয়েনবি স্বীকার করেন না যে, ইতিহাস বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন সভ্যতা বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে টয়েনবি একুশটি সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করেন।

ইতিহাস ব্যাখ্যার এই বিভিন্ন রীতি মোটেই অভ্রান্ত নয়। অতীত ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের প্রসার ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বহু রীতি এখন বর্জিত। রাজার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ইতিহাসের ঘটনার নিয়ামক— এই ধারণার উৎস, বিরুদ্ধ প্রকৃতির সম্মুখে দুর্বল মানুষের অসহায় মনোভাব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে মানবিক ঘটনায় অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস এখন শিথিল হইয়াছে। ইতিহাসের নিয়ম জ্যামিতি বা অর্থনীতি -শাস্ত্রের নিয়মের সমগোত্র— এই মতবাদ ইতিহাসের বিশিষ্ট নিয়মের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগের ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য কি ইতিহাসের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত অথবা শুধুমাত্র আকস্মিক? দুই বিভিন্ন যুগের অন্তর্বর্তী কালে হয়ত বিজ্ঞানের নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উৎপাদনের নূতন হাতিয়ার ব্যবহৃত হইয়াছে, নূতন অর্থনীতির গোড়াপত্তন হইয়াছে, মানুষের ধ্যান-ধারণা রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সাদৃশ্যের মূল্য কতটুকু? ইতিহাস বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়— এই মতবাদে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক কতকগুলি বিশেষ ঘটনাকে ইতিহাসের সামগ্রিক প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে ভৌগোলিক পরিবেশ আঞ্চলিক সভ্যতার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। কিন্তু ইহার দ্বারা এই সভ্যতার সামগ্রিক রূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। ভৌগোলিক পরিবেশ দুই শত বৎসর অপরিবর্তিত থাকিলেও আঞ্চলিক সভ্যতা পরিবর্তিত হইতে পারে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, বিকাশের ধারায় এক সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করে; বিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন সভ্যতার দৃষ্টান্ত সংখ্যায় নগণ্য। বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন চরিত্রবৈশিষ্ট্য আছে— কিন্তু এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার সঙ্গে বহু যোগসূত্রে যুক্ত।

ইতিহাসের সামগ্রিক রূপকে বুঝিবার প্রয়াস প্রধানতঃ শুরু হয় উনিশ শতকে। উনিশ শতকের ইতিহাস-চিন্তার উপর হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রী) ও মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩ খ্রী) প্রভাবই সম্ভবতঃ গভীরতম। হেগেল বলেন, ইতিহাসে পরিবর্তনই সত্য— অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর কিছু নাই। পরিবর্তনের অন্তহীন প্রক্রিয়ায় নূতন নূতন ব্যবস্থা ও মূল্যের উদ্ভব। ইটালীয় দার্শনিক ভিকোর (১৬৬৮-১৭৪৪খ্রী) দর্শনেও এই চিন্তার রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু ভিকোর কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ, অবক্ষয় ও পুনর্বিকাশের ধারা (স্পিরিচুয়াল সাইকল)। আবার, আমরা যাহা করি, কেবলমাত্র তাহাই জানিতে পারি— ভিকোর এই মতবাদ ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে যথেষ্ট সংকুচিত করে। হেগেল অন্তহীন এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন ডায়ালেকটিক পদ্ধতির দ্বারা। বিরোধ ও বিরোধের সমন্বয়ের মধ্য দিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহাই ইতিহাসে শৃঙ্খলার রূপ। হেগেলের দর্শনে ইতিহাসের এই বিশিষ্ট প্রক্রিয়া এক 'পরম মানসে'র (অ্যাব্সল্যুট আইডিয়া) প্রকাশ। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই পরম মানসের প্রকাশেই বিভিন্ন ব্যবস্থার উদ্ভব। কার্ল মার্ক্স হেগেলীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। ইতিহাসে পরিবর্তন সত্য— এই মত এবং এই পরিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি মার্ক্স গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাস ব্যাখ্যার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেগেলের ভাববাদী বিশ্লেষণকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। মার্ক্সের মতে ইতিহাস কোনও পরম মানসের প্রকাশ নয়; ইতিহাস বাস্তব মানবিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্ক্স মনে করেন, সভ্যতার বিভিন্ন অংশ— অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি— পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে না, ইহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তদানীন্তন উৎপাদনব্যবস্থাই প্রধানতঃ এই বিকাশের ধারাকে নির্ধারিত করে। এই অর্থনৈতিক বনিয়াদের রূপান্তরের ফলে সভ্যতার অন্যান্য অংশেও পরিবর্তন আসে। স্বভাবতঃই পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া সব ক্ষেত্রে সমান নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন-কানুন ইত্যাদিতে পরিবর্তন খুব শীঘ্র আসে; কিন্তু সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন, ধর্মবিশ্বাস তত সহজে রূপান্তরিত হয় না। মার্ক্স মনে করেন, বিকাশের ধারায় অর্থনৈতিক বনিয়াদ যেমন সমসাময়িক চিন্তাধারা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও তেমনই অর্থনৈতিক বনিয়াদকে প্রভাবিত করে। সমাজের

অর্থনৈতিক বিকাশ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়, কখনও বা ত্বরান্বিত হয়। উৎপাদনশক্তির বিকাশে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে মার্ক্স তদানীন্তন উৎপাদন-সম্পর্কের কথা বলেন। উৎপাদনব্যবস্থায় কাহার কি ভূমিকা— ইহার উপর এই উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ভর করে এবং উৎপাদনশক্তির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এই উৎপাদন-সম্পর্কের রূপ বিভিন্ন হয়। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনশক্তির রূপ ভিন্ন, তাই উৎপাদন-সম্পর্কের রূপও ভিন্ন। এই উৎপাদন-সম্পর্কের রূপ তদানীন্তন সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে প্রতিফলিত হয়। ইতিহাসের কোনও কোনও সময়ে দেখা যায়, এই উৎপাদন-সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ছাড়া উৎপাদনশক্তির বিকাশ অসম্ভব হয়। উৎপাদনশক্তির বিন্যাসে অসংগতির প্রধান একটা দিক শ্রেণীসংগ্রাম। মার্ক্সের মতে ইতিহাস বহুলাংশে এই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদন-শক্তির বিকাশের জন্য উৎপাদন-সম্পর্কের নূতন বিন্যাস প্রয়োজন, কিন্তু অনিবার্য নয়। যেখানে ইহা বিলম্বিত, ইহার বিকাশও দীর্ঘকাল ব্যাহত। এইখানেই মানুষের নূতন কর্মপ্রয়াস ও মনন অতীতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইতিহাসে বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামেরই তীব্রতম রূপ। নূতন বৈপ্লবিক শ্রেণী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দখল করে। মার্ক্সের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকগণ এই বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী। এই শ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে এবং শ্রেণীহীন এক সমাজের উদ্ভব হইবে। মার্ক্সের কাছে ইতিহাস শুধুমাত্র অনুসন্ধিৎসার বিষয় নয়; বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ইহা সংগ্রামের এক প্রধান হাতিয়ার। ইতিহাসজ্ঞান শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনাকে তীক্ষ্ণ ও সমৃদ্ধ করিবে। ইতিহাসজ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ এই শ্রেণী সচেতনভাবে ইতিহাসকে গড়িতে চেষ্টা করিবে।

ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসের অবদান যুগান্তকারী। মার্ক্সবাদী পণ্ডিতেরা কিন্তু বলেন, মার্ক্সের কোনও মতকেই যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। মার্ক্সবাদ একটি অনড় কাঠামো নয়, ইতিহাসের অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা ঐক্যসন্ধানের এক নির্দেশ মাত্র। মার্ক্সবাদের সমস্ত সূত্র অনেক ঐতিহাসিক গ্রহণ করেন না, কিন্তু মার্ক্সীয় চিন্তার অবদান ও তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে কোনও সংশয় নাই।

শুধু অতীতের রূপ বিশ্লেষণেই ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। মানুষ ইতিহাসের বিকাশে এক গভীর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রাণময় সত্তা যেন এক পূর্ণায়ত উদ্দেশ্যের প্রতীক। বর্তমানের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

গ্রীস ও রোমের ঐতিহাসিকদের কাছে ভবিষ্যতের কোনও রূপ ছিল না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহারা অনাগ্রহী। ইতিহাস বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়; তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও কল্পনা যেন গৌরবময় অতীতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। যেখানে অতীতবোধ জাগ্রত ছিল না (যেমন থোউকুদিদেস) সেখানে বর্তমানই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ইহুদীরাই প্রথমে ইতিহাসে এক অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের কথা বলেন। প্রতাপশালী শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত ইহুদীদের কাছে বর্তমান ছিল বিভীষিকা-ময়, অনাগত ভবিষ্যৎ ছিল মুক্তির প্রতীক। খ্রীষ্টীয় চার্চের সাধু-সন্তরাও ইতিহাসের এই গভীর উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। তবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ইতিহাসচিন্তায় উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম এক অতিপ্রাকৃত শক্তি। মানুষের সচেতন প্রয়াসের কোনও মূল্য সেখানে স্বীকৃত হয় নাই। এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতায় ইতিহাসের ধারার সমাপ্তি। রেনে-সাঁসের ফলে মানুষ আবার স্বকীয় মর্যাদা ফিরিয়া পাইল। রেনেসাঁসের মানুষের কাছে ভবিষ্যতের রূপ উজ্জ্বল। গ্রীক যুগের ইতিহাসচিন্তা তাহাকে খুব বেশি প্রভাবিত করে নাই। মানুষ বিশ্বাস করিল, সময় আর বিরোধ ও অবক্ষয়ের বীজ বহন করিবে না; সময় নূতন সৃষ্টির প্রতীক —সৌহার্দ্যের প্রতীক। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা ইতিহাসের এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ দর্শন মূলতঃ মানববাদী। তাই পৃথিবীতে মানুষের গভীরতর পূর্ণতাকেই ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য বলা হইল। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিবন বিশ্বাস করিতেন, বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হইল মানবজাতির অগ্রগতি, তাহার সম্পদ ও সুখসমৃদ্ধির প্রসার। মলথসের নূতন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সমসাময়িক প্রগতিবাদী চিন্তাধারায় এক ব্যতিক্রম। ফরাসী বিপ্লবের পরে রোম্যান্টিক আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের মন কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতীতচারী হইল। ইতিহাস প্রগতির বাহন— এ ধারণা ইংল্যাণ্ডেই খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার, ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন, তাহার রাষ্ট্রব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার— এ সব এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করা সহজ ছিল। লর্ড অ্যাক্টন মনে করিতেন, ইতিহাস স্বাধীনতা (লিবার্টি) বিকাশের ইতিহাস। ইতিহাস

'প্রগ্রেসিভ সায়েন্স'। তাঁহার মতে মানুষের অগ্রগতিতে দ্বিধাহীন বিশ্বাস ইতিহাস রচনার প্রাথমিক এক প্রকল্প। জার্মানীতে হেগেল ইতিহাসে উদ্দেশ্যকে স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার মতে এ উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা তদানীন্তন প্রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থায়। শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভবের মধ্য দিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান মার্ক্সের কাছে স্বপ্নের মত ছিল।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনায় ইতিহাসে উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ খ্রীষ্টান মিশনারি ও মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত ঐতিহাসিকেরা (যেমন চার্লস গ্র্যান্ট, ওয়ার্ড, মার্শম্যান, জেম্‌স পেগ্‌স, কল্ডওয়েল, পোপ ইত্যাদি) এ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁহাদের মতে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইহা যেন ভগবানের অভিপ্রায়সিদ্ধির উপায়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও গর্হিত আচারের পঙ্কে নিমজ্জিত ভারতবাসীর সম্মুখে ব্রিটিশ শাসন এক মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। ভগবানের নিশ্চিত অভিপ্রায়, ব্রিটিশ শাসনের সংস্পর্শে আসিলে নূতন শিক্ষা ও চিন্তার প্রভাবে ভারতের কলঙ্কময় অতীতের অবসান হইবে। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা এ গুরু দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়াছে, তাই যেন ভগবান তাহাদের বর্জন করিয়া এ দায়িত্ব ইংরেজদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ইংরেজ শাসন ত্রুটিহীন নয়; কিন্তু তাঁহাদের ধারণায়, ভারতবাসীর সামগ্রিক কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে এই ত্রুটিগুলি অকিঞ্চিৎকর।

এইভাবে সুদূর অতীত হইতে মানুষের ইতিহাস-চিন্তার রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে। মানুষের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা কোনদিন স্তব্ধ হয় নাই। অতীত চিন্তায় যাহা কিছু মূল্যবান, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া মানুষ নূতনভাবে চিন্তা করিয়াছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ চিন্তার রূপ শুধুমাত্র অতীতের বিশ্লেষণ, আবার কখনও বা মানুষের দুঃসাহসী জিজ্ঞাসা অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করে।

দ্র V. Gordon Childe, *History*, London, 1947; E. H. Carr, *What is History*, London, 1962; *The New Cambridge History*, vol. I, 1957; R. Collingwood, *The Idea of History*, Oxford, 1946; Karl Popper, *The Poverty of Historicism*, London, 1957; Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Introduction, New York, 1904; C. H. Philips, ed., *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961.

বিনয় চৌধুরী

ইতু পূজা সূর্য পূজা। সূর্যবাচক মিত্র শব্দ হইতে ইতু বা ইথু শব্দের উৎপত্তি বলিয়া মনে করা হয়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ইতুর ঘট স্থাপন করিয়া পূজার আরম্ভ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে পূজা হয়। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে পূজার পর ঘট বিসর্জন হয়। ব্রত-কথা হিসাবে মহিলারা সূর্য পূজার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী শ্রবণ করেন। পূর্ব বঙ্গে এই ব্রতের অনুরূপ ব্রতের নাম চুঙীর ব্রত।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ইত্তিহাদ আরবী শব্দ, অর্থ একত্ব লাভ করা। ইসলাম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই প্রকার ইত্তিহাদ-এর কথা বলেন। প্রকৃত (হকীকী) এবং রূপক (মদ্‌জাজী)। প্রথমোক্ত বিভাগের আবার দুইটি উপবিভাগ আছে:

ক. দুইটি বিভিন্ন সত্তার এক হইয়া যাওয়া, যেমন আমীর-এর জইদ হওয়া বা জইদ-এর আমীর হওয়া; খ. যাহার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না তাহাতে রূপান্তরিত হওয়া, যেমন ইতিপূর্বে অবিদ্যমান কোনও ব্যক্তিতে জইদ-এর রূপান্তরিত হওয়া। তবে, প্রকৃত বা হকীকী অর্থে ইত্তিহাদ সম্ভবপর নহে।

রূপক শ্রেণীর ইত্তিহাদের তিনটি উপবিভাগ আছে: ক. এক হইতে অন্য বস্তুতে ক্রমশঃ অথবা নিমেষে রূপান্তরিত হওয়া, যেমন জল হইতে বায়ু (যেখানে জলের মৌলিক প্রকৃতি নষ্ট হইয়া গিয়া তাহার স্থলে বায়ুর নিজস্ব লক্ষণ প্রকাশিত হয়); অথবা যেমন কৃষ্ণ বস্তু হইতে শ্বেত বস্তু (যেখানে এক বস্তুর গুণ অন্তর্হিত হইয়া অন্য বস্তুর গুণ দ্বারা পরিপূরিত হয়); খ. দুইটি বস্তুর সংমিশ্রণের ফলে তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব, যেমন মাটির সহিত জল মিশাইলে কাদার উদ্ভব; গ. এক ব্যক্তির অন্য আর এক ব্যক্তির রূপে প্রকাশ, যেমন মানুষের রূপে দেবদূতের প্রকাশ। রূপক শ্রেণীর এই তিন প্রকার ইত্তিহাদ বাস্তবিক সংঘটিত হইতে পারে। সূফীদের পরিভাষায়, যখন জীবের সহিত স্রষ্টার অনির্বচনীয় মিলন সাধিত হয় তখনই তাহা ইত্তিহাদ।

জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন-তত্ত্বটিকেও ইত্তিহাদ বলা যায়। দুইটি পৃথক সত্তার একত্ব লাভের প্রতীতি হইল ইত্তিহাদ। কিন্তু নিষ্ঠাবান সুফীগণ বলেন, সেই সনাতন পুরুষ হইতেই যখন ব্যক্তির প্রকাশ এবং অস্তিমে তাঁহাতেই যখন তাহার লয়, তখন আর দুইটি পৃথক সত্তা হয় কি করিয়া? কখনও কখনও ইত্তিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সুফীদের তওহীদ্‌ শব্দের অর্থে। অর্থাৎ, কোনও বস্তুর নিজস্ব অস্তিত্ব নাই, ঈশ্বর হইতেই সকল বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব এবং এইভাবে সকল বস্তুই ঈশ্বরের সহিত এক।

আবুল হায়াত

ইঁদ পূজা ইন্দ্র পূজা বা ইন্দপরব। প্রাচীন নাম শক্রোত্থান। মুখ্য অনুষ্ঠানের দিন ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী। মূলতঃ রাজারাজড়াদের অনুষ্ঠেয় মহোৎসব। বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর অঞ্চলে উৎসবের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শালগাছ কাটিয়া ইন্দ্রধ্বজ তৈয়ারি করা হয় এবং তাহা মাটিতে পুঁতিয়া ইন্দ্রের পূজা করা হয়। আটদিন পরে ইহার বিসর্জন হয়।

দ্র রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব; ত্রৈলোক্যনাথ পাল, মেদিনীপুর-ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৭; সুখময় সরকার, ‘ইন্দ-পরব’, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৬১; বিনয় ঘোষ, পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ইনকিউবেটর জীবকোষের রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি অনুকূল পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উহার উপর একান্ত নির্ভরশীল। প্রয়োজনাতিরিক্ত উত্তাপ ও শৈত্যাধিক্য উভয়েই জীবন-পরিপন্থী। অনুকূল উত্তাপ ও আর্দ্রতায় জীবকোষের স্তিমিত রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি গতিশীল হয় এবং সুপ্ত প্রাণশক্তিতে জীবনের লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে। ডিমে তা দিতে বসিয়া পাখি নিজের অজ্ঞাতসারে দেহের উত্তাপে অণ্ডমধ্যস্থ সুপ্ত প্রাণশক্তিকে বিকশিত করিতে সাহায্য করে। কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ অনুকূল উত্তাপময় পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহারই নাম ইনকিউবেটর। ইংরেজী এই শব্দটিতে পাখির ডিমে তা দেওয়ার অর্থ প্রচ্ছন্ন।

আধুনিক ইনকিউবেটর যন্ত্রের নানা ব্যবহার: ক. কৃত্রিম উপায়ে একসঙ্গে অনেক ডিম ফুটানো, খ. জীবাণুর চাষ করা, গ. অকালজাত অপুষ্ট শিশুকে অনুকূল উত্তাপময় পরিবেশে রাখা। ইহা ব্যতীত জীব-বিজ্ঞানীর গবেষণালয়ে এই যন্ত্রটি অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী নানা বিশেষত্বযুক্ত ইনকিউবেটর তৈয়ারি হইলেও উহাদের মূল উদ্দেশ্য এক— যন্ত্রের ভিতর উষ্ণতার পরিমাণ স্থির ও অব্যাহত রাখা। তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইহার একটি অত্যাবশ্যক অংশ। ইহার সাহায্যে ইনকিউবেটরের ভিতরে পূর্বনির্ধারিত তাপের মাত্রা স্থির অবস্থায় রাখা যায়। কয়েকটি বিশেষ কাজে শীতলকক্ষ (কোল্ড) ইনকিউবেটরের ব্যবহারও প্রচলিত আছে।

পরিমলবিকাশ সেন

ইনসুলিন একজাতীয় হর্মোন। এফ. জি. বানটিং (এবং বেস্ট) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উত্তেজক রস আবিষ্কার করেন। ইহা অগ্ন্যাশয়ের ‘বিটা’ শ্রেণীর কোষ (আইলেট্‌স অফ ল্যাংগারহ্যান) হইতে ক্ষরিত হয়। ইহা অ্যালবুমেন-জাতীয়। ইহাতে প্রায় সকল প্রকার অত্যাবশ্যক অ্যামিনো-অ্যাসিড বর্তমান। ইহা দেহকোষের শর্করা (গ্লুকোজ) দহন করিয়া তাহা স্নেহজাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করে। ইহার স্বল্পতায় শর্করাধিক্য হয়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে শর্করা জমে এবং কিছু পরিমাণ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়; ফলে নানা উপসর্গসহ বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। ইনসুলিন এই রোগে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহার ফর্মুলা $C_{90}H_{150}O_{24}N_{22}S_2$। ‘হর্মোন’ দ্র।

অমিয়কুমার মজুমদার

ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌স পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনে নিরত মনীষী-বৃন্দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরাসী দেশের মিশরতত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক লিওঁ দ্য রোনি-র (Leon de Rosny) আহ্বানে ও তাঁহারই সভাপতিত্বে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পারী-তে এই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পর বৎসর লণ্ডনে অধিবেশন হয় এবং তাহার পর হইতে দুই-তিন বৎসর বা আরও বেশি সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের অধিনায়কতায় মুখ্যতঃ ইওরোপের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে অধিবেশন বসে। এ পর্যন্ত ছাব্বিশটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবেশন-স্থানগুলির নাম যথাক্রমে পারী, লণ্ডন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ফ্লোরেন্স, বার্লিন, লাইড্‌ন, হ্বীন, স্টকহোল্‌ম, লণ্ডন, জেনিভা, পারী, রোমা, হামবুর্ক, অ্যালজিয়ার্স, কোবেন-হাভ্‌ন, অ্যাথেন্স, অক্সফোর্ড, লাইড্‌ন, রোমা, ব্রাসল্‌স,

ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার

পারী, ইস্তাম্বুল, কেম্‌ব্রিজ, ম্যুন্‌খেন (মিউনিখ), মস্কো ও নয়া দিল্লী। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত প্রতিটি অধিবেশনে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা ব্যতীত এই কংগ্রেস প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলনের ব্যাপক উৎকর্ষসাধন, প্রচার এবং প্রাচ্য-সভ্যতার নিদর্শনসমূহের অনুসন্ধান, সংগ্রহ, রক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। বিভিন্ন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের আন্তর্জাতিক সংঘ গঠন এবং ভারতীয় ভাষা ও লোক-সাহিত্যের সমীক্ষা -বিষয়ক গ্রন্থের নূতন সংস্করণ সংকলনের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

দ্র S. K. Chatterjee & S. Chaudhuri, *International Congress of Orientalists and India: A Brief Survey*, New Delhi, 1964.

শিবদাস চৌধুরী

ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার সংক্ষেপে আই. জি. ওয়াই.। পৃথিবীর অভ্যন্তর ও বাহিরের গড়ন, সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি ও তন্মধ্যে উত্থিত বিভিন্ন স্রোতের গতি, ধরিত্রীর চৌম্বকশক্তি, বাহির হইতে আগত রশ্মি বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ বিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার কয়েকটি রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক সমবেতভাবে মেরুপ্রদেশের বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও ব্যাপকভাবে অনুরূপ এক প্রচেষ্টা হইয়াছিল। বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এইরূপ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যে বিশেষভাবে প্রয়োজন, তাহা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি ৬৬টি রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ সংকল্প করেন যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে আই. জি. ওয়াই. সংজ্ঞা দিয়া সমবেতভাবে নানাভাবে ভূ-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন। এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় ৬০০০০ বৈজ্ঞানিক যোগ দিয়াছিলেন। আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত সকল দেশ এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেন। ব্যয়ের অঙ্কের নমুনা-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট ৪·১ কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক প্রয়াস এমনভাবে সার্থক হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত ‘বর্ষ’ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিশেষ গবেষণার জন্য সহযোগিতার মেয়াদ আরও এক বৎসরকাল বর্ধিত করা হয়। ইহার নাম দেওয়া হয় ‘আই. জি ওয়াই. কো-অপারেশন— ১৯৫৯’।

অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য পৃথিবীকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে তিনটি হইল— সুমেরু, কুমেরু এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল। এতদ্ভিন্ন এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে আরও তিনটি অঞ্চল নির্ধারিত হয়। ইহাদের একটির মধ্যে ইওরোপ ও আফ্রিকা, দ্বিতীয়টিতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং তৃতীয়টিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আই. জি. ওয়াই. স্থিরীকরণের একটি বিশেষ কারণ আছে। সূর্যের ‘কলঙ্ক’ প্রতি ১১ বৎসর অন্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সেই সময়ে পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি ও বায়ুমণ্ডলে নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যের কলঙ্ক বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া ঐ সময়টি গবেষণার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়।

আন্তর্জাতিক ভূ-প্রকৃতি নির্ণয় বর্ষে আবহতত্ত্ব, সৌর পদার্থতত্ত্ব, ভূ-চৌম্বকতত্ত্ব, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হইয়াছিল।

সূর্যসম্পর্কিত অনুসন্ধানের মধ্যে ছিল— সূর্যের ক্রিয়া-শীলতা (সক্রিয়তা), সৌরপৃষ্ঠের অবস্থা, সৌর কলঙ্ক, সৌর অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়। এতদ্ব্যতীত সৌর অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে অতিবেগুনী রশ্মি, দৃশ্যমান রশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ, আয়ন, ইলেকট্রন ও মুখ্য মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের বিষয়গুলিও অনুসন্ধানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আয়নমণ্ডলের উপর ইহাদের প্রভাব, কণিকা বিকিরণের ফলে চৌম্বক-ঝটিকা ও মেরুজ্যোতির আবির্ভাব এবং সূর্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য হাইড্রোজেনের একরঙা আলোতে ফোটোগ্রাফির ব্যবস্থা ছিল; এতদ্ভিন্ন অতি আধুনিক স্পেক্‌ট্রোহিলিওস্কোপের সাহায্যে ঊর্ধ্বে সূর্যা-লোকের বর্ণালি গ্রহণের জন্য রকেট ব্যবহৃত হইয়াছিল। মুখ্য এবং গৌণ মহাজাগতিক রশ্মির জন্য গাইগার-মুলার কাউণ্টার -সমন্বিত কস্‌মিক-রে টেলিস্কোপের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। ইহা ছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির গতিপথ মুদ্রণের জন্য বিশেষ ইমালশনে আস্তৃত ফোটোপ্লেট বেলুন ও রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয় এবং ভূপৃষ্ঠেও নিউট্রন-মনিটর এবং উইল্‌সনের মেঘ-প্রকোষ্ঠ (ক্লাউড চেম্বার) ব্যবহার করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বায়ুমণ্ডল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) পর্যন্ত ঊর্ধ্ব অঞ্চলকে বলা হয় নিম্ন বায়ুমণ্ডল। আবহবিদের পক্ষে বায়ুমণ্ডলের এই অংশ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ৮০ কিলোমিটারের (৫০ মাইল) পর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরের আরম্ভ। অরোরা এবং বায়ু-দীপ্তি (এয়ার গ্লো) এই ঊর্ধ্ব স্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল বাতাসের গতিবিধি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্যাদি নির্ধারণ করা। রেডিওসনড (হাইড্রোজেন বেলুন -বাহিত এক প্রকার ছোট বেতার প্রেরক যন্ত্র) পাঠাইয়া এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতিবিধি, ওজোনের পরিমাণ, সৌর এবং পার্থিব বিকিরণ, মেঘপুঞ্জের গতিবিধি, রাত্রির অতি উচ্চ দীপ্তিময় মেঘ, 'ঝঞ্ঝাবাতের বেতার-নির্দেশ এবং কুমেরুর বাতাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের সহায়তায় ভবিষ্যতে আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হইবে। অধিকন্তু ইহার ফলে উচ্চ স্তরে বিমান চলাচল-ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম উপায়ে ঋতুনিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনাও দেখা দিতেছে।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে ব্যাপকতর অনুসন্ধানও ছিল এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। চতুর্দিক হইতে মুখ্য মহাজাগতিক রশ্মি আসিয়া অনবরত পৃথিবীপৃষ্ঠে আঘাত করিতেছে। উচ্চশক্তিসম্পন্ন এই কণিকাগুলি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ ঘটায়। উক্ত সংঘর্ষের ফলে গৌণ মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হয়। এই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য রকেট খুবই সহায়ক বটে, কিন্তু রকেট মহাকাশে অতি অল্প সময় থাকে, তাহা ছাড়া বেশি উঁচুতেও ওঠে না। এইজন্য কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য লওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই কারণে কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মেরু-সমুদ্র, নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্র, অ্যাটল্যান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের গভীর তলদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং সমুদ্রস্রোত ও তরঙ্গ, বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রজলের ভৌত এবং রাসায়নিক অবস্থা এবং ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে জলের তাপমাত্রা ও লবণতার পরিমাপ এবং ভাসমান সামুদ্রিক জীবের পরিমাণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে দেখা গিয়াছে যে উপসাগরীয় স্রোত নামক যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, সমুদ্রের তলদেশে তাহার বিপরীতমুখী একটি স্রোতও বর্তমান। গভীর তলদেশে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় কার্বনের নমুনা ও বিভিন্ন স্তরের পলল প্রভৃতিও বহু স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে কয়েক লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট ও তামার ছোট ছোট টুকরা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নূতন ধাতব সম্পদের মূল্য কত কোটি টাকা হইবে, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না।

গবেষণাকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন আধুনিক উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূ-চৌম্বকত্ব, মার্কোভিজ পদ্ধতিতে দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সঠিক নির্ধারণ, অভিকর্ষ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও হিমবাহ সম্বন্ধেও প্রচুর নূতন তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, আণ্ডীজ পর্বতমালায় গবেষণার ফলে ধার্য হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠে যে সকল পর্বতশ্রেণী বর্তমান, সেগুলি পৃথিবীর উচ্চতম স্তরে 'ভাসমান' হইয়া আছে। জলে যেমন হিমশৈল ভাসিয়া থাকে ইহাদের প্রকৃতিও কতকটা সেইরূপ।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্‌স্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক) নামে অধিকতর খ্যাত। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রেট্‌ন উড্‌স-এ সংঘটিত আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রা -সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুগপৎ ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্কের কর্মকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন শহরে। ব্যাঙ্কটি স্থাপনের আদি উদ্দেশ্য ইহার নামেই প্রকাশিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সঙ্গে দরিদ্র, অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রগতি-সাধনের জন্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনও অনুভূত হয়। এই দুই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। তবে, প্রথম কয়েক বছর ইওরোপে সাহায্যদানের প্রসঙ্গ বাদ দিলে, অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্কের অধিকাংশ সামর্থ্য নিযুক্ত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক জাতিসংঘের (ইউনাইটেড নেশন্‌স) অন্যতম সংশ্লিষ্ট সংস্থা (স্পেশালাইজ্‌ড এজেন্সি)। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে ব্যাঙ্কের শর্তপত্রী (আর্টিকৃল্‌স অফ এগ্রিমেণ্ট)

মানিয়া চলিতে হয়। ৩০ জুন ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ছিল পঁচাশি। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের কোষপাল-সংসদে (বোর্ড অফ গভর্নর্‌স) একজন করিয়া সভ্য মনোনয়ন করেন। কোষপালগণ বৎসরে মাত্র একবার মিলিত হন; তাঁহারা প্রায় সমস্ত ব্যাবহারিক ক্ষমতা একটি নির্বাচিত অধিকরণের (বোর্ড অফ এগ্‌জিকিউটিভ ডিরেক্‌টর্‌স) হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। অধিকরণে প্রতি রাষ্ট্রের ভোটাধিকার মূলধনাংশের (শেয়ার) আনুপাতিক। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুগোস্লাভিয়া ব্যতিরেকে অন্য কোনও সমাজতন্ত্রী দেশ ব্যাঙ্কের সদস্য নয়।

প্রতিষ্ঠাকালে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ছিল এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বৃদ্ধি করিয়া দুই হাজার একশত কোটি ডলার নির্ধারণ করা হইয়াছে। তবে এই অঙ্কের মাত্র এক-দশমাংশ কোষভুক্ত (পেড-ইন); বাকি অংশ ব্যাঙ্কের দায় মিটাইবার প্রয়োজন হইলে সংগৃহীতব্য। কোষভুক্ত মূলধনের প্রয়োগ ছাড়া অন্য দুই উপায়ে ব্যাঙ্ক লগ্নি-খাটানোর অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে: প্রথমতঃ প্রধান প্রধান ধনাঞ্চলে (ক্যাপিটাল মার্কেট) বন্ধকপত্র (বন্‌ড) বিক্রয়ের সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ লগ্নির সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পুনর্নিয়োগের দ্বারা। এ যাবৎ প্রায় চার হাজার কোটি ডলারের সমপরিমাণ বন্ধকপত্র বিক্রয়ে ব্যাঙ্ক সফল হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন দেশেও ব্যাঙ্কের বন্ধকপত্র সমাদর পাইয়াছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত লগ্নির অঙ্গীকারের অংশ (পোর্টফোলিও অফ অব্‌লিগেশন্‌স) নিউইয়র্কে কিংবা অন্যত্র বিক্রয় করিয়াও ব্যাঙ্কের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে।

লগ্নিবিতরণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের শর্তপঞ্জীতে কতিপয় নির্দেশ দেওয়া আছে। সদস্য না হইলে ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ঋণ পাওয়া কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও সদস্য রাষ্ট্রের সরকারকে, অন্যথা সদস্য রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (গ্যারান্টীড) প্রতিষ্ঠানকেই শুধু ব্যাঙ্ক ঋণদানের জন্য বিবেচনা করিতে পারে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে, একমাত্র এমন কর্মকল্পের জন্যই সাধারণতঃ ঋণ দেওয়া হয়; তৎক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ ব্যয়ের কেবল বৈদেশিক মুদ্রাঘটিত অংশটির জন্য লগ্নিবিতরণে সম্মত হইয়া থাকে। লগ্নির জন্য পেশ করা বিভিন্ন কর্মকল্প পরীক্ষান্তে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, সেই কর্মকল্পটিই লগ্নিদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। নিয়মানুগ ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতা ব্যাঙ্কের পক্ষে বিশেষ বিচার্য বিষয় এবং যে পরিকল্পনা বাবত ঋণ বরাদ্দ হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই যাহাতে ঋণদত্ত অর্থ ব্যয়িত হয় সে ব্যাপারে ব্যাঙ্ক অত্যন্ত সতর্ক। তাহা ছাড়া ধনাঞ্চলাদিতে কিংবা অন্যত্র সাধারণ উপায়ে কোনও রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহে অকৃতকার্য হইলে তবেই ব্যাঙ্ক ঋণদানের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবে। ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত লগ্নির টাকা ব্যাঙ্কের যে কোনও সদস্য রাষ্ট্রে (এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডে) ব্যয় করা সম্ভব।

কোনও দেশ হইতে লগ্নির জন্য আবেদন করা হইলে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ দেশটির ঋণভারবহনক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত হইতে লগ্নির সুদ স্বচ্ছন্দে মিটানো যাইবে কি না তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হয়। যে সব দেশের বৈদেশিক ঋণঘটিত আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ অমীমাংসিত, তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ঋণ পাওয়া দুরূহ।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক পৃথিবীর নানা দেশে সাড়ে তিন শত বিভিন্ন লগ্নিতে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে; মোট লগ্নির পরিমাণ প্রায় সাত শত কোটি ডলার। প্রথমাবস্থায় অধিকাংশ লগ্নির জন্য ডলার বরাদ্দ হইত, কিন্তু সম্প্রতি ডলার ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রাও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত অর্থের দ্বারা প্রধানতঃ যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিগত উন্নতি এবং শিল্পব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ করা হইয়া থাকে। তবে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্য ঋণদানে অনিচ্ছুক।

ব্যাঙ্কের লগ্নির মেয়াদ প্রায় সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালিক (লং-টার্ম)। ব্যাঙ্কের বন্ধক-পত্রের জন্য যে হারে সুদ দিতে হয়, সাধারণতঃ তাহার সঙ্গে ১¼% যোগ করিয়া ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত লগ্নির সুদের হার নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান ঋণগ্রাহক। ৩০ জুন ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট একত্রিশটি লগ্নি বাবত ভারতবর্ষ ব্যাঙ্কের কাছে প্রায় পঁচাশি কোটি ডলার ধার করিয়াছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সম্প্রতি আরও দুইটি আন্তর্জাতিক অর্থ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন অনুন্নত দেশগুলিতে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগে নিষ্ঠাশীল; ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন উপযুক্ত ক্ষেত্রে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়া থাকে। 'ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড' দ্র।

অশোক মিত্র

ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড

ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ড সংক্ষেপে আই. এম এফ। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার। ইহা রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ব্রেটন উড্‌স কন্‌ফারেন্‌স-এ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কার্য শুরু হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক লেন-দেনের (পেমেণ্ট্‌স) ক্ষেত্রে মুদ্রাভাণ্ডারের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহার সদস্য। ইহার বহুমুখী উদ্দেশ্যের প্রধান হইল বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা আনয়ন। স্থিতিশীলতার অর্থ এই নয় যে বিনিময়-হার চিরকাল অপরিবর্তনীয় হইয়া থাকিবে। স্বর্ণমানের যুগে বিনিময়-হারের নিশ্চলতার ফলে নানা সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে গিয়া আভ্যন্তরীণ আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা ব্যাহত হইত। দেশের মূল্যমান আন্তর্জাতিক লেন-দেনের গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। মুদ্রাভাণ্ডারের উদ্যোক্তারা আশা করিয়াছিলেন যে, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বহুবিধ নীতি রূপায়িত করিবার স্বাধীনতা লাভ করিবে। স্বর্ণমানের বিলুপ্তির পর বিনিময়-হারের নিত্যপরিবর্তনশীলতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিল। বহু দেশ প্রতিযোগিতা করিয়া স্বীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। জার্মানী প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কঠোর বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের নীতি (এক্সচেন্জ কণ্ট্রোল) গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোরতর ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিয়াছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের উদ্যোক্তাগণ এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বর্ণমানের দুর্বলতা পরিহার করিয়া দৃঢ় আর্থিক কাঠামো গঠন করা যাইবে। তাঁহারা কি ধরনের নিয়ম-কানুনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সদস্য রাষ্ট্রের স্বীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য (পার্ ভ্যাল্যু) স্থির করিবার অনুরোধ জানানো হয়। অধিকাংশ সদস্য স্বীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্ধারণ করেন। সাধারণভাবে এই মূল্য শতকরা দশ ভাগের অধিক পরিবর্তন করা মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতিসাপেক্ষ। মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে আন্তর্জাতিক লেন-দেনের (ব্যালান্স অফ পেমেণ্ট্‌স) ক্ষেত্রে কোনও সদস্য রাষ্ট্র যদি 'ফাণ্ডামেণ্টাল ডিস্‌ইকুইলিব্রিয়াম'-এর সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের মুদ্রার বিনিময়-হার পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। অবশ্য 'ফাণ্ডামেণ্টাল ডিস্‌ইকুইলিব্রিয়াম'-এর কোনও সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে বিনিময়-হার সাধারণতঃ স্থিতিশীল থাকিবে, কিন্তু আন্তর্জাতিক লেন-দেনের সাম্যস্থিতি ব্যাহত হইলে বিনিময়-হারের পরিবর্তন করা সম্ভব। মুদ্রাভাণ্ডার সর্বপ্রকার বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। একাধিক বিনিময়-হার-প্রথাও মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়মবিরুদ্ধ। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতি লাভ করিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, মূলধনের বহির্গমন (আউটফ্লো) রোধ করিবার ব্যবস্থা মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়মবহির্ভূত নয় এবং যদি কোনও মুদ্রাকে 'দুর্লভ মুদ্রা' ঘোষণা করা হয় সে ক্ষেত্রেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

সদস্য রাষ্ট্রবর্গ কিভাবে মুদ্রাভাণ্ডারের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় সাহায্য লাভ করিতে পারে তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রতি সদস্য রাষ্ট্র মুদ্রাভাণ্ডারের নিকট স্বল্পমেয়াদি সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে, যাহার ফলে বিনিময়-হার বারংবার পরিবর্তন অথবা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের বরাদ্দ (কোটা) নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া এই বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দ সর্বাধিক। এই বরাদ্দের পরিমাণের উপর প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের ভোটদানের শক্তি নির্ভর করে। বর্তমানে মোট কোটার পরিমাণ ১৫০০ কোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের কিছু অধিক। মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যকে বরাদ্দের এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণে ও বাকি অংশ দেশীয় মুদ্রায় জমা রাখিতে হইবে। এইভাবে ভাণ্ডারের হস্তে স্বর্ণ ও বিভিন্ন মুদ্রা সঞ্চিত হইয়া থাকে। দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এই ভাণ্ডার হইতে সদস্যবৃন্দ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে। এই ক্রয়ক্ষমতা নানা বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমিত। সাধারণতঃ কোনও এক বৎসরে কোনও সদস্য তাহার বরাদ্দের এক-চতুর্থাংশের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে না। ইহার অবশ্য ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সাধারণতঃ মুদ্রাভাণ্ডারের হস্তে কোনও দেশের মুদ্রার পরিমাণ তাহার বরাদ্দের দ্বিগুণ হইলে ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহারও ব্যতিক্রম হইয়াছে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ক্ষেত্রে। মুদ্রা-

ভাণ্ডারের অনুসৃত নীতি হইতেছে যে, যতদিন পর্যন্ত ভাণ্ডারের হস্তে কোনও সদস্যের মুদ্রার পরিমাণ তাহার কোটার পরিমাণের অধিক নহে, ততদিন পর্যন্ত সেই সদস্যের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করার আবেদন মঞ্জুর করিতে সাধারণতঃ দ্বিধা করা হইবে না। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানিকারী সদস্য দেশগুলির জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রপ্তানির ঘাটতিজনিত বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা ইহাতে সহজতর হইবে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুদ্রাভাণ্ডার বহু সদস্যের সহিত একটি বন্দোবস্ত (স্ট্যাণ্ড-বাই অ্যারেন্‌জ্‌মেণ্ট) করিতেছেন, যাহার ফলে সদস্য রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিবার আশ্বাস পাইয়া থাকেন। ভারত, জাপান, ব্রিটেন প্রভৃতি বহু সদস্য রাষ্ট্রের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা মুদ্রাভাণ্ডার করিয়াছেন। মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা বিনিময়যোগ্য (কন্‌ভার্টিব্‌ল্) মুদ্রার দ্বারা দেশীয় মুদ্রা ধনভাণ্ডারের নিকট পুনরায় ক্রয় করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়মাবলী ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদি সাহায্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ভারসাম্য অব্যাহত রাখা। কোনও দীর্ঘমেয়াদি কারণে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইলে তাহার সমাধান মুদ্রাভাণ্ডারের ক্ষমতাবহির্ভূত। মুদ্রাভাণ্ডারের প্রভাবে আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আসিয়াছে— অবশ্য এই বিষয়ে মতানৈক্যের অবকাশ আছে।

কাননকুমার মজুমদার

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে আই. এল ও। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারীর শান্তি সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা স্থাপনের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এবং সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে সংস্থার প্রথম অধিবেশন বসে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা শুরু হইতে লীগ অফ নেশন্‌স-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিলেও তাহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে লীগ অফ নেশন্‌স উঠিয়া গেলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার অস্তিত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাষ্ট্রসংঘ (ইউনাইটেড নেশন্‌স) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা স্পেশালাইজ্‌ড এজেন্সি রূপে কার্য নির্বাহ করিতেছে।

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, মানবিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার লক্ষ্য। মানুষের শ্রম যাহাতে অন্যান্য পণ্যের মত বিবেচিত না হয়, সংস্থা সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখে। নারী ও শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষা করাও ইহার অন্যতম কাজ।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্য মাত্রেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সদস্য। বর্তমানে সংস্থার সদস্যসংখ্যা ১০৪। ভারত প্রথমাবধি (১৯১৯ খ্রী) ইহার সদস্য রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সদস্যবর্গ কেবলমাত্র সদস্য রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধি নহেন। প্রত্যেক দেশের সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ সংস্থায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে ২ জন সরকারি সদস্য থাকিলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ১ জন করিয়া সদস্য থাকেন। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের দেয় চাঁদাই এই সংস্থার আয়।

সংস্থার সংগঠনের মধ্যে পরিচালক সভা, আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে সংস্থার কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে। পরিচালক সভা (গভর্নিং বডি)— বিভিন্ন সদস্য দেশের প্রেরিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি, ১০ জন শ্রমিক ও ১০ জন মালিক প্রতিনিধি —মোট ৪০ জনকে লইয়া এই পরিচালক সভা গঠিত। এই সভাই শ্রমিক সংস্থার কার্য পরিচালনা করেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন (ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার কন্‌ফারেন্‌স)— আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার কার্য নির্বাহ হয়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র সম্মেলনে ৪ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে ২ জন সরকারি ও বাকি ২ জনের মধ্যে একজন মালিক পক্ষের ও অপরজন শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হইয়া থাকেন। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ন্যায় এই শ্রম সম্মেলনে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা জোটবদ্ধ হইয়া ভোট দেন না। ভোট দিবার পক্ষে সকলেরই স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং ভোটাভুটিতে প্রায়ই দেশগত বিভেদ অতিক্রম করিয়া শ্রমিক, মালিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থের ঐক্য প্রতিফলিত হয়।

সম্মেলনে কোনও প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পড়িলে তাহা সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে :

১. নীতিগত বিধান (কন্‌ভেন্‌শন) ও ২. সুপারিশ (রেকমেণ্ডেশন)। কন্‌ভেন্‌শনগুলি প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপিত করা আবশ্যিক। কোনও কন্‌ভেন্‌শন অনুমোদন (র‍্যাটিফিকেশন) করিলে, সম্পূর্ণতঃ করা প্রয়োজন। ইচ্ছামত রদবদল করা চলে না। কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হইলে কন্‌ভেন্‌শন আন্তর্জাতিক চুক্তির মর্যাদা পায়।

সুপারিশগুলি (রেকমেণ্ডেশন) কন্‌ভেন্‌শনের ন্যায় ধরাবাঁধা নহে। যে সব সিদ্ধান্ত সুপারিশ রূপে গৃহীত হয়, প্রত্যেক দেশ তাহা আইনে পরিবর্তিত করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি গ্রহণ করা না করা সংশ্লিষ্ট দেশের ইচ্ছাধীন। এগুলিকে আইনতঃ অনুমোদন করার প্রয়োজন হয় না, তবে যে কোনও দেশই এই সব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্ব স্ব শ্রম আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর (ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস)— ইহা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সচিবালয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা নির্বাহ, তথ্য বিনিময় এবং পত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে এই সব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করা দপ্তরের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে দপ্তরের বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক তথ্যানুসন্ধান করিয়া পরামর্শ দিয়া থাকেন। দপ্তরে সদস্য রাষ্ট্রগুলি হইতে বিশেষজ্ঞ ও কর্মী নিয়োগ করা হয়। ইহা জেনিভায় অবস্থিত।

সুব্রতেশ ঘোষ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ও ভারতীয় শ্রম আইন— আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা প্রায় একই সময়ে ঘটিয়াছে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রভাব মানিয়া লইলেও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ভারতীয় শ্রম আইনে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অবদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার বিভিন্ন কন্‌ভেন্‌শন বা সুপারিশ অনুসরণ করিতে কখনও বাধ্য ছিলেন না। সুতরাং কোনও বিশেষ শ্রম আইন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার কোনও বিশেষ নীতির অনুগামী হইলে তাহার একমাত্র কারণ হিসাবে ঐ সংস্থার প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট করা যুক্তিসংগত হইবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে এ দেশে যে বিশেষ অগ্রগতি হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। ১৯১৯-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত যে সমস্ত আইনে শ্রম সংস্থার নীতি প্রতিফলিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফ্যাক্টরি আইন, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের খনি আইন, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (ওয়ার্কমেন কম্পেন্‌সেশন অ্যাক্ট) এবং বিভিন্ন প্রদেশে গৃহীত প্রসূতি-শ্রমিকদের খয়রাতি আইন উল্লেখযোগ্য।

যদি কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কোনও কন্‌ভেন্‌শন অনুমোদন করে তাহা হইলে উহার সহিত সংগতি রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য ঐ কন্‌ভেন্‌শন সংরচিত, সাধারণভাবে উহা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট থাকাও তাহাদের কর্তব্য। তবে প্রথম হইতেই নীতিগুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমের উল্লেখ থাকিত। যে সকল দেশ শিল্পোন্নত নহে, তাহাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতর মানদণ্ডের অনুসরণে সম্মতি দেওয়া হইত। যেমন শ্রমের সময় -সম্পর্কিত কন্‌ভেন্‌শনে সাধারণভাবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক শ্রমকাল যথাক্রমে ৮ ও ৪৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হইলেও ভারতের ক্ষেত্রে ৬০ ঘণ্টার সাপ্তাহিক কাজের সময় বাঁধিয়া দেওয়াই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আই. এল. ও.-র আর একটি কন্‌ভেন্‌শনে রাত্রিবেলায় নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই কন্‌ভেন্‌শন শুধু ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইনের গণ্ডিভুক্ত কল-কারখানা সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল। এতদ্ভিন্ন, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শ্রমিক বলিতে শ্রম সংস্থার ঐ কন্‌ভেন্‌শনে ১৮ বছরের কমবয়সী শ্রমিকদের বুঝায়; ভারতের ক্ষেত্রে কোনও শ্রমিকের বয়স ১৬ বছরের কম হইলে তাহাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হয়।

আই. এল্. ও.-র শ্রমকাল, রাত্রিকালীন নিয়োগ ও সাপ্তাহিক বিশ্রাম -সংক্রান্ত নীতিগুলি সর্বপ্রথম ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফ্যাক্টরি আইনে ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের খনি আইনে প্রতিফলিত হয়। খনিশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমকাল সর্বপ্রথম নিয়ন্ত্রিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের খনি আইনে। খনির মধ্যে ও বাহিরে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য পৃথক শ্রমকাল নির্ধারণ, নারী ও শিশু শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নির্দেশ ইত্যাদি এই আইনের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী (১৯১১ খ্রী) ফ্যাক্টরি আইনে নারী ও শিশু শ্রমিকদের সাধারণভাবে এবং কেবলমাত্র যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের

শ্রমকাল নির্দিষ্ট ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফ্যাক্টরি আইনে সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের সাপ্তাহিক শ্রমকাল স্থিরীকৃত হয় ৬০ ঘণ্টা। তিন ধরনের শ্রমিকের ক্ষেত্রেই কাজের সময় পূর্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করা হয়। পরবর্তী কালে নূতন আইনের মাধ্যমে কাজের সময় আরও হ্রাস করা হইয়াছে। সাপ্তাহিক ছুটি ও দৈনিক বিশ্রামের ব্যবস্থাও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফ্যাক্টরি আইনের বৈশিষ্ট্য।

ব্যতিক্রম স্বীকৃত না থাকিলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কন্‌ভেন্‌শনগুলির আংশিক অনুমোদন করা যাইত না। এই অসুবিধাই অনুমোদনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য কোনও নীতি অনুমোদিত না হইলেও কোনও কোনও সময়ে আইনে তাহার প্রতিফলন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রসূতি-শ্রমিকদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন এবং খনিশিল্পে নিযুক্ত প্রসূতি-শ্রমিকদের জন্য সর্বভারতীয় আইনের উল্লেখ করা যায়।

নবেন্দু সেন

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন সংক্ষেপে আই. এফ. সি.। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প কমিশন ভারতের শিল্প-পুঁজি সমস্যার সমাধানের জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রথম স্বীকার করেন। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিও শিল্প-পুঁজি সরবরাহের জন্য বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কয়েকটি বেসরকারি তথাকথিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক বা শিল্প-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সেগুলি ঠিক শিল্প-ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় নাই। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই সংসদের আইন অনুসারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন বা ভারতীয় শিল্প-পুঁজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা স্বয়ংশাসিত আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি বৃহদায়তন যৌথ-মূলধনী বা সমবায় প্রথায় গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ ও মধ্য -মেয়াদি ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে ঋণদানের ক্ষমতা ইহার উপর অর্পিত হয় নাই। কোনও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ সরবরাহ করিতে পারে না। আই. এফ. সি. যখন প্রথম স্থাপিত হয়, ইহার পরিচালনার ভার একটি পরিচালক সমিতির হাতে ন্যস্ত ছিল। সেই পরিচালক সমিতি একটি কার্যনির্বাহক সভা ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাহায্যে যাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতেন। শ্রীমতী কৃপালনীর সভাপতিত্বে গঠিত একটি তদন্ত কমিটির সুপারিশে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মূল আইন সংশোধনের ফলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অপসারিত হইয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে পরিচালক সমিতির একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিচালক সমিতির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এই চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যানকে লইয়া সমিতিতে সর্বসমেত ১৩ জন সভ্য আছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত ৪ জন পরিচালকের মধ্যে একজন বেসরকারি অর্থনীতিবিদ্ ও একজন শ্রমিক নেতা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নিযুক্ত হন। পরিচালকদের মধ্যে দুই জন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মনোনীত। আই. এফ. সি.-র অংশীদারগণ— বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি— অন্য পরিচালকদের নির্বাচিত করে। পুরাতন কার্যনির্বাহক সভার পরিবর্তে ৫ জন সভ্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই পরিচালক সমিতির সভায় উত্থাপিত হইয়া থাকে। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সমিতির ১২টি সভা হয়। কিন্তু ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি মাত্র সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ গুরুত্ব নাই। আই. এফ. সি.-র অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। উহা ৫০০০ টাকা মূল্যের ২০০০০ শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে ৭ কোটি টাকা মূলধন তোলা হইয়াছে। আইনে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট এবং সমবায় ব্যাঙ্ক মিলিয়া এই শেয়ারগুলি ক্রয় করিয়াছে। ভারত সরকার প্রথম দফায় তোলা ৫ কোটি টাকার মূলধন ফেরত দিতে এবং উহার উপর অন্ততঃ ২½% হারে বাৎসরিক লভ্যাংশ দিতে এবং দ্বিতীয় দফায় তোলা ২ কোটি টাকার মূলধনের উপরে অন্ততঃ ৪% হারে বাৎসরিক লভ্যাংশ দিতে গ্যারান্টি দিয়াছেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. সি-র শেয়ারগুলি এইভাবে বণ্টিত ছিল :

কেন্দ্রীয় সরকার	২৮০০ শেয়ার
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	২৮৬৪ শেয়ার
তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক	৩৪০৫ শেয়ার
ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি	৩৫৭৬ শেয়ার
সমবায় ব্যাঙ্ক	১৩৫৫ শেয়ার

আদায়ীকৃত মূলধনের দশ গুণ পর্যন্ত বন্‌ড বা ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবার ক্ষমতা ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত এই উপায়ে মোট ২৮ কোটি

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন

২৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল ঋণপত্রেরই পরিশোধ ও সুদ প্রদানে ভারত সরকারের গ্যারান্টি আছে।

এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে মোট ১০ কোটি টাকা আমানত গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ আমানত কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের মেয়াদি হওয়া প্রয়োজন। তবে আজ পর্যন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে কর্পোরেশন কোনও আমানত গ্রহণ করে নাই।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন সংশোধনী আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঋণপত্রের বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনধিক ৯০ দিনের জন্য কর্পোরেশন ঋণ লইতে পারে। নিজের ডিবেঞ্চারের বিনিময়েও আই এফ সি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনধিক ১৮ মাসের জন্য ঋণ লইতে পারিবে। তবে উহার মোট পরিমাণ কখনও ৩ কোটি টাকার বেশি হইতে পারিবে না। কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে এই ঋণের উপর সুদের হার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪% হইতে ৪½% করিয়াছে। কর্পোরেশন প্রথমে ৪½% ও পরে ৫% সুদের হারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনী আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৬ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্যারান্টি দিলে কর্পোরেশন বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে পারে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যে কোনও উপায়ে কর্পোরেশন ঋণদান বা সাহায্য করিতে সক্ষম। প্রথমতঃ, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনের সময়ে ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান। দ্বিতীয়তঃ, কোনও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে ২৫ বৎসরের কম সময়ের জন্য ঋণ লইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে কর্পোরেশন গ্যারান্টি দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কোনও বৃহৎ শিল্প সংস্থা যদি বাজারে শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার ছাড়িতে চায় তাহা হইলে কর্পোরেশন অবলেখন (আণ্ডাররাইট) করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিতে পারে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কর্পোরেশন নিজে কোনও শিল্প কোম্পানির শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের অধিকারী ছিল না। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মূল আইন সংশোধনের ফলে কর্পোরেশন এখন প্রত্যক্ষভাবে শিল্প কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ইচ্ছামত তাহা শেয়ারে পরিণত করিবার অধিকারও পাইয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্পোরেশন সরাসরি কোনও শিল্প কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে নাই, তবে ১৮২ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার কিনিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, যদি কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য বা সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করে, ভারত বা বিদেশ হইতে পাওনা মিটানোর চুক্তিতে (ডেফার্‌ড পেমেন্ট্‌স অ্যারেন্‌জ্‌মেণ্ট) শিল্পে প্রয়োজনীয় কোনও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে, তবে আই. এফ. সি তাহার গ্যারান্টি দিতে পারিবে।

ঋণদানের সময়ে কতকগুলি বিষয় কর্পোরেশন বিবেচনা করে। যেমন ১ জাতীয় স্বার্থে ঐ শিল্পের গুরুত্ব ; ২. উৎপন্ন দ্রব্যটির প্রয়োজন কতটা ; ৩. কুশলী কর্মী ও কাঁচামালের জোগানের অবস্থা ; ৪ পরিচালন-দক্ষতার মান ; ৫. বন্ধকি দ্রব্যের প্রকৃতি ; ৬. উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ প্রভৃতি।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্পোরেশন ঋণের উপর ৫½% হারে সুদ লইত এবং সময়মত সুদ ও আসল পরিশোধ করিলে পুরস্কার হিসাবে ½% রিবেট দিত। কিন্তু বর্তমানে কর্পোরেশন সুদের হার বাড়াইয়া ৭% করিয়াছে এবং পূর্বের হারেই রিবেট দেওয়া হয়। ডলার ক্রেডিট হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় যে ঋণ দেওয়া হয়, তাহার সুদের হার সামান্য বেশি এবং তাহা অপরিবর্তিত আছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশনের পঞ্চদশ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১ জুলাই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩০ জুন ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্পোরেশন মোট ১১৮·৩৯ কোটি টাকার ভারতীয় মুদ্রায় এবং ৯·২৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ইহার মধ্যে যথাক্রমে ৮০·০৫ কোটি টাকা এবং ২·২০ কোটি টাকা বণ্টিত হইয়াছে। শিল্পগতভাবে হিসাব লইলে দেখা যায় যে, চিনিশিল্পে সর্বাধিক ঋণ (৪১·৪৩ কোটি টাকা) দেওয়া হইয়াছে। তবে তাহার নীচে ক্রমানুসারে রসায়নশিল্প (১৭·৭ কোটি টাকা), ইঞ্জিনিয়ারিং (১৭·৯১ কোটি টাকা), নন-ফেরাস মেটাল (১৭·৮৫ কোটি টাকা), বয়নশিল্প (১৭·২৯ কোটি টাকা), কাগজ-শিল্প (১৫·৫৫ কোটি টাকা) এবং সিমেন্টশিল্প (৬·৩৫ কোটি টাকা) স্থান পাইয়াছে। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত যে সকল ফ্যাক্টরিকে কর্পোরেশন ঋণ দিয়াছে তাহাদের মধ্যে তিনটি সুতিশিল্প ও একটি উদ্ভিজ্জ তৈলের কারখানা ব্যতীত সবগুলিই চিনিকল। ঐ সময়ে শিল্প

প্রতিষ্ঠানে অন্যান্যভাবে কর্পোরেশন যে সাহায্য দান করিয়াছে তাহাদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

	অনুমোদিত (কোটি টাকা)	বণ্টিত (কোটি টাকা)
অবলেখন	৭·৬৬	৩·৭২
সরাসরি ক্রয় (ডিবেঞ্চার)	১·৮২	১·৮২
পাওনা মিটানো চুক্তির গ্যারান্টি	১৬·৮০	১২·৭৬
বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের গ্যারান্টি	১০·৩৭	২·০২

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

ইণ্ডিয়া অফিস ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত ভারতসচিবের লণ্ডনস্থ দপ্তরের নাম। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির শাসন অবসানে পূর্বতন বোর্ড অফ কণ্ট্রোল ও কোর্ট অফ ডিরেক্‌টর্‌সের পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল ভারতসচিব বা 'সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া' নামক এক মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়। এই মন্ত্রী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের বেতন দেওয়া হইত ভারতের রাজস্ব হইতে। ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে ভারতসচিবের একটি উপদেষ্টা-সভা ছিল। ভারতের সহিত বিলাতের তারের যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পর ভারতীয় ব্যাপারে ইণ্ডিয়া অফিস ও ভারতসচিবের হস্তক্ষেপের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। মণ্টফোর্ড-সংস্কারের ফলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করিয়া এই দপ্তরের ব্যয়ভার ব্রিটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ভারতের প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় প্রভৃতির দায়িত্ব ইণ্ডিয়া অফিসের স্থলে 'হাই কমিশনার' (ভারত সরকারের প্রতিনিধি) -এর হস্তে অর্পিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিবের পরামর্শ-সভা লুপ্ত হইলেও তাহার কয়েকজন মন্ত্রণাদাতা থাকিবেন, এই-প্রকার ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর ইণ্ডিয়া অফিসের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। তবে ইহার সংলগ্ন বিখ্যাত পুস্তকাগারটি এখনও বর্তমান।

রমেশচন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ইণ্ডিয়া অফিসের সংলগ্ন লাইব্রেরি। ভারতবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্যা -চর্চার প্রয়োজনে এই বিদ্যা -সম্পর্কিত পুথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির ঐতিহাসিক রবার্ট অর্‌ম এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সংস্কৃতবিদ্যার প্রথম ইংরেজ পণ্ডিত বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্ল্‌স উইল্‌কিন্‌স এই লাইব্রেরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পতনের ফলে তাঁহার সমৃদ্ধ পুস্তকসংগ্রহ কোম্পানির হস্তগত হয়। এই সংগ্রহের ভিত্তিতে কোম্পানির লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু এই সংগ্রহ লাইব্রেরিতে জমা হয় অনেক পরে। লাইব্রেরির প্রথম সংগ্রহ হইল অর্‌ম সাহেবেরই ব্যক্তিগত পুস্তকভাণ্ডার। তারপর একে একে অনেক সংগ্রহ এখানে জমা হইয়াছে। তন্মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ও প্রথিতযশা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ কোল্‌ব্রুক সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগার বিশেষ খ্যাত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস ও রেজিস্ট্রেশন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় লাইব্রেরিটি দ্রুত সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। এই আইনের শর্ত ছিল, ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রিত প্রত্যেক বইয়ের একখানি কপি এখানে জমা দিতে হইবে। কিন্তু অচিরেই কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে যে কোনও গ্রন্থ গ্রহণ করিবার পরিবর্তে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করেন। নির্বাচনে সুবিধার জন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকাশিত বইপত্রের এক ত্রৈমাসিক তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়।

গ্রন্থাগারের ভার বর্তমানে কমনওয়েল্‌থ রিলেশন্‌স অফিসের উপর ন্যস্ত। ইহার স্বত্ব লইয়া ব্রিটিশ, ভারত ও পাক সরকারের মধ্যে বিবাদ আছে।

বর্তমান সংগ্রহের পরিমাণ: প্রায় একশতটি বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় মুদ্রিত ২৫০০০০ পুস্তক, ২৫০০০ পুথি, ইংরেজী ও অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ৫০০০০। ইহার অধিকাংশই ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি -সম্পর্কিত। ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই লাইব্রেরির অবদান সর্বদেশস্বীকৃত।

দ্র Malcolm C. C. Seton, *The India Office*, 1926; A. J. Arberry, *The Library of the India Office: A Historical Sketch*, 1938.

আদিত্য ওহদেদার

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রানী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে হস্তান্তর করিবার এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। রানীর

প্রতিনিধিরূপে ভারতসচিব ভারতশাসনের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে পরামর্শ দানের জন্য ১৫ জন সদস্য দ্বারা গঠিত একটি সংসদ্ স্থাপন করা হয়। ইহার নাম 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল'। কেবলমাত্র আর্থিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ভারতসচিব ইহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষে চাকুরির পর অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কাউন্সিলের সভ্যপদে নিয়োগ করা হইত। তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি সমর্থন করিতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব লর্ড মর্লি কাউন্সিলে দুইজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন দ্বারা কাউন্সিলের বিলোপ ঘটে।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসা- -কল্পে এবং গবেষণার উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের সকল শাখার ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত সংস্থা। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালুরে প্রতিষ্ঠিত। অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে মহীশূরের তৎকালীন দেওয়ান স্যর মীর্জা ইসমাইলের উদ্যোগে মহারাজ কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার তাঁহার প্রাসাদ -সন্নিহিত অতি মনোরম পরিবেশে এগার একর জমি অ্যাকাডেমিকে দান করেন। বাঙ্গালুরে সেই জমির উপর তুমকুর রোডে একটি শাদাসিধা ধরনের গৃহে অ্যাকাডেমির দপ্তর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিবের আবাসগৃহও ইহার সংলগ্ন। গৃহ দুইটি নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে অ্যাকাডেমির নিজস্ব সংস্থান ও সদস্যগণের দানে।

বর্তমানে অ্যাকাডেমির সংগঠন এইরূপ : অ্যাকাডেমির সদস্যদের বলা হয় 'ফেলো'। বিজ্ঞানের কোনও শাখায় কেহ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিলে তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। অ্যাকাডেমির ফেলোর সংখ্যা অনধিক ২৫০ ধরা হইয়াছে। বিশেষ সম্মানিত ফেলো অনধিক ৬০। অন্যান্য দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের মধ্য হইতে বিশেষ সম্মানিত ফেলো মনোনয়ন করা হয়। সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত পরিষদ্ অ্যাকাডেমির কাজকর্ম পরিচালনা করেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর পরিষদের সভ্য নির্বাচন করা হয়। প্রতি বৎসর পালাক্রমে ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞানানুশীলন -কেন্দ্রে অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে ফেলো, বিশেষ সম্মানিত ফেলো ও পরিষদ্ নির্বাচিত হয়।

অদ্যাবধি ভারতের যে যে নগরে অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটির নাম : অন্নামলৈ নগর (১), আমেদাবাদ (১), উদয়পুর (১), এলাহাবাদ (১), ওয়ালটেয়ার (২), কটক (১), তিরুপতি (১), ত্রিবান্দ্রম (১), দিল্লী (১), নাগপুর (১), পুণা (১), বরোদা (১), বাঙ্গালুর (৫), বেলগাঁও (১), বোম্বাই (৩), মহীশূর (১), মাদ্রাজ (২), হায়দরাবাদ (৩) [কোথায় কতবার অধিবেশন হইয়াছে তাহার সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল]। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হওয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্যগণ পরস্পরের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন এবং একই বিষয়ে জিজ্ঞাসু বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সহিত মতের আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। বাৎসরিক সভায় সভাপতির অভিভাষণে তাঁহার নিজস্ব গবেষণা সম্পর্কিত কোনও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকে। সাধারণের বোধগম্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়েরও আলোচনা হয়।

অ্যাকাডেমির মাসিক পত্রিকায় গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি 'এ' ও 'বি' দুই পর্যায়ে বিভক্ত। দুইটি পর্যায়ে যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা-গণিতবিদ্যা-বিষয়ক এবং জীববিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যা -বিষয়ক নিবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাবৎসর হইতে আজ পর্যন্ত ৫৭টি যাণ্মাসিক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, কোনও বৎসর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে নাই। সব খণ্ডগুলি একত্র করিলে যেন বিপুল বিষয়বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞান-গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে। পত্রিকাটিতে প্রায় ৪৬০০ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা হইয়াছে ৪৫০০০। এই নিবন্ধগুলি অ্যাকাডেমির সদস্যগণের, তাঁহাদের ছাত্র ও সহযোগীগণের মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিবৃত্ত। ভারতে ও ভারতের বাহিরে পত্রিকাটি প্রচারিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জীতে পত্রিকাভুক্ত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অ্যাকাডেমির সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদা ও পত্রিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে অ্যাকাডেমির খরচ চলে। বলা বাহুল্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, মহীশূর, কেরল, হায়দরাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকার এবং মাদ্রাজ, অন্ধ্র, অন্নামলৈ ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স) অ্যাকাডেমির গবেষণাকার্যকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে।

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নিখিল ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাজনৈতিক সভা, বাংলা নাম ভারত-সভা। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই ইহা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও মনোমোহন ঘোষ। সভার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের নিমিত্ত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর একটি মিলনকেন্দ্র গঠন, হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য স্থাপন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত জনসাধারণের সংযোগ সাধন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া যে ক্ষতিকর নূতন বিধির প্রবর্তন করা হয়, তাহা লইয়াই ভারত-সভার কার্যারম্ভ। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন, শুল্কনীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হয়। ভারত-সভার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল: ১. প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ্‌ গঠন, ২. স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন, ৩ প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করাইবার প্রযত্ন এবং ৪. সুরাপান নিবারণকল্পে আন্দোলন পরিচালনা। এই সকল আন্দোলনের ফলে সরকার জনসাধারণের অনুকূলে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিতে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন বিধি সংশোধন করিতে বাধ্য হন। এই সভার নির্দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া রাজনৈতিক ঐক্যের বীজ বপন করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্‌স' অনুষ্ঠিত হয়, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ভারত-সভার নেতৃবৃন্দ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবার পর ভারত-সভা নিজ কার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যক্রমও গ্রহণ করে। ভারত-সভার উদ্যোগে কলিকাতায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা, বিহার ও আসামে ভারত-সভার শতাধিক শাখা-সমিতিও স্থাপিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনে ভারত-সভা নেতৃত্ব গ্রহণ করে। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য সভার নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। সভার আনুকূল্যে একটি 'জাতীয় ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ দুইটি: ১. বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ একটি মিলন-মন্দির স্থাপন এবং ২. দেশীয় শিল্প, বিশেষতঃ চরকা ও তাঁতের বহুল প্রসার। দীর্ঘ কাল আন্দোলন পরিচালনার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর একটি রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। ইহার পর ভারত-সভা বাংলার নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের মিলন-কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত উভয় দল একযোগে প্রাদেশিক রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়ন -মূলক কার্যে রত থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকালে সভা নিজ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সরকারি অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন -মূলক সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে সহযোগিতা করে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারত-সভা সমাজসেবা, ভাষা ও শিল্প -শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

প্রথমে ভারত-সভা কলেজ স্ট্রীটে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর উহা নিজ ভবনে (৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২) উঠিয়া আসে।

দ্র কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯৩৭; শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৯৬০; S. N. Banerjea, *A Nation in Making*, London, 1928; P. N. Dutta, *Memories of Motilal Ghose*, Calcutta, 1935; J. C. Bagal, *History of the Indian Association, 1876-1951*, Calcutta, 1953.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স বাংলা নাম 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহারই পটভূমিতে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার উদ্ভব। রাজা রামমোহন রায় -কৃত আন্দোলনের পর হইতে এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে অনুভূত হইতে থাকে। তবে ভারতীয়েরা যাহাতে মৌলিক গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইতে পারে, এরূপ সুযোগ-সুবিধা তখন ছিল না। সরকারি তত্ত্বাবধানে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার সুযোগ

লাভ করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু ভারতীয়দের মৌলিক গবেষণার এই দুর্লভ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মধ্য কলিকাতার বহুবাজার স্ট্রীটে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স' স্থাপন করেন।

এইরূপ একটি সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনার কথা ডঃ মহেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম আলোচনা করেন 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' পত্রিকার ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট সংখ্যায়। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে লেখেন যে, 'লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন ও ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স -এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মধারা অনুসারে কাজ হইতে পারে এমন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।' পর বৎসর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর ৩ জানুয়ারি সংখ্যায় জনসাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের এক আবেদন প্রসঙ্গে ডঃ সরকার প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির মর্মার্থ এইরূপ . ১. কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। প্রয়োজন ও সময় -মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা স্থাপন করিতে হইবে। ২ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অনুশীলন ও গবেষণায় ভারতীয়দের উৎসাহিত করা সমিতির উদ্দেশ্য। প্রাচীন ও নব্য ভারত-সম্পর্কিত সকল বিষয়কে বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করা ইহার আর এক উদ্দেশ্য। তাই মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ প্রাচীন নথিপত্রের সম্পাদনা ও প্রকাশনও সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হইবে। ৩. সমিতি সংগঠনের জন্য একটি ভবন, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ও যন্ত্রপাতি এবং যোগ্য ও উৎসাহী কর্মীর প্রয়োজন। এইরূপ একটি ভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতায় এক খণ্ড জমি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ মানের গ্রন্থাবলী ক্রয় করিতে হইবে.।

এই প্রস্তাবে দেশবাসী বিপুল উৎসাহের সহিত সাড়া দিয়াছিল। ডঃ সরকারের পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য লইয়া যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ফাদার ই লাফোঁ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আবদুল লতিফ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা ও সেকালের আরও অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স

প্রথম দিকে প্রায় ৩০ বৎসর কাল বিজ্ঞানসমিতির তৎপরতা প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল শিক্ষাদান ব্যাপারে ও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারে। পদার্থবিদ্যায় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও রেভারেণ্ড লাফোঁ এবং রসায়নে তারাপ্রসন্ন রায় নিয়মিতরূপে এখানে বক্তৃতা দিতেন। পরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আরও যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, চুনীলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বসু, মহেন্দ্রলালের পুত্র অমৃতলাল সরকার ও গিরিশচন্দ্র বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমিতির এই বক্তৃতাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহা ছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূবিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এসসি পরীক্ষার্থীরা এখানে নিয়মিত ক্লাশ করিত। পরে কলেজগুলিতে এই সব বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা হইলে এবং সমিতি গবেষণা পরিচালনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইলে শিক্ষণব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

মৌলিক গবেষণায় সমিতির তৎপরতা দেখা যায় বর্তমান শতকের প্রথম হইতে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সরসীলাল সরকার কেলাসিত কপার ফেরোসায়ানাইডের উপর গবেষণা করেন। ইহার কিছু পরে রসিকলাল দত্ত ও কয়েকজন ছাত্র রসায়নের উপর কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমিতি নিয়মিতরূপে আবহ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং এই পর্যবেক্ষণের ফল দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। সেকালে কলিকাতায় আবহ-সংক্রান্ত তথ্যাদি জানিবার ইহাই একমাত্র উপায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে সমিতির এই কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ সভ্য হিসাবে সমিতির প্রেক্ষাগারে গবেষণা আরম্ভ করিলে এই প্রতিষ্ঠানের, তথা ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। রমণ তখন অডিট ও অ্যাকাউণ্ট্‌স বিভাগের অফিসার রূপে কলিকাতায় অধিষ্ঠিত। অফিসের পরে ও অবসর সময়ে তিনি নিয়মিত সমিতির প্রেক্ষাগারে পদার্থবিদ্যার নানা বিষয়ে গবেষণা করিতেন। প্রথম দিকে ধ্বনিবিদ্যা বিষয়ে, বিশেষতঃ তারের বিবিধ বাদ্যযন্ত্র হইতে নির্গত ধ্বনির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গুণাগুণের গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদানকল্পে বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তিনি যে সব মৌলিক প্রবন্ধ

প্রকাশ করেন, তাহাতে অচিরে তাঁহার ও সেই সঙ্গে সমিতির সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইলে সেখানে রমণ পদার্থবিদ্যায় স্যর তারকনাথ পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভাতেই চলিতে থাকে। এই সময়ে তিনি আলোকরশ্মি-সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করেন, যেমন: বস্তুর সংঘাতে আলোক-তরঙ্গের বিক্ষেপ ও সেই বিক্ষেপ-হেতু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি; তরল ও কঠিন বস্তুর সংঘাতে রয়্‌ণ্ট্‌গেন রশ্মির বিক্ষেপ; বস্তুর চৌম্বক ধর্ম ইত্যাদি। তাঁহার আকর্ষণে বহু সুযোগ্য কর্মী ও ছাত্র তখন সমিতির প্রেক্ষাগার কর্মচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার উৎসাহী কর্মীগণ অত্যল্প সময়ের মধ্যে বহু মূল্যবান গবেষণার ফল সমিতির নিজস্ব পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্‌স'-এ, বিভিন্ন বুলেটিনে এবং বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই সব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন (১৯২৪ খ্রী)। আলোক-তরঙ্গের বিক্ষেপ ও তজ্জনিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি -সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অধ্যাপক রমণ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

অধ্যাপক রমণ বাঙ্গালুরের ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস -এর ডিরেক্টরের পদ লাভ করিয়া সমিতি পরিত্যাগ করেন (১৯৩৩-৩৪ খ্রী)। ঐ সময়ে বিহারীলাল মিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের সহিত সমিতির তহবিল হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্ট হয়। সেই পদে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে করিয়ামানিক্যম এস. কৃষ্ণন ইতিপূর্বেই সমিতির প্রেক্ষাগারে চৌম্বক সংক্রান্ত গবেষণায় যশস্বী হইয়াছিলেন; এই পদ পাইবার পরে পূর্ণোদ্যমে নানাবিধ গবেষণার অবতারণা করিয়া তিনি সমিতির আন্তর্জাতিক খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং দিল্লীতে ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইলে ইনিই প্রথম সেই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

বিজ্ঞান-সমিতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তৃতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমিতির সেক্রেটারি পদে এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সমিতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণাগারে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি অধ্যাপক পদ, নানা ধরনের গবেষক পদ এবং এক সঙ্গে অনেকগুলি গবেষণা-বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। শহরের জনাকীর্ণ কেন্দ্রস্থল বহুবাজারের ভবন ও তৎসংলগ্ন অপরিসর জমি সমিতির প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপন্থী ছিল। যাদবপুরে ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন এক বিরাট প্রেক্ষাগার নির্মাণ নূতন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার জমি ক্রয়, ভবননির্মাণ ও সমিতির বাৎসরিক ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করিলে যাদবপুরে এই সব কাজের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে সমিতি তাহার ২১০ বহুবাজার স্ট্রীটস্থ পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া যাদবপুরের নূতন ভবনে উঠিয়া আসে। উন্নয়নের এই কার্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারও সমিতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সমিতির প্রথম বেতনভোগী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন।

পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে চারি জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বর্তমানে অধ্যাপকরূপে গবেষণা পরিচালনা করিয়া থাকেন। রয়্‌ণ্ট্‌গেন রশ্মি ও কেলাস -সম্পর্কিত গবেষণায়, রমণ-এফেক্ট-এ, দৃশ্যমান ও অতি সূক্ষ্ম রেডিও-তরঙ্গের বর্ণালির সাহায্যে বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্যভেদে, তরলীভূত বায়ু ও হাইড্রোজেনের অতি নিম্ন উষ্ণতায় বস্তুর বিচিত্র ব্যবহার বিশ্লেষণে; প্রোটন, নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি মৌলিক কণিকার বিক্ষেপ ও পারস্পরিক সংঘাত -সম্পর্কিত তত্ত্বীয় গবেষণায় এবং চৌম্বকবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে এই অধ্যাপকেরা এবং তাঁহাদের সহযোগী কর্মী ও ছাত্র -বৃন্দ নিযুক্ত আছেন। সেইরূপ রসায়নের বিভিন্নবিভাগে (যেমন ভৌত রসায়ন, জৈব ও অজৈব রসায়ন এবং বৃহৎ অণুর রসায়নে) চারি জন অধ্যাপক ও বিভিন্ন পর্যায়ের সহযোগী কর্মী ও ছাত্র -বৃন্দ নূতন নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে এবং বিবিধ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম দ্রব্যের সংশ্লেষণে ব্যাপৃত আছেন। এক দিকে মৌলিক গবেষণার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, অপর দিকে এই কার্যে সফলকাম হইবার জন্য সুনিপুণ ও অভিনব একদল গবেষকগোষ্ঠীর সৃষ্টি— ইহাই বর্তমানে সমিতির প্রধান প্রচেষ্টা।

সমরেন্দ্রনাথ সেন

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন তারিখে প্রচারিত মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী

ভারত-বিভাগের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবকে আইনসংগত রূপ দিবার জন্য ঐ বৎসরের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। তখন ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক দলের সরকার ক্ষমতাসীন ছিল; প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ক্লেমেণ্ট এটলি।

এই আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হইতে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল। ইহাদের নাম হইল 'ইণ্ডিয়া' ও 'পাকিস্তান'। পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসাম বিভাগের ব্যবস্থা হইল। পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ, বাংলার পূর্বাংশ ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ, ব্রিটিশ বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও পাকিস্তানের ভাগে পড়িল।

প্রত্যেক ডোমিনিয়নে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে একজন গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল প্রত্যেক ডোমিনিয়নের নিজস্ব গণ-পরিষদের উপর। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোনও আইন ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য রহিল না। ভারতশাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সর্ববিধ দায়িত্ব বা অধিকার লোপ পাইল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ -শাসিত রাজ্যগুলির সহিত ব্রিটিশ-রাজের সমুদায় সন্ধি ও চুক্তি বাতিল করা হইল। দেশীয় রাজ্য ও উপজাতি -অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের কোনও দায়িত্ব বা অধিকার রহিল না। ইংল্যাণ্ডরাজের 'ভারতসম্রাট' উপাধি বাতিল করা হইল। তাঁহার উপাধি হইল 'ভারত ও পাকিস্তানের রাজা'।

ব্রিটিশরাজ হইতে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা নামেমাত্র ভারতের রাজা রহিলেন; ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এবং মন্ত্রীসভার সমুদায় কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল। শাসন-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে রাজা ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করিতেন। গভর্নর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে শাসন-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শাসন-পরিষদ্ কার্যত: গণ-পরিষদের নিকট দায়ী ছিল। সুতরাং আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গণ-পরিষদ্ প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম অধিকার লাভ করিয়াছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলি সূক্ষ্ম আইনের দৃষ্টিতে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থার চাপে তাহারা কোনও ডোমিনিয়নের অঙ্গীভূত হইতে বাধ্য হইল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় ভারতের ভৌগোলিক সীমার অন্তঃপাতী সকল দেশীয় রাজ্যই ভারতে যোগ দিল। কাশ্মীর ভারতে যোগদান করিল, কিন্তু পাকিস্তান অদ্যাপি কাশ্মীরের ভারতভুক্তি মানিয়া লয় নাই।

ভারত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ডোমিনিয়ন সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস কংগ্রেস দ্র

ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস ভারতীয় দর্শন-সম্মেলন সংস্থা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাহিরে একমাত্র সিংহলেই একবার অধিবেশন হইয়াছিল (১৯৫৪ খ্রী)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলন এবং ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উপর চৈনিক আক্রমণের জন্য বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয় নাই।

সাধারণ অধিবেশনে সদস্যগণ দর্শনশাস্ত্রের নানা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন; দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের সুযোগ ও ইহার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরাগ কেমন করিয়া বৃদ্ধি করা যায়, এই বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অধিবেশন চারিটি শাখায় বিভক্ত হয়: ১. দর্শনের ইতিহাস, ২. তর্কশাস্ত্র ও অর্থবিদ্যা, ৩. মনোবিদ্যা, ৪. নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন। একজন মূল সভাপতি ও চারি জন শাখা-সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রতি অধিবেশনে দুইটি বিষয়ে বিতর্কের ব্যবস্থা থাকে এবং বিতর্কে যাঁহারা অংশগ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম পূর্বেই নির্বাচিত হয়। সদস্যদের গবেষণাকার্যে উৎসাহ দানের জন্য প্রতি বৎসর বেদান্ত দর্শনের উপর শ্রীমন্ত প্রতাপ শেঠ বক্তৃতা ও বৌদ্ধ দর্শনের উপর বুদ্ধজয়ন্তী বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিণ ভারতের অমলনের-স্থিত ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফি-র প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপ শেঠ মহাশয়ের অর্থসাহায্যে প্রথমোক্ত বক্তৃতা ও সিংহল সরকারের অর্থসাহায্যে দ্বিতীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণাকার্যে উৎসাহ দানের জন্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ও অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে।

কংগ্রেসে পাঁচ শ্রেণীর সদস্য আছেন। এককালীন পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়া পৃষ্ঠপোষক, এককালীন একশত টাকা দিয়া আজীবন সদস্য, বার্ষিক দশ টাকা চাঁদায় সাধারণ সদস্য এবং বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া সহযোগী সদস্য হওয়া যায়। ইহা ছাড়া, কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত পৃথিবীর যে কোনও ফিলসফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্‌স্টিটিউট বিশেষ সদস্য হইতে পারেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী ও দর্শনগ্রন্থের প্রণেতা বা যে কোনও দর্শনানুরাগী ব্যক্তি সদস্য হইবার যোগ্য। পারী-স্থিত 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফি' ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসের সহিত কার্যসূত্রে যুক্ত। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দর্শনসংস্থার অধিবেশনে কংগ্রেস তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফি এবং ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন হয়।

প্রতি তিন বছরের ব্যবধানে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন হইয়া থাকে। একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সচিব, দুই জন যুগ্ম-সচিব (তাহার মধ্যে একজন কোষাধ্যক্ষ), প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং সমিতির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিন জন বিশেষ প্রতিনিধি লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া সমিতির সভাপতি ছিলেন ; ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সভাপতি পদে আছেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির।

কংগ্রেসের নিজস্ব মুখপত্র নাই। দক্ষিণ ভারতের অমলনের-স্থিত ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ফিলসফির মুখপত্র 'ফিলসফিক্যাল কোয়ার্টারলি'-তে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মূল সভাপতির ভাষণ, শাখা-সভাপতির ভাষণ, বিতর্কের উপর আলোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী 'প্রসিডিংস অফ দি ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি প্রতি দশ বৎসরে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করিয়া একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯২৫-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে নির্বাচিত এইরূপ একটি সংকলন-গ্রন্থ 'রিসেণ্ট ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬৩ খ্রী)।

কংগ্রেসের বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ২৫০। ইওরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনে যোগদান করেন।

অমিয়কুমার মজুমদার

ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের বৃহত্তম উদ্ভিদ-উদ্যান। গঙ্গার পশ্চিম তীরে শিবপুরে অবস্থিত।

মগ এবং পরবর্তী কালের পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার প্রতিরোধকল্পে বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ পঞ্চদশ শতাব্দীতে উক্ত স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করান। উহা মাগুয়া-র দুর্গ নামে খ্যাত ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পোতাঙ্গনের অধ্যক্ষ এবং ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক বোর্ডের কর্মসচিব মেজর রবার্ট কিড ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির কমিটি অফ রেভিনিউ -এর নিকট মাগুয়া দুর্গের চৌহদ্দি -স্থিত জমির বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করেন। দুর্গের অন্তর্গত ৩৪ বিঘা জমি তখন কিডকে দখল দেওয়া হয়। পরে বাকি জমির মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে তিনি তাহারও দখল পান। গড়ের পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া পরিখাগুলি ভরাট করিয়া এবং কেল্লার ভিতর অষ্টকোণের অর্ধাংশের উপর একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়া স্থানটিকে উদ্ভিদ-উদ্যানের উপযোগী করা হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কিড গভর্নর-জেনারেলের নিকট একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিকল্পনা পেশ করেন। আবেদনপত্রে তিনি বলেন যে উদ্যানটি তৈয়ারি হইলে ভিন্ন দেশ হইতে আনীত গাছ-গাছড়া এ দেশের জলবায়ুতে বর্ধিত হয় কিনা তাহার পরীক্ষা সম্ভব হইবে এবং নৌবাহিনীর জাহাজাদির জন্য সেগুন কাঠও সরবরাহ হইতে পারিবে। কোম্পানি পরিকল্পনাটি মঞ্জুর করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কিডকেই উদ্যানের অবৈতনিক পরিদর্শক (সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট) নিযুক্ত করেন।

উদ্যান-সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে কিড ইতিপূর্বেই বিদেশ হইতে আনীত গাছ-গাছড়া লাগাইয়াছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্তী পরিদর্শক উইলিয়াম রক্সবার্গ -এর সুপারিশক্রমে সরকার এই জমিটিও ক্রয় করিয়া উদ্যানের শামিল করিয়া লন। উদ্যানের জমি হইতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ্‌স কলেজকে ৬৪ বিঘা, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এগ্রি-হরটিকালচারাল সোসাইটিকে ২ একর এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর ওয়ার্কশপকে কিছু জমি দিয়া দেওয়া

হয়। বিশপ্‌স কলেজের জমি পরে বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধিকারভুক্ত হয়।

উদ্যানটি দীর্ঘকাল 'কোম্পানির বাগান' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় সনদ লাভ করিয়া রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন নামে পরিচিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নাম হয় ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তদানীন্তন বাংলা সরকার এবং স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইহার পরিচালনা করিতেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার ২৭৩ একর-সমন্বিত এই উদ্যানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

রবার্ট কিড স্বয়ং উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী পরিদর্শক বা অধ্যক্ষগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। দ্বিতীয় পরিদর্শক রক্সবার্গ-এর কার্যকালে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয় এবং উদ্যানের গাছ-গাছড়ার তালিকা প্রস্তুত হয়। ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচের আমলে (১৮১৭-৪৬ খ্রী) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তাহার বাহিরেও উদ্ভিদসমীক্ষার অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হার্বেরিয়াম-এর সহিত শুষ্ক চারা বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়। ওয়ালিচের পর উদ্যানের ভার যথাক্রমে হিউ ফকনার (১৮৫৫ খ্রী পর্যন্ত) ও টমাস টমসনের (১৮৬০ খ্রী পর্যন্ত) উপর ন্যস্ত ছিল। টমাস অ্যান্ডারসন (১৮৬১-৭০ খ্রী) হিমালয়ের সিকিম অঞ্চলে সিন্‌কোনার চাষ প্রবর্তন করেন। জর্জ কিং (১৮৭১-৯৭ খ্রী) বাগানের হার্বেরিয়ামটির পুনর্গঠন করেন এবং উদ্ভিদবিদ্যা-সম্পর্কিত একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয় উদ্ভিদসমীক্ষার প্রবর্তন হয়। তিনিই প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রথম ডিরেক্টর। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন কালীপদ বিশ্বাস (১৯৩৭-৫৫ খ্রী)।

শিবপুরের বাগানটি সূচনা হইতেই উদ্ভিদ এবং হর্‌টিকাল্‌চারের গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে চা, সিন্‌কোনা, মেহগনি প্রভৃতির চাষ প্রবর্তনের প্রারম্ভিক কার্য এখানেই হয়। পাটের ব্যাবহারিক প্রয়োগ, ভারতীয় তুলার উৎকর্ষ সাধন, তামাক, কফি, কোকো, ইণ্ডিয়া রবার, ট্যাপিয়োকা, আলু, শণ, ইক্ষু এবং আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়ার চাষ-আবাদ এখানে বা ইহার তত্ত্বাবধানে অন্যত্র শুরু হয়। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদ্যানটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদ্যানটিতে বার হাজারেরও অধিক গাছ-গাছড়া আছে এবং এগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উদ্যানটির গ্রন্থাগার এবং হার্বেরিয়াম বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। হার্বেরিয়াম-এ ২৫ লক্ষেরও বেশি নমুনা এবং গ্রন্থাগারে ৩০ হাজারের অধিক মূল্যবান গ্রন্থাদি সংগৃহীত আছে। হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক চিঠিপত্র, ভারতীয় উদ্ভিদের মূল চিত্র ইত্যাদিও এখানে সুরক্ষিত।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উদ্যানটির পরিপূরক হিসাবে দার্জিলিঙে লয়েড বোটানিক গার্ডেন স্থাপিত হয়। যে সমস্ত গাছ-গাছড়ার পালন শিবপুরের বাগানে সম্ভব নহে সেইগুলি দার্জিলিঙে রাখা হয়। ইহার কর্তৃত্ব পশ্চিম বঙ্গ সরকারের।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ; শিবদাস চৌধুরী, 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনস্', দেশ, ১০ আগস্ট ১৯৬৩ ; যামিনী-মোহন ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনস্' (আলোচনা), দেশ, ২৪ আগস্ট ১৯৬৩।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কলিকাতার চৌরঙ্গীতে অবস্থিত জাদুঘর। এই বিরাট সংগ্রহশালায় ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও চিত্রবিদ্যা -সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক নানা প্রকার সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে এত বৃহৎ এবং এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ মিউজিয়াম আর নাই। ইহার প্রথম সূচনা এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে। তাই প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট ইহা সুসাইট বা সোসাইটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্‌স -এর উদ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়া মহাদেশে মনুষ্যনির্মিত বা প্রকৃতিসৃষ্ট যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের অনুসন্ধান ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সোসাইটির পণ্ডিত-মণ্ডলী ভারতের নানা স্থান পর্যটন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের বস্তু সংগ্রহ করেন। এই সকল সামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করিয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি পার্ক স্ট্রীট -স্থিত নিজ ভবনে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কদেশীয় পণ্ডিত ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ সংগ্রহশালাটির অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। সংগ্রহগুলিকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সজ্জিত করেন। প্রথম বিভাগে প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং দ্বিতীয় বিভাগে প্রাণীতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব -বিষয়ক সামগ্রীসমূহ সজ্জিত হয়। সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধতর করিবার জন্য সোসাইটির সকল কর্মী প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। ফলে শিলালিপি, দেব-দেবীর

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

মূর্তি, পুথি, প্রাচ্যদেশীয় যুদ্ধাস্ত্র, ভারতবর্ষের চারু ও কারু -কলার পরিচায়ক নানা প্রকারের দ্রব্য সংগৃহীত হইতে থাকে। অন্য দিকে ভারতবর্ষের প্রাণীজগতের বিষয়ে চর্চা আরম্ভ হইবার ফলে বিভিন্ন পশু-পক্ষীর কঙ্কাল, ফসিল প্রভৃতি বস্তুরও সংগ্রহ চলিতে থাকে।

তদানীন্তন সরকারের পক্ষ হইতে এইরূপ একটি সংগ্রহশালার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনির কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ব বিষয়ে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত ভূতত্ত্ববিষয়ক বস্তুগুলি এই সংগ্রহশালায় প্রদত্ত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের নিকট একটি সর্বভারতীয় সংগ্রহশালা স্থাপনার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাহা মঞ্জুর করেন। পরস্পরের আলোচনার ফলে স্থির হয়, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত ন্যাসরক্ষক সমিতির হস্তে সংগ্রহশালার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গী রোডস্থ ভবন নির্মিত হইলে কেবল প্রাণী বিভাগ, পক্ষী বিভাগ ও প্রত্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের জন্য নূতন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়।

ইতিমধ্যে বাংলা সরকারের প্রযত্নে আর একটি সংগ্রহ-শালা গড়িয়া ওঠে। এই সংগ্রহের বিষয় ছিল দুইটি: ১. ভূমিজাত দ্রব্যের শিল্প এবং ২. চারু ও কারু-কলা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার তাঁহাদের সমগ্র সংগ্রহ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ন্যাসরক্ষক সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সমিতির সভাপতি হার্বার্ট রিজলে সংগ্রহশালার প্রদর্শন-বস্তুগুলিকে পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত করেন: ১. প্রত্নতত্ত্ব ২. প্রাণীতত্ত্ব ৩. নৃতত্ত্ব ৪. ভূতত্ত্ব এবং ৫. চারুকলা ও শিল্প। ভূমিজাত দ্রব্য হইতে যে সকল শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিশেষ চর্চার উদ্দেশ্যে শিল্পবিভাগটির প্রবর্তন হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া এই পুনর্বিন্যাস সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ভিত্তিতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংশোধিত আইন প্রবর্তিত হইবার ফলে ন্যাসরক্ষক সমিতির গঠনব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল সমিতির সভাপতি। এতদ্ভিন্ন একজন সহকারী সভাপতি, একজন অবৈতনিক সম্পাদক এবং একজন অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় ন্যাসরক্ষকগণ কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

সংগ্রহশালাটির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। যে সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহে ভারত সরকারের বিভিন্ন সমীক্ষা (সার্ভে) বিভাগ গঠিত হয়। প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন নমুনা সংগৃহীত হইলে সেই সেই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। ফলে সংগ্রহশালাটি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে। 'রেকর্ড্‌স অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' ও 'মেমোয়্যার' নামক প্রকাশন দুইটিতে সংগ্রহশালায় পরিচালিত যাবতীয় গবেষণার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

সপ্তাহে শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ১০টা (বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা) হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত সকলেই এখানে বিনামূল্যে প্রবেশ করিতে পারে। শুক্রবার ২৫ পয়সা দর্শনী লাগে।

কলিকাতায় অবস্থিত এই সংগ্রহশালায় ভারত তথা দেশবিদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও জনসাধারণের প্রভূত সমাগম হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর দর্শকের সংখ্যা হয় মোটামুটি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। দেখা যায়, দর্শকগণের মধ্যে প্রায় ১২% জন ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিচালনে দর্শকগণকে কলিকাতার যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো হয়, এই জাদুঘর তাহার অন্যতম।

প্রত্ন বিভাগ— সম্রাট অশোকের অশোকস্তম্ভ স্বাধীন ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্তম্ভের শীর্ষ এই বিভাগে সংরক্ষিত আছে। খ্রীষ্টপূর্ব দুই শত বৎসর পূর্বে ভারতে যে সকল স্থাপত্যের কাজ হইয়াছিল তাহার অতি সুন্দর নিদর্শনস্বরূপ একটি তোরণ ও অন্যান্য প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যাদি এই বিভাগের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীসের সহিত ভারতের সংযোগের ফলে গান্ধার দেশে একটি নূতন ভাস্কর্য শৈলী গড়িয়া ওঠে। এই শৈলীতে নির্মিত নানা প্রকার বুদ্ধমূর্তির সংগ্রহ এই বিভাগের সম্পদস্বরূপ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অপরাপর রীতিতে যে সব মূর্তিনির্মাণ প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচায়ক দ্রব্যাদিও এই বিভাগে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মথুরার ভাস্কর্যরীতিতে নির্মিত মূর্তিগুলি বিশেষ-ভাবে দ্রষ্টব্য। বাংলা ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত আধুনিক নানা মূর্তিও এই বিভাগে প্রদর্শিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত পিপরাওয়া স্তূপ হইতে সংগৃহীত

ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষের আধার ও তন্মধ্যস্থিত অন্যান্য রত্নাদি অপর দর্শনীয় বস্তু। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আরেকটি বিশেষ অংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যাদি। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শীল, তামার অস্ত্রশস্ত্র, পোড়ামাটির পাত্র, মূর্তি, গহনা ইত্যাদি গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। মিশরদেশীয় একটি ম্যমি এই বিভাগে সংরক্ষিত আছে।

চারুকলা ও শিল্প বিভাগ— পারসীক, দাক্ষিণাত্য, রাজস্থানী, পাহাড়ী প্রভৃতি নানা রীতিতে অঙ্কিত পুরাতন চিত্রাদি এই বিভাগের বিশিষ্ট অংশ। এই চিত্রগুলি সাধারণ পুস্তকের চিত্র হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মোগল-যুগের দরবারের চিত্র ও রাজস্থানী শৈলীতে অঙ্কিত রাগ-রাগিণীর চিত্রাবলীও এই অংশের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সঙ্গে, তিব্বতের মন্দিরে যে সকল টাঙ্কা বা চিত্রযুক্ত পতাকার ব্যবহার আছে, তাহাও প্রদর্শিত হয়। বিভাগের অপর অংশে বিভিন্ন অঞ্চলের কারুকলার পরিচায়ক বিভিন্ন দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। তিব্বত, নেপাল এবং দক্ষিণ ভারতের ধাতুনির্মিত মূর্তিগুলি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। মিনা বা বিদরির কাজ, হাতির দাঁতের কাজ বা কাঠের কাজ, কাপড়ের কাজ ইত্যাদির পরিচায়ক বহু দ্রব্য এই বিভাগে রক্ষিত। বেনারসী শাড়ি, পাঞ্জাবের ফুলকারি কাজ, কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের তোরণ বা চাকলা, চিকনের কাজ, কাশ্মীরী শালের কাজ বা বাংলার মসলিন ও জামদানি সবই এখানে দেখিবার সুযোগ আছে।

শিল্পবিভাগ মূলতঃ উদ্ভিদবিদ্যা-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য গঠিত। কিন্তু এই বিভাগের মাধ্যমে উদ্ভিদবিদ্যার একটি দিক মাত্র চর্চা করা হয়। যে সকল ভূমিজ দ্রব্য দেশীয় শিল্পে ব্যবহৃত সেইগুলিই এই বিভাগের বিষয়বস্তু। নানা শ্রেণীর কাঠ, খাদ্যদ্রব্যাদি, ভেষজ উদ্ভিদ-জাত রং বা তৈলবীজ ইত্যাদি কিভাবে ব্যবহৃত বা নির্মিত হয়, নানা সংগ্রহের মধ্য দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রাণীতত্ত্ব বিভাগ— এই বিভাগের ছয়টি উপবিভাগ আছে: ১. মেরুদণ্ডী প্রাণী; ২. অমেরুদণ্ডী প্রাণী; ৩. কীট-পতঙ্গাদি; ৪. মৎস্য এবং সরীসৃপ; ৫. পাখি; ৬. ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রত্যেক উপবিভাগেই প্রাণীজগতের নানা বিবর্তন ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত আছে।

নৃতত্ত্ব বিভাগ— ভারতবর্ষের কয়েকটি স্বল্পপরিচিত জাতির বিশেষ পরিচয় এই বিভাগে দেওয়া হইয়াছে। এক-একটি জাতির বসবাসের পদ্ধতি মডেল দ্বারা রূপায়িত করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ঐ ঐ জাতির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। হায়দরাবাদ বা মাদ্রাজ অঞ্চলে বসবাসকারী চেঞ্চু, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন অঞ্চলের কানিক্কার এবং উরালি, নিকোবর অঞ্চলের বাসিন্দা, আন্দামানের ওঙ্গি প্রভৃতি এই বিভাগে স্থান পাইয়াছে। মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত এবং উপহৃত নানা বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ এই বিভাগের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

ভূতত্ত্ব বিভাগ— মিউজিয়ামের এই বৃহৎ বিভাগটিকে মোটামুটি তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়: ১. উল্কা বা তদ্বিষয়ক বিভাগ; ২. ধাতব এবং প্রস্তর বিভাগ; ৩. ফসিল বিভাগ। উল্কা বিভাগে পাঁচ শতাধিক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত আছে; পৃথিবীতে এই রূপ উল্কাপিণ্ডের সংগ্রহ দুর্লভ। এই সঙ্গে আছে বহু ধাতব ও প্রস্তর দ্রব্যাদি। লৌহ অভ্র কয়লা পেট্রল প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যগুলির উৎপত্তি কিভাবে হয় এবং কিভাবে সেগুলি শিল্পজগতে ব্যবহৃত হয় তাহা মিউজিয়ামের এই অংশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। চুনি, পান্না প্রভৃতি যে সকল মূল্যবান প্রস্তর ভারত বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়, তাহা এই বিভাগের দর্শনীয় বস্তু। ফসিল বিভাগটি বিশেষজ্ঞদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের স্থান। প্রাচীন কালের বিভিন্ন প্রাণী বা গাছপালার অস্তিত্ব নানা সংগৃহীত প্রস্তরের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে যে সকল প্রাণীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। বর্তমানে পরিদৃশ্যমান কুমির, কচ্ছপ, গণ্ডার প্রভৃতির আদি রূপ কি ছিল তাহা এই বিভাগে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; *Commemoration Volume of the Indian Museum 1814-1914*, Calcutta, 1914.

বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

ইণ্ডিয়ান লীগ উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্রধানতঃ শিশিরকুমার ঘোষের প্রবর্তনায় ইহা কলিকাতায় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা -মুক্ত সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইণ্ডিয়ান লীগ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নামের আদিতে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটির তাৎপর্য এই যে, শুধুই ব্রিটিশ-ভারত নহে— ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্য লইয়া যে সমগ্র ভারতভূমি, তাহার সমুদায় অধিবাসীর কল্যাণ

সাধন ইহার ব্রত। লীগের উদ্দেশ্য ('সাধারণী' ১৫ আগস্ট ১৮৭৫ খ্রী দ্র) ছিল এইরূপ : ১. সর্ব সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা— বিশেষতঃ একজাতিত্ববোধের উন্মেষ সাধন ; ২. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত উপায় নির্ধারণ ; ৩. দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন। দুইটি বিষয়ে ইণ্ডিয়ান লীগ কৃতকার্য হয় : ১. কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন ; অনেকাংশে লীগেরই আন্দোলনের ফলে সরকার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন -কল্পে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন ; ২ উক্ত বৎসরেই একটি শিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ; ইহার নাম দেওয়া হয় 'অ্যালবার্ট টেম্প্ল্ অফ সায়েন্স'। বিদ্যালয়টি কিছুকাল সরকারি অর্থসাহায্যও লাভ করে। ইহার প্রয়োজনে একটি সাধারণ অর্থভাণ্ডারও গঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি শুধুমাত্র চিত্রকলা শিক্ষাদানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম 'দি ইণ্ডিয়ান লীগ অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট টেম্প্ল্ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড স্কুল অফ আর্টস'। ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোডে ইহা অবস্থিত।

৩৮ জন সদস্য লইয়া লীগের যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়, শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন ঘোষ ও মনোমোহন বসু প্রভৃতি তাহার সদস্য ছিলেন। প্রথমে সভাপতি ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদে বৃত হন (জানুয়ারি, ১৮৭৬ খ্রী)।

মতান্তরের ফলে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান লীগ হইতে পদত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম প্রায় অভিন্ন ছিল। ক্রমে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং লীগের অধিকাংশ নেতা ইহাতে যোগদান করেন। লীগ অল্পকাল পরে উঠিয়া যায়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৬, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ; J. C. Bagal, *History of the Indian Association, 1876-1951*, Calcutta, 1953.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলন সংস্থা। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের গৃহে তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪ দিলখুসা স্ট্রীটে ইহার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ শুরু হয়। মধ্যে কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার কার্যালয় ছিল।

এই সংস্থার জন্মলগ্নে ভারতীয়-বিজ্ঞানে উৎসাহী দুই জন দূরদর্শী ব্রিটিশ রাসায়নিকের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। অধ্যাপক জে. এল সাইমনসেন এবং অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমেহন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন কৃতবিদ্য সতর জন বিজ্ঞানীর কাছে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তার অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়া বিজ্ঞাপক পত্র পাঠান। ইহার ফলে সর্বসম্মতিক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিজ্ঞান-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার সভাপতি।

এই সংস্থার কৃত্য ও উদ্দেশ্য এই রূপ: ১. ভারতে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ; ২. ভারতের বিভিন্ন নির্বাচিত স্থানে বিজ্ঞানীদের সম্মেলন ; ৩ সম্মেলনের ধারাবাহিক বিবরণী ও বিজ্ঞানবিষয়ক সন্দর্ভ প্রকাশন।

বিজ্ঞানে আগ্রহশীল যে কোনও ব্যক্তি বা সংঘের জন্য সংস্থার সভ্যপদ উন্মুক্ত। অধিকার-ভেদে সভ্যরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর সভ্য অন্ততঃ এক বৎসর যাবৎ সভ্য থাকিবার পর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইবার বা অপর কোনও সভ্যকে নির্বাচিত করিবার ভোটাধিকার পান। অপর শ্রেণীর সভ্য সাময়িক (সেশনাল), নির্বাচনে ভোটাধিকারী নহেন। প্রথম শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যে কেহ এক সঙ্গে কয়েক বৎসরের চাঁদা দিলে 'আজীবন সভ্য' হইতে পারেন।

ভোটাধিকারী সভ্যরা প্রতি বৎসর নির্বাচন দ্বারা নির্বাহক সমিতি গঠন করেন এবং সমিতির সভ্যরা তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, দুই জন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া সংস্থার সকল কার্য সম্পাদন করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কার্য সম্পাদনের জন্যও বিভিন্ন শাখা-সভাপতি ও অনুলেখক নির্বাচন করা হয়।

বার্ষিক বিজ্ঞান-সম্মেলনের অধিবেশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হইবে, এমন রীতি নির্দিষ্ট আছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিজ্ঞান-সম্মেলন আহ্বান করায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা এই রূপ সম্মেলন আহ্বানের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। কার্যনির্বাহক সমিতি তদনুসারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া পর্যায়ক্রমে অধিবেশনের স্থান নির্বাচন করেন। বার্ষিক-সম্মেলনের বিস্তারিত সূচী ও বিবরণী, বিভিন্ন শাখার সভা-

পণ্ডিতের প্রদত্ত মূল্যবান ভাষণ, সমাগত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতালিপি, বিভিন্ন শাখায় পঠিত গবেষণা-প্রবন্ধ ইত্যাদি কয়েক খণ্ড পুস্তকাকারে সকল শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সকল শ্রেণীর সভ্যের জন্যই বার্ষিক সম্মেলনে যাতায়াত ও সম্মেলন-প্রাঙ্গণে বসবাসের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সম্মেলনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইহার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যথা— গণিত, পদার্থবিদ্যা, সংখ্যাবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষানীতি, শিল্পবিজ্ঞান ও ধাতুতত্ত্ব। আজ এই সকল বিজ্ঞান শাখার স্ব স্ব সংস্থাও (সায়েন্টিফিক সোসাইটিজ) গঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করায় প্রায় সকল শাখা-বিজ্ঞান সংস্থার স্ব স্ব মন্ত্রণা সভা, বার্ষিক সভা ও বক্তৃতা বিজ্ঞান-সম্মেলন-প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, সকল শাখা-বিজ্ঞানের অনুরাগী ও কৃতী লোকের সমাগমে সম্মেলন-প্রাঙ্গণ একটি বিরাট মিলনতীর্থে পরিণত হয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষেই সর্বপ্রথম প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। লর্ড রাদারফোর্ড সেই বৎসর সম্মেলনের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে স্যর জেম্‌স জীন্‌স সভাপতিত্ব করেন। ইঁহারা দুই জনেই তৎকালীন বিজ্ঞান-দিগন্তের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। ঐ বৎসরে ইঁহারা ছাড়া আরও ৭৪ জন বিদেশী বৈজ্ঞানিক আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশী বিজ্ঞানীদের নিমন্ত্রণ করা ইহার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্টের পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আবার এই সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের নিমন্ত্রণ করা হইতেছে।

বিজ্ঞানে অনুরাগী ও কৃতীদের আলোচনা ছাড়াও বিজ্ঞান-সম্মেলনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের, তথ্যের ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার ও প্রসার। এই উদ্দেশ্যসম্পাদনে বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় এবং সমাগত বিশিষ্ট স্বদেশবাসী ও বিদেশবাসী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল সভায় ভাষণ দেন।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কলিকাতা-প্রবাসী ইওরোপীয় শিল্পানুরাগীবৃন্দ এবং দেশীয় শিল্পী ও শিল্পরসিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে ইহার স্থাপনা। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টায় ভারতীয় শিল্পকলার যে নব উদ্বোধন ঘটে, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' তাহাকেই একটি প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিয়াছিল।

এই সোসাইটির চেষ্টায় দীর্ঘ কাল ধরিয়া অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর শিল্পীদিগের নিয়মিত চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হয় এবং বিদেশ হইতে বহু যত্নে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের মূলানুগ প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া তাহার প্রচার করা হয়। এই সকল আয়োজন নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা-লাভে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ কর, বীরেশ্বর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি পরবর্তী কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু শিল্পী এই সোসাইটির সহিত বিভিন্ন পর্বে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তো প্রথমাবধিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে ই. বি. হ্যাভেল প্রমুখ বিদেশী শিল্প-রসিকদের কথাও স্মরণীয়। লর্ড কিচেনার ছিলেন সোসাইটির প্রথম সভাপতি; অবনীন্দ্রনাথ ও নর্ম্যান ব্লান্ট প্রথম যুগ্ম-সচিব। পরে জাস্টিস উড্রফ, লর্ড কারমাইকেল প্রভৃতিও সভাপতিপদে বৃত হন। জেম্‌স কাজিন্‌স -এর উদ্যোগে এই সোসাইটির প্রদর্শনীস্থ চিত্রাবলী মাদ্রাজেও প্রদর্শিত হয়; চিত্রপ্রদর্শনীর নিয়মিত ব্যাখ্যান দ্বারাও তিনি ইহার প্রচার করেন। লর্ড রোনাল্ডসে (পরে জেটল্যাণ্ড) যখন বাংলা দেশের রাজ্যপাল ছিলেন তখন তাঁহার আনুকূল্যে সোসাইটির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

কলিকাতায় সোসাইটির বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী এক সময়ে শিল্পরসিকদের তীর্থস্বরূপ ছিল। সোসাইটি বহুকাল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও পরিচালন করেন। নন্দলাল বসু ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন, উড়িষ্যার গিরিধারী মহাপাত্র ছিলেন মূর্তিকলার শিক্ষক।

সোসাইটি কেবল আধুনিক ভারতশিল্পের প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সোসাইটি হইতে 'রূপম্' নামে যে ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহাতে প্রাচ্য কলা সম্বন্ধে প্রামাণিক বহু

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট

প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়ায় ইহা প্রাচ্যশিল্পচর্চাকারীর অবশ্য-পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্টেলা ক্রাম্‌রিশের সম্পাদনায় সোসাইটি যে জার্নাল প্রকাশ করেন তাহাও পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হয়। এই দ্বিতীয় পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

সোসাইটির কর্মোদ্যোগ প্রধানতঃ চিত্রকলার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ, অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর শিল্পধারার প্রসারে, সীমাবদ্ধ থাকিলেও শিল্পকলার অন্যান্য ক্ষেত্র ও অন্যান্য শিল্প-ধারার প্রতিও ইহার ঔদাসীন্য ছিল না। সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানেই উদয়শংকর প্রথম রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যামিনী রায় তাঁহার পূর্বাচরিত শিল্পরীতি পরিত্যাগপূর্বক যখন নূতন শিল্পধারায় চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হন, তখন সোসাইটিতেই তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী হয়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার প্রদর্শনীও এইখানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে জাপানের রঙিন কাঠখোদাই চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে কলিকাতার শিল্প-রসিকগণ উক্ত বহুখ্যাত শিল্পধারার রসগ্রহণের প্রথম সুযোগ পান।

প্রথম প্রতিষ্ঠার পর পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ, বাংলা দেশের শিক্ষিতসমাজের, শিল্পদৃষ্টি উদ্বোধনে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছে। আধুনিক ভারতশিল্পের প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, কলিকাতা, ১৯৪১ ; O. C. Gangoly, 'Indian Society of Oriental Art : Its Early Days', *The Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Golden Jubilee Number, November, 1961 ; James H. Cousins, *We Two Together*, Madras, 1950 ; The Marquess of Zetland, *Essayez*, 1956.

পুলিনবিহারী সেন

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট সংক্ষেপে আই. এস. আই.। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে পরিসংখ্যান ও তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞান-চর্চার বৃহত্তম সংস্থা। ১৯৫৯ সালের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাক্টে আই এস আই 'জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান' রূপে অভিহিত হইয়াছে। পরি-সংখ্যান, জাতীয় পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রসার, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের উদ্দেশ্য। জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনে তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা-প্রকল্প পরিচালনাও ইহার কর্মসূচীর অন্তঃপাতী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও স্ত্রী-পুরুষ -নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। বর্তমানে ইন্‌স্টিটিউটের সদস্যসংখ্যা সাড়ে পাঁচ শতেরও বেশি। কর্মীসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ২০৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৩৫। বাঙ্গালুর, বোম্বাই, দিল্লী, গিরিডি, মাদ্রাজ, পুণা ও ত্রিবান্দ্রমে ইন্‌স্টিটিউটের শাখা আছে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে পরীক্ষা ব্যবস্থা-সম্পর্কিত অনুসন্ধান-কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পরিসংখ্যানের সাহায্যে পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন। পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত সমস্যা লইয়া অধ্যাপক মহলানবিশের কাজের ইহাই সূত্রপাত। বলা হইয়া থাকে, তাঁহার এই কাজ হইতেই পরবর্তী কালের স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ল্যাবরেটরি তথা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের সূচনা।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার তদানীন্তন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একদল তরুণ গবেষণাকর্মী লইয়া স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ল্যাবরেটরি নামে একটি ক্ষুদ্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারের একাংশে ইহার কাজ আরম্ভ হয়। ইহাই পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট রূপে পরিণতি লাভ করে। ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ উক্ত সংস্থাকে ৩ বৎসরের জন্য বার্ষিক ২৫০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করে। ১৯৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নিখিলরঞ্জন সেন ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহূত ও শিল্পপতি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম সভাপতি ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইন্‌স্টিটিউট রেজিস্ট্রিকৃত হয়।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার বোর্ড অফ ইকনমিক এনকোয়ারি গঠন করেন। ইন্‌স্টিটিউট এই সংস্থার কার্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এই সময়ে কৃষিঋণ ও তাঁতশিল্প সম্পর্কে আই এস আই. সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করে। পাট উৎপাদনের পরিমাণ

নির্ধারণ ও জমির ফলন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ইন্‌স্টিটিউট বাংলা সরকারের সহযোগিতায় পাঁচ বছরের কার্যক্রম লইয়া ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নমুনা-সমীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই তদন্তকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত হয় ইন্‌স্টিটিউটের উপর। ১৯৪৩ সালে ধান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ঐ সমীক্ষাকার্য প্রসারিত হয়। একই বছরে বিহার সরকারের অনুরোধক্রমে উক্ত প্রদেশের ফসলের সমীক্ষা গ্রহণের কাজ ইন্‌স্টিটিউট গ্রহণ করে। এতদ্ভিন্ন, পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তদন্ত ও ১৯৪১ সালের আদমশুমারের তথ্যাবলীর নমুনা-ভিত্তিক বিশ্লেষণের কাজেও ইন্‌স্টিটিউট হাত দেয়। ১৯৪৪ সালে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে আই এস. আই. মন্বন্তরের ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ করে। ক্রমশঃই নমুনা-সমীক্ষার বিষয়বস্তু সম্প্রসারিত হইতে থাকে। সড়ক উন্নয়ন, খেত-মজুরদের অবস্থা, মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব, দিল্লীর বাস্তুহারাদের অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা গৃহীত হয়।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভারত সরকারের অবৈতনিক পরিসংখ্যান-উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। সেণ্ট্রাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠার (১৯৫১ খ্রী) পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরি-সংখ্যান সংস্থার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহুলাংশে ইন্‌স্টিটিউটের উপর ন্যস্ত ছিল। চিন্তামন দেশমুখ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহরু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে নমুনা-সমীক্ষা পরিচালিত হওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে, ১৯৫০ সালে 'ন্যাশন্যাল সাম্প্‌ল সার্ভে' নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমীক্ষার পদ্ধতি, প্রশ্নাবলী রচনা ও ফলাফল বিশ্লেষণের দায়িত্ব ইন্‌স্টিটিউটের উপর অর্পিত হয়। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৫০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইন্‌স্টিটিউট ৭৫টি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে ; আরও ১৫টি রিপোর্টের মুদ্রণ আসন্নপ্রায়। তন্মধ্যে পারিবারিক ভোগব্যয়, কর্মসংস্থান ও বেকার সমস্যা, ভূমির আয়তন ও ফসল কাটা-সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সারা ভারত হইতে সরকারি কর্মচারীগণ পরিসংখ্যান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইন্‌স্টিটিউটে আসিতেন। ১৯৩৯ সাল হইতে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। তারপর হইতে ইন্‌স্টিটিউটের ট্রেনিং ক্লাসগুলি রীতিমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রধানতঃ ইন্‌স্টিটিউটের কর্মীদের উদ্যোগে ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান-বিভাগ খোলা হয়। প্রথম পাঁচ বৎসর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটি অবস্থিত ছিল এবং শিক্ষাদানের কাজে ইন্‌স্টিটিউটের কর্মীগণও অংশগ্রহণ করিতেন। ১৯৪৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিসংখ্যানে বি. এস্‌সি অনার্স কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। সেখানেও যাঁহারা শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহারা ইন্‌স্টিটিউটের হয় সর্বক্ষণের অথবা আংশিক সময়ের কর্মী ছিলেন। আই. এস আই-এর রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকার বার্ষিক সাড়ে চার লক্ষ টাকার পৌনঃপুনিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট অ্যাক্টের ফলে পরিসংখ্যান বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রিদানের অধিকার ইন্‌স্টিটিউট লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ আই. এস আই. অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। উক্ত আইনে যে সকল পাঠ্যক্রম ও ডিগ্রি প্রবর্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে ৪ বছরের বি স্ট্যাট ও ২ বছরের এম. স্ট্যাট. ডিগ্রির পঠন-পাঠন এবং পিএইচ ডি. ও ডি. এস্‌সি পর্যায়ের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন পরিসংখ্যান, কম্পিউটেশন প্রভৃতি বিষয়ে ১১টি ট্রেনিং কোর্সের এবং ৬টি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও চালু আছে। প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিসংখ্যান-পদ্ধতির প্রয়োগ রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের বৈশিষ্ট্য। গাণিতিক পরিসংখ্যানে উচ্চতর গবেষণার জন্য খ্যাত এই বিভাগে বাইয়মেট্রি, অ্যানথ্রোপমেট্রি, সাইকোমেট্রি প্রভৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণাও চলিতেছে। রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪২০০ জন শিক্ষার্থীকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৩০০০ জন শিক্ষানবিশ এখানে কাজ শিখিয়াছেন।

ইউনেস্কো ও ইণ্টারন্যাশন্যাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টি-টিউটের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৫০ সালে ইন্‌স্টিটিউট ভবনে ইণ্টারন্যাশন্যাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল এডুকেশন সেণ্টার নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। ১৯৫০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়ার ২২টি দেশের ৪২৯ জন ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে ইন্‌স্টিটিউটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু আই. এস. আই.-এর জাতীয় পরিকল্পনা-সংক্রান্ত গবেষণাকে স্ত্র

উদ্বোধন করেন। সেণ্ট্রাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অর্গানাইজেশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্ল্যানিং কমিশন ও ইন্‌স্টিটিউটের সমবেত সহযোগিতায় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহিলানবিশ দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া কাঠামো প্রণয়ন করেন। ইন্‌স্টিটিউটের প্ল্যানিং ডিভিসনের দিল্লী শাখা, প্ল্যানিং কমিশন ও কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সহিত একযোগে পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কাজ করিতেছে। প্ল্যানিং ডিভিসনের কলিকাতা শাখা জাতীয় আয়, আর্থিক উন্নতি, গাণিতিক অর্থনীতি, ইকনমেট্রিক্স এবং পরিকল্পনাবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণারত। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কেও এখানে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের কাজ চলিতেছে।

আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ছোট বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে নির্মিত একটি কম্পিউটার যন্ত্র ইন্‌স্টিটিউটে বসানো হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'উরাল' নামক একটি বড় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার প্রেরণ করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ইন্‌স্টিটিউট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ডিজাইনের ও নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটেশন বিভাগ ইন্‌স্টিটিউটের নিজের কাজ ছাড়া ভারতের বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজও করিয়া থাকে। যন্ত্রপাতির মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ইন্‌স্টিটিউটে একটি কারখানা আছে। এখানে পাঞ্চ্‌ড কার্ড সর্টার যন্ত্র নির্মিত হইতেছে। সম্প্রতি আই. এস. আই. ক্যালকুলেটিং যন্ত্র নির্মাণের লাইসেন্স পাইয়াছে।

স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোল অর্থাৎ পণ্যমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যাপারে আই. এস. আই. দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন করিতেছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোল বিষয়ে ইন্‌স্টিটিউট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। বোম্বাই, বাঙ্গালুর, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ইন্‌স্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এতদ্বিষয়ে শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

ইন্‌স্টিটিউটের বৃহৎ ও সুসংগঠিত গ্রন্থাগারটি উহার অন্যতম আকর্ষণ। উক্ত গ্রন্থাগারে প্রায় এক লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে প্রায় ২৩০০ পত্র-পত্রিকা ও রিপোর্ট গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে আসে। বিদেশী ভাষায় রচিত মূল্যবান নিবন্ধাদির অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রন্থাগারটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে পরিসংখ্যানবিষয়ক পত্রিকা 'সংখ্যা' প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম হইতেই ইহা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বহু প্রসিদ্ধ বিদেশী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের আমন্ত্রণে এখানে আসিয়া কাজ করিয়াছেন। ইহাদের আগমন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শুরু হয়, তবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পরিকল্পনা -সংক্রান্ত কাজ আরম্ভ হওয়ার পর, স্বভাবতঃই আরও বেশি সংখ্যক বিদেশী বিশেষজ্ঞ এখানে পদার্পণ করিতেছেন। যে সকল মনীষী ইন্‌স্টিটিউটের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রোনাল্‌ড ফিশার, এইচ হটেলিং, ডব্‌লু এ শিউহার্ট, হারমান হোল্‌ড, এ ওয়াল্‌ড, উইলিয়াম হারউইট্‌স, জে বি. এস হলডেন, ফ্র্যাঙ্ক য়েট্‌স, আর্থার লিণ্ডার, টি. কিটাগাওয়া, এইচ. থাইল, রিচার্ড গুড্‌উইন, রাগনার ফ্রিশ, এম আই. রুবিন্‌স্টাইন, অস্কার লাঙ্গে, নর্বার্ট হ্বীনার, জে. টিন্‌বার্গেন, জে. কে. গ্যাল্‌ব্রেথ, নিকোলাস ক্যাল্‌ডর, পল ব্যারান, রবার্ট হল, মরিস হ্যান্‌সেন, জে. এস. নেম্যান, এ. এফ জেলিনভ্‌স্কি, আবদুস সালাম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট যে পরিসংখ্যান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান -চর্চার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে শুরু করিয়া ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট যে বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হইয়াছে, তাহার মূলে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রেরণা ও উদ্যোগ সর্বাগ্রগণ্য। এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিন্তামন দেশমুখ, শুভেন্দুশেখর বসু, রাজচন্দ্র বসু, সমর রায় এবং সি. আর. রাও -এর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। 'পরিসংখ্যান' দ্র।

দ্র *Indian Statistical Institute : History and Activities 1931-1957*, Calcutta, 1958. *The Indian Statistical Institute*, Annual Reports.

ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণার ভারত-ইতিহাস-সংশোধকমণ্ডলের রজত-জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গস্বরূপ আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের (দি মডার্ন ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস) প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য সম্মেলনে (অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স) কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচিত হইত। সুতরাং ভারতের মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস আলোচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর

সফায়ৎ আহ্‌মদ খাঁ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ জুন— পুণায় এই অধিবেশন হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৫০ জন ঐতিহাসিক ইহাতে যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে প্রায় ৩৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার অধিকাংশই ভারতের মধ্য ও আধুনিক যুগ সম্বন্ধে, তবে কয়েকটিতে প্রাচীন যুগ সম্বন্ধেও আলোচনা ছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের (ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ড্‌স কমিশন) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস-শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনার জন্য একটি সমিতি স্থাপন এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দলিল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই কংগ্রেস যাহাতে স্থায়ীভাবে গঠিত হয়, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইহাও স্থির হয় যে, কংগ্রেসের নাম হইতে 'আধুনিক' শব্দটি বাদ দেওয়া হইবে এবং অতঃপর ভারতবর্ষের সর্ব যুগেরই ইতিহাস আলোচনা এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইবে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এলাহাবাদে 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস' এই নূতন নামে উক্ত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহার মূল সভাপতি ছিলেন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার। আলোচনার সুবিধার জন্য আটটি শাখা-অধিবেশনের প্রতিষ্ঠা হয়: ১. প্রাচীন ভারত, ২. প্রত্নতত্ত্ব, ৩. প্রথম মধ্যযুগ, ৪. সুলতানী আমল, ৫ মোগল যুগ, ৬. আধুনিক যুগ, ৭. শিখ জাতির ইতিহাস, ৮. মারাঠা জাতির ইতিহাস। এই অধিবেশনে মোট ১৭৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। ৯৪টি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং কংগ্রেসের একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। এই গঠনতন্ত্র অনুসারে ইতিহাস কংগ্রেস একটি স্থায়ী সংগঠনে পরিণত হয় এবং প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তে কংগ্রেস পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। স্থির হয় যে, ভারতের ইতিহাসের অনুরাগী যে কোনও ব্যক্তি বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে ইহার সদস্য হইতে পারিবেন। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস -চর্চা ও -গবেষণার সাহায্য ও উন্নতিবিধান— ইহাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয়। সর্বাঙ্গীণ পরিচয় -সংবলিত একখানি ভারত-ইতিহাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচনা করা সম্ভব কিনা, তাহা নির্ধারণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ইহার মূল সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল ১৮৫ এবং পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৪৪। শাখা-অধিবেশন হইয়াছিল পাঁচটি। এই অধিবেশনে গঠনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন হয় এবং পূর্বোল্লিখিত সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনার আয়-ব্যয় আলোচনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে চতুর্থ অধিবেশন হয়। মূল সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার। শাখা-অধিবেশনের সংখ্যা ছিল ৬ ; প্রতিনিধিসংখ্যা ২৬২ ; পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৯৭। এই অধিবেশনে সর্বাঙ্গীণ ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে একখানি ভারত-ইতিহাস রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎকালীন ও প্রাক্তন সভাপতিদের লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দরাবাদে পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যে নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয়, মোটামুটি তাহাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সি. এস. শ্রীনিবাসাচারী। ইহার ছয়টি শাখা-অধিবেশনে ১৪৭টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সদস্যসংখ্যা ছিল ২৭৭।

অতঃপর প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কেবল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলন ও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আক্রমণের জন্য ঐ দুই বৎসর অধিবেশন স্থগিত ছিল। পরবর্তী অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫০৯ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইল।

ইতিহাস কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব আলোচিত হয়। যেমন, একটি ইতিহাস-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, ইতিহাসের গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, বিভিন্ন স্থানে আরব্ধ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোনটিই কার্যে পরিণত হয় নাই।

ভারতের একখানি সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনার প্রস্তাব কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩৮ খ্রী) উত্থাপিত হয়। তারপর প্রায় প্রতি অধিবেশনেই এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয়, কিন্তু এই কার্য বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। পরিকল্পিত ১২ খণ্ডের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড ('কম্‌প্রিহেন্সিভ হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া', ভল্যুম টু) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তদশ অধিবেশনে ইতিহাস কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সদস্যদের চাঁদা বার্ষিক ১৫ টাকা ধার্য হয় এবং শাখা-অধিবেশনের সংখ্যা কমাইয়া তিনটি করা হয়: প্রাচীন ভারত (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত), মধ্যযুগ (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ও আধুনিক যুগ। তবে কার্যনির্বাহক সমিতি ইচ্ছা করিলে বিশেষ কোনও বিষয়ে

ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯৪৩-১৯৬১

অধিবেশনের ক্রমিক সংখ্যা	খ্রীষ্টাব্দ	স্থান	মূল সভাপতি	শাখার সংখ্যা	সদস্য	পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা
ষষ্ঠ	১৯৪৩	আলীগড়	কাশীনাথ দীক্ষিত	৫	২০৬	৯৫
সপ্তম	১৯৪৪	মাদ্রাজ	সুরেন্দ্রনাথ সেন	৫	৭৮	২০৯
অষ্টম	১৯৪৫	অন্নামলৈ নগর	তারাচাঁদ	৬	৮৯	২২০
নবম	১৯৪৬	পাটনা	নীলকান্ত শাস্ত্রী	৫	৫৩	১৭০
দশম	১৯৪৭	বোম্বাই	মহম্মদ হবিব	৬	৭৪	২০৮
একাদশ	১৯৪৮	দিল্লী	দত্তবামন পোতদার	৫	৩৪	২৩৭
দ্বাদশ	১৯৪৯	কটক	রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী	৬	৪৭	২৮৭
ত্রয়োদশ	১৯৫০	নাগপুর	হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী	৫	৫১	২৭৪
চতুর্দশ	১৯৫১	জয়পুর	গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই	৬	৬৬	৩২০
পঞ্চদশ	১৯৫২	গোয়ালিয়র	রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়	৪	৬৬	৩৫১
ষোড়শ	১৯৫৩	ওয়ালটেয়ার	পাণ্ডুরং বামন কানে	৬	৯৯	—
সপ্তদশ	১৯৫৪	আমেদাবাদ	নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী	৫	১১৩	৩৭৬
অষ্টাদশ	১৯৫৫	কলিকাতা	কবলম মাধব পানিক্কর	৫	৬৭	৩৪৩
উনবিংশ	১৯৫৬	আগ্রা	নরেন্দ্রনাথ লাহা	৪	৭২	৩০৩
বিংশ	১৯৫৭	আনন্দ	কহ্নাইয়ালাল মুন্সী	৩	৫১	৩০৩
একবিংশ	১৯৫৮	ত্রিবান্দ্রম	কালীকিংকর দত্ত	৪	১০৬	৪৫৪
দ্বাবিংশ	১৯৫৯	গৌহাটি	(নির্বাচিত অনন্ত সদাশিব আলতেকারের মৃত্যুতে দত্তবামন পোতদার তাঁহার স্থানে কার্য করেন)	৪	৭৮	৩৬০
ত্রয়োবিংশ	১৯৬০	আলীগড়	উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	৩	১১৫	৪৭৩
চতুর্বিংশ	১৯৬১	দিল্লী	মহামহোপাধ্যায় মিরাশী	৩	১২৫	৫১৯

বিশেষ শাখার অধিবেশন হইতে পারে। সাধারণতঃ যে রাজ্যে অধিবেশন হয় সেই বৎসর সেই রাজ্য-সম্পর্কিত ইতিহাস আলোচনার জন্য এইরূপ বিশেষ শাখা করা হয়। বর্তমানে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যসংখ্যা ২০। সমিতির সদস্যগণ একাদিক্রমে তিন বৎসরের অধিক কোনও পদ অধিকার করিতে পারেন না।

কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনে শেঠ মোহনলাল দুগার কংগ্রেসকে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। কংগ্রেস স্থির করে যে রাজস্থানে, বিশেষতঃ, জয়পুরের মহাফেজ-খানায় যে সমুদায় দলিলপত্র আছে তাহার মধ্য হইতে নির্বাচিত দলিল প্রকাশ করিবার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবীর সিংহের সম্পাদনায় এই দলিল-সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি (ডিসেম্বর, ১৯৬৩ খ্রী) পুণা শহরে কংগ্রেসের পঞ্চবিংশতি অধিবেশনে ইহার রজত-জয়ন্তী অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন হারুন খাঁ শেরবানী। ইহার বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২ খ্রী) প্রকৃত নাম সুরূপা দেবী। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুরূপা দেবী ইঁহারই অনুজা। বাল্যেই ইন্দিরা দেবীর কবিতা রচনার শক্তি পরিলক্ষিত হয়। পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি সংস্কৃতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন এবং কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে সাময়িক পত্রে রচনাপ্রকাশে উদ্যোগী হন। সুরূপা নাম ব্যবহার না করিয়া 'ইন্দিরা' রাশিনামে তিনি লেখা প্রকাশ করিতেন। 'স্পর্শমণি' উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন; 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি', 'প্রত্যাবর্তন' তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস; 'মাতৃহীন', 'ফুলের তোড়া', 'শেষ দান' ছোট-গল্পের সমষ্টি; 'সৌধরহস্য' কোনান ডয়েলের অনুবাদ। কবিতাসংগ্রহ 'গীতিগাথা' তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০ খ্রী) পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। পিতার কর্মস্থল বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌ঘিতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর জন্ম; শেষ জীবনের নিবাস শান্তিনিকেতনে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট মৃত্যু।

মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথের সহিত ইন্দিরা দেবী শৈশবেই বিলাত যান; কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর বিদেশ-যাপনের পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ফরাসী ভাষা ছিল তাঁহার অন্যতম অধীত বিষয়। পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তিনি পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

কৈশোরেই ইন্দিরা দেবীর সাহিত্যপ্রচেষ্টার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ-পরিচালিত ও জ্ঞানদানন্দিনী-সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ) রাস্কিনের রচনার একটি অংশের তর্জমা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা। অনুবাদকর্মে তাঁহার এই আকৈশোর প্রবণতা উত্তরোত্তর দক্ষতায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। 'সাধনা' পত্রিকায় পিয়ের লোতি-র গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ, 'সবুজপত্রে' ফরাসী গীতাঞ্জলির আঁদ্রে জিদ -কৃত সুবিখ্যাত ভূমিকার অনুবাদ, 'পরিচয়ে' প্রকাশিত রেনে গ্রুসে -লিখিত *L'Inde* -এর বাংলা সংকলন প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ফরাসী হইতে বাংলায় যেমন, বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদেও তিনি তেমনই কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা এবং তাঁহার 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থ তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

সংগীতে তাঁহার সহজ কুশলতা লক্ষিত হয় শৈশবকাল হইতেই। রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম ধারক-বাহক বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গীতচর্চা কেবল রবীন্দ্রসংগীতে বা দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত সংগীতেই আবদ্ধ ছিল না; দেশী ও বিদেশী সংগীত, পিয়ানো বেহালা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসংগীত, সকল ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শিতা অর্জন করিয়া-ছিলেন এবং দীর্ঘ জীবনের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তাহার চর্চা যথাসাধ্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সহিত একযোগে লিখিত 'হিন্দুসংগীত' গ্রন্থে (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) ইন্দিরা দেবীর সংগীতবিষয়ক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সংগীতচর্চায় তাঁহার এই উৎসাহ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক গানের সুর বিলুপ্তির আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অল্প বয়স হইতে তিনি রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় তাঁহার রচিত সংগীতের সুর সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলে ইন্দিরা দেবী ঐকান্তিক শ্রমস্বীকারপূর্বক বহু বিস্মৃতপ্রায় গানের সুর স্বরলিপিবদ্ধ করেন। তাহার মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী ও কালমৃগয়া উল্লেখযোগ্য। মায়ার খেলার স্বরলিপি পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও তিনি রবীন্দ্র-নাথের প্রায় দুই শত গানের স্বরলিপি করিয়াছেন। এই কালে প্রকাশিত অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপিগ্রন্থ তিনি সম্পাদনাও করেন। পূর্বরচিত গানের সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) ইন্দিরা দেবী তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করেন।

তিনি নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকটি 'সুরঙ্গমা পত্রিকা'র বিশেষ সংখ্যায় স্বরলিপিসহ গ্রথিত হইয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও আশুতোষ চৌধুরীর সহধর্মিণী প্রতিভা দেবীকে কলিকাতাস্থ সংগীতসংঘ পরিচালনায় তিনি বিশেষ সাহায্য করেন এবং প্রতিভা দেবীর সহযোগে শ্রাবণ, ১৩২০ হইতে আষাঢ়, ১৩২৮ পর্যন্ত সংগীতসংঘের মুখপত্র 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন। কলিকাতা সংগীতসম্মিলনীর সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী সংগীতভবনের প্র-নেত্রীরূপে ইহার পরিচালনায় তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেন।

শান্তিনিকেতন আলাপিনী মহিলা-সমিতি ও ইহার মুখপত্র 'ঘরোয়া' তাঁহার উৎসাহ ও নির্দেশনায় পরিচালিত হইত। নারীজাতির উন্নতিকল্পে স্থাপিত বেঙ্গল উইমেন্‌স এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স কন্‌ফারেন্‌স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। বঙ্গনারীর মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীর মতামত 'নারীর উক্তি' নামক প্রবন্ধসংগ্রহে (১৯২০ খ্রী) সমাহৃত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ভিন্ন ইন্দিরা দেবী কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনও করেন: 'বাংলার স্ত্রী-আচার' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ); 'পুরাতনী' (১৯৫৭ খ্রী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা ও তাঁহাকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী; 'গীতপঞ্চশতী' (১৯৬০ খ্রী) রবীন্দ্রনাথের পাঁচ শত গানের সংগ্রহ, নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত, সাহিত্য আকাদেমির পক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইতেছে।

পরিমাণ-বিচারে স্বল্প হইলেও তাঁহার রচনার গুণ-বিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে তাঁহাকে ভুবনমোহিনী পদক দানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন (১৯৪৪ খ্রী)। বিশ্বভারতী তাঁহাকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী উপাচার্য-পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশিকোত্তমা পদবী-সম্মানে বরণ করেন। রবীন্দ্রচর্চায় তাঁহার অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাঁহাদের প্রবর্তিত রবীন্দ্র-পুরস্কার সর্বপ্রথম তাঁহাকেই অর্পণ করেন (১৯৫৯ খ্রী)।

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত 'ছিন্নপত্রাবলী', 'কড়ি ও কোমলে' প্রকাশিত ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে লিখিত কবিতাবলী, 'প্রভাতসংগীত'-গ্রন্থোৎসর্গ-কবিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সর্বজনজ্ঞাত স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে; এই স্নেহের যোগের স্মৃতি জীবনের শেষ ভাগে ইন্দিরা দেবী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবী যে উনিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে নানা পথে রবীন্দ্রভাবধারা প্রচারে। বস্তুতঃ এই কালে তিনি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিধারা তথা রবীন্দ্রস্মৃতির প্রতিমা-রূপে দীপ্যমান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ রমণীর যে তিনটি শ্রেষ্ঠ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন সেই শ্রী, হ্রী ও ধী-র অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাঁহার জীবনে; 'নারীর উক্তি'র উৎসর্গপত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া, সেকালের আদর্শস্থানীয়া বঙ্গ-নারীর যে সকল গুণের বর্ণনা আছে: 'স্নেহ যাদের অগাধ, ক্ষমা যাদের অপার, ধৈর্য যাদের অসীম, কর্ম যাদের বন্ধু, ধর্ম যাদের রক্ষক, মন যাদের সরল, বাক্য যাদের মধুর, সেবা যাদের অক্লান্ত, যারা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট': সেই সকল গুণের সহিত একালের সর্বোত্তম শিক্ষার সুফল একত্রে আসিয়া ইন্দিরা দেবীর চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল।

দ্র প্রফুল্লকুমার দাস, 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী', উত্তরসূরী, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৭; মহিলা-মহল, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী শ্রদ্ধা-স্মরণ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬৮; সুরঙ্গমা পত্রিকা, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বিশেষ সংখ্যা; ঘরোয়া, আলাপিনী মহিলা-সমিতি, শান্তিনিকেতন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৯; সুশীল রায়, স্মরণীয়, কলিকাতা, ১৩৬৫; Sudhamoyee Mukhopadhyay, 'Indira Devi Chaudhurani,' *Roshni*, Journal of the All India Women's Conference, September, 1957; 'Indira Devi Chaudhurani : A Short Life-Sketch', *Visvabharati News*, September, 1960; Sunilchandra Sarkar, 'Indira Devi Chaudhurani', *Visvabharati News*, September, 1960.

পুলিনবিহারী সেন

ইন্দুরাজ প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে ইন্দুরাজের স্থান খুব উচ্চে। ইনি কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বিভিন্ন অলংকারগ্রন্থে 'ইন্দুরাজ' নামটির সহিত দুইটি পৃথক বিশেষণ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও স্থলে 'ভট্টেন্দুরাজ' উল্লেখ দৃষ্ট হয়, আবার 'প্রতীহারেন্দুরাজ' উল্লেখও বিরল নহে। উদ্ভট রচিত 'কাব্যালংকার-সারসংগ্রহ' গ্রন্থের উপর প্রতীহারেন্দুরাজ-কৃত 'লঘুবৃত্তি' নাম্নী টীকা সুপ্রসিদ্ধ। ইনি 'অভিধাবৃত্তি-মাতৃকা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা আচার্য ভট্টমুকুলের শিষ্য ছিলেন। 'লঘুবৃত্তি'-টীকার পুষ্পিকাশ্লোকে তিনি মুকুলভট্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। অপর পক্ষে, ভট্টেন্দুরাজ ছিলেন আচার্য অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু। তাঁহার নিকটই অভিনবগুপ্ত ধ্বনিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে ভট্টেন্দুরাজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন'-টীকায় ভট্টেন্দুরাজের একাধিক শ্লোক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। আচার্য কানের মতে ভট্টেন্দুরাজ এবং প্রতীহারেন্দুরাজ উভয়েই অলংকারশাস্ত্রে প্রবীণ এবং সমকালিক আচার্য হইলেও উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। তবে 'অলংকারসর্বস্ব'-ব্যাখ্যাতা সমুদ্রবন্ধ এক স্থলে ভট্টেন্দুরাজকে প্রতীহারেন্দুরাজের সহিত অভিন্ন বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের সাহিত্যজীবনের পরিধি পণ্ডিতগণের মতে ৯৮০-১০২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং ইন্দুরাজের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৯৬০-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

দ্র P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, Bombay, 1951 ; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, vols. I & II, Calcutta, 1960 ; N. D. Banhatti, *Kavyalankara Sarasamgraha*, Bombay Sanskrit Series, Bombay, 1925.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ইন্দো-ইওরোপীয় পৃথিবীতে যে সকল ভাষা এখন বলা হয় অথবা একদা বলা হইত, সেই সকল ভাষার ধ্বনিমালা, ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার আলোচনা করিয়া তাহার অধিকাংশকে কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইরকম একটি ভাষাগোষ্ঠী হইল ইন্দো-ইওরোপীয়। ইওরোপের অধিকাংশ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ এবং ইওরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী এশিয়া ভূখণ্ডের অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দো-ইওরোপীয় গোষ্ঠীর শাখাচিত্র
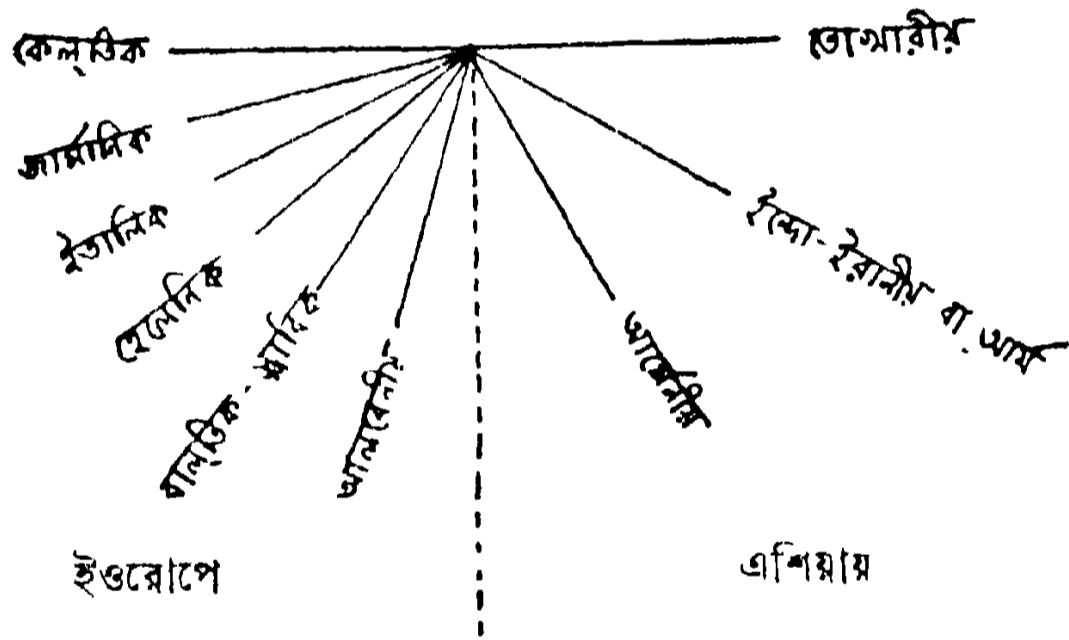
মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শাখাগুলির ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া মূল ভাষার বিশেষত্ব নির্ণীত হইয়াছে। মূল ভাষাটি কোথায় বলা হইত সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মোটামুটি এখন স্বীকৃত হইয়াছে যে, মূল ভাষা যাহারা বলিত তাহাদের যৌথ নিবাস ছিল পূর্ব-দক্ষিণ ইওরোপে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে)। পরে সেখান হইতে কতক দল পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইওরোপে আর কতক দল এশিয়া মাইনরে চলিয়া আসে। ঠিক কখন ও কিভাবে বিভিন্ন দলের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। তবে পরবর্তী কালে কোনও কোনও দলের গতিবিধির হদিশ পাওয়া গিয়াছে।

যে দল পশ্চিম ইওরোপে গিয়া দক্ষিণ অংশের সম্পূর্ণ ও পশ্চিম অংশের অধিকাংশ অধিকার করে তাহাদের ভাষা ছিল কেল্‌তিক। কিন্তু পরে অন্য দল (যেমন ইতালিক ও জার্মানিক) আসিয়া ইহাদের হটাইয়া কোণঠাসা করিয়া দেয়। তাহার ফলে কেল্‌তিক শাখার এখন একটি-মাত্র উল্লেখযোগ্য ভাষা জীবিত আছে— আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা আইরিশ। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইরিশ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

জার্মানিক বা টিউটনিক শাখার বংশবৃদ্ধি খুব বেশি হইয়াছে। এই শাখা প্রথমে তিনটি উপশাখায় বিস্তৃত হয়— পূর্ব জার্মানিক, উত্তর জার্মানিক ও পশ্চিম জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক উপশাখার কোনও ভাষাই এখন জীবিত নাই। কিন্তু এই মৃত উপশাখারই একটি ভাষা গথিক-এ জার্মানিক শাখার ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ। অনুবাদ করিয়াছিলেন পাদরি বুলফিলা (Wulfila) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে। উত্তর জার্মানিক উপশাখা হইতে আধুনিক এই ভাষাগুলি উৎপন্ন— আইস্‌ল্যাণ্ডীয়, দিনেমার, নরওয়ের দুইটি ভাষা (Dano-Norwegian এবং Norwegian Lanesmaal) ও সুইডিশ। পশ্চিম জার্মানিক উপশাখা হইতে উদ্ভূত— ইংরেজী, জার্মান ও ওলন্দাজ।

ইতালিক শাখার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষা লাতিন। আরও দুইটি প্রাচীন ভাষা একদা লাতিনের পূর্বেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল— ওস্‌কান ও উম্‌ব্রিয়ান। লাতিন যে প্রদেশের ভাষা ছিল, সে প্রদেশের প্রধান নগর ছিল রোম। রোমের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ওস্‌কান-উম্‌ব্রিয়ান প্রভৃতি ভাষা বিনষ্ট হইয়া যায়। লাতিন ভাষার নিদর্শন মিলিতেছে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে। লাতিনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত লাতিন ইওরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে বিদ্যাচর্চার প্রধান ভাষা রূপে পরিগণিত ছিল, আমাদের দেশে সংস্কৃতের মত।

রোমান সাম্রাজ্য ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিস্তারের ফলে লাতিন ভাষা ইওরোপের বৃহৎ অংশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা (ইন্দো-ইওরোপীয় অথবা অন্য) লুপ্ত হয় এবং সেখানে লাতিন বিকৃত হইয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি করে। এইভাবে ইতালিক

শাখার লাতিন উপশাখায় এই প্রশাখাগুলি উদ্ভূত— ইটালীয়, ফরাসী, রুমানীয়, স্পেনীয়, কাতালান, পর্তুগীজ ইত্যাদি।

ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাবৃক্ষের অন্যতম প্রধান শাখা ছিল হেলেনিক বা গ্রীক। সাহিত্যসম্পদে গ্রীক ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয়। ইওরোপীয় সংস্কৃতিতে গ্রীসের দান তো সর্বাধিক। কিন্তু এ শাখার মোটেই পুষ্টি হয় নাই। গ্রীক শাখার একমাত্র জীবিত ভাষা আধুনিক গ্রীক।

হোমারের ইলিয়দ ও ওদিসি মহাকাব্য দুইটি লইয়া গ্রীক সাহিত্যের সূত্রপাত (খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী)। সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির পাঠোদ্ধার হওয়ার ফলে গ্রীক ভাষার নিদর্শন ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে মিলিতেছে। ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের গ্রীক ভাষা সংস্কৃতের খুব নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

বাল্তিক-স্লাবিক শাখাকে কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিক একদা দুইটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে গণনা করিতে চাহিয়াছিলেন। বাল্তিক ও স্লাবিক উপশাখা দুইটির মধ্যে ভেদ একটু বেশি রকম। বাল্তিক উপশাখার প্রশাখা-ভাষা হইল লিথুয়ানীয়, লেটিশ (লাটভিয়ার ভাষা) ও প্রাচীন প্রুশীয়। শেষের ভাষাটি এখন বিলুপ্ত। লিথুয়ানিয়ার ভাষা আধুনিক ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনরূপিণী। বাল্তিক উপশাখার দক্ষিণে প্রচলিত স্লাবিক উপশাখার প্রশাখা-ভাষাগুলি এখন বেশ বলিষ্ঠ: পোলিশ, চেক, স্লোবাক, রুশীয়, বুলগারীয় ইত্যাদি। এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে প্রাচীন বুলগারীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদে (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী)।

আলবেনীয় শাখা নগণ্য বলিলেই হয়। আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব তীরে স্বল্পসংখ্যক (প্রায় পনর লক্ষ) লোকের ইহা মাতৃভাষা। এ শাখার নিদর্শন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই মিলিতেছে।

আর্মেনীয় শাখার আধুনিক প্রতিনিধি আধুনিক আর্মেনীয়। এ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর। ইন্দো-ইওরোপীয় সকল শাখার মধ্যে আর্মেনীয় ভাষায় বিকৃতি হইয়াছে সর্বাধিক। আগে তাহার কারণ ধরা হইত অন্য শাখার অথবা অসম্পৃক্ত ভাষার (যেমন আক্কাদীয় ও সুমেরীয়) প্রভাব। এখন বোধ হইতেছে, ইহা ছাড়া অন্য কারণও ছিল। সে কারণ হইল হিত্তী ভাষার প্রভাব। কেহ কেহ এমনও ভাবিতেছেন যে, আর্মেনীয় মূলে ছিল ইন্দো-ইওরোপীয় ও হিত্তীর মধ্যবর্তী ভাষা (যেমন ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যের মধ্যবর্তী দর্দীয়)।

তোখারীয় শাখা অনেক দিন লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনীয় তুর্কিস্তান হইতে প্রাপ্ত প্রত্নলিপিতে এই শাখার আবিষ্কার হইয়াছে। প্রত্নলিপিগুলির লিপিকাল ৫০০ হইতে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ। তোখারীয় শাখার দুইটি ভাষা। একটি ছিল কুভা অঞ্চলের ভাষা, এ ভাষার নাম অগ্নীয়, অপরটি তুখারদের ভাষা তোখ্রী (Toxri) অর্থাৎ যথার্থ তোখারীয়। ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তোখারীয় শাখা শুকাইয়া গিয়াছিল।

ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাবৃক্ষের যে নয়টি শাখা বর্ণিত হইল, সেগুলিকে সাধারণতঃ দুইটি ঝাড়ে ভাগ করা হয়। একটির নাম কেন্তম্ ঝাড়; এ ঝাড়ে আছে: কেল্তিক, জার্মানিক, ইতালিক, গ্রীক ও তোখারীয়। অপরটির নাম সতম্ ঝাড়; এ ঝাড়ে পড়ে: বাল্তিক-স্লাবিক, আলবেনীয়, আর্মেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয় (বা আর্য)। ঝাড় দুইটির নাম যথাক্রমে লাতিন ও ইন্দো-ইরানীয় হইতে লওয়া। এ ঝাড়-বিভাগের হেতু হইল মূল ভাষার পূর্ব-কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির পরিণাম। এ ধ্বনিগুলি বিকৃত হইলেও কেন্তম্ ঝাড়ে জাতি বদল করে না, সতম্ ঝাড়ে করে। যেমন, মূল ভাষার K ধ্বনি কেন্তম্ ঝাড়ে [ক] অথবা [খ] হয়, সতম্ ঝাড়ে [স] অথবা [শ] হয়। মূল ভাষায় ১০০ সংখ্যাবাচক শব্দ ছিল Kṃtom, এটির পরিণতি বিভিন্ন শাখার ভাষায় এইরকম:

কেন্তম্ ঝাড	সতম্ ঝাড়
ইতালিক : কেন্তম্ (Centum, লাতিন)	ইন্দো ইরানীয় : শতম্ (সংস্কৃত), সতেম (অবেস্তীয়)
গ্রীক : হে-কাতোন (he-Katon)	
জার্মানিক · হুন্দ্ (hund = Khund, গথিক)	বাল্তিক-স্লাবিক : সিম্তাস্ (Szimtas, লিথুয়ানীয়)
কেল্তিক : কেত্ (Cet, প্রাচীন আইরিশ)	
তোখারীয় : কন্ত্ (Kant)	

মূল ভাষার ধ্বনিসংখ্যা যে কোনও শাখা-ভাষার অপেক্ষা বেশি ছিল। ব্যাকরণ মোটামুটি সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার মতই ছিল, তবে ক্রিয়ারূপে এই দুই ভাষার তুলনায় বিচিত্রতর। প্রত্যয়যোগে নূতন শব্দ সৃষ্ট হইত। সমাসও হইত, তবে দুই পদের বেশি নয়। পদে মূল স্বর-ধ্বনির নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পরিবর্তন হইত (অপশ্রুতি, অ্যাব্লউট)। পদের উচ্চারণে স্বরের (ইন্টোনেশন) অবস্থান অনুসারে অর্থের পরিবর্তন ঘটিত।

সুকুমার সেন

ইন্দোর ২২°৪৪´ উত্তর, ৭৫°৫০´ পূর্ব। প্রাচীন নাম ইন্দ্রেশ্বর। ইন্দোর মধ্য প্রদেশ রাজ্যের অন্যতম জেলা ও ঐ জেলার সদর। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জেলার আয়তন ৩৮৩১ বর্গ কিলোমিটার (১৪৭৯ বর্গ মাইল)। জেলার লোকসংখ্যা ৭৫৩৫৯৪। তন্মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ৭৭৫৬৯ ও খেতমজুর ৪০০৪৫; গৃহ-শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৩২৫৪। গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদনশিল্পে ৪৩৫২০ জন এবং ২৭৬৩৩ জন ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। জেলার সদর শহর ইন্দোরে একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) আছে। ইন্দোর জেলার অবস্থান বিন্ধ্য পর্বত-মালার একটি মালভূমির উপর, নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে। শহরটি খান ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের সংগমস্থলে অবস্থিত। আজমীর-খাণ্ডোয়া মিটারগেজ রেলপথ এই শহরের উপর দিয়া গিয়াছে। ইন্দোর শহরের জনসংখ্যা ৩৯৪৯৪১। তন্মধ্যে ২১৩৩৪৬ জন পুরুষ ও ১৮১৫৯৫ জন নারী। কর্পোরেশন এলাকার পার্শ্ববর্তী মহৌ ক্যান্টন-মেন্টের লোকসংখ্যা ৪৮০৩২। সেখানে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৬৪৭৫ ও ২১৫৫৭ জন। জেলায় অপর দুইটি মিউনিসিপ্যাল শহর আছে— দেপালপুর ও সাভার। উহাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৬৭৩ এবং ৪৪৩৭ জন।

জেলায় উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, আফিম, ভাঙ্গ এবং তুলা প্রধান। অষ্টাদশ শতক হইতে ইন্দ্রেশ্বর (ইন্দোর) মধ্য ভারতে এই সকল পণ্যের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। খনিজ দ্রব্য বলিতে জেলায় স্বল্প পরিমাণ ব্যারাইটীস ও লিথোগ্রাফিক প্রস্তর পাওয়া যায়। ইন্দোর শহরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি কাপড়কল আছে। হোলকাররাজের আনুকূল্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। তবে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হোলকাররাজের উদ্যোগে শহরে যে ঢালাই-কারখানাটি স্থাপিত হয় তাহা আজ ইন্দোর জেলার সরকারি শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ইন্দোর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম রেশম, বনস্পতি তৈল ও বিস্কুট -শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইন্দোর জেলার কুটিরশিল্পের মধ্যে কাগজের মণ্ড হইতে খেলনা তৈয়ারি, রেশম উৎপাদন, কাঁসা ও অষ্টধাতু -নির্মিত দ্রব্যাদি নির্মাণ এবং কাপড়ের নকশা তৈয়ারি ইত্যাদি প্রধান।

ইন্দোর শহরে কলেজের সংখ্যা ১৫। তন্মধ্যে দুইটি সংগীতকলার, তিনটি চিকিৎসাবিদ্যার এবং একটি করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার কলেজও আছে। অনেক কলেজে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও আইন বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইন্দোর হোলকারবংশের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ইন্দোরের হোলকারবংশের প্রতিষ্ঠাতা মল্‌হর রাও হোলকার। ইনি পেশোয়ার সৈন্যবাহিনীতে সামান্য সৈনিকরূপে যোগ দিয়া স্বীয় শৌর্যবলে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন ও অল্প কালের মধ্যে সেনা-পতির পদ লাভ করেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মালব অঞ্চলে নর্মদার দক্ষিণাংশে ১২টি জেলার জায়গিরদারি লাভ করিয়া মহেশ্বর শহরে হোলকার সামন্ত রাজ্য স্থাপন করেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জায়গির নর্মদার উত্তর দিকে আরও ৭০টি জেলার উপর বিস্তার লাভ করে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পূর্বে রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের অনেকাংশ তাঁহার জায়গিরভুক্ত হয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর মল্‌হর রাও নিজ জায়গির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। হোলকার রাজ্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক হইলেন মল্‌হর রাও-এর পুত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ (১৭২৫/২৬-১৭৯৫ খ্রী)। অহল্যাবাঈ সুশাসিকা, ধর্মপ্রাণা ও দয়াবতী মহিলা ছিলেন। তিনিই প্রথম ফরাসী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ-গণের সাহায্যে হোলকার রাজ্যে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোর হইতে ২৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) দূরবর্তী কামপেল নামক স্থানের ভূস্বামী যখন ইন্দ্রেশ্বর গ্রামে আসিয়া পত্তনি স্থাপন করেন, তাহার পর হইতে ইহা ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব লাভ করিতে থাকে। স্থানটির গুরুত্ব বুঝিয়া রানী অহল্যাবাঈ কামপেল হইতে ইন্দোরে জেলার শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন (হোলকার রাজ্যের রাজধানী মহেশ্বর-ই থাকিয়া যায়)। অহল্যাবাঈ-এর মৃত্যুর পর হইতে রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া দীর্ঘ বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হয়। অবশেষে যশোবন্ত রাও হোলকার রাজ্যের শাসনভার লাভ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু রাজধানী মহেশ্বর জয় করিবার অল্প কাল পরেই সিন্ধিয়ার হস্তে পরাস্ত হইয়া তিনি মহেশ্বর ত্যাগ করিয়া ইন্দোরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পরাক্রান্ত মন্ত্রী সারজী রাও ঘাট্‌কে ইন্দোর শহরটি ধূলিসাৎ করেন। অতঃপর যশোবন্ত রাও পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পেশোয়া ইংরেজ-গণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তখন যশোবন্ত রাও

মালবে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ইংরেজদের সহিত সম্মুখসমরে লিপ্ত হইয়া আংশিক পরাজয় বরণ করিতে হয়। সন্ধির পর তিনি ইংরেজ কর্তৃক হোলকার রাজ্যের আইনসংগত শাসক বলিয়া স্বীকৃত হন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও -এর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর আইনসংগত উত্তরাধিকার লইয়া আবার অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই অরাজকতার কালে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইলে, অমাত্যগণের ইচ্ছায় হোলকারের সৈন্যবাহিনী পেশোয়ার সাহায্যে নিয়োজিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মেহিদপুরের যুদ্ধে রাজ্যের সৈন্যবাহিনী স্যর টমাস হোপ -এর হস্তে পরাজয় বরণ করে। অতঃপর ইংরেজ ও হোলকার -এর মধ্যে মান্দাসোরে এক সন্ধি হয় (১৮১৮ খ্রী)। ইংরেজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত হোলকার রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ শক্তির সম্পর্ক এই মান্দাসোর-চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হইয়া আসিয়াছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হোলকাররাজকে রাজপুতানার সামন্তগণের উপর সকল অধিকার এবং নর্মদার দক্ষিণ তীরস্থ সকল ভূখণ্ডের অধিকারও পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু নর্মদার উত্তর তীরে মালব অঞ্চলে নিজামের অধিকৃত ভূখণ্ডের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। হোলকারের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা অনেক কমাইয়া উহাকে রাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদলে পরিণত করা হয়। চুক্তির শর্ত যথাবিহিত পালিত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্দোর শহরে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হয় এবং ইন্দোরের শহরতলি মহৌ-তে একটি ব্রিটিশ সেনানিবাস স্থাপিত হয়। মান্দাসোর-চুক্তির শর্ত অনুসারে রেসিডেন্সি স্থাপিত হইবার পর ইন্দোরে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া আসে এবং দেশীয় রাজ্যটির সরকারি নাম হয় 'ইন্দোর রাজ্য'। রাজ্যের পাঁচটি জেলার মধ্যে ইন্দোর-ই সর্বপ্রধান জেলা ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পর, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য -সম্পর্কিত ব্যবস্থা অনুযায়ী গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মালব রাজ্য লইয়া মধ্য ভারত রাজ্য ইউনিয়ন নামে একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল গঠিত হয় এবং হোলকারের ইন্দোর রাজ্য লোপ পায়। অবশেষে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের পর এই জেলা ও শহর মধ্য প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শহরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে লালবাগ প্রাসাদ, মানিকবাগ প্রাসাদ, অষ্টতলবিশিষ্ট পুরাতন প্রাসাদ, নূতন প্রাসাদ, শঙ্খ মহল বা কাচ মহল, ছত্রিবাগ এবং কৃষিবিজ্ঞান কলেজের সংলগ্ন উদ্যানটি উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, New Series, vol. XIII, London, 1908 ; G. Duff, *History of the Mahrattas*, Bombay, 1873 ; G. S. Sardesai, *Main Currents of Maratha History*, Bombay, 1933 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962.

প্রণবরঞ্জন রায়

ইন্দ্র১ ঋগ্‌বেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রকেই ঋগ্‌বেদীয় যুগে আর্যগণের জাতীয় দেবতারূপে নির্দেশ করিতে পারা যায়।

নিরুক্তকার আচার্য যাস্কের মতে ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা। যাস্ক ইন্দ্রের বিশিষ্ট কর্ম উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'বৃষ্টিদান, বৃত্রবধ এবং এক কথায় দৈহিক বলসূচক যাহা কিছু, সমস্তই ইন্দ্রের কার্য।'

ঋগ্‌বেদীয় সূক্তসমূহে ইন্দ্রের আকৃতি ও রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 'সুশিপ্র' (সায়ণের মতে ইহার অর্থ 'শোভন-হনু' বা 'শোভন-নাসিক'), 'হরিকেশ', 'হরি-শ্মশ্রু', 'হিরণ্যবাহু' প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা ভূষিত। তিনি স্বেচ্ছায় অনন্তরূপ ধারণ করিতে পারেন (ঋক্, ৩।৫৩।৮)। তাঁহার রথ 'হিরণ্যয়'। তাঁহার হস্তে 'হিরণ্যয়ী কশা'। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে 'হরী' বলা হইয়াছে। তিনি ত্বষ্টৃ-নির্মিত দ্যুতিমান্ বজ্র হস্তে ধারণ করেন; এই বজ্র অন্তরিক্ষবর্তী সমুদ্রে জলরাশির দ্বারা আবৃত (ঋক্, ৮।১০০।৯)। এই বজ্রও 'হিরণ্যয়'; ইহাকে কখনও 'চতুরস্রি', কখনও 'শতাস্রি', 'শতপর্বন্' বা 'সহস্রভৃষ্টি' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইন্দ্র হিরণ্যয় অঙ্কুশের সাহায্যে তাঁহার রথ চালনা করেন।

'সোমরস' ইন্দ্রের প্রিয়তম পানীয়। তিনি যজ্ঞে ত্রিশটি সোমপাত্র নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (ঋক্, ৮।৭৭।৪)। যজমানগণ সোমকলস পানের জন্য যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রকে সাগ্রহে আবাহন করিয়া থাকেন। তৃষ্ণার্ত ঋশ্যমৃগের ন্যায় ইন্দ্রও সোমপানের জন্য ধাবিত হন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ১১৯ সংখ্যক সূক্তে সোমপানমত্ত ইন্দ্রের উক্তি বর্ণিত আছে।

বৃত্রবধ ইন্দ্রের প্রধান কর্ম। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেঘরাজি বিদীর্ণ করিয়া বৃত্র কর্তৃক লুক্কায়িত জলধারা প্রবাহিত করিয়া দেন। ঋগ্‌বেদে মেঘকে কখনও 'পর্বত', কখনও 'পুর' বা 'দুর্গ' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বৃত্রবধের

উপাখ্যানসমূহকে যাস্ক প্রভৃতি টীকাকার আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মত নৈসর্গিক রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ প্রভৃতি শত্রুবধের উল্লেখও বৈদিক সূক্তসমূহে দৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে এই সকল বর্ণনা হইতেই ইন্দ্রসম্বন্ধীয় বহুবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।

আর্যগণের সহিত দস্যুগণের যুদ্ধে ইন্দ্র আর্যদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে 'কৃষ্ণত্বক্ দস্যু' বা 'দাসবর্ণ' বশীভূত হইয়াছিল। তিনি 'ভূরিদা' এবং 'মঘবন্'। অপর পক্ষে যাহারা তাঁহার স্তব করে না বা তাঁহাকে স্বীকার করে না, তাহাদের তিনি 'শাস্তা'। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন ভারতীয় অনার্য অধিবাসীগণই 'দাসবর্ণ' বা 'দস্যু' রূপে বৈদিক সূক্তসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র প্রধানতঃ যোদ্ধদেবতা-রূপেই বর্ণিত। বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগের পুরী বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পুরন্দর'। ডঃ মর্টিমার-হুইলার মহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, আর্যপূর্ব 'দাস'সভ্যতা ও বৈদিক আর্যসভ্যতার সহিত ঘোরতর সংঘাতের ফলেই মহেঞ্জো-দড়োর সমৃদ্ধ অনার্য সভ্যতা ও নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ডঃ হুইলারের এই সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে।

বেদে ইন্দ্রের একটি বহুপ্রচলিত বিশেষণ 'বৃত্রহন্'। অবেস্তাতেও 'বেরেথ্রঘ্ন' পদটি দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইন্দ্র যে সুপ্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় যুগ হইতেই দেবতারূপে কীর্তিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ।

দ্র A. A. Macdonell, *Vedic Mythology*, Strassburg, 1897 ; J. Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. V, London, 1870 ; R. E. Mortimer-Wheeler, 'India's Earliest Civilization: Recent Excavations in the Indus Basin', *The Illustrated London News*, August 10, 1946.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পু[২] বেদে ইন্দ্রের যে সব বিশেষত্বের কথা আছে তাহার প্রায় সবই পৌরাণিক যুগেও বর্তমান ছিল। তবে পুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন কাহিনীরও সন্ধান পাওয়া যায়। পুরাণমতে তিনি সমস্ত দেবতার রাজা। তাঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। তিনি পুলোমা দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন; সেই কন্যাই ইন্দ্রাণী বা শচী। তাঁহার পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ— কোনও কোনও মতে মীঢ়, বালী ও অর্জুন; কন্যা জয়ন্তী। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রধনু (রামধনু), অসি পরঞ্জ (পারঞ্জ), অস্ত্র বজ্র। তিনি পূর্বদিকের পালক। তিনি আদিত্যগণের অন্যতম। তিনি সংবর্ত ও পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর বলিয়া মর্ত্যের সকলে স্ব স্ব অন্নের প্রাচুর্য কামনায় তাঁহার অর্চনা করেন। তিনি বৃষ্টিদাতা।

এক-এক মনু পর্যন্ত এক-একজন ইন্দ্রের অধিকার-কাল। প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্রের পৃথক নাম। চতুর্দশ মন্বন্তরে যজ্ঞ, রোচন, সত্যজিৎ প্রভৃতি তাঁহার চতুর্দশ নাম (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১-৩)। তাহা ছাড়া বৃত্রকে হত্যা করায় বৃত্রহা, মেঘ বা গিরির পক্ষচ্ছেদ করায় গোত্রহা বা গোত্রভিৎ, অসুরদের লৌহনির্মিত পুরী ধ্বংস করায় পুরন্দর, পাক নামক অসুরকে শাসন করায় পাকশাসন, নমুচিকে বিনাশ করায় নমুচিসূদন ইত্যাদি নামেও তিনি অভিহিত হন। ইহা ছাড়াও তাঁহার বহু নাম, যেমন: মহেন্দ্র, বজ্রপাণি, মেঘবাহন, মরুত্বান্, জিষ্ণু প্রভৃতি। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। সেইজন্য ইন্দ্রের নাম শতমখ, শতক্রতু, শতমন্যু (মহাভারত, শান্তি, ৩১)। কেহ কঠোর তপস্যা করিলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপের আশঙ্কা হইত এবং সেইজন্য তিনি তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিজের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করিতেন। অসুরদের তিনি চিরশত্রু। বৃত্র, নমুচি, বল, জম্ভ প্রভৃতি অসুর তাঁহার প্রধান শত্রু ছিল। দধীচি মুনির অস্থিতে নির্মিত বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া তিনি স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেন (মহাভারত, আদি, ১৩৭; পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি, ১৯)।

কথিত আছে, সুন্দ-উপসুন্দের ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মা তিলোত্তমার সৃষ্টি করিলে সেই অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী কন্যা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য সহস্রনয়ন হন। মহাভারতে বলা হইয়াছে, গুরু গৌতমের অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধরিয়া তিনি তৎপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন; মুনির শাপে দেহে সহস্র যোনিচিহ্নের উৎপত্তি হয়। সেগুলি পরে চক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। এইজন্য ইন্দ্রের নাম সহস্রাক্ষ বা নেত্রযোনি (মহাভারত, আদিপর্ব)। রামায়ণে এই ঘটনা অন্যরূপে বর্ণিত আছে। গৌতমের শাপে ইন্দ্রের অণ্ড খসিয়া পড়ে, পরে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় মেষাণ্ড-সংযোগে ইন্দ্রের পুরুষত্ব ফিরাইয়া আনেন (রামায়ণ, আদি, ৪৮)।

একবার রাবণ স্বর্গরাজ্যে গিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। রাবণ-পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার ইন্দ্রজিৎ নাম হয়। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বর দেন যে, অগ্নিপূজা করিলে তাঁহার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বসমেত রথ উত্থিত হইবে এবং সেই রথে আরূঢ় অবস্থায় তিনি যুদ্ধে অবধ্য হইবেন। এই বরের বিনিময়ে ইন্দ্রজিতের হাত হইতে ইন্দ্র মুক্তি লাভ করেন। অহল্যার সতীত্বনাশের জন্যই ইন্দ্রের এই দুর্গতি হইয়াছিল, এইরূপ বলা হয় (রামায়ণ, উত্তর, ৩৩-৩৫, ৪৯)।

একবার দুর্বাসার দেওয়া মালা ইন্দ্র ঐরাবতের মাথায় পরাইয়া দেন, ঐরাবত উহা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হন। ফলে দৈত্যদের হাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরাজিত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯)। বিষ্ণুর নির্দেশে সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উত্থিত হয় তাহা পান করিয়া দেবগণ দৈত্যদের বিতাড়িত করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধিতার অনেক উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। ব্রজবাসীরা একসময় ইন্দ্রের উপাসক ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের নির্দেশে তাহারা ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি এবং প্লাবনের সৃষ্টি করেন; তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে আঙুলে ছত্রের মত ধারণ করিয়া ব্রজধামকে প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ ৫০)।

একবার কৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রী সত্যভামার অনুরোধে স্বর্গোদ্যান হইতে ইন্দ্রের পারিজাত বৃক্ষ অপসারিত করেন। ইন্দ্রাণীর প্ররোচনায় অন্যান্য দেবতাগণের সঙ্গে ইন্দ্র কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজিত হন। পরে তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণের পুনরায় সদ্ভাব হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩০-৩১)।

পুত্র অর্জুনকে ইন্দ্র নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁহারই উপদেশে অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে অর্জুনের কল্যাণ-কামনায় তিনি কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল তাঁহার নিকট অন্যায়ভাবে প্রার্থনাপূর্বক সংগ্রহ করেন। পরিবর্তে কর্ণকে তিনি একাঘ্নী বাণ দান করেন (মহাভারত, বনপর্ব, ৩৮-৪১, ৩০০-৩১০)।

রামায়ণে উল্লেখ আছে (আদিকাণ্ড, ৪৬) ইন্দ্রের বিমাতা দিতি কশ্যপের কাছে এমন একটি সন্তান কামনা করিয়াছিলেন যে ইন্দ্রকে হত্যা করিতে পারিবে। ইন্দ্র তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে তখন বজ্রদ্বারা সপ্ত খণ্ড করেন এবং প্রতি খণ্ডকে পুনরায় সাত ভাগে বিভক্ত করেন। গর্ভস্থ শিশু কাঁদিয়া উঠিলে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'মা রুদঃ' (কাঁদিও না)। ইহা হইতে সেই উনপঞ্চাশটি খণ্ডের নাম হয় মারুত।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ইন্দ্র[৩] দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশে ইন্দ্র নামে চার জন রাজা রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় ইন্দ্রই (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯১৪-২৮ খ্রী) সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি উচ্চাভিলাষী, সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগে তিনি উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ দখল করেন। ভীত প্রতিহাররাজ মহীপাল পলায়ন করেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তৃতীয় ইন্দ্র দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলে মহীপাল কনৌজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। তবে এই সময় হইতেই গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ইন্দ্রের উক্ত অভিযান এই হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয় ইন্দ্র বেঙ্গীর চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। চালুক্যরাজ চতুর্থ বিজয়াদিত্য যুদ্ধে নিহত হইলেও তৃতীয় ইন্দ্র চূড়ান্ত সাফল্যলাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর বেঙ্গী রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি নিজ মনোনীত প্রার্থীকে বেঙ্গীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপন প্রাধান্য বিস্তার করেন।

দ্র G. Yazdani, ed., *The Early History of the Deccan*, part V, Oxford, 1960.

নিমাইসাধন বসু

ইন্দ্রজাল জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি বা ম্যাজিক। হস্ত-কৌশল, যান্ত্রিক কৌশল, ঔষধপত্র, প্রখর বুদ্ধি, মনঃশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির একক বা সম্মিলিত প্রয়োগ দ্বারা অদ্ভুত বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনকেই ইন্দ্রজাল বলে। ইন্দ্রজালবিদ্যার আদি জন্মস্থান প্রাচ্য মহাদেশে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের একটি অংশ-বিশেষ এবং গুপ্ত বা গুহ্য -বিদ্যা হিসাবে ভারতে প্রচলিত।

কথিত আছে, স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় মায়াকারগণ নানা-রূপ অদ্ভুত খেলা দেখাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। সেই কারণেই এই বিদ্যা ইন্দ্রজাল নামে খ্যাত। আবার অনেকে বলেন, ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ চক্ষুর উপর 'জাল' বিস্তার করে বলিয়া, অর্থাৎ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় বলিয়া, ইহার নাম ইন্দ্রজাল। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্ম দেশের ভাষায় ইন্দ্রজালকে বলে 'মিয়া হেল', অর্থাৎ চক্ষুর উপর ভ্রম বিস্তার করা। অনেকে বলেন, মালব দেশের রাজা ভোজ ও তাঁহার কন্যা

ইন্দ্রজাল

(বিক্রমাদিত্যের মহিষী) রানী ভানুমতী এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতেই 'ভোজবাজি' বা 'ভোজবিদ্যা' এবং 'ভানুমতী কা খেল' নাম দুইটির উৎপত্তি। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে, ভোজবিদ্যার সহিত রাজা ভোজের কোনও সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ ইহা 'ভুজবাজি' ও 'ভুজবিদ্যা' কথা দুইটির বিকৃতি মাত্র। তাঁহাদের মতে 'ইন্দ্রজাল' হইতেছে 'হাত সাফাইয়ের খেলা (ভুজ=হাত)' বা 'হস্তলাঘববিদ্যা'। ইংরেজীতেও এই বিদ্যা বিষয়ে অনুরূপ কথা sleight of hand ব্যবহৃত হয়। 'ভানুমতী কা খেল' বলিতেও তেমনই হয়ত রানী ভানুমতীর কোনও ব্যাপারই নাই; উহা 'ভান্ মতীকা খেল'— যে খেলায় মতি (মন) বিভ্রম ঘটায় উহাই 'ভান্ মতীকা খেল'। জাদুবিদ্যা কথাটি আসিয়াছে ফারসী শব্দ হইতে। তবে ইংরেজ রাজত্বের পর হইতে ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রতিশব্দ হিসাবে ভারতবর্ষে 'ম্যাজিক' কথাটিরই বহুল প্রচলন হইয়াছে। অহরহ ব্যবহারের ফলে 'ম্যাজিক' কথাটি নিত্যব্যবহার্য বাংলা শব্দ বলিয়াই ভ্রম হয়। খ্রীষ্টের জন্মকালে 'প্রাচ্যের তিন জন বুদ্ধিমান লোক' (ইংরেজীতে ইহাদের নাম মেজাই, magi) খ্রীষ্টের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বেথ্লেহেম যান। প্রাচীন সেই 'মেজাই' বা বুদ্ধিমান লোকদের ক্রিয়াকলাপ হইতে ম্যাজিক কথাটির সৃষ্টি।

ভারতীয় ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে গবেষণা করিলে দেখা যায় বাটি ও বলের খেলা এ দেশের (ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খেলা। পথের বেদিয়াগণ শূন্য বাটি এবং কয়েকটি ছোট ছোট গুটি (বল) লইয়া 'এই আছে, এই নাই'— এইরূপ ভেলকি দেখাইয়া থাকে। উহা প্রকৃতই পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে লব্ধ হস্তকৌশলের ফল। জ্যোতিষী বা সন্ন্যাসীগণ যে কোনও অঙ্কসংখ্যা বা রাশি অথবা ফুলের নাম পূর্বাহ্ণে লিখিয়া রাখিয়া যে সমস্ত মনঃশক্তির খেলা দেখান, অথবা যে কোনও বস্তুর ঘ্রাণ পাইবার অথবা নখদর্পণে দেব-দেবীর মূর্তি আবির্ভাবের যে খেলা দেখান, উহা প্রকৃতই মনঃসমীক্ষণ, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির খেলা। বশীকরণ, চিন্তাপাঠ, সম্মোহন প্রভৃতিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

পথের বেদিয়াগণ জলের মধ্য হইতে শুষ্ক বালি তুলিয়া লইয়া যে খেলা বহু শতাব্দী যাবৎ দেখাইয়া আসিতেছে উহা বস্তুতঃ ঔষধপত্রাদির বা রাসায়নিক ক্রিয়ামাত্র। সাধারণ বালুকাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া এই খেলা দেখানো হয়। শূন্যে অবস্থান, আদেশমত হুঁকা হইতে ছোট কাঠের খেলনার নৌকার মধ্যে জল ফেলা এবং তাহা বন্ধ করা, ঝুড়ির মধ্যে মেয়ে ভর্তি করিয়া অদৃশ্য করা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় খেলাগুলিও বস্তুতঃ যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী -সংবলিত খেলা মাত্র।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রচলন। মিশর দেশের ধর্মযাজকগণ, রোমের পুরোহিতগণ, ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষি ও সন্ন্যাসীগণ এই বিদ্যা নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাকে ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া প্রাচীন কালের পুরোহিত, ধর্মযাজক এবং সন্ন্যাসীগণ নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী, সম্রাট্ অপেক্ষাও অধিক দৈবক্ষমতাশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাকে গুপ্তবিদ্যা হিসাবে অনুসরণ করিতেন এবং গুরু হইতে শিষ্যপরম্পরায় ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিত।

দর্শকদের চক্ষু ধাঁধাইবার জন্য এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে এই বিদ্যার প্রদর্শনী প্রচলিত হয়। মোগল রাজত্বকালে একদল বাঙালী জাদুকর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারে অপূর্ব জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে (জাহাঙ্গীরনামা) ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শংকরাচার্য তাঁহার বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে স্থানে স্থানে সর্পে রজ্জুভ্রম, মায়া প্রভৃতির উদাহরণস্বরূপ ইন্দ্রজালবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তররামচরিত, অথর্ববেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রজাল ও ঐন্দ্রজালিকের উল্লেখ আছে।

রঙ্গমঞ্চে কালো পর্দার সম্মুখে কালো রঙের কোট-প্যান্ট পরিধান করিয়া ইন্দ্রজাল-প্রদর্শনরীতি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের প্রভাবজাত। ইংরেজরা সান্ধ্য পোশাকে যে ধরনের কালো কোট-প্যান্ট পরিধান করে, উহাই এ দেশে জাদুকরদের পোশাক হিসাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইদানীং কালে অবশ্য ভারতীয় জাদুকরগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিতেছেন এবং নিজস্ব ইন্দ্রজাল প্রতিষ্ঠান 'নিখিল ভারত জাদু সম্মিলনী'র (অল ইণ্ডিয়া ম্যাজিক সার্ক্ল) মাধ্যমে নানাভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ইন্দ্রজালের সাজ-সরঞ্জাম, প্রয়োগপদ্ধতি, পোশাক এবং পরিবেশের প্রভূত পরিবর্তন করিয়াছেন। ভারতীয় ইন্দ্রজাল আবার বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

রঙ্গমঞ্চে নাটকের প্রয়োগকর্তাগণ এতদিন ইন্দ্রজাল-বিদ্যার সাহায্য লইতেন। পৌরাণিক নাটকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমূর্তি কালীমূর্তিতে রূপান্তরিত হইল, সীতা পাতালপ্রবেশ করিলেন অথবা আরব্য উপন্যাসের নাট্য-রূপায়ণে নায়ক পক্ষীরাজ ঘোড়া অথবা উড়ন্ত কার্পেটে চলিয়া আসিলেন— এই সমস্তই ইন্দ্রজালের খেলা মাত্র। নানারূপ আলোককৌশল, পর্দার প্রয়োগচাতুর্য, দড়ি, সুতা,

স্প্রিং, মেঝেতে গর্ত (ট্র্যাপ) প্রভৃতির সাহায্যে এই সমস্ত সম্ভবপর হইত। এত কাল নাটক ইন্দ্রজালের সাহায্য লইত, কিন্তু বর্তমানে ইন্দ্রজাল নিজেই নাটকে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজালের প্রতিটি ক্রিয়ায় এক্ষণে নাটকীয় রূপ দেওয়া হয়। ইহার পাত্র-পাত্রীদের এখন চরিত্রে অভিনয়দক্ষতার প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রিত আলোকবিন্যাস, বিধিবদ্ধ পোশাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যবহুল পশ্চাৎপট এবং গতিশীল আবহসংগীত— সমস্ত একত্র হইয়া ভারতীয় ইন্দ্রজাল এখন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর টমাস রো ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৌত্য করিতে আসিয়া রাজধানীতে ইন্দ্রজাল দেখিয়া যান। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গ-পট্টনম হইতে একদল ভারতীয় জাদুকর ইংল্যাণ্ডে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতে যান। তৎপূর্বে অপর একটি ভারতীয় জাদুকরদল সেখানে ভেলকির খেলা দেখাইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাদুকর রামস্বামীর নেতৃত্বে লণ্ডনের বন্ড স্ট্রীটের রঙ্গালয়ে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হয়। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে (১৯০৫-৬ খ্রী) প্রসিদ্ধ মার্কিন জাদুকর থার্সটন ভারতবর্ষে আসেন। বেলা হাসান নামক তৎকালীন একজন ওস্তাদ জাদুকরকে তিনি তাঁহার দলভুক্ত করেন এবং আমেরিকায় লইয়া যান। এ দেশে বড় বড় বিদেশী ঐন্দ্রজালিকের আগমনের ফলে বোম্বাইয়ে জাদুকর মিস্ত্রু, সুরাটে জাদুকর আলভারো এবং জাদুকর গণপতি স্টেজ-ম্যাজিকে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। জাদুকর গণপতি প্রথমে যাত্রাদল, তার পর নাটকের দল হইতে ক্রমে জাদু-জগতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি বিখ্যাত বসুর সার্কাসের দলের সঙ্গে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিয়া বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং শেষ জীবনে নিজেও জাদুবিদ্যার একটি দল গঠন করিয়া ভারতের নানা স্থানে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। বর্তমান কালে ইন্দ্রজালবিদ্যায় বাঙালীর দান সর্বাধিক।

দ্র গণপতি চক্রবর্তী, যাদুবিদ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ; পি. সি. সরকার, ইন্দ্রজাল, কলিকাতা, ১৯৫৫ ; অজিতকৃষ্ণ বসু, যাদু-কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৬২ ; P. C. Sorcar, *Sorcar on Magic*, Calcutta, 1960.

প্রতুলচন্দ্র সরকার

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১ খ্রী) মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে জন্ম। পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পুর্নিয়ার উকিল। কলিকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ হইতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া ইন্দ্রনাথ বীরভূমের হেতমপুর ও বর্ধমানের ওকড়সা গ্রামে কিছুদিন হেডমাস্টারের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল পাশ করিয়া তিনি ওকালতিতে প্রবেশ করেন। প্রথমে পুর্নিয়া ও দিনাজপুর (১৮৭১-৭৬ খ্রী), অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্ট (১৮৭৬-৮১ খ্রী) এবং সর্বশেষে বর্ধমান ছিল তাঁহার কর্মস্থল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রনাথ 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' নামে একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ব্যঙ্গরসিক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ। কয়েক বৎসর পরে 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে তিনি 'কল্পতরু' উপন্যাস রচনা করেন (১৮৭৪ খ্রী)। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করিয়া ইন্দ্রনাথকে টেকচাঁদ ও হুতোমের সমকক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্ষুদিরাম'-এ (১৮৮৮ খ্রী) উপন্যাসের সমগ্রতা নাই, লেখক ইহাকে গালগল্প বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৮ খ্রী) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য। কাব্যটি পাঁচটি সর্গে সম্পূর্ণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মের নব্য চিন্তাধারা লেখকের ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্লেষ-বিদ্রূপে পরিপূর্ণ 'পঞ্চানন্দ'। পঞ্চানন্দ প্রথমতঃ পত্রিকা আকারে সম্পাদিত হইত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া হইতে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বছর দুই চলিবার পর পঞ্চানন্দ আর পত্রিকা আকারে বাহির হয় নাই। অতঃপর যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী'তেই পঞ্চানন্দ প্রকাশিত হইতে থাকে। পাঠক-সাধারণের উপভোগ্য এই গদ্য-পদ্য সরস চুটকিগুলি লিখিবার সময়ে ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচু ঠাকুর' ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। পরে এই সব রচনা 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থমালায় (পাঁচ খণ্ড) সংকলিত হইয়াছে।

সংখ্যায় অল্প হইলেও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গে তাঁহার রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী'র কাশিমবাজার অধিবেশনে 'বাংলা ভাষার সংস্কার' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিয়া

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন যে অসংগত, উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ কথা বুঝাইতে চাহেন।

'পাঁচু ঠাকুরে'র ভূমিকায় ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে'। নিছক রসিকতা ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। সর্ববিধ রচনার অন্তরালে তাঁহার স্বদেশানুরাগের পরিচয়টি প্রচ্ছন্ন থাকিত। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বাঙালীর মনোজীবনকে এইভাবে রঙ্গ-রসিকতায় উজ্জীবিত রাখিবার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ ইন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

দ্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, '৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩৪, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

রথীন্দ্রনাথ রায়

ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রপত্ বা পুরাতন দিল্লী। ইন্দ্রপত্ত, ইন্দ্রপতন, ইন্দ্রস্থান এবং খাণ্ডবপ্রস্থ নামেও ইহা পরিচিত ছিল। মহাভারতে আদিপর্বের রাজ্যলাভপর্বাধ্যায়ে আছে, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কুরু-রাজধানী হস্তিনাপুর (মিরাট) হইতে কিছু দূরে যমুনাতীরবর্তী খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বসবাস করিতে বলেন; তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে যান। সেখানে তিনি সৌধমালাশোভিত পরিখাপ্রাকারবেষ্টিত উপবন-সরোবর-ভূষিত স্বর্গধামতুল্য যে নগর স্থাপন করেন কালক্রমে তাহাই সাহিত্যে ও ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভাগবতপুরাণে যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে আছে, ত্রিদশাধীশ ইন্দ্র এই স্থানে স্বর্ণযূপ দ্বারা অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত যজ্ঞে নারায়ণের সমক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু রত্নপ্রস্থ দান করিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত স্থানের নাম হইয়াছে ইন্দ্রপ্রস্থ। এখানে মৃত্যু বরণ করিলে মানুষ পুনর্জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে। জাতকে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রপত্ত বা ইন্দ্রপ্রস্থ শহরের আয়তন সাত যোজন।

বর্তমান ফিরোজ শাহ্ কোটলা এবং হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোনও কোনও প্রত্ন-তাত্ত্বিকের মতে ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন 'পুরান কিলা' কোনও প্রাচীনতর হিন্দু স্থাপত্যের রূপান্তর কিংবা তাহারই উপর নির্মিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও ধারণা, ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যমুনাতীরবর্তী নিগমবোধঘাট এখনও প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পবিত্র মহিমার ঐতিহ্য বহন করিতেছে। গাহড়বাল-নৃপতি চন্দ্রদেবের চন্দ্রাবতী শিলালেখ (বিক্রম সংবৎ ১১৪৮, খ্রীষ্টীয় ১০৮৯/৯০ অব্দ) হইতে জানা যায় যে, একাদশ শতকেও ইন্দ্রস্থান বা ইন্দ্রপ্রস্থ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পুরান কিলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল হইতে নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ইন্দ্রভূতি তিব্বতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবের পিতা ও উড্ডীয়ানের অধিপতি। রাজা হইলেও বজ্রযান ও তন্ত্রশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিব্বতী-সূত্র হইতে তাঁহার রচিত অন্ততঃ ২৩টি গ্রন্থের নাম আমরা জানিতে পারি। তন্মধ্যে 'কুরুকুল্লা-সাধন' ও 'জ্ঞান-সিদ্ধি' এই দুইটির পুথি মূল সংস্কৃত ভাষায় আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য অনঙ্গবজ্র ছিলেন ইঁহার গুরু। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ইঁহার আবির্ভাবকাল বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রিয় আমাদের দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো। ত্বককে সাধারণ ইন্দ্রিয়স্থান এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে বিশেষ ইন্দ্রিয়স্থান বলা হয়। ত্বকের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার স্পর্শ, তাপ ও ব্যথা অনুভূত হয়। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয়। সকল প্রকার সাধারণ ও বিশেষ ইন্দ্রিয়স্থান বহিরাগত উদ্দীপকের (স্টিমুলাস) দ্বারা উত্তেজিত হয়। উদ্দীপকের প্রকৃতি, তীব্রতা ও ব্যাপকতার তারতম্য অনুসারে ইন্দ্রিয়-বিশেষ বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত হয় এবং গুরুমস্তিষ্কের (সেরিব্রাম) মাধ্যমে বিশ্লেষিত হইয়া উহা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে উত্তেজনার বৃদ্ধিতে সকল সময় অনুভূতির তারতম্য বোধ হয় না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির পার্থক্য-বোধ সম্পর্কে 'ওয়েবার্স ল', 'ফেক্‌নার্স ল' প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি তত্ত্ব আছে। পৌনঃপুনিক উত্তেজনার সময় অধিক ব্যাপ্ত হইলে

উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া কমিয়া আসে। ইহাকে অনুভূতির 'অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা' (অ্যাডাপ্‌টেশন) বলা হয়।

সাধারণ ইন্দ্রিয়স্থান ত্বক। ত্বকের মাধ্যমে দুই প্রকার স্পর্শানুভূতি অনুভব করা যায়। যথা, সূক্ষ্মতাবোধক (এপিক্রিটিক) এবং রক্ষামূলক (প্রোটোপ্যাথিক)। সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা আমরা মৃদু স্পর্শ, শীতোষ্ণ অবস্থার পার্থক্য, অঙ্গের স্থানবিশেষের স্পর্শ-পার্থক্য ইত্যাদি অনুভব করি। রক্ষামূলক অনুভূতির দ্বারা অতি শৈত্য এবং অতি উষ্ণতা, আঘাত, বেদনা প্রভৃতি অনুভব করি। বিভিন্ন প্রকার স্পর্শ অনুভবের জন্য ত্বকের বিভিন্ন স্থানে ও স্তরে গ্রাহক যন্ত্র আছে। ইহাদের জন্যই বিভিন্ন প্রকার স্পর্শ বিশেষ-ভাবে ত্বকের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত হয়।

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়

ইব্‌ন বতুতা (১৩০৪-৭৮ খ্রী) ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনকালে যে সকল বিদেশী পর্যটক ভারত পরিভ্রমণ করিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আরবজাতীয় আবু আবদুল্লাহ্‌ মহম্মদ ইবন বতুতা তাঁহাদিগের অন্যতম। সংক্ষেপে তিনি ইব্‌ন বতুতা নামে পরিচিত। শামসুদ্দীন ও মওলানা বদরুদ্দীন নামেও তিনি অভিহিত হইতেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা উত্তর আফ্রিকার তান্‌জিয়ের নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তরুণ বয়সেই অদম্য দেশভ্রমণের নেশায় ইব্‌ন বতুতা পৃথিবী-পর্যটনে বাহির হন ও ১৩২৫ হইতে ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনের প্রায় ২৮ বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষেই ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন এবং ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের নানা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে তিনি সিংহল, মালদিভ দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি ভূখণ্ডেও গমন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরবী ভাষায় 'তুহ্‌ফাৎ-উন্‌-নুজ্জার ফী ঘরাইব্‌-ইল্‌-অম্‌সার্‌ ওয়া-অজাইব্‌-ইল্‌-অক্‌সার্‌' -শীর্ষক তাঁহার বিশ্বভ্রমণের সুবিখ্যাত বৃত্তান্ত রচনা করেন। এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ইব্‌ন বতুতার 'রেহ্‌লা' বা ভ্রমণকাহিনী নামে পরিচিত। ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইব্‌ন বতুতা স্বভাবতঃ ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশে মুসলমান তীর্থ পরিদর্শন, মুসলিম সাধু-সন্তগণের সঙ্গলাভ ও তৎকালীন মুসলমান শাসকগণের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতির সহিত পরিচয়সাধন করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু পথ চলার নেশা ও দুঃসাহসিক কার্যের প্রতি আকর্ষণই ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মধ্যযুগে অরক্ষিত বিপদসংকুল পথে সকল বাধা ও কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি সর্বসমেত ১২৪৯৪৬ কিলো-মিটার (৭৭৬৪০ মাইল) ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগ সম্পর্কে যাঁহারা কৌতূহলী, তাঁহাদের নিকট ইব্‌ন বতুতার ভারতবৃত্তান্ত বিশেষ মূল্যবান। দিল্লীতে তোগলক-বংশীয় তুর্কী সুলতান মহম্মদ বিন্‌ তোগলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১ খ্রী) তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দিল্লী রাজসভায় তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হন। ১৩৩৪ হইতে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর প্রধান কাজী বা বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান তাঁহাকে চীন দেশে দিল্লীর রাজদূত নিযুক্ত করেন। রাজকার্য উপলক্ষে ও চীনগমনকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সর্ব স্তরের লোকের সহিত মিশিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থানকালেও তাঁহাকে কিছুকাল কাজীর কার্য করিতে হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতায় তাঁহার ভারতবিবরণ বহুলাংশে সমৃদ্ধ হইয়াছে। দিল্লী রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ -হেতু তিনি কুতুবুদ্দীন আইবক হইতে মহম্মদ বিন্‌ তোগলক পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানগণের শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মহম্মদ বিন্‌ তোগলকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহার রাজদরবার ও রাজকার্য পরিচালনপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিবরণ নিজ রচনায় সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন। আবার, ভারতের প্রায় সর্বত্র (কোন ও কোনও অঞ্চলে একাধিকবার) অবাধ গতায়াত -হেতু জনসাধারণের জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। সুলতান মহম্মদ বিন্‌ তোগলকের চরিত্রে নানা বিপরীত বৃত্তির সমাবেশ, একদিকে তাঁহার বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা, নম্রতা, অপর দিকে হঠকারিতা ও প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার বিবরণপাঠে ধারণা হয়, তদানীন্তন ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ সম্পর্ক বিশেষ সম্প্রীতির ছিল না। হিন্দুরা মুসলমানদের অস্পৃশ্যজ্ঞানে ঘৃণা করিত, মুসলমানেরাও বিজিত ও বিধর্মী বলিয়া হিন্দুদের তাচ্ছিল্য করিত; নানাবিধ অত্যাচার-লাঞ্ছনাও যে হিন্দুদের সহ্য করিতে হইত না, তাহা নহে। তবে হিন্দুগণের সুবিচার পাইবার পথ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়

নাই। ইব্‌ন বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন, জনৈক হিন্দু স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে অভিযোগ করিয়া সুবিচার পাইয়াছিলেন। সুলতান হিন্দু যোগীগণের সঙ্গ করিতেন; ইব্‌ন বতুতা একবার সুলতানের উপস্থিতিতে দুই জন যোগীর অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়া আতঙ্কে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গ দেশ সম্পর্কে ইব্‌ন বতুতা বলিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও এই দেশের মত পণ্যের এত কম দাম দেখেন নাই। তদানীন্তন বঙ্গ দেশে চাউল ও জীবনযাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের কল্পনাতীত প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু সম্ভবতঃ বহিরাগত তুর্ক ও আফগানদিগের সহ্য হইত না। তাই তাহারা বঙ্গ দেশের নামকরণ করিয়াছিল 'দোজখ্‌-ই-পুর-নি'মৎ' বা প্রাচুর্যপূর্ণ নরক। বঙ্গ দেশের শ্যামলশ্রী ইব্‌ন বতুতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত মুসলিম সন্ত পীর শাহ্ জালালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি শ্রীহট্টে গমন করেন। কামরূপ যে জাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ, এই জনশ্রুতির সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল।

ইব্‌ন বতুতা সকল সময়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও নির্ভরযোগ্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, এ কথা বলা চলে না। প্রচলিত ভিত্তিহীন কাহিনী বা কিংবদন্তীকে তিনি মধ্যে মধ্যে সত্যের মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তিনি ভারতে অবস্থানকালে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন নিরপেক্ষভাবে তাঁহার গ্রন্থে উহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাহা হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের সমগ্র ভারতবর্ষের একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়।

দ্র C. Defrémery & B. R. Sanguinetti, tr., *Voyages d'Ibn Batoutah*, vols. I-IV, Paris, 1853-58; H. Yule & H. Cordier, *Cathay and the Way Thither*, vols. I-IV, London, 1913-16; Mahdi Husain, tr., *The Rehla of Ibn Battuta: India, Maldive Islands & Ceylon*, Baroda, 1953; H. A. R. Gibb, tr., *Travels of Ibn Batoutah*, vols. I & II, London, 1958, 1962; Mahdi Husain, *Tughluq Dynasty*, Calcutta, 1963.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ইব্‌সেন, হেন্‌রিক য়োহান (১৮২৮-১৯০৬ খ্রী) প্রখ্যাত নরওয়েজীয় নাট্যকার। পিতা ক্নুদ্ হেন্‌রিক্‌সেন ইব্‌সেন, মাতা মারিয়া কর্নেলিয়া অল্‌তেন্‌বার্গ। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ নরওয়ের স্কীয়েন শহরে জন্ম। পিতা ছিলেন জাহাজের ব্যবসায়ী। কিন্তু অচিরেই তাঁহার ব্যবসায়ে দুর্যোগ দেখা দেয়। কিশোর ইব্‌সেন তখন গৃহত্যাগ করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিমস্তাদ শহরের এক ঔষধালয়ে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগদান করেন।

ইব্‌সেন প্রথম কবিতা রচনা করেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে; কবিতার বিষয় ছিল নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সংশয়, কৈশোরের অনিবার্য নিঃসঙ্গতার বেদনা ও মৃত্যুভয়। 'লিস রীভ' (অন্ধকারের ভয়) এবং 'ফুগ্‌ল অগ্ ফুগ্‌লফিঙ্গার' (পাখি ও ব্যাধ) কবিতা দুইটির শিরোনামেই এই বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের জের নরওয়েতে পৌঁছাইলে ইব্‌সেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন এবং সিসেরো-সমালোচিত রোমক সেনাপতির নামে 'কাতিলিনা' (১৮৪৮/৪৯ খ্রী) বলিয়া একটি নাটক রচনা করেন। এই তাঁহার নাট্যচর্চার সূত্রপাত। পরবর্তী কয়েক বৎসরের (১৮৫০-৫৭ খ্রী) মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'খ্যাম্পেহাইয়েন' (যোদ্ধার সমাধিস্তূপ), 'নুরমা', 'সান্‌কথান্স-নাত্তেন' (সেন্ট জনের রাত্রি), 'য়িলদ্যা প সুলহাউগ' (সুলহাউগে ভোজ), 'ফ্রু ইন্‌গের তিল ওস্‌ত্রোত' (ওস্‌ত্রোত-এর শ্রীমতী ইঙ্গের)।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওল বুলের সহায়তায় ইব্‌সেন ব্যার্গেনের থিয়েটারে মঞ্চাবধায়কের কাজ পান। নাট্যপ্রয়োগরীতি শিক্ষার জন্য বুল তাঁহাকে বিদেশেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি ইউজিন স্ক্রিব্-এর (১৭৯১-১৮৬১ খ্রী) দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন। ব্যার্গেনের রঙ্গালয় ছাড়িয়া পরে তিনি পরিচালক হিসাবে ক্রিস্টিয়ানিয়ার (ওস্‌লো) রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। দীর্ঘ প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী মঞ্চের এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁহার নাট্যচর্চায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে 'উলাফ লিলিয়াক্রান্‌স' (১৮৫৭ খ্রী) ও 'হ্যারম্যান্দেনা প হেল্‌গেলন্দ' (হেল্‌গেলন্দে ভাইকিং, ১৮৫৮ খ্রী) নাটক দুইটি রচিত।

ক্রিস্টিয়ানিয়ার রঙ্গমঞ্চ অল্পদিনেই উঠিয়া যায়। এই সময়ে ইব্‌সেন লেখেন বিদ্রূপাত্মক 'খ্যার্লিহেতেন্‌স কুমেদিয়ে' (প্রেম প্রহসন, ১৮৬২ খ্রী) এবং ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রণে 'খন্‌স্‌সেম্‌নেনা' (ভণিতাকারীর দল, ১৮৬৪ খ্রী)। পরবর্তী দশ বৎসর স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়া ইব্‌সেন বিদেশে দিনযাপন করেন। 'ব্রান্দ' (১৮৬৬ খ্রী) ও 'পীয়ের য়িন্ত' (১৮৬৭ খ্রী) নামক বিখ্যাত নাটক দুইটি বিদেশ-বাসকালে রচিত।

এতদিন পর্যন্ত নাট্যকারের আলোচ্য ছিল দেশের

অতীত গৌরব, লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের রোমন্থন। পরবর্তী নাট্যাবলীতে প্রত্যক্ষ সমাজসমস্যা দেখা দিতেছে। 'দি উন্‌গেস ফর্‌বুন্দ' (যুবসংগঠন, ১৮৬৯) হইতে 'এন্ ফোল্‌কেফিএন্‌দে' (জনশত্রু, ১৮৮২) পর্যন্ত এই পর্বের বিস্তৃতি। মধ্যবর্তী কালে আছে 'ছেইসর অগ্ গলিলায়ের' (সম্রাট্ ও গালিলীয়, ১৮৭৩), 'সাম্‌ফুন্‌দেত্‌স স্ত্যাত্তের' (সমাজের স্তম্ভ, ১৮৭৭), 'এত্ দুক্কোএম্' (পুতুলের সংসার, ১৮৭৯) এবং 'য়েন্‌গঙ্গেরে' (প্রেতাত্মা, ১৮৮১)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'ভিল্‌দান্‌দেন' (মত্তহংসী) ইব্‌সেনের নাটকে প্রতীকী ধারার সূত্রপাত করে। এই সময় হইতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রকাশিত হইতে থাকে 'রুস্‌মের্স্‌হল্‌ম' (১৮৮৬), 'ফ্রুএন ফ্রা হাভেত' (সমুদ্র হইতে নারী, ১৮৮৮), 'হেদ্‌দা গাব্‌লর' (১৮৯০), 'ব্যিগমেস্তের স্যল্‌নেস' (মহানির্মাতা স্যল্‌নেস, ১৮৯২), 'লিল্লি ইয়োল্‌ফ' (ছোট্ট ইউল্‌ফ, ১৮৯৪), 'য়োউন গাব্রিএল বর্কমান' (১৮৯৬), 'নঅর ভি দ্যোত্থাভাকনের' (আমরা মৃতেরা যখন জাগি, ১৮৯৯)।

সমালোচকেরা সাধারণতঃ ইব্‌সেনের নাট্যজীবনকে চারিটি পর্বে বিন্যস্ত করিয়া দেখেন। প্রথম শিক্ষানবিশির পর্ব শেষ হইয়াছে 'ভণিতাকারীর দল'-এর সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায় মূলতঃ কবির রচনা, 'ব্রান্‌দ' ও 'পীয়ের য়িন্ত'। 'যুবসংগঠন' হইতে 'জনশত্রু' পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে সামাজিক নাটকাবলী। অন্তিম পর্যায় কল্পকাহিনী ও প্রতীকের যুগ। অবশ্য সমালোচকদের এই শ্রেণীবিন্যাসের উপযোগিতা সামান্যই। কারণ ইব্‌সেনের সমগ্র রচনা প্রকৃতপক্ষে একটিই বৃহৎ জীবনসত্যে উপনীত হইবার সাধনা। ব্যক্তির মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, এই ছিল তাঁহার নিরন্তর সংগ্রামের বিষয়। আর এই সামগ্রিক লক্ষ্যের রূপায়ণে তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে নারীচরিত্র।

আমাদের দেশে ইব্‌সেনের পরিচয় প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারক হিসাবে। অবশ্য সম্প্রতি অনুবাদ ও অভিনয়ের মধ্য দিয়া ইব্‌সেনীয় নাট্যরীতির পূর্ণতর পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। আধুনিক ইওরোপীয় নাট্যচর্চায় ইব্‌সেনের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার অনুবর্তী হিসাবে জার্মানীতে হাউপ্টমান ও সোডারমান এবং ইংল্যাণ্ডে বার্নার্ড শ -এর নাম উল্লেখযোগ্য। শ বলিতেন, 'ইংল্যাণ্ডে ইব্‌সেনের প্রভাব তিনটি বিপ্লব, ছটি ক্রুসেড, কয়েকটি বৈদেশিক অভিযান ও একটি ভূমিকম্পের সমান।'

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে ক্রিস্টিয়ানিয়ায় ইব্‌সেনের মৃত্যু হয়।

দ্র G. B. Shaw, *The Quintessence of Ibsenism* London, 1913 ; Halvdan Koht, *Life of Ibsen*, tr., R. L. MacMahon & H. A. Larsen, vols. I & II, New York, 1931 ; F. L. Lucas, *The Drama of Ibsen & Strindberg*, London, 1962.

শান্তি বসু

ইব্রাহিম কুতুব শাহ্ গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের চতুর্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান (রাজ্যকাল ১৫৫০-৮০ খ্রী)। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদর, আহ্‌মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহেন্দ্রীর হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করেন এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ অন্যান্য হিন্দু রাজগণকে পরাজিত করেন। ২ জুন ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ সুশাসক বলিয়া খ্যাত ; হিন্দুগণকে তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন ; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ পদও লাভ করিয়াছিলেন।

দ্র M. Taylor, *A Students' Manual of the History of India*, London, 1886 ; Sha Rocco, *Golconda and the Qutb Shahi (A Guide to Golconda Fort and Tombs)*, Hyderabad.

সুকুমার রায়

ইমাদশাহী বংশ ফতুল্লাহ ইমাদশাহ্ বেরারের মুসলমান রাজবংশ। বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে যে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজবংশের আবির্ভাব হয়, ইমাদশাহী বংশ তাহার অন্যতম। ফতুল্লাহ্‌র জন্ম কর্ণাটের এক হিন্দু পরিবারে। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধ-বন্দী হইয়া ইনি বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা খান-ই-জাহানের নিকট আনীত হন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে তাঁহার অধীনে উচ্চ পদ লাভ করেন। অবশেষে খান-ই-জাহানের মৃত্যুর পর তিনি বেরারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৯০ খ্রী) মাহ্‌মুদ বাহ্‌মনীর রাজত্বকালে ইমাদশাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ এই রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন না। ইলিচপুরে ছিল এই বংশের রাজধানী। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য আহ্‌মদনগরের নিজামশাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

বিজনকান্তি বিশ্বাস

ইমান প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ঈশ্বরের বাণীতে অন্তরে এবং মুখে আস্থা স্থাপনকে ইসলামে ইমান বলা হয়। 'যাহাদের ইমান আছে ও যাহারা সৎকর্মে লিপ্ত', কোরানে তাহারাই পুণ্যবান ব্যক্তি বলিয়া বর্ণিত।

আবুল হায়াত

ইমাম মুসলমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত। ইমাম মসজিদে নামাজ পড়ান ও জুম্মা (শুক্রবারের দ্বিপ্রাহরিক প্রার্থনা) এবং ঈদের নামাজে প্রার্থনান্তর ভাষণ দেন। সুন্নী সম্প্রদায় পূর্বকালের মুসলিম সংঘগুরু ও খলিফাকেও ইমাম বলিয়া অভিহিত করেন। হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হাসান ও হোসেন বিখ্যাত এবং মাননীয় ইমাম ছিলেন। ঐসলামিক নিয়ম-কানুন-প্রণয়নকারীগণকেও ইমাম বলা হয়।

আবুল হায়াত

ইমামবাড়া ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইমাম-এর জন্য দেওয়াল-ঘেরা স্থান। সাধারণতঃ মসজিদ অপেক্ষা ইমামবাড়ার আয়তন অনেক বড় হইয়া থাকে। সুবৃহৎ এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে মহরম উৎসব পালিত হয়। উৎসব ভিন্ন অন্যান্য সময়ে তাজিয়াসমূহ এই স্থানে রক্ষিত থাকে। কখনও কখনও প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার বংশধরগণের সমাধিক্ষেত্র হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। লখ্নৌ, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলির ইমামবাড়া সমধিক প্রসিদ্ধ।

হুগলি ইমামবাড়ার বর্তমান বিশাল অট্টালিকাটি হাজী মহম্মদ মহ্সীন -প্রদত্ত অর্থে নির্মিত। ১৮৪১ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহার নির্মাণকার্য চলিয়াছিল। ইহার প্রবেশপথের দুই ধারে ৮০ ফুট উচ্চ মিনার, প্রস্তরখচিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে দ্বিতল কক্ষের সারি, অভ্যন্তরস্থ মসজিদের দেওয়াল-গাত্রে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ। সংলগ্ন উদ্যানে অন্যান্য অনেকের সহিত মহম্মদ মহ্সীনের সমাধি বিদ্যমান।

দ্র Mrs. Meer Hassan Ali, *Observations on the Mussulmans of India*, Oxford, 1917.

ইম্পে, স্যর ইলাইজা (১৭৩২-১৮০৯ খ্রী) কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী নিযুক্ত। ১৩ জুন, ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্ম। ওয়েস্টমিন্স্টারে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের সহপাঠী ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলায় ইম্পে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসকে প্রণয়ঘটিত একটি মামলায় তিনি ৫০০০০ টাকা জরিমানা করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পে সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হাউস অফ কমন্স'-এ তাঁহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অবশ্য তিনি অভিযোগ-গুলি হইতে সসম্মানে নিষ্কৃতি পান। মিল, থর্নটন, মেকলে প্রভৃতির ইতিহাসগ্রন্থে তিনি কুচক্রীরূপে চিত্রিত। কিন্তু ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র কর্তৃক প্রকাশিত জীবনীতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হইয়াছে।

বিনয় ঘোষ

২৪°৪৪´ উত্তর, ৯৩°৫৮´ পূর্ব। আসাম রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মণিপুর ইউনিয়ন টেরিটরির রাজধানী। পূর্ব ইম্ফল ও পশ্চিম ইম্ফল নামে দুইটি মহকুমা এবং ইম্ফল নামে একটি নদীও আছে। ইম্ফল শহরে একটি বিমানবন্দর আছে। এখান হইতে বিমান-যোগে শিলচর হইয়া গৌহাটি ও কলিকাতা যাওয়া যায়। বিমানপথে ইম্ফল হইতে কলিকাতার দূরত্ব ৮৪৮ কিলো-মিটার বা ৫২৭ মাইল। স্থলপথে কলিকাতা হইতে সাহেবগঞ্জ মণিহারীঘাট আমিনগাঁও পাণ্ডু হইয়া ইম্ফল যাইতে পুরা তিন দিন লাগে এবং রেল ব্যতীত একবার স্টীমার ও ২২০ কিলোমিটার (১৩৭ মাইল) বাসে— মোট ১২৭৫ কিলোমিটার (প্রায় ৮০০ মাইল) পথ অতিক্রম করিতে হয়। বর্তমানে ফরাক্কা ও খেজুরিয়াঘাট দিয়াও যাওয়া যায়। প্রধানতঃ ডিমাপুর-ইম্ফল ন্যাশন্যাল হাই-ওয়ের মাধ্যমেই ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত ইম্ফলের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগ রক্ষিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী শহরের জনসংখ্যা ৬৭৭১৭। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৪১২১ এবং নারীর ৩৩৫৯৬। নারী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯৮৫ : ১০০০। মোট কর্মী ২৭৫৬৯ জন। পুরুষ ও নারী কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৯৮৫ ও ১৩৫৮৪। ইহাদের মধ্যে ২১২৬ জন পুরুষ ও ১১০৫৫ জন নারী গৃহশিল্পে নিযুক্ত। মণিপুরের ৪৯টি ধানকলের মধ্যে ৪৮টিই পূর্ব ও পশ্চিম ইম্ফল মহকুমায় অবস্থিত। ইম্ফল শহরে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিতের সংখ্যা ৩৪৩৭৮ (তন্মধ্যে পুরুষ ২৪০০৪ ও নারী ১০৩৭৪ জন)। এখানে একটি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, একটি পাবলিক লাইব্রেরি, ছোটদের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি সরকারি

কলেজ, দুইটি বেসরকারি সান্ধ্য কলেজ এবং একটি আইন কলেজ আছে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য 'আদিম জাতি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ৪টি হাসপাতাল ও ২টি ডাকবাংলো আছে। ইম্ফল শহর মণিপুরী সাহিত্য প্রচারের কেন্দ্র। সংগীত নাটক আকাদেমি ও মণিপুর সরকারের অর্থসাহায্যে 'মণিপুর ডান্স কলেজ' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ৪ বছরের পাঠ্যক্রমে মণিপুরী নৃত্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইম্ফলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪.৪° সেন্টিগ্রেড (৯৩.৯° ফারেনহাইট) ও ৩.৫° সেন্টিগ্রেড (৩৮.৩° ফারেনহাইট)। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৪১৩ মিলিমিটার (৫৫.৬৩ ইঞ্চি)।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Eastern Bengal & Assam*, Calcutta, 1909 ; *Census of India : Paper No. I of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962 ; *Gazetteer of India : Manipur*, Calcutta, 1963.

দিনেনকুমার সোম

ইয়ং বেঙ্গল নব্যবঙ্গ। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-শিষ্যগণ এই নামে খ্যাত। অবশ্য প্রাক্-ডিরোজিও ও উত্তর-ডিরোজিও যুগের কোনও কোনও ছাত্রকেও কেহ কেহ পরবর্তী কালে ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন। ঠিক কখন হইতে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামের প্রচলন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে (vol. xvi) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'ইয়ং বেঙ্গল' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল হেয়ারের স্মৃতিসভায় 'ইয়ং বেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও -র অধ্যাপনাকালে (১৮২৬-৩১ খ্রী) হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার শিক্ষায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ খ্রী), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮ খ্রী), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮ খ্রী), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৬৮ খ্রী), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮ খ্রী), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ খ্রী), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ খ্রী), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮ খ্রী), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০ খ্রী) প্রভৃতি। তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭ খ্রী) ও চন্দ্রশেখর দেব -এর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তারাচাঁদ ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এমন কি ডিরোজিও অপেক্ষাও তিনি তিন বৎসরের বড় ছিলেন। নব্যবঙ্গের যুবকদল সকল কর্মে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। এই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর উপর তারাচাঁদ চক্রবর্তীর এতদূর প্রভাব ছিল যে, 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'-র সম্পাদক মার্শম্যান ইহাদের নামকরণ করেন 'চকরবর্তী ফ্যাক্‌শন' বা 'চক্রবর্তী চক্র'।

কলেজভবনে ও কলেজের বাহিরে ডিরোজিও এই যুবক ছাত্রগণকে দার্শনিকোচিত যুক্তির ভিত্তিতে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ ভাবধারার অনুবর্তী হইয়া ছাত্রেরা ধর্মীয় রীতিনীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করিতে এবং কখনও কখনও উহা লঙ্ঘন করিতেও প্রবৃত্ত হইতেন। খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধও তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। এই কারণে হিন্দুসমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়।

ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালীর যে দুইটি দিক ছাত্রদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা হইল, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা। কৃষ্ণমোহনের মতে তাঁহারা ছিলেন 'সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু'। এই সংস্কারমুক্তির প্রেরণায় রসিককৃষ্ণ প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গার নামে শপথ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন: 'আমি গঙ্গার পবিত্রতা মানি না।' এক দিকে ধর্মীয় ও সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে, অন্য দিকে প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা ছিলেন সমান কঠোর। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনই হউক অথবা দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হউক, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারই হউক অথবা কৃষিকার্যের উন্নতি বিষয়েই হউক, সমস্ত কিছুতেই তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অত্যধিক মোহ সত্ত্বেও মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। তখন নব্যবঙ্গের শিক্ষিত যুবকদল ইংরেজী সমর্থন করিলেও শিক্ষার মাধ্যম যে একদা মাতৃভাষা তথা বাংলাকেই করিতে হইবে, এইরূপ মত ব্যক্ত করেন। বাংলা ভাষাকে সর্বজনবোধ্য ও সহজ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ব্যাপারে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র -সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪ খ্রী) ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ

ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডিরোজিওর শিষ্যগণের বহুমুখী কর্মধারার সূত্রপাত ছাত্রজীবন হইতে লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষের জন্য তাঁহারা একাধিক বিতর্ক ও আলোচনা -সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধরনের সভার মধ্যে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ইহা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই সভায় শিক্ষা ও সমাজ -বিষয়ক নানা ব্যাপারে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতেন। এই সব বিতর্ক-সভায় স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডব্‌লু. ডব্‌লু. বার্ড, কর্নেল বেন্‌সন প্রমুখ বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারীগণও উপস্থিত থাকিতেন। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডেভিড হেয়ার ইহার সভাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অধীত বিদ্যা অনুশীলন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য নব্যবঙ্গের যুবকগণ 'এপিসোলারি অ্যাসোসিয়েশন' -এরও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার পরিদর্শক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে এই সভার দান অনেকখানি। ইহার একটি অধিবেশনে (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩ খ্রী) দক্ষিণারঞ্জন 'প্রেজেন্ট কণ্ডিশন অফ দি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিজ কোর্ট্‌স অফ জুডিকেচার অ্যাণ্ড পোলিস আণ্ডার দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে কোম্পানির শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইলেও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ঠিক রাজনৈতিক সভা ছিল না। কিন্তু ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টম্‌সনের এ দেশে আগমন ও তাঁহার সহিত নব্যবঙ্গের যুবকগণের যোগাযোগ হইবার পর হইতে তাঁহারা এই জাতীয় রাজনৈতিক সভার প্রয়োজন অনুভব করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা আহূত হয়, তাহাতে টম্‌সনের সভাপতিত্বে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র গোড়াপত্তন হয়। ইহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ। কার্যনির্বাহক সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর -প্রতিষ্ঠিত জমিদার-সভার (ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্‌স অ্যাসোসিয়েশন) সহিত মিলিত হইয়া বিখ্যাত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এ পরিণত হয়। ইহা ছাড়া 'বেথুন সোসাইটি', 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা' প্রমুখ সভা-সমিতির সঙ্গেও ইয়ং বেঙ্গলের অনেকের যোগ ছিল। বঙ্গের বাহিরেও ইঁহাদের কর্মধারা পরিব্যাপ্ত হয়। অযোধ্যার তালুকদার-সভা (১৮৬১ খ্রী) প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই সভার মুখপত্ররূপে 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত-পত্রিকা' নামে দুইখানি সংবাদপত্রেরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা জনমত গঠন ও জনশিক্ষা ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহারা 'দি পার্থিনন' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দরুন ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রচারিত হয় নাই। ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যগণ ইহা ছাড়া আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'দি এন্‌কোয়ারার' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহযোগিতায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তারাচাঁদ চক্রবর্তী 'দি কুইল' ও রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' (১৮৪২ খ্রী) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার -সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারকল্পে নব্যবঙ্গের প্রযত্ন সুবিদিত। তাঁহারা কেহ কেহ কলেজে অধ্যয়নকালেই কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজত্যাগের পরেও তাঁহারা এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র জনৈক বন্ধুকে লইয়া নিজ বাটীতে এইরূপ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন এবং রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব সেখানে ছাত্রগণকে রীতিমত পড়াইতেন। বিজ্ঞানশিক্ষা, কারিগরিশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নব্যবঙ্গের নেতৃ-স্থানীয় রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নানা প্রকারে আন্তরিক সহযোগিতা করেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, শেষে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত) প্রতিষ্ঠাকালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র দীর্ঘকাল

ইহার গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহাকে বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবার প্রয়াস পান।

সাহিত্যসাধনায়ও নব্যদল বিশেষ অগ্রণী। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর বাংলা-ইংরেজী অভিধান (পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সহযোগিতায়), ৫ খণ্ডে মনুসংহিতার সংস্কৃত-বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত (সম্পাদিত) গ্রন্থসমূহ, বিশেষভাবে তাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক ইংরেজী-বাংলা কোষগ্রন্থ, প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন এবং গ্র্যান্টের জীবনচরিত প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প-বাণিজ্যেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র। স্বদেশীয় কৃষির উন্নতি ও প্রসার-কল্পে প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রিকাল্‌চারাল অ্যাণ্ড হর্‌টিকাল্‌চারাল সোসাইটি'-র (কৃষি সমাজ) সঙ্গেও তাঁহাদের কেহ কেহ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা সরকারি কর্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সততা ও দক্ষতায় আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। শাসন ও বিচার-বিভাগে দুর্নীতি দমনে তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচন্দ্র দেব ও হরচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখ করিতে হয়। আদর্শ শিক্ষাব্রতীরূপে রামতনু লাহিড়ী সরকারি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া একটি সুষ্ঠু শিক্ষাদানরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

এইরূপে নব্যদল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে নব ভারত গঠনের ভিত্তিস্থাপনে একান্ত যত্নপর হন। ধর্ম-বিষয়ে ইঁহারা ছিলেন উদারমতাবলম্বী। কেহ কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর কল্যাণ-চিন্তাই ছিল তাঁহাদের সকল কর্মের নিয়ামক। এই কথা বিশেষভাবে বলিবার উদ্দেশ্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সেকালের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি ইঁহাদের দেশ ও মাটির সহিত সম্পর্কশূন্য অমূল তরু বলিয়া মনে করিতেন। ফলে গোমাংস ভক্ষণ, সুরাপান ও হিন্দুয়ানির বিরোধিতাই ইয়ং বেঙ্গলের একমাত্র আদর্শ— এইরূপ বিকৃত ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় যথেষ্ট উগ্রতা থাকা সত্ত্বেও দেশের গঠনমূলক কার্যে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে।

দ্র শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯০৩; রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলিকাতা, ১৯৬১; যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬১; যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৯৬০। Thomas Edwards, *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*, Calcutta, 1884; Pearychand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta, 1877; A. C. Gupta, ed., *Studies in The Bengal Renaissance*, Bepin Chandra Pal Centenary Commemoration Volume, Calcutta, 1958.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ইয়ংহাজব্যাণ্ড, ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড (১৮৬৩-১৯৪২ খ্রী) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে পাঞ্জাবের সুপরিচিত শৈলাবাস মারি-তে (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত) তাঁহার জন্ম। প্রথমে ক্লিফ্‌টন-এ, পরে ব্রিটেনের বিখ্যাত সামরিক বিদ্যালয় স্যাণ্ডহার্স্ট-এ শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে অফিসার রূপে যোগদান করেন। ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের পিকিং নগরী হইতে সিনকিয়াং প্রদেশের ইয়ারকন্দ্‌ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত ভূভাগ পর্যটন করেন এবং ইয়ারকন্দ্‌ হইতে মুজতাগ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া কারাকোরাম পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে উপনীত হন। পর্যটনকালে তিনি আগহিল (Aghil) পর্বতমালা আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, কারাকোরাম পর্বতমালাই ভারত ও মধ্য এশিয়ার জলবিভাজক। পরবর্তী কালে কারাকোরাম অতিক্রম করিয়া দুইবার পামীর মালভূমি পরিক্রমণ করেন। শাকস গাম নদীর গতিপথ অনুসরণ করিয়া যেখানে তাহা ইয়ারকন্দ্‌ নদীতে মিশিয়াছে ততদূর পর্যন্ত তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ংহাজব্যাণ্ড ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগে বদলি হন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কাজ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। তিব্বত-ভারত সীমান্তে গোলযোগের পর তাঁহারই নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ কূটনৈতিক মিশন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের রাজধানী লাসায় গমন করে। ইহার ফলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর বিখ্যাত ইঙ্গ-তিব্বতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রিড লেকচারার-পদে বৃত হন। কিন্তু পরবৎসরই তিনি আবার ভারতে ফিরিয়া আসেন

এবং কাশ্মীরে ভারত সরকারের রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে আসীন ছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ংহাজব্যাণ্ড 'নাইট কম্যাণ্ডার অফ দি স্টার অফ ইণ্ডিয়া' খেতাবে ভূষিত হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁহাকে স্বর্ণপদক দান করিয়া সম্মানিত করেন। অবসর গ্রহণের পর (১৯১৯ খ্রী) তিনি উক্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট-পদে বৃত হন। সেই সময়ে তিনি এভারেস্ট-অভিযানের জন্য রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ হইতে একটি সমিতি গঠন করেন। পরে তিনি উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জুলাই ইংল্যাণ্ডের ডরসেট কাউন্টিতে লাইচেট গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইয়ংহাজব্যাণ্ডের রচনাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য : 'লাইফ ইন দি স্টারস্' (১৯২৮ খ্রী), 'দি লিভিং ইউনিভার্স' (১৯৩৩ খ্রী) ও 'দি মডার্ন মিস্টিক্স' (১৯৩৫ খ্রী)। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধ : 'হার্ট অফ এ কন্টিনেন্ট' (১৮৯৬ খ্রী), 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড টিবেট' (১৯১২ খ্রী), 'হোয়্যার থ্রি এম্পায়ার্স মীট' ও 'কাশ্মীর' (১৯০৯ খ্রী)। দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া তিনি 'সাউথ আফ্রিকা অফ টুডে' (১৮৯৮ খ্রী) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

ইয়েট্স, উইলিয়াম য়েট্স, উইলিয়াম দ্র

ইয়েট্স, উইলিয়াম বাটলার য়েট্স, উইলিয়াম বাটলার দ্র

ইরাবতী পঞ্চনদের অন্যতম। গ্রীক নাম হিদ্রাওতেস, পাঞ্জাবে ও ইংরেজীতে রাবি নামে পরিচিত। ধওলাধর পর্বতের উত্তর ঢাল ও পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ ঢাল হইতে উদ্ভূত দুইটি জলধারা মিলিয়া ইরাবতী নদীর সৃষ্টি। উৎপত্তির পর ইহা চম্বা উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচীন হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ ও লাহোর ইরাবতীতটে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের মুলতান জেলার উত্তরে সরাই-সিধার নিকটে চন্দ্রভাগার (চেনাব) সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। কিছু দূর পর্যন্ত ইরাবতী পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা রচনা করিয়াছে।

কপিল ভট্টাচার্য

ইল রামায়ণে ও বিভিন্ন পুরাণে রাজা ইলের কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত আছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও কাহিনীর সারাংশ সর্বত্রই প্রায় এক। রামায়ণে আছে, বাহ্লীকদেশের নরপতি কর্দমের পুত্র ইল ছিলেন পরম ধর্মপরায়ণ নৃপতি। একদিন মৃগয়াব্যাপৃত নরপতি অকস্মাৎ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সে সময়ে মহেশ্বর উমার সহিত সেই অরণ্যে বিহার করিতেছিলেন বলিয়া সেই স্থানের সমস্ত প্রাণীর সহিত রাজা ইল স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। নিজের এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত নরপতি মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেবের বরে তখন ইল কিম্পুরুষত্ব লাভ করেন। এইজন্য তাঁহার বাসস্থান কিম্পুরুষবর্ষ নামে খ্যাত হয়। স্ত্রী অবস্থায় থাকাকালীন তাঁহার সহিত চন্দ্রের পুত্র বুধের মিলন হইয়াছিল। তাঁহাদের পুত্র পুরূরবা ছিলেন চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চ্যবন বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণের পরামর্শে ইল মহাদেবের প্রীত্যর্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রীরূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

মৎস্যপুরাণে এই কাহিনী ঈষৎ অন্যরূপে পাওয়া যায়। এই কাহিনী অনুসারে ইল বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মনু ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যার জন্য নন্দনবনে গমন করেন। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ইল দিগ্বিজয়যাত্রা করেন। সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণান্তে ইল একদিন অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণকালে দৈবাৎ মহাদেবের শরবনে প্রবেশ করেন। সেই বনে তখন শিব-পার্বতী অবস্থান করিতেছিলেন। কোনও পুরুষ সেই সময়ে শরবনে প্রবেশ করিলে স্ত্রীরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ফলে অশ্বসহ ইল স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্ত্রী অবস্থায় তিনি ইলা নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার পূর্বস্মৃতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। ইলা রূপে অবস্থানকালীন চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও উত্তরকালে ইলা পুরূরবা নামক বিখ্যাত নৃপতির জননী হন। এই পুরূরবাই প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইতিমধ্যে রাজা ইলের অন্যান্য ভ্রাতা উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার সন্ধানে বাহির হন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁহারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া ইলার কিম্পুরুষত্বের বরলাভ করেন। অর্থাৎ ইলা একমাস সুন্দরী স্ত্রীরূপে থাকিবেন ও একমাস পুরুষরূপে অবস্থান করিবেন এই অবস্থায় ইলার নাম হইল সুদ্যুম্ন। পুরুষ অবস্থায় সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব নামে তিনটি রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নৃপতি ইলের নামানুসারে তাঁহার বর্ষ ইলাবৃতবর্ষ নামে খ্যাত হয়। 'ইলা' ও 'ইলাবৃতবর্ষ' দ্র।

দ্র রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০১-২ ; মৎস্যপুরাণ, ১১।৪০-৬৬, ১২।১-৪৪ ।

সংযুক্তা গুপ্ত

ইলতুৎমিস, শামসুদ্দীন (রাজ্যকাল ১২১১-৩৬ খ্রী) তথাকথিত দাস রাজবংশের তৃতীয় সুলতান। তুর্কিস্তানের এক উপজাতীয় বংশে জন্ম। কুতুবুদ্দীন কর্তৃক ইনি ক্রীত হন। কিন্তু আপন বুদ্ধি ও শক্তিমত্তার প্রভাবে ইলতুৎমিস ক্রমেই উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেন। তিনি বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, কুতুবুদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'আমীর-উল্-উমরা' নামক সম্মানের পদে উন্নীত হন।

কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম লাহোরে সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু দিল্লীর আমীরগণের আমন্ত্রণে ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার অল্প পরেই দেশের চতুর্দিকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও সাহসের সহিত তিনি দিল্লীর আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও বহিরাগত আক্রমণগুলিকে ব্যাহত করেন। বদায়ুন, বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চল শীঘ্র তাঁহার আয়ত্তে আসে। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাজউদ্দীন ইলদিজ পাঞ্জাব অধিকার করিলে ইলতুৎমিস সতর্ক হন এবং ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দী করেন। পাঞ্জাবের পরে বাংলার বিদ্রোহ দমিত হয়। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রনথম্ভোর ও সিন্ধু দেশ এবং ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র পুনরধিকার করেন। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মালব আক্রমণ করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগর বিধ্বস্ত করেন। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়।

দিল্লীর তুর্কি সাম্রাজ্যকে ইলতুৎমিসই প্রথম একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে 'সুলতান-ই-আজম' রূপে স্বীকৃতি দান করিলে মুসলিম জগতে ভারতের মুসলমান রাজ্যের বিধিসংগত প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইলতুৎমিসের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের জন্য দিল্লী ও মুলতানে তিনি দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইলতুৎমিস শিল্পানুরাগী নরপতি ছিলেন। একাধিক কবি ও মনীষী তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন। দিল্লীর কুতুব-মিনার ও আজমীরে 'আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া' মসজিদের নির্মাণকার্য তিনি সম্পূর্ণ করান।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. V, Bombay, 1957 ; A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1961.

ইলবার্ট বিল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি বড়লাটের আইনসভায় ফৌজদারী বিচার আইনের সংশোধক একটি বিল উপস্থাপিত হয়। তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড রিপন। ভারত সরকারের আইন-সদস্য ইলবার্ট ছিলেন এই বিলের রচয়িতা। এই বিলের দ্বারা মফস্বলের ইওরোপীয় আসামীদিগকে ভারতীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই বিলের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় ইওরোপীয়দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এই বিল নাকচ করিবার জন্য তাহারা তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ব্যারিস্টার ব্র্যান্‌সন ছিলেন ইলবার্ট বিল-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। ভারতীয়দের স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতীয়দের পক্ষে এই সময়ে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাগ্মী লালমোহন ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে তিনি ঢাকার নর্থব্রুক হলে যে উত্তেজক বক্তৃতা দেন, এদেশের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। এই উপলক্ষে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেভার-নেভার' কবিতা ইওরোপীয়দের স্বার্থের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর কল্পনা প্রদীপ্ত করিয়াছিল।

ভারতবর্ষস্থ ইওরোপীয়দের আন্দোলনের চাপে ইলবার্ট বিল শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত আকারে আইনে পরিণত হয় (১৮৮৩ খ্রী)। নূতন আইনে ইংরেজদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতীয়দের পক্ষে তখনকার মত ব্যর্থ হইলেও পরিণামে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। ঐক্য ও সংগঠন ছাড়া ইংরেজদের নিকট হইতে যে অধিকার অর্জন করা যাইবে না, ভারতবাসী সেদিন ইহা উপলব্ধি করে।

দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, কলিকাতা, ১৯৩৫ ; Sir James Stephen, 'Ilbert Bill' : *Sir J. F. Stephen's Letters to "The Times"*, 1883 ; Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, *The Growth of Nationalism in India*, Calcutta, 1957.

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ইলা ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রগণের জন্মের পূর্বে বৈবস্বত মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণ দেবযুগলের প্রীতিসাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু মনুপত্নী মনাবী দুহিতা কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে যজ্ঞের হোতা কন্যা-

লাভের সংকল্পে আহুতি প্রদান করেন। এই বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী এক কন্যা উদ্ভূত হইয়া মনুর নিকটে গমন করেন ও তাঁহার কন্যা বলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন। মনু পুত্রপ্রার্থী থাকায় মিত্রাবরুণের বরে ইলা পুত্ররূপে পরিবর্তিত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। আবার যৌবনে সুদ্যুম্ন দৈবরোষে কন্যা হইয়া যান। তদবস্থায় চন্দ্রপুত্র বুধের দৃষ্টিপথে আসিয়া বুধপুত্র পুরূরবার জননী হন। কিন্তু তাঁহাকে চিরদিন স্ত্রীরূপে থাকিতে হয় নাই। অমিততেজা মহর্ষিগণ কর্তৃক আরাধনায় পরিতুষ্ট শিবের বরে তিনি পুনরায় সুদ্যুম্নরূপ প্রাপ্ত হন।

দ্র বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১।৯-১৩, ৪।৬।৩৪।

সংযুক্তা গুপ্ত

ইলাবৃতবর্ষ পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে পৃথিবী নয় ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগকে বর্ষ বলা হইত। ইলাবৃত ইহার চতুর্থ বর্ষ। ইহার উত্তরে নীল, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান ও পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতানুসারে চীন, তুর্কিস্তান ও গোবি মরু লইয়া ইলাবৃতবর্ষ। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতানুসারে ইলাবৃতবর্ষ মধ্য এশিয়ার কোনও স্থান, সম্ভবতঃ আধুনিক পামীর বা পূর্ব তুর্কিস্তান। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ।

ভাগবতপুরাণ (৫।২) অনুসারে জম্বুদ্বীপের অধিপতি অগ্নিধ্রের পুত্র ছিলেন ইলাবৃত। অগ্নিধ্র তাঁহার নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ ভাগ করিয়া দেন। তন্মধ্যে ইলাবৃতের বর্ষ ইলাবৃতবর্ষ নামে পরিচিত। আবার মৎস্যপুরাণে (১১-১২) আছে, বৈবস্বত মনুর পুত্র রাজা ইল-র নামানুসারেই ইলাবৃতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। 'ইল' দ্র।

দ্র গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণপ্রবেশ, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৌরাণিক উপাখ্যান, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

ইলামবাজার বীরভূম জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত থানা ও মৌজা। ইহা বোলপুর স্টেশন হইতে অনধিক ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরে অজয় নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পানাগড়, সিউড়ি ও বোলপুর যাইবার পাকা রাস্তা ইলামবাজারের পাশ দিয়া গিয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ইলামবাজার থানার লোকসংখ্যা ৬৮৮৮২ (পুরুষ ৩৪৬৪৫ ও স্ত্রীলোক ৩৪২৩৭)। তন্মধ্যে ১০১৯৯ জন পুরুষ ও ৩০৩১ জন স্ত্রীলোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত।

ইলামবাজার একদা বর্ধিষ্ণু মৌজা ছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে লাক্ষা, তসর প্রভৃতি কুটিরশিল্পের জন্য ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইলামবাজার যে একসময় তুলা-ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবেও পরিগণিত হইত, এখানকার অধুনালুপ্ত তুলাপট্টি পল্লীর নামকরণের মধ্যে তাহার সাক্ষ্য বিদ্যমান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত ইলামবাজারের লাক্ষার তৈয়ারি খেলনা ও অলংকারের এবং লাক্ষারং দিয়া বস্ত্ররঞ্জনশিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। লাক্ষাশিল্পী সম্প্রদায়ের দুই-চারি জন ব্যক্তি আজিও ঐ শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; তাহাদের উপাধি 'নুরী'।

আর্স্‌কিন অ্যাণ্ড কোম্পানি নামক একটি ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠান উনবিংশ শতাব্দীর কোনও সময়ে লাক্ষাজাত দ্রব্য ও নীলের বাণিজ্যের জন্য ইলামবাজারে একটি কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠান বোধ হয় তুলার বাণিজ্যও করিত। স্বত্বাধিকারী ডেভিড আর্স্‌কিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে ফার্কারসন ও ক্যাম্প্‌বেল নামক দুই ব্যক্তি কোম্পানিটি কিনিয়া লন। এই সময় হইতে ব্যবসায়ের মন্দা শুরু হয় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মালিকানা হস্তান্তরের পরে কোম্পানিটি উঠিয়া যায়।

ইলামবাজারে মোট সাতটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলির গায়ে দেব-দেবীর মূর্তি, জীবজন্তু, গাছপালা, সৈন্যসামন্ত এবং রামায়ণ ও পুরাণ -কাহিনীর বৃত্তান্ত -সংবলিত পোড়ামাটির কাজ প্রশংসনীয়। হাটতলার মন্দিরের স্থাপত্যরীতি ও ভাস্কর্যের লৌকিক বিষয়বস্তু দেখিয়া মনে হয় উহা ইংরেজ আগমনের প্রারম্ভিক পর্বে নির্মিত। অবশ্য ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় নাই। ইলামবাজার গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত শিব-মন্দিরে দৈনিক পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে। মন্দিরটির পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে প্রথমোক্ত মন্দিরের অনুরূপ কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজ আছে। মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে সুন্দর জগদ্ধাত্রীমূর্তি বিদ্যমান। তৃতীয় মন্দিরটি লক্ষ্মী-জনার্দনের। ইহা স্থানীয় ভূস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহাঙ্গনে অবস্থিত। গৌড়ীয় শৈলীর এই পঞ্চরত্নমন্দিরের স্থাপত্যে ইসলামি ও ইওরোপীয় রীতির প্রভাব আছে। পোড়ামাটির কারুকার্যে মন্দিরটি অলংকৃত। মন্দিরগাত্রের একটি ফলক হইতে জানা যায়, ইহার নির্মাণকার্য ১৭৬৮ শকাব্দের বা বাংলা ১২৫৩ সনের বৈশাখ মাসে (১৮৪৬ খ্রী) সমাপ্ত হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হাটতলার মন্দিরপ্রাঙ্গণে তিন দিন ধরিয়া যে কীর্তনের আসর বসে তাহাতে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রায় ১০ কিলোমিটার (সাড়ে ছয় মাইল) দূরবর্তী বৈষ্ণব-বাউল তীর্থক্ষেত্র জয়দেব-কেঁদুলির বিখ্যাত মেলা উপলক্ষে ইলামবাজার গ্রামেও বাউল ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দ্র *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Birbhum*, Calcutta, 1954; A. Mitra, ed., *West Bengal District Records : New Series : Birbhum : 1786-1797 and 1855*, Calcutta, 1954; M. Dey, *Birbhum Terracottas*, New Delhi, 1959; *Imperial Gazetteers of India*, vol. XIII, London, 1908.

প্রণবরঞ্জন রায়

ইলিশ আমাদের দেশের সুপরিচিত মাছ। ইহা সাড মাছের ভারতীয় প্রকারভেদ, বৈজ্ঞানিক নাম 'হিল্‌সা ইলিশ'। ইলিশের মত সুদৃশ্য মাছ খুব কমই দেখা যায়। স্বাদ ও গন্ধের জন্যও ইলিশ মাছ প্রায় সর্বজনসমাদৃত। ভারতের প্রায় অধিকাংশ বড় বড় নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের মাছের স্বাদে যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। বাংলা দেশের গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ইলিশ মাছই বোধ হয় সর্বাধিক রসনাতৃপ্তিকর। সদ্যধৃত পদ্মার ইলিশের সর্বশরীরে একটা গোলাপি আভা থাকে। কিন্তু সদ্যধৃত গঙ্গার ইলিশে একপ্রকার সোনালি আভা দেখা যায়।

বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব বঙ্গে, হিন্দু অধিবাসীরা ইলিশ মাছকে আচার-অনুষ্ঠানেরও অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। হিন্দুদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিজয়া দশমীর পর হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত ইলিশ জালে ধরা বা খাওয়া নিষিদ্ধ। শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রথম জোড়া ইলিশ আনিয়া গৃহিণীরা মাছের উপর সিন্দুর দিয়া নোড়া, ধান-দূর্বা ও শুষ্ক পাটপাতা সমেত বরণ কুলায় স্থাপন করে। তার পর হুলুধ্বনি দিয়া বড় ঘরের মধ্যে লইয়া যায় এবং মাছ কুটিয়া আঁশগুলিকে মধ্যম খুঁটির গোড়ায় গর্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলে। পরে এই মাছ না ভাজিয়া রান্না করা হয়।

ইলিশ সমুদ্রে বিচরণকারী মাছ। প্রায় সারা বৎসর ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া দলে দলে তীরের কাছাকাছি সমুদ্র-জলে আহার্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ডিম ছাড়িবার সময় হইলেই বড় বড় নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটিয়া নদীর উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহারা সাধারণতঃ জলের ৬০-৯০ সেন্টিমিটার (২-৩ ফুট) নীচ দিয়াই চলাফেরা করে; তবে কোনও কোনও স্থানে স্রোতের বেগ খুব তীব্র হইলে জলের অনেক নীচে নামিয়া যায়। নদীর উপরের দিকে শত শত কিলোমিটার অগ্রসর হইবার পর স্ত্রী মাছ নদীর কোনও অগভীর স্থানে মন্দীভূত স্রোতে ডিম ছাড়ে এবং সেখানেই পুরুষ মাছ কর্তৃক ডিমগুলি নিষিক্ত হয়। ডিম ফুটিবার পর বাচ্চাগুলি প্রায় মাসখানেক সেখানে থাকিয়া একটু বড় হইবার পর নদীর প্রধান স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রবল স্রোতের দ্বারা পরিবাহিত হইয়া সমুদ্রে উপনীত হয়। প্রায় দুই বৎসর সমুদ্রে থাকিয়া পরিণত অবস্থায় ইহারা আবার নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং উজান বাহিয়া তাহাদের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসে। গঙ্গা নদীতে ইলিশ মাছকে প্রায় ১২৮০ কিলোমিটার (৮০০ মাইল) উজানে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। আজকাল অনেক নদীতে বাঁধ ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টির ফলে বেশিদূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অসংখ্য মাছ বাঁধের কাছে জমায়েত হয়। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ইলিশ এখানে ডিম ছাড়িতে পারে না। কাজেই এই সকল স্থানে প্রচুর মাছ ধরিবার সুবিধা হইলেও তাহাতে মাছের বংশ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই কারণে কোনও স্থানে বাঁধের প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) আগে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে ডিম ছাড়িলেও হুগলি নদীতে বর্ষাকালেই ইলিশ মাছ সর্বাধিক ডিম ছাড়িয়া থাকে এবং এখানে প্রচুর জাটকা মাছও (ইলিশের বাচ্চা) দেখা যায়। জাটকা মাছ সমুদ্রে পৌঁছিয়া খুব গভীর সমুদ্রে যায় না—নদীর মোহানায় বা সমুদ্রতীরের কাছাকাছি ঝাঁক বাঁধিয়া আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ছোট-বড় সব রকম ইলিশ মাছই সাধারণতঃ প্ল্যাঙ্কটন, ডায়েটম ও নানা প্রকার জৈব পদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকে।

বর্ষাকালে যখন অন্যান্য মাছের দারুণ অভাব ঘটে, তখন রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে অবশ্য পূর্ব বঙ্গে শীত-কালেও ছোট ইলিশ এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চে প্রচুর জাটকা মাছ ধরা হয়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদী ছাড়া বরিশালের তেঁতুলিয়া, কাজুলিয়া, জয়ন্তী, কালাবদর, টর্কি, আঁধারমানিক, বিশখালি, লোহালিয়া, পটুয়াখালি, বেগলি, পাল্‌নাখালি, ইলিশা, বেরিং, আড়িয়াল খাঁ,

সফিপুর, নয়াভাঙা ; যশোহর জেলার মধুমতী, মাথাভাঙা, চিত্রা, নবগঙ্গা ; ময়মনসিংহের ধন্থ, কালিনদী ; খুলনায় ভৈরব, অস্তরহাকী, আতাইর, পস্থর, বলেশ্বর ; শ্রীহট্টের কুশীয়ারা, সুর্মা ; চট্টগ্রামে বেতুয়া, কুমারিয়া খাল, কর্ণফুলী ; রাজশাহীর মহানন্দা ; পাবনার হুরাসাগর ; ফরিদপুরের মধুমতী এবং কুষ্টিয়ার গড়াই প্রভৃতি নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদীর উপরের দিকে বেশি ইলিশ পাওয়া যায় না, কারণ ঐ সকল নদীর উপরের দিকের স্রোতের তীব্রতা এত বেশি যে, মাছ আড়াই-তিন শত কিলোমিটারের (দুই-এক শত মাইল) বেশি উজানে যাইতে পারে না। পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন নদীতে ইলিশ ধরিবার জন্য বিভিন্ন রকমের জাল ব্যবহার করা হয় : তাহাদের মধ্যে টানা জাল, বেড় জাল, কোনা জাল, দাঁড়া জাল, পাতন জাল, চণ্ডী জাল, ছাঁকনি জাল, চাপিলা জাল, হর জাল, খড়কি জাল, সাংলা জাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশ ছাড়া বিহার, ওড়িশা (উড়িষ্যা), মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও যথেষ্ট ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ ও হুগলি নদী বা রূপনারায়ণের ইলিশের মত উত্তর প্রদেশ ও চিল্‌কা হ্রদ, বালেশ্বর, ছত্রপুরের মাছ তত উৎকৃষ্ট নহে। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা, গোমতী, এটোয়াম, যমুনা ও চম্বল নদী ; মাদ্রাজে কৃষ্ণা, গোদাবরী ও কাবেরী নদী ; ভারতের পশ্চিম উপকূলে নর্মদা ও উলাস নদী ; মালাবার উপকূল এবং সিন্ধু নদে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। সিন্ধু নদের ইলিশকে বলা হয় পালা।

কলিকাতার বাজারে প্রধানতঃ এই সব স্থান হইতে ইলিশ মাছ আমদানি হইয়া থাকে পূর্ব বঙ্গে— নারায়ণগঞ্জ, মুনশিগঞ্জ, ভাগ্যকুল, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি, বেলগাছি, কালুখালি, পাংশা, কুষ্টিয়া, সারাঘাট, ভেড়ামারা, পাকশী, দামুকদিয়া ঘাট, বরিশাল, খুলনা ; পশ্চিম বঙ্গে— ফলতা, উলুবেড়িয়া, ডায়মণ্ড হারবার, কোলাঘাট, লালগোলাঘাট, ধুলিয়ান ; বিহারে— বক্সার, রাজমহল ; উত্তর প্রদেশে— বারাণসী, চুনার, মীর্জা রোড, মীর্জাপুর, জামানিয়া, এলাহাবাদ ; ওড়িশায়— চিল্‌কা, বাহানাগা বাজার, বালেশ্বর, ছত্রপুর। বোম্বাইয়ে— বম্বে ভি. টি.।

ইলিশের দেহে তেল অত্যন্ত বেশি এবং এই তেলের জন্যই ইহা এত সুস্বাদু ও সুগন্ধি। ইলিশ স্নিগ্ধকর, পাকস্থলীর ক্রিয়াবর্ধক, কফ-প্রধান ও বায়ুনাশক। ইহার যকৃতে ১২০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়, কিন্তু এই মাছের তেলে 'এ' ভিটামিনের অস্তিত্ব নাই। ইহার দেহে ১৯·৪ শতাংশই চর্বি। ১০০ গ্রাম কাঁচা মাছের মধ্যে থাকে ০·১৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০·২৮ গ্রাম ফস্‌ফরাস, ২১৩ মিলিগ্রাম আয়রন এবং আয়নিত হইতে পারে এরূপ আয়রন ০·৬৩ মিলিগ্রাম। মাছের খাদ্যোপযোগী অংশে ২১·৮ শতাংশ প্রোটিন, ১৯·৪ শতাংশ চর্বি এবং ৫৩·৭ শতাংশ জল।

দ্র 'Symposium on Hilsa and its Fisheries', *Journal of the Asiatic Society,* vol. XX, 1954.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত অতি ক্ষুদ্র কণিকা। যে কোনও পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে ইলেকট্রন পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ১টি ও সোনার পরমাণুতে ৭৯টি ইলেকট্রন থাকে। ইলেকট্রনের সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। রেশম দিয়া ঘর্ষণ করিলে কাচ হইতে ইলেকট্রন বাহির হইয়া রেশমে যায়। ফলে কাচে ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও রেশমে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তারের মধ্য দিয়া ইলেকট্রনের প্রবাহকেই আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ বলি। ২২০ ভোল্টে ৬০ ওয়াটের বাল্‌ব জ্বালাইলে প্রতি সেকেণ্ডে ঐ বাল্‌বের তারের মধ্য দিয়া ২৩×১০^{১৮}টি ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। এই সংখ্যা আমাদের ন্যায় আট শত কোটি পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার সমান। এই উদাহরণ হইতে ইলেকট্রনের ক্ষুদ্রতা কিছু দূর অনুমান করা যাইতে পারে। এক গ্রাম সোনায় যত ইলেকট্রন থাকে তাহার মোট ওজন মাত্র ০·২ মিলিগ্রাম। ইলেকট্রনের মৌলিক কতকগুলি ধর্ম আছে, যাহা দ্বারা অন্যান্য মূল পদার্থসমূহ হইতে ইহার ভিন্নতা বুঝা যায়। স্থির অবস্থায় ইহার ভর হইল $৯·১১ \times ১০^{-২৮}$ গ্রাম। বেগের পরিবর্তনের সহিত ইহার ভরের পরিবর্তন হয়। বেগ যত বেশি হইবে ভরও তত অধিক হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আইনস্টাইনের জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার। ইলেকট্রন নিজের মেরুদণ্ডে লাট্টুর মত পাক খায়। তবে লাট্টুর পাকের সহিত ইহার ঘূর্ণনের মূল পার্থক্য হইল যে, লাট্টুর পাক খাওয়ার ধরন বাহির হইতে প্রযুক্ত বলের দ্বারা পরিবর্তিত করা যায়, কিন্তু ইলেকট্রন যেভাবে ঘোরে, তাহার পরিবর্তন করা যায় না। ইলেকট্রন নিজের চারি পাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কাচের নলে বাতাসের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে গিয়া ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জে. জে. টম্‌সন ইহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরে অন্য উপায়ে ইলেকট্রন পাইবার পদ্ধতি জানা গিয়াছে। কোনও ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে ইলেকট্রন বাহির হয়। এইরূপে প্রাপ্ত

ইলেকট্রনকে থার্মোইলেকট্রন বলে। ইহাকে কাজে লাগাইয়া ইলেকট্রনিক ভ্যাল্‌ভ তৈয়ারি করা হয়। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার শাস্ত্রকে থার্মোআয়োনিক্‌স বলে। কোনও কোনও ধাতুর উপর আলো ফেলিলে তাহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইহার নাম ফোটো-ইলেকট্রন। এই তথ্য কাজে লাগাইয়া আলোকের ঔজ্জ্বল্য মাপিবার যন্ত্র ফোটোইলেকট্রিক সেল তৈয়ারি করা হয়। আলোকচিত্র গ্রহণ প্রভৃতি নানা কাজে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইলেকট্রন প্রবাহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও ইহা কাজে লাগাইয়া নানা যন্ত্র প্রস্তুত করা ইলেকট্রনিক্‌স-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। বিজ্ঞানপরীক্ষার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্‌স যুগান্তর আনিয়াছে। ইহার ক্রমিক উন্নতি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিফায়ার, রেডিও, টেলিভিসন, রেডার, ইলেকট্রনিক ব্রেন প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে; অন্য দিকে ইহা নানা প্রকার ভ্যাল্‌ভ, অসিলোস্কোপ, ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা মৌলিক গবেষণায় বহু সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। 'ক্যাথোড-রে' দ্র।

শ্যামল সেনগুপ্ত

ইলেকট্রনিক্‌স পদার্থবিদ্যার বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত শাখার একটি প্রধান উপশাখা। কঠিন ও তরল পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নিঃসৃত করা এবং নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলিকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রই ইলেকট্রনিক্‌স। অসিলেশন, রেক্‌টিফিকেশন, মড্যুলেশন, পরিবর্তী তড়িৎকে অপরিবর্তী তড়িতে পরিণত করা, গণনা ইত্যাদি নানা কাজে ইলেকট্রনের ব্যবহার হইতে পারে। ইলেকট্রন নিঃসরণ ও তাহার ব্যাবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিদেশে সর্বত্রই, আমাদের দেশেও বিরল নহে। টেপ রেকর্ডিং, রেডার, রেডিও, টেলিভিসন, টেলিপ্রিণ্টার, কাউণ্টিং মেশিন (গণনা-যন্ত্র) ইত্যাদির সহিত আমাদের পরিচয় আছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লী ড্য ফরেস্ট -এর যুগান্তকারী আবিষ্কার 'ট্রায়োড' (তিনটি তড়িৎ-দ্বারযুক্ত টিউব) হইতেই আসলে ইলেকট্রনিক্‌স-বিজ্ঞানের সূচনা। ট্রায়োড, বৈজ্ঞানিক ফ্লেমিং-আবিষ্কৃত ডায়োড-এরই (দুইটি তড়িৎ-দ্বারযুক্ত টিউব) উন্নত রূপ। ট্রায়োড ব্যবহার করিয়া ড্য ফরেস্ট কম বৈদ্যুতিক বিভবকে বেশি বৈদ্যুতিক বিভবে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্লেমিং-এর ডায়োড পরিবর্তী তড়িৎকে অপরিবর্তী তড়িতে পরিণত করিতে পারিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ডায়োডের সাহায্যে ফ্লেমিং বৈদ্যুতিক তার ছাড়াই টেলিগ্রাফের সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৯০৪ খ্রী)। ড্য ফরেস্ট -এর পূর্ববর্তী কয়েকজন বৈজ্ঞানিকেরও ইলেকট্রনিক্‌স-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। যথা, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টমাস এডিসনের বিখ্যাত এই পরীক্ষা: তড়িৎপ্রবাহের অর্থ হইল ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত কণিকার গতি; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হার্ট্‌স-এর পরীক্ষা ফোটোইলেকট্রিক নিঃসরণ; ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে টম্‌সনের পরীক্ষা, যাহার দ্বারা ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রানজিস্‌টর-এর আবিষ্কার ইলেক-ট্রনিক্‌স-বিজ্ঞানের আর একটি দিক উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। ইহার সম্বন্ধীয় আলোচনা 'সলিড স্টেট ফিজিক্‌স' নামে পরিচিত। ট্রানজিস্‌টর বাস্তবিক ইলেকট্রন-বিজ্ঞানে বিপ্লব আনিয়াছে। ইহা ইলেকট্রনিক ভ্যাল্‌ভ অপেক্ষা অনেক ছোট। কম বৈদ্যুতিক শক্তিতে ইহা কার্যকরী হয়, অপ্রয়োজনীয় তাপ কম উৎপন্ন হয় এবং ইহা অনেক বেশি সময় কার্যকরী থাকে। কিন্তু অন্যান্য গুণাবলী বিচার করিলে ইলেকট্রন টিউব অনেক উৎকৃষ্ট সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে ট্রানজিস্‌টর দিয়া নির্মিত যন্ত্রসমূহ অত্যন্ত হালকা এবং ছোট বলিয়া সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।

প্রায় অধিকাংশ ইলেকট্রনিক যন্ত্র কম বিদ্যুতে চালিত হইতে পারে। ইহার সাধারণ সীমা $১০^{-৬}$ ওয়াট হইতে $১০^{৩}$ ওয়াট পর্যন্ত। অবশ্য যদি অনেকগুলি ইলেকট্রনিক যন্ত্র একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় (যেমন বড় ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে) তাহা হইলে অধিক বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। রেডিও-অ্যান্টেনমিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে আরও বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি দরকার হয়।

কোনও কম মানের প্রবাহ বা বিভবকে উচ্চ মানের প্রবাহ বা বিভবে রূপান্তরিত করাকে অ্যামপ্লিফিকেশন বলে। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফিকেশনের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয় এই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। রেডিওতে এই অ্যামপ্লিফিকেশন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঈথর হইতে রেডিওর এরিয়্যাল অল্প বিভবের বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, উহাকে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বাড়াইয়া এরূপ শক্তিশালী করা হয় যাহার দ্বারা স্পীকার কার্যকরী হইয়া থাকে। কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কতটা অ্যামপ্লিফিকেশন হইবে তাহার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকিলেও, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এই সীমা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে। কেবল বিভব বা প্রবাহই নহে, কম্পনাঙ্কেরও অ্যামপ্লি-ফিকেশন সম্ভব।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি তড়িৎ-বর্তনী হইতে অতি দ্রুত অন্য বর্তনীতে যাওয়ার পদ্ধতিকে ইলেকট্রনিক সুইচিং বলা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন।

ইলেকট্রনিক-বিজ্ঞানের আর একটি অবদান, দূরবর্তী কোনও জিনিসকে নিয়ন্ত্রিত করা। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং তাহার পরে বর্তমানেও ইহার ব্যবহারে আশ্চর্যজনক কার্যসমূহ সম্পাদিত করা যাইতেছে।

অলক চক্রবর্তী

ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ দ্র

ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ নির্ণয় করিবার যন্ত্র। জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ্ হান্স বার্জার ইহা আবিষ্কার করেন (১৯২৯ খ্রী)। একটি ইলেকট্রনিক পরিবর্ধক এবং রেখলিপি-প্রস্তুতকারক অসিলোগ্রাফ যন্ত্র ইহার প্রধান অংশ। অসিলোগ্রাফ যন্ত্র সাধারণ মসী-লেখনী-সন্নিবিষ্ট হইতে পারে, আবার ক্যাথোড-রশ্মির টিউব-বিশিষ্ট অর্থাৎ ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপ হইতে পারে। প্রথমটি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট প্রায় চৌদ্দটি স্বল্প-বিদ্যুৎবাহী ক্ষুদ্রাকৃতির তড়িৎ-দ্বার মস্তকের চর্মে আটকাইয়া রাখা হয়। রোগী কোনও যন্ত্রণা অনুভব করে না। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে মস্তিষ্কের কোষসমূহের বৈদ্যুতিক বিভব (ইলেকট্রিক পোটেনশাল) লেখনীদ্বারা রেখচিত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়। এই লিপির নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ। মৃগীরোগ বা মস্তিষ্কে স্ফোটকজনিত রোগ নির্ণয়ে এবং অনেক সময়ে অপরাধীর মস্তিষ্কের অবস্থা নির্ধারণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

অমিয়কুমার মজুমদার

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ গ্যালভানোমিটার-বিশেষ। লাইড্‌ন শহরে ওলন্দাজ শারীরতত্ত্ববিদ্ ডব্‌লু আইনথোভেন এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন (১৯০৩ খ্রী)। যন্ত্রের অপর একটি প্রধান অংশ ক্যামেরা এবং আলোকচিত্র মুদ্রণের পট্টিকা। যন্ত্র-সংশ্লিষ্ট তড়িৎ-দ্বার রোগীর দেহচর্মে আঁটা থাকে। গ্যালভানোমিটারের নির্দেশকের দুই মেরুর মধ্যে রৌপ্যপাত-জড়িত স্ফটিকের সূত্র থাকে। তড়িদাবিষ্ট হইলে নির্দেশকটি আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলন হৃৎপিণ্ডের চলাচল নির্দেশ করে। ইহার চিত্র যন্ত্রসাহায্যে পট্টিকায় মুদ্রিত হয়। আন্দোলনের ফলে যে রেখচিত্র উদ্ভূত হয় তাহার নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। করোনারি থ্রম্‌বোসিস এবং অন্যান্য হৃদ্‌রোগে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের গতি-প্রকৃতি রেখলিপিতে প্রকাশ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

অমিয়কুমার মজুমদার

ইলোরা এলোরা দ্র

ইসমাইলি সৈয়দ ইমাম জাফর সাদিক ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশধর। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম। ইসমাইল ও মূসা নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ইসমাইল মারা যান। উত্তরাধিকারসূত্রে মূসা সপ্তম ইমাম নিযুক্ত হওয়ায় ঐ সম্প্রদায়ের একদল প্রতিবাদ জানাইলেন। কেননা, একমাত্র প্রথম পুত্রেরই উত্তরাধিকার-সূত্রে ইমাম হইবার অধিকার আছে, দ্বিতীয় পুত্র মূসার ইমাম হওয়া অবৈধ। তাঁহারা দাবি করিলেন যে, মৃত ইসমাইলের বালক পুত্রই ইমাম-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। শিয়া সম্প্রদায়ের এই দলকে বলা হয় ইসমাইলি। ইসমাইলের বালক পুত্র অল্পকালের মধ্যেই মারা যান। কিন্তু ইসমাইলি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে তাঁহাদের বালক ইমাম মারা যান নাই, তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হইবার দিন পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। ইসমাইলি সম্প্রদায় মিশর, আফ্রিকা, পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমান্তে, যথা সুরাট, বোম্বাই, পুণা ও কচে ইসমাইলিদের সংখ্যাধিক্য। বর্তমানে ইসমাইলি সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত। আগাখানি খোজা এবং দাউদি বোহ্‌রা। প্রথম দলের ইমাম আগা খাঁ এবং দ্বিতীয় দল বোম্বাইয়ের সৈয়দ তাহির সৈয়িফউদ্দীনের অনুগামী।

আবুল হায়াত

ইসলাম বৌদ্ধ খ্রীষ্ট বা চীনদেশীয় কনফুসিয় ধর্মগুলির ন্যায় ইসলাম কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম নহে। এক হাজার চারি শত বৎসর পূর্বে প্রকটিত এই ধর্ম মহম্মদ-উদ্ভাবিত নহে, মহম্মদ শুধু প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। কোরানের মতে, মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর সকল দেশের পয়গম্বরগণ এই ধর্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন। মহম্মদ কেবল যন্ত্রী, তাঁহার মাধ্যমে ঈশ্বর ইহাকে শুধু নিখুঁত করিয়াছেন। কোরান বলিয়াছেন, 'আজ ইসলামকে নিখুঁত করিয়া আমার পূর্ণ আশীর্বাদসহ আমি তোমার ধর্ম হিসাবে তাহা মনোনীত করিলাম'।

ইসলাম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'শান্তির মধ্যে আত্মস্থ হওয়া'। ইহার তাৎপর্য, যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং মনুষ্যের

সহিত শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছে সে-ই মুসলিম। ঈশ্বরের সহিত শান্তির বন্ধনের অর্থ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারা এবং মানুষের সহিত শান্তি বলিতে বুঝিতে হইবে অপরকে আঘাত এবং তাহার অনিষ্টসাধন করিবার প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা ও তাহার মঙ্গলকামনা করা। কোরানে এই দুইটি তত্ত্ব ইসলাম-এর সারমর্ম হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে (২।১১২)।

কোরানে কথিত হইয়াছে যে, যুগে যুগে দেশে দেশে ঈশ্বর তাঁহার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন; কোনরূপ ভেদাভেদ না করিয়া যে ব্যক্তি এই সকল পয়গম্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনিই মুসলিম-পদবাচ্য (২।২৮৫)।

বিশেষ কয়েকটি ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মকৃত্যের ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এই সাতটি ধর্মবিশ্বাস: ১. এক ঈশ্বর বা আল্লাহ্, ২. দেবদূত, ৩. প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, ৪. ঈশ্বরের বাণী -সংবলিত ধর্মপুস্তক, ৫. ইহলোকের পরে কিছু আছে, ৬. সৃষ্ট সকল পদার্থেই আল্লাহ্ সৃষ্টি হইতেই গুণ এবং অগুণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ৭. মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান।

অদৃষ্ট বা প্রারব্ধে ইসলাম বিশ্বাস করে না। সৃষ্ট বস্তু-সমূহে ঈশ্বর গুণ এবং দোষ স্থির করিয়া দিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া চলিলেই মনুষ্যের মঙ্গল, অন্যথায় অমঙ্গল ও দুঃখভোগ।

এই পাঁচটি ধর্মকৃত্য: ক. নামাজ বা উপাসনা ('নামাজ' দ্র), খ জাকাত বা দরিদ্রসেবা-বর ('জাকাত' দ্র), গ. রোজা বা উপবাস ('রোজা' দ্র), ঘ. হজ্ বা মক্কাতীর্থযাত্রা ('হজ্' দ্র), ঙ জিহাদ বা পাষণ্ডী-দলন ('জিহাদ' দ্র)।

কোরান অনুসারে ইসলাম মহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন কোনও ধর্ম না হইলেও প্রচলিত পুরাতন নীতিগুলিকে মহম্মদ নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন এবং নূতন আবেগের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। বহুধাবিভক্ত আরবদেশবাসী মহম্মদের সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া জনসাধারণের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছিল। কয়েকটি শক্তিশালী জাতি-গোষ্ঠীর নায়কগণ তাঁহাদের খেয়াল-খুশিমত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। মহম্মদ বলিলেন, ধনী-দরিদ্র -নির্বিশেষে ঈশ্বরের সম্মুখে সকলেই এক, সকলেই সকলের ভাই। জাতি, বর্ণ, পেশা, বংশমর্যাদা কিছুই মানুষকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান; যে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে সে-ই মুসলিম। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি সমবেত নামাজ, জাকাত, হজ্, জিহাদ প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের বিধান দিয়াছিলেন। যে ধনী, তাহাকে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসুখপরায়ণ হইলে চলিবে না। দরিদ্রের জন্য তাহাকে নিয়মিত দান করিতে হইবে। সমবেত নামাজে কোনও ভেদাভেদ না রাখিয়া সম্মুখের সারিতে যদি কোনও দরিদ্র ব্যক্তি থাকে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহারই পদতলে মাথা নোয়াইয়া ধনী ব্যক্তিকে প্রার্থনা করিতে হইবে। মক্কায় তীর্থযাত্রা-কালে সকলকেই এক বেশে, এক নিয়মে চলিতে হইবে।

মহম্মদের এই সকল মানবিক বিধান জনসাধারণের চিত্তে এমন ভাবাবেগের সৃষ্টি করে যাহার ফলে দলে দলে সাধারণ লোক তাঁহার অনুরাগী এবং অনুগামী হইয়া উঠে। ফলে আরব দেশে একটি নূতন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। এই নূতন ভাবাবেশ পার্শ্বস্থ দেশসমূহে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইতে থাকিলে অগণিত মানুষ তাঁহার ধর্মানুগামী হয়। বর্তমানে (১৯৬২ খ্রী) পৃথিবীর মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি।

সৎ এবং অসৎ-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোরানে কোনও আলোচনা নাই, তবে স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তাহার বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মনুষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে কয়েকটি বৃত্তি ও শক্তির অধিকারী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে মানুষ তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

আবুল হায়াত

ইসা খাঁ মসনদ আলী পূর্ব বঙ্গের বারভূঁইয়াদের অন্যতম। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আকবরনামায় একজন প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বলিয়া ইসা খাঁর উল্লেখ আছে। তাঁহার পিতা কালিদাস গজদানী ছিলেন রাজপুত। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ, সুসং ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলা এবং রংপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলার কিয়দংশ লইয়া ইসা খাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। দায়ুদ খাঁর পরাজয়ের পর তিনি আফগানদিগের নেতা হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্গ দেশে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীদিগের অন্যতম নেতা মসুম খাঁকে তিনি আশ্রয় দান করেন। মোগল সেনাপতি তরসুন খাঁ তাঁহার হস্তে পরাজিত ও নিহত হন এবং ঢাকা আক্রমণ করিয়া ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোগল সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে বঙ্গ দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসা খাঁ মোগলদিগের সহিত সন্ধি করেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার

রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং ইসা খাঁ পুনরায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ ইসা খাঁর রাজধানী কাত্রাভু আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্জনসিংহ পরাজিত ও নিহত হন। পর বৎসর ইসা খাঁ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইসা খাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, ইসা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় যান এবং আকবর তাঁহাকে 'দেওয়ান' ও 'মসনদ আলী' উপাধি দান করেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের সন্নিকটে হয়বত্‌নগর ও জঙ্গলবাড়িতে ইসা খাঁর বংশধরগণ এখনও বর্তমান।

দ্র J. N. Sarkar, ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948; H. Beveridge, *Akbarnama*. vol. III, Calcutta, 1939; J. Wise, 'On the Bara Bhuyas of Eastern Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1874.

সুকুমার রায়

ইসিগিরি রাজগৃহ দ্র

ইসিদাসী উজ্জয়িনীর এক ধনী ও ধার্মিক বণিকের কন্যা। সাকেত দেশের এক ধনী বণিকপুত্রের সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। মাত্র এক মাস পর স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইসিদাসী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্বামীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন। অবশেষে থেরী জিনদত্তার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সংঘে যোগদান করেন এবং অর্হত্ব লাভ করেন। 'থেরীগাথা' দ্র।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইসিপত্তন সারনাথ দ্র

ইস্পাত একশ্রেণীর খাদ-যুক্ত লৌহের নাম ইস্পাত। ব্যবহারযোগ্য অবিশুদ্ধ লৌহের তিনটি শ্রেণী: পেটা লৌহ, ঢালাই লৌহ ও ইস্পাত। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহ আমাদের ব্যবহারে লাগে না।

প্রধানতঃ অঙ্গার (কার্বন) -এর খাদ এই তিন শ্রেণীর লৌহের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। যে লৌহে অঙ্গার খুব কম (·১২-·২৫%) পরিমাণে থাকে সে লৌহের শ্রেণীগত নাম পেটা লৌহ; ইহার গলনাঙ্ক ১৫০০° সেন্টিগ্রেড, তরলায়িত অবস্থায় ইহা অত্যন্ত সান্দ্র, তাই গড়ায় না। সেইজন্য পেটা লৌহ দিয়া ঢালাই করা যায় না, উত্তাপনম্র অবস্থায় খণ্ড খণ্ড পিটিয়া জোড়া দেওয়া হয়। যে লৌহে অঙ্গার অধিক পরিমাণে (২-৫%) থাকে সে লৌহের নাম ঢালাই লৌহ; ইহার গলনাঙ্ক ১২০০° সেন্টিগ্রেড। তরলায়িত অবস্থায় ঢালাই লৌহ বেশ সচল, সুতরাং ইহা ছাঁচে ঢালা যায়। পেটা লৌহ ঘাতসহ, ভাঙে না; উত্তপ্ত পেটা লৌহ সহসা শীতল করিলে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হয় না। ঢালাই লৌহ অনুরূপ অবস্থায় ভাঙিয়া যায়। পেটা লৌহে যত কম অঙ্গার থাকে ততই তাহাতে কম মরিচা পড়ে, ঢালাই লৌহে দ্রুত মরিচা পড়ে। পেটা লৌহ বাঁকানো বা মোচড়ানো যায় কিন্তু ঢালাই লৌহ এইরূপ করিতে গেলে ভাঙিয়া যায়। ইস্পাত এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী। ইহাতে খাদরূপে অঙ্গারের পরিমাণ ·১৫% হইতে ১·৫% পর্যন্ত। অঙ্গার কম হইলে ইহার ধর্ম পেটা লৌহ এবং অঙ্গার বেশি হইলে ইহার ধর্ম ঢালাই লৌহের সমীপবর্তী হয়। ইস্পাত শ্রেণীর লৌহে কম মরিচা পড়ে; ইহা ঘাতসহ হয়, আবার ঢালাই করাও যায়। উত্তপ্ত করিয়া জলে বা তেলে ডুবাইয়া দ্রুত শীতল করিলে ইহা ভাঙে না, বরং খুব কঠিন হয়; ইহাকে বলে পান দেওয়া (টেম্পার)। পান দিলে ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ধার দিলে অনেক দিন যাবৎ ধার অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সকল গুণের জন্য ইস্পাত শ্রেণীর লৌহের দ্বারা ধারালো যন্ত্রাদি, স্প্রিং, গাড়ির চাকার অক্ষদণ্ড, রেলের লাইন ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের অংশবিশেষ প্রস্তুত হয়। যন্ত্রযুগে ইস্পাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। জনপ্রতি ইস্পাতের ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়া কোনও দেশের শিল্পপ্রগতির মান ধার্য করা হয়।

অঙ্গার ব্যতীত অন্য কয়েকটি ধাতু ও অধাতু খাদরূপে ঈষৎ পরিমাণে ইস্পাতের সঙ্গে মিশাইলে ইহাতে নূতন নূতন গুণ দেখা দেয়। ১২-১৩% ম্যাঙ্গানিজ-সমন্বিত ইস্পাত অত্যন্ত কঠিন ও ঘাতসহ; ইহার দ্বারা প্রস্তরচূর্ণক যন্ত্র, ট্যাঙ্কের দেওয়াল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ১০-১৫% ক্রোমিয়াম ধাতু-সমন্বিত ইস্পাতে মরিচা পড়ে না, ইহারই নাম অকলঙ্ক ইস্পাত (স্টেনলেস স্টীল)। ১% ক্রোমিয়াম ও ·১৫% ভ্যানাডিয়াম-সমন্বিত ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা গুণ দেখা যায়, তাই স্প্রিং তৈয়ারিতে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

লৌহ-আকর হইতে ইস্পাত প্রস্তুতির তিনটি স্তর। প্রথম, লৌহ-আকর হইতে ঢালাই লৌহ। অনির্বাণ বাত্যাচুল্লিতে (ব্লাস্ট ফার্নেস) এই কার্য সম্পাদিত হয় ('লৌহ' দ্র)। দ্বিতীয় স্তরে ঢালাই লৌহ হইতে বিশুদ্ধ পেটা লৌহ এবং তৃতীয় স্তরে উহার সহিত পরিমিত অঙ্গার ও অন্যান্য খাদ মিশ্রণ। এই কার্য সম্পাদিত হয় বিবর্তকের

(কন্‌ভার্টার) মধ্যে। বিবর্তক যন্ত্র ন্যুব্জগ্রীব বিরাটাকার কলসির মত। গলিত ঢালাই লৌহ, কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ও কলসির নিম্নপথ দিয়া প্রবিষ্ট বেগবান বায়ু একত্র মিলিত হওয়ার ফলে ঢালাই লৌহের অঙ্গার দগ্ধ হইতে থাকে এবং বিবর্তকের মুখে লেলিহান শিখা দেখা যায়। শিখা মন্দীভূত হইলে, বিবর্তক হইতে প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ বড় বড় পাত্রে ঢালিয়া তাহাতে পরিমিত পরিমাণে অঙ্গার ও অন্য খাদ মিশাইয়া ঢালাইয়ের ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়। প্রতি ৬-১০ মিনিটে একবার করিয়া বিবর্তক হইতে ইস্পাত ঢালা হয়। টাটা ও কুলটির কারখানায় এইরূপ বিবর্তক আছে। অধুনা সুপ্রশস্ত তাপ ও আগম-নিগম-পথ -নিয়ন্ত্রিত চুল্লিতে (ওপ্‌ন হার্থ্‌) ঢালাই লৌহ হইতে সরাসরি পরিমিত খাদ মিশ্রিত ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। টাটা, কুলটি, রাউরকেলা, দুর্গাপুর, ভিলাই ইত্যাদি কারখানায় এইরূপ চুল্লি আছে।

ইস্পাত প্রস্তুতির পুরাতন পদ্ধতি এখনও জামশেদপুর ও ভদ্রাবতীর গ্রামে গৃহশিল্পরূপে টিঁকিয়া আছে। বাংলায় ঝালদা-র মত বহু স্থানের ছুরি, কাঁচি, তলোয়ার ইত্যাদির প্রসিদ্ধি আছে। যে ব্যাপন (সিমেণ্টেশন) ও মুচি (ক্রুসিব্‌ল) পদ্ধতিতে ইহারা ইস্পাত তৈয়ারি করে তাহার রাসায়নিক নীতি পূর্বোক্ত প্রকার। আমাদের দেশের কামারেরা কেবলমাত্র হাপরের সাহায্যে পেটা লৌহের (কাঁচা লৌহও বলা হয়) সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অঙ্গার মিশাইয়া ধারালো যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারে। ইহাদের তৈয়ারি জিনিস প্রকৃতপক্ষে ইস্পাত-আস্তরিত পেটা লৌহ, অর্থাৎ উপরের কয়েক পর্দায় পরিমিত অঙ্গার -সমন্বিত ইস্পাত এবং ভিতরে পেটা লৌহ। এইগুলি ঘাতসহ অথচ পান দেওয়া যায়, সহজে ধার নষ্ট হয় না।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই প্রথম ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল। দ্বিসহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্বে ভারতে উজ্‌ (wootz) ইস্পাতের ব্যবহার ছিল। বিশ্ববিশ্রুত দামাস্কাসের তরবারি এই উজ্‌ ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হইত। পরবর্তী কালে ভারতে এই শিল্প প্রায় অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা (১৯০৭ খ্রী) দ্বারা ভারতে ইস্পাত-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কয়েকটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

অরুণকুমার শীল

ইস্পাত-শিল্প লৌহ ও ইস্পাত -শিল্প দ্র

ইহুদী, ভারতে ভারতের উপকূল অঞ্চলে ইহুদী সম্প্রদায়ের বহু দিনের বাস। সংখ্যায় তাহারা কোনদিনই বেশি ছিল না। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৫০০। ইহার পরে বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় ইহুদী ইজ্‌রেয়েল-এ বসবাসের জন্য ভারত ত্যাগ করিয়াছে। কাজেই বর্তমান ভারতে ইহুদীর সংখ্যা মনে হয় আরও কম। সংখ্যার অল্পতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে— বিশেষতঃ ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্যের বিবর্তনে— তাহাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস আজিও অজ্ঞাত ও অলিখিত। তবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ভারতের পশ্চিম উপকূল— বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চল— ইহুদীদের প্রাচীনতম বাসভূমি ও প্রধান কর্মক্ষেত্র। অবশ্য মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতাতেও ইহুদী-ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

মালাবার উপকূলে ইহুদীদের বসবাস কোন্‌ সময়ে শুরু হয় তাহা সঠিক জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোচিনের ওলন্দাজ শাসনকর্তা আড্রিয়ান মুন্‌স স্থানীয় ইহুদীদের জনশ্রুতি বিচার করিয়া বলেন যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই অঞ্চলে ইহুদীদের বসবাস শুরু হয়। তিনি অবশ্য এ কথাও বলেন যে, এ সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। একাদশ শতাব্দীর একটি তাম্রলিপি মালাবারের ইহুদীদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক সম্পদ। উহা আজিও কোচিনের প্রধান সিনাগগ্‌-এ (ধর্মমন্দির) রক্ষিত আছে। যদিও এই লিপির মর্মার্থ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নহেন, তবু মনে হয় যে একাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় ইহুদীদের নেতা জোসেফ রাব্বান উপকূলের পরাক্রান্ত রাজা ভাস্কর রবিবর্মার নিকট হইতে ক্রাঙ্গানোর শহরে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার লাভ করেন। এই ক্রাঙ্গানোর শহরই মালাবার উপকূলে ইহুদীদের প্রথম কেন্দ্র।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্রাঙ্গানোর শহরটি ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে ইহুদীরা কোচিন শহরে বসবাস আরম্ভ করে। এই সময়ে কোচিন অঞ্চলে পর্তুগীজরা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহুদীরা সেই যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পর্তুগীজদের ধর্মান্ধতায় তাহাদের বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। এই উৎপীড়নের ফলে পর্তুগীজরা ইহুদীদের সমর্থন হারায়। তাই ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন

ওলন্দাজেরা কোচিন আক্রমণ ও অধিকার করে, তখন স্থানীয় ইহুদীসমাজ তাহাদের প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোচিন ওলন্দাজশাসনে থাকে। উহাদের শাসনকাল মালাবারের ইহুদী বণিকদের সুবর্ণ যুগ।

ওলন্দাজ কোম্পানির সহিত সহযোগিতা করিয়া কিছু সংখ্যক ইহুদী বণিক বিত্তশালী হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে রাহাবি-পরিবারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইজিকিয়েল রাহাবি নামক একজন বণিক ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া হইতে কোচিনে আসেন।

ইজিকিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ডেভিড ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মালাবারে বাণিজ্য শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ওলন্দাজ কোম্পানির সহিত রাহাবি-পরিবারের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড রাহাবির মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ইজিকিয়েল রাহাবি (১৬৯৪-১৭৭১ খ্রী) ঐ পরিবারের সর্বাপেক্ষা কৃতী পুরুষ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান বণিক হিসাবে নিযুক্ত হন ও কোচিন রাজপরিবারের নিজস্ব বাণিজ্যের ভারও গ্রহণ করেন। এই সময়ে মালাবার উপকূলের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল মরিচ। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিভিন্ন কারণে মরিচের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই সময়েই আবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মার্তণ্ড-বর্মা সমস্ত দক্ষিণ মালাবারের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রথমে হায়দার আলী ও পরে টিপু সুলতান উত্তর মালাবারেও বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দুই দিকে রাজশক্তির দ্বারা তাড়িত মালাবারের বণিকসমাজ ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যায়। এই সন্ধিক্ষণে ইজিকিয়েল রাহাবি বাণিজ্য করার স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় স্বাধীন বণিকদের শক্তি লোপ পায় নাই। ইজিকিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র ডেভিড, ইলাইয়াস ও মোজেস পিতার বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু মালাবারের বণিকসমাজ তখন অবক্ষয়ের সম্মুখীন। ওলন্দাজ কোম্পানিও এই উপকূল হইতে তাহাদের ব্যবসায় সরাইয়া লইতে ব্যস্ত। সেইজন্য রাহাবি-পরিবারের প্রতিপত্তিও শীঘ্রই হ্রাস পায়। ইজিকিয়েলের তিন পুত্রের কেহই দীর্ঘজীবী হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইজিকিয়েল রাহাবির ভ্রাতুষ্পুত্র মেইয়ার রাহাবি পারিবারিক ব্যবসায়ের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাহাবি-পরিবারের অবশিষ্ট সম্পত্তি মহাজনদের হাতে চলিয়া যায়।

এই সময়ে কোচিনেরই অন্য একটি ইহুদী পরিবার বিখ্যাত কালিকট (কোঝিকোড়ে) বন্দরে বাণিজ্যে সমৃদ্ধিলাভ করেন। এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বণিক আইজাক সুর্‌গুন। সুর্‌গুন-পরিবার সম্ভবতঃ ইস্তাম্বুল হইতে কোচিনে আসেন। আইজাক সুর্‌গুন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসায় চালাইতেন, কারণ কালিকটে রাজশক্তি অর্থাৎ সামুদ্রী (জামোরিন) রাজ-পরিবার কোনভাবেই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলী কালিকট অধিকার করার পর ব্যবসায়ে রাজার একচ্ছত্র অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল। সুর্‌গুনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছুদিন পর্যন্ত এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু পরে টিপু সুলতানের অত্যাচারে কালিকটের বণিকগোষ্ঠী ধ্বংস হইয়া গেল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে— অথবা তাহার অল্প পরে— আইজাক সুর্‌গুনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র জোসেফ সুর্‌গুন পিতার মৃত্যুর পরে অল্প কয়েক বৎসর পারিবারিক ব্যবসায় চালু রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সুর্‌গুন-পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হয়। মালাবার উপকূলের ইতিহাসে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি এইভাবে শেষ হইয়াছিল।

মালাবারী ইহুদীদের কয়েকটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইহারা দুইটি শাখায় বিভক্ত শ্বেত ইহুদী ও কৃষ্ণ ইহুদী। কৃষ্ণ ইহুদীরা দাবি করে যে, তাহারাই ইহুদীদের মধ্যে উপকূলের প্রাচীনতম অধিবাসী, শ্বেত ইহুদীরা পরে আসে। কৃষ্ণ ইহুদীদের এই দাবির কিছু ঐতিহাসিক সমর্থনও আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেন-দেশীয় বিখ্যাত র‍্যাবাই, টুডেলা-র বেঞ্জামিন, মালাবার উপকূলে শুধুমাত্র কৃষ্ণ ইহুদীদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ওলন্দাজ পর্যটক লিন্‌স্‌খোটেন কোচিনে আসেন, তখন অবশ্য শ্বেত ইহুদীরা উপকূলে বসবাস শুরু করিয়াছে। শ্বেত ইহুদীদের মতে তাহারাই প্রকৃত ইহুদীধর্মাবলম্বী; কৃষ্ণ ইহুদীরা উপকূলেরই আদি অধিবাসী, উহারা প্রথমে ক্রীতদাস ছিল, পরে ধর্মান্তরিত হইয়া ইহুদীসমাজে প্রবেশ করে। রাহাবি ও সুর্‌গুন -পরিবার শ্বেত ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

মালাবারের ইহুদীগণ স্বধর্মনিষ্ঠ। শ্বেত ও কৃষ্ণ ইহুদীদের মধ্যে ধর্মাচরণে কোনও পার্থক্য নাই। কোচিনে শ্বেত ইহুদীদের একটি বিখ্যাত সিনাগগ্ আছে। ইহা ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইজিকিয়েল

ইহুদী, ভারতে

রাহাবি প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সিনাগগ্ পুনর্নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণ ইহুদীদের কোচিন শহরে তিনটি এবং শহরের উপকণ্ঠে আরও কয়েকটি সিনাগগ্ আছে। বলা বাহুল্য, এই সিনাগগ্‌গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই ইহুদীদের ধর্মজীবন আবর্তিত। তবে রাহাবি-পরিবারের অভ্যুত্থানের পূর্বে ধর্মবিষয়ে ইহুদীসমাজ বিশেষ উৎসাহী ছিল না। ইহাও লক্ষণীয় যে, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সংস্কার ইহুদীদের প্রভাবিত করিয়াছে। এলকান অ্যাডলার নামক একজন ইহুদী লেখক লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথা ভারতীয় ইহুদীদের মধ্যেও অল্প পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠানেও মালাবারের ইহুদীসমাজ কিছু হিন্দু প্রথা অনুসরণ করে। যেমন, বিবাহ যদিও মোজেইক প্রথায় সিনাগগেই সম্পন্ন হয়, বিবাহের আচারে কিন্তু শুধু সধবারাই যোগ দিতে পারে।

ইহুদীসমাজের উপর হিন্দু ও মুসলমান আচারের প্রভাব অবশ্য কোঙ্কন উপকূলের বেনে-ইজ্‌রেয়েল নামক ইহুদীগোষ্ঠীতে সর্বাপেক্ষা প্রকট। উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত ইহুদীরা মারাঠী ভাষায় কথা বলে। তৈল-নিষ্কাশন বা তিলির ব্যবসায় ইহাদের কুলগত বৃত্তি। ইহুদী আচার অনুযায়ী প্রতি শনিবার ইহারা সাপ্তাহিক বিশ্রাম গ্রহণ করে। তজ্জন্য কোঙ্কন উপকূলে এই গোষ্ঠী 'শনিতিলি' নামে বিদিত। বেনে-ইজ্‌রেয়েল সমাজের লোকেরা দাবি করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসে। এই দাবির সমর্থনে অবশ্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই এবং বেনে-ইজ্‌রেয়েল সমাজ উপকূলের সমাজের সহিত বহুলাংশে মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদের বিবাহ সিনাগগেই হয় বটে, কিন্তু হিন্দুদের মত 'গায়ে হলুদ'-ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার বিবাহ অনুষ্ঠানে মুসলমান প্রথা অনুযায়ী কন্যার হাতে-পায়ে হেনা ও মেহেদির রংও লাগানো হয়। বেনে-ইজ্‌রেয়েল পুরুষেরা অনেক স্থানীয় নাম নিজেদের পদবীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। যেমন, কেহিম্ (কেহিমকার), নবগাঁও (নবগাঁওকার), ও চিন্‌চোল্ (চিন্‌চোল্‌কার)।

পূর্ব উপকূলের ইহুদীদের ইতিহাস মালাবারী ও কোঙ্কনী ইহুদীদের ইতিহাস হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানির ছত্রচ্ছায়ায় ইহুদীদের সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীতেই ইহা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। মাদ্রাজে অবশ্য ইহুদী-ইতিহাসের বেশি চিহ্ন নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রড্রিগেজ-পরিবার ও পরে আল্‌ভারেজ ডা ফন্‌সেকা ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় ভারত-চীন বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেন। পরে কিছু ইহুদী বণিক হীরকের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করে। ইহাদের মধ্যে মাইকেল সলোমন, এলিজার মোজেস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে প্রেগার-পরিবারও হীরকের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হয়। এই পরিবারের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেন লায়ন প্রেগার। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ শহরের নিকটে লায়ন প্রেগারের সমাধি আজিও বিদ্যমান। ডেভিড জোসেফ এজ্‌রা কলিকাতার বিখ্যাত এজ্‌রা-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এজ্‌রা-পরিবার চীনের সহিত আফিমের ব্যবসায়ে বিত্তশালী হন। ব্যবসায়ের লাভ তাঁহারা কলিকাতায় ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। কলিকাতায় ক্যানিং স্ট্রীটের বিখ্যাত মেঘেন সিনাগগ্ এজ্‌রা-পরিবারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৪ খ্রী)। বোম্বাই শহরের ধনকুবের সাসুন-পরিবারের সহিত এজ্‌রাদের বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। জোসেফ ইলাইয়াস এজ্‌রা ১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শেরিফ ছিলেন। এই পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ গাব্বে-পরিবার কলিকাতার ইতিহাসে সুবিদিত। গাব্বে-পরিবারও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় চীন দেশে আফিমের ব্যবসায়ে বিত্তশালী হইয়া উঠে এবং পরে কলিকাতায় ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে।

সামাজিকভাবে সাসুন, এজ্‌রা ও গাব্বে-পরিবার রাহাবি বা বেনে-ইজ্‌রেয়েল -গোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর এই ধনী ইহুদীরা ভারতের সংস্কৃতি কোনভাবেই গ্রহণ করে নাই। সাংস্কৃতিক দিক দিয়া ইওরোপ তাহাদের আদর্শ— তাহাদের ভাষাও ইংরেজী। উল্লিখিত তিনটি পরিবারেরই অনেক লোক লণ্ডন ও পারীতে (প্যারিস) স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ভারতের ইহুদী বলিতে সেইজন্য পশ্চিম উপকূলের সাধারণ ইহুদীসমাজই প্রথম স্বীকৃতির দাবি রাখে।

দ্র W. Logan, *Malabar*, vols. I & II, Madras, 1951 ; C. Achyuta Menon, *The Cochin State Manual*, Ernakulam, 1911 ; J. H. V. Linschoten, *The Voyage to the East Indies*, London, 1885 ; J. C. Visscher, *Mallabarse Brieven*, Leeuwarden, 1743 ; A. Galletti, ed., *The Dutch in Malabar*, Madras, 1911 ; E. Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, vol. II, Madras, 1909 ; M. D. Japheth, *The Jews of India*, Bombay, 1960 ; H. S. Kehimkar,

The History of the Bene-Israel of India, Tel-Aviv, 1937 ; I. A. Isaac, *A Short Account of the Calcutta Jews*, Calcutta, 1917 ; W. J. Fischel, 'Cochin in Jewish History', *Proceedings of the American Academy for Jewish Research*, vol. XXX, 1962 ; W. J. Fischel, 'Cochin and Some Prominent Jewish Personalities', *Joshua Bloch Memorial Volume*, New York, 1960 ; W. J. Fischel, 'The Jewish Merchant Colony in Madras', *Journal of Economic and Social History of the Orient*, April, 1960, Leiden ; Ashin Dasgupta, 'Malabar in 1740', *Bengal Past and Present*, July, 1960.

অশীন দাশগুপ্ত

ঈডিপাস কম্‌প্লেক্‌স মনঃসমীক্ষণ দ্র

ঈ-ৎসিঙ (৬৩৫-৭১৩ খ্রী) খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে যে সকল চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারত-পর্যটন করিয়াছিলেন ঈ-ৎসিঙ তাঁহাদের অন্যতম। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশের অন্তর্গত চি-লি প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সে তিনি বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। ঈ-ৎসিঙের বয়স যখন পনর, তখন হইতেই তাঁহার মনে ভারত-পর্যটনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই বিষয়ে পূর্বগামী ফা-হিয়েন ও হিউএন্‌-ৎসাঙের আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টন হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া ঈ-ৎসিঙ প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রা দ্বীপের পালেম্‌বাং) উপনীত হন। শ্রীবিজয় তৎকালে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্ররূপে সুবিখ্যাত ছিল। ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জলপথে পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বাণিজ্যনগরী তাম্রলিপ্তে (আধুনিক তমলুক) আসেন। কিছুকাল সেখানে থাকিয়া তিনি পদব্রজে নালন্দা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করেন এবং পরে পুনরায় নালন্দায় আসিয়া একাদিক্রমে দশ বৎসর তথায় বাস করেন। নালন্দায় তিনি গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং চারি শত বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে ঈ-ৎসিঙ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। সংগৃহীত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার মানসে এবার তিনি তাম্রলিপ্তে আসেন এবং সেখান হইতে সমুদ্রপথে শ্রীবিজয়ে পৌছিয়া পুনরায় কিছুকাল সেখানে বাস করেন। অতঃপর ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ বৎসর প্রবাসে কাটাইবার পর তিনি চীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি তাঁহার সংগৃহীত বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হিউএন্‌-ৎসাঙের ন্যায় বৌদ্ধদর্শনচর্চায় ঈ-ৎসিঙ আগ্রহী ছিলেন না ; বরং ফা-হিয়েনের ন্যায় বৌদ্ধ সংঘের বিধি-নিয়ম যথাযথভাবে পালন করিবার উপরই তিনি অধিকতর জোর দিতেন। তজ্জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে বিনয়সাহিত্যের চর্চা করিয়াছিলেন। মূলসর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভিক্ষুগণের সাহায্যে তিনি সর্বসমেত ছাপ্পান্নখানি বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা ভিন্ন ঈ-ৎসিঙ সাতখানি মৌলিক গ্রন্থেরও রচয়িতা। তন্মধ্যে দুইটি গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের একখানিতে তিনি ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা ও বৌদ্ধসমাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে স্বীয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু অশেষ কষ্টস্বীকার ও মৃত্যুপণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য পশ্চিম দেশে— বিশেষতঃ ভারতবর্ষে— আসিতেন, তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনা দ্বিতীয় গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। আধুনিক কালে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইংরেজীতে ও দ্বিতীয়টি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

দ্র I-Tsing, *Memoir Compose a l'e'poque de la Grande Dynastie T'ang sur les Religieux Eminents qui alle`rent chercher la Loi dans les pays d'Occident*, tr., E. Chavannes, Paris, 1894 ; I-Tsing, *A Record of the Buddhist Religion as Preached in India and the Malaya Archipelago, 671-695* A. D. tr., J. Takakusu, Oxford, 1896, P. C. Bagchi, *India and China*, Calcutta, 1944; যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় কল্প, একাদশ খণ্ড, পাটনা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ঈথর সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ্ হয়্গেন্স (১৬২৯-৯৫ খ্রী) আলোকের তরঙ্গবাদ প্রচার করেন। সমুদ্র-তরঙ্গ ও শব্দ-তরঙ্গ যথাক্রমে জল ও বাতাস আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ করে। আলোক-তরঙ্গ কোন্ পদার্থ আশ্রয় করিয়া সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসে? কল্পনা করা হয়, সমগ্র বিশ্ব অদৃশ্য এক পদার্থে পূর্ণ। এই কল্পিত পদার্থের নাম ঈথর। আলোকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায় যে, এই ঈথর বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিন্তু ইস্পাত হইতে অধিক স্থিতিস্থাপক। উনিশ শতকের শেষ দশকে মার্কিন বিজ্ঞানী মাইকেল্সন (১৮৫২-১৯৩১ খ্রী) ও মর্লি (১৮৩৮-১৯২৩ খ্রী) আলোর সাহায্যে ঈথরের মধ্য দিয়া চলমান পৃথিবীর গতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া দেখেন, গতি শূন্য। পরীক্ষার এই অবিশ্বাস্য ফল বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রী) উপলব্ধি করেন এই পরীক্ষায় ঈথরের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া আপেক্ষিকবাদ রচিত হয়।

রসায়নশাস্ত্রে ঈথর একটি সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত জৈব তরল পদার্থের নাম। অবেদনকারক (অ্যানেস্থেটিক) রূপে ইহার ব্যবহার হয়।

শ্যামল সেনগুপ্ত

ঈদ ভোজ, উৎসব, বিশ্রামের দিন। ঈদ শব্দের অপর অর্থ— যাহা ফিরিয়া আসে। মুসলমানদের উৎসবপর্ব, যথা— ঈদ-ই-মিলাদ, হজরত মহম্মদের জন্মদিন। 'ঈদ-উজ্-জোহা' ও 'ঈদ-অল্-ফিত্র্' দ্র।

আবুল হায়াত

ঈদ-উজ্-জোহা মুসলমান সম্প্রদায়ের ত্যাগের উৎসব। হিজরি সনের জিল্হজ মাসের দশম দিবসে এই উৎসব পালিত হয়। ঐদিন প্রভাতে মুসলমানগণ সুসজ্জিত হইয়া মসজিদে অথবা ময়দানে সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করিয়া থাকে। যে সকল মুসলমানের সামর্থ্য আছে তাহারা ঐদিন পশু বলি দেয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে কোরবানি। একটি ছাগল অথবা ভেড়া কোরবানি দিলে পরিবারের একজন পুণ্যলাভ করে এবং একটি গোরু, মহিষ অথবা উট কোরবানি দিলে পরিবারের সাত জন পুণ্যলাভ করিতে পারে, এইরূপ বলা হয়। ঈদের নামাজ পড়িবার পর এই কোরবানি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তীর্থযাত্রীরা ঐদিন মক্কায় হজ করিতে যায় ও সেখানেই কোরবানি দিয়া থাকে।

আবুল হায়াত

ঈদ-অল্-ফিত্র্ রমজান মাসের উপবাসান্তে মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত উৎসব। হিজরি সনের শওয়াল মাসের প্রথম দিন এই উৎসব পালিত হয়। ঐদিন প্রভাতে মুসলমানগণ সুসজ্জিত হইয়া মসজিদ অথবা ময়দানে সমবেত প্রার্থনার নিমিত্ত জমায়েত হয়। প্রার্থনায় যাইবার পূর্বে তাহারা সাধারণতঃ মিষ্টান্নসহযোগে প্রাতরাশ সমাপন করে। প্রার্থনান্তে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং উপহারাদি বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক মুসলমান পরিবার ঐদিন সামর্থ্য অনুযায়ী সুখাদ্য প্রস্তুত করে। দরিদ্র মুসলমানেরাও যাহাতে সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, এইজন্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এই দানকে বলে ফিত্রা, তাই এই উৎসবের নাম ঈদ-অল্-ফিত্র্।

আবুল হায়াত

ঈভ মনুষ্যজাতির আদিজননী, প্রথম-সৃষ্ট মানুষ আদম-এর স্ত্রী। ইসলামি, খ্রীষ্টীয় ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থে প্রথম নারীর সৃষ্টি বর্ণনা করা হইয়াছে। হিব্রু ও আরবী ভাষায় ঈভ নামটি 'হবা' রূপে প্রচলিত; বাংলায় মুসলমানেরা ও অধিকাংশ খ্রীষ্টান ঈভকে হবা বলে। হিব্রু শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জীবিতা বা জীবনদায়িনী।

বাইবেলের বর্ণনা এইরূপ: 'তারপর প্রভু পরমেশ্বর বললেন, "মানুষের একা থাকা ভাল নয়; তার অনুরূপ সহকারিণী একজনকে আমি মানুষের জন্য তৈরি করব।" …তিনি মানুষকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন…তাঁর একখানি পাঁজর নিয়ে…সেটি দিয়ে একটি নারী গড়ে তুলে তাকে পুরুষটির কাছে উপস্থিত করলেন। পুরুষটি তখন বলল, "এইবার এটি হল আমার অস্থি থেকে গঠিত অস্থি, আমার দেহ থেকে গঠিত দেহ; এর নাম হবে নারী, কেননা নরদেহ থেকে একে তুলে নেওয়া হয়েছে"। …পুরুষ নিজ স্ত্রীর নাম রাখল হবা, কারণ সে জীবিত সকলের জননী হল' (আদিপুস্তক)।

ঈভ সর্পবেশী শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া আদমকেও পাপে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টজননী মারীয়াকে 'নবা ঈভ' বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ তিনি ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের মাতা হইয়া সমগ্র মনুষ্য-জাতির নবজীবনদায়িনী জননী হইয়াছেন।

পিয়ের ফালোঁ

ঈশান[১] ঋগ্বেদে ঐশ্বর্যশীল অর্থে দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত: তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিম্ (১।৮৯।৫)। উপ-

নিষদে প্রভু বা নিয়ন্তা অর্থে প্রযুক্ত . ঈশানো ভূতভব্যস্য (কঠ, ২।১।১২)।

বেদসংহিতায় যিনি রুদ্র, রামায়ণ-মহাভারতে তিনিই শিব নামে প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক যুগে শিবের অন্যতম নাম ছিল ঈশান। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে শিবের যে সহস্র নাম আছে, ঈশান তাহার অন্যতম। একাদশ রুদ্রের মধ্যে অষ্টম রুদ্র ঈশান নামে পরিচিত।

পৌরাণিক যুগে শিবের অষ্টমূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে : পঞ্চ ভূত, সূর্য, চন্দ্র ও যজমান। ঈশান এই অষ্টমূর্তির মধ্যে সূর্যমূর্তি। তন্ত্রমতে শিবের পাঁচ মূর্তি : ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত।

আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ঈশান। পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী দিক ঈশান-কোণের অধিদেবতাও তিনি। বিষ্ণুর এক নাম ঈশান। আবার সাধ্যদেব-বিশেষের নামও ঈশান।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ঈশান[২] ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রমুখ বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হলায়ুধ ছিলেন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ। ইঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ঈশান দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার আর এক ভ্রাতা পশুপতি শ্রাদ্ধাদিকৃত্যপদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নাই। এই পরিবারের পাণ্ডিত্য ও বৈদিক কর্মনিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য।

দ্র Monmohan Chakravarti, 'Contributions to the History of Smriti in Bengal and Mithila', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. XI, no. 9, 1915 ; R. C. Majumdar, ed., *The History of Bengal,* vol. I, Dacca, 1943 ; *Brahmana Sarvasva*, Introduction, Sanskrit Sahitya Parishad Series, Calcutta, 1960.

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১২৬৭-১৩৪২ বঙ্গাব্দ) অধ্যয়নানুরাগী, বহুভাষাবিদ্ এবং সুলেখক। যশোহর জেলার এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে জন্ম। নয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে অন্যের সাহায্য লইয়া ঈশানচন্দ্রকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতার দ্বারা কৃতিত্বের সহিত তিনি পরীক্ষাসমূহ উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কিছুকাল ছাত্র পড়াইয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারি শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করিয়া কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন এবং স্কুলটির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। পরে তিনি হুগলি নর্মাল স্কুলের হেডমাস্টার এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টার হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরও হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার লিখিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহে নূতনত্ব থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কীর্তি বৌদ্ধ জাতকসমূহের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিবার জন্য পরিণত বয়সে তাঁহাকে পালি ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ষোল বৎসর পরিশ্রম করিয়া একক চেষ্টায় তিনি ঐ অনুবাদ সমাপ্ত করেন এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

ঈশানচন্দ্রের ব্যবসায়বুদ্ধিও ছিল প্রখর। অনেক ব্যবসায়ী নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন এবং তিনি কয়েকটি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির বৃহৎ অংশ তিনি জনহিতকর কার্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬২-১৩০৪ বঙ্গাব্দ) কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অল্প বয়স হইতে ঈশানচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ দেখা যায় এবং অল্প বয়সেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি যখন বিস্তীর্ণ, ঈশানচন্দ্র তখন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া গাথাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং শীঘ্রই পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। বাল্যকাল হইতেই ঈশানচন্দ্র অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন। তাহার ফলে সারাজীবন তিনি এক অন্তর্গূঢ় বেদনায় জর্জরিত হইতেন। তাঁহার অন্যতম গাথাকাব্য 'যোগেশ'-ও সেই মূর্ত বেদনার কাব্য। কবির এই অশান্ত চিত্ত-বিক্ষোভের জন্য মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিষপানে আত্মঘাতী হইতে হয়।

ঈশানচন্দ্র-রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম : 'চিত্ত-মুকুর' (১২৮৫), 'বাসন্তী' (১২৮৭), 'যোগেশ' কাব্য (১২৮৭), 'চিন্তা' (১২৯৪)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত 'যোগেশ' কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। নয় সর্গে সমাপ্ত 'অনন্ত' এবং দশ সর্গে রচিত 'দেবতীর্থ' নামক খণ্ডকাব্য দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'পূর্ণিমা' মাসিক

পত্রিকা প্রকাশে ঈশানচন্দ্রের উৎসাহ ছিল প্রবল। তাঁহার অন্তরঙ্গদের নিকট লিখিত পত্রগুলি সংখ্যায় অল্প হইলেও, সাহিত্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, 'ঈশানচন্দ্র', বঙ্গশ্রী, আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪৬, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

সনৎকুমার গুপ্ত

ঈশান নাগর নিমাই পণ্ডিতের গৃহভৃত্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (২।৮)। ইনি গদাধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতির পা ধুইবার জল জোগাইতেন এবং ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর তিনিই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিতেন। ইনি অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশের লেখক হিসাবে ইনি প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐ গ্রন্থের প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। ঈশান নাগরের বংশধরেরা গোয়ালন্দে এবং ঝাঁকপাল গ্রামে বসবাস করেন বলিয়া কথিত আছে।

বিমানবিহারী মজুমদার

ঈশ্বর মানুষের ঈশ্বর-ধারণা বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। এক রূপে, বহু রূপে— এমন কি রূপাতীতভাবেও মানুষ ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তুতে, ঘটনায়, বিভিন্ন প্রাণীতে— মানুষে তো বটেই— যুগে যুগে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন মার্গে মানুষ ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহাকে লাভের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজের মানুষের ধারণা এতই বিচিত্র যে, তাহা সাধারণভাবে প্রকাশ করিলে অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরকে তাহাদের পরম মূল্যবোধের আশ্রয় ও লক্ষ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। তবে সকল কালেই কিছু লোক নিরীশ্বরবাদী ছিল।

ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তায় নিরীশ্বরবাদের ধারা নিঃসন্দেহে গৌণ, কিন্তু অপাঙ্‌ক্তেয় নহে। ভারতবর্ষীয় দর্শনের ইতিহাসে নিরীশ্বরবাদিতা ও নাস্তিকতার অর্থ এক নহে। যে সব দর্শন বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না, সেই সব দর্শনকে নাস্তিক বলা হয়। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন -দর্শন নাস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)— এই ষড়্‌দর্শন আস্তিক। সাংখ্য আস্তিক, তবে নিরীশ্বরবাদী।

সাংখ্যদর্শন প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর-ধারণা অসিদ্ধ বলিয়া মনে করে। প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করা যায় না। ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শনে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট পুরুষ রূপে ভাবা যুক্তিসংগত নহে; কারণ পুরুষ হয় বদ্ধ হইবে, নতুবা মুক্ত হইবে। জ্ঞানে ও শক্তিতে সীমাবদ্ধ পুরুষ জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ নিষ্ক্রিয়; তাহার পক্ষে ক্রিয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, অভাব দূর করিবার জন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরকে পূর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হয়; সুতরাং তিনি জগৎসৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, চৈতন্যময় পুরুষ ঈশ্বর কখনও জড় জগতের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। চতুর্থতঃ, শুধু জগতের নহে, ঈশ্বর জীবেরও সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। সাংখ্যমতে জীব নিত্য ও অবিনাশী। জীব সৃষ্ট নহে, অতএব তাহার স্রষ্টা কল্পনা করিবারও প্রয়োজন নাই। প্রতিকূল জগৎ ও অসম্পূর্ণ জীবচরিত্রও ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সূচনা করে। পঞ্চমতঃ, বেদের কর্তারূপে ঈশ্বর-ধারণাও অসিদ্ধ, কারণ বেদ অপৌরুষেয়। অনেকের মতে, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না; কেবল মনে করে, ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করা যায় না।

সাংখ্যকারের মতে পুরুষ-প্রকৃতির প্রভাবে জগতের সৃষ্টি। কিন্তু সমস্যা হইল, নিষ্ক্রিয় পুরুষ ও অচেতন প্রকৃতির সংযোগে কিরূপে এই সুনিয়ন্ত্রিত জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষা সম্ভবপর? যোগদর্শন ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারা সাংখ্যদর্শনের এই ত্রুটি দূর করিতে চাহিয়াছে। ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়। তিনি আপ্তকাম, সদামুক্ত। অভাবতাড়িত হইয়া বা ফলপ্রাপ্তির বাসনাবশতঃ তিনি কোনও কর্ম করেন না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও দেহাদিরহিত পরম পুরুষ। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। অদৃষ্ট শক্তি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তিনি জীবকে তাহার কর্মানুসারে ফল প্রদান করেন। যে জীব ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং সকল কর্মফল অর্পণ করে, ঈশ্বর তাহার সাধনমার্গের বাধাবিপত্তি দূর করিয়া কৈবল্যলাভ সহজ করিয়া দেন। যোগী ঈশ্বরকে অন্তরে অনুভব করেন। যোগীর অনুভূতি ঈশ্বর-সত্তার অন্যতম প্রমাণ। পতঞ্জলি শ্রুতিকেও ঈশ্বরের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

শুধু সাংখ্যদর্শনই নহে, চার্বাক ও বৌদ্ধ -দর্শনও ঈশ্বর-সত্তায় অবিশ্বাসী। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে চার্বাকপন্থী ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ঈশ্বর-সত্তা অস্বীকার করেন।

বুদ্ধের মতে, জগৎপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরকে

স্বয়ম্ভূ কারণরূপে ভাবিবার কোনও যুক্তিসংগত ভিত্তি নাই। অনাথপিণ্ডিককে বুদ্ধ বলিয়াছেন, জগৎ যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট হইত তাহা হইলে জগতে বিনাশ, পরিবর্তন, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি দেখা দিত না। শোক-দুঃখপরিপূর্ণ জগতের কারণ ঈশ্বর নহেন। জীবের কর্মানুসারে জগৎ-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে; ইহাতে ঈশ্বরেচ্ছার কোনও স্থান নাই। জীবগণ কর্তা-ক্রিয়ার উপমা দ্বারা জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভুলবশতঃ ঈশ্বরকে জগৎক্রিয়ার কর্তা মনে করে।

ন্যায়দর্শনে যদিও ঈশ্বরকে অপ্রমেয় বলিয়া ধরা হইয়াছে, তথাপি নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার দিক হইতে বিচার করিলে ঈশ্বর-সত্তা প্রমাণের প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এই যুক্তিগুলি তাঁহার মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে মননের রূপমাত্র। প্রথমতঃ কুম্ভকার যেরূপ কুম্ভের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ। ক্ষিত্যাদি জাগতিক বস্তুনিচয় কার্য; ঈশ্বর তাহাদের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় পরমাণুগুলিকে নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া ঈশ্বর ব্যতীত কেহ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। সৃষ্টিকালে পরমাণুদের মধ্যে আযোজন-কর্তারূপে এবং প্রলয়কালে তাহাদের বিযোজন-কর্তারূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকারে আমরা বাধ্য হই। তৃতীয়তঃ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-সত্তায় বিশ্বাস না করিলে বিচিত্র ও নিয়মানুগ জাগতিক ঘটনাধারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ঈশ্বর জগতের কর্তা, ধারক ও ব্যবস্থাপক। চতুর্থতঃ, জীবের কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সম্বন্ধশক্তি হইল অদৃষ্ট। অদৃষ্টশক্তি অচেতন। ঈশ্বর জীবের কর্ম বিচার করিয়া অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং যথোচিত ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। জীবের কর্মফলভোগের ব্যবস্থা করিবার জন্যই ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, ন্যায়দর্শনে ভক্তহৃদয়ের ঈশ্বরানুভূতিও ঈশ্বর সত্তার অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। অভ্রান্ত বেদের কর্তারূপেও নৈয়ায়িকগণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন।

নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে পৃথক এক সগুণ ও সক্রিয় আত্মা। তাঁহার দেহ নাই বটে, তিনি ইচ্ছা-শক্তি দ্বারাই কর্ম করিয়া থাকেন।

বৈশেষিকসূত্রে কণাদ জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। কণাদের মতে, জীবের কর্ম হইতে সৃষ্ট অদৃষ্টশক্তি, জগতের নিমিত্ত কারণ। পরবর্তী বৈশেষিকগণ বলিয়াছেন, অন্ধ অদৃষ্টশক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নিয়মানুগ জগতের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার না করিলে এই বিচিত্র ও নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণে নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলি বৈশেষিকগণ গ্রহণ ও স্বীকার করেন।

মীমাংসকগণ জগৎকর্তারূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। আদি-অন্তহীন জগতের সৃষ্টিরই প্রশ্ন উঠে না; সুতরাং তাহার স্রষ্টার প্রশ্নও উঠে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর-সত্তা প্রমাণ করা যায় না। বেদ নিত্য; সুতরাং তাহারও স্রষ্টা নাই। ঈশ্বরকে মানুষ পরম করুণাময় বলিয়া মানে; মীমাংসক প্রশ্ন তুলিয়াছেন: করুণাময় ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন? তাহা ছাড়া মীমাংসাদর্শনে এই প্রশ্নও তোলা হইয়াছে: অশরীরী ঈশ্বর কি প্রকারে জগৎসৃষ্টিক্রিয়ার কর্তা হইতে পারেন? পরমেশ্বরবাদ খণ্ডন করিলেও মীমাংসকগণ দেবগণের সত্তা স্বীকার করেন। দেবগণ জগৎকর্তা নহেন। তাঁহারা নিত্য ও সর্বব্যাপী। তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞে যে সব হব্য আহুতিরূপে প্রদত্ত হয় তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন। দেবগণের সত্তার প্রমাণ বেদ। মীমাংসাদর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বেদান্তদর্শন অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর। জীবের যখন যথার্থ জ্ঞানোপলব্ধি হয় তখন তাহার নিকট ঈশ্বরের কোনও সত্তা থাকে না। মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মকে শংকর ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াক্রান্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, অনন্তশক্তি ও গুণময়। জীব ও জগৎ তাঁহার পরিণাম। তিনি মায়াযুক্ত হইয়াও মায়ার অধীন নহেন। তিনি জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মূল কারণ। তিনি জীবের উপাস্য দেবতা। জীবকে তাহার কর্মানুসারে তিনি ফল প্রদান করেন। ঈশ্বরের সত্তা ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঈশ্বরের সত্তা থাকে না।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে (সিস্টেম) ঈশ্বর-ধারণার যে সব বিশ্লেষণ এবং উক্ত ধারণার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, বিভিন্ন সমাজে যে সব তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ঈশ্বর-ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে ও সমালোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঈশ্বর-ধারণার তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার দিক নূতনভাবে বিবেচনা করিবার প্রবণতা দেখা দিতেছে। ইহার কারণ, অতীতে ঈশ্বর-ধারণা ব্যতীত যে সব তাত্ত্বিক সমস্যার সদ্‌ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না, বিজ্ঞান-বিচারের অগ্রগতির ফলে

এখন তাহার অনেকগুলির ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য এই কথার অর্থ এই নহে যে, বিজ্ঞান সকল সমস্যা সমাধান করিয়াছে, কিংবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিচার হইতে ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদ্ভব হয় নাই ; বিজ্ঞান-বিচারের দ্বারা ঈশ্বর-বিশ্বাস নষ্ট না-ও হইতে পারে। যুক্তি-বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে সেই অর্থে প্রমাণ করা যায় না, যে অর্থে নিগমনপদ্ধতিতে জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়। বস্তুতঃ জার্মান দার্শনিক লোৎজেও উদয়নাচার্যের মত মনে করেন, ঈশ্বরপ্রমাণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাত্ত্বিক মননের রূপ মাত্র।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি ও প্রয়োজন প্রধানতঃ ব্যাবহারিক এবং সেইজন্যই সমাজায়ত। সামাজিক সকল বিশ্বাসের মত ঈশ্বর-বিশ্বাসও সমাজবিবর্তনের সহিত বিবর্তিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন, দার্শনিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্বরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হয়। জ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিকের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ও স্থায়ী সীমা-রেখা টানা যায় না। ব্যাবহারিক সমস্যা (যাহা তত্ত্ব-উদ্ভূতও হইতে পারে) সমাধানের জন্য বা ব্যাখ্যা করিবার জন্য, তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়। রোগ শোক মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি বিরূপ অভিজ্ঞতায় কাতর মানুষ ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা সন্ধান করে। শান্তি ও সান্ত্বনার অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ ইচ্ছা ও অনুভব -আশ্রয়ী ; ততটা বিষয়গত নহে, যতটা বিষয়ীগত। ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস তাহার সমাজ পরিবেশ ও ঐতিহ্য দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে মানুষ শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে এবং করেও। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে : মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শান্তি পায় বলিয়া ইহা কি প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর সত্যই আছেন? সামাজিক ঐতিহ্যলালিত মানুষ এমন অনেক কিছুই বিশ্বাস করে যাহার ভিত্তি আবেগ, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন— জ্ঞান নহে। জ্ঞানসঞ্জাত বিশ্বাস হইতে আবেগ-আকাঙ্ক্ষাদি -সঞ্জাত বিশ্বাস পৃথক। জ্ঞানসঞ্জাত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যাসত্য বিনিশ্চয় করা যেভাবে সম্ভব, আবেগসঞ্জাত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাহা সেভাবে সম্ভব নহে। প্রথম ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের প্রশ্ন প্রধানতঃ বিচার-নির্ভর ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা প্রধানতঃ সিদ্ধান্ত-নির্ভর। কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শান্তি পাইলে সে বিশ্বাস করিবে কি না তাহা মূলতঃ তাহার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বর-সত্তার অস্তিত্বের কোনও নির্ণেয় সম্বন্ধ নাই।

বলা যাইতে পারে 'ঈশ্বরই পরম সত্তা এবং তিনি সত্যস্বরূপ'। এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে জল্পনামূলক বিতর্ক হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কোনও অভিজ্ঞানাশ্রয়ী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। যে পরাতাত্ত্বিক অর্থে 'ঈশ্বরের সত্তা' 'পরম' এবং তাঁহার 'স্বরূপ' 'সত্য', সেই অর্থ বিবরণীয় ভাষায় বুঝা অসম্ভব।

তথাপি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনও ঈশ্বর-সত্তায় বিশ্বাস করে ; এই বিশ্বাসের ফলে তাহাদের ব্যাবহারিক প্রয়োজন অনেকাংশে মিটিয়াও থাকে। ন্যায়যুক্তিতে ইহার বিপক্ষে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। অপ্রমেয় ঈশ্বরকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে বিশ্বাস করা নীতির বিচারে অনুমোদনীয় কিনা, তাহাও সমস্যার বিষয়। এই সমস্যার সমাধান করিবার পূর্বে নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ ও পরিধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক।

দ্র O. Pfleiderer, *Religion and Historic Faiths*, London, 1907 ; S. N. Das Gupta, *A History of Indian Philosophy*, vols. I-V, London, 1922-55 ; S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, vol. I, London, 1948 ; W. James, *Varieties of Religious Experience*, London, 1953 ; A. C. Das, *A Modern Incarnation of God*, Calcutta, 1958.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রী) সাংবাদিক ও কবি। ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন কাঁচড়াপাড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতার নাম হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত, মাতা শ্রীমতী। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। হরিনারায়ণ পৈতৃক বৃত্তি কবিরাজি ছাড়িয়া শিয়ালডাঙার কুঠিতে মাসিক আট টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। দশ বৎসর পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামেই কাটান ; মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে আসিয়া থাকিতেন। বাল্যকালে তিনি নিয়মিত লেখাপড়া শেখেন নাই। তবে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, যাহা শুনিতেন সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তিনি মুখে মুখে সংগীত রচনা করিতে পারিতেন এবং গ্রামের কবি ও ওস্তাদির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলে হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র

তখন হইতে (১৮২২ খ্রী) মাতামহের গৃহে বাস করিতে থাকেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহ সুখের হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুইটি বন্ধু লাভ করেন— যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৫-৬৭ খ্রী)। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন জোড়াসাঁকোর গোপীমোহন ঠাকুরের (মৃত্যু ১৮১৮ খ্রী) তৃতীয় পুত্র নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতুল-পরিবারের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়সী। ঈশ্বরচন্দ্রের অপর বন্ধু প্রেমচাঁদ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রেমচাঁদ ও যোগেন্দ্রমোহন উভয়েই ছিলেন কাব্যরসিক এবং কবিগানের ভক্ত।

শোনা যায়, ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সংস্কৃতও শেখেন। ঈশ্বরচন্দ্রের এক বাল্যসখা সংবাদ-প্রভাকরে (১ বৈশাখ, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ) লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ পড়িয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের টোলে তিনি এবং রামতনু লাহিড়ী সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে (১৮৩৩-৩৬ খ্রী) তিনি কটকী এক দণ্ডীর নিকট তন্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া সম্ভবতঃ বেদান্তও পড়েন। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে তাঁহার এই শিক্ষার নিদর্শন আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র সারা জীবনে মোট চারটি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রমোহন এবং প্রেমচাঁদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক সংবাদপ্রভাকর প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ (২ আগস্ট, ১৮৩২ খ্রী) আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক 'সংবাদরত্নাবলী' বাহির করেন। মহেশচন্দ্র পাল ছিলেন ইহার নামমাত্র সম্পাদক ; ঈশ্বরচন্দ্রই ইহার লিপিকর্ম করিতেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই কাজ ছাড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র পুরী যাত্রা করেন। প্রায় তিন বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া পাথুরিয়াঘাটার কানাই-লাল ঠাকুরের চেষ্টায় তিনি ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ২৭ শ্রাবণ (১০ আগস্ট, ১৮৩৬ খ্রী) বারত্রয়িকরূপে সংবাদপ্রভাকরের পুনঃপ্রকাশ করেন। ১ আষাঢ়, ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৪ জুন, ১৮৩৯ খ্রী) ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় পত্রিকা 'পাষণ্ডপীড়ন' (২০ জুন, ১৮৪৬ খ্রী)। গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' পত্রিকার সহিত কবিতাযুদ্ধ চালাইবার জন্যই তিনি এই পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় চতুর্থ পত্রিকা 'সংবাদসাধুরঞ্জন'। শেষোক্ত দুইটি পত্রিকাই সাপ্তাহিক।

আধুনিক বাংলার সমাজগঠনে সংবাদপ্রভাকরের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে নব্যবঙ্গ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মসভাগোষ্ঠীর পক্ষভুক্ত ছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবপর্যায়ে সংবাদপ্রভাকর সম্পাদনের সময় হইতেই তাঁহার মতের পরিবর্তন হইতে থাকে। দেশের প্রগতি-মূলক ভাবধারার সহিত তিনি যুক্ত হন। হিন্দু থিয়ফিলান-থ্রফিক সভা এবং তত্ত্ববোধিনী সভায় তিনি বক্তৃতাও দিতেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন, ধর্মসভার বিরোধিতা, দেশের বৈজ্ঞানিক এবং বাণিজ্যিক উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র উদারতর মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহেও তিনি আপত্তি করেন নাই।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র যুগসন্ধির কবি বলিয়াই সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ লুপ্ত হইয়া আসিলে তিনি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খণ্ডকবিতা রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই ছিল তাঁহার রচনারীতির বিশেষত্ব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এই ভঙ্গী তিনি কবিওয়ালাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

অনেক গুরু বিষয়ও তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতেন। স্বদেশীয় সমাজের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল নিবিড়। বাংলা ভাষার জন্য তাঁহার আন্দোলনও বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার নিজস্ব ভাষা ছিল ইংরেজী-প্রভাববর্জিত খাঁটি বাংলা ভাষা। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার বিস্ময়কর অধিকারের প্রমাণ রহিয়াছে 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার। দ্বিতীয় কীর্তি— বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি ভবিষ্যৎ লেখকদের প্রস্তুত করা। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যরীতি শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয় নাই, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জন্য এই সকল গঠনমূলক কাজের চিরস্থায়ী মূল্য আছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে তিনটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ সেন -কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩ খ্রী), কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত

(১৮৫৫ খ্রী) এবং 'প্রবোধপ্রভাকর' (১৮৫৮ খ্রী)। ইহা ছাড়া তিনি শকুন্তলা ও গীতার অনুবাদ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। কলিনাটক নামে একটি নাটকের কথাও জানা যায়। মৃত্যুর (২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯ খ্রী) পর ঈশ্বরচন্দ্রের চারটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হইয়াছিল: রামচন্দ্র গুপ্ত -সংগৃহীত কবিতার খণ্ডশঃ প্রকাশ (১২৬৯, ১২৭৬, ১২৮০ এবং ১২৮১ বঙ্গাব্দ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১২৯২ বঙ্গাব্দ), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন -সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ), মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত -সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাস এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬১, ১৮৬৩ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। গদ্য-রচনার দুইটি সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কবিচরিত, কলিকাতা, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনচরিত ও কবিত্ব', বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৫; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১০, কলিকাতা, ১৯৪২; ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮; বিনয় ঘোষ -সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

ভবতোষ দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রী) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার (তৎকালীন হুগলি) অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র পণ্ডিত পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন জন্ম হয়, কলিকাতায় তখন নব-জাগরণের সূত্রপাত হইতেছে। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত পদব্রজে সেই প্রাণচঞ্চল মহানগরীতে চলিয়া আসেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে। ইতিমধ্যে কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, ডিরোজিওর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আবির্ভাবও প্রায় আসন্ন। ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্র হিন্দু কলেজের সংলগ্ন গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃতশিক্ষার্থী রূপে প্রবেশ করিতেছেন (১ জুন, ১৮২৯ খ্রী)।

মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র এখানে একাদিক্রমে বার বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। মধ্যে কয়েক বৎসর (১৮৩০-৩৫ খ্রী) এখানে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষারও কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার শেষে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রেই তাঁহার নামের সহিত 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র কলেজ ত্যাগ করেন।

দেশের সংস্কার-আন্দোলনগুলি এতদিনে আরও একটু নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বিবিধ সংস্কার ও সংস্কৃতি -মূলক সভা-সমিতিতে শহর ভরিয়া উঠিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯ খ্রী) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩ খ্রী) সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের মত বিদ্যাসাগরও খানিকটা যুক্ত হইতেছেন (১৮৪৮ খ্রী)। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহির্জগতের আন্দোলনের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বরং চাকুরি-জীবনের অন্তরালে থাকিয়া শিক্ষাসংস্কারের মৌলিক দিক-গুলি লইয়াই প্রথম পর্বে তাঁহাকে চিন্তিত দেখা যায়।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা-বিভাগে হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষায় তিনি রীতিমত মনঃসংযোগ করেন এবং সাংখ্য ও পুরাণ পাঠে রত হন। কয়েক বৎসর পরে (৬ এপ্রিল, ১৮৪৬ খ্রী) সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও উন্নতি -সাধনে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ইহার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সেক্রেটারি রসময় দত্ত তাঁহার সংস্কার-প্রস্তাবগুলি একে একে অগ্রাহ্য করায় অল্প দিনের মধ্যেই পদত্যাগ করিয়া (১৬ জুলাই, ১৮৪৭ খ্রী) তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পুনর্নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও পুনর্গঠন বিষয়ে তাঁহাকে অবাধ সুযোগ দেওয়া হইবে, এই শর্তে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। রসময় দত্ত এই সময়ে সেক্রেটারি-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ঈশ্বরচন্দ্রকে কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করা হয় (২২ জানুয়ারি, ১৮৫১ খ্রী) এবং 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' আশা করেন: 'বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, কর্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়ক রূপে অনেক কাজ করিতে পারিবে'।

অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজ পুনর্গঠনের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়া কর্মিষ্ঠ বিদ্যাসাগর এই প্রত্যাশাকে সফল করিবার

আয়োজন করিলেন। তাঁহার সংস্কারকার্যের একদিকে ছিল শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন, অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে রবিবারে সাপ্তাহিক বিরতির ব্যবস্থাপন, ছাত্রদের নিকট হইতে প্রবেশ-দক্ষিণা ও মাসিক বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন; অপর দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল শিক্ষার প্রসার এবং পাঠ্যতালিকার পুনর্বিন্যাসে।

পাঠ্যক্রমের সংস্কারকার্যে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ আধুনিক চেতনার পরিচয় দিলেন। দুরূহ 'মুগ্ধবোধে'র সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার রীতি প্রথমেই পরিত্যক্ত হয়; স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১ খ্রী) এবং 'ব্যাকরণকৌমুদী'র (১৮৫৩-৬২ খ্রী) সাহায্যে তিনি বাংলায় সংস্কৃত আয়ত্ত করিবার সহজতর পন্থা উদ্ভাবন করেন। রামায়ণ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ হইতে গদ্য-পদ্যের সংকলন তাঁহার তিন খণ্ড 'ঋজুপাঠে' প্রকাশিত হয় (১৮৫১-৫২ খ্রী)। সাহিত্য-শ্রেণীতে এইগুলি পড়াইবার ব্যবস্থা হইলে ছাত্রগণ অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যও অধিগত করিতে পারে। আবার অন্য দিকে, নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য কলেজে তিনি ইংরেজী-বিভাগেরও পুনর্গঠন করেন। এখন হইতে কলেজে সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজীতে গণিত শিক্ষা প্রবর্তিত হইল এবং ইংরেজী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত হইল। একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়াতে ছাত্রগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারায় সামঞ্জস্য সাধনের শিক্ষা পাইতে থাকে। সংস্কৃত শাস্ত্র-সমূহের নির্বাচনেও বিদ্যাসাগর বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ছাত্রদের চিন্তা যাহাতে আচ্ছন্ন না হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বেদান্ত বা সাংখ্যের সঙ্গে সঙ্গে মিল-এর লজিক জাতীয় পাশ্চাত্ত্য রচনা পঠনেরও ব্যবস্থা হইতে থাকে।

সংস্কৃত কলেজে এতদিন কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদেরই শিক্ষালাভের অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে (১৮৫১ খ্রী) কায়স্থ এবং পরে (১৮৫৪ খ্রী) ভদ্র শ্রেণীর যে কোনও হিন্দুর জন্য এই অধিকার প্রসারিত করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে জনশিক্ষার প্রসারকল্পে বাংলা শিক্ষার উন্নতি ও ব্যাপ্তিরও প্রয়োজন। 'বোধোদয়' (১৮৫১ খ্রী), 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫ খ্রী), 'কথামালা' (১৮৫৬ খ্রী), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি তাই বাংলা শিক্ষার পথ সুগম করিয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহার বহু দিনের এই উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে তাঁহাকে নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কলেজের ছুটির সময়ে বিদ্যাসাগর 'স্পেশাল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল্‌স' রূপে এই কার্যভার লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করিতেন। এইভাবে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে একে একে তিনি কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন (আগস্ট ১৮৫৫-জানুয়ারি ১৮৫৬ খ্রী)। এই সব স্কুলের শিক্ষকগণের শিক্ষণবিদ্যার জন্য বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজ ভবনে একটি নর্মাল স্কুলও স্থাপিত হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। হিন্দু কলেজ-সন্নিহিত বাংলা পাঠশালা পরিচালনার ভারও ক্রমে বিদ্যাসাগরের উপর অর্পিত হয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নাম হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন', বিদ্যাসাগর ছিলেন ইহার সেক্রেটারি। এই দশকের শেষে স্কুলটি তাঁহার একক কর্তৃত্বে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে তিনি ইহাকে প্রথমে (১৮৭২ খ্রী) দ্বিতীয় শ্রেণী ও পরে (১৮৭৯ খ্রী) প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। দেশীয় অধ্যাপকদের অধ্যাপনাতেও যে ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে তখন মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

জনশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর কেবল বালকদের কথাই ভাবেন নাই, পূর্বকথিত জেলা চারিটিতে অল্প দিনের মধ্যেই (নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮ খ্রী) তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের সেই আদি যুগে এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয়টির (বর্তমান বেথুন স্কুল) সূত্রপাত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তাহারও অবৈতনিক সেক্রেটারি (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে নবগঠিত কমিটিতেও তিনি অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৫৬-৫৯)। সাধারণের উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য বিদ্যাসাগর তখন উক্ত বিদ্যালয়ের গাড়ির দুই পাশে মহানির্বাণতন্ত্রের (৮।৪৭) এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন: 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'। সাধারণের পরিহাস ও আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া নূতন আন্দোলন এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এ আন্দোলনে সরকারের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির জন্য সরকার হইতে প্রত্যাশিত স্থায়ী সাহায্য পাওয়া গেল না, শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে

ব্যক্তিগত দায়িত্বে এগুলির ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মেরী কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে তখনও বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁহার অন্যতম সহযোগী।

কর্মপ্রণালীর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের ফলে সরকারি কর্তৃপক্ষের সহিত প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তাঁহার অনমনীয় ব্যক্তিত্ব কোনও মধ্যপথ মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু এই সব সংঘর্ষ ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে হতাশ করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর ৫০০ টাকা বেতনের দুই সরকারি পদ তিনি একযোগে পরিত্যাগ করেন।

দেশের বৃহত্তর দায়িত্ব হইতে অবশ্য এত শীঘ্র তিনি অবসর লন নাই। জীবনমুক্তির ব্যাপকতর সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সাধনা তখনও অসমাপ্ত ছিল। শৈশবে যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসেন তখন সতীদাহ-প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে। তাহারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে দেশীয় সমাজে বিধবা-বিবাহ লইয়া বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র এবং কলিকাতায় কেহ কেহ তখন বিধবা-বিবাহের বিধান খুঁজিতেছেন। অন্য দিকে সেই সময়ে, হিন্দু বালিকা বিধবাদের দুর্দশা প্রসঙ্গে সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায় (১৮৫০ খ্রী) এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে (১৮৫৪-৫৫ খ্রী) বিদ্যাসাগর দীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করিতেছেন। এই সব প্রস্তাবে সমাজদেহ আলোড়িত হইয়া ওঠে। কিন্তু নিজস্ব বক্তব্য প্রচারে বিদ্যাসাগর কেবল সুবুদ্ধি ও মানবতার উপর নির্ভর করেন নাই, সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি অসীম শ্রমে অনুকূল শাস্ত্রবচনও উদ্ধার করিয়াছিলেন।

উপরন্তু বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন যে মানবতার যুক্তি বা শাস্ত্রনির্দেশও যথেষ্ট নহে, প্রয়োজনমত সরকারি আইনেরও সাহায্য লইতে হইবে। বিধবা-বিবাহের সমর্থনকারীরা এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট জনস্বাক্ষরিত একাধিক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর যে আবেদন পাঠান তাহাতে প্রায় সহস্রটি স্বাক্ষর ছিল। বিরোধী পক্ষ হইতেও বিপরীত আবেদন পৌছায়। কিন্তু বহুবিধ বিচার-আলোচনার পর সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করাইয়া লন (২৬ জুলাই, ১৮৫৬ খ্রী)। শান্তিপুরের তাঁতিরা তখন কাপড়ের পাড়ে বুনিয়া দিত 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে'। বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তিত হইলে তাহাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস যেন সার্থকতা লাভ করিল।

আইন অনুসারে প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন (ডিসেম্বর, ১৮৫৬ খ্রী) সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে এই বিবাহ সিদ্ধ হয়। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু বিধবার বিবাহ দিতে সক্ষম হন এবং এজন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্তও হইতে হয়। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগরের ব্রত চরিতার্থ হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই'।

পরবর্তী কালে তাঁহার 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপার্জনক্ষম সাধারণ গৃহস্থের মৃত্যুতে তাহার পরিবারবর্গ যাহাতে নিতান্ত অসহায় হইয়া না পড়ে, এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর প্রাক্‌সঞ্চয়ের এক পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাই অ্যানুয়িটি ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগর ছিলেন ইহার ন্যাসরক্ষক। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সংস্রব তিনি ত্যাগ করেন।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় হইতেই বহুবিবাহ নিরোধকল্পে দেশে অপর একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল। এই উদ্দেশ্যেও বিদ্যাসাগর দীর্ঘ সংগ্রাম করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার (২৭ ডিসেম্বর) এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার (১ ফেব্রুয়ারি) বহুবিবাহ রহিতকরণের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের এই প্রয়াস সফল হয় নাই। তবে দেশের মধ্যে চেতনা সঞ্চারের জন্য যেমন পূর্ববর্তী আন্দোলন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (জানুয়ারি ও অক্টোবর, ১৮৫৫ খ্রী) রচনা করেন এই নূতন আন্দোলনের জন্যও তেমনই তিনি দুই খণ্ডে 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (আগস্ট, ১৮৭১ ও এপ্রিল, ১৮৭৩ খ্রী) প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতমহল এই সব গ্রন্থকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলে বিদ্যাসাগর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (মে, ১৮৭৩ খ্রী) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খ্রী) নামে বিদ্রূপকৌতুকে পরিপূর্ণ দুইখানি প্রতি-আক্রমণ রচনা করিয়াছিলেন।

কেবল পণ্ডিতসমাজই নহে, এই সব সামাজিক বিপ্লবের ফলে তাঁহার আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার ভয় দেখাইতেছিলেন। কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শনে বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সমাজের মুক্তি হইবে জানিয়া যে সকল মঙ্গলকর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেখানে ব্যক্তিগত দৃঢ়তাই ছিল তাঁহার সর্বপ্রধান অবলম্বন। মানুষের প্রতি সহজাত মমত্ববোধ তাঁহাকে সকলের সহিত যুক্ত রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর অন্তর্গত হইয়া কর্মে ব্রতী হন নাই বলিয়া পৌরুষময় একাকিত্বে তিনি চিরজীবন অভ্যস্ত ছিলেন।

এই আন্দোলনগুলির পাশাপাশি তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। যথার্থ মৌলিক সাহিত্য-প্রয়াস তাঁহার অল্পই। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজীর অনুবাদের মধ্য দিয়া যে গদ্যরীতি তিনি নির্মাণ করেন, তাহাতে বাংলা গদ্যের মুক্তি সূচিত হইল। গদ্যপ্রবাহে এক 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' সঞ্চার করিয়া এবং উচ্চাবচ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে এক সমৃদ্ধ রীতির সূত্রপাত করিলেন। অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঞ্চার এই রীতির অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য: নিপুণ শব্দনির্বাচন ও নিয়মিত ছেদচিহ্নের প্রবর্তন ইহার বহিরঙ্গ। এই রীতির অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল না। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ খ্রী) হইতে শুরু করিয়া শকুন্তলা' (১৮৫৪ খ্রী), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০ খ্রী) পর্যন্ত এই গদ্য ক্রমে পরিণত হইয়াছে; প্রতিটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে ভাষার পুনর্মার্জনা করিয়া বিদ্যাসাগর তাঁহার শিল্পচেতনার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সদস্য, ইহার অন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভার অন্যতম অধ্যক্ষ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন শক্তিমান লেখক। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ (১৮৪৮ খ্রী) পরবর্তী দশকে কালীপ্রসন্ন সিংহের সমগ্র মহাভারত অনুবাদের প্রেরণা হইয়াছিল। সর্ব্বশুভকরী ও সোমপ্রকাশ পত্রিকা তাঁহারই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়; হিন্দু পেট্রিয়টের সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠা-সদস্য বিদ্যাসাগর এই সভার একটি অধিবেশনে (১৮৫৩ খ্রী) সংস্কৃতচর্চার প্রয়োজন বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন: 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'। ইহাতে তিনি দেশের ঐতিহ্য জানিবার পক্ষে ভাষাতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব ইতিহাস জ্ঞানের আবশ্যিকতা প্রতিপাদন করেন। 'রঘুবংশম্' (১৮৫৩ খ্রী), 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ' (১৮৫৩-৫৮ খ্রী), 'কুমারসম্ভবম্' (১৮৬১ খ্রী), 'কাদম্বরী' (১৮৬২ খ্রী), 'মেঘদূতম্' (১৮৬৯ খ্রী), 'উত্তরচরিতম্' (১৮৭০ খ্রী), 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' (১৮৭১ খ্রী) প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে অনারারি সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৬৪ খ্রী)। আবার সেই বৎসরেই প্রকাশিত হয়, ত্রিবর্ষীয়া বন্ধুকন্যার মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার শোকাঞ্জলি 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'। 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪ খ্রী), 'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৮৯১ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর মৌলিক রচনা।

সতীর্থ মদনমোহন তর্কালংকারের সহযোগিতায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি' স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকারি কর্ম হইতে অবসরগ্রহণের পর এই ডিপোজিটরি এবং স্বরচিত গ্রন্থাদির উপার্জন ছিল তাঁহার বিশেষ সম্বল। এই উপার্জনের দ্বারা তিনি অসংখ্য আত্মীয়-বান্ধব ও দুঃস্থ সাধারণকে নিত্য সাহায্য দানে প্রতিপালন করিতে পারিতেন।

অনুরূপ দায়িত্ব তিনি সমস্ত জীবন বহন করিয়াছেন। উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাপক দুর্ভিক্ষকালে (১৮৬৫-৬৬) বীরসিংহে তিনি বুভুক্ষু জনসাধারণের জন্য ছয়মাসব্যাপী এক অন্নসত্র খোলেন, বিভিন্ন জেলার ব্যাধিগ্রস্তদের শুশ্রূষা-ব্যবস্থার জন্য জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। সাধারণের নিকট তাঁহার পরিচয় তাই 'দয়ার সাগর'। বিদেশে বিপন্ন মধুসূদন বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্য পাইয়া যে ভাষায় কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই 'প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের উদ্যম এবং বাঙালী মায়ের হৃদয়' যথার্থই তাঁহার চরিত্রে মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব' (রবীন্দ্রনাথ)।

জীবনের শেষ ভাগে নাগরিক কর্মকোলাহল হইতে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করিয়া প্রায়ই তিনি কর্মাটারের সাঁওতালদের মধ্যে দিনযাপন করিতেন, বয়সের অবসাদে তখন তিনি অধ্যাত্মজীবন আশ্রয় করেন নাই। সাংখ্য-বেদান্তকে যিনি একদা মিথ্যা দর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, জনক-জননী ছিলেন যাঁহার চেতনায় শ্রেষ্ঠ দেবতা, পরলোক যাঁহার নিকট পরিহাসের বিষয়— কর্মাটারের জীবন ছিল সেই আধুনিক মানবের উপযুক্ত বিশ্রাম-

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগরচরিত, কলিকাতা, ১৮৯১; বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৫; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, কলিকাতা, ১৯০৭; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৩১; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৮, কলিকাতা, ১৯৫৫; যোগেশচন্দ্র বাগল, বিদ্যাসাগর-পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৬০; Subalchandra Mitra, Isvarchandra Vidyasagar, Calcutta, 1902.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ঈশ্বর পুরী শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু এবং মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। জন্মস্থান কুমারহট্ট বা হালিশহর। 'প্রেমবিলাসে'র অপ্রামাণিক ত্রয়োবিংশ বিলাস অনুসারে তাঁহার পিতা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য। ঈশ্বর পুরী সন্ন্যাসী হইয়াও সাধারণ বেশে থাকিতেন (চৈতন্যভাগবত, ১।৭); তাই নবদ্বীপে অদ্বৈতের গৃহে গেলে প্রথমে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। কিন্তু মুকুন্দ দত্তের দ্বারা কৃষ্ণের চরিতমূলক এক গান শুনাইয়া অদ্বৈত তাহার দেহে সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করেন এবং তাঁহাকে চিনিতে পারেন। এই সময়ে তিনি কয়েক মাস নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ছিলেন। 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামে স্বরচিত এক সংস্কৃত কাব্য তিনি গদাধরকে পড়িতে দেন। নিমাই পণ্ডিত এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। অবশ্য 'কৃষ্ণলীলামৃত' অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে গয়াতে নিমাই ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সন্ন্যাস লইয়া পুরীতে অবস্থানের পর শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনযাত্রা উপলক্ষে গৌড় দেশে আসেন, তখন তিনি কুমারহট্ট গ্রামে গিয়া ঈশ্বর পুরীর নাম করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন এবং ঐ গ্রামের মৃত্তিকা অঞ্চলে বাঁধিয়া লন। ঈশ্বর পুরীও শ্রীচৈতন্যকে এত ভালবাসিতেন যে অপ্রকট হইবার সময় তিনি নিজের সেবক গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবার জন্য পুরীতে প্রেরণ করেন।

শ্রীরূপ-সংকলিত 'পদ্যাবলী'তে ঈশ্বর পুরীর রচিত তিনটি শ্লোক আছে। একটিতে (৬২) তিনি নিজের দৈন্য প্রকট করিয়াছেন এবং অন্য দুইটিতে (১৮, ৭৫) মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা মাধুর্যময় শ্যামসুন্দরের সেবা ও গোপ-গোপীর প্রেমরস আস্বাদনই যে অধিক শ্রেয়ঃ, এইরূপ বলিয়াছেন।

দ্র মুরারি গুপ্তের কড়চা; বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত; কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিমানবিহারী মজুমদার

ঈস্‌কাইলাস, আইস্‌খুলস (৫২৫-৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীক নাট্যকার। ৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্ম। ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইনি পারসীক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ম্যারাথনের সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। অ্যাথেন্স সে সময়ে গ্রীসের রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। ট্র্যাজেডির তখন শৈশবকাল, নাটকীয় ক্রিয়া অপেক্ষা তখনও তাহা মহাকাব্যোচিত আবৃত্তিরই অধিকতর অনুকূল। কোরাসের অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া এবং দ্বিতীয় অভিনেতার প্রবর্তন করিয়া আইস্‌খুলস এই সময়ে সংলাপের মূল্য বাড়াইয়া দেন এবং যথার্থ নাট্যরূপ গঠন করেন। দিওনুসিওস-এর উৎসব উপলক্ষে প্রযোজিত ট্র্যাজেডির বার্ষিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকারদের চারিটি নাটক দেখাইতে বলা হইত: তিনটি ট্র্যাজেডি ও একটি স্যাটার নাটক। এইভাবে আইস্‌খুলস প্রায় ৮০টি নাটক লেখেন; তন্মধ্যে সাতটি মাত্র আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

তাঁহার ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল দেবতা ও মানবের জীবন-নিয়ামক নিয়তির রহস্যময় লীলা। অথচ দেবতা ও মানুষ উভয়েই তাহাদের আপন আবেগের প্রভাবে কাজ করিয়া যায়, তাহারা জানে না কোন্ শক্তিবলে এই আবেগের উৎসারণ। মানুষ যখন মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা করে, দেবতারা ঈর্ষাতুর হইয়া ওঠেন, কেননা: 'দর্পিত ভাবনা মানব নামক কীটের জন্য নয়; পরিপূর্ণ দর্প স্ফীত হয়, শস্যশীর্ষ যেন, পরিণামে আনে শুধু অশ্রুজলে ভরা সর্বনাশ!' দৈব প্রতিহিংসা বংশপরম্পরায় মানুষকে তাড়া করিয়া ফেরে, দেবতার অভিশাপ সমগ্র জাতিকে আসিয়া আঘাত হানে। অবশ্য দেবতা ও মানবের এই জগৎ, বিশেষতঃ অ্যাথেন্সে, হানাহানির যুগ হইতে ধীরে ধীরে তখন নিয়ম-সংগতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

মহাকাব্যের ঐতিহ্য হইতে গৃহীত সহজ একটি মানবিক পরিস্থিতির নির্বাচন এবং দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি-চালিত ধর্মীয় পরিবেশে ইহার ভয়াবহ পরিণতি প্রদর্শন— ইহাই ছিল আইস্‌খুলসের শিল্পবৈশিষ্ট্য।

তাঁহার এই সাতটি ট্র্যাজেডি এখন পাওয়া যায়:

'সাপ্লিকেস' (প্রার্থিনী), 'পেরসাই' (পারসীকবৃন্দ), 'হেপ্টা এপি থেবাস' (থেবাসের বিরুদ্ধে সপ্ত বীর), 'প্রোমেথেউস দেস্‌মোতেস' (বন্দী প্রমিথিউস), 'আগামেম্নোন', 'খোয়েফোরয়' (তর্পণকারী), 'ইউমেনাইদেস' (তৃপ্ত দেবীগণ)।

দ্র মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ঈ স্ কা ই লা স, কলিকাতা, ১৯৪৩।

রবেয়ার আঁতোয়ান

ঈসপ (আনুমানিক ৬২০-৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) জীব-জন্তু লইয়া নীতিমূলক উপকথা রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ঈসপ গ্রীস দেশে ফ্রিজিয়ার অধিবাসী ছিলেন। আদিতে তিনি ছিলেন স্যামস দ্বীপবাসী ইয়াদমন নামক কোনও ব্যক্তির ক্রীতদাস। লিদিয়ার রাজা ক্রেসাস তাঁহাকে মুক্ত করেন এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োগ করেন। কথিত আছে, রাজাজ্ঞায় দেল্‌ফি নামক স্থানে দৌত্যকার্যে গিয়া তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের অসন্তোষ উৎপাদন করিলে তাহারা পর্বতশিখর হইতে নীচে ফেলিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। হেরোদোতস (আনুমানিক ৪৮৪-২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক এই বিবরণ লিখিত হইলেও ইহার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়। কিংবদন্তী অনুসারে, ঈসপ ছিলেন দেখিতে কদাকার, কিন্তু বাক্‌পটু ও সুরসিক। গল্প শুনিতে তাঁহার কাছে দলে দলে লোক আসিত। সম্ভবতঃ ঈসপ নিজে তাঁহার গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। মুখে মুখে প্রচলিত তাঁহার গল্প নানা দেশের গল্পের সঙ্গে মিলিয়া যে বিরাট সাহিত্যসম্পদ সৃষ্টি করে, গ্রীক ভাষায় ব্যাব্রিয়াস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) ও লাতিন ভাষায় ফেদ্রাস (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) তাহা প্রথম ছন্দে গ্রথিত করেন। কালক্রমে তাহাই ঈসপের গল্প নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রিটেনে ক্যাক্সটন (১৪২২-৯১ খ্রী) প্রথম ঈসপের গল্প মুদ্রিত করেন। ফরাসীতে কতকগুলির পুনর্লিখন করেন লা ফঁতেইন (১৬২১-৯৫ খ্রী)। আমাদের দেশে বিষ্ণুশর্মা-রচিত পঞ্চতন্ত্রের উপকথাগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' (১৮৫৬ খ্রী) ঈসপের গল্প অবলম্বনে রচিত। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বিষ্ণুশর্মা' দ্র।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল হইতে ইংল্যাণ্ডের বণিকসম্প্রদায় ইওরোপের বাহিরে বাণিজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিল। পর্তুগাল ও স্পেনের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং মশলার বাণিজ্যে হল্যাণ্ডের লাভের পরিমাণ তাহাদের এমন উৎসাহিত করে যে কতিপয় লণ্ডনবাসী বণিক একত্র হইয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করে এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন রানী এলিজাবেথের এক সনন্দের বলে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র পর রাজকীয় সনন্দ উপেক্ষা করিয়া পার্লামেণ্ট অন্য এক বণিকসংঘকে এশিয়াখণ্ডে ব্যবসায় করিবার অনুমতি দেন। পুরাতন ও নূতন কোম্পানির বিরোধের ফলে উভয়ের ক্ষতি হওয়ায় ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি দুইটি মিলিত হইয়া 'দি ইউনাইটেড কোম্পানি অফ মার্চেণ্টস অফ ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ' নাম গ্রহণ করে। ইহাই প্রখ্যাত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের দ্বারা ইহার গঠনতন্ত্র স্থির হয়। এক হাজার পাউণ্ড বা তদূর্ধ্ব শেয়ারের মালিকদের লইয়া মালিক-সমিতি বা দি কোর্ট অফ প্রপ্রাইটর্‌স গঠিত হয়। তাঁহারা ৪ বৎসরের জন্য পরিচালক-সভা বা দি কোর্ট অফ ডিরেক্টর্‌স নির্বাচন করিতেন। ২৪ জন পরিচালকের মধ্যে ৬ জন প্রতি বৎসর অবসর লইতেন; কিন্তু পরবৎসরই তাঁহারা নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিতেন বলিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব এক বিশেষ গোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকিত। ইহার মধ্যে জাহাজ-ব্যবসায় বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্ষুদ্র দল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার একটি গোপন কমিটি গঠিত হয় এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় বাণিজ্য-সম্পর্কিত সমস্ত জরুরি সমস্যা এই কমিটি সমাধান করিত এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অফ কণ্ট্রোল-এর সভাপতির সহিত সকল সময় সংযোগ রক্ষা করিত। কুড়ি বৎসর অন্তর কোম্পানির সনন্দের পুনর্বিচার হইত। কোম্পানি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষবারের মত সনন্দ লাভ করে।

প্রথম দিকে কোম্পানি সাধারণ বাণিজ্যসংস্থাই ছিল। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টায় বিফল হইয়া ভারতের দিকে তাহার দৃষ্টি প'ড়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হকিন্‌স জাহাঙ্গীরের (রাজত্বকাল ১৬০৫-২৭ খ্রী) নিকট হইতে সুরাট বন্দরে কুঠি গড়িবার অনুমতি পান। কিন্তু নানা বাধা দেখা দেয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর টমাস রো-র দৌত্য এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আদায় করে। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রথমে সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ ও বরোচে এবং পরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অগ্রসর

হইয়া হরিহরপুর, মাদ্রাজ ও হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে বোম্বাই উপহার দেন। কুঠি রক্ষার জন্য সেখানে এবং মাদ্রাজে ও কলিকাতায় দুর্গ নির্মিত হয়।

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের প্রথম অধ্যায়ে রপ্তানির গুরুত্ব ছিল অধিকতর। কোম্পানি সুরাট, মাদ্রাজ ও বাংলা হইতে কাপড় এবং বাংলা হইতে রেশম ও সোরা রপ্তানি করিত। বিলাতি পণ্যের চাহিদা ছিল না বলিয়া তাহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য আমদানি করিতে হইত অথবা অন্তর্বাণিজ্যের দ্বারা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ আনিতে হইত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের হাতে বাংলার দেওয়ানি আসার পর রাজস্বের উদ্বৃত্ত ব্যবসায়ে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, উপরন্তু ব্যক্তিগত অন্তর্বাণিজ্যের লাভ, নবাবি উপঢৌকন, বেনামি জমিদারির মুনাফা— সবই ভারতীয় পণ্যসামগ্রী বা হীরকে রূপান্তরিত হইয়া ইওরোপে যাইতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় কাপড়ের উপর বিপুল শুল্কভার ন্যস্ত হইলে এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে বিলাতি কাপড়ের মূল্য কমিলে কোম্পানি কাপড়ের ব্যবসায় সংকুচিত করিয়া নীল ও রেশমের উপর জোর দেয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পপতি ও সাধারণ বণিকদের চাপে ভারতের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু স্টার্লিং দেনা প্রভৃতি খাতে ইংল্যাণ্ডে অর্থ পাঠাইবার দায়িত্ব বর্তমান ছিল বলিয়া কোম্পানি তারপরেও রপ্তানি বাণিজ্য চালায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় এবং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যও চিরতরে চলিয়া যায়। ইহাতে কোম্পানির বিশেষ ক্ষতি হয় না। ভারতীয় বাণিজ্যে তাহাদের ক্ষতি হইতে থাকা সত্ত্বেও শুধু সাম্রাজ্যের জন্যই তাহারা বাণিজ্যাধিকার রাখিয়াছিল।

বহুদিন হইতে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী রূপ প্রকট হইতেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে, পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রী) জয়লাভের পরে ক্লাইভের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ সাম্রাজ্যের প্রথম সোপান। হেস্টিংসের (শাসনকাল ১৭৭২-৮৫ খ্রী) আমল হইতে ড্যালহৌসি (শাসনকাল ১৮৪৮-৫৬ খ্রী) পর্যন্ত সাম্রাজ্য-বিস্তারের ধারা নিরবচ্ছিন্ন, প্রথমে মহীশূর, পরে মারাঠা এবং শেষে শিখ— সর্বাধিক শক্তিশালী এই তিন দেশীয় রাজ্যের পতনের ফলে ব্রিটিশ শাসন ভারতের তিন দিকে প্রসারিত হয় এবং ড্যালহৌসির আমলে সে শাসন ব্রহ্ম দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শুধু আফগানিস্তানেই ইহার গতি ব্যাহত হয়। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে সব সময় সাম্রাজ্যলোলুপ ছিলেন তাহা নয়, বরং ওয়েলেস্‌লির (শাসনকাল ১৭৯৮-১৮০৫ খ্রী) ক্ষেত্রে তাঁহারা স্পষ্টতঃই বাধার সৃষ্টি করেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ ইংরেজ বণিক, দূরদর্শী ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল এবং ফ্রান্স ও রুশ -বিরোধী ব্রিটিশ সরকারের মিলিত চাপে কোম্পানিকে বহু ক্ষেত্রে নীরব সাক্ষী হইতে হয়।

কোম্পানির আমলে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমতঃ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য -বিস্তারের ফলে নগর-সভ্যতা ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুদয়। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া এই শ্রেণীই আধুনিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতে শুরু করে। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানি-প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে এক দিকে যেমন পুরাতন জমিদারশ্রেণী বিলুপ্ত হয়, অন্য দিকে তেমনই উচ্চতম হারে খাজনা ও রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা মন্দ হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ কোম্পানি হিন্দু বা মুসলমানের ধর্মে আঘাত না করিলেও নানা মধ্যযুগীয় কুপ্রথা দমনে অগ্রসর হয়। কোম্পানির আইনের চোখে সকলে সমান বলিয়া জাতিভেদপ্রথা অনেকখানি শিথিল হয়। চতুর্থতঃ ডাক, তার, বাষ্পীয় পোত, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পুরাতন ভারতের খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রূপ দূর হইয়া একই আর্থিক ব্যবস্থা ও শাসনপদ্ধতিতে দৃঢ়বদ্ধ নূতন ভারতের জন্ম হয়।

একটি ক্ষুদ্র কোম্পানির পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন বা সম্যক উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তদুপরি কোম্পানির নানা শত্রু ছিল। তাহারা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রমাগত সমালোচনা করিয়া কোম্পানির শাসনের ভিত্তি দুর্বল করিতেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে প্রাথমিক পরাজয় ইহার ধ্বংস সাধন করিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলে কোম্পানির আমলের অবসান হয়। ইহার ইতিহাস অনেক অত্যাচার-অবিচারে কলঙ্কিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ভাল দিকও ছিল। হেস্টিংসের আনুকূল্যে এশিয়াটিক সোসাইটি, ওয়েলেস্‌লির চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের প্রেরণায় হিন্দু কলেজ, বেন্টিঙ্কের উৎসাহে মেডিক্যাল কলেজ এবং ড্যালহৌসি ও উড -এর চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা— তাহার কতকগুলি প্রমাণ। মান্‌রো, ম্যাল্‌কম, এল্‌ফিনস্টোন, মেটকাফ, বার্ড, টোমাসন, লরেন্সের মত কুশলী শাসক পরবর্তী ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায় নাই। বণিকের মানদণ্ড যোগ্য হস্তেই রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

দ্র P. Anber, *Rise and Progress of the British Power in India*, vols. I-II, London, 1837; James Mill, *History of British India*, vols. I-IX, London, 1848; J. W. Kaye, *Administration of the East India Company*, London, 1853; H. H. Dodwell, ed., *Cambridge History of India*, vol. V, Cambridge, 1929; C. H. Philips, *The East India Company, 1784-1834*, Oxford, 1961; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, part I, Bombay, 1963.

অমলেশ ত্রিপাঠী

ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব খেলাধুলার বড় ক্লাব। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল। পূর্ব বঙ্গের নাগরপুরের জমিদারবংশীয় সুরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ক্রীড়ামোদীগণের চেষ্টায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা। বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ইহার সংস্থাপক-সভাপতি এবং পূর্বোক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও বিখ্যাত অ্যাটর্নি তড়িৎভূষণ রায় ইহার প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। বর্তমান (১৯৬৩ খ্রী) সভ্যসংখ্যা ৫০০০। কলিকাতা ময়দানের একই মাঠ ১৯২১ হইতে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোহনবাগান ও ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাবের যুগ্ম-অধিকারে ছিল। মোহনবাগান ক্লাব অন্য মাঠ গ্রহণ করায় বর্তমানে ঈস্ট বেঙ্গল ও এরিয়ান ক্লাব ঐ মাঠের যুগ্ম-অধিকারী হইয়াছে। ক্লাবের সভ্যদের জন্য নিজস্ব দর্শক-মঞ্চ আছে। ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণ হইল সোনালি ও লাল রঙের শার্ট ও মোজা এবং কালো (ফুটবলের জন্য) হাফপ্যাণ্ট। ক্লাবের মুখ্য উপজীব্য ফুটবল। তবে কলিকাতার অগ্রণী ক্রীড়া-সংস্থাগুলির ন্যায় হকি, ক্রিকেট, লন টেনিস প্রভৃতি খেলার এবং বাৎসরিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত প্রখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতাসমূহে ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব বিজয়ী হইয়াছে :

আই. এফ. এ. লীগ (১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৬১ খ্রী)।
আই. এফ. এ. শীল্ড (১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৮ খ্রী, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্ম বিজয়ী)।
ডুরাণ্ড কাপ (১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৬ খ্রী, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্ম-বিজয়ী)।
রোভার্স কাপ (১৯৪৯ খ্রী, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্ম-বিজয়ী)।

এতদ্ব্যতীত কালিকট গোল্ড কাপ (১৯৪৪ খ্রী) এবং ত্রিবাঙ্কুর অল ইণ্ডিয়া ফুটবল টুর্নামেণ্ট -এ (১৯৪৫ খ্রী) ঈস্ট বেঙ্গল একবার করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ওলিম্পিক ফুটবল দল এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের গোটেবার্গ ফুটবল দলকে কলিকাতার মাঠে পরাজিত করে। ক্লাবের ফুটবল দল ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও রুমানিয়া পরিভ্রমণ করে এবং তিন বার (১৯৩৩, ১৯৩৭ ও ১৯৪৮ খ্রী) ব্রহ্ম দেশ সফর করে। হকি খেলাতেও ক্লাব সাফল্য অর্জন করিয়াছে। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত লীগে তিন বার (১৯৬০ ও ১৯৬৩ খ্রী; ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্ম-বিজয়ী) এবং বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় দুই বার (১৯৫৭ ও ১৯৬২ খ্রী) বিজয়ী হইয়াছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু এবং বন্যাপীড়িত দুর্গতদের সাহায্যকল্পে আই. এফ. এ. বা অপরাপর সংস্থা পরিচালিত চ্যারিটি ম্যাচে এই ক্লাব বিভিন্ন বার অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

জ্ঞানশংকর সেনগুপ্ত

উইন্‌টারনিৎস, মরিস হ্বিন্‌টেরনিৎস, মোরিৎস দ্র

উইল সম্পত্তি সম্বন্ধে দাতার চরম ব্যবস্থাপত্র। দাতার মৃত্যুর পর উইল বলবৎ হয় এবং দাতা যতদিন জীবিত থাকেন তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রদ, বদল, রহিত বা বাতিল করিতে পারা যায়। দাতার সম্পত্তি তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন, ইহাতে তাঁহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ওয়ারিস-দের কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না— ইহা হইল উইলের নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে— ওয়ারিসদের মনে আশা থাকে, ত্যক্ত সম্পত্তি তাহারা ভোগদখল করিবে। এখন খেয়াল-খুশি মত তাহাদের পথে বসাইতে পারা যায় না। এজন্য ফরাসী দেশে বিধান ছিল, সন্তান থাকিলে অর্ধেকের বেশি সম্পত্তি উইল করিয়া সন্তানদের বঞ্চিত করা আইনবিরোধী। মুসলমান আইনে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি উইল করিতে পারা যায় না। এক-তৃতীয়াংশ যাহাকে খুশি দান করা যায় কিন্তু ওয়ারিসদের মধ্যে একজনকে বেশি দেওয়া চলিবে না। কারণ এইরূপ দানে সাংসারিক অশান্তি বাড়িতে পারে।

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে উইলের বা অনুরূপ দানকার্যের কোনও ব্যবস্থা নাই। ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা দেশে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে হিন্দুরা উইল করিতে আরম্ভ করে। ফরাসী-অধিকৃত ভারতেও কিছু কিছু উইলের নিদর্শন পাওয়া যায়। গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী তাঁহার সুবিখ্যাত 'হিন্দু ল' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে হিন্দুদের

মধ্যে উইলের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ইহা হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রসম্মতও নহে। মুসলমানদের অনুসরণে বা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে উইলের ব্যবস্থা হয় নাই। ইংরেজ আমলেই হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথম উইলের প্রচলন হয়। হিন্দুসমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এবং দত্তক গ্রহণ ও নিবন্ধদানের ব্যবস্থা থাকায় উইলের প্রয়োজন ছিল না। তাহা ছাড়া, পিতৃ-পিতামহের মৃত্যুকালীন অভিপ্রায় পালন করিবার ইচ্ছা সন্তানদের মনে স্বভাবতঃই প্রবল ছিল বলিয়া উইলের আবশ্যক হইত না। কেহ কেহ বলেন যে নারদসংহিতায় এমন দুই-একখানি বচন আছে, যাহা হইতে উইলের বনিয়াদ সৃষ্ট হইতে পারে। তর্কের কথা বাদ দিলে দেখা যায়, কলিকাতার বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ১১৭৭ বঙ্গাব্দ (১৭৭০ খ্রী) হইতে উইল করা চলিতেছে। ইতিহাস-বিখ্যাত উমিচাঁদ ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উইল করিয়াছিলেন। উমিচাঁদ ছিলেন পাঞ্জাবী। হাটখোলার দত্তবংশের মদনমোহন দত্ত ১১৯৩ বঙ্গাব্দে এবং শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১১৯৮ বঙ্গাব্দে উইল করেন। মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয়ী ভূপ বাহাদুর তাঁহার নদীয়া রাজত্ব জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে ইহার আগে উইল করিয়া দান করেন। রাজা শিবচন্দ্র উইল করেন ১১৯৫ বঙ্গাব্দে। বাংলায় নদীয়ারাজের সামাজিক প্রভাব ছিল প্রবল। তাঁহার উইল আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হওয়ায় অনেকের মনে উইল করিবার ইচ্ছা হয় এবং ইহা যে শাস্ত্র-সংগত এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়।

হিন্দু উইল করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে ইংরেজ জজেদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বি. বি. মথুরার মকদ্দমায় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাসেল সাহেব সাব্যস্ত করেন যে, সকল হিন্দুরই উইল করিবার অধিকার আছে।

এই প্রসঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নম্বর রেগুলেশনের বিধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাতে আছে: 'যদি কোনও জমিদার উইল অথবা অন্য কোনও লিখিত বা বাচনিক ব্যবস্থা না করিয়া মারা যান এবং যদি হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র অনুযায়ী দুই বা ততোধিক উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান, তাহা হইলে উক্ত ওয়ারিসগণ তাহাদের অংশ অনুযায়ী তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি পাইবে।' এই রেগুলেশনে ও অন্যান্য বহু রেগুলেশনে হিন্দুর পক্ষে উইল করিবার অধিকার পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

স্পষ্ট আইন করিয়া হিন্দুর উইল করিবার অধিকার স্বীকৃত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'হিন্দু উইল্‌স অ্যাক্ট'-এ। এই আইন বাংলার ছোটলাটের এলাকাভুক্ত স্থানে (অর্থাৎ বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর, ওড়িশা ও আসামে) এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে বলবৎ হয়। উইলপত্র লিখিয়া উইলকর্তাকে অন্ততঃ পক্ষে দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিতে হইত এবং সাক্ষীরাও নিজ নিজ স্বাক্ষর করিতেন। এই সকল স্থানের বাহিরে হিন্দুরা বাচনিক উইল অর্থাৎ বিনা স্বাক্ষরে বা বিনা সাক্ষীতে উইল করিতে পারিতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর সকল হিন্দুকেই লিখিত উইল অন্ততঃ পক্ষে দুই জন সাক্ষীর সামনে স্বাক্ষর করিতে হয়। উইল রেজিষ্ট্রি করিলেই ভাল; কিন্তু রেজিষ্ট্রি যে করিতেই হইবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। উইলকর্তার মৃত্যুর পর যথাসম্ভব শীঘ্র উপযুক্ত আদালত হইতে উইল প্রমাণ করিয়া প্রবেট লওয়া উচিত।

কোনও সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক যুদ্ধে যাইবার পূর্বে দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে বাচনিক উইল করিতে পারেন। লিখিত উইল হইলে সহি থাকা প্রয়োজন; কিন্তু সাক্ষীর দরকার নাই। যদি সহি না থাকে তাহা হইলে তাঁহার আদেশে বা উপদেশে যে উইল লিখিত হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে। এইরূপ বাচনিক উইল ইত্যাদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার এক মাস পর পর্যন্ত বলবৎ থাকে, তার পর সাধারণের মত উইল করিতে হয়।

দ্র W. A. Montriou, *Some Precedents and Records to Aid Enquiry as to the Hindu Will of Bengal*, Calcutta, 1870; Golapchandra Sarkar Sastri, *Hindu Law*, Calcutta, 1940.

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

উইলকিন্‌স, চার্লস (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬ খ্রী) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্‌স ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটারের চাকুরি লইয়া ভারতবর্ষে আসেন। এ দেশে আসিবার অব্যবহিত পর হইতেই উইলকিন্‌স ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একাগ্র অধ্যবসায়ের দ্বারা ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাচ্যের ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই উইলকিন্‌স এই সকল ভাষায় ছাপার হরফ নির্মাণের চেষ্টাও শুরু করেন এবং দ্রুত হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণশিল্পে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ওঠেন। কোম্পানির অপর একজন কর্মচারী হ্যাল্‌হেড সাহেব ইংরেজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল হেষ্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্‌স তাহার জন্য

বাংলা হরফ নির্মাণ করেন এবং হুগলিতে স্বীয় ছাপাখানায় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক রচনার জন্য হ্যালহেডকে এবং মুদ্রণকৃতিত্বের জন্য উইলকিন্‌সকে একযোগে ৩০০০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়। মুদ্রণ-ব্যাপারে তাঁহার একক চেষ্টা ও দক্ষতার জন্য ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চিন্তা এবং প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির প্রেসের অধ্যক্ষের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। ঐ পদে তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা ছাড়াও তিনি ফারসী ভাষায় এক সেট হরফ তৈয়ারি করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন -সংকলিত বিখ্যাত ইংরেজী-ফারসী অভিধান তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই হরফে মালদহে মুদ্রিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি সংস্কৃত অক্ষরের হরফও নির্মাণ করেন। হরফ নির্মাণের এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে বাংলা দেশের ছাপাখানা ও মুদ্রণ-শিল্পের জনক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনে উইলকিন্‌স বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ভগবদ্‌-গীতার অনুবাদে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য হেস্টিংস স্বয়ং ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। তিনি মনুসংহিতার অনুবাদও শুরু করেন কিন্তু তাঁহার প্রারব্ধ কার্য শেষ করেন ভারততত্ত্ববিদ্‌ স্যর উইলিয়াম জোন্‌স। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে উইলকিন্‌স বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকটি শিলা ও তাম্র -লিপির প্রথম পাঠোদ্ধারও তিনি করেন। এই অর্থে তিনি প্রথম ভারততত্ত্ববিদ্‌। বিভিন্নভাবে কঠিন পরিশ্রম করিবার ফলে তাঁহার শরীরের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিলাতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্‌স উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ উইলকিন্‌স-এর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গীতা এবং হিতোপদেশের তিনি অনুবাদ করেন (১৭৮৫ ও ১৭৮৭ খ্রী)। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'স্টোরি অফ শকুন্তলা ফ্রম দি মহাভারত' (১৭৯৩ খ্রী), 'কম্পাইলেশন অফ জোন্‌স ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট্‌স' (১৭৯৮ খ্রী), 'রিচার্ডসন্‌স পার্সিয়ান, অ্যারাবিক অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিকশনারি' (১৮০৬ খ্রী), 'এ গ্রামার অফ দি স্যান্‌স্‌ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮০৮ খ্রী) এবং 'র‍্যাডিক্যাল্‌স অফ দি স্যান্‌স্‌ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮১৫ খ্রী)।

শিবনাথ রায়

উইলসন, হোরেস হেম্যান (১৭৮৬-১৮৬০ খ্রী) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যবিদ্‌ পণ্ডিত। জন্ম ইংল্যাণ্ডে, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসেন। রসায়নশাস্ত্রে এবং ধাতুর গুণাগুণ নির্ণয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তিনি কলিকাতা টাঁকশালের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ পর্যন্ত কলিকাতা টাঁকশালে তিনি অ্যাসে-মাস্টার ছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি মনোনীত হন। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের 'বোডেন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন (১৮৩৩ খ্রী)। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর নির্বাচিত হন।

হেনরি টমাস কোলব্রুকের সহায়তায় উইলসন সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। উইলসন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সমর্থক ছিলেন। কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের সম্পাদক এবং হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধায়ক রূপে এ দেশে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা প্রসারের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। বিভিন্ন সোসাইটির (যেমন এশিয়াটিক, মেডিক্যাল, ফিজিক্যাল) জার্নালে প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উইলসন রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৬২-৭১ খ্রী)। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'মেঘদূত', 'সিলেক্ট স্পেসিমেন্‌স অফ দি থিয়েটার অফ দি হিন্দুজ', 'এ ডিক্‌শনারি ইন স্যান্‌স্‌ক্রিট অ্যাণ্ড ইংলিশ', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'গ্রামার অফ স্যান্‌স্‌ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ', 'ঋগ্‌বেদ', 'গ্লসারি অফ ইণ্ডিয়ান টার্মস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিনয় ঘোষ

উগ্‌গ বৈশালীর এক গৃহপতি। শ্রেষ্ঠ একজন দাতা হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদেহধারী, উন্নতমনা এবং অপরিমেয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে উগ্‌গ সেট্‌ঠি নামে অভিহিত করা হইত,

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম নির্ণয় করা শক্ত। বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই তিনি স্রোতাপন্ন হন এবং অচিরেই অনাগামী হন।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

উগো, ভিক্তোর মারী (১৮০২-৮৫ খ্রী) ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। উগো ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি। কাব্যসাহিত্যের সর্ব ক্ষেত্রে বিচরণশীল এমন ব্যাপক ও সর্বতোমুখী প্রতিভা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তাঁহার পিতা ছিলেন নাপোলেঅঁ (নেপোলিয়ন) -এর সৈন্যবাহিনীর একজন অধিনায়ক। নাপোলেঅঁর পতনের পর তাঁহার সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের পর্ব শুরু হয়। উক্ত পর্বের শেষে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম্যান্টিক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতৃপদ অধিকার করেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যতন্ত্রের (১৮৫২-৭০ খ্রী) যুগ, উগোর স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কাল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তৃতীয় নাপোলেঅঁর পতনের পর। ততদিনে উগো দেশপূজ্য বীরের আসনে বৃত হইয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবাসীর স্বতঃ উৎসারিত স্তব ও বন্দনার মধ্যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

উগোর সাহিত্যকৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার সম্পর্কে বদলেয়ার বলিয়াছেন: 'তাঁহার [উগোর] আবির্ভাবের পূর্বে ফরাসী কাব্যের কি অবস্থা ছিল এবং তাঁহার আগমনের পরে উহা কি নবজীবন লাভ করিয়াছে, এ কথা কেহ যদি চিন্তা করিয়া দেখেন এবং তাঁহার অভ্যুদয় না হইলে ফরাসী কাব্যের কি পরিণাম হইত তাহাও যদি কেহ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে যাঁহারা সাহিত্যে সর্বমানবের মুক্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই দুর্লভ ও দৈবপ্রেরিত প্রতিভাধরগণের অন্যতমরূপে তাঁহাকে স্বীকার না করা অসম্ভব হইবে।' ভালেরির সমালোচনাও উদ্ধৃত করার যোগ্য: 'তিনি [উগো] ছিলেন ক্ষমতার মানুষী রূপ। তাঁহাকে বুঝিতে গেলে এ কথা হৃদয়ংগম করাই যথেষ্ট যে, শুধু পাশাপাশি বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে তাঁহার সমকালীন কবিদের কি উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে।'

'ক্রমওয়েল' (১৮২৭ খ্রী) নাটকের প্রসিদ্ধ ভূমিকায় উগো রোম্যান্টিক আন্দোলনের ইস্তাহার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাহিত্যরূপের প্রথাবদ্ধ শ্রেণীবিভাগ এবং স্থান-কালের ঐক্য-সংক্রান্ত অনড় বিধিবিধান তিনি অগ্রাহ্য করেন। উগো গম্ভীর ও উদ্ভট রসের একত্র সমাবেশের পক্ষে ছিলেন; কারণ প্রকৃতি তো উহাদের পৃথক করিয়া রাখে না। সাহিত্য প্রকৃতির অনুলিপি নয়, কিন্তু প্রকৃতিই সকল শিল্পকলার ভিত্তিস্বরূপ। শিল্পের কাজ প্রকৃতির বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত করা। এই প্রক্রিয়ায় 'যে আলো স্তিমিত ছিল তাহা উজ্জ্বলিত হয় এবং যাহা উজ্জ্বল ছিল, তাহা শিখায়িত হইয়া ওঠে'।

এই সকল শিল্পনীতি তিনি বহুবিচিত্র সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করেন। অসীম আত্মপ্রত্যয়ে তিনি নিজেকে দ্রষ্টা ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্‌বক্তা রূপে গণ্য করিতেন। গীতিকবিতা তাঁহার রচনাবলীর অধিকাংশ জুড়িয়া আছে এবং উহাই তাঁহার অমরত্বের শ্রেষ্ঠ বনিয়াদ। তাঁহার গীতিকবিতায় আবেগের যে বৈচিত্র্য ও বিস্তার অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। মানবহৃদয়ের এমন কোনও অনুভূতি বিরল, যাহা তিনি অনুভব ও রূপায়িত করেন নাই। উগো ছন্দোগুরু, ফরাসী কাব্যকলাকে তিনি ছন্দোবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্রূপ উদ্দীপ্ত, তীব্র, শ্লেষপূর্ণ ও জ্বালাময়। 'লে শাতিমঁা' (শাস্তি, ১৮৫৩ খ্রী) ইহার দৃষ্টান্ত। উক্ত কাব্যে উগো তৃতীয় নাপোলেঅঁকে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন। 'লা লেজঁাদ দে সিয়েক্‌ল্' (যুগ-যুগান্তের বীরকাহিনী, ১৮৫৯-৮৩ খ্রী) মানুষের মহাকাব্য। অন্ধকার ও গ্লানি হইতে আলোক ও মুক্তির অভিমুখে মানুষের ক্রমিক অগ্রগতি উহার উপজীব্য। উগোর উপন্যাসগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়; তন্মধ্যে 'নোত্‌র্ দাম দ্য পারী' (পারী শহরের নোত্‌র্ দাম, ১৮৩১ খ্রী) ও 'লে মিজেরাব্‌ল্' (দীন-দুঃখীগণ, ১৮৬২ খ্রী) সর্বাধিক পরিচিত। কিছু সংখ্যক নাটক রচনাকালে তিনি তাঁহার রোম্যান্টিক নাট্যতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক রচনার প্রতিভা উগোর ঐ নাটক-গুলিতে পূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। তৎপ্রণীত নাটকের মধ্যে 'এরনানি' (১৮৩০ খ্রী) ও 'রুই ব্লা' (১৮৩৮ খ্রী) প্রসিদ্ধতম।

রবেয়ার আঁতোয়ান

উগ্রক্ষত্রিয় পশ্চিম বঙ্গে প্রধানতঃ বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরীদের বাস। ক্ষত্রিয় পিতা এবং শূদ্র মাতা হইতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি— এইরূপ কথিত আছে। ইহারা সুত এবং জানা এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। সুতদের মধ্যে আবার কয়েকটি প্রশাখা আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক এই দুইটি বিভাগও আছে। বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ। পূর্ব বঙ্গে ইহারা তথাকথিত নিম্নজাতি হিসাবে পরিচিত; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহারা নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা জলচল।

দীপালি ঘোষ

উগ্রসেন[১] মহাভারতের একাধিক চরিত্রের নাম। তন্মধ্যে একজন যদুবংশীয় রাজা, কংসের পিতা। কংস তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং মথুরার সিংহাসনে বসান। অপর এক উগ্রসেন পরিক্ষিতের চারি পুত্রের অন্যতম; জনমেজয়ের ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নামও উগ্রসেন।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

উগ্রসেন[২] নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। 'মহাবোধিবংশ' গ্রন্থে উল্লিখিত উগ্রসেন এবং পুরাণ-প্রোক্ত মহাপদ্ম বা মহাপদ্ম-পতিকে পণ্ডিতগণ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

মূল অর্থ ভুক্তাবশিষ্ট। উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দিতে নাই, উচ্ছিষ্টযুক্ত মুখে অর্থাৎ খাওয়ার পর না আঁচাইয়া কোথাও যাইতে নাই (মনুসংহিতা, ২।৫৬)। শিষ্যের পক্ষে গুরুর এবং নিম্নবর্ণের পক্ষে উচ্চবর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজনের রীতি আছে। এক জাতি উচ্ছিষ্টমুখে আর এক জাতিকে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। বাংলা দেশে লোকাচার অনুসারে রন্ধন-করা খাদ্যদ্রব্য (বিশেষ করিয়া ভাত, ডাল, তরকারি) উচ্ছিষ্ট (এঁটো বা সকড়ি)। কোনও জিনিসে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে তাহা মাজিয়া ধুইয়া লইলে শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে খুঁটিনাটি নানা বিধি-নিষেধের প্রচলন ছিল। শুষ্ক খাদ্যে (খই, চিড়া, মুড়ি) জলস্পর্শ হইলে উহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে দিন বা রাত্রির মধ্যে দুই বার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উজানি কোগ্রাম দ্র

উজির খাঁ (১৮৬০-১৯২৭ খ্রী) তানসেনের কন্যাবংশে জাত মহাগুণী সংগীতজ্ঞ। পিতা আমীর খাঁ ও মাতামহ-সম্পর্কীয় বাহাদুর সেন খাঁর শিক্ষাধীনে ঘরানা তালিম প্রাপ্ত। সুরশৃঙ্গার, বীণা ও রবাব যন্ত্রে এবং ধ্রুপদ সংগীতে উজির খাঁ নেতৃস্থানীয় কলাবিদ্। অধিকাংশ জীবন তিনি রামপুর দরবারে সসম্মানে অবস্থান করেন। কলিকাতাতেও তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অমৃতলাল দত্ত, যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাউদ্দীন খাঁ প্রভৃতি তাঁহার বাঙালী শিষ্য; অপরাপর শিষ্যের মধ্যে আছেন হাফিজ আলী খাঁ (সরোদ), নাসির আলী (সেতার, সুরবাহার), মহম্মদ হোসেন (বীন) আবদর রহিম (সেতার), সৈয়দ ইব্বন্ আলী (হারমোনিয়াম) প্রভৃতি।

দ্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান, কলিকাতা, ১৩৬৪।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

উজ্জয়িনী, উজ্জয়িন মধ্য প্রদেশ রাজ্যের ইন্দোর বিভাগের জেলা ও ঐ জেলার সদর। জেলার আয়তন ৬১১২ বর্গ কিলোমিটার (২৩৬০ বর্গ মাইল)। উজ্জয়িনী শহরের অবস্থান ২৩°৯´ উত্তর, ৭৫°৪৩´ পূর্ব।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলার লোক-সংখ্যা ৬৬১৭২০; তন্মধ্যে পুরুষ ৩৪৪৫১৫ ও স্ত্রীলোক ৩১৭২০৫ জন। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯২১ : ১০০০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ১৩৮ (প্রতি বর্গ মাইলে ২৮০)। প্রতি হাজারে ৬৭৬ জন গ্রামে ও ৩২৪ জন শহরে বাস করে। উজ্জয়িনী পৌরাঞ্চলে ১৪৪১৬১ জন লোক বাস করে। তন্মধ্যে ৭৭০০৫ পুরুষ ও ৬৭১৫৬ জন স্ত্রীলোক। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৮৭২ : ১০০০।

উজ্জয়িনী প্রাচীন অবন্তি বা মালবের রাজধানী। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধে মহাদেবের জয়লাভের ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য অবন্তি শহরের নাম রাখা হয় উজ্জয়িনী। কালিদাসের মেঘদূত (পূর্বমেঘ) কাব্যে উজ্জয়িনী বিশালা নামেও অভিহিত হইয়াছে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে ইহার পদ্মাবতী, ভোগবতী এবং হিরণ্যবতী নাম পাওয়া যায়।

শিপ্রাতটবর্তী সুরম্য নগরী উজ্জয়িনী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের সময়ে রাজপ্রতিনিধির শাসনকেন্দ্র ছিল। সিংহাসনলাভের পূর্বে রাজপুত্র অশোক এক সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও উজ্জয়িনী বিখ্যাত ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'পেরিপ্লউস' গ্রন্থ হইতে জানা যায় 'ওজেনী' (উজ্জয়িনী) হইতে বরিগাজায় (ব্রোচ নগরে) এবং ভারতের অন্যান্য অংশে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইত। তিনটি বিশিষ্ট বাণিজ্যপথের সংগমস্থলে অবস্থিত হওয়ার জন্য উজ্জয়িনী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। শুধুমাত্র আর্থিক নয়, মানসিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উজ্জয়িনীর নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের

(সাধারণতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য মনে করা হয়) সভার নবরত্নের প্রধান রত্ন মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও, তিনি যে শহরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, মেঘদূত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যবিষয়ক কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন সাহিত্য ও লেখ -গত প্রমাণ হইতে মনে হয় উজ্জয়িনী সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য -চর্চার, একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদ্যারও বিশেষ চর্চা ছিল এবং প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদ্ ও ভূগোলবিদ্‌গণ এখান হইতে দ্রাঘিমান্তর স্থির করিতেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুণমতির শিষ্য উজ্জয়িনীর অধিবাসী মহাপণ্ডিত পরমার্থ চীন পরিদর্শন করেন এবং লক্ষণানুসারশাস্ত্রসহ মোট ৭০টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

গুপ্তবংশের রাজত্বকালের পরে উজ্জয়িনী কলচুরিদের হস্তগত হয়। কলচুরিরাজ শংকরগণ ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কালক্রমে উজ্জয়িনী প্রতিহারদের অধিকারে চলিয়া যায় এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নাগভট্ট প্রতিহার অবন্তিতে রাজত্ব করিতেন। উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। এই সময় আরবগণ উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু নাগভট্ট তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করেন এবং তাহাদের কবল হইতে পশ্চিম ভারত মুক্ত রাখেন।

মালবের অধিকার লইয়া প্রতিহারদের সহিত রাষ্ট্রকূট ও তাহাদের সামন্ত পরমারদের দীর্ঘদিন যুদ্ধবিগ্রহ চলে এবং উজ্জয়িনীর অধিকার পুনঃ পুনঃ হস্তান্তরিত হয়। এই অঞ্চলে অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্রকূটদের প্রাধান্যই বজায় থাকে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে মালবের উপর কল্যাণের চালুক্যরাজ ও তাঁহার মিত্র চৌলুক্যরাজের দৃষ্টি পড়ে। পরমারগণ শাকম্ভরির চাহমানদের সাহায্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস পান। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মামুদ পরমার-রাজধানী উজ্জয়িনী আক্রমণ করেন, কিন্তু পরমার লক্ষ্মদেবের নিকট পরাজিত হন। ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটরাজ কুমারপাল মালবকে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি আইন-উল্-মুল্‌ক উজ্জয়িনীসহ মালব অধিকার করেন। তিনি মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে মালবের শাসনকর্তা দিলাবর খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মালবের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর ধার ও মাণ্ডু মালবের রাজধানী হওয়ায় উজ্জয়িনীর গৌরব কমিয়া যায়।

মোগল রাজত্বে উজ্জয়িনী একটি প্রাদেশিক কেন্দ্র ছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনী সিন্ধিয়ার অধিকারে আসে এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসন হইতে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর গোয়ালিয়র রাজ্যের অবলুপ্তি পর্যন্ত উজ্জয়িনী গোয়ালিয়রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উজ্জয়িনী জেলায় ১৯৯৩৫৭ জন পুরুষ ও ১২২৬৯৮ জন নারী কর্মী আছে (১৯৬১ খ্রী)। তন্মধ্যে কৃষিতে ৯৩৮৮৯ জন পুরুষ ও ৭৭১০৫ জন নারী; খেতমজুররূপে ২৭৯৭৭ জন পুরুষ ও ৩১১২৭ জন নারী, গৃহশিল্পে ১০৭৭৫ জন পুরুষ ও ৫১০৯ জন নারী, গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রম-শিল্পে ১৮৯১১ জন পুরুষ ও ১৪৬৫ জন নারী এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ১২৯৭৫ জন পুরুষ ও ৮৯৭ জন নারী নিযুক্ত। উজ্জয়িনী শহরে কর্মরত পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৪৪৮ ও ৫৪২৪। তন্মধ্যে ১৩২৩৭ জন পুরুষ ও ৯২১ জন নারী গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে এবং ৭৩৯৬ জন পুরুষ ও ৩৮৯ জন নারী ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে।

চম্বল ও শিপ্রা -বিধৌত উজ্জয়িনী জেলার জমি অত্যন্ত উর্বর। এখানে সাধারণ শস্যাদি ব্যতীত প্রচুর আফিমও উৎপন্ন হয়। মধ্য প্রদেশে সুতিবস্ত্র, আর্টসিল্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ময়দা, জিনিং ও প্রেসিং ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র উজ্জয়িনী। এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে কাগজ-মণ্ডশিল্প (প্যাপিয়ে ম্যাশে) উল্লেখযোগ্য। তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য উজ্জয়িনীতে একটি কেন্দ্রীয় ডাইং, ব্লিচিং ও ক্যালেণ্ডারিং -এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী তুলা, শস্য ও আফিমের বড় গঞ্জ।

উজ্জয়িনী জেলায় প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২৩৪ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রতি হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪৮ ও ১১১। উজ্জয়িনী পৌরাঞ্চলে ৪৫৬৪৪ জন পুরুষ ও ২২০২২ জন স্ত্রীলোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত। উজ্জয়িনী শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়) অবস্থিত। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত উজ্জয়িনীর সিন্ধিয়া ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট ভারততত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য পুথি রক্ষিত আছে। উজ্জয়িনীর সরকারি 'সংগীত মহাবিদ্যালয়'

খয়রাগড়ের ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

উজ্জয়িনী শহরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে জয়সিংহ-নির্মিত বিখ্যাত মানমন্দির উল্লেখযোগ্য। মহাকাল শিবের প্রসিদ্ধ মন্দির এবং কালিয়াদহ বা প্রাচীন ব্রহ্মকুণ্ড ও কালভৈরবের মন্দির উজ্জয়িনীর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। উজ্জয়িনী হিন্দু লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি। ইহা একান্নটি শাক্ত পীঠের অন্যতম। শিবরাত্রি, বৈশাখী পূর্ণিমা ও কার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে বড় মেলা বসে। ভারতের যে চারিটি স্থানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়, উজ্জয়িনী তাহার অন্যতম। বার বৎসর অন্তর কুম্ভযোগ উপলক্ষে এখানে নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সমাগম হয় ('কুম্ভমেলা' দ্র)। উজ্জয়িনী বৌদ্ধ ও জৈনগণেরও পুণ্যক্ষেত্ররূপে নন্দিত। বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক মহাকচ্চায়ন বা মহাকাত্যায়ন উজ্জেনিতে (অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লুইপাদও এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ও অনুসন্ধানের ফলে উজ্জয়িনীতে বহু প্রাচীন মৃৎফলক, প্রস্তরপাত্র, মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এখানে প্রাপ্ত অনেকগুলি মুদ্রাতে 'ক্রস ও বল' চিহ্ন ('উজ্জয়িনীচিহ্ন' নামে খ্যাত) এবং 'উজেনিয়া' কথাটি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 'অবন্তি' ও 'মালব' দ্র।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. XIII, London, 1908; *Census of India: Paper No. 1 of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

উটকামণ্ড, উটি মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি জেলার মহকুমা, ঐ মহকুমার তালুক এবং জেলা, মহকুমা ও তালুকের সদর। উটকামণ্ড একটি মনোরম ও সুপরিচিত পার্বত্য শহর (১১°২৪´ উত্তর, ৭৬°৪৪´ পূর্ব)। ইহা দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য শহরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মাবাস এখানে অবস্থিত।

উটকামণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে। ডোডাবেট্টা, স্নোডাউন, এল্‌ক, চার্চ, ফার্ন, কেয়ার্ন ইত্যাদি পর্বতবেষ্টিত উপত্যকায় উটকামণ্ড অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উটকামণ্ড শহরের উচ্চতা ২২৮৬ মিটার (৭৫০০ ফুট)।

উটকামণ্ডের জলবায়ু বৎসরের সব সময়েই, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল হইতে জুন), অত্যন্ত আরামদায়ক। এই সময়টি ভ্রমণ, শিকার, অশ্বারোহণ এবং গল্‌ফ খেলা ইত্যাদি ক্রীড়ার পক্ষে প্রশস্ত। সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়াই উটকামণ্ডে আকস্মিক পশলা বৃষ্টি অথবা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় যথাক্রমে ১০০·৭৬ সেন্টিমিটার ও ৭৫·৫৭ সেন্টিমিটার (৪০ ও ৩০ ইঞ্চি)। গড় তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেড হইতে ১৫·৫° সেন্টিগ্রেড (৫০°-৬০° ফারেনহাইট)।

উটকামণ্ড তালুকের উত্তর-পশ্চিমের মালভূমি হইতে নীলগিরি জেলার একমাত্র নদী পাইকারা-র অবতরণপথে দুইটি জলপ্রপাত সৃষ্টি হইয়াছে। পাইকারা উটকামণ্ড তালুকের মধ্য দিয়া প্রবহমান। এইখানে ২২০১ মিটার (৭২২০ ফুট) উপরে ডোডাবেট্টা পর্বতের ঝরনাগুলি বাঁধিয়া দিয়া একটি কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উটকামণ্ড তালুকের অর্ধেকেরও বেশি সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে নীলগিরি অঞ্চলে পর্তুগীজ ধর্মযাজক ফেরেইরির অনুসন্ধানমূলক অভিযানের ফলে এখানকার আদিম অধিবাসী টোডাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন-হ্যামিল্টন এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কিজ্‌ ও ম্যাক্‌মেহনের পর্যবেক্ষণ-অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কোইম্বাটুরের তদানীন্তন কালেক্টর সুলিভান তাঁহার প্রেরিত দুই জন সহকারীর বিবরণীতে উৎসাহিত হইয়া ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বয়ং এই স্থানে আগমন করেন। তাঁহাকেই সাধারণতঃ উটকামণ্ডের আবিষ্কর্তা বলা হয়। এখানকার প্রথম অট্টালিকা 'স্টোন হাউস' তিনিই নির্মাণ করান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। সুলিভানই উটকামণ্ডের প্রথম ইওরোপীয় অধিবাসী। 'স্টোন হাউস' এখনও বর্তমান, তবে ইহার কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অনেক ইওরোপীয় এখানে বসবাস শুরু করেন। কিছুকালের মধ্যেই ইহা মাদ্রাজ গভর্নরের স্থায়ী গ্রীষ্মাবাস বলিয়া ঘোষিত হয়।

উটকামণ্ডের নামকরণ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। 'মণ্ড' শব্দের অর্থ গ্রাম। টোডা গ্রামগুলিতে প্রত্যেক সংগতিসম্পন্ন পরিবার গৃহের নিকটে একটি প্রস্তর প্রোথিত করিত। এই প্রস্তরে তাহারা দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য রাখিত। সুলিভান উটকামণ্ড পরিদর্শনে আসিলে, স্থানীয় গ্রামের একটি মাত্র কুটিরের মালিক বৃদ্ধ টোডা সর্দার পার্থ-কাই কুটিরের নিকটে যে স্থানে প্রস্তর প্রোথিত ছিল, সেই স্থানটি দেখাইয়া বলেন, 'ঘেল্লোকো এ মাণ্ড', অর্থাৎ এই প্রস্তর গ্রামটি গ্রহণ করুন, ইহা

আপনার। টোডা ভাষায় 'যেল্লোকো' কথার অর্থ একটি প্রস্তর বা একটি প্রস্তর গ্রাম। 'যেল্লোকো' তামিল ভাষায় 'উট্টাকাল্লা'। পূর্বে এই স্থানকে বলা হইত 'উটাকাল মাণ্ডু'। 'উটাকাল মাণ্ডু' হইতে 'উটকামণ্ড' নামের উদ্ভব। বাডাগা উপজাতি অবশ্য এই নাম সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। তাহাদের মতে উটিকে প্রথমে 'হুটাকামাউণ্ড' বলা হইত। 'হুটাকামাউণ্ড' ক্রমে 'উটায়াকামণ্ড', 'উট্টাকামণ্ড' এবং অবশেষে 'উটকামণ্ড'-এ রূপান্তরিত হয়। 'উটকামণ্ডলম্' হইতেও এই নাম উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। 'উটকামণ্ডলম্'-এর অর্থ সর্বদা বৃষ্টি হয় এমন স্থান।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী উটকামণ্ডের জনসংখ্যা ৫০১৪০ (পুরুষ ২৬৩৭২ জন ও ২৩৭৬৮ জন স্ত্রীলোক)। স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৯০১ : ১০০০।

টোডা উপজাতি নীলগিরি অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী। টোডা পুরুষদের চেহারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উহাদের দেহগঠন গ্রীকদের অনুরূপ ও নাসিকা রোমকদের সহিত তুলনীয়। টোডারা দাড়ি কামায় না বা চুল কাটে না। টোডা পুরুষেরা একটি মাত্র অখণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। তাহারা অত্যন্ত কর্মঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু। তাহারা সর্বপ্রাণবাদে (অ্যানিমিজ্‌ম) বিশ্বাসী এবং সূর্যের উপাসক। ইহাদের মধ্যে এক নারীর সহিত কয়েকজন পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। বর্তমানে টোডাদের সংখ্যা মাত্র ৮০০। সরকার তাহাদের সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন।

এই অঞ্চলের প্রধান উপজাতি বাডাগা। ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৪০০০। ইহাদের উপজীবিকা কৃষি। কোটাহ্ এই অঞ্চলের আর একটি উপজাতি। বর্তমানে ইহারা সংখ্যায় প্রায় ১২০০। ইহারা নৃত্য ও সংগীতে পারদর্শী। ইহাদের লোকনৃত্য জাঁকজমকপূর্ণ, বর্ণাঢ্য ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। কুরুম্বা ও ইরুলা উপজাতিদ্বয়ও এই অঞ্চলে বাস করে। কুরুম্বাদের বর্তমান সংখ্যা মাত্র ৪০০।

নীলগিরি অঞ্চলে নয় শতাধিক চা-বাগান আছে। এখানে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চা-এর চাষ আরম্ভ হয়। এই অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ লক্ষ কিলোগ্রাম (১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড) চা উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত একমাত্র উটকামণ্ডেই সিন্‌কোনার চাষ হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সিন্‌কোনার চাষ প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে এখানে ৯৩১ হেক্টরের (২৩০০ একর) অধিক জমিতে সিন্‌কোনা চাষ হয় এবং প্রতি বৎসর ৯ হাজার কিলোগ্রাম (২০ হাজার পাউণ্ড) কুইনিন সালফেট প্রস্তুত হইতেছে। উটকামণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণ কফিও উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এখানকার আলুর চাষও উল্লেখযোগ্য।

ফোটোগ্রাফির কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনের জন্য বৈদেশিক সহযোগিতায় এবং পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে উটকামণ্ডে ভারত সরকারের 'হিন্দুস্তান-ফোটো ফিল্‌ম্‌স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি'র একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

উটকামণ্ড হইতে ২৯ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দূরবর্তী পাইকারা বাঁধ দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম বাঁধগুলির অন্যতম। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্র হইতে উটকামণ্ড, কোয়ম্বাটোর, মাদুরাই, তিরুচ্চিরাপ্পল্লি, তাঞ্জোর ইত্যাদি স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কুণ্ডা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও উল্লেখযোগ্য।

উটকামণ্ড মহকুমার অন্তর্গত গুডালুরু তালুকে পূর্বে স্বর্ণ ও অভ্রের খনি ছিল।

এখানকার পরিবহনব্যবস্থা উন্নত। মেট্টুপালয়ম জংশন হইতে উটকামণ্ড পর্যন্ত মিটার গেজের রেলপথ আছে। মাদ্রাজ হইতে কোয়ম্বাটোর ও মেট্টুপালয়ম হইয়া উটকামণ্ড পর্যন্ত রেলপথের মোট দূরত্ব ৬৭১ কিলোমিটার (৪১৭ মাইল)। কোয়ম্বাটোর হইতে মোটরপথেও উটকামণ্ড যাওয়া যায়। দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার (৫৫ মাইল)। কয়েকটি সুদৃশ্য ও দীর্ঘ মোটরপথ এই পার্বত্য শহরটিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

উটকামণ্ড শহরে ১০৪০৮ জন পুরুষ ও ১৭২২২ জন স্ত্রীলোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত। এখানে একটি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয় আছে। উটকামণ্ড গ্রন্থাগারটি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্বোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত দি বেন্‌লক ডাউন্‌স, সরকারি বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স ইত্যাদি অবশ্যদর্শনীয়। মুদুমালাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, শম্বর, বন্য মহিষ, ভালুক, বার্কিং ডিয়ার, বন্য শূকর ও অন্যান্য জীবজন্তুকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখিবার সুযোগ আছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Madras*, vol. II, Calcutta, 1908 ; *Madras District Gazetteers : The Nilgiris*, vol. I, Madras, 1908 ; Government of Madras, The Director of Information and Publicity, *Madras, In Maps and Pictures*, Madras, 1952 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962 ;

Government of India, Ministry of Transport, Tourist Division, *Hill Stations of India*, New Delhi.

দিনেনকুমার সোম

উডকাট কাঠখোদাই। কাঠের ছাঁচ হইতে ছাপ নির্মাণের শিল্পরীতি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশেই এই রীতি প্রচলিত।

প্রাচীন ভারতের বস্ত্র অলংকরণে কাঠের ছাপের ব্যবহার ছিল। কাঠখোদাই সম্ভবতঃ ইহার পরিবর্তিত রূপ। ইহা শিল্পশাস্ত্রের শলাকালেখ্য (ত্রিবিক্রম ভট্ট রচিত 'নলচম্পূ' দ্রষ্টব্য) পদ্ধতির রূপভেদ। তীক্ষ্ণশীর্ষ শলাকার দ্বারা ক্ষোদিত তালপত্রের পুথি ওড়িশা ও অন্ধ্র প্রদেশে প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম কাঠখোদাইয়ের মুদ্রিত নিদর্শন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র 'বজ্রচ্ছেদিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র ছয় অংশে মুদ্রিত ক্রমান্বয়ে সাজানো ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) প্রস্থ ও ৫ মিটার (১৬ ফুট) দৈর্ঘ্য -বিশিষ্ট দীঘল পট। চীনের তুন-হুয়াং গুহা হইতে ইহা আবিষ্কার করেন (১৯০৭ খ্রী) মার্ক আউরেল স্টাইন। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মে এই কাঠখোদাইটি মুদ্রণ করেন ওয়াং চিয়েন। চীন, তিব্বত এবং বাংলার প্রান্তিক সিকিম নেপাল ও ভুটানে এই পদ্ধতিতে ধর্মপুস্তক মুদ্রণের রীতি বর্তমানেও প্রচলিত আছে। কৃৎ-কৌশল ও মুদ্রণপারিপাট্যে পরবর্তী ইওরোপের প্রাথমিক প্রচেষ্টা জাইলোগ্রাফিতে (কাঠখোদাই-মুদ্রণ) মুদ্রিত খ্রীষ্টীয় পুরাণ-চিত্রগুলি (১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দ) অপেক্ষা তুন-হুয়াং-এ প্রাপ্ত চৈনিক মুদ্রণটি অনেক সার্থক।

কাঠখোদাইয়ের অন্যতম প্রাথমিক রূপ পূর্ণপৃষ্ঠার ছাপ নির্মাণ (ব্লক-বুক) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে উন্নত করিয়া ইওরোপের গোটেনবের্গ প্রভৃতি কয়েকজন অক্ষরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং কাঠের ছাঁচ হইতে ধাতুনির্মিত অক্ষর নির্মাণ করিয়া কাঠখোদাই-মুদ্রণ হইতে সাধারণ মুদ্রণপদ্ধতিকে পৃথক করেন। পরে পর্তুগীজদের অনুসরণে ভারতে এই নব মুদ্রণপদ্ধতি অনুপ্রবেশ করে (১৫৫৬ খ্রী)। বাংলা দেশে প্রথমে চার্লস উইলকিন্‌স-এর (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬ খ্রী) চেষ্টায় হরফ নির্মাণ করিয়া মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয় (হুগলি, ১৭৭৮ খ্রী) ও উইলিয়াম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রী) চেষ্টায় বাংলা দেশে প্রথম বাংলা মুদ্রণ শুরু হয়। তিনি পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁহার জামাতা মনোহরের সহযোগিতায় বাংলা ও বিভিন্ন ভারতীয় অক্ষর নির্মাণ করেন। সুমুদ্রণের প্রয়োজনে পুস্তকচিত্রণের প্রচলন এই যুগান্তকারী মুদ্রণবিপ্লব সম্ভব করিল। এই পুস্তকচিত্রণের প্রাথমিক রূপ কাঠখোদাই।

বাংলায় ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণযুগে কাঠখোদাই-শিল্পেও নবপ্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় প্রাচ্য শিল্পীদের প্রয়াসে বাংলা দেশে এই শিল্পশৈলীতে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে আচার্য নন্দলাল ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের চেষ্টায় ভারতীয় কাঠখোদাই-শিল্প আপন শৈলী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কাঠখোদাই-মুদ্রণে পাশ্চাত্ত্যে যেমন সাধারণতঃ তেল-রঙের ব্যবহার হয়, সেইরূপ প্রাচ্যে— বিশেষতঃ চীন, জাপান এবং অংশতঃ ভারতে— কাঠখোদাই-মুদ্রণে জল ও ভাতের মাড় -মিশ্রিত গুঁড়া রঙের ব্যবহার প্রচলিত আছে। শেষোক্ত পদ্ধতিই শ্রেয়।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

উড্রফ, স্যর জন জর্জ (১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রী) জন্ম ইংল্যাণ্ডে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী স্যর জেম্‌স টি. উড্রফের জ্যেষ্ঠপুত্র।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ ও বি. সি এল. উপাধি লাভ করিয়া জন উড্রফ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উড্রফ ভারতে আগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। অচিরকালের মধ্যেই আইনব্যবসায়ে তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করেন ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি (পিউনি জাজ) নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড্রফ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন; ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্প-কালের জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে টেগোর ল প্রফেসর নির্বাচিত করেন। এই সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পরে 'দি ল রিলেটিং টু রিসীভার্স ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামে প্রকাশিত হয় (১৯০৩ খ্রী)।

ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পদ তন্ত্রশাস্ত্র। বিকৃত ক্রিয়া-কলাপ ও ব্যাখ্যার ফলে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে ও বিদেশে ঘৃণা ও উপেক্ষার ভাব প্রবল হয়। তন্ত্রশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া উড্রফ তন্ত্রশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেন ও ইহার মহিমা প্রচারে ব্রতী হন।

ফলে ইহার প্রতি সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক ও নিবন্ধাদি রচনা এবং অনেকগুলি মূল তন্ত্রগ্রন্থ সম্পাদন ও প্রচার উড্রফের জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থ তিনি মুদ্রণ করান।

প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের নিকট উড্রফ তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তন্ত্রপ্রকাশ-কার্যে কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের উকিল অটলবিহারী ঘোষ ছিলেন তাঁহার সহযোগী। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশকালে উড্রফ 'আর্থার অ্যাভ্যালন' ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে এই পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য: 'মহানির্বাণতন্ত্র' (১৯১৩ খ্রী), 'দি সার্পেন্ট পাওয়ার' (১৯১৪ খ্রী), 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ তন্ত্র' (১ম খণ্ড ১৯১৪, ২য় খণ্ড ১৯১৬ খ্রী), 'শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত' (১৯১৮ খ্রী), 'পাওয়ার অ্যাজ লাইফ' (১৯২২ খ্রী)।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উড্রফ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইন বিষয়ের রীডার নিযুক্ত হন (১৯২৩-৩০ খ্রী)। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

উড্ডীয়ান বৌদ্ধ বজ্রযানের বহু গ্রন্থে এই নামে একটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দেশটি কোথায় ছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে উড্ডীয়ান দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম প্রচার হয় এবং তাহার পর ইহা কামাখ্যা, পূর্ণগিরি প্রভৃতি পীঠস্থানে ও শেষে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভব এই দেশেরই রাজা ইন্দ্রভূতির পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তারনাথ বলেন যে, উড্ডীয়ানে ৫০০০০০ নগর ছিল এবং রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ওয়াডেল মনে করেন, এই দেশটি আফগানিস্তানের সোয়াট উপত্যকায় অবস্থিত। ভারতীয় পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস, জার্মান বিশেষজ্ঞ এইচ. হফ্‌মান প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি বলেন, ইহার অবস্থান কাশগড়ে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে উড্ডীয়ান উড়িষ্যার কোনও অঞ্চল। নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উড্ডীয়ান উড়িষ্যার অঞ্চল হইতে পারে, আবার বাংলা দেশের কোনও অঞ্চল হওয়াও অসম্ভব নহে। ফলতঃ ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও ঐকমত্য নাই। তবে বজ্রযানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

দ্র B. Bhattacharya, *An Introduction to Buddhist Esoterism*, Oxford, 1932; Waddel, *Lamaism*, London, 1934; H. Hoffmann, *Die Religionen Tibets*, Freiburg, 1956.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়িষ্যা ওড়িশা দ্র

উৎকল ওড়িশা দ্র

উৎখনন প্রত্নতত্ত্ব (আর্কিওলজি) দুই ভাগে বিভক্ত: সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব ও ক্ষেত্র প্রত্নতত্ত্ব। ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ-স্থিত প্রত্নবস্তুর আবিষ্করণ ও অধ্যয়নকে ক্ষেত্র প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। উৎখননবিজ্ঞান (এক্‌স্‌কাভেশন) ক্ষেত্র প্রত্নতত্ত্বের অংশ। সুনিয়ন্ত্রিত খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত ইমারত, সমাধি, হাতিয়ার, গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম, গহনা ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে মানবসভ্যতার যথার্থ ইতিবৃত্ত গ্রন্থন করাই উৎখননের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ বা সঞ্চয় করাকে উৎখনন বলা যায় না।

পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র ভূগোল ভূবিদ্যা জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখা হইতে তথ্য আহরণ করিয়া উৎখনন একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। নৃতত্ত্ব ও ভূবিদ্যার সহিতই ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম।

উৎখননের উদ্দেশ্য— মৃত্তিকাগর্ভ যে কোনও প্রকারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তু উদ্ধার করাই উৎখনন নহে। প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব নির্ভর করে উহার স্থিতির উপর। প্রত্নবস্তুর প্রকৃত স্থিতি ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুর অবস্থান ও সম্পর্ক নির্ধারণ করাই উৎখননের মূল উদ্দেশ্য। এই নির্ধারণের দ্বারা খননকারী মানবসভ্যতার ইতিহাস রূপায়িত করেন। ইতিহাসের কোনও সমস্যার সমাধান করাও উৎখননের একটি উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে কোনও উৎখননকে বিজ্ঞান-সম্মত বলা যায় না।

অতীত ও বর্তমান উৎখনন— সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই প্রাচীনতম বিষয়বস্তুর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ইওরোপে ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের

ফলেই প্রত্নবস্তু সংগ্রহের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু সংগ্রহকারীদের কৌতূহল বা আগ্রহ তখন প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রদান করিবার রীতি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ হয়।

খননকার্য দ্বারা সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করাও অতি প্রাচীন পন্থা। কিন্তু অতীত খননকার্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রত্নবস্তু ও ধনদৌলত সংগ্রহ করা। ফলে খননকার্যের জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না। যে কোনও প্রকার খনন করিয়া প্রত্নবস্তু ও ধনদৌলত সংগ্রহ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর তথ্য নির্ধারণ করা ও ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হয় নাই। এই প্রকার খননকার্য প্রকৃতপক্ষে মানব-সভ্যতার নিদর্শনকে ধ্বংসই করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহাদের মধ্যে মাসপেরো, শ্লীমান, ক্রুক্স, লেয়ার্ড, বোটা, এডেল, পেট্রি, পিট্ রিভার্স, ঈভান্স, উলি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্লীমান প্রথমে সাধারণভাবে উৎখননপদ্ধতির আরম্ভ করেন। তাহার পর পেট্রি, পিট্ রিভার্স, ঈভান্স, উলি প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উৎখনন বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠায় রূপায়িত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পেট্রি এবং পিট্ রিভার্স উৎখননের বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীর স্রষ্টা। সম্প্রতি কালে হুইলার উৎখননের জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও ব্যাখ্যাপ্রদানের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কানিংহ্যাম, বোলোর, মার্টিন প্রভৃতি পণ্ডিত প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন খননকার্য দ্বারা আবিষ্কার করেন, উহাদের অধিকাংশেরই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখননকার্য আরম্ভ করেন এবং প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত নূতন পথের সন্ধান প্রদান করেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে উৎখনন করিয়া সিন্ধুসভ্যতার উত্থান ও পতন, আর্যসভ্যতার বিকাশ, দক্ষিণ-ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয়, ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বরূপ ও রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

প্রত্নস্থল ও মৃত্তিকাস্তূপের উৎপত্তি— অতি প্রাচীন কালে মানুষ মৃত্তিকা দ্বারাই বাসগৃহ নির্মাণ করিত। আবর্জনা ফেলিবার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। কাজেই সদর পথেই আবর্জনা নিক্ষেপ করিত। যখন মৃত্তিকা-নির্মিত বাসগৃহ পুনর্বার নির্মাণ করিবার প্রয়োজন হইত, গৃহতল ও রাস্তা সমতল না করিয়া গৃহ নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। এই প্রকারে বহুবার গৃহ নির্মাণের ফলে আবাসস্থলের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হয়। পশ্চিম এশিয়া ভূখণ্ডে এইরূপে প্রতিটি গ্রাম উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ বা ঢিবির উপর নির্মিত হইয়াছে। সিরিয়া ও ইরাকে এক-একটি মৃত্তিকাস্তূপ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৩০ মিটার উচ্চ এবং উহার উপরেই মানুষের বসতি। কিন্তু যে স্থানে কোনও স্থায়ী বসতি ছিল না— যেমন ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন রোমক শিবির— সেই সব স্থান পরিত্যক্ত হইবার পর আর কোনও লোকবসতি না হওয়ায় ধূলি ও মৃত্তিকাকণা বায়ু-বাহিত হইয়া ঐ সকল স্থানকে আবৃত করিয়া ঢিবিতে পরিণত করে। অনেক সময় প্রাচীন শহর ও গ্রাম আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হইত। আক্রমণকারীগণ অগ্নিসংযোগ করিয়াও মানববসতি ধ্বংস করিত। এই প্রকারে নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন স্বস্থানেই থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অধিবাসীগণ গ্রাম ও শহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্মাণ করে। এই সব ক্ষেত্রে অধিবাসীগণ তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে এই সব পরিত্যক্ত স্থানে সভ্যতার বিশেষ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। জলবায়ুর পরিবর্তন, মহামারীর প্রকোপ প্রভৃতির জন্যও গ্রাম ও শহর পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমে ঢিবিতে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রত্নবস্তুর পরিমাণ খুবই কম। ভূমিকম্প ও আগ্নেয় উৎপাতের ফলে নগর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষের ভিতরই লুক্কায়িত থাকে। পম্পেই মহানগরী আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সভ্যতার সকল নিদর্শন ভস্ম দ্বারা অতি উত্তমরূপে আবৃত হইয়া চিরকালের জন্য সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই বিধ্বস্ত অঞ্চল ক্রমশঃ মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া ঢিবিতে পরিণত হয়। প্রাচীন কালে মানুষের আবাসস্থল নদীতীরবর্তী ছিল। অনেক সময় পলিমাটি পড়িয়া নদী বন্ধ হইয়া যায় অথবা উহার স্রোত অন্য দিকে ধাবিত হয়। নদীর প্রবাহ বা গতির পরিবর্তনের জন্য অধিবাসীগণ বাধ্য

হইয়া বাসস্থল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আবাস নির্মাণ করে। পরে পরিত্যক্ত বাসস্থল ঢিবিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নগর ও মহানগরী এই কারণে পরিত্যক্ত হইয়া মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সংখ্যাও অল্প। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলপ্রবাহই প্রাচীন বাসস্থল ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে নিমজ্জিত করিবার জন্য দায়ী। সেই সব স্থানে সভ্যতার নিদর্শনের সংখ্যা প্রচুর। কারণ লোকেরা জিনিসপত্র লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ও গ্রাম জলপ্রবাহের ফলে মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। মহেঞ্জো-দড়ো, হস্তিনাপুর প্রভৃতিও ঐভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক ছিল কিন্তু নদীই আবার ইহার ধ্বংসকারী।

এই ভাবে নানা কারণে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ধরাতলে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার কিছুকাল পরে সেখানে আবার মানববসতি স্থাপিত হয়। বিভিন্ন যুগে ও স্তরে মানববসতির এই প্রকার নিদর্শন অধিকাংশ প্রত্নস্থলে উৎখননদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি মহেঞ্জো-দড়োতেও বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজবাড়ি ডাঙায় উৎখননের ফলে ছয়টি বিভিন্ন স্তরের সৌধনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষ বসতির পরে কোনও কোনও প্রত্নস্থলে আর নূতন বসতি বা আবাসস্থল গড়িয়া উঠে নাই। আবার এমনও দেখা যায় যে কোনও প্রাচীন মহানগরীর মৃত্তিকাস্তূপের উপর পরে একটি সাধারণ গ্রামের বসতি হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্নস্থলের উপর কোনও বসতি পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র জঙ্গল ও বালুকার দ্বারা আবৃত থাকে।

মৃত্তিকাস্তূপ বা ঢিবি সমতলভূমি হইতে উচ্চতর হইবে। প্রাচীন নগর বা গ্রামের প্রত্নস্থলের ঢিবি সাধারণতঃ সমতল— আর মন্দির বা উচ্চ সৌধমালার প্রত্নস্থলের ঢিবি অসমতল ও উচ্চতর হয়।

মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত সভ্যতার নিদর্শন— কি কি বিশেষ কারণে ও কিরূপে অজস্র প্রত্নবস্তু ভূগর্ভে প্রোথিত হয়, তাহার বিষয়ে জ্ঞান থাকা উৎখনকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে খনন করিতে হইবে তাহার ধারণা এবং প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা, নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা এই জ্ঞানের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে।

ভূগর্ভে প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ ও অবস্থান, পদার্থ ও বস্তু -বিশেষের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ পদার্থ দুই প্রকার— অজৈব ও জৈব। অজৈব পদার্থ বহু দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে ; যেমন প্রস্তর, প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, ইষ্টক, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির তৈয়ারি জিনিস, ধাতু (তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য) প্রভৃতি। কিন্তু জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়, এমন কি অদৃশ্যও হইতে পারে ; যথা, জীবজন্তুর অস্থি, গজদন্তনির্মিত বস্তু, চামড়া, কাষ্ঠ, বল্কল, কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি। কিন্তু জৈব পদার্থ-নির্মিত প্রত্নবস্তু অঙ্গারীভূত হইলে দীর্ঘ কালের জন্য সুরক্ষিত থাকে। যে সকল কারণে প্রত্নবস্তু বিনষ্ট হয় তাহার মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৈব পদার্থের ধ্বংসের জন্য জলবায়ু বহুলাংশে দায়ী। অতীব তপ্ত বা অতীব আর্দ্র জলবায়ু জৈব পদার্থকে সহজে বিনষ্ট করে। এ কথা বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু শুষ্ক জলবায়ু দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ বহুদিন সুরক্ষিত থাকে। উৎখননকারীর পক্ষে শুষ্ক জলবায়ু বিশেষ সহায়ক, কারণ তাহাতে জৈব পদার্থ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। মধ্যম ধরনের জলবায়ুতেও জৈব পদার্থ সংরক্ষিত থাকে। সংরক্ষণের নিমিত্ত অতীব শীতল জলবায়ু বিশেষ সহায়ক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট শীতল জলবায়ু বিশেষ আকর্ষণীয়। ভূমি বা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপরেও প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ নির্ভর করে। মৃত্তিকার বিশেষ গুণ বা প্রকরণও জৈব পদার্থকে রক্ষা করে, যেমন তৈলাক্ত মৃত্তিকা, আগ্নেয়গিরির ভস্ম প্রভৃতি। মানুষের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের ফলেও মৃত্তিকাগর্ভে প্রত্নবস্তু সুরক্ষিত থাকে ; যেমন শব সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথা, স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, মৃৎপাত্রে অস্থি সমাধি, আবাসস্থল নির্মাণ ও অগ্নির ব্যবহার দ্বারা জৈব পদার্থ ভস্মীভূত হওয়া ইত্যাদি। মানবসভ্যতার নিদর্শনসমূহ ধরাতলে এইরূপে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিবার জন্যই উৎখনন করিয়া সভ্যতার ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের পথনির্দেশ— সাধারণতঃ প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার আকস্মিক বা দৈব। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে অথবা মানবীয় তৎপরতার ফলেও সুরক্ষিত প্রত্নবস্তু উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রত্নস্থল নির্ধারণ করিতে উৎখনকদের বিশেষ সাহায্য করে। ভূগর্ভ হইতে প্রত্নবস্তু নানা কারণে উদ্ঘাটিত হয়, যেমন নদ-নদী ও সমুদ্রের ভাঙন, বায়ুর গতি পরিবর্তন প্রভৃতি। অনাবৃষ্টির ফলে অনেক সময় নদী ও সরোবর শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রত্নবস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত মানুষের বিশিষ্ট কার্যপ্রণালীর জন্যও অনেক প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত

হইয়াছে। হলকর্ষণ, পয়ঃপ্রণালী খনন, মৃত্তিকা খনন, ধীবরদিগের কার্যপ্রণালী, পুষ্করিণী বা নালা খনন, নগর, গ্রাম বা বসতি নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ, প্রস্তর আহরণ, পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূগর্ভস্থ ধনদৌলত অন্বেষণ-কারীদের (ট্রেজার হাণ্টার) কার্যকলাপের জন্যও অনেক প্রত্নস্থল নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু হইতেও প্রত্নস্থল নির্ধারণ করা সম্ভবপর। মৃত্তিকার বিশেষ চিহ্ন, কৃষিজাত শস্য, পশুদের কার্যকলাপ, মৃত্তিকার বন্ধুরতা প্রভৃতিও প্রত্নাঞ্চল নিরূপণে সাহায্য করে। প্রাচীন সাহিত্য, নকশা, কিংবদন্তী প্রভৃতি হইতেও উৎখনক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নস্থল নির্ধারণ করেন। প্রত্নাঞ্চল ও প্রত্নবস্তু আবিষ্করণে এই সকল পথনির্দেশ উৎখননকারীদের বিশেষ সাহায্য করে।

প্রাক্-উৎখনন কার্যক্রম— উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে অনেক প্রাথমিক কার্যের প্রয়োজন। প্রথমে প্রত্নাঞ্চলে উৎখননের জন্য অংশ বা ক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইবে— তাহার উপরেই প্রত্নস্থল ও উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ নির্ভর করে। নির্ধারিত প্রত্নস্থল সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও উপকথা সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রত্নাঞ্চলের বিবরণ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদুপরি প্রত্নস্থলপৃষ্ঠে যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্নস্থল নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি— প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও উৎখননের নিমিত্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নানা প্রকার পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া উৎখননের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে এবং ইহার সহিত জড়িত অনেক সমস্যারও সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি প্রত্নস্থল ও প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিবার জন্য যে সকল পদ্ধতি ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১. আকাশ হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ (এরিয়াল ফোটোগ্রাফি)— প্রত্নস্থলের অস্তিত্ব নির্ধারণ করিবার জন্য এই পদ্ধতিটির ব্যবহার করিয়া ক্রফোর্ড প্রথম সাফল্য অর্জন করেন। ব্র্যাডফোর্ড আকাশ হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ ও উহা হইতে প্রত্নাঞ্চল নিরূপণ পদ্ধতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন। এরূপ আলোকচিত্র হইতে ভূগর্ভে প্রোথিত সৌধমালার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়া প্রত্নস্থল নির্ধারণ করা সম্ভব। উপরন্তু, ফসলের চিহ্ন বা নিদর্শন পরীক্ষা করিয়াও প্রত্নাঞ্চল নির্ণীত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে সৌধমালা বা ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষের উপর ফসল অকালে পক্ব হয়। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোনও পরিখার উপর ফসলের বৃদ্ধি অধিক ও বর্ণ গাঢ় হয়। এরূপ আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রত্নস্থলের পরিধিও নির্ধারণ করা যায়। উৎখননের নিমিত্ত নকশা ও মানচিত্র আলোকচিত্রের সাহায্যে নিখুঁত-ভাবে অঙ্কিত করা যাইতে পারে। স্টেরিঅস্কোপিক পরীক্ষার সাহায্যেই এরিয়াল ফোটোর বিশেষরূপ বিশ্লেষণ করা হয়। অধুনা এই ধরনের আলোকচিত্রের সাহায্যে বহু প্রত্নাঞ্চল ও প্রত্নস্থলাংশের পরিধি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে উৎখননের নিমিত্ত এরিয়াল ফোটোগ্রাফিকে একটি প্রকৃষ্ট সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

২. বৈদ্যুতিক-প্রতিরোধ-পদ্ধতি— এই পদ্ধতি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব হইতে ভূবিদ্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বে মাত্র ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। সর্বপ্রকারের মৃত্তিকা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাধা প্রদান করে। বৈদ্যুতিক শক্তিকে মৃত্তিকায় চালনা করিয়া বাধা প্রদানের মান নির্ণয় করা যায়। মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বৈদ্যুতিক বাধা প্রবলতম হয়। কিন্তু মৃত্তিকা সিক্ত হইলে বৈদ্যুতিক বাধা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এই বৈদ্যুতিক বাধার মান একটি মিটারে নির্ণয় করা যায়। ইহা হইতে প্রত্নস্থলের কোনও বিশেষ ক্ষেত্রের বা অংশের মৃত্তিকা শুষ্ক অথবা আর্দ্র তাহা নিরূপণ করা সম্ভব। ইহারই সাহায্যে প্রত্নাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে সৌধধ্বংসাবশেষ ও পরিখার স্থিতি নির্ধারণ করা সহজসাধ্য। এই যন্ত্রের সাহায্যে উৎখননকারী প্রত্নস্থলের কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে বা ক্ষেত্রে উৎখননকার্য আরম্ভ করিবে তাহাও স্থির করিতে পারে। জন মার্টিন একটি অতি সাধারণ যন্ত্র তৈয়ারি করিয়াছেন এবং ক্লার্ক এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সফলতার সহিত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিয়াছেন।

৩. পেরিঅস্কোপ আলোকচিত্র— এই যন্ত্রের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। লেরিসি এবং তাঁহার সহায়কবৃন্দ এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এই আলোকচিত্র গ্রহণ অনেক সময়সাপেক্ষ ও জটিল। সেইজন্য লেরিসি আর একটি যন্ত্র ও পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকা-গর্ভস্থ প্রত্নবস্তু অবলোকন করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ প্রত্নস্থলাংশে উৎখনন করিতে হইবে তাহাও সঠিক-ভাবে নির্ধারিত হয়।

উৎখনন

৪. চৌম্বক স্থিতি (ম্যাগনেটিক লোকেশন) — উনবিংশ শতাব্দীতে সুইডেনে ভূগর্ভে গচ্ছিত লৌহময় দ্রব্যাদির অবস্থান চৌম্বক-মান-পদ্ধতির দ্বারা নির্ণয় আরম্ভ হয়। প্রত্নস্থল এবং প্রত্নস্থলাংশ আবিষ্কারের একটি প্রধান সহায়ক প্রোটন ম্যাগনিটোমিটার। ভূ-আকৃতির বিবর্তন এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কুম্ভকারের পোয়ানের অবস্থানও চৌম্বক পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব। এমন কি ভূগর্ভে রাস্তা, ইমারত প্রভৃতির অবস্থানও সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা যাইতে পারে।

৫. যান্ত্রিক গর্তকারক (মেকানিক্যাল ড্রিল)— ইহার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে গর্ত করিয়া প্রত্নাঞ্চলের নিম্নে কোথায় প্রস্তর প্রভৃতি রক্ষিত আছে তাহা নির্ণয় করা যায়। আমেরিকাতে এই পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহার করা হইয়াছে। মেক্সিকোর প্রত্নতাত্ত্বিক কালো রাজ্ এবং পেনসিলভ্যানিয়ার অধ্যাপক ইয়ং এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।

৬. খনিনির্দেশক— এই প্রণালী দ্বারা ভূগর্ভস্থ ধাতুর অবস্থান অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়।

৭. প্রোবিং বা শলাকাযন্ত্র, অগারিং বা বর্মা (তুরপুন) এবং বসিং প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে পরিখা ও প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। বসিং পদ্ধতিতে হাতুড়ি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিলে যে শব্দ ধ্বনিত হয় তাহার সাহায্যে পরিখা বা প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ণয় সম্ভব।

৮. উদ্ভিদবিদ্যার সাহায্যেও প্রত্নস্থল ও প্রত্নস্থলাংশ আবিষ্কার করা হয়।

৯. অধুনা সমুদ্রগর্ভস্থ প্রত্নতত্ত্ব নামে প্রত্নতত্ত্বের একটি নূতন বৈজ্ঞানিক শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক পন্থার সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত প্রাচীন পোতাশ্রয়, নগর, পোত ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ প্রত্নবস্তু, গাছপালা প্রভৃতির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। মৃত্তিকার ফস্ফেট এবং পরাগ বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্নস্থলের নিম্নে উদ্ভিদরাজির অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভব এবং ইহা হইতেই লোকবসতি নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর্হেনিয়াস এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে উৎখনক অতি সহজেই প্রত্নস্থল ও উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিয়া খননকার্য আরম্ভ করিতে পারেন।

জরিপ ও পর্যবেক্ষণ— এই সকল অতি আধুনিক যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের অবস্থান নিরূপণকার্যে অনেকাংশে সাহায্য করে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্নাঞ্চল ও উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নিরূপণ করিতে পর্যবেক্ষণ ও জরিপের বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্নস্থল ও পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ জরিপ করিয়া নকশা তৈয়ার করা আবশ্যক। অঙ্কিত সমোন্নতি-রেখা ও বন্ধুরতার সাহায্যে প্রত্নস্থলের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং উৎখননের নিমিত্ত প্রস্তুত স্থলাংশ নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়। প্রত্নস্থলের উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ (সী লেভেল) হইতে অবধারণ করিতে হয়। নির্ধারিত সাগরপৃষ্ঠ হইতেই উৎখননের সময়ে সকল প্রকার পরিমাপ লওয়া হইয়া থাকে। জরিপ ও নকশার সাহায্যে প্রত্নস্থলাংশ নির্ণয় করিয়া খননকার্য আরম্ভ করিতে হয়।

সাধারণতঃ প্রত্নস্থলের পার্শ্বে সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু যে অংশে হলকর্ষণ দ্বারা কৃষিকার্য করা হয় সেই স্থানে সৌধমালা বিনষ্ট হয় এবং তাহার ক্ষীণ নির্দেশমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ উৎখনক উহা হইতেই সৌধমালার অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন।

উৎখননকৌশল— উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্দিষ্ট হইবার পর কোন্ দিক বা কোন্ গতিপথ হইতে এবং কি উপায় বা পদ্ধতিতে খননকার্য চালাইতে হইবে তাহা প্রথমেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। খনন-চালনা-পদ্ধতি প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। খননকৌশল সম্বন্ধে উৎখনকের সবিশেষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন খুব বেশি। সাধারণ ধারণা এই যে, উৎখননের সফলতা অপ্রত্যাশিত বা দৈবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সফলতা উৎখননকৌশলের উপরই নির্ভরশীল। হুইলার বলিয়াছেন যে, বায়ু এবং তরঙ্গ যেমন সকল সময়ে অভিজ্ঞ ও কুশলী নাবিকের পক্ষেই সহায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ উৎখননকারীর সফলতাও সুপরিকল্পিত উৎখনন-কৌশলের উপরেই নির্ভর করে। এই খননকৌশল-পরিকল্পনার নিমিত্ত জরিপ ও নকশার বিশেষ প্রয়োজন।

উৎখননের দ্বারা প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির দুইটি প্রধান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে : ১. প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বা অনুক্রম, ২. সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ এবং বিস্তার। উৎখননকৌশল এই দুই সমস্যার সহিত জড়িত এবং কৌশল ও পরিকল্পনা উৎখনকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যদি আবাসস্থল হয়, সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিবার জন্য প্রত্নস্থলের উচ্চাংশে একপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া খননকার্য চালাইতে হইবে।

প্রত্নস্থলের আড়াআড়ি ভাবেও অন্য কৌশলে উৎখনন করা প্রয়োজন। পরে দুইটি উৎখনিত অংশকে সংযুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলেই উপরি-উক্ত দুইটি সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। কিন্তু প্রত্নস্থলে কোনও মন্দির বা উচ্চ সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ থাকিলে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

উৎখনন যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম— উৎখননের নিমিত্ত অনেক প্রকারের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন। (চিত্র ১)। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের যন্ত্র
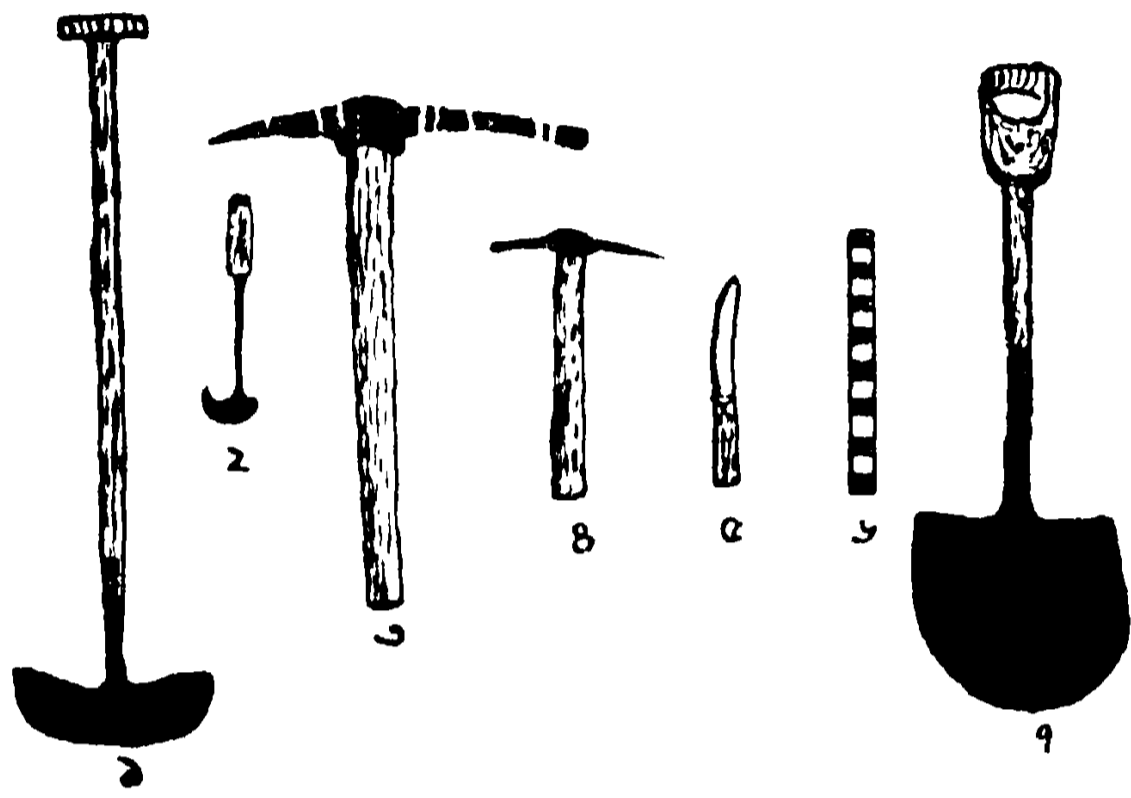
চিত্র ১ : কতিপয় উৎখনন হাতিয়ার
১. টার্ফ-কাটার ২. দেত্তলি ৩. বড় গাঁইতি
৪. ছোট গাঁইতি ৫. ছুরিকা ৬. স্কেল ৭. বেলচা

ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ উৎখনন যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়: ১. অধিনায়কবৃন্দের যন্ত্র, ২. শ্রমিকগণের যন্ত্র। অধিনায়কবৃন্দের যন্ত্র ও সরঞ্জামগুলি বেশির ভাগ জরিপ ও আলোকচিত্র গ্রহণের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এই সকল সাজ-সরঞ্জাম প্রতিটি খাদ তদারককারীর নিকট থাকিবে। একটি ছুরিকাই খাদ তদারককারীর অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। উহার সাহায্যে যাবতীয় সূক্ষ্ম ও সুশ্রী কাজ করিতে হয়। শ্রমিকদের হাতিয়ার খননকার্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং হাতিয়ারের প্রকার ও রূপ স্থান-বিশেষের উপর নির্ভর করে। যে সকল হাতিয়ার সাধারণতঃ খননকার্যে ব্যবহৃত হয় উহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : গাঁইতি (বড় ও ছোট), বেলচা (বড় ও ছোট), কোদাল, মাটি পরিষ্কার করিবার হাতিয়ার, ছুরিকা, কর্নিক, ঝুড়ি, তক্তা, লৌহদণ্ড, হাতুড়ি, দেওলি, কুড়াল প্রভৃতি। এই সকল হাতিয়ারের মধ্যে গাঁইতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। শ্রমিককে গাঁইতির চওড়া অংশ দিয়া খনন করিতে দেওয়া কখনই যুক্তিসংগত নহে। কারণ তাহা হইলে প্রত্নবস্তু অতি সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকল সময়েই গাঁইতির ছুঁচালো অংশ দিয়া খননকার্য চালাইতে হয়। ছোট গাঁইতির ব্যবহার একমাত্র খাদ তদারককারীগণেরই করণীয়। ডুপ মনে করেন যে খননকার্যের জন্য গাঁইতি বা কোদাল অতীব অমার্জিত বা স্থূল হাতিয়ার। তাঁহার মতে প্রত্নবস্তুকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য খননকার্যে ছুরিকাই সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার। বিস্তৃত উৎখননকার্যে সম্প্রতি নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন— জল নিষ্কাশনের জন্য বৈদ্যুতিক পাম্প, উইলফোর্ড ইউনিট, শাবল বা ক্ষেপণী এবং ভার উত্তোলক যন্ত্র। কেহ কেহ শৃঙ্খলিত বালতি বা গ্রাস-হপারও ব্যবহার করেন।

উৎখননকারীদের কার্য ও যোগ্যতা— উৎখননকারী-দলের বিভিন্ন সদস্যদের কার্য সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। উৎখনকদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্রধান পরিচালক, সহকারী পরিচালক, খাদ তদারককারী, শিক্ষিত প্রধান বা সর্দার, ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুর লিপিকারক, মৃৎ-পাত্রসহায়ক, আলোকচিত্র গ্রহণকারী, জরিপকারী, রাসায়নিক, নকশাকারী, অক্ষরবিদ্যাবিশারদ, মুদ্রাশাস্ত্র-বিশারদ, ভূবিদ্যাবিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ প্রভৃতি এবং শ্রমিকবৃন্দ। কিন্তু উৎখননের সফলতা প্রধান পরিচালকের উপরেই নির্ভর করে। প্রধান পরিচালকের কেবল পুথিগতবিদ্যায় পারদর্শিতা থাকিলেই চলিবে না, যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও দূরদৃষ্টি থাকাও প্রয়োজন। তাঁহার দূরদৃষ্টির উপরেই উৎখননের রীতিপদ্ধতি ও খননকার্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রধান পরিচালকের বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। তিনি একজন দক্ষ জরিপকারী, নকশাকারী এবং আলোকচিত্র গ্রহণকারী হইবেন। ইতিহাস, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব এবং রসায়নশাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

খননপদ্ধতি— উৎখনন ধ্বংসাত্মকও হইতে পারে। উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য মানবসভ্যতার ইতিহাসকে রূপায়িত করা। তথ্যবহুল ইতিহাস রূপায়ণের নিমিত্ত নিয়মনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখননকার্য করিতে হইবে। অতীতে 'পরীক্ষণ-খাদ'-পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন করা হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক এবং ইহা বহু ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় নাই। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উৎখননের নিমিত্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ১. অনুভূমিক, ২. উর্ধ্ব-অধঃ। অনুভূমিক উৎখনন দ্বারা প্রত্নস্থলকে বহুলাংশে খনন করিয়া অনাচ্ছাদিত করা হয়। এই অনাচ্ছাদন একটি বা দুইটি স্তরে করা যাইতে পারে। যদি কোনও সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ না পাওয়া যায় তাহা হইলেই প্রাকৃতিক মৃত্তিকার ভিত্তিস্তর পর্যন্ত খনন করা উচিত। উর্ধ্ব-অধঃ উৎখননের ফলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও কালানুক্রম নির্ণয় করা সহজসাধ্য, কিন্তু সংস্কৃতির প্রকৃত কোনও পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত আচরণ প্রভৃতির বিশেষ কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ড্রুপ মনে করেন যে, উর্ধ্ব-অধঃ উৎখনন অপ্রচুর এবং তিনি নসস্ রাজপ্রাসাদে উৎখননের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে উর্ধ্ব-অধঃ উৎখনন করিয়া কোনও সফলতা অর্জন করিতে পারা যায় না। ড্রুপ অনুভূমিক উৎখননকেই বরণীয় মনে করেন। কারণ অনুভূমিক উৎখননেই বিভিন্ন স্তর সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু অনুভূমিক উৎখননও মাঝে মাঝে ভ্রমাত্মক হয় এবং কালানুক্রমে সংস্কৃতিবিকাশের প্রকৃত রূপ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সন-তারিখ-সংবলিত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত অনুভূমিক পদ্ধতি অনুসারেই উৎখনন করা হইয়াছে। মহেঞ্জো-দড়ো, তক্ষশিলা প্রভৃতির উদাহরণ স্মরণীয়। মহেঞ্জো-দড়োর উৎখননের অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার সর্বাত্মক পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এ কথা স্বীকার্য যে অনেক প্রত্নবস্তুর প্রকৃত অবস্থান ও সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিকাশের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃতির উত্থান ও পতন নির্ণয় করাও সম্ভবপর হয় নাই। সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় নির্ধারণ করিতে হইলে এই দুইটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারাই উৎখনন করিতে হইবে। পদ্ধতি দুইটি পরস্পরবিরোধী নহে, বরং একে অন্যের সহায়ক।

কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ও কোন্ পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন করিতে হইবে তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কোনও নগরের আবাসস্থল উৎখননের নিমিত্ত প্রথমে উর্ধ্ব-অধঃ উৎখনন দ্বারা সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিকাশ নির্ণয় করিয়া অনুভূমিক পদ্ধতিতে খননকার্য করিতে হয়। তবে কোন্ পদ্ধতি প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা প্রত্নস্থলের আকৃতি-প্রকৃতি ও উৎখননের সহিত জড়িত সমস্যাগুলির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে।

খাদবিন্যাস— উৎখননের নিমিত্ত খাদবিন্যাস প্রথম প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের নানা অংশে বিশৃঙ্খলভাবে খনন করা অবৈজ্ঞানিক। বিশৃঙ্খল খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ইতিহাসকে বিকৃত করে। এই কারণেই প্রথমে প্রয়োজন খাদবিন্যাস অর্থাৎ যাহাতে খননকার্য নির্ধারিত খাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজনমত প্রারম্ভিক খাদবিন্যাসকে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। খাদবিন্যাস সাধারণতঃ দুই প্রকারের (চিত্র ২ ক ও ২ খ) : ১. অনুভূমিক খাদবিন্যাস, ২. উর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস। অনুভূমিক খাদবিন্যাস কতকগুলি সমকৌণিক খাদসমষ্টি। সমকৌণিক খাদবিন্যাস উৎখননের নিমিত্ত বিশেষ সহায়ক। অভিজ্ঞ উৎখনক মনে করেন যে সমকৌণিক খাদের পরিধি খাদের আনুমানিক গভীরতার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ একটি খাদের পরিধি ৬×৬ মিটার হইবে। প্রত্নস্থলের নির্ধারিত সমকৌণিক অংশকে এইরূপ কয়েকটি সমকৌণিক খাদে বিভক্ত করিতে হয়। প্রতি খাদের অন্তর্বর্তী ৬১ সেন্টিমিটার অংশ ন্যূনপক্ষে বাদ রাখিতে হইবে। ইহাকে 'বক' (baulk) বলা হয়। প্রতি
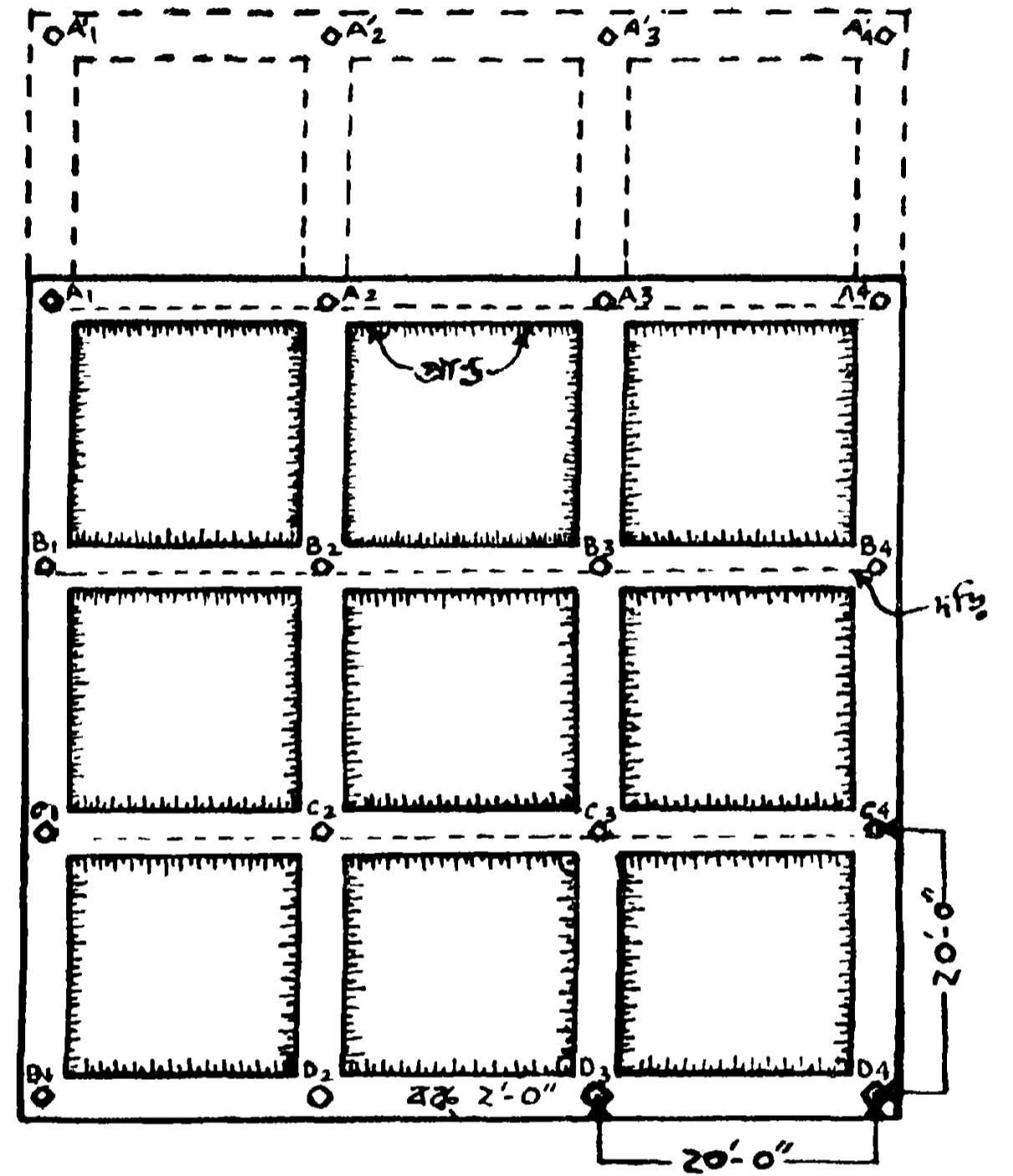
চিত্র ২ ক : আনুভূমিক খাদবিন্যাস

উৎখনন

সমকৌণিক খাদের কোণে কাষ্ঠদণ্ড (৪৪ মিলিমিটার চওড়া ও ৩৮ সেন্টিমিটার লম্বা) প্রোথিত করিতে হইবে। খাদ শনাক্ত করিবার জন্য খাদসংখ্যা এই কাষ্ঠদণ্ডের উপর লিখিয়া রাখিতে হয়। যেমন A^1, A^2, A^3; B^1, B^2, B^3 ইত্যাদি। প্রারম্ভিক খাদবিন্যাসকে বিস্তৃত করিতে হইলে প্রাথমিক খাদসংখ্যার সহিত সমন্বয় রাখিয়া সংখ্যা নির্দেশ করিতে হইবে। তৎপরে একটি দড়ি দিয়া প্রত্যেক খাদের প্রথম ও শেষ দণ্ডে বাঁধিতে হইবে। এই দড়িই ভিত্তিক রেখা। ইহা হইতেই খাদের মাপ ও জরিপকার্য করিতে হয়।

হওয়া দরকার যাহাতে প্রত্নস্থলের বহিরংশ ও অন্তরংশ খাদবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। খাদের প্রস্থ নিম্নে গচ্ছিত প্রাকৃতিক মৃত্তিকার সন্ধানের উপরেও নির্ভরশীল। যাহাতে খননকার্যে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন, সূর্যের আলো পৌছিতে যেন কোনও বাধা না হয়। দীর্ঘ ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদকে দক্ষিণ ও বাম দুইটি অংশে ভাগ করিয়া অন্তর্বর্তী কিছু অংশ বা 'বক' বাদ দিতে হয়। এই দীর্ঘ খাদবিন্যাসে কাষ্ঠদণ্ড ৯১ সেন্টিমিটার অন্তর পুঁতিতে হয় এবং দণ্ডের ক্রমিক সংখ্যা I, II, III, IV ইত্যাদি এবং I', II', III', IV' ইত্যাদি

চিত্র ২খ: ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস
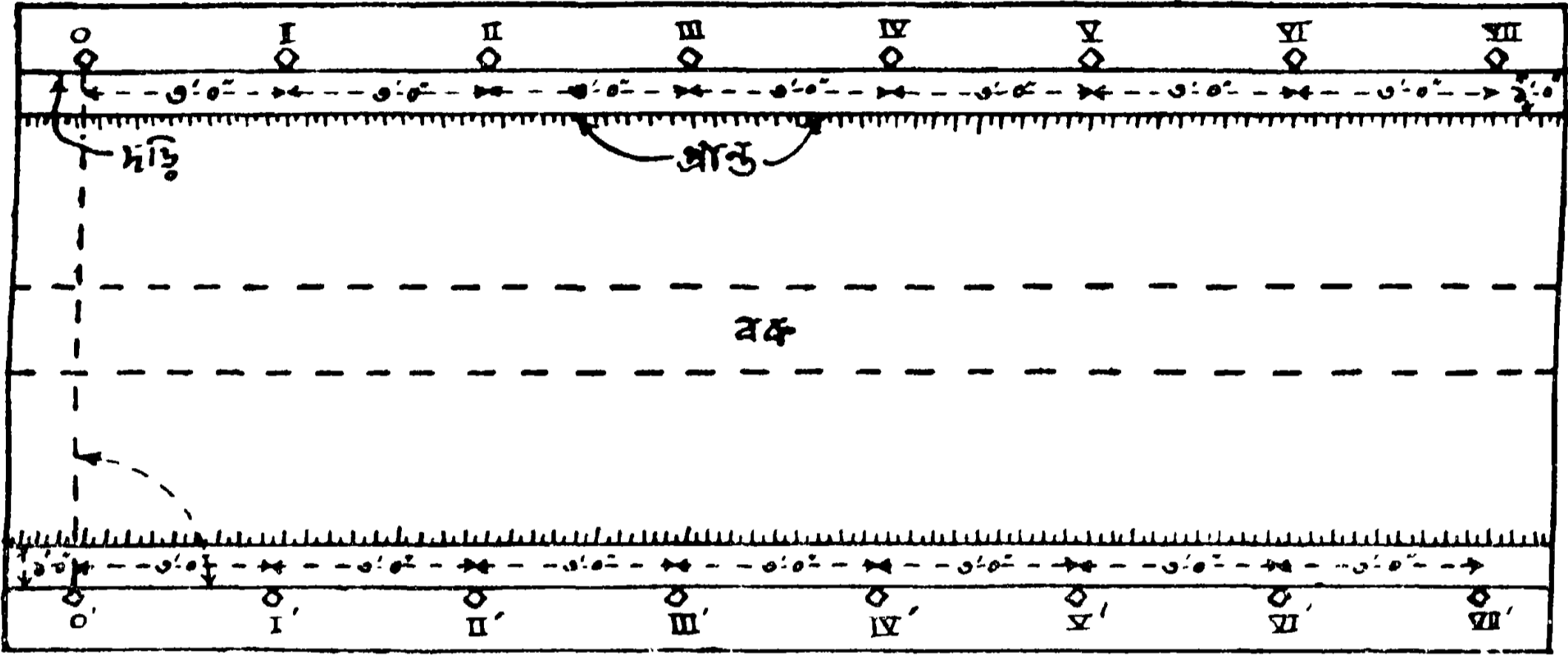
সমকৌণিক খাদবিন্যাসের সাহায্যেই প্রত্নবস্তুর যথার্থ আবিষ্করণ সম্ভবপর; খননপরিচালন ও প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ প্রণালীকে ইহা সুনির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। প্রত্নবস্তুর অবস্থান ও ভিত্তি নিরূপণ খাদের চতুষ্পার্শ্বের সমকৌণিক প্রস্থচ্ছেদের উপর নির্ভর করে। সুনির্দিষ্ট সমকৌণিক খাদের বিভিন্ন স্তর বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলানুসারে নির্ণয় করিয়া চিহ্নিত করা সহজসাধ্য। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রকৃত অবস্থান এবং উহার লিপিকরণ সমকৌণিক খাদ-বিন্যাসে সহজতর। প্রত্নবস্তুর স্তর অর্থাৎ যে স্তরে প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিয়া লিপিকরণও সহজসাধ্য হয়।

ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস অনুভূমিক খাদবিন্যাস হইতে ভিন্নরূপ। প্রত্নস্থলে আড়াআড়ি ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ খাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এমন হইবে। শূন্য (০) দণ্ড হইতে শেষ দণ্ড পর্যন্ত লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধিতে হয়। এই দড়ি ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদের জরিপ ও মাপ লইবার ভিত্তিক রেখা।

কিন্তু 'বারো' এবং মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) সমাধি প্রত্নস্থলে খাদবিন্যাস অন্য প্রকার। সাধারণতঃ দুই প্রকারের খাদবিন্যাস প্রচলিত (চিত্র ৩) : ১. স্ট্রিপ পদ্ধতি, ২. কোয়াড্রান্ট পদ্ধতি। স্ট্রিপ পদ্ধতিতে প্রত্নস্থলকে তিন বা ততোধিক সমান্তরাল রেখা দ্বারা ভাগ করিতে হয়। প্রতি রেখায় স্তরে স্তরে মৃত্তিকা খনন করিতে হইবে। কোয়াড্রান্ট পদ্ধতিতে মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রকে চতুষ্পাদে ৯১ সেন্টিমিটার 'বক' ছাড়িয়া বিভক্ত করিতে হয়। একটি পাদের উৎখনন শেষ করিয়া অন্য পাদে খনন আরম্ভ করিতে হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই খননকার্য বহিরংশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরংশে পৌছিতে হইবে। প্রত্নস্থলের

স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং উৎখননসমস্যার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া খাদবিন্যাস করিতে হইবে।

স্ট্রিপ খাদবিন্যাস কোয়াড্রান্ট খাদবিন্যাস
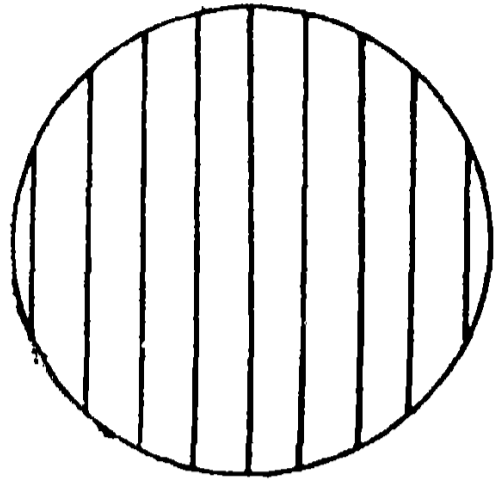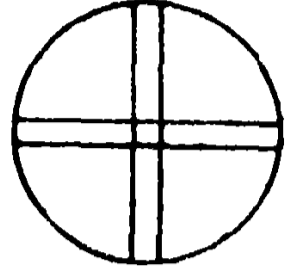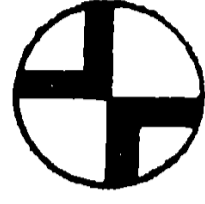
চিত্র ৩

প্রকৃত খননকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে বাস্তু নকশা ও জরিপের কাজ শেষ করিতে হইবে। প্রত্নস্থল কোনও নগর বা গ্রামের আবাসভূমি হইলে সাধারণতঃ নগর-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং প্রত্নাঞ্চলের উচ্চতা ৯-১১ মিটারের বেশি হয় না। নগর বিভিন্ন যুগে নির্মিত হইয়া থাকিলেও উহার নিদর্শন প্রাচীরনির্মাণপদ্ধতিতে ধরা পড়িবে। যদি প্রাচীর বহিরাক্রমণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রাচীরগাত্রে তাহারও প্রমাণ থাকিবে। প্রাচীর বিভিন্ন সময়ে নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হইলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি নগর জলপ্রবাহে বা ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও ঐ ধ্বংসের নিদর্শন পাওয়া যাইবে। এক কথায় বলা যায় যে নগরের উত্থান ও পতনের ইতিহাসের সহিত প্রাচীরনির্মাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উৎখননকারী প্রথমেই প্রাচীর খননের জন্য প্রত্নাঞ্চলের উপর আড়াআড়িভাবে ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস করিবে। তৎপরে এই খাদবিন্যাস প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তার করা আবশ্যক। আবাসস্থলের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীরগাত্রের খাদবিন্যাস এইরূপ অংশে করিতে হইবে যাহাতে প্রাচীরদ্বারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীরগাত্রে বিভিন্ন স্তর সুনির্দিষ্ট করিয়া প্রাচীরদ্বার ও কেন্দ্রাংশের সহিত যোগাযোগের রাস্তা প্রভৃতির বিস্তারিত তথ্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। নগর-প্রত্নস্থল উৎখননের নিমিত্ত প্রথমেই ঊর্ধ্ব-অধঃ খনন সমাপ্ত করিয়া অনুভূমিক উৎখনন করিতে হইবে। প্রথমেই অনুভূমিক উৎখনন করা যুক্তিসংগত নহে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুভূমিক উৎখনন প্রথমেও করা যায়। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলের উর্বরতা নিরূপণ করিবার জন্যই অনুভূমিক উৎখনন করা যাইতে পারে।

প্রত্নস্থলে বিশৃঙ্খলভাবে খনন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্নস্থলাংশকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিতে পারিলেই ইতিহাসের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। বিশৃঙ্খল উৎখনন ইতিহাসকে বিকৃত করে। প্রকৃতপক্ষে বহু প্রত্নাঞ্চল বিশৃঙ্খল উৎখননের ফলে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উৎখননকারীকে সব সময়েই সুনির্দিষ্ট খাদবিন্যাসের মধ্যেই খনন-কার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

উৎখনন ও স্তরবিন্যাস— প্রত্নবস্তু কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, ইহা মানবসমাজের। প্রত্নবস্তুর সন্ধান ও সর্বাত্মক পরিচয় প্রদান করা উৎখননকের গুরু দায়িত্ব। এই সন্ধান ও পরিচয় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে দেওয়া সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত: ১. প্রাকৃতিক, ২. রাসায়নিক। প্রাকৃতিক পন্থায় প্রস্থচ্ছেদ, বর্ণবিচার, স্তরবিন্যাস, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় পন্থায় রাসায়নিক সামগ্রী বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য।

উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রতি খাদে সাধারণতঃ একজন খাদ তদারককারী ও চার জন শ্রমিক থাকিবে। অধিক সংখ্যক শ্রমিকের বিশৃঙ্খল খননকার্যে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার, স্তরবিন্যাস ও প্রস্থচ্ছেদ নিরূপণের ব্যাঘাত ঘটে।

স্তরবিন্যাস— প্রথমে নির্ধারিত খাদে মৃত্তিকা খনন করিয়া একটি কোণে ৭৬ সেন্টিমিটার সমকৌণিক একটি ছোট খাদ খনন করিতে হইবে। এই খাদকে ‘নিয়ন্ত্রণ-খাদ’ বলা হয়, অর্থাৎ এই ছোট খাদটিই খাদের অপরাংশের খননকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ-খাদ ৩০-৬০ সেন্টিমিটারের বেশি গভীর হইবে না। ইহার চতুষ্পার্শ্বের স্তর নির্ধারণ করিয়া ছুরিকার সাহায্যে চিহ্নিত করিতে হয়। খননকার্যের সময়ে সাধারণতঃ ৫১-৭৬ মিলিমিটার, ৩০ সেন্টিমিটার বা ততোধিক গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপ ও প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একই প্রকারের রূপ ও প্রকৃতির গচ্ছিত মৃত্তিকাকে স্তর বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ-খাদের স্তর নির্ণয় ও চিহ্নিত করিয়া খাদে ঐ স্তর অনুসরণ করিয়া খনন করিতে হয়। এক-একটি স্তরের গচ্ছিত মৃত্তিকার খনন সমাপ্ত করিয়া পুনরায় নিয়ন্ত্রণ-খাদ খনন করা আবশ্যক। ইহার পর স্তর নির্ণয় করিয়া খননকার্য চালাইতে হয়। এইরূপে স্তরে স্তরে খনন করিয়া প্রাকৃতিক গচ্ছিত মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখনন করিতে হইবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে

দুই বা ততোধিক স্তরের গচ্ছিত মৃত্তিকা যেন মিশ্রিত না হয়। তাহা হইলে প্রত্নবস্তুর স্তর নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য হইবে। প্রত্যেক স্তরের প্রত্নবস্তুর সঠিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব— স্তরবিন্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ধারিত না হইলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিকৃত হইবে। পূর্বে একটি ইমারত বা ইষ্টক-দেওয়াল আবিষ্কৃত হইলে, উহাকে অনুসরণ করিয়াই খননকার্য চালানো হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সকল প্রকার ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূলে বিনষ্ট হয়। যদি উৎখনিত ইমারতের সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তু দ্বারা কাল নির্ণয় সম্ভব না হয়, ঐ ইমারতের নির্মাণকাল ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই নির্ধারণ করিতে হইবে। স্তরের বৈশিষ্ট্যের উপরেই সৌধের ধারাবাহিক ইতিহাস নির্ভর করে। বাস্তু নির্মাণ ও ধ্বংসের ইতিবৃত্তও স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে উৎখননই স্তর-বিন্যাস নির্ণয় করিয়া প্রত্নবস্তুর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে এবং সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব পরিবেশন করিতে পারে। আবিষ্কৃত ইমারতের কালনির্ণয় ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক বস্তুনিদর্শন তিন প্রকারে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর উপর নির্ভরশীল : ১. প্রাক্-ইমারত গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর ও প্রত্নবস্তু, ২. ইমারতের সমসাময়িক স্তর ও প্রত্নবস্তু,
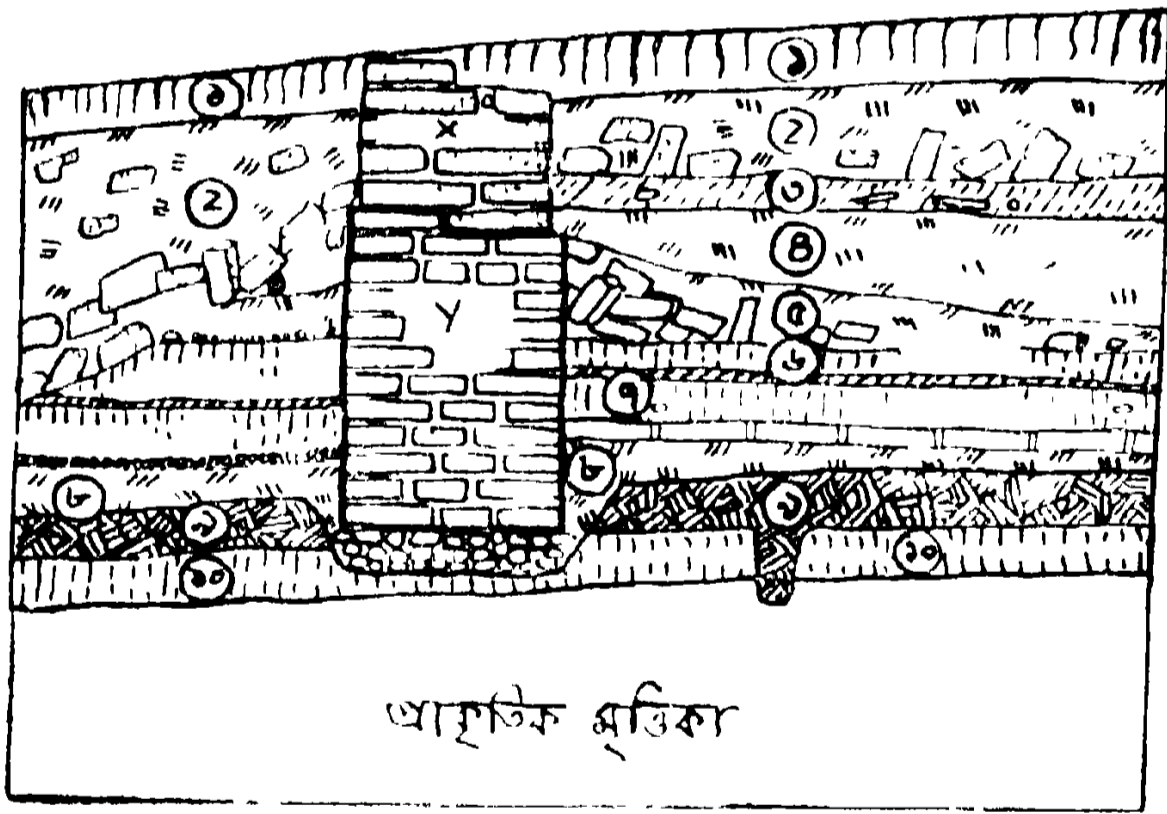
চিত্র ৪ . স্তরবিন্যাস ও দেওয়াল
(হুইলারের চিত্র অনুসারে)

৩. ইমারত-পশ্চাৎ স্তর ও প্রত্নবস্তু। এই সকল নিদর্শন হইতে প্রাক্-ইমারত, সমসাময়িক ইমারত ও পরবর্তী ইমারতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন করা যায়। হুইলার একটি উদাহরণ দ্বারা ইমারতের সহিত সংশ্লিষ্ট স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্র ৪-এ দেওয়ালের দক্ষিণ দিকের স্তর-বিন্যাসে দুইটি স্তরে (৯,১০) গ্রামীণ সংস্কৃতির আবাস ছিল (সংস্কৃতি ‘এ’)। এই স্থানে খুঁটির গহ্বর, খোলামকুচি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। খুঁটির গহ্বর হইতে প্রমাণিত হয় যে কাষ্ঠনির্মিত ছাপ্পর ছিল। এই স্তর দুইটিকে (৯, ১০) কর্তন করিয়া দেওয়ালে y-এর ভিত খনন করা হইয়াছে এবং খাদের পার্শ্বদ্বয় ৮ সংখ্যক স্তর দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহাই ১ সংখ্যক মেঝের ভিত্তি এবং উপরিভাগে গচ্ছিত স্তর (৭) দেওয়ালের সমসাময়িক সংস্কৃতি ‘বি’। এই অধ্যুষিত স্তরের উপরের নিদর্শন মর্দিত বা পিটানো মেঝে ‘২’ এবং ইহার উপরিভাগে আর একটি অধ্যুষিত স্তর ‘৬’। কিন্তু এই স্তরে (সংস্কৃতি ‘বি’) উন্নত ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই অধ্যুষিত স্তরের উপরে ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষ, অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই অধ্যুষিত স্তর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হইয়াছিল। দেওয়াল ধ্বংস হইবার পর আর একটি ভিত করিয়া একটি কাঁচা ইটের দেওয়াল ‘x’ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার সহিত মৃত্তিকা মেঝে ‘৩’ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই স্তরে এক নূতন সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে এবং এই সংস্কৃতিকে ‘সি’ সংস্কৃতি বলা যাইতে পারে। আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ‘বি’-সংস্কৃতি অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইবার পর এক বহিরাগত নিকৃষ্ট সংস্কৃতিগোষ্ঠী এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দেওয়ালের বাম দিকেও
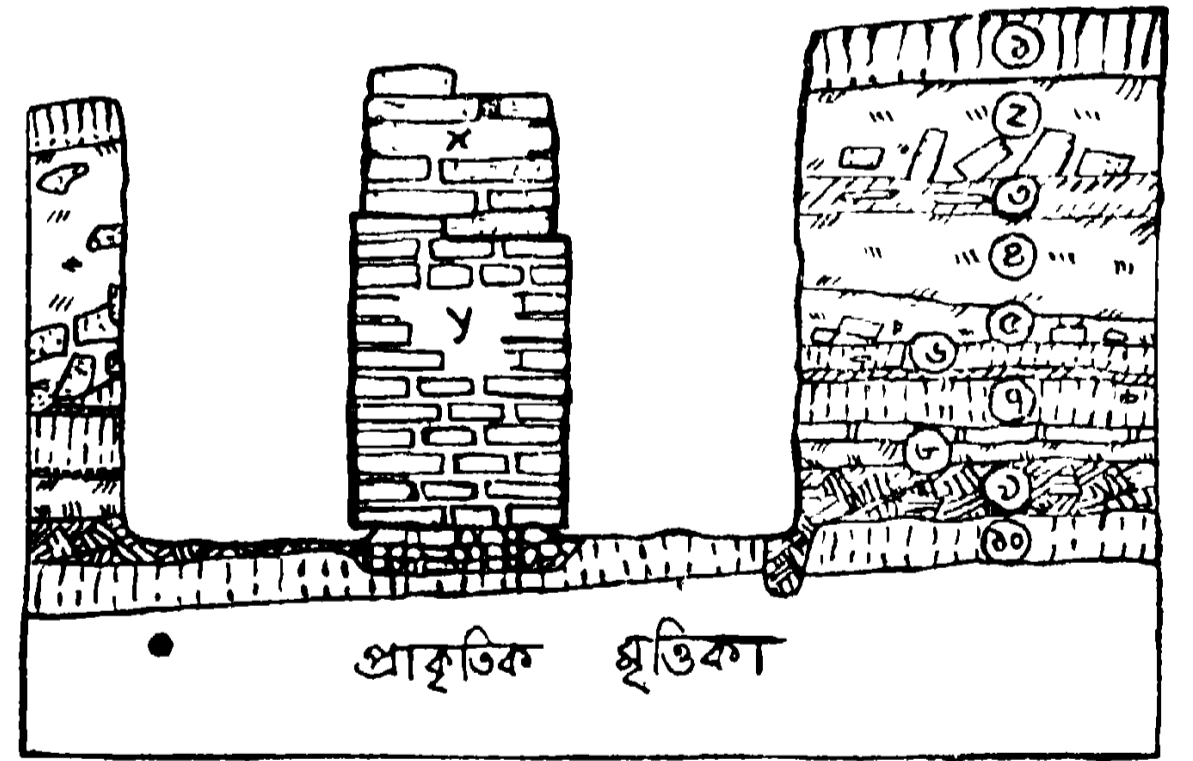
চিত্র ৫ : স্তর ও দেওয়াল
(হুইলারের চিত্র অনুসারে)

প্রাক্-দেওয়ালের দুইটি স্তর (৯, ১০) পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই স্তর দুইটি দেওয়ালের সংস্তরে একটি রাস্তাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। এই রাস্তাটি পর পর দুইবার নির্মিত হইয়াছিল কিন্তু উপরের সংস্তরে নির্মিত রাস্তা নিম্ন সংস্তরের রাস্তা হইতে নিকৃষ্ট। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে পৌরসংস্থার অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল এবং সংস্কৃতি 'সি'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট দেওয়ালের 'x' সংস্তরের রাস্তাকে সুদৃঢ় করিবার পদ্ধতি বর্জিত হইয়াছিল। ক্রমাগত লোক ও যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তা গহ্বরে পরিণত হয়। এই প্রকার পরিবর্তন বর্তমানে ভারতবর্ষের নানা স্থানেও লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ৫-এ দেওয়াল-অনুসরণ-পদ্ধতি দ্বারা উৎখনিত হইয়াছিল। এই চিত্রে স্তরবিন্যাসের সহিত দেওয়ালের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। ফলে সংস্কৃতির প্রকৃত তথ্য বিনষ্ট হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্ত হইতে স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। স্তরে স্তরে উৎখননের জন্য সকল প্রকার নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্নবস্তু ও সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং দেওয়াল-অনুসরণ-পদ্ধতি দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ধ্বংসই করা হয়। উহাদের পুনর্নির্মাণ বা গঠন সম্ভবপর নহে।
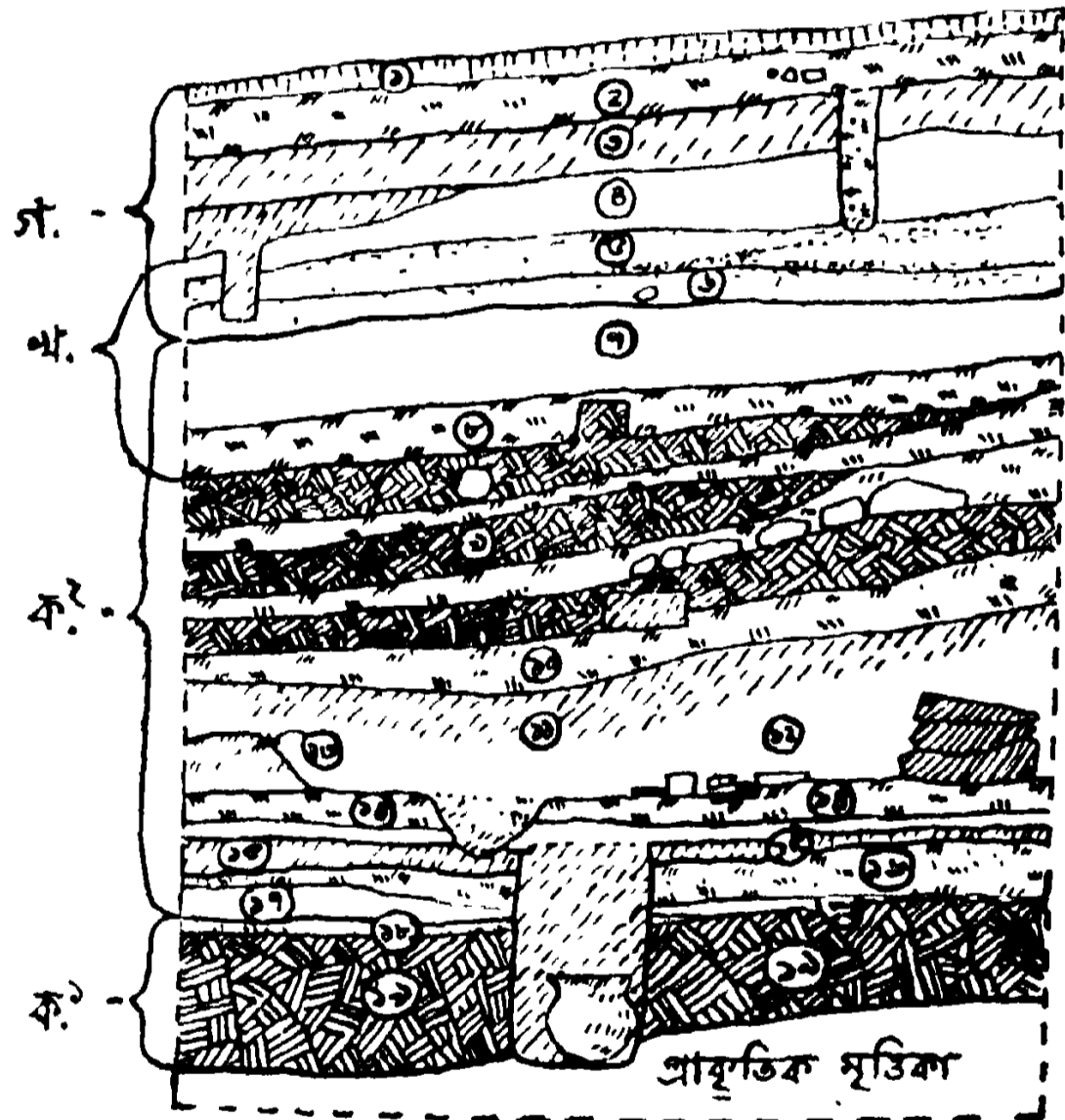
খাদবিন্যাসপূর্বক উৎখনন করিলে দেওয়ালের সংশ্লিষ্ট প্রস্থচ্ছেদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। স্তরবিন্যাস-উৎখননই প্রাচীন সভ্যতার উত্থান ও পতনের প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে পারে।

বিভিন্ন স্তরের উৎখননপদ্ধতিও বিভিন্ন। স্তর ও প্রত্নবস্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর খননকার্যের প্রকারভেদ নির্ভর করে, যেমন সমাধিক্ষেত্রের উৎখননে বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন অবলম্বন করিতে হয়। একপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন স্তরে গচ্ছিত মৃত্তিকা অপসারণ করা উচিত। অতীব যত্নসহকারে সমাধিক্ষেত্রের প্রত্নবস্তুর নিরীক্ষণ ও লিপিকরণ আবশ্যক। প্রস্থচ্ছেদ, নকশা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার পরে বিশেষ সতর্কতার সহিত কঙ্কাল বা কঙ্কালাংশ উদ্ধার করিতে হইবে। শবদাহের ধ্বংসাবশেষও অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করা আবশ্যক। কুম্ভ-সমাধির বিষয়বস্তু পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ উৎখনকের অভিজ্ঞতা
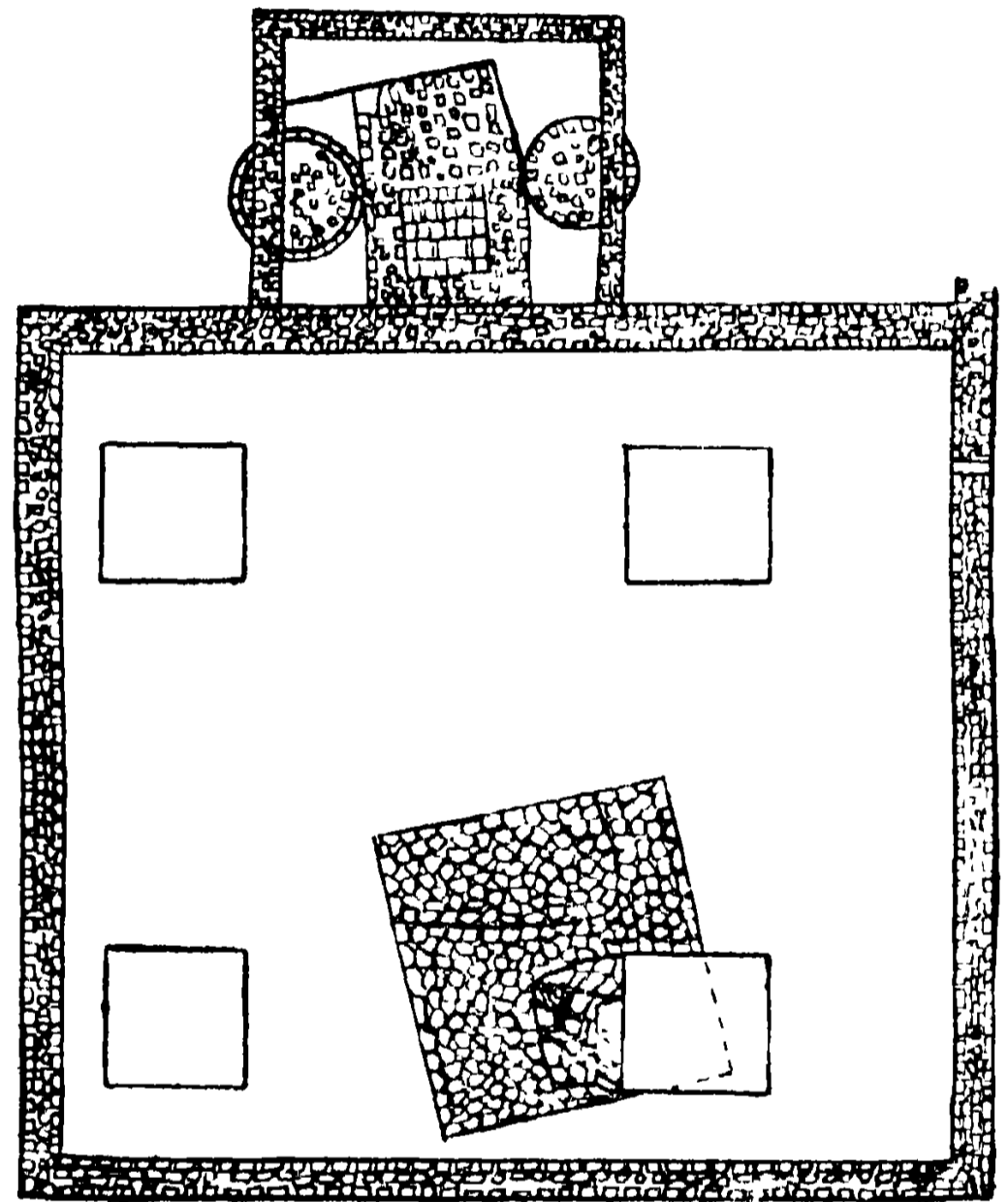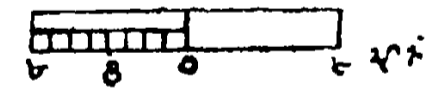
গ. ঘ. ক২ ক১ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা

চিত্র ৬ক: ব্রহ্মগিরি (মহীশূর): সংস্কৃতি পর্যায়
(হুইলারের চিত্র অনুসারে)

ক১ প্রারম্ভিক প্রস্তর পর্যায় — খ. মহাশ্মীয় সংস্কৃতি
ক২ পরবর্তী প্রস্তর পর্যায় — গ. অন্ধ্র সংস্কৃতি (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

চিত্র ৬খ: রাজবাড়ি ডাঙা— বাস্তু নকশা

ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। 'বারো' এবং মহাশ্মীয় সমাধি উৎখননের নিমিত্ত খাদবিন্যাস অনুরূপ (চিত্র ৩)। বহির্ভাগ হইতে খননকার্য আরম্ভ করিয়া অন্তর্ভাগে অগ্রসর হইতে হয়। মহাশ্মীয় সমাধি উৎখননও বিভিন্ন স্তরে করিতে হয় এবং নানা স্তরের প্রত্নবস্তু নির্ণয় করিয়া সর্বাত্মক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। ভঙ্গুর ও ক্ষীণ প্রত্নবস্তু উৎখননে বিশেষ পারদর্শিতার আবশ্যক।
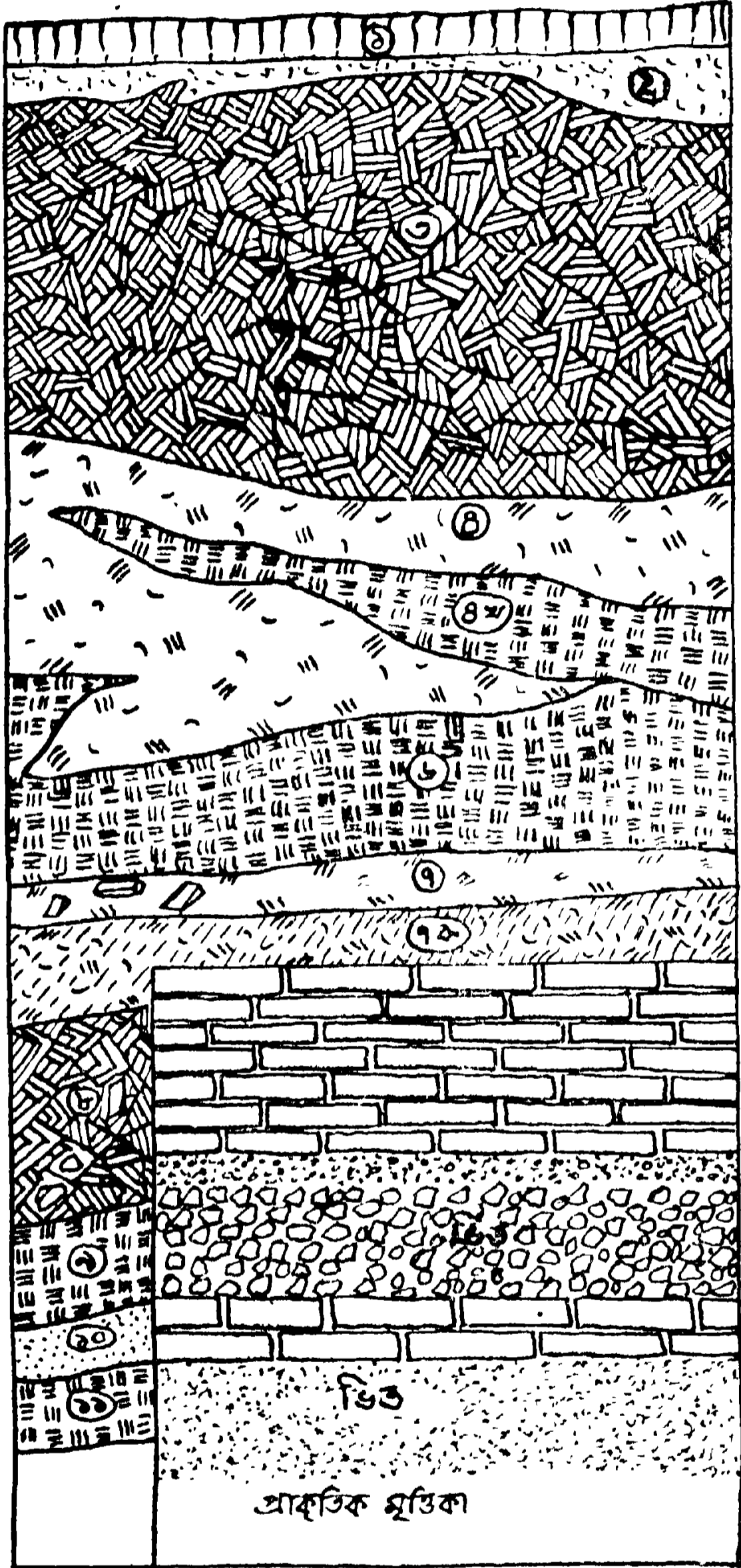
প্রস্থচ্ছেদ ও নকশা— প্রস্থচ্ছেদের সহিত জরিপ-কার্যের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। নকশা ও প্রস্থচ্ছেদ প্রতি স্তরে স্তরে অঙ্কন করিতে হয়। সাগরপৃষ্ঠ-ভিত্তিক রেখা হইতে সমকৌণিক খাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন আবশ্যক। প্রস্থচ্ছেদে প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্নবস্তু ও অন্যান্য বিষয়ের সূক্ষ্ম নির্দেশ অঙ্কিত করিয়া বর্ণনা করিতে হয়। সাধারণ নকশা ও বাস্তু নকশারও বিশেষ প্রয়োজন (চিত্র ৬ খ)। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুর নকশাও অঙ্কন প্রয়োজন। নকশা ও প্রস্থচ্ছেদ দ্বারাই উৎখনিত প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রত্নবস্তু ও সৌধমালার নির্মাণ ও ধ্বংসের তথ্যবহুল প্রমাণ একমাত্র নকশা ও প্রস্থচ্ছেদই সরবরাহ করিতে পারে। নকশা ও প্রস্থচ্ছেদ হইতেই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, উত্থান ও পতন প্রভৃতির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর (চিত্র ৬ ক ও ৭ খ)।

আলোকচিত্র গ্রহণ— উৎখনিত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিয়া সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়। ইত্যবসরে প্রত্নবস্তুর স্থিতি ও সম্পর্কের নজির একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইতিহাস রূপায়ণে প্রত্নবস্তু ও সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের অবস্থান এবং পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত আলোকচিত্র গ্রহণ অধিকতর প্রয়োজনীয়। উৎখননের নিমিত্ত নানা প্রকারের ক্যামেরা প্রয়োজন হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক আলোক-চিত্র গ্রহণের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ আলোকচিত্র-গ্রহণকারী আবশ্যক। তিনি উৎখননদলের অন্যতম সদস্য। আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার পূর্বে যে স্থানের, ইমারতের বা প্রত্ন-বস্তুর চিত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহা সযত্নে পরিষ্কার করা অত্যাবশ্যক। মৃত্তিকা ও ধূলিকণা বুরুশ বা তুলির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। খাদপার্শ্বস্থ প্রস্থচ্ছেদ পরিষ্কার করিয়া বিভিন্ন স্তর নির্ণয়পূর্বক ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা স্তরের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। প্রত্নস্থল, প্রস্থচ্ছেদ বা প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণের সময় স্কেল (ক্রমিক ফুট বা মিটার স্কেল) ব্যবহার করিতে হয়। প্রস্থচ্ছেদের আলোকচিত্র গ্রহণের সময়ে বিশেষ করিয়া ক্রমিক ফুট বা মিটার অঙ্কিত কাষ্ঠদণ্ড ঊর্ধ্ব-অধঃভাবে রাখিতে হয়। স্কেল না থাকিলে প্রত্নবস্তুর প্রকৃত পরিধি ও পরিমাপ পাওয়া যায় না। আলোকচিত্র গ্রহণ অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়, কারণ উৎখননের প্রকৃত বাস্তব পরিচয় একমাত্র আলোকচিত্রই প্রদান করিতে পারে। প্রত্নস্থল খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত সৌধমালা

চিত্র ৭খ : রাজবাড়ি ডাঙা—প্রস্থচ্ছেদ

ও প্রত্নবস্তুর যথার্থ রূপ, প্রকৃতি ও স্থিতি আলোকচিত্র ব্যতীত নির্ণয় করা একেবারেই সম্ভব নহে।

প্রত্নবস্তু লিপিকরণ প্রণালী— উৎখনিত প্রত্নবস্তু লিপিকরণ প্রণালীর উপর ইতিহাসের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস বহুলাংশে নির্ভর করে। সাধারণতঃ তিন প্রকার প্রত্নবস্তু লিপিবদ্ধ করিতে হয়: ১. ইমারত, ২. স্তরবিন্যাস, ৩. অন্যান্য প্রত্নবস্তু। প্রথম দুইটি জরিপকারী বা নকশাকারীর এক্তিয়ারের মধ্যে। অন্যান্য প্রত্নবস্তু লিপিকরণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লিপিকরণ প্রণালীর উপরই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও যথার্থ বিবরণ লিখন নির্ভরশীল। কিন্তু প্রত্নবস্তু লিপিকরণ আবার স্তরবিন্যাস ও স্তরবিন্যাসের নিদর্শন প্রণালীর উপরই নির্ভর করে।

প্রত্নবস্তু লিপিবদ্ধ করিবার কোনও সার্বভৌমিক পদ্ধতি নাই। প্রত্নস্থলের বিভিন্নাংশে প্রত্নবস্তুর সহিত তুলনামূলক পরীক্ষাও প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত সংকলনে বিশেষ সাহায্য করে।

লিপিকরণ প্রণালী আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সংখ্যার উপরেও নির্ভর করে। মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সর্বদা সম্ভবপর নহে। সুতরাং লিপিকরণ প্রণালী খাদবিন্যাসের উপরই নির্ভর করে। প্রত্যেক খাদের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর যথার্থ অবস্থান নির্ধারিত ভিত্তিক-রেখা বা বিন্দু হইতে নির্ণয় করিতে হয়। প্রত্নবস্তু লিপিকরণের জন্য প্রয়োজন: ১. নির্দিষ্ট বিন্দুবিন্যাস, ২. খাদের সংখ্যাবিন্যাস, ৩. স্তরের সংখ্যাবিন্যাস। মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী একেবারেই অন্যরূপ। খাদ তদারককারী প্রতিটি স্তরের খোলামকুচি স্তরানুসারে একটি কাষ্ঠপাত্রে রাখিবে এবং স্তরের বিস্তারিত

চিত্র ৮: মৃৎপাত্র প্রাঙ্গণ

রূপ ও খাদসংখ্যা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণ করিবে। মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ (চিত্র ৮) প্রত্যেক খাদসংখ্যা ও স্তরসংখ্যা অনুসারে ছোট ছোট সমকৌণিক ঘরে বিভক্ত। মৃৎপাত্র-সহায়ক প্রেরিত খোলামকুচি নির্দিষ্ট খাদ ও স্তরের সমকৌণিক ঘরে গচ্ছিত রাখিতে হইবে। মৃৎপাত্র-সহায়ক গচ্ছিত খোলামকুচি পরীক্ষার পর জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যে সকল খোলামকুচিতে অক্ষর, শস্যাংশ বা চিত্রণ থাকিবে, উহাদের তৎক্ষণাৎ রাসায়নিকের নিকট প্রেরণ করা কর্তব্য। অন্যান্য খোলামকুচি ধৌত হইবার পর আবার পরীক্ষা করিয়া কাপড়ের থলিতে পূর্ণাঙ্গ লিখিত বিবরণসহ সংরক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে খোলামকুচি সজ্জিত করিয়া কালি দ্বারা সংখ্যা লিখিয়া রেজিস্টারে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে আবশ্যক বিবরণ লিখিয়া পুনরায় কাপড়ের থলিতে রাখিতে হইবে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন প্রত্নবস্তু অধিক যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করিতে
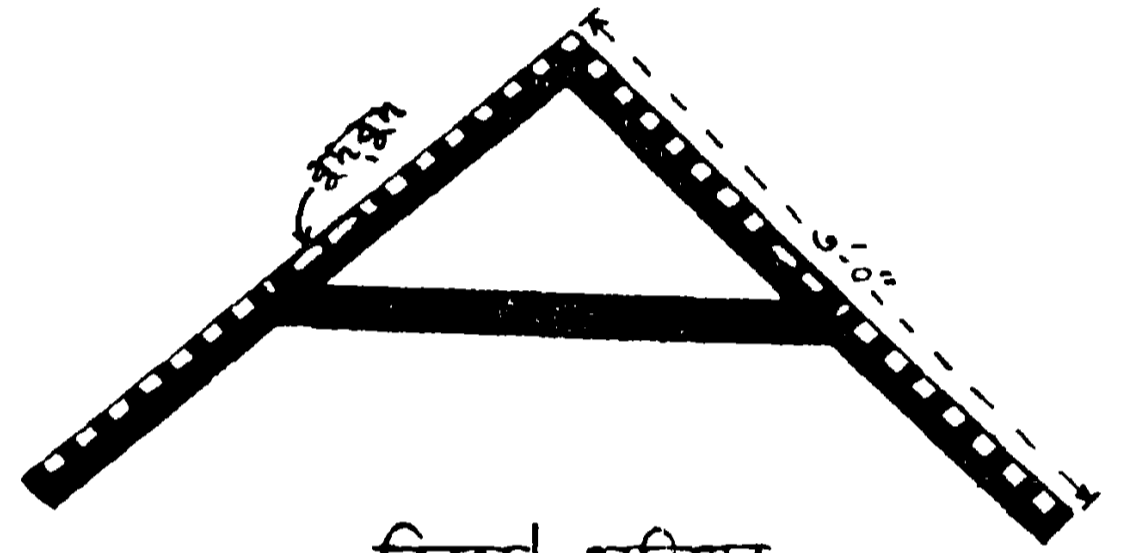
ত্রিকোণ হাতিয়ার

চিত্র ৯

হয়। কারণ ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুর নির্দিষ্ট ভিত্তিক রেখা বা বিন্দু হইতে প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করিতে হয়। ইহার নকশা ও স্তরবিন্যাস যথাযথ অঙ্কিত করিয়া একটি ছোট খামে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। মুদ্রা, সীলমোহর, ধাতুবস্তু প্রভৃতির অবস্থানের সর্বাত্মক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এই সকল প্রত্নবস্তুর অবস্থান লিপিকরণের জন্য ক্রমিক ইঞ্চি, ফুট বা মিটার অঙ্কিত 'বাব্‌ল্‌-লেভেল' যুক্ত কাষ্ঠনির্মিত ত্রিকোণ হাতিয়ারের সাহায্যে খুঁটির সহিত সংলগ্ন ভিত্তিক-রেখা হইতে পরিমাপ লইতে হইবে (চিত্র ৯)। খুঁটি হইতে দ্রাঘিমা, বহিঃস্থ ও অধোগামী পরিমাপ গ্রহণ করিয়া প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ণয় করিতে হয়। এই হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে প্রত্নবস্তুর প্রকৃত স্থিতি নির্ধারণ করা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে।

সাধারণতঃ উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য প্রত্নবস্তু লিপিকরণ অনেক সহজ হইয়াছে। লিপিকরণ প্রণালীর

উৎখনন

উপরই প্রত্নবস্তুর স্থিতি, স্বরূপ, ব্যাখ্যা এবং প্রত্নস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্যায়ের ক্রমবিকাশ, উত্থান ও পতন প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস রূপায়ণ নির্ভর করে। প্রস্থচ্ছেদ ও স্তরবিন্যাস, নকশা অঙ্কন ও আলোকচিত্র গ্রহণ, লিপিকরণ প্রভৃতি হইতেই প্রত্নবস্তুর প্রকৃত রূপ ও অবস্থানের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

প্রত্নবস্তু অপসারণ প্রণালী— উৎখনিত প্রত্নবস্তু অপসারণও একটি গুরুতর সমস্যা। প্রত্নবস্তু স্বস্থানে সুরক্ষিত হইবে বা সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইবে— ইহাও একটি কঠিন সমস্যা। প্রত্নবস্তু স্বস্থানে না থাকিলে উহার প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। যদি কোনও আবিষ্কৃত মন্দিরগাত্র হইতে মূর্তি বা ভাস্কর্যের নিদর্শন অপসারিত হয় তাহা হইলে মন্দিরের তথা ধর্মের প্রকৃত ইতিহাস রচনার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। যে সকল প্রত্নবস্তু অপসারণ করা সম্ভব নহে, উহাদের স্বস্থানে সংরক্ষণ করাই কর্তব্য। আর যে সকল প্রত্নবস্তু স্বস্থানে রক্ষিত করা সম্ভব নহে উহারাই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইবে।

উৎখননের শেষ পর্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাতায়াতের সমস্যার প্রসঙ্গও বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। কোনও কোনও প্রত্নবস্তু এত ক্ষণভঙ্গুর যে উহারা অপসারণের সময়ে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রত্নবস্তুর যথার্থ সংরক্ষণ প্রয়োজন। ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তু, অস্থি, কাষ্ঠ প্রভৃতির অপসারণের পূর্বেই রাসায়নিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। প্রত্নবস্তুর যথাযথ বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করিয়া পেটিতে ভরিয়া রাখিতে হইবে। ইহার পর যথাসময়ে নিকটবর্তী পোতাশ্রয়ে বা রেল স্টেশনে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

উৎখনিত প্রত্নবস্তুর পরবর্তী রক্ষণস্থল বীক্ষণাগার। সে স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা উৎখননের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

উৎখনিত প্রত্নস্থলের উদ্ধার ও সংরক্ষণ— উদ্ধার ও সংরক্ষণ উৎখনন বিজ্ঞানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উৎখননকার্য সমাপ্ত হইবার পর উৎখনিত সৌধমালার উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা আর একটি প্রধান সমস্যা। উৎখননকার্য সমাপ্তির পর উৎখনিত খাদ অপসারিত মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় আচ্ছাদন করিয়া প্রত্নস্থলকে প্রাক্-উৎখনন অবস্থায় স্থাপন করিতে হয়। আবিষ্কৃত ইষ্টক বা প্রস্তর -নির্মিত সৌধ প্রভৃতিও অপসারিত মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় আবৃত করা যুক্তিসংগত নতুবা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যথা সৌধমালা বা ইমারত জলবায়ুর সংঘাতে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ঊর্ধ্ব-অধঃ উৎখননে নিম্ন সংস্তরে আবিষ্কৃত ইমারতের সংরক্ষণ সব সময় সম্ভব হয় না। অনুভূমিক উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সৌধের সংরক্ষণ সহজসাধ্য। সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ। সেইজন্য সাধারণতঃ উৎখননের পর মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় আবৃত করাই যুক্তিসংগত। তবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইমারত বা সৌধ আবিষ্কৃত হইলে ব্যয়সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষে অতীতে উৎখনিত অধিকাংশ প্রত্নস্থল সংরক্ষিত করা হইয়াছে। আবিষ্কৃত সৌধ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

ব্যাখ্যা ও ইতিহাস লিখন— উৎখনন করিয়া ধরাতলে রক্ষিত প্রত্নবস্তুর ব্যাঘাত জন্মানো হয়। প্রত্নবস্তুর ব্যাঘাত জন্মাইবার অধিকার কোনও উৎখনকের থাকিতে পারে না। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ইতিহাস লিখিতে পারিলেই উৎখননের সার্থকতা হয়। প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করিয়া সংগ্রহশালায় গচ্ছিত রাখাই উৎখনকের কর্তব্য নহে। তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইল ইতিহাস লিখন।

যে নীতি অনুসারে প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা বা তথ্য নিরূপণ করিতে হয় তাহা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও সমন্বয়। কোনও প্রত্নবস্তুর যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভবপর না হইলে আনুমানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করা যাইতে পারে। প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা বিভিন্ন পর্যায়ে করিতে হয়, যেমন সন-তারিখ নির্ধারণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বা পর্বের সঠিক কাল নির্ণয়; অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও অনুক্রম স্থিরীকরণ। সর্বশেষে উৎখনিত নিদর্শনের অন্তর্নিহিত অর্থ নিরূপণ করিয়া মানবজীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হয়। আবিষ্কৃত জড় পদার্থকে প্রাণবন্ত করিয়া উহার সাহায্যেই ইতিবৃত্ত লিখন উৎখনকের প্রধান কর্তব্য।

সন-তারিখ নির্ণয় পদ্ধতি— বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের ইতিবৃত্ত নিরূপণ করাই উৎখনকের প্রথম কর্তব্য। উৎখনন দ্বারা সকল যুগেরই সঠিক সন-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংস্তর বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পর্বের ক্রমিক সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে— যেমন নবাশ্মীয় (নিওলিথিক) ক, খ, গ ইত্যাদি পর্ব। এই প্রকারের বর্ণনাকে সাংস্কৃতিক স্তর বা পর্ব বলা হয়। কোনও ক্রমিক সন-তারিখ আরোপ করা একেবারেই সম্ভব নহে।

সন-তারিখ নির্ণয়ের পদ্ধতি স্তরবিন্যাস ও সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তুর উপর নির্ভর করে। একটি বিশিষ্ট

স্তরের সন-তারিখ ঐ স্তরে প্রাপ্ত সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তু হইতে নির্ণীত হয়। আবার প্রত্নবস্তুর সন-তারিখ স্তরের সন-তারিখ হইতে নির্ণয় করা যায়। সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তু দ্বারা স্তরের সন-তারিখ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ করিতে হইবে। স্তরের মৃত্তিকা কোন্ সময়ে ও কিভাবে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাও স্থির করা আবশ্যক। যে স্তরে প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে সেই স্তর প্রত্নবস্তুর সমসাময়িক এবং প্রত্নবস্তুর উপর গচ্ছিত মৃত্তিকা পরবর্তী সময়ের। তবে প্রত্নবস্তুর অবস্থান স্বাভাবিক কিনা তাহাও নির্ণয় করা প্রয়োজন। অনেক সময় এক বা একাধিক প্রত্নবস্তু অন্য কারণে ঐ স্তরে অবস্থান করিতে পারে। পরবর্তী কালে কোনও গহ্বর খননের সময়েও প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত স্থানে যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রস্থচ্ছেদ ও স্তরবিন্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপণ করিতে হইবে। একটি স্তর অন্য একটি স্তর দ্বারা আবৃত থাকিলে বলা যাইতে পারে যে স্তর '৩' স্তর '৪'-কে আবৃত করিয়াছে। আবৃত স্তরের সন-তারিখ জ্ঞাত থাকিলে নিম্ন স্তরের প্রত্নবস্তু ঐ সময়ের পূর্ববর্তী হইবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গহ্বর, ইমারত প্রভৃতির কালনির্ণয় করা যায়— যেমন ইমারতের ভিত পরিখার নিম্ন স্তরের প্রত্নবস্তু ইমারত নির্মাণের পূর্বে এবং ইমারতের ভিত বা মেঝেতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু ইমারতের সমসাময়িক। ইমারত-আবৃত স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু ইমারত ধ্বংসের পরবর্তী কালের হইবে।

প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয়— বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয়ে ভূবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র বিশেষ সাহায্য করে। সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তুর মধ্যে মুদ্রা ও লেখমালা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য উপাদান। তবে মুদ্রার সাক্ষ্য অতি সহজে গ্রহণ-যোগ্য নহে। কোনও স্তরে প্রাপ্ত একটি মাত্র মুদ্রার কাল অনুসারে ঐ স্তরের কালনির্ণয় করা যুক্তিসংগত নহে। কারণ পরবর্তী বা পূর্ববর্তী কালের মুদ্রাও ঐ স্তরে অবস্থান করিতে পারে। সুতরাং কোনও স্তরে একাধিক মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে ঐ স্তরের কালনির্ণয় করা উচিত নহে। আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য অতি দ্রুত নির্ধারণ করাও উচিত নহে। কোনও একটি আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে যদি অনুমান করা হয় যে প্রত্নস্থলের ঐ সংস্তর মুদ্রায় লিখিত রাজার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা হইলেও ভুল করা হইবে। মুদ্রা চলমান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোক মারফত স্থানান্তরিত হইতে পারে। লিপিযুক্ত সীলমোহর সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। অতএব কাল নির্ণয়ের জন্য একাধিক সীলমোহর বা মুদ্রার আবিষ্কার প্রয়োজন। অন্যান্য আবিষ্কৃত লেখমালার বিষয়েও একই কথা বলা চলে। তবে লেখমালার স্থিতি ও সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তু বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া কালনির্ণয় করিতে হয়। অলিখিত প্রত্নবস্তুর ঊর্ধ্ব বা নিম্ন স্তরে আবিষ্কৃত লিখিত প্রত্নবস্তুর সাহায্যে কালনির্ণয় করা সহজ-সাধ্য। এতদ্ভিন্ন একই প্রকারে, অন্য প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সহিত তুলনাত্মক পরীক্ষা দ্বারাও কাল-নির্ণয় সম্ভবপর।

আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর তুলনাত্মক পরীক্ষণ প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিবৃত্তের ভিত্তি। একই প্রকারের বা শ্রেণীর প্রত্নবস্তু স্তরানুসারে সজ্জিত করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় কোন্‌টি অতি সাধারণ ও কোন্‌টি উন্নত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতি সাধারণ নৈপুণ্যের প্রত্নবস্তু হইতে উৎকৃষ্ট প্রত্নবস্তুর বিবর্তন হইয়াছে। এই বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের কালনির্ণয় করাও সম্ভব। সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট প্রত্নবস্তু, নিকৃষ্ট প্রত্নবস্তুর অভিব্যক্তির শেষ নিদর্শন। অন্তর্বর্তী ধাপগুলির বৈশিষ্ট্যও নিরূপণ করা সম্ভব। যদি এই বিভিন্ন ধাপ বা স্তরের কোনও একটির কাল-নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে অপরাপর পর্যায় বা স্তরের কালনির্ণয়ও অনেক সহজসাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে প্রত্নবস্তুর উপাদান ও প্রাপ্ত সংখ্যার কথাও বিচার করা প্রয়োজন। পিট্‌ রিভার্স বলিয়াছেন যে, প্রত্ন-তত্ত্বের ইতিবৃত্ত নির্ধারণে দুষ্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু অপেক্ষা বহুল-প্রাপ্য প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অনেক বেশি। দুষ্প্রাপ্য বস্তু তুলনা-মূলক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। অতি সহজেই নমনীয় উপাদানের প্রত্নবস্তুর আকার ও প্রকার -ভেদ হয়, যেমন মৃৎপাত্র। ভঙ্গুর বস্তুর পরিবর্তন ও বিবর্তন অতীব দ্রুত কিন্তু স্থায়ী বস্তুর পরিবর্তন হইতে অনেক সময় লাগে। তবে ধর্মানুষ্ঠান-সংক্রান্ত বস্তু বহু দিন অপরিবর্তিত থাকে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র পুনঃ পুনঃ পরি-বর্তিত ও বিবর্তিত হয়। অতি সাধারণ বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি বেশিদিন স্থায়ী হয়। কিন্তু জটিল আকৃতি-প্রকৃতি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সুতরাং কাল-নিরূপণের জন্য ভঙ্গুর মৃৎপাত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি; ইহার পর ধাতুবস্তু, অস্থি ও প্রস্তরবস্তু। কালনির্ণয়ে প্রস্তরবস্তুর গুরুত্ব খুব বেশি নহে। মৃৎপাত্রই এমন বস্তু, যাহার সাহায্যে বিভিন্ন স্তরের কালনির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি খোলামকুচির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াও কালনির্ণয় করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে কালনিরূপণ সুদৃঢ়ভাবে নির্ধারিত করা

যায়; যেমন, উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্র, চিত্রিত-ধূসর মৃৎপাত্র প্রভৃতি। সুনির্দিষ্টভাবে কালনিরূপিত এই সকল মৃৎপাত্র হইতে প্রত্নস্থলের বিভিন্ন স্তরের কালনির্ণয় করা সম্ভবপর।

ইতিবৃত্তে কালনিরূপিত প্রত্নবস্তুর সংখ্যার মূল্য অনেক বেশি। এমন কি খোলামকুচির গুরুত্বও সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে। কালনির্ণয়ে কোনও এক বিশেষ প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বা মূল্য নাই। সাধারণতঃ কোনও এক স্তরে অন্ততঃ তিনটি প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, কোনও প্রত্নবস্তু যে স্তরে পাওয়া গিয়াছে, উহা যে ঐ স্তরের সমসাময়িক তাহাও অতি সহজে বলা যায় না, কারণ বৃক্ষের শিকড়, মূষিক ও কীট-পতঙ্গের গর্ত ইত্যাদির জন্যও অনেক সময় প্রত্নবস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটে। আবার মৃত্তিকার ফাটলের জন্যও প্রত্নবস্তু স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং স্তরবিন্যাস নির্ণয় করিয়াই সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক। প্রত্নাঞ্চলে প্রত্নবস্তু দুষ্প্রাপ্য হইলে বিস্তৃত উৎখনন করিয়া যাহাতে অধিক পরিমাণে প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করা যায়, তাহার প্রয়াস করা প্রয়োজন। প্রত্নবস্তুর প্রাচুর্যের উপরেই কালনির্ণয় ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস নির্ভর করে।

কালনির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি— সাধারণতঃ ইতিবৃত্তের কালনিরূপণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. সাপেক্ষ, ২ নিরপেক্ষ। সাপেক্ষ কালনির্ধারণ করিবার জন্য প্রত্নবস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতির তুলনামূলক পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ, স্তরবিন্যাস, সাগরপৃষ্ঠ পরিবর্তন, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ, ভৌগোলিক বিস্তার প্রভৃতির প্রয়োজন। অতীতে কেবলমাত্র স্তরবিন্যাসের উপরেই নির্ভর করিয়া সন-তারিখ আরোপ করা হইত। কিন্তু এই প্রকারের কালনির্ণয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। অধুনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নানা প্রকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে সাপেক্ষ কালনির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন, ১. ফ্লুরিন পরীক্ষা: ইহার সাহায্যে হাড়ের ফ্লুরিন বস্তু নির্ধারণ করিয়া কালনির্ণয় করা সম্ভব। প্রত্নস্তরের কালনির্ণয়ে ওকূলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সফলতা অর্জন করিয়াছেন (১৯৫১ খ্রী)। ২. উদ্ভিদ ও পরাগ বিশ্লেষণ: ইহার সাহায্যে আবিষ্কৃত উদ্ভিদের পরাগের উত্থান ও পতন নিরূপণ করিয়া কালনির্ণয় করা হয়। লেনার্ট এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উদ্ভিদের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

নিরপেক্ষ কালনির্ণয় পূর্বে আলোচিত সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তুর উপরই নির্ভর করে। অধুনা অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার ফলে সন-তারিখ-বিহীন প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয় সঠিকভাবে করা যায়। যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রত্নতত্ত্বে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: ১. জ্যোতির্বিদ্যা— এই বিজ্ঞানের সাহায্যে সূর্যরশ্মির উত্থান ও পতন নিরূপণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের আনুমানিক কালনির্ণয় করা যায়। ২. ভূবিদ্যা— এই বিজ্ঞানের সাহায্যে 'তলানি'র মান নির্ণয় করিয়া সঞ্চিত মৃত্তিকা বা স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরের কালনিরূপণ করা সম্ভবপর। ৩. ভার্ভ (varve) বিশ্লেষণ— তলানির ভার্ভ নিরূপণ করিয়াও কালনির্ণয় করিতে পারা যায়। ৪. ডেনড্রো-ক্রনোলজি বা ক্রমিক-বৃক্ষপাদতত্ত্ব— বৃক্ষপাদবেষ্টনীর বাৎসরিক পরিবর্তন ও রূপান্তর নিরূপণ করিয়া কালনির্ণয় করা সম্ভবপর। জয়নার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বের কালনির্ধারণ করিয়াছেন। ৫. রেডিও কার্বন পদ্ধতি— এই উপায় দ্বারা জৈব বস্তুতে রেডিও-তরঙ্গ বিকিরণের পরিমাণ স্থির করিয়া বর্তমান কাল হইতে বস্তুর বয়স নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই পরীক্ষার নিমিত্ত সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান অঙ্গার বা কয়লা এবং দগ্ধ অস্থি। অধ্যাপক লিবি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন (১৯৫৫ খ্রী)। ইহাকে C^{14} সন-তারিখ-নির্ণয়-পদ্ধতিও বলা হয়। বর্তমানে C^{14} নির্ণয়-পদ্ধতি বহুলাংশে প্রয়োগ করিয়া কালনির্ণয় করা হয়। ভারতবর্ষে টাটা ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে C^{14} নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

স্তরবিন্যাস, সন-তারিখ-সংবলিত প্রত্নবস্তু ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয় করিয়া প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ ও পর্বের কালনির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রত্নবস্তুর ব্যবহার নির্ণয়— স্তরবিন্যাস ও প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণের পরে প্রত্নবস্তু কোন্ বিশেষ কার্যে বা ব্যবহারে লাগিত তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। প্রত্নবস্তুর ব্যবহার নির্ণয় উৎখনকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে। ইহা নিরূপণ করিতে উৎখনক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখা হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন, যেমন— ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি। মৃৎপাত্রসম্বন্ধীয় বস্তুর ব্যবহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহার উপাদান, নির্মাণপ্রণালী ও উপযোগিতা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত বস্তুর সহিতও

সাক্ষাৎ পরিচয় আবশ্যক। এমন কি, আবিষ্কৃত ইমারত বা সৌধমালার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও তথ্য পরিবেশন করিতে হইলে উহাদের উপাদান ও নির্মাণপ্রণালীর সহিত সম্যক পরিচয় থাকাও প্রয়োজন। আদিম অধিবাসীদের কুটিরশিল্প ও বর্তমান ইমারত-নির্মাণ-প্রণালীর সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আবিষ্কৃত নগর পত্তনের রীতি ও ব্যাখ্যার নিমিত্ত অন্য আদিম নগর পত্তনের প্রণালী ও রীতি অধ্যয়ন করিয়া তুলনাত্মক পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্ত উৎখনকের নৃতত্ত্ব বা মানববিজ্ঞানের উপর বিশেষ দখল থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উৎখননকারী নৃতত্ত্ববিদ্‌ও বটে। নৃতত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত প্রত্নবস্তুর প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। প্রাগৈতিহাসিক ও বর্তমানের আদিম অধিবাসী -সম্পর্কিত অনুরূপ তথ্যের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিসংগত নহে। কারণ আদিম অধিবাসী-দিগের সংস্কৃতি অনেক সময় পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী। নানা প্রকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপরেই প্রত্নবস্তুর প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সাধারণতঃ উৎখনক যদি কোনও প্রত্নবস্তুর প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে ধর্মানুষ্ঠান-সংক্রান্ত বস্তু বলিয়া বিশ্লেষণ করেন। অ্যাট্‌কিন্‌সন বলিয়াছেন যে প্রত্নবস্তুর এই প্রকার ধর্মীয় ব্যাখ্যা উৎখনকের জ্ঞানের অভাব নির্দেশ করে। প্রত্নবস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত বর্তমানে ব্যবহৃত বস্তু এবং আদিম অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত বস্তুর সহিত সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন মানবসংস্কৃতির, তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিবর্তনের সহিতও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। অর্থ ও ব্যাখ্যা নিরূপিত হইলেই মানবসংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস লিখন সহজসাধ্য হইবে।

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নির্ণয়— কেবলমাত্র প্রত্নবস্তুর কাল-নির্ণয় ও ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সংস্কৃতির রূপের পরিচয় দিলেই উৎখনকের কর্তব্য শেষ হয় না। উৎখনিত সংস্কৃতির নিদর্শন কোন্ সাংস্কৃতিক বা নরগোষ্ঠীর অবদান তাহাও নির্ধারণ করা কর্তব্য। এই নরগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দেশজ না বৈদেশিক, তাহাও স্থির করিতে হইবে। বৈদেশিক গোষ্ঠী হইলে ইহাদের আদিম বাসস্থান এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই কার্যে উৎখননকারীকে নৃতত্ত্ব বা মানববিজ্ঞান বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। আবিষ্কৃত নরমুণ্ড ও নর-কঙ্কালাংশ পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ নরগোষ্ঠী নির্ণয় করিতে পারেন। নরগোষ্ঠীর সহিত প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া সংস্কৃতির প্রবর্তক বা স্রষ্টা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

উৎখনন-বিবরণী-প্রকাশন— উৎখনিত প্রত্নবস্তু ও সৌধমালার ব্যাখ্যা প্রদান করিলেই উৎখনকের কার্যের সমাপ্তি হয় না। প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখন ও প্রকাশন তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। উৎখনন-বিবরণী-প্রকাশন প্রত্নতত্ত্বের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রত্নাঞ্চলের কোনও বিশেষ অংশকে খননান্তে ত্যাগ করা অন্যায়। খননকার্যের বিবরণ প্রকাশ না করাও অপরাধ। খননকারী বিবরণ প্রকাশ না করিলে ভবিষ্যতে ঐ স্থান পুনরায় উৎখনিত হইতে পারে। সুতরাং উৎখনন-বিবরণী যত শীঘ্র প্রকাশ করা যায় তাহার সুব্যবস্থা করাও উৎখনকের কর্তব্য। বাৎসরিক উৎখনন-বিবরণী লিখন সমাপ্ত না করিয়া পুনরায় উৎখননকার্য আরম্ভ করা উচিত নহে। এমন কি, প্রয়োজন মত বাৎসরিক উৎখননকার্য স্থগিত রাখিয়াও বিবরণী সমাপ্ত করা অত্যাবশ্যক।

পিট্‌ রিভার্স উৎখনন-বিবরণী-লিখন ও প্রকাশন সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থাসূত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আজও সাধারণ-ভাবে অনুসৃত হয়। তিনি মনে করেন যে, প্রত্নবস্তুর সন-তারিখ লিপিকরণের সময় হইতে আরোপিত হয়— আবিষ্কারের সময় হইতে নহে। উৎখনন-বিবরণী-লিখন ও প্রকাশনের সর্বপ্রধান অঙ্গ উদাহরণমূলক চিত্র। উদাহরণ-মূলক চিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : প্রত্নবস্তুর চিত্র ও তালিকা, রেখাঙ্কন, চিত্রিত লিপি, মানচিত্র, নকশা, আলোকচিত্র, প্রস্থচ্ছেদ ও স্তরবিন্যাসচিত্র, খাদচিত্র প্রভৃতি। বিবরণী লিখনে উৎখনকের কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন, উৎখনন-পদ্ধতি, প্রত্নবস্তুর আকার ও রূপ, সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিকাশ প্রভৃতি অর্থাৎ প্রত্নবস্তুর একটি সামগ্রিক পরিচিতি দান উৎখনকের কর্তব্য। এমন কি, অতি সাধারণ নিদর্শনও যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। উৎখননের বিবরণী সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ, অল্পসংখ্যক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ উৎখনন-কৌশল ও প্রণালীর গুরুত্ব জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং বিবরণী এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণও পাঠ করিয়া বুঝিতে পারে। বিবরণী লিখিবার কৌশল বা প্রণালী সম্বন্ধে হুইলার মনে করেন যে, বিবরণীতে প্রধানতঃ সারসংক্ষেপ, সংযোগাত্মক পর্যালোচনা, উপাদানের বিস্তৃত বিবরণ, উদ্ধৃত বিবরণের সাধারণ আলোচনা, পরিশিষ্ট, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি থাকিবে।

মুদ্রণ, 'ব্লক' তৈয়ারি প্রভৃতি বিষয়ে উৎখনকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন-বিবরণী সর্বাঙ্গীণ ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা অনেক। বিবরণের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের উপর বিবরণী-প্রকাশনের সফলতা নির্ভর করে। উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, উৎখনন-বিবরণীর রূপ, প্রকৃতি, আকার ও বিষয়বস্তু এমন হওয়া দরকার, যাহাতে ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য ও রূপ উদ্ঘাটিত হয়।

উৎখননের অবদান— উৎখনন মানবসভ্যতার ক্রম-বিকাশের তথা ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রদান করিয়া অতীতের সহিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্যক সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। ঘটনার সমসাময়িক লিখিত সূত্র সরবরাহ উৎখনন করে— যেমন, প্রস্তরলেখমালা, সীলমোহর, তাম্রফলক ও বিভিন্ন বস্তুর উপর লেখ প্রভৃতি। লেখমালা ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি। লেখমালার উপরে ভিত্তি করিয়াই প্রাচীন ভারতের ক্রমিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত মুদ্রাও ইতিবৃত্ত সংকলনের প্রকৃষ্ট উপাদান।

সাহিত্য-গবেষণাতেও উৎখননের অবদান কম নহে। ইথাকায় আবিষ্কৃত লেখমালা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাহিত্যের ইতিহাস রূপায়ণেও উৎখননের অবদান ন্যূন নহে। উৎখনন হইতেই মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের উৎখনিত লেখমালা কূট রাজনৈতিক এবং আইনশাস্ত্রের রূপায়ণেও বিশেষ সাহায্য করে। অতীতের আবিষ্কৃত বিষয়বস্তু চিকিৎসাশাস্ত্রেরও যথেষ্ট সহায়ক। কারণ, আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্গণ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। করোটি-ছেদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালে ইন্‌কাগণের নিকট সুপরিচিত ছিল। প্রাচীন প্যালেস্টাইনেও এই প্রথার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম ভারতের লোথাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে অনেক কঙ্কাল ও নরমুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরমুণ্ডের বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, করোটি-ছেদন-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন মিশরে উৎখনিত নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বিভিন্ন জটিল রোগের সূক্ষ্ম বিচার করিবার প্রণালীও তৎকালে জানা ছিল।

কারুশিল্প ও ললিতকলার ইতিহাস রচনায় উৎখননের অবদান সর্বাধিক। বিভিন্ন দেশের ও যুগের আবিষ্কৃত স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রে মানবসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পকলার, বিশেষ করিয়া নবাশ্মীয় যুগ হইতে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রশিল্পের বিস্তারিত ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারা উৎখননই পরিবেশন করিতে পারে। বর্তমানে মৃৎপাত্রশিল্পের বিশ্লেষণ প্রত্নতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা

উৎখননের দ্বারা মানবধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস ও বিবর্তনের রূপ পাওয়া যায়। প্রাচীন মন্দির, দেব-দেবীর মূর্তি, প্রার্থনার মন্ত্র, সমাধিপদ্ধতি, আনুষ্ঠানিক সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি উৎখনিত না হইলে ধর্ম ও দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হইত না।

সম্প্রতি উৎখনন নূতন নূতন প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল আবিষ্কার করিয়া মানবসভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে নূতন তথ্য পরিবেশন করিতেছে। বহু দিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, মিশর দেশই মানবসভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র, কিন্তু উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, মিশরসভ্যতার পূর্বেও মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। উৎখননই মিশরকে প্রাচীন মানবসংস্কৃতির সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া মেসোপটেমিয়াকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে— অতি আধুনিক উৎখননের ফলে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষের দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানবসংস্কৃতির বিকাশ, বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক ও আদান-প্রদান, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্য উৎখনন সরবরাহ করে। এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন যুগেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র ছিল। এই প্রসঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎখনন হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয়গণ মেসোপটেমিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

প্রায় প্রতি মাসেই উৎখননের দ্বারা নূতন নূতন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও মানব-সভ্যতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক জটিল সমস্যা আছে উৎখননের দ্বারা যাহার সমাধান হইতে পারে।

দ্র W. M. F. Petrie, *Methods and Aims in Archaeology*, London, 1904; P. Droop, *Archaeological Excavation*, Cambridge, 1915; G. Clark, *Archaeology and Society*, London, 1941; L. Wooley, *Digging up the Past*,

London, 1949 ; G. E. Daniel, *A Hundred Years of Archaeology*, London, 1950 ; F. E. Zeuner, *Dating the Past*, London, 1950; R.E. Mortimer-Wheeler, *Archaeology from the Earth*, London, 1952 ; K. M. Kenyon, *Beginning in Archaeology* London, 1952 ; J. C. Atkinson, *Field Archaeology*, London, 1953 ; O. G. S. Crawford, *Archaeology in the Field*, London, 1953.

সুধীররঞ্জন দাশ

উৎখনন, ভারতে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের প্রত্নকীর্তির প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সাহিত্যিক স্যামুয়েল জন্সন তদানীন্তন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি চিঠিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে, হেস্টিংস যেন প্রাচ্যের ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রত্নকীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর হেস্টিংসের নেতৃত্বে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই প্রতিষ্ঠানের আদিপর্বে সব কাজই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না। সে সময়ে প্রাচীন সাহিত্য ও উপকথার ছায়ায় প্রত্নতত্ত্ব আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজও হইয়াছিল। যেমন উইলকিন্স বহু গুপ্ত ও কুটিল লিপির পাঠোদ্ধার করেন। কোলব্রুক প্রত্নলিপিপাঠে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। আফগানিস্তানে উইলসনের অনুসন্ধান স্মরণযোগ্য। জোনাথন ডান্‌কান সারনাথে যে কাজ আরম্ভ করেন তাহা পরে শতাধিক বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছে। ফেল সাঁচিস্তূপের আবিষ্কার করেন। পশ্চিম ভারতে ম্যালেট, সল্ট, গোল্‌ডিংহ্যাম প্রভৃতি গবেষক এলোরা, কান্‌হেরী, এলিফ্যান্টা ইত্যাদির বিবরণ প্রকাশ করেন। অজন্টার প্রথম উল্লেখ করেন আর্সকিন। দক্ষিণ ভারতের প্রত্নকীর্তি সম্বন্ধে কলিন ম্যাকেন্‌জি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ফ্রান্সিস বুকানন-হ্যামিল্টনের অনুসন্ধান। তিনি বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া ঐ অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্বের এই অবস্থা ছিল। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রত্নতত্ত্বের কর্ণধার ছিলেন কলিকাতা টাঁকশালের প্রধান নিরীক্ষক জেম্স প্রিন্‌সেপ। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি রূপে তিনি দেশের সকল প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ সুসংবদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করেন। গবেষণায় তাঁহার নিজস্ব অবদানও প্রচুর। ভারতীয় গ্রীক মুদ্রার সাহায্যে তিনি খরোষ্ঠীলিপির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হন। সাঁচিস্তূপবেদিকায় উৎকীর্ণ লেখগুলি হইতে অসীম অধ্যবসায় ও প্রতিভা -সহকারে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠ উদ্ধার করেন। এই নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি অশোকের লেখগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি লেখে অশোকের সমসাময়িক কয়েকজন গ্রীক রাজার নাম রহিয়াছে। ইহাতে অশোকের কালনির্ণয় সহজ হইল। এইরূপে প্রিন্‌সেপ প্রত্নলিপি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সময়ে এলিয়ট দক্ষিণভারতীয় লেখ সম্বন্ধে এবং এডওয়ার্ড টমাস মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। পশ্চিমভারতীয় লেখ সম্বন্ধে কাজ করেন স্টীভ্‌ন্‌সন ও তাঁহার পর ভাউ দাজী। বলিতে গেলে ভাউ দাজীই প্রথম ভারতীয় লেখতত্ত্ববিদ্‌। দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) সমাধি লইয়া গবেষণা করেন মেডোজ টেলর। ভারতীয় স্থাপত্য অধ্যয়নের সূত্রপাত করেন জেম্‌স্ ফার্গুসন।

এই যুগে পুরাতত্ত্বক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যামের আবির্ভাব হয় এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের একজন ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগবশতঃ প্রিন্‌সেপের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি ১৮৩৪-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সারনাথের ধমেকস্তূপে ও নিকটবর্তী স্থলে উৎখনন করেন। পরে এই কাজ চালান কিটেন। ভারতে সুসংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা কানিংহ্যামই প্রথম উপলব্ধি করেন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা কার্যে পরিণত হয়। ঐ বৎসর তাঁহার অনুরোধের ফলে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) নামক প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত করেন এবং কানিংহ্যামকেই প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর কানিংহ্যাম নূতন পদে যোগদান করেন। ইহাই হইল ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের উদ্ভব।

পরবর্তী চার বৎসর (১৮৬১-৬৫) কানিংহ্যাম বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের বহু স্থলে ভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্যাশ্রিত সমস্যার সমাধান। ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্বের উপরই তাঁহার ঝোঁক ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভারতে প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দে লা মস্যুরিয়ে উত্তর প্রদেশে তমসা নদীর ধারে নবাশ্মযুগের (নিওলিথিক) প্রথম নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কর্মচারী ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটে প্রথম প্রত্নাশ্মের (প্যালিও-লিথিক) নিদর্শন পান। ইহার পর ফুট ও ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মচারীরা ভারতের নানা প্রদেশে— সুদূর দক্ষিণে, দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে ও মধ্যাঞ্চলে— অশ্মযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। কিন্তু কানিংহ্যাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাগৈতিহাসিক গবেষণাকে প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

কোনও অজ্ঞাত কারণে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার প্রত্ন-তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং কানিংহ্যাম সর্বাধ্যক্ষ রূপে পুনরায় তাহার কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার দুই জন সহকারী নিযুক্ত হইলেন— বেগলর ও কার্লাইল। পরে তৃতীয় সহকারী রূপে যোগ দেন গ্যারিক। পরবর্তী পনর বৎসর ধরিয়া কানিংহ্যাম ও তাঁহার সহকারীবৃন্দ উপর্যুপরি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। ইহার ফলে বহু প্রত্নকীর্তি বিবৃত হইল, বহু প্রত্নস্থল নজরে আসিল এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উৎখনিত হইল।

ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন নাম যথার্থভাবে অনুমান করিবার ব্যাপারে কানিংহ্যাম অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক প্রাচীন নগরীর অবস্থিতি নিরূপিত হইল— যথা শ্রাবস্তী, সাংকাশ্য, অহিচ্ছত্রা, কৌশাম্বী, বৈশালী। তিনি ও তাঁহার সহকর্মীগণ যে সমুদায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ দিয়াছেন, সংখ্যা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের হিসাবে তাহা এখনও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল কারণে এবং স্বীয় প্রত্নলেখ ও মুদ্রা -বিষয়ক গবেষণার জন্য কানিংহ্যামের নাম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

তখনকার যুগে সংগ্রহালয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ উৎকৃষ্ট প্রত্নসামগ্রী মূল্যবান সন্দেহ নাই, কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ও পারম্পর্য, প্রাচীন মানবের জীবনযাত্রাপদ্ধতি— এই সকল তথ্যের সহিত সম্যক পরিচয়ের জন্য উহা পর্যাপ্ত নয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কানিংহ্যাম উদাসীন ছিলেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়েই রেলের ঠিকাদার কর্তৃক অধুনাপ্রসিদ্ধ হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত-ভাবে বিধ্বস্ত হয়। কানিংহাম নিজেও সেখানে কিছু উৎখনন করিয়া হরপ্পাসভ্যতার বহু নিদর্শন পান। কিন্তু সেখানকার সীলমোহরের উপর অজ্ঞাত লিপি দেখিয়া উহাকে অভারতীয় মনে করিয়া ঐ বিরাট সভ্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই।

এই যুগে প্রত্নলেখ সম্পর্কিত গবেষণা দ্রুত অগ্রসর হয়। কানিংহ্যামের অনুসন্ধানের ফলে বহু লেখ আবিষ্কৃত হয়; তিনি নিজেই অনেকগুলির পাঠোদ্ধার করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অশোকলেখমালা প্রকাশ করেন। এগার বৎসর পরে নবনিযুক্ত সরকারি লেখতত্ত্ববিদ্ ফ্লীট কর্তৃক গুপ্তলেখসমূহ প্রকাশিত হয়। বেসরকারি পণ্ডিতদের মধ্যে পশ্চিম ভারতে ভগবানলাল ইন্দ্রজী ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের এবং পূর্ব ভারতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজ উল্লেখযোগ্য। ব্লকম্যান ও অন্য কয়েকজন পণ্ডিত আরবী ও ফারসী লেখ অধ্যয়নে পারদর্শিতা লাভ করেন।

কানিংহ্যাম ও তাঁহার সহকর্মীরা উত্তর ভারতে যে কাজ করিতেছিলেন, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাহার অনুরূপ কাজ করিতেছিলেন বার্জেস। বার্জেসের প্রধান অধ্যয়নবিষয় ছিল স্থাপত্য, এজন্য তিনি স্থাপত্যের উপর জোর দিয়া বহু প্রত্নকীর্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহ্যাম অবসর গ্রহণ করিলে পরবৎসর তিনি সর্বাধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন এবং তিন বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়েও স্থাপত্যমূলক প্রত্নতত্ত্বেই অধিক মনোযোগ দেন, তবে প্রত্নলেখেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়্যারি' নামে যে পত্রিকা প্রবর্তন করেন, তাহাতে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও প্রত্নলেখ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র প্রত্নলেখ প্রকাশনার্থ তিনি 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক সরকারি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকা এখনও নিয়মিত বাহির হইয়া থাকে।

বার্জেসের পর কয়েক বৎসর প্রত্নতত্ত্বের কোনও সরকারি কর্ণধার ছিলেন না, সেজন্য কাজের অগ্রগতি বেশ ব্যাহত হইয়া পড়ে। তবে কয়েকটি প্রদেশে প্রত্নকীর্তির তালিকা প্রস্তুত হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতে বড়লাট হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্নতত্ত্বের সুদিন আরম্ভ হয়। সর্বাধ্যক্ষের পদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যুবক জন মার্শাল ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। তাহার পর গবেষণা, উৎখনন ও প্রত্নকীর্তি সংরক্ষণ অবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হয়।

প্রথম কয়েক বৎসর কানিংহ্যামের মত মার্শাল ও তাঁহার সহকর্মীরা বৌদ্ধ প্রত্নস্থল উৎখননেই মনোযোগ দেন। তবে প্রাচীন নগরীর উৎখননও কিছু কিছু

হইয়াছিল, যথা ভীটা, বৈশালী, পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা। এলাহাবাদের নিকটস্থ ভীটা নামক স্থানে মৌর্য (হয়ত প্রাক্-মৌর্যও) ও তৎপরবর্তী যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। মনে হয় নগরটি বণিকদের আবাসস্থল ছিল। উত্তর বিহারে অবস্থিত বৈশালী (বর্তমান বসাঢ়) নগরে গুপ্ত ও প্রাক্-গুপ্ত যুগের অনেক সীলমোহর ও মৃন্ময় মূর্তি পাওয়া যায়। পাটনার নিকটে প্রাচীন পাটলিপুত্রের মৌর্যকালীন একটি বিস্তীর্ণ হলঘরের অবশেষ আবিষ্কৃত হয়। হলঘরটিতে আশিটি অথবা ততোধিক প্রস্তরস্তম্ভ ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় পূর্বগান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলা অবস্থিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সহিত ইহার প্রাচীন ইতিহাস জড়িত। ইহা বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল, তদুপরি মধ্য এশিয়ার সহিত মধ্য ভারতের বাণিজ্যপথে অবস্থিতিবশতঃ বাণিজ্য-প্রসূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখানে পর পর তিনটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটির বর্তমান নাম ভীড় টিবি (মাউণ্ড)। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রাজধানী হয় বর্তমান সিরকপ, ইহার আয়ু প্রায় চার শত বৎসর। শেষ নগর হইল সিরসুখ। এই নগরত্রয় ছাড়া তক্ষশিলার আশেপাশে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারের অবশেষ আছে।

তক্ষশিলায় দীর্ঘ কাল ধরিয়া উৎখননের ফলে দেখা গিয়াছে যে ভীড় টিবিতে কোনও রীতিবদ্ধ নগরসন্নিবেশ ছিল না। গৃহাদি নির্মিত হইত আকৃতিবিহীন প্রস্তরখণ্ড দিয়া। ছাদের আধারস্বরূপ অসংস্কৃতাকার প্রস্তরখণ্ড-নির্মিত স্তম্ভ অনেক ঘরে পাওয়া যায়। জল নিষ্কাশনের জন্য সরু সরু কূপ অথবা উপর্যুপরি রক্ষিত সচ্ছিদ্র তলবিশিষ্ট কলসীশ্রেণী ব্যবহৃত হইত। বাড়িঘর ও শহর ভাল না হইলেও নাগরিকদের সমৃদ্ধির অভাব ছিল না, কেননা উৎখননে বহু স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র -মুদ্রা এবং মূল্যবান অলংকার পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্তী নগর সিরকপ ভারতীয় গ্রীকনৃপতিদের সময়ে স্থাপিত হয়, পরে পার্থীয় নৃপতিগণ ইহার চারি দিকে প্রস্তরের প্রতিরক্ষা-প্রাচীর গাঁথিয়া দেন। সিরকপ বিস্তীর্ণ নগর ছিল। নগরের মধ্যে ছিল একটি প্রশস্ত সড়ক, তাহার দুই ধারে বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির পর একটি করিয়া ছোট সড়ক থাকিত, এই সমান্তরাল সড়কগুলি বড় সড়কে আসিয়া পড়িত। নগরের মধ্যেই কয়েকটি স্তূপ ও স্তূপবিশিষ্ট শূর্পাকৃতি মন্দির ছিল। উৎখননে বহু মুদ্রা, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। অনেক প্রত্নবস্তুতে গ্রীকপ্রভাব লক্ষিত হয়। তৃতীয় নগর সিরসুখে বিশেষ কোনও উৎখনন হয় নাই।

সিরকপ নগরের উত্তরাংশে পাহাড়ের উপর একটি বড় স্তূপ ও বিহার ছিল। এইগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। স্তূপটি হয়ত অশোকের পুত্র কুণালের স্মৃত্যর্থে রচিত। সিরকপের উত্তর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে নগরের বাহিরে গ্রীকপদ্ধতিতে নির্মিত একটি মন্দির ছিল।

তক্ষশিলার আশেপাশে যে সকল বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদের মধ্যে ধর্মরাজিকা প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। নাম হইতে মনে হয় যে ধর্মরাজিকা স্তূপের প্রতিষ্ঠা হয়ত অশোকের সময়ে হয়। পরে কয়েকবার ইহার পুনর্নির্মাণ ও পরিবর্ধন হয়; শেষ পরিবর্ধন সম্ভবতঃ কুষাণ যুগের। কালাত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তূপের চারি দিকে ক্ষুদ্রতর স্তূপরাজি, ছোট ছোট মন্দির ও বিহার গড়িয়া উঠে। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোহড়া-মোড়াডু ও জৌলিয়ানই প্রধান। উভয় স্থলের স্তূপই সন্নিবদ্ধ চুন-নির্মিত গান্ধারশৈলীয় বুদ্ধমূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে উৎখনিত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পেশওয়ারস্থ শাহজী-কি-ঢেরী বিখ্যাত। এখানে কনিষ্কের সমসাময়িক একটি স্তূপ উদ্ঘাটিত হয় এবং স্তূপগর্ভে ঐ যুগের একটি ধাতুমঞ্জুষা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের অন্যান্য অবশেষের মধ্যে তখ্‌ৎ-ঈ-বাহী, শহর-ঈ-বহলোল ও জামালগঢ়ী উল্লেখযোগ্য। সকল স্থলেই স্তূপ ও বিহার -সংবলিত প্রতিষ্ঠান ছিল। তখ্‌ৎ-ঈ-বাহীতে স্তূপপ্রাঙ্গণের চারি ধারে ধাপে ধাপে উন্নীত খিলানের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি ছোট ছোট কক্ষ আছে।

মধ্য গঙ্গার উপত্যকায় বারাণসীর নিকটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম প্রবর্তনস্থল সারনাথে উপর্যুপরি উৎখননের ফলে পূর্বেই বহু বৌদ্ধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। মার্শালের সময়ে এখানে লেখযুক্ত অশোকস্তম্ভের অংশ ও স্তম্ভোপরি সংস্থিত শীর্ষ, মূলগন্ধকুটী অর্থাৎ বুদ্ধের আবাসস্থল ও সেখানে নির্মিত মন্দিরাদি, দ্বাদশ শতকের কলচুরিরাজ্ঞী কুমারদেবী দ্বারা নির্মিত বিহার— ইত্যাদি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপৃত বহুতর বৌদ্ধকীর্তির অবশেষ পাওয়া যায়। অধোমুখ পদ্মের উপর অবস্থিত চতুঃসিংহ-বিশিষ্ট অশোকস্তম্ভশীর্ষ ভারতীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম। পণ্ডিতদের মতে ইহা সমসাময়িক পারস্যকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত, হয়ত পারসীক শিল্পীর দ্বারা ক্ষোদিত। ইহা এখন স্বাধীন ভারতের প্রতীকরূপে স্থান পাইয়াছে। কুষাণ ও পরবর্তী

উৎখনন, ভারতে

যুগের বুদ্ধ ও বৌদ্ধ প্রস্তরমূর্তি বহু সংখ্যায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গুপ্তকালীন মূর্তিগুলি হইতে গুপ্তযুগীয় কলার উৎকর্ষের সম্যক উপলব্ধি হয়।

শ্রাবস্তীতে (উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা-বহরাইচ জেলায় অবস্থিত সাহেট-মাহেট) অনাথপিণ্ডিক নামক এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করেন, তাহার নাম জেতবনারাম। এই বিহারকে কেন্দ্র করিয়া এখানে একটি বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং ইহা প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এখানে উৎখননের ফলে বহু বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলাস্থ কাসিয়া) বুদ্ধ পরিনির্বাণ-লাভ করেন, কাজেই উহা পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এখানেও উৎখনন হয় এবং পরিনির্বাণ চৈত্যের চারি ধারে মন্দির, ছোট ছোট স্তূপ ও কয়েকটি বিহার পাওয়া যায়। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহে (পাটনা জেলায় অবস্থিত রাজগির) পালি গ্রন্থ ও চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় ফা-হিয়েন ও হিউএন্-ৎসাঙের বিবরণের আধারে বুদ্ধজীবন-সম্পৃক্ত স্থানগুলির অবস্থান নিরূপিত হয় এবং সে সকল স্থলে কিছু কিছু উৎখনন হয়।

রাজগৃহের অনতিদূরস্থ নালন্দার বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভবকাল খুব প্রাচীন নয়, তবে মহাযান মতের ইতিহাসে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহা মহাযান দর্শন ও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। হিউএন্-ৎসাঙ্ এখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি এখানকার শিক্ষার ও আচার্যগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উৎখননের ফলে এখানে বহু-সংখ্যক মন্দির ও বিহার পাওয়া গিয়াছে। প্রধান মন্দিরটি প্রথমে ক্ষুদ্র ছিল, পরে উপর্যুপরি ছয় বার পরিবর্ধনের ফলে বিরাটাকার ধারণ করে। পঞ্চমকালের (অর্থাৎ চতুর্থবার পরিবর্ধিত) মন্দিরটির গাত্রে চুননির্মিত সারি সারি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর; এগুলি আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের হইবে। অন্যান্য মন্দিরগুলি পালযুগে নির্মিত। প্রথম বিহারটির পত্তন হয় সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে, পরে ইহা আট বার পুনর্নির্মিত হয়। এখানে গুপ্ত ও অন্যান্য বংশীয় রাজাদের অনেক সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। একটি তাম্রপট্টে লিখিত আছে যে সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রার) শৈলেন্দ্রবংশীয় নৃপতি বালপুত্রদেবের অনুরোধে পালরাজ দেবপাল নালন্দায় উক্ত রাজকর্তৃক নির্মিত বিহারের ব্যয়নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রদান করেন। অন্যান্য বিহারগুলি পালযুগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে নালন্দা বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। পালযুগের কাংস্য (ব্রঞ্জ) মূর্তিকলা নালন্দায় উৎকর্ষ লাভ করে। এখানে বহু কাংস্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

উপরি-লিখিত উৎখননগুলি মার্শালের প্রথম যুগের (অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত); তাহাদের মধ্যে কয়েকটি তাহার পরেও চলিয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর দয়ারাম সাহনী পূর্বোল্লিখিত হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে পুনরায় উৎখনন আরম্ভ করেন। পরবৎসর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের লার্কানা জেলায় অবস্থিত মহেঞ্জো-দড়োতে কাজ আরম্ভ করেন। মহেঞ্জো-দড়োর বৌদ্ধ স্তূপ পূর্বেই পরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু যে বিরাট ধ্বংসা-বশেষের একাংশের উপর স্তূপটি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্ন-বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান থাকায় প্রমাণিত হইল যে উভয় স্থানের ধ্বংসাবশেষ একই সভ্যতার নিদর্শন। সে সভ্যতা যে তৎকালে পরিচিত অন্য কোনও সভ্যতার সহিত মেলে না তাহাও সাব্যস্ত হইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ পণ্ডিতেরা প্রচার করিলেন যে মহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত সীলগুলির অনুরূপ সীল ইরাকের কয়েকটি স্থলে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধের স্তরে পাওয়া গিয়াছে। অতএব সিন্ধুসভ্যতাও যে ঐরূপ প্রাচীন তাহা প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে সিন্ধুসভ্যতা (বর্তমানে হরপ্পাসভ্যতা বা হরপ্পাসংস্কৃতি নামটিই অধিকতর প্রচলিত) ভারতের প্রথম সভ্যতারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ইহার পূর্বে বলিতে গেলে প্রাক্-মৌর্য যুগের কোনও সভ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সম্যক অনুধাবন না করিয়া থাকা যায় না, সেজন্য উভয় স্থলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে উৎখনন চলে। এই সভ্যতার বিস্তৃতি জানিবার জন্য সিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রদেশেও অনুসন্ধান করা হয়।

হরপ্পাসভ্যতা প্রাক্-লৌহযুগের। এ যুগের প্রধান ধাতু ছিল কাংস্য (অর্থাৎ তামা ও রাঙের সংমিশ্রণ)। কিছু কিছু পাথরের জিনিসও পাওয়া যায়, সেজন্য কেহ কেহ এই সভ্যতাকে তাম্রাশ্ম-যুগীয় (ক্যাল্‌কোলিথিক) বলিয়া মনে করেন। হরপ্পা পূর্বেই বহুবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেজন্য নগরের ধ্বংসাবশেষ মহেঞ্জো-দড়োতেই অনেক বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর অতিশয় সুবিন্যস্ত ছিল। ইহার সোজা সমান্তরাল পথ, দগ্ধ ইষ্টকের বাড়ি ইত্যাদি ভারতের বাহিরে এ যুগের অন্য কোনও নগরে দেখা যায় না। জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর ছিল। বাড়ির উপরতলা হইতে প্রাচীরের মধ্যে গাঁথা অথবা ইট

উৎখনন, ভারতে

দিয়া ঢাকা দগ্ধ মৃত্তিকার নল বাহিয়া জল নীচে আসিত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পাকা কূপ ও স্নানাগার ছিল, সেখান হইতে নোংরা জল পথের পাশে ঢাকা নালীতে পড়িত। জল নিষ্কাশনের এরূপ সুব্যবস্থা ঐ যুগের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর।

মহেঞ্জো-দড়ো শহর উপর্যুপরি সাত বার নির্মিত হয় (ভূগর্ভস্থ জলের জন্য আরও তলদেশে কি আছে জানা সম্ভব হয় নাই) ও হরপ্পা আট বার। লক্ষণীয় এই, মহেঞ্জো-দড়োতে প্রতিবার একই পদ্ধতিতে নগর গঠিত হয়। বাড়ির মালিকেরা রাস্তার কোনও অংশ অন্যায্য ভাবে অধিকার করে নাই। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কোনরূপ কঠোর নাগরিক বা কেন্দ্রীয় শাসন বর্তমান ছিল। কেবল শেষকালে নগরজীবনের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। নগরে একটি পুষ্করিণী ছিল, সেখানে নীচে নামিবার সিঁড়ি ও জল প্রবেশের ও বহির্গমনের ব্যবস্থা ছিল। ইহার প্রাচীর জিপসাম দিয়া গাঁথা ছিল, যাহাতে জল বাহির না হইয়া যায়। চারি দিকে ছোট-বড় ঘর ছিল, বোধ হয় বস্ত্রপরিবর্তনের জন্য। পুষ্করিণীটির কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব নয়। কাছেই অন্যান্য সর্বজনীন গৃহাদি ছিল, যেমন একটি কলেজগৃহ এবং একটি স্তম্ভবিশিষ্ট হলঘর। এই স্থানটি সাধারণতঃ 'বৃহৎ স্নানাগার' বলিয়া পরিচিত। মনে হয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলিয়া মহেঞ্জো-দড়োতে নানাজাতীয় লোকের বাস ছিল। উৎখননে প্রাপ্ত কঙ্কালাবশেষ হইতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে তখনকার মানুষের সহিত নিকটবর্তী অঞ্চলের আধুনিক কালের অধিবাসীগণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উৎখনিত বস্তুগুলি হইতে লোকের আচার-ব্যবহারের বা ধর্মবিশ্বাসের যেটুকু প্রমাণ মেলে তাহাতে মনে হয় যে মাতৃকাপূজা বেশ প্রচলিত ছিল। একটি সীলে যোগাসীন, বিবিধপশুপরিবৃত, সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বলিঙ্গ একটি দেবমূর্তি আছে। অনেকে মনে করেন যে উহা পরবর্তী যুগের শিবেরই আদিম প্রতিমূর্তি। অনেকগুলি প্রত্নবস্তু দেখিয়া মনে হয় যে লিঙ্গপূজাও হয়ত প্রচলিত ছিল। এই সকল বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমান হিন্দু ধর্মে হরপ্পাযুগের ধর্মের অনেক উপাদান আছে। ইহা কিয়দংশে সত্য।

নাগরিকেরা খাদ্যের জন্য গ্রামের উপরই নির্ভর করিত, বর্তমান কালেও ইহা নাগরিকতার অন্যতম লক্ষণ। শস্য-সংরক্ষণের জন্য বড় বড় গোলাঘর মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পা উভয় স্থলেই বর্তমান। গম ও যবের দানা উৎখননে পাওয়া গিয়াছে। আমিষের মধ্যে গোরু, ছাগ, মেষ, শূকর, কুক্কুট ও মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। গৃহপালিত পশু ছিল ককুদযুক্ত ও ককুদবিহীন গোরু, বিড়াল ও কুকুর। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, শম্বরমৃগ, খড়্গী ইত্যাদি বন্য পশুও পরিচিত ছিল।

তুলাতন্তু হইতে কাপড় তৈয়ারি হইত। এই যুগে ভারতের বাহিরে সভ্যজগতে তুলার প্রচলন ছিল না। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নানাবিধ মূল্যবান ও অনতিমূল্য মণিক অলংকাররূপে ব্যবহৃত হইত। কার্নেলিয়ান মণিকের উপর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শাদা নকশা ক্ষোদিত হইত। কোঅর্ৎস-চূর্ণ অথবা বিশুদ্ধ বালির সহিত রং ইত্যাদি মিশাইয়া প্রস্তুত পিষ্ট (faience) হইতে অলংকার ও ছোট ছোট ভাণ্ড প্রস্তুত হইত। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কাংস্যনির্মিত কুঠার, বাণমুখ, ছুরি, করাত, কাস্তে, ক্ষুর, মৎস্য ধরিবার বড়শি ইত্যাদি এবং চার্টপাথরের ফলা নির্মিত হইত। মারণাস্ত্রের সংখ্যা কম, হয়ত প্রতিবেশীদের সহিত লোকেদের যুদ্ধস্পৃহা বেশি ছিল না। কুম্ভকারের শিল্পকর্ম বেশ উন্নত ছিল। অধিকাংশ মৃৎপাত্র চক্রপ্রসূত, লোহিত বর্ণের ও লোহিত পঙ্কলেপযুক্ত। মৃৎপাত্রের অনেকগুলি বিশিষ্ট আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা সাধার স্থালী, শঙ্কুতলদেশবিশিষ্ট ভাণ্ড ইত্যাদি। এইগুলির উপর অনেক সময় জীবজন্তু, গাছপালা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রিত হইত।

সাধারণতঃ ছোট ছোট চতুষ্কোণ খড়ি-পাথরের টুকরা সীলরূপে ব্যবহৃত হইত। উহার উপর ক্ষোদিত হইত হস্তী, বৃষ, একশৃঙ্গ বা অন্য কোনও বাস্তব অথবা কাল্পনিক জীব এবং এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট লিপি। জন্তু-গুলির, বিশেষ করিয়া ককুদযুক্ত বৃষের মূর্তিতে শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমুদায় লিপি এখনও পড়িতে পারা যায় নাই, তবে মনে হয় উহা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত হইত। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে হরপ্পাসভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যাইবে আশা করা যায়।

সকল কথা বিবেচনা করিয়া মনে হয় মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পা— দুইটিই বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল। বাণিজ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ওজনপ্রণালীর একান্ত প্রয়োজন। হরপ্পীয়যুগে ওজনের জন্য নানাবিধ প্রস্তরের ঘনক ব্যবহৃত হইত, তাহাদের পরিমাণ ছিল ১, ২, ৮৩, ৮, ১৬, ৩২, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০— এই অনুপাতে। আমদানি ও রপ্তানির বহু প্রমাণ আছে। স্বর্ণ, তাম্র ও বহুবিধ মণিক ভারত ও ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিত। আবার ইরাকে প্রাপ্ত প্রায় ত্রিশটি সীল হইতে স্পষ্টই

উৎখনন, ভারতে

হরপ্পীয়দের সহিত ঐ দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ প্রতীত হয়। বোধ হয় হরপ্পীয় বণিকরা বিদেশে নিজেদের সীল লইয়া যাইত। জল ও স্থল উভয় পথেই যাতায়াত হইত।

হরপ্পাসভ্যতার কালনির্ণয়ের প্রধান উপকরণ ইরাকে প্রাপ্ত সীলগুলি। ইরাকের প্রত্নতত্ত্ব অনুযায়ী এগুলি আক্কাদ-নৃপতি সারগনের (আনুমানিক ২৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সমসাময়িক। অতএব আজকাল পণ্ডিতেরা মনে করেন যে হরপ্পাসভ্যতার আয়ুষ্কাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবে ঐ সভ্যতার অবসান দুই-তিন শত বৎসর পূর্বেও হইয়া থাকিতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এই সভ্যতার গুরুতর কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। হরপ্পীয় বণিকসমাজ নিশ্চয়ই অতিশয় রক্ষণশীল ছিল।

কোন্ জাতীয় লোক এই সভ্যতার প্রবর্তন করিয়াছিল অথবা পরে ইহার প্রভাবে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা দ্রাবিড়ীয় ছিল এবং পরে আর্য আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্যগণই এই সভ্যতার প্রবর্তক। দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড়ীয়দের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় খ্রীষ্টযুগের প্রারম্ভে, প্রাচীন তামিল সাহিত্যের মাধ্যমে। ইহার পূর্বে তাহাদের সংস্কৃতি ও ভাষা কিরূপ ছিল তাহা জানা নাই। কাজেই দুই সহস্র বৎসর ডিঙাইয়া হরপ্পীয়দের সহিত দ্রাবিড়ীয়দের সমতা প্রতিষ্ঠা করিবার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা কারণ নাই। আর্যদের বৈদিক সংস্কৃতির সহিত হরপ্পাসভ্যতার কোনও মিল নাই বলিলেই চলে, কারণ বৈদিক সংস্কৃতি গ্রামীণ, হরপ্পাসভ্যতা নাগরিক। প্রমাণাভাবে দ্রাবিড় বা আর্যগণের সহিত হরপ্পীয়গণের অভিন্নতা স্বীকার করা শক্ত। তবে ভবিষ্যৎ গবেষণার ফলে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহাও বলা যায় না।

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে এই অঞ্চলে হরপ্পীয়দের ছোট ছোট বসতিস্থল ছিল। বেলুচিস্তানে কুল্লী, মেহী ইত্যাদি স্থলে তাম্রযুগের প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাল নামক স্থানে হরপ্পাসভ্যতার পূর্ববর্তী ও আংশিকভাবে সমসাময়িক একটি সমাধিক্ষেত্র উৎখনিত হইয়াছে। সেখানে প্রলম্বিত ও আংশিক শবসমাধি পাওয়া যায়। নালের মৃৎপাত্র বিশিষ্ট ধরনের; উহার বর্ণ হরিতাভ, তাহার উপর একাধিক বর্ণে চিত্র অঙ্কিত হইত। সিন্ধু দেশে অম্রী নামক স্থানে হরপ্পীয় স্তরের আরও নিম্নে (অর্থাৎ প্রাক্-হরপ্পীয়) অম্রীসংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্র পাণ্ডুবর্ণ, তাহার উপর কৃষ্ণ ও লোহিতাভ বর্ণের জ্যামিতিক নকশা অঙ্কিত আছে। ঝুকড় ও চানহু-দড়োতে হরপ্পাসভ্যতার নিদর্শনের উপর নূতন এক সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া যায়। ঝুকড়সংস্কৃতির মৃৎপাত্র ধূসর অথবা হালকা পীত বর্ণের, তাহার উপর বেগুনি বা লোহিত বর্ণের চিত্র আছে। বেলুচিস্তানে শাহীতুম্প নামক স্থানে হরপ্পার পরবর্তী যুগের এক সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানকার মৃৎপাত্রও (কৌলাল) বিশিষ্ট ধরনের, উহা ধূসর বর্ণের, তাহার উপর কৃষ্ণ অথবা গাঢ় বাদামি বর্ণের চিত্র বিদ্যমান। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এখানে একটি তাম্রনির্মিত কুঠার পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বাঁট পরাইবার জন্য গর্ত আছে। এইরূপ কুঠার হরপ্পা-সভ্যতায় নাই— কেবল রুশ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দুই-একটি প্রাচীন স্থলে পাওয়া গিয়াছে। শাহীতুম্পে হয়ত উত্তর দিক হইতে বিদেশী সংস্কৃতি আসিবার ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। হরপ্পাতেই হরপ্পাসংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত দুইটি স্তরবিশিষ্ট একটি সমাধিক্ষেত্র (সেমিট্রি 'এইচ' নামে পরিচিত) পাওয়া যায়; ইহার কথা পরে বলা হইবে।

হরপ্পাসভ্যতার পূর্বেকার ও পরবর্তী এই সংস্কৃতিগুলির মধ্যে কোনটিই হরপ্পাসভ্যতার মত উন্নত ও দূরব্যাপী নয়। সবগুলিই ছোট ছোট এবং সীমাবদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি। হরপ্পার পূর্ববর্তী কোনও সংস্কৃতিকেই ইহার আদিজননী বলিয়া গণ্য করা যায় না। উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। তেমনই হরপ্পার পরবর্তী কোনও সংস্কৃতিকেই সরাসরি হরপ্পাসভ্যতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয় না। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে হরপ্পা-সভ্যতার অবসান কি করিয়া ঘটিল তাহা স্থির হয় নাই। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমিয়া যাওয়ার ফলে মরুভূমির সৃষ্টি, বন্যার প্রকোপ, বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ আর্যদের আক্রমণ— এইরূপ বহুবিধ অনুমান আছে, কিন্তু কোনটির স্বপক্ষেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইহাই হইল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিজ্ঞাত হরপ্পা-সভ্যতা ও পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের (অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের) অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পরবর্তী কালে হরপ্পাসভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বর্ণনা করিবার পূর্বে পাহাড়পুর ও নাগার্জুনকোণ্ডা— এই দুই স্থানে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার অন্য দুইটি প্রধান উৎখননের কথা বলা প্রয়োজন।

পাহাড়পুর বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলায় অবস্থিত, ইহার প্রাচীন নাম সোমপুর। এখানকার উৎখননকার্য রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রবর্তিত হয়, পরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এখানে ভূগর্ভ হইতে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার গঠনপ্রণালী অনন্যসাধারণ। মন্দিরের আসন পগবিশিষ্ট। তিনটি প্রদক্ষিণপথ ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়াছে, সর্বোপরি মন্দিরের গর্ভগৃহ ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রদক্ষিণপথের প্রাচীরগাত্রে শত শত পোড়ামাটির ফলক বসানো ছিল, সেগুলির বিষয়বস্তু বহুবিধ— যথা, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি, গন্ধর্ব-বিদ্যাধরের মূর্তি, জীবজন্তু, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, পঞ্চতন্ত্রের উপকথা ইত্যাদি। মন্দিরটি অবস্থিত ছিল একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে। যে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা প্রাঙ্গণটি বেষ্টিত, তাহার অন্তর্গাত্রে ভিক্ষুকের ছোট ছোট আবাসকক্ষ ছিল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় পালনৃপতি ধর্মপাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অনতিদূরে দ্বাদশ শতকে নির্মিত বৌদ্ধ দেবী তারার একটি মন্দির ছিল।

গুণ্টুর জেলায় কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী নাগার্জুনকোণ্ডায় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার প্রাচীন নাম বিজয়পুরী। এখানকার বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের ইক্ষ্বাকুরাজগণের সময়কার। তাঁহাদের অনতিদীর্ঘ রাজত্বকালে এই উপত্যকায় বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিবাস ছিল। তাহাদের জন্য স্তূপ, চৈত্যগৃহ ও বিহার রচিত হয়। কয়েকটি স্তূপ হরিতাভ চুনাপাথরের ক্ষোদিত ফলক দ্বারা আবৃত ছিল। ফলকগুলির বিষয়বস্তু হইল বুদ্ধের জীবনী ইত্যাদি, তাহাদের শিল্পকলায় অমরাবতী-শৈলীর বিকাশ লক্ষিত হয়। এইস্থানে প্রাপ্ত বহু শিলালেখ হইতে ইক্ষ্বাকুগণের ইতিহাস এবং বিজয়পুরীনিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে পুনরায় উৎখননের ফলে নাগার্জুনকোণ্ডায় বহু নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। সে কথা পরে বলা হইবে।

মার্শাল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সর্বাধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার চার বৎসর পরে সর্বত্র ব্যয়সংকোচের ফলে উৎখননের কাজ বিশেষ ব্যাহত হয়। এই যুগের একটি মাত্র উৎখনন উল্লেখযোগ্য। উত্তর বিহারের চম্পারন জেলায় লৌড়িয়া-নন্দনগড় নামক স্থানে অশোকস্তম্ভের নিকটে প্রায় পনরটি স্তূপ আছে। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উৎখনিত হয়। উৎখনক সিদ্ধান্ত করেন যে ঐগুলি শবদাহের পর ভস্মসমাধির জন্য বৈদিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার উৎখননে স্থিরীকৃত হইল যে ঐগুলি খুব সম্ভব বৌদ্ধ স্তূপ। নিকটবর্তী ৮০ ফুট উচ্চ নন্দনগড় ঢিবিতে উৎখনন করিয়া জানা গেল যে উহা বহুকোণ-সংবলিত ভিত্তির উপর সংস্থিত একটি বিরাটকায় স্তূপের অবশেষ। স্তূপের তলদেশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, উপরিভাগ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্তূপগর্ভে একটি তাম্রপুটের মধ্যে ভূর্জপত্রে লিখিত কোনও বৌদ্ধ সূত্রের (খুব সম্ভব প্রতীত্যসমুৎপাদসূত্রের) অংশ পাওয়া যায়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডি. টেরার নেতৃত্বে একটি ভূতাত্ত্বিক প্রাগৈতিহাসিক অভিযান ভারতে আসে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীর ও নিকটবর্তী পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে তুষারযুগের ও তৎসম্পৃক্ত মানবের অবশেষ অনুসন্ধান করা। অভিযান রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় সোহান নদীর তটচত্বরে ক্রমবদ্ধ বহু অশ্মায়ুধ পায় এবং কাশ্মীরের তুষারযুগ ও অন্ত্যতুষারযুগের সহিত তাহাদের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করে। বলিতে গেলে ভারতে প্লাইস্টোসিন যুগের ভূতত্ত্বের সহিত প্রত্নাশ্ম-যুগের সম্বন্ধস্থাপনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান স্কুল অফ ইণ্ডিক স্টাডিজ ও বস্টন মিউজিয়ামের একটি অভিযান দ্বারা পূর্বোল্লিখিত চানহু-দড়ো উৎখনিত হয় এবং সেখানকার হরপ্পাসভ্যতার পরবর্তী সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হয়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুরে বাণগড়ের উৎখনন আরম্ভ করে। সেখানে শুঙ্গযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত কালের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় ময়ূরভঞ্জে বহু প্রত্নাশ্মায়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উনবিংশ শতকে প্রায় একই সময়ে ইওরোপ ও ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা রীতিবদ্ধভাবে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং তৎকালে উৎখননের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিও মোটামুটি অনুরূপ ছিল। পরে ইওরোপে উৎখননপদ্ধতির বহুবিধ উন্নতি হয়, উদ্দেশ্যও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারতে প্রায়শঃ প্রাচীন গতানুগতিক পদ্ধতিতেই কাজ হইতেছিল, যদিও কখনও কখনও কর্ম-ধারায় স্বল্প নূতন প্রভাব লক্ষিত হয়।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক লেনার্ড উলী প্রথমে ইহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। উলী ভারতে মাত্র কয়েক মাস ছিলেন, সেজন্য তাঁহার রিপোর্টে ভ্রান্ত মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও উৎখননপদ্ধতি সম্পর্কে

মন্তব্যগুলি অনেকাংশে সত্য। এই রিপোর্টের অব্যবহিত পরে ভারতে যে কাজ হয় তাহাতে তৎপ্রদর্শিত দোষ দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে সাবরমতী নদীর উপত্যকায় অশ্মযুগীয় অনুসন্ধানের জন্য ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ একটি অভিযান পাঠায়। এখানে প্রত্নাশ্মযুগের দুই শ্রেণীর আয়ুধের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পর্যবেক্ষণ বস্তুতঃ এই প্রথম অশ্মযুগের গবেষণায় মনোযোগ দেয়। পূর্বে যে কাজ হইয়াছিল তাহা ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কর্মচারী অথবা বিদেশীয়দের দ্বারা।

১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাচীন পঞ্চালরাজ্যের রাজধানী বর্তমান বেরিলী জেলায় অবস্থিত অহিচ্ছত্রনগরে ব্যাপকভাবে উৎখনন চলে। এই উৎখননে বহু ঘরবাড়ি ও ইষ্টকনির্মিত দুইটি বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। নগরটিতে প্রাক্‌-মৌর্য যুগ হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মনুষ্যের বসতি ছিল। গঙ্গা উপত্যকার প্রায় ১৭০০ বৎসর ব্যাপী প্রাচীন মৃৎপাত্রনির্মাণকলার ধারাবাহিক পারম্পর্য এখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। অহিচ্ছত্রে প্রথমে চিত্রিত ধূসর ও উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের পরিচয় লাভ হয়। প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় এই উভয় পদ্ধতিই পরবর্তী গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চার বৎসরের জন্য ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সর্বাধ্যক্ষরূপে আসেন স্যর মর্টিমার-হুইলার। তিনিই উৎখননের নূতন আদর্শ ও পদ্ধতির প্রচলন করেন। প্রথমে তিনি তক্ষশিলার ভীড় ঢিবি ও সিরকপে পুনরুৎখনন করেন। ভীড় ঢিবি খননের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আর্যগণের আগমনের নিদর্শন আবিষ্কার, কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। সিরকপ নগরের প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের সময় নির্ণয় এবং তাহার সহিত নগরের প্রাচীনতম অধিবাসীর কি সম্পর্ক, স্তরবিন্যাসের সাহায্যে তাহা দেখিবার জন্য তিনি সিরকপে উৎখনন করেন। এই দুইটি উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রস্তরনির্মিত প্রতিরক্ষা-প্রাচীর যে পার্থীয় নৃপতিদের সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় এবং উহার নিকটবর্তী বসতি যে উহার সমসাময়িক তাহাও প্রমাণিত হয়। তবে নগরের উত্তরাংশে পূর্বতর যে বসতির অবশেষ আছে সেগুলি ভারতীয় গ্রীক রাজাদের সমসাময়িক।

ভারতের বহু স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণে, খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের রোমক সম্রাটদের বহু মুদ্রা পাওয়া যায়, কারণ ঐ সময়ে রোমের সহিত ভারতের সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত। ভারতের রপ্তানিদ্রব্য ছিল সূক্ষ্ম কাপড়, মশলা ইত্যাদি এবং ভারতে আমদানি হইত রোমের স্বর্ণ। পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকমেডু নামক স্থলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রোমের কিছু কিছু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। সেজন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার আরিকমেডুতে উৎখনন করেন। তাহার ফলে কিছু রোমদেশীয় মৃৎপাত্র পাওয়া গেল এবং তৎসংশ্লিষ্ট দেশীয় মৃৎপাত্রশিল্পের সময়নির্ণয় সহজ হইল। এইরূপে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মৃৎপাত্রশিল্পের অধ্যয়নের সূত্রপাত হইল।

তাহার পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার হরপ্পার পুনরুৎখনন করেন। সেখানকার একটি সমাধিক্ষেত্র (সেমিট্রি 'এইচ') পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রে দুইটি স্তর ছিল, নিম্নতর স্তরে বিস্তৃত সমাধি, উপরের স্তরে মৃৎকুম্ভের ভিতর আংশিক সমাধি। উভয় স্তরের মৃৎশিল্পই প্রকৃত হরপ্পার মৃৎশিল্প হইতে ভিন্ন। ইহা ছাড়া প্রকৃত হরপ্পার একটি সমাধিক্ষেত্র ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। হুইলারের উৎখনন দ্বারা প্রমাণিত হইল যে সেমিট্রি 'এইচ' হরপ্পা-সভ্যতার পরবর্তী, হরপ্পীয়গণ হরপ্পা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর উহার উৎপত্তি। আরও দেখা গেল যে হরপ্পীয়দের শব বিস্তৃতভাবে প্রোথিত হইত, তাহার আশে-পাশে থাকিত মৃৎপাত্র। একটি শবনিখাতে কাষ্ঠনির্মিত শবাধারের চিহ্নও পাওয়া যায়।

হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের একাংশে অত্যুচ্চ প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। হুইলারের উৎখননে ঐ প্রাচীরের নকশা ও গঠনপ্রণালী জানা গেল। প্রাচীরটি ছিল অদগ্ধ ইষ্টক দিয়া তৈয়ারি, তাহার বহির্গাত্রে সংলগ্ন দগ্ধ ইষ্টকের অবলম্বন-প্রাচীরও ছিল। প্রাচীরবেষ্টিত অংশের অভ্যন্তরে মাটি ভরাট করিয়া উহাকে একটি কৃত্রিম অধিত্যকায় পরিণত করা হয়, তাহার উপর সম্ভবতঃ নগরের ঘরবাড়ি ছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সমগ্র নগরটির চারি ধারে কোনও প্রতিরক্ষা-প্রাচীর ছিল না, ছিল কেবল একটি সীমিত অংশে। অতএব এই অংশে যে নগরের দুর্গিকা ছিল এবং সেখানে যে নগরের প্রধান ব্যক্তি অথবা শাসকদের গৃহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি ছিল তাহা স্বতঃই মনে হয়। মহেঞ্জো-দড়োর পুষ্করিণী ও কলেজগৃহ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎখননে প্রমাণিত হয় যে, যে অংশে এই সকল গৃহাদি অবস্থিত তাহাও ছিল হরপ্পার সহিত তুলনীয় একটি দুর্গিকা। উভয় নগরেই দুর্গিকা আবিষ্কার হরপ্পাসভ্যতার উপর নূতন আলোকপাত করে, কারণ ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হরপ্পীয় সমাজে বিশিষ্ট অধিকারভোগী একদল লোক ছিল।

পরবৎসর উৎখনন হয় মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে।

সেখানে বহু মহাশ্মীয় সমাধি ও তন্নিকটে অধিবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আছে। উৎখননের উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মগিরির (এবং দক্ষিণ ভারতের) মহাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল নির্ণয় ও মহাশ্মীয় সমাধিগুলির সহিত অধিবাসভূমির সম্বন্ধ নির্ধারণ। উৎখননে জানা গেল যে, মহাশ্মীয় সংস্কৃতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইতিপূর্বে এই সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায় নাই এবং তাহার ফলে বহু অযৌক্তিক অনুমান প্রচলিত ছিল। অধিবাসভূমিতে তিনটি সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া গেল— প্রাক্-মহাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত), মহাশ্মীয় সংস্কৃতি (ইহার কাল পূর্বে বলা হইয়াছে) এবং ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি (৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৃতীয় শতক পর্যন্ত)। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির উপকরণ ধূসর ও কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রিত লোহিত মৃৎপাত্র, মাজিত প্রস্তরকুঠার, সমান্তরাল ধারবিশিষ্ট প্রস্তরফলা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাম্র। মহাশ্মীয় সংস্কৃতির মৃৎপাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের; এই যুগে প্রচুর লৌহদ্রব্য ব্যবহৃত হইত। পরবর্তী যুগের মৃৎপাত্র গোলাপি বর্ণের, তাহার উপর শাদা নকশা। এই যুগে রোমদেশীয় ও সাতবাহন বংশের মুদ্রা পাওয়া যায়।

হুইলারের সময়ে ও পরে দেশে উৎখনন ও গবেষণা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং এখনও হইতেছে। বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট ও আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান উৎখননকার্যে ব্রতী হইয়াছে— যথা, পুণার ডেকান কলেজ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট অ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণগড় ও ময়ূরভঞ্জে উৎখননের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে) এবং এলাহাবাদ, বরোদা, সাগর, পাটনা ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। আবার কয়েকটি প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় সরকারও এই কাজে যোগ দিয়াছে। যথা রাজস্থান, মহীশূর, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও এই সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার ফলে এখন ভারতের প্রত্নতত্ত্বের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্তী বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে। অশ্মযুগ, হরপ্পা ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক যুগ— সর্বত্রই নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে এবং পূর্বযুগের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ক্রমেই দূর হইতেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক নূতন সমস্যারও উদ্ভব হইতেছে, যাহার সমাধানের জন্য বহুবিধ গবেষণা প্রয়োজন।

অশ্মযুগের ক্ষেত্রে নানা প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানপ্রসূত ফল হইতে জানা যায় যে, এই যুগকে আয়ুধ ও তদাশ্রিত সংস্কৃতির কালক্রমানুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়— আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য। আদ্য অশ্মযুগের আয়ুধ পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণে নদীর তটভূমিতে ও অন্যত্র বহু স্থলে লক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই অশ্মপিণ্ড হইতে নির্মিত, যদিও মাঝে মাঝে অশ্মশল্ক হইতে প্রস্তুত আয়ুধও পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে সোহান নদীর তটভূমিতে একমুখবিশিষ্ট আয়ুধের প্রাচুর্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে কাংড়া জেলায় বাণগঙ্গা নদীর উপত্যকায় এই জাতীয় আয়ুধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অন্যতম লক্ষণ এই যে নদীস্রোতে মসৃণ উপলের এক পৃষ্ঠ হইতে শল্ক অবচ্ছিন্ন করিয়া পাতলা ধার প্রস্তুত করা হইত। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে এতাদৃশ আয়ুধের ধারা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করে।

মাদ্রাজ অঞ্চলে দ্বিমুখ আয়ুধের প্রাধান্য। আয়ুধ প্রস্তুতির জন্য উপল অপেক্ষা অন্য অশ্মপিণ্ডই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। পিণ্ডের উভয় পৃষ্ঠ হইতে শল্ক অবচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিমুখ হস্তকুঠার, বিদারক ইত্যাদি নির্মিত হইত। এই জাতীয় আয়ুধের সহিত ইওরোপ ও আফ্রিকার আবেভিলীয়-অ্যাশিউলীয় আয়ুধের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। একমুখ ও দ্বিমুখ আয়ুধধারার সংমিশ্রণ ভারতের বহু স্থলে দেখা যায়, তবে হিমালয়ের পাদদেশ ব্যতীত সর্বত্রই দ্বিমুখ আয়ুধের প্রাধান্য।

আদ্য অশ্মযুগের পর মধ্য ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত ছোট আয়ুধ— এগুলি মধ্য অশ্মযুগীয় বলিয়া পরিগণিত। এই জাতীয় আয়ুধের অধিকাংশই কর্নেলিয়ান, জ্যাস্পার, অ্যাগ্যাট, চার্ট ইত্যাদি সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট মণিকের শল্ক হইতে প্রস্তুত। আকৃতিও বহুবিধ, যথা তক্ষক, ফলা, ছেদক, উৎকিরক ইত্যাদি। নর্মদা ও গোদাবরী এবং উহাদের উপনদীগুলির অতট পরীক্ষা করিয়া প্রতীত হয় যে, যে প্রাকৃতিক স্তরে আদ্য অশ্মায়ুধ পাওয়া যায়, তাহার বহু পরবর্তী স্তরে মধ্য অশ্মযুগের আবির্ভাব। কাজেই দুই শ্রেণীর আয়ুধের মধ্যে কোনও জন্মগত সম্বন্ধ স্থাপনা করিবার মত প্রমাণ বা উপকরণ নাই। কিন্তু মধ্য অশ্মায়ুধ হইতে অন্ত্য অশ্মায়ুধের উদ্ভব অসম্ভব নয়, যদিও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। অন্ত্য অশ্মায়ুধ ক্ষুদ্রাশ্মীয়। আকারে মধ্য অশ্মায়ুধ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু উভয়ের উৎপাদনসামগ্রী সমজাতীয় এবং উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। সুদূর দক্ষিণে রক্তাভ

উৎখনন, ভারতে

বালুকাস্তূপে (স্থানীয় নাম টেরি) এই ধরনের ক্ষুদ্রাশ্মায়ুধ বর্তমান। পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান জেলার বীরভানপুরেও উৎখননে এরূপ আয়ুধ পাওয়া যায়। মনে হয়, প্লাইস্টোসিন যুগের পরবর্তী হলোসিন যুগে (অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক বর্তমান যুগের) প্রথমের দিকে অন্ত্য অশ্মযুগীয় আয়ুধের উৎপত্তি। টেরির আয়ুধগুলির ন্যূনতম কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ ধরা হইয়াছে, তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে আরও প্রাচীনতর কাল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। গুজরাটে, অন্ধ্র প্রদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া যায়। ইহার পর মৃৎপাত্রের উদ্ভব হয়। আরও পরবর্তী যুগের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি সম্পৃক্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধের কথা পরে বলা হইবে।

এই ত্রিধাবিভক্ত অশ্মযুগের পর নবাশ্মযুগ। মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে নবাশ্মীয় কুঠারাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত। অবিমিশ্র নবাশ্মযুগের অস্তিত্ব এখনও উৎখননের ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তবে কয়েকটি স্থলে ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যথা মহীশূরে টি. নরসিপুর, পক্‌লিহল ও সঙ্গনকল্লু, অন্ধ্র প্রদেশে মহ্‌বুব-নগর জেলায় উটনুর ইত্যাদি। ওড়িশায় ময়ূরভঞ্জের কুচাই নামক স্থলে সম্প্রতি উৎখননে মৃৎপাত্রহীন ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ-বিশিষ্ট স্তরের উপর নবাশ্মীয় স্তর লক্ষিত হইয়াছে। এই স্তরে বাদামি রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতে অর্থাৎ আসামে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে এবং বিহারে বহু নবাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি উৎখননপ্রসূত নয় এবং তাহাদের কালনির্ণয়ের কোনও উপকরণ নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের নবাশ্মীয় কুঠারের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে। পূর্ব ভারতের কুঠারগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুষ্কোণ এবং তাহাদের অনেকগুলি স্কন্ধবিশিষ্ট। দক্ষিণ ভারতের কুঠারগুলির প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকৃতি বা উপবৃত্তাকৃতি। পূর্ব ভারতে নবাশ্মীয় ধারা পূর্ব এশিয়া হইতে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি কাশ্মীরে শ্রীনগর জেলায় অবস্থিত বুর্জাহোম নামক স্থলে একটি নূতন নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সংস্কৃতির লোকেরা দৃঢ় মৃত্তিকাময় প্রাকৃতিক অধিত্যকায় (স্থানীয় নাম করেওয়া) অর্ধবৃত্তাকার গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করিত। তাহাদের দৈনিক ব্যবহারের বস্তু ছিল প্রস্তরকুঠার, অস্থিনির্মিত আয়ুধ (যেমন হারপুন, তুরপুন, ছুঁচ ইত্যাদি) ও হস্তনির্মিত কৃষ্ণাভ বর্ণের মৃৎপাত্র। ঐ জাতীয় সংস্কৃতি ভারতে অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, বহির্ভারতের সহিত ইহার সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয়।

সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সহিত পরবর্তী তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কিছু যোগ আছে (এই তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কথা পরে বলা হইবে)। এখানে হরপ্পাসভ্যতার কথা পুনরুত্থাপিত করা প্রয়োজন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত ঐ সভ্যতা সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের ফলে হরপ্পাসভ্যতার জ্ঞাত সকল স্থলই পাকিস্তানভুক্ত হয়। ভারতসীমান্তের মধ্যে ঐ সভ্যতার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা দেখিবার জন্য পাকিস্তানসংলগ্ন উত্তর রাজস্থানে গঙ্গানগর জেলায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিস্তৃত অনুসন্ধান করে, বিশেষ করিয়া অধুনালুপ্ত সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর উপত্যকায় অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত হয়। ইহার ফলে প্রায় ২৫টি হরপ্পাসভ্যতার বসতিস্থল লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কালিবঙ্গা। আরও দেখা যায়, হরপ্পা-সভ্যতার পরবর্তী চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির কয়েকটি স্থল। ঐতিহাসিক যুগেরও বহু স্থল দৃষ্টিগোচর হয়— তাহাদের অন্যতম রংমহল। এই রংমহলসংস্কৃতির মৃৎপাত্রে লোহিত বর্ণের উপর কৃষ্ণ বর্ণের চিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। এই অনুসন্ধানে কিন্তু হরপ্পাসভ্যতা ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি— এই উভয়ের নিদর্শন একই স্থলে পাওয়া গেল না। সেজন্য হরপ্পাসভ্যতার শেষের দিকে অথবা তাহার ধ্বংসের পর পরবর্তী সংস্কৃতিটির আবির্ভাব হইয়া-ছিল, এ সমস্যার সমাধান হইল না, যদিও উভয় সংস্কৃতির বিস্তৃতি সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র অহিচ্ছত্রে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প। সেখানে তাহার কালনির্ণয় সম্ভব হয় নাই, যদিও উহা প্রাক্-খ্রীষ্টীয় তাহাতে সন্দেহ ছিল না। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই মৃৎপাত্র উত্তর রাজস্থান ছাড়াও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বহু প্রত্নস্থলে পাওয়া যায় এবং ইহা ঐতিহাসিক যুগের (খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের) পূর্বকালীন। এইরূপে এই মৃৎপাত্র ইতিহাসের দৃষ্টিতে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার কাল ও বিস্তৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে ইহা আর্যগণের সহিত সংশ্লিষ্ট, যদিও তাহার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। উত্তর প্রদেশে মীরাট জেলায় গঙ্গার এক প্রাচীন ধারার উপর অবস্থিত হস্তিনা-পুরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ১৯৫০ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন করে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে এখানে উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের পূর্বে

উৎখনন, ভারতে

চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের প্রচলন ছিল। নানাবিধ প্রমাণ-বশতঃ উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের আয়ুষ্কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত বলিয়া মনে হয়। অতএব চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির প্রারম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের আদিতে, হয়ত তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির পূর্বেও হস্তিনাপুরে লোকের বসতি ছিল; ইহারা গেরুয়া বর্ণের অপূর্ণদগ্ধ মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত। উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ মার্জিত মৃৎপাত্রের পরও হস্তিনাপুরে বহু দিন পর্যন্ত ইহাদের বসতি ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত স্থলটি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পুনরধ্যুষিত হয়।

এবার আম্বালা জেলায় শিবালিক গিরিশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত রূপড়ের কথা আলোচনা করা যাক। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক এখানে ১৯৫২ হইতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন হয় এবং জানা যায় যে এখানে হরপ্পাসভ্যতার নিদর্শনের উপর চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির নিদর্শন অবস্থিত। অর্থাৎ হরপ্পীয়গণ এই স্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পরে (কত পরে তাহা নিশ্চিত নয়) দ্বিতীয় সংস্কৃতির অধিকারীগণ এখানে বসবাস আরম্ভ করে। অতএব এখানেও হরপ্পাসভ্যতার বিনাশের সহিত চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির আবির্ভাবের কোনও কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা অজ্ঞাত রহিল। তাহার পর রূপড়ে আসে ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন— উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্র ইত্যাদি। তাহারও পরে এখানে কয়েক শতক পর্যন্ত বসতি ছিল।

দিল্লী হইতে ৪০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব-উত্তর দিকে যমুনার উপনদী হিণ্ডনের তীরবর্তী মীরাট জেলায় অবস্থিত আলমগীরপুর নামক স্থলে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক হরপ্পাসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। হয়ত এই সকল অবশেষ ঐ সভ্যতার শেষ যুগের চিহ্ন। রূপড়ের মত এখানেও হরপ্পীয়গণ স্থানত্যাগ করিয়া যাইবার পর চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির আগমন হয়।

রূপড় ও আলমগীরপুরে উৎখননের গুরুত্ব এই যে ইহা হইতে হরপ্পাসভ্যতা কতদূর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা জানা যায়। এই দুই স্থলে আরও দেখা যায় যে হরপ্পাসভ্যতা ও তৎপরবর্তী সংস্কৃতির মধ্যে কোনও সংস্রব হয় নাই। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় হরপ্পাসভ্যতার যেরূপ আকস্মিক অবসান হয় এখানেও সেইরূপ।

উত্তর রাজস্থানে হরপ্পাসভ্যতার একটি প্রধান স্থল কালিবঙ্গা। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে উৎখনন আরম্ভ করে, কাজ এখনও চলিতেছে। এখানে প্রত্যক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির কোনও চিহ্ন নাই, আছে প্রাক্-হরপ্পীয় একটি সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ। এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের আকৃতি ও চিত্রকলা এবং গৃহাদি হরপ্পা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এইরূপ মৃৎপাত্র পূর্বে এই অঞ্চলের বহু স্থলে পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের একটির নাম সোথী, ইহা দৃষদ্বতী উপত্যকায় অবস্থিত। অতএব এই মৃৎপাত্র-সংবলিত সংস্কৃতির নামকরণ হইয়াছিল সোথী-সংস্কৃতি। সিন্ধু দেশে কোট-ডীজী নামক স্থলেও এই সংস্কৃতির নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বোঝা যায় যে হরপ্পীয়গণ এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বে সোথী-সংস্কৃতি বেশ বিস্তৃত ছিল। হরপ্পাসভ্যতার উৎপত্তির উপর এই সংস্কৃতির কোনও প্রভাব আছে কিনা বোঝা যাইবে আরও উৎখনন ও গবেষণার পর। কালীবঙ্গা সম্বন্ধে আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এখানেও নগরের একাংশে একটি দুর্গিকা ছিল বলিয়া মনে হয়।

গুজরাট অঞ্চলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে হরপ্পাসভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে। সুরেন্দ্রনগর জেলায় অবস্থিত রংপুর নামক স্থলে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য উৎখনন হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে এখানে হরপ্পীয়দের বসতি ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হয়। সমস্যা নিরাকরণের জন্য ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা স্থলটির বিস্তৃতভাবে পুনরুৎখনন হয়। দেখা যায়, এখানে অধস্তন স্তরে অন্ত্য-অশ্মযুগের ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া যায়। তাহার পর হরপ্পাযুগের বসতি আরম্ভ হয়। হরপ্পীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হরপ্পা-সভ্যতার সকল লক্ষণই বর্তমান, তবে সীল পাওয়া যায় নাই। তদুপরি একশ্রেণীর মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে যাহার আকৃতি হরপ্পীয় হইলেও বর্ণ পাণ্ডু, লোহিত নয়। আবার কিছু কৃষ্ণ-লোহিত এবং ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। রংপুরে বন্যার ফলে হরপ্পীয় বসতিটি ধ্বংস হয় এবং তাহার পর অবশিষ্ট লোকেদের মধ্যে সকল বিষয়েই দৈন্য লক্ষিত হয়। এই যুগের সংস্কৃতিকে অপকৃষ্ট হরপ্পাসংস্কৃতি বলা যাইতে পারে। ইহার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ১১০০ অব্দ পর্যন্ত। তাহার পরবর্তী যুগে দেখা যায় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা। হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের অনেক নূতন আকৃতিও প্রচলিত হইল; যেন হরপ্পাসভ্যতা নূতন বেশে আবির্ভূত হইল। অনুমান হয়, এই সংস্কৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ হইতে ১০০ বৎসর বর্তমান ছিল। তাহার পর যে সংস্কৃতি দেখা যায়

উৎখনন, ভারতে

তাহার প্রধান মৃৎপাত্র ছিল উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের, যাহার উৎপত্তি পূর্ববর্তী কালেই হইয়াছিল এবং তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র। হরপ্পীয় মৃৎপাত্র সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইলেও জন্মগত সাদৃশ্য একেবারে দূর হইল না। এইকালে অশ্ব, বৃষ ও শূকরের মৃৎপুত্তলিকাও পাওয়া গিয়াছে।

এতএব দেখা গেল যে, রংপুর অঞ্চলে হরপ্পাসভ্যতা ধীরে ধীরে রূপ পরিবর্তন করিয়া নূতন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে এই সভ্যতার যেমন আকস্মিক অন্তর্ধান হয়, এখানে সেরূপ নয়। বিশেষ করিয়া রংপুরের শেষ যুগের মৃৎপাত্রের, বিশেষতঃ কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের সহিত মধ্য ভারতের তাম্রাশ্মীয় মৃৎপাত্রের কিছু কিছু মিল আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ রংপুর হইতে ৫০ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে ক্যাম্বে উপসাগরের অনতিদূরে সারগওয়ালা গ্রামে লোথাল নামক স্থলে ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন করে। সারগওয়ালা সাবরমতী ও ভোগাওয়া নদীর দোয়াবে অবস্থিত। লোথালে হরপ্পাসভ্যতার অধিবাস ছিল। এখানে বাড়িঘর, কূপ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিশিষ্ট মৃৎপাত্র, দীর্ঘ অশ্মফলা, সীল, বাটখারা প্রভৃতি হরপ্পাসভ্যতার সকল লক্ষণই বিদ্যমান। বর্তমান কালের মত পূর্বেও এই স্থলে বন্যাপ্লাবনের ভয় ছিল, বন্যার চিহ্নও উৎখননে লক্ষিত হইয়াছে। লোকে বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অদগ্ধ মৃত্তিকার উচ্চ চত্বর প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গৃহাদি নির্মাণ করিত। নগরের একধারে ২১৬ মিটার লম্বা ও ৩৮ মিটার চওড়া একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ছিল। মনে হয়, একটি প্রণালী দ্বারা উহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল এবং জোয়ার-ভাঁটার সময়ে বড় বড় নৌকা পুষ্করিণীতে যাতায়াত করিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, লোথাল ছিল বহির্দেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য বন্দর।

লোথালের ধ্বংসাবশেষের অধিকাংশই প্রকৃত হরপ্পার পরিচয় দেয়, তবে নগরজীবনের শেষের দিকে অপকৃষ্ট হরপ্পাসংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। সে যুগে গৃহাদি মাটি দিয়া নির্মিত হইত, দগ্ধ বা অদগ্ধ ইষ্টকের চিহ্ন নাই। অশ্মফলাগুলি হ্রস্বতর হয় এবং সীলগুলির কলায় অবনতি ঘটে। উভয় যুগেই নগরের এক কোণে সমাধিক্ষেত্র ছিল, সেখানে নিখাতের মধ্যে মৃৎপাত্র ইত্যাদির সহিত শব প্রলম্বিতভাবে প্রোথিত হইত।

হরপ্পীয়গণ সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে গুজরাটে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রকৃত হরপ্পাসভ্যতার বসতি গুজরাটে সংখ্যায় কমই ছিল মনে হয়। কিন্তু অপকৃষ্ট হরপ্পার নিদর্শন অনেকগুলি স্থলে পাওয়া গিয়াছে— যথা, জামনগর জেলায় আম্রা, গোপ ও লাখাবাওয়ল; রাজকোট জেলায় আটকোট ও রোজডি; জুনাগড় জেলায় প্রভাসপাটন ও সোমনাথ; ব্রোচ জেলায় মেহগাম; মেহসানা জেলায় সোজানিপুর ইত্যাদি। এই স্থলগুলির মধ্যে কয়েকটি গুজরাট (ভূতপূর্ব সৌরাষ্ট্র) সরকার কর্তৃক উৎখনিত হইয়াছে। তাপ্তী নদীর মোহানায় ভগতরাও নামক স্থলে প্রকৃত হরপ্পাসভ্যতার কেন্দ্র ছিল জানা যায়। অতএব পূর্ব দিকের মত দক্ষিণ দিকেও হরপ্পাসভ্যতা সুদূরপ্রসারিত ছিল।

উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ গঙ্গা উপত্যকায়, অনেক স্থলে তামার তৈয়ারি অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাল-পরম্পরায় এই সকল আয়ুধের স্থান নিশ্চিত জানা যায় না। তবে কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে হস্তিনাপুরে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের পূর্বে যে গেরুয়া বর্ণের মৃৎপাত্র পাওয়া যায় সেই মৃৎপাত্র তাম্রাশ্মপুঞ্জের সমকালীন। হরপ্পাসভ্যতা অথবা তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সহিত ইহাদের কোনও যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে মনুষ্যাকৃতি একটি অস্ত্র এই পুঞ্জে ও রূপড়ের হরপ্পীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে।

মহীশূরে অবস্থিত ব্রহ্মগিরিতে মহাশ্মীয় সংস্কৃতির পূর্ববর্তী তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এখন পর্যন্ত রাজস্থান, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে উৎখননও হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে (যে প্রতিষ্ঠান উৎখনন করিয়াছে তাহার নাম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল): উদয়পুর জেলায় আহাড় (রাজস্থান সরকার, ডেকান কলেজ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট অ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্স্টিটিউট ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং গিলুণ্ড (ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, পরে ভা.প্র.প. রূপে উল্লিখিত); পশ্চিম নীসাড় জেলায় নর্মদাতীরস্থ মহেশ্বর ও নাওডাটোলী (ডেকান কলেজ ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়); এবং জব্বলপুর জেলায় ত্রিপুরী (সাগর বিশ্ববিদ্যালয়); উজ্জয়িনী জেলায় চম্বলতীরস্থ নাগদা (ভা.প্র.প.); ধুলিয়া জেলায় তাপ্তীতীরস্থ প্রকাশা (ভা.প্র.প.); নাসিক জেলায় গোদাবরীতীরস্থ নাসিক ও তন্নিকটবর্তী জোরওয়ে (ডেকান কলেজ); আহ্মদনগর জেলায় প্রবরাতীরস্থ নেওয়াসা (ডেকান কলেজ ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়); এবং দায়মাবাদ (ভা.প্র.প.); জলগাঁও জেলায় গিরনাতীরস্থ বহল ও ডেকওয়াডা (ভা.প্র.প.);

উৎখনন, ভারতে

এবং রায়চুর জেলায় কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার উপত্যকাস্থ মাস্কী (ভা.প্র.প.)। এ সকল স্থলে যে সুদূরবিস্তৃত প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায় তাহা যে একজাতীয় এ কথা বলা যায় না। প্রতি অঞ্চলেই স্থানীয় বিশেষত্ব সুস্পষ্ট, মৃৎপাত্রের আকৃতি ও চিত্রকলাতেও পার্থক্য বিদ্যমান। তবে জাতিগত সাদৃশ্যও উপেক্ষণীয় নয়— এই সাদৃশ্যের পরিচায়ক হইল ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, নবাশ্মীয় মার্জিত কুঠার (রাজস্থানে নাই); লোহিত মৃৎপাত্রের উপর কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রাঙ্কনের প্রথা (রাজস্থানে নাই) এবং বহু ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র। এ যুগের ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলির সহিত অন্ত্য অশ্মযুগের আয়ুধের পার্থক্য এই যে, এ যুগে পল-তোলা সমান্তরাল ধারবিশিষ্ট ফলারই প্রাধান্য, তবে এই ফলাগুলি হরপ্পীয় ফলা অপেক্ষা অনেক ছোট। মার্জিত কুঠার দক্ষিণ ভারতের নবাশ্মীয় কুঠারের সমতুল্য। মনে হয় তাম্রাশ্মীয় যুগে ক্ষুদ্রাশ্ম ও কৃষ্ণ বর্ণে লোহিত মৃৎপাত্র চিত্রিত করিবার প্রথা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল এবং নবাশ্মীয় কুঠার দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে আসিয়াছিল।

স্থূল বিচারে এই সংস্কৃতিকে এইভাবে ভাগ করা যায়: আরাবল্লীসংস্কৃতি, নর্মদাসংস্কৃতি, গোদাবরীসংস্কৃতি ও কৃষ্ণাসংস্কৃতি। মনে হয় আরাবল্লীসংস্কৃতির উৎপত্তি সর্বপ্রথম (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ), তাহার পরে নর্মদাসংস্কৃতি এবং আরও পরে গোদাবরীসংস্কৃতি। কৃষ্ণা-সংস্কৃতির উৎপত্তিকাল ব্রহ্মগিরি উৎখননের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এখন হয়ত এই মতের পরিবর্তন প্রয়োজন, তবে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে এই স্থূল সংস্কৃতি-বিভাগ ও কাল-মানে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হইবে। এ সকল সমস্যা লইয়া যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে। দ্রুতগতিতে নব নব আবিষ্কার হইতেছে, সেজন্য আজ যাহা বলা হইল কিছু দিন পরেই তাহার সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে।

বহু তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থলেই ঐতিহাসিক যুগেরও অধিবাস ছিল। উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী যুগের বহু অবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

রাজস্থান, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বাহিরে কোনও কোনও অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় নিদর্শন পাওয়া যায়। বিহারে গয়া জেলায় শোণপুর নামক স্থলে নবাশ্মীয় মার্জিত কুঠার, ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। এখানে উৎখনন করিয়াছে পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট। পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে মৃৎপাত্র পাওয়া যায় তাহা তাম্রাশ্মীয় ধরনের মনে হয়। তবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উৎখননে এই মৃৎপাত্রের সহিত সম্ভবতঃ লৌহ পাওয়া গিয়াছে, অতএব এই স্থল প্রকৃত তাম্রাশ্মীয় নাও হইতে পারে। ছোটনাগপুরের নানা স্থলে নবাশ্মীয় কুঠার, ক্ষুদ্রাশ্ম ও তাম্রনির্মিত আয়ুধ পাওয়া যায়। এই সকলই তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির উপকরণ, কিন্তু রীতিমত উৎখনন না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে এই প্রত্নবস্তুগুলির সংস্কৃতি নির্ণয় সম্ভব নয়।

গত ১৫ বৎসরে অশ্মযুগীয় হরপ্পা ও তাম্রাশ্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই সময়ে ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্বও উপেক্ষিত হয় নাই। বরঞ্চ বহুবিধ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হস্তিনাপুর ও রূপড়ে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রসংস্কৃতির পরে এবং মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির পরে বহু স্থলেই ঐতিহাসিক যুগের অধিবাস দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছিল। মোটামুটি বলা যায় যে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে দেখা যায় লৌহ ও উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের ব্যবহার। এই মৃৎপাত্র পশ্চিম-উত্তরে তক্ষশিলা হইতে দক্ষিণ-পূর্বে অমরাবতী পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে মধ্য গঙ্গা উপত্যকায় ইহার উৎপত্তি, কিছুদিন পরে ইহার বিস্তৃতি হয়ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে জড়িত।

মধ্য প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে শিপ্রাতীরে অবস্থিত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক উৎখননের ফলে উচ্চ প্রতিরক্ষা-প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের স্তরবিন্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা যায়, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দে নগরপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীর নির্মিত হয়। ঐ সময়ে লৌহ ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র এবং কিছু পরে উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। মধ্য যুগ পর্যন্ত নগরে লোকের বাস ছিল।

উত্তর প্রদেশে দেরাদুন জেলায় জগৎগ্রাম নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের কয়েকটি ইষ্টক-নির্মিত অশ্বমেধচৈত্য উৎখনন করে। বহু ইষ্টকে লিখিত আছে যে শীলবর্মা নামক নৃপতি চারটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ জেলায় যমুনাতটে অবস্থিত কৌশাম্বীতে উৎখনন করিতেছে। নগরের পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের কিয়দংশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা যায় যে ইহার বহির্গাত্রে দগ্ধ ইষ্টকের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর ছিল। নগরের এক কোণে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান

পাওয়া যায়। ঐ স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি লেখ হইতে জানা যায় যে উহাই প্রাচীন ঘোষিতাবাস, যেখানে বুদ্ধ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। নগরের অন্য নানা স্থলেও উৎখনন হইয়াছে। সম্ভবতঃ নগরের পত্তন হয় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে এবং গুপ্তযুগের পর নগরটি পরিত্যক্ত হয়। পূর্বোল্লিখিত শ্রাবস্তীনগরের ধ্বংসাবশেষে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের উৎখননে জানা যায় যে, ঐ স্থলে বসতি আরম্ভ হওয়ার কিছু পরেই উহার প্রতিরক্ষা-প্রাচীর নির্মিত হয়। এখানে নিম্নতম স্তরে অল্প পরিমাণে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ও তাহার পর উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্র। নগরটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত অধ্যুষিত ছিল, পরে মধ্য যুগে পুনরায় কিছু বসতি আরম্ভ হয়। প্রাচীন বারাণসী নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান নগরের পাশেই রাজঘাট নামক স্থলে দেখা যায়। এখানে উৎখনন করিতেছে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। নদীতীরবর্তী প্রাচীর সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্র প্রচলনের কিছু পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল, কারণ ইহার অধোভাগে কিয়ৎ পরিমাণ কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র পাওয়া যায়, তাহার উপর পাওয়া যায় প্রথমোক্ত মৃৎপাত্র। নগরে তৃতীয়-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত আবাদ ছিল। অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে মৃন্ময় মূর্তি ও সীল প্রচুর পাওয়া যায়।

পাটনার নিকটে মৌর্যযুগের একটি হলঘর আবিষ্কারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট দ্বারা এই স্থলটি পুনর্বার উৎখনিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, যে প্রস্তরস্তম্ভগুলির উপর হলঘরটি নির্মিত হইয়াছিল সে স্তম্ভগুলি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই (পূর্বে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল), সেগুলি পরবর্তী যুগে ইচ্ছা করিয়া ভাঙা হয়। হলঘরের আশেপাশে মৌর্যযুগের আর কোনও অবশেষ পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে এখানে বসতি আরম্ভ হয় এবং ছয়-সাত শত বৎসর চলে। মৌর্যযুগের নিদর্শন পাওয়া যায় বর্তমান পাটনা সিটির বহু স্থলে। উত্তর বিহারে মজফ্‌ফরপুর জেলায় অবস্থিত বৈশালী (বর্তমান নাম বসাঢ়) নগরে উৎখনন করে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বৈশালী সংঘ এবং পরে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট। নগরের মধ্যে প্রাপ্ত গৃহাদি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুর কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত। নগরের বাহিরে কিছু দূরে একটি স্তূপ উৎখনিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় স্তূপটি মৃত্তিকানির্মিত ছিল। উৎখনক অনুমান করেন যে বুদ্ধপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে লিচ্ছবিগণ বুদ্ধধাতুর উপর যে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে ইহাই সেই স্তূপ। পরে এই স্তূপের তিন বার জীর্ণোদ্ধার হয়।

পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত তমলুকে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ উৎখনন করে। তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি, ইহা পুরাকালে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে এখানে অজস্র পুকুর কাটিবার ফলে প্রাচীন স্তরবিন্যাস প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উৎখননে বহু মাটির মূর্তি পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর ধরিয়া চব্বিশ পরগনায় অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখনন করিতেছে। আনুমানিক গুপ্তযুগের একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী যুগের অনেক মৃন্ময় মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া যাইতেছে। ঐ জেলার হরিনারায়ণপুর ও অন্যান্য স্থল হইতে অনুরূপ অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তবে কোনও উৎখনন হয় নাই।

ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী শিশুপালগড়ে ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত জৌগড়াতে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ উৎখনন করিয়াছে। শিশুপালগড়ে প্রতিরক্ষা-প্রাচীরের আসন চতুষ্কোণ, প্রতি দিকে দুইটি করিয়া প্রবেশদ্বার ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মাটি, উভয় গাত্রে দগ্ধ ইষ্টক দ্বারা সুরক্ষিত। পশ্চিম দিকের একটি প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ উৎখনিত হয় এবং তাহাতে অনুমিত হয় যে নগর-রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নগরের মধ্যেকার সন্নিবেশ রীতিবদ্ধ ছিল। অধস্তন ভাগে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র ও মধ্য ভাগে রুলেটযুক্ত মৃৎপাত্র। শেষোক্ত মৃৎপাত্র আরিকমেডুতে পাওয়া যায়, সেখানে ইহার কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক। উপরিভাগে পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে মনে হয় যে নগরের আয়ুষ্কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। জৌগড়ার ইতিবৃত্তও অনুরূপ, তবে এখানকার প্রতিরক্ষা-প্রাচীর সম্পূর্ণ কাঁচা ছিল। উৎখননে প্রাকৃতিক ভূমির উপরেই একটি নবাশ্মীয় কুঠার পাওয়া যায় এবং আরও কয়েকটি কুঠার পাওয়া যায় বর্তমান ভূমিপৃষ্ঠে। অতএব হয়ত এখানে নগরপত্তনের পূর্বে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি বসতি ছিল।

কটক জেলায় তিনটি অনুচ্চ পাহাড় আছে : ললিতগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরি। রত্নগিরির ধ্বংসাবশেষের উৎখনন করিয়াছে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, তাহার ফলে একটি স্তূপ, দুইটি বিহার ও ছোট ছোট অনেক স্তূপ, মন্দির ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তূপটির আসন বহুকোণ-

সমন্বিত, দেখিতে মনোরম। তাহার চারি ধারে বহুতর প্রস্তর ও ইষ্টকের স্তূপ সমাবেশ দেখা যায়। বিহার দুইটির মধ্যে একটির প্রস্তরনির্মিত প্রবেশদ্বারের কারুকার্য অতি সুন্দর। উৎখননে প্রস্তর ও কাংস্যের তৈয়ারি অনেক বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি এবং অন্যান্য বস্তু পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি সীলের উপর রত্নগিরি মহাবিহারের নাম আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে পূর্বেও এই স্থলের নাম রত্নগিরি ছিল। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত মহাযান-বজ্রযানের কেন্দ্র ছিল।

পশ্চিম ভারতে সম্প্রতি উৎখনিত স্থলগুলির মধ্যে সাবরকাঠা জেলায় অবস্থিত দেওনীমোরী উল্লেখযোগ্য। এখানে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে ক্ষত্রপদের রাজত্বকালে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তাহার ধ্বংসাবশেষ উৎখনন করিতেছে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান স্তূপের আসনের বহির্ভাগে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ কুলুঙ্গিতে পোড়ামাটির তৈয়ারি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্তিকলায় গান্ধারশৈলীর কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনে হয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল।

রাজস্থানে গঙ্গানগর জেলায় অবস্থিত রংমহল নামক স্থল পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে উৎখনন করে সুইডেনের একটি দল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত রংমহলসংস্কৃতির মৃৎপাত্র-পারম্পর্য উৎখননে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ ভারতে মহাশ্মীয় সমাধির প্রথম রীতিমত উৎখনন হয় ব্রহ্মগিরিতে এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার পর আরও অনেক স্থলে এইজাতীয় সমাধি উৎখনিত হইয়াছে এবং প্রত্নতত্ত্বীয় পর্যবেক্ষণের ফলে ইহাদের সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক চিঙ্গলপট জেলায় সানুর, অমির্থমঙ্গলম ও কুনতুরে উৎখনন উল্লেখযোগ্য। সমাধিগুলির আকৃতি স্থান-বিশেষে বহুবিধ। কোথাও ভূমি উৎখনন করিয়া নিখাতের মধ্যে প্রস্তরকক্ষ নির্মিত হইত। কক্ষনির্মাণে প্রস্তরখণ্ড অথবা দণ্ডায়মান শিলাপট্ট ব্যবহৃত হইত। কোথাও কোথাও একটি শিলাপট্টে (সাধারণতঃ পূর্ব দিকের) একটি বড় গর্ত থাকিত, বোধ হয় লোকের বিশ্বাস ছিল যে গর্ত দিয়া মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যাতায়াত করে। কক্ষটি এক বা একাধিক শিলাপট্ট দ্বারা আচ্ছাদিত হইত এবং চারি-দিকে প্রস্তরখণ্ড বৃত্তাকারে স্থাপিত হইত। কোথাও বা শব-নিখাতে কক্ষ নির্মাণ না করিয়া নিখাতে মৃত্তিকা ভরাট করিয়া তাহার উপর ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ রচিত হইত। কেরল অঞ্চলে নরম মাকড়া পাথর (ল্যাটেরাইট) কাটিয়া ভূগর্ভস্থ একটি বা একাধিক কক্ষ নির্মিত হইত। কোথাও বা কক্ষ নির্মাণ না করিয়া নিখাতের মধ্যে কুম্ভসমাধি হইত। আকৃতিভেদ সত্ত্বেও মহাশ্মীয় সমাধিগুলির সম-সংস্কৃতিজ্ঞাপক বহু লক্ষণ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আংশিক সমাধি, অর্থাৎ মৃতদেহ বাহিরে ফেলিয়া রাখিবার পর কয়েকটি অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া প্রোথিত হইত। সঙ্গে রাখা হইত মৃৎপাত্র (এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্র ছিল সাধারণতঃ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের) ও লৌহনির্মিত আয়ুধাদি। ব্রহ্মগিরির উৎখননে অনুমিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাশ্মীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। নিশ্চিত প্রমাণ না থাকিলেও এখন মনে হইতেছে যে উহার উদ্ভব প্রাচীনতর হইতেও পারে। মহাশ্মীয় সমাধি ইওরোপ ও আফ্রিকায় দৃষ্ট হয়, আকৃতিগত সাম্যও যথেষ্ট। কিন্তু কালক্রমগত পার্থক্য অত্যধিক, কারণ দক্ষিণভারতীয় মহাশ্মীয় সংস্কৃতি পুরা-মাত্রায় লৌহযুগের, অন্যত্র সেগুলি অনেক প্রাচীনতর।

সম্প্রতি নাগপুরের নিকটবর্তী জুনাপানি নামক স্থলে কয়েকটি মহাশ্মীয় সমাধি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্তৃক উৎ-খনিত হইয়াছে। সেগুলি যে দক্ষিণভারতীয় মহাশ্মীয় সমাধিগুলির সমগোত্রীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্ধ্র প্রদেশে গুণ্টুর জেলায় কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী নাগার্জুনকোণ্ডার বৌদ্ধ অবশেষের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই স্থল হইতে ১০ কিলোমিটার দূরে নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হইবে এবং তাহার ফলে নাগার্জুনকোণ্ডা উপত্যকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইবে— এইরূপ স্থির হওয়ায় ১৯৫৪ হইতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এখানে ব্যাপকভাবে উৎখনন করে। তাহাতে জানা যায় যে বৌদ্ধ অবশেষ ছাড়াও নাগার্জুনকোণ্ডার প্রত্নসম্পদ প্রচুর। এই উপত্যকায় প্রত্নাশ্মীয়, ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের বহু আয়ুধ পাওয়া যায়। অনেকগুলি নবাশ্মীয় শব-নিখাতও দৃষ্ট হয়। তাহার পর আসে মহাশ্মীয় সমাধি। পূর্বে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত আরও অনেক স্তূপ, বিহার ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়। সবগুলিই খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের ইক্ষ্বাকু-রাজগণের সমকালীন, যদিও তাহার পূর্বে সাতবাহন রাজত্বের শেষকালেও এখানে বৌদ্ধ বসতি ছিল তাহার প্রমাণ আছে। ইক্ষ্বাকুযুগে এখানে ব্রাহ্মণ্য মন্দিরও নির্মিত হয়। আরও ছিল প্রতিরক্ষা-প্রাচীর-বেষ্টিত ইক্ষ্বাকুদের দুর্গিকা। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি রঙ্গভূমি

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য . রঙ্গভূমিতে সামান্য শব্দও পাহাড় হইতে প্রতিধ্বনিত হইত। নাগার্জুনকোণ্ডার মত প্রত্ন-সম্ভারপূর্ণ স্থল অচিরে প্লাবিত হইয়া যাইবে ইহা আক্ষেপের কথা সন্দেহ নাই। তবে সান্ত্বনা এই যে, উৎখননদ্বারা উপত্যকার প্রায় সকল প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং আগামী বন্যা হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকীর্তি (উপরি-উক্ত রঙ্গভূমিসহ) অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর পুনর্নির্মিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রত্নকীর্তিরও স্বল্পাকার প্রতিকৃতি প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি ও উৎখনিত সকল প্রত্নবস্তু পাহাড়ের উপর সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হইবে। কৃষ্ণানদীর অপর পারে এলেশ্বরম নামক স্থলেও মহাশ্মীয় ইক্ষ্বাকু ও তৎপরবর্তী কালের বহু কীর্তি আছে। সেগুলি অন্ধ্র প্রদেশ সরকার দ্বারা উৎখনিত হইতেছে, কারণ এলেশ্বরম ও তন্নিকটবর্তী স্থানও জলমগ্ন হইয়া যাইবে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের শতবার্ষিক উৎসবে এশিয়ার প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এইরূপ সম্মেলন পৃথিবীতে এই প্রথম ; ইহার সমধিক গুরুত্ব আছে, কারণ ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এখন এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে যে এশিয়ার বিরাট প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমিকায় ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবার যুগ আর নাই। প্রত্নাশ্মীয়, নবাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয়, মহাশ্মীয়, ঐতিহাসিক— সকল প্রাচীন সংস্কৃতিই কোনও না কোনও প্রকারে বহির্ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই সংসর্গগুলি অবহেলা করিলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে।

ভারতের বাহিরে ভারত হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান বিশেষ হয় নাই। এই শতকের প্রথম ভাগে তিন বার (১৯০০-০১, ১৯০৬-০৮ ও ১৯১৩-১৬ খ্রী) আউরেল স্টাইন মধ্য এশিয়ায় ও চীন দেশের পশ্চিম প্রান্তে অনুসন্ধান-যাত্রা করেন। তাহাতে বহু সংস্কৃতির মিশ্রণস্থল এই ভূভাগের সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। আউরেল স্টাইন প্রচুর প্রত্নবস্তু-সম্ভার ভারতে আনেন, তাহার মধ্যে বহু লিপিতে লিখিত পুথি ও প্রাচীরচিত্র প্রসিদ্ধ।

আউরেল স্টাইনের শেষ অভিযানের বহু বৎসর পরে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ উৎখননের জন্য দুইটি অভিযান বাহিরে পাঠায়। একটি মিশর দেশে, অন্যটি নেপালে। আস্যুয়ান নামক স্থানের নিকট নীল নদের উপর অত্যুচ্চ বাঁধ নির্মিত হইবে, তাহার ফলে দক্ষিণ মিশরের নুবিয়া প্রদেশে বহুসহস্র বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী ভূমি এবং তাহার সহিত অনেক প্রত্নকীর্তি ও প্রত্নস্থল জলমগ্ন হইবে। সেজন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইউনেস্কো এই প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিকে আহ্বান করে। এই আহ্বানের ফলে ভারত হইতে অভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত অভিযান একটি বসতি ও একটি সমাধিক্ষেত্র উৎখনন করে। স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় প্রথমটি 'গ্রুপ এ' ও দ্বিতীয়টি 'গ্রুপ সি' শ্রেণীর লোকেদের, আনুমানিক কাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ ও ২০০০ অব্দ। উভয়ই প্রাক্-লৌহ যুগের। সমাধিক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৃতদেহকে চর্মাবৃত করিয়া মৃৎপাত্র (কৃষ্ণ-লোহিত), পুঁতি, চামড়ার পোশাক ইত্যাদির সহিত শব-নিখাতে রক্ষা করিয়া নিখাতের মুখ প্রস্তরখণ্ড দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়া হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কতকগুলি মৃৎপাত্রের আকৃতি দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের আকৃতি হইতে অভিন্ন। তবে সংস্কৃতিদ্বয়ের কাল ও দূরত্বে ব্যবধান এত অধিক যে এই আপাত সমতার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃতিগত ঐক্যের সিদ্ধান্ত এখন যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু এই প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় সংস্কৃতির উদ্ভবের ভবিষ্যৎ বিচারে অগ্রাহ্য করা চলিবে না। অভিযানের কৃতিত্বের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে ইহার অনুসন্ধানে অশ্মযুগীয় বহু আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। এতৎপূর্বে এই অঞ্চলে এই জাতীয় আয়ুধ দৃষ্ট হয় নাই।

নেপালে ভারতীয় সাহায্য মিশনের অনুরোধে দ্বিতীয় অভিযানটি নেপালে যায়। উদ্দেশ্য ছিল নেপাল-তরাইয়ের মধ্য ভাগে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং দুই-একটি উপযুক্ত স্থলে উৎখনন। উভয় উদ্দেশ্যই সফল হয়। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীকে কেন্দ্র করিয়া ভৈরাহাওয়া ও তৌলিহাওয়া জেলায় অনুসন্ধানে বহু প্রত্নস্থল লক্ষিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। উৎখনন হয় দুইটি স্থলে— তিলৌরা-কোট ও কুদান— উভয়ই তৌলিহাওয়া জেলার অন্তর্গত। নেপালে আধুনিক পদ্ধতিতে এই প্রথম উৎখনন হইল। তিলৌরাকোট মৃৎপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, অনেক পরে উহার উপর প্রস্তরপ্রাচীর নির্মিত হয়। নগরে বসতি আরম্ভ হয় মোটামুটি উত্তরভারতীয় কৃষ্ণ-মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে সঙ্গে। মৃৎপ্রাচীরও প্রায় ঐ সময়ে নির্মিত হয়। নগরে বসতি ছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। তাহার পর বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, মধ্য যুগে কিয়দংশ পুনরধ্যুষিত হয়। উৎখননে বহু পুঁতি, মাটির মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। তিলৌরাকোটে শাক্য-

জাতির রাজধানী কপিলবস্তুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় এই মত পূর্বে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উৎখননে এই মত সপ্রমাণ বা অপ্রমাণিত হয় নাই। কুদানে আদি ও মধ্য যুগের দুইটি বিশাল ইষ্টকনির্মিত মন্দির আবিষ্কৃত হয়। একটিতে আসনের মধ্যে মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ দেখা যায় এবং সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গর্ভগৃহে পৌছিবার বন্দোবস্ত ছিল। মন্দিরের বহির্গাত্রের প্রাচীরের ইষ্টকে বহু কারুকার্য ছিল। সম্পূর্ণ অবস্থায় মন্দিরটি অতিশয় মনোরম ছিল সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়টির অধোভাগের চতুর্দিকে রাশীকৃত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত ছিল, মৃত্তিকারাশির ঢাল দিয়া মন্দিরচত্বরে উঠিতে হইত।

এইরূপে ভারতের বাহিরেও যে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সমাদর হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' দ্র।

অমলানন্দ ঘোষ

উৎপল বংশ নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে কার্কোট বংশের পতনের পর কাশ্মীরে উৎপল নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন অবন্তীবর্মা (রাজ্যকাল ৮৫৫-৮৩ খ্রী)। প্রজাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মহাপদ্ম হ্রদের জল স্ফীত হইয়া যে বন্যার সৃষ্টি করিত, তাহা নিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তিনি তাঁহার মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বন্যানিরোধের ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে বহু জমি চাষোপযোগী করা সম্ভব হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রজাহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার সাহায্য ও আনুকূল্য লাভ করেন।

অবন্তীবর্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শংকরবর্মা (রাজ্যকাল ৮৮৩-৯০২ খ্রী) রাজ্যবিস্তারের দ্বারা কাশ্মীরের পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কনৌজরাজ ভোজ এবং সমসাময়িক শাহীরাজ্যের অধিপতির সহিত তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিগর্ত (বর্তমান কাংড়া) রাজ্যের রাজা বিনা বাধায় শংকরবর্মার আধিপত্য মানিয়া লন। গুর্জর দেশের (পাঞ্জাবের অন্তর্গত বর্তমান গুজরাট) রাজাকে শংকরবর্মা চেনাব নদীর পূর্বতীরবর্তী একটি অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। প্রতিহারনৃপতি মহেন্দ্রপালও পাঞ্জাবে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চল শংকরবর্মার হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী হইলেও শংকরবর্মা শাসক হিসাবে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি প্রজাদের উপর অকারণ অত্যাচার করিতেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

তাঁহার মৃত্যুর পর কাশ্মীর রাজ্যে আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তন্ত্রী নামক সৈন্যদলই ক্রমে রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া ওঠে এবং কিছুকাল পরে যশস্কর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় (৯৩৯ খ্রী)।

বিজনকান্তি বিশ্বাস

উত্তঙ্ক গুরুভক্ত শিষ্য। সাধারণতঃ উতঙ্ক নামে পরিচিত। গুরুগৃহত্যাগের সময়ে উত্তঙ্ক উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে গুরুপত্নী বলেন যে তিনি রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া পত্নীর কুণ্ডল দুইটি আকাঙ্ক্ষা করেন। উত্তঙ্ক সেই কুণ্ডল দুইটি সংগ্রহ করিয়া যখন আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন ছদ্মবেশী তক্ষক কর্তৃক উহা অপহৃত হয়। নাগ-লোকে গমন করিয়া উত্তঙ্ক উহা পুনরায় সংগ্রহ করেন এবং গুরুপত্নীকে দান করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলে তিনি হস্তিনাপুরে জনমেজয় রাজার নিকটে যান। তক্ষকের প্রতি আক্রোশবশতঃ উত্তঙ্ক জনমেজয়কে তাঁহার পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তর আমেরিকা ৫০° পশ্চিম হইতে ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং ১০° উত্তর হইতে ৭০° উত্তর অক্ষ-রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির আয়তন ২৪৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৯৪ লক্ষ বর্গ মাইল)। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে উত্তর মহাসাগর ও পূর্বে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর ও তাহাদের বিভিন্ন উপসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই মহাদেশটি দক্ষিণে পানামা যোজক দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সহিত যুক্ত।

মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশটি ভূগোলবিদ্গণের নিকট লরেন্সীয় অঞ্চল নামে পরিচিত; ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ডের অংশ। ইহা কখনও সমুদ্রনিমগ্ন হয় নাই। প্রাচীনতম কেলাসিত আগ্নেয় শিলার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলটি নানা প্রকার খনিজ সম্পদে পূর্ণ। ইহা উত্তরে হাডসন উপসাগরের দিকে ঢালু। বহুযুগব্যাপী ক্ষয়ীভবনের ফলে সমগ্র অঞ্চলটি ঈষৎ ঢেউ খেলানো। নিম্ন ভূমিতে

পরিণত হইয়াছে। প্লাইস্টোসিন যুগের হিমবাহ দ্বারা বহু সুপেয় হ্রদের সৃষ্টি হয়, তাহাদের মধ্যে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরি ও অণ্টারিও এবং ক্যানাডায় গ্রেট বেয়ার, গ্রেট স্লেভ, আথাবাস্কা, রেন ডিয়ার, উইনিপেগ, চার্চিল ও স্যাস্ক্যাচেওয়ন উল্লেখযোগ্য।

লরেন্সীয় অঞ্চলের দক্ষিণে ভূপ্রকৃতি মূলতঃ দ্রাঘিমাঙ্গ। পূর্বে আপালাচিয়ার পার্বত্যভূমি ও পশ্চিমে রকি পার্বত্যভূমির মধ্যে মিসিসিপি নদীর উপত্যকা অবস্থিত।

আপালাচিয়া ইওরোপের হার্সিনিয়ান ভঙ্গিল পর্বতের সমসাময়িক। পূর্বে ও পশ্চিমে মালভূমির দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলের মধ্য ভাগে প্রকৃত ভঙ্গিল পর্বত দেখা যায়। পূর্বের পিড্‌মণ্ট মালভূমি প্রাক্‌-আপালাচীয় আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার দ্বারা গঠিত। পিড্‌মণ্ট মালভূমির পূর্বপ্রান্তে চ্যুতি থাকার জন্য অ্যাটল্যাণ্টিক সমভূমি অভিমুখী প্রত্যেক নদীতেই জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ নদীগুলির মধ্যে হাডসন, মোহাক, কনেক্টিকাট, পোটোম্যাক, সাস্কেহানা ও ডেলাওয়ার প্রধান। পশ্চিমের কাম্বারল্যাণ্ড মালভূমি মূলতঃ স্তরীভূত পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত। মধ্যের ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চল কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। সমগ্র অঞ্চলের কোনও অংশই ২১৩৫ মিটার (৭০০০ ফুট) অধিক উচ্চ না হইলেও ভূপ্রকৃতি বন্ধুর বলিয়া স্থলপথে পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

রকি পার্বত্যভূমির উদ্ভব টার্সিয়ারি যুগে। বিস্তৃতি ও উচ্চতায় ইহার নিকট আপালাচিয়া নগণ্য। উচ্চ মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইটি বিচ্ছিন্ন গিরিশ্রেণীর দ্বারা গঠিত এই ভূভাগ উত্তরে আলাস্কা হইতে দক্ষিণে টেওয়ানটেপেক যোজক পর্যন্ত বিস্তৃত। ৪০° উত্তর অক্ষরেখা অঞ্চলে ইহার সর্বাধিক বিস্তার প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার (১০০০ মাইল)। পূর্বের গিরিমালা রকি নামে এবং পশ্চিমের গিরিশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে কোস্ট রেঞ্জ, কাসকেড, সিয়েরা নেভাডা ও সিয়েরা মাদ্রে নামে পরিচিত। মধ্যবর্তী মালভূমিসদৃশ ভূভাগ প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে কলম্বিয়ার লাভা-আবৃত মালভূমি, গ্রেট বেসিনের অন্তর্দেশীয় জলনিকাশযুক্ত মালভূমি, কলোরাডোর নদীখাতপূর্ণ মালভূমি এবং মেক্সিকোর শুষ্ক মালভূমি উল্লেখযোগ্য। ইউকন, স্কিনা, স্নেক, কলম্বিয়া, ফ্রেজার, কলোরাডো প্রভৃতি নদীগুলি মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া উপকূলস্থ গিরিশিরা ভেদ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হইতেছে। ক্রম-উন্নীয়মান উপকূলীয় গিরিমালার সহিত নিজস্ব গতিবেগ ও গতিপথ বজায় রাখিবার প্রচেষ্টায় নদীগুলি বহু খাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলোরাডো নদীখাত জগদ্বিখ্যাত। রকি পার্বত্যভূমির পূর্ব দিকে উদ্ভূত নদীগুলির মধ্যে ম্যাকেন্‌জি, স্যাস্ক্যাচেওয়ন, মিসৌরী, প্ল্যাট, আর্‌কান্‌সাস ও রিওগ্র্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য।

রকি পার্বত্যভূমি হইতে উদ্ভূত মিসৌরী, প্ল্যাট, রেড, আর্‌কান্‌সাস এবং কাম্বারল্যাণ্ড মালভূমি হইতে উৎপন্ন ওহাইও ও টেনেসি প্রভৃতি উপনদীসহ মিসিসিপি নদী-বিধৌত অঞ্চলটি মহাদেশীয় সমভূমি নামে পরিচিত। দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্তরে লরেন্সীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ড টার্সিয়ারি যুগের পূর্বে সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। প্রাচীন শিলাগঠিত ওর্জাক ও ওয়াচিতার উচ্চভূমি ভিন্ন সমগ্র সমতল ভূমিটি বৈচিত্র্যহীন ও পলল দ্বারা গঠিত। গত শতাব্দীতে অবাধে বনভূমি ধ্বংসের জন্য ও গ্রীষ্মকালে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে প্রতিটি নদীখাতে ক্রমাগত পলি জমিয়া নদীগর্ভ উঁচু হইয়া ওঠে। ইহার ফলে ঐ নদীগুলিতে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয় এবং বদ্বীপ অঞ্চলের আয়তনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

ভূপ্রকৃতি দ্রাঘিমাঙ্গ হইবার ফলে সুমেরু অঞ্চলের শীতল বায়ু এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু বহুদূর পর্যন্ত দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু সু-উচ্চ রকি পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভাব উপকূলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অ্যাটল্যাণ্টিকের প্রভাব দেশাভ্যন্তরে অধিকতর অনুভূত হয়। জলবায়ুর হিসাবে মহাদেশটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। মোটামুটি ৩০° উত্তর অক্ষরেখার দক্ষিণাঞ্চলে ক্রান্তীয় উষ্ণ জলবায়ু। ৫৫°-৬০° উত্তর অক্ষরেখার উত্তরে মেরুপ্রভাবে শীতল জলবায়ু। পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভাবে সমভাবাপন্ন জলবায়ু। পূর্ব ভাগে অ্যাটল্যাণ্টিকের প্রভাবে আর্দ্র জলবায়ু এবং মহাদেশের মধ্য ভাগে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলের উত্তর ভাগে ৪৫ উত্তর অক্ষরেখার উত্তরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় কালেই বৃষ্টিপাত হয় এবং ঐ অঞ্চল রেড উড, ডগলাস ফার জাতীয় সরলবর্গীয় বৃক্ষে আচ্ছাদিত। ৪৫° উত্তর ও ৩০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শুধু শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। খর্বাকৃতি ওক ও চেরি গাছ এবং বাঞ্চ ঘাস এই স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। রকি মালভূমি অঞ্চলের উত্তর ভাগে তুন্দ্রা অঞ্চলের

উদ্ভিদ বিদ্যমান, দক্ষিণ ভাগ মরুভূমিতুল্য এবং মধ্য ভাগে কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। রকি পর্বতের পশ্চিম ঢালে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে দীর্ঘাকৃতি পাইন এবং পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাতের অল্পতায় খর্বাকৃতি পাইন ও জুনিপার বন দেখা যায়। অ্যাটল্যান্টিক অঞ্চলে বৎসরের সকল সময়েই বৃষ্টিপাত হয় এবং ওক, বীচ, অ্যাশ, এল্‌ম ও আখরোট জাতীয় বৃক্ষাদির গভীর বন আছে। এই অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে প্রবল তুষারপাত হয় বলিয়া বনভূমির পরিমাণ কম এবং দক্ষিণ প্রান্তে উত্তাপের প্রাচুর্যে ইয়েলো পাইন ও সাইপ্রেস অধিক সংখ্যায় জন্মে। মহাদেশের মধ্য ভাগে শীতকালে মেরুদেশীয় বায়ুর প্রভাবে প্রবল শৈত্য ও গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ক্রান্তীয় বায়ুর প্রভাবে প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হয়। রকি পর্বতের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত মূলতঃ অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলিয়া উহার পরিমাণ পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ কমিয়া যায়। মিসিসিপি উপত্যকার পূর্ব ভাগে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের জন্য বনভূমি ও পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাতের অল্পতার ফলে বিস্তৃত তৃণভূমি (প্রেইরি) লক্ষিত হয়। মহাদেশের সর্বোত্তর প্রান্তে তুন্দ্রাজাতীয় উদ্ভিদ এবং তাহার দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সরলবর্গীয় বনভূমি দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই অধিক। কিন্তু ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের জন্য সাগর-উপসাগর-পরিবৃত ঐ সংকীর্ণ অঞ্চলে নানা প্রকার জলবায়ু ও উদ্ভিদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে মৌসুমী জলবায়ু ও ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বন বিদ্যমান। অ্যাটল্যান্টিকপ্রান্তে বৎসরের সকল সময়েই বৃষ্টিপাত হয়। তাই এই অঞ্চল দীর্ঘাকৃতি ক্রান্তীয় বৃক্ষে পূর্ণ। পার্বত্য বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে— অর্থাৎ মেক্সিকোর মালভূমিতে— কাঁটা-ঝোপের বন জন্মায়। এই অঞ্চলের উত্তর ভাগের জলবায়ু মরুভূমিতুল্য এবং সেখানে নানা প্রকার ঘাস জন্মিয়া থাকে।

এই মহাদেশে প্রথম জনবসতির কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। ইওরোপ মহাদেশ হইতে সর্বপ্রথম ভাইকিং-গণ দশম শতকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ল্যাব্রাডর ও গ্রীনল্যাণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু তাহাদেরও পূর্বে আমেরিকা মহাদেশে জনবসতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ প্লাইস্টোসিন যুগে স্থলভাগে অত্যধিক তুষারসঞ্চয়ের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের অবনতি ঘটে। উহার ফলে বেরিং প্রণালী জলমুক্ত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ সেইজন্য এশিয়া মহাদেশ হইতে এখানে জনাগম হইতে থাকে। কিন্তু এই মতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিবার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। আমেরিকায় উপনীত হইয়া কলম্বাস ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি ভারতেই পৌছিয়াছেন। কলম্বাসের এই ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে এখানকার উপজাতিরা ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। আধুনিক কালে ইহাদের আমেরিণ্ডিয়ান বলা হয়। আমেরিণ্ডিয়ানদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সর্ব উত্তরে এস্কিমোরা শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সুমেরু-বৃত্তের নিকট অবস্থানের ফলে এখানে শীত প্রবল, বৎসরে প্রায় ছয়মাস সূর্য ওঠে না এবং গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া বিস্তৃত জলাভূমি সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার ফলে এখানে কৃষিকার্য সম্ভব নয়। সমুদ্রে সীল ও তিমি এবং স্থলে বল্‌গা হরিণ এই অঞ্চলের প্রধান শিকার। শিকারের তাগিদে অনবরত স্থান পরিবর্তন করিতে হয় বলিয়া স্থায়ী জনবসতি গড়িয়া ওঠে নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে— বিশেষতঃ ৪০° উত্তর হইতে ৬০° উত্তর অক্ষরেখা অঞ্চলে— নূটকা, কোয়াকুটুল প্রভৃতি উপজাতি প্রধানতঃ মাছ ধরিয়া জীবনধারণ করিত। ইহারাও খাদ্য উৎপাদন করে না। স্ত্রীলোকগণ বনভূমি হইতে নানা প্রকার ফলমূল ও বীজ জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করিত। হাইদা উপজাতির মধ্যে তামাকের চাষ প্রচলিত ছিল। ৎলিংগিটগণ (Tlingit) পশমের কম্বল ও তামার পাত্র গড়িতে পারিত। রকি পর্বত অঞ্চলের পূর্ব ঢালে ও মিসিসিপি উপত্যকার তৃণাচ্ছাদিত পশ্চিম ভাগে বহু উপজাতি বসবাস করিত। তাহারা শিকার ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহের উপর বেশি নির্ভর করিত। এই সকল উপজাতিদের মধ্যে ক্যানাডা অঞ্চলে কারিবু হরিণ ও অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ অঞ্চলে বাইসন শিকার প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও অঞ্চলে তামাকের চাষ হইত। কৃষিজীবী আমেরিণ্ডিয়ানরা প্রধানতঃ মিসিসিপি উপত্যকার পূর্বভাগে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বসবাস করিত। তাহাদের মধ্যে অ্যাল্‌গন্‌কুইন, ওজিবাওয়া, ইরোকুয়ো, আপাচি প্রভৃতি উপজাতি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ভুট্টা, ধান, আলু ও তামাকের চাষ করিত। পশ্চিমের তৃণভূমি ও পূর্বের বনভূমি অঞ্চলের প্রান্তদেশে অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ (হুরন, মোহাক, সিওস, হিদাৎসা প্রভৃতি) গ্রীষ্মকালে কৃষিকার্য এবং শীতকালে শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। কৃষিকার্যের ভার প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত ছিল। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ভুট্টা, শিম ও তামাক প্রধান। সব উপজাতিই শীতকালে বাইসন শিকারের জন্য যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। শুষ্ক রকি পর্বত অঞ্চলে হোপি, য়ুমা, পাইউট প্রভৃতি উপজাতিগণ কৃষিকার্য না জানিলেও

জলসেচের ব্যবহার জানিত। তাহারা ছোট নদীতে বাঁধ দিয়া বন্য ঘাসের স্বাভাবিক উৎপাদন বাড়াইত এবং উহার বীজ সংগ্রহ করিত। স্ত্রীলোকগণ নানা প্রকার ফল, শিকড় ও বাদাম সংগ্রহ করিত। শীতকালে শিকার প্রধান উপজীবিকা ছিল।

মেক্সিকো অঞ্চলে আসতেক (অ্যাজটেক), টোলটেক ও মায়া উপজাতি বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য করিত। শাবল ও কোদালের ব্যবহার এবং সেচের সাহায্যে ইহারা সভ্যতার উচ্চ স্তরে পৌছাইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা রৌদ্রশুষ্ক ইটদ্বারা বাড়ি ও শহর বানাইত, খনিজ সম্পদ আহরণ করিত এবং নানা প্রকার ধাতুর বিশুদ্ধ ও মিশ্র ব্যবহার জানিত। এতৎসত্ত্বেও আসতেকগণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে দুর্বল রহিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে আমেরিণ্ডিয়ান উপজাতিদের অধিকাংশই লুপ্ত। ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের হাতে ইহারা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও অঞ্চলে বিশেষভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় তাহারা এখনও অল্প সংখ্যায় বসবাস করিতেছে।

দশম শতাব্দীতে ভাইকিংগণ হাডসন উপসাগর ও ল্যাব্রাডরে অস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিলেও ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিগ্‌ভ্রান্ত কলম্বাসই প্রকৃতপক্ষে এই মহাদেশের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। যদিও ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস-স্থাপিত হাইতি দ্বীপের নাভিদাদ উপনিবেশ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, এমন কি মূল ভূখণ্ডের হনডুরাস, পোর্টো বেলো (পানামা) ও আকাপুলকো অঞ্চলে স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন ক্যাবট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-এ ইংরেজ উপনিবেশ এবং ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন কার্টিয়ার সেণ্ট লরেন্স উপত্যকায় ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এই মহাদেশের সর্ববৃহৎ উপনিবেশগুলি স্পেনের অধিকারে ছিল।

স্পেনীয় উপনিবেশগুলি ছিল প্রধানতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে মূল ভূখণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ উপনিবেশ স্থাপন করে। সেণ্ট লরেন্স নদীর উপত্যকা ও মধ্যমহাদেশীয় বৃহৎ হ্রদগুলি অতিক্রম করিয়া ফরাসী আধিপত্য প্রায় সমগ্র মিসিসিপি উপত্যকায় স্থাপিত হয়। ইংরেজ উপনিবেশগুলি অ্যাটল্যাণ্টিক উপকূলে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ উপনিবেশের উত্তরে ফরাসী এবং দক্ষিণে স্পেনীয় উপনিবেশ বিদ্যমান ছিল। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে মেক্সিকো উপসাগরস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি ইংরেজ নৌবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হইতে থাকে। পূর্ব উপকূলের ওলন্দাজ উপনিবেশগুলিও পরে ইংরেজদের হস্তগত হয়।

আমেরিণ্ডিয়ান উপজাতিদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ধনসঞ্চয় করাই স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের মূল লক্ষ্য ছিল। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্পেনীয়দের কৃষিখামার প্রসারে সাহায্য করিলেও মূল ভূখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর উপকূলভাগ বিস্তৃত খামার স্থাপনে প্রতিবন্ধক হয়। দেশের অভ্যন্তর ভাগের অনভ্যস্ত জলবায়ুও মাতৃভূমির সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারে বাধা দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতি স্পেনীয় জমিদারি ব্যবস্থায় পরিচালিত হইতে থাকে। আদিবাসী ও স্পেনীয়দের মধ্যে অবাধ রক্তমিশ্রণের ফলে মেস্তিজো নামে বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব ঘটে।

ফরাসী উপনিবেশগুলি মূলতঃ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। স্থানীয় শিকারজীবী উপজাতিদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া তাহারা পশুর চামড়া ও লোম ব্যাপকভাবে মাতৃভূমিতে রপ্তানি করিত। কুইবেক, মণ্ট্রিয়ল প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বড় বড় কৃষিখামার-নির্ভর উপনিবেশ ভিন্ন সমগ্র ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে কোনও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই।

অ্যাটল্যাণ্টিক উপকূলের ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য ইওরোপ হইতে ধর্মনিপীড়িত মানুষ, কৃষিবিপ্লবের ফলে ভূমিহীন কৃষক, নানা প্রকার কারিগর ও ভাগ্যান্বেষী দলে দলে আগমন করে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ ; অথচ ঐ সময়ে ইংরেজ-শাসিত উপনিবেশে পনর লক্ষের উপর ইওরোপীয় বসবাস করিত। বর্তমান আমেরিকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে অ্যাটল্যাণ্টিক উপকূলের উপনিবেশগুলির ইতিহাস যথেষ্ট সাহায্য করে। ইওরোপীয় সভ্যতার ব্যাপক মিশ্রণের ফলে যে আধুনিক আমেরিকার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বনিয়াদ এই উপনিবেশগুলিতেই স্থাপিত হয়।

ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয় প্রধানতঃ কয়েকটি চার্টার্ড কোম্পানির উদ্যোগে। তাহাদের মধ্যে অ্যাটল্যাণ্টিক উপকূলে 'প্লিমাথ কোম্পানি' (১৬০৬ খ্রী), 'লণ্ডন কোম্পানি' (১৬১২ খ্রী), 'ওলন্দাজ পশ্চিমভারতীয় কোম্পানি' (১৬২১ খ্রী), সেণ্ট লরেন্স অঞ্চলে 'লা কোম্পানি দ্য লা নুভেল ফ্রাঁস' (১৬২৯ খ্রী), দক্ষিণে 'লা কোম্পানি দেসিন্দে অক্সিদঁতাল' (১৬৬৪ খ্রী) এবং ক্যানাডায় 'হাডসন বে কোম্পানি' (১৬৭০ খ্রী) সর্বাপেক্ষা

প্রতিপত্তিশালী ছিল। বসতি স্থাপিত হইতে থাকিলে ঐ সব কোম্পানির মারফত উপনিবেশগুলিতে কিছু কিছু স্বায়ত্ত শাসন চালু হয়। তাহাদের মধ্যে প্লিমাথ কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত অঞ্চলে প্রথমে কাউন্সিল ও পরে 'কনফেডারেসি অফ নিউ ইংল্যাণ্ড সংগঠন' উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিকদের ধর্মমত বিভিন্ন ছিল; উহারা সকলে যে একই প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে তাহাও নহে। সেই কারণে পৃথক পৃথক চার্টার্ড কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপিত হইতে থাকে। যেমন, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যারিল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপিত হয় ইংরেজ ও আইরিশ ক্যাথলিকদের জন্য, অথচ ফিলাডেলফিয়ার (১৬৮১ খ্রী) উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল কোয়েকার ধর্মমতাবলম্বীদের জন্য। আবার জর্জিয়া (১৭৩৭ খ্রী) ছিল উৎপীড়িত প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপনিবেশ। স্বভাবতঃই ঐ সব উপনিবেশের মধ্যে কোনও একতা ছিল না। ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত গভর্নর কর্তৃক প্রতিটি উপনিবেশ শাসিত হইত। অথচ জাতি ও ধর্ম -গত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের জন্য উপনিবেশবাসীগণ কখনও আপনাদিগকে নিছক ইংল্যাণ্ডের প্রজা হিসাবে ভাবিতে পারে নাই।

অ্যাটল্যান্টিক উপকূলে আগন্তুকগণ নূতন ইওরোপ গড়িবার সংকল্প লইয়া বসতি স্থাপন করে। কিন্তু এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য তাহারা যাহা সৃষ্টি করিল তাহা ইওরোপের প্রতিরূপ নহে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই অঞ্চলের জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রকৃতি একপ্রকার ছিল না। দক্ষিণ অঞ্চলের সুবিস্তৃত উর্বর সমভূমিতে রৌদ্র ও বৃষ্টিপাতের অভাব ছিল না। তজ্জন্য সেখানে কৃষিকার্য সহজতর হয়। কিন্তু ঐ জলবায়ুতে পশ্চিম ইওরোপে প্রচলিত ফসলের চাষ করা দুষ্কর ছিল। ফলে ঔপনিবেশিকগণ অন্য স্থান হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে বাধ্য হইত। রপ্তানির উদ্দেশ্যে তাহারা এমন সব কৃষিপণ্যের চাষ শুরু করে যাহা অন্য উপনিবেশ বা ইওরোপে সহজে বিক্রয়যোগ্য ছিল। মহাদেশের নিজস্ব ফসল তামাক, তুঁত ও ধান চাষের জন্য বড় বড় বাগিচা (প্ল্যান্টেশন) স্থাপিত হয়। ঐ সব বাগিচায় আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত নিগ্রো ক্রীতদাস শ্রমিক হিসাবে কাজ করিত। এই প্রকার ক্রীতদাস-চালিত কৃষিব্যবস্থা ইওরোপে প্রচলিত ছিল না; দক্ষিণের কৃষক ঔপনিবেশিকরা নূতন ভঙ্গীতে জীবনযাপন করিতে থাকে।

উত্তর অঞ্চলে আপালাচিয়ার পার্বত্যভূমি উপকূলের নিকটতর হওয়ার ফলে সমভূমির পরিমাণ কম। উপরন্তু নদী-উপত্যকা অত্যন্ত প্রস্তরময়। তজ্জন্য ঐ অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে আবাদ করা সম্ভব হয় নাই। জমির মালিক ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রে নিজের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া ভুট্টা, বার্লি ও রাই এবং কিছু কিছু ফলের চাষ করিত। অবশ্য নিকটেই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও গ্রেট ব্যাঙ্কের মৎস্যস্থলী থাকার জন্য জীবিকাসংস্থানের অন্যতর উপায়ও ছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডে নির্মিত জাহাজের সাহায্যে কেবলমাত্র মৎস্য-শিকারেই নয়, নৌবাণিজ্যেও উত্তরের অধিবাসীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মৎস্যশিকার ও নৌবাণিজ্য তাহাদের বহির্মুখী করিয়া তোলে, আবার জমির অনুর্বরতার জন্য তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার কুটির-শিল্পেরও দ্রুত বিস্তার ঘটে। প্রতি গৃহেই বস্ত্রবয়ন, প্রতি গ্রামেই কামারশালা, প্রত্যেক শহরেই কিছু না কিছু শিল্পের পত্তন হয়। উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম অবস্থা হইতেই উত্তরের অধিবাসীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদিত গুড় হইতে নিউ ইংল্যাণ্ডে রাম্ মদ্য প্রস্তুত হইত। ঐ ধরনের বিনিময়-ব্যবস্থায় আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত নিগ্রো ক্রীতদাস পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণের আবাদ অঞ্চলে চালান যাইত। সমগ্র বাণিজ্যই নিউ ইংল্যাণ্ডের জাহাজের সাহায্যে চলিত। উৎপাদনপ্রথায় নিউ ইংল্যাণ্ড পশ্চিম ইওরোপের প্রতিচ্ছবি হইলেও কায়েমি স্বার্থের সৃষ্টিতে তাহারা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই ভাবিয়াছিল।

মধ্য অঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতির মিশ্রণ ঘটে। উপকূলভাগে জাহাজ নির্মাণ ও নানা প্রকার ছোট-বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। আবহাওয়া পশ্চিম ইওরোপের তুল্য হওয়ায় এবং সুবিস্তৃত সমতলভূমি থাকার জন্য ব্যাপকভাবে গম ও বার্লির চাষ শুরু হয়। গোরু, ভেড়া ও শূকর পালন সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করে। কৃষিখামারের শ্রমিকগণ প্রধানতঃ ইওরোপ হইতে আসে, কারণ ইওরোপীয় ফসলের চাষ নিগ্রো শ্রমিকের দ্বারা হইত না। ঐ সব ইওরোপীয় শ্রমিক খামারে কাজ করিয়া জাহাজভাড়া পরিশোধ করিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিত এবং নির্দিষ্ট সময় কাজ করিবার পর স্বাধীন হইয়া নিজেদের খামার স্থাপনের চেষ্টা করিত। চুক্তিমুক্ত শ্রমিকগণ আপনাদিগকে সীমান্তবাসী বলিয়া পরিচয় দিত, কারণ নূতন কৃষিখামার স্থাপনের উপযুক্ত জমি কেবলমাত্র সীমান্তপ্রদেশেই পাওয়া যাইত। তাহারা নিজ পরিশ্রমে জঙ্গল পরিষ্কার ও আমেরিণ্ডিয়ানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিত্য নূতন জনবসতি গড়িত এবং ঐ ভাবে উপনিবেশের আয়তন সম্প্রসারিত করিত। আমেরিকা

উত্তর আমেরিকার রাজ্য ও রাজধানী

রাষ্ট্র	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	জনসংখ্যা (হাজার) ১৯৬০ খ্রী	রাজধানী	জনসংখ্যা (হাজার) ১৯৫৩ খ্রী	নগরের বৈশিষ্ট্য
ক্যানাডা	৯৯১৩৬৫৫/৩৮৪৩১১০	১৭৮১৪	অটাওয়া	২৮২	কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ ও সিমেন্ট -শিল্প ; দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র
যুক্তরাষ্ট্র	৭৭১০৪৩০/২৯৭৭০০০	১৮০৬৭০	ওয়াশিংটন	৮০২	—
মেক্সিকো	১৯৬৩২২০/৭৫৮০০০	৩৪৯৮৮	মেক্সিকো সিটি	২৫০০	রেলকেন্দ্র ; পশম ও কার্পাস বয়ন এবং ধাতু -শিল্প
গুয়াটেমালা	১০৮৮৯৪/৪২০৪৪	৩৭৬৫	গুয়াটেমালা	৩০০	বাণিজ্যকেন্দ্র ; কলা, কফি, কাঠ, মধু ও চামড়া রপ্তানি
ব্রিটিশ হন্ডুরাস	২৩০৫১/৮৯০০	৯০	বেলিজ	২২	বন্দর ; মেহগনি কাঠ, কমলা লেবু ও কলা রপ্তানি
হন্ডুরাস	১১৩৯৬০/৪৪০০০	১৮৮৩	টেগুই কালপা	৮০	রৌপ্য খনি
সালভাডর	৩৪১৩৬/১৩১৮০	২৫০১	সান্ সালভাডর	১২৪	বয়নশিল্প
নিকারাগুয়া	১৩৩৬৪৪/৫১৬০০	১৪৭৭	মানাগুয়া	১৪২	—
কোস্টারিকা	৫৯৫৭০/২৩০০০	১১৭১	সান্ জোসে	৯৪	কফি ব্যবসায়ের কেন্দ্র
পানামা	৮২৫৯৫/৩১৮৯০	১০৫৫	পানামা	২১০	কলা, চিনি ও নারিকেলের ব্যবসায়কেন্দ্র

রাষ্ট্র	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	জনসংখ্যা (হাজার) ১৯৬০ খ্রী	রাজধানী	জনসংখ্যা (হাজার) ১৯৩৩ খ্রী	নগরের বৈশিষ্ট্য
গ্রেটার অ্যান্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ :					
কিউবা	১১৩৯৬০/৪৪০০০	৬৭৯৭	হাভানা	৬৭৪	বন্দর ; তামাক, কলা, রাঙা আলু, চাউল, কফি, কোকো, ভুট্টা, চিনি ও ফল রপ্তানি -কেন্দ্র
সান্ত ডমিঙ্গো	—	—	সিয়ুদাদ ত্রুহিয়ো	—	চিনি, কফি ও পেট্রোলিয়াম রপ্তানি
জ্যামাইকা	১১৪২৪/৪৪১১	১৬২১	কিংস্টন	১০৯	বন্দর ; চিনি, কফি, নারিকেল, কোকো ও তামাক রপ্তানি করে
পোর্টো রিকো	—	২৩৬১	সান্ জুয়ান	—	বন্দর ; কার্পাস, কলা, কফি, কোকো, চিনি, মদ, ম্যাঙ্গানিজ, লবণ ও সোনা রপ্তানি
হাইতি	—	৩৫০৫	পোর্ট অফ প্রিন্স	১২৬	বন্দর ; চিনি ও কফি রপ্তানি
লেসার অ্যান্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ :					
উইণ্ডওয়ার্ড গ্রুপ	১৮৮০/৭২৬	৩১৫	—	—	কোকো, নাটমেগ, নারিকেল, চিনি, তুলা, ফল রপ্তানি করে
লীওয়ার্ড গ্রুপ	৫৯০৮/২২৮১	১২৩	—	—	চিনি, কোকো, তামাক, তুলা, নারিকেল, আনারস ও চুন রপ্তানি করে
বার্বাডস	৪৩১/১৬৬	২৩২	ব্রিজ টাউন	১৪	বন্দর ; চিনি ও তুলা রপ্তানি
ট্রিনিডাড	৪৮২৩/১৮৬২	৮৪৪	পোর্ট অফ স্পেন	১০৩	বন্দর ; পেট্রোলিয়াম, কোকো, চিনি, নারিকেল, অ্যাস্ফ্যাল্ট রপ্তানি
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ	১১৬৫৫ ৪৫০০	১০৫	নাসাউ	৩০	বন্দর ; স্পঞ্জ, টোমাটো, আবলুস কাঠ রপ্তানি

মহাদেশের অর্থনীতিতে ও জনবসতি বিস্তারে উক্ত সীমান্তবাসীদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইওরোপের সামাজিক জীবনে সীমান্তবাসীদের অনুরূপ কোনও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। নূতন ইওরোপ গড়িতে আসিয়া ঔপনিবেশিকরা নূতন আমেরিকা গড়িয়া তুলিল এ কথা একাধিক অর্থে সত্য।

ঔপনিবেশিকরা নূতন আমেরিকা গড়িয়া তুলিল। কিন্তু সে আমেরিকায় প্রথমে কোনও রাষ্ট্রিক ঐক্য ছিল না। সেই নূতন অর্থনীতিতে কোনও সংহতি ছিল না। আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ সীমান্তবাসীরা কেবল চিত্তের দৃঢ়তায় জঙ্গল কাটিয়া যে নূতন জমি কৃষিযোগ্য করিত, পরবর্তী কালে বড় কৃষিখামারের মালিকেরা ঐ জমি শুধু টাকার জোরে দখল করিয়া লইত। তাহাদের পরে আসে উত্তরের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। এই তিন প্রকার অর্থনীতির মিলিত চরিত্রই আমেরিকাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের (১৭৭৬ খ্রী) পূর্বে ঔপনিবেশিকদের সম্মুখে এমন কিছুই ছিল না যাহার আদর্শে তাহারা নিজেদের এক জাতি হিসাবে ভাবিতে পারিত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর অবশ্য পশ্চিম প্রান্ত অভিমুখে নূতন চাষের জমি সংগ্রহ, কৃষিখামার ও পরে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন প্রায় অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু এই নূতন অর্থনৈতিক সংগঠনে রাজনৈতিক একতার প্রয়োজনীয়তা ১৮৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধের পরই যুক্তরাষ্ট্রে নূতন করিয়া স্বীকৃতি পাইল।

ক্যানাডা রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রিক একতার সমস্যা আরও জটিলরূপে দেখা দেয়। ফরাসী উপনিবেশগুলি প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩ খ্রী) পর ইংরেজদের দখলে আসে। কিন্তু ভাষা, ধর্মমত ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্যের জন্য তাহারা এক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাই ক্যানাডা রাষ্ট্রের প্রত্যেক অঞ্চল স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অনেক বেশি মাত্রায় ভোগ করে, যদিও মূলতঃ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণমূলক রাজনীতির ভয়ে সমগ্র রাষ্ট্রই ব্রিটিশ ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য ক্যানাডায় কৃষিক্ষেত্রের অবাধ বিস্তার সম্ভবপর হয় নাই। রাষ্ট্রের প্রায় ৯০ শতাংশ লোক যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের কাছে বসবাস করে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের উভয় পার্শ্বে উৎপাদনপদ্ধতি একই ধরনের।

মহাদেশের দক্ষিণে উপদ্বীপসদৃশ অঞ্চলটি প্রথমে স্পেনের উপনিবেশ ছিল। কিন্তু মাতৃভূমির রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বলতার জন্য ঐ সকল উপনিবেশ অল্পকালের মধ্যেই স্বাধীন হইয়া ওঠে। একমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ হন্‌ডুরাস ইহার ব্যতিক্রম। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ব্রিটিশ উপনিবেশের সংখ্যা প্রচুর।

ইওরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা জীবিকার সন্ধানে আমেরিকায় সমাগত হয়। সমগ্র উপনিবেশের উৎপাদনব্যবস্থা প্রথম হইতেই বিনিময়-অর্থনীতির (এক্সচেন্‌জ ইকনমি) কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ এখানে শিল্পবিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্ট হইয়াছিল। শিল্পবিপ্লব সর্বপ্রথম সার্থক হয় নিউ ইংল্যাণ্ড উপনিবেশে। কিন্তু দক্ষিণের কৃষিপ্রধান উপনিবেশগুলির সহিত শিল্পপ্রধান উত্তর অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ঘটিলে উৎপাদনব্যবস্থার ঐ রূপান্তর কতদূর সাফল্য লাভ করিত তাহা বলা কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত উত্তর আমেরিকার অন্য কোনও রাষ্ট্রে শিল্প ও কৃষির এই সমন্বয় সাধিত হয় নাই। মার্কিন দেশ যে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিয়াছে উক্ত সমন্বয় তাহার অন্যতম কারণ।

স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৭৭৫-৮৩ খ্রী) যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক স্বীকৃতির নির্দেশচিহ্ন। কৃষি-উৎপাদনেও ক্রমে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

যন্ত্রের সার্থক প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে কৃষি-উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। কেবল যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা প্রতি খণ্ড জমির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয় বলিয়া অঞ্চলের গড় পরিস্থিতিতে (অ্যাভারেজ কন্‌ডিশন) যে ফসল নিশ্চিতভাবে জন্মিতে পারে, তাহারই বিস্তৃত চাষ চালু হয়। তাই মেক্সিকোর উপসাগর উপকূলে আখ ও ধান, তাহার উত্তরে কার্পাস, তাহার উত্তরে শীতকালীন গম, তাহার উত্তরে ভুট্টা, ইত্যাদির চাষ এবং উত্তর-পশ্চিমে বসন্তকালীন গম প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। বিনিময়-অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে পুঁজির পৌনঃপুনিক ব্যবহার যেমন একদিকে অতি উৎপাদনের সংকট সৃষ্টি করে, তেমনই ফসল চাষের জন্য বিস্তৃত অঞ্চলের গড় পরিস্থিতি অনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তিরও অবনতি ঘটায়। কিন্তু ইহার পরিবর্তে প্রতি খণ্ড জমির সার্থক ব্যবহারের জন্য যে বিরাট শ্রমশক্তির প্রয়োজন শিল্প-উৎপাদনের কাঠামোয় তাহা যুক্তরাষ্ট্রে সুলভ নয়। যে সব জমি অতিরিক্ত ঢালু বলিয়া যন্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য তাহাদের বনভূমিতে রূপান্তরিত করা হইতেছে।

শিল্পবিপ্লবের অভাবে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপদ্বীপ অঞ্চলে কৃষি-উৎপাদনে বিনিময়-অর্থনীতিরও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয় নাই। সুগম অঞ্চলে বাগিচা-প্রথায় প্রচুর দৈহিক শ্রম নিয়োগ করিয়া ফসলের চাষ করা হয়। উক্ত কৃষিপণ্য বিক্রীত হয় ইওরোপ অথবা যুক্তরাষ্ট্রে। অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার তাগিদেই কৃষি-উৎপাদন নিবদ্ধ আছে —উৎপন্ন পণ্যাদি বাহিরে রপ্তানি হয় না। ঐ অঞ্চলের খনিজ সম্পদও অপরিশোধিত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইওরোপে রপ্তানি হয়। সমগ্র অঞ্চলটি তাই এক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপের শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে।

ক্যানাডা অঞ্চলে শিল্পবিপ্লব ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে উহা সাফল্যমণ্ডিত হইবার পর। যুক্তরাষ্ট্রের বহু পুঁজি ক্যানাডার বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে নিয়োজিত আছে। কিন্তু ক্যানাডার সেই শিল্প-উৎপাদন-ব্যবস্থাও একান্তভাবে বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা ৬০২-৩ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। নগরের আধিক্য বশতঃ কেবল রাজধানীর লোকসংখ্যা বর্ণিত হইল।

দ্র. A. M. Schlesinger, *The Colonial Merchants & the Revolution, 1763-1776*, New York, 1918 ; F. J. Turner, *The Frontier in American History*, New York, 1920 ; C. A. Beard & R. Marry, *The Rise of American Civilisation*, New York, 1930 ; Leo Huberman, *We, The People*, London, 1940 ; C. Daryll Forde, *Habitat, Economy & Society*, London, 1956 ; E. G. Ashton, *North America*, London, 1959 ; Ll. R. Jones & P. W. Bryan, *North America*, London, 1960.

সন্তোশ চক্রবর্তী

উত্তর কুরু হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২৩) বলা হইয়াছে যে ইহা দেবভূমি এবং মানুষের পক্ষে ইহা জয় করা সম্ভব নহে। রাজ্য জয় করিবার এই প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হয় যে উত্তর কুরুর বাস্তব অস্তিত্ব ছিল এবং উহার ঐতিহাসিক স্মৃতি তখনও লুপ্ত হয় নাই। পরবর্তী কালে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে লোকে ক্রমশঃ ইহার অস্তিত্ব ভুলিয়া ইহাকে একটি কাল্পনিক দেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে, উত্তর কুরু ভারতবর্ষ হইতে বহু উত্তরে এবং ইহার উত্তর সীমায় সমুদ্র অবস্থিত। জাতক অনুসারে ইহার অবস্থান হিমালয়ে। লাসেন মনে করেন, উত্তর কুরু কাশগড়ের পূর্বস্থিত দেশ। বুনসেনের মতানুসারে পামীর মালভূমির বেলুর তঘ নামক পর্বতশ্রেণীর যে ঢালু অঞ্চল বড় বড় নদীগুলির উৎপত্তিস্থান, তাহাই আর্যগণের উত্তর কুরু। চিরতুষারাবৃত এই বেলুর তঘ পশ্চিম তিব্বতের উত্তর সীমা, কিউনলুন, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ অথবা সুন্‌লুং নামেও ইহা পরিচিত। জিমারের মতানুসারে উত্তরকুরুবংশীয়গণ পরবর্তী কালে কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখান হইতেই তাঁহারা পরে কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে বসবাস করিতে যান।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. 1, London, 1951 ; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient & Medieval India*, New Delhi, 1960.

উত্তরপাড়া হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার থানা ও ঐ থানার সদর শহরটি হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহা হাওড়া হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ নগরাঞ্চলের অংশ। উত্তরপাড়া পৌর শহরটি পূর্ব রেলপথের হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের উত্তরপাড়া স্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। রেলপথে ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হাওড়া রেল স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী উত্তরপাড়া শহরের জনসংখ্যা ২১১৩২। তন্মধ্যে পুরুষ ১১৫৬৭ ও নারী ৯৫৬৫ জন। নারী-পুরুষের অনুপাত ৮২৭ : ১০০০।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিংডন সেতু (আধুনিক নাম বিবেকানন্দ ব্রিজ) নির্মিত হইবার পর হইতে উত্তরপাড়ার সহিত কলিকাতার যোগাযোগ সহজতর হইয়াছে। এখানকার বহু বাসিন্দা কার্যব্যপদেশে প্রতিদিন কলিকাতায় যাতায়াত করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে হাড়ের গুঁড়া প্রস্তুত করার জন্য উত্তরপাড়ায় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানাটি এখনও চালু আছে। ইহাই উত্তরপাড়ার বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। হিন্দুস্থান মোটর্‌স লিমিটেডের মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা

উত্তরপাড়ায় অবস্থিত। ইহা স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা। উত্তরপাড়ায় যে সকল যন্ত্রচালিত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা ও ইটখোলা আছে তাহাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

উত্তরপাড়া শহরের উন্নয়নে স্থানীয় মুখোপাধ্যায়-পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য। উক্ত পরিবারের জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের লোকহিতকর কার্যক্রম শহরের উন্নতি-বিধানে সমূহ সাহায্য করিয়াছে।

উত্তরপাড়ায় একটি ডিগ্রী কলেজ আছে। ইহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষ ও ভারততত্ত্ব সম্পর্কে বহু প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রক্ষিত আছে। গ্রন্থাগার ভবনের দ্বিতলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছুকাল (১৮৭৩ খ্রী) বাস করিয়াছিলেন।

দ্র সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; অশোক মিত্র, আমার দেশ, কলিকাতা, ১৯৫৪; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Hooghly*, Calcutta, 1912 ; *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Hooghly*, Delhi, 1952 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, New Delhi, 1962.

প্রণবরঞ্জন রায়

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি নীফা দ্র

উত্তর প্রদেশ ভারতের অন্যতম রাজ্য। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি হইতে পৃথক করিয়া আগ্রা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা অঞ্চল লইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স) গঠন করা হয়। ১৮৭৭ সালে একই প্রশাসক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনান্ট-গভর্নর ও অযোধ্যার চীফ কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে উহার নূতন নামকরণ হয় 'ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অফ আগ্রা অ্যাণ্ড আউধ'। ১৯২১ সালে উক্ত প্রদেশের লেফটেনান্ট-গভর্নরের পদকে গভর্নরের পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রদেশের নাম 'যুক্ত প্রদেশ' রূপে (ইউনাইটেড প্রভিন্সেস) সংক্ষিপ্ত করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর নূতন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি হইতে যুক্ত প্রদেশের নাম 'উত্তর প্রদেশে' পরিবর্তিত হয়। তিনটি প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য— টিহরী গাঢ়ওয়াল, রামপুর ও বারাণসী— এবং রাজস্থান ও পূর্বতন বিন্ধ্য প্রদেশের কিছু অঞ্চল উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই রাজ্যের বর্তমান আয়তন দাঁড়াইয়াছে ২৯৪৩৬৭ বর্গ কিলোমিটার (১১৩৬৫৪ বর্গ মাইল)।

উত্তর প্রদেশ হিমালয়ের পাদদেশে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত (২৭°৪০´ উত্তর, ৮০° পূর্ব)। ইহার উত্তরে তিব্বত ও নেপাল, পূর্বে বিহার, পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থান এবং দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ। এখানকার জলবায়ু পূর্ব ভারতের তুলনায় শীতল ও শুষ্ক; কিন্তু উপত্যকা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে। উত্তর প্রদেশ মৌসুমি অঞ্চলের ঠিক সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এখানকার বৃষ্টিপাত পূর্ব ভারতের ন্যায় প্রচুর নহে— গড়ে ১০২ সেন্টিমিটারের (৪০ ইঞ্চি) কম। কিন্তু গঙ্গা ও যমুনা নদী এবং উহাদের বহু খালের কল্যাণে সমগ্র ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশেই সেচের জলের সর্বাধিক প্রাচুর্য। উত্তর প্রদেশ রাজ্যে ১১টি বিভাগ আছে: মীরাট আগ্রা এলাহাবাদ (ইলাহাবাদ) রোহিলখণ্ড ঝাঁসী বারাণসী গোরখপুর কুমায়ুন লখনৌ ফৈজাবাদ এবং উত্তরখণ্ড। যে ৫৪টি জেলায় এই রাজ্য বিভক্ত তাহাদের নাম (বিভাগের উল্লেখসহ) নীচে লিপিবদ্ধ হইল :

মীরাট বিভাগে ৫টি জেলা : ১. দেরাডুন (দেহরাদূন) ২. সাহারানপুর ৩. মজফ্‌ফরনগর ৪. মীরাট ৫. বুলন্দ-শহর।

আগ্রা বিভাগে ৫টি জেলা : ১. আলীগড় ২. আগ্রা ৩. মৈনপুরী ৪. এটা ৫. মথুরা।

এলাহাবাদ বিভাগে ৫টি জেলা : ১. ফরুরুখাবাদ ২. ইটাওয়া ৩. কানপুর ৪. ফতেপুর ৫. এলাহাবাদ।

রোহিলখণ্ড বিভাগে ৭টি জেলা : ১. বেরিলী (বরেলী) ২. বিজনৌর ৩. বদায়ূঁ ৪. মোরাদাবাদ ৫. রামপুর ৬ শাহ্‌জাহানপুর ৭. পীলীভীত।

ঝাঁসী বিভাগে ৪টি জেলা : ১. ঝাঁসী ২. জালোন ৩. হমীরপুর ৪. বান্দা।

বারাণসী বিভাগে ৫টি জেলা : ১. বারাণসী ২ মীর্জাপুর ৩. জৌনপুর ৪ গাজীপুর ৫. বালিয়া।

গোরখপুর বিভাগে ৪টি জেলা : ১. গোরখপুর ২. দেওরিয়া ৩. বস্তী ৪. আজমগড়।

কুমায়ুন বিভাগে ৪টি জেলা : ১. নৈনীতাল ২. আলমোড়া ৩. গাঢ়ওয়াল ৪. টিহরী গাঢ়ওয়াল।

লখনৌ বিভাগে ৬টি জেলা: ১. লখনৌ ২. উন্নাও ৩ রায়বেরিলী ৪. সীতাপুর ৫. হরদোঈ ৬. খেরী।

ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টি জেলা: ১. ফৈজাবাদ ২. গোণ্ডা ৩. বহরাইচ ৪. সুলতানপুর ৫. প্রতাপগড় ৬. বারাবংকী।

উত্তরখণ্ড বিভাগে ৩টি জেলা: ১. উত্তরকাশী ২. চমোলী ৩. পিথোরাগড়।

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনৌ। হাইকোর্ট এলাহাবাদে অবস্থিত; তবে লখনৌতে একটি বেঞ্চ বসে। উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর কানপুর। রাজ্যের অন্যান্য বৃহৎ শহরের মধ্যে বারাণসী আগ্রা মীরাট বেরিলী মোরাদাবাদ সাহারানপুর আলীগড় গোরখপুর ঝাঁসী দেরাদুন রামপুর মথুরা শাহ্‌জাহানপুর ও মীর্জাপুর-বিন্ধ্যাচলের জনসংখ্যা লক্ষাধিক।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের লোকসংখ্যা ৭৩৭৪৬৪০১। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮৬৩৪২০১ ও নারী ৩৫১১২২০০ জন। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯৫১-৬১ এই দশকে উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা ১৬·৬৬% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জেলাগুলির মধ্যে নৈনীতালে এই বৃদ্ধির হার সর্বাধিক (৭৩·১০%) এবং সুলতানপুরে সর্বনিম্ন (৯·২৮%)। রাজ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ৯০৯ : ১০০০। রাজ্যের মধ্যে টিহরী গাঢ়ওয়াল জেলায় স্ত্রীলোকদের আনুপাতিক সংখ্যা সর্বোচ্চ: প্রতি ১০০০ পুরুষের অনুপাতে ১২০২ স্ত্রীলোক। নৈনীতালে এই সংখ্যা সর্বনিম্ন, প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে ৭১৯ জন স্ত্রীলোক। রাজ্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৫১ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৬৪৯)। জেলাগুলির মধ্যে ঘনত্বের হার লখনৌতে সর্বাধিক: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫২৯ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১৩৭০) এবং উত্তর কাশীতে ন্যূনতম: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬ (প্রতি বর্গ মাইলে ৪১)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের এই রাজ্যে ২৭৫টি শহরাঞ্চল ছিল; শহরাঞ্চলের মোট লোকসংখ্যা ৯৪৭৯৮৯৫ এবং গ্রামাঞ্চলে ৬৪২৬৬৫০৬। অর্থাৎ রাজ্যের প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৮৭১ জন গ্রামে বাস করে, ১২৯ জন শহরে। লক্ষাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্যের ১৭টি শহরের নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী এই শহরগুলির লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইল:

শহর		জনসংখ্যা
কানপুর	টাউন গ্রুপ	৯৭১০৬২
লখনৌ	„	৬৫৫৬৭৩
আগ্রা	„	৫০৮৬৮০
বারাণসী	„	৪৮৯৮৬৪
এলাহাবাদ	„	৪৩০৭৩০
মীরাট	„	২৮৩৯৯৭
বেরিলী	„	২৭২৮২৮
মোরাদাবাদ	„	১৯১৮২৮
সাহারানপুর	„	১৮৫২১৩
আলীগড়		১৮৫০২০
গোরখপুর		১৮০২৫৫
ঝাঁসী	টাউন গ্রুপ	১৬৯৭১২
দেরাদুন	„	১৫৬৩৪১
রামপুর		১৩৫৪০৭
মথুরা	টাউন গ্রুপ	১২৫২৫৮
শাহ্‌জাহানপুর	„	১১৭৭০২
মীর্জাপুর-বিন্ধ্যাচল		১০০০৯৭

উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। গৃহের দেওয়াল মৃত্তিকানির্মিত। উত্তর প্রদেশের গ্রামজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ফসল কাটার সময়ে গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলিতভাবে প্রত্যেকের খেতের ফসল কাটে।

১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী মোট কর্ষিত জমি ১৭১ লক্ষ হেক্টর (৪২৩ লক্ষ একর); ইহার মধ্যে একবারের বেশি কর্ষিত জমির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ হেক্টর (১১৩ লক্ষ একর)। খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ২০৩ হেক্টরে (৫০১ লক্ষ একর)। ৪১ লক্ষ হেক্টরে (১০২ লক্ষ একর) ধানের, ৩৮ লক্ষ হেক্টরে (৯৫ লক্ষ একর) গমের, ১৮ লক্ষ হেক্টরে (৪৫ লক্ষ একর) যবের, ১১ লক্ষ হেক্টরে ২৬ লক্ষ একর) বাজরার, ১১ লক্ষ হেক্টরে (২৬ লক্ষ একর) ভুট্টার, ১২ লক্ষ হেক্টরে (২৯ লক্ষ একর) আখের চাষ হয়। জোয়ার, মাড়ুয়া, সাওন, কোদো, কাকোন, কটকি, মটরশুঁটি, অড়হর, মসুর, কলাই, মুগ, আলু, বিভিন্ন ফল ও শাক-সব্‌জি ইত্যাদির চাষেও প্রভূত জমি ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয় ১৪ লক্ষ হেক্টরে (৩৫ লক্ষ একর); তাহার মধ্যে তিসি উৎপন্ন হয় প্রায় ০·৭ লক্ষ হেক্টরে (পৌনে দুই লক্ষ একর), রাই ও সরিষা ১ লক্ষ হেক্টরে (৩ লক্ষ একর), তিল ০·৮ লক্ষ হেক্টরে (২ লক্ষ একর) এবং আফিম ১০ হাজারের অধিক হেক্টরে (২৫ হাজারের অধিক একর)। চীনা বাদাম, রেড়ি, তুলা, পাট, শণ, তামাক ইত্যাদি চাষও

অনেক জমিতে করা হয়। গম, ভুট্টা, যব, মটর, আখ ও তিলের চাষ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশেই সর্বাধিক। বাজরা, তিসি, রাই ও সরিষার চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ-বিচারে সর্ব ভারতে উত্তর প্রদেশের স্থান দ্বিতীয়। আফিম উৎপাদনে ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশের স্থান প্রথম। এই রাজ্যে পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ১২৪ লক্ষ হেক্টর (৩০৬ লক্ষ একর) এবং বনভূমির পরিমাণ ৩৮ লক্ষ হেক্টরের (৯৩ লক্ষাধিক একর) অধিক। ভারতের মোট বনাঞ্চলের এক বৃহদংশ উত্তর প্রদেশে বিদ্যমান। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ২৪৪৮০০০ মেট্রিক টন (২৪ লক্ষ টন) চাউল, ১৪২৮০০০ মেট্রিক টন (১৪ লক্ষ টন) যব, ৬১২০০০ মেট্রিক টন (৬ লক্ষ টন) বাজরা, ১০২০০০০ মেট্রিক টন (১০ লক্ষ টন) ভুট্টা, ৩২৬৪০০০ মেট্রিক টন (৩২ লক্ষ টন) গম, ১১২২০০০ মেট্রিক টন (১১ লক্ষ টন) মটর, ৩২৮৪৪০০০ মেট্রিক টন (৩২২ লক্ষ টন) ইক্ষু, ১০২০০০ মেট্রিক টন (১ লক্ষ টন) তিসি, ৬১২০০০ মেট্রিক টন (৬ লক্ষ টন) রাই ও সরিষা, ৮১৬০০ মেট্রিক টন (প্রায় ৮০ হাজার টন) তিল ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য শস্যও প্রচুর উৎপন্ন হয়। ঐ বৎসরে কাঠের জন্য বহু বৃক্ষও রোপিত হইয়াছিল।

এই রাজ্যের গৃহপালিত পশু-সম্পদ উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশুর উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদেশে ১৪১টি গবাদি পশু প্রজনন ও সম্প্রসারণ -কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আলীগড়ের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় ডেয়ারিতে ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্য, শূকরের মাংস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। উত্তর প্রদেশ হইতে ৫৫৯৮৬০০ কিলোগ্রাম (প্রায় দেড় লক্ষ মন) মৎস্য রপ্তানি হয়।

সেচখাল, নলকূপ ও পুষ্করিণীর সাহায্যে উত্তর প্রদেশে ৩০৩৫২৫০ হেক্টর (মোট প্রায় ৭৫ লক্ষ একর) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। সেচখালগুলির মধ্যে আপার গঙ্গা, লোয়ার গঙ্গা, পূর্ব যমুনা, আগ্রা, বেতওয়া, সর্দা, কেন, চাকিয়া ও চান্দৌলি খাল উল্লেখযোগ্য।

উত্তর প্রদেশ স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের জলবিদ্যুৎ -শাখা দ্বারা পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ৬০ কোটি একক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

চুনাপাথর, লৌহ, আকরিক তাম্র, বালি, অভ্র, জিপ্সাম, সীসা, রামখড়ি (সোপস্টোন), গন্ধক, অগ্নিসহ মৃত্তিকা (ফায়ার ক্লে), ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মীর্জাপুর জেলায় কয়লাখনি আছে। সুতি, পশমি এবং পাট -বস্ত্র, চিনি, বিদ্যুৎ, অ্যাল্‌কোহল, কাচ, চামড়া এবং ট্যানিং, তৈল, বনস্পতি, রজন এবং তার্পিন, লণ্ঠন, কাগজ এবং কাগজের বোর্ড, হোসিয়ারি, ববিন, স্টার্চ, কৃষি-যন্ত্রপাতি, খদির, দিয়াশলাই, মেটাল রোলিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (প্রিসিসন্ ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট), সিমেণ্ট, সিগারেট ইত্যাদি এই রাজ্যের বৃহদায়তন শিল্প। মীর্জাপুর জেলার চুর্ক-এ একটি সরকারি সিমেণ্ট কারখানা আছে। এই কারখানায় অগ্নিসহ ইষ্টকও (ফায়ার ব্রিক্) উৎপন্ন হইতেছে। লখনৌতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং জলের মিটার তৈয়ারি হইতেছে। কানপুর এই রাজ্যে সুতি কাপড় উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। জুতা তৈয়ারিতে আগ্রার স্থান প্রথম। কানপুরও জুতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে একটি চামড়া পাকাইয়ের (ট্যানিং) গবেষণা এবং পরীক্ষণ -কেন্দ্র আছে। কাচশিল্পের প্রধান কেন্দ্র আগ্রাতে ৪ বৎসরে ২ কোটি টাকার অধিক মূল্যের কাচের চুড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ফিরোজাবাদ কাচের চুড়ির জন্য প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট কাচের দ্রব্যাদির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় লৌহমুক্ত সিলিকা সরবরাহের জন্য এলাহাবাদ জেলার শংকরগড়ে একটি সরকারি বালিধৌতাগার আছে।

এই রাজ্যে ৩টি বনস্পতির কারখানা, ১০৬টি বৃহদায়তন তৈলকল, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ২৫০টি ক্ষুদ্রায়তন তৈলকল, উৎকৃষ্ট সাবান তৈয়ারির প্রায় ১২টি বৃহৎ কারখানা, সাধারণ সাবানের বহু ছোট কারখানা এবং ৭২টি চিনির কল আছে।

কানপুর, মীরাট, বেরিলী এবং লখনৌ -এ মাঝারি ও ছোট আকারের প্রায় ১২টি রঙের কারখানায় অন্ততঃ ২০৩২ মেট্রিক টন পেণ্ট ও এনামেল, ৩৫৬ মেট্রিক টন শুষ্ক রঙ ও পিগ্‌মেণ্ট এবং ১১৩৮০০০ লিটার (২৫০০০০ গ্যালন) বার্নিশ উৎপাদিত হয়। আগ্রা, হাথরাস, ইটাওয়া, মৈনপুরী এবং গাজিয়াবাদের ক্যানেস্তারা শিল্প, মীরাটের ক্রীড়া-সরঞ্জাম শিল্প, ৪০৬৪০ মেট্রিক টন সোডা-অ্যাশ এবং ৪০৬৪০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদনক্ষমতাবিশিষ্ট সোডা-অ্যাশ ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কারখানা, কানপুরের জে কে. রেয়ন কারখানা এবং লখনৌ ও রামগড়ের ফল-সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান দুইটি উল্লেখযোগ্য। মীর্জাপুর জেলার পীপরীতে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ও বেরিলীতে একটি সিন্‌থেটিক রবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই রাজ্যে ২৪০০-এর অধিক রেজিস্টার্ড কারখানা আছে। উত্তর প্রদেশে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ১০৯৫।

তাঁতবস্ত্র, চামড়া, পিতল ও তামার বাসন, তালা, কাঁটা-চামচ-ছুরি, পিতলের তৈয়ারি কবজা ছিটকিনি ইাসকল প্রভৃতি, লৌহ ও ইস্পাত, কাচ, মৃৎশিল্প, ঘৃত, তৈল, সাবান, গুড়, কাঠের উপর কাজ, বেতের আসবাব-পত্র, তন্তু, উদ্বায়ী তৈল ও অন্যান্য সুগন্ধি উত্তর প্রদেশের প্রধান কুটিরশিল্প। কুটিরশিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে আগ্রার জুতা ও দরি (শতরঞ্জি); বারাণসীর রেশমবস্ত্র, ব্রোকেড, পিতলের বাসন, কাঠের খেলনা ও কাচের পুঁতি; মোরাদাবাদের শিঙের চিরুনি ও পিতলের বাসন; সাহারানপুরের কাঠের কাজ; ফরুখাবাদের ছাপা কাপড়, লখনৌ-এর বিদরি ও চিকনের কাজ, তাঁতবস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র; মীর্জাপুরের কার্পেট ও গালা -শিল্প, বেরিলীর দরি; কানপুরের বাদ্যযন্ত্র; মথুরার দরি, নেয়ার ও ছাপা কাপড়; প্রতাপগড়ের টাট-পট্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে মোরাদাবাদে একটি ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কুটিরশিল্পে ব্যবহৃত নকশা প্রভৃতির বৈচিত্র্য ও উন্নতি -সাধনের জন্য লখনৌ-এর ডিজাইন সেণ্টারে কাজ হইতেছে।

এই রাজ্যের উপত্যকাভূমির সর্বত্রই রেলপথ আছে। ৬১১৪২ কিলোমিটার (৩৮০০০ মাইল) রাস্তার মধ্যে প্রায় ২৭৪০০ কিলোমিটার (১৭০০০ মাইল) পিচ ঢালা পথ। সর্বত্রই বাস সার্ভিস চালু আছে। ইউ. পি. গভর্নমেণ্ট রোডওয়েজ ৬০৮টি রুটে বাস সার্ভিস পরিচালনা করেন। এই রাজ্যে প্রায় ৩৮০০ বাস এবং প্রায় ৪০০ ট্যাক্সি যাত্রীপরিবহনে নিযুক্ত। এতদ্ভিন্ন প্রায় ১৩০০০ মালবাহী ট্রাক আছে।

রাজ্যটির মধ্য ভাগে জনসমাজের ভাষা পূর্বদেশীয় হিন্দী। অন্য প্রধান দুইটি ভাষা পশ্চিমদেশীয় হিন্দী ও বিহারী। উত্তরে অবধী ভাষা ব্যবহৃত হয়। পর্বতাঞ্চলে মধ্য পাহাড়ী বহু লোকের ভাষা। রাজ্যভাষা হিন্দী হইলেও নগরাঞ্চলের উচ্চ ও মধ্য -বিত্ত সমাজে প্রচলিত ভাষা উর্দু অথবা হিন্দুস্থানী এবং ইহা রাজ্যের সর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বোধগম্য।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তর প্রদেশে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ১৩০১৩১৮৩ জন (১০৫৪৬-৭৯৫ জন পুরুষ এবং ২৪৬৬৩৮৮ জন স্ত্রীলোক) অর্থাৎ, হাজার প্রতি ১৭৬ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ২৭৩ ও ৭০। রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে এই হার দেরাদুনে সর্বোচ্চ (যথাক্রমে ৩৮৭, ৪৭৯ এবং ২৬৮); এবং বদায়ুঁর হার সর্বনিম্ন (যথাক্রমে ৯৬, ১৪২ এবং ৪২); উত্তরকাশী এবং টিহরী গাড়ওয়ালের স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই হার মাত্র ২০। ১৯৫১ সালের জনগণনায় রাজ্যের প্রতি হাজারে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এই হার ছিল যথাক্রমে ১০৮, ১৭৪ এবং ৩৬; সুতরাং গত দশ বৎসরে শিক্ষিতের হার পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যেই কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তর প্রদেশের প্রায় ৪৬ হাজার প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষালয়, ৪ হাজারের অধিক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৮৫০-এর অধিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ লক্ষ, ৫½ লক্ষ ও ৯ লক্ষ এবং শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১ লক্ষ, ২৩ হাজার ও ৩৭ হাজার। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে। ৯৫টি পৌরাঞ্চলে বালকদের জন্য এবং ১০টি পৌরাঞ্চলে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ৯টি: আগ্রা, আলীগড় মুসলিম, এলাহাবাদ, বানারস হিন্দু, গোরখপুর, লখনৌ, রুড়কি, কুরুক্ষেত্র এবং সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী)। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৩ হাজারের অধিক, শিক্ষকের সংখ্যা ২৩ শতাধিক; রাজ্যের ১৪২টি অনুমোদিত ডিগ্রী কলেজে ছাত্র ও শিক্ষক -সংখ্যা যথাক্রমে ৫০ হাজারের অধিক এবং ২ হাজারের অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মধ্যে আলীগড় মুসলিম, এলাহাবাদ, বানারস হিন্দু, লখনৌ, রুড়কি ইত্যাদি আবাসিক। রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চ মানের শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধ। বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নোলজির বিভিন্ন শাখায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব, সংস্কৃত ইত্যাদিরও বিশেষ চর্চা হয়। কাশীর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন উল্লেখযোগ্য। কানপুরের ইন্‌স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজিতে প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চ মানের পাঠ্যক্রম চালু আছে। এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত শিক্ষা এবং গবেষণা -কেন্দ্রগুলিও উল্লেখযোগ্য: বীরবল সাহ্‌নী ইন্‌স্টিটিউট অফ প্যালিওবটানি, শীলা ধর ইন্‌স্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স, এলাহাবাদ এগ্রিকাল্‌চারাল ইন্‌স্টিটিউট, ন্যাশন্যাল শুগার ইন্‌স্টিটিউট, জে. কে. ইন্‌স্টিটিউট অফ সোশিওলজি, ইকলজি অ্যাণ্ড হিউম্যান রিলেশন্‌স, বলবন্ত বিদ্যাপীঠ রুরাল ইন্‌স্টিটিউট ও ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ।

এই রাজ্যের সামাজিক উৎসবাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

হিন্দুদের প্রধান উৎসব দশেরা বা রামলীলাতে রামায়ণ-কাহিনী কথিত ও অভিনীত হয়। দশম দিবসের 'ভরত-মিলাপ' (ভরতের সহিত রামের মিলন) অনুষ্ঠান জন-সাধারণের মিলন-উৎসব।

কার্তিকী অমাবস্যায় রাবণবিজয়ী রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের স্মরণার্থে দেওয়ালি (দীপাবলী) উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষে শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে আবাহন করা হয়।

ফাল্গুনী শুক্লা পঞ্চমীতে বসন্ত-উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি উৎসবে পরস্পরকে রঞ্জিত করিয়া জনসাধারণ হোলিকারূপী অসুরশক্তির উপর প্রহ্লাদরূপী সুরশক্তির বিজয়-উৎসব পালন করে। মথুরা হইতে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে রাধা এবং কৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া কথিত বরসানা এবং নন্দগাঁওতে এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এক গ্রামের মহিলারা অন্য গ্রামের পুরুষদের উপর রং নিক্ষেপ করে এবং তাহাদিগকে যষ্টিদ্বারা মৃদু প্রহার করে; পুরুষেরা শুধুমাত্র চামড়ার ঢাল এবং হরিণের শিং দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে। বৃন্দাবনে শ্রাবণ মাসে শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরে মহোৎসব, মথুরায় রথযাত্রা, বনযাত্রা ও রাসলীলা, কংসমেলা, ফতেপুর সিক্রীতে কংসমেলা ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য উৎসব। মুসলমানদের প্রধান উৎসব মহরম, ঈদ-অল্‌-ফিতর্‌, ঈদ-উজ্‌-জুহা, সব্‌-এ-বরাত ইত্যাদি।

এলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনার (এবং সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী লুপ্ত সরস্বতীর) সংগমস্থল প্রয়াগ হিন্দুদিগের অতি পুণ্য তীর্থ; প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় এখানে পুণ্যস্নানের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিপুল লোকসমাগম হয়। শোণপুরের নদীসংগমও হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ। হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, দেবপ্রয়াগ, গড়মুক্তেশ্বর, সরন, ডালমউ, বারাণসী ইত্যাদি স্থানে পুণ্যস্নানের জন্য বিশাল জনসমাবেশ হয়।

হরিদ্বার, অযোধ্যা, বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান। বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দির সুবিখ্যাত। বৃন্দাবনে আকবরের শাসনকালে নির্মিত সুন্দর মন্দিরগুলির মধ্যে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মন্দিরটি অতি মনোহর।

ভারত-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান রঙ্গমঞ্চ উত্তর প্রদেশে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ধর্মীয় গৌরব-বিশিষ্ট অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। তাহাদের মধ্যে বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ, সারকি রাজাদের দ্বারা নির্মিত জৌনপুরের বিশাল মসজিদগুলি, মোগল সম্রাটদের অতিপ্রিয় ফতেপুর সিক্রী এবং আগ্রার মনোহর হর্ম্যাবলী —বিশেষতঃ তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, জুম্মা মসজিদ, মতি-মসজিদ, ইতিমাদউদ্দৌলার সমাধিমন্দির, দেওয়ান-ই-আম, —সিকান্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধ এবং মোগল-ভারতের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র লখনৌ-এর স্থাপত্যনিদর্শনসমূহ উল্লেখ-যোগ্য।

মুসৌরী এবং নৈনীতাল প্রসিদ্ধ শৈলাবাস।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : United Provinces of Agra and Oudh*, vol. I, Calcutta, 1908 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi ; Government of India, Publications Division, *Festivals of India*, Delhi, 1957.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

উত্তর মহাসাগর অন্য নাম সুমেরু মহাসাগর। এশিয়া, উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপের ভূখণ্ডের দ্বারা বেষ্টিত সুমেরু মহাসাগরের আয়তন ১৩৯৮৬০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৪০০০০০ বর্গ মাইল)। উত্তর মেরু অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহার কেন্দ্রাংশ সর্বদাই বরফাচ্ছন্ন থাকে। সুমেরু মহাসাগর অগভীর— গড় গভীরতা ৫০০ ফ্যাদম। ইহার তলদেশে কয়েকটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন, ১৫০০ ফ্যাদমের উপর গভীর বেসিন রহিয়াছে। যথা, সুমেরু বেসিন, নরওয়ে বেসিন এবং ব্যাফিন বেসিন। প্রথমটি সুমেরু অঞ্চলে এবং অপর দুইটি যথাক্রমে গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপের পূর্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত। সুমেরু বেসিন ও নরওয়ে বেসিনের মধ্যে একটি শৈলশিরা থাকিলেও ৭৫০ ফ্যাদম গভীর একটি খাত বেসিন দুইটিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে।

গ্রীনল্যাণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শৈলশিরা নরওয়ে বেসিনকে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই শৈলশিরাটির জন্য আইসল্যাণ্ড, ফ্যারো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি। ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে ইহার নাম ওয়াইভিল টম্‌সন গিরিশিরা। নরওয়ে বেসিনের মধ্যে জ্যান মায়েন দ্বীপ অবস্থিত। নরওয়ে বেসিনের ন্যায় ব্যাফিন বেসিনও ডেভিস প্রণালীর তলদেশে অবস্থিত একটি শৈলশিরার দ্বারা অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর হইতে বিচ্ছিন্ন।

ভূ-বিজ্ঞানীদের নিকট সুমেরু মহীসোপান আকর্ষণের বিষয়। ইহা অতিশয় প্রশস্ত এবং সাইবেরিয়ার উপকূলে ইহা পৃথিবীর প্রশস্ততম মহীসোপানে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর হিমবাহসৃষ্ট কয়েকটি খাত পাওয়া গিয়াছে।

সুমেরু সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়া প্রবাহিত স্রোতের মধ্যে পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ড স্রোতের উল্লেখ করা যায়। এই দক্ষিণমুখী স্রোত গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ডেনমার্ক প্রণালী দিয়া অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিতেছে। ইহারই এক শাখা— পূর্ব আইসল্যাণ্ড সুমেরু স্রোত— পূর্বে ঘুরিয়া দক্ষিণ নরওয়ে সাগরে প্রবাহিত হয়।

দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত উপসাগরীয় স্রোতের (গাল্‌ফ স্ট্রীম) একটি শাখা নরওয়ে স্রোত নামে নরওয়ে সাগরে ঢুকিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একটি শাখা ব্যারেণ্টস সাগরে প্রবেশ করে ও অপরটি উত্তরে প্রবাহিত হইয়া স্পিট্‌স্‌বার্জেন দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম দিয়া ঘুরিয়া যায়।

সুমেরু মহাসাগরের জল বেশি লোনা নয়। ইহার জলের লবণতা, উত্তাপ প্রভৃতি আঞ্চলিক সমুদ্রস্রোতের উপর সাধারণভাবে নির্ভরশীল। দক্ষিণগামী সমুদ্রস্রোত-বাহী হিমবাহ এই মহাসাগরের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

সুমেরু মহাসাগরে বিভিন্ন গভীরতায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত জলরাশির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে আর্কটিক সারফেস ওয়াটার, অ্যাটল্যান্টিক ওয়াটার এবং আর্কটিক ডীপ ওয়াটার।

দ্র H. U. Sverdrup, M. W. Johnson & R. H. Fleming, *The Oceans*, New Jersey, 1942; F. P. Shepard, *Submarine Geology*, New York, 1948; Ph. H. Kuemen, *Marine Geology*, New York, 1950.

অভিজিৎ গুপ্ত

উত্তরমীমাংসা বেদান্ত দ্র

উত্তর মেরু ভূ-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের এই পৃথিবী গোলাকার। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবী সূর্যের অংশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির পর পৃথিবী ক্রমাগত নিজের অক্ষের চারি দিকে আবর্তিত হইতে হইতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই দুইটি ঘটনা হইতেই পৃথিবীর উত্তর মেরুর সম্বন্ধে আমরা একটি ধারণা করিতে পারি।

কোনও একটি গোলক ক্রমাগত একই ভাবে যদি আবর্তন করে, তাহা কোনও একটি অক্ষকে ঘিরিয়াই আবর্তিত হইবে। গোলকের উপর সেই অক্ষটি দুইটি প্রান্তবিন্দুরও সৃষ্টি করিবে। পৃথিবীর উপর সেই দুইটি প্রান্তবিন্দুকে মেরুবিন্দু বলা হয়। এই দুইটি মেরুবিন্দু যোগ করিলে আমরা পৃথিবীর মেরুরেখা পাইব। পৃথিবী এই মেরুরেখার চারি দিকে আবর্তন করিতে করিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে একটি কক্ষতলের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর মেরুরেখা এই কক্ষতলের সহিত ৬৬½° কোণে হেলিয়া থাকে। পৃথিবীর এই দুইটি মেরুবিন্দুর একটিকে (গ্রীনল্যাণ্ড ও আর্কটিক উপসাগরের দিকে অবস্থিত) উত্তর মেরু ও অপরটিকে দক্ষিণ মেরু বলা হয়। সুমেরুর অক্ষাংশ ৯০°। সুমেরু ও উত্তরস্থিত চৌম্বক বিন্দু (নর্থ ম্যাগ্‌নেটিক পোল) এক নয়। রবার্ট এডুইন পেরি (১৮৫৬-১৯২০ খ্রী) সর্বপ্রথম (৬ এপ্রিল, ১৯০৯ খ্রী) উত্তর মেরুতে পদার্পণ করেন।

পৃথিবী ক্রমাগত তাহার আহ্নিক গতিবশতঃ মেরু-রেখার চারি দিকে আবর্তন করিলেও তাহার মেরুরেখাটি ঠিক একই দিকে স্থির হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রায় ৭২ বৎসর অন্তর উহা ১° করিয়া সরিয়া যায়। এত দীর্ঘ দিনে এই পরিবর্তন হয় বলিয়া, ইহাকে স্থির-ই কল্পনা করা হইয়াছে। পৃথিবীর এই মেরুরেখাকে উত্তর দিকে প্রলম্বিত করিলে আমরা ধ্রুবতারাকে পাই। এইজন্য ধ্রুবতারাকে মেরু নক্ষত্র বলা হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলটি নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত ও সূর্যরশ্মি সেখানে কোনও ঋতুতেই লম্বভাবে কিরণপাত করিতে পারে না। তজ্জন্য এখানে শীতের প্রাবল্য। সব ঋতুতেই এই অঞ্চল তুষারাচ্ছন্ন থাকে। তাহা ছাড়া মেরুরেখাটি সবদাই হেলানো অবস্থায় থাকে বলিয়া এখানে গ্রীষ্মকালে ৬ মাস দিবালোক ও শীতকালে ৬ মাস অন্ধকার থাকে। গ্রীষ্মের সময় রাত্রেও সূর্য দেখা যায় বলিয়া উত্তর মেরু অঞ্চলকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলা হয়।

নিশীথরঞ্জন কর

উত্তরা মৎস্যদেশের অধিপতি বিরাটের কন্যা, অভিমন্যুর পত্নী এবং রাজা পরিক্ষিতের জননী। উত্তরাকে বিরাটরাজ প্রথমে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিতে চাহেন। কিন্তু অর্জুন তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যু যখন নিহত হন, উত্তরা তখন গর্ভবতী। পরে অশ্বত্থামা-পরিত্যক্ত ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাবে উত্তরার গর্ভ নষ্ট হয় এবং তিনি মৃত পুত্র প্রসব করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই মৃত শিশুর জীবন দান করিয়া তাহার নাম রাখেন পরিক্ষিৎ।

দ্র মহাভারত, বিরাটপর্ব, ৬৬-৬৭ ও সৌপ্তিকপর্ব, ১৫-১৬।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

উত্তরাধিকার কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্রাদির যে স্বত্ব জন্মে, তাহাকেই উত্তরাধিকার বলা হয়। উত্তরাধিকারী কাহারা হইবে সেই সম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে।

হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি দুই প্রকার উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশে সাধারণতঃ জীমূতবাহন-লিখিত 'দায়ভাগ' অনুসারে উত্তরাধিকার নির্ণীত হইত। বাংলা দেশের বাহিরে প্রধানতঃ বিজ্ঞানেশ্বর-লিখিত 'মিতাক্ষরা'র প্রচলন ছিল। দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরার উত্তরাধিকারবিধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিতাক্ষরার মতে জন্মিবামাত্রই পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বত্ব জন্মে; দায়ভাগ-মতে পূর্বস্বামীর মৃত্যু হইলে তবে তাহার উত্তরাধিকারীর স্বত্ব জন্মে। যাহা হউক, এখন আর দুই রকম বিধি প্রচলিত নাই। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু উত্তরাধিকারবিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ আইন (ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী, প্রার্থনাসমাজী, বীরশৈব ও লিঙ্গায়েত সহ) সমস্ত হিন্দু এবং বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য। যাহারা মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী বা ইহুদী নহে কিংবা যাহাদের উত্তরাধিকার বিষয়ে অন্য কোনও আইন বা প্রথা নাই তাহাদের সম্পর্কেও এই আইন প্রযোজ্য। তবে কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে এই নূতন আইন আদৌ কার্যকরী নহে এবং মিতাক্ষরা-শাসিত যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পূর্বের মত মিতাক্ষরা-মতেই নির্ণীত হইবে। তবে মিতাক্ষরা-শাসিত পরিবারভুক্ত কোনও ব্যক্তির মাতা, পত্নী, কন্যা প্রভৃতি স্ত্রী-উত্তরাধিকারী অথবা উহাদের মারফত কোনও প্রথম শ্রেণীর পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকিলে যৌথ সম্পত্তিতে তাহার অংশের উত্তরাধিকার মিতাক্ষরা-মতে না হইয়া পূর্বোক্ত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারেই হইবে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মৃত পুরুষ হিন্দুর প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। ইহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা সকলে এক সঙ্গে উত্তরাধিকারী হইবে:

পুত্র, কন্যা, বিধবা পত্নী, মাতা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা পত্নী, পূর্বমৃত পুত্রের মৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের মৃত পুত্রের বিধবা পত্নী।

এই সমস্ত উত্তরাধিকারীগণের নিজ নিজ অংশ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত হইবে: বিধবা পত্নী বা একাধিক বিধবা পত্নী থাকিলে সমস্ত বিধবা পত্নী এক অংশ এবং পুত্র, কন্যা ও মাতা প্রত্যেকে এক এক অংশ। পূর্বমৃত পুত্রের শাখা ও পূর্বমৃত কন্যার শাখা প্রত্যেকে এক এক অংশ।

পূর্বোক্ত উত্তরাধিকারীগণের কেহ না থাকিলে, অধিকারীর ক্রম নিম্নানুরূপ হইবে: ১. পিতা; ২. পৌত্রীর পুত্র ও কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী; ৩. দৌহিত্রের পুত্র ও কন্যা, দৌহিত্রীর পুত্র ও কন্যা; ৪. ভ্রাতার পুত্র ও কন্যা, ভগিনীর পুত্র ও কন্যা; ৫. পিতামহ, পিতামহী; ৬. বিধবা বিমাতা, ভ্রাতার বিধবা পত্নী; ৭. পিতার ভ্রাতা ও ভগিনী; ৮. মাতার পিতা ও মাতা; ৯. মাতার ভ্রাতা ও ভগিনী।

হিন্দু স্ত্রীলোক এখন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তিতেই নির্ব্যূঢ় স্বত্বের অধিকারী। বসতবাটী সম্পর্কে বিশেষ বিধিনিষেধ আছে। হিন্দু স্ত্রীলোকের ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে নির্ণীত হয়:

১. পুত্র ও কন্যা, মৃত পুত্র ও মৃত কন্যার সন্তান (পুত্র ও কন্যার অংশ), পতি, তদভাবে ২. পতির উত্তরাধিকারীগণ, তদভাবে ৩. মাতা ও পিতা, তদভাবে ৪. পিতার উত্তরাধিকারীগণ ও তদভাবে ৫. মাতার উত্তরাধিকারীগণ।

কিন্তু পুত্র বা কন্যা বা পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান না থাকিলে পিতা বা মাতা হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি পিতার উত্তরাধিকারীগণ পাইবে— অন্যেরা নহে। তদ্রূপ পতি বা শ্বশুর হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি পতির উত্তরাধিকারীগণ পাইবে, অন্যেরা নহে।

পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা পত্নী, পূর্বমৃত পুত্রের মৃত পুত্রের বিধবা পত্নী ও ভ্রাতার বিধবা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিলে উত্তরাধিকারী হয় না। কোনও হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে, ধর্মান্তর গ্রহণের পরে জাত তাহার সন্তানেরা তাহাদের কোন হিন্দু আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না। কোনও উত্তরাধিকারী না থাকিলে মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের অধিকারে আসে।

মুসলমান উত্তরাধিকার মুসলমান আইন অনুসারে নির্ণীত হয়। শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার আইনে অনেক পার্থক্য আছে। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ের হানাফী শাখাভুক্ত। এই শাখার আইনে তিন প্রকার উত্তরাধিকারী বর্ণিত আছে— অংশগ্রাহী, অবশিষ্টগ্রাহী ও দূর আত্মীয়। অংশগ্রাহী কেহ থাকিলে, সে বা তাহারা নির্দিষ্ট অংশ পাইবে; বাকি অবশিষ্টগ্রাহীরা তাহাদের অংশ অনুসারে পায়। অংশগ্রাহী বা অবশিষ্টগ্রাহী কেহ না থাকিলে, দূর আত্মীয়দের মধ্যে

সম্পত্তি বণ্টিত হইয়া থাকে। মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে অংশ বণ্টন এক জটিল ব্যাপার। মুসলমান আইনে স্ত্রী-পুরুষের একত্র উত্তরাধিকার বহুকালাবধি স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে নির্ণীত হয়। ঐ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীষ্টান, পার্শী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহ করিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারও ঐ আইন অনুসারে হইয়া থাকে— ঐ ব্যক্তি হিন্দু বা মুসলমান হইলেও হিন্দু বা মুসলমান আইন অনুসারে নহে।

উইল করা থাকিলে উইলের নির্দেশ অনুসারে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। তবে উত্তরাধিকারীগণের সম্মতি ব্যতীত কোনও মুসলমান তাহার সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক উইল দ্বারা বণ্টন করিতে পারে না।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্যের উপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দায়কর আইন (এস্টেট ডিউটি অ্যাক্ট) অনুসারে বিভিন্ন হারে দায়কর দিতে হয়।

কেহ যদি মৃত্যুর পূর্বে উইল করিয়া যায় এবং সেই উইলে এক বা একাধিক অছি নির্বাচিত থাকে, তাহা হইলে সেই উইল অনুসারে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য অছিদিগকে আদালত হইতে প্রবেট বা উইলের প্রমাণপত্র লইতে হয়। উইলে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীগণ অছির নিকট হইতে সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পায়। কোনও উইল না থাকিলে অথবা উইলে উল্লিখিত কোনও ব্যক্তি অছি হিসাবে কার্য করিতে অসম্মত হইলে অথবা প্রবেট লইবার পূর্বেই অছির মৃত্যু হইলে এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আদালত হইতে লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ত্যক্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার অধিকারপত্র লওয়া যায়। আবার মৃতের পাওনা অর্থ ইত্যাদি আদায় করিবার জন্য, অন্যথা প্রবেট অথবা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর প্রয়োজন না হইলেও সাক্সেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ উত্তরাধিকারের নিদর্শনপত্র আদালত হইতে লইতে হয়। প্রবেট, লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সাক্সেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি লইবার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে কোর্ট ফি দিতে হয়।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

উত্তরায়ণ অয়ন দ্র

উত্তানপাদ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, মাতার নাম শতরূপা। সুরুচি ও সুনীতি নামে উত্তানপাদের দুই স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। সুরুচি রাজার নিতান্ত প্রেয়সী ছিলেন। সুনীতি তদ্রূপ প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে ধ্রুবের মাতার নাম সুনৃতা।

দ্র ভাগবত, ৪।৮

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

উদয়গিরি ওড়িশার অসিয়া পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তস্থিত পাহাড়। ২০°৩৮´ উত্তর, ৮৬°১৬´ পূর্ব। উদয়গিরি কটক জেলায় অবস্থিত। বিরূপা নদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত। কেন্দ্রপাড়া রোড স্টেশন হইতে পটামুণ্ডেই খালের ধার দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথে এখানে আসিতে হয়। কটক হইতে উদয়গিরির দূরত্ব ৫১½ কিলোমিটার (৩২ মাইল)। পাহাড়টি উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খানিকটা বাঁকিয়া পূর্ব পাদদেশে এক অর্ধচন্দ্রাকার স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকার উপরিভাগে বুদ্ধ, জটামুকুট লোকেশ্বর, জম্ভল প্রমুখ বৌদ্ধ মূর্তি ও একশিলা উদ্দেশিক স্তূপ পাওয়া যায়। ইহাতে এই ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে মূল্যবান প্রত্নসম্পদের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা দৃঢ় হয়। তদুপরি, খননকার্য পরিচালিত হইলে, এখানকার বহুসংখ্যক ঢিবি হইতেও যে স্তূপ, সংঘারাম, বৌদ্ধ দেবায়তন প্রভৃতি উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে রাণক ব্রজনাগ কর্তৃক প্রদত্ত একটি শৈলখাত সোপানযুক্ত বাপী এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। চতুষ্কোণ ঢিবিগুলির একটিতে আংশিক অনাবৃত একটি ইটের প্রকোষ্ঠ দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে এখানে বিরাটাকার পূর্ণাবয়ব চতুঃশালা সংঘারাম নিহিত। প্রকোষ্ঠটির পশ্চাৎ-দেওয়ালে সংলগ্ন আছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন বুদ্ধদেবের সুন্দর প্রতিমা; প্রকোষ্ঠটি ছিল সংঘারামের মন্দির। পাটনা সংগ্রহালয়ে কিছুকাল পূর্বে যে সুচারু কারুকার্যবহুল খণ্ডালাইট পাথরের দরজার ফ্রেম স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা এই সংঘারাম অথবা ইহারই পার্শ্ববর্তী অপর একটির প্রবেশিকা অলংকৃত করিত। এই প্রবেশিকা-সংলগ্ন দেওয়ালের শোভা-বর্ধনকারী অনবদ্য গঙ্গামূর্তি (খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক) বর্তমানে পাটনা সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত আছে। ইহার দোসর যমুনামূর্তি এই স্থলেই একটি অর্বাচীন মন্দিরে ব্রাহ্মণ্যদেবী হিসাবে পূজিত হইতেছেন। আংশিক প্রকট

একটি ইষ্টকনির্মিত স্তূপের দুই দিকে দুইটি বুদ্ধবিগ্রহ উদয়গিরির ভাস্কর্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্তিসমুদায়ের মধ্যে লোকেশ্বরের একটি বৃহৎ প্রতিমার পৃষ্ঠভাগে সুদীর্ঘ ধারণী উৎকীর্ণ; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতকে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি বজ্রযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাহাড়টির পশ্চিম গাত্রে একটি প্রাকৃতিক গুহার পার্শ্বে কতিপয় বৌদ্ধ দেবদেবীর উদ্গত মূর্তিতে এখানকার অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা আপনাদের শৈলখাত রূপকর্মের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়পর্ব এই বৌদ্ধ কেন্দ্রের বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ।

উদয়গিরির ভাস্কর্যকৃতির কিছু কিছু নিদর্শন বর্তমানে পাটনা সংগ্রহশালা, কলিকাতায় ভারতীয় সংগ্রহশালা এবং কটকের যোল-পুয়-মার মন্দিরে সংরক্ষিত আছে।

এই স্থলে এবং ইহার প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) দক্ষিণস্থ ললিতগিরির (এ স্থলেও বহু বৌদ্ধমূর্তি ও ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান) প্রত্নসম্পদের প্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাসে (১৮৮৭ খ্রী)। প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে ললিতগিরি অথবা উদয়গিরিই হইতেছে হিউএন্-ৎসাঙ্-বর্ণিত উ-তু (ওড্র) দেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান পুষ্পগিরি; অবশ্য এখনও ইহার স্বপক্ষে কোনও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ মিলে নাই।

দ্র হারানচন্দ্র চাকলাদার, 'উড়িষ্যার সুবৃহৎ প্রাচীন বুদ্ধপীঠ', প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ; Haran Chandra Chakladar, 'A great Site of Mahayana Buddhism in Orissa', *Modern Review*, August, 1928; Ramaprasad Chanda, 'Excavations in Orissa', *Memoirs of the Archaeological Survey of India. no. 44*, Calcutta, 1930.

দেবলা মিত্র

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত (২০°১৬´ উত্তর এবং ৮৫°৪৭´ পূর্ব) দুইটি বালিপাথরের পাহাড়। একটি খণ্ডগিরি ও তাহার পূর্বোত্তরে উদয়গিরি। উচ্চতা যথাক্রমে ৩৮ মিটার (১২৩ ফুট) ও ৩৪ মিটার (১১০ ফুট)। দুইটিতেই জৈন সাধুদের বসবাসের জন্য শৈলখাত গুহা ও পুষ্করিণী আছে। খণ্ডগিরিশিখরে অনতিপ্রাচীন মন্দিরও বিদ্যমান; ইহাতে এখনও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের রাজত্বকালে তাঁহারই নেতৃত্বে স্থানটি জৈন ধর্মের একটি কেন্দ্ররূপে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। কয়েকটি গুহা অবশ্য প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। উদয়গিরিতে হাথীগুম্ফায় উৎকীর্ণ খারবেলের সপ্তদশ পঙ্ক্তির 'লেখে' তাঁহার বিজয়যাত্রা ও জৈনধর্ম-সমর্থনের বিবরণ বর্ণিত আছে। তিনি, তাঁহার রানী ও তদ্বংশজ কূদেপ ও বড়ুখ যে এখানে গুহা খনন করাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদের শিলালেখ। এই লেখগুলিই পরাক্রান্ত মহামেঘবাহন বংশের অস্তিত্বের একমাত্র স্বাক্ষর। খারবেল বংশের পর বহুদিন উদয়গিরি-খণ্ডগিরির কোনও লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অবশ্য তাহার পরেও জৈন সন্ন্যাসীরা যে গুহাগুলি আবাস রূপে ব্যবহার করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উদয়গিরির গণেশগুম্ফায় অষ্টম-নবম শতকের হরফে উৎকীর্ণ ভৌম-রাজবংশের শান্তিকরদেবের সময়কার একটি লেখ আছে। একাদশ শতকে সোমবংশীয় রাজা উদ্যোতকেসরীর সময়ে খণ্ডগিরির কয়েকটি বাসগুহায় জৈন তীর্থংকর ও শাসন-দেবীদের মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়া গুহাগুলিকে পূজাস্থলে পরিণত করা হয় এবং সম্ভবতঃ দুই-একটি মন্দিরও নির্মিত হয়। গঙ্গ ও গজপতি -রাজবংশের সময়েও খণ্ডগিরি জৈনধর্মের কেন্দ্ররূপে গণ্য ছিল। পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে খণ্ডগিরির ত্রিশূলগুম্ফায় তীর্থংকরদের উৎকীর্ণ দিগম্বর-মূর্তির সংযোজন হয়। খণ্ডগিরিশিখরে ঋষভদেবের মন্দিরটি আনুমানিক অষ্টাদশ শতকে এবং পার্শ্বনাথের মন্দিরটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে, প্রাচীন শৈলখাত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও উদয়গিরি-খণ্ডগিরির বিশেষ গুরুত্ব। দুইটি পাহাড়েই বহু খাতগুহা বর্তমান। ইহাদের মধ্যে উদয়গিরিতে ১৮টি এবং খণ্ডগিরিতে ১৫টি দর্শনীয়। উদয়গিরিতে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে খাত রানীগুম্ফা এইগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা অলংকারবহুল। বেশির ভাগ গুহারই খননকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক। এই সময়কার গুহাগুলিতে একটি বা একাধিক কক্ষ আছে; কক্ষের সম্মুখে সাধারণতঃ প্রলম্বিত স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। রানীগুম্ফাতে অঙ্গনের তিন দিকে বারান্দা এবং বারান্দার পশ্চাতে কক্ষশ্রেণী। এই গুম্ফাটি দ্বিতল, দোতলার সামনে অলিন্দ। আরও কয়েকটি গুহাও দ্বিতল। কক্ষগুলি অপ্রশস্ত, তাহাদের দরজা ও ছাদ অত্যন্ত নিচু। মেঝে দরজার দিকে ঢালু, ইহাই ছিল সাধুদের শয্যা; জৈন সন্ন্যাসীদের জীবনচর্চায় কৃচ্ছ্রসাধন সর্বত্রই প্রতিভাত।

চিত্রোৎকীর্ণ বেশ কয়েকটি গুহা সমসাময়িক শিল্পীদের তক্ষণশিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদয়গিরির রানীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী ও গণেশগুম্ফা এবং খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফা। এইগুলির উদ্‌গত চিত্ররাজিতে সমসাময়িক মধ্য দেশের শৈলীই প্রতিফলিত; শিল্পমান খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারুতের শিল্পকৃতি হইতে উচ্চস্তরের এবং সাধারণভাবে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের সাঁচীর সহিত তুলনীয়।

খ্রীষ্টপূর্ব যুগের গুহাতে প্রতীকপূজাই উৎকীর্ণ। পরবর্তী কালে প্রতীকপূজার স্থান অধিকার করে তীর্থংকরদের মূর্তিপূজা। এই মূর্তিগুলি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই স্থান অন্ততঃ দশম শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কেন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছে।

সাম্প্রতিক খননের ফলে উদয়গিরির শীর্ষদেশে, ঠিক খারবেলের লেখের উপর, মাকড়াপাথরের একটি দেবায়তনের শূর্পাকার নিম্নাংশ ও ভূমি এবং হাথীগুম্ফার সম্মুখস্থ অঙ্গন সংযোগকারী একটি ঢালু আয়ত প্রস্তরাকীর্ণ রাস্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লেখের সান্নিধ্যবশতঃ মনে হয় উভয়ই খারবেল-নির্মিত এবং দেবায়তনটি খারবেলের লেখে উল্লিখিত মন্দির। এই অঞ্চলে প্রাচীন বসতি আরম্ভ হয় জৈন ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্বে। তাই খননসময়ে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম (মাইক্রোলিথ) হাতিয়ার ও একটি নবাশ্ম (নিওলিথ) হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত খণ্ডগিরির পাদদেশে একটি প্রত্নাশ্মযুগের (প্যালিওলিথ) হস্তকুঠারও পাওয়া যায়।

দ্র J. H. Marshall, 'The Monuments of Ancient India,' *The Cambridge History of India*, vol. I, ed., E. J. Rapson, Cambridge, 1922; *Bihar and Orissa Gazetteers: Puri*, revised edition, Patna, 1929; B. Bhattacharya, *The Jaina Iconography*, Lahore, 1939; D. C. Sircar, *Select Inscriptions*, vol. I, Calcutta, 1942; Debala Mitra, *Udayagiri and Khandagiri*, New Delhi, 1960.

দেবলা মিত্র

উদয়ন পুরু (ভরত/কুরু) বংশীয় রাজা বুদ্ধদেবের জীবিতকালে উদয়ন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বৎসরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী নগর (এলাহাবাদের পশ্চিমে)। অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে তিনি হরণপূর্বক বিবাহ করেন।

উদয়নের শাসনকালে বৎসরাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁহার আধিপত্য ভর্গরাজ্যেও প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রথমে বিরূপ থাকিলেও উদয়ন পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বোধি নামক তাঁহার এক পুত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বোধি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা অজ্ঞাত। উদয়নের পরে বৎসরাজ্য সম্পর্কে আর বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

ভাস-রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং হর্ষ-রচিত 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী' নামক বিখ্যাত তিনটি সংস্কৃত নাটকের নায়ক উদয়ন। কথাসরিৎসাগরেও তাঁহার দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উদয়নারায়ণ প্রতাপনারায়ণের দৌহিত্র, উলাইলের গৌরচরণ মিত্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চন্দ্রদ্বীপে (বাকলা) বসু পরিবারের পর ইনি রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু ঢাকার নবাবের চাখার-নিবাসী দুই শ্যালক কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হন। পরে তাঁহার শৌর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া নবাব তাঁহাকে জমিদারি প্রত্যর্পণ করেন। ম্যাসি সাহেবের রিপোর্ট (১৮ জুন, ১৮০১ খ্রী) হইতে জানা যায় যে উদয়নারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে অধিকার সমর্থনের সনদ পাইয়াছিলেন। দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ উদয়নারায়ণ ছিলেন মিত্রবংশের সর্বোত্তম নৃপতি। চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত ঢাকার কয়েকটি পরগনারও তিনি জমিদার ছিলেন। তাঁহার অনুজ রাজনারায়ণ জমিদারির অংশ পান নাই, তবে প্রতাপপুরের তালুক পাইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের পৌত্র জয়নারায়ণের সময়ে বকেয়া খাজনার দায়ে জমিদারি নিলাম হইয়া যায় (১৭৯৯ খ্রী)।

জগদীশনারায়ণ সরকার

উদয়পুর রাজস্থান রাজ্যের জেলা ও জেলা-সদর। শহরের অবস্থান ২৭°৪২´ উত্তর, ৭৫°৩৩´ পূর্ব। উদয়পুর জেলার আয়তন ১৭৬৪৩ বর্গ কিলোমিটার (৬৮১২ বর্গ মাইল)। ভীম, রাজসমন্দ, সারদা, উদয়পুর ও বল্লভনগর— এই পাঁচটি মহকুমা লইয়া উদয়পুর জেলা গঠিত। উদয়পুর ব্যতীত এই জেলায় আরও দুইটি ক্ষুদ্র পৌর শহর আছে— উহাদের নাম ভিন্দর ও দেওগড়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উদয়পুর একটি দেশীয় রাজ্য ছিল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৪৬৬২৭৬ (৭৫৫৩৫১ পুরুষ ও ৭০৮৯২৫ স্ত্রীলোক)। স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ৯৩৯ : ১০০০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ৮৩ (প্রতি বর্গ মাইলে ২১৫)। উদয়পুর পৌরাঞ্চলে ১১১১৩৯ জন লোকের বাস। তন্মধ্যে ৬০২৮৪ জন পুরুষ ও ৫০৮৫৫ জন স্ত্রীলোক। শহরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ৮৪৪ : ১০০০।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গুহদত্ত নামে জনৈক প্রধান অধুনাবিলুপ্ত দেশীয় রাজ্য উদয়পুরের পশ্চিমাংশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরেরা গুহিল বা গুহিলপুত্র নামধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭২৫ হইতে ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরবীয়গণ যখন এই অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন এই বংশের নবম রাজা বাপ্পা রাওয়ল প্রথম খুম্মান -এর নিকট তাহারা পরাজিত হয়। আরব-অভিযানের পর বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া প্রথম খুম্মান চিতোর দুর্গ এবং সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একাংশ অধিকার করেন। ইঁহার পূর্বে, আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই অঞ্চলে সম্ভবতঃ মোরি (মৌর্য ?) বংশ রাজত্ব করিত। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর গুহিলপুত্রগণ প্রতিহার সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন।

দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে গুহিলবংশের মহারাজাধিরাজ ভর্তৃপট্ট মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উদয়পুরের কয়েক মাইল উত্তরে আঘাট-এ (বর্তমান অহর) তাঁহার রাজধানী ছিল। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভর্তৃপট্টের পুত্র অল্লট সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল প্রতিহারকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আঘাট গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কর্ণাট, লাড়, মধ্য দেশ ও টক্ক হইতে বণিকেরা এখানে আসিত। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কোনও সময়ে পরমাররাজ মুঞ্জ গুহিলরাজের হস্তীবাহিনী ধ্বংস করেন এবং রাজধানী আঘাট লুণ্ঠন করেন। পরাজিত গুহিল-রাজ (সম্ভবতঃ শক্তিকুমার) হস্তীকুণ্ডীর রাষ্ট্রকূট রাজা ধবলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দশম শতাব্দীর শেষে শক্তিকুমারের পুত্র অম্বাপ্রসাদ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় নাগহ্রদ মেবারের প্রধান ও আঘাট দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধর রাজা ক্ষেমসিংহের উত্তরাধিকারীগণ রাবল বা রাজকুল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ক্ষেমসিংহের ভ্রাতা রাহপ-এর উত্তরাধিকারীগণ রাবলদের অধীনে শিশদ-এর সামন্ত রাজা ছিলেন এবং রানা নামে অভিহিত হইতেন। রাহপ শিশোদীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাডোলের চাহমান (চৌহান) বংশীয় রাজা রাও মেবার অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু কুমারসিংহ তাঁহাকে তাড়াইয়া স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন (১১৮২ খ্রী)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জৈত্রসিংহের রাজত্বে গুহিলগণের রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। চিত্রকূট (বর্তমান চিতোর) এই সময় গুহিলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয়তল (জৈত্রসিংহ) -এর রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস মেবার আক্রমণ করিয়া রাজধানী নাগহ্রদ ধ্বংস করেন কিন্তু মেবার জয় করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুহিল সমরসিংহের রাজ্য চিতোর হইতে আবু পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর ভ্রাতা উলুঘ খাঁ গুজরাট আক্রমণ করেন। নিজের রাজ্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সমরসিংহ তাঁহার বশ্যতা মানিয়া লন। সমরসিংহের পুত্র রত্নসিংহের রাজ্যকালে আলাউদ্দীন খিলজী চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ও চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা শের শাহের হস্তগত হয়। ইসলাম শাহ্ শূরের রাজত্বকালে মেবারের (উদয়পুর) রানা আফগান-অধিকারভুক্ত অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। (মোগল যুগে মেবারের ইতিহাস 'প্রতাপসিংহ', 'আকবর', 'জাহাঙ্গীর' ও 'শাহ্‌জাহান' প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে)। আকবর চিতোর অধিকার করার পর রানা উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারানা রাজসিংহ মার-বাড়ের অজিতসিংহকে সমর্থন করায় এবং জিজিয়া কর দিতে অস্বীকার করায় মোগল বাহিনী রাজধানী উদয়পুর ও চিতোর দুর্গ অধিকার করে। তাহারা উদয়পুর ও চিতোরে ২৩৯টি মন্দির ধ্বংস করে। অবশেষে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রানা জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের মহারানা অমরসিংহ অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সহিত একযোগে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই রাজ্য সিন্ধিয়া, হোলকার এবং আমীর খাঁর সৈন্য-বাহিনী এবং পিণ্ডারি দস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় (১৮০৬ খ্রী)।

মেবারের সন্ধি (১৮১৮ খ্রী) অনুযায়ী উদয়পুরের রানা ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করেন ও বাৎসরিক কর দিতে প্রতিশ্রুত হন। ব্রিটিশ সরকার উদয়পুর রাজ্য রক্ষা

করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রানার সর্বময় কর্তৃত্ব মানিয়া লন। উদয়পুরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিলে উদয়পুর রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা ভারতের অন্তর্গত রাজস্থান ইউনিয়নে যোগ দেয়। পরে (১৯৪৯ খ্রী) 'গ্রেটার রাজস্থান ইউনিয়ন' গঠিত হইলে উদয়পুর তাহার অন্তর্গত হয়।

উদয়পুর জেলার প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৮৯১ জন গ্রামে ও ১০৯ জন শহরে বাস করে। এই জেলার মোট কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭৭৩৫৫৩। তন্মধ্যে ৪৬২৬১৯ জন পুরুষ ও ৩১০৯৩৪ জন স্ত্রীলোক। ৩৫০৩২৭ জন পুরুষ ও ২৬৫২৩৪ জন স্ত্রীলোক কৃষিকর্মে, ২২৭৮৪ জন পুরুষ ও ১৯০০৯ জন স্ত্রীলোক গৃহশিল্পে এবং ১৮৯১৯ জন পুরুষ ও ১৭৮৯ জন স্ত্রীলোক ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। উদয়পুর পৌরাঞ্চলে ২৯৪৯১ জন পুরুষ ও ৫৪২১ জন স্ত্রীলোক কর্মরত। তন্মধ্যে ৩৬৯৩ জন পুরুষ ও ১৯৯ জন স্ত্রীলোক গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে, ৩১৭৬ জন পুরুষ ও ৬৬৪ জন স্ত্রীলোক গৃহাদি নির্মাণকার্যে, ৫৪০৮ জন পুরুষ ও ৭৩৫ জন স্ত্রীলোক ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং ৩৪১১ জন পুরুষ ও ২৮ জন স্ত্রীলোক পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ -ব্যবস্থায় নিযুক্ত।

উদয়পুর অভ্র খনির বড় কেন্দ্র। উদয়পুর জেলার জাওয়র-এ গাঢ়তাপন্ন সীসা (লেড কন্‌সেন্‌ট্রেট) ও গাঢ়তাপন্ন দস্তা (জিঙ্ক কন্‌সেন্‌ট্রেট) প্রস্তুত করা হয়। উদয়সাগর ও উমরা -তে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উদয়পুরে একটি কাপড়ের কল এবং আকরিক দস্তা হইতে দস্তা নিষ্কাশিত করার একটি কল (জিঙ্ক স্মেল্‌টার) স্থাপিত হইয়াছে।

বল্লভনগরের বেরোচ এ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেচ-প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। ইহার ফলে ৪২০০ হেক্টরের (১০৫০০ একর) অধিক জমিতে জলসেচ হইতে পারে। চম্বল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উদয়পুর জেলায়— বিশেষ করিয়া উদয়পুর শহর, জাওয়র প্রভৃতি অঞ্চলে— বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। 'চেম্বার অফ কমার্স, উদয়পুর', রাজ্যের অন্যতম বণিক-সমিতি।

জেলায় ১৬২৩০২ জন পুরুষ ও ৩৬৭৭৮ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। অর্থাৎ প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১৩৬ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। জেলার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই অনুপাত যথাক্রমে ২১৫ ও ৫২। উদয়পুর পৌরাঞ্চলে ৩৮৩৭৫ জন পুরুষ ও ১৮১৮৬ জন স্ত্রীলোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত। উদয়পুরে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১১টি। উহাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষক-শিক্ষণ এবং সমাজসেবা-শিক্ষণের কলেজও আছে। উক্ত দশটি কলেজের মধ্যে একটিতে সন্ধ্যায় ক্লাশ হয়। 'বিদ্যা-ভবন রুরাল ইন্‌স্টিটিউট' গ্রামীণ শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র। উদয়পুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'ভারতীয় লোক কলা মণ্ডল' ও 'বিদ্যাভবন সোসাইটি' উল্লেখযোগ্য।

উদয়পুর শহর ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রানা উদয়সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উদয়পুরের পাহাড় ও হ্রদগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। শহরে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজ-প্রাসাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রানা উদয়সিংহ এই প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। তাহার উত্তরাধিকারীগণ মূল প্রাসাদে বহু নূতন মহল সংযোজন করেন। জগমন্দির ও জগনিবাস প্রাসাদ পিছোলা হ্রদের দুইটি দ্বীপের উপর নির্মিত। একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়া এই হ্রদটি তৈয়ারি করা হইয়াছে। জগনিবাস প্রাসাদটি শ্বেত পাথরে নির্মিত। ঐ প্রাসাদটি প্রায় ২ হেক্টর (৪ একর) জমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী জগদীশমন্দিরের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। ফতে-সাগর হ্রদ প্রস্থে ১ কিলোমিটারের (প্রায় ১ মাইল)। ও দৈর্ঘ্যে ২ কিলোমিটারের (প্রায় দেড় মাইল) উপর। এই হ্রদটিও নদীতে বাঁধ দিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। উক্ত হ্রদ হইতে সেচখাল কাটা হইয়াছে। শাহেলিয়োঁ কি বাড়ি, ৪০ হেক্টর (১০০ একর) ব্যাপী সজ্জননিবাস বাগ, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদিও দর্শনযোগ্য।

উদয়পুর জেলায় বহু কৃত্রিম হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে জয়সমন্দ ও রাজসমন্দ আয়তনে বিশাল। জয়সমন্দ উদয়পুর শহর হইতে প্রায় ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) দূরে। এই হ্রদটির পরিধি প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল)। বাঁধের উপর শিবমন্দির, ছত্রী ও প্রাসাদ আছে। রাজা রাজসিংহ কর্তৃক রাজসমন্দ নির্মিত। হ্রদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল), ধনুকের মত বাঁকা বাঁধটি প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল)। এই হ্রদ হইতেও খালের মাধ্যমে সেচের জল লওয়া হয়। রানা রাজসিংহের রাজত্বকালে রণছোড় ভট্ট -রচিত সংস্কৃত কাব্য 'রাজপ্রশস্তি'র ২৪টি সর্গ ২৫ খণ্ড প্রস্তরে লিখিয়া বাঁধের শোভা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বাঁধের এক দিকে একটি ছোট দুর্গ, অন্য দিকে রানার মর্মর প্রাসাদ। উদয়পুর শহর হইতে ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) দূরে উদয়-সাগর। রানা উদয়সিংহ ইহা খনন করাইয়াছিলেন। আহাদা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া এই হ্রদ তৈয়ারি করা

হইয়াছে। জয়সাগর বা বাড়ি কা তলাও শহর হইতে প্রায় ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে অবস্থিত। শহরের ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) উত্তরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম খুম্মান কর্তৃক নির্মিত একলিঙ্গজীর মন্দিরটি অবশ্যদর্শনীয়। নিকটবর্তী হ্রদের ধারে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে মীরাবাই-নির্মিত মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। শহরের ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) পূর্বে আহাদা গ্রামে রানাদের সমাধি বিদ্যমান। প্রচলিত ধারণা এই যে, এখানকার কুণ্ডে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য পুণ্য লাভ হয়। ভীলদেরও একটি বড় তীর্থ আহাদা। শহর হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পশ্চিমে রানা সজ্জনসিংহ-নির্মিত গড়টিও উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। 'মেবার' দ্র।

দ্র *Imperial Gazetteers of India: Provincial Series: Rajputana*, 1908; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. II-VI & IX (part I), Bombay, 1960-1963; *Census of India: Paper No. I of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

নিমাইসাধন বসু

উদয়প্রভসূরি প্রসিদ্ধ জৈন কবি ও টীকাকার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহামাত্য বস্তুপালের সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বস্তুপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজঃপাল ছিলেন আমেদাবাদের অন্তর্গত ধবলক্কের (বর্তমান ধোল্কা) রাজা বীরধবলের অমাত্য। বস্তুপাল কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উদয়প্রভসূরি ছিলেন এই গুণীজনেরই অন্যতম। শাস্ত্রশিক্ষার্থে বস্তুপাল তাঁহার জন্য দূরদূরান্ত হইতে পণ্ডিতগণকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে উদয়প্রভসূরি আচার্যপদেও উন্নীত হন। উদয়প্রভসূরি নাগেন্দ্রগচ্ছের আচার্য, বস্তুপালের কুলগুরু বিজয়সেনসূরির প্রধান শিষ্য। গুরুর মাধ্যমেই তিনি বস্তুপালের সান্নিধ্যে আসেন।

'ধর্মাভ্যুদয়' বা 'সংঘপতিচরিত্র' নামে উদয়প্রভসূরি একটি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি বস্তুপালের সংঘযাত্রা উপলক্ষে রচিত। বস্তুপালের সংঘযাত্রা হয় ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থ নিকটবর্তী কোনও সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে। আবার কম্বের জৈন ভাণ্ডারে রক্ষিত ইহার পুথিতে বিক্রমসংবৎ ১২৯০ (=১২৩৪ খ্রী) তারিখটি পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থখানি অন্ততঃ ঐ সময়ের মধ্যে রচিত। 'নেমিনাথচরিত' নামে উদয়প্রভসূরির যে গ্রন্থ আছে, তাহা এই গ্রন্থেরই দশম হইতে চতুর্দশ সর্গান্ত অংশ। 'সুকৃতকীর্তিকল্লোলিনী' ও 'বস্তুপালস্তুতি' নামে উদয়প্রভসূরি দুইটি প্রশস্তিমূলক কাব্যও লিখিয়াছিলেন। 'আরম্ভসিদ্ধি' নামে এক জ্যোতিষগ্রন্থও তাঁহার রচনা। কেবল তাহাই নহে, তিনি ধর্মদাসগণি কর্তৃক রচিত প্রাকৃত গ্রন্থ 'উবএসমালা'-র 'কর্ণিকা' নামক একটি টীকাও রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। 'স্যাদ্বাদমঞ্জরী'র (১২৯২ খ্রী) রচয়িতা মল্লিষেণ উদয়প্রভসূরির শিষ্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জৈনাচার্য রবিপ্রভসূরিরও উদয়প্রভ নামে এক শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী তাঁহার জীবৎকাল। তিনি নেমিচন্দ্রের 'প্রবচনসারোদ্ধার' গ্রন্থের টীকাকার।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উদয়সিংহ (১৫২২-৭২ খ্রী) মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের পুত্র, ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। কথিত আছে, শিশু উদয়সিংহকে ধাত্রী পান্না নিজ পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রানা বিক্রমাদিত্য নিহত হইলে উদয়সিংহ কুম্ভলমীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেবারের সিংহাসন লাভ করেন। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ চিতোর জয় করিলে উদয়সিংহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লন এবং শের শাহের মৃত্যুর পর চিতোর পুনরুদ্ধার করিয়া মেবারের হৃত সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। আজমীরের আফগান শাসক হাজি খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হয়। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে উদয়সিংহ জয়মল ও পত্ত নামে দুই রাজপুত বীরের উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া সসৈন্যে আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আকবরের অধিকারভুক্ত হয়।

সম্ভাব্য মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিস্বরূপ উদয়সিংহ 'উদয়পুর' নামক নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৫৫৯ খ্রী)। উদয়পুরের বিখ্যাত উদয়সাগর তিনি খনন করাইয়াছিলেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর (৩ মার্চ, ১৫৭২ খ্রী) পর তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ মেবারের রানা হন।

চিতোর ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উদয়সিংহ রাজপুত চারণ কবিবৃন্দ ও ঐতিহাসিক টড কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সাহস ও মনোবলের প্রশংসা করেন। তাঁহারা মনে করেন যে,

চিতোরত্যাগ ও উদয়পুর শহর নির্মাণ উদয়সিংহের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

নিমাইসাধন বসু

উদয়াদিত্য[১] যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইসলাম খাঁ-পরিচালিত মোগলবাহিনীর সহিত প্রতাপাদিত্যের জলযুদ্ধে (ডিসেম্বর ১৬১১ হইতে জানুয়ারি ১৬১২ খ্রী) সৈন্য পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন উদয়াদিত্য। যমুনা ও ইছামতীর সংগমস্থলের নিকটবর্তী সালকা নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রতাপাদিত্যের স্থলবাহিনীর অধিকাংশ এবং পাঁচ শত রণতরী উদয়াদিত্যের অধীনস্থ ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন এবং পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বীয় চরিত্রগুণে উদয়াদিত্য সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। স্বদেশী যুগে তাঁহার বীরত্ব স্মরণ করিয়া কলিকাতা অ্যালফ্রেড থিয়েটারে 'উদয়াদিত্য-উৎসব' পালিত হইয়াছিল। উৎসবের পরিকল্পনা করেন সরলা দেবী চৌধুরানী।

উদয়াদিত্য[২] (আনুমানিক ১০৫৯-৮৭ খ্রী) মালবের বিখ্যাত পরমারবংশীয় (রাজপুত) রাজা। চৌলুক্য ও কর্ণাটদের আক্রমণে পরমাররাজ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হইলে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্য ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং পরমার-রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনেন। উদয়াদিত্য মালবের পূর্ব দিকে ভিলসায় উদয়পুর নামে এক শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইখানে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করান। সাহিত্য ও শিল্পে অনুরাগী, প্রজাহিতৈষী এবং বীর যোদ্ধারূপে তিনি পরমার ইতিহাসে বিখ্যাত।

নিমাইসাধন বসু

উদান সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের উদাত্তবাণীর সংকলন উদান আটটি বগ্‌গে (বর্গ) বিভক্ত এবং প্রত্যেক বগ্‌গে দশটি করিয়া সুত্ত (সূত্র) আছে। সাধারণতঃ সুত্তগুলিতে প্রথমে বুদ্ধের সময়ের কোনও একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং শেষে বুদ্ধের একটি উক্তি (উদান) রহিয়াছে। এই উদানগুলি সাধারণতঃ ত্রিষ্টুভ্ বা জগতী ছন্দে রচিত এবং এইগুলিতে বৌদ্ধদিগের জীবনাদর্শ, অর্হতের মানসিক শান্তি, নির্বাণ প্রভৃতির মহিমা ও গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সুত্তের গল্পগুলি অপেক্ষা উদানগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন এবং ইহাদের অধিকাংশ বুদ্ধের নিজের অথবা তাঁহার প্রাচীন শিষ্যদিগের বাণী বলিয়া মনে হয়।

দ্র M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol. II, Calcutta, 1933; B. C. Law, *Pali Literature*, vol. I, London, 1933.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উদাসী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়বিশেষ। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রী)-প্রবর্তিত শিখ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইহা প্রাচীনতম। নানক-পুত্র শ্রীচন্দ্ এই সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইহা 'নানক-পুত্র' নামেও অভিহিত হয়। ভারতের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের প্রধান নগরীগুলিতে অদ্যাবধি ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

শিখ সম্প্রদায় যে গার্হস্থ্য ধর্মের বিরোধী নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, নানক স্বয়ং অঙ্গদকে (১৫০৪-৫২ খ্রী) পরবর্তী গুরু নির্বাচন করেন, অথচ অঙ্গদ স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারী ছিলেন। কিন্তু নানকের জীবনী ও উপদেশ হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে সংসারত্যাগই শিখ ধর্মের আদর্শ। উদাসী সম্প্রদায় এই আদর্শই অনুসরণ করে। সংসারের সুখ-দুঃখের প্রতি একান্ত নিরাসক্ত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করাই যে ইহাদের আদর্শ, সম্প্রদায়টির নাম হইতেই তাহা বুঝা যায়।

নানক-সম্প্রদায়গুলি প্রথম দিকে একত্র থাকিলেও তৃতীয় শিখগুরু অমরদাস (১৪৭৯-১৫৭৪ খ্রী) ঘোষণা করেন যে, কর্মপরায়ণ সাংসারিক শিখগণ ও সন্ন্যাসধর্মাশ্রয়ী উদাসীগণ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায়। এই ঘোষণার ফলে শিখদের একটি বৃহৎ অংশ মোগল শক্তির প্রতিরোধ-কল্পে সমাজের সকল স্তর হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া দলবৃদ্ধি করিতে থাকে। অপর দিকে উদাসীগণ ধর্মচর্চার মধ্যে নিজেদের কর্মপন্থা আবদ্ধ রাখে এবং গোঁড়া হিন্দু-সমাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। তবে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যতীত মূল শিখ সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের আর বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না।

উদাসী সন্ন্যাসীর সাধনার লক্ষ্য মায়ার ছলনা হইতে আত্মাকে রক্ষা করা, স্বার্থত্যাগ ও সুকৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধীকরণ, মরজীবনে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ। কবীরের ন্যায় নানকও সকল ধর্মের ঐক্য উপলব্ধি ও সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার বাণী প্রচার করিতেন। ক্ষুদ্রতা ও ভেদাভেদজ্ঞান বিসর্জন দিয়া এক এবং অদ্বিতীয়ের (তিনি

হরি বা আল্লাহ্ যিনিই হউন) ভজনায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে যে আত্মার শান্তিলাভ হয় এবং পৃথিবীও শান্তিময় হইয়া ওঠে, উদাসী সন্ন্যাসীগণ নানকের এই মতবাদেরই ধারক।

প্রার্থনা এবং ধ্যান উদাসীদের মুখ্য ধর্মকৃত্য। সংগতে মিলিত হইয়া ধর্মালোচনা করা অথবা দলবদ্ধ হইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করা ইহাদের ধর্মানুশীলনের অঙ্গ। ভিক্ষাজীবী না হইলেও সকল সময়ে দারিদ্র্যাভ্যাস ইহাদের নীতি। কিন্তু ছিন্ন বসন পরিধান করিলে বা বসনহীন হইয়া থাকিলেই যে আত্মিক উন্নতি হয়, উদাসীগণ তাহা বিশ্বাস করে না।

সাধারণ উদাসীগণ যাজক বা পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মুখ্য কৃত্য 'আদিগ্রন্থ' এবং গুরু গোবিন্দের 'দশম পাদশাহী দা গ্রন্থ' পাঠ ও ব্যাখ্যান। কখনও কখনও কবীর, সুরদাস বা মীরাবাই -এর ভজনও গীত হইয়া থাকে। উপাসকগণ কর্তৃক গ্রন্থসাহেবকে উৎসর্গীকৃত অর্থ ও অপরাপর দ্রব্য উদাসী যাজকগণের প্রাপ্য হয়। সমবেত উপাসকগণকে প্রসাদ বিতরণ করেন পুরোহিত। বারাণসীর কোনও কোনও উদাসী-প্রতিষ্ঠানে উপাসনাদি আরম্ভ হয় সূর্যাস্তের পরে এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত সংগীতানুষ্ঠান চলে। উদাসীগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং বেদান্ত ব্যাখ্যায় পারদর্শী।

দ্র Indu Bhusan Banerjee, *Evolution of the Khalsa*, vol. I, Calcutta, 1936 ; H. H. Wilson, *Religious Sects of the Hindus*, Calcutta, 1958.

উদ্দক-রামপুত্ত সংসারত্যাগের পরে এবং বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে গোতম যাঁহাদের নিকট অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়াছিলেন, উদ্দক-রামপুত্ত তাঁহাদের শেষতম। মহাবস্তু, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি 'উদ্রক' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

উদ্দক নিজেকে কোনও নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার পিতা রাম ধ্যানমার্গে সমাধিলাভের যে তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই 'না-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা' অবস্থা তিনি গোতমের গোচরী-ভূত করেন। নিজের অভিজ্ঞার সাহায্যে গোতম রামের উপলব্ধ সমগ্র তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহা ধ্যানমার্গের অষ্টাঙ্গ 'সমাপত্তি'র শেষ অঙ্গ বলিয়া বিদিত। গোতম নিজেকে উদ্দকের সব্রহ্মচারী বলিয়া মনে করিলেও, সেই জ্ঞানের জন্যই উদ্দক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় আচার্যরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নবলব্ধ বিদ্যাও গোতমের নিকট সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ না হওয়ায় তিনি উদ্দককে পরিত্যাগ করেন। তবে ইহার পরেও বুদ্ধ উদ্দক সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। বুদ্ধত্বলাভের পর যখন তিনি চিন্তা করিতে-ছিলেন যে তাঁহার নবলব্ধ জ্ঞান ('সঞ্ঞা-বেদযিত-নিরোধ') সম্যক রূপে হৃদয়ংগম করিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কে আছেন এবং কে এই নূতন তত্ত্ব প্রচারে তাঁহার সহায়ক হইতে পারেন— তখন প্রথমে আলার কালাম ও পরে উদ্দকের কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু উদ্দক ইতিমধ্যে গতায়ু হওয়ায় গোতমের এই সংকল্প-সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

সঞ্ঞুত্তনিকায়-তে বুদ্ধ বলিতেছেন যে, সর্বপ্রকার পাপের মূল উৎপাটিত করিয়া সব কিছু জয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া উদ্দক যে দাবি করিতেন তাহা অযৌক্তিক। আবার দেখা যায় যে, দীঘনিকায়-এর পাসাদিক সুত্তেও বুদ্ধ চুন্দ-কে বলিতেছেন, "উদ্দক যখন 'দেখা-না-দেখা'র তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিতেন তখন তিনি সেই ব্যক্তির কথাই মনে করিয়া বলিতেন যিনি শুধু ক্ষুরের ধারালো ফলাটিই দেখিতে পান কিন্তু ফলার তীক্ষ্ণ প্রান্তটি দেখিতে পান না। ইহা নিছক বাচনভঙ্গী।"

অঙ্গুত্তরনিকায়-এর বস্সকার সুত্তে উল্লিখিত আছে যে, যমক মোগ্গল্ল প্রভৃতি দেহরক্ষীসহ নৃপতি এলেয্য উদ্দকের অনুগত ভক্ত ছিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

উদ্দণ্ডপুর ওদন্তপুরী দ্র

উদ্দালক বিখ্যাত ঋষি। অরুণ ঋষির তনয় উদ্দালক আরুণি। রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ইনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন (ছান্দোগ্য, ৫।১১,১৭-২৪)। ইহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু (ছান্দোগ্য, ৬।১)। রাজা জনমেজয় তাঁহার সর্পসত্রে উদ্দালককে সদস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৮)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম-প্রকরণে (৫১-৫৫ সর্গ) উদ্দালক মুনির তপস্যা ও সিদ্ধিলাভের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। 'আরুণি' দ্র।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

উদ্ধব দাস বৈষ্ণব পদকর্তা। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস' নামে জনৈক পদকর্তা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। আবার 'শ্রীরাধামোহনপদ, যার ধন সম্পদ' বলিয়া অপর একজন উদ্ধব দাস আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক,

'পদামৃতসমুদ্র'-সংকলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর ইঁহার গুরু এবং 'পদকল্পতরু'-র সংগ্রাহক বৈষ্ণবচরণ দাস ইঁহার বন্ধু। পদকল্পতরুতে উদ্ধব দাসের নামাঙ্কিত ৯৯টি পদ দেখা যায়। সবগুলি সম্ভবতঃ একই কবির রচনা নহে।

বিমানবিহারী মজুমদার

উদ্ধারণ দত্ত (১৪৮১-১৫৩৮ খ্রী) নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য। ইনি সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকদের নেতা ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার গৃহে অনেক সময় আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। শেষ জীবনে ইনি কাটোয়ার উত্তরে উদ্ধারণপুরে বসবাস করেন। সেখানে তাঁহার সমাধি আছে। উদ্ধারণপুরে গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি উদ্ধারণ দত্তের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ। নিত্যানন্দের প্রিয় সহচরগণ পরবর্তী কালে 'দ্বাদশ গোপাল' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত সেই দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত 'সুবাহু', এইরূপ মনে করা হয়। 'উদ্ধারণপুর' দ্র।

বিমানবিহারী মজুমদার

উদ্ধারণপুর পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) উত্তরে, কেতুগ্রাম থানায় ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। উদ্ধারণপুর নিত্যানন্দ প্রভুর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের স্মৃতি বহন করিতেছে। ভাগীরথীতীর হইতে ঈষৎ পশ্চিম দিকে অবস্থিত উদ্ধারণ দত্তের ভজনস্থান এবং দেবমন্দির এখন ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ। দত্তঠাকুরের সমাধিমন্দিরের পশ্চিমে নিম্ববৃক্ষতলে নিত্যানন্দ প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। স্থানীয় বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে গৌণী পৌষী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্তঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব যাপিত হয়।

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সন্নিহিত অঞ্চল হইতে স্থানীয় জনসাধারণ বহু মৃতদেহ ভাগীরথীর তীরবর্তী উদ্ধারণপুরের বৃহৎ শ্মশানঘাটে সংকারার্থে লইয়া আসে। স্থানীয় আচার অনুসারে, মৃতব্যক্তির স্বগ্রাম-বহির্ভূত নির্দিষ্ট কোনও স্থানে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি ও মুখাগ্নির পর উদ্ধারণপুরের শ্মশানে শবদাহ সম্পন্ন করা হয়। কথিত আছে, এই শ্মশান বহু তন্ত্রসাধকের সাধনস্থল ছিল।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

উদ্বায়ু মানসিক রোগ দ্র

উদ্ভট প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলংকারিকগণের অন্যতম। ইনি কাশ্মীর দেশের অধিবাসী ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী'কার কহ্লণের মতে ইনি মহারাজ জয়াপীড়ের রাজসভায় সভাপতি ছিলেন। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ৭৭৯-৮১৩ অব্দ। সুতরাং উদ্ভটাচার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন— পণ্ডিতগণের এইরূপ অনুমান। 'অলংকার-সর্বস্ব'কার রুয্যক তাঁহাকে 'চিরন্তনালংকারকার' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান'-এ রুয্যক তাঁহাকে 'অলংকারতন্ত্র-প্রজাপতি' এই গৌরবপূর্ণ বিশেষণের দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী আলংকারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভটোদ্ভটের সম্মানিত আসন ছিল।

উদ্ভট-রচিত একখানি মাত্র অলংকারনিবন্ধই বর্তমানে প্রচলিত। উহা 'কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ' নামে পরিচিত। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্তী আলংকারিকগণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের উপর 'ভামহ-বিবরণ' নামক একখানি বিস্তৃত টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ' গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ সেই লুপ্ত বৃহত্তর 'বিবরণ'গ্রন্থেরই সারসংকলন মাত্র।

উদ্ভট ভামহের অতি বিশ্বস্ত অনুগামী। ভামহের ন্যায় তিনি কাব্যে অলংকারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার 'কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ' নিবন্ধটি ছয়টি বর্গে বিভক্ত। ইহাতে ৪১টি বিভিন্ন অলংকার এবং তাহার উদাহরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ভামহের লক্ষণসমূহ অক্ষরশঃ অথবা ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্ভটাচার্য স্বরচিত 'কুমার-সম্ভব' নামক কাব্য হইতে ঐ সকল অলংকারের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন— পরকীয় কোনও উদাহরণ উদ্ধার করেন নাই। এই সকল উদাহরণ পাঠ করিলে উদ্ভটের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারি। তবে অনেক ক্ষেত্রে মহাকবি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবম্' মহাকাব্যের কোনও কোনও শ্লোকের সহিত উহাদের কোনও কোনও শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

উদ্ভটাচার্য ভামহের অনুগামী; তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ভামহ গ্রাম্যা ও উপনাগরিকা এই দ্বিবিধ অনুপ্রাস এবং রূপকের দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু উদ্ভটের মতে অনুপ্রাস ত্রিবিধ এবং রূপক চতুর্বিধ। ভামহের গ্রন্থে উদ্ভটসম্মত পরুষা, গ্রাম্যা এবং উপনাগরিকা -ভেদে ত্রিবিধ বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেইরূপ শ্লেষ, প্রেয়ঃ প্রভৃতি অলংকার সম্পর্কেও এই দুই আচার্যের মধ্যে মতভেদ বর্তমান।

উদ্ভটাচার্য অলংকারশাস্ত্রে কয়েকটি নূতন মতবাদেরও

প্রবর্তক। তন্মধ্যে, শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য, শ্লেষের সহিত উপমা-রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারের সম্পর্ক, বাক্যের অভিধাব্যাপারের ত্রৈবিধ্য স্বীকার, রসের স্বশব্দবাচ্যত্ব-স্বীকার এবং পঞ্চরূপত্ব-কথন— এই সকল বিষয়ের আলোচনায় ভট্টোদ্ভট স্বকীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরবর্তী আলংকারিকগণের উক্তি হইতে ইহা আমরা অবগত হইতে পারি। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন যে তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের বহু স্থলে উদ্ভটের মতবাদের উল্লেখ ও সমীক্ষা করিয়াছেন, তাহা অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। উদ্ভট যে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে একটি নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রাজশেখরের 'ইত্যৌদ্ভটাঃ' এই উক্তির দ্বারা সূচিত হয়।

উদ্ভটাচার্য যে ভারতীয় 'নাট্যশাস্ত্রে'র উপরেও টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা 'সংগীতরত্নাকর'-এ শার্ঙ্গদেবের উক্তি হইতে জানা যায়। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিনবভারতী'র বহু স্থলে নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভটের স্বকীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ভটের 'কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ'-এর উপর দুইখানি টীকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। একটি প্রতীহারেন্দুরাজ প্রণীত 'লঘুবৃত্তি' ও অপরটির নাম 'বিবৃতি'। শেষোক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'অলংকারসর্বস্ব'-এ উল্লিখিত রাজানক তিলক প্রণীত 'উদ্ভটবিবেক' বা 'উদ্ভট-বিচার' নামক গ্রন্থের সহিত অভিন্ন, কোনও কোনও পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করেন। প্রতীহারেন্দুরাজের আবির্ভাবকাল আনুমানিক দশম শতাব্দীর পূর্বার্ধ। রাজানক তিলক কাহারও কাহারও মতে 'অলংকারসর্বস্ব'প্রণেতা কাশ্মীরক আচার্য রাজানক রুয্যকের পিতা।

দ্র N. D. Banhatti, *Kavyalamkara-Sara-Samgraha of Udbhata*, Bombay Sanskrit Series, Bombay, 1925; P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, 1951; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1960.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

উদ্ভিদবিদ্যা গাছপালা, লতা-গুল্ম, ছত্রাক, শ্যাওলা প্রভৃতিকে সাধারণভাবে উদ্ভিদ বলা হইয়া থাকে। যে বিজ্ঞানে এই সকল উদ্ভিদের বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহার নাম উদ্ভিদবিদ্যা। প্রাণীদের মত উদ্ভিদের পক্ষেও জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, প্রজনন প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলি অপরিহার্য। কাজেই প্রাণী ও উদ্ভিদ— উভয়ই জীবপর্যায়ভুক্ত এবং এই কারণেই উভয়ের বিষয় লইয়া জীববিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে। উদ্ভিদবিদ্যায় উদ্ভিদের জন্মবৃত্তান্ত, অঙ্গসংস্থান, খাদ্যসংগ্রহ, শারীরবৃত্ত, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি ছাড়াও কৃষিকার্য ও বনসম্পদের উন্নতিবিধান, উদ্ভিদ-উন্নয়ন, ভেষজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার ফলে আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে কেবল উদ্ভিদের ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই নহে, উদ্ভিদের জীবনরহস্যের বিষয় জানিতে পারিলে প্রাণীজগতের জীবনরহস্য সম্বন্ধেও কিছু আভাস মিলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেও উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন হইতেছে।

উদ্ভিদবিদ্যার মূল বিভাগগুলি হইল: ১. ট্যাক্‌সনমি (সিস্টেমেটিক বটানি)— উদ্ভিদ-শ্রেণীবন্ধবিদ্যা। ইহাতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। ফুল এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ-পরিচিতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ২. মর্ফলজি— অঙ্গসংস্থান। উদ্ভিদের আকৃতি ও দৈহিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা ইহার বিষয়বস্তু। উদ্ভিদের অ্যানাটমি অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ গঠন এবং হিস্টলজি অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কোষের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত আলোচনাও ইহার অন্তর্গত। ৩ ফিজিওলজি— উদ্ভিদ-শারীরবিদ্যা। ইহাতে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যপ্রণালী ও আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। জীব-রসায়নের সহিত উদ্ভিদবিদ্যার এই বিভাগের নিকটসম্পর্ক আছে। ৪. জেনেটিক্‌স— বংশানুক্রম বা বংশগতির আলোচনা। বিবর্তন-সম্পর্কিত আলোচনার সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট। অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যার এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ পরস্পর-নিরপেক্ষও নহে, চূড়ান্তও নহে। ট্যাক্‌সনমিস্টকে উদ্ভিদের বিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। আবার, উদ্ভিদের দেহ-গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, উহার আচরণ বোঝা সম্ভবপর নহে। সাইটোলজি— কোষ-বিষয়ক বিদ্যা। ইহা মর্ফলজি, ফিজিওলজি ও জেনেটিক্‌স-এর সহিত সংশ্লিষ্ট। ইকলজি —পরিবেশের সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক ইহার আলোচ্য বিষয়। ইকলজির সহিত ফাইটোজিওগ্রাফি বা উদ্ভিদ-ভূগোল এবং প্ল্যান্ট সোশিওলজি বা উদ্ভিদের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মাইকোলজি হইতেছে ছত্রাক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। অ্যাল্‌গলজির আলোচ্য বিষয় শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ। মস ও লিভারওয়ার্ট শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ ব্রাইয়লজির বিষয়বস্তু; টেরিডলজিতে ফার্নজাতীয় উদ্ভিদবিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। উদ্ভিদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ইকনমিক বটানির উপজীব্য। ফাইটোপ্যাথলজির বিষয়বস্তু উদ্ভিদ-রোগ।

প্যালিওবটানির আলোচ্য বিষয় অধুনালুপ্ত উদ্ভিদ। সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া নামক জীবাণুগোষ্ঠীকে উদ্ভিদ-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যাকটিরিয়লজি উদ্ভিদবিদ্যারই অন্যতর শাখা।

উদ্ভিদবিদ্যা একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। পশ্চিম ইওরোপে ইহার প্রায় সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইলেও এই বিদ্যা কোনও নির্দিষ্ট জাতি বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। মনে হয়, গ্রীকেরাই উদ্ভিদবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। আরিস্তোতল-এর শিষ্য থেওফ্রাস্তোস খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ শতকে 'হিস্তোরিয়া প্লান্তারুম' (উদ্ভিদ বিষয়ে অনুসন্ধান) নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা আছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত গ্রন্থে উদ্ভিদশরীরের বিভিন্ন অংশের বিবরণ, উদ্ভিদের গুণাগুণ ও ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। তাহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। পারস্য ও ভারত আক্রমণের সময় আলেকসান্দর (আলেকজাণ্ডার) যে সকল বিজ্ঞানীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণীর উপরও নির্ভর করা হইয়াছে। রোমকদের মধ্যে প্লিনি (২৩-৭৯ খ্রী) 'হিস্তোরিয়া নাতুরালিস' নামক বৃহৎ গ্রন্থের ৩৭ খণ্ড জুড়িয়া উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে তৎকালীন জ্ঞান সমাহৃত করিয়াছিলেন। প্রায় একই সময়ে পেদানিওস দিওস্কোরিদেস নামে একজন গ্রীক চিকিৎসক একটি মেটেরিয়া মেডিকা প্রণয়ন করেন। উহাতে প্রায় ছয় শত প্রকার উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাহাদের ভেষজ ব্যবহারের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর মধ্যযুগে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ইওরোপে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য রেনেসাঁসের পর তাহার কিয়দংশ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় চিকিৎসাবিদ্ ও উদ্ভিদবিদেরা প্রধানতঃ দিওস্কোরিদেস-এর কাজের উপর ভিত্তি করিয়া এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণের সাহায্যে উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে জার্মানীর অটো ব্রুন্‌ফেল্‌স (১৫৩২-৩৭ খ্রী), হিয়েরোনিমুস বক্ (১৫৩৯ খ্রী), লেওনহার্ড ফুক্‌স (১৫৪২ খ্রী), ফালেরিউস করডুস (১৫৬১ খ্রী); নেদারল্যাণ্ডের রেমবেয়ার্ট দোডুন্স (১৫৫৪, ১৫৮৩ খ্রী), শাল দ্য লেক্‌ল্যুজ (১৬০১ খ্রী), ম্যাথিয়াস দ্য লোবেল (১৫৭০,১৫৭১ খ্রী); ইটালীর পিয়েরান্দ্রেয়া মাত্তিওলি (১৫৪৪ খ্রী); ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম টার্নার (১৫৫১-৬২ খ্রী) এবং জন জেরার্ড-এর (১৫৯৭ খ্রী) গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশের সাল প্রদত্ত হইল] মোটের উপর ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে নূতনভাবে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

রেনেসাঁসের পরে এবং ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটনের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ অনেক নূতন নূতন উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। ইহার ফলে কেবল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদের পরিবর্তে অনেক বিজ্ঞানী নূতন উদ্ভিদের নামকরণ এবং তাহাদের তালিকা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। এই জাতীয় তালিকা-সংবলিত গ্রন্থাদির মধ্যে গ্যাস্‌পাড় বউহিন্ প্রণীত 'পিনাক্স থেআত্রি বোতানিকি' (১৬২৩ খ্রী) নামক পুস্তকখানিই সর্বোৎকৃষ্ট। এই পুস্তকে প্রায় ৬০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা এবং তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। জন রে (১৬২৭-১৭০৫ খ্রী) যাবতীয় উদ্ভিদকে তাহাদের বীজপত্র অনুসারে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী —এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। জন রে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের অন্যতম। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নীহেমাইয়া গ্রু পরাগরেণুর কার্যবিষয়ে একটি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদের যৌন-পার্থক্য সম্বন্ধে রুডল্‌ফ ইয়াকোব্ কামেরারিউস-এর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়; অবশ্য অতি প্রাচীন কালেই মিশরীয় ও আসিরীয়রা এই বিষয়টি অবগত ছিল।

প্রখ্যাত সুইডিশ উদ্ভিদবিদ্ লিনিয়াস (১৭০৭-৭৮ খ্রী) ফুলের পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রথা প্রবর্তন করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদ-পরিচিতির জন্য তাহাদের জাতি এবং প্রজাতি-বাচক দুইটি নাম যুক্তভাবে দিবার প্রস্তাব করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উদ্ভিদের নামকরণের এই রীতি আজ পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা যখন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন নীহেমাইয়া গ্রু এবং মার্চেল্লো মাল্‌পিজি কর্তৃক উদ্ভিদের শারীরসংস্থানের ভিত্তি স্থাপিত হয় (১৬৭০ ও ১৬৭৪ খ্রী)। অবশ্য ইহার পূর্বেই ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রবার্ট হুক উদ্ভিদের দেহকোষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন কর্তৃক নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কোষের মধ্যস্থিত কেন্দ্রীয় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে থেওডোর শ্‌ভান্ এবং শ্লাইডেন কোষ-সম্পর্কিত মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাকিন্‌জি এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগো ফন্

মোল্ কোষের অভ্যন্তরস্থ অর্ধতরল পদার্থকে প্রোটোপ্লাজ্ম নামে অভিহিত করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস রবার্ট ডারুইন (১৮০৯-৮২ খ্রী)-এর 'অরিজিন অফ স্পীশীজ' (প্রজাতির উৎপত্তি) নামক গ্রন্থ যুগান্তর আনয়ন করে। ডারুইনের গবেষণার ফলে জীববিজ্ঞানের অনেক রহস্যের ব্যাখ্যা সহজসাধ্য হয়।

এডুয়ার্ড স্ট্রাসবুর্গের্ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী) প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে কোষের গঠনপ্রণালী এবং কোষ-বিভাজন সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এই সম্পর্কে কার্ল ফন্ গোয়েবেল (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রী)-এর গবেষণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতেই হাইনরিখ গুস্তাভ অ্যাডল্ফ এঙ্গলের্ এবং কার্ল আন্টোন্ অয়গেন প্রান্ট্ল ডারুইনের মতবাদের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করেন (১৮৮৭-৯৯ খ্রী)। বিংশ শতাব্দীতে মাইক্রোডিসেকশন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় এবং তাহার সাহায্যে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন রকম গবেষণার ফলে মর্ফলজি ও ফিজিওলজি শাখার মধ্যে ব্যবধান অনেকাংশে দূরীভূত হয়। এতকাল ফিজিওলজিতে কেবল উদ্ভিদের রস-শোষণ, রস-সঞ্চালন ও পরিপুষ্টির বিষয় লইয়াই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল— এখন তাহা ছাড়াও আলোকপাত এবং অভিকর্ষের জন্য উদ্ভিদের বক্রতাপ্রাপ্তি (ট্রপিজ্ম) প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা চলিতে থাকে। মাটি হইতে উদ্ভিদ যে সকল পদার্থ শোষণ করিয়া লয়, সেই শোষণপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে ইয়ুসটুস্ ফন্ লিবিখ্ এবং বাতিস্ত্ বুসিনিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে অনেক গবেষণা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উগো দ্য ভ্রি-র গবেষণার ফলে অস্মোসিস ও কোষের আভ্যন্তরীণ চাপ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার উপর উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা উদ্ভিদের শারীরক্রিয়ার ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম এবং প্রোটোপ্লাজ্ম সম্পর্কিত রহস্য উদ্ঘাটনে ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। বিষয়টি প্রত্যেকটি বিভিন্ন কোষের গঠন-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াশীলতার সহিত সংশ্লিষ্ট। এখান হইতেই উদ্ভিদবিজ্ঞানে সাইটোলজি নামক শাখার উৎপত্তির সূত্রপাত হয়।

পুষ্টিসংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া ফোটোসিন্থেসিস (সালোক-সংশ্লেষ) সম্পর্কে বিভিন্ন রকম গবেষণা চলিতে থাকে। ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ, জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন মুক্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়, সেই সম্পর্কে যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইউলিউস ফন্ জাখ্স্ (১৮৩২-৯৭ খ্রী)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উন্নত ধরনের অনেক কৌশল উদ্ভাবিত হইবার ফলে উদ্ভিদবিদ্যার জেনেটিক্স শাখায় বংশগতি সম্পর্কে সাইটোপ্লাজ্ম, ক্রোমোজোম, জিন প্রভৃতির অনেক কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্যালিওবটানি-সংক্রান্ত গবেষণার ফলে অধুনালুপ্ত অনেক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে ফোটোসিন্থেসিস ও শ্বাসক্রিয়ার বিষয় অনুসন্ধানের জন্য শ্যাওলাজাতীয় এককোষী উদ্ভিদ লইয়া গবেষণা চলিয়াছে। পারমাণবিক বিভাজন (ফিশন) আবিষ্কৃত হইবার পর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু জানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সহায়ক হর্মোন এবং ভিটামিন প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কৃত্রিম পরাগনিষেক, নির্বাচনপ্রক্রিয়া এবং ঔষধ ও এক্স-রে প্রভৃতির প্রয়োগে অনেক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসাধনও সম্ভব হইয়াছে।

ব্যাবহারিক প্রয়োজনে মানুষ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োগ করিতেছে। কৃষিকর্মে উন্নত ধরনের শস্য উৎপাদন, ফলন বৃদ্ধি, রোগনিরাময় প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে সাফল্য লাভের জন্য উদ্ভিদবিদ্যার সম্যক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন।

দ্র গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৬০, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ; সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৮; J. von Sachs, *A History of Botany 1530-1860*, Oxford, 1906; J. R. Green, *A History of Botany 1860-1900*, Oxford, 1909; H. S. Reed, *A Short History of the Plant Sciences*, 1942; R. C. Mclean & W. R. Ivimey-Cook, *Textbook of Theoretical Botany*, vols. I & II, London, 1951, 1956; E. N. Transeau, *et al.*, ed., *Textbook of Botany*, 1953.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

উধুয়ানালা নামান্তর উদয়নালা। প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র; সাঁওতাল পরগনা জেলার গ্রাম ও ঐ নামের নদী। গ্রামের অবস্থান ২৪°৬০´ উত্তর, ৮৭°৫৩´ পূর্ব। রাজমহল হইতে গ্রামটি ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দক্ষিণে

অবস্থিত। উধুয়ানালার পার্বত্য গিরিপথের পাশে নবাবি আমলে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। তাহার এক দিকে গঙ্গা, অন্য দিকে উধুয়ানালা। স্থানটি প্রাকৃতিক কারণেই দুরধিগম্য ছিল। মীর কাশিম সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া এবং প্রায় ১০০টি কামান সাজাইয়া দুর্গটি সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর (১ আগস্ট ১৭৬১ খ্রী) মীর কাশিমের সৈন্যবাহিনী এইস্থানে পুনরায় ইংরেজ ও মীর জাফরের সৈন্যদলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অধিনায়ক ছিলেন মেজর অ্যাডাম্‌স। মীর কাশিমের সৈন্যদলভুক্ত জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সাহায্যে ইংরেজবাহিনী গভীর রাত্রে এক গোপন পথ দিয়া দুর্গে প্রবেশ করে (৪ সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খ্রী)। মীর কাশিমের সুপ্তোত্থিত সৈন্যদল এই অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হয়। সুমরু, মার্কার, আরাটুন প্রভৃতি নবাবের বিদেশী সেনাপতি পলায়ন করে। উধুয়ানালার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ইংরেজের প্রাধান্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়।

দ্র নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর কাশিম, কলিকাতা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

উন্মাদ রোগ মানসিক রোগ দ্র

উপকথা আধুনিক কালের আগে কথাটির ব্যবহার হয় নাই। শব্দটির মূলে সংস্কৃত উপ+কথি ধাতু থাকিতে পারে। কিন্তু 'উপকথা' এবং 'কথোপকথন'-এর 'উপকথন' —ইহাদের কোনটিরই সিদ্ধ প্রয়োগ নাই। সংস্কৃত শব্দ ধরিলে উপকথা মানে অবান্তর, অপ্রধান অথবা ছোট আখ্যায়িকা বা গল্প। আবার শব্দটি বাংলা রূপকথা (<অপূর্বকথা) হইতে আদি র-কার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এইরূপও বলা যায়।

ছোট উপন্যাসকাহিনী অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহার 'ক্ষুদ্র উপন্যাস'গুলির (ইন্দিরা, প্রথম সংস্করণ; যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী) সংকলনে। প্রচলিত লৌকিক আখ্যায়িকা, বিশেষ করিয়া ছেলে-ভুলানো অর্থে উপকথা শব্দটি এখন প্রচলিত। উপকথার বিষয় মনোরঞ্জক বিচিত্র ঘটনা। তাহাতে ভূত প্রেত দেব দানব থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরাণকাহিনীকে উপকথা বলে না। হাস্যরস উপকথায় নিষিদ্ধ নহে। 'কথা' দ্র।

সুকুমার সেন

উপগুপ্ত উত্তর ভারতে এবং মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহে প্রচলিত বৌদ্ধ সাহিত্য ও কিংবদন্তীতে উপগুপ্ত একটি শ্রদ্ধেয় নাম। এই অতুল প্রভাবশালী ও পুণ্যচরিত সংঘস্থবিরের জীবনবৃত্তান্ত ও কীর্তি সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তদনুসারে তিনি মথুরা (মতান্তরে বারাণসী) অঞ্চলের গুপ্ত নামধেয় কোনও গান্ধিক বা গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ীর তৃতীয় পুত্র। বুদ্ধনির্বাণের (আনু-মানিক ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) একশত বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজদ্বয়ের নাম যথাক্রমে অশ্বগুপ্ত ও ধনগুপ্ত। প্রথম জীবনে তিনি পৈতৃক ব্যবসায়কেই বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে মথুরার উরুমুণ্ড পর্বতোপরি অবস্থিত নটভটিক বিহারনিবাসী অর্হৎ শাণবাস কর্তৃক তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই স্বীয় সাধনা ও পুণ্য -বলে তাঁহার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং তিনি 'অলক্ষণক বুদ্ধ' (বিশিষ্টশরীরলক্ষণবিরহিত বুদ্ধ) রূপে পরিচিত হন। লামা তারনাথের উল্লেখ অনুসারে উপগুপ্তের দীক্ষাগুরুর নাম অর্হৎ যশস্‌ বা যশেথ। কিন্তু এই মত অন্য কোনও সূত্রে সমর্থিত হয় না। শাণবাসের মৃত্যুর পর উপগুপ্ত বৌদ্ধসংঘের সর্বোচ্চ স্থবিরের পদে উন্নীত হন ও মথুরায় নটভটিক সংঘারামে বাস করিতে থাকেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বৌদ্ধসংঘের অধস্তন চতুর্থ সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে মথুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহিত তাঁহার স্মৃতি ও কাহিনী সর্বাধিক বিজড়িত। কথিত আছে, এইখানে 'মার' বা পাপপুরুষের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় এবং মারবিমোহিত অসংখ্য নর-নারী তৎকর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনদেশীয় পর্যটক হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ মথুরা-ভ্রমণকালে তথায় উপগুপ্তের স্মৃতিবিজড়িত গুহা ও সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। তারনাথও উক্ত গুহার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উপগুপ্ত পশ্চিমে ও উত্তরে যথাক্রমে সিন্ধু ও কাশ্মীর পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এই মর্মেও কিংবদন্তী আছে। হিউএন্‌-ৎসাঙের সময়ে ভারতবর্ষে ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাংঘিক শীর্ষক পাঁচটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনয়-শাস্ত্রের পাঁচটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল। সেগুলি উপগুপ্তের পঞ্চশিষ্য কর্তৃক সংকলিত বলিয়া কথিত আছে।

হিউএন্‌-ৎসাঙের মতে উপগুপ্ত মৌর্য সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে অশোক দেবগণের সাহায্যে সমগ্র জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) চুরাশি

সহস্র স্তূপ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে বুদ্ধের শরীরনিদান সংরক্ষিত করেন। অশোকাবদানে প্রদত্ত কাহিনী অনুসারে উপগুপ্ত অশোকের সাক্ষাৎ দীক্ষাগুরু না হইলেও তাঁহার অসীম শ্রদ্ধাভাজন ও ধর্মবিষয়ে তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে অশোক লুম্বিনী বন, কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, ঋষিপতন (সারনাথ), কুশীনগর ও শ্রাবস্তী— বুদ্ধের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই বৌদ্ধতীর্থসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ যাবৎ আবিষ্কৃত অশোকের অনুশাসনগুলিতে কুত্রাপি উপগুপ্তের উল্লেখ নাই। সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রচলিত বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ পরিচালনা বিষয়ে অশোকের প্রধান উপদেষ্টা মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য নামক জনৈক অর্হৎ। এই ঐতিহ্যে উপগুপ্তের স্বীকৃতি নাই। ওয়াডেল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য এবং উপগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

উপগুপ্তের মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত। তারনাথের মতে মথুরাতেই তাহার মৃত্যু হয়। জাপানের বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে এক ভূমিকম্পের ফলে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। অপর পক্ষে ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুযায়ী মহাকশ্যপ ও অন্য কতিপয় অর্হতের ন্যায় উপগুপ্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য, সিংহল, ব্রহ্ম দেশ প্রভৃতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ শাস্ত্রে উপগুপ্তের উল্লেখ না থাকিলেও ব্রহ্ম দেশের প্রচলিত বৌদ্ধ লোকশ্রুতিতে ধর্মপ্রাণ অর্হৎ রূপে উপগুপ্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

উপগুপ্ত সম্পর্কে যে সকল কাহিনী ও কিংবদন্তী উত্তরখণ্ডের বৌদ্ধ সাহিত্যে সঞ্চিত হইয়া আছে, ঐতিহাসিক বিচারে সেগুলির মধ্যে বহু অসংগতি ও অতিরঞ্জন দৃষ্ট হইবে। তথাপি তাঁহার পূত চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও কর্মপ্রতিভা বৌদ্ধ জগতে তাঁহার প্রতি যে পরিমাণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে আগ্রহ জন্মায়। উত্তরখণ্ডের বৌদ্ধ জগৎ তাঁহাকে এতই গুরুত্ব দিয়াছে যে, অশোকাবদানে স্বয়ং বুদ্ধের দ্বারা তাঁহার জন্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করানো হইয়াছে। তারনাথ বলিয়াছেন, বুদ্ধনির্বাণের পর উপগুপ্তের ন্যায় মানবহিতকারী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে উপগুপ্তের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

দ্র Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Calcutta, 1882; E. B. Cowell & R. A. Neil, ed., *Divyavadana*, London, 1886; L. A. Waddel, 'Upagupta', *Journal of The Asiatic Society of Bengal*, vol. LXVI, part I, 1897; V. A. Smith, 'Asoka Notes,' *Indian Antiquary*, vol. XXXII, 1903; T. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, vols. I & II, London, 1904-5; J. Przyluski, *La Legende de L'Empereur Asoka*, Paris, 1923; S. K. Mukherjee, ed., *Asokavadana*, Calcutta, 1964.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

উপগ্রহ সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে (কেপলারের সূত্র অনুসারে) উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ৯টি গ্রহ যেমন আবর্তিত হইতেছে, কতকগুলি গ্রহের চতুষ্পার্শ্বে অনুরূপভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর জ্যোতিষ্কও আবর্তন করিতেছে। শেষোক্ত জ্যোতিষ্কগুলির সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম উপগ্রহ। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ আর উহার উপগ্রহ চন্দ্র প্রায় ৩৮৪০০০ কিলোমিটার (২৪০০০০ মাইল) দূরে অবস্থান করিয়া প্রায় ২৭.৩৩ দিনে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত উপগ্রহের মোট সংখ্যা ৩১। সূর্যের নিকটতম দুইটি গ্রহ বুধ ও শুক্র এবং দূরতম গ্রহ প্লুটো ছাড়া অন্য সব গ্রহেরই এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর উপগ্রহ ১টি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১২টি, শনির ৯টি, ইউরেনাসের ৫টি ও নেপচুনের ২টি। শনিগ্রহের সহিত সংশ্লিষ্ট তথাকথিত বলয়গুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন বস্তুপিণ্ডের সমষ্টি। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে বস্তুপিণ্ডগুলি শনির দশম উপগ্রহের অংশ বা উপাদান-স্বরূপ। ঐ উপগ্রহটি কোনও কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে অথবা গঠিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

বৃহস্পতির সহিত যুক্ত গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো এবং শনির সহিত যুক্ত টাইটান উপগ্রহগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। উহারা আকারে বুধগ্রহের সমকক্ষ। তুলনায় জন্য জ্ঞাতব্য যে বুধের ব্যাসের মাপ প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার (৩০০০ মাইল) এবং চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ৩৫২০ কিলোমিটার (২২০০ মাইল)।

উত্তর অথবা ধ্রুবতারার দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হইবে অধিকাংশ উপগ্রহ বামাবর্ত অর্থাৎ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গতিশীল। কিন্তু

কতকগুলি দক্ষিণাবর্ত উপগ্রহও আছে। উপগ্রহগুলি সর্বাংশে বা অধিকাংশে কঠিন পদার্থে গঠিত। ইহাদের নিজস্ব তাপ বা আলো নাই— সৌররশ্মির প্রভাবে ইহারা উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়।

উপগ্রহের মধ্যে সাধারণতঃ শুধু চন্দ্রই দুরবীন ছাড়া দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অনুকূল অবস্থায় অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন কোনও কোনও ব্যক্তি বৃহস্পতির এক বা একাধিক উপগ্রহ দেখিতে পান।

উল্লিখিত প্রাকৃতিক উপগ্রহ ছাড়া সাম্প্রতিক কালে অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে বা করিতেছে। এই জাতীয় উপগ্রহগুলির মধ্যে স্পুটনিক১ প্রথম। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর উহা রুশ বিজ্ঞানীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়। স্পুটনিক১-এর ব্যাস ৫৮ সেন্টিমিটার (২৩ ইঞ্চি)— পৃথিবী হইতে গড় দূরত্ব ৫৮৪ কিলোমিটার (৩৬৫ মাইল)। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে ইহার সময় লাগিত ৯৬ মিনিট। 'কৃত্রিম উপগ্রহ' দ্র।

দ্র W. M. Smart, *The Origin of the Earth*, Harmondsworth, Middlesex, 1959, R. H. Baker, *Astronomy*, Princeton, New Jersey, 1959.

রমাতোষ সরকার

উপচার পূজার উপকরণ। পাঁচ দশ ষোল আঠার বা চৌষট্টি উপচারে পূজার বিধান আছে। সংক্ষিপ্ত পূজা বা অপ্রধান দেবতার পূজা পঞ্চোপচারে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পূজা দশোপচারে এবং বিশেষ পূজা ষোড়শোপচারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আঠার বা চৌষট্টি উপচারের তেমন প্রচলন নাই। পঞ্চোপচারে গন্ধ (চন্দন বাটা), পুষ্প (ফুল, বেলপাতা বা তুলসী), ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের প্রয়োজন। দশোপচারে পাদ্য (পা ধোয়ার জন্য), অর্ঘ্য (দূর্বা, ভিজা আতপ চাল, ফুল, চন্দন ও জল), আচমনীয় (আচমনের জল), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বূল দরকার হয়। ষোড়শোপচারের বস্তু হইতেছে: আসন (সাধারণতঃ রূপার পাতের টুকরা), স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক (কাঁসার পাত্রে মিশ্রিত দধি মধু ঘৃত), স্নানীয় জল, বস্ত্র, আভরণ (সাধারণতঃ রজতাঙ্গুরীয়ক), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, তাম্বূল। বিত্তশাঠ্য (অর্থাৎ অর্থ সম্পর্কে শঠতা) না করিয়া গৃহকর্তা সম্ভবমত পরিমাণ ও উৎকর্ষ অনুসারে উপকরণ ব্যবহার করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আশয়। গন্ধ-পুষ্পাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণব দেবতার পূজায় রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও বিল্বপত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ। শক্তিপূজায় এইগুলি প্রশস্ত। শিবপূজায় ধুতুরা ফুল, আকন্দ ফুল ও বেলপাতা অতি প্রশস্ত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উপজাতি আদিবাসী দ্র

উপতিস্স[১] গৌতম বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্তের অপর নাম। তাঁহার জন্মস্থান নালকের নাম উপতিস্সগাম এবং তাঁহার প্রচারিত বাণীকে বলা হয় উপতিস্স সুত্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, জগতের কোনও পরিবর্তনই তাঁহার পক্ষে দুঃখজনক নয়। 'সারিপুত্ত' দ্র।

উপতিস্স[২] নানা সময়ের বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু। কস্সপ-রচিত 'অনাগতবংস' নামক পালি গ্রন্থের ভাষ্যকারের নাম উপতিস্স। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অরহৎ উপতিস্স নামে বৌদ্ধ ভিক্ষু 'বিমুত্তিমগ্গ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উহাই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বুদ্ধঘোষ 'বিসুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দশম শতাব্দীতে সিংহলবাসী এক উপতিস্স ছিলেন 'মহাবোধি-বংসে'র রচয়িতা। 'মহানিদ্দেস' গ্রন্থের ভাষ্য 'সদ্ধম্মপ্প-জ্জোতিকা' এবং 'মহাবংসে'র ভাষ্য রচয়িতাদের নামও উপতিস্স।

উপতিস্স নামে দুই জন নৃপতি যথাক্রমে ৩২২ হইতে ৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৫২২ হইতে ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন।

উপদংশ যৌনব্যাধি দ্র

উপনন্দ[১] মগধরাজ অজাতশত্রুর সেনাপতি। মজ্ঝিম-নিকায়ের গোপক-মোগ্গল্লান সুত্তে বর্ণিত আনন্দ এবং বস্সকারের আলাপচারির সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

উপনন্দ[২] বৌদ্ধ স্থবির। ভোগ্য বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহার আসক্তির বহু কাহিনী বিনয়পিটক এবং জাতকে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও আপন গোষ্ঠীতে তিনি কলহপর কুচক্রী ও অসাধু বলিয়া ধিকৃত ছিলেন। বুদ্ধঘোষ তাঁহাকে 'লোলজাতিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটি জাতক-কাহিনীতে বলা হইয়াছে, পূর্ব কোনও জন্মে তিনি ছিলেন মায়াবী

নামক শৃগাল ; অপর দুই শৃগাল কর্তৃক সংগৃহীত রোহিত মৎস্য তিনি কৌশলে আত্মসাৎ করেন।

উপনয়ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপবীতগ্রহণরূপ বিশিষ্ট সংস্কার। ইহার কাল— ব্রাহ্মণের পক্ষে সাত বৎসর তিন মাস হইতে পনর বৎসর তিন মাস ; ক্ষত্রিয়ের দশ বৎসর তিন মাস হইতে একুশ বৎসর তিন মাস ; বৈশ্যের এগার বৎসর তিন মাস হইতে তেইশ বৎসর তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে কঠিন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বর্তমানে প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প হিসাবে সামান্য অর্থদান করা হয়। এই সংস্কারের মধ্য দিয়া বালক অধ্যয়নের জন্য গুরুসকাশে নীত হইত। আধুনিক অনুষ্ঠানে পিতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া নিজেই গুরু বা আচার্যের কাজ করেন— অনেক স্থলে পুরোহিত বা অন্য কেহ আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। আচার্য বালককে কতকগুলি নিদেশ দিয়া দণ্ড ও উপবীত ধারণ করান এবং গায়ত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেন। নিদেশগুলির মধ্যে দিবানিদ্রা-নিষেধ অন্যতম। দণ্ড ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীকে মাতা, মাতৃস্থানীয়া মহিলা ও পিতার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। গুরুগৃহে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী অবস্থায় ক্ষারলবণবর্জিত ভিক্ষান্ন ভক্ষণের বিধান ছিল। উপনয়নের পর বেদারম্ভের অনুষ্ঠান। ইহাতে চারি বেদের প্রথম চারিটি মন্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উপনয়নের পূর্বসংস্কার চূড়াকরণ বা মস্তকমুণ্ডন ও কর্ণবেধ। উপনয়নের পরবর্তী সংস্কার সমাবর্তন— অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ব্রহ্মচর্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের জন্য গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। সমাবর্তন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক স্নান এবং দণ্ডত্যাগপূর্বক নববস্ত্র, নূতন উপবীত, পাদুকা, কুণ্ডল ও গন্ধমাল্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে উপনয়নের পূর্ব ও পরবর্তী কার্যগুলি উপনয়নের সঙ্গে একই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে তিন দিন বা ক্বচিৎ বার দিন ব্রহ্মচর্যপালন ও হবিষ্যান্নগ্রহণের রীতি কেহ কেহ পালন করেন। ব্রহ্মচর্যকালের পর দণ্ড ভাঙিয়া ব্রহ্মচারীর বেশ বর্জনপূর্বক নববস্ত্রাদি গ্রহণ করা হয়। এই রীতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে এবং উপনয়নানুষ্ঠানের গুরুত্ব কমিয়া যাইতেছে।

দ্র ভবদেব, পশুপতি ও কালেশি -কৃত পদ্ধতিগ্রন্থ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উপনিষদ্ বেদের অন্তিম অংশ। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত : 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ'। যজ্ঞ প্রভৃতি কার্যে প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির সংগ্রহ হইল 'মন্ত্র' বা 'সংহিতা'। এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও যাগযজ্ঞাদির বিবরণই 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণের আবার তিন ভাগ : শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ 'আরণ্যক'। ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু অরণ্যবাসীগণের ধ্যান বা উপাসনার বিবরণ। 'উপনিষদ্' আবার আরণ্যকের অন্তর্গত। এইভাবে উপনিষদ্ বেদের অন্ত অথবা 'বেদান্ত'।

অনেকে অবশ্য বেদান্ত শব্দটির ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে উপনিষদ্ বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। তাই ইহা বেদান্ত। বেদাধ্যয়ন শেষ করিলে তবেই বিদ্যার্থীর এই বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণে অধিকার জন্মে।

উপনিষদ্ শব্দটির অর্থব্যাখ্যা লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন, গুরুর সমীপে (উপ-) আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া (নি-√ সদ্) জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী যে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাই উপনিষদ্। আবার কাহারও মতে, ব্রহ্মবিদ্যার নিকট (উপ-) উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়ের সহিত (নি-) ইহার অনুশীলন করিলে অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয় (√ সদ্), তাই ইহা উপনিষদ্।

উপনিষদের অপর অর্থ 'রহস্য'। অতি দুর্লভ এই ব্রহ্মজ্ঞান গুরু সকলকে নির্বিচারে দান করিতেন না ; প্রকৃত অধিকারী মনে করিলে প্রিয় শিষ্য অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গোপনে ইহা সমর্পণ করিতেন। তাই ইহা 'রহস্য'। প্রাচীন দিনে সাঙ্গ সরহস্য বেদপাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্যকরণীয় বলিয়া গণ্য ছিল।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে। প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ মূলতঃ কর্মকে অবলম্বন করিয়াছে। মধ্যবর্তী আরণ্যকে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই কথা আছে। উপনিষদ্ বিশেষভাবে জ্ঞানের উপদেশ। আরণ্যকে যাহা বীজাকারে ছিল, উপনিষদে তাহাই পল্লবিত। উপনিষদের ঋষি যজ্ঞকে গৌণ মনে করিয়া যষ্টব্যের স্বরূপনির্ণয়ে সমাহিত হইয়াছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ব্রাহ্মণের তিন অংশেই কর্ম ও জ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে ; তবে ব্রাহ্মণে যেমন কর্মের প্রাধান্য, উপনিষদে তেমনই জ্ঞানের প্রাধান্য।

উপনিষদ্গুলি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ, তবে ঈশোপনিষদ্খানি সংহিতার সহিত যুক্ত। এইজন্য ইহাকে সংহিতোপনিষদ্ এবং অপরগুলিকে ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ উপনিষৎসমূহ বলিতে বুঝি : ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, ঈশা, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য। ইহার

মধ্যে মাণ্ডুক্য ভিন্ন অপরগুলি শংকরাচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং সেই কারণে প্রধান বলিয়া গণ্য। অবশ্য মাণ্ডুক্যেরও কারিকার উপর শংকরাচার্যের ভাষ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক আকারে সুবৃহৎ; অপরপক্ষে ঈশোপনিষদ্ মাত্র ১৮টি শ্লোকে সম্পূর্ণ।

কোন্ বেদের সহিত কোন্ উপনিষদ্ যুক্ত তাহার একটি তালিকাচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঋগবেদ — ঐতরেয়, কৌষীতকি
সামবেদ — ছান্দোগ্য, কেন
শুক্লযজুর্বেদ — বৃহদারণ্যক, ঈশা
কৃষ্ণযজুর্বেদ — তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর
অথর্ববেদ — প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য
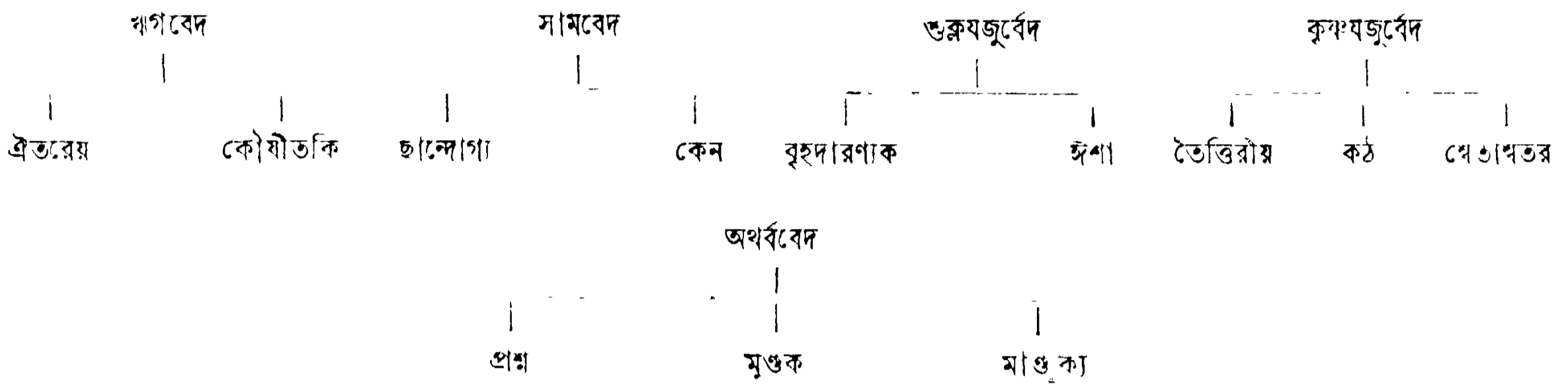
রচনাকাল এবং রচনারীতি-অনুসারে পণ্ডিতগণ উপনিষৎসমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়াছেন। যথা

১ ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন— এই ছয়খানি উপনিষদ্ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এইগুলি প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। ভাষার প্রাচীনত্বে ও রচনাশৈলীতে ইহারা ব্রাহ্মণসাহিত্যের অনুরূপ। নিঃসন্দেহে এইগুলি পাণিনি-পূর্ব যুগের রচনা।

২. কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ (তৈত্তিরীয় আরণ্যকের চতুর্থ প্রপাঠক), ঈশা ও মুণ্ডক— এই পাঁচটি ঈষৎ পরবর্তী কালের। তবে এইগুলির রচনাও বুদ্ধ-আবির্ভাবের পূর্বকালীন। এইগুলি প্রধানতঃ পদ্যে রচিত। অর্বাক্‌কালীন হইলেও উপনিষদ্-সাহিত্যে ইহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। এই সব উপনিষদে বেদান্তচিন্তার সহিত সাংখ্য-যোগের মতবাদও মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

৩ প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য ও মৈত্রায়ণীয় তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এইগুলি বুদ্ধোত্তর কালে সংকলিত। গদ্য ও পদ্য উভয়ই এখানে বর্তমান। এই সব উপনিষদের গদ্যের সহিত লৌকিক (ক্ল্যাসিক্যাল) সংস্কৃতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

৪. চতুর্থ শ্রেণীতে আছে পরবর্তী কালের অসংখ্য উপনিষদ্। বেদের সঙ্গে তাহাদের যোগ গৌণ। ইহাদের সবগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদকও নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায় কেবল স্ব স্ব মতকে প্রতিষ্ঠা দিবার উদ্দেশ্যে তাহা উপনিষদ্ নামে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অনেক-গুলি প্রধানতঃ পুরাণ ও তন্ত্রের অনুগামী। এইভাবে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু সাম্প্রদায়িক উপনিষদের উদ্ভব হইয়াছে, যোগ সন্ন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে, এমন কি মোগল যুগে 'অল্লোপনিষদ্' নামেও একখানি রচনা মিলিতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন উপনিষদের সংখ্যা প্রায় ২৮০। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১০টি ঋগ্‌বেদের, ১৯টি শুক্ল-যজুর্বেদের, ৩২টি কৃষ্ণযজুর্বেদের, ১৬টি সামবেদের এবং ৩১টি অথর্ববেদের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে 'ঈশাদিবিংশোত্তর-শতোপনিষদঃ' নামে ১২০টি উপনিষদের এক সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে। সংগৃহীত উপনিষদ্‌গুলির নাম :

১ ঈশাবাস্য ২ কেন ৩ কঠ ৪ প্রশ্ন ৫ মুণ্ডক ৬ মাণ্ডুক্য ৭ তৈত্তিরীয় ৮ ঐতরেয় ৯. ছান্দোগ্য ১০ বৃহদারণ্যক ১১ শ্বেতাশ্বতর ১২ কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ ১৩ মৈত্রেয়ী ১৪ কৈবল্য ১৫ জাবাল ১৬ ব্রহ্মবিন্দু ১৭. হংস ১৮ আরুণিক ১৯. গর্ভ ২০ নারায়ণাথর্বশিরস্ ২১ মহানারায়ণ ২২. পরমহংস ২৩ ব্রহ্ম ২৪. অমৃতনাদ ২৫. অথর্বশিরস্ ২৬. অথর্বশিখা ২৭. মৈত্রায়ণী ২৮ বৃহজ্জাবাল ২৯. নৃসিংহপূর্বতাপনীয় ৩০. নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় ৩১. কালাগ্নিরুদ্র ৩২. সুবাল ৩৩. ক্ষুরিকা ৩৪. মন্ত্রিকা ৩৫. সবসার ৩৬ নিরালম্ব ৩৭ শুকরহস্য ৩৮. বজ্রসূচিকা ৩৯. তেজোবিন্দু ৪০. নাদবিন্দু ৪১. ধ্যানবিন্দু ৪২. ব্রহ্মবিদ্যা ৪৩. যোগতত্ত্ব ৪৪ আত্মপ্রবোধ ৪৫. নারদপরিব্রাজক ৪৬ ত্রিশিখিব্রাহ্মণ ৪৭ সীতা ৪৮ যোগচূড়ামণি ৪৯. নির্বাণ ৫০ মণ্ডলব্রাহ্মণ ৫১. দক্ষিণামূর্তি ৫২ শরভ ৫৩ স্কন্দ ৫৪. ত্রিপাদ্বিভূতি-মহানারায়ণ ৫৫. অদ্বয়তারক ৫৬ রামরহস্য ৫৭. শ্রীরামপূর্বতাপিনী ৫৮. শ্রীরামোত্তরতাপিনী ৫৯ বাসুদেব ৬০. মুদ্গল ৬১. শাণ্ডিল্য ৬২. পৈঙ্গল ৬৩. ভিক্ষুক ৬৪. মহা ৬৫. শারীরক ৬৬. যোগশিখা ৬৭. তুরীয়াতীতা ৬৮. সন্ন্যাস ৬৯. পরমহংসপরিব্রাজক ৭০. অক্ষমালিকা

৭১. অব্যক্ত ৭২. একাক্ষর ৭৩. অন্নপূর্ণা ৭৪. সূর্য ৭৫ অক্ষি ৭৬. অধ্যাত্ম ৭৭. কুণ্ডিক ৭৮. সাবিত্রী ৭৯. আত্মা ৮০. পাশুপতব্রহ্ম ৮১. পরব্রহ্ম ৮২. অবধূত ৮৩ ত্রিপুরাতাপিনী ৮৪. দেবী ৮৫. ত্রিপুরা ৮৬. কঠরুদ্র ৮৭. ভাবনা ৮৮. রুদ্রহৃদয় ৮৯. যোগকুণ্ডলী ৯০. ভস্মজাবাল ৯১ রুদ্রাক্ষজাবাল ৯২. গণপতি ৯৩ শ্রীজাবালদর্শন ৯৪ তারসার ৯৫. মহাবাক্য ৯৬. পঞ্চব্রহ্ম ৯৭ প্রাণাগ্নিহোত্র ৯৮ গোপালপূর্বতাপিনী ৯৯. গোপালোত্তরতাপিনী ১০০ কৃষ্ণ ১০১. যাজ্ঞবল্ক্য ১০২. বরাহ ১০৩ শাট্যায়নীয় ১০৪. হয়গ্রীব ১০৫. দত্তাত্রেয় ১০৬ গারুড় ১০৭ কলিসন্তরণ ১০৮ জাবালি ১০৯. সৌভাগ্যলক্ষ্মী ১১০. সরস্বতীরহস্য ১১১. বহ্বৃচ ১১২. গণেশপূর্বতাপিনী ১১৩ গণেশোত্তরতাপিনী ১১৪ গোপীচন্দন ১১৫. পিণ্ড ১১৬. মহা ১১৭. আশ্রম ১১৮. সন্ন্যাস ১১৯ যোগশিখা ১২০ মুক্তিক।

প্রাচীন উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রায়শঃ গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুরুই জিজ্ঞাসু। স্থানে স্থানে এই সকল তত্ত্ব সাংকেতিক ভাষায় অথবা ছোট ছোট উপাখ্যানের দ্বারা প্রকাশিত, কোথাও বা 'ব্রহ্মোদ্য' সূক্তের আকারে পরিবেশিত। অনেক ক্ষেত্রে আবার মূল সংহিতা হইতেই বহু মন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব মন্ত্র বা উপাখ্যানে বর্ণিত তত্ত্বালোচনায় গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনী যোগ দিয়াছেন, জনক প্রমুখ ক্ষত্রিয়েরা অংশ লইয়াছেন এবং রৈক্ক শূদ্র হইলেও বাধা পান নাই।

উপনিষদে আছে আত্মাবিষয়ে নানা বিদ্যার অর্থাৎ আত্মবিদ্যার আলোচনা। আত্মাই ব্রহ্ম, তাই আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্ অনুযায়ী বিদ্যা দুই প্রকারের, পরা ও অপরা। উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করে, তাই উপনিষদ্ পরাবিদ্যা। ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশেরই ভিত্তি এই পরাবিদ্যাযুক্ত উপনিষদ্। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। প্রতি মতানুসারে উপনিষদের ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। তবে অনেকের ধারণা যে বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে একই উপনিষদে, একই সঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ প্রচ্ছন্ন।

উপনিষদের তাৎপর্য বিচারার্থে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তন্মধ্যে প্রধান। এই দুই গ্রন্থ ও উপনিষদ্ একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান, উপনিষৎসমূহ শ্রুতিপ্রস্থান। বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য, কারণ শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ।

কেবল ভারতীয় দর্শনে নহে, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতেও উপনিষদের প্রভাব লক্ষিত হয়। বহু অতীতকাল হইতেই বিভিন্ন ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ সম্প্রচারিত হইতেছে। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দারা শিকোহ্-র প্রচেষ্টায় ৫০টি উপনিষদের একটি পারসীক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৮০১/২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থেরই লাতিন অনুবাদ করেন আঁকেতিল দ্যুপেরোঁ ('ঔপ্‌নেক্‌হৎ')। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এই অনুবাদ পাঠে বলিয়াছিলেন, উপনিষদ্ তাঁহার জীবন ও মৃত্যুর সান্ত্বনা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উপনিষদের বহুবিধ জার্মান ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্স মূলার, ডয়সেন, কোলব্রুক, অল্‌ডেনবের্গে, বার্নেট প্রভৃতি মনীষীর সংকলন ও আলোচনা-সমূহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় চিন্তাতেও উপনিষদের প্রভাব প্রাচীন ও মধ্য যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসৃত হইয়াছে। রামমোহনের ইংরেজী ও বাংলা উপনিষদ্ অনুবাদ, 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থে সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্তের উপনিষদ্ সংগ্রহ, দেবেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা অথবা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে ঔপনিষদ ভাবনার প্রকাশ— উপরি-উক্ত সেই প্রভাবেরই বিচিত্র দিক।

দ্র সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত -সংকলিত, হিন্দুশাস্ত্র, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ; স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ১-৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ; বিধুশেখর শাস্ত্রী, উপনিষদ্, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৫৮, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ; A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature*, London, 1900; James Hastings, ed., *Encyclopaedia of Religion & Ethics*, vol. XII, New York, 1958; M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol. I, part I, Calcutta, 1959.

বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

উপন্যাস কার্য-কারণশৃঙ্খলিত, চরিত্রদ্যোতক ও জীবন-স্বরূপনির্দেশক কাহিনীই উপন্যাসের সংজ্ঞা। গল্পকৌতূহল হইতেই উপন্যাসের উদ্ভব— গল্পের আকর্ষণই উহার আদিম রূপ। কিন্তু যে গল্পে কেবল আকস্মিক সংঘটনের মেলা এবং যাহা চরিত্র ও জীবনসত্য প্রকাশ করে না তাহা উপন্যাসপদবাচ্য নহে। তবে ঔপন্যাসিক উদ্দেশ্যের বীজ গল্পের মধ্যে খুব প্রাচীন কাল হইতেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

মিশর দেশে খ্রীষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বেও যে সমস্ত

উপন্যাস

গল্প রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ব্যঙ্গপ্রধান, বাস্তব-সচেতন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়— এমন কি দেবতার অবতাররূপে পূজ্য মিশররাজ ফ্যারো-ও এই ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। কোমল ও দার্শনিক চিন্তাপুষ্ট গল্পেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

গ্রীস ও রোমক সাহিত্যেও বাস্তবগুণান্বিত ও প্রণয়-কাহিনীমূলক গল্প খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই আবির্ভূত হয়। ইহাদের মধ্যে এক দিকে রোমাঞ্চকর দুঃসাহসের কাহিনী (অ্যাডভেঞ্চার), অন্য দিকে কুরুচির স্পর্শযুক্ত নর-নারীর প্রেমাকর্ষণের বিবরণ— উভয় প্রকারেরই দর্শন মিলে। রঙ্গরসিকতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতার স্থর গল্পগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। উদাহরণস্বরূপ আপুলেউসের (আনুমানিক ১২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) 'মেতামোর্ফোসেস' (রূপ বদল; ইংরেজীতে 'দি গোল্ডেন অ্যাস') প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জাপানে 'গেন্‌জি মোনোগাতারি' (গেন্‌জির কাহিনী) নামে আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি প্রেম-আখ্যানের মধ্যে আশ্চর্যভাবে আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা লক্ষিত হয়। ইহার রচয়িতা জাপানের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট মুরাশাকি নামে এক অভিজাত মহিলা। এই উপন্যাসধর্মী গল্পে রাজসভার নানা রমণী ও এক লম্পট নায়কের কেলিবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে দেহগত অশ্লীলতার কোনও চিহ্ন নাই, আছে অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ। ব্যর্থ প্রেমের মর্মান্তিক বেদনা শেষ পর্যন্ত আনন্দময় পুনর্মিলনের সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে এই সুদূর অতীতে, মধ্যযুগীয় সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজচেতনার দেশে একজন স্ত্রীলোক এইরূপ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির এবং নিষিদ্ধ বিষয় বর্ণনায় সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেন।

ভারতীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ নীতিবাদপ্রধান ছোট ছোট আখ্যানেরই প্রাধান্য। 'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর' ও 'দশকুমারচরিত'-এ এই আখ্যানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি মূলতঃ ছোট-গল্প হইলেও একটি বৃহত্তর উপলক্ষসূত্রে গ্রথিত বা প্রসঙ্গক্রমে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বোক্কাচ্চোর 'ইল্ দেকামেরোনে' (১৩৪৮-৫৩ খ্রী) বা চসারের 'ক্যান্টার-বেরি টেল্‌স'-এর মত অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রসার ও অবয়ব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই আখ্যানসংগ্রহগুলিতে কতকগুলি রাজনীতি-সমাজনীতি-শঠতা-চাতুরী-মিশ্র অ্যাডভেঞ্চার গল্পও স্থান পাইয়াছে। এগুলি রসবৈচিত্র্যে ও বিষয়বিস্তারে কথঞ্চিৎ উপন্যাস-লক্ষণান্বিত। 'জাতকে' মহাজনক-জাতক, মহা-উম্মগ্‌গ জাতক, 'পঞ্চতন্ত্রে'র 'মিত্রভেদে' যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের কাহিনী, 'কথাসরিৎসাগরে'র অনেকগুলি গল্প এবং 'দশকুমারচরিতে' অপহারবর্মা, উপহারবর্মা ও মন্ত্রগুপ্তের কাহিনীগুলি ইহার দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ 'দশকুমারচরিতে' ভারতীয় চরিত্রের নৈতিক অবক্ষয়, কূটবুদ্ধির ন্যায়নীতিহীন প্রয়োগ ও তান্ত্রিক অভিচার অবলম্বনে অলৌকিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি ভারতের মূল আদর্শ -বিরোধী প্রবণতার প্রচুর নিদর্শন আমাদের বিস্মিত করে। তুর্কী আক্রমণের নিকট নীতিবলহীন, ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হিন্দু রাজন্যশক্তির পরাজয় যে অনিবার্য ছিল, ইহাতে যেন তাহা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। স্ত্রীজাতির প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস অধিকাংশ গল্পেরই বিষয়বস্তু ও মানস পরিবেশ রচনা করিয়াছে।

আরব ও পারস্য দেশেও প্রায় একই প্রকার গল্পের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষই ইহাদের বহু গল্পের আদিম উৎস। আরব্য রাত্রির কাহিনী বিচ্ছিন্ন গল্পের সমষ্টি হইলেও উদ্দেশ্যগত যোগসূত্রে ও বক্তার অভিন্নত্বে ইহারা একপ্রকার বৃহত্তর ঐক্যে সংহত হইয়াছে। বিশেষতঃ আরব দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, উহার শহর, বাজার, গ্রাম, সরাইখানা, মরুপথ, উহার আমোদ-প্রমোদ ও নৈতিক শিথিলতা এবং অতিপ্রাকৃতের ঘন সন্নিবেশ ঐ বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিকে দেশের মানসিকতার অখণ্ড প্রতিচ্ছবি-রূপে উপন্যাসের দূরব্যাপ্ত ভাবমর্যাদামণ্ডিত করিয়াছে। পারসীক কাহিনীগুলি অনেকটা আরবের অনুকৃতি ও সাহিত্যগুণে হীনতর পর্যায়ের।

মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় সাহিত্যে বোক্কাচ্চোর 'ইল্ দেকা-মেরোনে' পূর্বোক্ত মানদণ্ডপ্রয়োগে উপন্যাসের পূর্বাভাসরূপে স্বীকৃত। ফরাসী দেশে রাবলে তাঁহার 'পাতাগ্রুয়েল' (১৫৩২ খ্রী) ও 'গার্গাঁতুয়া' (১৫৩৪ খ্রী) এবং স্পেন দেশে থের্ভান্তেস তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত 'দোন্ কিখোতে' (ডন কুইক্‌জোট, ১৬০৫,-১৫ খ্রী) রচনায় উদ্ভট কল্পনা, যুগ-প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য জীবনাদর্শের প্রতি তির্যক ব্যঙ্গ ও নানা হাস্যকর ঘটনার সংমিশ্রণে এমন এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন যাহা অনেকাংশে উপন্যাসের সমধর্মী। ব্যঙ্গাতি-রঞ্জনের মাধ্যমে তাঁহারা এমন চরিত্র সৃষ্টি করিলেন যাহারা মানুষের অন্তরে একটা বিলীয়মান আদর্শের প্রতীকরূপে চিরন্তন স্থান গ্রহণ করিল। ইহাদের কিছু পরে সুইফ্‌ট তাঁহার 'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স'-এ (গালিভারের ভ্রমণকাহিনী, ১৭২৬ খ্রী) তীব্র দ্রাবকরসপূর্ণ রূপকের মাধ্যমে মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁহার নিরতিশয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার সঙ্গে আপাতবিজ্ঞানসম্মত অথচ সম্পূর্ণ কাল্পনিক লোকবিবরণ ও ঘটনাবিন্যাস যুক্ত করিয়া লেখক তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্রোধকে আরও জ্বালাময় করিয়াছেন। ভোলতেয়ার-এর 'কাঁদিদ্' (১৭৫৯ খ্রী) এই ধরনের ছদ্ম-উপন্যাসের ধারাকে প্রবহমান রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে রিচার্ডসনের হাতে আসল উপন্যাস— ঘটনার মাধ্যমে চরিত্র-চিত্রণ—'পামেলা' (১৭৪০ খ্রী) গ্রন্থে কতকটা আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে এই নবপ্রবর্তিত রচনা সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশে এবং ইংরেজী উপন্যাসের প্রভাবে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও প্রসারিত হইয়াছে। প্রতি দেশে উহার সামাজিক ঐতিহ্য ও সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা নূতন নূতন ভাবকেন্দ্র ও গঠনবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াছে এবং রূপকল্পের নানা বৈচিত্র্যে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছে। স্থূলভাবে ইহার মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর কল্পনা করা যাইতে পারে।

১ হৃদয়াবেগমূলক উপন্যাস : শতকরা প্রায় নব্বইটি উপন্যাস এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নর-নারীর হৃদয়াকর্ষণই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য— প্রেমই মানবজীবনের সৌর শক্তি। ইহার প্রভাবে উহার জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গভীরতম রহস্য প্রকাশিত হয়, মানুষের আত্মপরিচয় উচ্ছল হইয়া উঠে। যে ঔপন্যাসিক প্রেমের রহস্য-অবগুণ্ঠন যতটা উন্মোচিত করিতে পারিয়াছেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সেই পরিমাণে। বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ (১৮৫৮ খ্রী) প্রেম নাই, ইহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫ খ্রী) প্রেমের প্রথাবদ্ধ ও আলংকারিক রূপই প্রধান, বাস্তব অনুভূতি গৌণ; সেইজন্য ইহা শিক্ষানবিশি স্তরের। 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬ খ্রী) প্রেমের বৈদ্যুতিক আলোকের পরিবর্তে আছে ধর্মসংস্কারের স্তিমিতশিখা মৃৎপ্রদীপ ; পদ্মাবতীর প্রেম দুর্বার হইলেও আকস্মিক। সুতরাং ইহাতে মানবপ্রকৃতির গভীরতম অংশ আলোচিত হয় নাই। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খ্রী) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ (১৮৭৮ খ্রী) প্রেম বাধার সহিত প্রবল আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে ও ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করিয়াছে। সেই-জন্য উহাদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে (১৯০৩ খ্রী) হৃদয়বৃত্তির দুর্বার শক্তির প্রথম আবির্ভাব ও প্রাত্যহিক জীবনের চক্রঘর্ষণে উহার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সঞ্চার। 'গোরা'তে (১৯১০ খ্রী) সুচরিতার প্রেম তাহার সমস্ত শান্ত, আত্মনিরোধশীল জীবনের মধ্যে এক অদম্য বিরুদ্ধশক্তির বেদনাময় অনুপ্রবেশ। 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খ্রী) ও 'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯ খ্রী) প্রেম হয় জীবন-উত্তাপহীন কাব্যসুরভিত অনুভূতি, না হয় বাস্তব-উদাসীন ধ্যাননিবিষ্টতা। সুতরাং এই উপন্যাসদ্বয়, স্থানে স্থানে বস্তুরসসিক্ত হইলেও প্রধানতঃ কাব্যধর্মী। শরৎচন্দ্র এই প্রেমরহস্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক অবহিত। সুতরাং তাঁহার উপন্যাসগুলিই সর্বাপেক্ষা দ্বন্দ্বজটিল ও প্রাণরসসমৃদ্ধ। অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকগোষ্ঠী প্রেমের মর্মরহস্যভেদ অপেক্ষা উহার প্রবৃত্তিগত প্রেরণা ও দৈহিক আচরণের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী বলিয়া মনে হয়।

ইওরোপীয় সাহিত্যে প্রণয়মূলক উপন্যাসের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে : রিচার্ডসনের 'পামেলা' (১৭৪০ খ্রী), গ্যেটের 'ডি লাইডেন ডেস ইয়ুঙ্গেন হেবর্থের' (তরুণ হেবর্থেরের দুঃখ, ১৭৭৪ খ্রী), জেন অস্টেনের 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' (অভিমান ও সংস্কার, ১৮১৩ খ্রী), বালজাকের 'ল্য পেয়র গোরিও' (পিতা গোরিও, ১৮৩৪ খ্রী), শার্লট ব্রন্টির 'জেন আয়ার' (১৮৪৭ খ্রী), ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' (১৮৪৯ খ্রী), ন্যাথানিয়েল হথর্নের 'দি স্কার্লেট লেটার' (লাল চিঠি, ১৮৫০ খ্রী), থ্যাকারের 'হেন্‌রি এসমণ্ড' (১৮৫২ খ্রী), ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭ খ্রী), ভিক্তর উগো-র 'লে মিজারাব্‌লে' (দীন-দুঃখীগণ, ১৮৬২ খ্রী), তলস্তয়ের 'বোয়না ই মির' (যুদ্ধ ও শান্তি, ১৮৬৪ খ্রী), দস্তয়েভ্‌স্কির 'ইদিওৎ' (মূর্খ, ১৮৬৮ খ্রী), মেরেডিথের 'দি ইগোয়িস্ট' (আত্মপর, ১৮৭৯ খ্রী), হার্ডির 'টেস অফ দি ডারবারভিল্‌স' (ডারবারভিলের টেস, ১৮৯১ খ্রী), কন্‌রাডের 'লর্ড জিম' (১৯০৬ খ্রী), লরেন্সের 'সন্‌স অ্যাণ্ড লাভার্‌স' (পুত্র ও প্রেমিক, ১৯১৩ খ্রী)। প্রেমকাহিনীর মধ্যে যৌন আবেদনের প্রাধান্য অধুনা উহার মর্যাদা ও মনস্তাত্ত্বিক যাথার্থ্যের হানি ঘটাইতেছে, তবে উপন্যাসে যৌনতত্ত্বের প্রভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

২. অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চপ্রধান উপন্যাস . এই-জাতীয় উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেই অধিকসংখ্যক ও গুণগরিষ্ঠ। বাংলার সাধারণ জীবনে ঘটনারোমাঞ্চ বা দুর্ধর্ষতার বিশেষ অবসর নাই। এইরূপ উপন্যাসের আদি দৃষ্টান্ত ডিফোর 'রবিন্‌সন ক্রুসো' (১৭১৯ খ্রী)। ফিল্‌ডিং-এর 'টম জোন্‌স' (১৭৪৯ খ্রী) চরিত্রমূলক উপন্যাস হইলেও ইহাতে হানাহানি, ছুটাছুটি, আক্রমণ, পশ্চাদনুসরণ প্রভৃতি উত্তেজনাময় ঘটনা ও দৈহিক শক্তির পরিচয়েরও যথেষ্ট প্রাচুর্য আছে। সুতরাং ইহাতে কৌতূহলরস ও মানবচরিত্রজ্ঞান

উভয়েরই একটা মিশ্রিত আবেদন অনুভব করা যায়। এক হিসাবে স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের রণোন্মাদনা ও শৌর্যদৃপ্ত আচরণের আশ্রয়ে আমাদের এই রোমাঞ্চপ্রীতিকেই উচ্চতর কলাসম্মত উপায়ে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে। এমিলি ব্রন্টির 'ওয়দারিং হাইট্স' (১৮৪৭ খ্রী) এই অসম্ভব রোমাঞ্চকেই ঘটনা হইতে চরিত্রে স্থানান্তরিত করিয়াছে, উদ্দাম ঘটনার পরিবর্তে বিস্ফোরক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে। কন্‌রাডও সমুদ্র-যাত্রার সমস্ত বিপদ-দুর্যোগ-বিপর্যয়কে আত্মিক শক্তির মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' (বৃদ্ধ এবং সমুদ্র, ১৯৫২ খ্রী) উপন্যাসে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পো এবং হথর্ন এই দুই আমেরিকান ঔপন্যাসিকও অতিপ্রাকৃত বিভীষিকার মাধ্যমে মানবমনের রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। স্টিভেন্‌সন তাঁহার 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' (রত্নদ্বীপ, ১৮৮৩ খ্রী) 'কিড্‌ন্যাপ্ট' (অপহৃত, ১৮৮৬ খ্রী) 'মাস্টার অফ ব্যালাণ্ট্রি' (১৮৮৯ খ্রী) প্রভৃতি উপন্যাসে, মেস্‌ফিল্ড তাঁহার 'লস্ট এন্‌ডিভাওয়ার' (নিষ্ফল প্রয়াস, ১৯১০ খ্রী) -এ এবং জন বুকান ও জেম্‌স স্টিফেন্‌স তাঁহাদের বিভিন্ন রচনায় এই অ্যাডভেঞ্চারের রক্তরেখারই অনুসরণ করিয়াছেন। আলেক্‌জান্দ্‌র্‌ দুমা তাঁহার 'লে ত্রোয়া মুস্‌কেতেয়ার' (বন্দুকধারী তিন জন, ১৮৪৪ খ্রী) উপন্যাসে এই দুর্ধর্ষতার আতিশয্যে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সম্ভব-অসম্ভব বোধের সীমা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার ও সত্যের অন্তর্নিহিত বিস্ময় পাঠককে বহির্জগতের কাল্পনিক ঘটনার রোমাঞ্চের প্রতি কিছুটা উদাসীন করিয়াছে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বাংলা উপন্যাসে অ্যাডভেঞ্চার তেমন প্রধান হইয়া উঠে নাই। বঙ্কিমের উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহ, অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত, ঘটনাসংঘাতের দ্রুতগতি ও চমকপ্রদ পরিণতি ও প্লটের নিপুণ বিন্যাস আমাদিগকে অ্যাডভেঞ্চার রসের আস্বাদন দেয়। কিন্তু এই ঘটনাগত অ্যাডভেঞ্চার বঙ্কিমের হাতে চরিত্রের সহিত সুসংগত ও সমস্ত পরি-কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া এক উচ্চতর কলাকৌশলের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে (১৯১৭ খ্রী) ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের মাছ চুরির জন্য গঙ্গা-বক্ষে নিশীথ অভিযান, সাপধরা বেদের আড্ডায় তাহাদের আনাগোনা ও অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানভূমিতে শ্রীকান্তের নিঃসঙ্গ বিচরণের বর্ণনায় রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিকতার মাদকতা আছে, কিন্তু শ্রীকান্তের পরবর্তী পর্ব এই সুরকে গৌণ করিয়া দার্শনিক জীবনসমীক্ষায় পরিণত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯২৬ খ্রী) উপন্যাসে ব্রহ্ম দেশ ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বিপ্লবীদের জীবনযাত্রা ও গতিবিধি এক অজ্ঞাত বিপদের শিহরন বহন করিয়া আনে, কিন্তু এই মোহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকে না। পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রী) এই দুঃসাহসিক জীবনের বার্তাবাহী, তবে অজ্ঞাতের আকর্ষণের সহিত প্রেমের রহস্য যুক্ত হইয়া ঘটনাগত দুঃসাহসের মধ্যে অন্তঃপ্রেরণার নিগূঢ়তার সঞ্চার করিয়াছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এ (১৯৪৪ খ্রী) জনবসতিবিরল নদী-সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ডের শাসনশৃঙ্খলাহীন পরিবেশে চোর-ডাকাত-বোম্বেটের দুর্ধর্ষ প্রকৃতি ও নৃশংস অত্যাচার আমাদের রোমাঞ্চ-পিপাসাকে তৃপ্ত করে।

৩. অদ্ভুত বা উদ্ভট রসপ্রধান উপন্যাস. ইওরোপীয় সাহিত্যে রাব্‌লে-র 'গার্গাঁতুয়া' (১৫৩৪ খ্রী), থের্ভা-ন্তেসের 'দোন কিখোতে' (১৬০৫, -১৫ খ্রী), বুনিয়ানের 'দি পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' (তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ, ১৬৭৮-৮৪ খ্রী), সুইফ্‌টের 'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স' (গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী, ১৭১৬ খ্রী), ভোলতেয়ারের 'কাঁদিদ্‌' (১৭৫৯ খ্রী), লুইস ক্যারলের 'অ্যালিসেজ অ্যাডভেঞ্চার্‌স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' (অপরূপ দেশে অ্যালিসের অভিজ্ঞতা, ১৮৬৫ খ্রী), নীট্‌শের 'আল্‌সো স্প্রাখ জরথুস্ট্র' (জরথুশ্‌ত্রের এই উক্তি, ১৮৮৩-৯২ খ্রী) জয়েসের 'ইউলিসিস' (১৯২২ খ্রী), কাফকার 'ডাস সুক্লস' (দুর্গ, ১৯২৬ খ্রী) এই সবই অল্পবিস্তর কাল্পনিকতার কুয়াশামাখা। ইহাদের বাস্তব জগতের অন্তরালে যেন একটা কুহকমায়ার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব উঁকি মারে। পরিচিত জীবনের পিছনে একটা লোককল্পনার (মিথ) অনির্দেশ্য সংকেত ফুটিয়া ওঠে। উপন্যাস এখন সোজাসুজি বস্তু-চিত্রণে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বস্তুর গভীরতায় যে নিগূঢ়তর উপচ্ছায়া অর্ধনিমগ্ন আছে তাহাকেই পরিস্ফুট করার দিকে লক্ষ্য দিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসে অদ্ভুত ও উদ্ভট রসের উদাহরণ দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২ খ্রী), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩ খ্রী) প্রভৃতি গল্পে, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬ খ্রী), 'চিনিবাস-চরিতামৃত' (১৮৮৬ খ্রী) প্রভৃতি ব্যঙ্গাতিরঞ্জনময় রচনাতে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষুদিরাম'-এ (১৮৮৮ খ্রী)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮ খ্রী) প্রমুখ উপন্যাসে

চরিত্র ও কাহিনী যৌনতত্ত্বের রূপক-বাসিত হইয়া এক অদ্ভুত জীবনবিকারের বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, রক্ত-মাংসের মানুষ 'আইডিয়া'র প্রতীকরূপে এক অর্ধছায়াময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ত্রিশের যুগের ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের কোনও কোনও উপন্যাসে নর-নারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নবরূপকল্পনা তাহাদের বর্তমান বাস্তব প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া এক অভিনব সমাজবিন্যাসের ইঙ্গিত দিয়াছে।

ইহা ছাড়া নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানবের নব নব চিন্তাধারা উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইতেছে। বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে বিভিন্ন অত্যাধুনিক মতবাদ, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় ও পুনর্গঠনের প্রধান সূত্রগুলির মানবমনের উপর প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে আলোচিত হইবার প্রবল প্রবণতা দেখা যাইতেছে।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স -এর বিজ্ঞান-প্রভাবিত ভবিষ্যৎ জীবন-কল্পনা, আন্তর্জাতিক পরিধি পর্যন্ত জীবনের দিগন্ত প্রসার, চেতনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের দ্বারা জীবনের বিভিন্ন স্তরের সহাবস্থানের জটিলতা, ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে নূতন ধারণা— এ সমস্তই অতি-আধুনিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাসের সীমান্ত আমাদের পূর্ব-ধারণাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমপ্রসারিত হইতেছে। এই অনন্ত প্রসার-সম্ভাবনার মধ্যেই ইহার জীবনীশক্তি নিহিত আছে।

ইহারই পরোক্ষ ফলরূপে উপন্যাসের কোনও নির্দিষ্ট রূপকল্প (ফর্ম) নির্ধারণ করা খুব দুরূহ। ইহার প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতিও চিরপরিবর্তনশীল। উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইহার আঙ্গিক ক্রমশঃ একটি বিশিষ্ট নিয়মবন্ধনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। গল্প হইতে প্লট, ঘটনা হইতে চরিত্র ও জীবনব্যাখ্যা, অতিকায়তা হইতে সুমিত, সুসংবদ্ধ গঠনসুষমা, আকস্মিকতার খেয়াল হইতে একলক্ষ্যাভিমুখী গতিনিয়ন্ত্রণ— উপন্যাসের রূপবিবর্তন এই পথ ধরিয়াই চলিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ যেন উপন্যাস মোড় ফিরিয়া বিপরীতমুখী হইল। প্লটের সংহতি, এমন কি গল্পের ধারাবাহিকতাও অমূর্ত ভাবানুভূতির একটানা প্রবাহে বিলুপ্ত হইল। চরিত্র-চিত্রণের সুনির্দিষ্টতা বহু পরস্পর-বিরোধী অথচ সমকালীন চেতনাপরম্পরার মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। লেখকের ইচ্ছামত উপন্যাসের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি আপাতলক্ষ্যহীনভাবে নিয়মিত হইল। ইহাতে কলাসৃষ্টির রূপচিত্রের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিভ্রান্তি ও সিদ্ধান্তবিমূঢ়তা প্রাধান্য লাভ করিল। লেখক সক্রিয় শিল্পী ও নির্মাতা না হইয়া নৈর্ব্যক্তিক সত্য উপস্থাপনের বাহনমাত্র হইলেন। জীবনের সামগ্রিক সত্যের পরিচয় দিবার তাঁহার কোনও দায়িত্ব রহিল না— সত্যের যে অংশ উপেক্ষিত বা নবাবিষ্কৃত তাহাই তাঁহার একমাত্র কৌতূহলের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। উপন্যাস এখন উহার ক্রমপ্রসারিত গতিপথের এক সন্ধিস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান। উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত অনুমান সম্ভব নয়। তবে মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, আগামী যুগে ঔপন্যাসিক হয়ত তাহা অবলম্বন করিয়া জীবনের এক অভিনব সংশ্লেষমূলক ইতিহাস রচনার কার্যে ব্রতী হইতে পারেন, এরূপ অনুমান অসংগত নয়।

দ্র E. M. Forster, *Aspects of the Novel*, Harmondsworth, Middlesex, 1928 ; T. H. Uzzell, *The Technique of the Novel*, 1947.

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস, বাংলা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে নীতিকথা, পশু-পক্ষীর জীবনকাহিনী, ধর্মতত্ত্বমূলক আখ্যায়িকা প্রভৃতির ছদ্মবেশে উপন্যাস-বীজ অঙ্কুরিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, পালি সাহিত্যের বৌদ্ধ জাতক এবং রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানগুলি অনেকটা অজ্ঞাতসারেই উপন্যাসের আবির্ভাবের সূচনা করিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা, মুসলমান কবিদের প্রণয়-রোম্যান্স এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ -গীতিকাগুলি ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষ জীবন-কৌতূহলের ধারাকে প্রসারিত করিয়াছে। কিন্তু ইহারা শ্রেণীর সাধারণ চিত্র ছাড়াইয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের নিগূঢ়তায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। ব্যক্তির অন্তরকাহিনী তখনও স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশে ইংরেজী উপন্যাসের জন্ম হইয়াছে। ইংরেজের সহিত ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির অনুচিকীর্ষা বাঙালীর সমাজশাসনবদ্ধ অতিনিয়ন্ত্রিত জীবনধারায় বিক্ষোভ-তরঙ্গ তুলিয়াছে এবং আত্মসচেতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম হইয়াছে। উনবিংশ শতকের এই তরঙ্গ-চঞ্চল, আত্মাভিমানে দৃঢ়, আত্মবিচারণাশীল প্রতিবেশেই বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব।

ব্যঙ্গ-ধূমকেতুর পুচ্ছ ধরিয়া বাংলার সাহিত্যাকাশে উপন্যাস-জ্যোতিষ্কের পরাশ্রয়ী আবির্ভাব। যে পর্যবেক্ষণ-

শক্তি ও জীবনসমীক্ষা উপন্যাসের প্রাণ, তাহার প্রথম অনুশীলন সম্ভব হইল বিকৃত আদর্শের প্রভাবে উন্মার্গগামী চরিত্রের মধ্যে। ভোগবিলাসাসক্ত, প্রাচীনপ্রথালঙ্ঘী, পারিবারিক জীবনে শাসনশৃঙ্খলাহীন 'বাবু'-ই সর্বপ্রথম উপন্যাসের নায়করূপে অবতীর্ণ হইলেন। বাবুর সঙ্গে বাবু-প্রসূতি সমাজও আসিল ; এই উভয়ের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবে ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের শিক্ষানবিশি আরম্ভ হইল। 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনামধারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'নববাবুবিলাস'-এ (১৮২৫ খ্রী) উপন্যাসের প্রথম আভাস রচনা করিলেন। অবশ্য বাবুচরিত্র ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল নহে ; একটি সমাজপ্রবণতার মূর্ত রূপ, সামাজিক দুর্নীতির বিষবাষ্পসঞ্চয় মাত্র। তথাপি এই বিকৃত সত্তাই অতি-রঞ্জিত তাৎপর্যে প্রতিভাত হইয়া পরবর্তী উপন্যাসে সুস্থতর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছে। অতঃপর প্রায় ত্রিশ বৎসর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত না হইলেও সংবাদ-পত্রে বাদ-প্রতিবাদ, ধর্মমূলক বিতর্ক, কুপ্রথা-উচ্ছেদকারী বিবিধ সামাজিক আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের সমাজদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া উহার ক্ষেত্রপ্রস্তুতি চলিতেছিল।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙালী পরিবারের ধর্মজীবনের সমস্যা অবলম্বনে লেখা। ইহাতে দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের যে জীবনচিত্র ও কথ্য ভাষার সরস প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে ইহার সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। তবে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহা নিতান্ত প্রচারধর্মী সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রী) উপন্যাসের বিবর্তনে আর এক পদ অগ্রগতির সূচনা করে। 'নববাবুবিলাস'-এর তুলনায় ইহাতে সমাজচিত্র পূর্ণতর ও বিচিত্রতর। কাহিনীর গঠনকৌশলও লক্ষণীয়। ঠকচাচা 'নববাবুবিলাস'-এর প্রধান খলিপার উন্নততর, সজীবতর সংস্করণ। মতিলালের দুষ্ক্রিয়াসক্তির সঙ্গে তাহার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই ; কিন্তু যে অসাধুতার আবহে সে লালিত তাহার প্রবর্তনে ঠকেরই প্রাধান্য। বিশেষতঃ সে কেবল বাবুরাম-কাহিনীর উপগ্রহ নহে, পাপাচরণে তাহার উদ্ভাবনকৌশল ও স্বভাবচতুর্বৃত্তি চিত্তবৃত্তি তাহাকে অ-পরতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে। 'নববাবুবিলাস'-এ বে-হিসাবি বিলাস-ব্যসনের চরম দুর্গতি লেখকের ব্যঙ্গপ্রবণতাকেই তৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু 'আলাল'-এ সংস্কারের নীতিগত প্রয়োজনও স্বীকৃত। রামলাল, বরদাবাবু, বেণীবাবু ধর্মপক্ষ-সমর্থক ও মতিলালের চরিত্র সংশোধনে সহায়ক। ব্যঙ্গচিত্র ইহাতে নৈতিক পুনরুদ্ধারের মহত্তর উদ্দেশ্যের দ্বারা রূপান্তরিত। এই সময়ে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২ খ্রী) উপন্যাস নহে— রঙ্গ-ব্যঙ্গ চিত্রসমষ্টি। ইহার মধ্যে উপন্যাসের অনেক নূতন উপাদান থাকিলেও পরিস্ফুট উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের অভাবের ফলে তাহা বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করে নাই।

এইরূপে বাংলা উপন্যাসে সমাজসমস্যার পূর্বাভাস রচিত হইতে থাকে। অপর দিকে ঐতিহাসিক রোম্যান্সের প্রতিও একটা ক্ষীণ আগ্রহ এই সময়ে সঞ্চারিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' নামক উপাখ্যান দুইটি লইয়া রচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতি-হাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ খ্রী) সেই আগ্রহের একটি বহিঃ-প্রমাণ। শেষোক্ত কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রকেও ঈষন্মাত্রায় প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকের অনুমান।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রী) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ বাংলা উপন্যাসের যথার্থ সূত্রপাত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই বাঙালী জীবনের দ্বন্দ্বজটিল রহস্যময় মহিমা প্রথম উদ্ঘাটিত। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের সংঘাতময় গৌরবকাহিনী জীবন্ত চরিত্রের সাহায্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইল। ইতিহাসের উত্তেজনাপূর্ণ সংকটমুহূর্তে মানবচরিত্রের কি অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, বঙ্কিমের উপন্যাসে তাহার প্রমাণ মেলে। কতলু খাঁর হত্যাদৃশ্যে বিমলার উত্তেজিত আবেগ-কল্পনা অথবা জগৎ-সিংহ ও ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ (দুর্গেশনন্দিনী), মেহেরুন্নিসা ও মতিবিবির কূটবুদ্ধির প্রতিযোগিতা (কপালকুণ্ডলা, ১৮৬৬ খ্রী), মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের অগ্নিজ্বালাময় বর্ণনা (মৃণালিনী, ১৮৬৯ খ্রী), মীর কাসেমের অনুতাপ-দিগ্ধ মনোবেদনা ও নিয়তিবিড়ম্বিত প্রতিবেশ (চন্দ্রশেখর, ১৮৭৫ খ্রী), সর্বত্যাগী দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস (আনন্দ-মঠ, ১৮৮২ খ্রী), দেশসেবায় নিষ্কাম ধর্মপ্রেরণা (দেবী চৌধুরাণী, ১৮৮৪ খ্রী), সীতারামের বিরাট পতন ও মহনীয় পুনরুদ্ধার (সীতারাম, ১৮৮৭ খ্রী), রাজসিংহ-ঔরঙ্গ-জেবের সর্বস্বপণ সংগ্রামের বীরত্বমহিমা (রাজসিংহ, ১৮৯৩ খ্রী)— বঙ্কিমের উপন্যাস এই সব স্মরণীয় কীর্তি-ভাস্বর দৃশ্যাবলী আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয়। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩ খ্রী), রজনী (১৮৭৭ খ্রী), কৃষ্ণ-কান্তের উইল (১৮৭৮ খ্রী) প্রভৃতি পারিবারিক উপন্যাস-গুলিতে মানবচিত্তে অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্মদাহী তীক্ষ্ণতা ও ট্র্যাজেডির করুণ রহস্যগভীর পরিণতি, আবার কোথাও

কোথাও জীবনের স্নিগ্ধ-মধুর প্রকাশ এবং সরস আনন্দোচ্ছলতা রূপ পাইয়াছে। আধুনিক সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের আপেক্ষিক অভাব সত্ত্বেও বঙ্কিমের উপন্যাস ঘটনাবৈচিত্র্য ও অন্তর মহিমার স্পর্শে সাহিত্যিক উৎকর্ষের সমুন্নত পর্যায়ে পৌছিয়াছে। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ১৮৭৭ খ্রী; কণ্ঠমালা, ১৮৭৭ খ্রী; মাধবীলতা, ১৮৮৪ খ্রী) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (বঙ্গবিজেতা, ১৮৭৪ খ্রী; মাধবীকঙ্কণ, ১৮৭৭ খ্রী; মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, ১৮৭৮ খ্রী; রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, ১৮৭৯ খ্রী; সংসার, ১৮৮৬ খ্রী; সমাজ, ১৮৯৪ খ্রী) প্রধানতঃ বঙ্কিম-অনুসৃত আদর্শেরই অনুশীলন করেন। অবশ্য প্রধানতঃ বঙ্কিম-অনুবর্তী হইলেও ইঁহাদের রচনা স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। বিশেষতঃ রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের প্রতি অধিকতর অনুগত এবং সামাজিক উপন্যাসে তিনি স্পষ্টতঃই বিধবা-বিবাহ অথবা অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক। বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অপরাপরদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্পতরু, ১৮৭৪ খ্রী) ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (মডেল ভগিনী, ১৮৮৬ খ্রী, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, ১৯০২ খ্রী) হাস্যরসপ্রধান ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' (১৮৬৯, ১৮৮৪ খ্রী) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮৭৬ খ্রী), 'মিবাররাজ' (১৮৭৭ খ্রী) প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়া। কিন্তু নূতন ধরনের আস্বাদ মিলিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। তারকনাথ তাঁহার 'স্বর্ণলতা'য় (১৮৭৪ খ্রী) বাংলা দেশের সহজ পারিবারিক চিত্র আঁকিয়াছেন, অপর দিকে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২ খ্রী) অথবা 'ডমরু-চরিত' (১৯২৩ খ্রী) উদ্ভট রসে পরিপূর্ণ। রূপকথার আমেজে, ভৌতিক আবহে অথবা ভরপুর কৌতুকে তাঁহার রচনা একক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

নূতন বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা-রীতি প্রবর্তন করিয়া বাংলা উপন্যাসকে যথার্থ যুগোপযোগী রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও প্রতিষ্ঠিত প্রথার অনুকারকরূপেই উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম পদার্পণ। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩ খ্রী) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭ খ্রী) বাহ্যতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস; কিন্তু উহাদের অন্তরধর্ম লেখকের জীবনদর্শন-প্রভাবিত। ঐতিহাসিক সংঘর্ষের ছদ্মবেশে বিভিন্ন জাতীয় মানবপ্রকৃতির দ্বন্দ্বপ্রকাশই লেখকের অভিপ্রেত। আর এই দ্বন্দ্বের পিছনে আনন্দময় মুক্ত পুরুষের মানস-প্রশান্তি লেখকের কল্পনায় মুখ্যভাবে উদ্ভাসিত। তাই 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট নির্মম, ক্রূর আততায়ী শক্তি রূপে প্রতিভাত এবং বসন্ত-রায় আনন্দের ও বাহ্য-ঘটনা-নিরপেক্ষ অন্তরশক্তির উৎস। 'রাজর্ষি'তে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের স্বতন্ত্র জীবনাদর্শের সংঘাত নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ হইয়াছে। নানা সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থলে গোবিন্দমাণিক্যের স্থির, ধ্যানতন্ময় প্রশান্তিই উজ্জ্বলতম। ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজ আদর্শের প্রতিচ্ছবিই দেখিয়াছেন।

'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রী), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬ খ্রী) ও 'গোরা' (১৯১০ খ্রী)— তাঁহার এই পরবর্তী উপন্যাস-গুলির মধ্যে উপন্যাসের আঙ্গিক ও শিল্পকলা পূর্ণভাবে অনুসৃত। কবি ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে রবীন্দ্র-মানসে যে আজীবন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, এই উপন্যাসগুচ্ছের মধ্যে তাঁহার সাময়িক নিবৃত্তি। 'চোখের বালি'তে অবৈধ প্রণয়াকর্ষণের হৃদয়মন্থনক্রিয়া উদাহৃত। বঙ্কিমচন্দ্রে যাহা আভাসে ইঙ্গিতে ঈষৎ-ব্যক্ত, রবীন্দ্রনাথে তাহাই প্রাত্যহিক আচরণের তথ্যসমৃদ্ধ সুস্পষ্টতায় উদ্ঘাটিত। এইজন্যই ইহা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মূল উৎসরূপে স্বীকৃত। অবশ্য উপ-সংহারের আদর্শবাদ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনবোধপ্রসূত, এবং বর্তমান বস্তুবাদের যুগে তাহা সুকুমার কবিকল্পনার অভিযোগে প্রত্যাখ্যাত। 'নৌকাডুবি'তে ঘটনার বিস্ময়াবহ বৈচিত্র্য মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিকতার উপর জয়ী হইয়াছে— হিন্দুনারীর আজন্মপোষিত সংস্কার এখানে স্নেহসাহচর্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে অতিক্রম করিয়াছে। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার বিরাট পটভূমিকার সহিত চরিত্রের ব্যক্তিগৌরব সুন্দর সংগতি রক্ষা করিয়াছে। গোরা বিদেশীর শাসন হইতে মুক্তিকামী, অথচ প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সর্বপ্রকার সংকীর্ণ বন্ধনস্বীকৃতির একান্ত অনুরাগী। তাহার জন্মরহস্য উদ্ঘাটনে তাহার মানসিক দৃঢ়তার একটি ভিত্তি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়া তাহার প্রেম-প্রবণতা ও স্বাধীনতাস্পৃহাকে সর্ববাধামুক্ত উদার বিকাশের সুযোগ দিয়াছে। নারীচরিত্র অঙ্কন ও প্রতিবেশ রচনাতেও ইহা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বঙ্কিম-উপন্যাসের অর্ধাবগুণ্ঠিতা নায়িকার তুলনায় সুচরিতা হৃদয়রহস্যের পূর্ণ-বিকশিত রূপ লইয়া আবির্ভূত। এক দিকে বিনোদিনী এবং অপর দিকে সুচরিতা নারীপ্রকৃতির দ্বিবিধ রহস্যের পরিপূর্ণ উন্মোচন।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে (চতুরঙ্গ, ১৯১৬ খ্রী; ঘরে বাইরে, ১৯১৬ খ্রী; যোগাযোগ, ১৯২৯ খ্রী; শেষের কবিতা, ১৯২৯ খ্রী; দুই বোন, ১৯৩৩ খ্রী; চার অধ্যায়, ১৯৩৪ খ্রী; মালঞ্চ, ১৯৩৪ খ্রী) বিষয়নির্বাচন,

উদ্দেশ্য ও শিল্পরীতির দিক দিয়া মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। বাঙালী জীবনের সাধারণ চিত্রের পরিবর্তে এখন তিনি উহার অসাধারণ, সংঘাতোন্মুখ খণ্ডাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার চরিত্রাবলীও অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী হইল। তাঁহার জীবনব্যাখ্যার রীতিতেও আনুপূর্বিক ঘটনাবিন্যাসের স্থানে কেবল নির্বাচিত তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ইঙ্গিতময় দিকটিই প্রাধান্য লাভ করিল। ভাষা এক দিকে তীক্ষ্ণ, অর্থগূঢ় ও সংক্ষিপ্ত এবং অপর দিকে কবিত্বময় আবেগমুগ্ধতার বাহন হইল। জীবনের খণ্ডাংশে প্রতিফলিত মানবসমস্যার চিত্রণে জীবনের তির্যক রূপটি প্রকাশ পাইল। ইহাতে এক দিকে যেমন জীবনের সংকট-উত্তেজিত অপ্রত্যাশিত মহিমা ফুটিয়াছে, অপর দিকে তেমনই কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের চাপে উহার স্বতঃস্ফূর্ত বহুমুখিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই পর্বের রবীন্দ্র-উপন্যাস কল্পনাবিভোর কবি ও সমস্যাবিশ্লেষণনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাতার অনন্য মিলনের অসমচিহ্নাঙ্কিত। বাংলা উপন্যাসের পরবর্তী বিবর্তনের সহিত ইহারা প্রায় সম্পর্কহীন এবং আপন নিঃসঙ্গ মহিমায় ইহারা ঊর্ধ্বলোকচারী।

রবীন্দ্রযুগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও একজন বিশেষ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁহার উপন্যাস (রমাসুন্দরী, ১৯০৮ খ্রী ; নবীন সন্ন্যাসী, ১৯১২ খ্রী ; রত্নদীপ, ১৯১৫ খ্রী ; সিন্দূরকৌটা, ১৯১৯ খ্রী ইত্যাদি) ঘটনা-প্রধান— চরিত্রের গভীর বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত। তবে তাঁহার সহানুভূতিস্নিগ্ধ জীবনদর্শন, সরস বর্ণনাভঙ্গী ও জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতির প্রতি কৌতুক-কর কটাক্ষ সমস্যাক্লিষ্ট পাঠকের নিকট বিশেষ রুচিকর ও আস্বাদনীয় মনে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মর্মস্থল হইতে রস আহরণ করিয়া ও মানসদ্বন্দ্বের সন্ধান দিয়া বাংলা সাহিত্যে নূতন রসের সঞ্চার করে। তাঁহার উপন্যাস মূলতঃ নির্মম সামাজিক আইন-কানুনের বিরুদ্ধে সহানুভূতিমূলক বিচারের সমর্থক। অপরাধীর চরিত্রস্খলনের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান না করিয়া নির্বিচার দণ্ডপ্রয়োগ মূঢ়তারই পরিচয়। তাহা ছাড়া কোনও মানুষ সম্বন্ধে অপরাধই চূড়ান্ত সত্য নয়। পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির সমাবেশে মানবচরিত্র দুর্জ্ঞেয় ; ইহার গ্রন্থিমোচন সম্ভব বিচারকের রক্তচক্ষুতে নয়, সমবেদনার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে। আবার মানবমনের সকল অংশের মধ্যে ভালোবাসার রহস্য আরও দুর্ভেদ্য। কোনও যুক্তি-তর্ক, আচরণসংগতি, কৃতজ্ঞতাবোধ, স্নেহ-মমতার মানদণ্ডে ইহার প্রকৃতির পরিমাপ হয় না। এমন কি, সতীত্ব ও প্রেমও একার্থবাচক বা একপাত্রন্যস্ত নয়। প্রেমের দুর্বার বন্য আবেগ সব সময় পাতিব্রত্যনিষ্ঠার বন্ধন মানে না। এইজাতীয় নিগূঢ় জীবনসত্য শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের আবেগময় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তত্ত্বজটিলতার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

সমাজবিগর্হিত এবং সমাজ-অনুমোদিত— প্রেমের এই উভয়বিধ চিত্রই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আছে। তাঁহার নারীচরিত্র তেজস্বিতায়, সহজ সংস্কারলব্ধ সত্যদৃষ্টিতে কখনও কখনও আশ্চর্য স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভেদী বিচারশক্তিতে ও জটিল সমস্যাসমাধানের নিপুণতায় সমাজ-প্রাণশক্তির উৎসরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষচরিত্র দার্শনিক নির্লিপ্ততার জন্য অনন্যতা অর্জন করিয়াছে। তথাপি নারীশক্তির তুলনায় উহারা অপ্রধান ও নিষ্ক্রিয়। শরৎচন্দ্র বাঙালীর নিস্তরঙ্গ নিয়ম-নিগড়বদ্ধ জীবনে যে দ্বন্দ্বমথিত গতিবেগ, ভাবের বিপরীতমুখী উচ্ছ্বাস এবং প্রাণের লীলাস্বাচ্ছন্দ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাহা তুলনারহিত।

শরৎ-উত্তর যুগে ও প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণায় আমাদের সমাজচেতনায় এমন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে তাঁহার 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬ খ্রী), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬ খ্রী) প্রভৃতি উপন্যাস প্রায়-অবলুপ্ত গ্রামজীবনের ছবি বলিয়া মনে হয়। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার অনুযোগ-অভিযোগ বর্তমানকালে বস্তুভিত্তিকতাচ্যুত হওয়ায় উহাদের ভাবাবেদনও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। হয়ত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এরূপ সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করিবে না। তাঁহার 'পথের দাবী'ও (১৯২৬ খ্রী) স্বাধীন বাংলার কানে হয়ত ভাবাতিরঞ্জনের চড়া সুরের জন্য মুখরভাষণের পর্যায়ে পড়িবে। তাঁহার সাবিত্রী (চরিত্রহীন, ১৯১৭ খ্রী) অথবা রাজলক্ষ্মীর (শ্রীকান্ত, ১৯১৭-৩৩ খ্রী) দৈহিক শুচিতা বিষয়ে অতিসতর্কতা বর্তমান নীতিবোধের মানদণ্ডে হয়ত বাড়াবাড়ি মনে হইবে। কিরণময়ীর (চরিত্রহীন) তীক্ষ্ণ মনন ও কমলের (শেষ প্রশ্ন, ১৯৩১ খ্রী) হিন্দু আদর্শের পুরাপুরি অস্বীকৃতি বৈপ্লবিকত্ব হারাইয়া হয়ত তর্ককুশলতার সাড়ম্বর প্রদর্শনীতে দাঁড়াইবে। তথাপি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিক মানবের মনোলোকের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের জীবনসমস্যার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মানস আবেগ-আকূতি ভিন্নবিষয়াশ্রয়ী হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র পূর্ণবিকশিত আধুনিকতার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকরূপে স্মরণীয় থাকিবেন।

শরৎচন্দ্রের সমকালীন ও কিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

উপন্যাস, বাংলা

মহিলা-ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর সাহিত্যকৃতিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। উনবিংশ শতকের নবজাগরণের পর কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নারীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। নারীর বিশেষ মানসিকতা, দৃষ্টির সৌকুমার্য ও ভাবপ্রবণতা, প্রেমের ক্ষেত্রে তাহার সলজ্জ, দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ ও জীবনদর্শনের করুণ অদৃষ্টনির্ভরতা পুরুষ লেখকের সহিত তাঁহার পার্থক্য সূচিত করে। স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের সহিত নারীসুলভ সাধারণ লক্ষণগুলি বহন করেন। ইঁহাদের রচিত দাম্পত্য অভিমান ও মনোমালিন্যের কাহিনীগুলিতে প্রাচীন সমাজপ্রথার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে ও নারীর ন্যায্য অভিমানকেও পরিবারশৃঙ্খলাবিরোধী রূপে নিন্দার্হ বলা হইয়াছে। কিন্তু অতি-আধুনিক মহিলা ঔপন্যাসিকেরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধারণ জীবনবোধের দিক দিয়া পুরুষের সহিত এতটা অভিন্নতা অর্জন করিয়াছেন যে তাঁহাদের রচনায় নারীদৃষ্টিবৈশিষ্ট্য প্রায় অলক্ষ্য। আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায় প্রভৃতিকে আমরা স্ত্রী-পুরুষ-নিরপেক্ষ মানদণ্ডে বিচার করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি। নারীকে আপন ভাগ্যজয়ের অধিকার বিধাতা দিয়াছেন; কিন্তু এই দানপত্রে সরস্বতীদেবী প্রসন্ন মনে স্বাক্ষর করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শরৎচন্দ্রের পরে উপন্যাস-সাহিত্যে নানা বিচিত্র সুরের সমাবেশ ঘটিল এবং উহার পরিধিবিস্তার ও বিষয়-বৈচিত্র্য নানারূপে প্রকাশিত হইল। মনীষা ও জীবন-পর্যবেক্ষণের নানামুখী উৎকর্ষের সাক্ষাৎ মিলিল। উপন্যাসের মধ্যে যৌনজটিলতা ও অপরাধতত্ত্বের প্রবেশ ঘটাইয়া নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যেমন সমসাময়িক রুচিকে আঘাত করিলেন, তেমনই পাঠকের মনে এক উদারতর মনোভাব ও বিচারবুদ্ধির প্রেরণা জোগাইলেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতিও এই সময়ে উপন্যাস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অজস্র হাস্যরস ও উদ্ভট পরিস্থিতি ও চরিত্র-কল্পনাকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার মুখ্য পরিচয় ঔপন্যাসিক রূপে নহে, হাস্যরসিক রূপে। ডিটেকটিভ উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে এক সময়ে খ্যাতিমান হন পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়। জগদীশ গুপ্ত ইতিমধ্যে এককভাবে নির্মোহ বাস্তবদৃষ্টি ও ব্যঙ্গের তির্যক ব্যঞ্জনাপূর্ণ এক জীবন-আলোচনারীতি প্রচলন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কল্লোলযুগের বহু লেখক এবং বিশেষভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে আরও মার্জিত রূপ ও একনিষ্ঠ জীবনদর্শনের মর্যাদা দিয়াছেন।

জীবনদর্শনের বিশিষ্টতা ও জীবনসত্যের দৃঢ় উপলব্ধি করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। তারাশংকর উত্তর রাঢ়ের ভূস্বামীতন্ত্রের বিলোপ এবং উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের সামগ্রিক রূপান্তরকে তাঁহার প্রথম স্তরের উপন্যাসের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী স্তরে তিনি সমাজের অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাসের সমস্যা অতিক্রম করিয়া অতীত সংস্কৃতি ও জীবনবোধ-সংক্রান্ত হিন্দু দার্শনিক চেতনার মর্মমূলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনসমীক্ষা এখনও নব নব দিগন্তচারিণী, সুতরাং তাঁহার চূড়ান্ত মূল্যায়নের আজও সময় হয় নাই। 'কবি' (১৯৪২ খ্রী), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রী), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪ খ্রী), 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রী), 'আরোগ্য-নিকেতন' (১৯৫৩ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিদৃষ্টি, প্রকৃতির সহিত একাত্মতা ও সরল, সুস্থ, দ্বন্দ্বহীন জীবন-সাধনা সম্বল করিয়া উপন্যাসক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির শান্তি, সৌন্দর্য ও নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রাবলীর মানসগঠনের প্রধান উপাদান। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯ খ্রী) ও 'অপরাজিত'-এর (১৯৩২ খ্রী) নায়ক যেন প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্যবোধ ও অক্ষুব্ধ প্রশান্তির মানবিক প্রতিরূপ। তাঁহার 'আরণ্যক'-এ (১৯৩৯ খ্রী) অরণ্যের অধৃষ্য মহিমা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া কয়েকটি সরল, আত্মভোলা, আনন্দময় নর-নারীর জীবনের মর্মকোষে মধুক্ষরণ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবন যেন আধুনিক জটিল ও দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ জীবনবেগকে নিজের প্রগাঢ় অনুভূতিছন্দের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আধুনিক আত্মশক্তির সমস্ত দুর্বোধ্যতা ও চিত্তবিক্ষেপের সমগ্র ঘূর্ণাবেগ তাঁহার উপন্যাসে বিধৃত। মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ বাংলার অতীত-আচ্ছন্ন জীবনচর্যায় যতখানি শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হইতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তাহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই দুঃসাধ্যসাধন করিতে গিয়া তিনি সাধারণ বাঙালী জীবনে কখনও অর্ধ-অবাস্তবতার গোধূলিছায়া, কখনও রূপকের সর্বব্যাপী মায়াবরণ, কখনও সাধারণ প্রচলিত ধারণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান-বিশ্লেষণ আরোপ করিয়া উহাকে নিজ উদ্দেশ্যের অনুকূল

করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের রচনাতে কিছু পৌনঃপুনিকতা ও ক্লান্তির লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার জীবন-নিরীক্ষার গভীরতা ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাঁহার 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬ খ্রী) ও 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রী) বাংলা সাহিত্যের বিশেষ স্মরণীয় উপন্যাস।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকগণ তাঁহাদের তরুণ বয়সের আতিশয্য কাটাইয়া ধীরে ধীরে উপন্যাসক্ষেত্রে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেহবাদের পঙ্ক হইতে তাঁহাদের জীবনদর্শনের বিশিষ্ট ভঙ্গী ঠিক পঙ্কজের মত না হইলেও নিজ স্বভাবসৌন্দর্য ও সত্যনিষ্ঠায় বিকশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জীবনকে দেখেন খণ্ড খণ্ড ভাবে, কোনও আকস্মিক প্রেরণার অস্থির আলোকে, হঠাৎ-আবিষ্কৃত তাৎপর্যের পটভূমিকায়। তাঁহাদের প্রথম রচনার দেহপঙ্কিলতা ও কাব্যাতিরেক পরবর্তী যুগে লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের একটা সূক্ষ্ম, অদৃশ্য প্রভাব যেন তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের তরুণ বয়সের প্রতিশ্রুতি অনেকটা অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। কয়লাকুঠির জীবনযাত্রা, সাঁওতাল-কুলি-মজুরের হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত ও নীতি-অনুশাসনে অনিয়ন্ত্রিত মানস আবেগ বাংলা উপন্যাসে কোনও স্মরণীয় রূপ পায় নাই। এগুলি এখন ব্যবহৃত হয় চিত্রসৌন্দর্যের প্রয়োজনে, জীবনের মূলগত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নহে। মণীন্দ্রলাল বসুর স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসে রোম্যান্টিক অনুভূতির বর্ণাঢ্য স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জীবনচিত্রণের একনিষ্ঠতা যাযাবরের ভ্রমণ-ঔৎসুক্যের দ্বারা কতকটা অভিভূত হইয়াছে। প্রাচ্য আদর্শে লালিত বঙ্গযুবকের মনে পাশ্চাত্ত্য জীবনের ছন্দ কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে তাহারই আলোচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় মননই মুখ্য; তাঁহার জীবননিরীক্ষা তত্ত্বাভিভূত হইয়াও প্রাণশক্তিসমুজ্জ্বল। অন্নদাশংকর রায় সম্বন্ধেও অনেকটা সেই মন্তব্যই প্রযোজ্য। সুবৃহৎ 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২) উপন্যাসে তিনি তাঁহার জীবনবোধকে একটি মহাকাব্যোচিত পটভূমিকায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। 'বনফুলে'র (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) বিষয়বৈচিত্র্য আশ্চর্যজনক। পরিকল্পনার মৌলিকতায়, জীবন-আস্বাদনের নূতন নূতন পদ্ধতিতে, মানসভঙ্গীর নানা বিচিত্র প্রকাশে তাঁহার সমকক্ষ দুর্লভ। কিন্তু অতিরিক্ত বিস্তৃতির ফলে যে গভীরতার অভাব ঘটে তাহাই তাঁহার রচনায় উৎকর্ষের কিছুটা হানি করিয়াছে মনে হয়। নূতন পরীক্ষার চঞ্চল কৌতূহল, নূতন বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ তাঁহার জীবনবীক্ষণের স্থির, অন্তর্ভেদী একাগ্রতাকে কতকটা বিচলিত করিয়াছে। রাজনৈতিক উপন্যাসে একটি অনন্য স্থান অধিকার করিয়াছেন গোপাল হালদার। সমস্যাপ্রধান উপন্যাসের একজন মুখ্য স্রষ্টা সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সতীনাথ ভাদুড়ী বিহারের জীবনযাত্রার অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বাংলা উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ-আশ্রিত রচনা এবং ডিটেকটিভ উপন্যাসে নূতনত্ব আনিয়াছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সমকালীন অপর কয়েকজন বিখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক যুগে উপন্যাসের আঙ্গিক ও মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ নূতন পথের সন্ধান দিতেছেন। বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ও বৃত্তিগত জীবন-পরিচয়, ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের জীবনযাত্রা এবং প্রাচীনতম ইতিহাস প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতে উপন্যাসের পটভূমির যে আশ্চর্য প্রসার ঘটিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের ন্যায় বাংলা উপন্যাসেও ব্যাপ্তির সহিত গভীরতার সমতা রক্ষা হইতেছে না। মানবজীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখার অভ্যাসের ফলে উহার বৃহত্তর মর্যাদা ও ঘটনানিরপেক্ষ মহিমা যেন অন্তরালে পড়িয়া যাইতেছে। যে গল্প-কাহিনী হইতে উপন্যাসের উদ্ভব, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সেই আদিম উৎসেই ফিরিয়া যাইবার প্রবণতা দেখাইতেছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় স্বাভাবিক, কিন্তু এ সংশয়ের নিরসন খুব সহজ নহে।

দ্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপপুরাণ পুরাণসাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত— মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণ-গ্রন্থ উপপুরাণ নামে পরিচিত। উপপুরাণকে সাধারণতঃ মহাপুরাণের পরবর্তী ও পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণের মত কোনও কোনও উপপুরাণ মহাপুরাণের তুল্য অথবা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বা প্রতিস্পর্ধী। অনেক উপপুরাণ অর্বাচীন হইলেও কোনও কোনও উপপুরাণ (যথা শাম্ব, বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি) বেশ প্রাচীন। উপপুরাণের বিষয়বস্তু অনেকাংশে

মহাপুরাণেরই মত। উপপুরাণের সংখ্যাও মহাপুরাণের মত অষ্টাদশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কূর্মপুরাণের তালিকা (১।১। ১৭-২০) অনুসারে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম এইরূপ: আদ্য, নারসিংহ, স্কান্দ (কুমারপ্রোক্ত), শিবধর্ম, দুর্বাসসোক্ত, নারদীয়, কাপিল, বামন, উশনসেরিত, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশরোক্ত, মারীচ, ভার্গব। বিভিন্ন গ্রন্থে অষ্টাদশ উপপুরাণের যে বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায় সেগুলি মিলাইয়া দেখিলে উপপুরাণের মোট সংখ্যা অষ্টাদশের অনেক বেশি হয়। তাহা ছাড়া, তালিকা-বহির্ভূত উপলভ্যমান মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপপুরাণের সংখ্যাও কম নয়। কিছু কিছু উপপুরাণের নামমাত্র বা অংশবিশেষের উদ্ধৃতি নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ পুরাণের মত— বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে— উপপুরাণের মধ্যেও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

দ্র R. C. Hazra, *Studies in the Upapuranas*, vol. I, Calcutta, 1958.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উপভাষা বড় কোনও ভাষার আঞ্চলিক (ক্বচিৎ বিশেষ সমাজ বা সম্প্রদায়-গত) রূপান্তর। কোনও ভাষার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইলে সেই ভাষা নিজের সীমানার সর্বত্র সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে থাকে না। বিভিন্ন অঞ্চলে সে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। সেই পরিবর্তিত আঞ্চলিক ভাষা হইল বৃহৎ পরিধির ভাষার উপভাষা। কোনও ভাষার লোকসংখ্যা খুব বেশি না হইলে এবং সে ভাষার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ না হইলে উপভাষার উদ্ভব হয় না। বাংলা ভাষার সীমানা অল্প নয়, একদা আরও অনেক বড় ছিল। তাই বাংলা ভাষার অনেকগুলি উপভাষা (অথবা উপভাষাগুচ্ছ)— দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গীয়, মধ্য-পশ্চিমবঙ্গীয়, মধ্যবঙ্গীয়, উত্তরবঙ্গীয়, উত্তর-পূর্ববঙ্গীয়, পূর্ববঙ্গীয় ইত্যাদি।

উপভাষার তুলনায় ভাষা কিছু কৃত্রিম। অর্থাৎ বিশুদ্ধ কথ্যভাষা কোনও উপভাষার অন্তর্গত হইবেই (যদি সে ভাষায় উপভাষা থাকে)। তবে ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা কথ্যভাষা রূপেও ব্যবহার করে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার মূলেও কোনও উপভাষা আছে অথবা ছিল। যেমন বাংলা সাধুভাষার মূলে ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের উপভাষা, বাংলা চলিত ভাষার মূলে আছে কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষা।

ভাষা ভাঙিয়া উপভাষার সৃষ্টি হয়। কোনও ভাষা-গোষ্ঠী হইতে কিছু জনসমষ্টি যদি অন্যত্র চলিয়া যায় এবং মূল ভাষাগোষ্ঠীর সহিত দীর্ঘকাল কোনও বাগ্‌ব্যবহার না থাকে, তবে তাহা নিজস্ব পথে পরিণতি লাভ করিয়া নূতন ভাষায় পরিণত হয়। এইভাবে এক মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা হইতে একদা গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার কোনও একটি উপভাষা নানা কারণে— বিশেষ করিয়া সাহিত্যব্যবহারে— অনুশীলিত হইয়া ভাষার মর্যাদা পায়। তখন সহযোগী উপভাষাগুলি তাহার আওতায় পড়িয়া যায়।

উপভাষা ভাঙিয়াও নূতন উপভাষা হয় এবং সুযোগ পাইলে নূতন উপভাষা ভাষায় উন্নীত হইতে পারে। এইভাবে একদা উত্তর-পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা হইতে কামরূপীয় উপভাষার সৃষ্টি এবং তাহার অসমীয়া ভাষায় উন্নয়ন হইয়াছে।

সুকুমার সেন

উপমন্যু আয়োদধৌম্যের শিষ্য। ধৌম্য তাঁহাকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোচারণ-প্রত্যাগত শিষ্যকে স্থূলকায় দেখিয়া গুরু তাঁহার খাদ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং জানিতে পারেন ভিক্ষান্নের দ্বারা উপমন্যুর উদরপূর্তি হয়। ভিক্ষান্ন গুরুকে প্রদেয়, এই কথা বলায় উপমন্যু প্রথম বারের ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে প্রদান করিয়া পুনরায় ভিক্ষা করিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ভিক্ষাচরণ গৃহস্থের পীড়াদায়ক। তাই উহা নিষিদ্ধ হয়। তখন উপমন্যু গোদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করেন। তাহাতে গোবৎসগণ বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাও নিষিদ্ধ হইল। তখন উপমন্যু বৎসমুখনিঃসৃত ফেন ভক্ষণ করিতে থাকেন। বৎসগণ কষ্টস্বীকার করিয়া অধিক ফেন নিঃসারিত করে বলিয়া ফেনাহারও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। অনন্যোপায় ক্ষুধার্ত উপমন্যু তখন আকন্দপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হন এবং কূপে পতিত হন। উপমন্যুকে অনুপস্থিত দেখিয়া সশিষ্য গুরু তাঁহাকে খুঁজিতে যান। গুরুর আহ্বানে কূপ হইতেই উপমন্যু নিজ দুরবস্থার কথা জানাইয়া দেন। তখন গুরুর নির্দেশে তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করেন। উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা আরোগ্য-লাভের জন্য তাঁহাকে একটি পিষ্টক প্রদান করিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলেন। উপমন্যুর অসাধারণ গুরুভক্তির জন্য অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাকে বর দেন। গুরুভক্তিপ্রীত ধৌম্যের আশীর্বাদে সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত হয়।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উপসেন বঙ্গন্তপুত্ত বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাদের পিতা বঙ্গন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। ত্রিবেদ অধ্যয়ন করার পর উপসেন বুদ্ধের নিকট ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া 'প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা' লাভ করেন, অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্মে বীতরাগ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষু হইবার যোগ্যতা ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কারসমূহও অর্জন করেন। তিনি ধুতংগ অর্থাৎ তেরটি বিশেষ সদাচার অভ্যাস করেন এবং অপরকেও ঐগুলি অভ্যাস করিতে প্রবুদ্ধ করেন। তাঁহার বাচনপ্রভাবে বহু লোক সংঘে যোগদান করিয়াছিল। দৃঢ়তার সহিত তিনি 'বিনয়' মানিয়া চলিতেন। সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

উপালি বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। বুদ্ধের বিশিষ্ট শিষ্য। কপিলবস্তুতে নাপিতের গৃহে জন্মলাভ করিয়া উপালি শাক্যদের সেবায় দিন যাপন করিতেন। অনুরুদ্ধ প্রমুখ শাক্যের সহিত উপালিও বুদ্ধসমীপে গমন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'উপসম্পদা' বা দীক্ষা দান করেন। বুদ্ধদেবের নিকটে সমগ্র 'বিনয়-পিটক' শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিনয়ধরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধদেবের নিকট উপালি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেব তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, 'পরিবার'-গ্রন্থের 'উপালি-পঞ্চক' অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কিয়দংশ উপালি সম্পর্কে পরবর্তী কালে আরোপিত মাত্র। বিনয় বিষয়ে ভিক্ষুগণ তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। বিনয়ের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তিনি বিনয় সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই উপালির নিকট বিনয়ের শিক্ষা গ্রহণকে ভিক্ষুগণ পরম শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিত। থেরগাথায় উপালির আত্মোৎকর্ষের বিবরণ আছে।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫ খ্রী) প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে জন্ম। পূর্বনাম ছিল কামদারঞ্জন। পিতা কালীনাথ রায়ের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। কালীনাথ লোকসমাজে মুনশি শ্যামসুন্দর নামে পরিচিত ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে খুল্লতাত হরিকিশোর রায়চৌধুরীর দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হইলে কামদারঞ্জনের নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (১৮৮০ খ্রী) উপেন্দ্রকিশোর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র হন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান হইতে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং প্রখ্যাত সমাজসেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন।

উক্ত সময়পর্বটি ছিল বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রায় প্রারম্ভযুগ। 'সখা' (১৮৮৩ খ্রী), 'বালক' (১৮৮৫ খ্রী), 'সাথী' (১৮৯৩ খ্রী), 'সখা ও সাথী' (১৮৯৪ খ্রী), 'মুকুল' (১৮৯৫ খ্রী) প্রভৃতি মাসিক পত্রের প্রকাশে শিশুসাহিত্যের যে নবীন সম্ভাবনা দেখা দিল, উপেন্দ্রকিশোর প্রথম হইতেই তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় 'সখা' পত্রিকাতে তিনি প্রথম রচনা প্রকাশ করেন। অনেক পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি স্বয়ং যে পত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকেন, সেই 'সন্দেশ' পত্রিকা বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ববিধ সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্পে, কৌতুকে ভরপুর রস-কাহিনীতে, কল্পনা-উদ্রেককারী চিত্ররাজিতে উপেন্দ্র-কিশোরের 'সন্দেশ' তরুণ চিত্তের যোগ্য এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল।

শিশু ও কিশোরের মনোমত সহজ ভাষায় লেখার রীতিটি উপেন্দ্রকিশোর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যেটি বলিলে এবং যেমনভাবে বলিলে শিশুদের নিকট সহজ হইবে, তিনি তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতেন। এক দিকে শিশুর মনভুলানো উপকথা ও ছড়া, কিশোরের মনোরঞ্জক কাহিনী এবং অন্য দিকে কোটি বৎসর পূর্বেকার জীবজগৎ ও কোটি কোটি যোজন দূরের নভোমণ্ডলের কথা— এ দুই-ই তাঁহার রচনাবলীকে পূর্ণ করিয়াছে। 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৬ খ্রী), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৮৯৭ খ্রী), 'মহাভারতের গল্প' গ্রন্থগুলিতে অনায়াস সুষমাময় গদ্যে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিয়াছেন, 'ছোট্ট রামায়ণ'-এ আছে রামায়ণের পদ্য-কাহিনী, 'টুনটুনির বই' (১৯১০ খ্রী) পূর্ব বঙ্গের নানা ছেলেভুলানো কথিকার পুনর্বিন্যাস, 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন'-এ (১৯৬৩ খ্রী) বোকা জোলা, ঘ্যাঁঘাসুর, কামার, ভূত, রাজা আর রাজপুত্রের বিচিত্র মিছিল। অপর দিকে 'সেকালের কথা' (১৯০৩ খ্রী), প্রমুখ গ্রন্থে সীমাহীন জ্ঞানরাজ্যের আভাস বিধৃত হইয়া আছে। এইভাবে

বাংলা শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর প্রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে উপেন্দ্রকিশোর সংগীত ও চিত্র-বিদ্যারও নিতান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের প্রিয় শিষ্য। পাখোয়াজ হার্মোনিয়াম সেতার বাঁশি বেহালায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন, তবে বেহালাই ছিল তাঁহার বিশেষ প্রিয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবসমূহে সংগীতের সহিত তাঁহার বেহালা-সংগত ছিল একটি বড় আকর্ষণ। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কখনও কখনও সংগীতরচনা ও সংগীতে সুরযোজনাতেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত 'জাগো পুরবাসী' এখনও মাঘোৎসবের অবশ্যগেয় গান। 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়' নামক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বালক-বালিকাদের জন্য একটি গানের ক্লাস সংগঠন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সংগীতশিক্ষা পরিচালনা করিতেন তিনি নিজেই। সাধনা ও প্রবাসী পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে সংগীতবিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'বেহালা শিক্ষা' (১৯০৪ খ্রী), 'হারমোনিয়াম শিক্ষা' (১৯০৫ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ সংগীতবিষয়ে তাঁহার উৎসাহের প্রমাণ। ডোয়ার্কিন কোম্পানি পরিচালিত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকার সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন।

অল্প বয়সের চিত্রাঙ্কননৈপুণ্যও উপেন্দ্রকিশোরের পরিণত জীবনে পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠে। তাঁহার নিজস্ব রচনা-বলীতে ছবি আঁকিতেন তিনি নিজেই। 'হিন্দুস্থানী উপকথা'য় (শান্তা দেবী ও সীতা দেবী -সংকলিত) অঙ্কিত তাহার ছবিগুলি এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে স্মরণীয়। রবীন্দ্র-নাথের 'নদী' নামক দীর্ঘ কবিতাটির বর্ণনাসামঞ্জস্যেও উপেন্দ্রকিশোরের সাতটি ছবি পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্কনে সচরাচর তিনি পাশ্চাত্ত্য প্রথায় তেলরঙ ও কালিকলম ব্যবহার করিতেন। জলরঙের ছবিতেও তিনি কুশলী শিল্পী ছিলেন। তাঁহার দৃশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিত অথবা মানুষ ও জীবজন্তুর শারীরসংস্থান ও শারীরিক অনুপাত হইত বিদেশী রীতি অনুযায়ী। 'বলরামের দেহত্যাগ' তাঁহার খ্যাত চিত্রাবলীর অন্যতম। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের এই চিত্রাঙ্কনরীতি সমকালীন সমর্থন লাভ করে নাই, কেননা তখন অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাধনায় চিত্রকলাতে প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন ঘটিতেছিল।

ছোটদের জন্য রচিত গ্রন্থাবলীতে চিত্রমুদ্রণের দুর্ব্যবস্থায় পীড়িত হইয়া উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন বিষয়ক গবেষণাতে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন (১৮৯৫ খ্রী)। বিদেশেও তখন হাফটোন ব্লকের প্রারম্ভিক পর্যায় এবং প্রাচ্যে তখন ইহার কোনও চর্চা ছিল না। গণিতে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে উপেন্দ্রকিশোর তখন এদেশে বসিয়াই এ বিষয়ে অনেক নূতন পথ প্রস্তুত করেন। নানা প্রকারের ডায়াফ্রাম সৃষ্টি, রে-স্ক্রীন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র তৈয়ারি, ব্লক নির্মাণের ডুয়োটাইপ ও রে-টিন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবন তাঁহার কৃতিত্বে সম্ভবপর হইয়াছে। বিদেশে তাঁহার এই প্রণালীসমূহ উচ্চপ্রশংসিত হয়। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'পেনরোজেজ পিক্‌টোরিয়াল অ্যানুয়াল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে তাঁহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল (৫ম, ৯ম, ১১শ এবং ১৭শ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। উহার তৎকালীন সম্পাদক উইলিয়াম গ্যাম্ব্‌ল প্রসেস কর্মপন্থা ও প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত গবেষণাকারীদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে 'প্রসেস ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইলেকট্রোটাইপিং', 'দি ইন্‌ল্যাণ্ড প্রিন্টার', 'লে প্রসিদ' প্রভৃতি মুদ্রণ-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ বিদেশী পত্রিকাবলীতে তাঁহার কার্যাবলীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যাইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ইউ. রায় অ্যাণ্ড সন্স' কোম্পানি হইতেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প বিকাশের সূত্রপাত হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে এইভাবে নানাবিষয়ক যোগ্যতার সম্মেলন ঘটিয়াছিল। তবে সমস্ত সত্ত্বেও ভাবী-কালের নিকট প্রধানতঃ তিনি নির্মল আনন্দরসিক শিশু-সাহিত্যিক রূপেই পরিচিত থাকিবেন। এই শিশুসাহিত্য পরে প্রায় তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছে। কন্যা সুখলতা রাও ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী এবং পুত্র সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়— ইহারা প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর গিরিডিতে উপেন্দ্র-কিশোরের মৃত্যু হয়।

দ্র 'উপেন্দ্রকিশোর রায়', প্রবাসী, মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দ; বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, ১৯৫৪; পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ছেলেবেলার দিনগুলি, কলিকাতা, ১৯৫৮; অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, কলিকাতা, ১৯৬০; আশা দেবী, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, কলিকাতা, ১৯৬১; লীলা মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, কলিকাতা, ১৯৬৩; কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'উপেন্দ্রকিশোর', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০ খ্রী) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর (২৬ আশ্বিন ১২৮৮

বঙ্গাব্দ) ভাগলপুরে উপেন্দ্রনাথের জন্ম। বি. এল. পাশ করিয়া তিনি ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মীয়। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ভাগলপুরে যে লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে, উপেন্দ্রনাথ তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরে তিনি 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন (আষাঢ় ১৩৩৪ হইতে আশ্বিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)। অতঃপর প্রায় ৮ বৎসর (ফাল্গুন ১৩৫৮ হইতে পৌষ ১৩৬৬) উপেন্দ্রনাথ 'গল্পভারতী' পত্রিকারও সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। বার বৎসর বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ; তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'সপ্তক' (১৯১২ খ্রী) নামক গল্প-সংগ্রহ। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৫ খ্রী), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিং দাস পুরস্কার' (১৯৫৮ খ্রী) এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা পুরস্কার' (১৯৬০ খ্রী) লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'লীলা বক্তৃতা' দিতে আহ্বান করা হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শশিনাথ (১৯১২ খ্রী), রাজপথ (১৯২৫ খ্রী), অন্তরাগ (১৯৩২ খ্রী), অভিজ্ঞান (১৯৩৬ খ্রী), স্মৃতিকথা— ৪ খণ্ড (১৯৫১-৫২ খ্রী), বিগত দিন (১৯৫৭ খ্রী), শেষ বৈঠক (১৯৫৮ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি (১৬ মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। সংস্কৃত কলেজ হইতে উপেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে সংবাদপত্র পরিচালনা, রাজনীতিচর্চা, নাট্য-আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর পরিচালক নিযুক্ত হন। 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪ খ্রী) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫ খ্রী) নামক তৎপ্রণীত নাটক দুইটি সেখানে মঞ্চস্থ হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স কলিকাতায় আসিলে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গৃহের মহিলাদের দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করান। এই ঘটনায় কলিকাতায় কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। উপেন্দ্রনাথ-পরিচালিত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় (১৮৭৬ খ্রী) এই উত্তেজনাকে রূপ দিয়াছিল। পুলিশ উক্ত প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলে উহা 'হনুমান চরিত্র' নামে পরিবর্তিত রূপে অভিনীত হয়। অভিনয়-রজনীতে উপেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়া বঙ্গীয় নাট্যশালার স্বাধীনতারক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। পুলিশ পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তখন পুলিশকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি 'পোলিস অফ পিগ অ্যাণ্ড শীপ' নামক প্রহসন এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অশ্লীলতার দায়ে তাঁহাকে সদলে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুকে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু পরে হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারা মুক্তি পান। এই-সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'ড্রামাটিক পার্ফর্মেন্সেস কন্ট্রোল বিল' উত্থাপন করিয়া সরকার নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের এক আইন প্রণয়ন করেন।

উপেন্দ্রনাথের শেষ নাটক 'দাদা ও আমি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি 'ব্রাদার জিল অ্যাণ্ড আই' নামক একটি ইংরেজী প্রহসন অবলম্বনে ইংল্যাণ্ড-প্রবাস-কালে রচিত।

দ্র 'বঙ্কুকৃত্য', পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

সনৎকুমার গুপ্ত

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রী) অগ্নি-যুগের রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুন চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় উপেন্দ্রনাথের জন্ম। ডাফ কলেজে অধ্যয়নকালে হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী জীবনের রাজনৈতিক সাধনায় এই বন্ধুত্রয়ের সাহচর্য ও সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে তিনি 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের সহিত যুক্ত হন (১৯০৬ খ্রী)। ক্রমে 'যুগান্তর' সম্পাদনার দায়িত্ব বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার উপরেও আসিয়া পড়ে। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ঐ সংবাদপত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছিলাম।' বারীন্দ্রনাথ-উল্লাসকর-উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বে বিপ্লবী দল পূর্ণোদ্যমে কর্ম-তৎপর হইয়া ওঠে। এই সময়েই (৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রী) প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজফ্‌ফরপুরের জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তাহার দুই দিন পরেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে বারীন্দ্রনাথের

মানিকতলার বাগানবাড়ি (৩২ মুরারিপুকুর রোড) হইতে পুলিশ উপেন্দ্রনাথকে আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, দেবব্রত বসু, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি। চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ প্রসিদ্ধ মামলায় আসামি পক্ষের ব্যারিস্টার ছিলেন। বিচারে উপেন্দ্রনাথের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয় (৬ মে ১৯০৯ খ্রী)। প্রায় বার বৎসর আন্দামানে নির্বাসিত থাকার পর উপেন্দ্রনাথ (১৯২০ খ্রী) মুক্তিলাভ করেন। ফেব্রারি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের চেষ্টা ও বারীন্দ্রনাথের 'বিজলী'তে (নভেম্বর ১৯২০ খ্রী) রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনা ছিল কারামুক্তির পর তাঁহার প্রধান রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ। এইসময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখিতেন। অজ্ঞাতবাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ করার পর, তাঁহার ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক সাপ্তাহিকী 'আত্মশক্তি' প্রকাশিত হইলে (মার্চ ১৯২২ খ্রী), উপেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক-পদে বৃত হন। ইতি-পূর্বেই তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই সময়ে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী 'আত্মশক্তি লাইব্রেরি' হইতে অমরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত হইতে থাকে। কাউন্সিল-প্রবেশ উপলক্ষে তদানীন্তন কংগ্রেস রাজ-নীতিতে প্রো-চেন্‌জার (পরিবর্তনকামী) ও নো-চেন্‌জার (পরিবর্তনবিরোধী) -দের যে দ্বন্দ্ব বাধে, উপেন্দ্রনাথ তাহাতে প্রথমোক্ত পক্ষ অবলম্বন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহাদের সমর্থকদের সহিত তখন উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবপন্থীর রাজনৈতিক মিতালি স্থাপিত হইয়াছিল। বহুবাজারের যে চেরী প্রেস হইতে তখন 'আত্মশক্তি' বাহির হইত, সেখান হইতেই স্বরাজ্য দলের বাংলা মুখপত্র দৈনিক 'স্বদেশ' প্রকাশিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রী)। 'স্বদেশ' প্রতিষ্ঠার কাজে উপেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর, ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশনে তাঁহাকে আটক করেন। এবার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজবন্দী ছিলেন। মুক্তিলাভের পর প্রধানতঃ সাংবাদিকতার কাজেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই পর্বে 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি ইংরেজী সাময়িক পত্রের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে মৃত্যুকাল (৪ এপ্রিল ১৯৫০ খ্রী) পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদনা করেন।

শেষ জীবনে হিন্দুমহাসভার মতাদর্শ তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুদক্ষ সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথের কিছু রচনার স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য আছে। উদাহরণস্বরূপ 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯২১ খ্রী) ও 'উনপঞ্চাশী' (১৯২২ খ্রী) গ্রন্থ-দ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধুরীতির গদ্যে তিনি অনায়াসে এমন উজ্জ্বল উপভোগ্য হাস্যরস, সচ্ছন্দগতি ও সরস কথ্য বাগ্‌ভঙ্গী সঞ্চার করিতে পারিতেন যাহা এক-মাত্র নিপুণ শিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'আমাদের উপেনদা', মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৬ ; অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের উপেন', মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৬ কার্তিক ১৩৫৭ ; যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; *Sedition Committee 1918 : Report*, Calcutta, 1918

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬ খ্রী) উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি কলেজ হইতে গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর একই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. বি. পাশ করেন। এই পরীক্ষাতে মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উপেন্দ্রনাথ গুডিভ ও ম্যাকলাউড পদক লাভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. ডি. এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শারীরতত্ত্বে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া কোট্‌স পদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মিণ্টো পদকও তিনি পান।

উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ও পরে (১৯০৫-২৩ খ্রী) কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক হন। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টীবামাইন' আবিষ্কার করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভার এবং সাধারণভাবে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত গবেষণা করেন ও তদানীন্তন ভারত সরকার

কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন (১৯৩৪ খ্রী)। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 'রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন' -এর তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমিয়কুমার মজুমদার

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থপ্রকাশক। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা উপেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কীর্তি। গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি বাংলার ঘরে ঘরে যেভাবে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সম্ভার পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' (২৫ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রী) এবং 'দৈনিক বসুমতী'র (৬ আগস্ট ১৯১৪ খ্রী) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার সহিতও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'সাঙ্খ্যদর্শন', 'মানসোল্লাস' প্রমুখ বহু শাস্ত্র ও ধর্ম -গ্রন্থের সম্পাদনা তাঁহার সাহিত্য-সেবার পরিচায়ক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নির্বাণীতোষ ঘটক

উপোসথ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান (বৈদিক : উপবসথ)। ইহা বুদ্ধের নিজস্ব সৃষ্টি নহে ; বৈদিক জৈন, এবং অন্যান্য প্রাক্-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকারের অনুষ্ঠান বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাক্-বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি প্রতি কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষের অষ্টম, চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ দিনে এই অনুষ্ঠান পালন করিত। ঐ দিন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অথবা পরিব্রাজকগণ একসঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্মালোচনা করিত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষের অষ্টম, চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ দিবসে মিলিত হইয়া 'পাতিমোক্খ' (বৌদ্ধ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত -প্রকরণ) আবৃত্তি করিত, অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে কোনও দোষ করিলে ঐ সভায় তাহা স্বীকার করিয়া পাপমুক্ত হইত। এই দিক দিয়া উপোসথকে একটি শুদ্ধি-অনুষ্ঠানও বলা যায়।

একই 'আবাসে'র ভিক্ষুদিগকে একটি অনুষ্ঠানেই সমবেত হইতে হইত এবং অনুষ্ঠানে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। উপোসথ-অনুষ্ঠানকেন্দ্র হইতে তিন যোজন (প্রায় ২৪ কিলোমিটার) পর্যন্ত একটি 'আবাসে'র পরিধি বিস্তৃত ছিল। এই সীমার মধ্যে একটিমাত্র উপোসথ-অনুষ্ঠানই সম্ভব। যে বিহারে 'থের' (প্রধান) বাস করিতেন উপোসথ-অনুষ্ঠান সেই বিহারেই হইত। কথিত আছে যে রাজা বিম্বিসারের পরামর্শেই বুদ্ধদেব এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন।

দ্র বিনয়পিটক, মহাবগ্গ ; G. De, *Democracy in Early Buddhist Sangha*, Calcutta, 1955.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপ্পলবণ্ণা বৌদ্ধ মহাশ্রাবিকা। বুদ্ধের প্রধান দুই মহিলা শিষ্যের অন্যতম। সাংসারিক জীবনে ইনি ছিলেন শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীকন্যা। তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল নীলপদ্মগর্ভের বর্ণের ন্যায়, এইজন্য তাঁহাকে উপ্পলবণ্ণা বলা হইত। বহু রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁহার পাণিপ্রার্থী ছিলেন ; কিন্তু তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুনীসংঘে যোগ দেন এবং একদিন একটি দীপ জ্বালাইয়া তাহার শিখা সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে অর্হত্ব লাভ করেন। 'ইদ্ধি' (অনৈসর্গিক শক্তি) -সম্পন্ন ভিক্ষুনীদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠা ছিলেন। 'মার' তাঁহার নিকট পরাজিত হয় কিন্তু তাঁহার মাতুলপুত্রের দ্বারা তিনি উৎপীড়িতা হন। উপ্পলবণ্ণা উৎপীড়িতা হইবার পরই বুদ্ধের আদেশে ভিক্ষুনীদের বনে বাস নিষিদ্ধ হয়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উভচর একশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। জল হইতে ডাঙায় আসিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস হিসাবে ইহাদের আবির্ভাব। জল ও ডাঙার দুইপ্রকার পরিবেশে বাস করিতে ইহারা অভ্যস্ত ; জীবনচক্রের প্রথম ভাগ জলে ও অবশিষ্ট ডাঙায় কাটে। ইহাদের দেহে আঁশ, পালক অথবা লোম -জাতীয় কোনও আবরণ নাই ; ত্বক সাধারণতঃ মসৃণ ; লার্ভা অবস্থায় ফুলকা শ্বাসকার্য চালায়, পরে ফুলকার পরিবর্তে ফুসফুস তৈয়ারি হয় ; ডিমে কোনও শক্ত আবরণী থাকে না। উভচরদের প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতি আছে। জীবিত উভচরদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ১. আপোডা— যেমন ইক্‌থিওপসিস ; ২. কডাটা— যেমন স্যালাম্যানডার ; ৩. স্যালিয়েনটিয়া— যেমন সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ।

কুমির, ভোঁদড়, উদবিড়াল, কইমাছ, পেঙ্গুইন প্রভৃতি

প্রাণী জল ও ডাঙা উভয় স্থলে থাকিতে পারিলেও, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাঙ, স্যালাম্যানডার প্রভৃতিকেই উভচর বলা হইয়া থাকে।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

উভয়বেদান্ত বেদের উত্তরভাগরূপ বেদান্তে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্পর্কে বহুমুখী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত। প্রাচীন ঋষিগণের সাক্ষাৎ-উপলব্ধ উক্ত তিন বিষয়ের বিবিধ তত্ত্ব বেদান্তের বিভিন্নাংশে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে 'আড়্‌বার' নামে পরিচিত মহাপ্রেমী যে ভগবদ্‌ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, গভীর অন্তর্মুখী অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে উপরি-উক্ত তত্ত্বত্রয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পাইত। এই তত্ত্বাবলী তাঁহাদের 'দিব্যপ্রবন্ধে' প্রাচীন তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আড়্‌বারগণের এই দিব্যপ্রবন্ধাবলী একত্রে দ্রাবিড়বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। তামিল ভাষায় দিব্য প্রবন্ধের নাম হইতেছে 'নাল্‌-আয়ির-প্রবন্ধম্‌' অর্থাৎ চারি সহস্র প্রবন্ধ বা পদ। প্রাচীন ঋষিগণের বেদান্ত এবং আড়্‌বারদের দ্রাবিড়বেদান্ত, এই বেদান্তদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুসমূহের সামঞ্জস্য এবং একত্ব স্থাপন করিয়া রামানুজ একত্রে ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন 'উভয়বেদান্ত'। তদবধি নামটি বহুপ্রচলিত। 'আড়্‌বার' দ্র।

যতীন্দ্র রামানুজদাস

উভয়ভারতী প্রখ্যাত বিদুষী। মাহিষ্মতী নগরীর মীমাংসা দার্শনিক মণ্ডনমিশ্রের পত্নী। উভয়ভারতীর পিত্রালয় ছিল বর্তমান শোণ নদীর তীরদেশে। বিভিন্ন কিংবদন্তীতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থে শংকরাচার্য বিচারদিগ্বিজয়ে বাহির হইলে তদানীন্তন মীমাংসকশ্রেষ্ঠ কুমারিলভট্টের নির্দেশে তিনি কুমারিলশিষ্য মণ্ডনমিশ্রের সহিত দার্শনিক বিচার আরম্ভ করেন। সর্বশাস্ত্রনিপুণ উভয়ভারতী এই দুই মহাপণ্ডিতের বিচারকালে মধ্যস্থা রূপে গৃহীত হন। বিতর্কের শর্ত ছিল এই যে, বিজিতকে বিজেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘকালব্যাপী বিচারের শেষে শংকরাচার্য জয়ী হন। কিন্তু পরাজিত মণ্ডনমিশ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বেই উভয়ভারতী স্বয়ং শংকরকে তর্কে আহ্বান করেন। বেদ ব্যাকরণ দর্শন নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকদিনব্যাপী বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া উভয়ভারতী কামশাস্ত্রবিষয়ক বিচারের সূত্রপাত করেন। আজীবন ব্রহ্মচারী শংকরাচার্য কামশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি এক বৎসর সময় চাহিয়া লন এবং বৎসরান্তে কামশাস্ত্রেও উভয়ভারতীকে পরাজিত করেন। অতঃপর মণ্ডনমিশ্র ও উভয়ভারতী উভয়েই শংকরাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দ্র রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ, কলিকাতা, ১৯২৬; আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্তদর্শন : অদ্বৈতবাদ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪২।

সংযুক্তা গুপ্ত

উভলিঙ্গ কয়েকটি ব্যতিক্রম থাকিলেও, বহুকোষপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি হয় শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে। শুক্রকীট ও ডিম্বাণু যথাক্রমে পুংজননযন্ত্রের শুক্রাশয়ে ও স্ত্রীজননযন্ত্রের ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দেহে পুং ও স্ত্রী -জননযন্ত্র একই সঙ্গে থাকে। এই সমস্ত প্রাণী যেমন কেঁচো, জোঁক প্রভৃতিকে উভলিঙ্গ বলা হয়। এক দেহে থাকিলেও শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনের জন্য একই প্রজাতির দুইটি প্রাণীর প্রয়োজন হয়। কেঁচো এবং জোঁকের প্রজনন এইভাবেই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্য নাই। একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকিলে তাহাকে উভলিঙ্গ ফুল বলা হয়। তবে সাধারণতঃ সংজ্ঞাটি প্রাণীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

উমা[১] উমার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কেনোপনিষদে। উল্লেখটি এইরূপ : দেবাসুরের সংগ্রামে ব্রহ্মের শক্তিতেই দেবতারা জয়ী হন, কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে নিজ শক্তিবলেই জয়লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের এই মিথ্যা অভিমান জানিয়া ব্রহ্ম দেবতাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া অভিভূত দেবকুল অগ্নিকে বলিলেন, 'এই পূজ্যস্বরূপকে জানিয়া আসুন।' অগ্নি সেখানে গেলে সেই পূজ্যস্বরূপ তাঁহার শক্তি পরীক্ষার্থে বলিলেন, 'এই তৃণখণ্ড দগ্ধ কর।' অগ্নি অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে বায়ু সেই পূজ্যস্বরূপকে জানিতে গেলেন। পূজ্যস্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন, 'এই তৃণখণ্ড গ্রহণ কর।' বায়ু অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, 'মঘবন্‌, আপনি এই পূজ্যস্বরূপকে জানিয়া আসুন।' ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তৎসমীপে গেলে পূজ্যস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরিবর্তে ইন্দ্র আকাশে অতি সুশোভনা সুবর্ণালংকারে ভূষিতা স্ত্রীরূপা

উমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তিরোহিত এই পূজ্যস্বরূপ কে?' উমা বলিলেন, 'ব্রহ্ম।' এই উমাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্রের ভক্তি দেখিয়া তিনি উমারূপে দর্শন দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উমা[২] দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী শিবের পত্নী ছিলেন। দক্ষ বিশ্বস্রষ্টাদের এক যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা এবং শিব ছাড়া সকল দেবতাই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্ধনা করেন। ইহাতে শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ তাঁহাকে অভিশাপ দেন। অতঃপর দক্ষ 'বৃহস্পতিসব' নামে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন, শিব এবং সতী তাহাতে নিমন্ত্রিত হন নাই। শিবের নিষেধ সত্ত্বেও সতী পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দক্ষ তখন শিবের নানা প্রকার নিন্দা করিয়া বলেন যে শিব অমঙ্গলের প্রতীক বলিয়াই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। মর্মন্তুদ পতিনিন্দা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সতী দক্ষগৃহেই দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য শুরু করিলে বিশ্বনাশের আশঙ্কায় বিষ্ণু চক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেন।

বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনকার গর্ভে হিমালয়ের ঔরসে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে তাঁহার জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে, কালিকাপুরাণের মতে বসন্ত ঋতুর নবমী তিথিতে। কালিকাপুরাণের মতে এই কন্যার নাম রাখা হয় পার্বতী।

বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হইলে মহাদেব হিমালয় পর্বতে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। নারদ হিমালয়কে বলিয়াছিলেন পার্বতী শিবপত্নী হইবেন। হিমালয়ের একান্ত অনুরোধে মহাদেব পার্বতীকে তাঁহার আরাধনা করিতে অনুজ্ঞা দিলেন।

ইতিমধ্যে তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবতাগণ ব্রহ্মার কাছে গিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন: শিবতেজোৎপন্ন পুত্রই তাহাকে বধ করিতে পারিবে। তখন পার্বতীর প্রতি শিবকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্র মদনকে প্রেরণ করিলেন। মদন ব্যর্থকাম হইলেন, নিজেও ভস্মীভূত হইলেন।

শোকে ও লজ্জায় অভিভূতা পার্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিতে উদ্যত হইলে মেনকা তাঁহাকে নিষেধ করেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় উমা (উ=হে, মা=না)। কিন্তু নিবৃত্ত না হইয়া পার্বতী কঠোর এবং উগ্র তপস্যা করিতে থাকেন। এই তপস্যাকালে পর্ণাদি কিছুই আহার করিতেন না বলিয়া তিনি অপর্ণা নামে খ্যাত হন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহার সম্মুখে ছদ্মমূর্তিতে উপস্থিত হন এবং শিবনিন্দা করিতে থাকেন। কিন্তু পার্বতী তাঁহার ব্রত হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া শিব পার্বতীকে পত্নীরূপে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সপ্তর্ষিদের দ্বারা মহেশ্বর হিমালয়ের কাছে পার্বতীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ হইল এবং কার্তিকেয় তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

উমার দেহসম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন (লিঙ্গপুরাণ, ৬৬৯)। উমাদেবীর দেহ হইতে এক মুদ্গর সৃষ্ট হয় এবং তাহাতে শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিধন করা হয়। পরে সেই মুদ্গর শম্বরকে প্রদত্ত হইয়াছিল (হরিবংশ, ১৬৩)।

লিঙ্গপুরাণ (৬৬৯, ৯৯), হরিবংশ (১৬৩), মৎস্য-পুরাণ (১৩), বায়ুপুরাণ (৭২), স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড, ৮৮; প্রভাসখণ্ড, ১৬৭), শ্রীমদ্ভাগবত (৩-৪, ৬-৭, ৯), বৃহদ্ধর্মপুরাণ (মধ্যখণ্ড, ১-১০), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড, ৫), দেবীভাগবত (সপ্তম স্কন্ধ, ২০), কালিকাপুরাণ (৪০-৪৪), শিবপুরাণ (৭৩), বামনপুরাণ (৪) ও মহাভারতে (শান্তিপর্ব) সতী-উমা কাহিনীর উল্লেখ আছে। কাহিনী সর্বত্র প্রায় একই রূপ, তবে কালিকাপুরাণের বর্ণনা বিস্তৃততম।

কালিদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কুমারসম্ভবম্' সতী, উমা এবং শিবের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কুমারসম্ভবের কাহিনী কালিকাপুরাণের অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু কালিকা-পুরাণ অর্বাচীন গ্রন্থ, সেইহেতু অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরাণাকারে গ্রথিত হইবার পূর্বেও জনশ্রুতিতে ও পুরাণবিদদের মুখে মুখে কাহিনীগুলি প্রচলিত ছিল এবং কালিদাস সেখান হইতেই তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কারণ কালিদাসের পূর্বে কোনও পুরাণ বর্তমান আকারে গ্রথিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম। অপর চারি জন পণ্ডিত বা রত্নের নাম: গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব ও কবিরাজ বা ধোয়ী। জয়দেবের মতে বাক্য পল্লবিত করা ইহার রচনার বৈশিষ্ট্য। ইহার রচিত বলিয়া

উল্লিখিত 'চন্দ্রচূড়চরিত' পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের 'দেওপাড়াপ্রশস্তি'র রচয়িতা হিসাবেও উমাপতির নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূক্তিগ্রন্থে উমাপতি-রচিত অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'পারিজাত-হরণ' নামক নাটকগ্রন্থের রচয়িতা উমাপতি উপাধ্যায় স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা হরিহরদেব হিন্দুপতি।

দ্র G. A. Grierson, 'Parijataharana Nataka', *Journal of Bihar Orissa Research Society*, 1917; Chintaharan Chakravarti, ed., *Pavanaduta of Dhoyi*, Calcutta, 1926; Nanigopal Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, vol. III, Rajshahi, 1929; M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol. III, part I, Delhi, 1963.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উমাস্বামী, -স্বাতি জৈনসমাজের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। তাঁহার মাতা উমা বাৎসী এবং তাঁহার পিতা স্বাতি নামে অভিহিত হইতেন। শ্বেতাম্বর জৈনগণ তাই উমাস্বামীকে উমাস্বাতি বলিয়া উল্লেখ করেন। মূলতঃ ঘোষনন্দি ক্ষমা-শ্রমণের শিষ্য হইলেও উমাস্বামী দিগম্বরগণ কর্তৃক কুন্দকুন্দাচার্যের শিষ্য বলিয়া অভিহিত। তিনি 'গৃধ্রপিচ্ছ', 'বাচকশ্রমণ' বা 'বাচকাচার্য' উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পাঁচ শত গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ভিন্ন অপর কোনও গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থখানি তিনি পাটলিপুত্র নগরীতে সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর— এই দুই সম্প্রদায়ই উক্ত গ্রন্থের বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছে। তন্মধ্যে পূজ্যপাদ দেবনন্দী, সিদ্ধসেন দিবাকর, অকলঙ্ক, সমন্তভদ্র ও হরিভদ্রের টীকা সমধিক সমাদৃত। দিগম্বর জৈনদের পট্টাবলী অনুসারে তিনি ১৩২-২১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

দ্র M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol. II, Calcutta, 1933.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উমিচাঁদ প্রকৃত নাম আমীরচাঁদ, অন্য মতে আমীনচাঁদ। ইনি শিখ সম্প্রদায়ের লোক, অমৃতসরের অধিবাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইনি এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দীপচাঁদ কলিকাতায় আসিয়া বিখ্যাত শেঠ বংশের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট শিক্ষানবিশি করেন। পরে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দালাল হন। এই কর্মে ৪০ বৎসর কাল লিপ্ত থাকিয়া উমিচাঁদ প্রভূত ধন উপার্জন করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়, তাহাতে উমিচাঁদ ইংরেজের পক্ষে ছিলেন। চক্রান্তের সময়ে উমিচাঁদ ইংরেজদের এই বলিয়া ভয় দেখাইতে থাকেন যে, তাহাদের হাতে সিরাজউদ্দৌলার যে ধনসম্পত্তি আসিবে তাহার শতকরা ৫ টাকা বা থোক ৩০ লক্ষ টাকা তাঁহাকে না দিলে এই চক্রান্তের কথা তিনি সিরাজউদ্দৌলার নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন। ক্লাইভ তখন দুইটি সন্ধিপত্র তৈয়ারি করাইলেন, একটি আসল ও অন্যটি জাল। প্রথমটি শাদা কাগজে লেখা, দ্বিতীয়টি লাল কাগজে। জাল সন্ধিপত্রে উমিচাঁদের ভাগে ৩০ লক্ষ টাকার উল্লেখ রহিল কিন্তু প্রকৃত দলিলে তাহার উল্লেখ মাত্র থাকিল না। পলাশির যুদ্ধের পর যখন উমিচাঁদ তাঁহার ভাগের ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করিলেন, তখন শাদা সন্ধিপত্রটি দেখাইয়া বলা হইল যে, তাঁহার কিছুই প্রাপ্য নাই। ইহার পর উমিচাঁদ মাত্র একবৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। স্বহস্তে লিখিত এক উইলের (১৭৫৮ খ্রী) দ্বারা তিনি তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করিয়া যান।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭ খ্রী) চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরমোহন, মাতা সর্বমঙ্গলা। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভান্তে তিনি ভবানীপুরস্থ 'লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ইন্‌স্টিটিউশন' হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেও কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দেই উমেশচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উমেশচন্দ্র জয়নগর, কলিকাতা, দত্তপুকুর, হরিনাভি, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা-কার্যে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে প্রাইভেট ছাত্ররূপে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাশ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কৈলাসকামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি সপরিবারে কেশবচন্দ্রের 'ভারত আশ্রম' ভুক্ত হন এবং শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক বিবিধ কার্যে যুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন কেশব-বিরোধী নেতৃবৃন্দের অন্যতম। অতঃপর

প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি প্রথমে সিটি স্কুলের (১৮৭৯ খ্রী) প্রধান শিক্ষক এবং পরে সিটি কলেজের (১৮৮১-১৯০৭ খ্রী) অধ্যক্ষ -পদে নিযুক্ত থাকেন। প্রতিষ্ঠাবধি বহু বৎসর যাবৎ 'কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ে'র (১৮৯৩ খ্রী) তিনি ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক।

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনায় উমেশচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। 'বামা-বোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩ খ্রী) তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করেন। স্ত্রীজাতির সর্ববিধ উন্নতিসাধনে পত্রিকাখানির প্রযত্ন সুবিদিত। ইহা ভিন্ন কেশবমণ্ডলী -পরিচালিত 'ধর্মসাধন' (১৮৭২ খ্রী) পত্রিকা এবং কালীনাথ দত্তের সহযোগে 'ভারত-সংস্কারক' (১২৮০ বঙ্গাব্দ) নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও তিনি কয়েক বৎসর সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুন উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, উমেশচন্দ্র দত্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯৮, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-৯৮ খ্রী) হুগলি জেলার রামনগর গ্রামে জন্ম। তাঁহার ছাত্রজীবন গৌরবোজ্জ্বল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার অর্জন করায় সংস্কৃত কলেজ হইতে পরে তিনি 'বিদ্যালংকার' উপাধিতে ভূষিত হন।

উমেশচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে। পরে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়নের পদ প্রাপ্ত হন। বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার ইতিহাস ও দর্শন -বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সুধীসমাজে সমাদৃত হইলেও উমেশচন্দ্র জীবিতকালে কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাংখ্য-দর্শন' (১৯০০ খ্রী), 'বেদ-প্রবেশিকা' (১৯০৫ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নামটি উমেশচন্দ্রেরই প্রস্তাব অনুসারে গৃহীত হইয়াছিল।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৫, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬ খ্রী)। প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। অ্যাটর্নি গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা; মাতার নাম সরস্বতী দেবী। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কলিকাতার খিদিরপুরে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও হিন্দুস্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। বোম্বাইনিবাসী রুস্তমজী জামশেদজী জিজিভাইয়ের অর্থে ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতে আইন শিক্ষার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ৫টি বৃত্তির (বোম্বাইয়ের জন্য ৩টি, মাদ্রাজের ১টি, বাংলার ১টি) ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি পাইয়া উমেশচন্দ্র বিলাতে আইন পড়িতে যান ও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ব্যারিস্টারি আরম্ভ করিয়া অচিরেই প্রতিষ্ঠা ও পশার অর্জন করেন। ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁহার পারদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁহাকে চার বার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল-এর পদে নিযুক্ত করেন। 'হিন্দু উইল্‌স অ্যাক্ট, ১৮৭০' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক প্রগতির জন্য লণ্ডনে যে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয় (১৮৬৫ খ্রী) উমেশচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম সম্পাদক। কংগ্রেসের প্রথম (বোম্বাই ১৮৮৫ খ্রী) ও অষ্টম (এলাহাবাদ ১৮৯২ খ্রী) অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদে বৃত হন। কংগ্রেসের কর্মপরিচালনায় তাঁহার অর্থানুকূল্য উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের তিনি সদস্য ছিলেন এবং ফ্যাকাল্টি অফ ল-এর সভাপতি ছিলেন। লর্ড ক্রসের ভারত সংস্কার আইনের বলে প্রথমবার (১৮৯৩-৯৫ খ্রী) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদান করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে তাঁহার নিজ বাসভবন 'খিদিরপুর হাউস'-এ তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ঐ বৎসরের জুন মাস হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়া তিনি লিবারল বা উদারপন্থী ছিলেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দাবি করেন নাই; আমলাতন্ত্রের সংস্কার ও আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি রূপে তিনি যে

ভাষণ দেন, তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল। কংগ্রেসের তৎকালীন উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি উহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এদিক দিয়া তাঁহার 'ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স' (১৮৯৮ খ্রী) নামক গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম বিষয়ে তাঁহার মনে কোনও গোঁড়ামি ছিল না। উমেশচন্দ্রের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁহার জীবিতকালেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও তিনি নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ক্রয়ডনের বাসভবনে একটি স্মৃতিফলকে ইংরেজী ভাষায় যে বাণী উৎকীর্ণ আছে তাহার প্রথম কথাগুলির মর্মার্থ এইরূপ : হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শায়িত।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; W. C. Bonnerjee, *Council Work of Woomesh Chunder Bonnerjee*, Calcutta, 1923; Krishna Lall Bundopadhyaya, *W. C. Bonnerjee*, Calcutta, 1923; B. Pattabhi Sitaramyya, *The History of the Congress*, Allahabad, 1935; Sadhana Bonnerjee, *Life of W. C. Bonnerjee*, Calcutta, 1944.

যোগেশচন্দ্র বাগল

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বেদের নূতন ব্যাখ্যাকার। পূর্ব বঙ্গের যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামের বৈদ্যবংশে উমেশচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইঁহার ধারণা হইয়াছিল যে শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা ভ্রমপরিপূর্ণ। স্বমতানুযায়ী শুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রচার করা ইনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিদিন বৈকালে কলিকাতার গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিতেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থবাহী নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'মানবের আদি জন্মভূমি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যার উপোদ্‌ঘাতপ্রকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল —তবে গ্রন্থে প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় নাই। ইঁহার মতে ব্রাহ্মণেরাই দেবতা— ইঁহাদের আদি বাসভূমি স্বর্গ বা মঙ্গোলিয়া, দৈত্য দানব বা রেড ইণ্ডিয়ান জাতি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ইঁহারা সামবেদ ও সংস্কৃত লইয়া ভারতবর্ষে আসেন; ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ ভূলোকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে রচিত এবং যজুর্বেদ ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষলোক বা তুরস্ক পারস্য আফগানিস্তান অঞ্চলে রচিত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উমেশচন্দ্র মজুমদার দুঃখীরাম দ্র

উর বর্তমান নাম মুকেয়ির। মেসোপটেমিয়া (ইরাক) -এর প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম ও সুমেরসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাইবেলে এইস্থান ('উর অফ দি ক্যাল্‌ডিজ', জেনিসিস, ১১,১১) এব্রাহ্যামের জন্মভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাবিলনের ২২৫ কিলোমিটার (১৪০ মাইল) দক্ষিণে ও ইউফ্রেটিস নদীর ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) পূর্বে এবং বাগদাদ-বাসরা রেলওয়ের বর্তমান উর জংশন হইতে ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দূরে প্রাচীন উর অবস্থিত (৩১° উত্তর, ৪৬° পূর্ব)। উর প্রাচীন কালে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। ইউফ্রেটিস নদীর পলিমাটি মেসোপটেমিয়ার নিম্ন উপত্যকায় ক্রমাগত সঞ্চিত হইবার ফলে অনেকগুলি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ঐরূপ একটি দ্বীপের উপর উর মহানগরী গড়িয়া ওঠে। আরব মরুভূমির দিকে বিন্যস্ত ছোট ছোট কয়েকটি পর্বতও উরের নিকট অবস্থিত। এইরূপ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উর প্রাচীন কালে একটি বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সমৃদ্ধিশালী মহানগরী উর ক্রমে ক্রমে মরুভূমির বালুকণার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই লুপ্ত মহানগরীর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে। উরের আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত ক্যাল্‌ডিজদের মহানগরী উরের কথা বহুদিন ধরিয়া জানা ছিল, কিন্তু উহার সঠিক অবস্থান জানা ছিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লফ্‌টাস প্রথমে উরের অবস্থান নির্ণয় করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল যথাবিহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বর্তমান মুকেয়িরেই প্রাচীন উর অবস্থিত ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃক বাসরার ইংরেজ কনসাল টেলর-এর উপর উরের খননকার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। টেলর অনেক সীলমোহর ও ভাস্কর্যনিদর্শন আবিষ্কার করিয়া প্রাচীন উরের অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল কিছু কিছু খননকার্য চালাইয়াছিল। কিন্তু উহার কোনও বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্বেল টম্‌সন খননকার্য করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রথমে লেনার্ড কিং -এর উপর ধারাবাহিক

খননকার্য চালাইবার ভার অর্পণ করে। কিন্তু কিং অসুস্থ হইয়া পড়ায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এইচ. আর হল্ ঐ দলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। হল্ ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খননকার্য চালাইয়া প্রাচীন সভ্যতার প্রভূত নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সিল্ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম সম্মিলিত-ভাবে একটি দল প্রেরণ করে। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেনার্ড উলী (১৮৮০-১৯৬০ খ্রী)। উলীর তত্ত্বাবধানে ১৯২২-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুকেয়ির এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নানা স্থানে খননকার্য পরিচালিত হয়। উক্ত খননকার্যের ফলে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রত্নবস্তু হইতে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও তথাকার বিভিন্ন রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ সংকলন করা সম্ভবপর হইয়াছে।
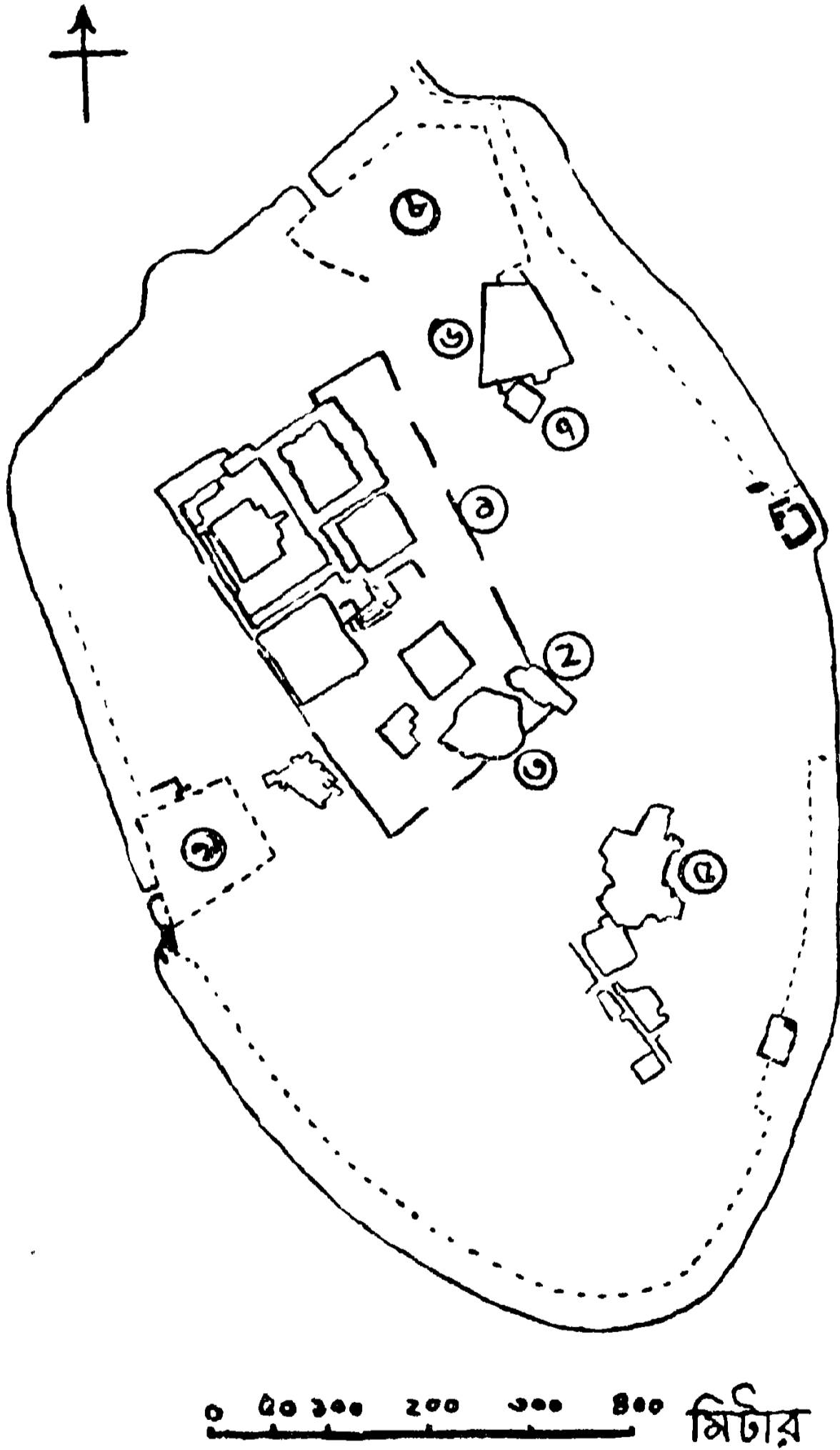
উর মহানগরীর মানচিত্র

০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ মিটার

উরের প্রাচীনতম ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া গিয়াছে মুকেয়ির হইতে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে অবস্থিত আল-উবৈদ-এ। উরের আদিম অধিবাসীরা কৃষিকার্য ও পশুপালন জানিত এবং মাটির বাড়িতে বাস করিত। ইহার কিছুকাল পরেই উত্তর দিক হইতে আর একদল লোক আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করে। ইহাদিগকেই সুমেরীয় বলা হয়। সুমেরীয়গণ নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা লইয়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া নগর পত্তন এবং ইষ্টকনির্মিত বাসগৃহ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা স্থানীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করে নাই। বরং ঐ আদিম অধিবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা এক অ-পূর্ব সভ্যতার সৃষ্টি করে।

সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, বাইবেলের 'জেনিসিসে' (৬-৯ অধ্যায়) বর্ণিত প্লাবন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা নয়— শুধু সুমেরীয় উপকথা হইতেই ঐ কাহিনীর উদ্ভব। উর-এ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে উক্ত প্লাবনের ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। জলপ্লাবনে সুমেরের বিস্তীর্ণ অংশ ধ্বংস হইয়া গেলেও কয়েকটি নগর ও গ্রাম উহার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সেই কারণে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই। প্লাবনের পর উর-এ রাজবংশ পুনঃস্থাপিত হয়। প্রথম রাজবংশের যুগ হইতে (আনুমানিক ৩০০০-২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উরের সন-তারিখ-সংবলিত ধারাবাহিক ইতিহাসের আরম্ভ। সমাধিক্ষেত্র উৎখনন করিয়া উহার পূর্ববর্তী— অর্থাৎ ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী— রাজবংশ ('আদি রাজবংশ') -সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল উপকরণ হইতে জানা যায় যে, সুমেরীয়গণ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের মধ্য ভাগে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উর মহানগরী আবার আক্রান্ত হয়। ইহারা আক্কাদ-এ নূতন রাজধানী স্থাপন করে। এই আক্কাদীয় রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সারগন (আনুমানিক ২৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আক্কাদীয় রাজবংশের পতনের পর কিছুকাল অরাজকতা চলে। ফলে উর আবার বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহার পর উর-নাম্মু নামক রাজা উর-এর পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (২৩০০-২১৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। উক্ত রাজবংশের আমলে মেসোপটেমিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কেন্দ্রীয় রাজ-

শক্তির অধীনে ঐক্য-সংহতি লাভ করে এবং এইরূপে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এই তৃতীয় রাজবংশের যুগ মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে সর্বাধিক গৌরব-উজ্জ্বল অধ্যায়। উরের অধিকাংশ স্মৃতিস্তম্ভ ও সৌধমালা এই যুগেই নির্মিত। এলামাইটদের আক্রমণের ফলে তৃতীয় রাজবংশের পতন ঘটে এবং উরে ইসিন ও লারসা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় (২৩০০-২১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইহার পর অ্যামোরাইটগণ মেসোপটেমিয়া জয় করে। উহারা ব্যাবিলনে রাজধানী স্থানান্তরিত করে, কিন্তু উরের গুরুত্ব তাহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে হাম্মুরাবি অল্প সময়ের জন্য উরের পূর্ব গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে উর মহানগরীর গুরুত্ব লোপ পাইতে থাকে। ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্যাসাইট রাজা কুরিগালজু সুমেরীয় রাজধানীর প্রাচীরের সংস্কার সাধন করেন। ক্যাসাইটদের রাজত্বকালের পর ব্যাবিলনের পতন ঘটে ও উত্তর মেসোপটেমিয়ায় আসিরিয়া পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে এবং ব্যাবিলনের সহিত দীর্ঘ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কালক্রমে ব্যাবিলনে আসিরিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আধিপত্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই এবং দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় অল্প কালের জন্য নব ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই নব রাজবংশের নেবুক্যাড্নেজার (৬০৫ ৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উরের প্রাচীরের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ধন করেন। তিনি বহু মন্দির ও ইমারত নির্মাণ করিয়াছিলেন। মেসোপটেমিয়ার প্রতিটি শহরে নেবুক্যাড্নেজার কর্তৃক নির্মিত মন্দির ও সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর পারসীকদের আক্রমণ শুরু হয়। ঐ আক্রমণের ফলে ব্যাবিলনের পতন ঘটে। আকামেনীয় সাইরাসের অভিযানের পর হইতেই উরের ধ্বংস আরম্ভ হয়। ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে উর মহানগরী ক্রমে ক্রমে ভূগর্ভে বিলুপ্ত হইতে থাকে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উরের যে সকল প্রত্নসামগ্রী ও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তন্মধ্যে ‘জিগ্গুরাট’ (‘পর্বতগৃহ’ বা ‘স্বর্গের পাহাড়’) নামক বিরাট মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা মেসোপটেমিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যনিদর্শন। মেসোপটেমিয়ার প্রতিটি নগরে একটি করিয়া জিগ্গুরাট ছিল। চন্দ্রদেবের (সিন) উদ্দেশে নিবেদিত উরের জিগ্গুরাটটি বহুতলবিশিষ্ট। ইহা উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। মূল মন্দিরের শীর্ষে আর একটি পবিত্র স্থান বা মন্দির আছে। ইহাকে শীর্ষমন্দির বলা যাইতে পারে। শীর্ষমন্দিরে আরোহণের জন্য ধাপে ধাপে সিঁড়ির ব্যবস্থা রহিয়াছে। জিগ্গুরাটের আকৃতি ছিল সমকৌণিক। এই জিগ্গুরাটটি বিভিন্ন যুগে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ন্যাবোনাইডাস (৫৫৬-৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উক্ত মন্দিরের এইরূপ পরিবর্ধন করেন। তাঁহার নির্মিত জিগ্গুরাটটি তৃতীয় রাজবংশের উর-নাম্মু কর্তৃক নির্মিত জিগ্গুরাট হইতে অনেক বৃহৎ। বর্তমান শীর্ষমন্দিরটি পোড়া ইট এবং পাথরের তৈয়ারি, কিন্তু মধ্য স্থলে কিছু কাঁচা ইট ব্যবহারেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্র হইতে জল নির্গমনের জন্য পয়ঃপ্রণালী রহিয়াছে। এই মন্দিরে অনেকগুলি লেখ পাওয়া গিয়াছে। ন্যাবোনাইডাস এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং পতিত বৃক্ষরাজি অপসারণ করিয়া মন্দিরটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন— এই মর্মে একটি শিলালেখে উল্লেখ আছে।

জিগ্গুরাটের ভিত্তিস্তরে যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহা ‘আদি রাজবংশে’র সমসাময়িক। ইমারতগুলি এক ধরনের ইটের তৈয়ারি। ঐ ইটকে ‘প্লেন কনভেক্স’ বলে। জিগ্গুরাটের দক্ষিণ-পূর্বে ক্যাসাইট-যুগের অনেকগুলি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরগুলির পরেই নেবুক্যাড্নেজার-নির্মিত প্রাচীর। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শুল্গী-নির্মিত সুরক্ষিত স্মৃতিমন্দির। এই মন্দির-প্রাচীরের বহির্ভাগে উর মহানগরীর আবাসিক অঞ্চল অবস্থিত ছিল।

জিগ্গুরাটের পূর্ব দিকে এ-নুম-মাহ্ -এর মন্দির। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত নানা যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই মন্দিরের নিকট পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়। হাম্মুরাবি ও ক্যাসাইট রাজবংশের রাজত্বকালের মধ্যবর্তী যুগে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেবুক্যাড্নেজার ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করেন।

জিগ্গুরাটের দক্ষিণ-পূর্বে রহিয়াছে নিন্-গলের আমলে নির্মিত একটি ভগ্ন মন্দির। এই মন্দিরটির নকশার সহিত ব্যাবিলনের ইস্টার মন্দিরের বেশ মিল দেখা যায়। নিন্-গল এবং এ-নুম্-মাহ্-এর মন্দিরের মধ্য স্থলে নান্নার-এর ‘এ-দুব-লাল-মাহ্’ মন্দির অবস্থিত। ইহাকে উরের মন্দির বলা হয়।

নেবুক্যাড্নেজার যে প্রাচীর (ডেমেনস) নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতরকার মন্দিরগুলি তিনটি সময়ের : ১. তৃতীয় রাজবংশ (আনুমানিক ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ২. ক্যাসাইট (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ৩. নব ব্যাবিলনীয় (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যুগের। প্রাচীরের অন্তর্গত মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘এ-দুব-লাল-মাখ্’। ইহা একটি ছোট মন্দির। পূর্বে

ইহার প্রাঙ্গণের চারি দিকে পুরোহিতগণের বাসস্থান ছিল। এই স্থানেই একটি পাথরের ভগ্ন ফলক (স্টীলী) পাওয়া গিয়াছে। জিগ্‌গুরাট নির্মাণের জন্য ভগবান উর-নাম্মুকে যে আদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার প্রতিকৃতি রহিয়াছে। ন্যাবোনাইডাসের সময়ে এই মন্দিরের একাংশে তাঁহার কন্যা বাস করিতেন। এইখানে একটি সংগ্রহশালার ধ্বংসাবশেষ এবং ছাত্রদের জন্য তৈয়ারি সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। নেবুক্যাড্‌নেজারের প্রাচীরের পূর্ব কোণে তৃতীয় রাজবংশ আমলের একটি স্মৃতিমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের সমষ্টি। প্রতিটি সৌধে কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ ছিল। তন্মধ্যে একটি কক্ষ (৫ সংখ্যক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি বেদি ও প্রাঙ্গণের অস্তিত্ব দেখিয়া মনে হয় এখানে ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান পালন করা হইত। এই মন্দিরের তিনটি অংশ ; প্রথম অংশটি নির্মাণ করেন শুল্‌গী এবং অপর দুইটি অংশের নির্মাণকার্যের সহিত বুর-সিনের নাম জড়িত।

উরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে সমাধিক্ষেত্রটিই প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাধিগুলির নির্মাণকাল আদি রাজবংশের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আক্কাদীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। উৎখননের ফলে দুই ধরনের সমাধি পাওয়া গিয়াছে: রাজাদের ও সাধারণ লোকের। রাজাদের সমাধিতে এক বা একাধিক কক্ষ থাকিত এবং ঐ সমাধি প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্মিত হইত। রাজার শবদেহ উক্ত কক্ষেই সমাধিস্থ হইত। তাঁহার ব্যক্তিগত অনুচরবৃন্দের দেহও তাঁহার সন্নিকটে প্রোথিত হইত। কক্ষের দ্বার পাথর দিয়া বন্ধ করা হইত। গহ্বরের বাহিরে বিন্যস্ত হইত রাজার সভাসদ ও অন্যান্য ভৃত্যদের কবর। তার পর সুসজ্জিত নারীদের, সৈন্যদের ও অন্যান্যদের সমাধি। রাজার কবরের সহিত রাজকীয় সম্পদ, রথ প্রভৃতিও সংরক্ষিত থাকিত। এই সকল মৃতদেহ ও রাজসম্পদ গহ্বরের মৃত্তিকার দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইত এবং কবর প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিলে উহার উপরিভাগ সমানভাবে 'লেভেল' করার পর অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। নরোৎসর্গ এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। এইরূপ অনুষ্ঠান ও উৎসর্গ পর পর বিভিন্ন স্তরে সাঙ্গ হইলে মৃত্তিকার দ্বারা সমাধিস্থল সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিয়া উহার উপর উপাসনাগৃহ নির্মাণ করা হইত। যে স্তরে সমাধিগুলি উৎখনন করা হইয়াছে সেখানে যে ধ্বংসস্তূপ ও মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই স্থানেই উপাসনার জন্য একটি সৌধ ছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই মেস-আন-নি-পাড-ডা, প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা, ও তাঁহার স্ত্রী নিন্‌-টুর-নিনের সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এই সীলমোহর হইতেই প্রমাণিত হয়, যে গৃহের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়াছে উহা প্রথম রাজবংশের সমসাময়িক। রাজা ও রানীদের সমাধিক্ষেত্র হইতে স্বর্ণ রৌপ্য মাণিক্য প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ লোকের সমাধি একেবারে অন্য প্রকারের। ঐ সকল শবাধার সাধারণতঃ পোড়ামাটির বা কাঠের তৈয়ারি এবং উহাদের শবের সহিত পাওয়া গিয়াছে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সাধারণ জিনিসপত্র। সমাধিগুলি তিনটি স্তরে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরের সমাধি কিশ-এর সমাধির সহিত তুলনীয়। তৃতীয় স্তরের সমাধি আরও পরবর্তী যুগের। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে প্রথম স্তরে। ইহার নিম্নবর্তী স্তরে রাজা-রানী ও শত শত প্রজার সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সমাধিক্ষেত্র উৎখনন করিয়া যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে পুরাতত্ত্বের দিক হইতে তাহাদের গুরুত্ব অসামান্য। উক্ত উপকরণ হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ বহু প্রাচীন কাল হইতেই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের নিম্ন উপত্যকায় বসবাস করিত এবং উহারা এক উন্নত সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে উলীর বিবরণের যে সারমর্ম পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আধুনিক কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সমাধিগুলি প্রাচীন উরের বসন্ত-উৎসবের নিদর্শন মাত্র। জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরোৎসর্গ উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষেও বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। উপরন্তু, যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা উলীর বৃত্তান্তই সমর্থিত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্র্যামার একটি স্টীলী বা ফলকের পাঠোদ্ধার করেন। উহাতে রাজকীয় সমাধির যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত উলী-প্রদত্ত বিবরণের বহুলাংশে সংগতি আছে।

উর মহানগরীর দুইটি পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর দিকের পোতাশ্রয়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দুইটি সৌধ পাওয়া গিয়াছে। আকারে প্রথমটি বৃহত্তর ও প্রাচীরবেষ্টিত। উহা ন্যাবোনাইডাসের প্রাসাদ ছিল। অপরটি নেবুক্যাড্‌নেজার-নির্মিত একটি ছোট মন্দির।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই উর মহানগরী প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উর-নাম্মু এই প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেন। উলীর খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে উহার ভিত্তি কাঁচা ইটের তৈয়ারি এবং ইহার উপরেই ছাপ দেওয়া ইটের

(স্ট্যাম্প্‌ড ব্রিক) গাঁথুনি ছিল। পোড়া ইটের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ভূমি হইতে প্রাচীর প্রায় ৬ মিটার (২০ ফুট) উচ্চ এবং ইহার ভিত্তিস্তরও ২০ মিটারের (৬৬ ফুট) কম পুরু ছিল না। অধুনা প্রাচীরের উচ্চতা ৮ মিটার (২৬ ফুট)। এই প্রাচীরের কাছে— জিগ্‌গুরাটের পূর্বে— বুর-সিন একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া জলদেবতা (এনকি) -কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। লারসা রাজবংশের রিম-সিন এই মন্দিরটিরই সংস্কার করেন। উক্ত মন্দির হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্লাবনের হাত হইতে উরকে রক্ষা করার জন্যই ঐ প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল।

পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী মন্দিরটির ৪০০ মিটার (১৩১২ ফুট) দক্ষিণে উর মহানগরীর আবাসিক অঞ্চলের একাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক ২০০০ বৎসর পূর্বে এব্রাহ্যাম এই অংশেই বাস করিতেন। আবাসিক অঞ্চলের পথঘাট ও সৌধমালা অতি মনোরম। অধিকাংশ বাসগৃহ পোড়া ইটের তৈয়ারি, কিন্তু উপরের দিকে আবার কাঁচা ইটেরও গড়ন রহিয়াছে। দেওয়ালের উপরেও প্রলেপ ও চুনকাম দেওয়া হইত। কিছু কিছু দ্বিতল গৃহও ছিল। গৃহসংলগ্ন প্রতিটি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া কক্ষের সংখ্যাও কম ছিল না। উপরের তলায় উঠিবার জন্য ইটের তৈয়ারি সিঁড়িও ছিল। বিভিন্ন কাজের জন্য এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হইত, কোনটি ছিল রন্ধনশালা, কোনটি শয়নগৃহ, কোনটি ভৃত্যদের ঘর, কোনটি বা উপাসনাগৃহ। ঘরগুলির প্রবেশ-দ্বার ছিল অঙ্গনের দিকে। দ্বিতলে ঘুরানো বারান্দা ছিল। এতদ্ভিন্ন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মন্দির বা উপাসনালয় থাকিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে সাধারণতঃ মেঝের নীচে মৃতদেহ সমাধিস্থ হইত।

উরের সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন অধুনা পশ্চিম এশিয়ার আরও অনেক অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সিন্ধুসভ্যতার কথা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। উর ও সিন্ধু উপত্যকার দূরত্ব অনেক, কিন্তু ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার নিগূঢ় সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্যের জন্য অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, সিন্ধুসভ্যতা উর বা সুমেরীয় সভ্যতারই অংশ মাত্র। এই মত সর্ববাদীসম্মত নহে। কারণ সিন্ধুসভ্যতার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা সুমেরীয় সভ্যতায় পাওয়া যায় না। উপরন্তু আধুনিক কালে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু হইতে প্রমাণিত হয় যে উরের, তথা সুমেরীয় সভ্যতার উপরেও সিন্ধুসভ্যতার প্রভাব কম ছিল না। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার ও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিকাশ সমসাময়িক এবং এই দুই সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ও নিগূঢ়তম সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সুমেরীয়গণ সিন্ধু উপত্যকা হইতেই উরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। তবে উরে যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের বসতি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্র H. R. Hall & Leonard Woolley, *Ur Excavations*, vol. I, Oxford, 1927 ; Leonard Woolley, *Ur of the Chaldees*, Oxford, 1929 ; V. Gordon Childe, *New Light on the Most Ancient East*, London, 1930 ; Leonard Woolley, *The Sumerians*, Oxford, 1930 ; Seton Lloyd, *Mesopotamia*, London, 1936 ; Leonard Woolley, *Ur Excavations*, vol. V, Oxford, 1939 ; Leonard Woolley, *Excavations at Ur*, 1954 ; Seton Lloyd, *Twin Rivers*, Oxford, 1961.

সুধীররঞ্জন দাশ

উরাঁও, ওরাঁও ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের দ্রাবিড়ভাষী উপজাতি। দৈহিক গঠনে অস্ট্রালয়েড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ইহাদের অনেকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষিজীবী, কুলি অথবা কর্পো-রেশনের ধাঙড় অথবা চা-বাগানের মজুর হিসাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য।

উরাঁওদের সমাজে বহু গোত্র বা কুল আছে। প্রতি গোত্রের এক-একটি বিশিষ্ট নাম (টোটেম) আছে, নামগুলি প্রায়ই প্রাকৃতিক দ্রব্য হইতে গৃহীত হয়। সগোত্রে ইহাদের বিবাহ হয় না। বিবাহের জন্য বরপক্ষকে টাকা পণ দিতে হয়। বিধবাবিবাহ এবং বিবাহচ্ছেদ— উভয়ই সমাজ-অনুমোদিত। গ্রামের মাতব্বরকে 'মাহাতো' বলা হয়। পূজার্চনার জন্য ও ভূতপ্রেতকে শান্ত করিবার জন্য 'পাহান' বা 'বাইগা' আছে। তাহার সহকারীর নাম 'পূজার' বা 'পানভরা'। 'সরনবুড়িয়া' হইল প্রধান গ্রামদেবী। ইহা ছাড়া চণ্ডী, মহাদানিয়া প্রভৃতি শক্তির কল্পনা আছে। মহাদানিয়ার কাছে পূর্বে নরবলি হইত, এখন মহিষবলি হয়। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য শয়নঘর আছে। তাহার অবস্থান আগড়া বা

মণ্ডলাকৃতি নৃত্যস্থলের কাছে। এই শয়নঘর বা 'ধুমকুড়িয়া'র নেতাকে 'ধাঙড় মাহাতো' বলা হয়। বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিয়া থাকে।

উরাঁওদের মধ্যে হিন্দুপ্রভাব যেমন দেখা যায়, তেমনই খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কিছুদিন পূর্বে হিন্দু ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক আন্দোলন হইয়াছিল। ইহা 'টানা-ভগৎ' আন্দোলন নামে পরিচিত। সারহুল পরব ইহাদের প্রধান পরব। উৎসব-পরবে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মদোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। মৃতদেহ সমাধি দেওয়া ও দাহ করা— উভয় রীতিই প্রচলিত। পূর্বে সকল মৃতদেহই সমাধিস্থ করা হইত। পরে বৎসরের এক নির্ধারিত দিনে গোরস্থান হইতে মৃতদেহ বাহির করিয়া একই দিনে দাহ করা হইত। ইহাকে বলা হয় 'হাড়বোরা'।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

উরুবিল্ব পালি উরুবেলা। বিহার রাজ্যের গয়া শহর হইতে দক্ষিণে প্রাচীন মগধরাজ্যে নিরঞ্জনা (বর্তমান ফল্গু) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে উরুবিল্ব বা উরুবেলা বলা হইত। বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনার সহিত ইহা সম্পৃক্ত। ইহার সেনানিগাম স্থানটি গোতম তাঁহার সাধনভূমিরূপে নির্বাচন করেন। মজ্‌ঝিমনিকায়-এর অরিয়-পরিয়েসন সুত্তে উরুবিল্বর প্রাকৃতিক বর্ণনা এইরূপ: 'এই সেই রমণীয় ভূমিভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সতীর্থযুক্ত প্রবহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনাপ্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই ত উপযুক্ত স্থান!' বুদ্ধত্ব অর্জনের পূর্বে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনার পথ বর্জন করিলে তাঁহার 'পঞ্চবগ্‌গীয়' সব্রহ্মচারীগণ উরুবেলাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সাধারণ ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিবেন স্থির করিলে সেনানিগাম অধিবাসিনী সেনানীকন্যা সুজাতার নিকট পায়সান্ন গ্রহণ করেন। যে বোধিদ্রুমতলে দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় সমাসীন থাকিয়া গোতম অবশেষে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা এই উরুবিল্ব অঞ্চলেই অবস্থিত। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর গোতম উরুবিল্বর সন্নিকটস্থ অজপাল বটবৃক্ষ, মুচলিন্দবৃক্ষ এবং রাজায়তনে বৃক্ষতলে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই স্থানগুলিতেই 'অনিমিস-চেতিয়', 'রতনচংকম-চেতিয়' এবং 'রতনঘর-চেতিয়' নামক চৈত্যগুলি নির্মিত হয়। উরুবিল্ব হইতে বুদ্ধ ইসিপতনে (সারনাথ) গমন করেন এবং ৬১ জন অর্হৎকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া তিনি উরুবিল্বে প্রত্যাবর্তনপথে কপ্‌পাসিক বনখণ্ডে গমন করিয়া 'ভদ্দবগ্‌গীয়' নামে পরিচিত যুবকগণকে দীক্ষিত করেন। উরুবিল্ব অঞ্চলেই সহস্রশিষ্যসহ জটিলতপস্বী ভ্রাতৃত্রয় উরুবেল কস্‌সপ, নদী কস্‌সপ ও গয়া কস্‌সপ বাস করিতেন। বুদ্ধ তাঁহার অসাধারণ বিভূতি-প্রভাবে ইহাদিগকে দীক্ষিত করেন।

উরুবেলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বালুকারাশির চড়া। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন গল্পে আছে, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালের পূর্বে দশ সহস্র তপস্বী এই অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহারা স্থির করেন যে তাঁহাদের কাহারও মনে কোনও অসৎ চিন্তার উদয় হইলে তাঁহাকে এক ঝুড়ি বালুকা বহন করিয়া বিশেষ একটি স্থানে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই ভাবেই এখানে বালুকা চড়ার সৃষ্টি হয়। দীঘনিকায়ে স্থানটিকে 'উরুবেলা' বলা হইয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত সেনানিগাম মহাবস্তু অবদানে সেনাপতি-গ্রাম নামে আখ্যাত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই গ্রামের সন্নিকটে আরও চারিটি ভদ্রগ্রামের উল্লেখ আছে: প্রস্কন্দক, বলাকল্প, উজ্জঙ্গল এবং জঙ্গল। ইহাতে মনে হয় সেনাপতিগ্রামসহ এই চারিটি গ্রাম লইয়া 'উরুবিল্বা' অঞ্চল গঠিত ছিল।

পরবর্তী কালে উরুবিল্বে বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান-গুলিতে বহু স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হয়।

দ্র বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ; মজ্‌ঝিমনিকায়, অরিয়-পরিয়েসন সুত্ত; মহাবস্তু অবদান।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

উরুবেল কস্‌সপ উরুবেলার তিন জটিল সহোদরের অন্যতম কস্‌সপ 'উরুবেল কস্‌সপ' নামে বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। পাঁচ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে উরুবেল কস্‌সপ নিরঞ্জনাতীরে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধ এক রাত্রিতে বিষধর সর্পাশ্রিত যজ্ঞগৃহে অবস্থান করেন। তিনি দুইটি সর্পকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া কস্‌সপ তাঁহার প্রাত্যহিক আহার্যের ব্যবস্থা করেন। ইদ্ধির (অনৈসর্গিক শক্তি) দ্বারা অনেক অত্যাশ্চর্য কার্য সম্পন্ন করায় কস্‌সপ সশিষ্য বুদ্ধের অনুগামী হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। রাজগৃহে যাইবার পথে এই শিষ্যগণ অপর অনেককে সংঘভুক্ত করিয়াছিল।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

উর্দূ হিন্দুস্থানীর (পশ্চিমা হিন্দীর) মুসলমানি সংস্করণ। পুরা নাম ছিল জবানে-উর্দূ অর্থাৎ সৈন্যশিবিরের ও

গোরাবাজারের ভাষা। এ ভাষার মূল মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী অঞ্চলের ভাষা। তুর্কী, ফারসী ও পশতো-ভাষী মুসলমানদের কথ্য ভাষায় পরিণত হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উপর লেখার ও সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় ইহাতে প্রথম হইতেই ফারসী লিপি গৃহীত হইয়াছিল। সেই সূত্রে আরবী-ফারসী শব্দের প্রবেশ অবারিত হইয়াছিল।

সাহিত্যে মুসলমানি হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যবহার চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু হয়। তখন ইহা ফারসী হরফে লেখা হইলেও ঠিক উর্দু রূপ পায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে মুসলমান লেখকদের দ্বারাই উর্দু সাহিত্যের পত্তন বলা যায়। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দিল্লীতে উর্দুর বিশেষ অনুশীলন হইতে থাকে এবং সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজেও ইহা শিষ্ট ভাষা ('খড়ীবোলী'—শব্দটি ইংরেজী স্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ -এর অনুবাদ) রূপে গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে উর্দু ও হিন্দুস্থানী (পশ্চিমা হিন্দী, এখন বলা হয় হিন্দী) স্বতন্ত্র ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে দুইটি ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত কোনও পার্থক্য নাই। পার্থক্য প্রধানতঃ লিপিতে ও শব্দভাণ্ডারে এবং সেই সূত্রে কিছু কিছু উচ্চারণে। সাহিত্যে হিন্দী সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছে, উর্দু ফারসীর। হিন্দী লেখা হয় নাগরী লিপিতে, ফারসী লেখা হয় অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ আরবী-ফারসী লিপিতে।

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে উর্দু ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাষারূপে অনুশীলিত হইত। তখন ইহার নামান্তর ছিল হিন্দোস্তানী। লেখা হইত রোমান হরফে।

সুকুমার সেন

উর্দু সাহিত্য উর্দু ভাষার মূল আধার হিন্দী খড়ীবোলী, তবে ইহার উপর অন্যান্য প্রচলিত ভাষার প্রভাবও বর্তমান। আদিতে এই ভাষা সাধারণ লোকে বলিত অথবা সুফী ফকিরেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের বিচারধারা প্রচার করিবার নিমিত্ত ইহার ব্যবহার করিতেন; এই কারণে এই ভাষার অনেকগুলি নাম প্রচলিত আছে। আমীর খুসরৌ ইহাকে 'হিন্দী', 'হিন্দবী' অথবা 'জবানে দেহলবী' (দিল্লীর ভাষা) আখ্যা দিয়াছেন; ভারতবর্ষের দক্ষিণে ইহাকে 'দক্কিনী' অথবা 'দক্‌খিনী' বলা হইয়াছে; গুজরাটে 'গুজরী' (গুজরাটী উর্দু) বলা হইয়াছে। দক্ষিণের কিছু লেখক ইহাকে 'জবানে-অহলে-হিন্দুস্তান' (উত্তর ভারতবর্ষের লোকের ভাষা) আখ্যা দিয়াছেন। যখন কবিতা এবং বিশেষভাবে গজল লিখিবার জন্য এই ভাষার প্রয়োগ হইতে থাকে তখন ইহাকে 'রেখতা' (মিশ্র ভাষা) বলা হইয়াছে; আরও পরে ইহাকে 'জবানে উর্দু', 'উর্দু-এ-মুঅল্লা' বা কেবল উর্দু বলা হইতে থাকে। ইওরোপীয় লেখকেরা ইহাকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী বলিয়াছেন এবং কিছু ইংরেজ লেখক ইহাকে 'মুস' নামে সম্বোধিত করিয়াছেন। এই সকল নাম হইতে ইহার ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

উর্দু ভাষার প্রাথমিক রূপ সুফী ফকিরদের বাণীতে অথবা সাধারণ লোকের কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যায়। উর্দুর উপর সর্বপ্রথম পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাব পড়ে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যখন দক্ষিণ ভারতের কবিরা সাহিত্যে উর্দুর ব্যবহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে পাঞ্জাবী শব্দ পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইহার উপর ব্রজভাষার প্রভাবও খুব গভীর পরিমাণে পড়ে এবং পণ্ডিতেরা গোয়ালিয়রী ভাষাকে অধিক শুদ্ধ ভাষা বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু সেই যুগে কিছু পণ্ডিত এবং কবি উর্দুকে নূতন রূপ দান করিবার জন্য ব্রজভাষার শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে যে উর্দুর ব্যবহার ছিল, উত্তর ভারতে তাহাকে নিম্ন শ্রেণীর ভাষা বলিয়া গণ্য করা হইত। কারণ ফারসী সাহিত্য এবং সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত দিল্লীর কথ্য ভাষা হইতে ইহা পৃথক ছিল। কথোপকথনের ভাষায় এই পার্থক্য হয়ত বিরাট ছিল না, কিন্তু শৈলী এবং শব্দপ্রয়োগের বিশিষ্টতায় সাহিত্যের ভাষায় এই পার্থক্য ব্যাপক হইতে হইতে বিভিন্ন ধারা বা 'স্কুল'-এর সৃষ্টি করে। যেমন দক্ষিণ ধারা, দিল্লী ধারা, লখনৌ ধারা, বিহার ধারা ইত্যাদি। এই ভাষা যখন নিজের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল তখন ইরানী এবং ভারতীয় এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ক্রমশঃ ভারতীয় প্রবণতাই জয়ী হয়। যে ভাষাকে উর্দু বলা হয় তাহার শতকরা প্রায় ৮৫টি শব্দ হিন্দীর কোনও না কোনও রূপ হইতে লওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট শতকরা ১৫টি শব্দ ফারসী, আরবী, তুর্কী এবং অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত। এই শব্দগুলি মুসলমান শাসকদের সময়ে সাংস্কৃতিক কারণে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসলমানদের ভারতে আগমনের ফলে যেমন এখানকার জীবনযাত্রা প্রভাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ এখানকার

জীবনযাত্রার দ্বারাও তাহারা প্রভাবিত হয়। তাহারা এখানকার ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করিয়া উহার মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাহোরের খ্বাজা মস্উদ সাদ্ সলমান-এর (১১৬৬ খ্রী) নাম করা যায়। তিনি হিন্দীতে নিজের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোনও পুথি আজ আর পাওয়া যায় না। এই সময়কার কয়েকজন সূফী ফকিরের নামও পাওয়া যায়, তাঁহারা দেশের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিয়া নিজেদের চিন্তাধারা প্রচার করেন। অনুমান করা সহজ যে সেই সময়ে ভাষার শুদ্ধ রূপ গড়িয়া ন। ওঠার ফলে সাধারণ কথোপকথনের ভাষাতে তাঁহারা আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। সূফী সাধকদের সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকগুলিতে ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। যাঁহাদের রচনা অথবা কবিতা পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম হইল— বাবা ফরীদ শকরগঞ্জ (১২৬২ খ্রী), শেখ হমীদুদ্দীন নাগৌরী (১২৭৪ খ্রী), শেখ শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দর (১৩২৩ খ্রী), আমীর খুসরৌ (১৩২৪ খ্রী), শেখ সিরাজুদ্দীন (১৩৫৬ খ্রী), শেখ শরফুদ্দীন য়াহিয়া মনেরী (১৩৭০ খ্রী), মখদুম অশরফ জহাঙ্গীর (১৩৫৫ খ্রী), শেখ আবদুল হক (১৪৩৩ খ্রী), সৈয়দ গেসূদরাজ (১৪২১ খ্রী), সৈয়দ মহম্মদ জৌনপুরী (১৫০৪ খ্রী), শেখ বহাউদ্দীন বাজন (১৫০৬ খ্রী) ইত্যাদি। ইঁহাদের রচনা এবং দোঁহাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই সময়ে প্রচলিত ভাষা হইতে পৃথক অথচ সাধারণের বোধগম্য এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইতেছে।

উপরি-উক্ত কবিদের মধ্যে আমীর খুসরৌ এবং গেসূদরাজ উর্দু সাহিত্যের প্রারম্ভিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। খুসরৌ-এর হিন্দী রচনার কিয়দংশ দিল্লীতে প্রচলিত 'খড়ীবোলী'তে লিখিত, তাই উর্দু বলিয়া পরিচিত। তাঁহার রচনা নাগরী লিপিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গেসূদরাজের রচনা এবং কবিতা এখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। বর্তমান সময় পর্যন্ত 'মেরাজুল আশিকীন', 'চক্কীনামা', 'তিলাবতুল বজুদ'— এই তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; এইগুলির মধ্যে সূফী বিচারধারার স্পষ্ট রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গেসূদরাজ দিল্লীর অধিবাসী হইলেও জীবনের অধিকাংশ সময় দক্ষিণ ভারতে কাটাইয়াছেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই কারণে তাঁহার ভাষাকে দক্বিনী উর্দু বলা হয়। যদিও উর্দু দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল তথাপি সৈন্যবাহিনী, সূফী ফকির, সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের অপরাপর প্রান্তেও উহা ছড়াইয়া পড়ে।

উর্দুভাষার সাহিত্যিক রূপের বিকাশের প্রথম চিহ্ন দেখা যায় দক্ষিণ ভারত এবং গুজরাটে। গেসূদরাজ ভিন্ন মীরানজী শমসুল উশ্শাক, বুরহানুদ্দীন জানম্, নিজামী, ফিরোজ, মহমূদ, অমীনুদ্দীন আলা প্রভৃতির রচনা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। বাহ্মনী রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি রাজ্যের সৃষ্টি হইলে উর্দুর উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নিমিত্ত বাদশাহেরাও উর্দুকে মুখ্য স্থান দিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে সাহিত্য এবং শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদনের পরে এবং নিজেদের স্বাধীনতা প্রচারের নিমিত্ত তাঁহারা ফারসীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষা গ্রহণ করিলেন এবং সাহিত্যরচয়িতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ্ তাঁহার সুবিখ্যাত 'নৌরস' রচনা করেন। ইহাতে ব্রজভাষা এবং খড়ীবোলীর মিশ্রণ হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে আরবী-ফারসী শব্দও মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার সকল গীত ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিতে রচিত। সুবিখ্যাত ফারসী পণ্ডিত জহুরী ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন; উহা 'সে নস্র্' (তিন) গদ্য নামে প্রসিদ্ধ। বিজাপুরের অন্যান্য বাদশাহেরা নিজেরাও কবি ছিলেন এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে আতশী, মুকীমী, অমীন, রুস্তমী, খুশনূদ, দৌলতশাহ্ প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য। বিজাপুরের পতনের সময় উর্দুর প্রসিদ্ধ কবি নুসরতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৃঙ্গার এবং বীর-রসের শ্রেষ্ঠ কবি।

বিজাপুরের মত গোলকুণ্ডাতেও বাদশাহ্ এবং সাধারণ লোক সকলের মধ্যেই অধিক মাত্রায় উর্দুর ব্যবহার ছিল। মহম্মদ কুলী কুতুবশাহ্ (১৬১১ খ্রী) স্বয়ং উর্দু, ফারসী এবং তেলুগু ভাষায় কাব্যরচনা করিয়াছেন এবং অপর কবিদের উৎসাহ দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যসংগ্রহে ভারতের ঋতু, ফল, ফুল, পাখি এবং উৎসবাদির বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। পরে যাঁহারা বাদশাহ্ হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন কবি এবং তাঁহাদের কাব্যসংগ্রহ এখনও বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ কবি এবং লেখকদের মধ্যে বজ্হী, গৌব্বাসী, ইব্নে নিশাতী, গুলাম আলী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইরূপে দক্ষিণ

ভারতে সর্বপ্রথমে উর্দু ভাষায় এমন রচনা হইল যাহা রস এবং চিন্তাধারা উভয়ের বিচারেই উচ্চ স্তরের সাহিত্য। এই রচনাগুলির মধ্যে কুলিয়াতে (কুলী কুতুবশাহ্), কুতুব মুশতরী (বজ্হী), সব্রস (বজ্হী), ফুলবন (ইব্নে নিশাতী), সৈফুল-মুলুক-ব-বদী উলজমাল (গৌব্বাসী), মনোহর মধু-মালতী (নুস্রতী), চন্দ্র-বদন-ব-মহয়ার (মুকীমী) ইত্যাদি গ্রন্থ উর্দু ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত।

সপ্তদশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই উর্দু গুজরাট, আরকট এবং মাদ্রাজে প্রচারিত হইয়াছিল। গুজরাটে সুফী কবিদের রচনার দ্বারা উর্দুর উন্নতি হয়। শেখ বাজন, শাহ্ অলীজ্যু এবং খূব মহম্মদ চিশ্তী প্রভৃতি কবির রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলেরা যখন দক্ষিণ ভারত বিজয় করে তখনও উর্দু সাহিত্যের উন্নতি রুদ্ধ হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বলী দক্কিনী (১৭০৭ খ্রী) নহরী, নজদী, বলী বেলোরী, সেরাজ (১৭৬৩ খ্রী), দাউদ এবং উজলতের মত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বলী দক্কিনী, বহরী এবং সেরাজ উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য; বলী-কে উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে সংযোগস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে যদিও দিল্লীর কথোপকথনের ভাষা ছিল উর্দু, তথাপি ফারসী প্রভাবের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ফারসীর সাহায্যেই নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করিত। তাহারা মনে করিত যে উর্দুর দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ হইবে না। বলীর কবিতায় এই ভ্রম দূর হইল এবং উত্তর ভারতবর্ষের সাহিত্যিক পরিস্থিতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লী শতাধিক উর্দু কবির গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিল।

তখন হইতে উর্দু জগতে দিল্লী ধারার ইতিহাস আরম্ভ। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা সামন্তশাসনের পতনের যুগ। মোগল শাসন কেবল অন্তঃসারশূন্য হইয়াই পড়ে নাই, বাহির হইতেও তাহার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ভাষাই উন্নতিলাভ করিল। এই কালের কবিদের মধ্যে খানে আরজূ, আবরু, য়করংগ, নাজী, মজমুন, তাবাঁ (১৭৪৮ খ্রী), ফুগাঁ (১৭৭২ খ্রী), হাতিম (১৭৮৬ খ্রী), মজহর-জানে-জানাঁ, ফায়েজ প্রভৃতি কবি উর্দু সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে আখ্যায়িকা কাব্য এবং মর্সিয়া অর্থাৎ শোকগাথা অধিক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু দিল্লীতে গজল প্রাধান্য লাভ করে। এখানকার প্রগতিশীল ভাষা মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার অধিকতর উপযোগী ছিল বলিয়া গজলের উন্নতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই সময়ের কবিতার মধ্যে শৃঙ্গার এবং ভক্তি রসের প্রাধান্য দেখা যায়। দিল্লীতে উর্দু ভাষা এবং সাহিত্যের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে উর্দু রাজদরবার পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। মোগল বাদশাহ্ শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রী) স্বয়ং কবিতা রচনা করিতেন এবং কবিদের আশ্রয়দাতাও ছিলেন। এই যুগে যে সকল কবি উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন মীর দর্দ (১৭৮৪ খ্রী), মীর্জা সৌদা (১৭৮৫ খ্রী), মীর তকী মীর (১৮১০ খ্রী) এবং মীর সোজ। ইঁহাদের চিন্তাধারার গভীরতা এবং বিস্তার, ভাষার সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। দর্দ সুফী চিন্তাধারার কাব্যে, মীর গজলের ক্ষেত্রে এবং সৌদা প্রায় সমস্ত শাখাতে উর্দু কবিতার অধিকার বিস্তৃত করেন।

কিন্তু ইহার পরেই দুর্দিন উপস্থিত হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। অসহায় শাহ্ আলম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইয়া প্রয়াগের কাছে প্রায় বন্দীজীবন যাপন করিতে থাকেন। ইহার ফলে অনেক কবি এবং শিল্পী দিল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রদেশে চলিয়া যান। এই সময় কিছু কিছু নূতন রাজদরবার স্থাপিত হয়—যেমন হায়দরাবাদ, অবধ, অজীমাবাদ (পাটনা), টাঁড়া, ফর্রুখাবাদ ইত্যাদি। ইহাদের নূতন ঐশ্বর্য এবং জাঁকজমক অনেক কবিকে আকর্ষণ করে। অবধের রা জ দ র বা র ই ইঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এখানকার নবাব নিজের দ র বা র কে মোগল বাদশাহের দরবারের ন্যায় করিয়া তুলিতে চাহেন। দিল্লীর অবস্থা মন্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুগাঁ, সৌদা, মীর (১৮১০ খ্রী), মীর হসন (১৭৮৭ খ্রী) এবং আরও কিছুকাল পরে মুস্হফী (১৮২৫ খ্রী), ইন্শা (১৮১৭ খ্রী), জুরঅত এবং অন্যান্য কবিরা অবধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এখানে কাব্যরচনার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল। ইহাকেই লখনৌ ধারা আখ্যা দেওয়া হয়।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ অবধের রাজধানী হইল। সেই সময় হইতেই এখানে আরবী-ফারসীর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং অবধী ভাষার প্রভাবে উর্দু ভাষাতে এক নূতন ধরনের মিষ্টতার সৃষ্টি হয়। এখানকার নবাব শিয়া

সম্প্রদায়ের মুসলমান ছিলেন। সেইজন্য এখানকার কাব্য-রচনার মধ্যে কিছু কিছু নূতন প্রবণতা দেখা দিল। এই নূতনত্ব দিল্লী ধারা হইতে লখনৌ ধারাকে পৃথক করিয়াছে। উর্দু কাব্যের ইতিহাসে দিল্লী এবং লখনৌ ধারার তুলনামূলক আলোচনা অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে সামন্তযুগের পতনের সময়ে রচিত দিল্লী এবং লখনৌ ধারার কাব্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। অন্য পক্ষে এ কথাও সত্য যে যেখানে লখনৌ ধারায় ভাষা এবং জীবনের বহিরঙ্গের দিকে অধিকতর দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে, সেখানে দিল্লী ধারায় ভাবের গভীরতার উপরই অধিকতর লক্ষ্য নিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দিল্লীর সাহিত্যিক ঐতিহ্য লখনৌ-এর ভিন্ন পরিবেশে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এখানকার কবিদের মধ্যে মীর, মীর হসন, সৌদা, ইন্শা, মুসহফী, জুরঅত এবং তাঁহাদের পরে নাসিখ (১৮৩৮ খ্রী) আতিশ (১৮৪৭ খ্রী), এবং অনীস (১৮৭৪ খ্রী), দবীর (১৮৭৫ খ্রী), নসীম, রশ্‌ক, রিন্দ এবং সবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। লখনৌতে মর্‌সিয়া এবং মস্‌নবী কাব্য অধিকতর উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

লখনৌ এবং দিল্লী ধারার বাহিরেও সাহিত্য রচনা হইতেছিল। এই সমস্ত রচনা রাজদরবারের প্রভাব হইতে দূরে ছিল বলিয়া জনসাধারণের নিকটবর্তী হইয়াছিল। এই ধারার রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ হইলেন নজীর আকবরাবাদী। ইনি নিজের কাব্যে প্রাচীন প্রচলিত রীতিকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রাণের স্পন্দনকে কাব্যে বিধৃত করিলেন। তাঁহার রচনাশৈলী এবং চিন্তাধারা উভয়ের মধ্যেই ভারতীয় জীবনের সরলতা এবং উদারতার আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিমের সংস্পর্শে আসার ফলে উনবিংশ শতকে অন্যান্য ভাষার মত উর্দুতেও নবচেতনার উন্মেষ দেখা যায়। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে উর্দু সাহিত্যে নূতন চিন্তাধারার প্রকাশ হইতে থাকে। ইহার পূর্বে দিল্লীর মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় জৌক (১৮৫২ খ্রী), মোমিন (১৮৫৫ খ্রী), গালিব (১৮৬৯ খ্রী), শেফতা (১৮৬৯ খ্রী), জফর প্রভৃতির ন্যায় কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষতঃ গালিবের রচনা এই জীবনের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই প্রতীক। মননশীলতা এবং অনুভূতিপ্রবণতা এই উভয়ের বিচিত্র সংমিশ্রণ গালিবের রচনাবৈশিষ্ট্য।

এই যুগের পূর্বেই উর্দু গদ্যের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু ইহার উন্নতি উনবিংশ শতকেই সম্পূর্ণ হয়। দক্ষিণ ভারতে মেরাজুল আশিকীন এবং সব্‌রস (১৬৩৪ খ্রী) ব্যতিরেকে অল্প কিছু ধর্মসম্বন্ধীয় গদ্য রচনা পাওয়া যায়। উত্তর ভারতবর্ষে তহসীনের নৌ-তরজে-মুরস্‌সার (১৭৭৫ খ্রী) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে কতকগুলি গদ্য পাঠ্য-পুস্তক রচিত হয়। ইহার ফলে উর্দু গদ্যেও এক নূতন শৈলীর সৃষ্টি হইল যাহার পূর্ণ ব্যবহার হয় পঞ্চাশ বৎসর পরে। এই সময়কার রচনার মধ্যে মীর অম্মন-এর 'বাগোবহার', হায়দরী-র 'আরাইশে মহফিল', অফসোস-এর 'বাগে উর্দু', বেলা-র 'বেতাল পচীসী', জবান-এর 'সিংহাসন বত্তীসী', নিহলচন্দ-এর 'মজহবে ইশ্‌ক' উচ্চ স্তরের রচনা; উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইন্শা 'রানী কেতকী কী কহানী' এবং 'দরিয়ায়ে লতাফৎ' রচনা করিয়াছিলেন। লখনৌ ধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'কিসানাএ অজায়ব' (রচনা ১৮২৪ খ্রী) -এ ইহার লেখকের নাম বলা হইয়াছে রজব আলী। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে নূতন পাঠ্যক্রমের নিমিত্ত ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী কলেজে 'ভার্নাকুলার ট্রানস্লেশন সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি রামায়ণ, মহাভারত, লীলাবতী, ধর্ম-শাস্ত্র ইত্যাদি ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দেড় শত পুস্তকের উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইভাবে উর্দু গদ্যের উন্নতি হইতে থাকে এবং তাহা নূতন চেতনার সার্থক বাহক হইয়া ওঠে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের পরে উর্দু সাহিত্যে জাগৃতির বাস্তব রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণ স্পষ্ট। এই কারণগুলির ফলে যে নূতন চেতনার জন্ম হইল তাহাই নূতন কবি এবং সাহিত্যিকদের নূতন পরিস্থিতির অনুকূল রচনায় প্রভাবিত করে। এই সময়ের লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয় স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের (১৮১৭-৯৭ খ্রী)। তাঁহার নেতৃত্বেই হালী (১৮৮৭-১৯১৪ খ্রী), আজাদ (১৮৩৩-১৯১০ খ্রী), নজীর আহ্‌মদ (১৮৩৪-১৯১২ খ্রী) এবং শিবলী (১৮৫৭-১৯১৪ খ্রী) উর্দু গদ্য এবং কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রেরণায় প্রভাবিত হইয়া নিজেদের সাহিত্যকে সময়ের অনুকূল করিয়া তোলেন। এই সময়ে অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। নূতন এবং পুরাতনের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছিল; ফলে এই লেখকগোষ্ঠীর নিজেদের নূতন বিচারধারা প্রকাশ এবং প্রচার করিবার অনেক সুযোগ ছিল। এই যুগের সরূশার, শরর এবং মীর্জা রুস্‌বা-র নাম উল্লেখ করা

যাইতে পারে। ইঁহারা উর্দু উপন্যাসের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। এই যুগকে সমালোচনার যুগ বলা যাইতে পারে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই যুগের রচনাগুলির বিচার হইয়াছে। ইঁহারা যে সকল আলোচনা, নিবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, কবিতা ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন, তাহাই বর্তমান সাহিত্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আছে। এই যুগের সাহিত্যিকগণ নবচেতনার অগ্রদূত এবং নেতা -স্বরূপ ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইঁহারা বিদ্রোহী ছিলেন না; ইঁহাদের বিচারধারাই পরবর্তী যুগের লেখকদের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

বিংশ শতক আরম্ভ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সাহিত্যের মধ্যেও তাহার প্রকাশ দেখা দিতেছিল। ইহার পূর্ণ বিকাশ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রী), চকৃবস্ত (১৮৮২-১৯১৬ খ্রী), প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রী) ইত্যাদির রচনায় পাওয়া যায়। এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই ধারার সঙ্গে প্রাচীন ধারার রচনাও বলবৎ ছিল এবং অমীর (১৮৯৯ খ্রী), দাগ (১৯০৫ খ্রী), জলাল (১৯১০ খ্রী) এবং অন্যান্য কবিরা স্বরচিত গজলের দ্বারা পাঠকের মনোহরণ করিতেন। কোনও না কোনও রূপে এই ধারা এখনও প্রবাহিত হইতেছে। এই শতকের উল্লেখযোগ্য কবি: সফী, দুর্গাসহায় সুরূর, সাকিব, মহশর, অজীজ, রর্বা, হসরত, ফানী, জিগর, অসর। অন্যান্য লেখকের মধ্যে হসন নিজামী, রশীদুল খৈরী, সুলেমান নদবী, আবদুল হক, রশীদ আহ্‌মদ, মসুদ হসন, মৌলানা আজাদ এবং আবিদ হুসৈন উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান কালে সাহিত্যের সীমা আরও বিস্তৃত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখকেরা নিজের নিজের চিন্তা ও বিচারধারার সাহায্যে উর্দু সাহিত্যকে অন্যান্য সাহিত্যের সমকক্ষ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। কবিদের মধ্যে বর্তমানে জোশ, ফিরাক, ফৈজ, মজাজ, হফিস, সাগর, মুল্লা, রবিশ, সরদার, জমীল এবং আজাদের নাম উল্লেখযোগ্য। গদ্য-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্র, অশ্‌ক, হুসৈনী, মিণ্টো, হায়তুল্লাহ্‌, ইসমত, আহ্‌মদ নদীম, খ্বাজা আহ্‌মদ অব্বাস প্রসিদ্ধ। বিংশ শতকে সমালোচনা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে নিয়াজ, ফিরাক, জোর, কলীম, মজনূঁ, সুরূর, অখতর রায়পুরী, এহতেশাম হুসৈন, এজাজ হুসৈন, মুমতাজ হুসৈন, ইবাদত প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ধারার বিরোধ সমাপ্ত হইয়া বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক সাহিত্যরচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা এবং সাহিত্যের প্রভাবে 'ছায়াবাদী সাহিত্য' পুষ্টিলাভ করিয়াছে। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চেতনা প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে। এই আন্দোলন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া কোনও না কোনও রূপে আজ অবধি অব্যাহত রহিয়াছে। বিভিন্ন লেখকগোষ্ঠীর উপর মার্ক্‌স এবং ফ্রয়েডের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু লেখক মুক্তছন্দেও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই।

[এই প্রবন্ধে বন্ধনীমধ্যে একটি তারিখের উল্লেখ থাকিলে উহাকে মৃত্যুকাল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।]

সৈয়দ এহতেশাম হুসেন

উর্বশী স্বর্গের রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরা। ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ, শুক্লযজুর্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদ্দেবতা এবং বৌধায়নশ্রৌত-সূত্রে ইহার উল্লেখ ও কাহিনী পাওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উর্বশীর কাহিনী আছে। কথাসরিৎসাগরেও তাঁহার কাহিনী বর্তমান।

ঋগ্‌বেদের সংবাদসূক্তেই (১০।৯৫) পুরূরবা ও উর্বশীর প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায়। কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। শতপথব্রাহ্মণে (১১।৫।১) এই কাহিনী বিস্তৃততর। সংবাদসূক্তের আখ্যান অনুযায়ী উর্বশী চারি বৎসর পুরূরবার সঙ্গে ছিলেন কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তর্হিতা হন। পুরূরবা তাঁহাকে একটি সরোবরে অন্য অপ্সরাগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া— এমন কি আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়াও— উর্বশীকে তিনি ফিরাইতে পারেন না। শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায়, উর্বশী তিনটি শর্তে রাজার সঙ্গে যাইতে রাজি হন। শর্ত তিনটি এই: দুইটি মেষশিশু উর্বশীর শয্যায় আবদ্ধ থাকিবে; উর্বশী এক সন্ধ্যা ঘৃত আহার করিবেন; উর্বশী রাজাকে কখনও নগ্ন দেখিবেন না। গন্ধর্বগণ উর্বশীকে স্বর্গে ফিরাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাত্রিযোগে মেষশাবক অপহরণ করিলেন। উর্বশীর ক্রন্দনে পুরূরবা নগ্নাবস্থাতেই নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া মেষ উদ্ধার করিতে ধাবিত হইলেন। গন্ধর্বেরা আকাশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলেন এবং উর্বশী রাজাকে নগ্ন দেখিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এক সরোবরে তাঁহার সাক্ষাৎ পান।

উর্বশীর সহিত রাজার পুনর্মিলন হইয়াছিল কিনা তাহার

উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নাই। বৃহদ্দেবতায় বলা হইয়াছে, মিত্রাবরুণ উর্বশীকে কামনা করেন। উর্বশীর প্রত্যাখ্যানে তাঁহারা অভিশাপ দেন এবং ফলে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হন। এই কাহিনী পদ্মপুরাণে বিস্তৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণু কোনও এক সময়ে ধর্মপুত্র হইয়া ঘোরতর তপস্যা করেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য কামদেব ও অপ্সরাদিগকে পাঠান। অপ্সরাগণ বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ করিতে না পারায় ইন্দ্র আপনার উরু হইতে, কোনও কোনও মতে অপ্সরাদের উরু হইতে, উর্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। তখন মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে কামনা করেন। উর্বশী প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহাদের অভিশাপে তিনি মনুষ্যভোগ্যা হন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, নরনারায়ণ তপোনিরত হইলে ইন্দ্র ভীত হইয়া কামদেব ও অপ্সরাগণকে তপোভঙ্গার্থ প্রেরণ করেন। তাঁহারা বিফলমনোরথ হইলে নরনারায়ণ দেবতাগণকে বহু লাবণ্যময়ী রমণী দেখাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচন করিতে বলেন। দেবগণ উর্বশীকেই গ্রহণ করেন। কোনও কোনও পুরাণের মতে উর্বশী সমুদ্রমন্থনের সময়ে উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সাত জন মুনির সৃষ্টি, ইহাও কোনও কোনও পুরাণের মত।

বিষ্ণুপুরাণ (৪।৬) ও হরিবংশে (২৬) শতপথব্রাহ্মণের কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়। পুরূরবার সহিত পুনর্মিলন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, রাজার অনুনয় বিনয়ে উর্বশী প্রতি বৎসরের শেষ রাত্রিতে তাঁহার সহিত রাজার মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এইভাবে বাৎসরিক মিলনে তাঁহাদের পাঁচটি, মতান্তরে সাত কিংবা আটটি, সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর গন্ধর্বদের বরে উর্বশী ও পুরূরবা অবিচ্ছিন্ন হইয়া গন্ধর্বলোকে বাস করিতে লাগিলেন।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে পুরূরবা-উর্বশী-কাহিনীর একটি রূপান্তর পরিদৃষ্ট হয়। কালিদাসের কাহিনী এইরূপ: কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করিলে পুরূরবা তাহার কবল হইতে উর্বশীকে উদ্ধার করেন ও পরস্পর প্রণয়াসক্ত হন। স্বর্গে অভিনয়কালে ভ্রমক্রমে পুরূরবার নাম উল্লেখ করিয়া ফেলায় উর্বশী শাপগ্রস্তা হইয়া পুরূরবার স্ত্রী হন। পুত্রমুখ দর্শনের পর তাঁহার শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরূরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়।

মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন ও উর্বশীর বিবরণ পাওয়া যায়। অর্জুন যখন ইন্দ্রলোকে বাস করিতেছিলেন তখন একদা গন্ধর্ব চিত্রসেন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে উর্বশীকে জানান যে, অর্জুন তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়া অর্জুনের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার বাসভবনে যান। কিন্তু অর্জুন তাঁহাকে গুরুপত্নীতুল্য বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করেন। ক্ষুণ্ণা উর্বশী অর্জুনকে সম্মানহীন নপুংসক হইয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে বাস করার অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্রের বরে অর্জুন অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলারূপে থাকিয়া এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হন।

ভারতীয় সাহিত্যের নানা স্থানে উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনী ব্যবহৃত হইয়াছে। মধুসূদনের 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' নামক পত্রকাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতা নূতন ভাবনা ও দীপ্তিতে ভাস্বর।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উলা বীরনগর দ্র

উলার কাশ্মীরের হ্রদ। ভারতে অবস্থিত মিষ্ট জলের হ্রদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ৩৪°২০´ উত্তর, ৭৪°৩৭´ পূর্ব। উলার হ্রদের মধ্য দিয়া ঝিলম (বিতস্তা) নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। উলারের উৎপত্তি বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান সংক্ষেপে বিবৃত হইল: প্লাইস্টোসিন যুগে কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিম মুখ হিমবাহের প্রান্ত গ্রাবরেখার দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। ফলে সমগ্র উপত্যকাটি একটি বিশাল হ্রদে পরিণত হয়। অধুনালুপ্ত এই হ্রদটিকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ 'কারেয়া হ্রদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐ হ্রদ হিমবাহ-পরিবাহিত শিলাচূর্ণের দ্বারা পূর্ব দিক হইতে ভরাট হইতে থাকে। পরবর্তী কালে ঝিলম নদী ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত প্রান্ত গ্রাবরেখা ভেদ করিয়া কারেয়া হ্রদের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঝিলম নদীবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও কারেয়া হ্রদের বিস্তৃতি কমিয়া যায় এবং ডাল, উলার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়।

জলনির্গমনের পথ অগভীর বলিয়া উলার হ্রদ অঞ্চলের প্রান্তভাগ কখনও কখনও বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে পরিণত হয়। ধান এই জলাভূমি অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। উলার হ্রদ পদ্মবন ও পানিফলের গাছে পূর্ণ। তাই পদ্মমধু ও পানিফল সংগ্রহ এতদঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। হ্রদের মাছ ধরিয়া জেলেরা জীবিকা নির্বাহ করে। উলার পক্ষীশিকারীদেরও লোভনীয় স্থান। মাছ ও বনহংসের আকর্ষণে এখানে ভ্রমণবিলাসীদের সমাগম

ঘটে। কাশ্মীরের সুলতান জইন্‌-উল্‌-আবিদিন এই হ্রদের মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

দীপ্তি সেন

উলুবেড়িয়া হাওড়া জেলার অন্যতম মহকুমা এবং ঐ মহকুমার সদর। ২২°২৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৭´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে ইহা অবস্থিত। উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে হুগলি নদী। রেলপথে হাওড়া শহর হইতে ইহার ব্যবধান ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) ও জলপথে ৩০ কিলোমিটার (১৯ মাইল)। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাওড়া জেলার সমগ্র দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের পশ্চিমার্ধ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এই নিম্নভূমি অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু এবং দামোদর ও উহার শাখাগুলি দ্বারা বিধৌত। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপনারায়ণ প্রবাহিত। মহকুমাটির আয়তন ৯৮৮ বর্গ কিলোমিটার (৩৮৬ বর্গ মাইল)।

১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্নক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই স্থানে সদলবলে আগমন করেন। পরে অবশ্য মত পরিবর্তন করিয়া সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের সংকল্প করেন।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী উলুবেড়িয়া শহরের লোকসংখ্যা ১৮৫০৯ (১০৬৪১ জন পুরুষ ও ৭৮৬৮ জন নারী)। নারী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা ৭৩৯ : ১০০০। উক্ত জনগণনায় চেঙ্গাইল, ফোর্ট গ্লাস্টার, বাউড়িয়া, বুড়িখালি, বাণীতলা বা বাণীতবলা প্রভৃতি অঞ্চলসহ উলুবেড়িয়াকে একটি শহরসমষ্টি (টাউন গ্রুপ) ধরা হইয়াছে। এই শহরসমষ্টির মোট লোকসংখ্যা ৬৬২৯৯।

উলুবেড়িয়া শহরে কর্মে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৭৭১ জন পুরুষ ও ২৫৯ জন নারী। ইহাদের মধ্যে ২৮৮০ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে নিযুক্ত আছে। উলুবেড়িয়া শহরসমষ্টিতে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩০৮৭ জন পুরুষ ও ১২৪১ জন নারী। গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে নিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৯ ও ১৬২৬৪।

উলুবেড়িয়া মহকুমা চাউল এবং ইলিশ-তপ্‌সে ইত্যাদি মৎস্যের বড় ব্যবসায়কেন্দ্র। সুন্তি অঞ্চলের সুগন্ধি পান উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী উলুবেড়িয়া শহরের ৫২৫৫ জন পুরুষ ও ২০৭৫ জন নারী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত। শহরসমষ্টিতে এই হার যথাক্রমে ১৭৮৯৪ ও ৫১১৫। উলুবেড়িয়া শহরে একটি ডিগ্রি কলেজ আছে।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Howrah District Gazetteer*, Calcutta, 1909; *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Howrah*, Calcutta, 1951.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঐরাবতনাগ-বংশজাত কৌরব্যের কন্যা। তাঁহার পতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন। বনবাসকালে অর্জুন যখন গঙ্গাস্নানরত ছিলেন, উলুপী তাঁহাকে নাগলোকে লইয়া যান। বিধবা উলুপীকে অর্জুন বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে ইরাবান্‌ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রাক্কালে উলুপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন অর্জুনকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয় অর্জুনের ভীষ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। হতচৈতন্য অর্জুনকে উলুপীই আবার সঞ্জীবনী মণির সাহায্যে চৈতন্যদান করিয়াছিলেন।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব, ২১৪; বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উল্কা[১] মহাকাশের অসীম শূন্যতার মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণকারী কতকগুলি বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাতাসের সহিত সংঘর্ষের ফলে প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং পুড়িয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই উল্কা খুব বড় রকমের না হইলে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

কোনও কোনও সময়ে উল্কার ঝাঁক আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। এইরূপ ঘটনাকে উল্কাবৃষ্টি বলা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে উল্কাপাতের সংখ্যা অগণিত। নানা স্থানে পতিত বিভিন্ন রকমের উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের কতকগুলি খনিজ-মিশ্রিত প্রস্তর এবং কতকগুলি কেবল লৌহ ও নিকেল-মিশ্রিত ধাতব পদার্থে গঠিত। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি উল্কার মধ্যে আবার উভয়বিধ পদার্থেরই সমাবেশ দেখা যায়। ইহা ছাড়া উল্কাপিণ্ডগুলির মধ্যে গ্র্যাফাইট, হীরক, প্ল্যাটিনাম, লৌহ, নিকেল, রেডিয়াম, ম্যাগ্‌নেটাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতি নানা রকম পদার্থের অস্তিত্বও রহিয়াছে। পাঞ্জাবের ধরমশালায় প্রাপ্ত প্রস্তর-উল্কার মধ্যে সামান্য রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

উল্কা নানা বিচিত্র আকারের হইয়া থাকে। কতকগুলি দেখিতে মোচার মত, কতকগুলি নাশপাতির মত, কতকগুলি আবার পটলের মত, দুই দিক ছুঁচালো। ইহা ছাড়া চাকা বা থালার মত গোলাকার উল্কারও অভাব নাই। ছোট-বড় হিসাবে উল্কাপিণ্ডগুলির ওজনও দুই-এক

সের হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত মন পর্যন্ত হইয়া থাকে।

প্রস্তর-উল্কা ভঙ্গুর বলিয়া সহজেই বিদীর্ণ হইয়া বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু লৌহ-উল্কা লৌহ ও নিকেলের সংমিশ্রণে এত কঠিন থাকে যে সহজে ভাঙে না।

উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে আজও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ধরনের উল্কা এবং তাহাদের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরম্যাণ্ডির বিরাট উল্কাপাত সম্বন্ধে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী খনিজতত্ত্ববিদ্ বিয়ট বিবিধ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে উল্কাপিণ্ডগুলি আমাদের পৃথিবীর কোনও পদার্থ নয়, পৃথিবীর বহির্দেশ হইতেই এইগুলি আসিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বাহিরে কোথায়, কিভাবে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন: কোনও কোনও আগ্নেয়গিরি হইতে প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড বায়ুমণ্ডলের বাহিরে চলিয়া যায়, সেইগুলিই আবার উল্কা রূপে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসে। কাহারও মতে চন্দ্র অথবা অন্য কোনও গ্রহের আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত প্রস্তর বা লৌহখণ্ড আমাদের পৃথিবীতে উল্কারূপে পতিত হয়। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সূর্য বা নক্ষত্র হইতেও এরূপ বস্তুপিণ্ড উৎক্ষিপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে। অপর এক দল বলেন, কোনও ধূমকেতু সম্ভবতঃ কোনও কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহারই কিছু অংশ পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উল্কা রূপে দেখা দেয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীর নিকটবর্তী কোনও বিধ্বস্ত গ্রহ বা উপগ্রহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই উল্কা রূপে পৃথিবীতে ছুটিয়া আসে। কিন্তু মতবাদের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, উল্কাপিণ্ডগুলি যে পৃথিবীর কোনও পদার্থ নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ উল্কাপিণ্ডের উপাদানের সহিত অনুরূপ পার্থিব পদার্থের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

উল্কা[২] উল্কাপাত প্রাচীনকালে অমঙ্গলসূচক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলিয়া পরিগণিত হইত। উল্কাপাত হইলে এক অহোরাত্র অনধ্যায় পালনের ব্যবস্থা ছিল (মনুসংহিতা, ৪।১০৩, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।১৪৫)। বিভিন্ন ধরনের উল্কাপাত বিভিন্ন রকম অমঙ্গলের আভাস দিত (বৃহৎসংহিতা, ৩৩ অধ্যায়)। সম্ভাব্য এই সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করা হইত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্কাপাত মঙ্গলসূচক বলিয়াও গণ্য হয়।

দ্র রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উল্কি আদিম সমাজ হইতে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত নানা জাতি উপজাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য দেহের বিভিন্ন অংশ নানা রং দিয়া চিত্রিত করিবার ব্যবস্থা আছে। স্থায়ীভাবে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের চিত্রের প্রতিকৃতি আঁকিয়া রাখাকে উল্কি পরা বলা হয়। উল্কির রং সাধারণতঃ ধূসর বা নীল। উপজাতিগুলি মধ্যে অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের মেয়েরা উল্কি আঁকিয়া দেয়। প্রাচীন কালে বিভিন্ন গাছের কাঁটা বা সজারুর কাঁটা দিয়া দেহ-ত্বকের উপরিভাগ বিদ্ধ করা হইত ও একরকম গাছের আঠার সহিত মনুষ্যদুগ্ধ মিশাইয়া লওয়া হইত। বর্তমান কালে নীলাভ রং দ্বারা ইচ্ছানুরূপ নকশা আঁকা হয়, তাহার উপরে ধীরে ধীরে সূচি দ্বারা ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়। পরের দিন দেহের ঐ স্থান অতিশয় স্ফীত হয় এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ঘা শুকাইয়া গেলে উল্কির নকশা বাহির হইয়া পড়ে। আধুনিক কালে যন্ত্রের সাহায্যে উল্কি দেওয়া হয়। কাগজের খাতায় গাছপালা, পাতা, ফুল, মাছ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ইত্যাদি বিভিন্ন নকশা আঁকা থাকে। ইহার মধ্য হইতে নকশা পছন্দ করিয়া লইয়া যন্ত্র চালাইয়া দিলে সূচটি ওঠানামা করে এবং সূচের মধ্য হইতে রং বাহির হয়। বাংলা দেশের 'হাঘরি' নামক যাযাবর গোষ্ঠীর মেয়েরা এই কাজে বিশেষ পারদর্শী। তাহারা গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষায় যায় এবং হাটে-বাজারে বা মেলায় বসিয়া এই উল্কি পরানোর কাজ করে। মূল্য হিসাবে নগদ পয়সা বা চাল গ্রহণ করে।

উল্কি নেওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রহিয়াছে। দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধিই হইল প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের মতে ডাইনি বা জাদুবিদ্যার সম্মোহন হইতে ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষা করিবার জন্য দেহে স্থায়ীভাবে উল্কির চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হয়। পলিনেশীয় উপজাতিগুলির বিশ্বাস উল্কি পরিলে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। মাওরী উপজাতি শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে মুখে বীভৎস আকৃতির উল্কি পরে। আসামের আদি (আবর) উপজাতির মধ্যে পুরুষের দেহে কোনও উল্কি না থাকিলে তাহার বিবাহ করা চলে না। এই চিহ্ন তাহাদের পক্ষে সম্মানসূচক। গণ্ড, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতির স্ত্রীলোক সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসে উল্কি পরিয়া থাকে। দক্ষিণ

ভারতের টোডা উপজাতির স্ত্রীলোকেরা সন্তানবতী হইলে হাতে ও বুকে উল্কি পরিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বর্তমান কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ 'রাধাকৃষ্ণ', 'হরিনাম সত্য' ইত্যাদি শব্দ বুকে বা হাতে আঁকিয়া লয়। ইহার পিছনে রহিয়াছে এক ধরনের ধর্মপ্রবণতা। গ্রামাঞ্চলে বাঙালী পরিবারেও উল্কির চলন দেখা যায়।

পূর্ব বঙ্গে এক সময়ে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে উল্কি বা গোদ্ধানি ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ ইহা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। মেয়েরা কপালে, নাক ও চিবুকের উপরে টিপ ও নানা প্রকার চিত্রাকার উল্কি ব্যবহার করিত, পুরুষেরা কপালে উল্কির টিপ পরিত। কপালে উল্কির ফোঁটা হইল লক্ষ্মীশ্রীর চিহ্ন, হাতে ময়ূরের চিহ্ন ব্যক্তিত্ব বা কর্তৃত্বের জ্ঞাপক। সন্তানবতী হইবার উদ্দেশ্যে মাছের চিহ্ন আঁকিয়া নেওয়ার প্রথা ছিল। সীতার চিহ্ন সতীত্বের জ্ঞাপক।

আধুনিক কালে উল্কি পরার এই অনুষ্ঠান অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তবে এখনও কেহ কেহ, বিশেষতঃ সৈনিকেরা নানা নূতন ধরনে শরীরের বিভিন্ন স্থানে (বাহুতে, বক্ষে) উল্কি অঙ্কিত করে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

উশীনর[১] ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অনুযায়ী উশীনর মধ্যদেশে কুরু-পঞ্চালের নিকট অবস্থিত জনপদ। গোপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, বশ (পরবর্তী কালে বৎস) ও উশীনর গোষ্ঠী একত্রে বসবাস করিত। সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদের কালেও তাহারা এই দেশেই বাস করিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পরবর্তী কালের কাশী ও বিদেহ -বাসী গোষ্ঠী ইহাদেরই বংশধর। পুরাণের বংশাবলীতে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় আনব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উশীনর নামক নৃপতি পাঞ্জাবে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহা তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। মুলতানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন 'শিবি'; পশ্চিম পাকিস্তানের মণ্টগোমারি জেলা এবং বর্তমান বিকানীর জেলার উত্তরাংশ লইয়া 'নৃগ' একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। যৌধেয়গণ এই বংশ হইতে উদ্ভূত; 'নব' নবরাষ্ট্রের এবং 'কৃমি' কৃমিলা শহরের অধিপতিগণের পূর্বপুরুষ; 'সুব্রত' সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাবের অম্বষ্ঠগণের আদিপুরুষ। উশীনরের পুত্রগণের মধ্যে শিবিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনিই শিবি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. I, London, 1951.

উশীনর[২] পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে উশীনর যদুবংশীয় নরপতি মহামনার পুত্র; পুত্রের নাম শিবি। উশীনর অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং বহু পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার ধর্মবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র শ্যেনমূর্তি গ্রহণ করিয়া কপোতমূর্তি ধারণকারী অগ্নির পশ্চাদ্ধাবন করিলে কপোত উশীনর রাজার ঊরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্যেন আপনার ভক্ষ্য কপোতকে মুক্তি দিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করে। আশ্রিত-পরিত্যাগ ঘোর অধর্ম বলিয়া রাজা তাহাতে অসম্মত হন এবং কপোতের পরিবর্তে অন্য কিছু প্রার্থনা করিতে বলেন। শ্যেন তখন রাজার নিজ দেহ হইতে কপোতের সমপরিমাণ মাংস প্রার্থনা করে। রাজা আপনার দেহ হইতে স্বহস্তে মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কপোতের ওজনমত মাংস না হওয়ায় অবশেষে নিজেই তুলাদণ্ডে উঠিয়া আসিলেন। শ্যেন এবং কপোত তখন স্ব স্ব প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়া রাজার ধর্মবলের প্রশংসা করে।

উষস্‌, উষা বৈদিক দেবতা। ঋগ্‌বেদের ২০টি সূক্তে এই দেবতার স্তুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনোহারিণী উষার বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ বৈদিক ঋষিগণের অন্তর হইতে দেবী উষার উদ্দেশে স্তোত্রগুলি স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঔষস সূক্তগুলিকে শেলি, কীট্‌স প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ গীতিকবিতার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

ঋষিকবিগণ উষাকে অপূর্ব সজ্জায় ভূষিতা প্রণয়িনী তরুণী রমণীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত কয়েকটি ঋক্‌ (রমেশচন্দ্র দত্ত -কৃত অনুবাদ) এইরূপ :

উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ [দোহনকালে] স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন (১৷৯২৷৪)।

সুপ্ত প্রাণীদিগকে জাগরিত করিয়া উষা অরুণ-অশ্বযুক্ত রথে আগমন করিতেছেন (১৷১১৩৷১৪)।

মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেইরূপ দীপ্তমান্‌ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন (১৷১১৫৷২)।

মাতা দেহমার্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর (১৷১২৩৷১১)।

বৈদিক ঋষিগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে উষার চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। একটি মন্ত্রে (১৷৯২৷১০) ঋষি বলিতেছেন, 'ব্যাধপত্নী যেরূপ চলনশীল

পক্ষীর পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে, সেইরূপ পুনঃপুনঃ আবির্ভূত, নিত্য এবং একরূপধারিণী উষা দেবী [দিনে দিনে] সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।' অপর একটি মন্ত্রে (১।১২৩।২) ঋষি কক্ষীবান্ বলিতেছেন: 'তিনি যুবতী এবং পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়েন।'

উষাকে 'দিবো দুহিতা' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উষা ও রাত্রি দুই ভগিনী। বহু সূক্তে 'নক্তোষাসা' এই শব্দে উভয়কে যুগপৎ আহ্বান করা হইয়াছে। দুইজনেই 'দিব্যযোষা'—'যোষণে দিব্যে মহী ন উষাসানক্তা'। সূর্য-দেবকে উষাদেবীর প্রণয়ী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি প্রণয়ীর ন্যায় মনোহারিণী উষার অনুগমন করেন। আবার কোথাও অগ্নিই তাঁহার প্রণয়ী রূপে কীর্তিত। উষা অশ্বিদ্বয়ের সখী। উষাদেবীর রথের বাহক অরুণবর্ণ অশ্ব, গো বা বৃষভ—'অরুণ্যো গাব উষসাম্' (নিরুক্ত)। 'মঘোনী' 'ঋতাবরী' 'হিরণ্যবর্ণা' 'অমৃতা' 'দক্ষিণা' প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

ঋক্‌সংহিতায় উষার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায় তাহাতে তাঁহার দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে সহজেই ধারণা জন্মে (ঋক্ ৬।৫৯।৬)। সুতরাং আমাদের পরিচিত স্বল্পস্থায়ী উষা হইতে যে বৈদিক উষা বিভিন্ন, ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার 'আর্ক্‌টিক হোম ইন দি বেদজ' নামক গ্রন্থে বৈদিক উষা যে মেরু-প্রদেশীয় চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক আলোক (অরোরা বোরিয়ালিস) ভিন্ন আর কিছুই নহে, নানা প্রমাণের সাহায্যে এই মত স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক আর্যগণ মেরুদেশীয় দীর্ঘ উষার অপূর্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়াই এই সকল স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

উষ্ট্র দুই প্রজাতির উষ্ট্র দেখা যায়: ব্যাকৃট্রিয় ও আরবীয়। ব্যাকৃট্রিয় উটের পিঠে দুইটি এবং আরবীয় উটের পিঠে একটি কুঁজ থাকে। ভারতে আরবীয় উটই পাওয়া যায়। প্রধানতঃ রাজস্থান, পাঞ্জাব, কচ্ছ ও উত্তর প্রদেশেই উট দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারত, সৌরাষ্ট্র ও বোম্বাইয়ের উত্তরাংশেও অল্প কিছু উটের অস্তিত্ব আছে। ভারতীয় উটকে সমভূমির উট ও পাহাড়ী অঞ্চলের উট, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সমভূমির উট আবার দুই প্রশাখায় বিভক্ত নদীবহুল অঞ্চলের উট ও মরুভূমির উট।

উট কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে ও বেশ কয়েক দিন জল ব্যতীত থাকিতে পারে। ইহারা রোমন্থন করিতে পারে এবং পাকস্থলীর সহিত সংযুক্ত কয়েকটি বিশেষ কক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। জলাভাবের সময় এই সঞ্চিত জল দেহের কার্যে লাগাইতে পারে বলিয়াই উট দীর্ঘ দিন জলপান না করিয়াও বাঁচে। এইজন্য স্বল্পবৃষ্টির দেশগুলিতে বা মরুভূমিতে পরিবহনকার্যে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। জলস্পর্শ না করিয়াও ক্রমাগত তিন দিন ভার বহিয়া চলিতে পারে এবং কেবল একজন আরোহী লইয়া পাচ দিন পর্যন্ত চলিতে পারে। বলিষ্ঠতর উটগুলি ৭০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ভার বহন করে। যে সকল উট গুরুভার বহন করে তাহারা দিনে প্রায় ২৫ মাইল যায়। আবার দ্রুতগামী উটেরা ৬০ হইতে ৯০ মাইল পর্যন্ত যাইতে পারে। পাঞ্জাবে মাল ও যাত্রী-বহন, জমিচাষ, ফসল ঝাড়াই, আখ মাড়াই, গাড়িটানা প্রভৃতি সকল কাজেই উটের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। আরব দেশে উটের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া গণ্য হয়, উটের দুধও পান করা হয়। উটের লোম হইতে তাঁবুর কাপড়, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

উট সাধারণতঃ ৪০।৫০ বৎসর বাঁচে। কিছু উন্মুক্ত জমি ও রৌদ্রবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষার জন্য একটি ছাউনি —উষ্ট্রপালনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সাধারণতঃ দীর্ঘ, সরস ঘাস ছাড়া আর কিছুই ইহারা চরিয়া খায় না। ভারি কাজের সময় পাত্রে করিয়া অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। এই খাদ্যে শুষ্ক ঘাসপাতা ও দানা, ছোলা, মটর, তুলার বীজ, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের দানা থাকা প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে গুল্ম, কাঁটাগাছ ইত্যাদি খাওয়ার ফলে উটের কুঁজ আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন আহার্যবস্তু দুর্লভ হয়, তখন কুঁজটি ক্রমে ছোট হইতে থাকে।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

উষ্ণতা ফুটন্ত জলে হাত ডুবাইলে যে স্নায়বিক অনুভূতি হয়, তাহাকে তপ্ততা এবং বরফমিশ্রিত জলে হাত দিলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাহাকে আমরা শীতলতা বলিয়া থাকি। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর তপ্ততা ও শীতলতার তারতম্য আমরা স্পর্শের দ্বারা মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারি। যেমন পানীয় জল অপেক্ষা ফুটন্ত জলকে বেশি গরম এবং সাধারণ বরফজল অপেক্ষা লবণমিশ্রিত বরফজলকে অধিক ঠাণ্ডা মনে করিয়া থাকি।

যদিও স্পর্শের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উত্তাপের তার-তম্যের বিচার করা যায়, তথাপি এই অনুভূতি গুণগত ও স্পর্শকারীর উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত। অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের ন্যায় পদার্থবিজ্ঞানেও কোনও গুণ, অবস্থা বা ধর্মকে ব্যক্তিগত অনুভূতির ঊর্ধ্বে সর্বজনীন বিশেষ রূপ

দেওয়ার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেইহেতু পদার্থবিজ্ঞানে সকল অবস্থা বা ধর্মকে মোটামুটি পরিমাণগত রূপ দেওয়া হইয়াছে। কোনও বস্তুর মধ্যে যে উত্তাপ ও শীতল ভাব লক্ষিত হয়, তাহার তীব্রতা নির্ণয়ার্থ যে পরিমাপক সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে পদার্থবিদ্যায় উষ্ণতা বা টেম্পারেচার বলে।

সুতরাং উষ্ণতা বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা যাহার দ্বারা বস্তুর মধ্যে পরিমাণগত ভাবে উত্তপ্ততার পরিমাপ করা হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে বস্তুর যাহা প্রয়োজন, তাহাকে আমরা তাপ বা হীট বলিয়া থাকি। অবস্থান্তর না হইলে অর্থাৎ কঠিন হইতে তরল অথবা তরল হইতে বায়বীয় এইরূপ পরিবর্তন না ঘটিলে কোনও বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে সমান তাপে সমান উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এক গ্রাম বস্তুর এক একক উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে স্পেসিফিক হীট বলা হয়। বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর স্পেসিফিক হীট -এর মান বিভিন্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যেমন বেশি উচ্চতার স্থান হইতে কম উচ্চতার স্থানে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ বেশি উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুর প্রতি তাপ প্রবাহিত হয়। ইহা পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম।

বস্তুর অবস্থান্তর না ঘটিলে সমান উষ্ণতার সহিত সমান আয়তন পরিবর্তন হয়, মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে উষ্ণতা নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। যে যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণতার মাপ নির্ধারণ করা হয় তাহাকে উষ্ণতাপরিমাপক যন্ত্র বা থার্মোমিটার বলে।

উষ্ণতা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেল আছে— তাহার মধ্যে সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট, রোমার, কেল্‌ভিন (অ্যাবসল্যুট) ও র‍্যাঙ্কিন -এর নাম করা যাইতে পারে। এই সকল স্কেলে বরফজল ও ফুটন্ত জলের উষ্ণতার মানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা আছে :

	সেন্টি.	ফারেন.	রোমার	কেল্‌ভিন	র‍্যাঙ্কিন
হিমাঙ্ক	০	৩২	০	২৭৩	৪৯১
স্ফুটনাঙ্ক	১০০	২১২	৮০	৩৭৩	৬৭১
দুই মানের মধ্যকার ভাগ	১০০	১৮০	৮০	১০০	১৮০

সহজেই দেখানো যায়, কোনও বস্তুর উষ্ণতা প্রথম তিন স্কেলে ক খ গ দ্বারা সূচিত হইলে তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এইরূপ হইবে :

$$\frac{ক}{১০০} = \frac{খ - ৩২}{১৮০}$$

উষ্ণ প্রস্রবণ ভূমির অভ্যন্তরস্থ জলরাশি ধারাপথে ভূমির উপরিতলে উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে প্রস্রবণ বলে। কোনও প্রস্রবণের জলরাশির তাপাঙ্ক (টেম্পারেচার) স্থানীয় জলবায়ুর গড় তাপাঙ্ক হইতে অন্ততঃ ১০° সেন্টিগ্রেডের অধিক হইলে উহাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলা হয়। যে প্রস্রবণের জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ অধিক (১০০০-এ ১ ভাগের অধিক) তাহাকে খনিজ প্রস্রবণ বলে। অধিকাংশ উষ্ণ প্রস্রবণই খনিজ প্রস্রবণ এবং অধিকাংশ খনিজ প্রস্রবণই উষ্ণ।

উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ভূগর্ভের যে জলরাশি (গ্রাউণ্ড ওয়াটার) নির্গত হয় তাহার উত্তাপের দ্বিবিধ কারণ থাকা সম্ভব। ১. বৃষ্টির জলের যে অংশ (মিটিওরিক্ ওয়াটার) ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা ভূতলের কোনও উত্তপ্ত শিলার সংস্পর্শে আসিয়া তাপ গ্রহণ করিতে পারে। ২. পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ যে গলিত উত্তপ্ত পদার্থ (ম্যাগ্‌মা) হইতে আগ্নেয় শিলার জন্ম হয়, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট জলে ('জুভেনাইল ওয়াটার' বা 'সদ্যোজাত জল') যথেষ্ট উষ্ণতা থাকে। উক্ত 'সদ্যোজাত জল' ভূমির অভ্যন্তরস্থ অন্য জলরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করিয়া তোলে।

কোনও উষ্ণ প্রস্রবণের জলে 'সদ্যোজাত জলে'র পরিমাণ কত তাহাও নির্ণয় করা যায়। যদি বৃষ্টিপাতের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত কোনও প্রস্রবণের জলের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি পায় তবে উহাতে বৃষ্টির জলেরই প্রভাব অধিকতর। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রস্রবণের জলে দ্রবীভূত সিলিকা, চুন ও লবণ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। কিন্তু যদি প্রস্রবণের জলের পরিমাণের সহিত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্পর্ক না থাকে এবং যদি জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড, গন্ধক, বোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহা হইলে ম্যাগমা-সংশ্লিষ্ট 'সদ্যোজাত জল'ই উষ্ণতার কারণ।

যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ফুটন্ত জলরাশি কিছুক্ষণ অন্তর প্রবল বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাদিগকে গেজার (geyser) বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত এক বৃহৎ জলস্তম্ভের নিম্নভাগের তাপাঙ্ক জলের স্ফুটনাঙ্ক (যাহা ভূপৃষ্ঠের নিম্নে অধিক চাপের জন্য ১০০° সেন্টিগ্রেডের অধিক) অতিক্রম করিলে সেইস্থানের জলরাশি বাষ্পে পরিণত হয়। ফলে তাহার আয়তন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পরিচলনক্রিয়ায় এই অতিতাপিত জলের কিয়দংশ উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করে এবং স্তম্ভের উপরিভাগের কিছু জল নির্গত হইয়া যায়। ফলে জলস্তম্ভের নিম্নাংশে চাপ কমিয়া যায় এবং একই সময়ে অনেক পরিমাণে জল (যাহা

ইতিপূর্বেই স্ফুটনাঙ্কে ছিল) হঠাৎ বাষ্পে পরিণত হয়। এই অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটে এবং জলরাশি প্রবলবেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। একবার বিস্ফোরণ হইবার পর আবার যতক্ষণ না জলরাশি সঞ্চিত হইয়া যথেষ্ট গরম হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ আর বিস্ফোরণ হয় না। আইসল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যাণ্ডের গেজারগুলি প্রসিদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'ইয়োলোস্টোন ন্যাশন্যাল পার্ক'-এ ৩০০০ উষ্ণ প্রস্রবণ ও ২০০টি গেজার আছে। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিউজিল্যাণ্ডের একটি গেজার হইতে বিস্ফোরণের ফলে জলরাশি ১৩০০ ফুট উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হইত।

উষ্ণ প্রস্রবণের জলে দ্রবীভূত পদার্থগুলি প্রস্রবণের মুখে জমিয়া স্পঞ্জের ন্যায় একপ্রকার ছিদ্রযুক্ত শিলার (সিণ্টার) সৃষ্টি করে। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার . সিলিকাযুক্ত (সিলিশাস) এবং চুনযুক্ত (ক্যালকেরিয়াস)। কোনও কোনও প্রস্রবণের মুখে বিচিত্র বর্ণের শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ (অ্যালজি) সঞ্চিত হইয়া বর্ণোজ্জ্বল পটভূমি রচনা করে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকুমার ঘোষ ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া ভারতের খনিজ ও উষ্ণ প্রস্রবণ সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ করেন ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতির ভাষণে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের খনিজ প্রস্রবণগুলি প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে বিন্যস্ত: ১. বিহারের কয়লাখনিগুলির সীমানার সমান্তরাল অঞ্চল এবং রাজগীর ও মুঙ্গের। ২. ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রত্নগিরি, থানা, কোলাবা প্রভৃতি অঞ্চল। ৩. সিন্ধু-বেলুচিস্তান অঞ্চল (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত)। ৪. হিমালয় অঞ্চল। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থানে (যেমন, পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে) উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

জলের প্রকৃতি অনুসারে ভারতের উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. বিশুদ্ধ জলের প্রস্রবণ : ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থ অতি অল্প। রাজগীরের ব্রহ্মকুণ্ড ইহার দৃষ্টান্ত। ২. ক্ষারযুক্ত জলের প্রস্রবণ : দ্রবীভূত পদার্থের মধ্যে সোডা, পটাশ প্রভৃতি ক্ষারজাতীয় (অ্যালক্যালাইন) পদার্থই প্রধান। হাজারিবাগের গান্ধোয়ানি ক্ষারযুক্ত জলের প্রস্রবণ। ৩ গন্ধকযুক্ত জলের প্রস্রবণ : গন্ধক 'সদ্যোজাত জলে'র উপস্থিতি প্রমাণ করে। হাজারিবাগের দুয়ারি ও সুরজ কুণ্ডের জল গন্ধকযুক্ত। ৪. লবণাক্ত জলের প্রস্রবণ : ইহাতে দ্রবীভূত লবণই পরিমাণে সর্বাধিক। মহারাষ্ট্রের কুণ্ডগুলি ইহার দৃষ্টান্ত। যথা, উনহেরা (কোলাবা), উনহারা (রত্নগিরি) ও বজ্রেশ্বরী (থানা)।

ইহা ব্যতীত কাংড়া উপত্যকায় অবস্থিত জ্বালামুখীর প্রস্রবণের জল আয়োডিনযুক্ত এবং মহারাষ্ট্রের কিছু কুণ্ডের জলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্তমান।

কুণ্ডের জলে রোগ নিরাময় হয় বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে। প্রস্রবণের জলে গন্ধক, আয়োডিন প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে বলিয়া সম্ভবতঃ এরূপ ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির প্রভাবও এরূপ লোক-প্রসিদ্ধির কারণ হইতে পারে।

শ্রমশিল্পের প্রয়োজনে ও অন্যান্য কাজে অধুনা উষ্ণ-প্রস্রবণের তাপশক্তি নানাভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, আমেরিকার ক্যালি-ফোর্নিয়া অঞ্চলের গেজারগুলির নিকট গভীর কূপ খনন করিয়া ভূগর্ভস্থ বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। শিবসুন্দর দেব প্রমুখ ভূতত্ত্ববিদ্ মনে করেন ভারতের কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণও এরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ বক্রেশ্বর ও সাঁওতাল পরগনার তাতলোই প্রস্রবণগুলি হইতে তাপশক্তি উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

ভারতের অধিকাংশ উষ্ণ প্রস্রবণ তীর্থমাহাত্ম্যমণ্ডিত।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্মিলা দেবী (১৮৮৩-১৯৫৬ খ্রী) পিতা ভুবনমোহন দাস, মাতা নিস্তারিণী দেবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইঁহার অগ্রজ। জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি। আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রাম। স্বামী অনন্তনারায়ণ সেন।

অসহযোগ আন্দোলনে যে তিনজন বাঙালী মহিলা প্রথম আইন অমান্য করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন, উর্মিলা দেবী তাঁহাদের অন্যতম। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী ও দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী সরকারি নিষেধ অমান্য করিয়া কলিকাতার রাজপথে খদ্দর বিক্রয় করেন এবং তৎকালীন যুবরাজের আগমন উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর হরতাল পালন করিবার আহ্বান জানান। পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। ইহার ফলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্গের অন্যত্রও অনেক মহিলা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অতঃপর এই সময়ে উর্মিলা দেবী কলিকাতায় যে 'নারী-কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা

করেন, তাহার দ্বারাও অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ পোষকতা ও প্রচার হইতে থাকে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বেই ভারতরমণীসমাজ রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনে নারীজাতির দায়িত্বপালনের পূর্ণ গৌরব অর্জন করেন। স্বয়ং গ্রেপ্তার হইবার পূর্বে মহাত্মা গান্ধী নারীসমাজের প্রতি যে নিবেদন জানান, তাহার ফলে কলিকাতায় নারী-সত্যাগ্রহসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উর্মিলা দেবী ছিলেন এই সমিতির সভানেত্রী। বঙ্গের বহু প্রবীণ ও নবীন মহিলা কর্মী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, কলিকাতাবাসী ভিন্নপ্রদেশীয়া বহু স্বদেশসেবিকাও ছিলেন এই সমিতির কর্মী। নারী-সত্যাগ্রহ সমিতির পিকেটিং-এর ফলে কলিকাতায় এই সময়ে বিদেশী বস্ত্র আমদানি একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া উর্মিলা দেবী পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হন এবং নিষিদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার ফলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের সময়েও উর্মিলা দেবী তাঁহাদের আনুকূল্যবিধানে বিশেষ দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসের পরিচয় দেন।

সাহিত্যরচনাতেও উর্মিলা দেবীর অনুরাগ ছিল; যৌবনে তিনি 'পুষ্পহার' নামে একখানি গল্পের বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির যে সকল স্মৃতিকথা তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদের ব্যক্তিজীবনের কোনও কোনও বিশেষ দিকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধমালার অন্যতম 'কবি-প্রিয়া'তে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর বিস্মৃতপ্রায় নিভৃতবাসী জীবনের ঔজ্জ্বল্য দীপ্যমান হইয়াছে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; 'Urmila Devi', *The Calcutta Municipal Gazette*, 19 May, 1956.

পুলিনবিহারী সেন

উষা উষস্ দ্র।

উষানাথ সেন (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রী) খ্যাতনামা সাংবাদিক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত নৈহাটির সন্নিকটে গরিফায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নবীনকৃষ্ণ সেন, মাতা শিবানী দেবী। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের প্রধান কর্মস্থল ছিল দিল্লী। কেশবচন্দ্র রায়ের সহযোগী রূপে কর্মজীবনের সূত্রপাত করিয়া পরে তিনি 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'-র (১৯১০ খ্রী; পরবর্তী কালে 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া'য় রূপান্তরিত) দিল্লী কেন্দ্রের ম্যানেজার হইয়াছিলেন।

দিল্লী ও সিমলায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীতে উষানাথের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই প্রতিপত্তি তাঁহার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে অনেক সহায়তা করিয়াছে। সরকারি মহলে তাঁহার জনপ্রিয়তার ফলে কেশবচন্দ্র রায়ের পর তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ইহা ছাড়া তিনি সি বি. ই. (১৯৩১ খ্রী) ও নাইট (১৯৪৪ খ্রী) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বহুকাল তিনি দিল্লীর প্রেস গ্যালারি কমিটি ও প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। দিল্লীর রোটারি ক্লাব তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স সোসাইটিরও তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। দুঃস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য উষানাথ বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ দান করিয়া যান।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গা দাস

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	৭	স্বরূপসম্ভোবন	স্বরূপসম্বোধন
১৬	১	২৫	দন্তধাবণপূর্বব	দন্তধাবনপূর্বক
১৯	২	১৭	পুরাণ ও	পুরাণও
৩১	১	৩০	Heigel	Hugel
৩২	১	১৫	অথবা	অথর্বন্, অথর্বা
৪২	২	১৭	ব্রহ্মবেদ	ব্রহ্মবেদ
৪৩	২	৭	মায়া—উপাধিবশতঃ	মায়া-উপাধিবশতঃ
৪৬	১	৩২	সর্বজ্ঞাতাত্মমুনি	সর্বজ্ঞাত্মমুনি
৪৮	১	২	সুষণ	সুষণা
৪৯	১	৬	সুমেরু	সমেরু
৬০	১	১৫	অজিতকুমার রায়চৌধুরী	…চৌধুরী
৬০	১	১০	Vol. IV	vol. II
,,	,,	২১	1955	1960
,,	,,	২০	1934	1930
৮৬	১	১	1952	1942
১১৬	২	২২	সূর্যসিদ্ধান্তে ছিল না	সূর্যসিদ্ধান্তে আদিতে ছিল না
১১৭	১	১৮, ১৯	গ্রহস্পষ্ঠ	গ্রহস্পষ্ট
১২৬	২	৯	Walrus	Walras
১২৯	২	১৬	Operative	Operations
১৩৭	২	২৫	১৩১৫ খ্রী	১৭১৫ খ্রী
১৪৯	১	৪০	৯৯০-১০৬৩ খ্রী	৯৯০-১০৬৬ খ্রী
১৫১	২	৫-৬	রসালংকার…তথাপি	রসালংকার…শাস্ত্রং তথাপি
১৫৮	১	৮	সেকেণ্ডে ১ মিটার	সেকেণ্ডে ১ ফুট বা ০·৩০৪৮ মিটার
১৬১	১	৭	৩৮-৯	৩৪৮-৯
১৯২	১	৩৪	অস্টিওব্রাস্ট	অস্টিওক্লাস্ট
১৯২	২	১৪	ক্রিয়াবরণ	ক্রিয়াকরণ
১৯৪	২	৫	পশ্চিম ভারতের সম্পর্ক ছিল	পশ্চিম ভারতের শকদের সম্পর্ক ছিল
১৯৭	১	৩৫	উটমালজাই	উটমানজাই

পৃষ্ঠা	কলম	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৪	১	১৫	হিন্দু সাহিত্য	হিন্দী সাহিত্য
২০৪	২	১৩	J. Douson	J. Dowson
২৩১	২	২২	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	…বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪০	১	৩৮	সমত্ববোধ	মমত্ববোধ
২৮৫	২	৪১	কীয়িনা	কীনিয়া
২৯৪	৪-৫	৪	প্রাক্তন উপনিবেশ	প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ
২৯৫	৬	১২	১৯৫৬ খ্রী	১৯৩৬ খ্রী
৩০৭	২	১৯	এনসেফেলোগ্রাম	ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ
৩১৩	২	৩৩	সারবত্তে	অসারবত্তে
৩২৩	২	৪১	আয়সংগ্রহ	আয়করসংগ্রহ
৩৩৫	২	৬	২° হইতে ৪° সেন্টিগ্রেডে	২° হইতে ৪° সেন্টিগ্রেড
৩৪২	২	১৯	ফ্লতস	ফ্লতস
৩৪২	২	২৯	বেতের আল	খেতের আল
৩৪৫	২	১৯	১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে	১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে
৩৬২	২	৩৪	১০০০ পাউণ্ড	১০০ পাউণ্ড
৩৬৬	১	১০	১০০০	১০০০০
৩৮০	১	২৪	৩×১০^{-১০}	৩×১০^{১০}
৩৮৬	১	২৪	'ইসলামী দর্শন' দ্র	'ঐসলামিক দর্শন' দ্র
৩৮৬	১	২০	সুয়াতুল	সুরাতু-ল্
৪০৫	১	৩৪	১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে	১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে
৪৪৮	১	৩০	ইউরেনিয়াসের	ইউরেনিয়ামের
৪৭৭	২	১৩	তাহার বারান্দা.	তাহার পর বারান্দা.
৪৯০	২	৪১	যন্ত্রশিল্প	বস্ত্রশিল্প
৪৯২	২	৫	১৮২ কোটি টাকা	১·৮২ কোটি টাকা
৪৯৭	১	২৯	কৃষ্ণন ইতিপূর্বেই সমিতির…	কৃষ্ণন নিযুক্ত হন। কৃষ্ণন ইতিপূর্বেই…
৬১৫	১	২৮	Excavations	Exploration
৬২১	১	১২	সাধারণ	সাধারণতঃ

অদ্বৈত আচার্য (পৃ ৪৪) আবুল কালাম আজাদ (পৃ ৩০২) ও ঈদ অল্-ফিত্র্ (পৃ ৫৪১) প্রসঙ্গগুলিকে যথাক্রমে অদ্বৈতচরণ আঢ্য (পৃ ৪৪), আবুল ফজল (পৃ ৩০৬) ও ঈদ-উজ্-জোহা (পৃ ৫৪১) -এর পূর্ববর্তী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা ১৩